পারিচারিকা—সূচী।

	বিষয়।	লেখক, লেখিকা।			পত্রাঙ্ক।
স্বরলিপি	কথা—বিদ্যাপতি। সুর ভানু সিংহ স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা		...	...	৬৯৭
ঐ	কথা ও সুর—কবি চণ্ডীদাস শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	...	...	...	৮০৪
	সেবিকা (গল্প) শ্রীমতী নীহারবালা দেবী		...	...	২৮৪
	স্বাস্থ্যরক্ষা (বঙ্গ সন্দর্ভ) শ্রীযুক্ত বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, এম-বি,			...	৬৭৩
	(হ)				
	হয়েছিল কবে পরিণয় (কবিতা) শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ,			...	৭২৭
	হাসি ও কান্না (কবিতা) শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ			...	৮২৮

লেখক-লেখিকার নামানুক্রমিক সূচী।

—:*:—

লেখক, লেখিকা	বিষয়			পত্রাঙ্ক।
	(অ)			
শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্ত বি-এ.	বংশানুক্রমিক রচনা (সন্দর্ভ)	...	...	৭৬
	(মামেরং ল্যাং প্রথা (সন্দর্ভ)	...	...	২৯১
শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী	বিদ্যারণ্য (নাটক)			২৫২, ৩২৫, ৪৩০, ৪৬৫, ৫৩৬,
শ্রীযুক্ত অক্রমান দাস গুপ্ত বি-এ,—	সাহিত্যে নীতিশিক্ষা (আলোচনা)		...	১৫৭
,, অসিত কুমার হালদার—	ভারতের কথা (সন্দর্ভ) ...		...	৫৬৬
	আ			
শ্রীযুক্তা আমোদিনী ঘোষ—	আশা (কবিতা) ...	...	...	৩১৮
	ই			
শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দে মজুমদার বি-এ. এম-এস-সি—(কর্ণেল নিউইয়র্ক)—	কিউব কাহিনী—(ভ্রমণ বৃত্তান্ত)...	...	...	১৭
	ক			
শ্রীযুক্তা কামিনী রায় বি-এ.	বৈদেহীর (কবিতা)...	...	...	২৮৯
শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি-এ,	কাদম্বেশ্বর—চীন পরিব্রাজকের প্রতি (কবিতা...			৫১
	তার পরে (কবিতা)	...	...	৯৫
	চন্দন-বর্ষার গান ঐ	...	...	১৫৭
	একাগ্রতা ঐ	...	...	২৫২
	সিন্ধু দর্শন ঐ	...	...	৩০৪
	ভারত রমণী ঐ	...	...	৪০১
	বসন্তসেনা ঐ	...	...	৪৩৭
	রথ ঐ	...	...	৫১৬
	বঙ্কিম প্রশস্তি ঐ	...	...	৬১২
	আগন্তুক ঐ	...	...	৬৫০
	শিল্প ও সহজ সাধক (সন্দর্ভ)	...	...	৭০৮
	ধ্যান (কবিতা)	...	...	৭৮৩

পরিচারিকা—সূচী।

লেখক, লেখিকা।	বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীপদ মিত্র এম-এ,—	মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের দু'একখানি গ্রন্থ—আলোচনা	৫৩
	কোচবিহার সাহিত্যের একটী বিস্মৃত অধ্যায় ঐ	২৬৭
	বিধির মা'র (গল্প)	৭৬৪
শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি.এ,—	ভাবুক (কবিতা)	১৬
	প্রবাসী ঐ	৮০
	পৌষ আগলানো ঐ	১[illegible]৬
	স্বপ্ন ঐ	২৮০
	চণ্ডীদাস ঐ	২৯৩
	পল্লী-ভ্রষ্ট ঐ	৩৬৭
	প্রত্যাবর্ত্তন ঐ	৪৫১
	আম্র ঐ	৫১৩
	ফুলের বাজার ঐ	৬০৪
	কাশী ঐ	৬৭১
	মা ঐ	৭৫০
	তাজ মহল ঐ	৭৯০
শ্রীযুক্ত কুলীশধর ভট্টাচার্য্য—	মায়াবাদে ভট্টাচার্য্যের পাঁতি	৪৮৮
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্.এ—	পাণিপথ (ভ্রমণ বৃত্তান্ত) ...	১১৮
	রেলপথে (আলোচনা)	১৮৩
গ		
শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র রায়—	নদী (কবিতা)	১৭১
	বনফুল (কবিতা)	১১৫
জ		
জনৈকাবালিকা—	পৌষ (ক্ষুদ্রকথা)	১০২
শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ বিশ্বাস		
	প্রতিবাদ নহে—আত্মনিবেদন	১৪৪
	ভূত—গল্প	৭০৬
	মৎস্যসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ (সন্দর্ভ)	৬৮৯
	প্রাণের প্রেরণায় (আলোচনা)	৭০০
	বড়লাট দরবারে ফিজি প্রবাসী কুলীর কথা ...	৭৭৪
	বর্ণের প্রভাব ও আকারের পসার (সন্দর্ভ) ইঃ ...	৬১৮
শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—	কর্ম্মের পথে (সন্দর্ভ)	৬৩০
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—	চীনরমণীর প্রেমপত্র	[illegible]১
	ভবঘুরে—(বিদেশী গল্প-সল্প)	[illegible]০৬
	লক্ষ্য-হারা (উপন্যাস) ...	৩২৫, ৩৮৭, ৭৮,
দ		
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—	(স্বরলিপি)	[illegible]৫

পরিচারিকা—সূচী।

লেখক, লেখিকা।	বিষয়।			পত্রাঙ্ক।
	ন			
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় বি-এ.	বিনিময় (অর্থনীতি)	...	...	১৯৭
	অর্থের ইতিহাস ঐ ...	...	...	২৮১
	কাগজের অর্থ ঐ ..	...	...	৪৩৪
	গ্রেসহামের নিয়ম ঐ ...	...	...	৭০৪
	নারীর জ্ঞানার্জ্জন (মতি ও গতি)	...	...	৮২৮
শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মজুমদার বি-এ,	মহাস্থান বা মস্তানগড়	...	...	৫১৮
" নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ—	ভাষার পশুত্ব (সন্দর্ভ)	...	...	৭৭৬
শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী—	অস্তি (কবিতা) ...	...	...	৩৮৬
শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র মল্লিক—	দিল্লীর লাড্ডু ...	...	...	৫৫৮
শ্রীমতী নীহারবালা দেবী—				
	সেবিকা—(ছোট গল্প)	...	...	২৮৪
	বিধির নির্দ্দেশ ঐ ...	...	...	৫২২
	প			
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দাস গুপ্ত—	প্রতিবাদ ...	...	...	৭৭৩
শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম-এ.—	গান ...	...	...	৫৬৫
	অভিমান (কবিতা)	...	...	৬৪৪
শ্রীযুক্ত পুলকচন্দ্র সিংহ—				
	কল্পনার প্রতি (কবিতা)	...	...	১৬১
	খাঁচার পাখী ঐ	...	...	২৯৩
শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ,—	চাহনি (কবিতা)	..	...	৩৪
	জোয়ার এল বনের বুকে ঐ ...	...	...	৫৬৯
	চাঞ্চল্য ... ঐ ...	...	...	৬৩৭
	হয়েছিল কবে পরিণয় ঐ ...	...	...	৭২৭
	(ব)			
"বাফুল"—	উষা (কবিতা) ...	...	...	২০৫
	দূর্ব্বা ঐ ...	...	...	৭০৩
শ্রীযুক্ত বনবিহারী মুখোপাধ্যায় এম. বি,—	বিলাত যাত্রা	...	...	৪৮৬
	তুড়ি ব্যঙ্গসন্দর্ভ	...	...	৫১৪
	টিকি ঐ	...	...	৬০৩
	স্বাস্থ্যরক্ষা ঐ	...	...	৬৭৩
	ব্রহ্মচর্য্য ঐ	...	...	৭৯০
	কাকদূত কবিতা	...	...	৮০৯
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—				
	শিশুর প্রভাব (কবিতা)	...	...	৫৩০
	মৃত্যু-সম্বর্দ্ধনা ঐ ...	...	...	৫৫৮
	পুত্র-বিসর্জ্জনে ঐ ...	...	...	৬২০
	ধর্ম্মজ্ঞান ঐ ...	...	...	৬৭৬
	কুমুদের ব্যথা ঐ ...	...	...	৭৯৫

পরিচারিকা—সূচী।

লেখক, লেখিকা।	বিষয়।		পত্রাঙ্ক।
শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ	জয়দেব ও তাহার জয়ঢাক…	…	১৩৫
	প্রাণের নমুনা (আলোচনা)	…	৪১৮
	পত্র … …	…	৭৭০
শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	পক্ষীপ্রবাদ …	…	৪৯১
„ বিভূতিভূষণ ভট্ট বি. এল,	দুই দিক (নাটক)	…	৩৫,১২৫,১৬৩
শ্রীমতী বিমলাবালা রায়	প্রবাদমালা …	…	২০৪
শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন	বাঙ্গালা ভাষা (আলোচনা)	…	৩
	ঐ ঐ	…	৯৫
	ঐ প্রতিবাদের প্রতিবাদ	…	১৫০
বেতাল ভট্ট	সাধুভাষা (কবিতা)	…	১২১
	সমাজে ঐ …	…	৫৮১
	কন্যাদায়োদ্ধার ঐ …	…	৭৬৩
শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ	প্রার্থনা (কবিতা)	…	৫৬০
শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ দাস	কেশব চন্দ্র ও বাঙ্গালাভাষা …	…	২০৭
(ভ)			
শ্রীযুক্ত ভবতারণ গুহ ঠাকুরতা	কাব্য ও কবি (আলোচনা)	…	৩৬২
(ম)			
শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ রায় বি. এ,	দুইদিক (সন্দর্ভ)	…	[illegible]
„ মুরারিমোহন বসু বি. এ,	পোসিয়া …	…	৬২২
শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা	স্বরলিপি (সুর) …	…	৫২৯
	ভ্রম সংশোধন …	…	১৬৬
	স্বরলিপি (সুর)	…	৪৬২
	ঐ … …	…	৬২৭
	ঐ … …	…	৮০৪
(য)			
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পত্র	…	৬২২
„ যতীন্দ্রলাল দাস	ভক্তেরউক্তি (কবিতা)	…	২০৩
(র)			
শ্রীযুক্ত স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	গান …	…	১৫৭
	স্বরলিপি ঐ …	…	৩১৫
	ঐ ঐ …	…	৪৬১
শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি. এ,	বাঙ্গালাভাষা (প্রতিবাদ)	…	২২৩
	ঐ ঐ উত্তর	…	৩১২
	বঙ্গসাহিত্যের ধারা (আলোচনা)		৬৭৫
	দুই সন্দর্ভ …		৬১৫
রেণু	মতি ও গতি (ছোটরকথা)		৬১৮
শ্রীমতি শকুন্তলা দেবী	পরখ (কবিতা) … …	…	২ ১
শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষজয়া	মঙ্গলমঠ (উপন্যাস) …	…	৬২, ১৭৩, ২১৮, ২৯৪, ৩৬৯, ৪৩৯, ৪৯৬, ৫৬৯, ৬
	শূরের শৌর্য্য (গল্প) … …	…	

পরিচারিকা সূচী।

লেখক, লেখিকা।	বিষয়।			পত্রাঙ্ক।
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম-এ, বি-এল, (ভারতী, সরস্বতী, বিদ্যাভূষণ ইত্যাদি)				
	মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের গীতাবলী	...	...	৩০৬
	দুইখানি প্রাচীন পুথি—আলোচনা	...	...	৩৮৮
	ডেপ্‌টী শিক্ষা গল্প	...	...	৫৯০
শ্রীমতী শরদিন্দু দাসী—চিরকুমারের ব্রতরক্ষা (গল্প)		...	...	৭৯৭
শ্রীমতী শেফালিকা কুণ্ডু—পক্ষী প্রবাদ		...	...	৪৯১
শ্রী—এমনি সোহাগে (কবিতা)		...	...	১১৮
শ্রী—ঢাকায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন		...	...	৪৭৯
শ্রী—কর্ম্ম ও মর্ম্মের সম্মিলন ফলে (মতি ও গতি)		...	...	৪৮৯

(স)

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটক এম-এ, বি-এল, করুণ ও মধুর (সন্দর্ভ)			...	১৪৮
রায় চৌধুরী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুস্তফী—স্বরলিপি		...	...	৬১৪
শ্রীযুক্ত সনৎকুমার সেনগুপ্ত—তুমি (কবিতা)		...	...	৪৭৯
	পাহাড়িয়া (কবিতা)	...	...	৮০৪
সম্পাদিকা—নিবেদন		...	...	১
	ধ্যান	(কবিতা) ...	...	২
	ধূপারতি	ঐ	...	৭৫
	নিরুত্তর	ঐ	...	১৫১
	অভয়	ঐ	...	২১৭
	খাঁচায় ও বাহিরে	(রূপক চিত্র)...	...	২৮৭
	গুরুরাম দাস ...	(জীবনী) ...	...	৩৪১
	ধর্ম্ম	(কবিতা)	...	৩৬১
	অসহ্য ...	ঐ	...	৪৩৩
	ভাই ...	ঐ	...	৪৩৪
	আহ্বান ...	ঐ	...	৪৩০
	সাজা ...	ঐ	...	৫২১
	অনুশোচনা ...	ঐ	...	৫২১
	মা ...	(কবিতা)	...	৫৮২
	বেদনার সুখ ...	ঐ	...	৬৩৯
	রাঁচির চিঠি ...	ঐ	...	৬৮৭
	দিশারী ...	ঐ	...	৭০৭
	অতুল ...	ঐ	...	৭৬০
	সত্তালাভ ...	ঐ	...	৭৭৫
শ্রীমতী সরযূ মৈত্র—কেন ?	(কবিতা)		...	৬০৬
শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—মুক্ত	(কবিতা)...		...	২৮৬
	আসামী	ঐ		৬৪১
	প্রেমের যজ্ঞ	ঐ		৪১৭

পরিচারিকা—সূচী।

লেখক, লেখিকা।	বিষয়।		পত্রাঙ্ক।
শ্রীযুক্ত সুকুমার দাসগুপ্ত—কবি-গৃহিনী	(কবিতা) ...	...	২০০
তিনরূপ ...	ঐ	...	৬০২
বিশ্ব সঙ্গীতে ...	ঐ	...	৭৬১
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—সিমলা ভ্রমণ	(ভ্রমণ বৃত্তান্ত) ...	...	৪৫৩
"সিদ্ধি" রচয়িতা—ধ্যান ভঙ্গ,	(কবিতা)	...	৪৯৩

হ

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—অর্থম্ অনর্থম্,	(গল্প) ...	...	১৫২
প্রতীক্ষায়	ঐ		৩১৯
পাঁচটো রূপেয়া	(বিদেশী গল্প-সল্প)...	...	৪০২
ফুল ওয়ালী	(গল্প) ...	...	৭৮৪
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকিশোর সেনগুপ্ত বি-এল,—বন্ধু	(ছোট গল্প)	...	১২২

(ক্ষ)

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র লাল সাহা এম-এ,—ঋতুসংহার	(কবিতা) ...	...	২৪২
বিশ্ব-বীণা	ঐ		৩:৪

—:*⊕*:—

চিত্র সূচী।

—:*:—

বিষয়।	পত্রিকা।
ভূতপূর্ব্ব কোচবিহারাধিপতি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর ...	১
কিউবান কৃষকের বাটী	১৭
দেল্ রিও নগরের উপকণ্ঠে জনৈক আমেরিকানের বাটী	১৮
মিঃ লুইমার্ক্সের তামাকের বাগানে মজুরদিগের থাকিবার ঘর	১৯
তামাকের বাগান	২০
কা য়াগা কারখানার প্রাঙ্গনে	২৮
"স মাঝে আমি ফির একেলা..."	৭৫
কলিঙ্গ রাজকুমার অনঙ্গমোহন ও তাঁহার বন্ধু মন্ত্রীপুত্র আনন্দবিহারীর মৃগয়া...	১৪২
রাজকুমার অনঙ্গমোহন ও তাঁহার নবপরিণীতা পত্নী স্বপ্নাবতীর স্বদেশ যাত্রা	১৪৭
কম্বোজরাজ যশোদ্ধজ ও যোগীবেশী চীনরাজ মন্ত্রী	২১৭
চীনরাজ মদনসুন্দরের বিবাহ	২১৭
স্নেহের পরশ	২০৯
কোচবিহারের রাজকীয়-পুস্তকাগারের প্রাচীন চিত্র হইতে	৩৩১
"সারাবেলা শুধু নদীতীরে..."	৪৩৩
ম্যাল,—সিমলা	৪৫৫
টাউনহল ঐ	৪৫৭
পার্ব্বত্যজাতী	৪৬০
ফুলবিলাস	৫৬৫
বাসক সজ্জা	৬৩৭
বিরহিণী	৭০৬
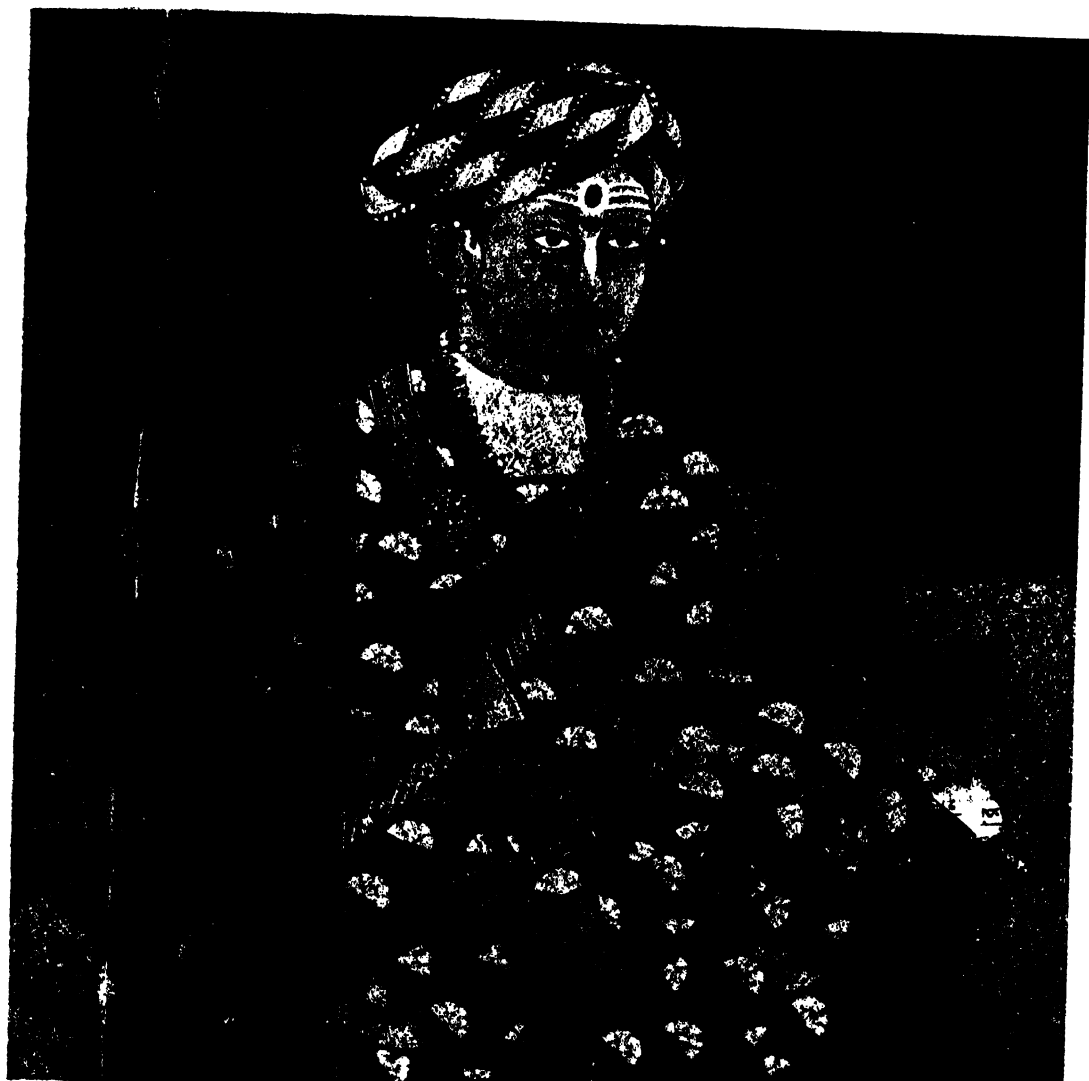
ভূতপূর্ব্ব কুচবিহারাধিপতি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর

প্রাচীন চিত্র হইতে।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

২য় বর্ষ। | অগ্রহায়ণ, ১৩২৪ সাল। | ১ম সংখ্যা।

নিবেদন।

আজ ভগবানের কৃপায় "পরিচারিকা"র এক বৎসর পূর্ণ হ'ল, এই দিনটি সব হিসাব নিকাশ বুঝে দেখ্‌বার দিন, লাভ লোক্‌সান খতিয়ে দেখবার দিন। কিন্তু যার জীবনে সেবার ব্রত নেমেছে, যার প্রাণে পূজার মন্ত্র ধ্বনিত হয়েছে, তার লাভই বা কি,—ক্ষতিই বা কি? যার কর্ম্মক্ষেত্র এই বিশ্বজগত, যার প্রভু এই বিশ্ব জগতের স্বামী, তার সঙ্কট আপনি কাট্‌বে; তার জীবনের পথ আপনি সহজ হবে, সরল হবে! তার অক্ষমতার লজ্জা, ভক্তির রসে ডুবে যাক্; তার বিপদের ভয়, সঙ্কটের আশঙ্কা কর্ম্মের আনন্দে লুপ্ত হ'ক্; তার দৈন্যের দুঃখ অন্তর্নিহিত সেবার অজস্র পুণ্যধারায় স্নিগ্ধ সুন্দর ও সরস হয়ে উঠুক। এই কর্ম্মের প্রেরণা তাঁর কাছ থেকে আস্‌ছে,—যাঁর সৃষ্টি এই নিখিল জগত, যাঁর সৃষ্টি এই বৃহৎ হ'তে বৃহত্তর আনন্দ ও শোক, যাঁর সৃষ্টি এই তুচ্ছ হ'তে তুচ্ছতর সুখ ও দুঃখ! সেই সর্ব্ব-কর্ম্মের কর্ম্মীর চরণে "পরিচারিকা"র বিশ্বসেবার কাজ সার্থক হ'ক্,—নিবেদিত হ'ক্; আর যেন সে কোন আকাঙ্ক্ষাকে, কোন সিদ্ধিলাভের কামনাকে পোষণ না করে, কারণ—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"

ধ্যান ।

—:o:—

মুখের কথা বন্ধ হ'ল
এবার কথা মনে মনে,
সুরের খেলা সাঙ্গ হ'ল
এবার খেলা এই গোপনে ।
এবার শুধু মনের চোখে
তোমার সনে আমার দেখা,
আমার মনের বিশ্বলোকে
তোমার সাথে মিল্‌ব একা ;
কেউ রবে না কোথাও বাকি,
তোমার প্রেমে উদাস হ'ব,
তোমার পায়ে হৃদয় রাখি'
এবার আমি মগন রব ;
সুখ রবে না, দুখ রবে না,
কেবল তুমি, কেবল আমি,
রবে তোমার এই চেতনা
আমার মনে দিবসযামী ।
ধ্যানে তোমার আনন্দ পাই,
শুনি তোমার নীরব কথা,
অহর্নিশি অন্তরে চাই—
শান্ত তব প্রসন্নতা ।
ধ্যানে এবার আমার প্রাণে
তোমার প্রাণে মিলিয়ে ধর,
ধ্যানে এবার মুক্তি দানে
তোমার সাথে যুক্ত কর ।

বাঙ্গালা ভাষা।*

—:*:—

দেশের যাহা কিছু ভাল তাহার যত্ন করা, তাহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করা, তাহার বিশুদ্ধতা রক্ষা করা, অন্য কোন ব্যক্তি সেই বিশুদ্ধতা নষ্ট করিতে চেষ্টা করিলে তাহার প্রতিবাদ ও প্রতিকার করা এবং দেশের যাহা কিছু মন্দ তাহা প্রাকৃতিকই হউক বা সামাজিকই হউক তাহা ভাল করিতে চেষ্টা করা বা স্থলবিশেষে তাহা সমূলে দূর করিতে চেষ্টা করাই প্রকৃত দেশানুরাগ। কোন বাঙ্গালী যদি বলেন যে "আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া চিরকালই ছিল সুতরাং বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত বা স্বাভাবিক অতএব সেই অভিপ্রায় বা স্বভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে ;" যদি কোন হিন্দুস্থানী উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াও তাঁহাদের দেশ প্রচলিত দোলের সময়ের উচ্ছৃঙ্খলতার এবং কোন সুশিক্ষিত আসামবাসী যদি তাঁহাদের দেশের বিহুর অশ্লীল আমোদপ্রমোদের সমর্থন করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কোন মতেই স্বদেশানুরাগী বলা যাইতে পারে না ; বরং তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে স্ব স্ব দেশের পরম শত্রু।

প্রত্যেক দেশের লোক উত্তরাধিকারসূত্রে দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা, সামাজিক আচার ব্যবহার প্রভৃতি যে সকল বস্তু লাভ করে দেশের ভাষা তাহার অন্যতম। সুতরাং নিজ নিজ দেশের ভাষার প্রতি অনুরাগ, ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ, ভাষার যে যে অঙ্গ দুর্ব্বল তাহা সবল করিবার চেষ্টা করা, যে যে অঙ্গ নাই তাহা পূরণ করিবার চেষ্টা করা, ভাষাকে অপরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা অর্থাৎ শিক্ষিত লোক অসাবধানে বা ইচ্ছাপূর্ব্বক যখন অশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করেন যাহা সাধারণে অনুকরণ করিতে পারে তখন তাহার প্রতিবাদ করা প্রত্যেক শিক্ষিত ভদ্র লোকের কর্ত্তব্য। বঙ্গভাষা ও বঙ্গের শিক্ষিতব্যক্তিরও এই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত হওয়া উচিত নহে। এই বিবেচনা করিয়াই আমি এই প্রবন্ধে বঙ্গভাষার প্রকৃতি ও গঠনপ্রণালী, বঙ্গভাষার বর্ণমালা, বানান ও উচ্চারণ, বঙ্গভাষার লিখন ও কথোপকথন এবং বঙ্গভাষা প্রয়োগের শুদ্ধাশুদ্ধতা বিষয়ে কিঞ্চিৎ সমালোচনা এবং বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে দুই একটা প্রস্তাব উত্থাপন করিব। বঙ্গদেশের মস্তিষ্কস্বরূপ প্রধান পণ্ডিতগণ এই সভায় উপস্থিত আছেন। তাঁহাদের অনুমোদন ও ইচ্ছা হইলে আমার এই প্রস্তাব দেশের অন্যান্য পণ্ডিতদিগেরদ্বারাও আলোচিত হইয়া একটা মীমাংসা হইতে পারে।†

বঙ্গভাষার প্রকৃতি ও গঠন প্রণালী।

ইংরেজী, সংস্কৃত, হিন্দী প্রভৃতি অপেক্ষা বঙ্গভাষা স্বভাবতঃ কিছু দীর্ঘায়ত। অর্থাৎ একই অর্থ প্রকাশ করিতে হইলে অন্য ভাষায় যতগুলি স্বর বা Syllableএর প্রয়োজন হয় বঙ্গভাষায় তাহা অপেক্ষা অধিক স্বর লাগে। কোন একটা ভাব ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করিলেই ইহা উপলব্ধ হইবে। ইংরেজী Whatever you do, do well, হিন্দী "জো কুছ্ করনা, অচ্ছী তরেহ্ সে করনা" বাঙ্গালা "যাহা কিছু করিবে ভাল করিয়া করিবে" এই তিনটী বাক্য একই ভাব প্রকাশ করে, কিন্তু ইংরেজীতে এই ভাব প্রকাশ করিতে সাতটী মাত্র স্বর লাগে, হিন্দীতে লাগে এগারটী এবং বাঙ্গালায় লাগে পনরটী। কখন কখন একই ভাব প্রকাশ করিতে ইংরেজী, হিন্দী, উর্দ্দু এবং সংস্কৃতে প্রায় সমানসংখ্যক স্বরের প্রয়োজন হয় কিন্তু বাঙ্গালায় সর্ব্বদাই অধিক স্বর লাগে। ইংরেজী Blessed are they that hunger and thirst after righteousness এই বাক্যটীতে পনরটী স্বর আছে, হিন্দী

---

* কোচবিহার সাহিত্য-সভায় ২য় বার্ষিক ৩য় অধিবেশনে পঠিত।

† আমরা এ বিষয়ে উপযুক্ত আলোচনা প্রাপ্ত হইলে সাদরে পত্রস্থ করিব। সঃ

"ধন্য্ বে্ জো ধর্ম্মার্থ্ ক্ষুধিত্ ঔর্ তৃষিত্ হৈং" ইহাতে এগারটী স্বর, উর্দ্দু "মবারক্ বে্ জো রাস্তবাজীকে ভূকে ঔর পিয়াসে হৈং" ইহাতে ষোলটী স্বর, সংস্কৃত "ধন্যাস্তে যে ধর্ম্মায় ক্ষুধিতাস্তৃষিতাশ্চ" ইহাতে চৌদ্দটী স্বর, কিন্তু বাঙ্গালা "ধন্য তাহারা যাহারা ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত" ইহাতে উনিশটা স্বর। এইরূপে বাঙ্গালায় মনোভাব প্রকাশ করিতে অধিক স্বরের প্রয়োজন হয় বলিয়া তাহা যেন কিছু গুরুভার সুতরাং অন্য ভাষার তুলনায় দুর্ব্বহ। দূর দেশ গমনেচ্ছু ব্যক্তি যেমন দুর্ব্বহ পয়সা বা টাকার পরিবর্ত্তে সঙ্গে নোট বা মোহর লইয়া যান তেমনই একই অর্থ প্রকাশ করিতে হইলে অল্প স্বরযুক্ত বাক্য ব্যবহার করিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। এই জন্যই যাহারা ইংরেজী জানে না তাহারাও লাইব্রেরি বলে কিন্তু পুস্তকালয় বলে না, হস্পিটালের অপভ্রংশ হাসপাতাল বলে কিন্তু চিকিৎসালয় বলে না। অধিক স্বর লাগে বলিয়াই ব্যবসা বাণিজ্যের এবং টেলিগ্রাফের ভাষা বাঙ্গালা হওয়া কঠিন। দ্রুত মনোভাব প্রকাশ করিতে হইলে যাঁহারা বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা জানেন তাঁহারা বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে সেই ভাষাই ব্যবহার করেন। ক্রোধ বা মদের উত্তেজনা বশতঃ মনোভাব যখন দ্রুত বাহির হইতে চাহে তখন যাঁহারা ইংরেজী জানেন তাঁহারা ইংরেজীই বলিয়া থাকেন। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকেরা কোন প্রবন্ধ পাইলে তাহাতে ইংরেজীতে হয় Approved না হয় Not approved লিখিয়া থাকেন। কেননা একেত বাঙ্গালা অক্ষর লিখিতে ইংরেজী অপেক্ষা অধিক সময় ও শ্রম ব্যয়িত হয়, তাহার উপর "মনোনীত" বা "মনোনীত হইল না" পুনঃপুন লিখিতে হইলে ধৈর্য্যচ্যুতি ও ক্লান্তির সম্ভাবনা। বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ দুর্ব্বহ হইবার অন্যতম কারণ এই যে ইহাতে ক্রিয়াবিশেষণ পদ প্রস্তুত করিতে হইলে বিশেষণের সহিত "করিয়া" "ভাবে" "রূপে" প্রভৃতি একাধিক স্বর যুক্ত প্রত্যয়ের একটা না একটা যোগ করিতে হয়। ইংরেজীতে ক্রিয়াবিশেষণ প্রস্তুত করিতে হইলে বিশেষণ পদে একটী একস্বর প্রত্যয় অর্থাৎ ly যোগ করিলেই হয়। সংস্কৃতে হসন্ত ম্ বা অনুসার যোগ করিলেই হয় অর্থাৎ স্বর মোটেই লাগে না।

বাঙ্গালা শব্দের বহুবচন নিষ্পন্ন করিতে হইলেও একাধিক স্বরের প্রয়োজন।

বাঙ্গালা দীর্ঘায়ত হইবার আর একটা কারণ এই যে ইহাতে ক্রিয়াপদের বড় অপ্রচুরতা। করা, খাওয়া, যাওয়া, দেখা বহু ক্রিয়াপদ বাঙ্গালার নিজস্ব বটে। কিন্তু বহুতর ক্রিয়াপদ সেই সেই ক্রিয়াজ্ঞাপক সংজ্ঞার সহিত কৃ ও ভূ ধাতুর অথবা করা ও হওয়া ধাতুর যোগ হইয়া নিষ্পন্ন হয়। এজন্য সে গুলি দীর্ঘায়ত হইয়া পড়ে। "He has passed", He has failed", "It seems" এই সকল বাক্যের বাঙ্গালা হয় "তিনি পাস হইয়াছেন" "তিনি ফেল হইয়াছেন" "বোধ হয়"। Investigate অনুসন্ধান করা, Beat প্রহার করা, Kill বধ করা ইত্যাদি রূপ অসংখ্য ক্রিয়াপদের প্রয়োগদ্বারা বাঙ্গালা দীর্ঘায়ত হয় বটে কিন্তু এরূপ প্রয়োগ সাধু ভাষার অপরিহার্য্য। অনেক গ্রন্থকার বিশেষতঃ কবিগণ স্বতন্ত্র ক্রিয়াপদের অপ্রচুরতা দেখিয়া অনুসন্ধানিল, প্রহারিল, বধিল, ঘ্রাণিল, সৃজিল প্রভৃতি পদ সৃষ্টি করিয়াছেন। কবি ও কাব্যের ভাষার কথা স্বতন্ত্র কিন্তু প্রচলিত সাধু ভাষায় এইরূপ প্রয়োগ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কোন নূতন ক্রিয়াপদ প্রস্তুত করিতে হইলে দেখা উচিত যে তাহাতে সকল বিভক্তি ও প্রত্যয় যুক্ত হইতে পারে কি না। যদি অনুসন্ধানিল, বধিল, প্রহারিল, ঘ্রাণিল, সৃজিল প্রভৃতি পদ হয় তবে তাহাদের মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞায় কি হইবে? অনুসন্ধানো, বধো, প্রহারো, ঘ্রাণো, সৃজো হইবে কি? এবং তাহাদের মূল ধাতুই বা কি হইবে? অনুসন্ধানা, বধা, প্রহারা, ঘ্রাণা, সৃজা হইবে কি? কোন কোন ক্রিয়াপদ কৃ ধাতুর সাহায্য বিনা অথবা অন্য একটা ধাতুর যোজনা বিনা প্রস্তুত হইতেই পারে না যথা kick শব্দের বাঙ্গালা পদাঘাত করা অথবা লাথি মারা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। পূর্ব্ব বঙ্গে চট্টগ্রাম প্রভৃতি

স্থানে লাথি এবং অন্য বহু শব্দ নামধাতুরূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সেই সকল পদ এমনই শ্রুতিকটু যে সেগুলি সাধু ভাষায় স্থান পাইতে পারে না।

উক্ত হেতু ভিন্ন একটী গুরুতর হেতু আছে যে জন্য অনুসন্ধানিল, খ্যাণিল প্রভৃতি পদ ব্যবহৃত হওয়া উচিত নহে। পূর্ব্বকালে বহু বস্তু, বহু কল্পনা, বহু জন্তু, বহু ভাষা, অতিকায়, জটিল, শ্লথগতি এবং এখনকার লোকের পক্ষে বিভীষণ ছিল। কিন্তু অভিব্যক্তির নিয়মানুসারে সকল বস্তুই অল্পায়তন, লঘু কলেবর ও সুগম হইয়াছে ও হইতেছে। এখন আর ম্যামথ প্রভৃতি অতিকায় জন্তু নাই। দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে হস্তীরও লোপ হইবে বলিয়া বোধ হয়। এখন আর কুড়িহাত দশমুণ্ড মনুষ্যের কল্পনাও হয় না। সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন, আরবী প্রভৃতি অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডারগুলিকে দুষ্প্রবেশ্য করিবার জন্যই যেন ইহাদের বহির্ভাগ ও অভ্যন্তর বিভক্তি, লিঙ্গভেদ, বচনের বহুত্ব, প্রত্যয়ের অনন্তত্ব প্রভৃতি দ্বারা কণ্টকিত কিন্তু কালের বিবর্ত্তনে এই সকল ভাষার কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। গ্রীকে এখন আর দ্বিবচন নাই। বৈদিক ভাষা ও সংস্কৃতে কত প্রভেদ তাহা পণ্ডিতেরা অবগত আছেন। আবার সাহিত্যিক লৌকিক সংস্কৃত অপেক্ষা মহারাষ্ট্র দেশ প্রচলিত কথোপকথনের সংস্কৃত কত সুগম তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিলক্ষণ জানেন। যখন বিভক্তিরূপ কণ্টক, ভাষার শরীর হইতে আর টানিয়া বাহির করা যায় না অথচ কর্ম্মশীল লোকের তাড়াতাড়ি মনোভাব ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন আসিয়া উপস্থিত হয় কিন্তু সেই বিভক্তিময় ভাষা আয়ত্ত করিবার অবকাশ থাকে না তখন অপেক্ষাকৃত অল্প বিভক্তিযুক্ত ভাষার জন্ম হয়। এই রূপে ভাষা হইতে বিভক্তির সম্পূর্ণ লোপ হওয়াই ভাষার চরম অভিব্যক্তি। ইংরেজীতে কয়েকটা মাত্র বিভক্তি আছে কিন্তু শব্দের লিঙ্গভেদ উঠিয়া গিয়াছে। এখন ইংরেজীতে বস্তুর স্ত্রী পুং ভেদ ব্যতীত শব্দের লিঙ্গভেদ স্বীকৃত হয় না। Sunএর যে পুংলিঙ্গ সর্ব্বনাম এবং Earthএর যে স্ত্রীলিঙ্গ সর্ব্বনাম হয় তাহা Sun এবং Earth যথাক্রমে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ শব্দ বলিয়া নহে কিন্তু রূপকচ্ছলে তাহারা পুরুষ ও স্ত্রী বলিয়া বর্ণিত হয় সেই জন্য। বাঙ্গালা ও আর্য্যাবর্ত্ত প্রচলিত সংস্কৃতমূলক অন্যান্য ভাষা এখনও বিভক্তি বহুল আছে বটে কিন্তু এই সকল বিভক্তির সংখ্যা সংস্কৃত বিভক্তি অপেক্ষা অনেক কম। সংস্কৃতে যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে শব্দের লিঙ্গভেদ আছে বাঙ্গালায় তাহাও উঠিয়া যাইতেছে। বঙ্গীয় লেখকেরা এখন বরং "শস্যশালিনী বঙ্গদেশ" লিখিবেন তথাপি "সংস্কৃত বড় সুন্দরী ভাষা" এমন কথা লিখিবেন না। স্ত্রীলোক শব্দটা পুংলিঙ্গ বলিয়া এখন উৎকট বৈয়াকরণ ও "গর্ভবান্ স্ত্রীলোক" লিখিতে সাহস করেন না কিন্তু "গর্ভবতী" স্ত্রীলোক লিখিয়া থাকেন। যদি বিভক্তির লোপ সাধনই অভিব্যক্তির নিয়ম হয় তাহা হইলে অনুসন্ধানিল, খ্যাণিল প্রভৃতি ক্রিয়াপদ সৃষ্টি করিয়া ক্রিয়াপদের রূপের সংখ্যা বাড়াইয়া সেই নিয়মের পরিপন্থি হওয়া উচিত নহে। যথাসাধ্য করা ও হওয়া ধাতুর যোগে সমস্ত ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন করাই সমীচীন।

বাঙ্গালা ভাষায় আরও কয়েকটা অভাব আছে। ইহাতে সর্ব্বনামের স্ত্রীপুরুষ ভেদ নাই। তিনি এবং সে স্ত্রীলিঙ্গেও ব্যবহৃত হয়, পুংলিঙ্গেও হয়। এই অভাব অনেক সময়েই অনুভব করিতে হয়।

ইংরেজীতে Participial adjective এবং সংস্কৃতে শতৃ শানচ্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন পদের অনুরূপ পদ বাঙ্গালায় সর্ব্বদা প্রস্তুত হইতে পারেনা। Laughing man, running train, falling body প্রভৃতির ভাল বাঙ্গালা কি হইতে পারে তাহা আমি অবগত নহি। ইংরেজীতে যৎ শব্দ (Relative Pronoun) দিয়া যে বড় বড় বিশেষণ বাক্য (Adjective sentence) রচিত হয় বাঙ্গালায় তদ্রূপ হয় না ছোট ছোট বিশেষণ বাক্য রচিত হইলেও বিশেষ্যকে পুনরাবৃত্তি করিতে হয়। বাঙ্গালা লেখকেরা পদে পদেই বিশেষতঃ ইংরেজী হইতে অনুবাদ করিবার সময়ে এই অভাব অনুভব করিয়া থাকেন।

কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল যে, বাঙ্গলায় নির্দ্দেশক সংখ্যাবাচক শব্দ (ordinals) হইতে পারে না। 62nd, 55th, 53rd প্রভৃতি শব্দের বাঙ্গলা কি হইতে পারে তাহা আমি ভাবিয়া পাইতাম না। কিন্তু সেবার মৈমনসিংহের সাহিত্য সম্মিলনে একজন প্রবন্ধ পাঠকের মুখে বাষট্টিতম, তিপ্পান্নতম, পঞ্চান্নতম প্রভৃতি বা তদনুরূপ শব্দ শুনিয়াছিলাম। বাঙ্গলা সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত সংস্কৃত প্রত্যয় জোড়া দিয়া প্রস্তুত এই সকল সঙ্কর শব্দ উত্তমরূপ কার্য্যোপযোগী। সুতরাং আমার বিবেচনায় এইরূপেই নির্দ্দেশক সংখ্যাবাচক শব্দ প্রস্তুত করা উচিত। আমি গত ১৩১৮ সালের মাঘোৎসবের সময়ে কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজে এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে গিয়া দেখিলাম এক সমাজে সেই উৎসবের নাম "দ্ব্যধিকাশীতিতম মাঘোৎসব" অন্য সমাজে "দ্ব্যশীতিতম ব্রাহ্মোৎসব।" এই দুইটা দাঁতভাঙ্গা সংখ্যাবাচক সংস্কৃত বিশেষণের পরিবর্ত্তে সরল বাঙ্গলায় বিরাশীতম শব্দ ব্যবহৃত হইলেই ভাল হইত। বাঙ্গলা সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত তম প্রত্যয় যোগ করিয়া পদ নিষ্পন্ন করায় আর একটা লাভ এই যে উহাতে ভগ্নাংশ পড়িবার সুবিধা হয়। একটী ভগ্নাংশের লব যদি ২৭ হয় এবং হর ৮২ হয় তাহা হইলে এই নিয়মানুসারে "সাতাশ বিরাশিতম" বলা যায়। কিন্তু পূর্ব্ব নিয়মানুসারে "সাতাশ দ্ব্যধিকাশীতিতম" বলা একটা প্রাণান্তকর ব্যাপার। আমার বিবেচনায় "প্রথম" হইতে "দশম" শব্দ কয়েকটীর পর "এগারতম" "বারতম" শব্দ ব্যবহার করা উচিত। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী মহাশয় বাঙ্গলাভাষাবিষয়ক ইংরেজী প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে "একের" "দুইয়ের" "তিনের" প্রভৃতি শব্দই বাঙ্গলা সংখ্যাবাচক নির্দ্দেশক শব্দ এবং সংস্কৃত শব্দের পরিবর্ত্তে সেই সকল শব্দই ব্যবহৃত হওয়া উচিত। বাঙ্গলা মাসিক পত্রিকা প্রবাসীতে সম্প্রতি একটা গল্প বাহির হইতেছে, তাহাতে দেখিতে পাই যে, লেখক একের পরিচ্ছেদ, দুইএর পরিচ্ছেদ এইরূপে পরিচ্ছেদগুলির নাম দিতেছেন। কিন্তু শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যদি ভাষার উন্নতি না হয় তাহা হইলে সে শিক্ষায় লাভ কি?

বাঙ্গলা ভাষায় ইংরেজীর মত "হওয়া" ধাতুর অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের রূপ অন্য ধাতুর ক্ত প্রত্যয়ান্ত পদের সহিত যুক্ত হইয়া কর্ম্মবাচ্য প্রস্তুত হয়। সংস্কৃতে কি কর্ম্মবাচ্যে কি ভাববাচ্যে প্রত্যেক পদে ভিন্ন রূপ হয়। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। বলির্বন্ধে, জলধির্মম্থে, অমৃতং জহ্রে দৈত্যকুলং বিজিগ্যে, বসুধা উহে এইগুলির বাঙ্গলা বলি বদ্ধ হইয়াছিল, জলধি মথিত হইয়াছিল, অমৃত আহৃত হইয়াছিল, দৈত্যকুল পরাজিত হইয়াছিল। কেহ কেহ প্রত্যেক ধাতুর সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ হয় না বলিয়া বাঙ্গলার প্রতি অসন্তুষ্ট। কিন্তু আমার বিবেচনায় ইহাতে বাঙ্গলার শক্তি বাড়িয়াছে বই কমে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও বাঙ্গলায় কর্ম্মবাচ্য নাই বলিলেই হয়। দুই একটা উদাহরণ দিতেছি। I am told এই বাক্যটীর বাঙ্গলা অনুবাদ "আমি শুনিয়াছি" ভিন্ন কর্ম্মবাচ্য হইতে পারে না। I am owed three Rupees by you ইহারও বাঙ্গলা "তুমি আমার তিন টাকা ধার" ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। বাঙ্গলায় যে সকল কর্ম্মবাচ্যের ব্যবহার আছে সেগুলিরও আকার বিরূপ হইয়া গিয়াছে। কতকগুলি কর্ত্তৃবাচ্যের আকার ধারণ করিয়া আছে কিন্তু কর্ত্তাকে বিকৃত করিয়া দিয়াছে। ভোজের সময়ে পরিবেশকগণ ভোক্তাদিগকে "লুচি চাই" "সন্দেশ চাই" প্রভৃতি প্রশ্ন করিয়া থাকে। এই "চাই" পদটী হিন্দী "চাহিয়ে" পদের অপভ্রংশ সুতরাং কর্ম্মবাচ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেননা তাহা না হইলে লুচি ও সন্দেশের সহিত উহার অন্বয় হয় না। এখানে কর্ম্মই কর্ত্তৃপদের স্থানে আছে। সেই জন্য লুচি ও সন্দেশের কোন বিকার হয় নাই। কিন্তু "বেদে বলে" এই বাক্যে বেদই সাক্ষাৎ কর্ত্তা। তাহা অধিকরণ রূপ ধারণ করিয়াছে। "গরুতে ঘাস খায়" "কুকুরে কামড়াইয়াছে" প্রভৃতি বাক্যে ক্রিয়ার রূপ কর্ত্তৃবাচ্য কিন্তু কর্ত্তার রূপ অধিকরণ। আমার এই মতের সহিত অনেকের হয় ত মত মিলিবে না। কেননা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় এই সকল কর্ত্তৃপদের বিকৃতির অন্য কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বাঙ্গলায় যখন অন্য ধাতুর সহিত কৃ ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন রূপের যোগ করিয়া ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন করিতে হয় তখন তাহাতে যে কোন নাম ধাতুরূপে ব্যবহৃত হইয়া তাহা হইতে ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হইবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। ইংরেজীতে boycott, listerate, macadamise, galvanise, mesmerise প্রভৃতি ভূরি ভূরি নাম ধাতুর ব্যবহার আছে। সংস্কৃতে শব্দায়তে নামক ক্রিয়াপদ যে নাম ধাতু হইতে নিষ্পন্ন তাহা অনেকেই জানেন। একটা রসায়নের ফলশ্রুতিতে লিখিত আছে যে তাহা দ্বারা "গর্দ্দভী অপ্‌সরায়তে" অর্থাৎ কুৎসিতা নারীও অপ্সরার মত সুন্দরী হয়। সংস্কৃতে যে কেবল একটা শব্দ লইয়াই ক্রিয়াপদ প্রস্তুত হইতে পারে তাহা নহে। বড় বড় সমাস দিয়াও বড় বড় ক্রিয়াপদ প্রস্তুত হয়। ইহার একটা দৃষ্টান্ত অপ্রীতিকর হইবে না বলিয়া দিতেছি।

কালিন্দীয়তি কজ্জলীয়তি কলানাথাঙ্ক মালীয়তি
ব্যালীয়ত্য বিষগুলীয়তি মুহুঃ শ্রীকণ্ঠ কণ্ঠীয়তি।
শৈবালীয়তি কোকিলীয়তি মহানীলাভ্র জলীয়তি
ব্রহ্মাণ্ডে রিপুদুর্যশস্তব নৃপালঙ্কার চূড়ামণে॥

কিন্তু বাঙ্গলা, হিন্দী, আসামী ভাষায় সাধু সাহিত্যে গৃহীত হইবার উপযুক্ত নামধাতু হইতে ক্রিয়াপদ প্রস্তুত হইতে পারে না। যে দুই চারিটা নামধাতু আছে তাহা কেবল ব্যঙ্গার্থেই প্রস্তুত হয়। একজন কবি স্বরচিত কাব্যে কয়েকটা নামধাতু ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া আর একজন এক কবিতা লেখেন। বাল্যকালে তাহা পাঠ করিয়াছি সুতরাং এখন তাহার এক চরণমাত্র মনে আছে। তাহা এই:—

কৌশলিয়া দশরথ যবে অযোধিল।

ইহার পাদ টীকায় লিখিত ছিল "কৌশলিয়া অর্থাৎ কৌশল্যাকে বিবাহ করিয়া।" "অযোধিল অর্থাৎ অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিল।"

বাঙ্গলা হিন্দী আসামী ভাষায় নামধাতু এবং স্বতন্ত্র ক্রিয়াপদ সম্ভবে না। কিন্তু খাসিয়া ভাষায় ঠিক্ ইংরেজী ও সংস্কৃতের মত সমস্ত ক্রিয়াপদই স্বতন্ত্র এবং সমস্ত নামই ধাতুরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

বাঙ্গলায় ক্রিয়াপদ বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়। ইহা অস্বাভাবিক। প্রথমে কর্ত্তা, কর্ত্তা হইতে ক্রিয়ার উৎপত্তি এবং কর্ম্মে তাহার পর্য্যবসান। সুতরাং প্রথমে কর্ত্তা, মধ্যে ক্রিয়া এবং সর্ব্বশেষে কর্ম্ম ইহাই স্বাভাবিক ক্রম। ইংরেজী ভাষা এই স্বাভাবিক পৌর্ব্বাপর্য্যের অনুসরণ করে বলিয়া তাহা বাঙ্গলা, হিন্দী, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি ভাষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষে এক খাসিয়া ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা এই স্বাভাবিক ক্রম অনুসারে চলে কি না জানি না।

উপরে বাঙ্গলা ভাষার মোটামুটি যে কয়েকটা অভাব ত্রুটি ও অঙ্গহীনতার কথা বলিলাম কালে তাহার প্রতিবিধান হইবে কি না তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু বিকলাঙ্গ স্থূলদেহ ব্যক্তিও অঙ্গ পরিচালন দ্বারা সুস্থ ও লঘু কলেবর হয়। অন্ততঃ তাহার যে অঙ্গ আছে তাহা সবল হইয়া যে অঙ্গ নাই তাহার অভাব পূরণ করে। সুতরাং প্রচুর অনুশীলন হইলে বাঙ্গালা ভাষারও উন্নতি অবশ্যই হইবে। আমি যাহা বাঙ্গালা ভাষার সহজাত রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম পণ্ডিতেরাও যদি সেইগুলিকে রোগ বলিয়া বিবেচনা করেন তাহা হইলে সময়ে আরোগ্যও হইতে পারে। যাঁহারা কখনও ইংরেজী বা সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন তাঁহারাই বাঙ্গালা ভাষার অভাব ও দারিদ্র উপলব্ধি করিয়াছেন। স্বর্গগত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য পাদ্রিগণ যে সকল পুস্তক বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন সেই অনুবাদের ভাষা অত্যুৎকৃষ্ট না হইলেও তাহা যে প্রকৃত অনুবাদ তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের অনুবাদ ভিন্ন অন্য কোন পুস্তকে যথাযথ অনুবাদ বাঙ্গালায় নাই বলিলেই হয়। অনুবাদকেরা

প্রায়ই লেখেন যে বাঙ্গালী পাঠকের উপযোগী করিয়া তাঁহারা নিজ নিজ অনুবাদে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিয়াছেন। ইহার প্রকৃত কারণ আমার এই বোধ হয় যে/বাঙ্গালার দারিদ্র বশতঃ তাঁহারা সকল স্থানের অনুবাদ করিতে সমর্থ হন নাই।

একশত বৎসর পূর্ব্বকার বাঙ্গালা এবং বর্ত্তমান সময়ের বাঙ্গালা তুলনা করিলে বর্ত্তমান সময়ের বাঙ্গালায় যে কত উন্নতি হইয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এই তুলনার ফলে আমরা দৃঢ় ভাবে আশা করিতে পারি যে আর এক শত বৎসরে আমাদের ভাষার অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি হইবে। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে নীলরত্ন হালদার "বহুদর্শন" নামে অসাধারণ পাণ্ডিত্য পূর্ণ একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। তখনকার ভাষার দৃষ্টান্ত স্বরূপ সেই পুস্তকের অনুষ্ঠান পত্র হইতে প্রথম বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আদৌ অদ্যন্ত রহিত স্বতঃ প্রতীত সগুণ নির্গুণ উভয়োপাস্যকে স্বীকৃত অদ্বৈত পরাৎপর বিঘ্ন হরণ স্মরণ পুরঃসর গুণিজন পর গুণ কৃতাদরভর মহাশয়দিগের মহাশয়তার মহাশয়ে মহাশয় যুক্ত হইয়া নিবেদন বহুকালাবধি বহুভাষায় বহুবিধ দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করণে বহুতর যত্ন ছিল যে হেতুক এক গ্রন্থে দৃষ্টিপাত করিলে বহুদর্শী হওনের সম্ভাবনা হয় অতএব এই সংগ্রহে ভিন্ন জাতীয় প্রসিদ্ধ বাক্য এবং শাস্ত্রোক্তির তাৎপর্য্য স্বজাতীয় শাস্ত্রোক্তি ও চলিতোক্তির সহিত এক বাক্যতা ও সমন্বয় করিয়া অর্থাৎ প্রথমতঃ ইংরাজী ও ল্যাটিন ভাষার বিবিধ পুস্তকান্তর্গত চলিত দৃষ্টান্ত ও নীতি শিক্ষা বিষয়ক গদ্য পদ্য তদীয় বাক্যার্থ ভাবার্থ সাধু ভাষায় প্রকাশ পূর্ব্বক তত্তৎউক্তির তাৎপর্য্য সংস্কৃত মূলের সহিত তুল্য মূল্য করিয়া এবং দ্বিতীয়তঃ পারসিক ও আরবীয় ভাষার বহু গ্রন্থোদ্ধৃত অথচ সমাজ ব্যবহৃত অশেষ বিশেষ গদ্য পদ্য সাধু ভাষায় অর্থ ও তাৎপর্য্য বর্ণন পূর্ব্বক সংস্কৃত প্রমাণের সহিত সমতা করিয়া এবং তৃতীয়তঃ স্বজাতীয় অর্থাৎ সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র ও কাব্য প্রভৃতি নানা শাস্ত্রোদ্ধৃত অথচ প্রাচীন ও নবীন প্রসিদ্ধ প্রচলিত পদ্য পদ্যার্থ ক্রমানুরূপ নিয়মানুসারে অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয় ও বিদ্যা বিষয় ও ধন বিষয় ইত্যাদি বহু বিষয়োপযোগী সংস্কৃত দৃষ্টান্ত পৃথক ২ পরিচ্ছেদ পূর্ব্বক সাধুভাষায় তদীয়ার্থ সঙ্কলন করিয়া কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিলাম।"

বর্ণমালা বানান ও উচ্চারণ।

বোধহয় কোন ভাষার বর্ণমালাই সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ নহে। আরবীতে গ ও চ নাই। পারসী চঙ্ শব্দ আরবীতে সঙ্ হইয়া যায়। সংস্কৃত চতুরঙ্গ স্থানে আরবীতে সৎরঞ্জ হয়। তাহাই ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া চতুরঙ্গ ক্রীড়ার অর্থাৎ দাবা খেলার নাম সৎরঞ্চ খেলা হইয়াছে। গ্রীকেও চ স্থানে স লিখিতে হয়। সংস্কৃত চন্দ্র শব্দ গ্রীকে সন্দ্র লিখিত হইয়া থাকে। ইংরাজীতে ত, থ, দ, ধ নাই। ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান প্রভৃতি ভাষায় ট, ঠ, ড, ঢ নাই। তবে যে আমরা ইটালি, ল্যাটিন, বোর্ডো প্রভৃতি শুনিতে পাই তাহার কারণ এই যে ইংরেজেরা ইতালি, লাতিন, বোর্দো প্রভৃতি শব্দকে ইটালি, লাটিন, বোর্ডো প্রভৃতিতে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন এবং আমরা এই শব্দগুলি ইংরেজদের নিকট হইতে পাইয়াছি। যখন বহু অনুশীলিত ভাষাগুলিরও বর্ণমালা এইরূপ অসম্পূর্ণ তখন আমাদের বর্ণমালা যে অসম্পূর্ণ হইবে তাহা বিচিত্র নহে। আমি এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে বাঙ্গালায় যতগুলি ধ্বনি আছে বাঙ্গালার বর্ণমালার তদনুরূপ অক্ষর নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া আমার এরূপ ইচ্ছা নহে যে বাঙ্গালায় কতকগুলি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি হয়। সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষার যত ধ্বনি আছে ঠিক তদনুরূপ অক্ষরও আছে। একটাও কম বা বেশী নাই। উর্দ্দু ভাষার ব্যঞ্জন সম্বন্ধেও এই কথা খাটে কিন্তু তাহাতেও স্বর ধ্বনির অনুরূপ সকল অক্ষর নাই। এক আলেফের সঙ্গে জের, জবর, পেশ্, মদ্, দিয়া ই, উ, এবং আ প্রকাশ করিতে হয়। কিন্তু অন্য পক্ষে বাঙ্গালা, আসামী, ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি ভাষায় যত ধ্বনি আছে তত

ধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করিবার উপযুক্ত অক্ষর নাই। অথচ এই সকল ভাষায় এমন কতকগুলি অক্ষর আছে যাহা না থাকিলেও চলে। ইংরেজীতে এ A অক্ষরের fate, fat, fare, fall, fast, far, what এবং many এই আটটী শব্দে আট প্রকার উচ্চারণ হয়। ইংরেজীতে যখন এই আটটা উচ্চারণ একমাত্র A অক্ষরের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে তখন আমাদেরই বা বর্ণমালার অক্ষর সংখ্যা বাড়াইবার প্রয়োজন কি? চীন দেশের বর্ণমালায় এক দিন ৮০০০ অক্ষর ছিল; এখন এই আট হাজারের স্থলে ৪৮টী মাত্র অক্ষর প্রচলিত হইতে যাইতেছে। গ্রীকেরও অক্ষর সংখ্যা অল্পীকৃত হইয়াছে। ইংরেজী V ধ্বনি জ্ঞাপক দিগন্মা (F) নামক অক্ষর একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখন গ্রীকে ২৪টী মাত্র অক্ষর। ল্যাটিনে ২৫টী এবং ইংরেজীতে ২৬টী অক্ষর দ্বারা সমস্ত কার্য্য চলিয়া যাইতেছে। সুতরাং আমাদের যে ৫০ টা অক্ষর আছে তাহাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তবে ইংরেজী অভিধানে যেমন প্রত্যেক অক্ষরের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ প্রদর্শন করিবার জন্য সাঙ্কেতিক চিহ্ন আছে আমাদের অভিধানেও সেইরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন থাকা ভাল বলিয়া বোধ হয়।

বাঙ্গলা ও আসামী ভাষায় সংস্কৃত অ কারের উচ্চারণ নাই। But শব্দের u অক্ষরের যে উচ্চারণ সংস্কৃত অ কারের ঠিক সেই উচ্চারণ। কিন্তু call শব্দের a অক্ষরের যে উচ্চারণ বাঙ্গলা ও আসামীতে অকারের ঠিক্ সেই উচ্চারণ। এই উচ্চারণ সংস্কৃতে নাই এবং বঙ্গদেশের পশ্চিমে কোন প্রদেশেই নাই। সুতরাং সংস্কৃত অ কারের উচ্চারণ প্রদর্শক একটা চিহ্ন বাঙ্গলা অ কারের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া উচিত। এই চিহ্ন একটী বিন্দু হইলেই হয় এবং সেই বিন্দুটী অ কার এবং অ কার যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে দিলে ভাল হয়। অ কারে এরূপ চিহ্ন যুক্ত হইলে তাহা দেখিতেও কতকটা দেবনাগর অ কারের মত হইবে। বাঙ্গলা ও আসামীতে "অবসর" "অবলম্বন" প্রভৃতি শব্দে অকারের যে উচ্চারণ তাহাই এই দুই ভাষার অ কারের স্বাভাবিক উচ্চারণ। কিন্তু অনেক স্থানে অকারের অন্য রূপ উচ্চারণ দেখিতে পাওয়া যায়। "ব্যক্তি" এবং "ব্যক্ত" এই দুই শব্দে আমরা অ কারের স্বাভাবিক উচ্চারণ করিতে পারি না অথবা করি না। অ কারের পর ই বা এ বর্ণ থাকিলে বাঙ্গলায় ও আসামীতে অ কারের উচ্চারণ প্রায় ওকার সদৃশ হয়, যেমন সই, কই, সখী, রবি, কপি, অপি, হউক, অমুক, শম্বুক, শত্রু ইত্যাদি। চট্ শব্দের এবং ওঁ ফট্ স্বাহা মন্ত্রের ফট্ শব্দের অ কারের যে উচ্চারণ তাহা অবলম্বনের অকার অপেক্ষা হ্রস্ব।

বাঙ্গলা আ কারেরও দুই উচ্চারণ আছে। একটী প্রকৃত সংস্কৃত উচ্চারণ যাহা ইংরেজী father শব্দে a অক্ষরের। অন্যটী প্রায় সংস্কৃত অ কারের অথবা ইংরেজী fast শব্দের a অক্ষরের মত। বাঙ্গলা অধিকাংশ স্থলেই আ কারের এই উচ্চারণ যথা আমি, আমরা, আমার, আমাকে, তোমার, তাহারা, তাহাদের, তামাসা ইত্যাদি। "তামাসা" শব্দটার স্বরগুলি আমরা যেরূপ উচ্চারণ করি হিন্দুস্থানীরা ও ইংরেজেরা সেরূপ উচ্চারণ করেন না। তাঁহাদের উচ্চারণই বিশুদ্ধ। ইংরেজীতে fat শব্দের a অক্ষরের ধ্বনি বাঙ্গলায় আছে কিন্তু তাহার অনুরূপ কোন অক্ষর নাই। আমরা লিখি এক কিন্তু বলি য়্যাক। হিন্দীতে এ কারের নিম্নে একটী বিন্দু দিয়া এই উচ্চারণ লিখিত হইয়া থাকে। আমাদেরও তদ্রূপই আভিধানিক সঙ্কেত থাকা বিধেয়। য এ আ কার দিয়া এই ধ্বনি প্রকাশ করিবার বিরুদ্ধে যুক্তি এই যে fat শব্দের a একটি স্বর কিন্তু আ কার যুক্ত য স্বর যুক্ত ব্যঞ্জন। সুতরাং একটা অন্যের প্রতিনিধি হইতে পারে না। এই ধ্বনি প্রকাশ করিতে কেহ অ এ য ফলা আকার, কেহ এতে য ফলা আকার দিয়া এক এক অদ্ভুত সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ব্যঞ্জনে স্বর যুক্ত হয়, স্বরে ও স্বর যুক্ত হয় কিন্তু স্বরে ব্যঞ্জনে যুড়িয়া দিলে একটা কিন্তুতকিমাকার Monster প্রস্তুত হয়।

বাঙ্গলায় ই এবং উ বর্ণের উচ্চারণে গোল যোগ নাই কিন্তু আমরা অনেক সময়ে হ্রস্ব ই এবং হ্রস্ব উ কে দীর্ঘ ঈ এবং দীর্ঘ উ রূপে উচ্চারণ করি। এক স্বর বিশিষ্ট শব্দ মাত্রেরই হ্রস্ব ই এবং হ্রস্ব উ, দীর্ঘ ঈ এবং দীর্ঘ উ রূপে আমরা উচ্চারণ করিয়া থাকি যথা দ্বি, ত্রি, কি, ঘি, ঝি, ছি, কিল্, খিল্, হিম্, শিব, বিষ্, বিশ্, সিল্, স্থির, ডিম্, কিল্, তিল্ ইত্যাদি, সু, কু, গুড়্, শুঁড়্ শুঁঠ, উট্, ফুল্, ভুল্, কুল্, গুণ্, পুর্ ইত্যাদি।

আমরা সর্ব্বদাই ই বর্ণ এবং উ বর্ণের মাত্রায় প্রভেদ করিনা বলিয়া সর্ব্বদাই হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈ ইত্যাদি বলিতে হয়। আবার শ্রীহট্টের লোক ও কারকেও উ কার রূপে উচ্চারণ করেন—গোলককে গুলক বলেন। সুতরাং তাঁহারা ও কারকে বলেন সন্ধ্যক্ষর উ। বাঙ্গলারও অনেক শব্দে ও স্থানে উ উচ্চারিত হয়। সেই সকল শব্দের বানানেও ও কার ত্যাগ করিয়া উকার গ্রহণ করা হইয়াছে যথা রোটি স্থানে রুটি, টোপি স্থানে টুপি, ধোতি স্থানে ধুতি ইত্যাদি।

আমাদের মধ্যে ই, উ এবং কখন কখন অ বর্ণের মাত্রার প্রভেদ নাই বলিয়া বাঙ্গলায় ইন্দ্রবজ্র, উপযাতি, মালিনী, শিখরিণী, তোটক, তূণক, পঞ্চচামর প্রভৃতি ছন্দে কবিতা হইতে পারে না। ভারতচন্দ্র, বলদেব পালিত প্রভৃতি কবিগণ সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গালায় কবিতা লিখিয়াছেন বটে কিন্তু সে কবিতা স্বাভাবিক নহে—তাহা পড়িবার সময়ে স্বাভাবিক উচ্চারণ বিকৃত না করিলে ছন্দোভঙ্গ হয়। সুতরাং এখন কোন কবিই ব্যঙ্গচ্ছলে ভিন্ন সেরূপ ছন্দে কাব্য লেখেন না।

ঋ কারকে হিন্দুস্থানী ও মহারাষ্ট্রীয়েরা যেরূপ উচ্চারণ করেন সে উচ্চারণ বঙ্গদেশে নাই। যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রণীত একখানি বাঙ্গলা নভেলে পড়িয়াছিলাম যে একজন উৎকলবাসী ক্রুষ্ণ ক্রুষ্ণ বলিতেছেন। তাহাতে বোধ হয় উড়িষ্যায়ও সেইরূপ উচ্চারণ আছে। কোন এক ভাষার ব্যাকরণে পড়িয়াছি যে সেই ভাষায় এমন একটী স্বর আছে যাহা উচ্চারণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত চেষ্টার প্রয়োজন হয় : উ উচ্চারণ করিতে হইলে ওষ্ঠদ্বয় যে আকার ধারণ করে, ওষ্ঠদ্বয়কে সেই আকার ধারণ করাইয়া ই উচ্চারণ করিতে হয়। উল্লিখিত পশ্চিম দেশীয় লোকেরা প্রায় তদ্রূপ করিয়া ই ঋ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার বোধ হয় যে আমরা ঋ-কে যে রি রূপে উচ্চারণ করি সংস্কৃত ব্যাকরণকারেরা তাহারও অনুমোদন করিতেন। কেন না ব্যাকরণে দেখিতে পাই যে ঋষিশব্দ রিষি রূপে, কৃমি শব্দ ক্রিমি রূপে এবং পৈতৃক শব্দ পৈত্রিক রূপেও লিখিত হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও বাঙ্গলাতেও ঋ ফলা এবং ই কার যুক্ত র ফলার মধ্যে উচ্চারণগত প্রভেদ আছে। অনেকেই কিন্তু ইহার ভুল উচ্চারণ করেন। আমি কোন কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকেও তাদৃশ, যাদৃশ, জতুগৃহ, সরীসৃপ্ প্রভৃতি শব্দকে তাদ্রিশ, যাদ্রিশ, জতুগ্রিহ, সরীস্রিপ্ রূপে উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছি। অর্থাৎ তাঁহারা ঋ-কে ব্যঞ্জন বর্ণ রূপে উচ্চারণ করেন। এইরূপ উচ্চারণ যে ভুল তাহা একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। মালিনী ছন্দের কোন শ্লোকের প্রথম চারিটা অক্ষর যদি জতুগৃহ হয় এবং জতুগৃহ যদি জতুগ্রিহ রূপে উচ্চারিত হয় তাহা হইলে দ্বিতীয় স্বর গুরু হইয়া যায় সুতরাং ছন্দোভঙ্গ হইবে কেননা মালিনীর প্রথম ছয়টী স্বর লঘু হইতেই হইবে।

হ্রস্ব এ বোধক কোন বর্ণ বাঙ্গলায় নাই—হিন্দীতেও নাই। হিন্দীতে হ্রস্ব এ কারের ধ্বনিও নাই। কিন্তু বাঙ্গলায় এ কার প্রায় হ্রস্ব রূপেই উচ্চারিত হয়। যখন আমরা সংস্কৃত পাঠ করি তখন এ কারের উচ্চারণ দীর্ঘই করিয়া থাকি। কিন্তু বাঙ্গলায় কথা কহিবার সময়েই হউক বা পাঠ করিবার সময়েই হউক সংস্কৃত শব্দের এ কারও আমরা হ্রস্ব রূপে উচ্চারণ করি যথা বাঙ্গলা শব্দ এই, এস, (আইস) যেখানে, সেখানে ইত্যাদি সংস্কৃত শব্দ স্বেচ্ছা, কেশব, কেদার, সেবক ইত্যাদি। সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা বলেন যে ই কারই হ্রস্ব এ কার। ইংরেজীতেও বোধ হয় আভিধানিকেরা সেইরূপই মনে করিতেন। Walker প্রণীত Dictionaryর পুরাতন সংস্করণে দেখিতে

পাই যে College, damage প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ Cal ij, dam ij বলিয়া লিখিত আছে। Webster প্রণীত Dictionaryর পুরাতন সংস্করণে Sunday, Monday, প্রভৃতির উচ্চারণ Sunday, Monday রূপে লিখিত আছে। ইংরেজী ticket বাঙ্গলায় টিকিট্ হইয়া গিয়াছে, Collegeকে এখনও হিন্দুস্থানীরা কালিজ বলেন। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে হ্রস্ব ই এবং হ্রস্ব এ এক বস্তু নহে। কিন্তু হ্রস্ব এ এবং দীর্ঘ এ কারের প্রভেদ আমার অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। তথাপি উভয়ের পার্থক্যসূচক একটা চিহ্ন থাকা ভাল।

এ কার সম্বন্ধে যাহা বলা গেল ও কার সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে। আমরা ও কারকেও প্রায়ই হ্রস্ব রূপে উচ্চারণ করি। এ কথাটা হঠাৎ অনেকের বিশ্বাস হইবে না। কিন্তু তাঁহারা একটু ভাবিয়া দেখিলেই আমার মতে মত দিবেন। তথাপি একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। "সকলেরি মুখে শুনিগো শুনিগো" এই দ্বাদশটী অক্ষর বাঙ্গলা স্বাভাবিক ভাবে উচ্চারণ করিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে ইহা বাঙ্গলা ছন্দের একটা চরণ। কিন্তু ইহার এ কার দুইটী এবং ও কার দুইটী যদি কিছু অস্বাবিক ভাবে টানিয়া দীর্ঘ করিয়া উচ্চারণ করা যায় তাহা হইলে অক্ষরগুলির সমষ্টি তোটক ছন্দের এক চরণে পরিণত হয় যথা—

সকলেরি মুখে শুনিগো শুনিগো

এই এক পংক্তি হইতেই দেখা যায় যে দীর্ঘ স্বরগুলিকে হ্রস্ব করিয়া উচ্চারণ করাই বাঙ্গলার প্রকৃতি। সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা বলেন যে উ কারই ও কারের হ্রস্ব। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে।

অন্যান্য ভাষায় আরও স্বর আছে। International phonetic society কর্ত্তৃক যে বর্ণমালা প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে শুনিয়াছি বত্রিশটী স্বর আছে। কিন্তু আমাদের আট নয়টি স্বর দিয়াই কাজ চলে।

এখন কয়েকটি স্বরান্ত বাঙ্গলা শব্দের নব প্রচলিত বানানের কথা বলিয়া প্রবন্ধের এই অংশের উপসংহার করিব। আমরা বহুকাল হইতে ছোট, খাট, বার, তের, পনর, কোন, মত প্রভৃতি বহু শব্দ অকারান্ত করিয়াই লিখিয়া আসিতেছি। কিন্তু কিছু দিন হইতে কয়েকখানি মাসিক পত্রিকায় এই শব্দগুলিকে ওকারান্ত করিয়া লিখিত হইতেছে। শব্দগুলি যখন সংস্কৃতমূলক নহে তখন সেগুলির উচ্চারণানুযায়ী বানান তেমন দোষের নহে বটে কিন্তু শব্দগুলিতে ও কার যোগ করিতে যে শ্রম এবং সময়ের ব্যয় হয় তদনুরূপ কোন ফল লাভ হয় কি? বিশেষত আমরা যখন হই, হউক, করি, অপি, অনু, কপি, বপু, বসু প্রভৃতি শত শত শব্দের অকারকে ও রূপে উচ্চারণ করি অথচ বানানে তাহা ওকারে পরিবর্ত্তিত করি নাই তখন কেবল শেষের আ কারগুলিকেই কেন ও কার করিয়া দিব? এই শব্দগুলির মধ্যে অনুরূপ হসন্ত শব্দ আছে যথা কোন, কোন্, মত মত্, বার, বার্। পাছে শীঘ্র অর্থ বোধ না হয় এই জন্য যদি বানান পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে হসন্তগুলিকে চিহ্নিত করিয়া দিলেই হয়। কোন অক্ষরে ও কার যোজনা করা অপেক্ষা হসন্তের চিহ্ন দিতে সময় ও শ্রম কম লাগে। কোন চিহ্ন না দিলেও অর্থ বোধ হইতে কতক্ষণ লাগে? এতৎ সম্বন্ধে আরও কয়েকটা কথা স্থানান্তরে বলিব।

এখন আমরা বাঙ্গলায় ব্যঞ্জনের প্রচুরতা অপ্রচুরতা বিষয়ে আলোচনা করিব।

স্পর্শ বর্ণের ঙ ঞ এবং ণ ছাড়া অন্য কোন বর্ণের উচ্চারণে মতদ্বৈধ নাই। শিশুদিগকে বর্ণমালা শিখাবার সময়ে ঙ কে উঁঅ অথবা উঁআ এবং ঞ কে ইঁঅ বলিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু উহাদের প্রকৃত নাম শেখানই উচিত। ঙ কারের সহিত গ যুক্ত হইলে রাঢ় প্রদেশ ভিন্ন বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই ঙ্ঙ উচ্চারিত হয়— বঙ্গকে বঙ্ঙ এবং গঙ্গাকে গঙ্ঙা বলে। গ্রীকে বঙ্গ এবং গঙ্গা লিখিতে বগ্গ এবং গগ্গা লিখিতে হয়।

ইহাতে প্রভেদ এই যে বাঙ্গলার অনেক প্রদেশে গঙ্গা ও বঙ্গের গ কে ঙ রূপে উচ্চারণ করে কিন্তু গ্রীকে দুইটা গ একত্র থাকিলে প্রথম গ কে ঙ রূপে উচ্চারণ করিতে হইবে। জ কারের সহিত ঞ যুক্ত হইয়া জ্ঞ হয়। ইহার প্রকৃত উচ্চারণ জ্ঞঁ। এই উচ্চারণটা এমন কঠিনও নহে। কিন্তু তথাপি কি বঙ্গে কি মহারাষ্ট্রে উভয় দেশেই ইহার ভুল উচ্চারণ প্রচলিত—আমরা গ্‌গঁ, মহারাষ্ট্রীয়েরা বলেন দ্ন। মাহারাষ্ট্রীয় জ্ঞানোদয় পত্রিকার নাম ইংরেজীতে Dnanoday রূপে লিখিত হইয়া থাকে। বাঙ্গলায় যাজ্ঞা শব্দের চলিত উচ্চারণ যাচ্‌ঙা কিন্তু তাহার প্রকৃত উচ্চারণ যাচ্চাঁ মূর্দ্ধন্য ণ কারের উচ্চারণ বাঙ্গলায় নাই। কিন্তু ট, ঠ, ড, ঢ এই চারি বর্ণের উপরে থাকিলে আমরা ণ কারের উচ্চারণ অনেকটা করিতে পারি ও করিয়া থাকি। ইচ্ছা করিলে সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। কণ্টক, কণ্ঠ এবং দণ্ড শব্দের অনুনাসিক জিহ্বাকে যে স্থান স্পর্শ করাইয়া উচ্চারণ করিতে হয়, অন্ত, পান্থ, মন্দ শব্দের অনুনাসিক উচ্চারণ করিবার সময়ে জিহ্বা তাহা অপেক্ষা নিম্নস্থান অর্থাৎ দন্তমূল স্পর্শ করে। যাহা হউক ন ও ণর মধ্যে যে প্রভেদ তাহা অকিঞ্চিৎকর। দয়ানন্দ সরস্বতী ণ স্থানে নই উচ্চারণ করিতেন।

স্পর্শ বর্ণের অন্য গুলির কোন্‌টার উচ্চারণ কিরূপ সে বিষয়ে মতভেদ না থাকিলে ও কার্য্যত কোন কোন স্থানের লোক কোন কোন বর্ণকে অশুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ করে। বঙ্গের অনেক স্থানে বিশেষত পূর্ব্ববঙ্গে ও আসামে চ ও ছ, স বা S রূপে এবং জ ও ঝ Z রূপে উচ্চারিত হয়। আসামের অনেক শিক্ষিত লোকও ঝ উচ্চারণ করিতে পারেন না। উপর আসামে ট, ঠ, ড, ঢ এবং ত, থ, দ, ধ এই বর্ণগুলি যথাক্রমে পরিবর্ত্তনীয় রূপে ব্যবহৃত হয়। আমরাও যে কথন কথন সে রূপ না করি তাহা নহে আমরা দাড়িম্বকে ডালিম এবং দ্বিদল অর্থাৎ দালকে ডাল বলি। পূর্ব্ব বঙ্গের অশিক্ষিত লোক কোন বর্গের চতুর্থ বর্ণ উচ্চারণ করিতে পারে না চতুর্থ বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ উচ্চারণ করিয়া থাকে। আসামের মিরিরা কোন মহাপ্রাণ বর্ণই অর্থাৎ বর্গের দ্বিতীয়, চতুর্থ বর্ণ এবং হ উচ্চারণ করিতে পারেনা। বাঙ্গলায় স্পর্শ বর্ণের সংখ্যা সাতাশ। অতিরিক্ত অক্ষর দুইটী ড় ও ঢ়। পূর্ব্ব বঙ্গের এবং আসামের অশিক্ষিত লোক এই দুইটা বর্ণ উচ্চারণ করিতে পারেনা। পূর্ব্ব বঙ্গের ড়কে বর্গীয় র বলে। কোন অক্ষরে প্রকৃত উাচ্চরণ না হইয়া যদি অন্য একটা অক্ষরের মত উচ্চারণ হয় তাহা হইলে সেই অক্ষরগুলিকে বিশেষিত করিবার জন্য প্রত্যেক অক্ষরের সংস্কৃত ব্যাকরণে যে উচ্চারণ স্থান উক্ত আছে সেই স্থানের নাম দিয়া পরিচিত করিতে হয়। আমরা সেই জন্যই দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য ণ বলিতে বাধ্য হই। উপর আসামে ট-কে মূর্দ্ধন্য ট এবং ত-কে দন্ত্য ট বলে। আমরা বর্গীয় জ ও অন্তঃস্থ জ (য), তালব্য শ, মূর্দ্ধন্য শ, এবং দন্ত্য শ বলি। আসামীদের পাঁচটা স (Sa), প্রথম স অর্থাৎ চ, দ্বিতীয় স অর্থাৎ ছ তালব্য স অর্থাৎ শ, মূর্দ্ধণ্য স অর্থাৎ ষ এবং এবং দন্ত্য স।

স্পর্শ বর্ণের পর অন্তঃস্থ য। ইহা কখনও জ রূপে কখনও য় রূপে উচ্চারিত হয়। কিন্তু ইহাতে আকার দিয়া কখনও স্বরের ধ্বনি প্রকাশ করা বিধেয় নহে। খাওয়া, যাওয়া প্রভৃতি শব্দের শেষ অক্ষর য়া না হইয়া আ হওয়া উচিত। ইংরেজীতে বর্ণান্তরিত করিতে হইলে উহাদের স্থানে Khaoa, jaoa ই লেখে কিন্তু Khaoya, jaoya লিখিত হয় না। Soda water কথাটা বাঙ্গলায় সোডা ওয়াটার লিখিত হয়। ইহাও নিতান্ত অশুদ্ধ কেননা ইংরেজীতে শব্দটায় য় কারের লেশ মাত্র নাই। প্রাকৃত ভাষার নিয়মানুসারে দুই স্বরের মধ্যস্থিত অসংযুক্ত ব্যঞ্জনের লোপ হয়। সুতরাং সংস্কৃত গোপাল শব্দ প্রাকৃতে গোআল। তাহার স্থানে বাঙ্গলায় গোআলা হয়। সুতরাং গোআল ও গোআলা, গোয়ালা রূপে কথনই লেখা উচিত নহে। এরূপ স্থলে সম্পূর্ণ অ্য না লিখিয়া লুপ্ত আকারের চিহ্ন অথবা Apastrophe লিখিয়া তাহার গাত্রে া সংযোগ করিয়া দিলে

লেখার সুবিধাও হয়। কেহ কেহ কোন কোন সংস্কৃত শব্দের য়া কেও আ রূপে উচ্চারণ করেন। উত্তর-বঙ্গের বিখ্যাত নদী করতোয়াকে উত্তর বঙ্গের অনেক লোক করতোআ রূপে উচ্চারণ করেন। কিন্তু সেই সকল লোকই স্বচ্ছতোয়া শব্দটীর ঠিক্ উচ্চারণ করেন। ওকারের পর আকার হিন্দীতে ব্যবহৃত হইতে পারে। হওয়া, যাওয়া, খাওয়া প্রভৃতি শব্দের বানান পরিবর্ত্তিত করিয়া ও র গায়ে া দিয়া অর্থাৎ হওা, খাওা, যাওা প্রভৃতিরূপ বানান করিবার প্রস্তাব ছয় বৎসর পূর্ব্বে আমি প্রথমে করিয়াছিলাম তখন আমি অনেকের উপহাসাস্পদও হইয়াছিলাম। কিন্তু এক বৎসর হইল বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রধান সাহিত্যিক পত্রিকা প্রবাসীর সম্পাদক সেইরূপ বানান অবলম্বন করিয়াছেন।

বাঙ্গলায় অন্তঃস্থ ব ঠিক বর্গীয় ব এর মতই লিখিত হইয়া থাকে। এই দুই বর্ণের উচ্চারণ-গত প্রভেদও বাঙ্গলায় নাই। কিন্তু বাঙ্গলা অক্ষরে সংস্কৃত ও ইংরেজী লিখিবার জন্য অন্তঃস্থ ব কারের পৃথক্ আকার থাকা নিতান্ত উচিত। সে জন্য কোন নূতন সৃষ্টি না করিয়া দেবনাগরের অন্তঃস্থ ব বাঙ্গলায় প্রচলিত করিলেই উত্তম হয়।

বাঙ্গলায় তালব্য শ কারের যেরূপ উচ্চারণ আমরা করিয়া থাকি সেইরূপ উচ্চারণ হিন্দুস্থানীরাও করেন। মহারাষ্ট্রীয়দের উচ্চারণও প্রায় তদ্রূপ। মাহারাষ্ট্রীয়েরা মূর্দ্ধণ্য ষ কারের যে উচ্চারণ করেন তাহা আমাদের পক্ষে কিছু কষ্টসাধ্য। কিন্তু তাহা তালব্য শকারের উচ্চারণের এতই অনুরূপ যে তাহার পৃথক্ রূপ উচ্চারণ করার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমার বোধ হয় না। কিন্তু আমরা যে দন্ত্য স কে তালব্য শ রূপে উচ্চারণ করি ইহা বড়ই দোষের কথা। বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে এই অক্ষরের প্রকৃত উচ্চারণ শিখাইয়া দিয়া স্কুলে কথা কহিবার সময়ে সেইরূপ উচ্চারণ করিতে বাধ্য করা উচিত। সেরূপ না করিলে আমাদের দেশের পতিত উচ্চারণের উদ্ধার হইবে না। পূর্ব্ববঙ্গে ও আসামে শ, ষ এবং স এই তিনটারই স্থানে অনেক স্থলে হ উচ্চারিত হয়। পশ্চিমদেশীয় এবং হাস্যরসপ্রিয় কবি বলিয়াছেন যে পূর্ব্বদেশীয় লোক শতায়ুর্ভব বলার পরিবর্ত্তে হতায়ুর্ভব বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন সুতরাং পূর্ব্বদেশীয়দের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে না। আশীর্ব্বাদং ন গৃহ্ণীয়াৎ পূর্ব্বদেশ-নিবাসিনাম্। শতায়ুরিতি বক্তব্যে হতায়ুরিতি ভাষিণাম্॥

পূর্ব্ববঙ্গে শ ষ স স্থানে হ এবং হ স্থানে অ উচ্চারিত হয়। শ, ষ, স স্থানে হ বলা, হ স্থানে অ বলা এবং চ, ছ, শ, ষ স্থানে দন্ত্য স বলা যেমন অন্যায়। এই সমস্ত উচ্চারণেরই সংশোধন হওয়া উচিত। কিন্তু যে সকল শব্দের উচ্চারণের সঙ্গে বানানেরও পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে তাহাদের বোধ হয় সংশোধন আর হইবে না। আসামীতে অনেক স্থলে শ, ষ, স স্থানে হ লিখিত হয়। আসামীরা আশ্বিনকে আহিন, বৈশাখকে বহাগ, আষাঢ়কে অহার, পৌষকে পুহ্, হাঁসকে হাঁহ্, এবং মাসকে মাহ্ বলেন এবং লেখেন। বাঙ্গলায়ও কোন কোন শব্দের শ স্থানে হ লিখিত ও উচ্চারিত হয়। ইহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

উপরে যে সকল বর্ণের বিবরণ দেওয়া হইল, তদ্ভিন্ন তিনটী উচ্চারণ জ্ঞাপক চিহ্ন বাঙ্গলায় আছে তাহা অনুস্বার বিসর্গ এবং চন্দ্রবিন্দু। ইহার মধ্যে অনুস্বার ও বিসর্গের প্রকৃত উচ্চারণ বাঙ্গলায় হয় না। বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বত্র এবং আসামে ও মিথিলায় অনুস্বার ঙ্ রূপে উচ্চারিত হয়। কিন্তু ইহার কৃত সংস্কৃত উচ্চারেণ চন্দ্রবিন্দুর প্রায় অনুরূপ। প্রভেদের মধ্যে এই যে চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হইলে কোন লঘুস্বর গুরু হয় না কিন্তু অনুস্বার যুক্ত হইলে লঘুস্বর গুরু হয়। শব্দের শেষের বিসর্গ বাঙ্গলায় মোটেই উচ্চারিত হয় না। এই সমস্ত বিসর্গ একেবারে বাদ দেওয়া উচিত। অনেক বিসর্গের ব্যবহার ইতি মধ্যেই উঠিয়া গিয়াছে। তেজ, মন, ছন্দ, স্রোত, প্রায়, বক্ষ প্রভৃতি শব্দে এখন আর বিসর্গ দেওয়া হয় না। কিন্তু ক্রমশঃ, প্রথমতঃ, বস্তুতঃ, কার্য্যতঃ প্রভৃতি শব্দে অনেকের লেখায়

এখনও বিসর্গ দেখিতে পাই। এ গুলি উঠাইয়া দিলেই ভাল হয়। ইহাতে কোন কোন বাঙ্গলা ব্যাকরণের সম্মতিও আছে। চন্দ্রবিন্দুর প্রচলন বোধ হয় অল্পদিন হইয়াছে। কেননা আমরা প্রাচীন পুস্তকে চাঁদ এর পরিবর্ত্তে চান্দ্, কাঁদিল র পরিবর্ত্তে কান্দিল দেখিতে পাই। পূর্ব্ববঙ্গের লোক চন্দ্রবিন্দু উচ্চারণ করিতে পারেন না। অন্য পক্ষে রাঢ়ে ও আসামে চন্দ্রবিন্দুর বড় বাহুল্য।

বাঙ্গলা বর্ণ মালায় যে সকল উচ্চারণ জ্ঞাপক বর্ণ আছে তাহাদের কথা নিঃশেষে বলা হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সকল বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ হয় না। আসামে উচ্চারণ সংস্কারের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু বঙ্গদেশে স্কুলে বাঙ্গলার উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া হয় না। ছাত্রদিগকে প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণ বুঝাইয়া দিয়া স্কুলের মধ্যে কথা কহিবার সময়ে সেই সেই উচ্চারণ করিতে পদ্মকে পদ্‌ম বলিতে, ভিক্ষাকে ভিক্‌ষা বলিতে, অন্তঃস্থ ব কে প বলিতে বাধ্য করা উচিত। পূর্ব্বে বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা কাশ্মীরকে কাশ্‌মীর বলিতেন, যদি সেই উচ্চারণটার সংশোধন উচিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে পদ্‌ম উচ্চারণ প্রচলিত হইবেনা কেন? আসামীরা সাহেব শব্দটার স স্থানে চ লিখিয়া থাকেন আমরা Shakespear শব্দটা বাঙ্গলায় সেক্ষপীর লিখিয়া থাকি। এ উভয়ই সমান অন্যায়। যদিও আসামীরা চ কে স রূপে উচ্চারণ করেন এবং আমরা দন্ত্য স কে তালব্য শ রূপে উচ্চারণ করি তথাপি যখন চ ও স র এক একটা স্বীকৃত উচ্চারণ আছে এবং দন্ত্য স ও তালব্য শ উচ্চারণ করিবার স্বীকৃত স্বতন্ত্র বর্ণ আছে তখন সাহেব ও শেক্‌স্‌পিয়ার লিখিতে কখনই চাহাব ও সেক্ষপীর লেখা উচিত নহে। সেইরূপে "বাঙ্গলা" শব্দটা ও অনুস্বার দিয়া "বাংলা" লেখা উচিত নহে। কেন না আমরা অনুস্বারের ভুল উচ্চারণ করিয়া "বংশ"কে "বঙ্‌শ" বলি বলিয়া বানানটাও ভুল করা উচিত নহে। Parcel শব্দটা বাঙ্গলায় তালব্য শ দিয়া লেখা উল্লিখিত কারণে ভুল। ইংরেজী Stamp, station, post প্রভৃতি বহু st যুক্ত শব্দ আমরা বাঙ্গলায় সর্ব্বদাই ব্যবহার করিয়া থাকি এবং সেগুলির উচ্চারণ ইংরেজীর মতই করি। কিন্তু লিখিবার সময়ে আমরা মূর্দ্ধণ্য ষ এর নিচে ট লিখিয়া st জ্ঞাপন করিয়া থাকি। উল্লিখিত কারণে মূর্দ্ধণ্য ষ র পরিবর্ত্তে সেই সকল স্থানে দন্ত্য স লেখা উচিত। হিন্দীতে দন্ত্য স ই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আমাদেরও সেই রূপ করা কর্ত্তব্য।

কতকগুলি ধ্বনি প্রকাশ করিবার উপযোগী বর্ণ বাঙ্গলায় নাই। যথা:—ইংরেজী F, V, Z, Zh, এবং পারসী (খ) (কাফ্) এবং (গাইন)। ইহার মধ্যে পারসী ধ্বনি কয়েকটা ত্যাগ করিলেও চলে কেন না বাঙ্গালার কথা কহিবার সময়ে সেই সকল ধ্বনির উচ্চারণ আমরা কখনই করিনা। কিন্তু অপর কয়েকটা ধ্বনির উচ্চারণ বাঙ্গলায় কথা কহিবার সময়ে আমাদিগকে অনেক সময়েই করিতে হয়। ঘড়ীটা fast, violet রঙ্, zebra, leisure প্রভৃতি শব্দ আমরা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া থাকি। এই কয়েকটাই মিশ্রবর্ণ বলিয়া মনে হয়। ফ এ (ব) ফলা দিয়া দ্রুত উচ্চারণ করিলে F উচ্চারিত হয়। হিন্দীতে F ধ্বনি ফ র নিচে একটা বিন্দু দিয়া লিখিত হইয়া থাকে। বাঙ্গলায় সেই চিহ্নই প্রচলিত হওয়া বিধেয়। সেই রূপে ভ এ (ব) ফলা দিলে অথবা অন্তঃস্থ ব কারের সহিত হ যুক্ত হইলে V উচ্চারিত হয়। দেবনাগরের দন্তৌষ্ঠ (ব) বাঙ্গলায় গৃহীত হইয়া তাহার নিচে একটা বিন্দু দিয়া V ধ্বনি প্রকাশ করা যাইতে পারে। নতুবা ভ র নিচে বিন্দু দিয়াও সেই কার্য্য হয়। অন্তঃস্থ (ব) এবং V র উচ্চারণ এক নহে। V মহাপ্রাণ কিন্তু (ব) অল্পপ্রাণ। হিন্দীতে কিন্তু অপরিবর্ত্তিত (ব) দ্বারাই V জ্ঞাপিত হয়। Z সম্বন্ধে গ্রীক ব্যাকরণকারেরা বলেন যে দন্ত্য স র সহিত দ যুক্ত হইলে এই ধ্বনি উৎপন্ন হয়। আমার বোধ হয় দন্ত্য সর সহিত বর্গের যে কোন তৃতীয় বর্ণ যুক্ত হইলে Z এর উচ্চারণ হয়। সুতরাং দন্ত্য স কারের নিচে একটা বিন্দু দিয়া Z প্রকাশ করাই সমীচীন। কিন্তু Z এর সহিত যখন বর্গীয়

জ কারের উচ্চারণের অনেক সাদৃশ্য আছে এবং যখন হিন্দীতে জ কারের নিম্নে বিন্দু দিয়াই Z এর ধ্বনি প্রকাশ করা হয় তখন আমাদেরও তাহাই করা ভাল। Zh ধ্বনি সম্বন্ধে আমার বোধ হয় যে কোন বর্গের তৃতীয় বর্ণ যোগ করিলে মূৰ্দ্ধণ্য ষ Zh রূপে উচ্চারিত হয়। সুতরাং মূৰ্দ্ধণ্য ষ কারের নিম্নে একটী বিন্দু দিয়াই এইধ্বনি প্রকাশ করা উচিত।

এখন সাধারণ বানান সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি। অনেকের ইচ্ছা এবং মত এই যে সমস্ত বানান আমাদের উচ্চারণানুযায়ী হওয়া উচিত। ইহাতে আমারও অমত নাই। বানানের পরিবর্ত্তনে যদি অর্থবোধের ব্যাঘাত না হয়, যদি প্রতিবেশীগণের উপহাসাস্পদ না হইতে হয়, যদি শ্রমের ও সময়ের লাঘব হয়, যদি নব প্রবর্ত্তিত বানান ঠিক উচ্চারণ প্রকাশ করে, তাহা হইলে যে সকল শব্দের বানান উচ্চারণ সমগ্র বঙ্গদেশে এক সেই সকল শব্দের বানান উচ্চারণানুযায়ী করাই উচিত। অনেক বাঙ্গলা শব্দের বানান বহুদিন হইতেই উচ্চারণানুসারে লিখিত হইয়া থাকে। হিন্দীতে উনসত্তর, একাত্তর, বাহাত্তর, তিয়াত্তর প্রভৃতি শব্দ উনহত্তর, একহত্তর, বাহাত্তর, তিহত্তর রূপে উচ্চারিত ও লিখিত হয়। এই সকল শব্দের শেষার্দ্ধ "সত্তর" শব্দের রূপান্তর। সত্তরের স স্থানে হ হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলায় কেবল বাহাত্তর শব্দে হ আছে কিন্তু অন্যগুলিতে হ-কার মহা-প্রাণতা হারাইয়া আকারে পরিণত হইয়াছে। কি "হ" কি "আ" উভয়েই এই শব্দগুলিতে সকারের পরিবর্ত্তে হইয়াছে। যদি কোন শব্দের বানান পরিবর্ত্তন করিতে হয় তাহা হইলে এরূপ পরিবর্ত্তনই হওয়া উচিত। ইহাতে অর্থবোধের ব্যাঘাত নাই, লিখিবার অসুবিধা নাই। পরিবর্ত্তনও ঠিক উচ্চারণানুযায়ী। কিন্তু বড়কে বড়ো করিলে আমাদের সেরূপ সুবিধা হয় না। তাহাতে অর্থবোধের ব্যাঘাত হয় না বটে কিন্তু শেষ বর্ণে ওকার যোজনা করিবার জন্য সময় ও শ্রমের প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন বঙ্গদেশের অনেক স্থানে শব্দটার যে উচ্চারণ ঠিক "বড়।" আরও আপত্তি এই যে কলিকাতা অঞ্চলে শব্দটার যে উচ্চারণ, ওকার দিলে সে উচ্চারণ হয় না। ওকারের উচ্চারণ দীর্ঘ। বাঙ্গলায় যে হ্রস্ব ওকারের ধ্বনি আছে তাহাও ওকারের বিকৃত উচ্চারণ। যদি স্বাভাবিক ত্যাগ করিয়া নবপ্রবর্ত্তিত বানানের অক্ষরেরও বিকৃত উচ্চারণ গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে পুরাতন বানানের অক্ষরের বিকৃত উচ্চারণ থাকাই ভাল। বড় শব্দের শেষে যে ঈষৎ ওকার ধ্বনি আছে তাহা অদ্য, কল্য, গরু, শনি, রবি প্রভৃতি শব্দেও আছে ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি।

আর একটা নব প্রবর্ত্তিত বানানের কথা বলিতেছি। কেহ কেহ "কি" শব্দটা দীর্ঘ ঈ দিয়া লেখেন। কিন্তু আমি উপরে দেখাইয়াছি যে স্থির, তিন, প্রভৃতি সমস্ত একস্বর বিশিষ্ট শব্দের হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈ রূপে উচ্চারিত হয়। যদি 'কি'কে দীর্ঘ ঈ দিয়া লিখিতে হয় তাহা হইলে সেই সমস্ত শব্দও দীর্ঘ ঈ দিয়া লেখা উচিত।

তাহার পর যে সকল শব্দ সংস্কৃত বা সংস্কৃতমূলক সেগুলিকে আমাদের বিকৃত উচ্চারণানুযায়ী বানান করিলে বিষম গোলযোগ হইবে। দন্ত্য স যুক্ত সকল শব্দের অর্থ সমস্ত, তালব্য শ যুক্ত শকলের অর্থ খণ্ড। দন্ত্য স যুক্ত সুর শব্দের অর্থ দেবতা, শ যুক্ত শূর শব্দের অর্থ বীর। এই শব্দগুলির একই বানান হওয়া কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। আমরা দন্ত্য স কে তালব্য শ রূপে উচ্চারণ করি বলিয়া যদি আমাদের জাতিকে তালব্য শ দিয়া শ্বজাতি লিখি অথবা Self-reliance এর বাঙ্গলা যদি তালব্য শ দিয়া শ্বাবলম্বন লিখি তাহা হইলে আমাদের প্রতিবেশী কেন আমাদের নিজের চক্ষেও আমরা বড় কৃপার পাত্র হইব।

সুতরাং সংস্কৃত শব্দের বানান কোন মতেই পরিবর্ত্তন করা উচিত নহে এবং আমাদের উচ্চারণেরই যথা-সাধ্য সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত। বর্ত্তমান সময়ের কোন বাঙ্গালীরই Settle fact এর দোহাই দিয়া এই প্রস্তাবটী উড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে।

তাহা হইলে বাকী রহিল খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ। সেগুলির বানান যেখানে সম্ভব সেখানেই উচ্চারণানুরূপ করা উচিত। সেই জন্য আমি খাওয়া, যাওয়া, সোড়াওআটার, ষ্টেশন, শেক্‌সপিয়ার প্রভৃতি শব্দের অশুদ্ধ বানানের সংশোধনের প্রস্তাব করিয়াছি।*

ক্রমশঃ—

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

ভাবুক।

—:-*-:—

নিতি নব গীতি গাও বল তুমি কেবা হে
হেসে হেসে ভেসে যাও জোছনার প্রবাহে।
কাঁদো তুমি চুপি চুপি, নিশি সনে মিশি রে
আঁখিজল পড়ে ঝরি নিশীথের শিশিরে,
নভো নীলে যাও মিলে রচ বাস আকাশে,
তব হিয়া গুমরিয়া উঠে ওই বাতাসে।
অতি দ্রুত গতি তব আছ কার খোঁজেতে,
ফাগুণের আগুণে ও মধুপের ভোজেতে।
হরে আয়ু বহে বায়ু, ফুল কলি ঝরায়ে
ঢাল তুমি আঁখিধার গলা তার জড়ায়ে।
জীবে তব শিব মিলে শ্যাম মিলে শ্যামলে,
কমল চরণ আশে, ভালবাসো কমলে।
মুখে হাসি, চোখে জল, হৃদি ভরা পুলকে
ছায়াপথে গতায়তি কর তুমি ভূলোকে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

* কোচবিহার সাহিত্য সভায় পঠিত।

কিউবা-কাহিনী।

—ঃ*ঃ—

কিউবা (Cuba) দ্বীপটী ভারতবাসীদিগের নিকট সুপরিচিত না হইলেও পশ্চিম ইণ্ডিজ্ (West Indies) দ্বীপপুঞ্জ ও হাভানা (Havana) নগরীর নাম অনেকের অপরিজ্ঞাত নহে। কিউবা পশ্চিম ইণ্ডিজের বৃহত্তম দ্বীপ, এবং হাভানা কিউবার রাজধানী। পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট চুরুট্ ঐ দ্বীপে প্রস্তুত হয়, তাহা হাভানা চুরুট্ নামে সর্ব্বত্র পরিচিত। ১৯০৯ সনের মার্চ্চ মাসে কিউবার তামাকচাষ-প্রণালী দর্শন করিতে কোচবিহারের মহারাজ-কুমার ভিক্টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণের সহিত নিউইয়র্ক হইতে হাভানা যাত্রা করি। কিউবার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ভারতবর্ষের—বিশেষতঃ কোচবিহারের—তামাকের উৎকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে কি না সেই উদ্দেশ্যেই আমরা যাত্রা করিয়াছিলাম; দেশভ্রমণই মূল উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু স্থানটী দেখিয়া যত প্রীতি ও শিক্ষালাভ করিয়াছি, য়ুরোপ এবং মার্কিণেরও অনেক স্থানে ততটা লাভ করিতে পারি নাই। আমাদের ভ্রমণকাহিনী আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কিউবার ঐতিহাসিক বিবরণ যৎকিঞ্চিৎ না বলিয়া লইলে দেশটী সম্বন্ধে পাঠকদিগের বিশেষ কোন ধারণা নাও হইতে পারে, তাই প্রথমেই বাধ্য হইয়া নীরস ঐতিহাসিক তত্ত্বের অবতারণা করিতে হইল।

একজন কিউবান কৃষকের বাটী। সম্মুখেই ডানদিকে
একটি তামাকের ক্ষেত।

অতলান্তিক (Atlantic) মহাসাগর, ক্যারিবিয়েন (Caribbean) সমুদ্র ও মেক্সিকো উপসাগর এই তিন জলরাশি বিভক্ত করিয়া যে দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত তাহাই পশ্চিম ইণ্ডিজ্ বা আন্তিলিজ্ (Antilles) নামে অভিহিত। ঐ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে কিউবা, পোর্টোরিকো (Porto Rico), হাটি (Haiti) ও জ্যামেইকাই (Jamaica)বৃহত্তম। জ্যামেইকা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। পোর্টোরিকো যুক্তরাজ্যের অধীন, এবং কিউবা একটী সাধারণতন্ত্র;

হাটি দ্বীপটীতেও দুইটী সাধারণতন্ত্র গঠিত আছে। এই দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া কিউবা Queen of the Antilles অর্থাৎ "আন্তিলিজের রাণী" বলিয়া খ্যাত। উহার দৈর্ঘ্য ৭৫০ মাইল, ও আয়তন ৪৩,০০০ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা বিংশতি লক্ষের উপরে।

পিনার দেল্ রিও নগরের উপকণ্ঠে মিঃ হোম্‌স্ নামক জনৈক আমেরিকানের বাটী। চিত্রের বামদিক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমে এক মার্কিণ যুবক, পরে মিঃ হোম্‌সের একজন কর্ম্মচারী, তৎপরে পিনার দেল্ রিও নগরের মেয়র, মিঃ হোম্‌স্, তাঁহার কন্যা ও পত্নী, লেখক, ও অবশেষে পিনার দেল্ রিও প্রদেশর গভর্ণরের সেক্রেটারী।

কলোম্বাস ভারতবর্ষে পৌছিবার সহজ পথ বাহির করিতে যাইয়া আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সে কথা অনেকেই অবগত আছেন। মৃত্যু সময়েও কলোম্বাসের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি যেই মহাদেশে পৌছিয়াছিলেন, তাহাই ইতিহাসবিখ্যাত ভারতবর্ষ; এবং তিনি মার্কিণের যে লোহিতাঙ্গ অধিবাসীদিগের (American Red Indians) সংস্রবে আসিয়াছিলেন, তাহারাই প্রকৃত ভারতবাসী। এই কারণেই মার্কিণের আদিম অধিবাসীরা ভারতবাসীদের সহিত কোন জ্ঞাতিত্ব না থাকাস্বত্বেও বর্ত্তমানেও "ইণ্ডিয়ান" নামে পরিচিত, এবং অতলান্তিক মহাসাগরস্থ মার্কিণের নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জ "পশ্চিম ইণ্ডিজ্" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মার্কিণে "ইণ্ডিয়ান্" কথাটিতে সেখানকার আদিম অধিবাসীদিগকেই বুঝায়, কাজেই ভারতবাসীরা যুক্তরাজ্যে "হিন্দু" অথবা "ইষ্ট ইণ্ডিয়ান" নামে পরিচিত হন। কোন ভারতবাসী নিজকে "ইণ্ডিয়ান্" বলিয়া পরিচয় দিলে মার্কিণবাসীদের তাহাকে পক্ষিপালকপরিশোভিত কম্বলধারী তাম্রবর্ণ অধিবাসীদিগের একজন বলিয়া ভ্রম করা আশ্চর্য্য নহে।

"আসিয়া" মহাদেশের পূর্ব্বপ্রান্ত খুঁজিবার অভিপ্রায়ে কলোম্বাস ১৪৯২ সনের ২৮শে অক্টোবর কিউবাতটে উপনীত হন, এবং তিনি ঐ দ্বীপটীকে প্রথমে ছিপাঙ্গো (Cipango) অর্থাৎ জাপান ও পরে ক্যাথে (Cathay) অর্থাৎ চীন বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। কলোম্বাস কিউবা উপনীত হইয়া দেশীয় রাজার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন।

দূতেরা দ্বীপের ত্রিশ চল্লিশ মাইল অভ্যন্তরে আসিয়া একটী গ্রাম দেখিতে পাইল। সেখানে প্রায় পঞ্চাশটীমাত্র কুটীর অবস্থিত, লোকসংখ্যাও সহস্রের অধিক নহে। কলোম্বাস বহু আশা করিয়া চীনের সম্রাট মনে করিয়া রাজ্যাধিপতির সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দূতেরা চীন সম্রাটের পরিবর্ত্তে একজন উলঙ্গ অসভ্য রাজার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া এবং ইসারা ইঙ্গিতে মনের ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়া অবশেষে বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কলোম্বাসের ধারণা ছিল যে, দেশটী সুবর্ণ ও মণিমাণিক্যে পরিপূর্ণ, কিন্তু সে বিষয়েও তাঁহাকে হতাশ হইতে হইল। আদিম অধিবাসীরা দ্বীপটীকে কিউবানাকান (Cubanacan) নামে অভিহিত করিত। তাহা হইতেই কিউবা নামের উৎপত্তি।

মিঃ লুই মার্ক্সের তামাকের বাগানে মজুরদিগের থাকিবার ঘর।

কলোম্বাস কিউবাতে কোন অভিনিবেশ স্থাপন করেন নাই; কিউবা আবিষ্কার করিয়াছিলেন মাত্র। ১৫১১ সনে ভেলাস্কেজ্ (Velasquez) আদিম অধিবাসীদিগের নেতা হাতোয়েকে (Hatuey) পরাজয় করিয়া স্পেনের শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশ স্থাপন করেন। কিউবার প্রাচীন ইতিহাসে হাতোয়ের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। স্পেনবাসী-দিগের নির্ম্মম নিষ্ঠুরতার কথা ও হাতোয়ের বীরত্বকাহিনী এখনও কিউবার লোকমুখে কথিত হইয়া থাকে। হাটি দ্বীপটী প্রথম স্পেনকর্ত্তৃক জিত হইলে স্পেনবাসীদিগের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার মানসে হাতোয়ে হাটি পরিত্যাগ করিয়া কিউবার পূর্ব্বপ্রান্তে পলায়ন করতঃ আত্মরক্ষা করে। কথিত আছে যে, শ্বেতাঙ্গদিগের-দ্বারা কিউবা আক্রমণের পূর্ব্বে হাতোয়ে তাহার দলের লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলে :—“তোমরা জান যে, স্পেনবাসীরা সত্বরই কিউবা আক্রমণ করিবে বলিয়া গুজব উঠিয়াছে। আমাদের বন্ধু ও দেশবাসীরা হাটিতে তাহাদের দ্বারা কিরূপ নৃশংসভাবে উৎপীড়িত হইয়াছে তাহা তোমাদিগের অবিদিত নাই। তাহারা এখানে আসিলেও আমাদিগের উপর পূর্ব্বের ন্যায় অত্যাচার করিবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহারা যে দেবতার পূজা করিয়া থাকে সেই দেবতাকে সন্তুষ্ট করা সহজ নহে। এই দেবতার পূজার জন্য তাহারা আমাদিগের নিকট

বহুল পরিমাণে অর্থ আদায় করিয়া লইবে, ও আমাদিগকে হয় দাস করিয়া রাখিবে, নয় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিবে।" অতঃপর হাতোয়ে স্বর্ণ ও মণিমুক্তাপূর্ণ একটী মঞ্জুষা সর্ব্বসমক্ষে প্রদর্শন করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল:—"ইহাই স্পেনবাসীদিগের দেবতা; আমরা নৃত্য ও কীর্ত্তনদ্বারা ইহাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিব—দেখি ইহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারি কি না। এই দেবতা সন্তুষ্ট হইলে স্পেনবাসীরা ইহার আদেশানুসারে আমাদের উপর কোন অন্যায়াচরণ করিবে না।" হাতোয়ের দলের লোকেরা তাহার এই উক্তির সমর্থন করিল এবং মঞ্জুষাটী ঘেরিয়া নৃত্য ও কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিল। নৃত্যব্যাপারে সকলে পরিশ্রান্ত হইয়া যখন বিশ্রাম করিতে লাগিল তখন হাতোয়ে আবার দলের লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল:—"আমরা যদি এই দেবতাটীকে এখন নিজেদের নিকট রাখি তবে স্পেনবাসীরা যখন ইহাকে আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইবে, তখন দেবতা আমাদের উপর অপ্রসন্ন হইয়া আমাদিগের জীবন গ্রহণ করিতে পারে; অতএব আমার মতে ইহাকে নদীতে ফেলিয়া দেওয়াই যুক্তিসিদ্ধ।" সকলে এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলে মঞ্জুষাটী নদীতে নিক্ষিপ্ত হইল।

মিঃ মার্ক্সের বাগানে স্ত্রীমজুরগণ তামাকের পাতা তুলিতেছে। কীট-পতঙ্গাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার ও তামাকের উৎকর্ষ সাধন মানসে বস্ত্রাচ্ছাদিত ক্ষেত্রে তামাক উৎপন্ন হইয়াছে।

ইহার অব্যবহিত পরেই স্পেনবাসীরা যখন কিউবা আক্রমণ করে, তখন তাহারা হাতোয়ে ও তাহার অনুচরবর্গ-কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়। আক্রমণকারীরা জয়লাভ করিলে, তাহারা হাতোয়েকে বন্দী করিয়া অবশেষে জীবিতাবস্থায় অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া সংহার করে। যখন চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বলিতেছে, এবং হাতোয়ে একটী কাষ্ঠখণ্ডে দৃঢ়বদ্ধ রহিয়াছে, তখন একজন ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজক তাহার নিকট ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন ও ক্যাথলিক ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া বলিল যে হাতোয়ে যদি মৃত্যুর পূর্ব্বে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে তবে সে স্বর্গরাজ্যে স্থান পাইবে, আর যদি তাহা না করে তবে অনন্তজীবন নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবে। হাতোয়ে ধর্ম্মযাজকের উক্তি মন দিয়া শুনিল, ও কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—স্বর্গরাজ্যের দ্বার স্পেনবাসীদিগের জন্যও উন্মুক্ত থাকিবে কি

না। ধর্ম্মযাজক বলিল যে স্পেনবাসীরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তাহারা অবশ্যই স্বর্গে প্রবেশলাভের অধিকারী। তখন হাতোয়ে কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া বলিল "যে স্বর্গরাজ্যে নৃশংস স্পেনবাসীরা স্থান পাইবে, সেখানে আমার কোন শান্তিলাভের সম্ভাবনা নাই; আমার পক্ষে নরকই ভাল।" এই প্রকারে বীর হাতোয়ের মৃত্যু হইল। চারিশত বৎসর পরে কিউবার গভর্ণমেণ্ট এই বীর পুরুষের স্মৃতিরক্ষার্থ তাহার নামে একটী যুদ্ধ জাহাজের নামকরণ করিয়া তাহাকে সম্মানিত করে।

প্রেস্কটের (Prescott) "মেক্সিকোর অভিযান" (March to Mexico) নামক পুস্তক অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। হার্ণেন কোর্ত্তেজ (Hernan Cortez) কিউবার অন্তর্বর্ত্তী সান্তিয়াগো দি কিউবা (Santiago de Cuba) নগরের মেয়র ছিলেন। ঐ স্থান হইতেই ১৫১৮ সনের ১৮ই নভেম্বর তিনি মেক্সিকো জয়ের জন্য সদল-বলে যাত্রা করেন ও ১৫২১ সনের মধ্যেই সাফল্য লাভ করেন। কোর্ত্তেজের মেক্সিকোজয়-কাহিনী উপন্যাস হইতেও হৃদয়গ্রাহী।

কোন কোন ইতিহাস লেখক অনুমান করেন যে, কলোম্বাসের আবিষ্কারের সময় কিউবার লোকসংখ্যা প্রায় দশলক্ষ ছিল। কিন্তু স্পেনবাসীদিগের অত্যাচারে আদিম অধিবাসীগণ ধ্বংশ পাইতে লাগিল। ১৫২১ সন হইতে কৃষিকার্য্য করিবার জন্য দাসব্যবসায় প্রবর্ত্তিত হইল। আফ্রিকা মহাদেশ হইতে নিগ্রোদিগকে ধরিয়া আনা হইত; ১৮৮৭ সন পর্য্যন্ত কিউবাতে দাসব্যবসায় প্রচলিত ছিল।

ইংলণ্ড ব্যতীত কোন দেশই স্পেনের ন্যায় উপনিবেশস্থাপনে সক্ষম হয় নাই। ক্যানাডা, নিউফাউণ্ড্ল্যাণ্ড্, নিউজিল্যাণ্ড্, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশসমূহ যেমন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত; পূর্ব্বে তেমন পশ্চিম ইণ্ডিসের কিউবা ও পোর্টোরিকো প্রভৃতি দ্বীপ, মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্তিনা প্রভৃতি দেশসমূহ স্পেনিশ্ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু স্পেনবাসীদিগের অত্যাচারে সমস্ত দেশগুলিই একে একে স্পেনের হস্ত-চ্যুত হইয়াছে। পোর্টোরিকো যুক্তরাজ্যের অধিকারে আসিয়াছে; আর কিউবা, মেক্সিকো, আর্জেন্তিনা প্রভৃতি উপনিবেশে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। আর্জেন্তিনা, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশ বহুপূর্ব্বেই স্বাধীনতা লাভ করে; ক্ষুদ্র কিউবাতেও স্পেনের অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য দুইবার রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছিল। ১৮৬৮ হইতে ১৮৭৮ পর্য্যন্ত দশ বৎসরকাল পর্য্যন্ত প্রথম বিপ্লব চলিতে থাকে, ১৮৯৫ সনে দ্বিতীয় বিপ্লব আরম্ভ হয়। যুক্তরাজ্য রসদ প্রভৃতি যোগাইয়া কিউবান্দিগের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করায় ১৮৯৮ সনে স্পেনের সহিত যুক্তরাজ্যের যুদ্ধ বাধিয়া যায়। ঐ সনের ১০ই ডিসেম্বর পারীতে যে সন্ধি হয় (Treaty of Paris) তদনুসারে কিউবা দ্বীপটী যুক্তরাজ্যের আশ্রয়ে (Protection) রাখিয়া স্পেন্ ১৮৯৯ সনের ১লা জানুয়ারী চিরকালের জন্য কিউবার সংশ্রব পরিত্যাগ করে, ও ১৯০২ সনের ২০শে মে পর্য্যন্ত মার্কিণের সামরিক শাসনে (Military Rule) দেশের অনেক উন্নতি সাধিত হয়। শেষোক্ত তারিখে কিউবায় সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হয় ও তমাস্ এস্ত্রাদা পাল্‌মা (Tomas Estroda Palma) সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট্ মনোনীত হন। উঁহার শাসনাধীনে ১৯০২ হইতে ১৯০৬ সন পর্য্যন্ত দেশের অনেক উন্নতি সাধন হয় বটে, কিন্তু কিউবান্দিগের মধ্যে অন্তর্বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় কিউবা দ্বীপটী পুনরায় মার্কিণের হস্তে সমর্পণ করিয়া ১৯০৬ সনের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে পাল্‌মা পদত্যাগ করেন। দেশে শান্তিস্থাপন করিয়া ১৯০৯ সনের ২৮শে জানুয়ারী মার্কিণ পুনরায় কিউবান্দিগের হস্তে দ্বীপটী সমর্পণ করে। তখন হোজে মাইগেল গোমেজ (Jose Miguel Gomez) প্রেসিডেণ্ট্ মনোনীত হন। ইহার প্রায় একমাস পরে আমরা যখন কিউবায় উপনীত হই, তখন ইনিই কিউবার শাসনকর্ত্তা।

কিউবা দ্বীপটী যুক্তরাজ্যের অতি নিকটবর্ত্তী; সুতরাং উভয় দেশ বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যাপারে এতটা সংশ্লিষ্ট যে কিউবার রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে মার্কিন সাধারণতন্ত্রে বহুদিন হইতেই আলোচনা চলিতেছিল। অধুনা প্রেসিডেন্ট্ উইল্সন্ যে নীতির অনুসরণ করিয়া বর্ত্তমান মহাসমরে যোগদান করিয়াছেন, ১৮২৩ সনেই যুক্তরাজ্যের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট্ মনরো (Monroe) কিউবার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া সেইরূপ নীতির প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাই যুক্তরাজ্যের ইতিহাসে "মনরো মত" (Monroe Doctrne) নামে খ্যাত। ঐ মতের কিয়দংশ নিম্নে অনূদিত হইল : "য়ুরোপীয় শক্তিসমূহের মধ্যে নিজেদের কোন ব্যাপার লইয়া যুদ্ধ সংঘটিত হইলে আমরা কোন দিন যোগদান করি নাই; আমাদের রাজনীতি অনুসারে তাহা করা বিধেয়ও নহে। কেবল যখন কেহ আমাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবে বা তাহার সূত্রপাত করিবে, তখন আমরা আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইব। পশ্চিম গোলকার্দ্ধের যুদ্ধবিগ্রহাদির সহিত আমাদের বিশেষ সম্পর্ক আছে। য়ুরোপের শক্তিসমূহ এই গোলকার্দ্ধে রাজ্যবর্দ্ধনপ্রয়াসী হইলে, তাহা আমাদের শান্তিভঙ্গ ও আপদের কারণ বলিয়া মনে করিব। য়ুরোপীয় শক্তিসমূহের বর্ত্তমান উপনিবেশ ও অধীন রাজ্যগুলির সহিত আমরা কোনদিন বিরোধাচরণ করি নাই, করিবও না। কিন্তু যে সকল দেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে, এবং যাহাদিগকে আমরা স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, সেই সকল দেশে কোন য়ুরোপীয় শক্তি অত্যাচার করিলে ও উহাদের শাসনপ্রণালীতে হস্তক্ষেপ করিলে, আমরা তাহা যুক্তরাজ্যের প্রতি শত্রুতাচরণ বলিয়া গণ্য করিব।" ১৮৫৪ সনে কিউবার বাণিজ্যসংক্রান্ত ব্যাপারে কোন বিষয় লইয়া স্পেনের সহিত যুক্তরাজ্যের বিরোধ উপস্থিত হইলে দ্বাদশ কোটি ডলার মুদ্রায় যুক্তরাজ্যের পক্ষ হইতে ঐ দ্বীপটী ক্রয় করার কথা উঠে; এবং ইহাও আলোচনা হয় যে, যদি স্পেন্ ন্যায্য মূল্যের অধিক অর্থ পাইয়াও কিউবা দ্বীপটী যুক্তরাজ্যের নিকট বিক্রয় না করে তবে কিউবা স্পেনের শাসনাধীন থাকায় যুক্তরাজ্যের যদি আভ্যন্তরিক শান্তিভঙ্গের কারণ ঘটে, তবে যুক্তরাজ্য ঐ দ্বীপটী স্পেনের নিকট হইতে কাড়িয়া লইলে মানুষের আইনে কিম্বা বিধির বিধানে যুক্তরাজ্য অপরাধী হইবে না। প্রতিবেশীর গৃহে আগুন লাগিলে ও তাহা নির্ব্বাপণের কোন উপায় না থাকিলে, আত্মগৃহ রক্ষার জন্য প্রতিবেশীর প্রজ্জ্বলিত গৃহটী ভাঙ্গিয়া ফেলিলে, তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

ইচ্ছা করিলেই প্রবল মার্কিণ এই ক্ষুদ্র দেশটীকে নিজরাজ্যভুক্ত করিতে পারিত, কিন্তু তাহা না করিয়া মার্কিণবাসীরা কিউবান্দিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া যে মহানুভবতার পরিচয় দান করিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

হাভানা বন্দরে পৌছিয়া আমাদের জাহাজ নঙ্গর করিলে ইংলণ্ডের রাজপ্রতিনিধি মিঃ ডফ্ (Duff) ও কিউবার কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রের ডিরেক্টার মিঃ ক্রলি (Crawley) জাহাজে আসিয়া মহারাজকুমারকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। মিঃ ডফ্ ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল স্যার্ গ্রাণ্ট্ ডফের (Sir Grant Duff) পুত্র। তিনি তাঁহার লঞ্চে করিয়া আমাদিগকে তীরে লইয়া গেলেন ও হোটেল সেভিলা (Hotel Sevilla) নামক হাভানার একটী উৎকৃষ্ট হোটেলে রাখিয়া আসিলেন। নিউইয়র্কের ন্যায় হাভানাতেও মাল পরীক্ষাসম্বন্ধে বিশেষ কড়াকড়ি। কিন্তু কিউবান্ গভর্ণমেণ্টের সৌজন্যে আমরা ঐ দায় হইতে রেহাই পাইলাম। হোটেল সেভিলা তিনমাস পূর্ব্বে খোলা হইয়াছিল; এই আধুনিকভাবে নির্ম্মিত, নূতন, সুসজ্জিত হোটেলটী মার্কিণের হোটেলগুলি হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না।

হাভানা পৌছিলেই চিঠি লিখিবার জন্য ষ্ট্যাম্প ও পোষ্টকার্ডের দরকার হইল। হোটেলে ষ্ট্যাম্প মিলিল কিন্তু পোষ্টকার্ড মিলিল না। তখন নিকটবর্ত্তী পোষ্টাফিসে অনুসন্ধান করিলাম। সেখানেও শুনিলাম যে পোষ্টকার্ড

ছাপান হইতেছে, দুই চারিদিন পরে মিলিবে। আমি অনেকটা বিস্মিত হইলাম। একজন মার্কিণবাসীর সহিত দেখা হইল, সেও পোষ্টকার্ড খুঁজিতেছিল। আমরা পোষ্টাফিস্ হইতে বাহির হইলেই সে একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল "সবে মাত্র কিউবায় সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হইয়াছে, সমস্ত বিষয়ে শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে ইহাদের আরও অনেক সময় লাগিবে। কিউবান্‌গণ মার্কিণের সাহায্য ব্যতিরেকে নিজেরা দেশ শাসন করিতে পারে কি না, তাহা দেখিবার জন্য সমস্ত জগতের দৃষ্টি এইক্ষণে ইহাদের উপর নিপতিত।"

রাস্তায় দেখিলাম যে একজন কিউবান্ দৈনিক খবরের কাগজ পাঠ করিতেছে, অপর একজন কিউবান্ আসিয়া মূল্য দিয়া উহা তাহার নিকট কিনিয়া লইল। পূর্ব্বোক্ত মার্কিণবাসী আবার বলিতে লাগিল "কিউবার যে সকল লোক লেখাপড়া জানে, তাহাদের মধ্যে ধনী দরিদ্র সকলেই খবরের কাগজ পাঠ করা অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া মনে করে। এই কারণে একজনের পড়া হইলেই সে তাহার খবরের কাগজটী অপর একজনকে অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে। কিউবার স্পেনিশ্ উপনিবেশ স্থাপন হওয়ার পর হইতেই এত বিপ্লব, এত অন্তর্বিরোধ ও এত শাসনবিধির পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইয়াছে যে অধিবাসীরা সকলেই এক একজন রাজনীতিবিশারদ Politician)।"

হাভানা নগরীর লোকসংখ্যা তিন লক্ষেরও অধিক। এই নগরীতে ইংরাজী ও স্পেনিশ ভাষায় লিখিত দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক বহু সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। কেবল হাভানা নহে, পিনার দেল্ রিওর (Pinar del Rio) ন্যায় আট দশ হাজার লোকবিশিষ্ট ক্ষুদ্র সহরগুলি হইতেও দৈনিকপত্র বাহির হয়। সংবাদ-পত্রের প্রচলন যদি দেশের উন্নতির পরিচায়ক বলিয়া ধরা হয় তবে ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে সভ্য জগতে কিউবা উচ্চস্থান অধিকার করে। জিনিষপত্রের অধিক মূল্য এবং জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহে ব্যয়াধিক্যও দেশের ঐশ্বর্য্য ঘোষণা করিয়া থাকে। জুতা ব্রাশ করাইবার ও কালী দেওয়াইবার খরচ আমাদের গরীবের দেশে এক পয়সামাত্র, বিলাতে এক পেনি অর্থাৎ চারি পয়সা, সমৃদ্ধিশালী মার্কিণে পাঁচসেণ্ট্ অর্থাৎ দশ পয়সা, কিউবা-তেও তাহাই। শুধু জুতা ব্রাশ বলিয়া নহে জিনিষপত্রও কিউবাতে মার্কিণের ন্যায়ই অগ্নিমূল্য। নিউইয়র্ক হইতে হাভানার খরচপত্র বেশী ছাড়া কম নহে। পূর্ব্ব ইণ্ডিসের ন্যায় পশ্চিম ইণ্ডিস্ গরীবের দেশ নহে। বহু ধনী মার্কিণবাসীর আগমনে হাভানার জিনিষপত্র ক্রমেই মহার্ঘ হইতেছে।

হাভানা নগরীর মধ্যদেশে একটী রমণীয় প্রমোদোদ্যান অবস্থিত। উহা স্পেনিশ্ ভাষায় পার্ক সেন্ত্রাল (Parque Central অর্থাৎ Cental Park বা কেন্দ্রস্থিত প্রমোদোদ্যান) নামে অভিহিত। এই স্থানে অপরাহ্ণে হাভানাবাসীরা বেড়াইতে আসে ও তাহাদের মনোরঞ্জনার্থ কলিকাতার ইডেন্‌গার্ডেনের ন্যায় প্রতি সপ্তাহে নির্দ্দিষ্ট দিনে ব্যাণ্ড বাজিয়া থাকে। পার্কের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে প্রধান প্রধান হোটেল ও রঙ্গালয়গুলি অবস্থিত। হাভানার নাশিওনেল (Nacional অর্থাৎ National বা জাতীয়) রঙ্গালয়ই সর্ব্বপ্রধান নাট্যশালা। পূর্ব্বে উহা টাকোন (Tacon) নামে অভিহিত হইত। ইহার নির্ম্মাণসম্বন্ধে বেশ একটু ইতিহাস আছে। ১৮৩৪ হইতে ১৮৩৮ সন পর্য্যন্ত টাকোন কিউবা দ্বীপের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ঐ সময়ে মার্ত্তি (Marti) নামে এক ব্যক্তি দস্যুবৃত্তি করিয়া ও শুল্ককর্ম্মচারীদিগের চোখে ধুলি দিয়া বিনাশুল্কে মাল আনয়ন করিয়া গভর্ণমেণ্টের বিরোধাচরণ করিতেছিল। জলদস্যুতা ও শুল্ককর্ম্মচারীদিগকে প্রতারণাদ্বারা সেই সময় অনেকেই অবৈধরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত; তাহাদের মধ্যে মার্ত্তিরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্নাম ছিল। তাহাকে ধৃত করিতে বা তাহার দলটী ভাঙ্গিয়া দিতে টাকোন অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না; সুতরাং মার্ত্তিকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরিয়া আনিবার জন্য সরকার হইতে অনেক অর্থ পুরস্কারের ঘোষণা হইল।

এই পুরস্কার-ঘোষণার কয়েক মাস পরে মধ্যরাত্রিতে শাসনকর্ত্তার প্রাসাদের সম্মুখস্থিত উদ্যানের একটী প্রস্তর-মূর্ত্তির পশ্চাতে একজন লোক লুক্কায়িত ছিল। রজনী গভীরতিমিরাচ্ছন্ন, আকাশও মেঘাবৃত ছিল। দুই জন প্রহরী তোরণদ্বারের সম্মুখে পায়চারি করিয়া পাহারা দিতেছিল। লুক্কায়িত লোকটী লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে প্রহরীদ্বয় পরস্পরের দিকে মুখ করিয়া অগ্রসর হইয়া তোরণদ্বারে মিলিত হইতেছিল, ও তৎপরে তাহারা পরস্পরের দিকে পিছন ফিরিয়া কতক্ষণ পায়চারি করিতেছিল। ঐ সময়ে ক্ষণিকের জন্য তাহাদের দৃষ্টি তোরণদ্বার হইতে অন্যদিকে নিপতিত হইতেছিল। তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া তোরণদ্বার দিয়া প্রবেশ করার উহাই এক-মাত্র মাহেন্দ্রক্ষণ। এই স্বল্পক্ষণের মধ্যে প্রহরীদিগের দৃষ্টি এড়াইয়া প্রাসাদপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে যাওয়া যে কতটা দুঃসাহসের কার্য্য তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে! কিন্তু লোকটী নির্ব্বিঘ্নে অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া প্রাসাদের একটী স্তম্ভের অন্তরালে লুক্কায়িত রহিল। প্রহরীদ্বয় কিছুমাত্র টের না পাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় পাহারা দিতে লাগিল। প্রাসাদের সোপানাবলীর নিকট আর দুইজন প্রহরী দণ্ডায়মান ছিল। লোকটী গম্ভীরভাবে সৈনিক পুরুষের ন্যায় তাহাদিগকে অভিবাদন করিয়া অগ্রসর হইল, সৈনিকগণের মনে আগন্তুকসম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহই উপস্থিত হইল না। অতঃপর সে শাসনকর্ত্তার খাস্ কাম্‌রায় প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

শাসনকর্ত্তা টাকোন তাঁহার প্রকোষ্ঠে হঠাৎ একজন আগন্তুককে বিনা খবরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। তিনি তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু আগন্তুক সোজা উত্তর না দিয়া মার্ত্তিসংক্রান্ত সরকারী পুরস্কারের কথার অবতারণা করিয়া টাকোনকে জিজ্ঞাসা করিল যে যদি কোন অপরাধী ব্যক্তি মার্ত্তিকে ধরাইয়া দেয় তবে সেই ব্যক্তির পূর্ব্বের অপরাধ সরকারকর্ত্তৃক মার্জ্জনীয় হইবে কি না, এবং প্রতিশ্রুত পুরস্কারও সে প্রাপ্ত হইবে কি না। শাসনকর্ত্তা তৎসম্বন্ধে সম্মতিসূচক উত্তর প্রদান করিলে আগন্তুক বলিল যে, তাহার নামই মার্ত্তি। তাহা শুনিয়া টাকোন স্তম্ভিত হইলেন বটে, কিন্তু প্রতিশ্রুতিমত মার্ত্তিকে কারারুদ্ধ করিলেন না। সে রাত্রি মার্ত্তি প্রাসাদেই রক্ষিত হইল। পরদিন তাহাকে লইয়া একটী যুদ্ধজাহাজ অন্যান্য জলদস্যুদিগকে ধরিবার জন্য যাত্রা করিল। মার্ত্তি তাহাদিগকে ধরাইয়া দিল। যে সকল স্থানে বিনাশুল্কে মাল আনীত হইয়া গোপনভাবে রক্ষিত ছিল, তাহাও বাজেয়াপ্ত হইল। এই প্রকারে সরকারের প্রভূত লাভ হইয়া গেল। মার্ত্তি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পূর্ব্বের সঙ্গীদিগকে ধরাইয়া দিয়া টাকোনের নিকট প্রতিশ্রুত পুরস্কারের জন্য উপস্থিত হইল। টাকোন পুরস্কারের অর্থ প্রদানের জন্য কোষাধ্যক্ষকে আদেশ করিলেন। মার্ত্তি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া কয়েক বৎসরের জন্য হাভানা নগরীতে মৎস্য বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার প্রার্থনা করিল। সে আরও প্রকাশ করিল যে, নিজ ব্যয়ে একটী প্রস্তর ইষ্ট প্রস্তুত করিয়া নির্দ্দিষ্ট বৎসরের পরে মার্ত্তি তাহা গভর্ণমেণ্টকে অর্পণ করিবে। এই প্রস্তাবে টাকোন সম্মত হইলেন। কতিপয় বৎসরের মধ্যেই মৎস্যের ব্যবসায় করিয়া মার্ত্তি কিউবার সর্ব্বপ্রধান ধনীরূপে পরিগণিত হইল। অতুল ধনের অধিকারী হইয়াও মার্ত্তি অধিকতর ধনলাভের আশায় নানা উপায় খুঁজিতে লাগিল। হাভানার রঙ্গালয়সম্বন্ধে একচেটিয়া অধিকার প্রাপ্ত হইবার জন্য সে আবেদন করিল। এবারও সে পৃথিবীর মধ্যে একটী সুবৃহৎ ও সুন্দর রঙ্গালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিবার সর্ত্তে আবদ্ধ হইল। উহার ফলে নাশিওনেল রঙ্গালয়ের সৃষ্টি। পূর্ব্বে উহা মিলানের গ্রাণ্ড্ থিয়েটারের পরেই বৃহত্তম রঙ্গালয় বলিয়া বিবেচিত হইত। গাইড্-বুকে দেখিলাম বর্ত্তমানে এই রঙ্গালয়টীকে পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় স্থান প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে তিন সহস্র লোকের বসিবার বন্দোবস্ত আছে। বার্ণহার্ডের ন্যায় জগদ্বিখ্যাত অভিনেত্রীর অভিনয়ে এবং পেটি ও টেট্রাজিনীপ্রমুখ সুপ্রসিদ্ধ গায়িকাগণের সঙ্গীতে এই রঙ্গালয় অনেকবার ধ্বনিত হইয়াছে।

কিউবার রঙ্গালয়গুলিতে টিকিট্ কিনিবার ব্যবস্থা একটু স্বতন্ত্র রকমের; প্রত্যেক অঙ্কের জন্য বিভিন্ন টিকিট্ প্রদত্ত হইয়া থাকে। এক একটি অঙ্কের পর রঙ্গালয়ে দর্শকদিগের নিকট হইতে টিকিট্ সংগৃহীত হইয়া থাকে। কেহ বা এক অঙ্ক দেখিয়াই চলিয়া যায়। যাহারা পরবর্ত্তী অঙ্কগুলিও দেখিতে ইচ্ছুক, তাহারা সেই সেই অঙ্কের টিকিট্ পূর্ব্বে না কিনিয়া রাখিলেও অভিনয়ের সময় আবার কিনিতে পারে। অধিকাংশ রঙ্গালয়েই ধারাবাহিকরূপে কোন নাটক অভিনীত না হইয়া বিবিধ রকমের নৃত্য-গীতাদিদ্বারা (Vaudeville বা Variety Entertainment) দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জন করা হইয়া থাকে; সুতরাং এক অংশের সহিত অন্য অংশের কোন সম্বন্ধ না থাকা নিবন্ধন সকল অংশের জন্য টিকিট্ না কিনিলেও দর্শকদিগের কোনই অসুবিধা হয় না; বরং দরিদ্র লোকেরাও সমগ্র অভিনয়ের জন্য টিকিট্ কিনিতে বাধ্য না হইয়া অল্প খরচে আংশিক অভিনয় দর্শন করিতে পারে।

হাভানা নগরীর প্রাদো (Prado) নামক রাজপথটী প্রকৃতই দেখিবার জিনিষ। এত বড় প্রশস্ত রাজপথ অন্যত্র দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। রাজপথের মধ্য স্থানটী সিমেণ্ট্ দিয়া বাঁধান। দুই পার্শ্ব দিয়া গাড়ী ঘোড়া চলিয়া থাকে, মধ্যস্থান দিয়া নাগরিকগণ পদব্রজে গমন করে; দরকার হইলে বৃক্ষতলে রক্ষিত বেঞ্চে বসিয়া বিশ্রামও করিতে পারে। রাস্তার পার্শ্বস্থিত অট্টালিকাগুলির ধারেও অপরিসর ফুট্পাথ্ আছে, তাহা দিয়াও লোকজন পদব্রজে যাতায়াত করিতে পারে। প্রাদো প্রকৃত পক্ষে একটী ডবল্ রাস্তা,—পারীর (Paris) বুল্ভার্ (Boulevard) গুলি হইতেও অনেক সুন্দর। এই রাজপথ যেখানে হার্বারে গিয়া পড়িয়াছে সেই স্থানের নাম লা পুন্তা (La Punta); এখানে একটী নৃশংস ব্যাপার সঙ্ঘটিত হয়। ১৮৭১ সনে একজন স্পেনিশ্ কর্ম্মচারী কোন রাজনৈতিক বিবাদে জনৈক কিউবান্‌কর্ত্তৃক হত হয়। হাভানা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিদ্যাশিক্ষার্থী ৪২ জন অল্পবয়স্ক কিউবান্ ছাত্র ঐ স্পেনিশ্ কর্ম্মচারীর সমাধিস্তম্ভ ধ্বংশ করা অপরাধে অভিযুক্ত হয়। এই অপরাধের জন্য বালকদিগকে সামান্য শাস্তি দিয়া ছাড়িয়া দেওয়াই সঙ্গত ছিল। পরে ইহাও প্রমাণিত হয় যে ছাত্রেরা অবৈধ জনতা সৃষ্টি করিয়া গোলমাল করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা স্মৃতিচিহ্ন লুপ্ত করে নাই। কিন্তু স্পেনিশ্ গভর্ণমেণ্ট তাহাদের অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া মনে করিলেন। সামরিক বিচারে আট জনের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে লা পুন্তা নামক স্থানে তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারা হয়; এবং বাকী কয় জনের যাবজ্জীবন কারা-বাসের আজ্ঞা হয়। পরে স্পেন্ নিজের নৃশংসতা বুঝিতে পারিয়া ঐ সকল ছাত্রদিগকে মুক্তি দান করে। কিউবান্‌গণ স্পেন্‌বাসীদিগের জ্ঞাতি। যে সকল স্পেনিয়ার্ড কিউবায় বসতি স্থাপন করিয়াছিল, কিউবান্‌গণ তাহাদেরই বংশধর। যে স্পেনিশ্ সাম্রাজ্যে জ্ঞাতিগণের উপর এবম্বিধ অত্যাচার করা হইত, সে সাম্রাজ্য যে অচিরে ধ্বংশপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই।

প্রাদো যে স্থানে হার্বারে গিয়া পড়িয়াছে সে স্থানের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রাজপথ মালেকন (Maleeon) নামে অভিহিত হয়। এই স্থানেও পার্ক সেন্ট্রালের ন্যায় সপ্তাহের নির্দ্দিষ্ট দিনে ব্যাণ্ড বাজিয়া থাকে। ব্যাণ্ডের দিনে বাদ্য শ্রবণ ও সমুদ্রের বিশুদ্ধ হাওয়া সেবনের জন্য মালেকনে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এই স্থানের সমুদ্রের দৃশ্য বর্ণনাতীত।

নভেম্বরের প্রারম্ভ হইতে এপ্রিলের শেষ পর্য্যন্ত কিউবা-ভ্রমণের পক্ষে উপযোগী সময়। তাপমান যন্ত্রের পারদ ঐ সময়ে খুব বেশী গরমের দিনে ৭৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে ও খুব ঠাণ্ডার দিনে ৭১ ডিগ্রী পর্য্যন্ত নামে। মার্কিণ হইতে শীত ঋতুতে বহু অবস্থাপন্ন লোক কিউবাতে বেড়াইতে আসেন। শীতকালে এই স্থানটি প্রকৃতই অতিশয় মনোরম। গাইড্‌বুকে তজ্জন্য স্থানটীকে Winter Paradise অর্থাৎ "শীতকালের স্বর্গ" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে এই স্থানে কার্ণিভাল (Carnival) আরম্ভ হয় ও চারি পাঁচ সপ্তাহ পর্য্যন্ত

উৎসব চলিতে থাকে। যাঁহারা কাউণ্ট্ অব্ মণ্টি ক্রিষ্টো (The Count of Monte Cristo) নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা রোমের কার্ণিভালের বিষয় অবগত আছেন। হাভানার কার্ণিভাল উহার ক্ষুদ্র সংস্করণ। ঐ সময়ে নগরবাসী সকলেই আনন্দে মগ্ন। কার্ণিভালের সময় প্রতি রবিবার হাভানার প্রধান রাজপথ প্রাদো ও মালেকন দিয়া শকটারোহণে নাগরিকগণ নানাপ্রকার বিচিত্র পোষাকে সজ্জিত হইয়া ক্রমাগত পরিভ্রমণ করিতে থাকে। পথিপার্শ্বস্থ অট্টালিকাগুলির ছাদ ও বারান্দা হইতে শকটারোহীদের উপর গোল ও অর্দ্ধচন্দ্রাকার রঙ্গীন কাগজের টুক্‌রা (Confetti) ও নানাবর্ণের সার্পেন্টিনা (Serpentina) বর্ষিত হইতে থাকে। কাগজের ফিতা জড়াইয়া সার্পেন্টিনা প্রস্তুত হয়। লাটিম ছুঁড়িতে যেমন কৌশলের আবশ্যক, সার্পেন্টিনা ছুঁড়িতেও সেইরূপ অভ্যাসের প্রয়োজন। ঠিকমত ছুঁড়িতে পারিলে উহা সর্পের আকারে লক্ষীকৃত ব্যক্তির উপর গিয়া পতিত হয়। শকটারোহীরাও পার্শ্ববর্ত্তী শকটের কিম্বা ফুট্‌পাথের লোকদিগকে রঙ্গীন কাগজ ও সার্পেন্টিনা নিক্ষেপ করিয়া বিব্রত করিয়া থাকে। সুন্দরী ললনাগণের উপরই সকলের দৃষ্টি পড়িয়া থাকে; তাহাদের গাড়ী কাগজে ভরিয়া যায়।

হাভানাতে যে সকল চুরুটের কারখানা আছে সেখানে সহস্র সহস্র রমণী কার্য্য করিয়া থাকে। উহাদের মধ্য হইতে শ্রেষ্ঠা সুন্দরীকে কার্ণিভালের রাণী ও অপর কয়েক জন সুন্দরীকে তাহার সহচরী মনোনীত করা হয়। ঢাকার জন্মাষ্টমীতে যেমন চৌকি বাহির হয় সেইরূপ একটী সুসজ্জিত চৌকিতে (Float) আরোহণ করিয়া কার্ণিভালের রাণী তাহার সহচরীগণসহ রবিবারে মিছিলে বহির্গত হইয়া থাকেন। কার্ণিভালের সময় নাশিওনেল থিয়েটারগৃহেও সাধারণের নৃত্য হইয়া থাকে। অনেক মহিলা মুখোশ পরিয়া ঐ নৃত্যে যোগদান করে। এই সকল নাচে যথেষ্ট কুরুচি ও অশ্লীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

স্পেন্‌বাসীদিগের জাতীয় নৃত্যের নাম ড্যান্‌সন্ (Danson)। উহা ওয়াল্‌টস্ (Walts) প্রভৃতি ইংলণ্ড ও যুক্তরাজ্যের জাতীয় নৃত্য হইতে অনেকটা মন্থরগতি ও লালসাব্যঞ্জক (Slow, sensuous, and voluptuous)। পিনার্ দেল্ রিও নামক স্থানে কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়াছিলাম। এই সহরের লোকসংখ্যা সার্দ্ধ দশ সহস্রের অধিক। নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে কিউবার ভুয়েল্‌তা আবাহো (Vuelta Abajo) নামক সর্ব্বোৎকৃষ্ট তামাক উৎপন্ন হয়। এই স্থানেও কার্ণিভালের আমোদপ্রমোদ চলিতেছিল। একটী বড় রকমের নাচে যোগদান করিবার নিমিত্ত আমরা নিমন্ত্রিত হইলাম। স্থানীয় গভর্ণর ও মেয়র প্রভৃতির অনুরোধে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইল। নৃত্যপটু মহারাজকুমার সহজেই ড্যান্‌সন্ নৃত্য আয়ত্ত করিয়াছিলেন; একেত স্পেনিশ্ ভাষায় যেরূপ দখল, তাহাতে আবার নূতন দেশের নূতন নৃত্য, কাজেই যখন লৌকিকতার অনুরোধে আমাকেও কিউবান্ ললনাদিগের সহিত নৃত্যে যোগদান করিতে হইল তখন যে কি প্রহসন অভিনয় করিতে হইয়াছিল তাহা বলিবার নহে। মিঃ হোম্‌স্ (Holmes) নামক একজন মার্কিণবাসীর ঐ স্থানে একটী তামাকবাগান ছিল। তাঁহার কন্যাও নৃত্যে আসিয়াছিলেন। উঁহার সহিত পূর্ব্বেই আলাপ হইয়াছিল। মিস্ হোমস্ তাঁহার কিউবান্ মহিলাবন্ধুদিগের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। ঐ সকল মহিলারা স্পেনিশ্ ভাষায় অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা কখনও ইংরাজীতে কখনও স্পেনিশ্ ভাষায় যথাসাধ্য উত্তর দিয়া অঙ্গভঙ্গিসহকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। কেহ কাহারও কথা বুঝিতে পারিল কি না তাহা সহজেই অনুমেয়। তবে কথাবার্ত্তারও বিরাম ছিল না, নৃত্যেরও বিরাম ছিল না। সময়টী বেশ আমোদেই কাটিয়াছিল। রাত্রি এক ঘটিকার সময় যখন মহারাজকুমার নৃত্যাগার হইতে ফিরিতে উদ্যত হইলেন, তখন আতিথ্যপরায়ণ কিউবান্‌দিগের ব্যাণ্ডের বাদ্যে ব্রিটিশ্ সাম্রাজ্যের জাতীয় সঙ্গীত "God save the king" বাজিয়া উঠিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আমরা দুইটী প্রাণী তখন টুপি খুলিয়া সম্মান

প্রদর্শন করত বিদায় হইলাম। চলিয়া আসার পর রাস্তা হইতে আবার স্পেনিশ্ বাদ্যের ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল। পরদিন শুনিলাম যে সমস্ত রাত্রিই নৃত্য চলিয়াছিল।

কিউবাতে দুইটী কথা খুব বেশী শুনা যায়,—একটী কথা "কিন্ সাবে" (Quien sabe) অর্থাৎ "কে জানে," অপরটী "মানিয়ানা" (Mañana) অর্থাৎ "আগামী কল্য।" শেষোক্ত কথাটীসম্বন্ধে কিউবার মার্কিণ অধিবাসীরা মন্তব্য প্রকাশ করেন যে—কিউবান্‌রা বড়ই দীর্ঘসূত্রী, সকল কার্য্যই তাহারা অবিলম্বে সম্পাদন না করিয়া আগামী কল্যের জন্য রাখিয়া দেয়, কাজেই "মানিয়ানা" কথাটী উহাদের বড়ই প্রিয়। মার্কিণবাসীরা ঐ জন্য কিউবাকে "মানিয়ানার দেশ" বলিয়াও অভিহিত করে। কর্ম্মপ্রবণ মার্কিণবাসীদিগের তুলনায় শান্তিপ্রিয় কিউবান্‌গণ কতকটা নিরুদ্যম ও দীর্ঘসূত্রী প্রতীয়মান হইতে পারে বটে; কিন্তু দক্ষিণ য়ুরোপের স্পেন্, ইটালী, গ্রীস্ প্রভৃতি নাতিশীতোষ্ণ স্থানসমূহের অধিবাসী হইতে তাহারা কম কর্ম্মঠ নহে। "কিন্ সাবে" ও "মানিয়ানা" কথা দুইটী সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। স্পেনিশ্ ভাষায় অনভিজ্ঞ একজন মার্কিণবাসী হাভানা নগরীতে উপনীত হইলে "কিন্ সাবে" ও "মানিয়ানা" কথা দুইটী তাহার কর্ণে নিরন্তর ধ্বনিত হইতে লাগিল। সে মনে ভাবিল "কিন্ সাবে" ও "মানিয়ানা" বুঝি কিউবার দুইজন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম, তাই কিউবান্‌দিগের মুখে ঐ নাম দুইটী লাগিয়াই আছে। ঐ দুটী বুলি নিরন্তর শুনিতে শুনিতে যখন তাহার কান ঝালাপালা হইল, তখন সে "কিন্ সাবে" ও "মানিয়ানার" উপর মনে মনে ভারি চটিল। মার্কিণবাসী একদিন দেখিতে পাইল যে শবাধারে করিয়া একটী মৃতদেহ গোরস্থানে নীত হইতেছে, এবং শকটারোহণে ও পদব্রজে বহু লোক শবের পিছনে পিছনে চলিয়াছে। সে রাস্তায় একজন কিউবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়, কাহার মৃত্যু হইল বলিতে পারেন কি?" উত্তরে কিউবান্ বলিল "কিন্ সাবে" (অর্থাৎ "কে জানে?")। ইহা শুনিয়া মার্কিণবাসী খুসী হইয়া বলিল "কিন্ সাবের মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া রক্ষা পাইলাম, এখন মানিয়ানার মৃত্যু হইলেই বাঁচি।"

কিউবান্‌গণ যে ধীর-প্রকৃতি,—কোন বিষয়েই মার্কিণবাসীদিগের ন্যায় ব্যস্তবাগীশ নহে, তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। একদিন কোন কিউবান্ বন্ধুর সহিত ইলেক্ট্রিক ট্রামে আরোহণ করিয়া নগর ভ্রমণ করিতেছি, ট্রাম্ কয়েকজন আরোহী তুলিয়া লইবার জন্য সহরতলীতে একটী কাফের (Cafe) নিকট আসিয়া থামিল। সে দিন একটু গরম পড়িয়াছিল। কিউবান্ বন্ধু বলিল "কাফেতে গিয়া একটু লেমনেড্ খাইয়া লইলে মন্দ হয় না।" আমি বলিলাম "এই ট্রাম্‌টী চলিয়া গেলে আবার কতক্ষণ ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিব?" কিউবান্ বন্ধু বলিল "আমি কণ্ডাক্টারকে বলিতেছি, আমরা ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত সে ট্রাম্ ছাড়িবে না।" তাহার কথায় প্রথমে আমার প্রত্যয় জন্মিল না। কাফে হইতে যখন দেখিলাম যে ট্রাম্ সত্যই আমাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তখন আমি এক নিঃশ্বাসে লেমনেড্‌টী নিঃশেষ করিতে উদ্যত হইলাম। তাহা দেখিয়া কিউবান্ বন্ধু বলিল "অত তাড়াতাড়ি করিতেছ কেন? দুই চারি মিনিট বিলম্ব করিতে কণ্ডাক্টার কোন আপত্তি করিবে না।" এইরূপ ব্যাপার মার্কিণেত্ দূরের কথা ভারতবর্ষেও কল্পনা করিতে পারি নাই। আমার মনে হয় ইহা কিউবান্‌দিগের ধীরপ্রকৃতি অপেক্ষা সৌজন্যেরই অধিক পরিচায়ক।

কিউবান্‌দিগের আতিথেয়তা ও সৌজন্য প্রসংশনীয়। ডিরেক্টর ক্রলি আমাদিগকে যে সকল ব্যক্তির তামাকের বাগান দেখাইতে লইয়া গেলেন সর্ব্বত্রই ঐসকল বাগানের স্বত্বাধিকারিগণ এক একটী ভোজ প্রদান করিয়া অতিথিসৎকারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। লারানিয়াগা (Larrañaga) চুরুটের কোম্পানী বহুদিন হইতে হাভানায় প্রতিষ্ঠিত। এই কোম্পানীর স্বত্বাধিকারীরা আমাদিগকে একদিন তাঁহাদের চুরুটের কারখানা দেখাইতে লইয়া গেলেন, ও মহারাজকুমারকে বহুমূল্যবান্ চুরুটে পরিপূর্ণ একটী বৃহৎ সুদৃশ্য কাষ্ঠাধার

(Wooden case) উপঢৌকন দিলেন। উহার মূল্য পাঁচশত টাকার অধিক হইবে। মহারাজকুমার আবার উহা উপহার স্বরূপ তদীয় পিতৃদেব মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহার নিকট লণ্ডনে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

কিউবা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। এই দ্বীপটী বর্ণনা করিবার সময় কলোম্বাস্ লিখিয়াছিলেন "The most beautiful land eyes have ever seen" অর্থাৎ "আমি যত স্থান দেখিয়াছি এরূপ সুন্দর স্থান আর দেখি নাই।" শিবপুর বোটানিকেল গার্ডেনে অনেক যত্নে বোতলাকৃতি পামগাছের অ্যাভিনিউ (Bottlepalm avenue) প্রস্তুত হইয়াছে। কিউবাই সেই প্রকার পামগাছের আদি জন্মস্থান ; সেখানে উহা আপনা হইতেই জন্মে। উহার বীজ শূকরের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় ; তাহা খাইলে না'ক শূকরের চর্ব্বিবৃদ্ধি হয়।

কিউবাতে আনারস, নারিকেল, লেবু, কমলালেবু, পেয়ারা প্রভৃতি ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। আমরা গ্রীষ্মকালে ভারতবর্ষে যে উপাদেয় লাইমজুস্ (Lime Juice) পান করিয়া থাকি, তাহাও পশ্চিম ইণ্ডিসের লেবু হইতে প্রস্তুত। কিউবার অধিবাসীরা টাট্‌কা ফল হইতে লেমনেড্, অরেঞ্জড্ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া পান করে। আমরা ভারতবর্ষে কলে প্রস্তুত লেমনেড্ বোতল হইতে খুলিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করি। কিউবার কাফে-গুলিতে চাহিবামাত্র লেবু হইতে যন্ত্রসাহায্যে রস নিংড়াইয়া পরিমাণমত জল ও শর্করার সহিত মিশ্রিত করিয়া লিমোনাদা (Limonada) অর্থাৎ লেমনেড্ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। ঐ প্রণালীতে কমলালেবু হইতে অরান্‌হিদা (Orangida) অর্থাৎ অরেঞ্জেড্ও প্রস্তুত হইয়া থাকে। আনারস হইতে পানীয় প্রস্তুত করিবার বেলা তাহাতে আর জল মিশ্রিত করিতে হয় না। একটী আনারসের রসেই গ্লাশ ভরিয়া যায়। গ্রীষ্মকালে লোকে উহা কিঞ্চিৎ বরফসংযোগে পান করিয়া থাকে। বরফ দেওয়া আনারসের রসকে স্পেনিশ্ ভাষায় পিনিয়া ফ্রিয়া (Piña Fria) কহে। এতদ্ভিন্ন তেঁতুলের সরবৎও অনেকে পান করে, তাহা তামারিন্দা (Tamarinda) নামে অভিহিত হয়। গ্রীষ্মকালে হাভানার কাফেগুলি মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে, সন্ধ্যায় সকল সময়েই ভরপুর থাকে। কেহবা লিমোনাদা, কেহবা ওরান্‌হিদা, কেহবা পিনিয়া ফ্রিয়া, কেহবা তামারিন্দা, কেহবা কাফি পানে রত। পারীর বুল্‌ভারগুলিতে বস্ত্রাচ্ছাদিত ফুট্‌পাথের উপর কাফে ও রেস্তরাঁ গুলির (Restaurant) সম্মুখে সারি সারি চেয়ার ও টেবিল পাতা থাকে, সেগুলি যেমন সর্ব্বদাই কাফি ও মদ্যপানে রত স্ত্রীপুরুষদ্বারা পূর্ণ থাকে, হাভানার ভোজনালয়গুলিতেও তদ্রূপ অহর্নিশ পান ভোজনের কার্য্য চলিতেছেই। তবে পারীতে অধিকাংশ লোকই মদ্য-পানে রত, আর হাভানাতে অধিকাংশ লোকই লেমনেড, অরেঞ্জেড্ প্রভৃতি পান করিয়া থাকে। আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি নানাবিষয়ে পারীর সহিত সাদৃশ্যনিবন্ধন হাভানা "Petit Paris" অর্থাৎ "ক্ষুদ্র পারী" নামে অভিহিত হয়। নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতাসম্বন্ধে পারী ও হাভানার কথঞ্চিৎ ঐক্য থাকিলেও, সত্যের খাতিরে ইহা অবশ্য বলিতেই হইবে যে কিউবার অধিবাসীরা ফরাসীদিগের ন্যায় অপরিমিতরূপে মদ্যপায়ী নহে। পারীতে অবস্থানকালে দেখিয়াছি কেহ বড় একটা জলপান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে না। ভোজনকালে প্রথম যেদিন ফরাসী খিদমৎগার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "Vin rouge ou vin blanc ?" অর্থাৎ "লাল মদ দিব না সাদা মদ দিব ?" তখন তাহার নিকট সাদা জল চাহিতে লজ্জা বোধ হইল, তাই তাহাকে "লিমোনাদ্" (Limonad) অর্থাৎ লেমোনেডের আদেশ করিলাম। কিন্তু এক গ্লাশ লেমনেডের মূল্য যখন এক ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ দশ আনা দিতে হইল, আর আমার টেবিলের অন্য লোকেরা যখন চারি আনায় এক এক পেয়ালা সেম্পেন পান করিতে লাগিল, তখন আমার মনে হইল যে ফরাসী মুলুকে বেশী দিন থাকিতে হইলে অর্থাভাবে অম্বুপায়ী আমাকেও মদ ধরিতে হইবে।
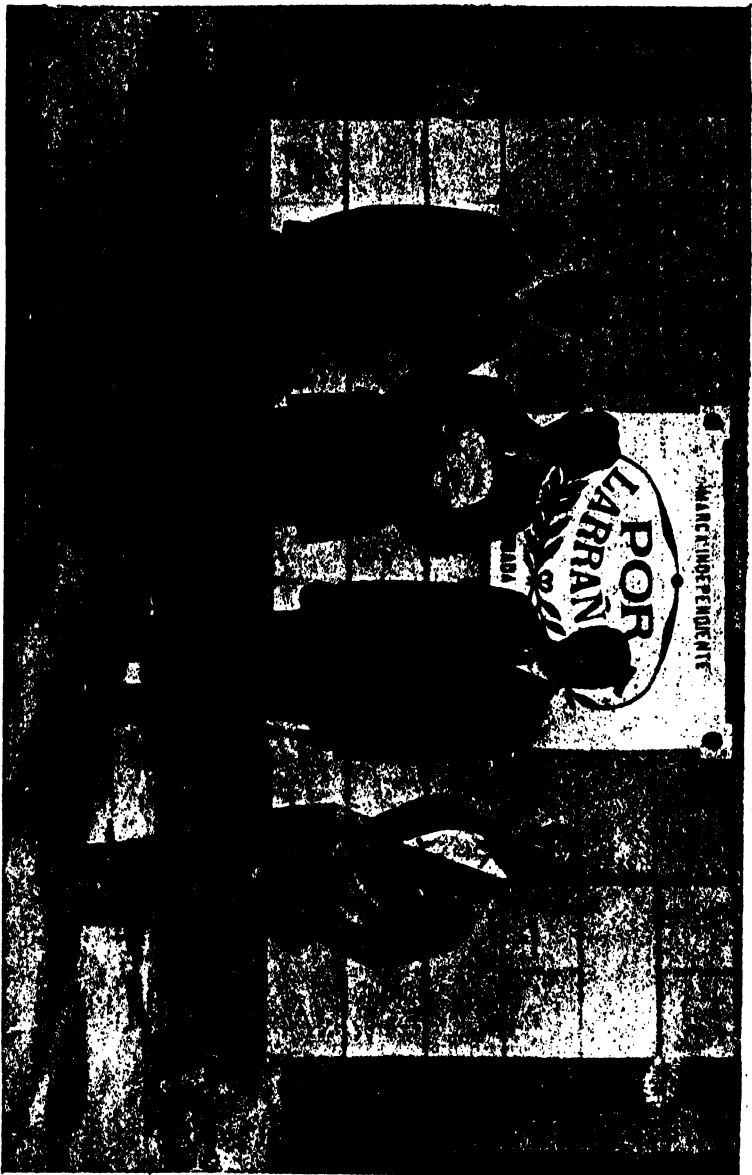
লারানিয়াগা কারখানার প্রাঙ্গণে এই আলোকচিত্রখানি তোলা হয়। চিত্রের বামদিক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমেই কারখানার স্বত্বাধিকারী অগ্রজ ভ্রাতা, পরে মহারাজকুমার ভিক্টর নারায়ণ, তৎপরে লেখক, ও সর্ব্বশেষে কারখানার অপর স্বত্বাধিকারী কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

কিউবার সর্ব্বত্র বহুল পরিমাণে কদলীবৃক্ষের আবাদ হইয়া থাকে। কিউবান্‌গণ ভারতবাসীদিগের ন্যায় ফল ও ব্যঞ্জন উভয়রূপেই কদলী ভক্ষণ করিয়া থাকে। একদিন তামাকের ক্ষেত্র দেখিতে দেখিতে মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় উপস্থিত হইল। নিকটে কোন হোটেল ছিল না, তাই দরিদ্র কৃষক মহারাজকুমার ও তাঁহার সহচর আমাদের কয়েক জনকে স্বগৃহেই আহারার্থ অনুরোধ করিল। কৃষক মোরগ পুষিত, তাহারই কয়েকটি রোষ্ট্‌ করিয়া কৃষকপত্নী টেবিলে উপস্থিত করিল; কিন্তু কৃষকের ঘরে রুটি বাড়ন্ত ছিল। কৃষকপত্নী রুটির পরিবর্ত্তে কাঁচাকলা ভাজিয়া আমাদিগকে পরিবেশন করিতে লাগিল। কদলীতে বহু পরিমাণে শ্বেতসার (Starch) আছে, সুতরাং উহা হইতে ময়দা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কাঁচাকলাভাজা ও রুটি প্রকৃত পক্ষে একই খাদ্যের রূপান্তর মাত্র। সেদিন সকাল বেলা পরিভ্রমণ করিয়া বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল; কাজেই দরিদ্র কৃষকের প্রদত্ত আহার্য্যই বিশেষ তৃপ্তিসহকারে ভোজন করিয়া জঠরানল নির্ব্বাপিত করিলাম।

পূর্ব্ব ইণ্ডিস্ ও পশ্চিম ইণ্ডিসের প্রায় সকল দ্বীপগুলিতেই ভূমির উর্ব্বরা শক্তি অত্যধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিউবাতেও কৃষিই লোকের প্রধান উপজীবিকা। দ্বীপটীতে তাম্রের, লৌহের ও কেরাসিনের খনি আছে; স্বর্ণ ও রৌপ্য স্থানে স্থানে সামান্য পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে বটে, কিন্তু অল্পতাহেতু উহা সংগ্রহ করা লাভজনক হয় না। কিউবাতে যে সকল ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে তন্মধ্যে ইক্ষু প্রথম ও তামাক দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। চিনি প্রস্তুত করার কয়েকটী কারখানাও বর্ত্তমান রহিয়াছে; তন্মধ্যে বড় একটী কারখানা আমরা দেখিয়াছিলাম।

কিউবাতে অত্যল্প পরিমাণেই ধান্যের আবাদ হইয়া থাকে; কিন্তু বিদেশ হইতে বহুল পরিমাণে তণ্ডুল আমদানি হয়, এবং উহা অধিবাসীদিগের একটী প্রধান খাদ্য। আমাদের দেশে যেমন পলান্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিউবাতেও মুরগী, বিলাতি বেগুন ও তণ্ডুলসংযোগে অল্পমসলায় সে প্রকার এক আহার্য্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহা আরোৎ কন্ পয়ো (Arroz con pollo *) নামে অভিহিত হয়। মহারাজকুমার ভিক্টর ও এপক্ষ উভয়েই "ভেতো বাঙ্গালী," কাজেই ঐ খাদ্যটী আমাদের বিশেষ রুচিকর হইবারই কথা। দুই একদিনের মধ্যেই হোটেলের খিদমৎগার আমাদের অন্নপ্রীতি বুঝিতে পারিল। ভোজনাগারে উপস্থিত হইলেই সে সর্ব্বাগ্রে এক এক প্লেট পলান্ন টেবিলে আনিয়া রাখিত; কোন কোন দিন আমরা পুনরায় আর এক প্লেট পলান্নের আদেশ দিতাম। কিউবাতে যে প্রকার উৎকৃষ্ট গোয়াভা জেলি প্রস্তুত হয়, পৃথিবীর অন্যত্র তাহা হয় কিনা সন্দেহ; উহাও আমাদের একটী প্রিয় খাদ্য ছিল।

আমরা যখন আহারে বসিতাম তখন একটী কিউবান্ বালিকা এক সাজি ফুল লইয়া উপস্থিত হইত, ও পাঁচসেণ্ট্‌ অর্থাৎ দশপয়সা মূল্যে এক একটী ফুল বিক্রয় করিত। ইহাকে দেখিয়া লাষ্ট্‌ ডেস্ অব পম্পিয়াই (Last Days of Pompeii) নামক পুস্তকের অন্ধ ফুলবালিকার কথা ও বঙ্কিম বাবুর রজনীর কথা মনে পড়িল। ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার উপায় ছিলনা। ফুল কিনিতে অসম্মত হইলেও বালিকা কোটের বুকে একটী ফুল পরাইয়া দিত, তখন সৌজন্যের অনুরোধে বাধ্য হইয়া মূল্যদিয়া ফুলটী গ্রহণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর থাকিত না। পূর্ব্বে ইংলণ্ড ও মার্কিণে In Havana অর্থাৎ "হাভানায়" নামক গীতিনাট্যে নকল ফুলবালিকাদিগের (Flower-girl) অভিনয় দেখিয়াছিলাম। হাভানাতে আসিয়া আসল ফুলবালাদিগেরই সাক্ষাৎ পাইলাম।

* Arroz অর্থে 'তণ্ডুল', con অর্থে 'সহিত' ও pollo অর্থে 'মোরগ'।

লুই মার্ক্‌স্ (Luis Marx) নামক একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি একদিন আমাদিগকে তাহার তামাকবাগান দেখাইতে লইয়া গেলেন। ইনি একজন Millionaire অর্থাৎ ক্রোরপতি। মার্কিণেও ইঁহার তামাকের কারবার আছে। কিউবার তামাকবাগানগুলির মধ্যে ইঁহার বাগানটাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এমন সুন্দর পরিপাটি বাগান আর আমার চোখে পড়ে নাই। বাগানের ভিতরই ইঁহার একটী সুসজ্জিত অট্টালিকা আছে। সেই স্থানেই আমাদিগের মধ্যাহ্ন-ভোজনের আয়োজন হইয়াছিল। আহারকালে লুই মার্ক্‌স্ গল্প করিলেন যে আমেরিকান্ টুবাকো ট্রাষ্টের (American Tobacco Trust) প্রেসিডেণ্ট্ মিঃ ডিউক্ পত্নীসমভিব্যাহারে কার্য্যানুরোধে দুইবার কিউবায় আগমন করেন। দুইবারই লুই মার্ক্‌স্ তাঁহাদের সম্মানার্থ এই অট্টালিকায় ভোজ প্রদান করিয়াছিলেন। প্রথম বারের ভোজে একটী ময়ূর রোষ্ট্ করা হইয়াছিল। এই দুষ্প্রাপ্য মাংস ভোজনে ডিউকগৃহিণীর আর আহ্লাদের পরিসীমা ছিল না। দ্বিতীয়বার আগমন করিয়াও মিসেস্ ডিউক পূর্ব্ববারের ভোজের উল্লেখ করিয়া সুখাদ্য ময়ূর মাংসের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। লৌকিকতার অনুরোধে এবারকার ভোজেও মিসেস্ ডিউকের সন্তোষ-বিধানার্থ একটী ময়ূর রোষ্ট্ করিয়া দেওয়া উচিত; কিন্তু তাহা না পাওয়ায়, লুই মার্ক্‌স্ একটু মুস্কিলে পড়িলেন। অনন্যোপায় হইয়া অবশেষে তাঁহাকে একটু কৌশল অবলম্বন করিতে হইল। পেরু (Turkey) ও ময়ূরের মাংসের আস্বাদনে বিশেষ কোন তফাত নাই। পালকগুলি ফেলিয়া দিলে উভয় পাখী দেখিতেও একরূপ। একটী পেরু রোষ্ট্ করিয়া উহার পুচ্ছদেশে ময়ূরের পালক সংযুক্ত করিয়া যখন ভোজন টেবিলে রক্ষিত হইল, তখন কাহার সাধ্য সেই নকল ময়ূরকে পেরু বলিয়া ধরিতে পারে! মিসেস্ ডিউক রোষ্টের আস্বাদন করিয়া বলিলেন যে এবারের ময়ূরটী পূর্ব্বের ময়ূরের মাংস হইতে আরও কোমল ও সুস্বাদু। লুই মার্ক্‌স্ যে তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনার্থ এতটা যত্ন প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি অশেষ ধন্যবাদও জ্ঞাপন করিলেন। অতিথি-সৎকারের নিকট সত্যবাদিতার যে অনেক সময়ই পরাজয় স্বীকার করিতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত সকল স্থানেই পাওয়া যায়। লুই মার্ক্‌সের কথা শুনিয়া আমাদের দেশেরও একটী কাহিনী মনে পড়িল। একজন বিশেষ উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ কোন জমীদারের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার জমীদারীতে শিকার করিতে যান। রাজপুরুষের অস্ত্র-কৌশলকে ব্যঙ্গ করিয়া যখন জন্তুগুলি অক্ষত শরীরে পলায়ন করিতে লাগিল এবং সমস্ত দিনের পরিশ্রমে যখন একটী শিকারও মিলিল না, তখন রাজপুরুষের লোহিত বদন মণ্ডল আরও লোহিত হইতে লাগিল। জমীদার মনে মনে প্রমাদ গণিতে লাগিলেন। অবশেষে ভগবৎকৃপায় অদূরে একটা হরিণ দেখা দিল। হুজুর বাহাদুরের এমনি অব্যর্থ সন্ধান যে বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে হরিণটীও অদৃশ্য হইল। রাজপুরুষ জমীদারকে বলিলেন "আমি দেখিয়াছি গুলি লাগিয়াছে। হরিণটী পলাইয়া বেশীদূর যাইতে পারিবে না, অল্পদূরে গিয়াই মরিয়া থাকিবে। লোকদিয়া অনুসন্ধান করিলে নিশ্চয়ই জঙ্গলের ভিতর পাওয়া যাইবে।" এই বলিয়া তিনি চা পান করিবার জন্য তাম্বু-অভিমুখে রওনা হইলেন, তখন শত শত লোক বাঁশ লাঠি লইয়া জঙ্গল ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু হরিণের মৃতদেহ, এমন কি রুধিরের চিহ্নও কোন স্থানে দৃষ্ট হইল না। অদূরে জমীদারের একটী পশুশালা অবস্থিত ছিল। অবশেষে জমীদারের গোপন আদেশ অনুসারে পশুশালা হইতে একটী হরিণ গুলি করিয়া জমীদারের অনুচরগণ রাজপুরুষের নিকট লইয়া গিয়া বলিল, "হুজুরের গুলিতে যে হরিণটী মরিয়া পড়িয়াছিল, তাহা আমরা খুঁজিয়া আনিয়াছি।" তখন একদিকে রাজপুরুষের আত্মপ্রসাদজনিত উল্লাস ও অপর দিকে তাঁহার সহচরদিগের ও জমীদারের সাধুবাদে প্রাঙ্গন কোলাহলময় হইয়া উঠিল। জমীদার বলিলেন "ইওর্ অনারের কি চমৎকার অস্ত্র-কৌশল! গুলিটী এমন সুন্দর ভাবেই লাগিয়াছে যে এক গুলিতেই এতবড় একটা জন্তু পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে!!"

কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল স্পেনিশ্, মেক্সিকান্, কিউবান, ফিলিপিনো ও দক্ষিণ আমেরিকার ছাত্র অধ্যয়ন করিত তাহাদের সকলেরই মাতৃভাষা ছিল স্পেনিশ্। তাহারা মাঝে মাঝে বলিত, "English is the language of commerce, French is the language of society and diplomacy, Italian is the language of music, and Spanish is the language of love" অর্থাৎ ইংরাজী—বাণিজ্যের ভাষা, ফরাসী—অভিজাত বংশীয়দিগের ও রাজনীতির ভাষা, ইটালিয়ান—সঙ্গীতের ভাষা, ও স্পেনিশ্—প্রেমের ভাষা। আমাদিগকে কেহ যখন জিজ্ঞাসা করিত "তোমাদের সংস্কৃত ভাষার বিশেষত্ব কি?" তখন আমরা বলিতাম "Sanskrit is the language of philosophy" অর্থাৎ সংস্কৃত—দর্শনের ভাষা। যে তিনমাস কিউবাতে ছিলাম তাহাতে স্পেনিশ্ ভাষা আর কি শিক্ষা করিব? একদিনখুব একটী বড় পুস্তকের দোকানে সার্ভেন্টিসের ডন্ কুইক্‌ঝোট্ (Cervantes' Don Quixote) নামক গ্রন্থখনি ক্রয় করিতে গেলাম। ইংরাজী-অনভিজ্ঞ কিউবান্ দোকানদার বলিল যে ঐ নামের কোন পুস্তক তাহার দোকানে নাই, উহার নামও কোন দিন সে শুনে নাই। আমি অবাক হইলাম,—স্পেনিশ্ ভাষাতে যত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে ডন্ কুইক্‌ঝোট্ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, আর যেখানে স্পেনিশই লোকের মাতৃভাষা সেই কিউবাতেই উক্ত গ্রন্থখানির নাম পর্য্যন্ত অজ্ঞাত! একটী পরিচিত ইংরাজী-অভিজ্ঞ কিউবান্ যুবক তখন দোকানের নিকট দিয়া যাইতেছিল, তাহাকে আমার মন্তব্য শুনাইলে সে একটু হাসিয়া দোকানদারকে বলিল "এই ভদ্রলোক সের্ভান্তের 'দন্ কি হোতে' চাহিতেছেন।" তখন দোকানদার তিন চারি রকম সংস্করণ আমার নিকট উপস্থিত করিল। ইংরাজীর সহিত ফরাসী ভাষার যেমন উচ্চারণের বিশেষ প্রভেদ, স্পেনিশের ততটা প্রভেদ না থাকিলেও শব্দ বিশেষে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। স্পেনিশ্ ভাষায় j, আর স্থল বিশেষে g ও x 'হ' য়ের ন্যায় উচ্চারিত হয়; যথা angela—আন্‌হেলা, San Juan—ছান্ হুয়ান্, San Jose—ছান্ হোজে।

কিউবান্ রমণীগণ ইটালি, স্পেন, গ্রীস্ প্রভৃতি অনতিশীতোষ্ণ দেশের রমণীদিগের ন্যায় ব্রীড়াবনতা, লাবণ্যময়ী ও সুন্দরী। কিউবার জনৈক ইংরাজ অধিবাসী এক দিন বলিল "They bloom quickly like hothouse flowers, but they also fade quickly" অর্থাৎ কিউবার রমণীগণ উষ্ণাগারের * পুষ্পের ন্যায় শীঘ্র শীঘ্র প্রস্ফুটিত হয় বটে কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র আবার শুকাইয়াও যায়। শীতপ্রধান দেশের তুলনায় সকল গ্রীষ্মপ্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ দেশের স্ত্রীজাতির সম্বন্ধেই ঐ কথা বলা যাইতে পারে। কিউবা ও স্পেন্ প্রভৃতি দেশের লোকেরা এঙ্গ্লো-স্যাক্সন দিগের (Anglo-Saxon) ন্যায় লম্বাকৃতি (Divinely tall) ও কৃশাঙ্গী (Slim) সুন্দরীগণের বিশেষ পক্ষপাতী নহে। আমাদিগের উপস্থিতিকালে হাভানাতে কার্ণিভালের সময় যে রমণীদিগকে কার্ণিভালের রাণী ও তৎসহচরী মনোনীত করা হইয়াছিল, তাহারা সকলেই স্থূলাঙ্গী। মার্কিণে ঐ সকল স্থূলাঙ্গী রমণীদিগকে ক্ষীণাঙ্গীদিগের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ থাকিতে হইত, ও উপবাসব্রত অবলম্বনে দৈহিক বৃদ্ধির হ্রস্বতা সম্পাদনে সচেষ্ট থাকিত হইত।

দাসব্যবসায়ের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি দক্ষিণ যুক্তরাজ্যের ন্যায় কিউবাতেও ইক্ষুপ্রভৃতি আবাদের জন্য পূর্ব্বে বহু নিগ্রোর আমদানি হইয়াছিল। ফলে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের মিশ্রণে অনেক বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইয়াছে। স্পেনিশ্, পর্ত্তুগিজ, ইটালিয়ান প্রভৃতি দক্ষিণ য়ুরোপের লাটিন্ জাতিরা

* মার্কিণ প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে প্রবল শীত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অনেক উদ্ভিদ্ কাচনির্ম্মিত গৃহে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। লোহার পাইপ সহযোগে বাষ্পীয় উত্তাপ দ্বারা বা অন্য উপায়ে ঘরগুলি গরম রাখা হয়; এই প্রকার ঘরকে hot house বা forcing house (উষ্ণাগার) কহে।

অন্য জাতির সহিত সহজেই মিশিয়া যায়। আমাদের দেশেও তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। দেশী ও পর্ত্তুগিজের সম্মিলনে যে সকল ফিরিঙ্গি উৎপন্ন হইয়াছে, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে তাহদের সংখ্যা বড় কম নহে। যুক্তরাজ্যের শ্বেতাঙ্গ জাতিতে এঙ্গ্লো-স্যাক্‌সন্‌দিগেরই অধিক প্রাদুর্ভব। এঙ্গ্লো-স্যাক্‌সন্ জাতি নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিবারই অধিক পক্ষপাতী। এই কারণে যুক্তরাজ্য অপেক্ষা কিউবায় লোক অনুপাতে বর্ণসঙ্করের অধিক প্রাদুর্ভাব, এবং তাহাদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদিগের ঘৃণাও অনেকটা কম। যে ব্যক্তির পিতামাতার মধ্যে একজন শ্বেতাঙ্গ ও একজন কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো তাহাকে মুলাটো (Mulatto) কহে। তাহার মধ্যে অর্দ্ধেক শ্বেতরক্ত ও অর্দ্ধেক কৃষ্ণরক্ত বর্ত্তমান। সঙ্কর বলিয়া "মিউল্" (Mule, খচ্চর) কথা হইতে মুলাটো কথার উৎপত্তি। যাহার পিতামাতার মধ্যে একজন শ্বেতাঙ্গ ও একজন মুলাটো, তাহাকে কোয়াড্রুন্ (Quadroon)কহে। তাহার মধ্যে এক চতুর্থাংশ কৃষ্ণাঙ্গের রক্ত ও তিন চতুর্থাংশ শ্বেতাঙ্গের রক্ত বলিয়াই কোয়াড্রুন্ কথার সৃষ্টি। "কাউন্ট্ অব্ মন্টি ক্রিষ্টো" প্রণেতা সুবিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক এলেক্‌জাণ্ডার্ ডুমা (Alexander Duma) একজন কোয়াড্রুন্। যে ব্যক্তির পিতামাতার মধ্যে একজন কোয়াড্রুন্ ও একজন শ্বেতাঙ্গ তাহাকে অক্টরুন (Octoroon) কহে। তাহার মধ্যে আট ভাগের একভাগ মাত্র কাফ্রীর রক্ত, বাকি সাত ভাগ শ্বেতাঙ্গের রক্ত; তাহা হইতে অক্টরুন নামের উৎপত্তি। অক্টরুনদিগকে খাঁটি শ্বেতাঙ্গ বলিয়া অনেক স্থলেই ভ্রম হইতে পারে। হয়ত একটু কুঞ্চিত কেশ বা স্থূল ওষ্ঠাধর * ব্যতীত কাফ্রীজাতীর কোন চিহ্ন উহাতে বর্ত্তমান থাকে না। অক্টরুন ও শেতাঙ্গের সম্মিলনে যে সকল গৌরবর্ণ সন্তান জন্মলাভ করে তাহাদিগের মধ্যে কাফ্রীরক্ত আছে কি না তাহা অনেক সময়ই চেহারা দেখিয়া অনুমান করা অসাধ্য বটে, কিন্তু মেণ্ডেলবাদের (Mendelism) অর্থাৎ উত্তরাধিকারবিধি (Law of Heredity) ও দৈববিধির (Law of Probalibity) দৃষ্টান্ত কাফ্রী ও শ্বেতজাতির সম্মিলনেও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এমন অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে,—পিতামাতা উভয়েই শ্বেতাঙ্গদিগের ন্যায় গৌরবর্ণ কিন্তু তাহাদের এমন একটী সন্তান জন্মিল যে উহা দেখিতে খাঁটি কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রীর ন্যায়; অনুসন্ধানে পরে জানা গেল যে পিতামাতার উভয়ের কি একজনের মধ্যে নিগ্রোরক্ত বর্ত্তমান আছে। দূরবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষের (Remote ancestor) দোষগুণ পাওয়াকেই ইংরাজীতে Atavism বা Reversion কহে। ঐরূপ দম্পতীর সন্তানদিগের মধ্যে অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে এক ভাই শ্বেতাঙ্গদিগের ন্যায়, অপরভাই কাফ্রীদিগের ন্যায়। এই সকল কারণে যুক্তরাজ্যে যাহার মধ্যে একবিন্দু কাফ্রীরক্ত (Touch of the tar brush) আছে জানা যায়, সে যতদূর সুশ্রী বা যতদূর গৌরবর্ণই হউক না কেন শ্বেতাঙ্গ সমাজ তাহার সংস্রব বিষধরের ন্যায় ত্যাগ করিয়া থাকে। বর্ণবৈষম্যহেতু যুক্তরাজ্যে যে জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ভারতবর্ষের জাতিভেদেরই অনুরূপ। কিউবায় যাত্রা করিবার পূর্ব্বে একজন মার্কিণবন্ধু গল্প করিলেন যে তাঁহার পরিচিত কোন মার্কিণবাসী কিউবা অবস্থান কালে একজন কিউবান্ ললনার পাণিগ্রহণ করেন। দুই বৎসর পরে তাঁহাদের একটী কৃষ্ণাঙ্গ সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে অনুসন্ধানে প্রমাণ হইল যে কিউবান্ ললনা খাঁটি স্পেনিশ্ নহেন,—তাঁহার মধ্যে নিগ্রোরক্ত বর্ত্তমান আছে। রমণীর নিজেরও বিশ্বাস ছিল যে তিনি খাঁটি শ্বেতাঙ্গ। পতিপত্নী কৃষ্ণাঙ্গ শিশু লইয়া মার্কিণে বিশেষ বিপদে পড়িলেন; অবশেষে তাঁহাদিগকে

---

* গত মাসের "ভারতবর্ষের" শারদীয় সংখ্যায় "আমার যুদ্ধযাত্রা" প্রবন্ধে আরব ও কাফ্রীদিগের মধ্যে সঙ্করত্ব সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতেও এই কথাই বলা হইয়াছে:—"আরবদের সঙ্গে এদের (অর্থাৎ কাফ্রীদের) বিবাহ হয়ে এক বর্ণসঙ্কর শ্রেণী হয়েছে—এদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়। হৈমবতীর ২০০ ডাইলিউশনে mother-tincture এর কণিকা থাকে কিনা, জানি না; কিন্তু এদের মাথার চুলে ও ঠোঁটে এখনও mother-tincture এর পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়।"

বাধ্য হইয়া কিউবায় বাস করিতে হইল। কিউবান্ সমাজে তাঁহারা স্থান পাইলেন, কারণ এরূপ ঘটনা সেখানে বিরল নহে।

কিউবাতে মাত্র দুইজন ভারতবাসীর সহিত দেখা হইয়াছিল। একজন বাঙ্গালী, অপরটী পশ্চিম ভারতের লোক। বাঙ্গালীর নাম নয়নরঞ্জন মিত্র। ইনি মার্কিণে অধ্যয়ন শেষ করিয়া কিউবায় হাভানা সেণ্ট্রাল রেল্‌রোড্ কোম্পানীতে একজন ইঞ্জিনীয়ারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই কোম্পানীর বিশেষত্ব এই যে রেলগাড়ী-গুলি বাষ্পদ্বারা চালিত না হইয়া বিদ্যুৎদ্বারা চালিত হয়। বিদ্যুচ্চালিত ট্রাম্‌গাড়ী ত সভ্যজগতের সর্ব্বত্রই প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু বিদ্যুচ্চালিত রেলগাড়ী অনেক স্থানেই দেখা যায় না। কয়লার সম্পর্ক না থাকা হেতু ষ্টেশন ও গাড়ীগুলি খুব পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। আমার মনে হয় কালে সর্ব্বত্রই এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে, এবং বিদ্যুৎ বাষ্পের স্থান অধিকার করিবে। মিত্র মহাশয় কিউবাতেই একজন স্পেনিশ্ মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া ঐ দেশে বাস করিতেছিলেন। বিদেশে এই বাঙ্গালীটিকে পাইয়া আমরা বড়ই সুখী হইয়াছিলাম। ইনি সময় পাইলে প্রায়ই আমাদিগকে লইয়া হাভানার নানাস্থানে বেড়াইয়া আসিতেন। অপর ভারতবাসীটিকে সান্তিয়াগো দি লাস্ ভেগাস্ (Santiago de las Vegas) নামক স্থানে কিউবার সরকারী কৃষিপরীক্ষাক্ষেত্রে পাচকের কার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়াছিলাম। লোকটী হাভানাতে আমাদের সহিত এক'দিন দেখা করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু আমরা তখন অন্যত্র থাকায় উহার সহিত দেখা হয় নাই। লোকটী কি প্রকারে কিউবায় আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা জানিবার জন্য আমাদিগের খুব কৌতূহল জন্মিয়াছিল, কিন্তু তাহার সহিত আর দেখা না হওয়ায় কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারিলাম না।

কিউবার অনেক স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম। অনেক সময় ডিরেক্টার ক্রলি সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। সমস্ত স্থানের পরিচয় দেওয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। কিউবার কৃষিপরীক্ষাক্ষেত্রে ভারতবর্ষের একটী প্রকাণ্ড বৃষ দেখিতে পাইলাম। আমাদের দেশের ষাঁড়গুলির যেমন ককুদ দেখা যায়, বিলাতে ও মার্কিণের ষাঁড়গুলিতে তাহা দেখা যায় না। ভারতবর্ষের বৃষের সহিত কিউবার গোজাতির সঙ্কর উৎপাদন করিয়া পরীক্ষা করার নিমিত্ত ঐ ষাঁড়টী রক্ষিত আছে। "পিনার্ দেল্ রিয়ো" নামক সহরে স্থানীয় মেয়র অধিকাংশ সময়ই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইতেন। একদিন মজা দেখিবার নিমিত্ত ডিরেক্টার ক্রলি তাঁহাকে বলিলেন "প্রিন্স্ ভিক্টর কিউবান্ মোরগের লড়াই দেখেন নাই। তাঁহাকে আপনাদের এই স্পেনিশ্ আমোদটী একবার দেখাইলে মন্দ হয় না।" আমরা জানিতাম যে কিউবারাজ্যের নূতন আইনে বৃষের সহিত মানুষের লড়াই (Bull fight) ও কুক্কুটের লড়াই প্রভৃতি স্পেন্‌দেশীয় নৃশংস আমোদগুলি নিষিদ্ধ হইয়াছে। কাজেই মোরগের লড়াইর কথা শুনিয়া বৃদ্ধ মেয়রের মুখ শুকাইয়া গেল। যদিও এই আইনটীর বিশেষ কড়াকড়ি ছিল না, এবং আইন ভঙ্গ করিয়া সুবিধা পাইলেই কিউবাবাসীরা মোরগের লড়াই দেখিত, তথাপি আতিথেয়তার খাতিরেও মেয়রের ন্যায় একজন সরকারী কর্ম্মচারীর আইন ভঙ্গ করা সমীচীন নহে। মেয়রের বিপদ্ দেখিয়া মহারাজকুমার বলিলেন যে তিনি এই সকল লড়াইয়ের বিশেষ পক্ষপাতী নহেন। কিউবান্ গভর্ণমেণ্ট্ উহা বন্ধ করিয়া ভালই করিয়াছেন। তখন মেয়র হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। ছান্ হুয়ান্ ই মার্টিনেজ্ (San Juan y Martinez) নামক স্থানে আমরা কুক্কুটের লড়াই দেখিয়াছিলাম। লড়াইয়ের মোরগগুলির (Game-cocks) বিশেষত্ব এই যে উহাদের পদতলের কিছু উপরে তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার এক একটী কাঁটা থাকে। সাধারণ মোরগেরও ঐরূপ কাঁটা লক্ষিত হয় বটে কিন্তু তাহা তত ধারাল নহে। প্রধানতঃ ঐ কাঁটা দিয়াই মোরগ লড়াই করিয়া থাকে, এবং উহাই আততায়ীর শরীরে বিদ্ধ করিয়া দেয়। অনেক সময় কিউবান্‌গণ উহার উপরে তীক্ষ্ণ

লোহার আবরণ পরাইয়া দেয়; তাহাতে কুক্কুটগুলির সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যায়। অনেক সময় পরাজিত কুক্কুট এবং কখনও কখনও জেতা ও বিজেতা উভয়েরই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। আমরা যে লড়াই দেখিয়াছিলাম তাহাতে বহুলোক সমবেত হইয়াছিল। টিকিটের মুল্য ২৫ সেণ্ট্ অর্থাৎ বার আনা হইতে দুই ডলার অর্থাৎ ছয় টাকা পর্য্যন্ত। দর্শকেরা এক একটী মোরগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বাজি রাখিতেছিল, এবং যখন যে পক্ষের জয়ের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল, তখন সে পক্ষের জয়োল্লাস ও চীৎকারে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত হইতেছিল।

কিউবাতে ক্রিকেট্, ফুট্‌বল্ প্রভৃতি খেলার চল আছে বটে, কিন্তু "হাই এলাই" (Jai Alai) নামক খেলাই এখানকার জাতীয় ক্রীড়া। এই খেলা অনেকটা স্কোয়াস্ টেনিসের মত। আমরা হাভানাতে যেদিন এই ক্রীড়া দেখিয়াছিলাম সেদিন কিউবার দুইজন বিখ্যাত খেলোয়াড়ের খেলা হইতেছিল। দর্শকদিগের আর উৎসাহের সীমা ছিল না। কেহ কেহ অনেক টাকার বাজিও রাখিতেছিল। শুনিলাম এক একটী খেলাতে সহস্র সহস্র মুদ্রার বাজি রাখা হয়। বাজি রাখা কিউবান্‌দিগের একটী জাতীয় দুর্ব্বলতা; অনেক কিউবান্ মোরগের লড়াই ও "হাই এলাই" প্রভৃতি ক্রীড়াতে বাজি রাখিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে।

কিউবার কৃষি শিল্প, বাণিজ্য,—বিশেষতঃ তামাক ও চিনির কারখানা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক বিষয় বলিবার আছে। কিন্তু সে সকল নীরস বিষয়ের আলোচনা পাঠকগণের ভাল না লাগিবারই কথা। সুতরাং তাঁহাদিগের ধৈর্য্যের উপর আর দাবি না করিয়া এই স্থানেই বিদায় হইলাম।

শ্রীইন্দুভূষণ দে মজুমদার।

চাহনী।

—ঃ-※-ঃ—

সে চাহনি, চাহেনা আমারে,
তাই আকাশের আলো নিভে বারে বারে,
তাই এ চোখের হাসি, আশার আলোক রাশি
ধুয়ে গেল, নয়ন আসারে!
সে পরশ আজি বীতরাগ,
কুসুমের বক্ষে নাই সুরভি সোহাগ,
অধর পল্লবে তাই প্রাণের রক্তিমা নাই!
পাণ্ডু ভালে, ভাবনার দাগ!
ডাকেনা সে প্রিয় সম্বোধনে,
কূজন গুঞ্জন স্তব্ধ নিখিল ভুবনে,
কণ্ঠের গিয়াছে গীতি, শ্রবণে বিগত স্মৃতি,
বক্ষ ভরে বিফল বেদনে!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

দুই দিক।

— * —

প্রথম অঙ্ক।

[স্থান কলিকাতার মেস্। কাল শীতের সন্ধ্যা। দৃশ্য একটা নাতিবৃহৎ কক্ষ—চার কোণে চারখানা চৌকী। একটা চৌকীতে বিছানা পাতা আর তিনটায় বিছানা গুটান। শয্যা কয়টীর মাথার শিয়রে চারখানা টেবিল। প্রত্যেক টেবিলে পুস্তকের সমাবেশ কিন্তু সব কখানায় গুছান, আর একখানায় এলো-মেলো। দুইটী টেবিলে আলো জ্বলিতেছে। পাতা বিছানায় দুই তিন জন বসিয়া এবং সম্মুখের চৌকীখানায় ৪।৫ জন বসিয়া সুগভীর মন্ত্রণায় ব্যস্ত। মাঝে হাসির সহিত চা এবং বিস্কুট চলিতেছে।]

বিমল। (চায়ের বাটীটা টেবিলে রাখিয়া) না হে শুভস্য শীঘ্রং—ও দেরী ফেরী করাই নয়—রাজেন দা বাধা দেবেই, ও জানবার আগেই সব ঠিক করে ফেল।

অনাদি। না ভাই, রাজেনদাকে না বলে কোন কাজ হতেই পারে না।

বিমল। আঃ তুমি বুঝছ না—এমন সময় বলা যাবে যখন তার বাধাটা কোন কাজেরই হবে না। ব্যাপারটা খুব এগিয়ে নিয়ে ফেলতে পারলে সে তখন উচিত অনুচিত বিবেচনাই করতে পারবে না।

অনাদি। কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তেও যদি সে বলে, না, তখন ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু এলেও তাকে হাঁ বলাতে পারবে না।

বিমল। আরে সে ভার আমার। আমি এমন করে সব manage করব যে সে কিছু জানতেই পারবে না—তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নারকেলডাঙ্গার বাগানে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারলেই বাস্ সব চুকে যাবে। তখন দেখো সে নিজেই খিচুরীর হাঁড়িতে কাটী দিতে বসে যাবে।

শঙ্কর। (গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া) কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা পরায় কে? তুমিত' তাকে তর্কে হারাতে পার, কিন্তু তার ঘাড়টা যদি ন'ড়ে যায় অমনি আমাদের সবই যে ন'ড়ে যাবে।

মণীন্দ্র। বিশেষতঃ সে যদি না বলে তা হ'লে যেমন করেই হোক্ আমাদের এই শেয়ালের ফন্দী বাঘের মত থাবা মেরে ভেঙ্গে দেবে।

বিমল। আঃ কেবল তার ভয়ে ভয়েই থাকবে তোমরা, তার ভেতরকার মানুষটাকে কি কেউ দেখবে না। সে বাঘ বটে কিন্তু—

শঙ্কর। তার লোধও আছে এবং সে তুমি তা জানি। কিন্তু সেবারকার মত এবারকার পোষল্লাটার টাকাটাও যদি তার প্রচণ্ড থাবার মধ্যে প'ড়ে কতকগুলা ভিখারীর পেট ভরায় তা হ'লে কিন্তু হবে না।

মণীন্দ্র। কিছুতেই না—

[নীচে একখানা গাড়ি আসিয়া মেসের সম্মুখে দাঁড়াইল।]

মণীন্দ্র। গাড়ী কার কে এল হে?

রাজেন্দ্র। (নিম্নতল হইতে) শঙ্কর মণী—

শঙ্কর। ঐরে রাজেনদা—(চটী পরিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে গেল) মণীন্দ্র ও অন্যান্য সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। বিমল বসিয়া রহিল।

রাজেন্দ্র। (নিম্নতল হইতে) শিগ্‌গির নেমে আয়, আলোটা আনিস্। নীচে আলো দেয় নি কেন এখনো?

অনাদি। নিশ্চয় একটা কিছু বিভ্রাট ঘাড়ে ক'রে এসেছে। চল পালাই।

বিমল। না—না পালাস্ নে তাহলে সন্দেহ করবে। চুপ করে বসে থাক।

[একটী আহত ও প্রায় সংজ্ঞাহীন বালককে বহন করিয়া শঙ্কর ও মণীর প্রবেশ। সকলে সন্ত্রস্ত বালককে একটী শয্যায় শুইয়া দেওয়া হইল।) তৎপশ্চাৎ কতকগুলা শিশি ও ব্যাণ্ডেজ হস্তে রাজেন্দ্রের প্রবেশ।

বিমল। একটা বিভ্রাট ঘাড়ে না নিয়ে এলে বুঝি,—তোমার ঘুম হয় না? রোজ রোজ—

রাজেন্দ্র। শঙ্কর—আজ তোর বিছানায় মণী শোবে তুই এইখানে থাকবি। সন্তোষ অনাদি সুরেশ রমেশের কাছে ওঘরে শোবে।

বিমল। আর তুমি?

রাজেন্দ্র। আমার ঘুম পেলে তেতালায় তোর পাশে গিয়ে শোবো জায়গা রাখিস্।

বিমল। অর্থাৎ আজকে কেউ ঘুমুতে পাব না। কেন? একে হাঁসপাতালে রেখে আসতে পারলে না? ছেলেটারও উপকার হত, আমরাও বাঁচতাম।

রাজেন্দ্র। উঁহু—ও বেটারা নার্সিংএর কি জানে? ওরা বেঁধেছেঁদে দিলে বাস্—তারপর ঝগড়াঝাটী ক'রে নিয়ে এলাম। না আন্‌লে রাস্কালেরা অমনি ফেলে রাখত। সময়মত ওষুধ লাগান,—পথ্যি দেওয়া কি ওদের দিয়ে হ'ত।

বিমল। ওরা নার্সিং জানে না আর জানে মিউনিসিপ্যাল অফিসের কেরাণী রাজেন ঘোষ! দিন দিন তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাচ্ছে! শঙ্কর ভাই ষ্ট্রেচারখানা আবার এনে একে আমার ঘরে নিয়ে চল।

রাজেন্দ্র। আরে না না—সে কি হয়?

বিমল। কেন হয় না?

রাজেন্দ্র। তুই শুবি কোথায়?

বিমল। আমি ইজি চেয়ারে ঘুমুব।

রাজেন্দ্র। না—না সে হবে না। তোর ঘুম না হ'লে শেষে মাথা ধরবে। না সে হবে না।

বিমল। আমার একলা কষ্ট হবে ব'লে বারণ করছ, এদিকে যে মেস্ সুদ্ধ সব্বাইকে উদ্বাস্ত করছ সেদিকে দৃষ্টি নেই। মণী আন্ না ষ্ট্রেচারখানা—

[ষ্টেচার এনে ধরাধরি করিয়া আবার বালককে বাহিরে লইয়া গেল।]

বিমল। ছোঁড়াটা একটু সুস্থ হয়ে ঘুমুতে পাচ্ছে না তোমার জ্বালায়—এক রকম ন্যাকড়ান্যাকড়ি করা বুঝি দয়া দেখান। তোমার দয়ার ভয়ে লোকের রাত্রে শেষকালে ঘুম হবে না দেখছি রাজেনদা।

[বিমল বাহির হইয়া গেল]

রাজেন। (শুইয়া পড়িয়া) আঃ বাঁচা গেল বিমল যখন ভার নিয়েছে তখন নিশ্চিন্দি। কি হচ্ছিল অনাদি তোদের এতক্ষণ?

অনাদি। কি আবার—রোজ যা হয়, চা খাচ্ছিলাম, গল্প করছিলাম। আর কি?

রাজেন্দ্র। বিমলে ছোঁড়ার এই বাজে খরচের জ্বালায় প্রাণ গেল? কিছুতেই শুনবে না! কেন,—ঐ দৈনিক খরচটা জমিয়ে রাখলে মাসের শেষে কত কাজ করতে পারা যায়? তোরা কি কিছুতেই মানা করবিনে?

সন্তোষ। মানা করলে কি বিমলদা শুনবেন? আপনার কথা যখন শোনেন না তখন আমাদের কথা ত' হেসেই উড়িয়ে দেবেন।

রাজেন্দ্র। তোরা না খেলেই পারিস্—চা বিস্কুট, পাঁউরুটী চপ কাটলেট্—এ সব কিরে বাপু! চার দিকে এত দুঃখু—লোকে যে দুবেলা দুমুঠো খেতে পাচ্ছে না! ওরে অনাদি (রাজেন্দ্র উৎসাহে উঠিয়া বসিল)—ওরে সেদিন বড় সাহেব আমাদের Second Clerk শৈলেশকে dismiss করলে। তারপর আজ শুনছি সে বেচারা চাকরী খুঁজে খুঁজে না পেয়ে শেষে আফিং খেয়েছিল। তার তিনটি মেয়ে, বুড়ো মা, পিসী স্ত্রী, এতগুলো পুষ্যি! অনেক কষ্টে বেচারীকে বাঁচান গিয়েছে এখন defalcationএর চার্জ্জে পড়বার মত হয়েছে। কি যে হবে। ওরে এই ত' সংসার! এই ত এমন দুর্ভিক্ষের দেশে বসে ক'রে তোরা বাজে খরচ করিস। তোদের গলায় বাধে না ঐ সব খাবারগুলো! তোরা যে অনাথদের মুখের গ্রাস কেড়ে খাচ্ছিস্! তোদের বেশী আছে ব'লে তোরা কেন বেশী অপচয় করবি, যখনি এক গ্রাস বাজে খরচ করবি তখনি মনে করবি যে ঐ একগ্রাস গরীবের অন্নহীনের মুখের গ্রাস খেলি,—রক্ত খেলি? ওরে ভাই তাদের কেউ নেই—

[বিমলের প্রবেশ]

বিমল। ওগো Don Quixot থামো—এদিকে—

রাজেন্দ্র। তাদের কেউ নেই ভাই—

বিমল। আর তা,—নাইবা থাকুল, তুমি ত একাই একশ! অনাদি ঐ দরজাটা লাগিয়ে দাও। ছোঁড়াটা ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছিলাম—এ দিকে দাদার আমার বক্তৃতার ধুম লেগে গেল। এমনি ক'রে সেবা করবার জন্য তাকে এনেছ বেশ্।

রাজেন্দ্র। ঘুমিয়েছে?

বিমল। তুমি না থামলে জগৎ ঘুমুতে পারে না। ও বেচারা ত রুগী। যাক এখন এই সুমহৎ দুর্ঘটনার বিবরণটা বল শুনে কর্ণ শীতল হোক!

রাজেন্দ্র। আরে ঐ সব রাস্কাল মোটরওয়ালাদের জ্বালায় কি এক পা চলবার জো আছে। ঐ ছেলেটী বোধ হয় লালবাজারের দিক হ'তে মোড় পার হয়ে আসছিল—আমিও ওরই পেছনে আসছিলাম এমন সময় সম্মুখে এবথ না ট্রাম, পেছনে ট্রাম পাশে একটা মোটর। সন্ধ্যার আলো আঁধারে কি যে ঠিক ঘটল বলতে পারিনে—এক মহা হৈ চৈ ব্যাপার; তারপর দেখি এই ছেলেটী রাস্তায় অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে। ওকে ত' ধরাধরি ক'রে ট্রামে তুলে তখনি মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেলাম। তারপর বাঁধাছাঁদা করিয়ে আমার ভাই ব'লে ওকে ওখান থেকে এখানে এনে তুল্লাম। রাস্ক্যাল মোটরওয়ালার আক্কেলকে সব চেয়ে বলিহারী যাই—সে বেটা অম্লানবদনে চলে গেল। থামলে না।

বিমল। তুমি তার অম্লানবদন দেখলে কি করে? দেখলে ত তার গাড়ির পেছন দিকটা?

রাজেন। নাঃ এ সংসারটা।

বিমল। ধোঁকার টাটি—এতে খাই দাই আর মজা লুটী।

রাজেন। না সত্যি বলছি বিমল, আমার ঘেন্না ধরে গিয়েছে। ভগবানের রাজ্যে এত অত্যাচার কি সহ্য করা যায়।

বিমল। কিন্তু সভ্যতার রাজ্যে এ সমস্তই সইতে হবে নইলে সভ্যতাই হবে না।

রাজেন্দ্র। সভ্যতা! বর্ব্বরতার চূড়ান্ত! দয়া নেই মায়া নেই শুধু ছুটোছুটী হুটোপুটি।

বিমল। এবং সেই সঙ্গে মজা লুটী!

রাজেন্দ্র। মজা দেখাতাম শালা মোটরওয়ালাকে হাতে পেলে। কেন এই সব বেনিয়ম? বলে ভগবান সব দেখেন, সব করেন, ভগবান থাকলে, একটা Moral government থাকলে, এই সব অবিচার অত্যাচার হয়! শুধু কাঠের মত একটা নিষ্ঠুরতা কাপড়চোপড় পরে পরমসুখে এই মস্ত সহরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এতে কি আছে?

বিমল। এতে সব আছে! সুখ আছে, দুঃখ আছে, ন্যায় আছে, অন্যায় আছে, বিচার আছে, অবিচার আছে, নেই কি? দয়া আছে, নির্দ্দয়তা আছে, লোভ আছে, নির্লোভতা আছে হাড়ভাঙ্গা খাটুনী আছে, আবার আরামে ঘুমান আছে। সবই আছে। এর একটাকে নিলে আর একটাকে নিতেই হবে। আলো নেব আর অন্ধকারটাকে বাদ দেব। সুখ নেব দুঃখটাকে নেব না এ হতেই পারে না। সবই নিতে হবে। এইটেই এ সংসারের আসল সত্য! তুমি বলছ এতে কেবল দুঃখ আছে কেবল নিষ্ঠুরতা আছে কিন্তু নিজেকেই ভুলে যাচ্ছ। যদি কেবল নিষ্ঠুরতাই থাকবে তবে শত খানেক টাকার কেরানী রাজেন বাবুরই বা ঐ অজ্ঞাত কুলশীল ছেলেটির জন্য অত টনক নড়বে কেন? আর বেচারী শঙ্কর মণী এরাই বা রাজেনদার অত্যাচারে পড়ে হয়ত সারারাতে ছেলেটীর পাশে বসে জেগে সময় কাটাতে হবে কেন। সুখ নেই বলছ? এই শোন এই আধ ঘণ্টা আগে কেমন আরামে বসে চা বিস্কুট দিয়ে সুখের সপ্তম স্বর্গে চড়ে বন্ধু কজন মজা মারছিলাম। তুমি দুঃখ ঘাড়ে ক'রে নিয়ে এসে ফেললে কিন্তু তাও দেখ এরা হাসছে দুঃখেও হাসছে তোমার মত পেচামুখো philanthropist এর মত সুখের সংসারকে দুঃখের বলে ভুল করছে না। তোমরা কেবল উল্টো দিকটাই উল্টে দেখবে—কেন বাপু আমার মত—।

রাজেন্দ্র। যাঃ তোর সঙ্গে তর্ক ক'রে মাথা খারাপ হবে আমি একটু বেড়িয়ে আসি।

অনাদি। আজ না হয় নেই বেরুলে।

রাজেন্দ্র। উঁহু আমার কাজ আছে।

(প্রস্থান)

বিমল। কাজত' তোমার ছাই।

সন্তোষ। না বিমল দা ওঁকে অমন করে গাল দাওয়া আপনার অন্যায়। সংসারে ওঁর মত লোক বেশী থাকলে—

বিমল। মানুষ সংসার ছেড়ে বনে যেত না। উনি একাই এই আমাদের এতগুলো খেটেখাওয়া সংসারী লোকদের বনে পাঠাবার জোগাড় ক'রে তুলিছেন। কোথায় সারাদিন খাটুনির পর একটু আরাম করব তা নয় কোথা থেকে হাঙ্গামা ঘাড়ে করে এনে ঘর দুয়োর অরণ্য ক'রে তুলছেন। বাপু বাড়ি ছেড়ে এই মেসে আছি, কটা দিন আরামে শুধু আফিসের কাজ ক'রে শান্তিতে কাটাব বলে—তা নয় কোথায় কে খেতে পাচ্ছে না ছোট সেখানে, কোথায় কার হাঁড়িতে তেল নুনের কমতি হয়েছে তার খবরদারি করতে। আরে ওসব কর'বার জন্যেই যদি জানতাম তা হ'লে কি সওদাগর অফিসের কেরানী হয়ে জন্মাতাম। ঐ আবার কার গাড়ি এসে থামল, আঃ জ্বালালে! দেখত অনাদি:—

(অনাদি জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল) কে মশায়? কাকে চান?

(নিম্নতল হইতে) "কে বিমল নাকি?

অনাদি। না আমি অনাদি। বিমল দা আছেন

বিমল। আরে না না বল আমি নেই।

অনাদি। আর নেই ঐ ওপরে আসছে।

বিমল। জ্বালালে

(দ্বার ঠেলিয়া বৃদ্ধ কার্ত্তিক চন্দ্রের প্রবেশ)

আরে কেও ঠাকুরদা—আসুন আসুন ইহা গচ্ছ ইহা গচ্ছ ইহ তিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু—ব্যাপার কি ?

কার্ত্তিক। ব্যাপার গুরুতর ! রাজেন কৈ ?

বিমল। কুকুরের কাজও নেই, অবসরও নেই, সে তার নিশাচরের কাজ philanthropic mission এ বেরিয়েছে। এদিকে আমরা—।

কার্ত্তিক। আরে সে শালা কি যে হাঙ্গামা বাধাতে পারে তার ঠিক নাই। সে কি একটা ছেলেকে এখানে এনেছে।

বিমল। হাঁ হাঁ কেন বলত ? হঠাৎ কোথা হ'তে এক অজ্ঞাতকুলশীলের বাচ্চা এনে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বাস্ for pastures new বেরিয়ে পড়েছে।

কার্ত্তিক। অজ্ঞাতকুলশীল কি রে ? নগেন মিত্তিরের ছোট ছেলে যে সেটা—সর্ব্বনাশ ! কৈ তাকে কোথায় রেখেছে সে ?

বিমল। নগেন মিত্তির—কে তিনি ?

কার্ত্তিক। প্রকাশপুরের জমিদার নগেন মিত্তিরকে চিনিস্ নে, সে যে রাজেনের বাপের আত্মীয়, মস্ত বড় লোক !

বিমল। রাজেন'ত তার geneology ancestry আমাদের কাছে রাতদিন খুলে রেখেছে কিনা তাই তার সব কথা আমাদের প্রায় নখদর্পন হ'য়ে আছে যাক্ ব্যাপার কি ?

কার্ত্তিক। আরে ছোঁড়াটাকে খুঁজতে লাখো লোক লেগে গিয়েছে। বৌবাজারে তাদের বাসা থেকে ছোঁড়া মাঠের দিকে একলাই বেড়াতে গেল তারপর বাস্ আর খোঁজ নেই। ছোটো ছেলে কাউকে না বলে একাই মর্দ্দানি দেখাতে বেড়াতে বেরিয়েছিল। কখন এর আগে কল্‌কাতায় আসে নি। চাকর দারোয়ানকে ফাঁকি দিয়ে নিজেই বেরিয়ে এই বিভ্রাট বাধিয়েছে,—যাক্ ভাল আছে ত ?

বিমল। ভাল মন্দ বুঝিনে ঘুমুচ্চে এই জানি। মাথায় আঘাত লেগেছে, ব্যাণ্ডেজ বেশ বেঁধে দিয়েছে। হাতেই দু'এক জায়গায় লেগেছে বোধ হচ্চে। জানইত তোমার রাজেনকে,—সব কথা কি জানতে পারা গেল ? তা ওকে এখানে নিয়ে এল কেন ? ওর চেনা লোক ত ?

কার্ত্তিক। তাই ত বুঝতে পারছিনে। বোধ হয় চিনতে পারে নি ; সন্ধ্যা বেলায় ঐ কাণ্ডটা ঘটেছে তারপর মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে এখানে এনেছে। ভগ্যিস্ নামধাম ঠিকানা দিয়ে এসেছিল তাই রক্ষে।

বিমল। আর চিনলেই বা কি হবে। ছেলেটা ত প্রায় অজ্ঞান হয়েই রয়েছে ; ঠিকানা জানবে কি করে রাজেনদা ? ঠিকানা কি ছেলেটা বলতে পেরেছে।

কার্ত্তিক। যাক আমি খবর দিয়ে আসি তারা এসে নিয়ে যাক্, না যা হয় করুন।

বিমল। না না এখন নড়িয়ে চড়িয়ে কাজ নেই ঠাকুর দা, রাজেনদার অত্যাচারে ও প্রায় আধমরা হয়েই রয়েছে। কেন বাপু হাসপাতাল থেকে এখানে আনা !

কার্ত্তিক। আরে তাতে ত এই গোলমাল! থাক কিন্তু এটা ভারী আশ্চর্য্য ঘটনা যে ছেলেটা ভগবানের দয়ায় আত্মীয়দের হাতেই পড়েছে! রাজেন ওদের পরমাত্মীয়দেরই মধ্যে।

বিমল। অর্থাৎ?

কার্ত্তিক। সে কথাও এতদিন রাস্‌ক্যাল জানায় নি! কি যে তোদের বন্ধুত্ব তাওত জানি নে।

বিমল। ও আমাদের international law আছে যে কেউ কারুর বাড়ির কথা কাউকে জানাবে না। দরকার হ'লে শনিবার বাড়ি যাব বাস্, বিশেষতঃ আমার আর রাজেনের বিষয় কারুর কিছু জানবার হুকুম নেই। আমরা এই মেসের কাছে শুধু বিমল আর রাজেন। আমাদের আগাও নেই গোঁড়াও নেই। যাক ওকথা আপনি খবর দিয়ে তাঁদের নিশ্চিন্ত করে আসুন।

কার্ত্তিক। ঠিক ঠিক—

(প্রস্থান)

বিমল। The plot thickens oh you chickens কিছু বুঝতে পার তোমরা?

অনাদি। কিছু না—আদিঅন্ত কিছুই তেমন বোঝা গেলনা। রাজেনদা তার আত্মীয়ের ছেলেটাকে কেনইবা এখানে আনলে আর কেনবা এখনও তাদের খবর দেয়নি কিছু বোঝা যাচ্চে না।

বিমল। ঐ যে গোবরা-মুখো আড়ষ্ট man-mountainটী দেখছ ওঁর মধ্যে একটা মস্ত mysteriousness আছে। দাঁড়াও আমরা সে mystary ভাঙ্গাবই ভাঙ্গব—

সন্তোষ। না, পরের গোপন কথায় থাকার দরকার নেই বিমলদা। কিজানি অজ্ঞাতে কোন ব্যথায় আঘাত ক'রে বস্‌ব, তখন সে দুঃখু রাখবার জায়গা থাকবে না।

বিমল। আরে মূঢ়, ব্যথার ওপর বেলেস্তারা না দিলে ব্যথা চিরদিন থাকবেই। আর রাজেনদার মত পাহাড়ে মানুষের মধ্যে যে কোনোখানে ব্যথা আছে তা হতেই পারে না। ব্যথা! ঐ cadএর মধ্যে fad ছাড়া আর কিছু নেই এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি। এবং এই রাত্রি পোয়াতে না পোয়াতে সব clear হয়ে যাবে; ঐ যে রাজেনদার পায়ের শব্দ। অমন মধুর দুপ্ দাপ্ আর কারও নয়—

(ব্যস্ত সমস্তভাবে রাজেন্দ্রের প্রবেশ)

রাজেন্দ্র। ওরে সর্ব্বনাশ হয়েছে এখুনি ছোঁড়াটাকে বৌবাজারে নিয়ে যেতে হবে! মণী যা এখুনি একটা গাড়ি ডেকে আন—

অনাদি। থামুন, কি হয়েছে?

রাজেন্দ্র। না দেখে শুনে বাঘের ল্যাজে কামড় মেরিছি ভাই, তোদেরত হায়রাণ করলাম আমিও হায়রান হলাম। ছেলেটার জন্য পুলিসে খবর দিতে গিয়ে মহাহাঙ্গামায় পড়ে গিয়েছি।

বিমল। অর্থাৎ মনে করেছিলে ছেলেটা বুঝি treasure trove কিন্তু যাদের জিনিষ ত রা তোমায় চোর বলে ধরেছে। কথাতেই ত' আছে

পরের সোনা দিওনা কানে—
প্রাণ যাবে তার হেঁচ কাটানে।

রাজেন্দ্র। ছড়া রাখ, এখন উপায়?

বিমল। কি ব্যাপার ভাই বোঝা গেল না তার উপায় আবার কি বলব?

রাজেন্দ্র। ব্যাপার আবার কি ? ও ছোঁড়া যে কে তাই যে ঠাহর ক'রে দেখা হয়নি—

বিমল। আরে সেটাতো তোমার মুদ্রাদোষ—

সন্তোস। মুদ্রাদোষ কি রকম ? কি যা তা বলছেন ওঁকে !

বিমল। বৎস, স্থিরোভব! পুত্তলিকার চক্ষু আছে দেখিতে পায়না কর্ণ আছে শুনিতে পায় না—এসবের কারণ কি জান ? বোধোদয়ে তা নেই কিন্তু আমরা জানি ওটা পুত্তলিকার মুদ্রাদোষ ওসব transcendental philosophyর কথা তুমি বুঝবে না। যাক রজেন দা মাথা চুলকে, চুল টেনে মাথাটাকে ধামার মত ক'রে কোনো ফল নেই। ঐ transcendental pate এর মধ্যে কি সব diabolic philanthropic plot জমে উঠেছে তা ভেঙ্গে বলত ? কে ঐ ছেলেটা !

রাজেন্দ্র যেই হোক ওকে না চেনাটা ভারী ভুল হয়ে গিয়েছে।

বিমল। চিনতে না পারেন, হারবার্ট স্পেনসার বলেছেন, কিছুতেই তাকে চেনা যায় না, এবং ডারউন যখন বলেছেন মানুষ চিনতে পারে না তখন সে তাকে identify করতে পারে না এবং কোমৃতের মতে classification is a—

রাজেন। আঃ আমি মরছি আপন জ্বালায় আর ওঁর ঠাট্টা সুরু হ'ল।

বিমল। আর সোপেন-হাওয়ার বলছেন—

আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা—

বিশেষতঃ—

রাজেন্দ্র। না ভাই, আমি চল্লাম, একি মণী তুই এখনো গাড়ি ডাকতে যাসনি ?

মণী। ব্যাপারটা না শুনে

রাজেন্দ্র। কিছু শুনতে হবে না তুই যা—যা বলছি—

(মণী যাইতে উদ্যত বিমল তাহাকে বাধা দিল।)

বিমল। থাম না—সব কথা না বললে কেউ এক পা এখান থেকে নড়তে পারে না, পেটের মধ্যে একঝুড়ি গোলমালের micro organism নিয়ে যে তুমি সমস্ত দেশটা infect করবে তা হবেনা। বল কি হয়েছে ?

রাজেন্দ্র। (মাথা চুলকাইতে) তাইত—

বিমল। ওসব তাইত মাইত আজ আর শুনছি না—আজ তোমার এই philanthropic রোগর একবারে bacterio-logical analysis করে ওর anti toxin develop করে তবে ছাড়ব।

(নিম্নতলে আবার গাড়ীর শব্দ)

রাজেন্দ্র। ঐ একখানা গাড়ি এসে থামল না ?

বিমল। যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যে হয় বাঘের ল্যাজে কামড় দিয়েছিলে এইবার স্বয়ং বাঘ আসছেন বোধ হয়—

রাজেন্দ্র। সেকি ? সেকি ? কি বলছিস্—তুই কিছু জানিস্ নাকি ?

বিমল। কিছু কিছু জানি বৈ কি—ঐ শোনো কে আস্‌ছে !

রাজেন্দ্র। কে কে ?

বিমল। তিষ্ঠ—

(দ্বার ঠেলিয়া নিঃশব্দ চরণে বৃদ্ধ কার্ত্তিকচন্দ্র এবং তৎপশ্চাৎ বৃদ্ধ নগেন্দ্র মিত্রের প্রবেশ)

রাজেন্দ্র। একি ঠাকুরদা এঁ—আপনি নিজেই এসেছেন আমি—আমি—গোপালকে কি ক'রে নিয়ে যাব—তাই—গিয়ে—আমি—চলুন গোপাল ঘুমুচ্চে —ভাল আছে ব্যস্ত হবেন না। আমি আপনার ঠিকানাটা—

কার্ত্তিক। ওরে রাস্‌ক্যাল উনি ব্যস্ত হন্‌নি তুই এত ব্যস্ত হচ্ছিস্ কেন?

নগেন্দ্র। গোপাল ঘুমুচ্চে—আঃ বাঁচলাম রাজু। ভাগ্যে তুমি সে সময় ছিলে উঃ—চল একবার দেখে আসি। ওর গর্ভধারিণীও আসতে চাচ্ছিলেন আমি অনেক বুঝিয়ে রেখে এসেছি। চল কোন ঘরে রেখেছ দেখে আসি। আর যদি বল এক জন ডাক্তার।

বিমল। আজ্ঞে ব্যস্ত হবেন না এখানে মেডিক্যাল কলেজের fourth year student আছেন আমিও কিছু কিছু ডাক্তারী জানি—ভয়ের বিশেষ কারণ থাকলে ওকে এখানে রাখতে দিতাম না। আপনি চলুন দেখবে ন সে বেশ আরামেই ঘুমুচ্চে।

[বিমলের সঙ্গে নগেন্দ্রের প্রস্থান]

কার্ত্তিক। হারে রাজু, তোদের এ সব কি রকম ব্যবহার! তোর সঙ্গে ত দেখি এদের গলায় গলায় ভাব বিশেষতঃ বিমলের সঙ্গেত' তোর হরিহর আত্মা অথচ তোর কোন খবর এরা জানে না! এসব কি?

রাজেন্দ্র। নাই বা জানলে ঠাকুরদা--মানুষের কতটুকুইবা জানা যায় কতটুকুইবা সে জানাতে পারে। আমার বাড়ির খবর সাতগুষ্টির খবর এদের ব'লে মিছে কেন এদের ব্যস্ত করব? তার চাইতে এই যেটুকু পরিচয় ওরা পাচ্ছে বা ওদের আমি পাচ্ছি এইত যথেষ্ট!

কার্ত্তিক। কি সর্ব্বনাশ! এই যথেষ্ট! যার সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা ওঠা নাবা করছি তাকে আমার বাপ দাদার খবরটুকু ছেলে পেলের খবর আত্মীয় স্বজনের খবর না দিয়ে কি করে তাদের কাছে পরিচিত হব? ওরে তুই তোর কতটুকু? তোর আর সবাই যে তোর পোণে ষোলো আনা।

অনাদি। ওঁর কথা ছেড়ে দেন ঠাকুরদা এখন বলুন ত' এইখানে এলেন উনি কে? উনিই কি সেই নগেন মিত্তির?

রাজেন্দ্র। যাঃ সর্ব্বনাশ! তুই কি ক'রে ওর নাম জানলি অনাদি।

অনাদি। ঠকুরদা যে তোমার বেরিয়ে যাওয়ার পর এসেছিলেন উনি ব'লে গিয়েছেন—

রাজেন্দ্র। তাইবল—তুমি কি ক'রে গোপালের খবর পেলে ঠাকুরদা?

কার্ত্তিক। আমিত' তোমার মত বিশ্বপ্রেমিক নই যে বিশ্বের খবর রাখব, কেবল আপন জন ছাড়া। আমি নগেন বাবুর আনবার আগে চিঠি পেয়েছিলাম। তারপর আজ সন্ধ্যে বেলায় দেখা করতে যাই, সেখানে গিয়ে দেখি হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছে ছেলে পাওয়া যাচ্ছেনা। আমি যখন বৌবাজারের মোড়ে তখন একটা মোটর accident আর একটা ছোট ৮।৯ বছরের ছেলের হাঁসপাতালে নিয়ে যাওয়ার হৈ চৈ শুনতে পেয়েছিলাম। তখন তুমি তাকে নিয়ে গেছ। আমি নগেনবাবুর বাসায় গিয়ে ছেলে হারান' খবর পেয়ে মনে করলাম এই ছেলে সেই ছেলে নয়ত! যাই মনে হওয়া, কাউকে কিছু না বলে মেডিকাল কলেজে গেলাম। কিন্তু সেখান থেকে খবর পেলাম এই মেসের কে সেই ছেলেকে তার ভাই বলে নিয়ে গেছে। তারপর বুঝতেই পারছ! কিন্তু বলিহারী তোমার বুদ্ধিকে ওকে হাঁসপাতালে না রেখে, কিম্বা ওদের বাড়ি না নিয়ে গিয়ে এখানে আনলে কোন সাহসে!

রাজেন্দ্র। ও যে ঠিকানা বলতে পারলে না—দু'বার নেবুতলা নেবুতলা বলেছিল বটে কিন্তু নম্বর ত বলে নি?

কার্ত্তিক। কিন্তু ওকে চিন্‌তে ও বলিতেও কি পার নি ?

রাজেন্দ্র। চিনতে তেমন চেষ্টা করিনি ঠাকুরদা, আর কবেই বা ভাল করে দেখেছি।' সেই বছর তিনেক আগে দেখেছিলাম ওদের সে কথা কি মনে থাকে ?

সন্তোষ। কিন্তু উনি রাজেনদার কে হন ?

রাজেন্দ্র। পিশে মশায়ের ভাই—

কার্ত্তিক। ওঁর কেউ নয় হে কেউ নয়—মামার শালা পিশের ভাই, তার সঙ্গে সম্পর্ক নাই। আসল কথা কি জান হে, যে বিশ্বকে ভালবাসে তার আপন জন কেউ নেই, সবই পর,—পরাৎপর।

অনাদি। তা একথা এত লুকুবার কি দরকার ?

কার্ত্তিক। তোমার আমার দরকার না থাকতে পারে কিন্তু সেই যে তোমাদের মহাকবি কি বলেছেন সেই—বিশ্ব জগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর ? অর্থাৎ সবাই পরাৎপর। শোনো তবে ওর ইতিহাস—

রাজেন্দ্র। ঠাকুরদা তোমার পায়ে পড়ি

কার্ত্তিক। পায়েই পড় আর ঘাড়েই চড় আজ তোমার বুজরুকি ভেঙ্গে দিচ্ছি—

সন্তোষ। আপনি অমন করে যা তা বলবেন না রাজনদাকে, উনি যাই হোন দেবতা।

কার্ত্তিক। দেবতা বটে কিন্তু ঐ কথাটার আগে একটা প্র পরা অপ ইত্যাদি উপসর্গ আছে কিনা তোমরাই বিচার কর। এই যে বুড়োমানুষটীকে দেখছ, উনি ওঁর পিশের ভাই, কিন্তু তার চাইতে আত্মীয় হবার একটা দুর্ম্মতি ওঁর হয়েছিল এবং বোধকরি এখনো আছে। বুড়ো Old fool বটে কিনা—বিশেষতঃ শাস্ত্রেই বলেছে— "নর্মতি স্ফুরতি কাপি বাসে বৃদ্ধে বিশেষতঃ।"

সেই জন্য ঐ Old cadটি এই মহাপুরুষকে নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে একে আপনার করে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাতে বিশ্বে দ্বার কার্য্যে বাধা হবে বলে এই বুদ্ধদেব বাপের সঙ্গে এক রকম হাতাহাতি করে এখানে পালিয়ে এসে আছেন। বিদ্যে-সিধ্যে এক রকম ছিল বলে যাহোক করে খাচ্চেন বটে কিন্তু অতবড় ভাল মানুষ, অথচ বড মানুষ বাপকে উনি ত্যাগ করে এসে এখানে Philanthropic work করছেন। বুড়ো বাপ কেঁদেকেটে কতবার ডেকেছেন, কিন্তু পাছে বিশ্বপ্রেমিকের— ওকি রাজু কেঁদে ফেল্লি দাদা—

রাজেন্দ্র। ঠাকুরদা—আমার তুমি আর যা ইচ্ছে বলো কিন্তু বাবাকে—উঃ—

সন্তোষ। যান ঠাকুরদা আমরা কিচ্ছু শুনতে চাইনে ছি ছি —একি রকম অন্যায়! একি অত্যাচার—

অনাদি। ঠাকুরদা ঠাট্টা করছেন রাজেনদা, তাতে তুমি কেঁদে ফেল্লে।

(রাজেন্দ্র বাহির হইয়া গেল। কার্ত্তিক লজ্জিত হইয়া বলিলেন)

কার্ত্তিক। চল অনাদি, দেখি ওরা কি করছে। (সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

[কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ একটী বাগানবাড়ী। সম্মুখে গঙ্গা। গঙ্গার উপরেই বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখাংশ। সময়—বৈকাল। গঙ্গার উপরিস্থিত বাঁধান স্থানটীর চতুস্পার্শ্ব নানাজাতীয় ফুলের গাছে সজ্জিত। নানাবর্ণের গাঁদা জাতীয়। পপিজাতীয় ফুল ফুটিয়া সেই বাঁধান স্থানটী ঘিরিয়া আছে। মাঝে২ বড়২ গোলাপ ফুল ও সূর্য্য-মুখী। একখানা রকিং চেয়ারে বালক গোপাল শুইয়া আছে। এখনো তার মাথার ব্যাণ্ডেজ খোলা হয় নাই।

পার্শ্বে চেয়ারে বসিয়া একটী কিশোরী, নাম মনোরমা. ঠাকুরমারঝুলি নামক পুস্তক নাতি উচ্চস্বরে পড়িয়া বালককে শুনাইতেছে। দূরে কয়েকজন মালী কার্য্য করিতেছে। সোপানের একপার্শ্বে টেবিলের উপর নানা রকম খেলার জিনিষ—ছবির বই ইত্যাদি।]

গোপাল আচ্ছা ছোটদিদি মনে করনা কেন ঐ গঙ্গাটাই ক্ষীরসাগর ওর তলায় গজমুক্তা আছে— আমি যদি ঐ আলসেটা থেকে এক লাফ মারি—

মনোরমা। ষাট্ ষাট্ কি ডাকাতের ছেলেরে তুই—

গোপাল। না না মনেই করনা কেন?

মনো। ছি গোপাল লক্ষ্মী ভাই অমন কথা ভাবতে নেই, ভয় করে না তোর?

গোপাল। আঃ তুমি যেন কি! আমি কি সত্যি সত্যিই লাফই মারছি, কিন্তু এই রকম মনে করতে বেশ লাগে—না?

মনো। লক্ষ্মী সোনা ওসব মনে করো না, তারপর শোন কি হল?

গোপাল। শুধু পড়ে কি হবে? যা পড়ছ তাই মনে করতে না পারলে ভাল লাগে?

মনো। তবে পড়ব না।

গোপাল। বেশ, পড়না, আমি কিন্তু—

মনোরমা। আয় ইকড়ি-মিকড়ি খেলি—

গোপাল। ছাই খেলা তার চেয়ে সুধু, খেতু, রাণীকে ডেকে তোমরা লুকোচুরি খেলো, আমি দেখি।

মনোরমা। ওরা যে মার সঙ্গে কালীঘাটে পূজো দিতে গিয়েছে

গোপাল। এঁ রোজই আমায় ফেলে ওরা কালীবাড়ী যাবে? আজ আমিও যাব—চলনা ছোটদি। বেশ মজা হবে চলনা—আমিত এখন হাঁটতে পারি, হেই ছোটদি, ওরে ধনিয়া মালী একখানা গাড়ি ডেকে আনত—(উঠিতে গিয়া) উঃ—(আবার শুইয়া পড়িল)

মনোরমা। কোথায় লাগল গোপাল? ছি অমন করে উঠতে হয়! লক্ষ্মী সোনা আমার তুমি সারলেই কত জায়গায় নিয়ে যাব, চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাব, সোসাইটী দেখাব থিয়েটার দেখাব—জ্বলছে? (গোপালের পায়ের ব্যথার স্থানটায় হাত বুলাইতে২) চুপ করে শুয়ে থাক্ ভাই—অমন করে কি সবাইকে ব্যস্ত করতে হয়? কি খেলাবি বল?

গোপাল। কিছু খেল্‌ব না?

মনোরমা। কিছু খাবি?

গোপাল। না খাব না—

মনোরমা। জলতরঙ্গ বাজাব!

গোপাল। না।

মনো। হারমনিয়াম বাজিয়ে গান করি শোন

গোপাল। ছাই ওসব—

মনো। লক্ষ্মী ভাই, আর উঠিস্ নে।

গোপাল। হাঁা নিয়ে যাবি মিথ্যে কথা—রোজইত বলিস্, কাল নিয়ে যাব—আজ যাইব।

মনো। সত্যি বলছি কাল নিয়ে যাব।

গোপাল। মিথ্যে কথা, কালত' রাজুদার বন্ধুরা এখানে খেতে আসবে।

মনো। তা এলইবা আমরা বেড়াতে যাব।

গোপাল। কাল যাবনা—আমিও ওদের সঙ্গে ঐ পুকুরটার ধারে পোষোল্লা করব।

মনো। সেই বেশ কথা আজ চুপ করে বসে থাক।

গোপাল। ছোটদি, তার চেয়ে চল না আজ ওরা কি করছে দেখে আসি ? কি দিয়ে পোষোল্লা হবে? ওরা হাঁড়িকুঁড়ি সব আনবে ? ওরাই রাঁধ্‌বে ! ওরা রাঁধ্‌তে পারবে ?

মনো। ওরা কিছু করবে না, পুরুষ মানুষে কিছু পারে ! মা সব ঠিক করে দেবেন বামুন ঠাকুর বেঁধে দেবে ওরা এসে ঐ বাগানে বসে বনভোজন করবে।

গোপাল। তবে ছাই পোষোল্লা হবে—ওতো নেমন্তন খাওয়া। আচ্ছা বিমল বাবু আসবে ?

মনো। আসবেন বৈ কি !

গোপাল। শঙ্কর বাবু !

মনো। সব্বাই আসবেন।

গোপাল। কি করে জানলে ?

মনো। কি করে আবার—বাবা নেমন্তন্ন করে এসেছেন যে—

গোপাল। ওঃ নেমন্তন্ন—তবে যে সে দিন বিমলবাবু বলে গেলেন পোষোল্লা করতে আসবেন।

মনো। ঐ হল,—ওরই নাম পোষোল্লা।

গোপাল। বিমল বাবু যে বলেছিলেন আর একদিন আসবেন ত' কৈ একদিনও আর এলেন না যে !

মনো। কাল ত' আসবেন।

গোপাল। বিমল বাবু বেশ, না ছোটদি ? কেমন আস্তে আস্তে ঘা ধুইয়ে দিতে পারেন। ওঁর ওষুধও ভাল। আননা দিদি ওঁর ছবির বৈটা—(মনোরমা উঠিয়া একখানা সাটীন বাঁধান বৈ আনিয়া দিল) গোপাল একটা পাত খুলিয়া বলিল—আচ্ছা দিদি, ছবিতে বাঘটাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে কিন্তু সত্যিকার বাঘ ত' এমন নয়। বাবারে যে ওদের চেহারা—ওকি ছোটদি উঠছ কেন ?

মনো। ঐ দেখ বাবার সঙ্গে কে আসছেন. তুমি চুপ করে শুয়ে থাক—আমি ঐ বারান্দায় আছি।

গোপাল। আরে ওযে বিমল বাবু—ওকে দেখে পালাচ্ছ কেন ? রাজুদা নয় দিদি, ভয় কি !

মনো। ভয় আবার কি তুই চুপ করে শুয়ে থাক্, ওরা বৈঠকখানায় ঢুকলেই আবার আসব।

(মনোরমা বারান্দার থামের আড়ালে গেল)

বিমল ও নগেন্দ্রনাথের প্রবেশ

গোপাল। বিমলবাবু, এইমাত্র আপনার কথাই বলছিলাম আর আপনি এলেন রাজু দা কৈ ?

বিমল। কেমন আছ গোপাল ? তোমার ঘা' ত সেরে গিয়েছে তবে শুয়ে আছ কেন ?

গোপাল। মাথার ঘাটা সারেনি হাতের সেরেছে।

বিমল। পায়েরটা ?

গোপাল। ওটা কেন সারছে না ?

নগেন্দ্র। যে সুবুদ্ধি শান্ত শিষ্ট ছেলে।

বিমল। তুমি দুষ্টুমী কর বলে, নড়্‌লে চড়্‌লে সারবে কি ক'রে ? চুপ ক'রে থাকনা কেন ?

গোপাল। চুপ করে রাত দিন আপনি পড়ে থাকুনত’

বিমল। অমার যদি সারাদিন কেউ এমনি ক’রে শুইয়ে রেখে যত্ন করে আমি তা’হলে বেঁচে যাই।

গোপাল। হ্যাঁ তা বৈকি ? তাই আজ পোষোল্লা, কাল চিড়িয়াখানা, পরশু থিয়েটার এই ক’রে বেড়ান কেন ?

বিমল। আমি আফিস্ ছাড়া কোথাও নড়িনে গোপাল। আমিত’ তোমার রাজুদা নই, গোপাল, যে মিছে ভুতেরবেগার খেটে মরব। যাক তা হ’লে ঐ কথা রৈল পিশেমশায়; আপনি কিছু মনে করবেন না; যে লোকটা জীবনটাকে কেবল থিয়েটারী ব্যাপার মনে ক’রে তার সঙ্গে একটু থিয়েটারী চালে চলতেই হবে এতে দোষ নেই। আপনি কোনো ক্ষোভ রাখবেন না কিন্তু আজ রাতে রাজুদার বাবা যদি কোন কারণে না আসতে পারেন তা হ’লেই সব গণ্ডগোল বেধে যাবে।

নগেন্দ্র। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক, ছেলের উপর রাগ অভিমান হতে পারে, কিন্তু তাদের রোগ হ’লে তার জন্যে বাপ মায়ে সব পারে।

বিমল। তাঁকে তাহ’লে একটু শিখিয়েপড়িয়ে রাখবেন! আমি এখন আসি—

নগেন্দ্র। আজ না হয় এখানেই থেকে গেলে এই এত দূর থেকে আবার সেই বেনেটোলায় যাবে ?

বিমল। না না আমার প্ল্যানটা তাহ’লে নষ্ট হয়ে যাবে সব পার্ট রিহার্সেল রাখতে হবে।

নগেন্দ্র। তা হোক না খাইয়ে তোমায় ছেড়ে দিতে পারব না তাহলে গোপালের মা রাগ করবেন।

বিমল। পিশিমাকে বলবেন, কাল যত রকম পারেন এই সব পেটুকদের জন্য জোগাড় রাখবেন। রাত আটটার আগে মেসে পৌছানই চাই।

গোপাল। না বিমল বাবু, তা হবেনা আপনি আজ কিছুতেই যেতে পাবেন না।

বিমল। কা’ল যে সারাদিন এখানে কাটাব গোপাল, ভয় কি!

গোপাল। না-না-না কিছুতেই না।

বিমল। আজ ছেড়ে দাও গোপাল, ক’াল তোমার জন্য অনেক মজার জিনিষ আনব।

গোপাল কি আনবেন শুনি ?

বিমল। এখন বল্লে সব মজা নষ্ট হয়ে যাবে।

গোপাল। তা হোক বলুন—বসুননা ঐ চেয়ারটায়, বাবা তুমি যাও জলখাবার পাঠিয়ে দাও গিয়ে। আমি বিমল বাবুর সঙ্গে গল্প করব; মা এমনি দুষ্টু, আমায় ফেলে সুবোধদের নিয়ে কালীবাড়ি গিয়েছেন।

নগেন্দ্র। না গোপাল আজ ওকে ছেড়েদে।

গোপাল। কিছুতেই নয়।

বিমল। তবে বলছি, আপনি ঐ চেয়ারে বসুন আমি এই টুলটায় বসছি।

নগেন্দ্র। ও মনু তোর বিমলদার জন্যে একটু চা আর জল খাবার নিয়ে আয় তো।

গোপাল। আমিও চা খাব।

নগেন্দ্র। তুই ত’ চা খাসনে গোপাল।

গোপাল। না আমিও খাব। বিমলবাবুর সঙ্গে খাব,

নগেন্দ্র। বেশ, ওরে কে আছিস্,—দু পেয়ালা চা আনিস, আমার ভয় হচ্চে বিমলবাবু, যে নাজানি এতে কি হয়ে বসে; বাপবেটার গোলমালের মধ্যে যেতে ভয় করছে। আর এর মধ্যে আমায় যদি কোনো রকম যোগ না থাকত তাহ’লে কোন ভয় ছিলনা মনুর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করেইত’ এই দুর্ঘটনা ঘটে গেল। অমন ভাল

ছেলে রাজু, সেই কিনা শেষে এমন হ'য়ে বাপের অবাধ্য হ'লো, আমাদের কষ্ট দিলে ! এইত' তোমারও আছ—

বিমল। পিশেমশায়, এইবার মুস্কিলে ফেল্লেন, আপনি আমায় যতটা ভাল মনে করছেন সাংসারী হিসেবে আমিও ঠিক রাজুদার মতই দুখী। রাজুদা পলিয়ে বেড়'চ্ছে সুখের ভয়ে, আমি এখানে পালিয়ে এসে চাকরী করছি দুঃখের ভয়ে। ও আমরা দুই বন্ধুতেই সমান দোষী।

নগেন্দ্র। বুঝতে পারলাম না।

বিমল। আজ্ঞে আমার জীবনটা ঠিক যে রাজুদার মত তা না হলেও আমিও একটা run away ছোট বেলায় বাপ মা মারা যান। বিষয় আশয় এক রকম ছিল বলে এবং বাবার আমাদের এক জন পুরোনো কর্ম্মচারী আছেন বলে কলকাতায় পড়াশুনা করিছি। কিন্তু মাথার ওপর কেউ ছিলনা বলে একবার এ কলেজ একবার সে কলেজ, একবার প্রেসিডেন্সী, একবার মেডিক্যাল আবার দু'চার মাস এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এই সব সাত ঘাটের জলখেয়ে ষাঁড়ের গোবর হয়েছি। কোনো জিনিষে লেগে থাকতে পারিনে কারণ একঘেয়ে কিছুই ভাল লাগেনা। বিশেষতঃ মাথা ঘামিয়ে বিষয় আশয় দেখার মত বুদ্ধি আমার নেই তাই আজ বছরখানেক থেকে একটা চাকরী জুটিয়ে আরামে আছি। আরামটাই একমাত্র আমার ধাতে সইল—আর কিছু নয়। বিষয়ের টাকা কড়ি জমে উঠছে কি কাজেলাগাবে জানিনে। কিন্তু বেশী টাকার বেশী ভাবনা বলে, ব্যাঙ্কে জমা করা ছাড়া আর কিছু করিনে,—করতে জানিইনে।

নগেন্দ্র। বিয়ে থাওয়া করনি কেন ?

বিমল। ঐত' বল্লাম, মিছিমিছি বিভ্রাট বাধিয়ে কি হবে ? সুখের চাইতে সোয়াস্তি ভাল ! এ এক রকম মন্দ জীবন নয় পিশেমশায়, ভাবনা নেই চিন্তা নেই বেশ কেটে যাচ্ছে।

নগেন্দ্র। তোমার আপনার জন কেউ নেই ?

বিমল। বাপ মা নেই, তা ছাড়া আর সবই আছে। খুড়োরা আছেন—আমার এক খুড়িমা আমায় মানুষ করেন। কিন্তু আমার জীবনটা এই রকম লক্ষ্মীছাড়ার আরামে কাটবে বলেই বোধহয় আজ বছর ছয়েক হল তিনিও গঙ্গালাভ করেছেন।

গোপাল। বাবা আমার ভাল লাগছে না, অন্য গল্প কর না।

বিমল। ঠিক কথা গোপাল, এসব আর একদিন হবে পিশেমশায়, আমিও নিজের গল্প করতে ভালবাসিনে, নিজের বিষয় ভাবতে হবে বলে পালিয়ে বেঁচেছি। ঐ যে চা জল খাবার আনছে (মনোরমা ও একজন দাসীর জলখাবার ও আসন লইয়া প্রবেশ) বিমল উঠিয়া দাঁড়াইল। কোথায় রাখবে ?—এই টুলটায় রাখ ! আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই—(মনোরমা নিঃশব্দে জল ছিটাইয়া আসন পাতিয়া দিলে বিমল বসিয়া পড়িল।)

গোপাল। দিদি, আমার চা ? মনো এই যে গোপাল, (মনোরমা গোপালকে চামচে দিয়া চা পান করাইতে লাগিল।)

গোপাল। মিষ্টি হয়নি যে (ঝি চিনি আনতে গেল)

নগেন্দ্র। একি রাজু যে হন্‌হন করে ছুটে আসছে ? ব্যাপার কি ? নিশ্চয় কিছু—

বিমল। কিছু না চায়ের গন্ধ পেয়েছে—তাই বড়সির দিকে ছুটে আসছে। মেসে বলে এসেছিলাম রাজুদা আজ ফিরলেই যেন তাকে কাঙ্গালীভোজের খবরটা দেওয়া হয়।—এই রাজুদা—

(রাজেন্দ্রের প্রবেশ ও নগেন্দ্রকে প্রণাম)

রাজেন্দ্র। পিসে মশায়, শুনলাম নাকি গোপালের আরাম হওয়ার জন্য বড় একটা ভোজ দিচ্ছেন ? এতে যেটুকু কল্যাণ হবে তার চাইতে হাজার গুণ ভাল হ'ত যদি ঐ টাকাটা কাঙ্গালীভোজে খরচ করা হ'ত—তাতে -

নগেন্দ্র। তাইত রাজু, আমি যে প্রায় ঠিক করে ফেলিছি, এখন কেবল নেমন্তন্ন করতে বাকি।

রাজেন্দ্র। বাকী আছে আঃ বাঁচা গেল—দেখুন যা জোগাড় করেছেন তাতে যদি অন্নহীনের এক দিনেরও দুঃখ দূর হয় তাতে গোপালের অনেক বৎসর আয়ু বেড়ে যাবে।

নগেন্দ্র। কিন্তু—

রাজেন্দ্র। ওতে কোনো কিন্তু নেই। এই যে মনোরমা, পিসী মা কৈ? ডেকে আননা তাঁকে—আমি বুঝিয়ে বলব—হাত জোড় করে মিনতি করব, তিনি নিশ্চয় শুনবেন। দোহাই পিসেমশায় আমার কথা রাখুন। যদি নেমন্তন্ন না হয়ে থাকে তা হ'লে—যাও না মনু, আমি ঠিক পিসীমাকে বুঝিয়ে দেব। যাও যাও তুমি যাও—

মনোরমা। আজ্ঞে মা যে—

বিমল। আঃ থাম না রাজুদা, এঁদের কেন ব্যাস্ত করছ। নেমন্তন্ন না হলেও ব্যাপারটা এতদূর এ'গিয়েছে যে আর পেছুবেন কি করে এঁরা। কলকাতার বন্ধুরা সবাই জেনেছেন যে কালকে সন্ধ্যায় এই বাগানে খেতে আসতে হবে। এখন কেবল formal একটা নেমন্তন্ন করা বৈত না।

রাজেন্দ্র। তা হোক, যদি নেমন্তন্ন না হয়ে থাকে তবু পেছুন যায়—পিসে মশায়—

বিমল। কি আশ্চর্য্য! কাঙ্গালী ভোজ না হয় আর একদিন করলেই হবে। তাই ব'লে বন্ধুবান্ধব নিয়ে একদিন করলেই আমোদ করাটা এতই দোষের? তোমাদের মত prigদের জ্বালায় কি মানুষ সব রকম সুখে জলাঞ্জলী দিয়ে কেবল—

রাজেন্দ্র। বিমল, ভাই তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ওরকম কথা বলনা। কি যে কষ্ট, কি যে হাহাকার রোজ আমার চোখে পড়ছে। আজকেই শুনে এলাম সেই আমাদের শৈলেশকে Prosecute করাই নাকি ঠিক হয়েছে। কি তার অপরাধ! ৩।৪টী ছেলে মেয়ে বুড়ো মা স্ত্রী নিয়ে তার সংসার। ত্রিশটী টাকা তার ছিল মাইনে—কোন দিন প্রাণের দায়ে সে ক'টা টাকা ভেঙ্গেছিল তাই দিতে না পেরে আজ সে জেলে যাবার মত হয়েছে। এ সব দেখেও কি অপচয় করতে মানুষ চাইতে পারে? না পিসে মশায় তা হবে না—যদি আপনার গোপালের মঙ্গল চান—

নগেন্দ্র। (হাসিতে হাসিতে) তাই হবে বাবা আমি নিমন্ত্রন্ন করব না, কাল কাঙ্গালীদেরই খাওয়াব কিন্তু তোমার এসে সব দাঁড়িয়ে করে দিয়ে যেতে হবে।

রাজেন্দ্র। (নগেন্দ্রের পদধূলি লইয়া) আঃ বাঁচলেম, আমি কাল ভোরেই আসব।

নগেন্দ্র। তা হলে ত এসবের জন্য লোকজন চাই, তোমাদের মেসোর বন্ধুদেরও সঙ্গে এনো—তাদের নেমন্তন্ন করতে হবে?

রাজেন্দ্র। কিছু না—আমি ধরে আনব সবাইকে। চল বিমল সুখবর সবাইকে দেই গে। ঐ যে পিসীমা এসেছেন। যাই ওকে বলি গে—

(রাজেন্দ্র বারান্দার দিকে অগ্রসর হইল)

বিমল। সর্ব্বনাশ করলে, পিসীমা ত' plot-এর মধ্যে নেই—ও রাজুদা শোনো শোনো—আঃ শোনই না—

নগেন্দ্র। যাক্ যাক্ ভয় নেই আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি। উনিও জানেন ভোজ হবে কালকে আমিও যাই—

(নগেন্দ্র চলিয়া গেলেন)

বিমল। তাইত' মনু দিদি, তুমিও খুব হাসছ? কেমন মজার মানুষটী এই রাজুদা বল ত দিদি?

(মনোরমা অবনত মস্তকে মৃদু২ হাসিতে লাগিল এবং ছবির বৈএর পাতা উল্টাইতে লাগিল।)

গোপাল। নাঃ—বাবারে এতক্ষণে বাঁচলাম। রাজুদা যেন একটা কি ?—কেমন ধারা মানুষ ?

বিমল। যেন একটা ঝড়—কি বল গোপাল ?

গোপাল। না না অমন মানুষ কেন ?

বিমল। তোমার ওকে খুব ভয় করে না গোপাল ? মনু ওকে ভয় কর খুব ? না আমার অত লজ্জা করলে চলবে না—আমি রাজুদা নই। আমায় যে ভয় করে তার পেছনে চব্বিশ ঘণ্টা লেগে থাকি তা বলে দিচ্ছি। আমায় যদি ভয় কর বা লজ্জা কর, তা হলে অনেক বিপদে পড়বে। ঐ যে মানুষটী দেখছ ওকে যদি সইতে হয় ত আমাকেও সইতে হবে, মনুদিদি নইলে ওকে সামলাবে কে ? হাসছ ? হেসো না, দেখে নিও শেষে আমিই তোমাদের অগতির গতি হব, রাজুদা কেবল আমার কাছে কেঁচো—আর সবারই কাছে বাঘ। তোমার মত ছোট মানুষকে ত ও একগ্রাসে গিলে ফেলবে।

গোপাল। (উচ্চ হাস্য করিয়া) ঠিক বিমল বাবু—ঠিক—রাজুদা বাঘ আর আপনি ফেউ

বিমল। ফেউ নই গোপাল ঘোষ। কিন্তু ঠাণ্ডা পড়ে আসছে যে—চল তোমায় ভেতরে নিয়ে যাই।

গোপাল। না না বড্ড ভাল লাগছে, ঐ দেখুন সূর্য্যি মামা কেমন লাল হয়ে ডুবছেন। দিদি তখন বলছিলে গান গাইবে এখন একটা গাও না—

(মনোরমা লজ্জিত হইয়া গোপালকে চোক টিপিল)

বিমল। এঁ মনুদি তোমার পেটে পেটে এত ! এঃ আমার যে বেজায় হিংসে হচ্চে—

মনোরমা। চল গোপাল—

গোপাল। না যাব না—তুমি যাও না কেন ? বিমল বাবু আপনি গাইতে পারেন ?

বিমল। না গাইতে পারলেও এ সময় সবাই গায়। এমন গঙ্গার ধারে গান গাইব না। তুমি নিশ্চয়ই গাইবে না মনুদি—তবে আমার গানই শোনো। এমন সন্ধ্যায় এমন জায়গায় আর এমন comedy হবার জোগাড় দেখে গাধাও সংগীতজ্ঞ হয়ে উঠবে। রাজুদা এতক্ষণ নিশ্চয় ঘরের মধ্যে বক্তৃতা জুড়ে দিয়ে পিসীমাকে হাসিতে ভরিয়ে ফেলেছে। আমরাও বা ছাড়ি কেন ?—

(বিমল হার্মোনিয়াম বাজাইয়া গানের উপক্রম করিয়া বলিল)

কি গান গাইব গোপাল ?

গোপাল। খুব একটা দূরের গান—

বিমল। দূর বোকা—দূরের গান গাইব কি দুঃখে, খুব নিকটের গান গাইব। মন দিয়ে শোনো আর হেসো না—

গোপাল। বাঃ হাসি পেলেও হাসব না ?

বিমল। না তা'হ'লে রাজুদা বকবে।

গোপাল। আর যদি কান্না পায় ?

বিমল। বকিও না। কান্না পায় যদি খুব জোরে হেসে উঠো—শোনো—

গয়াকাটার দেশেরে ভাই,

গয়াকাটার দেশে

গোপাল। সে আবার কোন দেশ বিমল বাবু ?

বিমল। এঃ তোমার কিচ্ছু Geography জানা নেই গোপাল বাবু—সে দেশ খুব কাছেই আছে, সে দেশের লোক একটু বড় হলেই দেখতে পাবে। এখন গান শোনো—

গন্নাকাটার দেশেরে ভাই
গন্নাকাটার দেশে
দম্‌ফেটে যে মরতে হল
দারুণ হাসি হেসে
মুখটা কারো বোঁজে নাকো
ব্যাপার কি তা বুঝে দেখো
মুখটা খোলা থাকার দরুণ
সবই যাচ্ছে ফেঁসে।
গন্নাকাটার দেশেরে ভাই গন্নাকাটার দেশে।

তাদের ভাষায় ফ বেশী তাই
সবই ফক্কিকার—
ভাবের পক্ষী ফক্কি হয়ে
উড়ে চমৎকার।
পেটের হাওয়া জম্‌তে নারে
ঠোটের ফাঁকে বেরিয়ে পড়ে
কাজের চেয়ে কাওয়াজ বেশী
সে ঠোঁঠ-কাটার দেশে।
গন্নাকাটার দেশেরে ভাই গন্নাকাটার দেশে

প্রাণের চেয়ে উদান বেশী
কেবলি উদ্গার
বদহজমে মরছে সদাই
উদর চক্কাকার
প্রাণের চেয়ে ভানই বড়
গানের চেয়ে ভালই দড়
ক্ষেতের চেয়ে আচোট বেশী
ধানের চেয়ে কেশে।
গন্নাকাটার দেশেরে ভাই গন্নাকাটার দেশে।

ক্রমশঃ

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

চীন পরিব্রাজকের প্রতি।

কহ কহ ওগো পর্য্যটক,
ভারত-গৌরব-গাথা গাহ তুমি প্রাচীন কথক।
পূর্ব্ব-সিন্ধুতীরে বসি কহ তুমি অশনি নির্ঘোষে,
শুনি মোরা ভক্তিনত সমুদ্রের অন্য কূলে বসে'।
স্বকণ্ঠে সবার সহ করিয়াছ তার জয়গান,
স্বচক্ষে দেখেছ তুমি নহে শব্দ নহে অনুমান।
নহি মোরা ঘৃণ্য নীচ, নহি মোরা কাফ্রীর মতন,
মোদের অতীত নহে আরণ্যের পাশব জীবন,
সমস্ত জগৎ যবে অন্ধকার ভূধর-গুহায়
দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিল অজ্ঞতার ঘোর তমিস্রায়,
জ্ঞানের সুমেরু শৃঙ্গে আলোকের পুণ্য-মন্দাকিনী
করিল ভারতে কিবা জ্ঞান ধর্ম্ম সম্পদশালিনী
নালন্দা, বৈশালী, কাঞ্চী, তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী কাশী,
আলোকের দীক্ষা-মন্ত্রে ব্যোম মাঝে উঠিল উদ্ভাসি,
জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল যেন সবিতার পাশে দীপ্ততম,
বাগেদবীর বীণাযন্ত্রে মূর্ত্তিমতী রাগিণীর সম।
কহ কহ তাম্রলিপ্তী সৌরাষ্ট্রের ঐশ্বর্য্যের কথা
ধরণী কমলারূপে খুলেছিল দানসত্র যথা।
কেমনে সে চারুকলা, শিল্পরাজলক্ষ্মী আসিয়ার
এই ভারতের বুকে সিংহাসন পেতেছিল তার।
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের স্বর্ণময় প্রান্তরে প্রান্তরে
অন্নপূর্ণা অন্নসত্র খুলেছিল পশুপক্ষী তরে।
'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' শান্তি-ধ্বজা উড়ায়ে আকাশে
মগধের রাজশক্তি আর্য্যাবর্ত্তে বাঁধে বাহু পাশে।
সর্ব্বস্ব বিলায়ে দীনে বল্কবাস পরিত সম্রাট
গুণী জ্ঞানী পাদমূলে ক্ষত্রশক্তি লুটা'ত ললাট।
সিদ্ধার্থের ধ্রুববাণী প্রচারিতে শুধু সিংহাসন
বুদ্ধের ভৃত্যের শুধু সুকঠোর কর্ত্তব্য পালন।

তেয়াগিয়া ভোগসুখ অৰ্দ্ধদেশ জুটে সংঘারামে
অৰ্দ্ধেক জীবন যাপে গৃহীগণ তীর্থ ধামে-ধামে।
কমা'তে কাঁধের বোঝা চাহে সবে নামাইতে ভার,
পারের কৌড়ির লাগি' বিতরিছে সমগ্র সংসার!
সকলে বর্জ্জিতে চাহে গ্রহণের প্রার্থী নাই দেশে,
নিরাশ্রয় ভোগসুখ, পথে কাঁদে কাঙালের বেশে।
শাঠ্য নাই, দ্বন্দ্ব নাই, নাহি দ্বেষ, নাহি চৌর ভয়,
ভবরোগ ছাড়া অন্য রোগচিন্তা নাহি দেশময়।
অস্ত্রাগারে ঊর্ণনাভ করে নিজ নিবাস বিস্তার,
রাজদণ্ড রহে তুলা রাজচিহ্ন শোভার ভাণ্ডার।
আপনি আপন দণ্ড দেয় পাপী হইয়া নিষ্ঠুর
গুহ্য পাপ অশ্রুজলে নিবেদিয়া চরণে গুরুর।
ছায়াশূন্য নাহি পথ, চৈত্যশূন্য নাহি কোনো গ্রাম,
পথে পথে গীত হয় তথাগত জন্য অবিরাম।
স্তূপে স্তূপে তীর্থযাত্রী মহোৎসব বিহারে বিহারে,
শাস্ত্রমন্ত্র উদীরিত চণ্ডালেরো আগারে আগারে।
সন্ন্যাসী, শ্রমণ, ভিক্ষু, বর্ণাশ্রমী, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ,
ভ্রাতৃভাবে মহানন্দে পরস্পরে করে আলিঙ্গন।
নাহি দ্বন্দ্ব ধর্ম্মে ধর্ম্মে, এক্ই লক্ষ্য সবারি জীবনে
'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' এ কথায় দ্বিধা নাহি মনে।
নৃপতির সভাতলে ভিক্ষু, বিপ্র, আচার্য্য, শ্রমণ,
সমান সম্মান যত্নে লভে ভক্তিদত্ত রত্নাসন।
প্রাণ হতে সত্য বড়, বিত্ত হতে চরিত্র মহৎ,
রাজসুখ হতে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচর্য্য পরম সম্পৎ।
ইহলোকে পিতৃসম পরত্রের গুরুর মতন
নৃপ করে বিশ্বে ইহ পরত্রের সৌখ্য আয়োজন।
তাপিত ক্ষুধিত অন্ধ তৃষাতুর আময়কাতর
সর্ব্বত্র আশ্রয় লভি জুড়াইত ব্যথিত অন্তর।
পথে পথে পান্থশালা, জলসত্র আতুর নিবাস,
ঘাটে মাঠে প্রীতিবর্ষ দানসেবা সান্ত্বনা আশ্বাস।

পালিত সন্তান স্নেহে পশুপক্ষী আগারে প্রান্তরে,
অতিথিরা দেবসম শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যে পূজ্য ঘরে ঘরে।
বিশ্বপ্রেম-সোমরস ঝরিল যা বোধিদ্রুমতলে
প্রভুর বদনচন্দ্রে, মত্ত তাই পিয়ে কুতূহলে।
আনন্দে সমগ্রদেশ হয়ে আছে পুণ্য চিন্তারত,
কাদম্বরী নির্ব্বাসিতা দূরদেশে আঁধারের মত।
কহ কহ পর্য্যটক ভারতের সে পুণ্য বারতা,
ভারত তোমার তীর্থ,—ধরণীর প্রত্যক্ষ দেবতা,
যাইনিক শুনিবারে এ-দেশের প্রাচীনের পায়
প্রাণের গরবে পাছে স্বদেশের গৌরব বাড়ায়।
অমর হয়েছ তুমি— পুণ্যতীর্থ ধূলি পরশনে
কহ কহ হে বিদেশি, মূল্য বেশী তোমার বচনে।

শ্রীকালিদাস রায়।

মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের দু' একখানি গ্রন্থ।

গত ভাদ্র মাসের "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রিকায় "উপকথা" শীর্ষক প্রবন্ধে কুচবিহারের প্রখ্যাত নরপতি মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ বিরচিত একখানি কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় তদ্বিরচিত অপর তিন চারিখানি কাব্য।

কি ভারতীয়, কি ইয়ুরোপীয় যাবতীয় সভ্যজাতির ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে সাহিত্যের শৈশব অবস্থায় সেই সেই দেশের নরপতির সস্নেহ আনুকূল্য ব্যতীত সাহিত্যের ত্বরিত বিকাশের সম্ভাবনা নাই। সকল দেশেই স্বদেশপ্রেমিক, নৃপতি-ভাষার উন্নতি সাধনে স্বকীয় শক্তি সমগ্রভাবে নিয়োজিত করিয়াছেন। দুই একটি উদাহরণ দিতেছি। রাজা আলফ্রেড স্বীয় প্রজাবর্গকে ঘোর অজ্ঞানান্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়া যে জ্ঞানালোকে উদ্দীপিত করিয়াছিলেন তাহার পূত অর্চ্চিঃ অনন্তকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভাস্বর করিয়া রাখিবে। অবসাদক্লিষ্ট নীতিবিযুক্ত প্রজার হিতসাধনকল্পে তদানীন্তন বিখ্যাত পণ্ডিতগণকে নিজ সভায় আনাইয়া, ও নিজে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তিনি বহু পুস্তক প্রণয়ন করিলেন। দক্ষিণ ইংলণ্ড জ্ঞান-রশ্মিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। West-Saxonএর ভাষা (dialect) আর ভাষা রহিল না; তাহা Standard (আদর্শ) ভাষায় পরিণতি লাভ করিল। সেই দিন হইতে Alfred গদ্যের জনয়িতারূপে পরিচিত হইলেন। রুষসাহিত্যের প্রথমাবস্থায় Ivan the Terrible, Renaissance (নব জীবন-নবজাগরণ) যুগে Peter the Great ও রুষসাহিত্যে পাশ্চাত্যপ্রভাবের যুগে রাণী দ্বিতীয় কাথারিণের (Catherine II) নাম উল্লেখযোগ্য। কাথারিণ

স্বয়ং ত্রিশটি নাটক লিখিয়াছিলেন। অনেক সাধনার ফলে পুশকিন, (Pouchkine), গোগোল (Gogol), তুর্গেনেভ (Tourgnéniev), টলষ্টয় (Tolstoi) প্রমুখ কবিগণের আবির্ভাব হইয়াছিল।

আর ভারতে? ভারতের ইতিহাস যখন উষার অনুদয়ে মলিন ও পাণ্ডুর, আমাদের দৃষ্টিশক্তি যখন কুহেলিকায় আচ্ছাদিত, সেই প্রাচীনতম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র মনীষাসম্পন্ন সুধীর অভ্যুদয় এই পুণ্য ভারতভূমিকে পুণ্যতর করিয়াছে; অনেকেই রাজপ্রসাদপুষ্ট ছিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসমুজ্জ্বলকারী ক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাস-বরাহমিহিরের নাম কে না জানেন? বহুশাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন কাব্যনাটক রচয়িতা শ্রীহর্ষদেবের নাম কাহার অবিদিত আছে? ভারতবর্ষের ম্লেচ্ছ বাদসাহ ও নবাবগণের নিকট বাণী ও তাঁহার বরপুত্রগণ অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত ছিলেন না। হিন্দুর শাস্ত্র ও ধর্ম্মপুস্তকসমূহ তাঁহাদের নিরবচ্ছিন্ন ঘৃণার সামগ্রী ছিল না। দারা শেকো উপনিষদসমূহের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। গৌড়ের মুসলমান নবাবগণের নিকট বঙ্গভাষা ও বঙ্গভাষার কবিগণ যে অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন তাহার পরিমাণ উপেক্ষণীয় নহে। তাঁহাদিগের নিকট আমাদের দেশের প্রাকৃতজনগণ ধর্ম্মশিক্ষার জন্য পরোক্ষভাবে ঋণী। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি শাস্ত্র—কত যে ধর্ম্মপুস্তক তাঁহাদের আনুকূল্যে অনুবাদিত হইয়াছিল "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পাঠে তাহা উপলব্ধি হইবে। নাসির শাহ, পরাগল খাঁ, সুলতান গিয়াসুদ্দিন, হোসেন শাহ প্রভৃতি নবাবগণের সাহিত্যানুরাগের বিষয় সকলেই অবগত আছেন। কুশাগ্রধী কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের মঞ্জুভাষার কুজনে যে শ্রুতিবিনোদ সঙ্গীতের সৃষ্টি হইত, তাহার তরঙ্গ দুইশতাব্দী কালের উপর দিয়া ভাসিয়া আসিয়া আজিও "পশিছে মরমে"।

কুচবিহার প্রদেশের নৃপতিবর্গ ও সাহিত্যানুরাগী কম ছিলেন না। মহারাজা প্রাণনারায়ণ (১৬২৫-৬৫ খৃঃ অঃ) লক্ষ্মীনারায়ণ, রূপনারায়ণ প্রভৃতি ভূপবৃন্দ কবি ও সাহিত্যামোদী ব্যক্তিদিগের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সংস্কৃতচর্চ্চার সুবিধার জন্য মহারাজা নরনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের আদেশে পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ মহাশয় "ছন্দোবদ্ধকারিকাবলী-ঘটিত ললিতকোমলপদাবলীবিশিষ্ট" "প্রয়োগরত্নমালা" ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন। আজিও গভর্ণমেণ্ট টাইটেল (Title) পরীক্ষায় তাহা পাঠ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপূর্ণ বিকাশ হয় মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের আমলে। তিনি নিজে কৃতবিদ্য ছিলেন। অতি যত্নের সহিত বঙ্গ ও পারস্যভাষার অনুশীলন করিয়াছিলেন। যৌবনে কতকগুলি গল্প (উপকথা) পদ্যাকারে রচনা করিয়াছিলেন। উত্তরকালে অনেকগুলি ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অতি পরিতাপের বিষয় যে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার বা কুচবিহারের নাম নাই। আমি ল্যান্‌স্‌ডাউন পুস্তকাগার হইতে অন্যূন ৪০ (চল্লিশ) খানি পুঁথি লইয়া পড়িয়াছি। আর বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের প্রকাশিত পুরাতন পুঁথির বিবরণও পাঠ করিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত পুঁথিগুলির কাব্য-সৌন্দর্য্য ঢের বেশী। বঙ্গসাহিত্য কুচবিহারের নিকট কম ঋণী নহে। এত দিনকার ঋণ অস্বীকৃত থাকা বিধেয় নহে।—

উপকথা। এখানি দ্বিতীয় "উপকথা" পাতার ভাঁজের মধ্যে একখানি আল্‌গা কাগজে লিখিত একটা দৈনন্দিন হিসাব পাওয়া গিয়াছে—সম্ভবতঃ লিপিকরের। উহা হইতে রচনার কাল নির্দ্ধারিত হইতে পারে।

৭ শ্রীশ্রীঈশ্বর সহায়।
সন ২৯৪ শকাব্দা
মতাবকে সন ১২১০ সাল
তে—২২শে আষাঢ়।

এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে ২৯৪ শকাব্দা কোচবিহার ভূপগণের অবলম্বিত রাজশক। ৯১৭ বঙ্গাব্দ, ১৪৩২ শকাব্দে

ও ১৫১০ খৃষ্টাব্দে কোচবিহারের প্রথম অধীশ্বর চন্দন রাজসিংহাসনে আরূঢ় হন। তাঁহার রাজ্যের প্রথম বৎসর হইতে রাজশকের গণনা আরব্ধ হইয়াছে। অতএব পুস্তক রচনার আনুমানিক কাল হইতেছে—২৯৪ রাজশক ১২১০—খৃঃ ১৮০৩—শকাব্দ ১৭২৫। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ২৭০ রাজশকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব এই পুঁথি প্রণয়ন করিবার সময় তাঁহার বয়স ছিল ২৪।২৫ বৎসর। একখানি আলগা কাগজের উপর নির্ভর করিয়া রচনাকাল নির্দ্ধারণ করা বিজ্ঞানসম্মত নহে স্বীকার করি, কিন্তু রচনার Style (ভঙ্গী) ও আখ্যানবস্তু প্রথম উপকথার মত হওয়ায় ২৯৪ রাজশক অথবা তাহার দুই এক বৎসর পূর্ব্বে গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা বিশেষ দোষের হইবে না। প্রথম "উপকথা" মন্ত্রীপুত্রের কালিকাস্তবে আমরা চৌত্রিশার ক্ষীণাঙ্কুর দেখিয়াছি। দ্বিতীয় উপকথার আরম্ভেই—শাখাপল্লবসুশোভিত পূর্ণাবয়ব চৌত্রিশাক্ষরে বিস্তৃত শিববন্দনা লক্ষিত হয়।

কপালি কলুস কাল কৃতান্ত দমক।
কামান্তক কিৰ্ত্তিবাস কৈবল্যদায়ক॥
*　　*　　*　　*　　*
ক্ষয় কর ভয়ে কহে হরেন্দ্র ভূপাল।
ক্ষয় হয় জেন মম এ জে মায়াজাল॥

চৌত্রিশাক্ষরে স্তব তখনকার পদ্যের একটী বিশিষ্ট অঙ্গ—poetic convention ছিল। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণ হইতে রায়গুণাকর পর্য্যন্ত সকল কবিই অল্প-বিস্তর ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্রীমন্ত সওদাগরের কমলেকামিনীর স্তব ও বিদ্যাসুন্দরের কালিকাস্তব বিশেষভাবে তুলনীয়। —সমগ্র চৌত্রিশাক্ষর স্তব উদ্ধৃত করিয়া ও গ্রন্থবর্ণিত গল্প বলিয়া পাঠকের ধৈর্য্য পরীক্ষা করিব না। শুধু দু' একটা কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব।

মহারাজার কর্ম্মচারী জয়নাথ মুন্সী তাঁহাকে একটী পারস্যদেশীয় গল্প বলেন। সেই গল্পই পদ্যে রচিত বর্ত্তমান "উপকথার" উপাদান।

জয়নাথ নাম, গুণ অনুপাম
মুনশি কার্য্যে সেবক।
তার প্রমুখাৎ, শুনিয়া পশ্চাৎ
আরম্ভিলাম এ কথাক॥

জয়নাথ মুন্সী (ঘোষ) পূর্ব্ববঙ্গের একজন কায়স্থ। তখনকার দিনে কলিকাতায় বেলা ৫টার সময় দার্জ্জিলিং মেলে চড়িয়া বসিয়া তৎপরদিন প্রাতঃকালে চক্ষুরুন্মীলন করিলেই কুচবিহার প্লাটফর্ম্ম নয়নগোচর হইত না। রেলপথ তো একরকম ছিল না। সুদূর কুচবিহার সম্বন্ধে অনেকেরই একটা অস্পষ্ট ছায়া ছায়া ধারণা ছিল—যাঁহাদের ভূগোলজ্ঞান অপেক্ষাকৃত বেশী তাঁহারা জানিতেন যে সেটা 'কাঙুর কামাখ্যার, দেশ মহাদেবের লীলাস্থল হীরা জীরার দেশ। সেই দূর অতীত কালে বঙ্গের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ বিপদসঙ্কুল পথঘাটের সমূহ বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া শুধু কুচবিহার কেন ভারতের অন্যান্য প্রদেশে গিয়া স্বীয় প্রতিভার বশে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর আসন গ্রহণ করিয়া খ্যাতি ও সম্মান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মুন্সী জয়নাথ সেই ধরণের লোক। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের সহিত হৃদ্যতা নিবন্ধন তাঁহার প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। ইনি "রাজোপাখ্যান" নামে কুচবিহার রাজবংশের একটী মনোরম ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। তাহা ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে রেভারেণ্ট আর রবিনসন সাহেব কর্ত্তৃক উহা ইংরাজীতে অনুবাদিত হয়।

২। স্কন্দপুরাণ—ব্রহ্মোত্তরখণ্ড।

পূর্ব্বোক্ত উপকথা দুইটির ভাব ও বিষয় স্থানে স্থানে মার্জ্জিতরুচির এতদূর বিরোধী হইয়া পড়িয়াছে যে তাহা পড়া যায় না। 'উপকথায়' আলোচনায় দেখাইয়াছি যে উদ্দাম যৌবনশোণিতের উষ্ণতা ও ভারতচন্দ্রের আদর্শ পূর্ব্বকথিত বিকৃতির উৎপাদক, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শোণিতের উপশমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক ধর্ম্মবুদ্ধির স্ফুরণ হইল। শান্ত, নির্ম্মল, বিরজঃ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নানাবিধ ধর্ম্মসঙ্গীত-পদ-প্রবন্ধ রচনায় ও ধর্ম্মপুস্তকানুবাদে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। মহারাজা একজন উচ্চ অঙ্গের সাধক ছিলেন। তাঁহার রচিত শ্যামাসঙ্গীতে একসময় কুচবিহারের আকাশ সর্ব্বদা ধ্বনিত হইত। মায়ের নামে কত শত ভক্তসন্তানের হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইত, কত অভিনব শক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত তাহা কে বলিবে? সে সঙ্গীতধ্বনি আর শ্রবণমূল স্পর্শ করে না। ক্বচিৎ কোথাও দূর পল্লীর অভ্যন্তরে অর্দ্ধাচ্ছন্ন জীর্ণ পর্ণকুটীরের মধ্যে বোধহয় তদপেক্ষা জীর্ণ কোন দরিদ্রবৃদ্ধের ক্ষীণকণ্ঠে আজি তাহার পরপারের পাথেয় জোগাইয়া ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝর্ অবিশ্রান্ত জলধারার শব্দের সহিত মিলিত হইয়া গীতগুলি আজিও বুঝি গীত হইতেছে! মধুর গীতগুলির পরিণতি এখন এই।

মনের আবেগে অনেক অবান্তর কথা বলিয়া ফেলিয়াছি পাঠকের নিকট তজ্জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। এখন গ্রন্থারম্ভের কথা বলি।—

নমো মৃত্যুঞ্জয় ভব ভয় বিনাশন।
নমো নীলগ্রীব নিত্যরূপ নিরঞ্জন॥
গৌরীশ গিরিশ ইশ বিশপান করি।
সর্ব্ব গর্ব্ব দুঃখহারি শ্মশান বেহারী॥
স্কন্দপুরাণেক ভাষা বন্ধে সুবচন।
করিব সকললোক বুঝান কারণ॥
বিঘ্নকর নিঘ্নহর দীগাম্বর স্বামী।
অতি মূঢ়মতি মন জ্ঞানহীন আমি॥

পদগুলি কিরূপ সুমধুর দেখুন।—অতঃপর বিষ্ণুবন্দনায় বলিতেছেন—

অচিন্ত্য অব্যয় আদি মধ্য অন্তহীন।
সূক্ষ্ম হনে সূক্ষ্ম পীন হনে পীন॥
তোমার চরিত্র চিত্র পবিত্র মহত।
রচিয়াছে বেদব্যাস স্কন্দ পুরাণত॥
প্রাকৃত মানবে তারে না পারে বুঝিতে।
এমতে বাসনা করি ভাষা বিরচিতে॥

* * * * *

প্রজাবর্গের ধর্ম্মপিপাসা মিটাইবার জন্য শাস্ত্রসমূহ "ভাষায়" অনুবাদিত হইয়াছিল। দুরূহ সংস্কৃতে নিবন্ধ থাকা প্রযুক্ত শাস্ত্রান্তর্গত উপদেশাবলি সাধারণ লোকের নিকট একপ্রকার অবরুদ্ধ ছিল। তাই দুর্ব্বোধ্য অর্দ্ধহস্তপরিমিত সমাসযুক্ত সংস্কৃত ভাষার নিগড় ভঙ্গ করিয়া! তদন্তর্নিবিষ্ট ভাবকে মুক্তি দিয়া, সরল সহজ ভাষার পরিচ্ছদ পরান হইয়াছিল। সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষে শাস্ত্রালোচনা এরূপ সুগম করিয়া দিবার পন্থা মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ

প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন এমন কথা বলিতে পারি না। —"প্রাকৃত" লোকসমূহের ধর্ম্মশিক্ষার সৌকার্য্যার্থে বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই ধর্ম্মপুস্তকের অনুবাদ হইয়াছিল। বাস্তবিক বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে এমন একটা যুগ আসিয়াছিল যখন কোন মৌলিক রচনাই লিখিত হয় নাই, অথবা ক্বচিৎ হইয়াছিল। তাহা অনুবাদের যুগেও বহুকাল ব্যাপিয়া এই যুগ ছিল। রাজপুস্তকাগারে (State Library) মার্কণ্ডেয় পুরাণের দুইখানি অনুবাদ দেখিয়াছি। তন্মধ্যে একখানি অতি পুরাতন। তারিখ ১৫২৪ শক=১৬০২ খৃষ্টাব্দ=৯২ রাজশকা তিন শত বৎসরের অধিক পুরাতন কোচবিহারের বঙ্গভাষায় নমুনা দেখুন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

বৃন্দারক বৃন্দের মুকুট যত্নমণি।
প্রফুল্ল কমলদল নয়ন দুখানি॥
পুরন্দর দর্পহর গোবর্দ্ধন ধর।
গোপীগণ কুসুম কানন মধুকর॥
তাহার দয়িতা দুই দেবী ভগবতী।
জয় মহালক্ষ্মী জয় মহাদেবী স্বরস্বতী॥
প্রণামো ভবানী দেবী চরণ কমল।
শিরে অর্দ্ধচন্দ্র কর্ণে মকর কুণ্ডল॥
গলে নাগহার শিরে শোভে জটাভার।
স্মরণে দুর্গতি সমুদ্র করে পার॥
*   *   *   *   *
মহারাজ বিশ্বসিংহ কমতা নগরে।
তার পুত্র ভোগে তুল্য নহে পুরন্দরে॥
*   *   *   *   *
একদিন সভামাঝে বসি যুবরাজ।
মনে আলোচিয়া হেন কহিলন্ত কাজ॥
পুরাণাদি শাস্ত্রে যেহি রহস্য আছয়।
পণ্ডিত বুঝয় মাত্রে অন্যে না বুঝয়॥
একারণে শ্লোক ভাঙ্গি সবে বুঝিবার।
নিজদেশ ভাষাবন্দে রচিয়ো পয়ার।
*   *   *   *   *
মহামায়া চরণ কমল মনে স্মরি।
রাজকুমারের আজ্ঞা মনে শিরে ধরি॥
বেদ পক্ষ বাণ আর শশাঙ্ক শকত।
আরম্ভ করিলোঁ মার্কণ্ডেয় কথা জত॥
জৈমিনি মার্কণ্ডেয় কহিলো তখন।
চারিগোট সংশয় মিলিল মোর মন॥

"বেদপক্ষবান সার শশাঙ্ক শকত"=৪২৫১। তারিখ গণনায় "অঙ্কস্য বামা গতি" এই নিয়মানুসারে আমরা ১৫২৪ পাই। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া লক্ষ্য করুন যে এই পয়ার "নিজদেশ ভাষাবন্দে" রচিত হইয়াছে। দু' একটী আসামী কথা ও ব্যাকরণের সামান্য বৈলক্ষণ্য ছাড়িয়া দিলে তিনশত বৎসরের পুরাতন বাঙ্গালা দেশের কোনও পুঁথির ভাষা ও এই ভাষার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখিতে পান কি? শঙ্করদেবকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ খাঁটি আসামী ভাষায় রচিত হইয়াছে। তথাচ তাহার অর্থগ্রহণে আমাদের কোন কষ্ট হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবত—১২শ খণ্ড (স্কন্ধ)।

ইতি সন ২৮৮ শকাব্দ।

৫৩৩ শ্লোক।

নাও এড়ি স্নাক্রত লজলত্ত বিবুদ্ধি।
জেন রোগি মরে কাছে আচন্তে ঔষধি॥
হাতর অমৃত এড়ি করে বিষপান।
হিয়াত কৃষ্ণক এড়ি ভজে দেব আন॥

ইহা দেখিয়া আমার মনে হয় পুরাতন বাঙ্গালা ও পুরাতন আসামী বস্তুতঃ অভিন্ন। যেটুকু বৈশিষ্টা (পার্থক্য) দেখা যায় তাহা ভাষার উপর "ভাথার" অলক্ষিত প্রভাবজনিত। এক্ষণে নানাকারণে যথা (Chauvirism অর্থাৎ প্রাদেশিক ঈর্ষা বশতঃ) সেই পার্থক্যের বিস্তার ঘটিয়া দুইটী বিভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ত্তমানে উত্তর ও দক্ষিণ আসামের মধ্যে যে রেষারেষি ভাব চলিতেছে তাহার ফলে অসমীয়া ভাষা আরও দুইটী স্বতন্ত্র ভাষায় না পরিণত হইয়া উঠিলে বাঁচি! এই প্রবন্ধে Grierson সাহেবের Linguistic Survey of India (ভারতবর্ষীয় ভাষা সমীক্ষণ)। এবং Brown ও Nicholl সাহেবের আসামী ব্যাকরণ দ্রষ্টব্য।

৩। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ। ৩২৬ রাজশক=১৮৩৫ খৃঃ—১৭৫৭ শক=বঙ্গাব্দ ১২৪২। রচনার কাল একটী সংস্কৃত স্রগ্ধরা শ্লোকে ও বাঙ্গালা পয়ারে নিরূপিত হইতেছে।

শ্রীলশ্রীশ্রীহরেন্দ্রবিলসতিভুবনে কীর্ত্তিচন্দ্রোনরেন্দ্র
স্তবক্ত্রক্কেশবাক্যামৃতরচিত পদব্যাং লিখৎ পোস্যদীনঃ।
৬ ২ ৩
শাকে বেদাঙ্গপক্ষে শর-নয়নমিতে বৈশ্যসিংহ কর্ম্মজ্ঞে
দেবানন্দঃ শ্রিয়েতল্লগতি সুরপতিঃ সূর্য্যথাতন্নিদেশাৎ॥

আমিও "যদৃষ্টং তল্লিখিতং" করিয়াছি। ভুলচুক যাহা আছে তজ্জন্য দায়ী নহি।

৬ ২ ৩ বাঙ্গালা পয়ার।

ঋতু ভুজ হরনেত্র বিশ্বসিংহ শাকে।
বারোশ বেয়াল্লিশ সন লোকে বলে যাকে।
সেহি সময়ত এহি পদ চারুতর।
বিরচিল শ্রীলশ্রীহরেন্দ্র নৃপবর॥

নমুনা—

নমস্তে কালিকে, ত্রিলোক পালিকে, হে শিব মালিকে,
শ্যামা বিমলা।

ত্রিগুণধারিণী, ত্রিতাপহারিণী, নমস্তে তারিণী,
ভীমা বগলা ॥
হরউরুস্থিতা, সর্ব্বগুণান্বিতা, পরম অমিতা,
বট আপনে।
প্রসীদ ঐশানী, ওমা, ভবরাণী,
শ্মশানবাসিনী, এ দাস জনে ॥

৪। ক্রিয়া যোগসার—রাজশক ৩২২, = বঙ্গাব্দ ১২৩৮ = শকাব্দ ১৭৫৩ = খৃষ্টাব্দ ১৮৩১। ভাষা পূর্ব্বের মত। অতএব কতকগুলি নমুনা উদ্ধৃত করিয়া আপনাদের সময় নষ্ট করিব না।

মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ ও তাঁহার বংশকর্ত্তৃগণ দ্বারা নিযুক্ত, কুচবিহার, আসাম, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালাবাসী কবিগণ যে সমস্ত পদ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।*

শ্রীকালীপদ মিত্র।

স্বরলিপি।

আলাইয়া—একতালা।

নব বর্ষ এল আজি তাঁহারি প্রভায়।
ধন্য হল গত বর্ষ তাঁহারি কৃপায়।
জাগ, উঠ যত জীব, আসিছেন সদাশিব,
ঘুমায়ে থেকনা আর অশিব মায়ায়।
পূরব গগন গায়, দেখ প্রভা, কি শোভায়,
অভয় করুণা-ধারা ক্ষরিছে ধরায়!
উঠরে তুলরে ফুল, চল হয়ে প্রেমাকুল,
ভকতি চন্দন লহ যে আছ যথায়।
ত্রিফল ত্রিপদ দল চল সবে লয়ে চল,
আবাহন করিবারে দেব দেবতায়।
আছ কেন অচেতনে, উঠ পাবে সচেতনে,
জীবন সফল তরে উঠরে ত্বরায়।
চির আরাধিত যিনি পাবে গো তাঁহায়।

* মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের গ্রন্থাবলী কোচবিহার সাহিত্য-সভা কর্ত্তৃক সত্বর মুদ্রিত হইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

রচয়িতা—অজ্ঞাত। স্থর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

২´
II সা´ -ন সা´ ধা | পা -া ধপা | মা -পা মা | গা -া -মগা I
ন • ব ব • র্ষ• এ • ল আ • জি•

২´ ৩ 0 ১
I রা -গা রা | গমা -পা মা | গা -মগা -রা | -া -া া I
তাঁ • হা রি• • প্র ভা •• • • • য়

২´ ৩ 0 ১
I সা -া সা | মা -গা মা | পা -া পা | ধা -া না I
ধ • ন্য হ • ল গ • ত ব • র্ষ

২´ ৩ 0 ১
I সা´ -া রা´ | স´রা´ -গা´ রা´ | সা´ -না -ধা | -পা -ধা- -না II
তাঁ • হা রি• • কৃ পা • • • • য়

২´ ৩ 0 ১
II{ পা -া পা | না -ধা না | সা´ -া রা´ | সা´ -া সা´ I
জা • গ উ • ঠ য • ত জী • ব

২´ ৩ 0 ১
I সা´ -ধা না | সা´ -া রা´ | সা´ -না স´না | ধা -ণা ধা I
আ • সি ছে • ন স • •দা শি • ব

২´ ৩ 0 ১
I পা -ধা পা | মা -গা -মা | পা -া পা | ধা -া না I
ঘু • মা য়ে • থে ক • না আ • র

২´ ৩ 0 ১
I সা´ -া রা´ | স´রা´ -গা´ রা´ | সা´ -না- -ধা | -পা -ধা- -না II
অ • শি •ব • মা য়া • • • • • য়

২´ ৩ 0 ১
II সা -পা পা | পা -া ধপা | মা -পা মা | গা -া মগা I
(১) পূ • র ব • গ• গ • ন গা • য়•
(২) ত্রি • ফ ল • ত্রি• প • দ দ • ল•

২´ ৩ 0 ১
I রা -গা রা | গমা -পা মা | গা -মগা রা | সা -া সা I
(১) দে • খ প্র• • ভা কি •• শো ভা • য়
(২) চ • ল স• • বে ল •• য়ে চ • ল

I সা -া সা | মা -গা মা | পা -া পা | ধা -ণা ধা I
(১) অ • ভ য় • ক স্ক • ণা ধা • রা
(২) আ • বা হ • ন ক • রি বা • রে

২´ ৩ ০ ১
I পা ধা পা | মা -গা মা | পা -া -া | -া -া -া I
(১) ক্ষ • রি ছে • ধ রা • • • • য়
(২) দে • ব দে • ব তা • • • • য়

২´ ৩ ০ ১
I{ পা -া পা | না -ধা না | র্সা -া র্রা | র্সা -া র্সা I
(১) উ • ঠ রে • তু ল • রে ফু • ল
(২) আ • ছ কে • ন অ • চে ত • নে

২´ ৩ ০ ১
I র্সা -ধা না | র্সা -া র্রা | র্সা -না র্সনা | ধা -ণা ধা }I
(১) চ • ল হ • য়ে প্রে • মা• কু • ল
(২) উ • ঠ পা • বে স • চে• ত • নে

২´ ৩ ০ ১
I পা -ধা পা | মা -গা মা | পা -া পা | ধা -া না I
(১) ভ • ক তি • চ ন্দ • ন ল • হ
(২) জী • ব ন • স ফ • ল ত • রে

২´ ৩ ০ ১
I র্সা -া র্রা | র্সর্রা -র্গা র্রা | র্সা -না -ধা | -পা -ধা না II
(১) বে • আ ছ• • য থা • • • • য়

২´ ৩ ০ ১
II র্সা -া র্রা | র্সা -া র্সা | না -র্সা -না | -ধা -ণা -ধা I
(২) উ • ঠ রে • ত্ব রা • • • • য়

২´ ৩ ০ ১
I পা -ধা পা | মা -গা মা | পা -া পা | ধা -া না I
(২) চি • র আ • রা ধি • ত ঘি • নি

২ ৩ ০ ১
I র্সা -া র্রা | র্সর্রা -র্গা র্রা | র্সা -না -ধা | -পা -ধা -না II II
(২) পা • বে •গো • তাঁ হা • • • • য়

রাগিণীর পরিচয় :—

ইহাতে সাত সুর লাগিয়াছে ; অতএব ইহা সম্পূর্ণ। গান্ধার বাদী। নিখাদ ও রেখাব অনুবাদী। পঞ্চম ও ধৈবত সমবাদী। কোন ২ ওস্তাদকে কোমল নিখাদও দিতে দেখিয়াছি। ইহার ঠাট ;—

গ র প ধ ন র্স র্স ন ধ প ম গ র স।

তালের পরিচয় :—

১২ মাত্রার তাল। তিনটী তাল ও একটী ফাঁক। প্রতি তালে তিনটী করিয়া মাত্রা থাকে। ইহা সমপদী তাল। ঠেকা :—

২´ ৩ 0 ১

II ধিন্ ধিন্ ধা | ধা থুন্ না | ক ত্তে ধাগে | তেটেকেটে ধিন্ ধা II

॥ খুব তার নাম্ । বেশ্ ধুম্ ধাম্ । কয় দিন্ পরে । সকলি সুম্ সাম্ ॥

মঙ্গল মঠ।

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের চুম্বক :—বিকানীরের প্রসিদ্ধ ভাস্কর চিত্তরঞ্জন দেবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা প্রতিভাশালী তরুণ শিল্পী নিরঞ্জন দেব বোম্বাইয়ে বল্লভাচারী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত মঙ্গল-মঠ দেবালয়ের শিল্প সংস্কার কার্য্যের জন্য দুইজন সহযোগী ভাস্কর সহ বোম্বাই আসিয়াছিল, একদা ঘটনা-প্রসঙ্গে এক অনূঢ়া কিশোরী বঙ্গ-সুন্দরীর আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য ও মহত্ব-মধুর ব্যবহারে চমৎকৃত হয়। এ দিকে বালিকাও নিরঞ্জনের উদার মহানুভবতা তেজস্বী সুন্দর চরিত্র গৌরব ও উন্নত-কোমল মহাপ্রাণতার নানাবিধ পরিচয় পাইয়া মনে মনে মুগ্ধ হয়। দুই জনের নানা ঘটনার ভিতর দিয়া—দূর হইতে নীরবে পরস্পরের হৃদয়ের প্রতি উচ্চ শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম ও সহানুভূতিতে অজ্ঞাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

বালিকার নাম মায়া; সে পিতৃ মাতৃহীনা, তাহার অভিভাবিকা দরিদ্রা বিধবা দিদিমা, উচ্চপণে দৌহিত্রীর বিবাহ দিতে অসমর্থা হইয়া, বোম্বাইয়ে দয়ালু আত্মীয় হৃষীকেশ বাবুর আশ্রয়ে আসিয়া রহিয়াছেন হৃষীকেশ বাবু তাঁহার দূর সম্পর্কীয় পিতৃব্য বেদান্ত বাগীশ মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া মায়ার বিবাহে উদ্যোগী হইয়াছেন, বিনাপণে বিবাহ করিতে সম্মত একটি শিক্ষিত দরিদ্র-সন্তান পাত্রও সম্প্রতি জুটিয়াছে। বিবাহের দিনও স্থির হইয়াছে।

পিতৃমাতৃহীনা বালিকা মায়ার পারিবারিক দুঃখ দারিদ্রের সংবাদ নিরঞ্জনের হৃদয়ে গভীর সমবেদনা জাগাইয়া তুলিল। একদা কোন সূত্রে, অন্তরালবর্ত্তিনী মায়ার গোপন-হৃদয়ের, ক্রন্দন-ব্যাকুল, হতাশা বেদনার আক্ষেপ রাগিণী শুনিয়া, নিরঞ্জনের তরুণ কোমল প্রাণ বিস্ময়-বেদনায় যুগপৎ বিহ্বল-অভিভূত হইয়া পড়িল! তাহার সমস্ত চিত্তশক্তি মূঢ় আবেগ-বিভোরতায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। তাহার কার্য্যে, চিন্তায়, শিল্পের রেখা-বন্ধনে সেই হৃদয়মনব্যাপী, সংহত শ্রদ্ধাবেগের সংস্কৃত-সঙ্গীত ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। বাহিরের মানুষ সে রহস্যের মর্ম্ম বৈচিত্র্য বুঝিল না। নিরঙ্কুশ পরিহাস প্রিয় চপল-স্বভাব সহকর্ম্মীদ্বয়, তাহার ভাবমুগ্ধ প্রকৃতির ও শিল্পচর্চ্চার অদ্ভুত অসামঞ্জস্যতার ত্রুটি উল্লেখে কৌতুকবিদ্রূপ করিতে লাগিল। নিরঞ্জন বেদনার নিঃশ্বাস চাপিয়া সস্নেহে ক্ষমার হাসি হাসিয়া নীরব রহিল।

ঘটনা-প্রসঙ্গে পরিচয়ের জের ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল। চিত্তবৃত্তির গতি বৈলক্ষণ্যে উভয় পক্ষই অন্তর মধ্যে নৈতিক দ্বন্দ্ব সংশয়ের ধাক্কা খাইয়া মনে মনে ব্যস্ত-চঞ্চল হইল-উঠিল, বিশেষ করিয়া—বিপন্ন কুণ্ঠিত হইল নিরঞ্জন! তাহার সুকুমার হৃদয়ের মধ্যে যে অভিনব ভাবোন্মাদনার স্পর্শাভিঘাত জাগিয়াছিল, তাহার আশ্চর্য্য প্রভাবে সে অনেকটা আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিল।—]

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অনেকটা বেলা হইয়া গিয়াছিল। দিদিমা অনেকক্ষণ হইল ঠাকুরবাড়ী হইতে আসিয়াছেন, তাঁহার মালা-জপ আহ্নিক পূজা সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তিনি এখনও রান্নাঘরে আসেন নাই। আজ রবিবার, আফিস বন্ধ। হৃষীকেশ বাড়ীতে আছেন,—কিন্তু তাঁহাকে এখনই কার্য্যোপলক্ষে কোথায় বাহির হইতে হইবে। মায়ার বিবাহ সম্পর্কীয় কোন একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য তিনি দিদিমাকে ডাকিয়াছেন, বৌদিদিও সেখানে গিয়াছেন,—মায়া দিদিমার বাটনাটুকু বাঁটিয়া, সামান্য রন্ধনের সামান্য আয়োজনটুকু গুছাইয়া, তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় রান্নাঘর আগ্‌লাইয়া বসিয়াছিল, মমতা রান্নাঘরের রোয়াকের পাশে খেলাঘর পাতিয়া,—খেলা করিতেছিল।

উনানের আগুন জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, আবার নূতন করিয়া কয়লা দেওয়া হইল, সে কয়লাও ধরিয়া আসিল, কিন্তু এখনও দিদিমার দেখা নাই—মায়া অস্থির হইয়া উঠিল, সেই পরামর্শ-সভার মাঝে নিজে গিয়া দিদিমাকে ডাকিতে লজ্জা হয়,—বাহিরে আসিয়া মমতাকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিল, "মমু লক্ষ্মীমেয়ে, যাও ত বড় মাকে ডেকে নিয়ে এস, বল উনুন ধরে গেছে—"

খেলাঘরের কাজকর্ম্ম লইয়া মমু অত্যন্তই ব্যস্ত ছিল, কিন্তু পিসিমার কথা অবজ্ঞা করিতে পারিল না,—তখনই পিতার শয়ন কক্ষের দিকে ছুটিল। মায়া দিদিমার আহ্নিকের ঘরে ঢুকিয়া আলোচাল ও রন্ধনের জল বাহির করিতে গেল। দিদিমার জিনিস-পত্র সমস্ত আহ্নিকের ঘরে স্বতন্ত্র থাকিত।

জলের ঘড়া 'কাৎ' করিয়া মায়ার চক্ষুস্থির হইল, কোথায় জল! যেটুকু জল আছে, তাহাতে ভাতে-ভাত সিদ্ধ হওয়া দূরের কথা—সামান্য তৃষ্ণা নিবারণ হওয়া সম্ভব নহে।

দুঃখে, ক্ষোভে, মায়ার চোখ ফাটিয়া জল আসিল! দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইতে চলিল, ইহার পর দিদিমা দীর্ঘিকা হইতে জল আনিবেন, তবে রান্না চড়িবে!

কিন্তু নিষ্ফল ক্ষোভ! কাহার উপর অভিমান করিবে? এ মর্ম্মন্তুদ মর্ম্ম-বেদনা মর্ম্মের মধ্যেই নিঃশেষে নিষ্পেষণ করিয়া,—নিজের মধ্যেই নিষ্ঠুর সতেজ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে, দুরবস্থার দুঃখে,—দুর্ব্বল দৈন্যে, বসিয়া কাঁদিলে কি হইবে?—ইহার মধ্যে ক্রন্দনের অবসর নাই!

মায়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দিদিমা এখনও আসেন নাই, মমুও তাহাকে ডাকিতে গিয়াছে কিন্তু ফিরে নাই।—মায়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া নিজেই চলিল। নিজের রন্ধন ভোজনের ন্যাটা দিদিমার পক্ষে বড়ই ক্লান্তি ও অস্বস্তিকর, ধরিয়া-বাঁধিয়া না করাইলে তিনি হয়ত আজ রন্ধনেই সম্মত হইবেন না!

হৃষীকেশের শয়নকক্ষের দ্বারপার্শ্বে দিদিমা বসিয়াছিলেন, তাঁহার মুখ দেখিতে পাওয়া গেল না, কিন্তু মায়া অনুমানে বুঝিল,—তিনি অশ্রুমোচনে ব্যাপৃতা, মায়া থমকিয়া দাঁড়াইল, আর অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না।

হৃষীকেশ বলিতেছেন শোনা গেল,—"না দিদিমা, ওটুকু হতে পারে না! আমার বাড়ী থেকে বিয়ে হচ্ছে, সমস্ত খরচটাই আমার দেওয়া উচিত……অন্ততঃ বিয়ের রাত্রের খরচটা, নাঃ, ও আমি কিছুতেই নিতে পারব না!—"

বৌদিদিও সেই কথার সমর্থন করিয়া মৃদুস্বরে কি বলিলেন। মমতা পিছন হইতে পিতার পিঠের উপর পড়িয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ক্ষুব্ধ করুণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল "হ্যাঁ বাবা, পিসিমা কেমন করে ঘোমটা পরে বৌ সাজ্‌বে?—"

হৃষীকেশ হাসিয়া বলিলেন "যা মমু বিরক্ত করিস্‌ নে, তাপর শোন দিদিমা……"

মায়ার আর কিছু শুনিবার ইচ্ছা ছিল না, সে ধীরে ধীরে ফিরিল। রান্নাঘরের সম্মুখে আসিয়া চৌকাঠের কাছে বসিল, দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া ক্ষণেক কি ভাবিল,—অজ্ঞাতে একটা ক্ষুন্ন নিঃশ্বাস পড়িল, দূর হউক; উদ্যত আত্মাভিমান প্রতিপদে পীড়িত-লাঞ্ছিত হইয়া,—তাহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিবার উপক্রম করিতেছে, সে আর পারে না, কোন দিকে চোখ কান দিবে না. তাহার কি দায়!—যাহার যতটুকু মাথাব্যাথা তিনি ততটুকু যন্ত্রণা ভোগ করুন,—সে কেন নিজেকে নিমেস্তের ভাগিনী ঠাহরাইয়া হুতাশে হাঁপাইয়া মরে?—সত্যইত, সে কে?—

চুলায় যাউক দুঃসহ চিত্তগ্লানি,—এখন দিদিমার জলের কি হয়?—মায়া সজোরে উঠিয়া দাঁড়াইল, না,' তাহার পক্ষে কঠিন আর কি? নিজে পাচে কাহারও চোখে পড়িয়া যায়, এই চিন্তাটাকে বড় করিয়া দেখিয়া—সঙ্কোচ সন্ত্রস্ত হইয়া প্রয়োজনকে অবহেলা করিয়া লুকাইয়া থাকিবার সুযোগ তাহার নাই, সমস্ত অস্বস্তিদ্বন্দ্ব-উৎসন্ন যাক, সকল অশান্তিকে সে সন্তোষের সহিত গ্রহণ করিতে বাধ্য!

ঘড়া লইয়া রান্নাঘরে শিকল চড়াইয়া, মায়া নিঃশব্দে বাড়ী হইতে বাহির হইল। সঙ্গে কেহ নাই,—সেই দীঘির দূর পথ। কিন্তু ইতস্ততঃ করিলে চলিবে না, জল আনিতে-ই হইবে!

আর একদিন প্রাতের সেই জল আনার কথা মনে পড়িল, অলক্ষিতে তাহার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল, চকিত দৃষ্টিতে এ দিক ওদিক চাহিয়া মায়া ঈষৎ দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

স্বর্গ সভার উন্নত-গৌরব-সম্ভ্রম-মণ্ডিত,—সেই অনিন্দ্যনীয় সুন্দর প্রকৃতির তরুণ দেবকুমার নিরঞ্জন,—তাহার প্রত্যেক চরণরেণু টি-ও সুদূর হইতে সসম্ভ্রমে বন্দ্যনীয়! সে বিদেশী, অপরিচিত, সামান্য একজন ভাস্কর মাত্র,—কিন্তু কি আশ্চর্য্য তাহার স্বভাব? তারুণ্যের তেজস্বী জীবনোচ্ছ্বাস তাহার চতুর্দ্দিকে কি সচ্ছল-মুক্ত স্রোতেই অবিশ্রাম বহিয়া যাইতেছে, পৃথিবীর কোন মালিন্য তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সৌন্দর্য্যে, আনন্দে, প্রসন্ন-শান্তি গরিমায় তাহার নবীন জীবন কি উজ্জ্বল মহিমাময়! কি প্রখর শক্তি-সামর্থ্যে পরিপূর্ণ!

ভাবিতে ভাবিতে গতকল্য বৈকালের কথা মায়ার মনে পড়িল,—প্রতিবেশিনী ভাটিয়া বণিক বধূগণের সহিত সে মঙ্গল-মঠের ভিতর দেবদর্শনে গিয়াছিল দেবালয়ের বহির্বাটীর প্রাঙ্গনে আর একদল পরিচিতা মহিলার সাক্ষাত পাইয়া ভাটিয়া রমণীগণ সেইখানে আটক পড়েন, বাধ্য হইয়া মায়াও অগত্যা দাঁড়ায়। মহিলাগণ পরস্পরের গলার গহনা, হাতের গহনা পায়ের গহনার গঠন-পারিপাট্যের সূক্ষ্মতত্ত্ব বিশ্লেষণে অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, গহনার আলোচনা হইতে বেশবিন্যাসের আলোচনা আসিল, আরও কত মাথামুণ্ড কাহিনীর অসম্বন্ধ একঘেয়ে প্রলাপ চলিল, মায়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, ইহারা দেবালয়ে আসিয়া কহিতেছেন কি!—মায়া অসহিষ্ণুভাবে মুখ ফিরাইয়া ইতস্ততঃ চাহিতেছিল, সহসা ওকি!—আদিত্য, সনাতন ও নিরঞ্জন,—সারাদিনের রৌদ্র শুষ্ক, ক্লান্ত মলিন মূর্ত্তিতে ভিতর হইতে আসিতেছেন, আহা তাহাদের দিকে চাহিলে মায়া হয়! মায়া নিজের অজ্ঞাতে মর্ম্মে-মর্ম্মে ক্লিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, অন্যমনে তাহাদের দিকে চাহিয়াছিল। তাহারা কথা কহিতে কহিতে আসিতেছিল, স্ত্রীলোকদের লক্ষ্য করে নাই, শেষের দিকটায় আদিত্যের মুখপানে চাহিয়া—আবেগরক্তমুখে নিরঞ্জন বলিতেছেন—স্পষ্ট শোনা গেল "পৃথিবীকে অকৃতজ্ঞ বলে গাল দেবার আগেই যেন, রক্তের তেজে

সত্যিকার পরার্থপরতা সাধন ক'রে, পৃথিবীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে পারি......"—মায়ার কানে সে কথাটা এখনও তেমনি স্পষ্ট—তেমনি মর্ম্মস্পর্শী সুরে—সমানে ধ্বনিত হইতেছে!—নিরঞ্জনের কথার মধ্যে তাহার মনের যে দৃঢ়-প্রত্যয়-শীল, প্রীতিসুন্দর কান্তিটুকু ফুটিয়া উঠিল, মায়া তাহাতে মুগ্ধ আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল! পরমুহূর্ত্তে-ই নিরঞ্জন তাহাদের দেখিতে পাইয়া সসম্ভ্রমে দৃষ্টি নত করিল, তরুণ যুবার সে নম্র-সুন্দর দৃষ্টি অবনমন ভঙ্গী কি চমৎকারই দেখাইয়াছিল!—কিন্তু পরক্ষণেই তাহার সহযোগীদের সেই বিষাদ-লাঞ্ছিত তীক্ষ্ণ-উজ্জ্বল কটাক্ষ—মায়ার মর্ম্মে মর্ম্মে একটা অপমান-বেদনার ধিক্কার ঝঙ্কনা হানিয়া গিয়াছিল, মায়া ত্রস্ত হইয়া আত্মগোপন করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল,—রমণীগণের অন্তরালে।

কিন্তু তবু সে দেখিয়াছিল, নিরঞ্জনের সেই সৌজন্য-মধুর মনোহর আচরণটুকু! সে কি কোমল-ভদ্রতার সহিত-ই সঙ্গীদের দিকে ফিরিয়া অস্ফুটস্বরে কি ইঙ্গিত করিয়া, চাকরদিগের ক্ষুদ্রদ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল, সেই-টুকু আচরণের মধ্যে তাহাকে কি মহৎ—কি অপরূপই দেখাইল! মায়ার প্রাণ সেইখানেই অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি-পুলকে ভরিয়া উঠিয়াছিল, সে তাহার ক্ষুদ্র ব্যবহারের মধ্যে চিত্তের সমগ্র সৌন্দর্য্যটা দেখিতে পাইয়াছিল, তাহা কত উন্নত, কত চমৎকার!

মায়া ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছিল, নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরের রৌদ্রঝলসিত পথ তখন জনশূন্য। একেত এ স্থানটা সহরের বাহিরে বলিলেই হয়, গাড়ী-ঘোড়ার হুড়াহুড়ী এ অঞ্চলে নোটেই নাই, শুধু সকাল-সন্ধ্যায় পথে জনসমাগম হইত—একটু বেশী; অন্য সময় কচিৎ দুই চারিজন আনাগোনা করে মাত্র; এ অঞ্চলটা অনেকটা বাঙ্গলার পল্লীগ্রামের মত।

নিস্তব্ধ-মধ্যাহ্নের উদাস-পবন হু হু করিয়া বাহিয়া যাইতেছিল, রাস্তার দুই পাশে গাছগুলার ডালে উপবিষ্ট, নানা ভাষায় কিচ্‌মিচ্ রবকারী অসংখ্য পক্ষীকণ্ঠের সঙ্গে, বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর শব্দ মিশিয়া এক অপূর্ব্ব ঐকতানের সৃষ্টি করিয়াছিল। দূরে নারিকেল গাছে বসিয়া নূতন ধূপে শুষ্ককণ্ঠ দুইটা কাক 'কা—কা—' করিয়া ক্লান্তভাবে চীৎকার করিতেছিল। আর তাহারই পাশে একটা আমগাছের ডালে, ঘনপল্লবিত পত্রান্তরে আত্মগোপন করিয়া, একটা কোকিল বেদনাকরুণকণ্ঠে ডাকিতেছিল 'কু—হু।'

আঁকা বাঁকা সরু পথটি ধরিয়া মায়া চিন্তামগ্ন চিত্তে ঘাটের কাছাকাছি আসিয়া পড়িল, ঘাটের দুই পাশে নানাবিধ বন্যবৃক্ষ গজাইয়াছিল, একটু দূর হইতে ঘাটের লোক দেখা যাইত না, আড়াল পড়িত।

চলিতে চলিতে মায়া, ঘাটের অদূরে ঝোপের কাছে আসিয়া পড়িল, সেইখান হইতে ঘাট বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল, সহসা উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দে চমকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া,—মায়া, বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল! অন্তরের সবেগে প্রবাহিত চিন্তা স্রোত, অকস্মাৎ অটল উন্নত, দৃঢ় পাষাণ-প্রাকার বক্ষে আহত, বর্ষাস্ফীত নদস্রোতের মত মুহূর্ত্তের জন্য সংঘাত-স্তম্ভিত হইয়া—পর মুহূর্ত্তে উন্মাদ-বিপ্লবে দুরন্ত ঘূর্ণীপাকের সৃষ্টি করিল—অন্তরেই,—নিঃশব্দে!

ঘাটে রহিয়াছে—সেই তিন জন ভাস্কর!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

এ কি অপ্রত্যাশিত ঘটনা-সংঘটন! নিরঞ্জন এখানে?—মায়া স্তম্ভিতনয়নে চাহিয়া প্রস্তর মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল! ভুলিয়া গেল,—নিজের কথা!

সনাতন, আদিত্যকে সাঁতার শিখাইতেছিল; আদিত্য ব্যর্থচেষ্টায় তুমুলআস্ফালনে হস্ত পদ ছুড়িয়া জলরাশি উৎক্ষিপ্ত করিয়া চতুর্দ্দিকে ছিটাইতেছিল, তাহার ব্যগ্র ব্যাকুলতায় হাস্যোদ্দীপক সন্তরণ চেষ্টা দেখিয়া সনাতন সপরিহাসে উচ্চহাস্য করিতেছিল, তাহার বিদ্রূপের তাড়নায়, এবং জলের মধ্যে অতিরিক্ত লম্ফ ঝম্ফে শ্রমক্লান্ত আদিত্য, নিজেও হাঁপাইতে হাঁপাইতে হাসিতেছিল! সে অত শ্রান্ত হইয়াছে, তবুও হাসি ছাড়ে নাই!— নিমেষ মধ্যে আত্মবিস্মৃতা মায়ার মুখচোখ স্নিগ্ধ কৌতুকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—নাঃ ইহাদের স্বভাবকে অশিষ্টতাপূর্ণ বলিয়া গালি দিলে অন্যায় করা হয়! ইহাদের জীবনটা বুঝি শুধু নির্ভীক-স্বচ্ছ সরলতায় গঠিত!—তাহার মধ্যে সম্ভ্রম-শিষ্টতা না থাক, কিন্তু কাপট্যের ছলনা নাই! কোথা হইতে থাকিবে, ইহারা যে নিরঞ্জনের বন্ধু!—মায়ার মস্তিষ্কে, গতকল্য ইহাদের সম্মান-লেশ-বর্জ্জিত কটাক্ষ বিক্ষেপে—যে আক্ষেপের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝলসিয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহা চকিতে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল, নাঃ, ইহাদের উপর রাগ করা চলে না!—কোনমতেই না!

আর নিরঞ্জন?—সেই অপরিচিত বিদেশী, সেই এক নিমেষের—চকিত দৃষ্টির, সূক্ষ্ম-অনুভূতির-স্পর্শ-সম্বন্ধে পরিচিত, সেই অপূর্ব্ব রহস্য লোকের রাসশ্রী-সুন্দর নিরঞ্জন,—সে তখন স্নান করিয়া উঠিয়া, সোপানের উপর দাঁড়াইয়া মাথা মুছিতে মুছিতে, শিবস্তোত্র আবৃত্তি করিতেছিল,—তাহার অধরে স্নিগ্ধ-কোমল মৃদু হাস্য রেখা,—বুঝি সঙ্গীদের কাণ্ড দেখিয়া!

মায়া দিদিমার জলের কথা ভুলিয়া গেল, আপনার কথা ভুলিয়া গেল, বিশ্বের কথা ভুলিয়া গেল! অবশ চরণে সবলে স্পন্দিত হৃদয়ে বিস্ময়-মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল!—তাহার দৃষ্টি সমক্ষে উজ্জ্বল শোভায় বিকশিত হইয়া উঠিল—এক জীবন্ত উচ্ছ্বাস পূর্ণ আনন্দ-সুন্দর অপার্থিব লীলাবৈচিত্র্য!—মায়া অভিভূত হইয়া গেল।

আদিত্যকে জল হইতে টানিয়া তীরের দিকে ঠেলিয়া দিয়া সনাতন বলিল "এই নাও, তীরস্থ হও!—" পরক্ষণে হাসিয়া,—মেয়েলী ধরণে তাহার চিবুক ধরিয়া চুমা খাইয়া, বলিল "আহা ষাট্ ষাট্ মার বাছা! কিছু মনে করিস নি ভাই!"

হাঁপানি এবং হাসির ঠেলায় আদিত্য তখন অধীর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার কিছু মনে করিবার সাবকাশ ছিল না, ঘাটে উঠিয়া বসিয়া পড়িল, একটু দম লইয়া, আত্মত্রুটি সংশোধন চেষ্টায়, কৈফিয়ৎ দিল, "কি জানিস ভাই, জলের ভেতর হাল্কা হয়ে ভাস্‌তে পারিনা—ডুবে যাই কেবল, তাইত দম বন্ধ হয়ে আসে!"

সনাতন ব্যঙ্গ করিয়া বলিল "তাত আস্‌বেই, শিবত্ব লাভ কি সহজ কথা গা! ভগবতী পার্ব্বতী যাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে তপস্বিনী সেজেছিলেন……—।

"কস্ত্বং বর্ব্বর শ্রেষ্ঠ"—আদিত্য লাফাইয়া জলে পড়িয়া অতর্কিতে তাহার পৃষ্ঠে প্রবল মুষ্ট্যাঘাত বসাইল!—সনাতন পৃষ্ঠদেশ বক্র-সঙ্কুচিত করিয়া বলিল "বাপ কি ভয়ানক সম্মান বোধ রে!—গুরুত্বের চাপে আমার দাঁড়াটা ভেঙ্গে গেল!

"নিবেদয়ামি চাত্মনং" বলিয়া প্রনাম সমাপ্ত করিয়া নিরঞ্জন বলিল "অতঃপর জলযুদ্ধটা স্থগিত রাখ্‌লে হয় না?"

"এর মধ্যে?"—আদিত্য ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল "এই ত, মোটে বসন্ত রঙ্গ ভূমিতে নেমেছেন!—জানিস তো—

"বাপী জলানাং মণি মেখলানাং শশাঙ্ক ভাসাং………ঐ যাঃ ভুলে গেলুম! কিরে নিরুদা কি বলত ভাই!—"

একটু কাশি.. নিরঞ্জন বলিল "সে আর বলে না, থাক"

সনাতন সোৎসাহে বলিল "হাঁ বলিস না, খবর্দ্দার নিরু," আদিত্য শ্লেষ ভরে বলিল "আঃ, জানিস বলে তোর ভারি অহঙ্কার, সাধ করে বলি……" সে বাকী কথাটা উহ্য রাখিয়া গেল। অহঙ্কারের অপবাদে বিচলিত হইয়া নিরঞ্জন হাসিয়া—বলিল "কি ছাই ভস্ম বলব ?

"ঐ, 'বাপী জলানাং মণি মেখলানাং শশাঙ্ক ভাসাং—'তা পর ?"

নিরঞ্জন মৃদু হাসিয়া, স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধ কোমলকণ্ঠে বলিল

… ……………………………………"প্রমদা জননাম্

চূত দ্রুমানাং কুসুমানতানাং দদাতি সৌরভময়ং বসন্তঃ ॥"

অদূরবর্ত্তিনী মায়ার বুকের মধ্যে এক অননুভূত-পূর্ব্ব আবেগ রেখা বিজলী বেগে ঝলসিয়া গেল; সমস্ত স্নায়ু তন্ত্রীর মর্ম্মে মর্ম্মে, তরুণ উন্মাদ রাগিণী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল! মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে—অনাস্বাদিত আবেশের ঘ্রাণ লালসা জাগিয়া উঠিল;—এ সৌন্দর্য্য স্তুতির অন্তরালে, নিরঞ্জনের অন্তর-ছন্দ ও অজ্ঞাতের উদ্দেশে কাঁপিয়া উঠিল, না?—মায়ার বোধশক্তি বুঝি লোপ হইল!—তাহার চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া বাতাসের স্তরে স্তরে সূক্ষ্ম-কোমল মাদকতার আবেশ জমিয়া উঠিল! নিঃশ্বাসের সঙ্গে পলকে পলকে তাহার মত্ততা ফেনাইয়া উঠিতে লাগিল! একি শুনিল সে!

নিরঞ্জনের কথায় বিদ্রূপ করিয়া সনাতন বলিল "হাঁ হাঁ বসন্তের সৌরভময়দানের খাতিরে যত না হোক, আদিত্য দেবের হাত পায়ের কল্যাণে বাপী জলানাং খুব পঙ্ক পঙ্কিল সৌগন্ধময় হয়ে উঠেছে, তবে তোমাদের মত দিব্য দৃষ্টিতে 'শশাঙ্ক ভাসাং'টা এই ঠিকুর রৌদ্রে ঠাওর পাচ্ছিল না বটে……!—ওগো কন্দর্প দেব, তোমার ঐ 'নয়নোপান্ত বিলোকিতঞ্চ রাখ' দাঁড়াও ভাই, তোমার চপেটাঘাতের পাল্লা থেকে আগে সরে দাঁড়াই—তা পর—কথাটা শেষ করব……"

কৃত্রিম আশঙ্কায় ত্রস্ত ভাবে সনাতন যেমন মুখ ফিরাইয়া সরিতে যাইবে, অমনি রাস্তার পাশে ঝোপের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল মায়া ঝোপের পাশে একটু আড়াল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল. সহসা সনাতনকে চাহিতে দেখিয়া তীক্ষ্ণ সঙ্কোচে তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন কেমন করিয়া উঠিল! অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া শূন্য ঘড়া লইয়া সে ত্রস্তভাবে ফিরিয়া চলিল।

হঠাৎ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সনাতনকে ঝোপের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া—নিরঞ্জনও সবিস্ময়ে সেই দিকে চাহিল, নিমেষে তাহার মুখভাব পরিবর্ত্তিত হইল! একি মায়া ফিরিয়া যাইতেছেন? তিনি বুঝি জল লইতে আসিয়াছিলেন?

ক্ষুব্ধ সঙ্কোচে নিরঞ্জনের আপাদমস্তকে একটা অসহনীয় উষ্ণ-শিক্ষা তড়িদ্বেগে বহিয়া গেল! ছিঃ ছিঃ, মূঢ় তাহারা!—এতক্ষণ কি বাচালতাই এখানে করিতেছিল?

ক্ষণ পরে সনাতনের মাথায় কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগিল, সে ব্যস্ত হইয়া বলিল "ডাকব? কেবলবাবুর বোন জল নিতে এসে ফিরে যাচ্ছে, ঐ দ্যাখ……।"

আদিত্য গলা বাড়াইয়া দেখিল, নিরঞ্জনের কিন্তু দর্শন ব্যাপারে কুণ্ঠাই পূর্ণ মাত্রায় ছিল, কৌতূহল আদৌ ছিল না, সে আর চাহিল না, শুধু আরক্ত মুখে অস্ফুট স্বরে বলিল "আমাদের দৌরাত্ম্যে কেউ ঘাটে আসতে পারে না,—এ ভারি অত্যাচার কিন্তু……।

"দাঁড়া ডাক্‌ছি ওকে," বলিয়া বিচলিত নিরঞ্জনকে একটি কথা কহিবার সাবকাশ না দিয়া আদিত্য নিতান্ত সহজ ভাবে, কোমলতা-লেশ বর্জ্জিত পরুষ কণ্ঠে ডাকিল "ওগো লক্ষ্মী ফিরে এস, জল নিয়ে যাও—"

নিরঞ্জনের মনের মধ্যে দৃপ্ত বিদ্রোহিতা সবেগে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, কিন্তু কেন,—নিরঞ্জন তাহার কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইল না!—অতিকষ্টে আত্মদমন করিয়া ঘাটের এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া, নতমুখে গামছা নিংড়াইতে লাগিল, তাহার ললাটের শিরাগুলা স্ফীত হইয়া উঠিল।

আদিত্যের আহ্বানে মায়ার সর্ব্ব শরীরের অস্থি মজ্জার ভিতর একটা কুণ্ঠা-ক্ষুব্ধ কম্পন ঝঞ্ঝনা তীব্র বেগে বহিয়া গেল! ফিরিতে হইবে! কি ভয়ানক, ওখানে নিরঞ্জন রহিয়াছেন যে!

কিন্তু এ আহ্বান উপেক্ষা করিলে আরও অশোভন নির্লজ্জতা প্রকাশ হইবে না কি? ইহাঁদের সকলকে অপমান করা হইবে না কি? মায়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া, ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

আবার আহ্বান আসিল! এবার সনাতন ডাকিল, "এস জল নিয়ে যাও আমরা সরে দাঁড়াচ্ছি—"

মায়া কঠিন বিপদে পড়িল, তাহার নবনী মার্জ্জিত শুভ্র কোমল ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ফুটিয়া উঠিল! ছি ছি ছি ইহাঁরা নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন, মায়া এতক্ষণ অন্তরালে লুকাইয়া তাঁহাদের নিরঙ্কুশ কৌতুক-চাপল্য উচ্ছ্বসিত আমোদ-রঙ্গ লক্ষ্য করিয়াছে!—ইহাঁরা—বিশেষতঃ নিরঞ্জন দেব, মায়ার সে নির্ব্বুদ্ধিতায় কি মনে করিলেন!—

কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহাত আর ক্ষালনের উপায় নাই! আর অপরাধের মাত্রা বাড়ান কেন? মায়া কম্পিত পদে ফিরিল, কাহারও পানে চক্ষু তুলিয়া চাহিবার সাহস ছিল না, তবুও অনিচ্ছুক দৃষ্টি, চকিত গোপন কটাক্ষে,—নিমেষের জন্য সকলকে দেখিয়া লইল, নিরঞ্জন অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া, কি দেখিতেছেন,—কিন্তু সনাতন ও আদিত্য,—ছিঃ, পরিষ্কার ধৃষ্টতায় অসভ্যের মত, তাহার দিকে চাহিয়া আছে! কিন্তু উপায় নাই!—আত্মদমন করিয়া সন্ত্রস্ত কুণ্ঠিত চরণে সোপান অবতরণ করিয়া মায়া জলে নামিল, হায়, জল লইবে কি? একি জল!—এ যে পঙ্কিল মৃত্তিকা মিশ্রিত অস্পৃশ্য পদার্থ!

বিব্রত মায়া ঘড়ার আঘাতে ঠেলিয়া,—জল ঢেউয়াইতে লাগিল, কিন্তু সমস্ত জলই কর্দ্দমাক্ত! ক্ষুব্ধ নিরুপায় দৃষ্টিতে, একবার দূরের জলের দিকে চাহিল, হাঁ সে জল পরিষ্কার,—কিন্তু আনিবে কে, সে যে দূরে!

মায়া যে অত্যন্তই বিপদে পড়িয়াছে, তাহা সকলেই বুঝিল, সনাতন গম্ভীর ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিল "এ জল বড়ই ঘুলিয়ে গেছে, নেওয়া চল্‌বে না ত।"

আদিত্য খপ্‌ করিয়া প্রশ্ন করিল, "কি করে জল নেবে?"

এ কথার উত্তর যদি মায়ার আয়ত্তের মধ্যে থাকিত, তাহা হইলে আদিত্যর পক্ষে প্রশ্ন করিবার সুযোগ ঘটিত না! মৃদু-দংশিত অধরে, নীরবে ইতঃস্তত; পরায়ণা মায়া বিপন্ন ভাবে মাথা নাড়িল, সে মস্তকান্দোলন এত মৃদু, এত ক্ষণস্থায়ী, যে তাহার অর্থ হাঁ কি না,—কিছুই বুঝা গেল না, সনাতন সবিস্ময়ে বলিল "জল নেবে না?"

আদিত্য ততোধিক বিস্ময়ে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল "অম্নি ফিরে যাবে?"

এবার নিরঞ্জন ফিরিয়া চাহিল, সঙ্গীদের কৌতুক-চপল কটাক্ষ সঞ্চরণ দেখিয়া,—নিমেষ মধ্যে ক্ষোভে বেদনায় তাহার অন্তরাত্মা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল! নৃশংস অধম পশুদ্বয়!—উহাদের কোন শব্দে তিরস্কার করা হইবে? উহারা প্রাণহীন, হৃদয়হীন! উহাদের বোধানুভূতি—কর্কশ স্থূল জড়ত্বের, মৃত-জড়িমায় পরিসমাপ্ত! উহাদের জড় দৃষ্টিতে ঐ ক্ষুদ্র কিশোরী মূর্ত্তি,—সামান্য পার্থিব উপাদান গঠিত,—ক্ষুদ্র বালিকা মাত্র! নির্ব্বোধ মূর্খের দল, নিজেদের নীচ-দৃষ্টি, গৌরব-মাহাত্ম্যে—উহাঁকে বিচার করিতেছে, উহাঁর ঐ ক্ষুদ্র আকৃতিটুকুর,—নগণ্য

পরিমাপে ! তাহার উর্দ্ধে দৃষ্টি তুলিবার সামর্থ্য উহাদের নাই ! উহারা কি বুঝিবে,—ঐ ক্ষুদ্র বক্ষের মাঝে ঐ যে ক্ষুদ্র হৃদপিণ্ডটুকু মৃদুস্পন্দনে কাঁপিতেছে,—উহার অভ্যন্তর রাজ্যে,—অলক্ষ্য জগতে,—কত ব্যর্থ-হতাশার ক্ষুব্ধ আগ্নেয়পর্ব্বত জলন্ত যাতনায়, বুকফাটা নিঃশ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইতেছে,—কত করুণ-বেদনার অতলস্পর্শ মহা-পারাবার, স্ফীত আবেগে মত্ত-আলোড়নে দুকূল হানিয়া গোপন হুঙ্কার ছাড়িতেছে !—কে তাহার সন্ধান রাখে, কে তাহার পরিচয় জানে !—হায়, জড় জগতের জড়-জীব,—তোমার চেতনাহীন দৃষ্টিতে পৃথিবীর যতকিছু—সচেতন ব্যাপর,—যতকিছু দুর্লভ-দর্শন, যতকিছু উন্নত-গৌরব-মর্য্যাদা,—সবই গ্লানিমায় সমুৎসৃষ্ট, তাহাতে সম্মানের, সম্ভ্রমের—সহানুভূতির কিছুই নাই !—আছে শুধু অসংযত আমোদ-রহস্য চরিতার্থতার জন্য জঘন্য লঘু হৃদয়হীনতা !—ধিক্ ! না এ উজ্জ্বল গরিমা সম্ভ্রমকে ইহাদের হৃদয়হীনতার অন্তর্বর্ত্তী করিয়া পীড়িত মলিন হইতে দেওয়া হইবে না,—নিরঞ্জন গভীর শ্রদ্ধায়, সংযত নিষ্ঠায়, এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের বেদনা-করুণ মহত্ব বন্দনা করিয়া চলিবে ; ক্ষিপ্র সঙ্কোচের মধ্য হইতে, উগ্র নির্ভীকতায় আপনাকে টানিয়া ছাড়াইয়া—নত নয়নে চাহিয়া ধীর স্বরে বলিল "ঘড়াটা আমায় দিন, আমি দূর থেকে জল এনে দিচ্ছি ।"

অন্য সময় হইলে এ ভার সঙ্গীদের কাহারও ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া, সে হয়ত সরিয়া দাঁড়াইত, কিন্তু আজ তাহার চিত্ত নিষ্করুণ ক্ষোভে জ্বলিয়া যাইতেছিল, নিজেদের দিক হইতে,—অপরাধের ত্রুটির শাস্তি, নীরবে নিজের ঘাড়ে টানিয়া লইয়া, আপনাকে পীড়ন করিবার জন্য সে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল ; তাই যে মায়ার ছায়া কল্পনা করিতেও তাহার চিত্ত সম্ভ্রম-ভরে হটিয়া যায়,—সেই মায়ার সম্পর্কীয় বিষয়ে স্বয়ং উপযাচক হইয়া প্রস্তাব ফাঁদিয়া বসিল !—তবু কিন্তু কথা কয়টা উচ্চারণ করিতে নিরঞ্জনের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিয়াছিল, হায় মার্জ্জনা ! আজ তুমিও যে প্রার্থনাতীত দুর্লভ !—হতভাগ্য ভক্ত পূজারী মাত্র সে,—বড় দুঃখে, বড় দায়ে পড়িয়া, নিজেকে স্বেচ্ছায় অধিকার সীমার বাহিরে টানিয়া—আপনার কাছে আপনাকে ঘোরতর অপরাধী করিয়া তুলিল !—হে চিত্তলোকের মুগ্ধ সম্ভ্রম, বাহিরের লঘু বিপ্লব-সংঘাত উৎসন্ন যাইতে দাও, তুমি শুধু গভীর গাম্ভীর্য্যে, অন্তরে—অমর উজ্জ্বলতায়, দীপ্ত-জাগ্রত থাক, এই নিবেদন !—

নিরঞ্জনের কথার লজ্জায় মায়ার সর্ব্বশরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল ; কিন্তু অসম্মতি জানাইবার সামর্থ্যও তাহার তখন ছিল না, সে নিরঞ্জনকে জলে নামিতে দেখিয়া, কম্পিত হস্তে ঘড়াটা ছাড়িয়া দিল, নিরঞ্জন ঘড়া লইয়া সাঁতার কাটিয়া, দূর জলে চলিল ।

তাহার এই অভাবনীয় আচরণে সনাতন ও আদিত্য প্রথমটা স্তব্ধ হইয়া গেল ; অলক্ষিতে পরস্পর মুখ চাওয়াচাযি করিয়া অর্থ-সূচক ভঙ্গীতে দুজনেই নিঃশব্দে একটু হাসিল ; তাহারা বুঝিয়াছে যে তাহাদের 'অতি সম্ভ্রমশীল' বন্ধু এমন করিয়া, লজ্জা-সঙ্কোচ এড়াইয়া তরুণীর সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল নিজে,—শুধু তাহাদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য,—তবু তাহারা ব্যাপারটার বিপরীত দিক্ হইতে,—কাল্পনিক রহস্য আবিষ্কার করিয়া—খোঁচা দিয়া কৌতুক করিতে ছাড়িবে কেন ? মায়া চকিত দৃষ্টিতে ইহাদের সাঙ্কেতিক অভিনয় দৃশ্য দেখিয়া, মনে মনে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল,—লজ্জায় অপমানে তাহার হাড়ের ভিতরকার মজ্জাগুলা শুদ্ধ আড়ষ্ট হইয়া উঠিল !

নিরঞ্জন দূরের পরিষ্কার জলে ঘড়া ভর্ত্তি করিয়া,—কৌশলে অপরিস্কার জল হইতে ঘড়া বাঁচাইয়া 'দাঁড়া সাঁতার' কাটিয়া ফিরিয়া আসিল, জল হইতে ঘড়া তুলিয়া, মায়ার সাম্‌নে নামাইয়া দিয়া—সে সরিয়া গামছা নিংড়াইয়া গায়ের জল মুছিতে লাগিল, সঙ্গীদের মুখ পানে চাহিল না, কি জানি যদি আত্মসম্বরণে অক্ষম হইয়া পড়ে !

আদিত্য দাঁতে অধরোষ্ঠ চাপিয়া বিপুল গাম্ভীর্য্যের ভাণে মোচ চুমরাইতে চুমরাইতে সিঁড়ির উপর পাদচারণা করিতে লাগিল, আর সনাতন স্পষ্টতঃ হাসি চাপিবার ছলে কাশিতে কাশিতে অধীর হইয়া উঠিল, তাহাদের অসহনীয় ধৃষ্টতা দেখিয়া,—নিরঞ্জনের ধৈর্য্য অসম্বরণীয় হইয়া উঠিল!

দুর্লক্ষণ দেখিয়া কুণ্ঠাহত মায়া, তাহার সলজ্জ-কৃতজ্ঞ দৃষ্টি, প্রাণপণে সংযত করিয়া, নত মস্তকে জলপূর্ণ কলস লইয়া সোপান বহিয়া উপরে উঠিল. নিজের উপর তখন তাহার অসহ্য ক্ষোভের উদয় হইতেছিল, কেন সে ইহাদের লক্ষ্মীছাড়া অভিনয় দেখিতে এখানে দাঁড়াইয়াছিল—কেন সে ইহাদের নিকট নিজেকে এমন নির্ম্মমভাবে ধরাইয়া দিল?

মায়া অদৃশ্য হইল; নিরঞ্জন সিঁড়িতে উঠিয়া কাপড় নিংড়াইতে লাগিল, রোষোত্তাপে তাহার মস্তিক তখন ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইতেছিল—ইহাদের ব্যবহার ক্ষমা করিতে আজ সে মোটেই প্রস্তুত নয়!

মায়াকে সম্পুর্ণরূপে দৃষ্টিপথাতীত দেখিয়া সনাতন বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে বলিল "ভাই আদিত্য, দেশকালপাত্র ভেদে, অযাচিত সহৃদয়তা জিনিসটা খুব চমৎকার ভাবব্যঞ্জক হ'য়ে দাঁড়ায়, না?

আদিত্য উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া বলিল "ওঃ! খুব খুব,—"

তাহার হাসি থামিতে না থামিতে মর্ম্মান্তিক ক্রোধে, উগ্রকণ্ঠে নিরঞ্জন বলিল "তোমাদের যদি এতটুকু আত্ম-সম্মান বোধ থাকৃত তা হ'লে মানুষ বলে মানতুম, উপযুক্ত উত্তর দিতুম, কিন্তু......" নিরঞ্জন আর কথাটা শেষ করিবার জন্য অপেক্ষা করিল না, দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

সনাতন মনে ঈষৎ উদ্বিগ্নতা অনুভব করিল.—বাস্তবিক নিরঞ্জন যে এতটা চটিয়া যাইবে, সেটা তাহারা আদৌ কল্পনা করে নাই!—কারণে-অকারণে অনাবশ্যক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে পরস্পরকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তোলাই তাহাদের অভ্যস্ত কৌতুক,—তাহারা মিথ্যা-রহস্যের জন্য-ই, তুচ্ছ সূত্রকে টানিয়া রহস্য জাল বুনে, তাহারা ত সত্য বলিয়া কিছু মনে করে নাই! তবে কেন আজ এই সামান্য পরিহাসটুকু নিরঞ্জন এত নিগূঢ় অধৈর্য্যতার সহিত গ্রহণ করিল?

সনাতন স্পষ্ট বুঝিল,—মিথ্যা হইলেও রহস্য-ব্যপদেশে মায়ার প্রতি কটাক্ষপাত করা তাহাদের পক্ষে বিসদৃশ ধৃষ্টতা হইয়াছে! সেই জন্যই চির ক্ষমাশীল সহৃদয় নিরঞ্জন, আজ অকস্মাৎ তাহাদের তীব্র ভাবে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে, যে.—সে সম্মান স্বাতন্ত্র্যের গণ্ডী ডিঙ্গাইয়া অবাধে তাহাদের সহিত মিশিয়া চলিলেও,—প্রকৃত পক্ষে—সকল ব্যাপারেই—শক্তি-সামর্থ্যে সে তাহাদের ঊর্দ্ধতন!

লজ্জার ধাক্কা সামলাইবার জন্য,—আদিত্য নিশ্চিন্তমুখে নির্লজ্জ হাসি হাসিতেছিল, সনাতন কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া—অসন্তোষের সহিত মাথা নাড়িয়া বলিল, "না আদিত্য আর হাসিস্ না,—"

ক্রমশঃ—

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

গ্রন্থ সমালোচনা

ঋতুমঙ্গল। শ্রীকালিদাস রায় প্রণীত। ডবল্ ক্রাউন ষোলপেজী ৮৫+।৵০ পৃষ্ঠা। এখানি কাব্য। কালিদাসবাবুর ঋতুবর্ণনাত্মক যে সকল কবিতা ইতঃপূর্ব্বে বিভিন্ন মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেইগুলি একত্র ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া এইগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। আমাদের দেশে সংস্কৃত সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে অবধি ষড়্ঋতু বর্ণনা স্থান লাভ করিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থ-খানিতেও নিদাঘ হইতে আরম্ভ করিয়া বসন্ত পর্য্যন্ত ষড়্ঋতু বর্ণনাত্মক কবিতাবলী সজ্জিত। এত বেশী কবি, এত রকমে এই ঋতুবর্ণনা করিয়া গিয়াছেন যে এই শ্রেণীর রচনায় নূতনত্ব ফুটাইয়া তুলা সাধারণ কবির অসাধ্য। বাঙ্গালা মাসিকপত্রগুলিতে প্রতিঋতুতে অজস্র একঘেয়ে সুমিষ্টছন্দে মামুলি উপমা ও বর্ণনার আবৃত্তিই তাহার প্রমাণ।

আলোচ্য গ্রন্থখানির সবগুলিতে নহে, অনেকগুলি কবিতায় কবির নিজস্ব ভাবসম্পদের পরিচয় পাওয়া যায়। বহুস্থলে কবি সংস্কৃত সাহিত্য হইতে উপমা ও বর্ণনা আহরণ করিয়াছেন। কবি গ্রন্থের প্রথমেই সে কথা স্বীকার করিয়াছেন—

"ঋতুমঙ্গল সঙ্গীত তা'র গা'ব সে পুরাণো তানে।
পুরা কবিগণ পদতলে বসি চরণামৃত পানে॥"

দুই একটী উদাহরণ দিলেই প্রাচীন কবিদের রচনা হইতে গ্রন্থকার কিরূপ ঋণী তাহা পরিস্ফুট হইবে।

"ঋতুরাণী"তে আছে—

"হস্তে তাহার লীলারবিন্দ, কুন্দ অলক 'পরে
লোধ্রের ফুলে গণ্ড তাহার পাণ্ডুর শোভা ধরে;
চূড়াপাশে তার নব কুরুবক, কর্ণে শিরীষ দুল,
চারু সীমন্তে পুলকাঞ্চিত শোভিছে কদম ফুল।"

মেঘদূতে আছে—

"হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষম্
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥"

আবার—

"তরু আলবালে তাপিত ময়ূর ফেলিছে তপ্তশ্বাস,
ফুলের শীতল বক্ষ ভেদিয়া ষট্পদ করে বাস।
কমলের পরে বারিবিহঙ্গ ত্যজিয়া তপ্ত জল,
পিঞ্জরে শুক তৃষার সলিল যাচিতেছে অবিরল।"

[নিদাঘ। ১৯ পৃষ্ঠা]

পাঠ করিলে "বিক্রমোর্ব্বশী"র—

"উষ্ণার্ত্তঃ শিশিরে নিষিদতি তরোর্মূলালবালে শিখী
নির্ভিদ্যোপরি কর্ণিকারমুকুলান্যাশেরতে ষট্‌পদাঃ।
তপ্তং বারি বিহায় তীরনলিনীং কারণ্ডবঃ সেবতে
ক্রীড়াবেশ্মনি চৈষ পঞ্জরশুকঃ ক্লান্তো জলং যাচতে॥" [দ্বিতীয় অঙ্ক]

মনে পড়ে।

এইরূপ "ঋতুসংহারে"র—

"তৃষামহত্যা হতবিক্রমোদ্যমঃ
শ্বসন্ মুহুর্দূরবিদারিতাননঃ।
ন হন্ত্যদূরেঽপি গজান্ মৃগেশ্বরো
বিলোলজিহ্বশ্চলিতাগ্রকেশঃ॥
বিশুষ্ককণ্ঠাহৃতশীকরাম্ভসো
গভস্তিভির্ভানুমতোঽনুতাপিতাঃ।
প্রবৃদ্ধতৃষ্ণোপহতা জলার্থিনো
ন দন্তিনঃ কেশরিনোঽপি বিভ্যতি॥
বিবস্বতা তীক্ষ্ণতরাংশুমালিনা
সপঙ্কতোয়াৎ সরসোঽভিতাপিতঃ।
উৎপ্লুত্য ভেকস্তৃষিতস্য ভোগিনঃ
ফণাতপত্রস্য তলে নিষীদতি॥
[১। ১৪। ১৫। ১৮]

শ্লোকগুলি নিম্নলিখিত পংক্তিগুলিতে পরিবর্ত্তিত—

"বারণবরের দেহের ছায়ায় কেশরী মলিন মুখে,
গ্রীষ্মের দাহে সর্প ঘুমায় ময়ূরের ক্রোড়ে সুখে,—
যদিও ক্ষুধিত, ক্লান্ত ময়ূর স্পর্শ করে না তায়;
নিয়েছে শান্ত ভেক আশ্রয় ফণীর ফণার ছায়॥"
[নিদাঘ। ১৯ পৃষ্ঠা]

অভিজ্ঞানশকুন্তলে"র—

"গাহন্তাং মহিষাঃ নিপানসলিলং শৃঙ্গৈর্মুহুস্তাড়িতং...
বিশ্রব্ধং কুরুতাং বরাহততিভির্মুস্তাক্ষতিঃ পল্বলে..."

পংক্তিগুলি— "পল্বলে নিজ অঙ্গ ডুবায়ে শূকর জুড়ায় প্রাণ,
কর্দ্দমময় নিপানসলিল মহিষ করিছে পান।"

"উত্তররামচরিতে"র—"তৃষ্যদ্ভিঃ প্রতিসূর্য্যকৈরজগরস্বেদদ্রবঃ পীয়তে"

এই পংক্তি— "তৃষিত তাপিত ক্লকলাসগুলি না পেয়ে তৃষায় জল
অজগর ফণী স্বেদধারা তাই পিইতেছে অবিরল।"

শুধু এইরূপ অবিকল ভাব আহরণের নয়, মধ্যে মধ্যে প্রাচীন কবিগণের ভাবের সূত্র ধরিয়া কবি নিজের মৌলিকতাও দেখাইয়াছেন,— "ধূমজ্যোতিঃ সলিল মরুতাং সন্নিপাতঃ ক মেঘঃ"

মেঘদূতের এই পংক্তি অবলম্বনে লিখিত "জগজ্জীবন" নামক কবিতা তাহার প্রমাণ। শুধু ইহাই নহে বহুস্থলে সংস্কৃত কবিদের ভাব ও ভাষার আভাস এই কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

"কর্ম্মী আজি স্বাধিকার-প্রমত্ত যৌবনে"

এখানে মেঘদূতের প্রসিদ্ধ বিশেষণটির যথার্থ অর্থ করেন নাই। সংস্কৃতে 'প্রমাদ' অর্থে 'অনবধানতা'। মেঘদূতেও ঐ অর্থেই বিশেষণটি প্রযুক্ত। কিন্তু 'যৌবনের অভিশাপে' 'প্রমত্ত' অর্থে 'প্রকৃষ্টরূপে মত্ত' এই অর্থ না ধরিলে সুসঙ্গত হয় না। কাজেই সংস্কৃতাভিজ্ঞ পাঠকের কর্ণে এই সকল স্থলে একটা খট্‌কা লাগে।

'নিদাঘ' শীর্ষক দীর্ঘ কবিতাটিই কাব্যমধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু কবিতার সকল পংক্তিগুলি সুবিন্যস্ত হয় নাই। এক এক ভাবের পর আর এক ভাবের পংক্তি সাজাইলেই ভাল হইত। একবার প্রভাত, তারপর রাত্রি, তারপর আবার প্রভাত, কোথাও বা বাদসাহদের নিদাঘ-যাপন চিত্র তারপর পল্লীচিত্র, তারপর প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের চিত্র এগুলি ঠিক বিষয়ানুক্রমে সজ্জিত হয় নাই। সেই জন্য পাঠের সময় একটার পর একটা চিত্র না ফুটিয়া খণ্ড খণ্ড কতকগুলি মিশ্রিত চিত্র মনে জাগিয়া উঠে। কবিতাটির শেষেও Climax এ উঠিয়া আবার চারিটি দুর্ব্বল পংক্তি যোগ করাতে সৌন্দর্য্যহানি ঘটিয়াছে। আমাদের মতে

"রবে না শুষ্ক পর্ণের পুটি বেশীদিন ঘরে ঘরে,
কড়ি দিয়ে রচা সিন্দুর ঝাঁপি ফিরিবে রমার করে।
দুগ্ধে ভরিবে ধেনুর আপীন, দুর্ব্বার দলে মরু
আঁচলে ঝরিবে কনকধান্য, পুষ্পে ভরিবে তরু
দেবতা আমার হাসিয়া দাঁড়াবে বরাভয় লয়ে করে
শীতল স্বচ্ছ সলিলের 'পরি মরাল কমলা পরে।
থামিবে ঝঞ্ঝা রুদ্রদেবের পিণাকের টঙ্কার,
ললাট আঁখির অনল নিভাবে করুণা নয়নাসার ;
কণ্ঠে রহিবে সকল গরল বদনে আশীষবাণী
অমৃতে ভরিবে শিব শঙ্কর হাতের করোটিখানি
মেঘের বক্ষে গিরির শৃঙ্গে হইবে শৃঙ্গনাদ
নদীর কণ্ঠে ঘোষিবে ডমরু মঙ্গলপরসাদ।
তপনেরে মোরা করিব আপন স্বস্তিবাচন ক'রে
অনলে তুষিব স্বাহার মন্ত্রে, ভক্তি বিনয়ে ভয়ে
মোরা তপ করি জাগাব জীবন আবার ভস্মতলে
করুণার স্বেদ ঝরাব প্রভুর চরণকমলদলে!
ষাট সহস্র জাগিবে তনয় শুভ শঙ্খের নাদে
সাঁতারি পড়িবে মকরের গায় ভক্তির উন্মাদে
নিভায়ে বগলা তারার ভ্রূকুটি অনল নিখিল রাণী
কমলাত্মিকা দাঁড়াবে বারিকুম্ভের জলদানি
চক্র গদায় আজিকে ধরার অরাতি করিয়া ক্ষয়
শঙ্খ পদ্মে শ্যামসুন্দর বিতরিবে বরাভয়।"

পংক্তিগুলি এইরূপে সজ্জিত করিয়া কবিতাটি শেষে করিলে সৌন্দর্য্য অক্ষুন্ন থাকিত। এইরূপ মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন করিলে কবিতাটি বঙ্গসাহিত্যে এক উজ্জ্বল রত্নরূপে পরিগণিত হইবে।

কবিতাটির মধ্যে ভাবের মৌলিকতা বহুস্থলে আছে। উপরে যে অংশ উদ্ধৃত হইল, ওরূপ অংশ বহু আছে, তদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

"নীরবে নিভৃতে সেবাপরায়ণা স্নেহ ছল ছল আঁখি,
ধূ ধূ সৈকত শুভ্রবসনে জ্বালাময় তনু ঢাকি

নিদাঘ-তটিনী বহে ধীরে ধীরে হিন্দু বিধবা নারী
শুন্য নাহিক কাঁথে আছে শুধু ঘটভরা শীতবারি।
রূপ,যৌবন দহিয়া ফেলেছে হৃদয়ের চিতানলে,
নির্ম্মল, শীত, শুভ্র যা কিছু বহিছে মরমতলে।
কর্ম্মক্ষেত্রে সহি শত জ্বালা, লাঞ্ছনা শিরে শত
ছায়াময় তরুগুলি আজিকার বঙ্গসুতের মত
বিবরে কোটরে ঘনপল্লবে, কুলায়ে ছায়ার তলে
পোষিতেছে ক'টি অসহায় জীবে লুকায়ে নয়নজলে,
অজ্ঞ সরল তারা ত জানেনা তরুর বেদনা কত
কাল বৈশাখী ঝঞ্ঝায় কোথা বক্ষ হয়েছে ক্ষত।"

"শ্রাবণপ্রশস্তি" নামক সুন্দর কবিতাটির মধ্যে কিছু কিছু দুর্ব্বল অংশ থাকিলেও, অধিকাংশই প্রথমশ্রেণীর কবির উপযুক্ত। আমরা যদৃচ্ছাক্রমে দুইটি ষ্টানজা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"পরক্ষণে তোমা হেরি হে শ্রাবণ রাখালের বেশে
ইন্দ্রধনু শিখীচূড়া কেশে।
শাঙলী ধবলী ধেনু ছাড়ি দিয়া শ্বেতশিলাপরে
গলে বলাকার মালা বসে আছ উদাস অম্বরে।
তোমার বাঁশরী তানে শিহরিয়া মল্লিকা আকুল
সিন্ধুপানে ছুটে নদী সচকিতে ভাঙ্গিয়া দু'কুল
ধাতকী শিহরি কাঁপে কামনায় নিকুঞ্জ বিতানে
কেতকী কত কি কথা কামিনীর কহে কানে কানে
কি যেন ভুলিয়াছিল কার কথা আছিল পাশরি
বাঁশী তানে স্মরিছে শিহরি'।
তারপর একি হেরি হে শ্রাবণ, হে প্রেমপ্রবণ
ঢল ঢল লাবণ্য-প্লাবন।
কীর্ত্তনে নর্ত্তন তব হেরি আজি ভবনদীয়ায়
শোভন সোণার অঙ্গ ধূসরিত ধূলার কাদায়,
প্রেমাশ্রু ঝরিছে তব দরদর আনন্দ উন্মাদে
ভুবন বিভোর আজি সুমধুর মৃদঙ্গ নিনাদে
চরণ চুম্বনে তব ধন্য ধরা উঠেছে মাতিয়া
চঞ্চল চরণতলে শ্যামাঞ্চল দিয়াছে পাতিয়া
বিটপীলতায় নদী পারাবারে, প্রেম বিতরণ
মেঘে মেঘে আজি আলিঙ্গন।"

'ঋতুমঙ্গল' কাব্যখানি আগাগোড়া সুমিষ্ট ছন্দে গ্রথিত। জয়দেবের গীতগোবিন্দের ন্যায় কোমল মধুর শব্দ ও ছন্দবিন্যাসে ঝঙ্কৃত। সংস্কৃত ইন্দ্রবজ্রা-ছন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গলা ভাষায় প্রবর্ত্তিত বহু নূতন ছন্দে কবি এই কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন। আমরা "রোমাঞ্চনোৎপক্ষ বৈতালিক, প্লক্ষ বৃক্ষস্থ পক্ষীশত ঐক্যতানী," "ঋতায়তে মধুবাতা," প্রভৃতির পক্ষপাতী না হইলেও "কণ্ঠাশ্লেষী প্রণয়ী," "অলস লুলিত দুর্ব্বল দেহলতা" "অশিথিল পরিরম্ভ" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারে কোন আপত্তি করি না।

এই নূতন কাব্যখানি পড়িয়া আমরা বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। কবি ইতঃপূর্ব্বেই যে যশ অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা এই নূতন গ্রন্থখানিতে বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। আশা করি বাঙ্গলা সাহিত্যিকমণ্ডলীর নিকট কাব্যখানি বিশেষ সমাদর লাভ করিবে।

কোচবিহার ষ্টেট্ প্রেসে শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও কোচবিহার সাহিত্য-সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
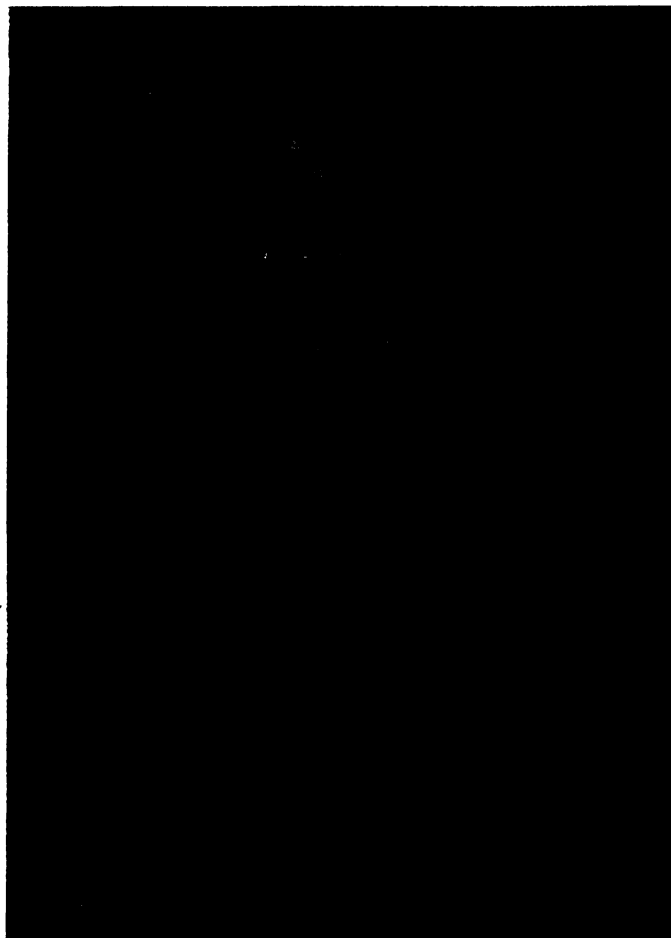
"সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা
কেমন করে কাটে সারাটা বেলা !
ইঁটের পরে ইঁট, মাঝে মানুষ কীট,
নাইক ভালবাসা নাইক খেলা।"

—রবীন্দ্রনাথ

চিত্রকর শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

২য় বর্ষ। | পৌষ, ১৩২৪ সাল | ২য় সংখ্যা।

ধূপারতি।

পূজা-মন্দির মাঝে
পূজা আয়োজন করিয়াছি শুধু
সঙ্কোচে ভয়ে লাজে।
চয়ন করেছি কুসুম-কলিকা
গোপন সুরভি ঢালা,
তব কণ্ঠের মতন করিয়া
গাঁথিয়াছি বর-মালা।

আছে কি তাহাতে মধু,
দীন ভাণ্ডার করিয়া উজাড়
তুমি কি লবে না বঁধু?
বুঝে দেখো তুমি আছে কি না আছে
অক্ষয় প্রেম সুধা,
নিমেষের লাগি মেটে কি না মেটে
গোপন মনের ক্ষুধা।

তুমি যদি কর মন
এক নিমেষেই সার্থক হয়—
মোর পূজা আয়োজন।
তুমি যদি কর গৌরব দান
কিছু নাহি চাই আর,
পদতলে যদি টেনে নাও তুমি
সেবিকার সেবা ভার।

জান কি বিশ্ব-ভূপ ?
বাসনার মুখে দিয়েছি আগুন
জ্বালাতে তোমার ধূপ!
তোমার আসন তলায় আসিয়া
মনের কালিমা মুছি'
চির মসীময় অন্তর মোর
হয়েছে শুভ্র শুচি!

বুকে তুলে নিনু সেবা,—
তব পূজাভার নিয়েছে যে জন
তার মত সুখী কেবা?
কোথায় জীবন, কোথায় মরণ,
কোথায় তুচ্ছ প্রাণ,
চরণের কাছে তুলিয়া ধরেছি
ভক্তির ধূপদান।

বংশানুক্রম-রহস্য।

(বীজ-পঙ্ক-প্রবাহ-বাদ—Theory of germinal continuity)

'যেম্‌নি বাপ তার তেম্‌নি ব্যাটা'; 'নরানাং মাতুলক্রমঃ' 'Chip of the old block' প্রভৃতি লৌকিক-কথা হইতে বুঝা যায় যে জীবজগতে বংশপরম্পরায় দোষ গুণের অনুক্রম (Heredity) ও ব্যতিক্রম (Variation) ব্যাপারটা সকল দেশেই সব সময়েই জানা ছিল। আর এত বেশী জানা ছিল যে মানুষের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ বা সঙ্কর মিলনে যে বংশ গৌরবের হানি হইবে এ ভয় খুবই ছিল। আভিজাত্য, কৌলীন্য প্রভৃতি এ সব ভাব বা ধারণা এই বংশানুক্রম ধর্ম্মেরই ক্রিয়াফল।

জীব সৃষ্টি বা অভিব্যক্তির মূলে এই বংশানুক্রম ও বংশব্যতিক্রম পূর্ণ মাত্রায় কাজ করিতেছে। বংশানুক্রম না থাকিলে সমস্ত জীব এত পরস্পর হইতে তফাৎ হইয়া যাইত যে 'জাতি' 'বর্ণ' বা 'গণ' প্রভৃতি এই শ্রেণীভেদ থাকিত না। আর ব্যতিক্রম না থাকিলে সব জীব একরকমই থাকিয়া যাইত। উন্নত অবনত, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট, সরল-জটীল কোনো ভেদই দেখা দিতনা।

এই যে বংশানুক্রম বিধি, ইহা জীবে দুই ভাবে কাজ করে। রামের ছেলের রামের সঙ্গেই বেশী সাদৃশ্য থাকিবে; রামেরই, ধরণধারণ হাবভাব স্বভাব লাভ করিবে, অন্য কাহারো নহে; এই হইল ব্যক্তিগত ব্যতিক্রম বা পুরুষানুক্রম (Individual inheritance), আবার রাম মানুষ বলিয়া রামের ছেলেতে মানুষ লক্ষণই বেশী হইবে; অন্য জন্তু বা জানোয়ারের লক্ষণ তাহাতে বর্ত্তাইবে না এই হইল জাতিগত অনুক্রম বা (Specific inheritance)। জীব মাত্রেই দুইটী ভিন্ন জাতীয় লক্ষণ ধারার বাহক; একটী ব্যক্তিগত লক্ষণ ধারা, অপরটী জাতিগত লক্ষণ ধারা। একটী ধারা তাহাকে পূর্ব্বপুরুষের সঙ্গে সংযুক্ত রাখিয়াছে; অপরটী তাহাকে তাহার স্বজাতির (Species) সঙ্গে সংযুক্ত রাখিয়াছে। মার্কীন লেখক Holmes যে মানুষকে রহস্যপূর্ব্বক Physiological ও psychological omnibus আখ্যা দিয়াছেন তাহা এই কথা স্মরণ করিয়াই।

কি করিয়া যে পুরুষান্তরে এই সব দৈহিক মানসিক গুণের সাদৃশ্য সঞ্চারিত হয় তাহা একটা মহা রহস্য। জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের সম্মুখে দুইটী সমস্যা বিরাজমান (১) জীবন পদার্থটা কি? কোথা হইতে কিরূপে উহার উৎপত্তি (২) বংশানুক্রম কি? উহার কার্য্যপ্রণালী কি? বাস্তবিকই প্রথম সমস্যা কখনো মীমাংসিত হইবে কিনা বলা যায় না, আর দ্বিতীয় সমস্যাটা খুবই বিস্ময়জনক হইলে মীমাংসার চেষ্টা দেখা যায়।

চক্ষুর অগোচর ক্ষুদ্রতম দুইটী জননকোষ (Egg-cell ও Sperm-cell) মিলিত হইয়া একটী বীজডিম্ব (Fertilised-egg)—উভয়েরই অন্তঃসার (Plasma) একই উপাদানে গঠিত কতকগুলি অতি জটীল রাসায়নিক মিশ্র পদার্থের অনুসংঘ মাত্র। কি মানুষ, কি চতুষ্পদ, কি কীট পতঙ্গ সবারই বীজডিম্ব ব্যাহতঃ একই;—অতি ক্ষুদ্র, চক্ষুর অগোচর এক বিন্দু প্রাণ-পঙ্ক; কিন্তু বাড়িতে বাড়িতে একটী হইল মানুষ, অন্য একটা হইল গাধা বা গরু, একটী পিপীলিকা বা অন্যটী পাখী! শুধু তাই কি? জনকের সঙ্গে জাতকের কি সাদৃশ্য! চোখ মুখ, নাক, চুল, গায়ের রং ধরণধারণ, গলার স্বর, স্বভাব, প্রবৃত্তি, পছন্দ অপছন্দ সবই কি একরকমের?

অণুপরিমাণ বীজডিম্বের অন্তঃসার! তাহারই ভিতর এই সব লক্ষ লক্ষ সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের বীজ গুপ্তভাবে বর্ত্তমান ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। শুধু এক পুরুষের নহে, বহু ঊর্দ্ধতন পুরুষের দৈহিক মানসিক গুণাগুণের কারণ বীজ ঐ অণুপরিমাণ কোষপঙ্কের মধ্যে বর্ত্তমান!

আধুনিক জীবতত্ত্ববিৎগণ বংশানুক্রমকে বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আর জীবের জনন-কোষই যে উহার মূলাধার ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বংশানুক্রমের কার্য্য কলাপের যদি কোনো সন্ধান পাওয়া যায় তবে এই কোষতত্ত্ব হইতে। এই মতে অনেকেই বংশানুক্রমের বিধি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কতকগুলি Theory খাড়া করিয়াছেন। তার মধ্যে ডারুইনের Theory ও বাইজম্যানের Theory-ই উল্লেখযোগ্য। এখন যেন প্রায় সমস্ত বৈজ্ঞানিকই বাইজম্যানের মতটাই প্রামাণিক ও বেশী সঙ্গত বলিয়া মান্য করেন।

বাইজম্যান কি প্রণালীতে বংশানুক্রম ব্যাখ্যা করেন তাহাই আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কিন্তু তার পূর্ব্বে দুটী কথার অবতারণা দরকার। প্রথম জীবকোষের পরিচয় প্রদান। দ্বিতীয় ডারুইনের থিওরির (মতবাদের) পরিচয়।

আজকাল জীবকোষ সম্বন্ধে কিছু না কিছু সকলেই জানেন। যেমন ইটের সমষ্টি হইল বাড়ী, বালুকণার সমষ্টিতে সমুদ্রতট বা তারা গ্রহনক্ষত্রাদির সমষ্টিতে বিশ্বজগত তেমনি অসংখ্য কোষ সমষ্টিতে জীবদেহ। এক একটী ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম আবরণের ভিতর বিন্দুমাত্র তৈলাক্ত পদার্থ কতকগুলা জটীল অঙ্গারাত্মক মিশ্র রাসায়নিক বস্তু মাত্র, অজ্ঞাত উপায়ে প্রাণময় হইয়া পড়িয়াছে। এই তৈলাক্ত পদার্থরাশির মধ্যে একটী ক্ষুদ্রতর কেন্দ্রবিন্দু। এই কেন্দ্র-বিন্দুটী আরো বেশী জটীল। এই কেন্দ্রসার বস্তুটী অণুবীক্ষণে দেখিতে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন তন্তুর বাণ্ডিলের মত। এই নগ্ন চক্ষুর অগোচর কোষবিন্দুর জীবন প্রণালী বড়ই বিচিত্র। উহার জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু আছে। এবং এই তিনটী জীবধর্ম্ম ঐ কেন্দ্রসারস্থ তন্তু বাণ্ডিলটীকে অবলম্বন করিয়া। নিম্নে প্রদত্ত চিত্র সাহায্যে জীবকোষের দেহ পরিচয় সুগম হইবে। কেন্দ্রসারের মধ্যে চওড়া ফিতার মত খণ্ডগুলি Chromatin বা কেন্দ্রতন্তু। জীব বিশেষের দেহ-কোষে বা জনন-কোষে কেন্দ্রতন্তুর সংখ্যা নির্দ্ধারিত। বাইজম্যান বলেন এই কেন্দ্র তন্তুগুলিই বংশানুক্রমে মূল ভিত্তি পূর্ব্বপুরুষদের সংস্কারের বাহক স্বরূপ। জীবদেহ দুই জাতীয় কোষে গঠিত। (১) দেহ কোষ বা পোষণকোষ Nutritive cell বা Somatic cell (২) জনন-কোষ বা Reproductive cell বা eggcell। জনন-কোষের সারকে Germ-plasm বা বীজপঙ্ক বলে। তাহার মধ্যস্থ যে কেন্দ্রসার তাহারই নাম Nucleo-plasm। এই কেন্দ্রসারের আসল পদার্থ হইল Chromatin বা বীজ-তন্তু বা কেন্দ্র-তন্তু। এই বীজতন্তুকে বাইজম্যান আবার নানা অংশে ভাগ করিয়া এক একটী তদনুযায়ী নাম দিয়াছেন; কেন্দ্রতন্তু চরমতঃ অসংখ্য জড়াণুর সমষ্টি মাত্র। এই রূপ কতকগুলি জড়াণু মিলিয়া একটী বীজানু (Biophore); আবার কতকগুলি বীজকণা বা determinant সেইরূপ কতকগুলি বীজকণা মিলিয়া একটী Id বা বীজবিন্দু; আবার কতকগুলি বীজবিন্দুর সমষ্টিতে একটী Idant বীজতন্তু। এই বীজতন্তুই হইল Chromatin। পূর্ব্বোক্ত বীজকণা বা determinantই জনকদেহের প্রতি সূক্ষ্মাংশের প্রতিনিধি স্বরূপ। ভবিষ্য দেহ গঠনের ইহারাই নিয়ামক। ইহারা জনক-লক্ষনের ছায়ামূর্ত্তিরূপে বীজ-কোষের কেন্দ্রভাগে সুপ্ত থাকে। গর্ভে ভ্রূণ-দেহের যখন গঠন চলিতে থাকে এই সকল নিয়ামক বিন্দু জাগরিত হইয়া অর্দ্ধাংশের যথাযথ স্থানে জনকদেহের সাদৃশ্য বহন করিয়া পৌছাইয়া দেয়। বীজে যাহা লীন ছিল জীবে তাহা প্রকট হইতেছে। আবার এই জীবের দেহে উহারাই পুনর্বীজ ভাবে লীন হইবে। Involution ও Evolution ধারাক্রমে জীব হইতে জীবান্তরে ঘটিয়া চলিতেছে। একই জীব দেহে পালাক্রমে সৃজন ও প্রলয় চলিতেছে।

বংশানুক্রমের রহস্য যে বীজ-ডিম্ব অবলম্বন করিয়া ইহা ডারুইনও স্বীকার করেন। কিরূপে ইহা ঘটে তাহা বুঝাইতে তিনি এক মত খাড়া করেন। এই মতকে Theory of pan-genesis বলে। এ মত অনুসারে দেহের প্রত্যেক কোষ অনবরতঃ স্বশরীর হইতে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অণু ত্যাগ করিতেছে। এই সব অণু গিয়া স্ত্রীদেহের ডিম্বা-ধারে (ovary) ও পুংদেহের বীর্য্যাধারে (Testes) জমিয়া জননকোষ উৎপাদন করিতেছে। অণুগুলি সর্ব্বাঙ্গের প্রতিনিধি স্বরূপ বলিয়া জাতক-দেহে জনকের সাদৃশ্য সঞ্চার করে এবং সারা জীবন এই কাজ চলিতেছে বলিয়া জনকের অর্জ্জিত গুণাগুণগুলিও জাতক-দেহে প্রকট হয়।

বাইজম্যান এ মত অগ্রাহ্য করেন। তিনি গোড়াতেই ধরিয়া লইয়াছেন, অর্জ্জিত গুণের সঞ্চার হয় না; কাজেই ডারুইনী মত মানিলে তাহাকে অর্জ্জিত গুণের সঞ্চার মানিতে হইবে। তাই তিনি এ মত অগ্রাহ্য করিয়া নিজে এক মত খাড়া করিয়াছেন। তাঁর মতের নাম বীজপঙ্কের চিরানুবর্ত্তিতা, বা Theory of the continuity of germ-plasm। তিনি বলিতেছেন বীজডিম্ব যে বংশানুগুণের মূল তাহা ঠিক; তবে বীজ

ডিম্বের সমস্ত অংশটা নহে। উহার কেন্দ্রসারের মধ্যে যে বীজতন্তু বা chromatin তাহাই বংশানুক্রম নিয়ামক। বীজকোষের সার যাহাকে cytoplasm বলে তাহার সঙ্গে জীবের সংস্কার সঞ্চয়ের কোন সংশ্রব নাই। Nucleo-plasm বা কেন্দ্রসারই পূর্ব্বপুরুষাবলীর সংস্কারবাহক। আর বীজডিম্ব যখন গর্ভে ভবিষ্য-জীবে গঠিত হইতে থাকে তখন ডিম্বস্থ সমস্ত কেন্দ্রসার দেহ-গঠনে ব্যয়িত হয় না। কতকটা অংশ অবিকৃত থাকে। পরে উহা হইতে জাতক দেহের বীজডিম্ব (sperm বা egg-cell) তৈয়ারী হয়। কাজেই জনক-দেহের বীজকোষেরই কতকটা অবিকৃত ভাবে জাতক দেহে সঞ্চারিত হইল। আবার এই জাতক হইতে আর এক অধঃস্তন জাতকে উহা অমনি অবিকৃত ভাবে সঞ্চারিত হইবে। জাতকের দেহ-কোষের সঙ্গে তাহার বীজ-কোষের কোন সম্বন্ধ রহিল না। পুত্রের দেহস্থ বীজকোষ পুরা মাত্রায় পিতার দেহ হইতে প্রাপ্ত, পুত্র-দেহ যেন গচ্ছিত ধনের আধার মাত্র। পুরুষানুক্রমে এইরূপ। কাজেই পুত্রের স্বোপার্জ্জিত-দৈহিক-মানসিক অভ্যাস তাহার বীজ-ডিম্বকে প্রভাবযুক্ত করিতে পারে না, কাজেই তদায় অর্জ্জিত গুণাগুণ তাহার পুত্রে সঞ্চারিত হইবে না। বাইজম্যানের মতের বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য দুইটী অনুমানে। প্রথম বীজ পঙ্কের ধারা অনবচ্ছিন্ন (absolutely continuous) ও দ্বিতীয় বীজ-ডিম্ব-উৎপাদনকারী বীজপঙ্ক পুরা মাত্রায় অবিকৃত বা খাঁটী alsolutely stable। তৈলবিন্দু জলে পড়িয়াও অমিশ্রিত অবিকৃত, তেমনি পিতার germ plasm (বীজ-পঙ্ক) পুত্রদেহে স্থানান্তরিত হইলেও কতকাংশ পুরা মাত্রায় অবিকৃত থাকে। অসংখ্য বর্ষ পূর্ব্বে 'ক' নামক আদিম ব্যক্তি যে বীজপঙ্ক বিন্দু পুত্র-দেহে রাখিয়া যায় তাহাই পুরুষানুক্রমে পূর্ণ মাত্রায় নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ও বিশুদ্ধ ভাবে আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। নিম্নস্থ চিত্রে উহা পরিস্ফুট হইবে।

একটি বীজ-ডিম্ব (পুংবীজ + স্ত্রীবীজ)
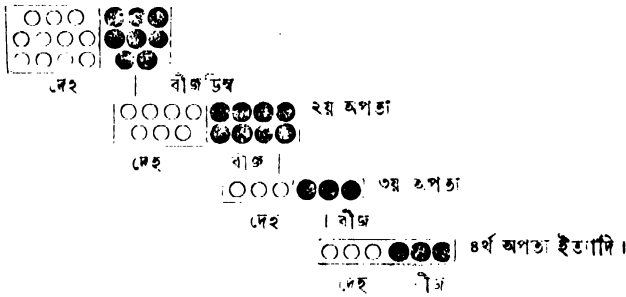
একটা কথা উঠিবে—যদি মূল জীবপঙ্কটুকু হাজার হাজার বছর ধরিয়া দেহ হইতে দেহান্তরে অবিকৃত ভাবে আসে, ইহা সত্য হয় তবে জনকের সহিত জাতকের তো পূর্ণ মাত্রায় সাদৃশ্য হইবে! কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় না। পুরুষানুক্রমে সাদৃশ্য মাত্রা কমিয়া আসিতেছে। ইহা কিরূপে? আর একটা গোলমাল এই যে হাজার বৎসর আগে যে বিন্দু প্রথম দেহান্তরিত হয় তাহা ক্রমশঃ ভাগ হইতে হইতে যে শূন্যে আসিয়া দাঁড়াইবে তাহার কি? বাইজ্যান তাহারও উত্তর দিয়াছেন।

পুরুষান্তরে যে বৈসাদৃশ্য দেখা দিতেছে তাহার হেতু amphimixia বা ভিন্ন জাতীয় জনন-কোষের মিলনেই তো বীজডিম্ব? পিতৃকোষ + মাতৃকোষ = অপত্যদেহ। পিতৃকোষে পিতার উর্দ্ধতন বহু পুরুষের লক্ষণ সঞ্চিত আছে। মাতৃকোষেও তাই। উভ জাতীয় ভিন্ন কোষ মিশ্রণে ফল তো ইতর বিশেষ হইবেই। এক স্রোতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহু দূরাগত ভিন্ন ভিন্ন স্রোত মিলিতেছে; কাজেই জলের তারতম্য হইবেই; সুপ্ত ভাবে সমস্ত

পুরুষের সমস্ত সংস্কার ক্রমশঃই মিশ্রণকে জটীলতর করিতেছে। O. W. Holmesএর সেই রসাল বাক্যটী স্মরণ করুন :—Man is a physiological and psychological omnibus carrying his ancestors forword on its back.

দ্বিতীয় আপত্তি বহুকাল পরে মূল বীজ পঙ্কটুকু ফুরাইয়া যায় না কেন? তাহার কারণ বীজপঙ্ক ক্রমশঃই আহার লাভে পুষ্টিলাভ করিতেছে। সাক্ষাৎ ভাবে উহাতে অন্য বীজপঙ্ক মিশিলেও উহার মূল মাত্রা কমিবে, কিন্তু তাহা তো ঘটিতেছে না; আসল প্রথম কিস্তি ক্রমাগতঃই বাহির হইতে আহারীয় পাইয়া বাড়িতেছে, কাজেই ফুরাইবার আশঙ্কা নাই।

বাইজম্যানের বীজপঙ্কবাদ হইল এই। অনেক পণ্ডিত এই মতের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। পণ্ডিত প্রবর হেকেল ও রোমানেঙ্গ তাহাদের অন্যতম। মোট কথা নানা বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও বংশানুক্রমের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সুধীজগৎ বাইজম্যানের মতকে প্রধান আসন দিয়াছেন। বাইজম্যানের মতের ভিত্তিভূমি হইল এই ধারণা যে জীবের অর্জ্জিত গুণাগুণ অপত্যে সঞ্চারিত হয় না উহা যে হয় এ কথা প্রমাণ প্রয়োগে যিনি যখন সাব্যস্ত করিতে পারিবেন তখন বাইজম্যানের মতের অসারতা প্রতিপন্ন হইবে, নচেৎ নহে। অর্জ্জিত গুণ এ ভাবে পুরুষান্তরিত হয় কি না তাহা লইয়া খুব তর্ক যুদ্ধ চলিতেছে, পাঠকের যদি প্রেমের গল্প ছাড়িয়া এ সব গল্পে রুচি হয় বারান্তরে তাহার পরিচয় দেওয়া যাইবে নচেৎ এই পর্য্যন্ত।

শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত।

প্রবাসী।

—:-:—

সহর তোমার কাঠ পাথরে
প্রাণ যে বড় আট্‌কে ধরে।
বন যে আমার মনকে টানে
উড়ে যেতে চায় সে ঘরে।
যত্নে আমার হাতের পোঁতা
ফুটেছে সেই তরুল লতা,
দেমাকে সে দামিয়ে বেড়ায়
ছোট্ট মাথা ছাপিয়ে পড়ে।

(২)

সাঁঝে সাদা বকগুলি সব
বসে এসে তেঁতুল গাছে,
শাবকগুলি মুখটী তুলি
আকাশ পানে চেয়েই আছে।

পূবের পিঁড়েয় দাঁড়িয়ে একা
হাসে আমার দুষ্ট খোকা,
চাঁদা মামা টিপ্ দিয়ে যায়,
উঁকি মারে সোহাগ ভরে।

(৩)

আসে ফুলের বাসটী লয়ে
বুক জোড়া সে দক্ষিণ হাওয়া,
দূরের গানের সুরটী মধু
মাঝে মাঝে যায় যে পাওয়া
ছাড়া নায়ের দাঁড়ের সাড়া,
রয়ে রয়ে হয় যে হারা,
সুখে আমার কি দুখ বাজে
পরাণ আমার কেমন করে!

(৪)

মন্দিরেরি শাঁকের ডাকে
পড়ে গ্রামের শির যে নুয়ে,
কত হৃদয় হয় যে পূত
তুলসী গাছের তলটী ছুঁয়ে।
হেথায় কল ও কথার হাটে
বেচা জীবন বৃথায় কাটে,
মিলায় গাঁয়ের গলার সাড়া
খাঁচার পাখী কেঁদেই মরে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

চীন-রমণীর প্রেমপত্র।

চীনের নারী-সমাজ সাধারণের কাছে অজ্ঞাত, তারা তাদের স্বামীর ও পুত্রের পিছনে লুকিয়ে থাকতেই ভালবাসে, তবু প্রাচ্যজাতির পিতামাতার প্রতি অগাধ ভক্তি আছে বলে তারা পুরুষের উপর অগাধ আধিপত্য বিস্তার করে আছে। প্রাচ্য ভূখণ্ডের অন্যান্য দেশের রমণীর চেয়ে চীনের রমণীদের সম্বন্ধে খুবই সামান্য কথা জানা যায়। অন্য দেশীয় সাধারণ ভ্রমণকারীর পক্ষে তাদের কথা জানা একপ্রকার অসম্ভব। চীন সম্বন্ধে এ

পর্য্যন্ত যা কিছু লেখা হয়েছে সাধারণও নীচজাতীয় চীনেদিগকে লইয়াই—কারণ ভ্রমণকারী অথবা ধর্ম্মপ্রচারক-দের সহিত যাদের মেলামেশা তারা প্রায়ই সামান্য লোক। ভ্রমণকারীরা কুলী রমণী দেখেন অথবা নৌ বিহারিণী নারীদের সম্বন্ধে কিছু দেখেন ও শোনেন—কিম্বা চা'র দোকানে পরিচ্ছদ পরিহিতা নর্ত্তকী বালিকার অঙ্গসঞ্চালনে মুগ্ধ হন, কিন্তু প্রকৃত চীনেরমণী—তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, উদ্বেগ, সংসার-ধর্ম্ম এ সমস্ত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

আমাদের বিশ্বাস নিম্নের পত্রগুলি চীনেরমণীর জীবনের কিছু পরিচয় দিতে পারবে। এগুলি চীনের কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী যখন প্রিন্স চুংএর সহিত ভ্রমণে বাহির হয়েছিলেন সেই সময়ে তাঁর পত্নী কুই-লি তাঁকে লেখেন।

সন্তানবতী না হওয়া পর্য্যন্ত চীনের নারী স্বামীগৃহে অতি নগণ্য। সন্তান হ'লে তবে সে তখন গৃহের অধিকারিণী রূপে বিবেচিত হয়। সে তার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য সম্পাদন করেছে, স্বামীকে সন্তানের অধিকারী করেছে, পিতা ও পিতৃপুরুষেরা এর তর্পণে তৃপ্ত হবে। ধনী, দরিদ্র, রাজকন্যা চীনের প্রত্যেক নারীরই অন্তরের ইচ্ছা তার সন্তান হো'ক।

কোয়াণ-ইস হচ্ছে এদের দেবী, এর কাছে এরা প্রার্থনা কচ্ছে "ওগো দেবতা আমায় একটি ছেলে দাও—শুধু একটি ছেলে।" চারিদিকের মন্দির হতে নারীর শুধু এই প্রার্থনাই শোনা যায়। সন্তানহীনা নারীর ন্যায় দুর্ভাগিনী চীনে আর নাই। স্বামী এ জন্যে তাকে ত্যাগও করতে পারেন, তার গভীর মর্ম্মোচ্ছ্বাস শুধু কোয়াণ-ইস ছাড়া আর কারো কাছে প্রকাশের ক্ষমতাও নাই এই পত্রে কুই-লি সেই অবস্থাই ব্যক্ত করেছেন, সন্তান লাভের পর তার গভীর আনন্দ। আবার পুত্রহারা হয়ে তার উন্মাদিনীর ন্যায় অবস্থা পত্রগুলি পাঠে পাঠকপাঠিকা বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

(১)

তোমার চিঠি ও ফটো ক'খানা পেয়েছি। তুমি লিখেছ প্রিন্সের অভ্যর্থনার ক'খানা চিত্র,—জানি না ঠিক ব্যাপারটি কি—কিন্তু বহু পুরুষ ও মহিলা দেখতে পাচ্ছি। তোমার মাকে আমি ছবিগুলো দেখাই নি হয়তো তোমায় তিনি এখনই ফিরে আস্‌তে লিখ্‌বেন। তোমার বন্ধুবান্ধবদের কথা আমি বল্‌ছি না, কিম্বা প্রিন্সও যে কোন অযোগ্য স্থানে যেতে পারেন এমনও নয়—তবু আমার সামান্য মতে ঐ সব নারীদের পোষাক পরিচ্ছদ দেখে যেন তেমন ভাল বোধ হলো না।

এখানকার কাগজগুলো সব তোমাদের অভ্যর্থনা কাহিনীতে পূর্ণ,—তোমার ভাই আমাদের সব পড়ে শোনান। বিদেশে আমাদের সম্রাটের বিপুল সম্মান কাহিনী—তুমি সদাই তাঁর পাশে আছ—এতে আমাদের কত আনন্দ! তোমার চিঠিগুলি পড়তে কত আনন্দ পাই আমি—বার বার পড়ি তবু পড়্‌তে ইচ্ছা হয়।

কুই-লি।

(২)

প্রিয়তম আমার,

তুমি জিজ্ঞাসা করেছ, তোমার কথা আমার মনে আছে কি না—তোমার মুখখানি এখনো তেমনি আমার হৃদয়ে জাগে কি না? প্রিয়তম আমার, অপরিচিতার মত তোমার সমুখে দাঁড়িয়েছিলাম,—দেখি নাই, চিনি নাই—তবু চিরদিনের জন্য তোমায় বরণ করে নিয়েছিলাম—আশা ভগবানের অনুগ্রহে যদি কোনদিন

তোমার ভালবাসা লাভ করতে পারি! যখন তোমার মুখের পানে চেয়ে দেখি—জগতে তখন আমার মত সুখী কে? জানি আমি,—আমি তোমার—তুমি আমার—জীবন আমাদের এক হয়ে গেছে। তোমায় কি আমি ভালবাসি? বলতে পারলুম না। সমস্তদিন তোমার চিন্তায় কাটে—স্বপনে তোমাকেই দেখি। জীবনে যেন কখনো তোমার একবিন্দু দুঃখের কারণও না হই। সুখে যেন চিরদিন তোমার পদসেবা করতে পারি। তুমি আমার প্রাণ, আমার ভালবাসা, সর্ব্বস্ব আমার তুমি—জীবনে মরণে আমি তোমারই—

(৩)

প্রিয়তম আমার,

স্কুলের সময় এখন, চাকরদের উঠান থেকে জড়িত স্বরে 'কনকিউসানেই'র বাণী ধ্বনিত হচ্ছে। আমি জানতুম না, আমাদের বাড়ীতে এতগুলো প্রাণী বাস করে, টেবিলের সামনে এত লোক জমে যায় যে তুমি দেখলে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। আমি অনেক সময় তাদের কাছে বসে গল্প শোনাই। আমার কাছে গল্প শুনতে ওরা খুব ভালবাসে, কিন্তু তোমার মা এ বড় পছন্দ করেন না। আমি তাদের সেদিন পাং-কুর গল্প শুনিয়েছি, তোমার কি সে গল্পটা মনে পড়ে? বিশ্বের জন্মদিনে কেমন করে ভগবান পাং-কু তাঁর হাতুড়ির সাহায্যে পৃথিবী নির্ম্মাণ করেছিলেন সে কাহিনী কি তোমার মনে আছে? আঠার হাজার বছর তিনি এই নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, এবং রোজই আয়তনে ছ'ফুট করে বেড়ে যাচ্ছিলেন, তাঁর স্থান দেবার জন্য স্বর্গ ক্রমেই উপরে উঠছিল এবং বিশ্ব বর্দ্ধিত হচ্ছিল। আকাশ যখন গোলাকার এবং বিশ্ব যখন বাসোপযোগী হোল তখন তাঁর মৃত্যু হোল, তাঁর মাথা হোল পর্ব্বত, নিশ্বাস হোল বায়ু ও মেঘরাশি—স্বরে বজ্র, হাত পা বিশ্বের চারিকোণ, স্নায়ুতে নদী, হাড়ে পাহাড়, মাংসগুলি হোল সব মাঠ। তার চক্ষু হোল তারকারাজি, চর্ম্ম ও কেশ সব নানাজাতি বৃক্ষলতা আর যে সব পোকাগুলো ছুঁয়েছিল সে দেহ, সেগুলো সব হোল মানুষ। এ সব গল্পে কি তোমার ছেলেবেলার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে না?

ওরা আমার চারদিক ঘিরে বসে বলে "আরো গল্প শোনাও—আরো বল।" মনে পড়ে ছেলেবেলার আমরাও এমনি ধাইকে ঘিরে বলতেম "গল্প বল,—গল্প শুনবো।"

সেদিন একটি ছেলে বলছিল "আমায় একটা সূর্য্যের গল্প শোনান।" আমার বলা উচিত ছিল যে, আমার ক্ষুদ্র কল্পনা সূর্য্য নাগাদ পৌঁছায় না, যদিও অন্তরে তাঁকে আমি মহাশক্তিমান ভগবান বলে পূজো করি, আমি তাকে বল্লুম "তুমি দেখেছ, কুলীরা সব এই বৃষ্টিতে ভিজে পথ চলছে সূর্য্য যদি না থাকত তো এদের কাপড় অমনি ভিজেই থাকত, তাঁরই অনুগ্রহে আমরা এই আলো, এত কিরণ লাভ করেছি, তিনি আমাদের ভগবান।"

আমি তাদের অপূর্ব্ব সুন্দরী চাং-উর গল্পও বলেছি, সে চাঁদের কাছে গিয়েছিল সেথায় দেবতারা সব মিলে তাঁকে চাঁদের কলঙ্ক বানিয়ে দিয়েছিলেন, সে এখনো সেথাই আছে আজীবন থাকিবেও সেথাই, সৌন্দর্য্য হারিয়ে সে কেঁদে সারা হচ্ছে।

এই সব বাজে গল্পও শোনাই ওদের তবে ওরা চাঁ-টাইর সেই ভীষণ দৃষ্টি, কঠোর বাণী সহ্য করে—স্কুলের কয়েদীখানার হাত এড়িয়ে দু'দণ্ড আমোদ করতে বড্ডো ভালবাসে।

এখানে একটা ভারী আন্দোলন চলছে। পাহাড়ের ওধারে নদীর ওপারে নাকি লোহার পুল হবে, নানারকম লোক এসে চারদিকে সব পরীক্ষা কচ্ছে—এরা সব অনেকরকম কাঁচ চোখে লাগিয়ে সবদিক দেখছে বলে বাতাসের দেবতারা সব দেশ ছেড়ে পালিয়েছে, শস্য ভাল জন্মে নাই, পশু পাখী সব মারা যাচ্ছে, চারিদিকে

হাহাকার পড়ে গেছে। নদীর ভয়ানক বাণ হয়েছে—জলদেবতাদের পিঠখুঁড়ে যে পুল বাঁধা হবে—এ তাঁরা সহ্য কর্‌বেন কেন? এ সব গল্প বাজার থেকে নিত্য নূতন আমদানী হচ্ছে—কান দিয়ে শোনা শুনি, এর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

শীতের রজনী বড় দীর্ঘ—চন্দ্রালোকে সমস্ত পর্ব্বত প্রদেশ রূপোলি আভায় ছেয়ে ফেলে। ছাদে বেশীক্ষণ থাকা যায় না, আমরা দরোজার সমুখে দাঁড়িয়ে দেখি। নারীর ক্রন্দনের মত নিশার বাতাস বৃক্ষরাজির উপর দিয়ে বয়ে যায়। কি ভাবে যে দিন যাচ্ছে—

তোমারই পত্নী।

(৪)

প্রিয়তম আমার,

সমস্ত দেশ ব্যাপী কি যেন একটা রোগ এসেছে,—ধনী, দরিদ্র, ব্যবসায়ী, কৃষক সকলকেই এই রোগে আক্রমণ কচ্ছে, কি একরকম জ্বর হচ্ছে কিছুতেই এ ভাল হয় না।

তোমার কি কোয়াণ-দিন মন্দিরের কথা মনে আছে? এ প্রদেশের লোকের পক্ষে বড়ই লজ্জার বিষয় যে, এতদিনও এ ভগ্নাবস্থায় আছে—দেবতারা এদের এই অবহেলা দেখে শাস্তি দেবার জন্য 'মড়ক' পাঠিয়েছেন। পুরোহিতেরা তাঁদের 'বাণী' হল্‌দে কাগজে ছাপিয়ে চারিদিকে পাঠাচ্ছেন। বাজারে, চা'র দোকানে, নদীরপথে, মন্দিরদ্বারে, সর্ব্বত্রই তাঁদের ঘোষণা জারী হয়ে গেছে। ঘোষণায় তাঁরা লিখেছেন—'দেশব্যাপী এই অশান্তি, মড়ক - এ ভগবানের নিগ্রহেই হচ্ছে—মন্দিরের সংস্কারের জন্য দেশবাসী প্রত্যেকেই যদি তিনদিন পরিশ্রম কর্‌তে রাজী হয় তবেই এ অশান্তি দূর হবে'।

তোমার ভাই সি পের অসুখ হওয়ার পূর্ব্বে আমরা এসব তেমন গ্রাহ্য করি নাই, তার অবস্থা দিন দিনই খারাপ হতে লাগল তোমার মা ও থি-টি ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তোমার মা ও আমি একদিন পাহাড়ের পাশে জ্ঞানবৃদ্ধ এবটের কাছে পরামর্শের জন্য গেলাম। তোমার পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী তাঁকে তাঁর ছেলের কথা সব বুঝিয়ে বল্‌লেন, এবং এ মন্দিরের পীড়াই কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বহুক্ষণ গম্ভীর ভাবে চিন্তা করে বল্‌লেন, "বৎসে দেবতারা তোমার ছেলের কাজ চান।" তোমার মা আপত্তি জানিয়ে বল্‌লেন "কিন্তু সে তো আর মজুর নয় যে, সেথায় গিয়ে কাজ করবে।" এবটে বল্‌লেন, "সে নিজে নাই বা খাটলে, তার অর্থ আছে তা দিয়ে সে মজুর খাটাতে পারে বটে, এতেই দেবতারা সন্তুষ্ট হবেন।"

তোমার মা তাঁকে বেশ খুসী করলেন, পুরোহিত তখন আমাদের সর্ব্বশক্তিমান বুদ্ধদেবের পূজো কর্‌তে বল্‌লেন এবং তাঁর আদেশ গ্রহণ করবার উপদেশ দিলেন।

তোমার মা তিন বার ভক্তিভরে বুদ্ধকে প্রণাম করলে পুরোহিত তোমার মার হাতে একখানি কাগজ দিলেন, কাগজে লেখা "যারা এসেছে পশ্চিম দ্বারে তাদের জন্য স্বাস্থ্য ও শান্তি সঞ্চিত রয়েছে।" এর মানে তোমার মা কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লেন না, তখন পুরোহিতের হাতে আরো কিছু রৌপ্য মুদ্রা দিতে তিনি বল্‌লেন "পশ্চিম দ্বারের পাশে জ্ঞান-পেচক চোং কং আছেন, তাঁর পিতামহ অতি জ্ঞানী ছিলেন, তাঁর সব জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন এই ডাক্তার চোং কং, বিশ্বের কিছু এঁর অজানা নেই এঁর কাছে যাও—সেথায় গেলেই তিনি সারবার উপায় করে দেবেন।"

আমরা পশ্চিম দ্বার অভিমুখে যাত্রা করলেম, আমার দুষ্ট মনে কিন্তু নানা ভাবেরই উদয় হচ্ছিল। ডাক্তার ও পুরোহিত দু'জনাই দু'জনার লাভের ব্যবসায়ের বেশ কর্ম্ম এঁটেছেন, আমরা যদি প্রথমে ডাক্তারের কাছে

যেতাম তবে বোধ হয় তিনি পুরোহিতের কাছে যাবার উপদেশই দিতেন। এ সব কথা মনে হয়েছিল তাই তোমায় লিখ্‌ছি এ সব কথা চিন্তা করতেও আমার কেমন ভয় হয়, একটা অজানা দুর্ব্বলতায় প্রাণ আচ্ছন্ন হয়ে আসে।

অন্ধকার কক্ষে ডাক্তার বসে আছেন, তার ডান হাতের কাছে প্রকাণ্ড কয়টা ডিম রয়েছে, এই আঁধার কক্ষে তাকে পেচকের মতই দেখাচ্ছিল, তোমার মা এই মহাপুরুষের চিন্তার বাধা জন্মাতে এসেছেন বলে তার কাছে মিনতি জানালেন। তিনি পুরোহিতের চিঠিখানি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করে—"ডাক্তারি শিক্ষার সোনার আয়না" নামে মস্ত একখানি পুঁথি বের করে পাতা উল্টাতে লাগ্‌লেন। তারপর একটা কবিতা লিখে পাঠ কর্‌লেন—তার ভাব হচ্ছে "চীনের প্রাচীর অপেক্ষা উচ্চ স্বর্ণ-মন্দিরে স্বাস্থ্যের ঔষধ আছে কিন্তু সে ঔষধ দৈত্যের হস্তগত।" তোমার মা এ কবিতার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে, ডাক্তারের টেবিলের ওপর কিছু মুদ্রা রেখে বিদায় নিলেন। তাঁর মুখের ভাবে বোধ হচ্ছিল যেন তিনি এখান থেকে বিদায় হতে পার্‌লেই বাঁচেন। তারপর ডাক্তারের কথা মত একটা ঔষধের দোকানে প্রবেশ কর্‌লুম, পরিচারক এসে কাগজখানা ঔষধ প্রস্তুতকারীর কাছে নিয়ে গেল, আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা কর্‌লুম, তোমার মা তো বিরক্ত হয়ে শেষে ঘুমিয়েই পড়্‌লেন, আমি চেয়ারে বসে উঠানে অন্ধদের সব ঔষধ প্রস্তুত কর্‌তে দেখ্‌ছিলুম, মহিষের মত তারা ঘানি ঘুরাচ্ছে—হায়! কি পাপে ভগবান বেচারীদের এ শাস্তি দিচ্ছেন, আঁধার তাদের চারিদিকে, জগতের সকল সৌন্দর্য্য হতে তারা বঞ্চিত—নিজে অন্ধ, অথচ পরের আরোগ্য হবার ঔষধ তাদের দিয়ে তৈরী হচ্ছে! অনেকক্ষণ অপেক্ষা কর্‌বার পর পরিচারক ছোট্ট একটা ভাঁড়ে করে ঔষধ নিয়ে এল—এই তো ঔষধ, এই প্রস্তুত কর্‌তে আবার এত সময় লাগে!

ঔষধের বর্ণ কাল, বিশ্রি, গন্ধও তেমন সুবিধার নয়। যা হোক সি-পে ক্রমে ভাল হতে লাগ্‌ল। মি-টির কাছে সংসার আবার মধুর বোধ হোল, ওষ্ঠে তার সঙ্গীত ভাস্‌তে লাগ্‌ল। সে এখন আমাদের সেই আনন্দময়ী,—কুণ্ডলে অপূর্ব্ব পুষ্পশোভা, নানা বিচিত্র রংয়ের পোষাকে তাকে প্রজাপতির মত দেখায়। পি-পের অসুখে সে এত চিন্তিত হয়ে গেছিল, যে আমরা তাকে ঠাট্টা কর্‌তুম—কিন্তু এখন ভাব্‌ছি যদি তোমার অমনি অসুখ হোত—আর আমি আরোগ্যের উপায় না জান্‌তেম! প্রিয়তম আমার, নারীর স্বামীই যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ,—নিজের প্রাণ অনন্ত স্বর্গ—স্বামীর তুলনায় অতি তুচ্ছ। নারীর আশা, আকাঙ্ক্ষা, সবই সে। তারই নিশ্বাসে হৃদয় তার আনন্দে ভরে আসে—নারীর জীবন স্বপ্ন, প্রেমের গভীরতায়,—সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হয়ে যায়।

আমি তোমারই—

পত্নী।

(৫)

প্রিয়তম আমার,

তোমার মা বিয়ে বিয়ে করে পাগল হয়েছেন, না গো চম্‌কে উঠো না—এ চিন্তা তার নিজের জন্য কিছু নয়। তিনি 'আআর-নদীতে' তোমার পূজনীয় পিতার জন্য শোক করতে যাচ্ছেন, সেথায় তার সম্মানের জন্য একটা 'ফটক'ও তৈরী হবে। তিনি তার সংসারের কথা নিয়েই মহা চিন্তায় পড়ে গেছেন, মা বলেন এ বাড়ী চারিটি নারীর স্থান হবার পক্ষে অতি ছোট—তার মধ্যে তো তিনজনার মাথা নেই বল্‌লেই হয়, এর মধ্যে তোমার প্রিয়তমা পত্নীও পড়েছেন, কিন্তু এতে তিনি অদ্ভুত প্রকৃতির মা-লিকেও জড়ালেন কেন বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা, তিনি যে পুত্রবধূদের বড় স্নেহের চোখে দেখেন না সে তো তাঁর কথাতেই বোঝা যায়।

প্রথমে মা-লির কথা বল্‌বার আগে তোমার ভাই সম্বন্ধে গোটা দুই কথা বলা দরকার। তোমার মা ঠিক বলেছেন যে, তার বিয়ে দিয়ে একটা কিছু 'পিছটান' জুটিয়ে দেওয়া দরকার। সে কারো কথা শোনে না, সব সময় 'সোণার পদ্ম' চা'র আড্ডায় পড়ে থাকে। সে মন্দও না দুষ্টও না কিন্তু কি খেয়াল মদ খেয়ে সব সময় ভোঁ হয়ে থাকে। কোন কাজ করে না, লেখাপড়া তো নাই, প্রায়ই এত রাত করে বাড়ী ফেরে যে আমি আমার অম্লাকে ফটকের পাশে শুইয়ে রাখি, যেন এলেই দোর খুলে দেয় তোমার মা যাতে তার এত রাত বাইরে থাকা না জান্‌তে পারেন। সে ছেলে মানুষ কিন্তু বন্ধু যাদের করেছে কেউ তার উপযুক্ত নয়, ওরাই ওকে এমনি ভাবে পিচ্ছিল পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

তার বিয়ে কর্‌বার ইচ্ছা নাই, আমরা তাকে বলেছি, বিবাহ ভগবানের বিধান, এ মান্‌তেই হবে—নারী বা পুরুষের কারো নিজের ইচ্ছায় এ হয় না। তার কাছে এ সব কথা বলা বৃথা, কাঁচাগাছে তো আর আগুন সহজে ধরাণ যায় না, আমায় বোধ হয় সে যৌবনের এই স্বাধীন উদ্দাম শৃঙ্খলতার পক্ষপাতী হয়ে পড়েছে।

পূজনীয়ার জ্ঞানবুদ্ধি সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই কিন্তু আমার বোধ হয় তিনি ফোং-ইর 'কনে' নির্ব্বাচনে ভুল করে বসেছেন, তিনি চি-সের একজনার কন্যা মনোনীত করেছিলেন, সবই প্রায় ঠিক হয়েছিল, পণ-পত্র সম্বন্ধেও কথা হয়েছিল, কিন্তু জ্যোতির্বিদ যখন তাদের এ মিলন সুখের হবে কিনা দেখ্‌বার জন্য 'কোষ্ঠি' মেলালেন তখন দেখা গেল ফোং ইর হচ্ছে সিংহরাশি, কনে যিনি হবেন তার হচ্ছে পক্ষী-রাশি, তখন পরিস্কার বোঝা গেল এমন ধারা দু'জনার মিলন হতে পারে না। আমার বোধ হয়, তোমার মা শুনলে আর রক্ষা নাই। জ্যোতির্বিদকে কিছু টাকাও দেওয়া হয়েছিল, ফোং-ই আমার কাছ থেকে কিছু ধার নিয়েছিল। সেদিন দেখ্‌লুম জ্যোতির্বিদের পত্নী আমাদের সমুখ দিয়েই একটি লাল ও সোণালি রংএর নূতন পোষাক পরে গেলেন।

আমার বোধ হয় ফোং-ই কনে দেখেছে, লোকের মুখে শুনি কনে মোটে সুন্দরী নয়, কিন্তু বুড়োদের মুখে যেমন শুনি "কস্তুরির গন্ধ শুঁকেই চেনা যায়, ডাক্তারখানার লেবেল দেখে নয়" খুব সম্ভব সে বেশ ভাল পত্নীই হোত, আমরা একজন নূতন সঙ্গিনী পাব এই যথেষ্ট।

বসন্তের মধুর বৃষ্টি পড়্‌চ্ছে এখন এখানে, এ শরতের ঠাণ্ডা, আঁধার বৃষ্টি নয় কিন্তু এ বৃষ্টি প্রান্তর মাঠ বয়ে, ধানের শিষগুলোকে সরল মধুর পরশ দিয়ে নেচে হেসে আসছে, এর সাড়া পেয়ে গাছে গাছে সব সবুজ কোমল পত্র-পল্লব ফুটে উঠ্‌ছে।

রাত্রে ছাদের উপর ঝম ঝম শব্দ; সকালে উঠে দেখি সমস্ত বিশ্ব যেন ধুয়ে মুছে নূতন সাজে সাজান হয়েছে, নূতনত্বের সে বৈচিত্র দেখে চোখের আর আশ মেটে না।

কবে আস্‌বে তুমি—ওগো আমার প্রাণের দেবতা?

তোমার পত্নী।

(৬)

মা-লির কথা এইবার তোমায় কিছু লিখ্‌ছি। সে আর লি-টি দু'জনে বসে পশ্চিমের কক্ষটিতে লেসের কাজ কচ্ছিল, সূর্য্যের শেষ-রশ্মিটুকুও সেথায় পাওয়া যায়। আমি ঠিক জানি না, বোধ হয় তারা নিষিদ্ধ কোন বিষয়ে আলাপ কচ্ছিল, তোমার মা এমন সময় চুপি চুপি সেথায় গিয়ে তাদের তিরস্কার আরম্ভ কর্‌লেন। মালি তখন তার মাকে বল্‌লে "কুকুর, বেড়াল আর চোরই শুধু এমন লুকিয়ে এসে কথা শোনে।" তোমার মা তো রেগে একেবারে আগুন—এই জন্যেই আরো, ঠিক হয়ে গেছে মা-লির বিয়ে দিতেই হবে।

তার এখন নারীর শাসন হ'তে একটু কঠোর শাসনের দরকার হয়ে পড়েছে। কথাটি হাসির নয়—কচি খুকী মা-লির কঠোর শাসন চাই! প্রথমে তিনি সু-কং এর মেং-ওয়ের কথাই ঠিক্ করেছিলেন—সে লোকটা কিন্তু বুড়ো, আমি আপত্তি জানাতে তিনি বল্‌লেন—'সে ধনী, তার রূপোর গাদি, যৌবন আর ভালবাসার চেয়ে ঢের মূল্যবান।' আমি বল্‌লুম "রূপোর দোর সোণার খিলে বন্ধ কর্‌লেও ভালবাস্‌তে না পার্‌লে কেউ পত্নীকে আপন কর্‌তে পারে না।" তোমার মা অনেক ভেবে ভেবে পরে সেং-টা-জেন পরিবারের ছেলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাতে লাগ্‌লেন।

যেখানেই হোক মা-লির বিয়ে যে শীগ্‌গীরই হবে তার কোন সন্দেহ নাই। ও এতে সুখ করবে কি দুঃখ করবে কিছুই জানে না, বাতাসে তুলোগুলো যেমন একবার এদিক একবার ওদিক উড়ে বেড়ায় ওরও তেমনি অবস্থা,— এই হাস্‌ছে, এই কাঁদ্‌ছে।

তোমার মা ওর আশা ছেড়ে দিয়েছেন, রাগ্‌লেই বলেন—"হাঁসের পা সোজায় বড় করা যায় না, সারসের পাও সোজায় খাট হয় না, মুচ্‌ড়ে দিতে হয়, তেমনি বোকা নারীর মাথায় বুদ্ধি ঢোকান সহজে হয় না।"

আমার বোধ হয় তোমার পূজনীয়া মা মা-লির উপর একটু নির্দ্দয় ব্যবহার কচ্ছেন, সে একটি ফুলের মত—ফুলেরও তো জায়গা আছে সংসারে—সে গন্ধ ভরা বাতাসের মত মধুর, তরুণ পবিত্র তাই আমার ইচ্ছা নয় যে, সে এমন কোন সংসারে গিয়ে পড়ে যেথায় তার এই হাসি-আবদার খেলা-ধূলো, কেউ ভাল চোখে দেখ্‌বে না।

মা-লি আমার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে রোজ একটি করে বড় মোমবাতি কিনে কোয়াণ-ইসের মন্দিরে বাতি দেবার জন্য পাঠিয়ে দেয়, আমি তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম কি প্রার্থনা তার যাতে এত ভক্তির দরকার হচ্ছে—সে নিঃসঙ্কোচে আমাকে তার প্রার্থনা বল্‌লে—"কোয়াণ-ইস আমায় এমন একটি স্বামী দাও, যার আর কেউ না থাকে।"

এমন সব বাজে কথাও তোমার কানে ঢাল্‌ছি আমি—তবু তুমি তোমার নিজ সংসারের খবর বুঝ্‌বে এ থেকে। বাইরের কথা তোমার ভাই তোমায় লিখ্‌ছেন, আমার জগৎ তো এই ঘের-দেয়ালের মধ্যেই—

তোমার পত্নী।

(৭)

প্রিয়তম আমার,

তোমার বাড়ীময় ষড়যন্ত্র চল্‌ছে। তোমার পত্নীও এতে যোগ দিয়ে এমন কাজ করে বসেছেন যা নারীর পক্ষে মোটেই শোভন নয়, তুমিও নিশ্চয় তাই বল্‌বে, কিন্তু মা-লি এমন ভাবে ধরে পড়্‌লে যে তাকে প্রত্যাখ্যান কর্‌বার উপায় ছিল না। পূর্ব্বের চিঠিতে তোমায় লিখেছি সেং-টা-জেন পরিবারের ছেলের সঙ্গে মা-লির বিয়ের কথা তোমার মা চালাচ্ছেন, সে ঠিক্ হয়ে গেছে, এই শরৎকালেই মা-লি আমাদের ছেড়ে যাবে। এক সি-পে ছাড়া আর কেউ আমরা সে যুবককে দেখি নি, কিন্তু মা-লি সেদিন লজ্জাহীনার মত একটা কাজ করে ফেলেছে। সে আমায় এসে সি-পের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে জান্‌তে বলে, কেমন সে তরুণ কি না—সুন্দর কি না! এ সব কথা কি নারীর জিভ দিয়ে বের হওয়ার উপায় আছে—অন্তরে এ কথা সহস্রবার ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌লেও ঠোঁট দিয়ে যে চেপে রাখ্‌তে হয়!

আমি তোমার ভাইকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, কিন্তু যা মা-লি জান্‌তে চায় তার কাছ থেকে সে কথার তেমন সন্তোষজনক উত্তর পেলুম না। তাই আমরা একটা মতলব কর্‌লুম, এই মতলব বের কর্‌তে কতরাত্রি আমার অনিদ্রায় কেটে গেছে। কার্য্যসিদ্ধি হয়ে গেছে—তবু আকাশ নীল আছে, রাত্রে তারাও উজ্জ্বল হয়ে উঠে,

চন্দ্রকিরণ পাহাড়ের গায় তেমনি মধুর হয়েই পড়ে। মতলবের প্রথম কাজটা লি-টিকেই করতে হয়েছে, সে তার স্বামীকে বলে কয়ে একদিন সেন-কোকে 'অগ্নি-বৃক্ষ' মন্দিরে নিয়ে যেতে বলেছিল। কিন্তু সে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য জানতে পেরেই অস্বীকার করলে—সে তো চমকেই গিয়েছিল, সত্যিও তো এমন ব্যাপার কেউ ভাবতেও পারে না, মা-লি কেন তার মার নির্ব্বাচনে সন্তুষ্ট হবে না, এতো সে বুঝতেই পারে না। যাক্ লি-টির সাধ্য-সাধনায় সি-পে শেষে আর অস্বীকার করতে পারলে না—চন্দ্রোৎসবের দিন তোমার ভাই গুটিতিন বন্ধুসহ সেথায় গিয়ে কুঞ্জে কুঞ্জে বেড়াতে লাগলেন।

মতলবের অবশিষ্টটুকু হাঁসিল করবার ভার ছিল আমার ওপর—আর আমি—তোমার পত্নী বেশ একটু বুদ্ধিই খাটিয়েছিলাম।

আমি দেখছিলুম মার যেন শরীর দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে, কেমন যেন ক্লান্তি অবসাদ সব সময় বোধ করেন, আর এ ভাবে আমাদের মত বোকা বুদ্ধিহীন তিনটি নারী নিয়ে সব সময় বদ্ধ থেকে তিনি যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন সে বুঝে আমি তার কাছে বন-ভোজন বা তীর্থ দর্শন একটা কিছু জোগাড় করে নেবার মতলব করলুম।

'স্বর্ণ-মৎস্য' পুকুরের নাম করলুম, জানি ও তিনি বড় পছন্দ করেন না, তারপর পাহাড়ের উপরের মন্দিরের নাম করলুম—জানি সেও তিনি পছন্দ করবেন না—কারণ সেথাকার পুরোহিতদের উপর তিনি সন্তুষ্ট নন—তারপর পাতা উল্টাতে উল্টাতে একখানা বই থেকে সেই দুই রাজার গল্প পড়তে আরম্ভ করলুম।

এ সেই হাংচু আর সুচুর রাজাদের গল্প, যারা পুরাকালে আমাদের এই বৃহৎ প্রদেশ দুই ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। হাংচুর রাজা হয়ে গিয়েছিলেন বুড়ো, সুচুর রাজা ছিলেন খেয়ালী যুবক—তিনি বুড়ো রাজার রাজ্য থেকে আজ একখানি গ্রাম, কাল একটি নগর এমনি করে নিতে নিতে একেবারে রাজার নিজ প্রাসাদের সীমানায় এসে সৈন্য 'হানা' দিলেন। যুবা রাজার সৈন্য-বল ছিল বটে কিন্তু বুড়ো রাজারও কৌশল-বুদ্ধি ছিল, তাই তিনি এক বছরের জন্য তার শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করলেন, তিনি তাকে বহুমূল্য রেশম, চা, মণি, মুক্তা, আরো কত কি উপহার দিলেন সেই সঙ্গে প্রদেশের মধ্যে সেরা সুন্দরী একটি দাসী-যুবতীও উপহার পাঠালেন।

রাজা তো সুন্দরী পেয়ে ভারি খুসী যুদ্ধ বিপদ ভুলে তিনি নারী মহলেই মত্ত হয়ে রইলেন।

শীত শেষ হয়ে গেলে নববসন্ত সমাগমে সুন্দরী অসুখের ভাণ করে যুবা রাজাকে বললে রাজ্যের পরিখার বাইরে ওই যে পাহাড় আছে ওইখানে থাকলে তার শরীর ভাল হতে পারে। রাজা ছিলেন নির্ব্বোধ তিনি সুন্দরীর জন্য পাহাড়ের ওপর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করে অসংখ্য দাসী সহ তাকে সেখানে পাঠালেন। রাজার রাজ্য মধ্যে কেমন একা-একা বোধ হতে লাগল, তাই তিনি ওই পাহাড় প্রদেশে গিয়ে নারী মহলে বাস করতে লাগলেন, রাজা বাস কচ্ছেন সেথায় মনের সুখে তার সৈন্য সামন্ত সব রয়েছে রাজ্য মধ্যে, এমন সময় একদিন হাংচুর রাজা সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন সেই প্রাসাদে। সুচুর রাজা তখন সৈন্যহীন—সহজেই পরাজিত হয়ে সে প্রাসাদ হতে পলিয়ে প্রাণ বাচালেন। হাংচুর সৈন্যেরা মণি মুক্তোয় সাজিয়ে সুন্দরী দাসীকে শুধু বুড়ো রাজার রাজধানীতে ফিরিয়ে আনলো।

আমি এই সব তোমার পূজনীয়া মার কাছে পড়ে, তাকে বললুম আমরা সেই প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আরো কত কি ওই পুকুরের কাছে গেলেই দেখতে পাব। বাহকেরা এলে আমরা রওনা হলুম, আমরা নির্জ্জন পথে চলতে লাগলুম—পদ্ম-পুকুর দেখলুম; এ সব জায়গায় কত সোণালি মাছ ছিল আগে—উঠানগুলি সব জনশূন্য, বাগানে গাছ নেই, সব যেন কেমন লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেছে—এ সব জায়গাই একদিন ফুলের গন্ধে আমোদিত, হাসি-ভরা ছিল।

এ কেমন যেন বিষাদভরা,—আনন্দের জন্য এ প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়েছিল, এখন এর সব ভগ্ন, আমাদের মন বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে গেল।

আমরা একখানি বেঞ্চে বসে পড়লুম, সেখান থেকে সব দূরের জিনিষ দেখা যায়, সেথায় বসে আমি দূরের 'অগ্নিবৃক্ষ' মন্দির দেখলুম। আমি সেথাকার জেস্‌মিন ফুলের সৌরভযুক্ত চা'র কথা বল্‌লুম, সেথায় গেলে ওই চা খেয়ে আমাদের পরিশ্রম দূরে যাবে, শরীরও ভাল বোধ হবে।

বাহকেরা আমাদের সেথায় নিয়ে এল. সবুজে 'ফার' গাছগুলির মধ্যে মন্দিরটিকে হলদে একখানি মাণিকের মত দেখাচ্ছিল। আস্‌তেই পুরোহিতেরা আমাদের আদর করে নিলেন, তাঁদের দেওয়া চা আমরা পান কর্‌লুম—সে অবশ্য উচ্চ প্রশংসার যোগ্য নয়—সেথায় আমরা খোলা জানালার ধারে বসে বাইরের শোভা দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। উঠানে সি-পে তার তিনজন বন্ধুর সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, মা-লি একবারও চোখ তুলে চায় নাই সকলের মধ্যে কনে যেমন ভাবে বসে থাকে তেমনি বসেছিল কিন্তু সে দেখছিল।

ফেরবার সময় আমরা অন্য রাস্তা দিয়ে সেং-ডংএর সমাধি মন্দির দেখে এলুম, সেই যে দুর্ভিক্ষের সময় যিনি সর্ব্বস্ব দিয়ে দুঃখী জনের অভাব মোচন করেছিলেন, দেবতারা তাঁকে এমন স্নেহ কর্‌তেন যে সমাধিস্থানে তাঁর দেহ নিয়ে যেতে দু'ধারের তাঁর সম্মানের জন্য সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন আজো তেমনি সোজা হয়েই আছে, যেন গড়িয়ে পড়্‌বার জন্যে তাঁরই আদেশের অপেক্ষা কচ্ছেন।

তুমি কি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছ? আমি কি অন্যায় করেছি? প্রিয় আমার এ শুধু মা-লিরই জন্য, তার প্রতীক্ষায় এই কটা মাস তাকে স্বপ্নে ডুবে থাক্‌তে দাও, অজানা-অচেনা কারো কথা এমনি ভাবার চেয়ে দেবতাকে দেখে ভাবাই কি ভাল নয়?

আমার কাছে ছোকরাটি দেখ্‌তে বেশ, কিন্তু মা-লির কাছে সে দেবতা, এমন উজ্জ্বল দন্তরাজি, এমন কাল চুল, এমন মধুর চলন-ভঙ্গী বোধ হয় সে জীবনে আর দেখে নাই। মা-লির এ গ্রীষ্ম তাড়াতাড়ি চলে যাবে আর বিবাহ-বাসরের চিন্তা কারাগারের দ্বারের মত বোধ হবে না।

ওই সুদূর দেশে তোমার বিরক্তি ধরে যায় নি কি? যতবার তোমার চিঠি খুলি ততবার বোধ হয়, এইবার বুঝি আমার সুসংবাদ বহন করে নিয়ে এসেছে এ, এবার নিশ্চয়ই লেখা আছে 'আমি ফিরে আস্‌ছি, তোমার কাছে।' সেই চিঠির প্রতীক্ষা কচ্ছি আমি।

তোমারই পত্নী।

(৮)

প্রিয়তম আমার,—

বসন্ত উৎসব শীগ্‌গীরই আরম্ভ হবে। এমনি দেখা যাচ্ছে দলে দলে নারী সব তাদের 'মানত' আর মোমবাতি নিয়ে বুদ্ধের মন্দির পানে চলেছে।

গাছে গাছে মুকুল এসেছে, বসন্ত সত্যিই এসে পড়্‌লো, আনন্দে সারা বিশ্ব যেন হাস্‌ছে, জলের ওপর সহস্র ধারায় সূর্য্যরশ্মি পড়ে হেসে যেন খুন হচ্ছে।

ওগো আমার, বল তুমি—তুমি আস্‌ছ—চেরী গাছ থেকে শিশির-বিন্দু তুলে সেই সুগন্ধে স্নান করে সেই সৌন্দর্য্য দিয়ে তোমায় ধরে রাখ্‌বো যেন আর ছেড়ে যেতে না পার।

আমি তোমারই পত্নী—

(৯)

প্রিয়তম আমার,

তোমার চিঠি পেলুম, তুমি লিখেছ বসন্তের আগে হেথায় আসতে পারবে না। তাই এখানকার খবর কিছু লিখ্‌ছি তোমাকে, বসন্ত এসেছে এখানে ফুলগুলি সব ফুটে উঠেছে—সব সবুজে রঙ্গে ভরা। এই কাগজখানি তোমার চোখের যে হাসি দেখ্‌বে তাতে আমার হিংসা হচ্ছে—সম্ভবতঃ যখন তুমি ফিরে আস্‌বে ততদিন আমি ছেলের মা হ'ব—যাঃ—বলেই ফেল্‌লুম তোমায়! প্রভু আমার এ সংবাদে খুসী হয়েছ কি তুমি? নিঃশ্বাস কি তোমার একটু জোরে বইছে না—তুমি ছেলের বাপ হতে যাচ্ছ এ সংবাদে ধমনীর স্পন্দন একটু দ্রুত হয়েছে না?

এতে যে আমি কি পেয়েছি সে তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না, আমার অন্তরাত্মাকে জাগিয়ে তুলেছে এ, তার গৌরবে আমি স্নাত হয়ে উঠেছি। তুমি জান না কতবার মন্দির গিয়ে দেবীর কাছে আমি এই বর প্রার্থনা করেছি,—তিনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন, জীবন আমার ধন্য হয়েছে গো!

নারী জীবনের যা' উদ্দেশ্য সে আমি পূর্ণ কর্‌তে পেরেছি, যে নারী প্রভুর জন্য সন্তান দিতে না পার্‌লো তার জীবনের মূল্য কি? পত্নী পরিত্যাগের সাতটি কারণের মধ্যে যদি নারী তার স্বামীর পিতৃপুরুষদের প্রীতির জন্য সন্তান না দিতে পারে সেই যে একটি প্রধান কারণ সে কি আমি জানি না? কিন্তু আমার পক্ষে তো আর সে কথা বল্‌বার উপায় নেই।

সময় সময় আমি ভাবি যদি কিছু হয়, যদি দেবতারা আমার সুখে ঈর্ষা করেন। যদি আর তোমায় দেখতে না পাই? তখন আমার নারী-হৃদয় ভয়ে কাঁপ্‌তে থাকে, কোয়াণ-ইসের পায়ের নীচে পড়ে আমি বর প্রার্থনা করি।

শান্তি পাই দেবীকে ডেকে, ভয় নাই এ হৃদে, শুধু প্রেম,—এই সুখেই যে হৃদয় আমার ভরা।—তোমারই।

(১০)

প্রিয়তম আমার,

নারীদের কোলাহলে উঠান আমার মুখরিত, নানারকম শেলাইর কাজ যারা জানে এমনি সব নারীরা সব সময় ছোট ছোট পোষাক বোনাচ্ছে।

লি-টি, মা-লি এমন কি তোমার মা পর্য্যন্ত ভারী ব্যস্ত, তিনি পর্য্যন্ত ছুঁচ হাতে নিয়েছেন; এবং কেমন করে তোমার ছেলেবেলাকার পোষাক তৈরী করেছিলেন সে আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছেন, জামা কাপড়ের স্তূপ দিনে দিনেই বেশী হচ্ছে, আমি সে গুলি জড়িয়ে ধরি,—বোধ হয়, ছোট্ট একটি কে যেন তার ভেতর থেকে আমায় ধচ্ছে। জ্যাকেট, ট্রাউজার, জুতো, টুপি আরো কত কি আছে ওতে।

দৈবজ্ঞ ভবিষ্যৎ গাইয়ে, সব সময় আমাদের ফটকের কাছে আসছে, তারা জানে এলেই তারা আদর পাবে। স্বাগত—

আমি তোমারই পত্নী।

(১১)

চেরি ফুলগুলি তোমায় পাঠালেম—এগুলি তোমার উঠানেই হয়েছে। এর প্রতিটি পেলব পত্র—যে তোমায় খুব ভালবাসে তারই কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

(১২)

তুমি যদি আমার উঠানটি দেখ্‌তে একবার! এত সব চেরীফুল ফুটেছে মনে হয় যেন বরফের কার্পেট বিছানো রয়েছে। তোমায় শুধু ঘর-সংসারের কথা আর বাজে গল্প শোনাতে পারি না, আনন্দে আমার হৃদয় এত পূর্ণ হয়ে গেছে—শুধু স্বপ্ন আর কল্পনার রাজ্যে বিরাজ কচ্ছি আমি। আমার খোলা জানালার সমুখে এসে আনন্দ পাখার ঝাপট দিচ্ছে, ক'দিনের মধ্যেই স্বর্গের সমস্ত দ্বার আমার জন্য খুলে যাবে।

তোমার পত্নী।

(১৩)

সে এসেছে,—প্রিয়তম, তোমার ছেলে হয়েছে। হাত মেলে তাকে যখন আমি পরশ করি পাইন গাছের ভেতর দিয়ে বাতাসের শ্বাসগুলি যেন দেবতার সঙ্গীতের মত আমার কানে ভেসে আসে। আমি তার চোখে আয়নার মত তোমারই প্রিয় মুখখানির প্রতিচ্ছবি দেখ্‌তে পাই; আমি জানি সে আমার আর তোমার—আমরা তিনজনে এক। সে আমার আনন্দ, আমার পুত্র,—আমার প্রথম সন্তান। ক্লান্ত হয়ে পড়েছি প্রভু আমার—কলমটাও যেন ভারি বোধ হচ্ছে—কিন্তু কি সুখের মধুর এ ক্লান্তি!—

তোমার পত্নী।

(১৪)

ছেলের মা হওয়ার মত আশ্চর্য্য জগতে কিছু আছে কি? আমি শুধু গান গাই—হাসি, কি যে আনন্দে আমার দিনগুলি কেটে যায়। সমস্ত বিশ্বে বিলিয়ে দেবার মত আনন্দ যেন আমি লাভ করেছি, শুধু আমি বিলিয়ে দিতে চাই—খোকার পানে চেয়েই আমার ইচ্ছা হয় যত সব দুঃখী অনাথ জন আছে তাদের অভাব মোচন করে আমার এ আনন্দের ভাগ তাদের দি। ওগো স্বামী আমার—ফিরে এসে—তোমার খোকাকে দেখে যাও।

(১৫)

বল তো দেখি ভালবাসা কি? এখনো তো তুমি ভালবাসাকে নিজ বাহুপাশে জড়িয়ে ধর্‌তে পারনি—ভাব্‌তুম আমি তোমায় ভালবাসি, এখন সে কথা মনে উঠে আমার হাসি পায়, এখনকার এ ভালবাসার তুলনায় সে যেন ছিল সূর্য্যের উজ্জ্বল রশ্মির কাছে মোমের আলো। এখন,—এখন তুমি হচ্ছ আমার সন্তানের পিতা, আমার হৃদয়ে এখন তোমার নূতন স্থান হয়েছে। যে বাঁধনে আমাদের হৃদয়কে বেঁধেছে এখন এ বাঁধন তো আর ছাড়্‌বার নয়।

আমি তোমার প্রথম সন্তানের মা, তুমি আমায় আমার খোকাকে দিয়েছ। তোমার ভালবাসা যে কি এখন আমি জেনেছি।

আমি তোমারই।

(১৬)

বড় আশ্চর্য্য দিন গেছে আজ,—তোমার ছেলের প্রথম উৎসব হোল। একপক্ষ পূর্ব্বে তাকে আমি আমার পাশে পেয়েছি, তাই আজ তার প্রথম 'মাথা কামানোর' ভোজ গেল, আমাদের সব বন্ধুজনেরাই অনেক উপহার নিয়ে এসেছিলেন। চিলো খোকাকে একটা টুপি দিয়েছে, ভারি সুন্দর, লি-টি তার নিজ হাতে বোনা একজোড়া বেড়ালমুখো গোঁফওয়ালা জুতো দিয়েছে, এতে খোকাকে বেড়ালের মত সতর্ক স্থির পদ করবে। মা-লি খোকার

মেঠাই রাখ্‌বার জন্য সুন্দর একটি রূপোর বাক্‌স দিয়েছে আরো অনেকে অনেক দিয়েছে। অত আমি তোমায় বলে উঠ্‌তে পার্‌বো না। দুঃখের সহিত বল্‌তে হচ্ছে তোমার ছেলে সে দিন বড় ভদ্র ব্যবহার করে নাই— নাপিত কামাবার সময় সে চীৎকার করে হাত পা ছুঁড়তে লাগ্‌ল, আমি ভারি বিব্রত হয়ে পড়েছিলুম, কিন্তু ওরা সবাই বল্‌লে ছেলে কালে যে জোয়ান হবে এ তারই চিহ্ন।

ভোজের ব্যবস্থা দেখে তোমার পূজনীয়া মা আমার ওপর খুব খুসী হয়েছেন। বসন্তে সে এসেছে আমার বুকে কত মধুরতা নিয়ে, কিন্তু আমি তাকে ডাকি বোকা হাবা বলে কি জানি আমার অত্যন্ত আদর দেখে দেবতারা যদি ঈর্ষা করেন—অমন ডাক্‌লে তারা ভাব্‌বেন আমি ওকে গ্রাহ্য করি না।—ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—বড় সুখের দিন গেছে আজ—দেবতার কত করুণা!

কুই-লি।

(১৭)

প্রিয়তম আমার,

আর একটি বিয়ের খবর আছে আমাদের বাড়ীতে, আমাদের বিয়ের পরই আমাদের বাড়ীতে চু টু নামে যে একজন দাসী আসে তার কথা তোমার মনে আছে কি? শীগ্‌গীরই সুং-টং গ্রামের একজন লোকের সঙ্গে তার বিয়ে হবে, সে তো এ সংবাদে ভারি খুসী। সে অবশ্য তার বরকে দেখেনি কিন্তু তার মা বল্‌ছে—বর বেশ সুন্দর, সৎস্বভাব—বেশ ভাল স্বামীই হবে। আমি তাকে এ সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়েছি, তার চেয়ে আমি তো বয়সেও বড় বিয়েও কত দিন আগে হয়েছে—আমি তাকে বলেছি নারীর মাতৃত্বে উপনীত হবার জন্য তাকে নম্রতা, বশ্যতা, মাধুর্য্য এই সব গুণ রীতিমত অভ্যাস কর্‌তে হয়।

ছেলের মা হওয়া সব সময় সুখের নয়, জুতোওয়ালা লিং-টি আজ সকালে এখানে এসেছিল, সে বড় মনোদুঃখে আছে, তার তিন মাসের খুকীটি জ্বরে মারা গেছে—তার সৎকার কর্‌বে এমন পয়সাটি পর্য্যন্ত ওর নেই।

এ সব কথা শুনে হৃদয়ে যেন হঠাৎ কেমন একটা ঘা পড়্‌লো, আমি দৌড়ে আমার খোকাকে দেখ্‌তে গেলুম।

তুমি হেসো না যেন, আমি খোকার ডান কান ফুঁড়িয়ে একটা আংটি পরিয়ে দিয়েছি, দেবতারা ভাব্‌বেন ও খুকী, তাই ওর ওপর আর দৃষ্টি পড়্‌বে না।

যাই তোমার ছেলে ডাক্‌ছে—

তোমার পত্নী।

(১৮)

প্রিয়তম আমার,

এখানে কুদৃষ্টির কথা নিয়ে বড় আন্দোলন চল্‌ছে, সে দিন আমরা তাই লিসিং উইলো পথে এক সাধুর কাছে গিয়েছিলুম, তিনি একা ওখানে বাস করেন, এতদিন জ্ঞান অর্জ্জন করে ইনি জেনেছেন শান্তিই জীবনের প্রধান ও শেষ উদ্দেশ্য,—জয়, কৃতকার্য্যতা, ধন, সম্পদ কিছু নয়, দেবতার প্রধান দান হচ্ছে শান্তি। আমি তার কাছ থেকে আমার 'বোকাটির' জন্য একখানা মেঠাই কিন্‌লুম যেন আর কেউ আমার উঠানে এসে ওর ওপর কুদৃষ্টি দিতে না পারে।

আমার কাছে এস স্বামী আমার, বল তুমি—তুমি আস্‌ছ। তুমি দেখ্‌বে, আমি তোমার ছেলে নিয়ে ফটকের সমুখে তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি—তোমার প্রতীক্ষা কচ্ছি—

তোমার পত্নী।

(১৯)

প্রিয়তম আমার,

তোমার চিঠি পেলুম, লিখেছ তুমি সকালেই আসবে। সে দিন আমি খোকার জন্য দেবমন্দিরে 'মানত' দিতে গিয়েছিলুম—আমি সেদিন আমার সব চেয়ে দামী সেই নীলের ওপর সোনার কাজ করা গাউনটি পরে গিয়েছিলুম, কেশের রাশি জেস্‌মিন ফুলে সাজিয়েছিলুম—তুমি যে সমস্ত গহনা দিয়েছ সব পরেছিলুম। আমার খোকা লাল জ্যাকেট গায় দিয়ে সেজেছিল, সে আমার কোলে বসে বেশ সুখে যাচ্ছিল,—বাহকদের আগে একজন দীন-দরিদ্রদের পয়সা বিলোতে বিলোতে যাচ্ছিল, আমার ইচ্ছা এই আনন্দের দিনে সকলেই সুখী হোক।

বাহকেরা একেবারে আমায় কোয়াণ-ইসের আসনের সমুখে এনে নামালে, আমি প্রণাম করে বড় বড় মোমবাতিগুলো স্বর্গের দেবীর সমুখে জ্বালালুম। তারপর সেই জ্যোতিষ্মান্‌ সর্ব্বশক্তির আধার বুদ্ধদেবের মন্দিরে গিয়ে খোকার মাথা তিনবার তার পায়ে ঠেকালুম—যেন খোকা আমার তাঁর বিশ্বাসী ভক্ত হয়।

বাহকদের পা'র 'প্যাট প্যাট' শব্দ শুনতে শুনতে বাড়ী ফিরলুম—চারিধারের সবই যেন সুখে ভরপুর! আর আমি কুই-লি—ছেলে কোলে নিয়ে চলেছি, আমিই যেন সব চেয়ে সুখী আজ।

প্রিয়তম আমার—দেবতার অসীম করুণা—তোমার মঙ্গল করুন।

কুই-লি

(২০)

একাকিনী পাহাড়ের শৃঙ্গে দাঁড়িয়েছি আমি। সেদিনও আমি কোয়াণ-ইসের পায় উপহার দিয়ে এসেছি, তিনি আমার প্রার্থনা শোনেন নি, না—না—দেবীদের দয়া নেই। শুধু কাঠের আর সোনার দেবী উনি,—আমার নৈরাশ্যে শুধু হাস্‌ছেন—কি যে আমি পেয়েছিলুম, কি যে হারালুম, সে তো আর ওরা বুঝ্‌তে পার্‌বেন না।

আমার ছেলে—আমার খোকা নাই! তার দেহ থেকে প্রাণ উড়ে গেছে—ঠোঁটের সে কম্পন নেই। সমস্ত রাত্রি তাকে আমি হৃদয়ে জড়িয়েছিলুম—তবু তার দেহ উষ্ণ কর্‌তে পার্‌লুম না। ওরা আমার কাছ থেকে আমার খোকাকে নিয়ে গেল—বল্‌লে সে ভগবানের কাছে গেছে। ভগবান তো সেই বিশ্বে—আমি বড় একাকিনী!

(২১)

তোমারই চোখ ছিল তার, তোমারই মত ছিল সে। তুমি কখনো তোমার ও আমার ছেলেকে জান্‌তে পার্‌লে না, আমার বসন্ত সমাগম বুঝ্‌লে না, তুমি এসে তোমার খোকাকে দেখ্‌বে সে অপেক্ষাও কি তাদের সইলো না? কত সুন্দর কেমন হৃষ্টপুষ্ট ছিল সে—আমার প্রথম সন্তান।

(২২)

রেগো না আমার ওপর—লিখ্‌তে তো পারি না—কি কর্‌বো আমি! কতক্ষণ শুয়ে শুয়ে সূর্য্যরশ্মির ভেতরকার ওই উজ্জ্বল কিরণবিন্দু দেখে ভাবি আমি আমার নারী জন্মের সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা, বিষাদ, বৃথা সব বিসর্জ্জন দিয়ে অমনি একটি বিন্দু হয়ে যদি থাক্‌তে পার্‌তুম।

ওদের তো এমন ভাবনা নেই। রাত্রে ঘুমে আর আমার চোখ ভারি হয়ে আসে না, কত রাত ছাদে পড়ে থাকি—আর ও ঘরে যাব না, আঁধার বিষাদ ভরা ওঘর—রাত্রের গোলমাল মৃদু ভাবে আমার কানে আসে যেন ওরাও আমার ব্যথার ব্যথী। মনে হয় প্রভাতের আলো আর আস্‌বে না—কিন্তু সে তেমনি আসে, কিন্তু তাতে তো আমার আনন্দ হয় না।

(২৩)

ওরা সবাই একটি ছেলে এনে দিয়েছে আমার কোলে, কোন ভিখিরীর সন্তান, রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া, আমার মনে হোল, না—না—তার জায়গায় যে অন্যের স্থান দেওয়া সে তো আমি পারব না, আমি শক্ত হয়ে বসে তাকে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা কর্‌লুম, কিন্তু শিশুর মুখের এবং হাতের পরশে যে সুখের আমার অবসান হয়ে গিয়েছিল, সে যেন আবার ফিরে এল—আর সহ্য কর্‌তে না পেরে শিশুর মাথার ওপর মুখ গুঁজে পড়্‌লুম—

আর লিখতে পাচ্ছিনা—হৃদয় আমার ফেটে যাচ্ছে।

(২৪)

দেবমন্দিরে যাব না বলে আমার কথা শুন্‌তে হয়েছে। কত সব নারী আস্‌বে সেথায়, সুখী তারা—কোল জুরে তাদের খোকা খুকীরা থাক্‌বে—আমায় কোল শূন্য।

কত সব আস্‌বে তাদের দুঃখ নিবেদন কর্‌তে কোয়াণ-ইসের পায়, ওরা জানেনা যে, দেবী আমাদের নারীদের জন্য একটুও ভাবেন না, তিনি তার পদ্মাসনে বসে আমাদের, মাদের দুঃখ নৈরাশ্য দেখে হাসেন, কাঠের দেবতা তিনি কি করে জান্‌বেন ?—

ছাদে পড়ে থাকি, একাকিনী নীরব স্বপ্নে দিন কেটে যায়। আমার তো আর ভগবান নেই।

(২৫)

ওরা দোকান থেকে আমায় একখানি নূতন দেবতার বই এনে দিয়েছে, ও আমি পড়্‌বো না, আমি বলি কত দেবতা তো রয়েছেন, আবার কেন নূতন একটি বৃদ্ধি করা ? আমার আর মোমবাতি কি ভক্তি নেই দেবতার সমুখে দিতে, কিন্তু বইখানির পাত উল্টাতে উল্টাতে দেখ্‌লুম তিনি বিশ্রাম, শান্তি, প্রেম দেন, শান্তি সেই যে সাধু আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন সবের শেষ—সবের সেরা, আমি—আমি তো স্মৃতির দান ভুলতে চাইনা, আমি স্মৃতি চাই কিন্তু ব্যথা শূন্য হবে সে।

চেরীফুল ফুটেছিল, চলে গেছে। আমার বসন্ত স্বপনের মত ক্ষণকাল - তারা থেকে চলে গেছে, কিন্তু চলে গেলেও এ জ্ঞান তারা আমার রেখে গেছে, আবার তারা ফিরে আস্‌বে। একটা কথা যেন শুন্‌ছি কোথা থেকে কে নিরাশ মাকে বল্‌ছে "কেঁদো না, আবার তুমি তোমার টিকে দেখতে পাবে।"

আমি মন্দিরওয়ালা দেবতা চাই না, কোয়াণ-ইসের কাছে কেঁদে কত নিবেদন কর্‌ছি কিন্তু সে সব প্রাণ হীন দেয়াল থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এসেছে।

এমন দেবতা আমি চাই, যিনি নিশীথে এসে আমার খোকার জন্য হাহাকার ভরা প্রাণে তৃপ্তির পরশ দিয়ে আমার শূন্য প্রাণে শান্তির বাতাস বইয়ে চোখ দু'টি বুজিয়ে দিয়ে যান।

দুঃখ আর নৈরাশ্য ঘেরা সমাধির মধ্যে আমি ডুবে আছি। একাকিনী সহায়হীনা নারী, আঁধারে বাহু বাড়িয়ে দিচ্ছি, কিন্তু এ আঁধারের মধ্যেও যেন অতি ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছে—আশার বাণী বল্‌ছে 'ভগবান আছেন।'

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

তার স্বরূপ

—:*:—

(চীনাকবি ছু-কঙ হইতে)

অণুপরমাণু নহে তার উপাদান
মন জ্ঞানময় নহে তার তনুখানি,
সিত মেঘে মেঘে পবনে সে প্লবমান
তাহার স্বরূপ প্রকাশিতে নাহি বাণী।
অসীমের মাঝে দূরে দূরে যবে ঘুরে
মনে হয় তারে রয়েছে সে কাছে কাছে,
কাছে গেলে তার, কোথা চলে' যায় উড়ে
মিছামিছি ছুটা নিশিদিন পাছে পাছে।
'তাও' আর তাহে নাহি বুঝি কোনো ভেদ
তাহারে বুঝাতে সকল তত্ত্ব হারে,
বুঝাতে পারেনা আগম নিগম বেদ
অধ্রুব পাশে ধরা নাহি যায় তারে।
গিরি তরু মরু গগন গহন প্রাণে
রবি সুধাকরে ঘুরে ফিরে অনাহুত,
তার কোনো বাণী পশেনা কখনো কানে
ধ্যান সমাধিতে হয় শুধু অনুভূত।

শ্রীকালিদাস রায়।

বাঙ্গলা ভাষা।

—:-*-:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিশুদ্ধ ও অশুদ্ধ বাঙ্গলা।

বানান ব্যতীত অন্য কারণেও ভাষা অশুদ্ধ বা দোষযুক্ত হয়। ইংরেজেরা নিজের ভাষা কত সাবধান হইয়াই বলেন ও লেখেন। তথাপি যদি কোন লেখক অসাবধানতায় বা অজ্ঞানতাহেতু কোন অশুদ্ধ শব্দ প্রয়োগ করেন তাহা হইলে অবিলম্বেই তাহার সমালোচনা হয়। বাঙ্গলায় সেরূপ সমালোচনা প্রায়ই হয় না। কত ভ্রান্ত প্রয়োগ চলিয়া যাইতেছে। বিদ্বান্ লোকের ভুল যদি ধরিয়া দেওয়া না যায় তাহা হইলে অল্প শিক্ষিত লোকে সেই ভুলকে

শুদ্ধ ভাবিয়া তাহার অনুকরণ করে। সুতরাং ভাষার বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা নষ্ট হয়। বাক্‌শুদ্ধিই পণ্ডিতদিগকে পূত ও বিভূষিত করে। এক এক জন পাদ্রি সমস্ত সপ্তাহ পরিশ্রম করিয়া রবিবারের উপদেশ (sermon) প্রস্তুত করেন। তাঁহারা উপদেশ কালে, এবং ব্যারিষ্টরেরা আদালতে বক্তৃতা করিবার সময়ে যেরূপ উচ্চারণ করেন তাহাই অপর সাধারণের আদর্শ হয়। পূর্ব্বে কোন বানানের পরিবর্ত্তন যতদিন Times পত্রিকা স্বীকার না করিতেন ততদিন সাধারণ কর্ত্তৃক তাহা গৃহীত হইত না। এখন Times এর সেই প্রাধান্য আছে কি না তাহা জানি না। কিন্তু পূর্ব্বে Times পত্রিকাও হঠাৎ কোন বানানের পরিবর্ত্তন করিলে তাহারও প্রতিবাদ হইত। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা ভাষা বিষয়ে বড় সাবধান ছিলেন। দেবস্থানে যাইবার সময়ে চিত্তশুদ্ধির সহিত, শরীর বস্ত্র এবং বাক্‌শুদ্ধিও আবশ্যক মনে করিতেন। এই জন্য স্নান করিয়া শুদ্ধ বস্ত্র পরিয়া সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমরা এমনই ভাবুকতা বর্জ্জিত হইয়াছি যে আমরা উপাসনা গৃহে যাইবার সময়ে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক মনে করি না—যাহা পরিয়াছিলাম তাহাই পরিয়া যাই এবং না ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা মুখে আসে তাহাই বলি—তাহা বিশুদ্ধ কি অশুদ্ধ একবারও ভাবি না। এখনকার কোন আচার্য্যই উপাসনা বেদী হইতে সাধুভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন না। অন্যের কথা দূরে থাকুক দেশের সর্ব্বপ্রধান কবি ও চিন্তাশীল শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কেও উপাসনার সময়ে বাস্তবিক অর্থে "সত্যকার" এই স্তোত্র এবং অশুদ্ধ শব্দটা বলিতে শুনিয়াছি। কলিকাতা অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা বাস্তবিক অর্থে 'সত্যিকার" বলিয়া থাকেন। রবীন্দ্রবাবু সেই অদ্ভুত শব্দটাকে একটা সংস্কৃত আকার দিয়া পুনঃপুন ব্যবহার করিয়া থাকেন।

অন্যান্য লেখকের আরও দুই চারিটা ভ্রান্ত প্রয়োগ প্রদর্শন করিতেছি। কয়েকস্থানে "কায়াদান" ও "কায়াধারণ" কথা পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি। সংস্কৃতে কায়া নামে কোন শব্দ নাই। কায়া শব্দ অশুদ্ধ। কায়মনোবাক্য, কায়েন মনসা বাচা কায়ক্লেশ প্রভৃতি কথা হইতে আমরা জানি যে কায় শব্দ অকারান্ত। সংস্কৃত অকারান্ত বহু শব্দ বাঙ্গলায় আকারান্ত হইয়া যায় যেমন গল স্থানে গলা, স্বর্ণ স্থলে সোণা, রৌপ্য স্থলে রূপা ইত্যাদি। কায়া শব্দও সেইরূপ কায় হইতে হইয়াছে। কিন্তু এই সকল বাঙ্গলা শব্দকে সংস্কৃত শব্দের সহিত যুক্ত করিয়া সমাস রচনা করা যাইতে পারে না। সংস্কৃতে সংস্কৃতে সমাস হয়, বাঙ্গলায় বাঙ্গলায়ও হইতে পারে। কিন্তু সংস্কৃতে বাঙ্গলায় সমাস সাধু প্রয়োগ নহে। সোণালঙ্কার, রূপাপাত্র, গলাদেশ ভাল নহে কিন্তু স্বর্ণালঙ্কার, রৌপ্যপাত্র, গলাধাক্কা প্রভৃতি সমাসে দোষ নাই। তেমনি কায়াধারণ বা কায়াদান সৎ প্রয়োগ নহে।

চওড়া বা আয়ত অর্থে "প্রশস্ত" শব্দের ভ্রান্ত প্রয়োগ হইতে বঙ্গদেশের অনেক পণ্ডিতও অব্যাহতি পান নাই। কোন পত্রিকার এক প্রবন্ধ লেখক "সুগন্ধে মুখরিত" হওয়ার কথা লিখিয়াছিলেন সুগন্ধে সুশ্রাব্য ও সুরভিত হওয়া লিখিলে আরও ভাল হইত।

ভারতবর্ষের দক্ষিণভাগকে দাক্ষিণাত্য বলা—বাঙ্গালীদিগের একটা রোগ হইয়াছে। সেই দেশের সংস্কৃত নাম দক্ষিণ এবং দক্ষিণাপথ। দক্ষিণদিক বা দক্ষিণ দেশে যাহা জন্মে তাহাই দাক্ষিণাত্য। দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ, দাক্ষিণাত্য আচার ব্যবহার হইতে পারে কিন্তু দাক্ষিণাত্য দেশ হইতে পারে না হরিভট্ট শাস্ত্রী মালিকর নামক একটী দাক্ষিণাত্য পণ্ডিত আমাকে এই ভুলটী বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার ভূগোলে এই ভুলের প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। তাহার পর হইতেই ইহার সার্ব্বভৌম বিস্তার হইয়াছে। যদি দক্ষিণ দেশকে দাক্ষিণাত্য বলা যায় তাহা হইলে এই দেশকে অত্রত্য এবং সেই দেশকে তত্রত্য বলা যাইতে পারে। আমরা যদি অত্রত্য হইতে দাক্ষিণাত্য যাই এবং তত্রত্য হইতে পাশ্চাত্য, পৌলস্ত্য এবং প্রাচ্য ঘুরিয়া আবার অত্রত্যে ফিরিয়া আসি তাহা হইলে পৃথিবীর গোলত্ব প্রমাণিত হইতে পারে বটে কিন্তু শব্দগুলির ভ্রান্ত প্রয়োগের দোষ ক্ষালিত হয় না।

যথেষ্ট শব্দের অর্থ যত প্রয়োজন বহু পরিমাণ অর্থে প্রযুক্ত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্ষম বা সমর্থ অর্থে সক্ষম শব্দের প্রয়োগ এক অদ্ভুত কার্য্য। ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রচারককে আবার ইহার উপর অক্ষম অর্থে অসক্ষম বলিতে শুনিয়াছি।

যে কথাটা ঠিক্ কোন কোন লেখক সে কথাটাকে সঠিক করিয়া দেয়।

স্বর্গগত বা পরলোকগত অর্থে স্বর্গীয় শব্দের ব্যবহারও দুষ্টপ্রয়োগ।

সাধুভাষা ও চলিতভাষা।

যাহা হউক এ সকল অপেক্ষাকৃত অকিঞ্চিৎকর বিষয়। বাঙ্গলাভাষা সম্বন্ধে প্রধান কথা এই যে ভদ্র ও শিক্ষিত লোক সাধুভাষায় অর্থাৎ সাধারণত যে ভাষায় পুস্তক, পত্র, পত্রিকা এবং সংবাদপত্র লিখিত হয় সেই ভাষায় কথা কহেন না। আর কোন সভ্যদেশেই বোধহয় এরূপ নহে। হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষা ভাষী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পরস্পর কথোপকথনের সময়ে বাক্‌শুদ্ধি বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন। ধর্ম্মালয়ে এবং আদালতের ভাষার ত কথাই নাই। ইংরেজেরাও ঠিক্ সেইরূপ করেন। জর্ম্মাণীতে লিখিত ও কথিত ভাষায় প্রভেদ ছিল। এখন সমস্ত ভদ্রলোকেই কথোপকথনে লিখিত ভাষা অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি। কিন্তু আমাদের দেশে অন্য স্থানের কথা দূরে থাকুক ধর্ম্মালয়েও সাধুভাষার ব্যবহার হয় না। সাধুভাষা কথোপকথনে প্রচলিত হওয়া উচিত কি চলিতভাষা লেখায় প্রচলিত হওয়া উচিত এ প্রশ্ন অনেকের মনেই উদিত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া আমি এই বিষয়ে যত লোকের সমালোচনা পাঠ করিয়াছি তাঁহারা কেহই ভাষা সম্বন্ধে সর্ব্ব-প্রধান বিষয় লইয়া আলোচনা করেন নাই—সকলেই বস্তুর নাম বিষয়ে যথা চলিতভাষায় পুষ্করিণী বলা হইবে, না লিখিত ভাষায় পুকুর লেখা হইবে ইহা লইয়া বিচার করিয়াছেন। কিন্তু আমার বিবেচনায় বস্তুর নামের উপর ভাষা নির্ভর করে না। একটা অশ্ব কৃষ্ণবর্ণ হউক বা শ্বেতবর্ণ হউক, স্থূল হউক বা কৃশ হউক, বলিষ্ঠ হউক বা দুর্ব্বল হউক, সুস্থ হউক বা রুগ্ন হউক, অশ্বই থাকে। সুতরাং এমন কোন অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু আছে যাহার উপর অশ্বত্ব নির্ভর করে। সেই অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু অশ্বের কঙ্কাল। সেইরূপ প্রত্যেক শ্রেণীর জীবেরই ভিন্নরূপ কঙ্কাল আছে। প্রত্যেক ভাষারও সেইরূপ কঙ্কাল আছে যাহা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। ইহা কয়েকটী দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিব। জিওগ্রাফি, ফিলসফি প্রভৃতি গ্রীক শব্দ আরবী ও পারসী ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। হোরা, কেন্দ্র, জামিত্র প্রভৃতি গ্রীক শব্দ, যৌতুক, কুঠার, ঘট প্রভৃতি দ্রাবিড় শব্দ, আরবী হইতে দ্রেক্কান শব্দ, বিনিস (venice) হইতে বণিজ বা বণিক্ শব্দ phoenicia হইতে পণ্য শব্দ সংস্কৃতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। লণ্ঠন, রেল, দলীল, বিছানা, আদালত প্রভৃতি শত শত ইংরেজী, পারসী শব্দ বাঙ্গলায় ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু তাহাতে আরবী, পারসী, সংস্কৃত ও বাঙ্গলাভাষার বিশেষত্ব কিছুমাত্র নষ্ট হয় নাই। লাটিন, গ্রীক, স্যাক্সন, আরবী, সংস্কৃত এবং অন্য বহু ভাষা হইতে বহু শব্দ পরিবর্ত্তিত বা অপরিবর্ত্তিত ভাবে ইংরেজী ভাষায় প্রচলিত আছে। কিন্তু ইংরেজী ভাষা যাহা ছিল তাহাই আছে ও থাকিবে। যে সকল বাঙ্গালী ইংরেজী জানেন তাঁহারা বাঙ্গলা বলিবার সময়ে অনেক ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই মিশ্র ভাষার প্রত্যেক পদই ইংরেজীতে পরিবর্ত্তনীয় নহে। "তিনি আমাকে মারিয়াছেন" এই বাক্যটী মিশ্র ভাষায় প্রকাশ করা যাইতে পারে না। "তোমার ভাই কলিকাতায় গিয়াছেন" ইহার মিশ্র বাঙ্গলা হয় "তোমার brother calcutta গিয়াছেন।" এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত হইতে আমরা দেখিতে পাই যে মিশ্র ভাষায় প্রধানত সর্ব্বনাম ও ক্রিয়া পদের পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। প্রধানত নাম ও বিশেষণই ইংরেজীতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। ইহা যে কেবল বাঙ্গলা ভাষার বিশেষত্ব তাহা নহে, প্রত্যেক

ভাষারই ক্রিয়াপদ, সর্ব্বনাম, যোজক, প্রত্যয়, বিভক্তি প্রভৃতি লইয়া কঙ্কাল প্রস্তুত হয় অর্থাৎ প্রত্যেক ভাষাই ব্যাকরণের উপর নির্ভর করে। ম্যাক্‌শ্‌মুলর বলেন "It matters not how many words may be derived in common from a language. It does not pronve the identity of any two dialects. It is the grammar we must look to, to decide their identity. সুতরাং যদি বস্তুর ভিন্ন দেশীয় নামই বাঙ্গলায় প্রচলিত হইতে পারিল তখন প্রাদেশিক ভিন্ন ভিন্ন নামও কখন কখন সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। অনেকে হয়ত "destroy করা" "prove করা" প্রভৃতি দেখিয়া বা শুনিয়া হঠাৎ ভাবিতে পারেন যে ইংরেজী ক্রিয়া পদও মিশ্র বাঙ্গলায় প্রযুক্ত হয়। কিন্তু কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিলেই বুঝা যাইবে যে এইরূপ কথাগুলি ইংরেজী ক্রিয়া জ্ঞাপক শব্দকে "করা" শব্দের যোগে বাঙ্গলার ছাঁচে ঢালিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইংরেজী ক্রিয়া পদ বাঙ্গলায় এবং বাঙ্গলা ক্রিয়া পদ ইংরেজীতে অপরিবর্ত্তিত ভাবে কখনই ব্যবহৃত হইতে পারে না।

সর্ব্বনামের নানা আকার বাঙ্গলায় প্রচলিত আছে। যথা তিনি, তেঁও, তানি, তাঁহারা, তাঁরা, তান্‌রা, তিনিরা, তেন্‌রা ; তাঁহাকে, তাঁকে, তিনিকে তাঁক, তেঁওক ; তাঁহার, তাঁর, তেনার, তেওর, তিনির ; তাঁহাদিগের, তাঁদের, তানাদের, তেনাদের, তেনবার, তিনিবার। উত্তমপুরুষ ও মধ্যমপুরুষের সর্ব্বনামেও সেই প্রকার নানা রূপ আছে। এই সমস্ত রূপের মধ্যে ইহাদের সাহিত্যিক রূপ বহুদিন হইল স্থির হইয়া গিয়াছে। সেগুল ideal না হইলেও শিক্ষিত ভদ্রলোক কথা কহিবার সময়েও সেই সমস্ত রূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেবল কথোপকথনে আমাদিগের, তোমাদিগের, তাহাদের, তাহাদিগের প্রভৃতি এবং রাঢ়ের বাহিরে আমাদিগকে, তোমাদিগকে প্রভৃতি শুনিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে না।

ক্রিয়া পদের ও সাহিত্যিক আকার স্থির হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অনেক লেখকের লেখায় বোধ হয় যে তাঁহারা সে আকার ভাঙ্গিয়া ক্রিয়া পদগুলির নূতন আকার দিতে চাহেন। এই রূপ করা উচিত কি না তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে এক একটা ক্রিয়া পদের কত প্রকার রূপ বঙ্গ দেশে প্রচলিত আছে তাহার কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। সাহিত্যিক, খাইলাম পদের প্রাদেশিক প্রতি শব্দ খেলাম, খেলেম, খেলুম, খালেম, খেলোম, খালাম, খেনু, খা ল, খালু। সাহিত্যিক খাইব শব্দের প্রাদেশিক প্রতিশব্দ খাব, খাবো, খামু, খাইমু, খাইতাম, খাম্। সাহিত্যিক, খাইতাম শব্দের প্রাদেশিক প্রতিশব্দ খেতাম, খেতেম, খেতুম, খালুহয়, খালু হেতেন। সাহিত্যিক, খাইতেছি পদের প্রাদেশিক প্রতিশব্দ খেতেছি, খাচ্চি, খাতেছি, খাইয়াছোঁ। এইরূপে প্রত্যেক ধাতুর ই প্রত্যেক কালে এবং প্রত্যেক পুরুষে নানা প্রকার রূপ হইয়া থাকে। এখন সমস্যা এই যে দেশে এই জনশিক্ষার আরম্ভ কাল হইতে ক্রিয়া পদের প্রাদেশিক কোন এক রূপ লিখিত ভাষায় এবং কথনে ব্যবহৃত হইবে না সাধু ভাষায় রূপের ই সর্ব্বত্র প্রচলন হইবে। প্রত্যেক প্রদেশের লোক সেই প্রদেশের চলিত ভাষায় কথা কহিবেন বা লিখিবেন এরূপ মত প্রকাশ করিতে বোধ হয় কেহই সাহস করিবেন না। কেন না সে রূপ হইলে এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের লোকের ভাষা বুঝিতেই পারিবেন না। কেবল ইহাই নহে তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সামান্য সদ্ভাব ও থাকিবে না। যদি বলা যায় যে কেবল কলিকাতায় প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষাই সকলের ব্যবহার করা উচিত কেননা কলিকাতাই বঙ্গদেশের রাজধানী তাহা হইলে সকলেরই স্মরণ করা উচিত যে এখন বঙ্গদেশের দুইটা রাজধানী—এক ঢাকা, এক কলিকাতা। তবে কি বঙ্গদেশের দুইটা ভাষার প্রচলন হওয়া উচিত ? কখনই নহে। বিশেষত কলিকাতার ভাষা চট্টগ্রাম, ঢাকা, রঙ্গপুর, কুচবিহার, রাজশাহী প্রভৃতি দুরবর্ত্তী স্থানের কথা দূরে থাকুক নিকটবর্ত্তী বর্দ্ধমান কৃষ্ণনগরের লোকেও আরও করিতে পারে

না। আর একটা কথা এই যে এক প্রদেশের বস্তুরই আদর হইবে অন্য প্রদেশের বস্তু বাজারে বিকাইবে না তাহাই বা অন্য স্থানের লোক পছন্দ করিবে কেন? এরূপ অসন্তোষ ও ঈর্ষা অস্বাভাবিক নহে। সুতরাং কলিকাতার ভাষা সাহিত্যে প্রচলনের প্রস্তাব সাধারণত কেবল যে গ্রাহ্য হইবে না এমন নহে, যাঁহারা অস্তুরক ভাবে এই প্রস্তাব করিবেন তাঁহার নূতন করিয়া বঙ্গ বিভাগের উদ্যোগ করিতেছেন বলিয়া দেশের শত্রু রূপে পরিগণিত হইবেন। ইহা ভিন্ন তাঁহাদের আরও কয়েকটী বিষয় বিবেচনা করা উচিত। ভাষার প্রথম উদ্দেশ্যই মনোভাব ব্যক্ত করা তাহা যত অল্প কথায় হয় তাহাই ভাল। এই হিসাবে খাইতেছি ও খাইলাম অপেক্ষা খাচ্চি ও খেলাম বা খেলুম ভাল। উদ্দেশ্য সিদ্ধি যদি অল্প ব্যয়ে হয় তাহা হইলে সে জন্য অধিক ব্যয় করা নির্ব্বুদ্ধিতা—তাহা অর্থ ব্যয়ই হউক বা সময় ব্যয়ই হউক। কিন্তু মনুষ্যের কোন উদ্দেশ্যই অমিশ্র নহে—অমিশ্র হওয়া উচিতও নহে। শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আচ্ছাদনের প্রয়োজন হয়। কেবলমাত্র সেই প্রয়োজন পশুচর্ম্ম দ্বারা, অগ্নিদ্বারা, শীতল জল দ্বারা এবং আরও নানা উপায়ের অন্যতম বস্তু দ্বারা সাধিত হইতে পারে। বায়কুণ্ঠ কৃপণেরা করিয়াও থাকে তাহাই। কিন্তু সমস্ত মুখ্য উদ্দেশ্যের সহিত অন্য বহুভাব মিশ্রিত থাকে—সৌন্দর্য্যের ভাব, সময় ও স্থানের উপযোগিতা, প্রতিবেশীগণের মতের প্রতি মর্য্যাদা। ভাষাতেও এ সকলের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য নহে। তবে খাচ্চি ও খেলাম সুন্দর—কি খাইতেছি ও খাইলাম সুন্দর, ইহা কেহই যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে পারেনা। এদেশে French Academy র মত কোন সমিতি নাই যাহার মতের প্রতি সকলেরই আস্থা হইতে পারে। তবে প্রণিধান করিতে হইবে যে খাচ্চ ও খেলাম ও খেলুম এক প্রদেশেরই কথা নহে। সকল প্রদেশের সকল প্রকার ক্রিয়াপদ উপেক্ষা করিয়া সমগ্র দেশের সম্মতি ক্রমে যখন এইরূপ পদ সাহিত্যে ব্যবহৃত হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে তখন দেশের সমস্ত লোক এইগুলিকেই সুন্দর বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন ইহা অপসিদ্ধান্ত নহে। সুতরাং সাহিত্যে ত ইহার ব্যবহার হইবেই—অন্যান্য বিশিষ্ট কার্য্যেও হওয়া উচিত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মনীষীগণ চিরকাল সুন্দরের উপাসনা করিয়াছেন—তাঁহাদের যে ভাষাবিষয়ে সৌন্দর্য্য শেষ ছিল তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। তাঁহারা যখন এইরূপ ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিয়াছেন তখনই বুঝিতে হইবে যে এইগুলিতেই অপেক্ষাকৃত অধিক সৌন্দর্য্য আছে। ইহার পর স্থান ও সময়ের উপযোগিতার কথা বিবেচনা করা যাউক। যে ভাষা হাটে বাজারে ক্রীড়াস্থানে ও আমোদপ্রমোদের সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সাধুসঙ্গকালে, উপাসনা-গৃহে এবং সাহিত্যে যদি তাহা অপেক্ষা ভাল ভাষা পৃথক্ করিয়া রাখিয়া দিতে পারি তবে তাহাই করা উচিত। যে পরিচ্ছদ পরিয়া দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াই সেই পরিচ্ছদ পরিয়া রাজ সন্দর্শন করিতে যাইবার চেষ্টা করিলেও বাধা পাইতে হয়। ইহার পর প্রতিবেশীর মতের প্রতি মর্য্যাদার কথা। আমি যদি কেবল আমার নিজের সুখস্বচ্ছন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এমন একটা অট্টালিকা নিৰ্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হই যে তাহাতে আমার প্রতিবেশীগণের বাতালোকের ও গমনাগমনের পথ রুদ্ধ হয় তাহা হইলে যেমন তদ্রূপ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা উচিত নহে সেইরূপ যে ভাষা আয়ত্ত করা কলিকাতা ব্যতীত অন্য স্থানের লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য বা অসাধ্য সাহিত্যে সেই ভাষার প্রচলন করিবার চেষ্টা করাও অন্যায়।

প্লেটো বলেন যে স্বর্গে একটা আইডিয়াল (ideal) ত্রিকোণ ক্ষেত্র (triangle) আছে যাহা সমকোণও নহে, স্থূল কোণও নহে, সূক্ষ্ম কোণও নহে; যাহা সমবাহুও নহে, সমদ্বিবাহুও নহে, অসমবাহুও নহে। খাইলাম, খাইতেছি প্রভৃতি ক্রিয়াপদ লইয়া আমাদের ভাষাটা সেইরূপ আইডিয়াল হইয়াছে। আইডিয়াল শব্দটা ঠিক—ইহার বাঙ্গলা প্রতিশব্দ জানি না। আদর্শ ইহার প্রতিশব্দ হইতে পারে না কেননা অনুকরণ করিবার জন্য

সম্মুখে যাহা রাখা যায় তাহাই আদর্শ বা model, এই আদর্শ আইডিয়াল নাও হইতে পারে। আইডিয়াল শব্দের অর্থ "যেরূপ হওয়া উচিত বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে সেইরূপ।" বাঙ্গালী সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে চাহেন না। তাঁহার ভাষাও সুতরাং প্রাদেশিক হইতে পারে না। কি আসামে, কি পঞ্চনদে, কি ইংলণ্ডে, কি আমেরিকায় বাঙ্গালী যেখানে গিয়াছেন সেখানেই বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিসত্তার জন্য প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গালীতে কিছু আইডিয়াল না থাকিলে তাঁহার তদ্রূপ প্রতিপত্তি কখনও হইত না। বাঙ্গালীর সাহিত্যিক ভাষা বাঙ্গালীর চরিত্রের অনুরূপ। যে ভাষা রাঁচি হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত ভূভাগে আধিপত্য করিতে চাহে তাহাকে অনেকটা আইডিয়াল হইতে হইবে, প্রাদেশিক হইলে চলিবে না এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে এবং আসামে উচ্চারণানুযায়ী বানান হয়। ইহার কারণ এই যে হিন্দী ও আসামী ভাষার বিস্তার লাভের ক্ষমতা অর্জ্জন করিবার প্রয়াস নাই কিন্তু বাঙ্গালার সেই প্রয়াস বিলক্ষণ আছে। এই জন্যই বাঙ্গলাভাষা উচ্চারণানুরূপ বানান লিখিয়া এবং সাহিত্যে কোন প্রাদেশিক ভাষা অবলম্বন করিয়া সংকীর্ণ হইতে পারে নাই।

ভাষায় কৃত্রিমতা।

কিন্তু কেহ হয়ত বলিবেন যে যে ভাষার প্রচলন কোন প্রদেশেই নাই সে ভাষা কৃত্রিম এবং অস্বাভাবিক এবং যাহা কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক তাহার বিনাশ অচিরেই হয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে এই আশঙ্কা যুক্তিযুক্ত নহে। একদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কোন কিছুই অস্বাভাবিক নাই। বাবুই যে নীড় নির্ম্মাণ করে, মধুমক্ষিকা যে চক্র রচনা করে এবং বীবর ও শূকর যে গৃহ নির্ম্মাণ করে সেগুলিকে কেহ অস্বাভাবিক বলে না। কিন্তু মনুষ্য যে ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করে তাহা অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম বলিয়া বর্ণিত হয়। কিন্তু বাবুই, মধুমক্ষিকা, বীবর ও শূকর যে বুদ্ধিদ্বারা স্ব স্ব আবাস প্রস্তুত করে সে বুদ্ধি যেমন স্বভাবলব্ধ, মানব যে বুদ্ধি দ্বারা ইষ্টকালয় প্রস্তুত করে তাহাও তেমনই স্বভাবলব্ধ সুতরাং মানব যাহা করে তাহাও স্বাভাবিক। কিন্তু তথাপি মানুষ বুদ্ধি দ্বারা যাহা করে তাহাকেই কৃত্রিম বা অস্বাভাবিক বলে। আমিও সেই অর্থেই কৃত্রিমতা ও অস্বাভাবিকতা শব্দ ব্যবহার করিব। মানবের সভ্যতায় নামান্তরই কৃত্রিমতা। আমরা বস্ত্র পরিধান করি, গৃহ নির্ম্মাণ করি, বিদ্যাশিক্ষা করি, ঔষধ প্রস্তুত ও সেবন করি, রেলে বা অশ্বারোহণে ভ্রমণ করি এ সমস্তই কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক। এত কৃত্রিমতার মধ্যে আমাদের ভাষায় কিছু কৃত্রিমতা থাকিলে আশঙ্কার বিষয় নাই। কৃত্রিম বস্তু যে শীঘ্র বিনাশপ্রাপ্ত হয় এ কথাটাও সত্য নহে, কৃত্রিমতাদ্বারাই স্বভাব জয় করা যায়। স্বাভাবিক বিনাশ হইতে কোন বস্তুকে রক্ষা করার নামই কৃত্রিমতা। যে বস্তু যত কৃত্রিম তাহা তত স্থায়ী এবং তাহার তত অধিক গৌরব। তাজমহলে বহু পরিমাণে কৃত্রিমতা আছে বলিয়াই তাহার এত গৌরব এবং তাহা এতদিন স্থায়ী হইয়া আছে। কত ভাষা অভ্যুদিত হইয়া লুপ্ত হইয়া গেল কিন্তু বহুল পরিমাণে কৃত্রিমতাবিশিষ্ট সংস্কৃত ভাষা সমস্ত পৃথিবীর প্রশংসাভাজন হইয়া কত সহস্র বৎসর হইতে বিরাজ করিতেছে। সুতরাং আমাদের সাহিত্যিক ভাষায় যে কৃত্রিমতা আছে তাহা গৌরবেরই কথা, দোষের নহে। যাঁহারা সাহিত্যে অকৃত্রিম স্বাভাবিক অর্থাৎ প্রাদেশিক ভাষা চালাইতে চাহেন তাঁহারা বড় ভ্রান্ত।

আপনারা ধীরভাবে আমার কথাগুলি শুনিলেন, সেজন্য আপনাদিগকে শত সহস্র ধন্যবাদ। আমি নগণ্য ব্যক্তি। তবে সাহিত্যের সাধারণতন্ত্রে কথা কহিবার অধিকার সকলেরই আছে বলিয়া আপনাদের সমক্ষে এত কথা বলিলাম। আপনাদের আদেশ পাইলে আর কোন দিন অন্য কথাও শুনাইতে পারি।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

পরখ।

—*—

ওহে অন্তরতম !
অন্তর হইতে আশার বাতিটী ক'রে দিলে তুমি লয়
তার স্থানে একি তীব্র অনল জ্বালিলে জীবনময় !
দেখিতেছ বুঝি পরখ করিয়া এ কালো জীবন মম,
দহন করিলে ফলে কি বর্ণ উজল স্বর্ণ সম ?
ওহে অন্তরতম !

সুখ সাগরের তলে
মগ্ন বিভল রেখেছিলে প্রাণ তোমার করুণা ভারে,
দিতে হবে বুঝি আজ তারি শোধ বেদনা-অশ্রুধারে !
দেখিতেছ বুঝি পরখ করিয়া ধুইয়া নয়ন-জলে,
হয় কি কুসুম-শুভ্র-কোমল বিকশিত শতদলে ?
ধুইলে নয়ন জলে !

জীবন পাত্রখানি
গড়ে'ছিলে কেন, ভরে'ছিলে কেন, জান তা ইচ্ছাময়,
ভেঙ্গে দিলে, পুনঃ গড়িবে ভরিবে পুরাতন করি ক্ষয় !
দেখিতেছ বুঝি পরখ করিয়া বার বার গড়ে' আনি,
ধরিতে কি পারে তোমার দানটী নিজেরে ধন্য মানি ?
জীবন পাত্রখানি !

কত দিয়েছিলে ব'লে
চিনি নাই বুঝি হে দাতা তোমারে মত্ত সুখের ভরে,
করি নাই নত সকল জীবন তোমার চরণ 'পরে !
দেখিতেছ বুঝি পরখ করিয়া তাই বুকখানা দ'লে,
তীব্র আঘাতে ধূলি রেণু সম ঝরে কি চরণতলে ?
ভাঙ্গা বুকখানা দ'লে !

ভাঙ্গিলে আপন হাতে,
জীবন গঠন বুঝিবা তোমার হ'ল না মনের মত,
দেখিলে হীনতা, কত মলিনতা, শত কুৎসিৎ ক্ষত!
দেখিছ কি তাই পরখ করিয়া ঘুরাইয়া হাতে হাতে,
কোথায় অসম, অসম্পূর্ণ,—গড়িছ নিঠুরাঘাতে?
ভাঙ্গিয়া আপন হাতে!

তবে তাই হোক সখা,
লীলা-মধু বুঝি এ দীন পাত্রে চাহ গো করিতে পান,
রুচির নূতন নিত্য গঠন তাই এরে কর দান!
দেখিছ কি তাই পরখ করিয়া কোথায় হ'য়েছে বাঁকা,
বাসনার দাগ, কামনার কালী, কোথায় র'য়েছে মাখা?
নিজেরে ক'রেছি বাঁকা!

ওগো অন্তরতম!
মনে যাহা আছে তাই মোরে গড়' কি আর বলিব আমি,
শুধু পদতলে ধরিনু নিবেদি' সমগ্র প্রাণ স্বামি!
পরখ করিয়া পদ ধুইবার রেখ ভৃঙ্গার সম,
সকল দহন, সব ভাঙ্গাগড়া হবে সার্থক মম।
ওগো অন্তরতম!

শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী।

মঙ্গল-মঠ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অব্যক্ত ক্ষোভ-অভিমানের নিঃশব্দ লাঞ্ছনায়—মায়ার মনটা অত্যন্তই উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বাড়ীতে আসিয়া, জলের ঘড়াটা রান্নাঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া,—সে একটু ত্রস্ততার সহিত শয়নকক্ষের দিকে চলিল। রান্নাঘরে তখন বৌদিদি ও দিদিমা আসিয়াছিলেন, হৃষীকেশ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন।—মায়া বিনাবাক্যে জলের ঘড়া রাখিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া বৌদিদি ঈষৎ হাসির সহিত বলিলেন—"দেখ্‌লেন দিদিমা, মায়া ঠাকুঝি ভাল গিন্নিপণা শিখেছে, আপনার নাত্‌জামাইকে কিছু দেখ্‌তে শুন্‌তে হবে না………!"

ভৎর্সনা-করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দিদিমা মৃদুস্বরে বলিলেন "এই দুপুরবেলা তাড়াতাড়ি জল আন্‌তে যাবার কি দরকার ছিল? খাবার জল ছিল—রান্নাটা না হয় আজকের মত ডোবার জলেই কর্‌তুম,—বিকেলে জলটা আন্‌তুম—"

মায়া শুষ্ক হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল, কোন উত্তর দিল না। সনাতন ও আদিত্যের সেই হাসি, তাহার মনে তখন দুঃসহ লজ্জা ও অপমানে তীক্ষ্ণ শান দিতেছিল,—ক্ষুব্ধ উত্তেজনায় তাহার মন, নিরঞ্জনকেই শুধু একমাত্র অপরাধী স্থির করিতেছিল, নিরঞ্জন মায়াকে সাহায্যের ঋণ স্বীকারে বাধ্য করাইয়া, তাহাকে যথার্থই অপমান করিয়াছে!

মায়া ঘরে আসিয়া বসিয়া পড়িল,—একমাত্র নিজের উপর ছাড়া, জীবনে সে কোন দিন কাহারও উপরে রাগ করে নাই—কিন্তু আজ নিরঞ্জনের উপর রাগ না করিয়া সে থাকিতে পারিল না!—মায়ার চতুর্দ্দিকে যেন গোলকধাঁধাঁর পাকচক্র বাধিয়া গিয়াছিল, কোন কিছুই যেন সে আয়ত্তের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেছিল না; তীব্র অধীরতায়, উদ্ধত অশান্তি পীড়িত চিত্তে মায়া নিজের মধ্যে নিজেকে বার বার ব্যাকুল প্রশ্ন করিতে লাগিল। "নিরঞ্জন কেন এ কাজটুকু করিতে অগ্রসর হইয়াছিল? কেহ ত তাহাকে ডাকে নাই!—"

কিন্তু জটিলতার মূল ত ইহাই!—মায়ার ক্ষিপ্ত রোষ ক্রমে অবসন্ন বেদনায় ভরিয়া উঠিতে লাগিল!—মায়ার জীবন, মর্ত্তোর মৃত্যু-বিভীষিকা বেষ্টিত মানব-জীবন, সে জীবনের মলিন বায়ু সংস্পর্শে—কেন ঐ অমরাবতীর আনন্দ-সুন্দর দেবত্ব মনোহর প্রাণ,—……নাঃ, মায়া আর ভাবিতে পারে না, তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিতেছে, সমস্ত প্রাণ বেদনায়,বিস্ময়ে,—অবনত, অভিভূত হইয়া লুটাইতে চাহিতেছে, সে এ কি নিষ্ঠুর বিপ্লবের মাঝে জড়াইয়া পড়িল!

আশ্চর্য্য অদ্ভুদ স্বভাব,—ঐ নিরঞ্জনের! নিষ্প্রয়োজনের অবসরে সে আপনাকে নম্র দীনতায় সম্ভ্রমের অন্তরালে ঠেলিয়া রাখে, কিন্তু প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে,—এক নিমেষে সকল দ্বিধা ছাড়িয়া সে মুক্ত সঙ্কোচে নির্ভীক সুন্দর হইয়া দাঁড়ায়!—পরের অসুবিধা, সে যত ক্ষুদ্র যত তুচ্ছই হউক, সেই তুচ্ছ ক্ষুদ্রতাকে মোচনের জন্যই, নিরঞ্জন স্বেচ্ছায় সানন্দে—বিনা আহ্বানে নিজের শক্তি-সবল হাত দুইটি বাড়াইয়া দেয়!—নিরঞ্জন দৃষ্টি রাখে শুধু কাজের উপর,—কাহার কাজ করিতেছে তাহা সে চাহিয়া দেখে না।

কিন্তু তাহার সেই নিষ্ঠুর করুণা,—আজ মায়াকে এ কি প্রাণঘাতী বিড়ম্বনার মাঝে ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিল!—এতদিন উন্নত মহত্ব-নিষ্ঠার বক্ষে,—সুদূর স্বাতন্ত্র্য পরিবেষ্টনে, তাহার যে নিষ্কলঙ্ক, সুন্দর, ত্রিদিব-জ্যোতিঃ-উদ্ভাসিত মনোহর আনন্দময় কান্তি, মায়া দেখিয়াছিল,—আজ এক নিমেষে সে নির্ভয় ব্যবধান লঙ্ঘন করিয়া—নিরঞ্জন কেন এত কাছে,—দৃষ্টির এত নিকট-সান্নিধ্যে আবির্ভূত হইয়া,—মায়ার সমস্ত দৃষ্টি-শক্তিকে নিষ্ঠুর দীপ্তি প্রাখর্য্যে ধাঁধাঁইয়া আতঙ্কে স্তম্ভিত করিল!—এ কি অসহনীয় তীব্রালোক! মায়া যে অন্ধ—দিশাহারা হইবে!

স্তব্ধ-নিঝুম চিন্তামগ্না মায়া—হঠাৎ এক সময় নিজের মধ্যেই তীব্র চমকে শঙ্কিত হইয়া উঠিল! না না,—এ কি ভ্রান্তি তাহার? এ কি কাল্পনিক দৌর্ব্বল্য বেদনার প্রভাবে সে আপনাকে আচ্ছন্ন-অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে? সত্যই ত নিরঞ্জনের সহিত তাহার সম্পর্ক কি!—দূর হউক, ও সব ক্ষুদ্র দৌর্ব্বল্য অবজ্ঞার ভ্রূকুটি পীড়নে বিতাড়িত করাই তাহার একান্ত কর্ত্তব্য, পৃথিবীর সম্মুখে,—অক্ষম, অসহায়, দীন সে,—দীনের মত নীরবে নতশিরে দিন যাপন করাই তাহার একমাত্র কাজ,—ও সকল চিন্তায় তাহার অধিকার নাই, সে অক্ষম!

আহারান্তে দিদিমা ও বৌদিদি, শান্তিদিদির সহিত বিবাহ সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বাটীতে চলিয়া গেলেন। মায়া একাকিনী নির্জ্জন শয়নকক্ষে আসিয়া মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পাতা উল্টাইতে লাগিল কিন্তু মুগ্ধবোধের একটি বর্ণও আজ তাহার বোধগম্য হইল না, অজ্ঞাত বিদ্রোহী উত্তেজনায় তাহার সমস্ত চিত্ত অধীর বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, মায়া অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল,—হায় সে ত আত্মপ্রবঞ্চনার দ্বারা আপনাকে জিতাইবার জন্য,—নিরঞ্জনের অপরাধী আচরণের আংশিক ত্রুটি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া, সযত্নে ঘষিয়া মাজিয়া উজ্জ্বল করিয়া দেখিতে চায়,—কিন্তু অলক্ষিতে, নিরঞ্জনের সমগ্র স্বভাবের মহত্ত্ব সৌন্দর্য্য বিজলী দীপ্তিতে ঝলমল করিয়া, তাহার মনের উপর নন্দন সৌরভের মুগ্ধ মোহাবেশ বিস্তার করে যে!—সে কেমন করিয়া ইহাকে ঠেকাইয়া রাখে?

মায়া মুগ্ধবোধ বন্ধ করিয়া হাতের উপর মাথা রাখিয়া, ভাবিতে লাগিল—এ কি হইল!

ধীরে মনে পড়িল—কৌতুক চপল সঙ্গীগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ নিরঞ্জন যখন সেই তুচ্ছ কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল, তখন কি সুমিষ্ট মনোরম স্নিগ্ধতাই—তাহার তুচ্ছতাকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল! সে কি অপরূপ সৌন্দর্য্য!

মায়া স্তব্ধ নিঝুম হইয়া হইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল, তারপর হঠাৎ তীরবেগে ক্ষিপ্তবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল! না না, এ সকল কি পাগলামী তাহার! ও সব ভুল—অলীক চিন্তাকে মনে স্থান দিবার অবসর তাহার নাই! নিরঞ্জন তাহার সম্মানকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, সে শত্রু!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

সদ্য অস্তগত সূর্য্যের সোনালী আভাময় রক্তরাগে পশ্চিমাকাশপ্রান্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, শুভ্র লঘু মেঘখণ্ড সায়াহ্ন-অম্বরে, মৃদু বায়ু বশে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। শীতের শেষ চিহ্নটুকু সম্পূর্ণ রূপে অন্তর্হিত হইয়াছিল, কয়দিন হইতে নবাগত বসন্ত প্রকৃতির মৃদুকোমল উষ্ণ উত্তাপ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল,—আজ সেটা যেন বেশী স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে। হাওয়ার জোর আদৌ ছিল না, চারিদিকে গাছপালাগুলা ক্ষুব্ধ স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়াছিল।

সমস্ত দিনের রৌদ্র তাপে অস্বস্তিকর উষ্ণতা ব্যঞ্জক ছাদের উপর,—কর্ম্মস্থান প্রত্যাগত নিরঞ্জন ক্লান্তি ক্লিষ্ট বদনে, একাকী বিচরণ করিতেছিল। আদিত্য ও সনাতন ঘরে যন্ত্রপাতি রাখিয়া অল্পক্ষণ পূর্ব্বে কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে। আজ দুপুর বেলার সেই ঘটনার পর,—তাহার সহিত নিরঞ্জনের ভালরূপ বাক্যালাপ হয় নাই, আজ তাহারা উভয়েই সংযত ব্যবহারে সাবধানে চলিয়াছে। বাসায় ফিরিয়া তাহারা বেড়াইতে বাহির হইবার পর, নিরঞ্জন কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিয়াছে, তাহার হাতের কাজ শেষ হইতে আজ একটু বেশী বিলম্ব হইয়াছে।

আজ সমস্ত দিনই তাহার মনটা—অজ্ঞাত উৎকণ্ঠা পীড়ন ভোগ করিয়া সঙ্কোচ সংশয়ের দ্বন্দ্ব দোলায় ক্রমাগত দোল খাইয়াছে, আজ সমস্ত দিনই সে ভাল করিয়া কাজে মন বসাইতে পারে নাই, অভ্যস্ত সংসারকে লইয়া, কাজের নামে,—মিথ্যা ছলনায় বাজে খেলা খেলিয়াছে, কিছুই তাহার ভাল লাগে নাই!

"ঝগড়ার সুরে সে সহকর্ম্মীদের আত্মসম্মানবোধহীনতার জন্য ভৎর্সনা করিয়াছিল—মর্ম্মান্তিক ক্ষোভের উত্তেজনা বশে!—কিন্তু সে উত্তেজনা প্রশমনের সঙ্গে সঙ্গে, তাহার নিজের মনের মধ্যে কেমন একটা খট্‌কা বাধিয়াছে!—সংশয় অভিঘাতে তাহার মনের মধ্যে—ধীরে ধীরে একটা শঙ্কিত-বেদনা স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে,—সে ত নিজের আত্মসম্মানটুকু অক্ষত রাখিয়া চলিতেছে, সে ত নিজের অন্তরের কাছে, কোন অদৃশ্য অপরাধে আপনাকে অবজ্ঞাত, হতমান করে নাই? সঙ্গীরা বাহ্যিক কৌতুক চপলতা করিয়া, বাহিরের দিক হইতে পরের কাছে অপরাধী হইয়াছে, কিন্তু সে ত অন্তরের দিক হইতে নিজের কাছে নিরপরাধ আছে?

নিরঞ্জন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, নিজকে কোন প্রশ্ন করিতে তাহার সাহস ক্রমে লোপ হইয়া আসিল! অ-স্বস্তির ঝঞ্ঝাঘাতে তাহার সমস্ত অন্তঃকরণটা একান্তই নিরুপায়—অবলম্বনহীন হইয়া পড়িল, নির্জ্জন ছাদের উপর একলা ঘুরিয়া বেড়ান অত্যন্ত অসহ্য বোধ হইল।—তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া একটা জামা টানিয়া মাথা গলাইয়া পরিয়া—মস্তক বেষ্টন করিয়া পাগড়ীর কাপড়টা বিশৃঙ্খলভাবে জড়াইতে জড়াইতে, বাহির হইল। গৃহদ্বারে চাবিবন্ধ করিয়া—উর্দ্ধশ্বাসে বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বাসার উদ্দেশে ছুটিল, আজ সমুদ্রতীরের দিকে অগ্রসর হইবার সাধ্য তাহার নাই!

পথে দুই চারিজন পরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল সৌজন্যের অনুরোধে নীরব-নমস্কার করিয়া ব্যস্তভাবে পাশ কাটাইয়া, দ্রুতপদে চলিল, কাহারও সহিত কথা কহিতে দাঁড়াইল না।

খানিকটা গিয়া মনে পড়িল, সন্ধ্যারতির সময় হইয়াছে, বেদান্তবাগীশ মহাশয় হয়ত ঠাকুরবাড়ীতে আরতি দর্শন করিতে গিয়াছেন। তিনি প্রত্যহ সেখানে যান,—আজিও নিশ্চয় গিয়াছেন—নিরঞ্জন থমকিয়া দাঁড়াইল, স্তব্ধভাবে ক্ষণেক ভাবিল, তারপর মোড় ফিরিয়া,—ধীরে ধীরে ঠাকুরবাড়ীর দিকে চলিল।

আবার অন্য চিন্তা আসিয়া, তাহার মন ছাইয়া ফেলিল অজ্ঞাতে গতিবেগ,—মৃদু—মৃদুতর হইয়া আসিল। দেবালয়ের বহিঃপ্রাঙ্গণে আসিয়া,—সহসা বিচলিত হৃদয়ে নিরঞ্জন থামিল,—উৎসুক আগ্রহে,- ব্যগ্র চকিত নয়নে চারিদিক চাহিল, মনে পড়িল—সেদিন এইখানে,—সেই মহিলাগণের সহিত মায়াকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল! সে মায়া সামান্য বঙ্গবালিকা,—মায়া,—কিন্তু কি অসামান্য প্রাণবেগে তাহার অভ্যন্তর পরিপূর্ণ! বাহিরে কেহ কিছু জানে না, সকলেই তাই অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাহার ক্ষুদ্র ক্ষীণ আকৃতির পানে চাহে! কিন্তু নিরঞ্জন তাহার গোপন প্রকৃতির খেদ-ক্ষিন্ন নিঃশ্বাসের তানে, সেই মর্ম্মভরা আগ্রহ ব্যাকুলতার সংবাদ জানিয়াছে.—সে সত্য-সন্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে চাহে, কোন নীরব নিদ্রার মাঝে, কোন নিভৃত—অন্তরের অন্তঃস্থানে, কোন শক্তি-শালী, আত্মচেতনায় জাগ্রত, মহিমাময় সাধক, পার্থিব সম্পর্কসংস্রবের উর্দ্ধে,—অপার্থিব আনন্দ গরিমায় একনিষ্ঠ সাধনে সমাসীন! মৃত্যুর মহান্ধকার আচ্ছন্ন মরুভূমির বক্ষে,—কোথায় অমৃত আলোকের দীপ্তি! কোথায় জীবনের সজীব-মাধুরী, কোথায় প্রাণের পূর্ণ-সুষমা!

নিরঞ্জনের বক্ষঃ কাঁপাইয়া, দীর্ঘ নিঃশ্বাস উঠিল! পরমুহূর্ত্তে অকস্মাৎ উদগ্র আতঙ্ক সংঘাতে সে নিজের মধ্যে চমকিয়া উঠিল! না না সে একি করিতেছ? একি অন্যায় একি মূঢ়তা তাহার!—না সে আর আত্মবিস্মৃত অপরাধী হইবে না! স্বেচ্ছাচারের পথ হইতে সে এবার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তবৃত্তিকে সজোরে টানিয়া ফিরাইবে,—আপনাকে স্বাধীন সঙ্কোচমুক্ত করিয়া গৌরবের বক্ষে দাঁড় করাইবে, নিজেকে কোন বিক্ষোভে বিক্ষুব্ধ হইতে দিবে না!—সে প্রস্তর-শিল্প-ব্যবসায়ী সামান্য ভাস্কর,—পাথরে ঘা দিয়া জীবন কাটাইবার জন্য, জগতে তাহার জন্ম হইয়াছে;—কে কোথায় গোপন অন্তরে,—পাষাণের মধ্যে স্পন্দন চেতনা খুঁজিবার জন্য দুরাশায় উন্মাদিত,—সে সংবাদ রাখিবার, সে কে? সে চিন্তায় তাহার অধিকার কোথা?

কিন্তু আরতি দেখিতে সে যাইবে কি? কে জানে, মায়াও যদি আরতি দেখিতে আসিয়া থাকেন?—নিরঞ্জনের মস্তকাভ্যন্তরে উষ্ণ রক্তের মত হোরিখেলা বাধিয়া উঠিল, আর সেখানে এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইয়া থাকিতে তাহার ভরসা হইল না—সবেগে ফিরিয়া চলিল!

অদূরে বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বাসা, কার্য্যব্যপদেশে তাঁহার ভৃত্য বাহিরে আসিতেছিল, বহির্দ্বারে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন নিরঞ্জন ত্রস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"ঠাকুর কি বাড়ীতে আছেন?"

ভৃত্য উত্তর দিল "আজ্ঞে হ্যাঁ—"

নিরঞ্জন আশ্চর্য্য হইয়া গেল! সে যে আদৌ এ কথা শুনিবার প্রত্যাশা করে নাই! নিমেষে তাহার সমস্ত ব্যগ্রতা শূন্যে মিলাইল, রুদ্ধ উৎকণ্ঠা দারুণ হতাশায় পরিণত হইল! বেদান্তবাগীশ মহাশয় বাড়ীতেই রহিয়াছেন? তবে,—অতঃপর নিরঞ্জন কি করিবে?

শুষ্ককণ্ঠে নিরঞ্জন প্রশ্ন করিল "আজ আরতি দেখ্‌তে যান নি?"

ভৃত্য বলিল "আজ্ঞে না, তাঁর শরীর আজ ভাল নেই, শুয়ে পড়েছেন, আপনি দেখা করেন ত যান,—দেখা হবে।" ভৃত্য নিজের কাজে চলিয়া গেল। শাস্ত্রপাঠ শুনিতে, বা শাস্ত্রালাপ ইচ্ছায়, সন্ধ্যার সময় কেহ কেহ বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কাছে আসিত, নিরঞ্জনও কয়দিন আসিয়াছিল। এ বাড়ীতে তাহার অবারিতদ্বার, ভৃত্য জানিত—সুতরাং সংবাদ বহনের দৌত্যে অনাবশ্যক অপেক্ষা করিল না।

—অননুভব্য আতঙ্ক-উন্মাদনাসংঘাতে, আজ নিরঞ্জনের মনের চতুর্দ্দিকে তীব্র ব্যাকুলতা উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, আজ সে কিছুতেই নিজের মধ্যে ক্ষান্ত হইয়া তিষ্ঠাইতে পারিতেছে না! বাহিরের দিকে,—যেখান হইতে হউক, যেমন করিয়া হউক,—একটা কিছু নির্ভর অবলম্বন করিয়া আজ তাহাকে স্বস্তি লইতে হইবে,—না হইলে, তাহার বিশ্বাস রোধ হইয়া আসিতেছে!

কিন্তু হায় তবুও,—সেই স্বচ্ছন্দ নিঃশ্বাস গ্রহণ চেষ্টার মধ্যেও—মুহুর্মুহুঃ একি নিগূঢ় বেদনাবহ,—নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক হতোদ্যম—নিঃশব্দে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে? একি অভূতপূর্ব্ব বিকলতা প্রতিমুহূর্ত্তে—তাহার সকল চেষ্টা-সকল চিন্তাকে—শৃঙ্খলাহীন ছন্নছাড়া করিয়া দিতেছে! আজ তাহার একি কঠোর দুর্দ্দৈব!

ভৃত্য চলিয়া গিয়াছিল, মূঢ়ের মত কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিরঞ্জন ধীরে ধীরে বাটীর ভিতর ঢুকিল, বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বিশ্রাম কক্ষের নিকটবর্ত্তী হইয়া স্খলিতকণ্ঠে ডাকিল "দাদা মহাশয়—"

কক্ষাভ্যন্তর হইতে বেদান্তবাগীশ মহাশয় ডাকিলেন, "কে ও নিরঞ্জন, এস দাদা এস,—"

জুতা খুলিয়া, নিরঞ্জন দ্বার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গৌরাঙ্গ সুন্দর খর্ব্বাকৃতি লোল বৃদ্ধ বেদান্তবাগীশ মহাশয়, স্বভাব সিদ্ধ শান্ত সুগম্ভীর বদনে--কক্ষ প্রান্তে খাটের উপর শয্যায় অর্দ্ধশায়িতভাবে বিশ্রাম করিতেছিলেন, তাঁহার পদতলে বসিয়া প্রসন্নবদনা শান্তিদেবী অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত মস্তকে,—বস্ত্রাঞ্চলে গ্রীবা বেষ্টন করিয়া অকুণ্ঠিতা সরলা বালিকার স্নিগ্ধ আনন্দময়ী মূর্ত্তিতে, পিতার পদসেবা করিতেছেন!

সংসারের সমস্ত প্রলোভনকে অবজ্ঞার হাসিতে পদদলিত করিয়া,—মূর্ত্তিমতী সংযম-পুণ্যোজ্জ্বলা,—স্নেহ মমতায় দেবী রূপিণী,—জননী শান্তিদেবী, কি সুন্দর উহাঁর কান্তি?—কি সুন্দর ঐ স্থির নিষ্ঠা বিশ্বাসে, আত্ম-সমাহিত ভগবদ্ভক্ত বৃদ্ধব্রাহ্মণ বেদান্তবাগীশ মহাশয়? কি অপরূপ মনোহর এই দৃশ্য!

নিরঞ্জনের বিক্ষোভাহত বিষাদ ম্লান চিত্তের উপর কে যেন এক অঞ্জলি শ্রদ্ধা শান্ত, তৃপ্তির কিরণ ছড়াইয়া দিল, আশ্বাসপূর্ণ চিত্ত—উদ্দেশ্যে প্রশান্ত হইয়া নম্র কোমল কণ্ঠে নিরঞ্জন প্রশ্ন করিল "আজ আপনার শরীর খারাপ হয়েছে ?"

বেদান্তবাগীশ মহাশয় উত্তর দিলেন "হাঁ একটু জ্বরভাব হয়েছে, তুমি ঘরে এস দাদা,—"

শান্তিদেবী খাটের উপর হইতে নামিয়া আসিয়া,—অদূরে মেঝের উপর একখানি আসন বিছাইয়া দিয়া সস্নেহে বলিলেন "এইখানে বস বাবা।"

অগ্রসর হইয়া—বিনীত ভাবে আসন স্পর্শ করিয়া ললাটে হাত ঠেকাইয়া, সসম্ভ্রমে নিরঞ্জন বলিল "ক্ষমা করুন, আজ সেবার সৌভাগ্য রয়েছে,—আমি ঐখানে বস্‌ছি—"

খাটের কাছে আসিয়া, বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের পদতলে বসিয়া নিরঞ্জন পায়ে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিল। ব্যস্ত হইয়া বেদান্তবাগীশ মহাশয় বলিলেন "কর কি নিরঞ্জন !"

'কিছুই না,'—এমনই ধীর প্রশান্তির সহিত, এই সংক্ষিপ্ত কথাটি উচ্চারিত হইল, যে তাহা যেন একটি অত্যন্ত সহজ দ্বিধাহীন কর্ত্তব্য পালনের স্থির-নিশ্চয়তা জ্ঞাপন মাত্র! তাহাতে গৌরব আস্ফালনের লেশ মাত্রও চেষ্টা নাই !

বেদান্তবাগীশ মহাশয় একটু বিব্রত হইলেন, এক ত অপরের সেবাগ্রহণে তাঁহার, চিত্ত চির-অনিচ্ছুক,—তাহাতে এই অনুপযুক্ত কাজে, ঐ নিঃসম্পর্কীয় তরুণ যুবাটি যে কিসের জোরে এমন অনাড়ম্বর অধিকার স্বচ্ছন্দে বসাইল, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন না,—তাহাকে বাধা দিতেও মন সরিল না, কন্যার পানে চাহিয়া নিরুপায় ভাবে হাসিয়া বলিলেন "দেখ, দেখি মা,—কি অন্যায় "

স্নেহপূর্ণ নয়নে নিরঞ্জনের পানে চাহিয়া শান্তিদেবী বলিলেন "এদের ভাই-ভাইয়ের একই রকম স্বভাব, চিত্তরঞ্জন কাকাকে দেখেছি, আর নিরঞ্জনকে দেখ্‌ছি, তারই ভাই বটে !—"

চকিতে নিরঞ্জনের সমস্ত চিত্তের উপর, একটা তীব্র বিস্বাদময় ক্ষোভের গ্লানি-নিষ্ঠীবন বৃষ্টি হইয়া গেল, সে চিত্তরঞ্জনের ভ্রাতা !—কোথায় সংযত-নিষ্ঠার পুণ্যময় মহত্ব দীপ্তি, আর কোথায় হতভাগ্য মূঢ়ের, উদ্ভ্রান্ত নির্ব্বেদ !—এ কি নিগূঢ় ধিক্কারাহত নিষ্করুণ অন্তর্দ্দাহ !

অসহ্য উষ্ণ-যন্ত্রণায় নিরঞ্জনের মস্তিষ্ক ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইল, ঘর্ম্মাক্ত ললাটের উপর হইতে পাগড়ীটা খুলিয়া বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া নিরঞ্জন বলিল "উঃ কি গরম !"

শান্তিদেবী হাত ধুইয়া আসিয়া হরিনামের মালা লইয়া—বসিবার উপক্রম করিতেছিলেন, নিরঞ্জনের কথায় বিস্মিত হইয়া বলিলেন "তোমার গ্রীষ্ম বোধ হচ্ছে নিরঞ্জন—"

শুষ্ক কণ্ঠে নিরঞ্জন ত্রস্তভাবে বলিল "না, বিশেষ কিছু নয়," স্নেহ-কোমল অনুরোধের সহিত শান্তিদেবী বলিলেন "বাবার শরীর ভাল নেই, আজ তোমাদের শাস্ত্রব্যাখ্যা শোনা হল না,—তুমি একটু বাইরে বেড়ালে—"

বেদান্তবাগীশ মহাশয়ও সাগ্রহে তাহাই অনুমোদন করিলেন। কিন্তু নিরঞ্জন অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে তাহার প্রতিবাদ করিয়া, নিজের কাজে মনোযোগী হইল। অগত্যা পিতা ও কন্যা নিরস্ত হইলেন।

নানা প্রসঙ্গের কথা আরম্ভ হইল। নিরঞ্জন কোন কথায় ভাল করিয়া উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিল না,—অধিকাংশস্থলে নীরব হইয়া রহিল। অন্যান্য কথার পর বেদান্তবাগীশ মহাশয় বলিলেন, "চিত্তরঞ্জনের ইচ্ছা এখানকার কাজ শেষ ক'রে, নিরঞ্জন বিকানীরে বাড়ীতে গিয়ে কিছু দিন বিশ্রাম ক'রে, শরীরটা ভাল রকম সুদরে নেয়।—কিন্তু নিরঞ্জন তাতে রাজী নয়, ও বলে শরীর সারবার জন্যে বিকানীর পর্য্যন্ত যাবার দরকার নেই।"

স্মিত হাস্যে শান্তিদেবী বলিলেন "না হোক, কিন্তু মার জন্যেও কি মন কেমন করে না, নিরঞ্জন? মার কাছে গিয়ে কিছুদিন থেকে এস না।"

প্রচ্ছন্ন বিষাদের নম্রকরুণ হাস্যরেখা নিরঞ্জনের অধরে ফুটিয়া উঠিল; শুষ্ককণ্ঠ ঝাড়িয়া নিরঞ্জন উত্তর দিল, "এখন আমাদের শেখবার সময়, খাটবার সময়, এ সময় পরিশ্রম-বিমুখ হ'লে উন্নতির আশা ব্যর্থ হবে।"

প্রসন্ন-সন্তোষের সহিত বেদান্তবাগীশ মহাশয় বলিলেন "সে কথা ঠিক,—এর পর সংসারী হলে মন সহস্র দিকে ছড়িয়ে যাবে, তখন এমনভাবে একাগ্র সাধনার সুযোগ পাবে কোথা! উন্নতি যদি করতে হয় ত, পরিশ্রমের সময় এই বটে!"

নিরঞ্জন নতশিরে নীরব রহিল, শান্তিদেবী কয় মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন "সুরাটে সুন্দর-মঠের অধিকারী মহারাজ নিরঞ্জনের কাজ দেখে না কি খুব খুসী হয়েছেন।"

নিরঞ্জন স্বীকারসূচক মস্তকান্দোলন করিল. কিন্তু কোন কথা কহিতে পারিল না। বেদান্তবাগীশ মহাশয় বলিলেন "এদের দুই ভাইকেই তিনি নিমন্ত্রণ করেছেন, এখানকার কাজ শেষ হলেই নিরঞ্জন সুরাটে যাবে, সেখানে তিনি শীঘ্রই একটা নূতন মঠ নির্ম্মাণ করাবেন।"

শান্তিদেবী সাগ্রহে বলিলেন "নূতনমঠ, বল্লভাচারী সাম্প্রদায়েরই?"

বেদান্তবাগীশ মহাশয় বলিলেন "নিশ্চয়, তিনি নিজেও ত এই সম্প্রদায়ের একজন গুরু। তবে তাঁর সঙ্গে অন্যের পার্থক্য ঢের,—সুরাটের অধিকারী মহারাজ—যথার্থ মোহন্ত নামের যোগ্য পাত্র, তিনি জিতেন্দ্রিয়, নিরভিমানী, শাস্ত্রদর্শী, সুপণ্ডিত;—সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগত কুপ্রথাগুলি সম্পূর্ণরূপে দূর করবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হয়েছেন, ঐ নূতনমঠ সেই উদ্দেশ্যেই তিনি স্থাপন করেছেন, মূল ধর্ম্মের সত্য মর্ম্ম প্রচারের জন্য, ঐ মঠে কেবল সম্প্রদায়ভুক্ত বাছা বাছা পণ্ডিত, সন্ন্যাসী, চিরকুমার মোহন্ত শাস্ত্রালোচনার জন্য স্থান পাবেন--আলস্যপ্রিয় বাজে অকর্ম্মা লোকের কোলাহল সেখানে থাকবে না।"

"চমৎকার ব্যবস্থা!" সানন্দে শান্তিদেবী বলিলেন "অধিকারী মহারাজ একটা মহৎ কাজের আয়োজন করেছেন।"

সহসা মৌনতা ভঙ্গ করিয়া,—বেদনামথিত দীর্ঘশ্বাসে ঈষৎ বেগের সহিত নিরঞ্জন বলিয়া উঠিল, "যদি সম্পূর্ণ হয়!"

বেদান্তবাগীশ মহাশয় ক্ষণেকের জন্য বিস্মিতভাবে তাহার পানে চাহিলেন, তারপর ধীর সংযত স্বরে বলিলেন "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি,—কিন্তু পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছুই নাই—"

দ্রুত স্পন্দিতবক্ষে কম্পিত স্বরে নিরঞ্জন উত্তর দিল "কিছুই না!"

বাহিরে গম্ভীর পুরুষকণ্ঠে কে ডাকিল, "জ্যাঠামশায়—"

পরক্ষণে একজন বলিষ্ঠ সুন্দর কান্তিপূর্ণ বয়স্ক যুবা পুরুষ কক্ষদ্বার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বেদান্তবাগীশ মহাশয় তাঁহার দিকে চাহিয়া, স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন 'হৃষিকেশ, এস বাবা এস,"

নিরঞ্জন চমকিয়া আগন্তুকের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিল,—ইনি বৃদ্ধা দিদিমার আশ্রয়দাতা, উদারচেতা সদাশয় ভদ্রলোক হৃষীকেশ বাবু!

শান্তিদেবী মালা জপ করিতেছিলেন, বামহস্তে নিরঞ্জনের পরিত্যক্ত আসনখানি সম্মুখে সুবিস্তৃত করিয়া দিয়া বলিলেন "এস ভাই বস," হৃষীকেশ অগ্রসর হইলেন, পশ্চাতে দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন "আয় মনু—"

নিরঞ্জন বিস্ফারিত নয়নে হৃষীকেশকে নিরীক্ষণ করিতেছিল—তাঁহার আহ্বান শুনিয়া সেও দ্বারের দিকে চাহিল,—মুহূর্ত্তে তীব্র উদ্বেগ আলোড়নে তাহার নিঃশ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল! আতঙ্ক অভিভূত নিরঞ্জন, অতি কষ্টে ঈষৎ আত্মসংযত করিয়া, গ্রীবা বাঁকাইয়া, বদন আনত করিল!

দ্বার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, মমতার হস্ত ধরিয়া,—নম্র কুণ্ঠিত নয়নে, লজ্জারুণ আভা রঞ্জিত অধরে—ললিত-কোমল তারুণ্য-দ্যুতি উদ্ভাসিতা, কাব্যবর্ণিতা কিশোরী পার্ব্বতীর মত নিরুপম লাবণ্যময়ী—মায়া!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

কক্ষস্থ দীপটা অত্যন্ত ম্লানভাবে জ্বলিতেছিল, দীপ সম্মুখবর্ত্তিনী শান্তিদেবীর বদন ছাড়া অন্য কাহারও বদন ভালরূপ দেখা যাইতেছিল না, একে দীপালোক ক্ষুণ্ণ তা, তাহাতে নিরঞ্জন অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়াছিল,—তাহার মাথায় পাগড়ী পর্য্যন্ত ছিল না,—মায়া তাহাকে আদৌ চিনিতে পারিল না,—ধীরপদে অগ্রসর হইল।

মায়া আজকাল এখানে বড় একটা আসে না, আজ অনেক দিনের পর আসিয়াছে, শান্তিদেবী স্নেহময় হাস্যে বলিলেন "মায়া আজ এসে পড়্‌লি কি রকম?"

মায়ার বদনে ঈষৎ বিষণ্ন-করুণ-হাস্যরেখা বিকশিত হইল, শান্তিদেবীর পানে একবার লজ্জা-নীরব দৃষ্টিতে চাহিয়া,—মমতার হাত ধরিয়া সে তাঁহার কাছে আসিয়া দেয়াল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। হৃষীকেশ উত্তর দিলেন, "ওরা দিদিমার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ী থেকে ফিরে যাচ্ছিল, রাস্তায় আমায় দেখ্‌তে পেলে, মমুকে ত জান, এখানে আস্‌ছি শুনে আর রক্ষা নাই, কাজেই মায়াকে শুদ্ধ নিয়ে এলুম"

বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের দিকে চাহিয়া হৃষীকেশ বলিলেন "আপনার শরীর অসুস্থ হয়েছে, আজ ঠাকুরবাড়ী যান নি শুন্‌লুম,—আমি দু'একটা কাজের কথার জন্যে আপনাকে বিরক্ত কর্‌তে এসেছিলুম।

বেদান্তবাগীশ মহাশয় বলিলেন "বেশ ত বল না বাবা, আমার শরীরে এমন কিছু হয়নি, সামান্য জ্বরভাব হয়েছে, মাথা, পা, একটু ব্যথা কর্‌ছে.—আর কিছু হয়নি,—"

বেদান্তবাগীশ মহাশয় উঠিয়া বসিয়া, নিরঞ্জনের ললাট-স্পর্শ করিয়া অঙ্গুলি চুম্বন করিলেন, স্নেহময় কণ্ঠে বলিলেন "থাক নিরঞ্জন, অনেকক্ষণ হয়েছে, আর নয় -এবার ছেড়ে দাও!"

শান্তিদেবীর পাশে উপবেশন উদ্যতা মায়া,—বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, কি ভয়ানক,—এখানেও নিরঞ্জন! মায়ার সর্ব্বশরীরে বাড়বানল-শিখা বহিয়া গেল, স্নায়ু-কেন্দ্রের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রলয় সংঘাতের তুমুল শব্দ ঝঞ্ঝনা বাজিয়া উঠিল, স্তম্ভিত দৃষ্টিতে মায়া চাহিল, হা বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের পদতলে নিরঞ্জন-ই ত! সে ধ্যানমগ্ন সাধকের মত নতশিরে—নীরবে বৃদ্ধের পদসেবা করিতেছে! সে সেবা? না পূজা?

মায়ার বক্ষের মধ্যে সমুদ্র মন্থন আরম্ভ হইল! দ্বিপ্রহরের সেই ঘটনার পর, অপমানাহত চিত্তের সমস্ত ক্ষোভ অভিমানের ঝাল তীক্ষ্ণ বিদ্বেষে শানাইয়া মায়া জোর করিয়া আপনাকে, বিদ্রোহ উত্তেজনার আশ্রয়ে সতর্কভাবে দাঁড় করাইয়াছিল। আপনাকে বাঁচাইবার জন্য,—আপনাকে খুন করিয়া ফেলিতে নির্ম্মমভাবে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিল! প্রাণের মুক্তস্বচ্ছল আনন্দবেগ-ধারায় পরিস্নাত, যে শ্রদ্ধামুগ্ধ—সম্ভ্রম-স্মিত সুন্দর আদর্শ, সে গোপন

অন্তরে প্রীতি-উচ্ছ্বসিত তৃপ্তি-পুলকে নম্রনত চিত্তে,—বিশ্বজয়ী গৌরবে, অভিনন্দন করিয়াছিল,—সে মহত্বকেও মিথ্যা অবজ্ঞার ঈর্ষিত ভ্রূকুটি পীড়নে কাল্পনিক লাঞ্ছনায়, অবমানিত করিতে—আপনার মর্ম্মমূলে নিষ্ঠুর আঘাত করিয়া, ছলনার আত্ম-প্রসাদের নামে—সত্যের আত্মাবমাননায়—আপনাকে ক্লান্তি-নিষ্পীড়িত করিতেও সে কুণ্ঠিত হয় নাই, নির্ব্বোধ বালিকা, দুর্ব্বোধ্য জেদ অবলম্বন করিয়া প্রাণপণে আপনার সহিত যুঝিয়াছে, মনকে আক্ষেপহীন করিবার জন্য কত মিথ্যা সান্ত্বনার সৃষ্টি করিয়াছে,—কিন্তু এখন? এখন মুক্ত কণ্ঠে তাহার দুর্ব্বুদ্ধিকে সহস্র ধিক্কার!—এই নিরঞ্জনের মহানুভবতা, সহৃদয়তার বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহিতার অভিযান সাজাইয়া মরে? এ নিরঞ্জনের হস্ত দু'টি জগতের প্রয়োজনীয়—প্রিয়কার্য্যে সদা নিযুক্ত! এ নিরঞ্জন পাথর কাটে, শিল্প গড়ে; পীড়িতের শুশ্রূষায়, অসহায়ের সাহায্য সহৃদয়তায়—ইহার প্রাণভরা আগ্রহ, বুকভরা সহানুভূতি! মায়ার তুচ্ছ জলের ঘড়াটা বহিয়া আনার জন্য যদি কিছু ত্রুটি ঘটিয়া থাকে, তবে সে ত্রুটি মায়ার,—মায়া এখন এক মুহূর্ত্তে বুঝিল,—নিরঞ্জন তাহার জন্য অপরাধী নহে!—মায়া নিজের—কঠোর সঙ্কোচাবদ্ধ জীবনের, নিরুপায় ক্ষোভে, নিষ্ফল আক্রোশে মিথ্যাই নিরঞ্জনকে দায়ী করিতেছে,—নিরঞ্জন কিন্তু তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্পর্শের ঊর্দ্ধে—বহুঊর্দ্ধে! মায়ার হাস্যাস্পদ মূঢ়তা সেখানে পৌঁছিতে পারে না,—তাহার চতুর্দ্দিকে অভ্রভেদী গৌরবের, অটল পাষাণ-প্রাকার!

বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কথায় নিরঞ্জন খাট ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল পাগড়ীর কাপড়টা টানিয়া কাঁধের উপর ফেলিয়া,—বিদায় নমস্কার করিয়া অস্ফুট-স্বরে বলিল "এখন তবে আসি—"

হৃষীকেশ ভাল করিয়া নিরঞ্জনের দিকে চাহিয়া, বিস্মিতভাবে বলিলেন "এ ছেলেটি কে? চিন্‌তে পার্‌ছি না—"

বেদান্তবাগীশ মহাশয় বলিলেন "তুমি জান না? চিত্তরঞ্জন ভাস্করের নাম শুনে থাক্‌বে বোধহয়, এ ছেলেটি তারই ভাই,—নিরঞ্জন, ইনি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র হৃষীকেশ;"

নিরঞ্জন হৃষীকেশের উদ্দেশ্যে নমস্কার করিল, হৃষীকেশ প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন "ওহো, ইনি নিরঞ্জন ভাস্কর!—চাক্ষুস আলাপের সৌভাগ্য হয়নি, নাম শুনেছি বটে,—কিন্তু ইনি দেখ্‌ছি নিতান্ত অল্পবয়স্ক—"

বেদান্তবাগীশ মহাশয় স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন "হাঁ, এই অল্পবয়সেই খুব খ্যাতি অর্জ্জন করেছে, আমাদের নিরঞ্জন বেশ কার্য্যদক্ষ বুদ্ধিমান লোক,—কালে 'একজন' হবে!"

গমনোদ্যত নিরঞ্জনের পানে প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া হৃষীকেশ প্রশ্ন করিলেন "এখন এখানে আপনাদের থাকা হবে?"

ভূমিলগ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া সংযতকণ্ঠে নিরঞ্জন উত্তর দিল "আজ্ঞে হাঁ দিনকতক,—মঠের কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত,—নমস্কার।"

হৃষীকেশ বলিলেন "নমস্কার আসুন—"

শান্তিদেবীর উদ্দেশ্যে মাথা নোয়াইয়া নিরঞ্জন অগ্রসর হইল, হৃষীকেশ বলিলেন,—"আমরাও এখনি উঠ্‌ব, আপনাকে জ্বালাতন কর্‌ব না,—বেশীক্ষণ। আমি বল্‌তে এসেছিলুম একটি কথা,—দিদিমার একান্ত অনুরোধ,—বিবাহের দিন আপনি মায়াকে সম্প্রদান করেন।"

"সম্প্রদান!"—কথাটা সজোরে আসিয়া দুইটি বেদনা পীড়িত হৃদপিণ্ডের উপর ধ্বক্‌ করিয়া বাজিল! নিবিড় ব্যাকুলতা হৃদয় ভেদ করিয়া—অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ঠিক্‌রাইয়া উঠিল! দীপ সম্মুখে উপবিষ্ট হৃষীকেশের পশ্চাতের ছায়াটি লঙ্ঘনের পূর্ব্বে, নতশিরে নমস্কার উদ্যত নিরঞ্জন,—অকস্মাৎ আত্মহারা বেদনায়, বিহ্বল-করুণ দৃষ্টি তুলিয়া

চাহিল, চকিতে আর একজনের সহিত তাহার দৃষ্টি বিনিময় হইল !—পরক্ষণেই চারিটি চক্ষের পলক নত হইল,—কিন্তু জাগিয়া উঠিল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত করিয়া—মরণোন্মাদ আকুলতায় পরিপূর্ণ—অসহ্য অপরিসীম আতঙ্ক শিহরণ !

কথোপকথনরত কেহ সেদিকে লক্ষ্য করিল না। হৃষীকেশের কথার উত্তরে বেদান্তবাগীশ মহাশয় বলিলেন "বেশ,—তিনি যদি বলেন, তাতে আমার আপত্তি কি ? এ ত আমার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম !"

সংজ্ঞাহীন নিরঞ্জনের কর্ণে আর কোন কথা ঢুকিল না, মায়ার অচেতন অনুভূতির নিকট আর কোন শব্দ,—বাহ্যজগতের কোন ভাষা পৌঁছিল না !—একটি ক্ষুদ্রতম মুহূর্ত্তে, ততোধিক ক্ষণস্থায়ী,—চকিত দৃষ্টিস্পর্শে—অসহনীয় পরিচয়ের তীব্র অভিঘাতে, এক বিরাট রহস্যাচ্ছন্ন মহাযবনিকা ছিন্ন হইয়া গেল ! দুইটি প্রাণী পরস্পরের অগোচরে,—পরস্পরের অস্তিত্ব লইয়া এতক্ষণ যে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের ভাঙ্গা গড়ায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল,—এক নিমেষে তাহার সমুদয় গুহ্যতত্ত্ব পরস্পরের মর্ম্মে প্রখর ঔজ্জ্বল্যে প্রকটিত হইল !—ধৈর্য্য-বিবেকের সংহত-কঠিন আবরণাবৃত আত্ম-বিপ্লবে, আত্মদ্রোহী, ভ্রান্তি উন্মাদ দুইটি হৃদ্‌পিণ্ডের উপর লৌহ কঠোর মুদ্গরাঘাত বাজিল !—রুদ্ধশ্বাসে নিরঞ্জন নিঃশব্দে পলাইল,—মায়া দুইহাতে বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া, মুমূর্ষু-কাতর দৃষ্টিতে মাটীর পানে চাহিয়া বসিয়া পড়িল !

কল্পনার খোঁচায় উত্তেজনার আগুন জ্বালাইয়া,—মায়া নিজের চক্ষে বঞ্চনার ধূলিমুষ্টি ছড়াইয়া,—নিজেকে নিষ্ঠুর গৌরবের রক্ত-রাগে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিল, এখন এক নিমেষে সত্য মিথ্যার সকল দ্বন্দ্ব চুকিল ! মায়া চাহিয়া দেখিল, তাহার প্রাণ বিদীর্ণ করিয়া, উচ্ছ্বসিত বেদনার লেলিহান অগ্নিশিখা—তাহার আহত হৃদ্‌পিণ্ডের ক্ষতমুখ নিঃসৃত শোনিত রস শোষণ করিয়া, এখন তাহারই, বুকের উপর, করাল-উল্লাসে তাণ্ডব-নৃত্যে অট্ট হাস্য করিতেছে !—মায়া সভয়ে চক্ষু মুদিল !

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

কতক্ষণ পরে কেমন করিয়া মায়া বাড়ী আসিয়া পৌঁছাইয়াছিল, তাহা তাহার আদৌ স্মরণ ছিল না—তবে বিদায়ের সময় সে যে জেঠা মহাশয়কে,—অর্থাৎ বেদান্তবাগীশ মহাশয়কে প্রণাম করিতে ভুলিয়াছিল—এবং হৃষীকেশ যে অনুগ্রহ করিয়া স্নেহময় স্বরে সেটুকু তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা মায়ার স্পষ্ট স্মরণ আছে !

মানসিক বিপ্লবের উগ্র-আতিশয্যে মায়া সমস্ত রাত্রে আদৌ ঘুমাইতে পারিল না, উদ্ভ্রান্ত ব্যাকুলতা পূর্ণ মস্তিষ্কে অনেক চিন্তা ছুটাছুটি হুটোপাটি করিল, অবসাদ ক্লান্ত মস্তিষ্ক ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িল, কিন্তু মন তবুও দমিল না ! সে মত্ত উত্তেজনায় তাহাকে লইয়া ব্রহ্মাণ্ডময় ঘুরপাক খাওয়াইতে লাগিল ! মায়া আড়ষ্ট নিস্পন্দ দেহে নিঝুম হইয়া শয্যার উপর পড়িয়া রহিল, তাহার নিঃশ্বাস-শব্দও যেন রুদ্ধ-গাম্ভীর্য্য মিশাইয়া গিয়াছিল, পার্শ্বে শায়িতা দিদিমা জানিলেন মায়া গভীর নিদ্রায় অভিভূতা !

মানুষের জীবনের কোন এক অনির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে,—আত্মার ব্যক্ত শক্তির স্বচ্ছন্দ স্পন্দন লীলার বক্ষে সহসা অতর্কিতে এমন উদ্দাম-চপল ঝঞ্ঝা সবেগে আসিয়া আহত হয় যে,—এক নিমেষে চিত্তের চির অভ্যস্ত সুর তান লয়,—সবই উন্মাদ উচ্ছৃঙ্খলতায় ছন্দোহীন হইয়া পড়ে !—চারিদিকে ভাঙ্গা গড়া জীবন-মরণের দ্বন্দ্ব উৎসব তীব্র

উত্তেজনায় জাগিয়া উঠে,—মানুষের মন তখন নিরীহ সহিষ্ণুতাকে দৃপ্ত অবজ্ঞায় ঘৃণা করে ! নিজেকে আয়ত্তের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারে না—মুক্ত বিদ্রোহিতার বক্ষে আপনাকে আয়ত্তের বাহিরে ছাড়িয়া দিয়া স্বস্তির নামে নিষ্কৃতি পাইতে চায় ! প্রচণ্ড উৎক্ষিপ্তির প্রলয় তরঙ্গে আপনাকে আছাড় খাওয়াইয়া মরণের আনন্দ অনুভব করিতে চায় ! দুঃসাহসের উন্মাদনায় তখন মানবের অন্তরাত্মা ভরিয়া উঠে ! মন চায়,—সদা জীবনঘাতী রোষোদ্যত তিলিংসের সূক্ষ্ম জিহ্বায় সূচি বিদ্ধ করিয়া খেলিতে !—প্রাণ চায়,—প্রলয় ঝঞ্ঝার বক্ষ ভেদ করিয়া বজ্রশিখার মত জলন্ত প্রখর তেজে ছুটিয়া,—মহাবেগে সংহার উৎসবের বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া,—ইচ্ছাধীন আনন্দে, অপ্রতিহত শক্তিতে, নূতন সৃষ্টি গড়িতে !—নূতনতমকে আবিষ্কার করিয়া, পুরাতনের ধ্বংসস্তূপের উপর নব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিতে !—পড়ুক আগুনে, ডুবুক জলে,—সব অগ্রাহ্য ! আপনার অস্তিত্ব,—ব্যক্তিত্ব, পদাঘাতে দূর করিয়া জীবন মৃত্যু দুই হাতে লইয়া স্বেচ্ছাচারে লোফালুফি খেলিতে উৎসুক হয় !

কিন্তু এই উৎকণ্ঠ-উত্তেজনার সঙ্গে আর এক বিকট অবসাদ ঘনিষ্ঠ সহৃদয় আত্মীয়ের মত, অলক্ষিতে পাশা-পাশি ঘুরিয়া বেড়ায় ! সে বুঝি আরও ভয়ানক !—উত্তেজনার বক্ষে নৃশংসতা আছে, নির্ভীকতা আছে কিন্তু নির্জীবতা নাই !—মানুষের মন অতর্কিতে ইহাদের একের উপর ঝুঁকিলে, অপরের হস্তে আর তাহার নিস্তার নাই !

বিরুদ্ধ ভাবের দ্রুত সংঘর্ষণে, মায়ার সমস্ত চিত্ত বিকল,—উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, দুইটি চকিত দৃষ্টির মুহূর্ত্ত বিকাশিত ভাব সংঘাতে যে তাড়িতানল বিস্ফুরিত হইয়াছিল—তাহার অসহনীয় উত্তাপে, মায়ার হৃদয়ের সমস্ত স্বচ্ছন্দ সরলতা—সমস্ত আনন্দ উজ্জ্বলতা, গভীর অন্ধকার গহ্বরে লুকাইয়া পড়িল !—মায়ার অন্তরাত্মা জীবন মৃত্যুর দ্বন্দ্ব দোলায়—উন্মাদ আন্দোলনে দুলিতে লাগিল ;—মায়া উপরে, নীচে—আশেপাশে যে দিকে চায়, সেই দিকেই দেখে প্রলয় ঘূর্ণন !

নিদ্রার জন্য তীব্র সতর্কতায় যতই যোঝাযুঝি করা যাক, নিদ্রা কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত না হইলে ধরা দেন না ; মায়া সারা রাত্রে নিদ্রার নাগাল ধরিতে পারিল না,—ভোরের দিকে অজ্ঞাতে কখন একটু তন্দ্রার ঝোঁক আসিয়াছিল, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্তেই তাহা ছুটিয়া গেল !—সঙ্গে সঙ্গে তীব্র ঔৎসুক্য—অকারণ উদ্বেগ, বুকের মধ্যে যেন দুই অদৃশ্য দৈত্যের ঘোরতর মল্লযুদ্ধ করিয়া গেল ! সমস্ত মাংসপেশীতে উষ্ণ উত্তেজনা প্রবাহ অনুভূত হইল, মায়া বশীকৃত হরিণ শিশুর ন্যায় ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিয়া পড়িল !

মনের ভিতর কল-ক্রন্দন রোল জাগিয়া উঠিল !—সে ক্রন্দনের কারণ মস্তিষ্কের যুক্তি তর্কের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, তাহার সবই যে খাপছাড়া বেহিসাবী বন্দোবস্তে পূর্ণ !—অথচ সে, চিত্তের সমস্ত অনুভূতি ব্যাপ্ত করিয়া—প্রকাণ্ড সত্য !

মায়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিল, বাহিরে বিশ্বজোড়া পরিবর্ত্তন স্রোত, তেমনি বৈচিত্র্য রঞ্জিত, তেমনি কোলাহলময় চলিতেছে, কিন্তু কোথায় তাহার তারুণ্য প্রভার ললিত লাবণ্য, কোথায় তাহার প্রাণ ! ঐ যে পথে সারি সারি অসংখ্য লোক ব্যস্ত চঞ্চলতায় কাজের জন্য ছুটিয়াছে, ঐ যে দুইটী শ্রমজীবি পরস্পরের গা ঘেঁসিয়া প্রসন্ন-উল্লাসে হাসিতে হাসিতে কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছে,—এর মধ্যে সত্য কই, শৃঙ্খলা কই, সৌন্দর্য্য কই ?—কিছু নয়, কিছু নয়, সবই সত্যকে ফাঁকী দিয়া চলিবার—কারচুপী কাণ্ড !

জগৎ জোড়া শুষ্ক রূঢ়তাপূর্ণ বিস্বাদ শুধু সত্য স্থির ভাবে বিরাজ করিতেছে, ইহাতে আনন্দের লেশ মাত্র নাই ! তবে যে যেটুকু টানিয়া বুনিয়া যোগাইতেছে, হাসিতেছে খেলিতেছে, সেটুকু শুধু ছলনা মাত্র, তাহার আগা গোড়া ফাঁকী !—ঐ যে মানুষগুলা উদ্বেগহীন ভাবে সুলভ শান্তিতে দিন কাটাইতেছে, এমন সহজ

সন্তোষে জীবন বহন করিতেছে, আশ্চর্য্য উহাদের ভ্রান্তি !—অদ্ভুত উহাদের ধৈর্য্য !—এমন ভাবে চলিতে উহাদের আক্ষেপ বোধ হয় না, ইহারা এমন পরিষ্কার ছলনায় নিজেদের মুখগুলো ঢাকিয়া চলিয়াছে, পরকেও ঠকাইতেছে, ধিক্ !

জীবনটা কি ?—কিছু নয়, একটা নিরবচ্ছিন্ন বেদনার স্পন্দনে সৃষ্ট কোন কিছু মজার জিনিস বটে, তবে সে সত্যে মিথ্যায় গড়া ; তাহার মধ্যে হাস্যোদ্দীপক প্রহসনত্ব যেটুকু আছে, সেই টুকুই ভুল, প্রাণান্তকর বেদনা যেটুকু আছে,—সেইটুকুই খাঁটি সত্য !

প্রাতঃস্নান সারিয়া কাপড় লইতে ঘরে ঢুকিয়া দিদিমা দেখিলেন মায়া উদাসব্যাকুল দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে, তাহার চক্ষু দুইটি সঙ্কোচে বেদনায়, মলিন নিষ্প্রভ !—তাহার মুখ স্বভাব-সুন্দর—সজীব লালিত্য এক রাত্রের মধ্যে কে যেন নিঃশেষে নিষ্কর্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে ; বাসী ফুলটির মত সে যেন একান্তই শুষ্ক পর্য্যুদস্ত, ভোরের আলোয় সে যেন বড়ই মুমূর্ষু !—আশ্চর্য্য হইয়া তিনি বলিলেন "মায়া কাল রাত্তিরে জ্বরটর হয় নি ত ?"

ঈষৎ হাসিয়া মায়া বলিল "কেন দিদিমা ?"

"মুখখানা যেন বড্ড শুষ্ক, কালিমাখা দেখাচ্ছে !"

"কি জানি"—মায়া মুখ ফিরাইল ; কি জানি ?—হাঁ কি জানি বৈ কি, এ ত কিছুই জানা যাইতেছে না,—বুঝি ইহা জানার চেয়ে না জানাই ভাল,—ভাল ত নিশ্চয়ই, কিন্তু হায়, সেই এক মুহূর্ত্তের স্মৃতি,—যদি জীবনের অঙ্ক হইতে একেবারে বাদ দিতে পারা যাইত, তাহা হইলে—মায়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিল !

দিদিমা চলিয়া গেলেন, মায়া চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সব মিথ্যা, পৃথিবী জোড়া একটা মিথ্যার কারখানা বসিয়া গিয়াছে, এই যে এত শব্দ কোলাহল, এই যে এত হাঁকাহাঁকি, ইহার কোনটার ভিতরই আজ, সত্যের,—স্বার্থকতার চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না ! চারিদিকেই ভুল, চারিদিকেই ব্যার্থতা,—ওঃ !

জীবনের হাসি আনন্দ,—একি নিকৃষ্টতা, কি নির্লজ্জতা ! মানুষ বোঝে না, সে নিজেকে কত প্রতারণা করিয়া চলিতেছে, কত ছলনায় পরকে মজাইতেছে ! ইহারা হাসে ফাঁকির দিক দিয়া কি না, তাই হাসিকে এত ভালবাসে—কান্নাটা সত্যের দিক দিয়া, বলিয়া বুঝি ইহারা কান্নাকে এত ডরাইয়া চলে, ইহারা এমনি আত্মপ্রবঞ্চক বুদ্ধিমান বটে ! মমতা ঘরে ঢুকিল, কাছে আসিয়া হাটু ধরিয়া সাদরে ডাকিল "পিসিমা।"

"কে রে মমতা"—মায়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাহার পানে চাহিল, বুঝি তাহার সন্দেহ হইয়াছিল, ইহার অস্তিত্বটা বোধহয় ভুল !—নির্ব্বোধ-দৃষ্টিতে কয় মুহূর্ত্ত তাহার মুখ পানে চাহিয়া থাকিয়া অবসন্ন ভাবে বলিল "কি বলছিস্ মমু ?"

"নাইতে যাবে না ?"

"হবে এখন"—মায়া আবার অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল, মমতা দাঁড়াইয়া তক্তপোষ চাপড়াইয়া 'আগডুম, বাগডুম' খেলিতে লাগিল ;

খানিকটা স্থির দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া,—সহসা ত্রস্তভাবে মায়া তক্তপোষ হইতে নামিয়া পড়িল, —ক্ষিপ্ত ব্যাকুলতায় বলিল "সর সর মমু, জ্বালাতন করিস্ নি, বিছনা মাদুর তুলতে দে ;"

"কেন ?" মমতা বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, সে বুঝি এতক্ষণ আটকাইয়া রাখিয়াছে ! মনে মনে ভর্ৎসনা লজ্জিত হইয়া মায়া অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল "না রে না, অনেক বেলা হয়ে গেছে কিনা, তাই—বলছি !"

ব্যস্ত-উদ্বেগে তাড়াতাড়ি বিছনা তুলিয়া, ঘর ঝাঁট দিয়া মায়া স্নান করিতে বাহির হইয়া পড়িল। বউ-দিদি তখন কলঘর হইতে কাপড় কাচিয়া বাহিরে আসিতেছিলেন, মায়াকে দেখিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন "এঃ তাই ত, দিদিমা তো ঠিক্ বলেছেন, তোমার মুখখানা যে বড্ড শুক্‌নো দেখাচ্ছে, যাও যাও, সকাল সকাল তেল মেখে নেয়ে ফেল, কিছু খাও, তারপর………।"

ওগো রক্ষা কর, রক্ষা কর,—এ স্নেহ মমতা তাহার আর আজ সহ্য হইতেছে না,—আজ যদি স্বস্তি দিতে চাও—সহৃদয়তা দেখাইতে চাও ত দাও অন্য দিক দিয়া—বেদনার ভিতর হইতে!—বাস্তবের এই মিথ্যা ভ্রূকুটী পীড়ন তাহার ধাতে আর সহিতেছে না!

মায়া তাড়াতাড়ি কলঘরে আসিয়া ঢুকিল, তারপর কি করিবে হঠাৎ যেন ভাবিয়া পাইল না, চৌবাচ্চার পাশে বসিয়া পড়িয়া অন্যমনস্কভাবে জল ঢালিয়া পা রগ্‌ড়াইতে লাগিল,—কয়েক মুহূর্ত্ত পরে, আপনার মধ্যে আপনি বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল হঠাৎ এত বিরোধ কোথা হইতে আসিল! একি অ-বনিবনা?—পৃথিবীর সহিত তাহার হইয়াছে কি?

ব্যাকুল বেদনায় উত্তর আসিল,—কিছু না—কিছু না!—পৃথিবীর সঙ্গে তাহার এতদিন যে সহজ সম্বন্ধটা চলিয়া আসিতেছিল, তাহারই মধ্যে কি একটা মস্ত গোঁজামিল আসিয়া পড়িয়াছে—পৃথিবীশুদ্ধ লোক যে পথে চলিবার সেই পথেই সোজা চলিয়াছে, শুধু তাহারই পথটা গিয়াছে বাঁকিয়া,—শুধু সেই ছুটিয়াছে দলভ্রষ্ট হইয়া!—

কিন্তু আবার দলে ভিড়িয়া পড়িতে পারা যায় কি করিয়া?—তাহার অন্তরাত্মা সাভিমানে ঝঙ্কার দিয়া বাজিয়া উঠিল, নাঃ, আর ফিরিবার দরকার নাই, বিশ্বের সহিত সম্পর্ক যখন ছিঁড়িয়াছে, তখন এই পর্য্যন্তই সমস্ত চুকিয়া বুকিয়া যাক্, এ উদ্ভ্রান্ত বেদনায় প্রাণ লইয়া সে আর বিশ্বের সহিত আত্মীয়তাও পাতাইতে পারিবে না, ঘরকন্নাও করিতে পারিবে না!

পর মুহূর্ত্তেই ধ্বক্ করিয়া মনে পড়িয়া গেল নিরঞ্জনের কথা!—"পৃথিবীকে অকৃতজ্ঞ বলে গাল দেবার আগেই, স্বক্তের তেজে, সত্যিকার পরার্থপরতা সাধন করে, পৃথিবীর সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়ে নিতে পারি যেন—"

এ তেজস্বিতা—এ দর্প,—এও কি মিথ্যা!—মায়ার বুকের ভিতর তোলপাড় করিয়া উঠিল, না না এ নিরঞ্জনের প্রাণের আবেগ-উচ্ছ্বাস! এ যে তাহার পক্ষে ধ্রুব সত্য! নিশ্চল আদেশ!—মায়ার দুই চক্ষে হুহু করিয়া অশ্রুস্রোত ছুটিল, হায় ভগবান একি শাস্তি!—

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

"আঃ কচ্ছিস্ কি নিরুদা"—আজ এমন কাজের খেই হারাচ্ছিস্ কেন ভাই,—"

"বাহবা সন্তুদা, নিরঞ্জনের কাজের ভুল ধরছ, 'আঁ—কি হনু রে মুই!' কেমন্?—" আদিত্য উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল;

চিন্তামগ্ন নিরঞ্জন ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া যন্ত্র চালাইতেছিল, সঙ্গীদের পরিহাসে চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিয়া, অপ্রস্তুত ভাবে ঈষৎ হাসিয়া বলিল "কি বল দেখি?"

"বলছি অমন জোর-তলবে তুরীয় অবস্থায় সমাধিস্থ হলে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতটায় যে মহা বিশৃঙ্খলা বেঁধে ওঠে, চতুর্ব্বর্গ তো আছেই, আপাততঃ একটু সচেতন হয়ে·········।"

উদ্বিগ্ন-দৃষ্টিতে চাহিয়া নিরঞ্জন বলিল "কি করতে হবে বল দেখি।"

"ভ্রম সংশোধন, দেখ দেখি এখানে মাথামুণ্ড এ কি সব হিজিবিজি কেটেছ!"—

"তাই ত!" নিরঞ্জন স্তব্ধভাবে চাহিয়া রহিল, সে এতগুলো ভুল করিয়া ফেলিয়াছে, কিছুই ঠাহর করে নাই!

আদিত্য ডাকিল "ওরে ভাই নিরঞ্জন দেখ তো এটা এম্নি হবে না?"

নিরঞ্জন সরিয়া আসিয়া মূঢ়ের মত ভাবহীন দৃষ্টিতে দুই মুহূর্ত্ত জিজ্ঞাসা বিষয়ের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর নিরুপায় ভাবে স্খলিত কণ্ঠে বলিল "তাই হোক্।"

"এ রেখাটা ডাইনে টান্‌ব?"

"তাই টান"—নিরঞ্জন চিন্তাকুল দৃষ্টিতে মুখ ফিরাইল। সনাতন হাতের যন্ত্র ফেলিয়া অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে নিরঞ্জনের মুখপানে তাকাইতেছিল, তাহার শেষ কথা শুনিয়া সবিদ্রূপে উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া বলিল "বা—বা ওস্তাদ, বেশ বলেছ।"

নিরঞ্জন চমকিয়া চাহিল, সবিস্ময়ে বলিল "কেন কি হয়েছে?"

"ঐ রেখা ডাইনে হয়? ও যে বাঁয়ে, দেখ দেখি ঐ টে,"

"—ওঃ তা হ'লে ভুল হয়েছে, আচ্ছা বাঁ দিক থেকে টান ভাই, আঃ সনাতন যে জোরে হাসিস্, আচম্‌কা কানে ভারি লাগে!"—উৎকণ্ঠিত ভাবে তাড়াতাড়ি আসিয়া নিরঞ্জন নিজের যন্ত্র তুলিয়া লইল; আবার যন্ত্র ফেলিয়া অসহিষ্ণু ভাবে এটা ওটা সেটা লইয়া নাড়া চাড়া করিল—কি করিতে হইবে ভাবিয়া পাইল না।

"নিরু দা—"

"আঃ কি যে বকিস্ রাদ্দিন, থাম—"

"তুমিই ত ভাই কাল রাত্তিরে নিজে আগে কথা কয়েছ ·······"

"ঝকমারী হয়েছে, থাম, এগুলো আগে শুধ্‌রে তুলি—" ত্রিভিত্তিগাত্রস্থ সদ্য অঙ্কিত নক্সাগুলি উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে সহসা সবেগে নিরঞ্জন বলিয়া উঠিল "না সনাতন, এ চল্‌বে না, কিছুতেই চল্‌বে না,"

আদিত্য মুখ ফিরাইয়া ব্যঙ্গস্বরে বলিল "কেন ওদের পায়ে কি পক্ষাঘাত হয়েছে?"

—অধীর হইয়া নিরঞ্জন বলিল "না না ঠাট্টা নয়, আমার হাতের কাজ, আমারই পছন্দ হচ্ছে না, তা অন্যের কথা—সব মাটী হয়ে গেছে, সনাতন, আজ ছুটির পর আমি ফের দো-কর খাট্‌ব, সব শুধ্‌রে নেব।"

"আরে—নে! ওতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না!—"

"কিন্তু আমার মনই বা শুদ্ধ হয় কৈ—" নিরঞ্জন থামিয়া গেল, তাহার অন্তরের মধ্যে একটা বেদনা-বিকল-মূঢ়তা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—ওরে হতভাগ্য ওরে বর্ব্বর, প্রাণের সে নিষ্করুণ ক্ষোভময় দৃশ্য, সে যে প্রাণের গোপন অন্ধকারে চিরদিন চাপিয়া চলিবার বস্তু! বাহিরের চাপে নিজেকে নিঃশব্দে পিষিয়া ফেলিয়া—পৃথিবীকে হাসিভরা মুখ দেখাইতে হইবে, পৃথিবী যেন সন্দেহ না করে যে তাহার ভিতর কোন কিছু খট্‌কা আছে!—তবে একি অসহিষ্ণুতা করিতেছ নির্ব্বোধ!

নিরঞ্জনের বুকের মধ্যে তীব্র বেদনা সজোরে আলোড়িত হইয়া উঠিল! এমনি ভাবে প্রবঞ্চনা করিয়া পৃথিবীর সহিত চলিতে হইবে? হাঁ,—এমনি ভাবে না চলিলে যে, আপনাকে পৃথিবীর উপযুক্ত রূপে গড়িয়া তুলিতে পারা

যাইবে না ;—না যায় তাহাতে ক্ষতি কি ? পৃথিবী কি তোমার উপযুক্ত ভাবে নিজেকে গড়িয়াছে ? না, পৃথিবী কাহারও উপযুক্ত মনোমত হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না, প্রত্যেকের উচিত নিজেকে পৃথিবীর উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলা !—

উচিত তো মানিলাম, কিন্তু বুক যে এ কঠোরতার আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়ে !—তবে আর মজা কি ? মস্তিষ্কের যুক্তি এবং হৃদয়ের আবেগ অনুভূতি—দুইয়ের মধ্যে আত্মশ্লাঘার দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে, দুই জনেই চায়, নিজের মাপে অপরকে তৈয়ারী করিতে—অথচ নিজেকে খাটো হইতে দিবে না, এই জেদ !—এই রেষারেষির ঠেলায় পড়িয়াই ত মানুষ আত্মহারা—উন্মাদ হইয়া উঠে !—নিরঞ্জন ব্যাকুলভাবে চারিদিক চাহিল !

উৎসন্ন যাউক মানুষের উন্মত্ততা ! দাও ঐ হাতুড়ীর আঘাতে প্রাণটা গুঁড়াইয়া !—জীবন ধ্বংস হইয়া যাক্, কিন্তু হৃদয়টা মুক্তির মাঝে এমন প্রতিমুহূর্তের অনিচ্ছার সহিত ঝুটাপুটি করিয়া, আপনাকে অবসন্ন অবসাদের মধ্যে বাঁচাইয়া রাখা অপেক্ষা,—খুনীর সহিত অতলের তলে তলাইয়া যাওয়ায় লাভ নাই কি ? হাঁ আছে ! প্রচুর আরাম আছে !—

কিন্তু না—না—না ! নিরঞ্জন তীরবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল, ওঃ একি দুর্ব্বিষহ উন্মত্ততা !—সে করিতেছে কি ?

সনাতন আপন মনে কাজ করিতেছিল, সহসা নিরঞ্জনকে উঠিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল "কোথায় যাবি নিরঞ্জন ?"

নিরঞ্জন অতি মাত্রায় চমকিয়া উঠিল ? স্তব্ধ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দুই মুহূর্ত্ত তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল, হঠাৎ তাহার সাড়াটা বুঝি কানে অত্যন্ত আশ্চর্য্য রকম বেসুরা লাগিল !—মস্তিষ্কের মধ্যে তাহার প্রশ্নের শব্দাভিঘাতটা —ব্যর্থ চেষ্টায় নিষ্ফল প্রতিধ্বনি করিয়া ফিরিতেছিল, তীব্র-সংঘাতে নিজেকে সতর্ক উন্মুখ করিয়া নিরঞ্জন শব্দার্থ অনুধাবনে মনটা ফিরাইল ; কোথায় যাইবে সে ? না কোথাও না !—

নিরঞ্জন স্খলিতকণ্ঠে উত্তর দিল "কোথাও না।"

সে আবার বসিয়া পড়িল ;

দূর হোক, একি বিশৃঙ্খল ক্ষিপ্ততা মনের মধ্যে—না না মনের ভিতর বাহির বিপর্য্যস্ত—বিক্ষোভিত করিয়া জীবনের উপর আসিয়া পড়িল !—সনাতন বলিল "তবে অমন তড়াক্ করে উঠ্‌লি কেন ?"

দন্তে অধর দংশন করিয়া নিরঞ্জন বলিল "ও কিছু নয়"—

হা ভগবন ?—এমন সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বময়কেও পরিষ্কার প্রবঞ্চনায় কিছু নয় বলিয়া উড়াইতে হইল !—নিরঞ্জনের ভিতরে মহাবিপ্লব করিয়া উঠিল ? তাহার হাতের যন্ত্র হাতেই রহিয়া গেল, সে শুধু উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টিতে নক্সাগুলির দিকে চাহিয়া রহিল।

গত কল্য রাত্রে একজন কীর্ত্তন-ভক্ত ভাটিয়া বণিক, সদলবলে খোল করতাল লইয়া ঠাকুরবাড়ীতে কীর্ত্তন করিতে আসিয়াছিলেন ; কীর্ত্তনের আনন্দে কিরূপ লম্ফঝম্ফে তিনি প্রচুর নৃত্য করিয়াছিলেন, কেমন করিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গনে গড়াগড়ি দিয়াছিলেন—কিরূপ উন্মত্তভাবে সকলকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন,—আদিত্য তাহাই বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী শ্রমজীবিকে শুনাইতেছিল, মাঝে মাঝে হাতের কাজ বন্ধ করিয়া, যথাবিহিত অঙ্গভঙ্গী যোগ দিতেও ছাড়িতেছিল না, শ্রমজীবিটা হাসিতেছিল। সনাতনও তাহাদের সহিত যোগ দিল, তাহাদের খুব হাসি চলিতে লাগিল।—তাহাদের হাসির তোড়ে নিরঞ্জনের কান ঝালাপালা হইয়া যাইতে লাগিল —কিন্তু তবু সে তাহাদের কথায় মনোনিবেশ করিতে পারিল না। নীরবে ভাবিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে মুখ ফিরাইয়া চাহিল; আঃ, ইহারা আছে বেশ! হাল্কা হাসির তোড়ে জীবনের যত কিছু ভার—দিব্য ভাসাইয়া বড় সুখে উজানে বাহিয়া চলিয়াছে,—কোনখানে দ্বিধা-সঙ্কোচ নাই, দিব্য সরল আনন্দময়, স্বচ্ছ সুন্দর জীবন! আহা হোক হোক,—উহাদের জীবন ঐরূপ স্বচ্ছলতার মধ্যেই সানন্দে বহিয়া যাক—

নিরঞ্জন সকরুণ ছল্ ছল্ নয়নে তাহাদের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। আদিত্য দেখিল, নিরঞ্জন কাজ ফেলিয়া তাহার অভিনয় দক্ষতায় মুগ্ধ আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, সে উৎসাহিত হইয়া উঠিল,—তুমুল আস্ফালনে হস্ত পদ ছুড়িয়া সুনিপুণ চাতুর্য্যে, কীর্ত্তন-কৌশল দেখাইতে লাগিল। উপস্থিত দর্শকগণ 'হো হো' করিয়া উচ্চ শব্দে হাসিয়া উঠিল, নিরঞ্জন তাহাদের সহিত যোগ দিবার চেষ্টা করিল,—কিন্তু অকস্মাৎ অজ্ঞাত বেদনার লৌহ কঠিন কর নিষ্পেষণে তাহা র কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, হাসিতে গিয়া অজ্ঞাতে যেন ফোঁপাইয়া—চমকিয়া উঠিল, দীর্ঘ নিঃশ্বাসে ত্রস্তে আত্মসম্বরণ করিয়া, মুখ ফিরাইয়া হেঁট হইয়া বসিল!—

না না,—ইহাদের সহিত সে আর ভিরিতে পারিবে না!—আর এদিকে ঘেঁসিবার সাধ্য তাহার নাই, এ মিলন আনন্দের মধ্যে, তাহার জন্য স্থান নাই, তাহার পথে পড়িয়া গিয়াছে, এক মস্ত পূর্ণচ্ছেদ!—তাহাকে লঙ্ঘন করা অসাধ্য, বুঝি লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা চিন্তাও ততোধিক অসহ্য!

নিরঞ্জনকে মুখ ফিরাইতে দেখিয়া সনাতন আদিত্যকে ইঙ্গিত করিয়া হাসিল,—নিরঞ্জন কুৎসা শুনিয়া চটিয়া গিয়াছে!—আদিত্য ডাকিল নিরঞ্জনদা,"

বিষণ্ণমুখে নিরঞ্জন আবার নিঃশ্বাস ফেলিল, উত্তর দিল, "কেন ভাই?"

—না নিরঞ্জন তো রুষ্ট হয় নাই, তবে? আদিত্য একটু বিস্মিত হইল, হাসিয়া বলিল "আচ্ছা ভাই এ সব ভণ্ডতা, ন্যাকামী দেখ্‌লে হাসি পায় না?"

নিরঞ্জন সজোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিল!—ভণ্ডতা, ন্যাকামী!—ব্যথিতভাবে চাহিয়া বলিল "কোথা?"

"ঐ ভাটিয়া মহাজনের ব্যাটা এমনি কসাই সুদখোর, যে এই সব গরীবের গলায় পা দিয়ে কড়া ক্রান্তি গুণে সুদ আদায় করে, এদিকে পঞ্চাশে বা দিয়ে এলেন, কিন্তু এখনও মুসলমান বাইজী………………"

"আহ্!—"নিরঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইল, অসহিষ্ণুভাবে বলিল "অত বাজে কথা কস্ কেন"—

"শোন না, তুই যে বলিস, যে তোরা কুচ্ছ করিস্, আচ্ছা দেখ দেখি ভাই—"

নিরঞ্জন মাথা নাড়িল, সে কিছুই দেখিতে চাহে না,—বিষণ্ণ ম্লানভাবে হাসিয়া বলিল "সাচ্চা ভণ্ড বাইরের নজর দিয়ে বিচার করিস্ নি ভাই,—সে বিচার ভুল, মানুষের মনে এক নিমেষে যুগযুগান্তের পরিবর্ত্তন এসে পড়ে। ভুল? সেও এক নিমেষের ওয়াস্তা!—"

সহসা নিরঞ্জন নিজের অজ্ঞাতে ত্রস্ত-চমক খাইয়া থামিয়া পড়িল! ব্যাকুল বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সঙ্গীদের দিকে চাহিয়া রহিল!—না না ইহাদের সহিত তাহার আর বনিবনাও হইবে না, ইহাদের ভাষার সহিত তাহার ভাষার আর খাপ খাইতেছে না, মনের ভাবের মধ্যে সুদূর পার্থক্য আসিয়া পড়িয়াছে, সে ইহাদের বুঝিতেছে না,—ইহারাও বোধ হয় তাহাকে ঝাপ্সা দেখিতেছে, দূর হোক আর জোর করিয়া মিশ খাইবার চেষ্টা ভুল!—

ক্রমশঃ—

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

"এমনি সোহাগে !"

—:*:—

মধুময় বসন্তের কুসুম পেলব কোলে
বরষের মরণ-শয়ন !
গোধূলির বাহুপাশে দিবসের মুদে আসে
ধীরে ধীরে অলস নয়ন !

নিশার মরণ-ক্ষণে উষা আসে মধু হাসে
মরণের আঁধার হরিয়া !
চাঁদের মরণ-রাতে উলসিত পূর্ণিমাতে
জ্যো'স্না দেয় আকাশ ভরিয়া !

মরণের হাসিমাখা মনোহর রূপ হেরি
চিতে মোর ক্ষীণ আশা জাগে,
এমনি মোহন রূপে মরণ মোরেও যদি
কোলে লয় এমনি সোহাগে !

পাণিপথ।

—:*:—

দিল্লীর মধ্যে ও বাহিরে যাহা কিছু দ্রষ্টব্য বস্তু ছিল তাহা যখন সমস্তই দেখা শেষ হইল, তখন আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান বঙ্কুবিহারী প্রস্তাব করিল, চল, এইবার একদিন পাণিপথে বেড়াইয়া আসা যাক্। ভিতরে ভিতরে সে আমার একটি ছাত্রের সঙ্গেও বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। এই ছাত্রটির বাড়ী পাণিপথে সে আমাদের সঙ্গে গিয়া অল্প সময়ের মধ্যে সকল জিনিষ দেখাইয়া লইয়া আসিবে এই রূপ ঠিক হইয়াছিল; ফাল্গুনের এক ছুটির দিনে শুনিলাম, সেই দিনই সকলে পাণিপথ যাওয়ার স্থির হইয়াছে।

আমার মনটা কেমন বিষণ্ণ হইয়া গেল। আনন্দোৎসাহের কোন প্রেরণাই হৃদয় অনুভব করিলাম না। প্রাণের মধ্যে কেমন একটা অব্যক্ত বেদনা গুমরিয়া উঠিতে ছিল, যেন তাহা ক্রন্দনের সুরে কেবলেই বলিতে চাহিতেছিল— 'হায় পানিপথ! দারুণ প্রান্তর!
কেন ভাগ্যফলে হলি নে অন্তর !

পাঠান-সাম্রাজ্যের শ্মশানভূমি, মোগলের গৌরব-সেতু, হিন্দু সৌভাগ্যের অস্তাচল পাণিপথক্ষেত্র—ইহার স্মৃতি কোন্ ভারতবাসীর প্রাণে বিষাদের ছায়াপাত না করে! যে দিন এই ক্ষেত্রে পাঠান-গৌরবরবি চির

অস্তমিত হইয়াছিল। সেদিন ভারতবাসী বুঝিয়া ছিল ভাগ্যলক্ষ্মী বড় চঞ্চলা। তাই বুঝি দুই শত বৎসর পরে মার্হাট্টা হিন্দু এইখানে একবার ভাগ্যপরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। আজ আমরা তাহার পরাজয়ে অশ্রু বিসর্জন করিতেছি; কিন্তু—

'তখনো জানেনি বঙ্গ মারাঠার সে বজ্রনির্ঘোষ কি ছিল বার্ত্তা।'

এইরূপ নানা চিন্তায় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রায় তিন ঘণ্টা কাল ট্রেণে কাটাইয়া পাণিপথে নামিলাম। পূর্ব্বে দিল্লী ও ইন্দ্রপ্রস্থ (আধুনিক ইন্দ্রপৎ) এবং পশ্চিমে শত মাইল ব্যবধানে থানেশ্বর ও কুরুক্ষেত্র পুরাণেতিহাসের অসংখ্য স্মৃতি ও নিদর্শন বক্ষে লইয়া কালপ্রভাবের সাক্ষ্য দিতেছে। ইহাদেরই ঠিক মধ্যস্থলে পাণিপথ। যে সেরশার বংশ দ্বিতীয়-পাণিপথের যুদ্ধে উন্মূলিত হয় তাঁহার নির্ম্মিত প্রশস্ত রাজপথ (Grand Trunk Road) উত্তর ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আজও অক্ষুণ্ণভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। পাণিপথের মধ্য দিয়াও এই পথ গিয়াছে। আমরা এই পথ ধরিয়া ক্রোশখানেক পথ অতিক্রম করিয়া এক হরিৎ শস্যাচ্ছাদিত সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার ছাত্র বলিল, ইহাই পাণিপথের রণক্ষেত্র। আমার তখনকার মানসিক অবস্থা অবর্ণনীয়। পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ যমুনা দর্শনে দুঃখ বিগলিত কণ্ঠে গাহিয়াছিলেন, 'যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনি!' ইংরাজ কবি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ ইয়ারো নদী দেখিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন,—

এই কি ইয়ারো!—এই সে নদী—
শত স্মৃতি যারে আছিল ঘেরি!
আজি কেন হায়! সে স্বপনজাল
ছিন্ন হইল ইহারে হেরি! (অনুবাদ)

বায়রণ ওয়াটার্লুক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া স্মৃতিস্তম্ভহীন শস্যাস্তীর্ণ প্রান্তর দেখিয়া বিস্মিতভাবে বলিয়াছিলেন—

যেথা একদিন ঘোর ভূকম্পনে
রসাতলে গেল ফরাসীভূমি,
নাহি সেথা কোন বীরের মূর্ত্তি?
উঠেনা মিনার আকাশ চুমি?
শস্যপূর্ণা আজি এক্ষেত্র—
যেথা রক্তের কি বর্ষণ!
ইহাই কি শুধু লভেছে জগৎ
তোমা হ'তে হায় হে মহা রণ! (অনুবাদ)*

---

* An Earthquake's spoil is sepulchred below!
Is the spot marked with no colossal bust?
Nor column trophied for triumphal show?
* * * *
How that red rain hath made the harvest grow!
And is this all the world hath gained by thee,
Thou first and last of fields! King-making Victory!

আর আমিও দেখিলাম সম্মুখে দিগন্তবিস্তৃত রণস্মৃতিলেশশূন্য শ্যামল শস্যক্ষেত্র।

'আজি হেথা নাহি ধ্বজা, নাহি সৈন্য, রণ-অশ্বদল

অস্ত্র খরতর,—

আজি আর নাহি বাজে আকাশেরে করিয়া পাগল,

হর হর হর!'

এইরূপ ভাবঘোরে কতক্ষণ আচ্ছন্ন ছিলাম জানি না। মনে পড়ে দিল্লী ও আগ্রার মোগল-প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়াছিল; কুতবমিনার সন্নিহিত পৃথ্বীরাজের তোরণদ্বার ও স্তম্ভশ্রেণী সারি অতীত-স্মৃতিবেদনায় আমাকে বিহ্বল করিয়া ফেলিয়াছিল সেদিনও কেমনই পাণিপথের রণক্ষেত্র দেখিয়া ভারতভাগ্য-বিপর্য্যয়ের অনেক কথাই মনে পড়িতে লাগিল। কতক্ষণ এইরূপ আত্মবিস্মৃত ছিলাম জানি না সেইখানে একটি অনতি উচ্চ প্রস্তর মঞ্চ দেখিয়া আমার চিন্তাস্রোত তাহাতে প্রতিহত হইল। এই মঞ্চটি প্রথম পাণিপথ যুদ্ধে নিহত, পাঠান বংশের শেষ বাদশা হতভাগ্য ইব্রাহিম লোদীর সমাধি। ইহার শ্বেত মর্ম্মর নির্ম্মিত প্রাচীর গাত্রে উর্দ্দুতে এই যুদ্ধের ইতিহাস সংক্ষেপে খোদিত আছে। আমার চক্ষে এই লিপির পরিবর্ত্তে কবির একটি কথা ভাসিতেছিল—

'অদৃষ্টচক্রের কিবা বিবর্ত্তন গতি!'

উক্ত লিপি পাঠে জানা যায় যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ইহার জীর্ণ সংস্কার করিয়াছেন। শুনিলাম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাণিপথ যুদ্ধ এই স্থান হইতে ক্রোশ দুই দূরে সংঘটিত হয়। স্থানটির আধুনিক নাম কাবুলবাগ।

* * * * *

আধুনিক পাণিপথ একটি ক্ষুদ্র সহর। অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির ও একদিকে একটি মসজিদ হিন্দু ও মুসলমানের সংঘর্ষের পরিচয় দিতেছে। সহরাভিমুখে অগ্রসর হইতে প্রথমেই যে মন্দিরটি নয়নপথে পতিত হয় তাহার নাম দেবীমন্দির। সম্মুখে একটি প্রাচীর বেষ্টিত সুন্দর পুষ্করিণী। এই পুষ্করিণীর পার্শ্বে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু-পুরাতন মন্দির প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে। একটি মন্দিরে কুরুক্ষেত্রে প্রকটিত শ্রীকৃষ্ণের বিরাট মূর্ত্তির প্রস্তর প্রতিকৃতি রহিয়াছে। মূর্ত্তিটির গঠন অতি সুন্দর। একটি মন্দিরে হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। শুনিলাম তৃতীয় পাণিপথ যুদ্ধের পূর্ব্বে মাহারাট্টাগণ এই মন্দিরে উপাসনা করিয়াছিলেন। সম্মুখে একটি মন্দিরে দেবীর অষ্টভুজা মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। শুনিলাম আশীত বৎসর পূর্ব্বে ভকৎসিং নামে থানেশ্বরবাসী জনৈক ধনী এই মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহার পার্শ্বে বাবা শিবগিরি নামক জনৈক সাধুর সমাধি রহিয়াছে। তিনি পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের প্রিয় সহচর ছিলেন। মহারাজের মৃত্যুর পর তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া কঠিন যোগসাধনায় নিযুক্ত হন এবং এই মন্দির মধ্যেই পাঁচিশ বৎসর কাল মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া অতিবাহিত করেন। এস্থানবাসীরা বলেন যে এরূপ মহাপুরুষ ভারতের এপ্রান্তে বহুকাল জন্মগ্রহণ করেন নাই।

যে মস্জিদটির কথা বলিয়াছি তাহা সুলতান আলাউদ্দিন খিলিজির রাজত্বকালে নির্ম্মিত; ইহার মধ্যে দুইটি কবর আছে। এই সমাধিদ্বয় সম্বন্ধে একটি গল্প শোনা গেল। সম্রাট আলাউদ্দিনের বহুকাল যাবৎ কোন পুত্রসন্তান না হওয়ায় তিনি অত্যন্ত মনোকষ্টে থাকিতেন। একদিন এক কালান্দার (ফকির) তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলেন যে, বাদশা যদি তাঁহার কথামত কার্য্য করেন তাহা হইলে তিনি পুত্রলাভে

সমর্থ হইবেন। আলাউদ্দিন সম্মত হইলে ফকির তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে তাঁহার পুত্রগুলির মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠটিকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। অতঃপর বাদশার চারিটি পুত্র হইল। যথাসময়ে কালান্দার সাহেব সম্রাট সমীপে পুনরায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার ধর্ম্মলক্ষণযুক্ত কনিষ্ঠ পুত্রটিকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন; এই শাহজাদাটি ফাকরে শিষ্যরূপে চিরজীবন কাটাইয়া ছিলেন। ইঁহাদের দুই জনের সমাধি এই স্থানের পাশাপাশি দিয়াছে। এখানকার মুসলমান অধিবাসীদিগের নিকট এখন পর্য্যন্ত এই সেখ কালান্দারের মহাত্ম দিল্লীর নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মহাত্ম্য অপেক্ষা কম নহে দেখিলাম। মস্‌জিদটি সুগঠিত। স্তম্ভগুলি সমস্তই বাল এষ্টি পাথরের।

এইসব দেখিতে হৃদয়ের বিষাদভার অনেকটা অপসৃত হইয়া গিয়াছিল। যখন পুনরায় সেই 'দারুণ প্রান্তর' সম্মুখ ফিরিলাম তখন পশ্চিমদিগন্ত কোলে সূর্য্যদেব অস্ত যাইতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

সাধুভাষা।

শুদ্ধকরে কথা বলার আমার সদাই চেস্টা।
আমি বলি কেস্টপেসাদ লোকে বলে কেস্টা।
মাছেরে তাই কহি মচ্ছ
বাছারে তাই বলি বচ্ছ,
কোটেরে তাই কোস্ট কহি, পিপাসারে তেস্টা॥
আলুরে তাই অলাবু কই
আতার পাতায় আতপত্র।
শ্বশুরে কই শ্মশ্রু মশায়
ঘরের ছাদে গৃহ-ছত্র।
পাঠশালাকে পটুশ্যালক
ইট চোঁড়াকে ইস্ট-বালক
কম্বলে কই 'অল্পশক্তি' ভেবে ভেবে শেষটা॥
চিত্রকলায় চিত্ররম্ভা
কাঁচারে কই কাঞ্চী—
কাসিরে কই বারাণসী—
হাঁচিরে কই হাঞ্চী।
শাঁখারে তাই সাংখ্য কহি,
খইদয়েরে লজ্জাদহী—
অবাক হয়ে চেয়ে রহে মু-মুক্ষু এই দেশটা॥

বেতাল-ভট্ট।

বন্ধু।

(১)

"ডাক্তারবাবু! ও ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু! দয়া ক'রে একবারটী একটু নীচে আসবেন কি ?"—বলিয়া একটী বলিষ্ঠ যুবক ডাক্তার রামতনু সরকারের সদর দরজায় দাঁড়াইয়া কড়া নাড়িতেছিল।

তখনও রাত ১২টা বাজে নাই। মনোহরপুরের সমস্ত বাড়ীই নীরব-নিশ্বর। মধ্যে মধ্যে দুই একটী গৃহ-পালিত কুক্কুরের গম্ভীর রবমাত্র এই নীরবতা ভঙ্গ করিতেছে। রামবাবু সবে মাত্র একটী "কল" হইতে প্রত্যাগত হইয়া কাপড়চোপড় ছাড়িয়া আহারের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় এই বাধা। গৃহিণী নিদ্রালসচক্ষে হাঁই তুলিতে তুলিতে বলিলেন, "এই রে, তবেই হয়েছে খাওয়া আজ!" তাঁর আহার ইতিপূর্ব্বেই হইয়াছিল, এমনিই হইত। প্রথম প্রথম একটু বাধ বাধ ঠেকিলেও, পরে কিন্তু এটী তাঁর সহিয়া গিয়াছিল।

খড়খড়ির ভিতর দিয়া নীচে আসিয়া আলো পড়িয়াছে। রামবাবুর গলার আওয়াজ তখনও শোনা যাইতেছে। এমন সময় সুরেশ বড় ব্যস্তভাবেই তাঁকে ডাকিতে আসিয়াছে। গিন্নির কথার কোনও উত্তর না দিয়া ডাক্তারবাবু আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন। হাতাকাটা লংক্লথের জামা গায়ে ডাক্তারবাবু চটী পায়ে সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে ভাবিতে লাগিলেন, "এমন সময় এত ব্যস্তভাবে কে ডাকে আমায়! কই কারই ত এমন রোগ পীড়ার কথা শুনি নাই।" ভারি গলার ধরা-আওয়াজটী তিনি ঠিক ঠাওর করিতে পারিতেছিলেন না। সহানুভূতিতে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ললাটে রেখা অঙ্কিত হইয়া উঠিল।

ম্যাডিক্যাল কলেজ হইতে পাশ করিয়া রামবাবু মনোহরপুরের জমিদারবাবুদের দাতব্য চিকিৎসালয়ের "ছোটবাবু" হইয়া যখন এখানে আইসেন তখন তাঁর বয়স ২৩।২৪ মাত্র। সে আজ ১০।১২ বছরের কথা। চালাক-চতুর সুশ্রী চেহারা ব্যবসার পক্ষে অনেক সাহায্য করিলেও রামবাবুর অন্য গুণও যথেষ্ট ছিল। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি-ফলে মাত্র বহির্সৌন্দর্য্যই তাঁর একমাত্র মূলধন ছিল না। ভগবান তাঁহার মনটীকেও নানাপ্রকারে ভূষিত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। মনোহরপুরে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। রামবাবুও কারণে অকারণে একবার স্থলে দুইবার খোঁজ খবর লইয়া পীড়িতের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া দিলেন। পাঠ্য-জীবন হইতে কর্ম্ম-জগতে পড়িয়া কর্ত্তব্যের স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন। হিংসাদ্বেষ পরিপূর্ণ পল্লী-সমাজের মধ্য দিয়াও সকলেই একবাক্যে তাঁকে প্রশংসা করিত। যে দেখিত সেই প্রশংসমানচক্ষে তাঁর দিকে চাহিয়া থাকিত। কর্ম্ম অন্তে যখন নিজ বাসাবাড়ীর বৈঠকখানায় রামবাবু আসিয়া বসিতেন তখন তাঁর সঙ্গ-সুখ লাভ করিতে গ্রামের যত যুবক-বৃদ্ধ আসিয়া জুটিত। ছুটীর অবকাশে সুরেশ যখন বাড়ী আসিত, এমনি একদিনে রামবাবুর সহিত তার প্রথম পরিচয়। তখন সে কলিকাতা থাকিয়া কলেজে পড়ে। ক্রমে এই পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইয়া উঠিল। যদিও ডাক্তারবাবু সুরেশ হইতে অল্প বড় ছিলেন তাহা হইলেও সুরেশ তাঁকে রীতিমত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। নিজের জীবনটাকেও সে রামবাবুর আদর্শেই গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছিল।

(২)

এই কয়টী বছরে মনোহরপুরে যথেষ্ট পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে; বড় ডাক্তারবাবু এ জগত হইতে বিদায় লইয়া চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন। সর্ব্বজন-প্রিয় ছোটবাবু জমিদারবাবুদের গৃহ-চিকিৎসক হইয়াছেন। গুণের এবং পরিশ্রমের আদর সর্ব্বত্র না হইলেও নিঃস্বার্থ কর্ম্মের ফল-ভোগ এ জগতে একেবারে যে নাই তাহা বলা চলে না। ধনে মানে যশ গৌরবে রামবাবু তখন অদ্বিতীয়।

চিকিৎসালয়সংলগ্ন ক্ষুদ্র বাসাবাড়ী ছাড়িয়া জমিদারবাড়ীর অতি নিকটে একটী দ্বিতলবাড়ী রামবাবুকে দেওয়া হইয়াছে। বাহিরের কর্ম্ম-কোলাহল অন্তে যখন দ্বিতলের বারান্দায় সারিবাঁধা জুঁই, বেল, হাস্নাহানা বৃক্ষের মধ্যে রামবাবু আরাম-কেদারায় গা ঢালিয়া দেন, তখন মনে হয় যেন নন্দন-কাননে বসিয়া স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতেছেন। ফুলেরই মত পবিত্র কয়েকটী শিশু দেবতার আশীর্ব্বাদের মত সর্ব্বদাই এই সুখী দম্পতিকে আনন্দে ভাসাইয়া রাখিত। ডাক্তারবাবু পুণ্যের সংসারে অশান্তির ছায়াটীও পড়িতে পাইত না।

গ্রামের যত খুড়া-জ্যেঠা-মামার অতিরিক্ত সঙ্গলাভে এবং সময়ের পরিবর্ত্তনে ডাক্তারবাবুর মন যে সময় সময় গর্ব্ব-স্ফীত হইয়া না উঠিত, তাহা নহে। স্বামী-সঙ্গ-সুখ-গর্ব্বিতা কামিনী সেবা-শুশ্রূষা দিয়া সর্ব্বদাই কর্ম্মক্লান্ত স্বামীর দৈহিক ও মানসিক সুখ শান্তির বিধানচেষ্টায় ফিরিত। কোকিলকুল-কূজিত প্রভাতের মত, বালারুণ- রাগ-রঞ্জিত সদা হাস্যময়ী প্রকৃতির মত, তাঁর প্রাণের সজীব-সাজান-ভাবগুলি স্বামী দেবতাটীকে সর্ব্বদাই ঘিরিয়া রাখিত।

(৩)

সুরেশ বি-এ. পাশ করিয়া স্বগ্রামে শিক্ষকতা করিতেছে। অভাব ও অভিযোগের মধ্য দিয়া সুখে দুঃখে একরকমে তার দিনগুলি বেশ কাটিয়া যাইতেছে। দিবসের কর্ম্ম অন্তে সান্ধ্যসমীরে গৃহ প্রাঙ্গনে বসিয়া জীবনের একমাত্র দোসর বালিকা বধূর সহিত সে যখন সুখ-দুঃখ, জীবনের এপার-ওপার প্রভৃতি লইয়া আলাপে মুগ্ধ থাকিত, তখন বুঝিতে পারিত না—যে কখন রাত্রের ঘনীভূত অন্ধকারের গাঢ়তা আরও বাড়াইয়া দিয়া গৃহের একমাত্র মাটির প্রদীপটী নিবিয়া গিয়াছে। অধিক রাত্রি দেখিয়া সরসী লজ্জায় মরিয়া গিয়া তাড়াতাড়ি রান্নার যোগাড়ে গেলে, সুরেশের সাহায্য উৎপাতে যখন তার সুন্দর ছোট্ট মুখখানিতে কেহ সিন্দূর মাখাইয়া দিয়া যাইত, তখন তাহা দেখিয়া যে নিঃশ্বাসটী কাঁপিয়া-কাঁপিয়া লুব্ধ স্বামীর অন্তঃস্থল হইতে রহিয়া-রহিয়া বাহির হইয়া পড়িত তাহা সুখের স্পন্দন আনিয়া দিত, না দুঃখের, তাহা কে বলিবে!

পরের সুখে বুক জ্বলিয়া যায় না পাড়াগাঁয়ে এ প্রকৃতির লোক অতি বিরল। সুরেশের সহিত মুখে কারও শত্রুতা না থাকিলেও তার এই আত্ম-তৃপ্তি ভাবটা সকলে বড় নিশ্চিন্তে হজম করিতে রাজি হইল না ইহা অহঙ্কারেরই নামান্তর মাত্র মনে করিয়া অনেকেই মনে মনে সুরেশের উপর বেশ একটু বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। ইদানীং ডাক্তারবাবুর সহিতও তার আর বড় বেশী ভাব ছিল না। অন্ততঃ দেখাশুনা বড় কমই হইত। খুড়া-জ্যেঠাদের আত্মীয়তায় ডাক্তারবাবু সুরেশের উপর বিরক্তই হইয়া উঠিতেছিলেন। এমন সময়ে ডাক্তারবাবুর ছোট ছেলেটির অন্নপ্রাশনে অসুস্থ স্ত্রীকে একা ফেলিয়া মাত্র নিমন্ত্রণ রক্ষা করা ছাড়া যখন সুরেশ রাত্রি জাগরণ, ধূমপান, ডাক-হাঁক প্রভৃতি আর কোন প্রকার আত্মীয়তা দেখাইতে অসমর্থ হইল, তখন ডাক্তারবাবু সুরেশ সম্বন্ধে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিলেন। এমন কি তাকে দেখিয়া লইবার প্রলোভনটীও প্রকাশ না করিয়া পারিলেন না। সুরেশের কিন্তু কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না সমস্ত জগৎটীকে সঙ্কুচিত করিয়া প্রাচীরবেষ্টিত ক্ষুদ্র বাড়ীখানির ভিতর সে আনিতে পারিয়াছিল। এ সুখের আস্বাদ যিনি তার ওষ্ঠপুটে স্পর্শ করাইয়াছেন, সুধু তাঁকে ছাড়া আর কাহাকেও সে ভয় করিত না, করিবার আবশ্যকতাও আছে মনে করিত না।

এমন সময়ে তার সুখের আকাশে কাল-মেঘ দেখা দিল। পড়িয়া গিয়া হঠাৎ সরসী যখন অকালে একটী মৃত সন্তান প্রসব করিল, তখন তার জীবনের আশা রহিল না। জল-মগ্ন ব্যক্তির নিকট তৃণ-গাছটীর মত সুরেশ আর রামবাবুর কাছে না-যাইয়া পারিল না। রামবাবুর দরজায় ডাকা-ডাকি হাঁকা-হাঁকি করিয়া ভ্রূকুটি-কুটিল-কটাক্ষ ডাক্তারবাবুর দিকে চাহিয়া সুরেশ যখন বসিয়া পড়িল, তখন দীর্ঘ-নিঃশ্বাসেরই মত একটী ক্ষুদ্রপ্রাণ মহাশূন্যে মিশাইয়া গিয়াছে !

(৪)

সৎকার করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সুরেশ যখন একাকী বাহিরের ঘরে বসিয়াছিল, তখন বেলা ৮টা। ভিতরে যাইতে তার সাহসে কুলাইতেছিল না। তখনও তার মনে জাগিতেছিল এত বেলা তাকে না দেখিয়া এখনিই তার সরসী দরজার আড়ালে উঁকি-ঝুঁকি মারিতে আসিবে। এমন সময় রামবাবু নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে সুরেশের দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখনও সুরেশের স্বপ্নের ঘোর ভাঙ্গে নাই। একদৃষ্টে সে তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দুইহাতে তার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া রামবাবু বলিলেন "সুরেশ, ভাই—!" আবেগে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। প্রশান্ত হৃদয়ে তার মুখের দিকে চাহিয়া সুরেশ তখন বলিয়া উঠিল, "ঈশ্বর তোমায় মঙ্গল করুন।"

দুইটী প্রাণের ভিতর ধীরে-ধীরে যে আবিলতা আসিয়া সঞ্চিত হইয়াছিল একটী বিরাট ঝঞ্ঝাবায়ুর মধ্যে দিয়া তাহা আবার শান্ত-সচঞ্চল গতি ধারণ করিল। রামবাবু বন্ধুকে সস্নেহে ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া, স্বগৃহে সর্ব্বদা নিকটে রাখিয়া তাহার সর্ব্বসন্তাপ হরণ করিতে ব্যগ্র হইলেন। সুরেশ তাহাতে ধরা দিল না। ডাক্তার গৃহিনী কামিনীর বহু চেষ্টাতেও সুরেশ তার নিজ বাটী ত্যাগ করিল না। এ স্থানের প্রতি ধূলামুঠীর সহিত যাহার স্মৃতি জড়িত, যাহার গাত্রগন্ধ বাতাসের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া তখনও বহিয়া আসিয়া যেন সঙ্গ-সুখেরই মত্ততা আনিয়া দেয়, সেস্থান যে তাহার মহাতীর্থ। ঘুরিতে ফিরিতে, জাগরণে-স্বপ্নে, সে এই এক-চিন্তায় মগ্ন থাকে। এতদিন যে ছিল বাহিরে এখন তাহার অনুভূতি যে সর্ব্বক্ষণ। কি সুখ! কি শান্তি! কি মাধুর্য্য এ চিন্তায়! ব্যবধান নাই, বিরহ নাই, অন্ত নাই! চক্ষু বুঁজিলেই সেই সদাহাস্যময়ী প্রেমময়ী মুর্ত্তি ; দগ্ধ হৃদয়ে কি স্নিগ্ধ-মধুর হস্ত বুলাইয়া দেয়!

একদিন মনে পড়ে সরসী বলিয়াছিল, "আমি মরিলে তুমি আবার বিবাহ কর ?" সুরেশ উত্তর দিয়াছিল "নিশ্চয়ই। এ সংসারে ভগবানের নিয়মই যে কোন স্থান শূন্য থাকিতে পারে না। তোমার অভাব হইলে সে স্থান ত আমাকে পূর্ণ করিতে হইবে। তোমার জন্য ত রাজার রাজা যিনি তাঁর আইন ভঙ্গ হইতে পারে না। ত্রেতায় স্বর্ণ-সীতার ব্যবস্থা হইয়াছিল, আমি দরিদ্র,—কোন বিধি মানিয়া লইব তাই ভাবি' প্রেমান্ধ মুগ্ধ বালিকা স্ত্রী অত-তত বুঝিল না, একদৃষ্টে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম তাহার কপাল ভরিয়া ঝিক্ ঝিক্ করিতে লাগিল। সে দৃশ্যে পুরুষ হৃদয় মোহিত হইয়া উঠিল, এ কথা আর কোনদিন উঠে নাই। আর একদিন সরসী জিজ্ঞসা করিয়াছিল, "তুমি তামাক খাও না কেন ? সকলেই ত খায়।" সুরেশ বলিয়াছিল, "আমারও ইচ্ছা করে, যদি তুমি গাল ফুলাইয়া ফুঁদিয়া আগুন ধরাইয়া দাও।" সরসী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "কেন, তাতে কি ?" সুরেশ উত্তর দিয়াছিল, "সূর্য্যাস্তের সময় পশ্চিম আকাশে আগুন ধরাইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে কেমন দেখায়। আগুনের রক্তবর্ণ তোমার মুখে পড়িয়া যখন ঠিক্‌রাইয়া পড়িবে তখন দেখিতে ইচ্ছা করে কেমন দেখায় ? কোনটী বেশী সুন্দর।" লজ্জায় সরসী রাঙ্গা হইয়া গিয়াছিল।

(৫)

একদিন প্রত্যুষে প্রাণের ভিতর হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাহির হইতে লাগিল—

কেড়ে লও—কেড়ে লও, আমারে কাঁদায়ে।

সমস্ত রাত সুরেশ স্বপ্ন দেখিয়াছে সরসীকে। আজ যেন তার মনে হইতে লাগিল বাতাস আকাশ গাছ পালা, দিক্‌দিগন্ত যেন সরসীময়। যেন সকলেই হাত বাড়াইয়া কেবল ডাকিতেছে "আয়, আয়, আয়।" কি এক ভাব আসিয়া তাকে ছাইয়া ফেলিতেছে তাহা সে নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। তার অসহ্য দৈন্য দুঃখ সব যেন চলিয়া গিয়াছে কি এক আশা—কি এক শক্তি তাহার প্রতি লোমকূপ দিয়া যেন গড়াইয়া পড়িতেছে। তাহার বুক যেন ছাপাইয়া উঠিতেছে নিজেকে এক শক্তিমান পুরুষ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কি শক্তিতে সে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। এ সুধা আবার আসিয়া তাহার ওষ্ঠাগ্রে ধরিল! এই জন্যই কি তাহার হৃদয় মন্থনের আবশ্যক হইয়াছিল! আজ আর তার চোখ বুজিয়া ভাবতে হয় না, হাত বাড়াইয়া ধরিতে হয় না। চারিদিক পরিপূর্ণতায় আজ তাহাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। আনন্দ আসিয়া দুঃখের স্থান লইয়াছে, পূর্ণতা আসিয়া অভাবকে চাপিয়া ধরিয়াছে।

*　*　*　*　*

খিড়কির দরজা দিয়া কামিনী যখন সুরেশকে 'বেলা হইল' বলিয়া তাড়া দিতে আসিয়াছে তখন দেখিল সে এতদিন পরে প্রকৃত উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে। গুণ গুণ করিয়া গাহিতেছে—

দিগন্ত প্রসার, অনন্ত আশার আর কোথা কিছু নাই
তাহার ভিতরে, মৃদু মধুস্বরে, কে ডাকে শুনিতে পাই।
আঁধারে নামিয়া,　　আঁধার ঠেলিয়া,
না বুঝিয়া চলি তাই;
আছেন জননী,　　এই মাত্র জানি,
আর কোন জ্ঞান নাই।"

কি এক উন্মত্ততা তার চোখে মুখে মাখান রহিয়াছে। তাহাই এখন তাহার দুর্ব্বহ জীবনের শান্তি,—সুখ,—প্রাণ-মন-বিনাশী সে আহবে সেই স্মৃতিই তাহার প্রকৃত বন্ধু!

শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর সেন।

দুইদিক।

—ঃ*ঃ—

তৃতীয় অঙ্ক।

[মেসের প্রথম অঙ্কের সেই কক্ষটী। বন্ধুগণ কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া চা পানে নিযুক্ত।]

অনাদি। কিন্তু যাই বল, গান-বাজনার সরঞ্জাম না নিয়ে গেলে পোষল্লা করা মিছে হবে।

সুরেশ। খেলা ধূলার জোগাড় নেই কেবল ফাঁকা আওয়াজ আর ঘুরে বেড়ান এতে কতক্ষণ সময় কাটবে?

শঙ্কর। আরে সারা বাগানটা হবে আমাদের ষ্টেজ, আমরা থিয়েটার করে বেড়াব ভয় কি? চুপি চুপি একটা গাড়ীতে লুকিয়ে সব সরঞ্জাম যাবে। বিমলদা বলে রেখেছে রাসন-শ্রাবণ-নয়ন সর্ব্ব রকমেরই ফুর্ত্তির যোগাড় থাক্‌বে। মস্ত বড় লোকের বাড়ি যাচ্ছি—কিছুরই অভাব থাকবে না ভাই।

সন্তোষ। নাই ব' থাকুল গানবাজনা, নাই বা থাকল খেলাধূলোর যোগাড় রাজেনদা যখন ওসব ভালবাসেন না—

শঙ্কর। কাল দেখো ওকেই যদি না গান গাওয়াতে পারি তা হ'লে আমার নামই নয়—উনিই কাল বেশী নাচ্‌বেন, কারণ উনিই হবেন নটরাজ—রাজব্যাঘ্রকে কাল ভালুকনাচ নাচাব।

অনাদি। কিন্তু আমার ভয় হচ্চে কি হতে কি না ঘটে বসে—এত আনন্দের মধ্যে যদি রাজুদা উল্টা বুঝে বসে? যদি আমাদের চেষ্টাকে সে যদি অন্য অর্থে নেয় তা হ'লে কিন্তু সব মাটী হবে। তার বুদ্ধির মধ্যে Sense of humour এর চাইতে যে জিনিষটা বেশী আছে তাকে ত' কেউ প্রাণে ধরে অপমান করতে পারব না। সে যে সত্যি সত্যি গরীবদের ভালবাসে। সে যদি শেষ পর্য্যন্ত কাতর হয়ে বলে, এমনি করে আমার অপমান কর্‌লে তোমরা, আমি কি এতই বিদ্রূপের উপযুক্ত—

সুরেশ। কি ভয়ানক! সে যে অতি ভয়ানক ব্যাপার হবে—

সন্তোষ। না—না—না কিছুতেই তা হবে না। আমি তোমাদের সব কথা রাজেনদাকে বলে দেব—

শঙ্কর। ঐই সর্ব্বনাশ কর্‌লে। এঃ দেখ্‌ছি, তোদের কোনো কথা না বলাই উচিত ছিল—ওরে তোরা চলে যা না ভাই, বিমলদা যখন আছে তখন কোনো ভয় নেই। ঠিক জানিস্ সে তোদের কারুর চাইতে রাজেনদাকে কম ভালবাসে না। তা যদি না হবে তা হলে ঐ রাজব্যাঘ্র বিমলদার কাছে কেঁচো হয়ে থাকে কেন? রাজেন সবারই কাছে জিতবে কিন্তু বাস্তবিক জোরাল ভালবাসার কাছে সে হার্‌বেই হার্‌বে। এ আমি বরাবর দেখে আস্‌ছি। আর তা যদি না হয় তবু দেখে নিস্ বিমলদা এমনি ভাবে সবকে manage কর্‌বে যে কোনো দিকে ফাঁক থাক্‌বে না অথচ সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি সাবধান করে দিচ্চি, কেউ এতে এতটুকু বুদ্ধি খাটাতে যেওনা—সব গোলমাল হয়ে যাবে।

সন্তোষ। সব বুদ্ধিটুকু ত তোমাদের একলার সম্পত্তি নয়?

অনাদি। থাম্ থাম্ গৃহবিবাদ বাধাস্‌নে সন্তোষ, ওতে সব মাটী হবে। তোর পায়ে পড়ি সন্তোষ, তোমার নামের উপযুক্ত কাজ কর—গোল পাকাস্‌নে—রাজেনদার সঙ্গে তার বাপের যে এমন একটা গোলমাল ছিল কে জান্‌ত?—কে জান্‌ত যে ঐ অত বড় স্নেহের শরীরের মধ্যে এতখানি নিষ্ঠুর অন্যায় বসে আছে? যে আপন বাপমাকে কাঁদিয়ে বন্ধুবান্ধবদের কষ্ট দিয়ে Philanthrophyর হুজুগে নেচে বেড়ায় তার মধ্যে কোনো না কোনো জায়গায় একটা ফাঁকা হাওয়া আট্‌কে আছে সেটাকে বার করে না দিলে তারই অপকার করা হবে। যে এই জীবনটাকে শুধু দুঃখেরই সমষ্টি মনে করে তাকে দেখিয়ে দিতেই হবে যে এ সংসারে সুখও আছে, হাসিও আছে, আনন্দও আছে।

সন্তোষ। আর যে এই সংসারকে কেবল হাসিখুসির আড্ডা মনে করে তার কি করা উচিত?

শঙ্কর। তাকে কাঁদিয়ে দিতে হবে।

সন্তোষ। তা হলে বিমলদারও যে একটা শাস্তি করা উচিত। উনিও যে এমনি করে কেবল হেসে নেচে গায়ে হাওয়া দিয়ে বেড়াবেন, তার কি ব্যবস্থা করেছ কি কেউ?

শঙ্কর। তার ব্যবস্থা হতে কতক্ষণ! এই এমন দুঃখের সংসারে কোনদিক থেকে কখন যে কোন পরম দুঃখ লাফিয়ে এসে ঘাড়ে পড়্‌তে পারে তা কি ঠিক্ আছে। সত্যিকার দুঃখ যেদিন ওঁর প্রাণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌বে, সেদিন ওঁর হাসিখুসিও চোখের জলে ঢাকা পড়বে। কিন্তু দুঃখ আস্‌বে বলে যেটুকু সুখ পেতে পারি তা হতে বঞ্চিত থাকা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। ঐ যে কে আস্‌ছে বোধ হচ্ছে—

(সিঁড়ি হইতে কার্ত্তিকচন্দ্রর আওয়াজ পাওয়া গেল)

কার্ত্তিক। বিমল—ও-বিমল—

অনাদি। এই যে ঠাকুরদা আসছেন—আসুন ঠাকুরদা—

(কার্ত্তিকের প্রবেশ)

—বিমলদা ত এখনো ফেরেন নি।

কার্ত্তিক। তাইত, মহামুস্কিল হল যে?

শঙ্কর। ব্যাপার কি?

কার্ত্তিক। ব্যাপার আর কি—যা প্রতিদিন ঘট্‌ছে তাই, একদিকে হাসি আর একদিকে কান্না—

সন্তোষ। কি হয়েছে শীগ্‌গির বলুন—

কার্ত্তিক। তোদের বলে কি হবে? তোরা কেবল গোলমালই কর্‌বি—কাজের কিছুই হবে না।

সন্তোষ। তবু যা পারি ততটুকুত' করব—

কার্ত্তিক। কিছুই পার্‌বি নে—

অনাদি। তবু বলুন না, কি হয়েছে?

কার্ত্তিক। শৈলেশ দত্তকে চিনিস্ তোরা?

অনাদি। না চিন্‌লেও চিনি, রাজেনদার কাছে থাক্‌লে সংসারের দুঃখের কোনো খবরই না পাওয়া থাকে না। সবই কানে আস্‌তে বাধ্য হয়। থাক্, কি হয়েছে শৈলেশবাবুর—

কার্ত্তিক। তাকে শুন্‌ছি তহবিল তছরুপাতের জন্য গ্রেপ্তার করেছে। এদিকে তার বাড়ীতে এখনও যে খবর পৌছয় নি।

অনাদি। কেন? সে টাকা দিতে পার্‌লে না?

কার্ত্তিক। কি করে দেবে? তিনটে মেয়ে, একটা ত বিয়ে দিতে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছিল। একটা বুড়ো বরে হাজার টাকা দিয়ে আর বছর বিয়ে দেয়। বছর না ঘুরতে সেটা বিধবা হয়েছে। আর একটারও বিয়ের বয়স পেরুবার মত হয়েছে। বুড়ো মা, রুগ্না স্ত্রী আরও কে কে ওর ঘাড়ে পড়ে আছে। দুটো ছোট ছেলে—রাতদিন ট্যাঁ ট্যাঁ—এ অবস্থায় যদি কিছু সে করেই থাকে তবু তার মাপ নেই।

অনাদি। মাপত' নেই বটেই, এমন লোক বিয়ে করে কেন? বিয়ে দেয়ই বা কেন? থাক্‌লই বা মেয়ে থুব্‌ড়ো হয়ে তবুত' চাট্টি খেতে পেতো! ঠিকই হয়েছে তার, জেলে যাওয়াই উচিত—

কার্ত্তিক। উচিত ত' জানি রে ভাই, কিন্তু—

শঙ্কর। কিছু কিন্তু নেই ঠাকুরদা, ও ঠিকই হয়েছে। মানুষকে যে সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। মানুষ সুখ চায় না—দুঃখকেই ডেকে নেয়। তারপর মিছিমিছি মারে বাবারে করে নিজেও কষ্ট পায়, দশ জনের সুখ-শান্তি নষ্ট করে। থাক্ তারপর কি হল—

কার্ত্তিক। হবে আবার কি? এখন তাদের কি করব তাই ভাবছি। চেনা-পরিচয় আছে বলেই আমার এত মাথাব্যাথা, নইলে চেপে বসে থাক্‌তাম হয় ত। বুড়ো হাড়ে কিনা হবে?

সন্তোষ। চেপে বসে থাক্‌তেন! কি ভয়ঙ্কর! এ কথা শুনে কে চেপে বসে থাক্‌তে পারে?

শঙ্কর। কিন্তু লাফাঝাঁপি করে কি করবে শুনি? কতটুকু তোমার ক্ষমতা? কতটুকু তাদের সাহায্য তুমি করতে পারবে? তোমার বাড়িতেও ৫চারটে পুষ্যি আছে—তুমি দিন আন দিন খাও বৈ ত' নয়। মাইনের হয় ত এক আনা রেখে ১৫ আনা বাড়ীতে পাঠাতে হয়। যদি নাও পাঠাও তবু তোমার তাই উচিত। তোমার কতটুকু সুখ আছে যে তা তুমি ভাগ করে দশজনকে দিতে পার? মূলে যেখানে দোষ সেখানে এক ভগবান ছাড়া আর কারও হাত দেখ্‌ছি না ত?

সন্তোষ। ভগবানের ওপর ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বসে থাক্‌লে চল্‌বে না কি? আসুন রাজেনদা, তিনি এসে নিশ্চয় একটা ব্যবস্থা করবেন।

কার্ত্তিক। ফুটো হাঁড়িতে জল ঢেলে কি সেটা ভরান যায়? যাই হোক একটা ব্যবস্থা কর্‌তেই হবে। শৈলেশের বাড়ীতে কি করে খবর দি তাই ভাবছি। না দিলেও নয়। অথচ দিয়ে কেবল একটা কান্নাকাটি জাগাব।

সুরেশ। তাই ত' ঠাকুরদা কি করা যায়। বিমলদা আর রাজেনদা ত' আপনার নগেনবাবুর বাড়ী গিয়েছেন।

কার্ত্তিক। যাক্‌ গে আজ চুপ করে থাকা যাক্‌।

সন্তোষ। চুপ করে? কিছুতেই নয়, আমার মাইনের টাকা এখনো বাক্সে রয়েছে পাঠাই নি। আমি তাই দিয়ে আসছি গিয়ে। তাদের হয় ত' সারাদিন খাওয়াই হয় নি।

কার্ত্তিক। তুমি না হয় দিতে গেলে, কিন্তু তারাও ভদ্রলোকের বাড়ীর মেয়েমানুষ, তারা কি বলে তোমার কাছ থেকে ভিক্ষে নেবে?

সুরেশ। আর তাদের ভিক্ষে দিতে যায় এত সাহসই বা কার?

সন্তোষ। মিছে কথা বলে দিয়ে আসব, বল্‌ব শৈলেশবাবু পাঠিয়ে দিলেন।

শঙ্কর। কিন্তু যখন তারা জিজ্ঞাসা করবে শৈলেশবাবু কোথায় তখন?

সন্তোষ। তখন বলব তিনি দু'দিন আস্‌তে পারবেন না একটা কাজের চেষ্টায় দূরে গিয়েছেন।

কার্ত্তিক। ওরে থাম, হাওয়ার ওপর তর্ক করে কি হবে? আজকের খাওয়ার অভাবে তারা মরবে না। যদি উপকার করতে হয় স্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু একটা কথা রাজুকে আজ কোনো কথা বলো না। কালকের সব ব্যবস্থা যেন কোনো রকমে ভেস্তে না যায়। রাজু শুনলেই একটা মহা হাঙ্গামা বাধাবে। আমার মাথায় একটা প্ল্যান আটকেছে দেখি কি করতে পারি।

অনাদি। প্ল্যানটার আভাষ দেন না একটু—

কার্ত্তিক। মনসা চিন্তয়েৎ কর্ম্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ বিশেষতঃ যে তোমরা সব Spit-fire আছে

(নীচে আবার শব্দ)

ঐ যে কে আসছে না। বিমল আর রাজুর আওয়াজ বোধ হচ্ছে না।

শঙ্কর। তাই বটে।

কার্ত্তিক। তা হ'লে চেপে যাও—কাল আমি যা হয় করব তারপর কিছু না পারি তোমরা আছ—

[বিমলের প্রবেশ]

এই যে বিমল, রাজুও আস্‌ছিল না?

বিমল। আস্‌ছিল ত'—কিন্তু ঐ যে কি বলে জীববিশেষের কাজও নেই অবসরও নেই। রাজুদা Genusএ মানুষ বটে কিন্তু Speciesএ ঠিক্ আমাদের মত নয়।

কার্ত্তিক। কোথায় গেল?

বিমল। কাল ওর মস্ত একটা কাঙ্গালিনী ভোজ, ও কি চুপ্ করে থাক্‌তে পারে? সহরে কোথায় কে অন্নহীন আছে তারই খোঁজ নিতে গেল বোধ হয়।

কার্ত্তিক। কোন্ দিকে গেল তা কিছু বলে গেল?

বিমল। কিছু না—কেন বলুন ত? কোন বিশেষ কাঙ্গালীর খোঁজ আছে নাকি আপনার?

কার্ত্তিক। পথের কাঙ্গালীর নয় কিন্তু তার চাইতে বেশী কাঙ্গালীর একটা খবর আছে। কিন্তু সে কথা একটু গোপনে বল্‌তে চাই।

বিমল। গোপন! আপনারও আবার কিছু গোপন আছে না কি? এ বুড়ো বয়সেও গোপন কথা?

কার্ত্তিক। বুড়ো বয়সে সারাজীবনটাই গোপন হয়ে গিয়েছে, সাম্‌নে মৃত্যুর একদম পরম গোপনতার পিছনে জীবনের সবটুকু শেষ হয়ে অতীতের মধ্যে লুকিয়েছে! গোপন ত' আমার সবই রে! যাক্ শঙ্কর, অনাদি, তোরা একটু ও-ঘরে যা না ভাই—

বিমল। না—না সে হবে না, যদি আপনার নিজের কথা না হয় তা হ'লে গোপনের আর দরকার নেই, আমি আজ নিজের সব কথা নগেনবাবুকে বলে আস্‌তে পেরেছি যখন, তখন আর গোপন কর্‌বার আমার কিছু নেই। একবার যখন ফাঁকা হওয়ার আস্বাদ পাওয়া গেছে—

কার্ত্তিক। এ গোপন কর্‌ছি তোমার জন্য নয়, রাজুর জন্য। রাজু শুন্‌লে একটা মহাহাঙ্গামা বাধাবে তার পূর্ব্বে তোমাতে-আমাতে মিলে কিছু করে ফেল্‌ব।

অনাদি। আমরা বাইরে চল্লাম বিমলদা, শুনুনই না ওঁর কথা। এস শঙ্কর, সুরেশ, এস সন্তোষ।

(চারজন বাহির হইয়া গেল)

বিমল। ব্যাপারটা কিছু ভয়াবহ বলেই বোধ হচ্চে, নইলে এত ঢাকাঢাকি কেন?

কার্ত্তিক। ভয়াবহ নয়—কারণ রোজ চারদিকে যা শুনছ এ তারই একটা। যাক্ শোনো—শৈলেশকে চিন্‌তে?

বিমল! কোন্ শৈলেশ? রাজুদার আফিসের?—হ্যাঁ চিনি বৈ কি। কি হয়েছে? আবার বিষ খেয়েছেন না গলায় দড়ি দিয়েছেন তিনি?

কার্ত্তিক। দেয় নি, দিলে ভাল হ'ত বোধ হয়। সব জ্বালা জুড়ুতো। কিন্তু তা হয় নি—আজ তাকে পথে পুলিসে arrest করেছে।

বিমল। সর্ব্বনাশ! কেন?

কার্ত্তিক। সেই টাকা ভাঙ্গার চার্জ্জে!

বিমল। বড় সাহেব যে ছেড়ে দেবেন বলেছিলেন, সামান্য টাকা—

কার্ত্তিক। সব সাহেব একমত হ'ল না—আর শুনছি আরও কটা item মিল্‌ছে না, সেই জন্য ওর ওপরেই অফিসের সবাই মিলে সে সব itemএর দোষও চাপিয়ে দিয়েছে। যে নৌকো ডুবেছে তার জন্য আর মায়া ক'রে

কি হবে, এই বোধহয় আর সব brother officerদের মত। তাই এখন যত রকম কিছু বেরুচ্ছে স[illegible]র ঘাড়ে পড়ছে।

বিমল। তা বেশ করেছে তারা, আত্মানাং সততং রক্ষেৎ এটা চিরন্তন নিয়ম। এখন কি কর্‌তে চাচ্ছ আমাদের? ডুবো নৌকো পিঠ দিয়ে ঠেলে ভাসাতে হবে? কিন্তু ঠাকুরদা তো আমা হতে হবে না। এ একটী ছোট্ট নৌকো হলে দু পাঁচ জনে ঠেলেঠুলে ভাসিয়ে রাখা যেত, কিন্তু এ আমাদের সমাজ জাহাজটাই ডুবতে বসেছে। আমরা নিজেরাই ডুব্‌ছি। আমরা আবার কাকে বাঁচাব?

কার্ত্তিক। তা বলে ত' ভাই চুপ্ করে থাক্‌তে পারব না—এযে আমার পরিচিত লোক—আমার নিজের লোক বল্লেই হয়। নিতান্ত বুকের কাছে টান পড়্‌লে কেউ চুপ্ করে থাক্‌তে পারে?

বিমল। পারে বৈকি? এই দেখনা আমি। আমি বেশ দেখ্‌ছি সুখের চাইয়ে সোয়াস্তি ভাল। যখন বুঝিছি আমার মত লাখো লোক জুটলেও এই দেশব্যাপী দুঃখের কিছু কর্‌তে পারব না তখন নিজের সোয়াস্তিটুকু হারাব কেন? যেখানে জাহাজে শতছিদ্র হয়েছে তখন নিজের কাঠের ভেলাটুকু আশ্রয় করে চেপে বসে থাকাই ভাল।

কার্ত্তিক। কিন্তু যদি তাতে একটু জায়গা থাকে আর দেখ্‌ছ সেই জায়গাটুকুতে আশ্রয় পেলে আর অন্ততঃ একটী প্রাণীও বাঁচে তা হ'লে সেটুকু জায়গায় তাকে স্থান দেবেনা কি?

বিমল। দিতে পারি যদি না তাতে আমিও ডুবি। কিন্তু যদি তাতে আমারও ডোবার ভয় থাকে তাহ'লে আমি সে জায়গা কিছুতেই দেবনা। আগে বাঁচো তারপর বাঁচাও।

কার্ত্তিক। মিথ্যে কথা, মরেও অনেক সময় বাঁচাতে হয়—

বিমল। এ কথাও মিথ্যে কথা। এই দেখনা কেন, আমার রাজুদা। উনি বাপের কাছ থেকে পালিয়ে এসে বিয়ে করার দায় হতে বেঁচে সুখী হবার ভয় হতে বেঁচে তারপর safe distance থেকে philanthrophy করছেন।

কার্ত্তিক। ঐটে ওঁর ভুল—সেই ভুল সংশোধনের ব্যবস্থা তুমি আমি সবাই মিলে কর্‌ছি। কিন্তু তুমিও ভুল কর্‌ছ। সব জিনিষেরই দুটো দিক আছে—সাধু কার্য্যেরও দুটো দিক আছে। একটা নিজের দিক আর একটা পরের দিক। যে কেবল পরের দিকটাই স্বীকার করে সেও ভুল করে যে কেবল আপন দিকটাই স্বীকার করে সেও ভুল করে। তুমি কেবল আপন দিকটাই দেখ্‌ছ, রাজু কেবল পরের দিকটাই স্বীকার করেছে। কাজে বেলায় তাই উভয়কেই একদেশদর্শী বল্‌তে হচ্ছে। তুমিও আপন সুখটাকে বড় করে দেখ্‌ছ রাজুও বল্‌তে গেলে তাই করেছে তোমাদের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে কেবল সুখটার রকম ফের নিয়ে। Stand ponitএর তফাৎ নেই বিশেষ। তুমি দেখ্‌ছ সেই নিজেরই সুখ নিজের দিক থেকে রাজুও দেখ্‌ছে সেই নিজেরই সুখ পরের দিক দেখে: এই দু'টোকে যে একসঙ্গে দেখে সেই ঠিক দেখে।

বিমল। অর্থাৎ যে একসঙ্গে বাইরে ভেতরে দু জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে পারে সেই ঠিক্ দেখে! এ রকম physical impossibility এবং Psychological paradox যারা সমাধান কর্‌তে পারে তারা—

কার্ত্তিক। তারাই ordinary মানুষ। সাধারণ মানুষের জীবন ঠিক্ তাই। Extraordinary মানুষরাই বিশেষভাবে একদেশদর্শী। তাঁরা চারদিক দেখেন না একদিক দেখেন। তাঁদের যে তিনটে চোখ আছে তা তাঁরা মানেন না, কেবল ঐ একটা কপালের চোখ দিয়ে সব দেখ্‌তে চান। তাঁদের দৃষ্টি সাপের মত সেই যে একদিকে সাপুড়ের ঝাঁপির দিকে পড়েছে সে আর অন্যদিকে চাইবে না। এ না হলে তাঁরা একনিষ্ঠ হয়ে কাজ করতে

পারেন না। কিন্তু যারা নিতান্তই সাধারণ মানুষ তাদেরই সবদিকে দৃষ্টি রেখে কাজ করতে হবে। বাস্তবিক সম্পূর্ণ সাধারণ মানুষই সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক,—তেমন মানুষ পাওয়াই যায় না। সেই রকম মানুষই অসাধারণ বলে গণ্য হয়। একটা চোখ বহুর দিকে চলুক, একটা স্থির হয়ে থাক একের দিকে, তবেই একসঙ্গে এক আর বহুরসঙ্গে যোগ রেখে চলা হবে।

বিমল। আহা রাজুদা নেই আপনার এই বক্তৃতা মাঠে মারা গেল ঠাকুরদা। যাক্ এখন আমায় কি কর্‌তে হবে বলুন। আমি তর্কে আপনাকে পারব না।

কার্ত্তিক। তর্ক নয় ভাই, তোদের সঙ্গে তর্ক আমি করিনে কেবল আনন্দটুকু পাবার জন্য ছুটে আসি। তোরা আনন্দের টুক্‌রো। তোরা ভুলই করিস্ আর যাই করিস্ তবু তোরা কিছু করিস্ আর আমরা ধাক্কা খেয়ে খেয়ে একেবারে হাড়গোড় ভাঙ্গা দ হয়ে পড়িছি। কুর্ম্মাঙ্গন্ ইব সর্ব্বশঃ হয়েছি। যাক্ এখন কথাটা হচ্ছে তোমায় আর সংসার হতে এমন আলাদা থেকে নিজের সুখটুকু নিয়ে পড়ে থাকৃতে দেবেনা।

বিমল। কেন? আমার অপরাধ?

কার্ত্তিক। অপরাধ অনেক—এখন শোন, এই শৈলেশের কিছু তোমার কর্‌তেই হবে।

বিমল। টাকাকড়ি দিয়ে সাহায্য কর্‌তে বলেন, কর্‌তে পারি। তার বেশী আর কি কর্‌ব?

কার্ত্তিক। টাকাকড়ি দিয়ে কিছুই হবে না, ফুটো ঘটে জল ঢেলে লাভ নেই। তুমি যদি সম্পূর্ণ আপনাকে দান না কর্‌তে পার তা হলে কিছুই হবে না।

বিমল। অর্থাৎ সেই সংসারটার ভার আমায় নিতে হবে?

কার্ত্তিক। হ্যাঁ তাই, এটা ছোট্ট কাজ বলে অবজ্ঞা কর না—এই অবজ্ঞা করে বলে রাজু ভুল করে, তুমি তা কর্‌বে না আশা করি। তোমায় এই শৈলেশের একটী মেয়েকে বিয়ে করে, তারপর আর যে মেয়েটা আছে তার বিয়ের বন্দোবস্ত করে দিয়ে এদের বিলি ব্যবস্থা কর্‌তে হবে।

বিমল। কি ভয়ঙ্কর! এ যে মহাব্যাপার! আপনি বল্‌ছেন ছোট্ট কাজ—এ যে আমার পক্ষে Howardএর মত কাজ! এ আমি পার্‌ব কি করে? তার চাইতে ওদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া সহজ—হাজারকতক খরচ হবে তা কর্‌তে রাজি আছি, কিন্তু তার বেশী আমার দিতে হবে কেন ঠাকুরদা?

কার্ত্তিক। তোমার দিতেই হবে! তোমার টাকা আছে ওদের বিয়ে দিয়ে কিছু দান করাটা তোমার পক্ষে খুব সহজ, কিন্তু নিজকে দান করা তোমার পক্ষে কষ্টকর। সেই কষ্টটুকু তোমার পেতেই হবে। এই একটা সংসারকে রক্ষা করে যেটুকু পুণ্য সঞ্চয় হবে তাই তোমার পক্ষে পরম লাভ মনে কর্‌তে হবে। তা যদি না কর—

বিমল। একেবারে সুখের মস্ত বাগান থেকে দুখের মরুভূমিতে নির্ব্বাসন দিতে চান ঠাকুরদা—

কার্ত্তিক। হাঁ৷ তাই চাই। রাজুকে দিয়ে তাই হচ্চে না সে কেবল বড়-কাজকেই বড় করে দেখেছে, ছোট-কাজ আমরা বলি যাকে, তাতে যে কত বড়-কাজ লুকিয়ে আছে তা সে দেখ্‌ছে না তাই বড় ভুল হচ্চে—ঐ যে রাজু না?

(নীচে শব্দ,—"বিমল,—ও—বিমল")

কার্ত্তিক। ভালই হয়েছে।

বিমল। একটু ভাব্‌বার সময় দেন আমায়।

কার্ত্তিক। কিছু না; ভাব্‌তে গেলেই ভুল হবে। ভেতর থেকে যে মহা স্নেহময়ী জননী প্রকৃতি কাজ কর্‌ছেন তার কথা নির্বিচারে শুন্‌তে হবে—রাজু, ওপরে আয় না।

(রাজেন্দ্রের প্রবেশ। বিছানার উপর রেপার ফেলিয়া)

রাজেন্দ্র। ঠাকুরদা! আপনি কি মনে করে?

বিমল। তাই ত' ঠাকুরদা, এসে ইস্তক বকে মরছেন—তামাক, চা কিছুই দেওয়া হল না।

কার্ত্তিক। আচ্ছা এখন পালিয়ে বাঁচ,—ডাক তামাক—কিন্তু আমি ছাড়্ছি নে।

(বিমল হাসিতে২ বাহিরে গেল।)

রাজেন্দ্র। তাই ত' ঠাকুরদা, কি gun powder plot হচ্ছিল? অনাদি, শঙ্কর, সন্তোষ এরা কৈ?

কার্ত্তিক। তাদের না তাড়ালে সব পরামর্শ ফাঁস হয়ে যাবে যে?

রাজেন্দ্র। কিসের পরামর্শ?

কার্ত্তিক। দেশোদ্ধার বা অন্য কোনো রকম বিরাট ব্যাপার নয়—একটা ছোট্ট কাজের। বিরাট ব্যাপারে তুমি না থাকলে without Hamlet আমরা কি করতে পারি?

রাজেন্দ্র। না—না ব্যাপারটা কি বলুন না?

(চা ও তামাক লইয়া বিমলের প্রবেশ। কার্ত্তিক হুঁকা লইয়া টানিতে লাগিলেন এবং মাঝে চা পান করিতে লাগিলেন।)

বিমল। কিছু না রাজুদা, কাঙ্গালী বিদায়ের পরামর্শ হচ্ছিল।

রাজেন্দ্র। উহুঃ, মিথ্যে কথা—কি পরামর্শ হচ্ছিল বল না।

বিমল। তবে সত্যিকথা বলি—একটা বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছিল।

রাজেন্দ্র। বিয়ে? কার বিয়ে?

বিমল। ভয় নেই, তোমার নয়, আমার।

রাজেন্দ্র। তোমার? কোথায় ঠাকুরদা?

বিমল। ঠাকুরদা অনেক বকেছেন, উনি তামাক খান, তুমি আমার কাছে শোনো না কি। আমারই বিয়ে। কোথায় শুন্‌বে? প্রকাশপুরের জমিদারের মেয়ের সঙ্গে—

রাজেন্দ্র। প্রকাশপুরের জমিদার? আরে সে তো পিসেমশায় তাঁর আবার মেয়ে কৈ?

বিমল। কি ঠাকুরদা? নগেনবাবুও প্রকাশপুরের জমিদার নন কি?

রাজেন্দ্র। নগেনবাবু! কি বিপদ? আরে তাই বল না, মনুর সঙ্গে। কিন্তু—কিন্তু—তা কি করে হবে?

বিমল। কি করে আবার। বাজনা বাদ্যি লোকলস্কর আতসবাজি সবই থাক্‌বে—

রাজেন্দ্র। তাইত—কৈ এ কথা ত' ওখানে শুন্‌তে পেলাম না।

বিমল। তোমায় কি করতে বলতে যাবেন ওঁরা? ওঁদের কি লজ্জা নেই? একবার বলে ওঁদের যে নাকাল হয়েছে তাকি ভুলেছেন নাকি?

রাজেন্দ্র। (মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে) তাইত—তা বেশ—তা—কিন্তু—

বিমল। কিন্তু কি? তুমি কি মনে করছ ভাঙ্গচি দেবে নাকি? সে জোটী নেই, আমি মনুকে বলে এসিছি, রাজুদা যখন বিয়ে করবেই না, তখন আমি বিয়ে করতে রাজী আছি। সেও বল্লে রাজী। আর কি? এখন কেবল নগেনবাবুর কাছে proposalটা পাঠাতে হবে তাই ঠাকুরদাকে দূত পাঠাবার পরামর্শ কর্‌ছি—

রাজেন্দ্র। (এগিয়ে) আমি মনে করেছিলাম,—তা ভালই হয়েছে—কিন্তু ভাই বিমল তুমি শেষে বিয়ে করবে?

বিমল। চিরদিন থুবড়ো হয়ে মেসের ভাত খেতে হবে তার কি মানে?

রাজেন্দ্র। না—না—তা কেন, তবু আরও বড় কাজ করতে পারতে[illegible] করে শেষে—

বিমল। তোমার sancho Panza-গিরি হতে বরখাস্ত হয়ে যাব [illegible] ভয় হচ্ছে? ভয় নেই, ঐ বিয়ে করাই মাত্র। মনুকে ওর বাপের কাছে চিরদিনের জন্য রেখে দিয়ে এই মেসে থাক্‌লেই চল্‌বে।

রাজেন্দ্র। সে কি? তা কেন করতে যাবে? কি ভয়ানক—আমি তা তোমায় কখনো করতে দেব না। মনু আমাদের—

বিমল। কে সে তোমার?

রাজেন্দ্র। কে আবার আমার? কেউ নয়।

বিমল। সে তোমার বোন নয়?

রাজেন্দ্র। না—না কেউ নয়, তার জন্য কেন ভাব্‌তে যাব?

বিমল। ভাব্‌ছ আর বল্‌ছ কেন ভাব্‌তে যাব? এখনো লুকোচুরি! ধন্যি তোমাকে! এমনি করে নিজের কাছে নিজেকে লুকুচ্ছ! যাক্ তা হলে এ বিয়েতে তোমার অমত নেই?

রাজেন্দ্র। অমত কেন থাক্‌বে—তবে—তা হলে, তোমার আর এরকম জীবন কাটান চল্‌বে না।

বিমল। নিশ্চয় চল্‌বে। কেন চল্‌বে না? বিয়ে করব এই সর্ত্তে যে আমার দিক হতে কোনো বন্ধন থাক্‌বে না। সমাজে বিয়ে না করলে জাত যায়—তাই নগেনবাবুর জাতটুকু বাঁচিয়ে দিয়েই বাস্ আমার কর্ত্তব্য শেষ হয়ে যাবে।

রাজেন্দ্র। কি সর্ব্বনাশ! ঠাকুরদা এ সব কি? ছি ছি এযে মনে করলেও পাপ হয়।

বিমল। হয় নাকি? তা হ'লে আমার রাজুদা এমন করে একটা সংসারকে কাঁদিয়ে বাপমায়ের মনে কষ্ট দিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন? তাঁর তাতে পাপ হচ্ছে না? কি? চুপ করে রৈলে যে? ঐ মনোরমা মেয়েটী সে যে আমার রাজুদার জন্যই ওঁর বাপে উৎসর্গ করে রেখেছেন তাকে কষ্ট দিয়ে, তার বাপকে কষ্ট দিয়ে আর সব চাইতে ভয়ঙ্কর নিজের বাপমায়ের চোখের জল ফেলিয়ে তাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ কাটিয়ে রাজুদা যে মস্ত বড় কাজে জীবন উৎসর্গ করেছেন তাতে কিছু হচ্ছে না। তাতে যদি মহাপুণ্য হয় আমার কাজেও না হয় তার চাইতে একটু কম পুণ্যই হবে।

রাজেন্দ্র। বেশ ভাই, যা হয় করো,—আমি কি বল্‌ব। কিন্তু মনু—কি রাজী—

বিমল। আবার মনু—হলেই বা সে মনু। মনুকে উৎসর্গ করলে যদি যাজ্ঞবল্ক্য উশনা অঙ্গীরা অত্রি এঁরা সবাই বাঁচেন, তা হলে তাতে পণ্ডিতের মতই কাজ হবে। সর্ব্বনাশে সমুৎপন্ন অর্দ্ধেক ত্যাগ করা যেমন বিধি অর্দ্ধাঙ্গিনীও তাই। আমি এ বিয়ে করবই এবং মনুকে তার মার কোলেই রেখে দেবই। তাতে ভালই হবে। এতে সর্ব্বনাশ ত' বড় কম নয় আমার পক্ষে—এমন সুখের মেস্ জীবন কি অত সহজে ছাড়া যায়?

ক্রমশঃ—

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

ভ্রম সংশোধন।

গত কার্ত্তিক মাসের "পরিচারিকা"তে, স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের রচিত "যদি এসেছো, এসেছো এসেছো বঁধু হে—" গানটির, আমার কৃত স্বরলিপির তালাঙ্কে, দুঃখের বিষয়, কিছু ভুল হইয়া গিয়াছে। স্বর গ্রামগুলি ঠিকই আছে। কোচবিহার নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দেব শর্ম্মণ মুস্তফী মহাশয় তালাঙ্কের এই ভ্রম প্রদর্শন করিয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। কাহার যে অসাবধানতা-বশতঃ ভুলটা হইয়াছে, তাহা আমি এখনও ঠিক করিতে পারি নাই। কম্পোজিটারদের পক্ষে,—আমার নিজের হাতের লেখা, তত সুবিধাজনক নহে বলিয়া, আমি যে আসল স্বরলিপি নিজে তৈয়ার করি, তাহার নকল করাইয়া, নানা পত্রিকাতে পাঠাইয়া থাকি। এ অবস্থায় নকল-নবীশ মহাশয়ই ভুল করিলেন, না কম্পোজিটারদের দ্বারাই ভুল ছাপান হইল, বলিতে পারি না। এ কথা এ জন্য বলিতেছি যে আমার হস্ত-লিখিত স্বরলিপিতে তালাঙ্ক ঠিকই আছে। যাহাই হউক স্বরলিপির যে অংশটুকুর ভুল হইয়াছে, তাহা শুদ্ধ করিয়া প্রকাশার্থে পাঠাইতেছি। ভরসা করি সঙ্গীত-প্রিয় পাঠকপাঠিকারা এতদনুযায়ী স্বরলিপিটির সংশোধন করিয়া লইবেন।

১ { সা রা] ২´ ৩ ০

| -া -া রা গা } | জ্ঞাঁ জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা |

• • য দি এ সে ছ দি ব হু দ য়া স ন

১ ২´ ৩ ০

| গা জ্ঞা পা -া | -া -া -া | গা জ্ঞা পা ধা I পা ধা -া |

পা • ত্তি • • • • দি ব গ লে নি তি •

১ ২´ ৩ ০

| না না ধা না | র্রা র্সা র্সা | না -া ধা -া I -া -া -া |

ন ব প্রে ম হা • র গাঁ • থি • • • •

১ ২´ ৩ ০

| -া -া -া -া না র্রা র্রা | ধা না না -া I পা ধা ধা |

• • • • র হি ব প ড়ি য়া • দি ব স

১ ২´ ৩ •

| জ্ঞা রা পা -া | রা গগা -জ্ঞা | গা পা পা -জ্ঞা I ধা -পা -না |

রা তি হে • চ রণে তো মা • রি • • • •

১

| ধপা পা সা রা II II

•• • "য দি"

শ্রীমোহিনী সেন গুপ্তা।

জয়দেব ও তাঁহার জয়ঢাক।

পাঠক আকর্ষণ কর্‌বার পক্ষে শিরোনামা-নির্ব্বাচনের শক্তি যে একটি অল্প আবশ্যকীয় পদার্থ নয়, তা' আর কেউ মানেন কিনা জানিনে, আমি কিন্তু বরাবরই মেনে আস্‌ছি। কাগজ হাতে পড়্‌লেই সর্ব্বাগ্রে আমি প্রবন্ধের শিরোনামাগুলি দেখি, এবং পছন্দসই নাম পেলেই তার অন্তরালের রূপটুকুর পরিচয় নিতে বসে যাই।

এই যে নামানুরাগ, এর কারণ খুঁজে দেখ্‌বার কথা কখনও মনে হয়নি—সেদিন শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের এক রিপোর্ট থেকে হঠাৎ ও-বস্তু পেয়ে গিয়েছি। যে-পল্লীটী আমার জন্মপল্লী, শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে তার আদিম নাম ছিল "গৌরের পাট"; ক্রমে ও-নাম "গৌরীপুরে"র মধ্যপথে তিন অক্ষরে-সংক্ষিপ্ত "গরিফা" আকার ধারণ করেছে। "গৌর" বল্‌তে শাস্ত্রীমহাশয় "গৌরে বেদে"কে নয়, কিন্তু "গৌরাঙ্গদেব"কেই নির্দ্দেশ করেছেন। কি চমৎকার অর্থ-গৌরব-ভরা এই নাম-রহস্যের নিগূঢ়তাটুকু!

আমি কিন্তু ভাবনায় পড়েছি; কেননা, 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়' এ-প্রবাদের মূলে যদি সত্য থাকে, তাহলে গৌরাঙ্গদেবের চরণ-স্পর্শ-পবিত্র মাটীতে যাদের প্রাণ-মনের আধারগুলো তৈরি, তাদের পক্ষে নামের ঘায়ে মূর্চ্ছা'ই তো যাবার কথা! কিন্তু এ পক্ষে ঐ অনুরাগটীর বেশী আর যে বড় একটা কিছু দেখা যাচ্ছে না কেন, তা' উদ্ধৃত নাম-রহস্যটা থেকেই দেখাচ্ছি।

গৌরের পাটের "গৌর" ছিলেন ভক্তিবাদের বাণী-মূর্ত্তি, আর গৌরীপুরের "গৌরী" হচ্ছেন শক্তিবাদের প্রাণের স্ফূর্ত্তি। বৈষ্ণব বল্‌তেন—'মহাপুরুষ যদি হবি রে দাদা, তবে ফুলের চেয়েও কোমল হ';' আর শাক্ত বল্‌তেন—'ও জিনিস যদি হতে চাস্ রে ভাই, তবে বাজের চেয়েও কঠোর হ'।' এই দোটানার মধ্যে পড়ে' সহজ-মানুষের পক্ষে যা' স্বভাবতঃই ঘটে উঠ্‌তে পার্‌তো, তা' হয় 'ভণ্ড' আর না হয় 'গোঁয়ার' হয়ে পড়া। এই সব দুর্ঘটনা দেখেশুনেই বোধ হয়, এ পল্লীটী ত্র্যক্ষর হয়ে ওঠবার আগে নিজের নামে গৌরেরও মান রেখেছে, গৌরীরও অপমান করেনি।

এ অবস্থায়, এমন ধারণা যদি আমার জন্মে থাকে যে ভক্তিবাদ ও শক্তিবাদের মাঝখানে বিসম্বাদটা গুণের নয়, এবং "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি" এইটাই হচ্ছে এ যুগের মহাপুরুষ-লক্ষণ,—তা' হলে খাঁটি মুঙ্গেরা যে ঐ দু-তরফ থেকেই আমার মাথায় চাঁটি লাগানো দরকার মনে কর্‌বেন তার নমুনা দেখা দিয়েছে। অন্ততঃ, আশ্বিন-সংখ্যা 'উপাসনা'য় দারুণ চীৎকার-শব্দে বিঘোষিত হয়েছে যে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের শুভ্র-অঙ্গে নিবের খোঁচা লাগিয়ে আমি রক্ত বার করে দিয়েছি। একথা আমরা অনেকেই জানি যে রক্ত-পুষ্প শাক্তের চিহ্ন ছিল, বৈষ্ণবের নয়; এ অবস্থায় বর্ত্তমানের রক্তহীন ফ্যাকাসে মনগুলিকে লাল-রক্তে ছুপিয়ে দেবার চেষ্টা কর্‌লে, কিম্বা বৈষ্ণবের শাদা-ফুল ও শাক্তের লাল-ফুলের সমন্বয়ে মানুষের চিত্তপুষ্পগুলিকে যুগোপযোগী বিশিষ্টতা দান কর্‌তে চাইলে অপরাধী যে হতেই হবে তাও বুঝ্‌ছি। প্রকৃত পক্ষে, যে প্রবন্ধ সম্বন্ধে অপবাদের আগুন ছাই হয়েও আজ পর্য্যন্ত ধোঁয়াতে ছাড়্‌চে না, তাতে ও-দুঃসাহসের কাজ আমি কর্‌তেও চাইনি; তবু প্রকাশ যে, সাহিত্যের মাপকাঠি দিয়ে বৈষ্ণব-পদাবলীকে মাপ্‌তে গিয়ে এ-লেখনী ধর্ম্মের অঙ্গ ছেঁদা কর্‌বারই চেষ্টা করেছে!

বৈষ্ণব-পদাবলীর পদ তো সব একরকম নয়। চৈতন্য-পূর্ব্বযুগের জয়দেব থেকে আরম্ভ করে চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত-যুগের তেত্রিশ-কোটী দাস দেব পর্য্যন্ত ও-পদাবলীতে চতুষ্পদ, দ্বিপদ ও ষট্‌পদ প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন পদ-মর্য্যাদাই দেখ্‌তে পাওয়া গিয়ে থাকে। জয়দেবের হাত যাকে চতুষ্পদ মর্য্যাদার অতিরিক্ত কিছু দিয়ে উঠ্‌তে পারেনি, তা'

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের হাতে কম-বেশী-পরিমাণে দ্বিপদ-মর্য্যাদা লাভ করেছিল—আর মধুপ-গুঞ্জন যদি কোথাও স্পষ্ট শোনা গিয়ে থাকে তবে তা' চৈতন্যেরই হাতে গড়া মধুচক্রখানির চতুষ্পার্শ্বে। এই তো গেল "বৈষ্ণব-পদাবলী"র পদ-মর্য্যাদার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। অপরপক্ষে, "বৈষ্ণব-ধর্ম্মে"র যদি কোন মর্য্যাদা থাকে, তবে পদ-মর্য্যাদা তা' নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু আত্মমর্য্যাদা। অঙ্গী যারা, যাদের চল্‌তে ফির্‌তে হয়, তাদেরই ঠ্যাং থাকা দরকার,—কিন্তু ধর্ম্ম বল্‌তে আসলে যা' বোঝায় তা' এইজন্যেই অনঙ্গ যে, তার কাজ হচ্ছে চলাফেরা নয় কিন্তু চলানো ফেরানো। যাকে অঙ্গে অঙ্গে চেতনা সঞ্চার করতে হবে তার নিজের অঙ্গভার থাকাটা অবশ্যই সুবিধার কথা নয়। এখন ঐ অনঙ্গটীকে অঙ্গভারে ভারাক্রান্ত করে' বিশেষ বিশেষ ধারণাশক্তি কি ভাবে তাকে পঞ্চভূতের নৃত্য-তাণ্ডবের মাঝখানে ধরে বেঁধে এনেছেন, তাই দেখা আমার উদ্দেশ্য ছিল।

ধর্ম্ম নামক অ-পদার্থটী অবশ্যই অ-পরিসীম, অতএব মানুষের স-পরিসীম বুদ্ধিতে ও-জিনিসের কোনো মাপ-কাঠি থাক্‌তে পারে না; তাই বলে সাহিত্যের মাপকাঠি যে ধর্ম্মের শূলদণ্ড, এরকম মনে করাও প্রবুদ্ধতার লক্ষণ নয়। মনুষ্য-জীবনে সাহিত্য আর ধর্ম্মের সম্পর্কটা যে দা-কুমড়োর সম্পর্ক, এবং এতদুভয়ের প্রথমের পক্ষে যা' পৌষমাস দ্বিতীয়ের পক্ষে তা' সর্ব্বনাশেরই কারণ, একথা আমরা ততক্ষণই বল্‌তে পারি যতক্ষণ ও-দুয়ের কোনো-টীর প্রতিই আমাদের শ্রদ্ধা থাকে না এবং গোঁড়ামির দিকেই মন উন্মুখ থাকে।

যে নির্বিশেষ নিয়ম-সূত্রে সমস্ত বিশেষই বিধৃত, তাকেই বলে ধর্ম্ম; আর, প্রকাশ ও প্রেরণ শক্তির সাহায্যে যে-বস্তু ঐ নিয়মসূত্রের সঙ্গে আমাদের প্রাণমনের যোগ অনুভব করায়, তাকেই বলে সাহিত্য। এক কথায়, ধর্ম্ম হচ্ছে জীবনের বিকাশ, আর সাহিত্য হচ্ছে জীবনের প্রকাশ। যে অখণ্ড-নিয়ম আপন জীবন সঞ্চয় কর্‌তে পার্‌লে আমরা যোগী বা ভক্ত-পদবাচ্য হই, সেই অখণ্ড নিয়মই জীবনে-জীবনে সঞ্চার কর্‌তে পার্‌লে আমরা কবি বা সাহিত্যিক-পদবাচ্য হই। প্রথমোক্তের প্রতিভা Retentive আর শেষোক্তের Reflexive. মানুষ সঞ্চিত শক্তি হয়েও যতক্ষণ মৌনী থাকে ততক্ষণই সে যোগী বা মুনি,—আর যখন গুঞ্জন করে তখনই সে কবি বা গুণী।

সাহিত্য ও ধর্ম্মের অভেদ বা প্রভেদ যা-কিছু তা' ঐটুকুমাত্র; সুতরাং ও-দুয়ের আগে 'বৈষ্ণব' শব্দটি জুড়ে দিলে, যে 'বৈষ্ণব-সাহিত্য' ও 'বৈষ্ণব-ধর্ম্ম' এই বিশেষ পদ-দুটি নিষ্পন্ন হয়, তাতেও ও-যোগাযোগ অক্ষুন্নই থাক্‌বার কথা। তবু যদি সাহিত্যের মাপকাঠিতে বিচার করার ফলে কোনো বিশেষ-সাহিত্যের সঙ্গে কোন বিশেষ ধর্ম্মের আদায়-কাঁচকলায় বেঁধে গিয়ে থাকে, অথচ সে-বিচারকে সাহিত্যের আদর্শানুগ বলে' স্বীকার করা হয়ে থাকে—তবে বুঝ্‌তেই হবে যে ঐ বিশেষ-সাহিত্যের ও বিশেষ ধর্ম্মের যোগাযোগের মাঝখানেই গোলযোগ ছিল।

কিন্তু সম্প্রতি "বৈষ্ণব ধর্ম্মের অশ্লীলতা" এই বাহাদুরী-ভরা শিরোনামায় শোভিত যে প্রবন্ধটী আমাকে আকৃষ্ট করেছে, তাতে এই সহজ-বুদ্ধির বক্র-দিক্‌টাই দেখা দিয়েছে—এবং ও-প্রবন্ধে মোটের ওপর এই কথাই বল্‌বার চেষ্টা হয়েছে, যে বৈষ্ণবধর্ম্মকে খোঁচা দেওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য, এবং বিষ্ণুদূত মাত্রেরই উচিৎ হবে যমদূতে পরিণত হয়ে এই "অবিশ্বাসী জনের" ঘাড় মট্‌কানো। এ-দুর্ঘটনা যদিবা আমার অদৃষ্টে ঘটেই যায়, তাতেও ক্ষুব্ধ হবার অবশ্যই কোনো কারণ নেই; কেননা, অন্ধবিশ্বাসী-জনের অজ্ঞান-তিমিরে গোলোকধামটা পর্য্যন্ত অন্ধকার করে' তোলার চেয়ে, যমের বাড়ীর দিকে রওনা হওয়াও ভাল।

যে-ধর্ম্মের প্রভাবে এককালে আসমুদ্র ভারতবর্ষ স্পন্দিত হয়ে উঠেছিল এবং বর্ত্তমানের নব-জাগ্রত বিশ্বজাতীয়-তার উদ্বোধন-ব্যাপারে যে ধর্ম্মের দান একেবারেই অনন্য-সাধারণ, আমার লেখনী মুখে তার অশ্লীলতা কীর্ত্তিত হয়েছে, একথা নির্লজ্জ-চীৎকারে বিঘোষিত কর্‌বার আগে প্রবন্ধলেখক যদি চোখ্ খুল্‌তেন, তা' হলে সম্ভবতঃ

দেখা যেত যে, যে সমালোচনাটীর অঙ্গে তিনি নখদন্তের চিহ্ন রাখ্‌তে এসেছেন, সেই সমালোচনাতেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মভাবের একটী ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। হতে পারে, সে-ব্যাখ্যা নিতান্তই অক্ষম,—কিন্তু যে-ব্যক্তি বৈষ্ণব-ধর্ম্মভাবের ব্যাখ্যায় তার অকিঞ্চিৎকর শক্তিটুকুও নিয়োগ করতে গিয়েছে তাকে আর যাই মনে করা হোক্, 'কালাপাহাড়' মনে করা নিশ্চয়ই সঙ্গত হবে না।

(২)

উক্ত প্রবন্ধ আমার বিরুদ্ধে যে-সমস্ত অভিযোগ এনেছে, একে একে তার প্রত্যেকটীরই মূল্য-বিচার করা আমি দরকার মনে করতুম—যদি এমন পরিচয় পাওয়া যেত যে সে সমস্ত প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে মুখ ছোটাবার আগে তিনি চোখ্ ফোটাবার চেষ্টা করেছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠকেরা এ-অভিযোগ পড়ে যদি অভিযুক্ত প্রবন্ধ-গুলি দেখে নেন তা' হ'লে মজা জিনিসটী যে বহুলপরিমাণেই পাবেন, এ ভরসা আমি তাঁদের নির্ভয়েই দিতে পারি।

জয়দেব বা বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের মাত্রানুক্রমিক অনুভূতি-পরিসরগুলির চেয়ে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ব্যাপ্তি ও গভীরতা যথেষ্টই বেশী এবং আমার সমালোচনা প্রধানতঃ জয়দেবেরই কাব্যাদর্শের পাশে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ভাবাদর্শ-টিকে দাঁড় করিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছে। তবে, এ-বিশ্বাস যদি কারুর থাকে যে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আত্মাপুরুষটী জয়দেবেরই দেহপিঞ্জরে রাধাকৃষ্ণ বল্‌তে শিখেছিল এবং ঐ দেহেরই সঙ্গে সঙ্গে খাঁচাছাড়া হয়েছে, তা' হলে তাঁহাদের সেই ভ্রান্ত-বিশ্বাসে আঘাত করতে বাধ্য হওয়ায় অবশ্যই আমি দোষী। কিন্তু এ-দোষ গোপন করে লাভ ছিল না, কেননা আমার বিশ্বাস যে 'বিষ্ণুপুরাণের' আত্মা কালক্রমে প্রেতাত্মায় পরিণত হয়ে জয়দেবের স্কন্ধে ভর করেছিল এবং গীত-গোবিন্দে মৃদঙ্গ-মন্দিরা-ধ্বনির ফাঁকে ফাঁকে যে "বলহরি, হরিবোল" শব্দ শোনা গিয়েছে তা' ঠিক সংকীর্ত্তন নয়।

এই জয়দেব যা' কবরস্থ করে এসেছিলেন, যথাক্রমে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের উন্নত ও উন্নততর চেষ্টার মধ্যপথে তা' শ্রীচৈতন্যে নবভাবে পুনর্জ্জীবিত হয়েছে। ফলকথা, বিষ্ণুপুরাণ থেকে জয়দেব পর্য্যন্ত আদিম বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ক্রম-পতন এবং জয়দেব থেকে চৈতন্য পর্য্যন্ত ও-বস্তুর ক্রমঃ-উত্থানই দেখিতে পওয়াযায়। জয়দেবের পৃষ্ঠপোষক বুদ্ধিগুলিতে চৈতন্যের আত্মা আবার প্রেতাত্মাতেই পরিণত হচ্ছে। কবিরাজ জয়দেবকে ধর্ম্মরাজে পরিণত করতে চাওয়া তখনই আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়, যখন extreme negative আর extreme positive এর বাহ্য-সাদৃশ্য ওদের অন্তরের বৈষম্য সম্বন্ধে আমাদের অন্ধ করে' দেয়, অর্থাৎ যখন নাকি আমরা ঐ দুটী extreme কে ঘুলিয়ে ফেলে ভাবি যে 'তুরীয়' অবস্থা আর 'আধমরা' অবস্থা একই জিনিস।

আমার সমালোচক নিজমুখেই জানিয়েছেন যে তিনি খাঁটি বৈষ্ণবও নন, কিম্বা ভক্তও নন। তবু যে চোখ 'ফোটবার আগেই তাঁর মুখফুটেছে' সে কেবল "লেখনী কণ্ডুয়ন নিবৃত্তর জন্যই" তাঁর এই সরল স্বীকারোক্তি-টিকে আমার পাঠকেরা স্নেহের চক্ষে দেখলেই খুশী হয়, কেননা ও-কথাগুলিকে বিনয়ের ভান বলে' মনে করবার কোনই কারণ নেই।

উপদেশ জিনিসটা যে আমোদের কান দিয়ে ঢুকে মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, এ অবশ্য এখনকার জনসাধারণের সনাতন স্বভাব। আমার সমালোচকেও এ-স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটেনি—মস্তিষ্ক ও হৃদ্-বৃত্তিগুলিকে স্ব স্ব কক্ষে সুখনিদ্রিত রেখেই তিনি অনেক কানে-শোনা মামুলি-কথা উপদেশামৃত রূপে চালিয়ে দিতে চেয়েছেন; এই চির-পরিচিত উক্তিগুলি অবশ্যই আমার কাছে অনাদৃত নয়, তবে লেখক-মহাশয়ের প্রতি আমার পরামর্শ হচ্ছে এই যে তিনি যা' উচ্ছ্বসিত করে দিয়েছে, তা' অতঃপর নিজের মধ্যেই কিছুকাল সংযত রাখুন;

তাতে আমার না হোক্ তাঁর নিজের অন্ততঃ উপকার হতে পারবে। ভগবানকে পারিবারিক সম্বন্ধের ছাঁচে ঢালাই করে' ফেলার প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে যে সমস্ত ওকালতী দেখ্‌ছি তাও অমূল্য নয়,—বাদপ্রতিবাদের মুখেই চৈত্রের 'মালঞ্চে' ও-বস্তুর মূল্য কষে দেখানো গিয়াছে।

লেখক মহাশয়ের দুটী উক্তি পাশাপাশি উদ্ধৃত করে, তাঁর মনের একটী রহস্য দেখিয়ে দিয়ে যাই :—

(১) "ভগবানকে এ-পর্য্যন্ত কেহ চর্ম্মচক্ষে দেখে নাই ; যাহারা দেখিয়াছে বলে তাহারা সকলেই মনে অনুভব করিয়াছে। কিন্তু সে-অনুভূতি এমন যে তাহা বর্ণনা করিবার কথা কোন ভাষায় নাই।"—অতিসত্য কথা ; এই কথাতেই প্রমাণ হচ্ছে যে ভগবান চতুষ্পদও নয়, চতুর্ভুজও নয় কিম্বা দ্বিভুজ মুরলীধারীও নয়—কিন্তু একটী intensest sense, একটী metaphysical entity, এক কথায় চৈতন্যস্বরূপ। মানুষে তাঁর এই স্বরূপটীর যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ-কল্পনা করেছে তা, রূপক ছাড়া অন্য কিছুই নয়। আসলে কিন্তু, ভগবান হচ্ছেন, মর্ম্ম-স্পর্শী—চর্ম্মস্পর্শী নন। মানুষকে যদি তিনি স্পর্শ করেন তবে সে-স্পর্শ তার মর্ম্মের দিক দিয়েই; যেহেতু তিনি মর্ম্মী। কিন্তু অন্যত্র প্রকাশ—

(২) "মনে করিও না রাধাকৃষ্ণলীলা-ব্যাপার একটা রূপক। ভগবান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপে গোলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার হ্লাদিনীশক্তি শ্রীরাধার সহিত লীলা করিয়াছিলেন।,—গোলোক যদি ব্রহ্মাণ্ড-গোলকের বা infinityর কেন্দ্র নির্দ্দেশক রূপক না হয় এবং গোলোক-পতি যদি স্বয়ং সেই infinitily produced straight lineএর, অপর কথায় circle এর কেন্দ্রস্থানীয় না হন—তবে 'গো-লোক' নিশ্চই 'গরু চরবার জায়গা'। শেষোক্ত অর্থে 'পালক' শব্দটাকে যদি গ্রহণ করা যায়, তবে স্বীকার করতেই হবে যে ওস্থান পরিত্যাগ করে' ভগবান গো-বুদ্ধির নয় কিন্তু সু-বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রথমোক্ত অর্থ যদি মিথ্যা না হয় তা' হ'লে বক্তব্য দাঁড়ায় এই, যে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে তিনি ভাল করেননি; এবং আরও সর্ব্বনাশ করে গিয়াছেন রাখালরাজসাজে এই স্বভাব-দীন মর্ত্তভূমিতে গরুর সর্দ্দারি করে'। বস্তুতঃ ও-কাজ যদি তিনি না করতেন তা' হ'লে আমাদের একেলে রাজবুদ্ধিগুলি কেন্দ্রচ্যুতও হ'ত না অথবা গোময়-গন্ধীও হ'ত না। বলা বাহুল্য, গোময় জিনিসটী অতীব পবিত্র ; অতএব আমার সমালোচকের মস্তিষ্কটীর প্রশংসা করাই এ-ক্ষেত্রে অভিপ্রেত।

সে যাই হোক, যে-সমস্ত প্রবন্ধের বক্তব্য-সম্বন্ধে শিক্ষিত ভদ্রলোকেও এতটা ভুল করছেন, তা' যে অস্পষ্ট ছিল না তার প্রমাণ কি ? প্রমাণ এই যে, একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিও অন্ততঃ সে সকল প্রবন্ধ গানের যথার্থ অর্থেই বুঝেছিলেন। যে চেতনাশক্তি আমাকে চৈতন্যের "কিছু প্রশংসা" নয় কিন্তু চরম প্রশংসা করতেই বাধা করেছিল, সেই চেতনাকে অগ্রাহ্য করে' চৈতন্যের জয়দেব-সম্বন্ধীয় সার্টিফিকেটটাকেই শিরোধার্য্য না করায় অপরাধী হতে হয়েছে দেখ্‌ছি। জয়দেবকে চৈতন্য যদি ধর্ম্মরাজ বলে থাকেন তবে আমি বল্‌তে বাধ্য যে চৈতন্যে চেতনা সে সময় লুপ্তই হয়েছিল, আর যদি সুন্দর শব্দ-শিল্পী বলে' থাকেন তা' হলে সে প্রশংসা আমরাও দিতে ভুলিনি। তবু শ্রীযুক্ত রাখালবাবুর কথা থেকে বুঝ্‌ছি যে নিজের অনুভূতির চেয়ে পরের দেওয়া সার্টিফিকেটের ওপরই তাঁর আস্থা বেশী।

অতএব 'যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ" এই প্রবাদ-বাক্যটী স্মরণ করে' তাঁর দন্তাক্রান্ত প্রবন্ধগুলি-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের মন্তব্যটুকু এখানে উদ্ধৃত করে দিলুম। এ-কাজে আমার মন সরেনি বলেই এত কাল তা' চেপে রেখেছিলুম, এখন দেখ্‌ছি, ও-জিনিস ছেপে দেওয়াই ভাল—কেননা, তাতে সার্টিফিকেট-গত বুদ্ধিগুলিও ঠাণ্ডা হবে এবং প্রমথবাবুর অভিমতও সাহিত্যের স্যাঁতসেঁতে আসর গরম করতে পারবে ;—

*   *   *   1, Bright Street, Ballygunj 7.3.17.

* * * 'ব্রজবেণু' সম্বন্ধে বাদ-প্রতিবাদ পড়লুম। তর্কের মুখে আলোচ্য বিষয়টী এত ফলাও হয়ে উঠেছে যে তার সম্যক বিচার করতে হলে অন্ততঃ তিন চারটী প্রবন্ধ লেখা দরকার। তবে, যতদূর সংক্ষেপে পারি, এই বাদানুবাদসম্বন্ধে আমার মত জানাচ্ছি।

আপনার প্রবন্ধের প্রধান গুণ, তার স্পষ্টবাদিতা। জয়দেবের গীতগোবিন্দ-সম্বন্ধে আপনি যা' লিখেছেন, সে কথা সম্পূর্ণ সত্য। বহুকাল পূর্ব্বে আমি জয়দেবসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখি; তাতে আমি এই কথা বলি যে, তাঁর কবিতা দেহসর্ব্বস্ব। তখন আমার অল্প বয়েস, সুতরাং উক্ত প্রবন্ধে আমার মত আমি অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করি। সে মত যে আমি অদ্যাবধি পরিবর্ত্তন করিনি, তার প্রমাণ আমার জয়দেবের উপর সনেটে দেখতে পাবেন। জয়দেবের কবিতার সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, এমন কোনো শিক্ষিত ব্যক্তির যে অন্যমত হতে পারে, এও আমার ধারণার বহির্ভূত; এ-বিষয়ে আমরা এ যুগের শিক্ষিত-সম্প্রদায় সকলেই যে একমত তার প্রমাণ, আধ্যাত্মিক-ব্যাখ্যার সাহায্যে আমরা তার নগ্নতা চাপা দিতে চাই। ও-সব হচ্ছে আমাদের নিজের মনভোলানো কথা। আমরা সকলেই মনে মনে জানি যে ও-জিনিস কাব্য হিসেবে অচল, তাই মুখে বলি তা' রূপক।

জয়দেব যদি সত্যসত্যই জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন রাধাকৃষ্ণের দেহের নামে বেনামি করে থাকেন, তা' হলে এতদিনে ও-কবিতার উপর আত্মার দাবী তামাদি হয়ে গেছে। কিন্তু জয়দেব যে দেহ-বস্তুটাকে আত্মার রূপক-হিসাবে ব্যবহার করেছেন এরূপ অনুমান করবার কোনও বৈধ কারণ নেই। গীত-গোবিন্দের মূল হচ্ছে ভাগবতের রাসলীলাধ্যায়। সেই অধ্যায়টী পাঠ করলেই দেখতে পাবেন যে, ব্রজলীলার কথা শুনে রাজা পরিক্ষীৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করেন যে ভগবানের অবতার কি কারণে এমন গর্হিত কার্য্য করেন। শুকদেব, উত্তরে, কোনরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আশ্রয় না নিয়ে এইমাত্র বলেন যে, যে ব্যক্তির "ঐশ্বর্য্য" আছে তাঁর চরিত্র ও কার্য্যকলাপ এতই বিচিত্র যে তা' আমাদের বুদ্ধির অগম্য। শুকদেব 'ব্রজলীলা' ব্যাপারটা যে Literally নিয়েছিলেন তার প্রমাণ, তাঁর মতে উক্ত লীলা মানুষের পক্ষে অনুকরণ করবার বস্তু তো নয়ই, বরং ও-ব্যাপার স্মরণ করাতেও পাপ আছে। আসল কথা এই যে, সাধারণ স্ত্রী পুরুষের আসঙ্গ-লিপ্সাই রাধাকৃষ্ণের নামে বেনামি করা হয়েছে।

আপনার প্রবন্ধ নিয়ে সমালোচকেরা যে কেন এতটা উতলা হয়ে উঠেছেন, তা বুঝতে পারলুম না। যদি ব্রজবেণুর পরিচয় পত্রে সসীমের সঙ্গে অসীমের যোগাযোগের কথা না থাকতো তা' হলে আপনি কখনই ও প্রবন্ধ লিখতেন না। কেন না sex-love যে কবিতার বিষয় হতে পারে একথা যখন কেউ অস্বীকার করে না তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আপনিও করেন না। পৃথিবীর অধিকাংশ কবিতাই তো প্রেম-মূলক। তবে স্ত্রী পুরুষের একের প্রতি অপরের টানটাকে সসীম-অসীমের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের টান বলায় একটু বাড়াবাড়ি করা হয়, কেন না এক্ষেত্রে উভয়েই সমান সীমাবদ্ধ এবং উভয়েরি পত্তন চৌদ্দ পোয়া। নবীন কবিরা যদি এই মামুলি ব্যাপারের মধ্যে একটা "অনন্ত ও চিরন্তন" তথ্য দেখতে চান, তা' হলে অন্ততঃ এ-যুগে তাঁদের দৃষ্টি, রক্ত-মাংসের সীমায় আবদ্ধ রাখলে চলবে না। অব্যক্তের প্রতি ব্যক্তের অভিসার যে-কবির প্রতিপাদ্য বিষয়, তাঁকে এযুগে ব্যক্ত অর্থে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই বুঝতে হবে। অব্যক্তকে ব্যক্তের ভিতর আমাদের খুঁজতে হবে, অর্থাৎ বিশ্বরূপের মধ্যেই অরূপ অথবা স্বরূপের সাক্ষাৎ লাভ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ তাই করেছেন সুতরাং তাঁর কবিতায় এদেশের একালের যুগধর্ম্মই ফুটে উঠেছে। এ বিষয় আপনি যা বলেছেন আমি তা সম্পূর্ণ গ্রাহ্য করি। একথা খুবই ঠিক যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনটাকে এ যুগে দেহের গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ রেখে আমাদের মনের তৃপ্তি হয় না।

sex-love এর স্পষ্টাস্পষ্টি বর্ণনাও তেমন অরুচিকর নয়, যেমন ঐ জিনিষের আত্মার ছদ্মবেশ ধারণ। এ বিষয় যা সত্য কথা তা' আপনি বলে দিয়েছেন।

বৈষ্ণব-পদাবলীতে আমরা যে সব রসের সাক্ষাৎ পাই, সখ্য বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি সে সবই হচ্ছে মানুষ মাত্রেরই জানা জিনিস—আর ঐ সুপরিচিত মনোভাবগুলির সুললিত ভাষায় প্রকাশ দেখে আমরা মুগ্ধ হই। যদি আমাদের আটপৌরে হৃদয়বৃত্তিগুলি আধ্যাত্মিক হয়, তবে জয়দেব থেকে দাশরথি রায় পর্য্যন্ত সকল কবিই সমান আধ্যাত্মিক। আর যদি আত্মা অর্থে আমাদের সাংসারিক মনের অতিরিক্ত কোনও বস্তু বোঝায় তা'হলে ও সব কবির লেখায় আধ্যাত্মিকতার লেশমাত্র নেই। ও-শ্রেণীর কবিতা পড়ে যাঁদের হৃদয়মন উল্লসিত হয়ে উঠে তাঁদের অবশ্য আমি দোষ দিইনে, কেন না যা নিতান্ত human তা' humanity-কে আকৃষ্ট করবেই। তবে গেরস্ত মনোভাবই যে মানুষের একমাত্র সম্বল তা' নয়,—যাকে আমরা spiritual বলি তাও মানুষের মনোভাব, অতএব তাও human—তবে তা' সকলের মনোভাব নয় বলে তাকে abstraction বলে উড়িয়ে দেবার প্রবৃত্তি সহজ মানুষের মনে সহজেই আসে। আমাদের শাস্ত্রের মধ্যে উপনিষদই হচ্ছে পুরোপুরি spiritual সুতরাং উপনিষদের ভাবে অনুপ্রাণিত হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়—সুতরাং বৈদান্তিক মনোভাব অনেকের কাছে অবজ্ঞার পদার্থ। এত হবারই কথা। এই জন্যেই সে কালে উপনিষদকে গুহ্যশাস্ত্র করে' রাখা হয়েছিল।

যে যাই হোক, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত মহাশয় যে বলেছেন যে "বৈষ্ণবেরা উপনিষদকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না" একথা শুনে বড়ই আশ্চর্য্য হলুম। এ সত্য সম্ভবতঃ তিনি "বৈষ্ণব নয়" "বোষ্টমের" কাছ থেকে উদ্ধার করেছেন। আমার বিশ্বাস ছিল যে এ-জ্ঞান শিক্ষিত লোকমাত্রেরই আছে যে বেদান্তই হচ্ছে বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল দর্শন। রামানুজ, বল্লভাচার্য্য প্রভৃতিরা বেদান্তের জগদ্বিখ্যাত টীকাকার; আর ভারতবর্ষের অধিকাংশ বৈষ্ণবই, হয় বল্লভাচার্য্য নয় রামানুজ পন্থী। "আমি বেদান্ত মানি কিন্তু আচার্য্যকে মানিনে" একথা সার্ব্বভৌমকে স্বয়ং চৈতন্যদেব বলেন। এখানে বেদান্ত অর্থে উপনিষদ্ এবং আচার্য্যের অর্থ শঙ্কর। শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ শুধু চৈতন্য নন এ ভূভারতের কোনও বৈষ্ণবগুরু কস্মিন্‌কালেও মানেন নি; কেন না, তাঁদের মতে অদ্বৈতবাদ আসলে প্রচ্ছন্ন শূন্যবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। চৈতন্যদেবের মতে ছান্দোগ্য উপনিষদের 'তত্ত্বমসি' এই বচনটী সমগ্র উপনিষদের সকল কথার বিরোধী। এবং ঐ একটা বচনের উপর শঙ্কর তাঁর সমস্ত ভাষ্য খাড়া করেছেন। যে মতে জীবাত্মা পরমাত্মার ভেদ ভ্রমাত্মক, সে মতের উপর কোন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করা যায় না, সুতরাং অদ্বৈতবাদের বিরোধী হওয়ার অর্থ উপনিষদের বিরোধী হওয়া নয়।

দ্বৈতবাদ বিশিষ্টদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এই তিন মতের উপর বৈষ্ণবধর্ম্মের তিনটী শাখা প্রতিষ্ঠিত এবং এই সকল মতেরই মূল হচ্ছে উপনিষদ্। সম্ভবতঃ কৃষ্ণবিহারী বাবু দ্বৈতবাদ অর্থে বোঝেন, সাংখ্যমত যার মূল কথা হচ্ছে পুরুষ-প্রকৃতির ঐকান্তিক প্রভেদ। তান্ত্রিকধর্ম্ম অবশ্য এই মতের উপর প্রতিষ্ঠিত সুতরাং তান্ত্রিকদের ধর্ম্মসাধনার একটী প্রধান অঙ্গ হচ্ছে পুরুষ-প্রকৃতির মিলন। "যত্র জীব তত্র শিব, যত্র নারী তত্র গৌরী" এ হচ্ছে তান্ত্রিক মত, বৈষ্ণব মত নয়।

তবে কোন কোন বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে, প্রকৃতি নিয়ে সাধনার কথা যে নেই তা নয়। অন্ততঃ সহজিয়া মত ঐ তান্ত্রিক মতেরই রূপান্তর। চণ্ডীদাস সহজিয়া ছিলেন, এই কথাটা মনে রাখলে আমরা অনেক পদাবলীর ভিতরকার কথা সহজেই বুঝতে পারব। কিন্তু খাঁটি বৈষ্ণবধর্ম্মের সাংখ্যদর্শনের সঙ্গে কোনই সম্পর্ক নেই এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে মানুষের হাতে কেন সহজেই প্রকৃতি-পুরুষ হয়ে ওঠে তা বোঝা কঠিন নয়—

—আমাদের প্রবৃত্তিই আমাদের ভুল করায়। আমি ব্রজরেণু পড়িনি, সুতরাং সে বইয়ে কি আছে তা নেনে—তবে আপনার সমালোচকদের কথা থেকে পরিচয় পাওয়া যায় যে উক্ত কাব্যের সঙ্গে ভাব পরিচয়-পত্রের বিশেষ কোন যোগাযোগ নেই। তাই যদি হয়, তা' হ'লে আপনার প্রবন্ধ নিয়ে এত গোলমাল করা হচ্ছে কেন, বুঝ্‌তে পার্‌লুম না।"

অতঃপর বৈষ্ণব-সাহিত্য ও জয়দেব-সম্বন্ধে রাধাকমল বাবুর মোদ্দাকথাগুলি পরীক্ষা করে দেখ্‌বার সময় এসেছে।

শ্রীযুক্ত অজিতকুমার বাবুর সঙ্গে শ্রীযুক্ত রাধাকমল বাবুর মসীযুদ্ধ সম্প্রতি কিছু প্রবলভাবেই চলেছে; এরই মাঝখানে বৈষ্ণব-সাহিত্য নিয়েও একদফা বকাবকি হয়ে গেল।

অজিত বাবু বল্লেন—বৈষ্ণব সাহিত্যের যা-কিছু মালমসলা তা' কামাগ্নিতেই ইন্ধনের যোগান্‌। রাধাকমল বাবু বলেন— বটে এতবড় আস্পর্দ্ধার কথা! ও সমস্তই হচ্ছে একেবারে তুরীয় অবস্থার অকৃত্রিম দৃষ্টান্ত। ওর মধ্যে খানাখন্দোল ডিবিডাবা কিছুই নেই—সমস্ত বৈষ্ণব বাবাজিরাই এক একজন মুক্তপুরুষ। অজিত বাবুর 'রায়'ও একপেশ্‌টা, সুতরাং রাধাকমল বাবুর জবাবও তাই পাল্টা জবাব। কিন্তু এসব লেখালেখি পড়ে বঙ্গ সরস্বতী সম্ভবতঃ বল্‌বেন—"লেখ্‌বার সময় তোমরা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে লেখো না, কাব্যের বুকের দিকে চেয়ে লিখো, এবং সে সমস্ত লেখায় আমি তোমাদের মনের মধ্যে থেকে সাড়া দিচ্ছি কি না সেইটাই বিশেষ করে দেখো"।

বস্তুতঃ, বৈষ্ণবসাহিত্য বিচারে এই উভয় পক্ষের কোনো পক্ষ অবলম্বন কর্‌তেই আমার সাহস নেই।

"আলোচনী"তে রাধাকমল বাবু 'রসতত্ত্ব' ব্যাখ্যা-কল্পে যথেষ্টই পরিশ্রম করেছেন। তত্ত্বব্যাখ্যায় তাঁর বিশেষ কোন খুঁত ঘটেছে, এমন মনে হয় না,—সুতরাং তত্ত্বের দুর্ভিক্ষ যাঁদের মনে আছে, রাধাকমল বাবুর চেষ্টা তাঁদের সেই তত্ত্ব-ক্ষুধা নিবৃত্ত কর্‌তে পার্‌বে। কিন্তু 'রসতত্ত্বের ব্যাখ্যা' আর 'রসানুভূতির সঞ্চার' একেবারেই এক জিনিস নয়—এবং এই নিয়েই দার্শনিক বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি 'ইক্‌' ভাগান্ত দলের সঙ্গে কবির প্রভেদ। এ-প্রভেদ-বোধ যে রাধাকমল বাবুর ধারণাক্ষেত্রে বড় বেশী স্পষ্ট নয়, তা তাঁর নির্ব্বাচিত অতুলনীয় কবিত্ব-নিদর্শন ও তৎসংলগ্ন উক্তিটুকু থেকেই দেখানো যেতে পারে।

"এ ভূমি-আকাশ আদি চৌদ্দভুবন
সুরলোক, নাগলোক, নরলোকগণ,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গোলক আদি যত ধাম,
মুখের ভিতর সব দেখ নিরমাণ॥ তত্ত্বকথাকে পদ্যে গেঁথে বল্‌লেই যদি তা'

সাহিত্য হয়ে উঠ্‌তো, তা হ'লে—

"কুড়োবা কুড়োবা কুড়োবা লিজ্জে
কাঠায় কুড়োবা কাঠায় লিজ্জে
কাঠায় কাঠায় ধূল পরিমাণ
দশ বিশ গণ্ডা হয় কাঠার প্রমাণ"—

এই তথ্যপূর্ণ পদ্যটুকুকেও অতুলনীয় সাহিত্য হিসাবে গ্রাহ্য করা শক্ত হ'ত না। কিন্তু রাধাকমল বাবু ধমক দিয়ে বল্‌ছেন— 'শিশুর ঐ বিশ্বলীলার ভাব কি কোনো সাহিত্যে আছে না ধর্ম্মে আছে!" যা' নিজগুণেই সাহিত্য ও ধর্ম্মের চেয়ে সাহিত্য তত্ত্ব ও ধর্ম্ম-তন্ত্রেরই প্রতি অধিকতর মমতাযুক্ত, তা যদি সাহিত্য ও ধর্ম্মে না থাকে তা'হলে অবশ্যই ক্ষুব্ধ হবার কারণ নেই। কিন্তু সেটী যে "শিশুর বিশ্বলীলার ভাব"? দেখা যাক্—ও বস্তু পড়ে কোন্ ভাব-চিত্র মনে জাগে।

শিশু বল্‌তেই একটী মানব-শাবক মানসক্ষেত্রে উদিত হল। সে-শিশুটীকে হাঁ করিয়ে তার মুখ-গহ্বরটী মনের মধ্যে এঁকে নেওয়া গেল। সে গহ্বর যত বড়ই রাক্ষুসে হোক্ না কেন, মুখ-গহ্বর যখন, তখন অবশ্যই মানুষের মনে একটা 'সীমাবদ্ধ' স্থানেরই ছবি ফুটে উঠ্‌ছে। কিন্তু যখন সেই গহ্বরের মধ্যে 'অনন্ত' ব্রহ্মাণ্ড গোলক দেখ্‌বার হুকুম এল, তখন পাঠকদের চক্ষুতারকাও দেখ্‌তেদেখ্‌তে কপালে উঠে পড়্‌ল, অথচ ঐ সীমাবদ্ধ মুখের ছবিটার মধ্যে অসীম ব্রহ্মাণ্ডের দৃশ্যপটখানা গুঁজে দেখ্‌তে পারা কোনমতেই ঘটে উঠ্‌লো না। বলা বাহুল্য ও-অস্বাভাবিক দৃশ্য চর্ম্মচক্ষেও দেখতে পাবার নয়—দিব্য চক্ষেও দেখতে পাবার নয়,—যদি দেখা যায়, তবে সে ঐ উভয়-জাতীয় চক্ষুধর্ম্মেরই মাথা খেতে পারলে। লৌকিক মনোভাবকে অলৌকিক ভাষায় প্রকাশ করলে মজা হয় বটে; কিন্তু তাতে সাহিত্যও হয় না কিম্বা ধর্ম্মের ধারণাও সঞ্চারিত হয় না।

ও-বস্তু হচ্ছে সৃষ্টি সম্বন্ধে একটু তত্ত্বকথা এবং ওর মূল তন্ত্রশাস্ত্রে পাওয়া যায়। সাংখ্যদর্শনোদ্ভূত শক্তিতন্ত্রে প্রকাশ যে, শক্তি হচ্ছেন সেই আদি মাতা যিনি নিজে সৃষ্টিকে নিজেই গ্রাস করে থাকেন। মহাকাল সম্বন্ধেও একথা আমরা শুনে আস্‌ছি।—কাল যে সর্ব্বগ্রাসী এবং ভক্ষণ-শীলতাই কালধর্ম্ম, একথা রক্ষণ-শীলের দলও, মুখে না মানুন মনে মনে জানেন। থিওসফি'র Occultism এ একটী গোলাকৃতি সাপের ছবি দেখা যায়, যাতে ঐ সাপটীর লাঙ্গুল তার মুখের মধ্যে প্রবিষ্ট। এ-সমস্তই হচ্ছে সৃষ্টিচক্রটার সম্বন্ধে একটা তত্ত্বকথা মাত্র। তত্ত্ব বুদ্ধি যে কোনো তত্ত্বগ্রন্থ পড়লেই পাওয়া যায়,—কিন্তু কবিত্ব বা ভাবুকতা অত সস্তাদরে পাওয়া যায় না।

কিন্তু জয়দেবকে কিভাবে বিচার করলে যে সে বিচার সত্য ও বৈজ্ঞানিক হবে, রাধাকমল বাবু তার একটী সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন। সূত্রটী একেবারেই হেসে উড়িয়ে দেবার মতন নয়, কেননা ছাইতে না জান্‌লেও আমরা যে গোড় চিনি, তার দৃষ্টান্ত তাঁর উক্তিটীতে পাওয়া যাচ্ছে। রাধাকমল বাবু ভাবে একটী প্রকাণ্ড সত্যের রগ ঘেসে বেরিয়ে গিয়েছেন তাতে আমি খুবই পুলকিত হয়ে উঠেছি, এবং তা, এই দেখে যে উপাসনার অন্য কোনো উপাসকই সত্যের এত কাছাকাছি ঘুরছেন না। অপর পক্ষে, এই ভেবে ক্ষুব্ধ না হয়েও থাকতে পারছিনে যে তাঁর বুদ্ধি যা ধরেছে, তাঁর দৃষ্টি তা' চিনতে পারেনি।

Freud পড়ে রাধাকমল বাবুর ধারণা জন্মেছে যে জয়দেব মদন-ভস্ম করেই মদনোৎসব বর্ণনা করেছিলেন; সুতরাং আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন যে তোমরা আপনাপন অনুভূতিকে অবিশ্বাস করে' Freud এর মাথাকে বিশ্বাস কর এবং গীত গোবিন্দকে হৃদয়ে আসন না দিতে পারলেও ও-বস্তুকে মাথায় রাখ। অবশ্য, রাধাকমল বাবুর সুনজরে পড়্‌বার জন্যে ও-কাজ করতে আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু উপাসনার ললাট-লিপি কি এর উল্টো কথাই বলছে না—"তুমি আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর—অটল অচল বিশ্বাসের শক্তি" ইত্যাদি? এতদিন পরে শোনা গেল যে জয়দেব-বিচার দেশী বিদ্যার কর্ম্ম নয়, ওজন্যে Freud এর শরণাপন্ন না হয়ে আর উপায়ান্তর নেই! উত্তম প্রস্তাব।

বেচারী জয়দেব অবশ্যই Freud পড়বার সুবিধে করে উঠ্‌তে পারেন নি, কিন্তু Freudian মনস্তত্ত্ব যখন মানুষের মন ছাড়া নয়, এমন কি মানব মনোবৃত্তিরই একটা বিশেষ প্রণালীর যোগাযোগ বিবৃতি, তখন না পড়ে পণ্ডিত হওয়াও অবশ্যই আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু—

Freudian মনস্তত্ত্বের কাঠামো-খানার বা জমিটার ওপর দিয়ে যেভাবে মনোবৃত্তিগুলিকে মুক্তি দিলে তাঁর কাম-বর্ণন ও পাঠকের চক্ষে নিষ্কাম-বর্ণ-চিত্র ভাসিয়ে তুল্‌তে পার্‌তো, জয়দেবের চিত্রাঙ্কনে তার আভাস আছে কি? তাঁর বিলাস-কলার রস-সম্ভোগ পড়ে পাঠকের মনে অনাবিল ও বৈরাগ্য-প্রতিষ্ঠ আনন্দরসের উদ্রেক হয় কি? রাধাকমল বাবু বল্‌বেন—যদি না হয় তবে সে তোমাদেরই দোষ।' এ-অপবাদ পাঠকেরা শিরোধার্য্য করতে প্রস্তুত। কিন্তু কবির প্রেরণাবল পাঠক চিত্তে "তুরীয়" অবস্থার সঞ্চার করবে না, পাঠকেরাই অনাত্ম চেষ্টাবেষ্টা করে' 'তুরীয় অবতার' হয়ে আস্‌বে, এবং কবি যা করে' উঠ্‌তে পারেন নি, নিজগুণেই তা' ধরে নেবে—এই রফাই যদি সত্য হয়, তবে কবি-মহাশয় আর কষ্ট করে নাই বা কাব্য লিখ্‌তেন? দুনিয়ার লালসা-চিত্র তো দুষ্প্রাপ্য নয়? সাহিত্য-সমাজে, যেখানে-যা-কিছু কাম সম্ভোগ আছে সে সবই তো ও-ক্ষেত্রে আমরা কাম-বিজয়ের দৃষ্টান্ত বলেই ধরে নিতে পার্‌তুম! রেনল্ড সাহেবই বা তা হ'লে এমন কি অপরাধ করেছিলেন যে ব'রিশালের অশ্বিনী বাবু তাঁর ভক্তিযোগ গ্রন্থে Mysteries of the Court of London বইখানার স্মরণটা পর্য্যন্ত নিষেধ করে দিয়েছেন? রাধাকৃষ্ণের নাম না থাকার জন্যেই কি?

মোটকথা,-জয়দেব তাঁর কাব্যে রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের যে অনুভূতি দেখিয়েছেন, তাতে Freud এর প্রপিতামহ ও তাঁকে উদ্ধার কর্‌তে পারেন না; তবে একথা খুবই ঠিক্ যে কাম-সম্ভোগকেও নিষ্কাম-বর্ণে কাব্যাকৃতি দেওয়া যায় এবং শুধু রবীন্দ্রসাহিত্যে কেন, সমগ্র বঙ্গসাহিত্যেই ও-জাতীয় চেষ্টার নিদর্শন নেই।

সে যাই হোক্, এ আশ্বাস রাধাকমলবাবুকে নির্ভয়েই দেওয়া যেতে পারে যে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীটা, (তা' হোক্ সে অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া) অনতিবিলম্বেই ফলে যাবে—নিষ্কামবর্ণে বিরঞ্জিত কামচিত্র আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যই প্রসব করবে এবং তার সূচনা দেখা গিয়েছে।

অবশ্য রাধাকমল বাবু যে-দলের মুখ চেয়ে আছেন তাঁদের তরফ থেকে এই দুঃসাধ্য-সাধন হবার কোনো আশা নেই; তা' ছাড়া, জয়দেবের নামে জয়ঢাক পিটিয়েও লাভের আশা দেখা যাচ্ছে না। আপাততঃ সম্ভোগ-বিষয়ে জয়দেবের রাধিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা-চিত্রটি মিলিয়ে দেখ্‌লে, আশা করি, তিনি বিশেষ একটা কিছু দেখ্‌তে পাবেন। তার আর কিছু না হোক, তুরীয়-অবস্থার বাড়ী যে কোন পথে তার কিঞ্চিৎ ইসারা আছে।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

প্রতিবাদ নহে,---আত্ম-নিবেদন।
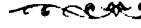
বিগত কার্ত্তিকের 'উপাসনা'য় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় মহাশয়ের 'আলোচনা, প্রতিবাদ নহে' প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এ আত্ম-নিবেদনের আবশ্যকতা উপলব্ধি হইয়াছে। 'পরিচারিকার' জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত "বিস্মৃত দেশে" শীর্ষক কবিতাটিকে, রায় মহাশয় সম্পাদিকার রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; আষাঢ়ে 'উপাসনা'র সমালোচক "ত্রি-শঙ্কুর" এক-শঙ্কু মহাশয়ও কবিতাটিকেও সম্পাদিকার কিনা সন্দেহ করিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন,—"ইহা কি সম্পাদিকার ?" সম্পাদিকার নামীয় আমাদের একাধিক লেখিকা ; তাঁহাদের প্রবন্ধের স্বাতন্ত্র রক্ষার জন্য, আমরা সম্পাদিকার রচনার শেষে নামোল্লেখ করি না, কেবল সূচীতে সম্পাদিকার নামোল্লেখ থাকে, এবং যে লেখক বা লেখিকা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তাঁহার প্রবন্ধ শেষে মাত্র "শ্রী—" সংযোজিত হয়। আলোচ্য কবিতাটি 'দিদি', "অন্নপূর্ণার-মন্দির," প্রভৃতি প্রসিদ্ধ উপন্যাস রচয়িত্রী শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবীর ; কবিতা শেষে তাহার নামোল্লেখ আছে। ইহা অবশ্যই শঙ্কু মহাশয়ও লক্ষ্য করিয়াছেন। পরিচারিকার "প্রথম পাতে" প্রকাশিত সম্পাদিকার কবিতা সমালোচনা কালে তাঁহার দ্বিধাহীন মন্তব্যই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহার পরও যে কেন তাঁহার মত মেধাবীর 'বিস্মৃত দেশে' বিস্মৃতি আসিল, তাহার নিদান জটিল ! আজকাল কথার বাহারে সমালোচনার বাহার,—তাহাতে আবার যদি মুরুব্বিয়ানার দুই চারিটি বোলচাল থাকে—সে ত সোনার সোহাগা ! সমালোচ্য বিষয়ের সহিত তাঁহার উক্তির সামঞ্জস্য থাকুক আর নাই থাকুক, পরচর্চ্চার রসানে আত্মম্ভরিতা মজ্‌গুল করিয়া মুখে সৎসাহসের লম্বা-চওড়া বক্তৃতা,—উদারতা জোর গলায় প্রচার করিতে পারিলেই সমালোচনার সার্থকতা ! সমালোচক ত্রি-শঙ্কুর এক-শঙ্কু—(শঙ্কু অর্থে ত শল্য,—মুড়াগাছ,—কলুষ,—শিব,—বিক্রম-দিত্যের নবরত্নের একরত্ন বা তাঁহার ক্রূরমতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা !—"উপাসনায়" ইহাদের তিনের কোন্ কোন্‌টির সমাহার ? "পরিচারিকার" পরিচর্য্যায় কোন্ মহাপুরুষ ?) শল্য বা শিব যাহাই হউন,—তিনিও যে আজকালকার তথা-কথিত লোক-মজান সমালোচনার আর্টের খাতিরে "বিস্মৃত-দেশে" সাধ করিয়া সন্দেহ-দোলায় দোল খাইয়াছেন, তাহা আমার ন্যায় নিরেটের নিকটও জাজ্বল্যমান ! ছোট বেলায় একশ্রেণীর কবিতা দেখিতাম—কবি, বর্ণিত বস্তুতে জগতছাড়া যত অসম্ভাব্য গুণের বর্ণনা করিয়া, শেষে—"বুঝিয়াছি"—মন্তব্যে উদ্দাম-বিকট কবিত্ব-উচ্ছ্বাসের একশেষ করিয়া ছাড়িতেন,—

অথ—পদ্মা-বক্ষে প্রদীপ ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া—ইতি শিরোনামা !

আরম্ভে—

"কোথা হতে আসিতেছ হে বর্ত্তিকা তুমি !"......ইত্যাদি ইত্যাদি।

শেষে—

সেই "বুঝিয়াছি—বর্ত্তিকা নহ ত কভু স্বরগ-দেউটী,
দেবতার আশীর্ব্বাদ—এসেছ ধরায়"—ইত্যাকার !

আমাদের সমালোচক শঙ্কু মহাশয়ও "বিস্মৃত-দেশকে" সম্পাদিকার বলিয়া সন্দেহ করিয়াই তখনি আবার বুঝিয়াছি বলিয়াই বলিতেছেন—"বোধ হয়—না,—কারণ সম্পাদিকার রচনায় ছন্দোদোষ আমরা দেখি নাই;

এই কবিতায় বহুবার ছন্দঃপতন হইয়াছে।”—অতএব স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ হইল যে উহা সম্পাদিকার নহে!—সঙ্গে সঙ্গে সমালোচক মহাশয়ের গভীর ছন্দোজ্ঞানের সুপ্রতিষ্ঠাও হইয়া গেল; একঢিলে দুটী পাখী মারা ইহাকেই বলে! কিন্তু তখন কে জানিত রাখালবাবু আবার হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিবেন। সমালোচক নিরঙ্কুশ,—তাঁহার জ্ঞান থাকুক আর নাই থাকুক, তিনি যে সমালোচক,—সবজান্তা,—তাঁহার কথায় প্রতিবাদ? এত সাহস সকলের হয় না! রাখালবাবু কি জানেন না,—

দ্বাপরে ছিল—

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্”—

এখনকার কিমাশ্চর্য্যম্—মানুষের আয়ুর অপরিমেয়তা-কল্পনাকেও হার মানাইয়াছে। স্থূল-বুদ্ধিতে শাশ্বত তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির কল্পনাই কলির কিমাশ্চার্য্যমতঃ পরম্! অনধিকারীর মন্তব্যের মূল্য কতখানি—তাহা বুঝিবার আবশ্যক নাই? মহাত্মা রামকৃষ্ণ দেব এই জন্যই ত বলিয়াছেন—'বাবা—প্রচার কর্‌বার আগে চাপ্‌রাস চাই!” এখন সে চাপ্‌রাসের ধার কেহ ধারেন না! সমালোচককের গা ঢাকা দিলে চলিবে না—তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমেই নিজগুণে সকলের ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া প্রবীণের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে,—তবে না তাঁহার কথার মূল্য? শঙ্কু মহাশয় হয়ত সে শক্তি যথেষ্ট আহরণ করিয়া থাকিবেন,—তিনি আত্ম-প্রকাশ করিলে তাঁহার বাক্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে বলাই বাহুল্য। তিনি যিনিই হউন, যাহাই হউন বাক্যে তাঁহার মোহিনীত্ব থাকুক বা নাই থাকুক—তিনি যে আমাদের চক্ষে শিব—তাহা সত্য। নিজগাত্রে ভস্ম মাখিয়াও পরোক্ষে তিনি পরোপকারব্রতী; শিব-শঙ্কুর উদারতাই আমরা তাঁহার নিকট আশা করি। কবিতা ছাপার কারচুপি,—এ টাইপটা ভাঙ্গা—সেটা অস্পষ্ট—বাঁকা কি সোজা—এ কবিতা আগে ছাপাইলে ভাল হইত—ওটা-পাইকায়, ওটা-স্মলপাইকায় কেন,—এ সকল অসার আলোচনা অন্যের পক্ষে বিশেষভাবে আলোচ্য হইলেও তাহা কাব্য-সমালোচকের আলোচনার সম্পূর্ণ অযোগ্য। সমালোচক দেখিবেন কবিত্ব-প্রতিভা,—অর্জ্জুনের মত তাঁহার নয়ন থাকিবে কেবল সেই লক্ষ্য-স্থলে। তিনি কবি,—মুখে তাহা স্বীকার নাই করুন—“আমরা নিজে কবি নহি”—অন্যে তাঁহাকে কবি অখ্যাতি (!) দিবেই। কবিতা রচনাকারী (Versifier) তিনি না হইতে পারেন,—কবি তিনি নিশ্চিত! যিনি কবি ন'ন, কাব্যামৃত পানে যিনি আত্মহারা তন্ময় ন'ন, কবিতা-মাধুর্য্য যিনি অনুভব করেন নাই,—কবিতা সম্বন্ধে তাঁহার মতামতের আর মূল্য কি! তিনি সত্যই শঙ্কু = শল্য,—শিব ন'ন। সতীর গলিত-নশ্বর-মৃতদেহ আপনার অধিক জানিয়া প্রেমভরে যে ভোলা বিশ্ব ভুলিয়া ত্রিলোকে উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করিতে পারেন না—যিনি কেবল বস্তুর বাহ্য-কঙ্কাল লইয়া ব্যস্ত, তাঁহার নিকট “গুঞ্জন করে রুদ্ধ বক্ষে মহা ওঙ্কার মন্ত্রধ্বনি” সত্যই দুর্ব্বোধ! ভাব-পুলকে ভক্তের নির্ব্বাক সমাধি—নির্ব্বাত-নিষ্কম্প প্রদীপবৎ ধীর স্তম্ভিত ভাব যিনি ধারণায় আনিতে অনিচ্ছুক,—কুলু-কুলু-নাদিনী মুখর-তটিনী কিরূপে মহাপারাবার-বক্ষে মূক হইয়া বিলীন হয়,—“বচনাতীতেরে সঁপিলে বচন বেসুর শুনাবে প্রাণের গীতি” কি তাহা তাঁহার অনুভবের বাহিরে। কাব্য সমালোচনা তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনা।

সমালোচকের চক্ষে—আমরা সম্পাদিকার কবিতা প্রথম পাতায় ছাপিয়া অপরাধী,—এ অনুযোগ নূতন নহে—পুরাতন সমালোচকের উক্তির প্রতিধ্বনি!—বাঁধাবাধি কেতায় হয়ত দোষও হয়—কিন্তু আমরা অপরাধের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। “প্রথম পাতে” সম্পাদিকার লেখা প্রকাশিত হইলে 'বিনয়ের অভাব সূচিত হয়!' কেন? প্রথম পাতটা কি বহুরূপী? যে প্রথম পাতে পত্রিকা সূচনায় সম্পাদিকাকে বিনয়ের

সহিত আত্মনিবেদন করিয়া স্বস্তিবাচন করিতে হয়,—বর্ষারম্ভে যে পৃষ্ঠাটিতে সে ধ্বনি বর্ষে বর্ষে ঝঙ্কৃত হয়,—যেই পৃষ্ঠাতেই সম্পাদিকা বিবিধ উপচারে অর্ঘ্য রচনা করিয়া, ওঙ্কার ধ্বনি উচ্চারণ অন্তে অন্য মাসে কার্য্যে ব্রতী হন যদি, তাহা কি বিনয়ের অভাব,—না—ভক্তের দীনতা? পেটুক ব্রাহ্মণ, এ-পক্ষ-—এ-সকল দ্বন্দ্ব কলহের সার্থকতা বুঝি না,—বড় ভোজেও প্রথমেই ত ভাগ্যে জোটে শাক-শুক্তো,—শেষে গলাধঃকরণের শক্তি হারাইলে মিষ্টান্ন -পক্কান্ন! ঔদরিকের আপশোষের কারণ হইতে পারে—কিন্তু রসনা-তৃপ্তিকর ত সমস্তই। আর যেখানে "মেনু" মাহাত্ম্য বিরাজিত সেখানে ত কথাই নাই!—মনটা যদি মেঠাই আদিতে যায়—পাত ঘুরাইয়া মনোমত পাত্রে লাগিয়া গেলেই গোল চুকিয়া যায়! বাস্!

আর এক কথা,—যিনি শুধু লেখক নন, পত্রিকার মুদ্রাঙ্কন ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট,—তিনি জানেন—স্থান নির্দ্দেশ-ব্যাপারে পরিচালকগণের স্বাধীনতা কতদূর,—বিশেষতঃ মফঃস্বল প্রেসে:—অনেক সময়ই পৃষ্ঠা গণিয়া অবস্থা বুঝিয়া স্থান সঙ্কুলানের ব্যবস্থা করিতে হয়। সমালোচক মহাশয় সে সকল গণনায় আনিলে "বিজ্ঞাপনদাতাদের ন্যায়" তাঁহাকে অগ্র পশ্চাৎ লইয়া এত কথা অনর্থক ব্যয় করিতে হইত না। ভবিষ্যতে তিনি এ সকল বাহ্যিক সমালোচনা বিরত না হইয়া কবিতা সমালোচনায় যদি মন দেন, তাহা হইলেই আমরা উপকৃত হইব। কলহ ও পরচর্চ্চায় কুপ্রবৃত্তিমূলক একটি বিকট উত্তেজনা আছে, সত্য কিন্তু বিমলানন্দ তাহাতে নাই। সাহিত্যের লক্ষ্য বিমলানন্দে, পরিণতি আনন্দে, সাহিত্য চর্চ্চার চরম সার্থকতা সেই আনন্দ-সুধা পানে। সাহিত্যামোদী মাত্রই আনন্দ-মন্দিরের যাত্রী,—কলহ-বিবাদ-কালিমা কখনই তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না; সহযাত্রীর, সহকর্ম্মীর সহিত সে ভাব পোষণ প্রবৃত্তি আমাদেরও নাই। আমরা এতদিন নীরবই ছিলাম। বিনিময়ে "উপাসনা"ও আমরা যথাসময়ে প্রাপ্ত হই নাই, উহাতে একাধিক বার আমাদের একই লেখিকার রচনা সম্বন্ধে গোল হওয়ায় আমরা এ আত্ম-নিবেদনে বাধ্য হইলাম।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

কোচবিহার ষ্টেট্ প্রেসে শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও কোচবিহার সাহিত্য-সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
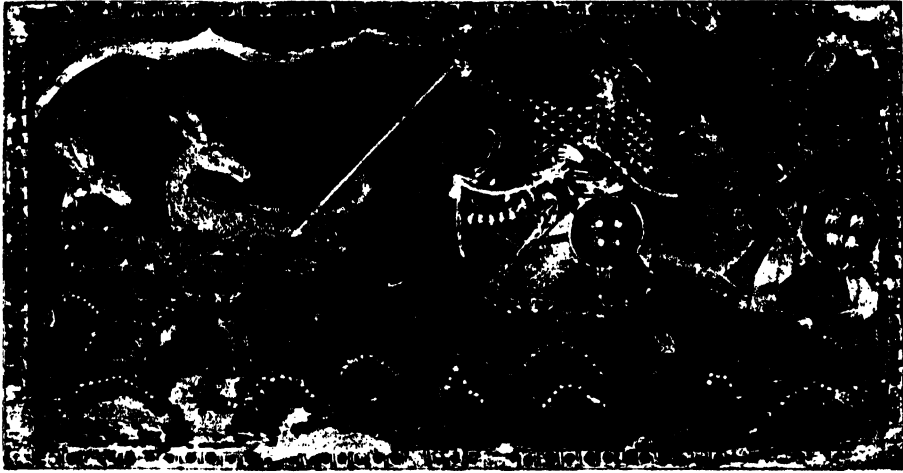
কলিঙ্গরাজকুমার অনঙ্গমোহন ও তাঁহার বন্ধু মন্ত্রীপুত্র আনন্দবিহারীর মৃগয়া।

(ভূতপূর্ব্ব কোচবিহারাধিপতি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ রচিত উপকথা নামক পুঁথির পাটায় অঙ্কিত গল্পের চিত্র।)

রাজকুমার অনঙ্গমোহন ও তাঁহার নবপরিণীতা পত্নী স্বপ্নবতীর স্বদেশ যাত্রা।

অগ্রে মন্ত্রীপুত্র আনন্দবিহারী।

(ভূতপূর্ব্ব কোচবিহারাধিপতি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ রচিত উপকথা নামক পুথির পাটায় অঙ্কিত গল্পের চিত্র।)

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

২য় বর্ষ। | মাঘ, ১৩২৪ সাল। | ৩য় সংখ্যা।

গান।

—:*:—

(বাউলের সুর)

ভেঙে মোর ঘরের চাবি
নিয়ে যাবি
কে আমারে ?
না পেয়ে তোমার দেখা
একা একা
দিন যে আমার কাটে না রে ॥
বুঝি ঐ রাত পোহালো,
বুঝি ঐ রবির আলো
আভাসে দেখা দিল গগন-পারে।
সমুখে ঐ হেরি পথ,
তোমার কি রথ
পৌঁছবেনা মোর দুয়ারে ॥

আকাশের যত তারা
চেয়ে রয় নিমেষ হারা,
জেগে রয় রাতপ্রভাতের পথের ধারে।
তোমারি দেখা পেলে
সকল ফেলে
ডুব্‌বে আলোক-পারাবারে ॥
প্রভাতের পথিক সবে
এল কি কলরবে ?
গেল কি গান গেয়ে ঐ সারে সারে ?
বুঝি রে ফুল ফুটেচে,
সুর উঠেচে
অরুণ বীণার তারে তারে ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

করুণ ও মধুর।

——(: :)——

(১)

করুণ-রস যে বাংলার প্রাণের-রস সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। "Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts" একথা আমাদের সম্বন্ধে যত খাটে এত আর কোন জাতির সম্বন্ধে নয়। আমাদের ব্যাকুল করা বাঁশীতে যে রাগিণী স্বতই বেজে উঠে, তাতে হাস্যরস ও বীররস বিবাদী। আমরা সে দুই রসে যে একেবারে বঞ্চিত তা বল্‌ছি না, তবে সে হচ্ছে আমাদের কথাবার্ত্তার রস, সভা-সমিতির রস; অন্তরের রস নয়। নির্জ্জনে যে রসের প্রস্রবণ আমাদের অন্তর হ'তে ছোটে—যাতে আমরা আকণ্ঠ ডুবে থাক্‌তে চাই—সে হচ্ছে করুণ-রস। সেই রসেই আমাদের সংসার-জ্বালা, মোহ-তৃষ্ণা, বাসনা-তাপ জুড়িয়ে যায়।

আমাদের ভক্তি, প্রেম, সবই করুণ-রসে মুখরিত। আমরা কেঁদে বলি "তনয়ে নেগো মা কোলে" বাষ্প-গদ্‌গদ কণ্ঠে কাণ্ডারীকে ডাকি—"পাতকী-তারণ তরীতে তৃষিত তাপিতে তুলিয়া লওগো।" আমাদের বিশ্বাস, আনন্দ, বৈরাগ্য এমন কি শান্তির ভিতর পর্য্যন্ত করুণ-রস। এ-রস ভিন্ন আমাদের কোন মনোভাব, কোন প্রবৃত্তি পূর্ণ বিকসিত হয় না। আমাদের আত্ম-সমর্পণে আক্ষেপ নেই, অনুতাপ নেই—কিন্তু অনুনয় আছে, আব্‌দার আছে। আমরা যখন সব চেয়ে সুখী তখন আমাদের প্রাণ সব চেয়ে কাতর। বড় দয়া পেলে আমরা তত কৃতজ্ঞ

হই না,—যত কাতর হই, বড় স্নেহে বঞ্চিত হলে তত ক্রুদ্ধ হই না,—যত ব্যথিত হই। আশা-নৈরাশ্যের সন্ধিস্থলে রাধার যা শেষ কথা আমাদেরও তাই :—

"মাধব হাম পরিণাম নিরাশা
তুহু জগতারণ দীন দয়াময়
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা"

পুরাণের রাধা যাই হো'ন্ কাব্যের রাধা খাঁটি বাঙ্গালী। তিনি মাধবের অনুগ্রহে সন্দিগ্ধ ন'ন। তিনি নিজেই বল্‌ছেন—"আজু বিহি মোরে অনুকূল হোয়ল, টুটল সবহু সন্দেহা।" তিনি জানেন—তাঁতে আর শ্রীহরিতে কোন প্রভেদ নেই—তিনি শ্রীহরিতেই লীন হবেন—"তোহে জনমি পুন তোহে সমাওয়ত, সাগর-লহরী সমানা"—তবু তাঁর এই পরিণাম নৈরাশ্য,-এই কাতরতা, এই ব্যাকুলতা।

কেন? এ-কাতরতার কোন মূল্য নেই—এ-ব্যাকুলতার কোন যুক্তি নেই—এটা স্বাভাবিক; কেবল রাধার নয়, সমস্ত বাঙ্গালীর মনের। এ-যদি দুর্ব্বলের স্বভাব হয়, হোক্—এ-দুর্ব্বলতার মধ্যেও প্রাণ আছে—মনুষ্যত্ব আছে। আত্ম-সম্ভ্রম বলি না দিলে প্রেম হয় না।

যা করুণ তাই করুণার উৎস—মানুষেরও, ভগবানেরও, এবং করুণাতেই ভালবাসার উৎপত্তি, অন্ততঃ অভিব্যক্তি। Pity soon melts the heart to love'. যিনি ভালবাসাকে ভালবাসেন তিনি করুণরসও ভালবাসেন—কারণ ভালবাসার প্রাণই হচ্ছে করুণ। প্রেমময়ী রাধার প্রাণের সব চেয়ে করুণ সুর হচ্ছে—"কানুর কলঙ্ক, জগতে হইল, জুড়াইব আর কোথা"—এবং এই করুণ সুরের উপরই তাঁর অটল প্রেমের অচল সৌন্দর্য্য প্রতিষ্ঠিত।

প্রণয়-রসের মধ্যে এই করুণ-রস আছে ব'লেই বৈষ্ণব কবিরা তাকে মধুর-রস বলেছেন। তাই তার ভিতর দাস্য, বাৎসল্য, সখিত্ব, এ সমস্ত রসেরই আস্বাদ বিদ্যমান্। আলঙ্কারিকরা তাকে আদিরসই বলুন আর অনাদি-রসই বলুন—তার অনন্ত মাধুর্য্যে বাঙ্গালীমাত্রেই মুগ্ধ। তাই, জগতের অন্য সব কাব্যও যদি একদিন আমাদের কাছে নীরস হয়ে উঠে, তবু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির পদাবলী নীরস হবে না; আমরা এখনও বলবো :—

"অমৃত নিছিয়া ফেলি, কি মাধুর্য্য পদাবলী, কি জানি কেমন করে মনে।"

(২)

কবিতায় চির-সুন্দরের আত্ম-বিকাশ। জলে, স্থলে, অন্তরে তাঁর যে অশরীরি সৌন্দর্য্য ছড়ান আছে—যা সূক্ষ্ম অথচ চিরন্তন, যা সকলের চোখে পড়ে না—তাকে ধরে ছন্দের মধ্যে সাকার ক'রে তুলে, 'সকলের সাম্‌নে দাঁড় করে' দেওয়াই কবিত্ব।

কবিতায় চির-সুন্দরের ঘনীভূত সৌন্দর্য্য যে উপলব্ধি করতে পারি ব'লেই কবিত্বে প্রাণ মুগ্ধ হয়—কি যেন একটা অব্যক্ত ভাব হৃদয়কে তোলপাড় করে। এ emotion এও কোন যুক্তি নেই—এ কাকেও বোঝান যায় না, এ শুধুই একটা আনন্দ, শুধুই একটা ব্যাকুলতা; এতে বুকের ভিতর একটা আন্দোলন, চোখে মুখে একটা জ্যোতি, দেহের উপর একটা রোমাঞ্চ এনে দেয়; 'একে তর্ক করে' ধরা যায় না, বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায় না—ব্যাখ্যা

করে' দান করা যায় না। এ শুধু অনুভবের জিনিষ! যে অনুভব করতে পারে, তারই মন কি জানি কেমন' করে' ওঠে'।

এই মন-কেমন-করা ভাব যা কাতর-করুণ সুরে ডেকে ডেকে আমাদের হৃদয়-দুয়ারে ঘা দেয়; তা বাইরে জগত হতে উৎপন্ন হয় না; তাই বাইরের শোক দুঃখের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক থাক্‌লেও সঙ্গতি নেই। তার কাতরতার ভিতর থেকেও কি যেন এক অলৌকিক আনন্দ-রূপের মধ্য হ'তে লাবণ্যের মত ঠিক্‌রে পড়ে।

মনোজগতের সৌন্দর্য্যালোকে এই যে করুণ ও আনন্দ রসের অপূর্ব্ব পুণ্য সঙ্গম, এইখানে স্নান করে' আমার দেহ মন প্রথম পবিত্র হয় যে দিন 'তাতল সৈকতের' সুর আমাকে কর্ম্ম-জীবনের তাতল সৈকত হ'তে বিচ্ছিন্ন করে' কল্পনার স্রোতে ভাসিয়ে নে' যায়—সেই কোন দূর অতীতের স্বপ্ন কুয়াসায় ঘেরা অনন্ত গভীর নীলিমার মধ্যে যেখানে রূপের সঙ্গে রস,—প্রেমের সঙ্গে ত্যাগ,—অভিমানের সঙ্গে অনুনয়,—বিশ্বাসের সঙ্গে আবদার,—মুরলী ধ্বনির সঙ্গে নূপুর নিক্কণ চিরকাল ধরে' ঝঙ্কৃত হচ্ছে। সে সুর সংকীর্ণ হলেও তীব্র, সূক্ষ্ম হলেও পরিপূর্ণ।

বিদেশীর কানে সে সুর হয় ত ভাল লাগবে না—বর্ত্তমান-বাদীরা হয় ত তাল পুরাণো বলে' নতুন রাগিণীর জমকালো মূর্চ্ছনার দিকে কান ফেরাবেন, কিন্তু এ ভাল লাগ্‌বে মধু তাঁর যিনি আমার মত এর অগাধ ব্যাকুলতা, অতলস্পর্শ ব্যঞ্জনার মধ্যে ডুবে গেছেন, যিনি আত্ম-নিবেদন ও আত্ম-সমর্পণের এক অখণ্ড পরিপূর্ণ সুরে বিভোর হয়ে আছেন। এর ভিতর সহস্র মনোভাবের ঐক্যতান না বাজুক, কিন্তু সেই একটি তান ভ্রমর গুঞ্জনের মত ধ্বনিত হচ্ছে—যা প্রাণের গভীরতম তারের সঙ্গে এক সুরে মেলানো। সে-তারের আশে পাশে উপরে নীচে যত বিদেশী তারই চড়াও না কেন, ভাষা ও ছন্দের চিকারা দিয়ে যত জোরেই তাতে ঘা দেও না কেন, সে সুর সব চেয়ে বেশী মিষ্টি লাগে, যখন ভুল করেই হোক্‌, ইচ্ছে করেই হোক্‌ তোমার আঙুল সেই তারটীর উপর গিয়ে পড়ে, যা বাঙ্গালীর কানে এত করুণ, বাঙ্গালীর প্রাণে এত মধুর। দেশের বীণায় দেশের যন্ত্রী যাই কেন বাজান না তাই আমি আপনার বলে' মেনে নিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু সে বীণা বৈষ্ণব কবিদের হাতে একতারা থেকেও যে প্রাণ-মাতানো কাজ-ভোলানো তান তুলেছে—আজও আমরা তার চেয়ে বড় বেশী দূর অগ্রসর হতে পেরেছি বলে' আমার মনে হয় না।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

নিরুত্তর।

—:*:—

আমি তোমায় খুঁজ্‌ব কোথায়
এই যে তুমি এই যে,
তোমায় ছেড়ে বিশ্বে আ-ার
তিল ঠাঁই আর নেই যে।
এরা বলে দেখাও তারে
কোথায় সে জন রয়েছে,
শোনাও মোদের তোমার প্রাণে
কোন্ কথা সে কয়েছে,
কি দেখাব কি বলিব
কি শুনাব হায় রে,
অবুঝ সাথে তর্ক করে
সময় বহে যায় রে।
কথায় এ কি ব্যক্ত হবে
স্পষ্ট হবে চক্ষে ?
এ কেবলি ভোগ করা যে
গোপন গভীর বক্ষে।
মন দিয়ে যে দেখা তোমায়,
মন দিয়ে যে পাওয়া ;
পাগ্‌লা-ভোলা স্পর্শবিহীন
হর্ষ-আকুল হাওয়া।
এদের কাছে হার মানি যে
দেখা শোনার দ্বন্দ্বে ;
তোমার কাছে হার মানি যে
অতল প্রেমানন্দে।

———

"অর্থম্ অনর্থম্"

বৈশাখ মাস। সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে রুদ্র বৈশাখ তাণ্ডব নর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিল। ঘোর দুর্য্যোগ! এমন সময় প্রৌঢ়া বারুণী পেট চাপিয়া ধরিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছিলেন। "উঃ মাগো! আরও কতদিন এ যাতনা সহ্য ক'রতে হবে?"...সঙ্গে সঙ্গে সেই বুকভাঙা তপ্তশ্বাস।

বাহিরে তখন ঘন অন্ধকারের মধ্যে বিপুল বারিপাত আরম্ভ হইয়াছে।

অকস্মাৎ বাহিরের দ্বারের কড়া নাড়ার শব্দ হইল। বারুণী কতকটা সুস্থতার ভাণ করিয়া উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। প্রভাতবাবু ধীরে ধীরে শ্রান্তপদে বাটীতে প্রবেশ করিলেন। বারুণী দেখিল স্বামী তাহার থর্ থর্ কাঁপিতেছেন!

"এই দারুণ বোশেখ মাসে একটা ছাতা নিয়েও কি বেরুতে নেই গা? দেখ দেখি, এই যে ভিজে ঝোড়-কাকটী হ'য়ে বাড়ী ঢুকুলে, এখন যদি একটা—ভগবান না করুন—ব্যামো-স্যামো হয়, তখন?"

বিষাদের মলিন হাসি হাসিয়া প্রভাতবাবু বলিলেন,—"গিন্নি, ছাতা কি আছে ছাই নিয়ে যাব? ছাতা মাথায় দেবার মত বরাত হ'ল কই বল? তা নইলে দু'দুটো...... .."

বাধা দিয়া বারুণী বলিলেন,—"থাক্ থাক্ যা হ'য়ে গেছে সে কথায় আর কাজ কি?...এ্যাঃ তোমার সমস্ত গা যে ভিজে গেছে দেখ্‌ছি। দাও দেখি আমায়, তোমার জামা-টামাগুলো এই; গামছাখানা দিয়ে গা-হাত মুছে ফেল ভাল ক'রে, তারপর কাপড়খানা ছেড়ে ফেল; আমি ততক্ষণ তামাক সাজি!"

প্রভাতবাবু পত্নীর নির্দ্দেশ মত গা-হাত মুছিয়া কাপড় ছাড়িতেই বারুণী এক কলিকা তামাক সাজিয়া তাহাতে ফুৎকার দিতে দিতে স্বামীর হুঁকাটী হাতে লইয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রভাতবাবু পত্নীর হাত হইতে কলিকাটা লইয়া হুঁকার উপর বসাইয়া ফুৎকার দিতে লাগিলেন। সহসা মুখ তুলিতেই তিনি দেখিতে পাইলেন বারুণী যন্ত্রণা-কাতর মুখে, দুইহাতে পেট টিপিয়া দাঁড়াইয়া আছেন; মুখে তাঁহার ঘর্ম্ম বিন্দু ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"কি হ'ল গিন্নি? ব্যথাটা বুঝি আবার বেড়ে উঠেছে, নয়?"

ততক্ষণ বারুণী কতকটা আত্মসম্বরণ করিয়াছিলেন।—"ও কিছু না, সেই যেমন হয় তাই আর কি!"—বলিয়া তিনি ঈষৎ চেষ্টার হাসি হাসিয়া সরিয়া যাইতে চাহিলেন।

প্রভাতবাবু তাঁহার গমনে বাধা দিয়া বলিলেন,—"হ্যাঁগা, বারু আজ এসেছিল? কি বল্‌লে বল ত'?"

"কি আর বল্‌বে? তুমিও যেমন! খেয়ে দেয়ে কাজ পেলে না বীরেন্ ডাক্তারকে ডাকতে গেলে, অনর্থক দু'টো টাকা দণ্ড!"

"তবু? কি ব'ল্‌লে শুনি!"

"বলব'খন রাতে, আগে খেয়ে দেয়ে নাও তারপর সে সব বাজে কথা হবে!"

"না, না, বলই না সে কি ব'লে গেল?"

"সে বলে গেল পেটের ফোড়া অস্ত্র ক'র্‌তে হবে, তাও আবার এখানে হবে না, কোলকেতায় মেডিকেল কলেজে যেতে হবে!"

সেটা যে প্রভাতবাবুর মত লোকের পক্ষে কতদূর সম্ভব তাহা তিনি ভালই জানিতেন; নিজের অক্ষমতা এবং সেই সঙ্গে অদৃষ্টের কথা ভাঁহার ভাবিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পতিত হইল। কি যে তিনি পত্নীকে বলিবেন তাহা ভাবিয়া পাইলেন না।

বারুণী স্বামীকে নিরুত্তর দেখিয়া পুনরায় বলিলেন,—"কোলকেতায় গিয়ে ফোড়া কাটান, সেত' বড় চাট্টিখানি টাকার খেলা নয়; তাই ত' বল্‌ছিলুন, ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে আমাদের সে লাখ টাকার স্বপ্নে কাজ কি বল?"

"সেই কথাই ত' ভাব্‌ছি বারুণী! এমন অভাগার হাতে পড়েছিলে যে বিনা চিকিৎসায় বিঘোরে প্রাণটা দিতে হ'ল। আমাদের মত অবস্থার লোকে বিয়ে যে কেন করে তা জানি না।"

"তোমার আর দোষ কি বল, যতদিন শক্তিসামর্থ্য ছিল ততদিন ত' প্রাণপাত ক'রে দৈন্য ঘোচাবার চেষ্টা ক'রেছ...তবু যে সেই হাহাকার দৈন্যদশা ঘুচ্‌ল না সে শুধু আমার অদৃষ্টের দোষে........"

"সে কথা বড় মিথ্যে বলনি বারুণী, তা নইলে দু'দুটে অমন জোয়ান সোমত্ত ছেলে থাক্‌তে আজ আমাদের কেউ নেই!"

"আহা, অমন কথা ব'ল না, বাছাদের অকল্যাণ হবে যে, তারা যাই হোক্ ছেলে ত'!"

"ছেলে?...তারা ছেলে? কি ব'ল্‌ছ তুমি বারুণী? অঘোরের মত যার ছেলে, তার ছেলে থাকার চেয়ে আঁটকুড়ো হওয়া ভাল! পেটে না খেয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাকে মানুষ ক'র্‌লুম সে কিনা শেষে একটা ইতর চোর হ'য়ে দাঁড়াল?...ফলে হ'ল কি? না, অত পরিশ্রমের ফলে আজ এই বুড়ো বয়েসে দুহাতে লোকের অভিশাপ কুড়ুচ্ছি হা ভগবান! তারপর ধম্মাটা যদিও একটু মানুষের মত হয়েছিল তাও, যেই সে চাকরীতে ঢুক্‌ল, যেই দু পয়সা হাতে এল অম্‌নি সে হতভাগা মা-বাপকে ভুলে গেল, অম্‌নি .. . ."

"আহা, কর কি ছাই! অমন ক'রে বাছাদের অকল্যাণ ক'র না! অঘোরের দোষ হ'য়েছে বটে...তা আর কি ক'রবে বল, সব মানুষের মতিগতি ত' আর সমান হয় না...যে যেমন অদৃষ্ট নিয়ে জন্মেছে সে ত' তেমনি ক'রবে। আর ধর্ম্মদাসকে দোষ দেওয়া তোমার অন্যায়। সে যে গোয়েন্দার চাক্‌রীতে ঢুকেছে তাতে সে নিজেই নাইবার খাবার সময় পায় না, তা বাপ মার খবর নেবে কি? হ্যাঁ, একটা কথা শুনেছ? ধম্মা আজ বাড়ী আস্‌বে বলে পাঠিয়েছে!"

"তবু ভাল, এতদিন পরে মা-বাপের কথা যে তার মনে পড়েছে সেই আমাদের যথেষ্ট!"—বলিয়া প্রভাতবাবু একটু কষ্টের হাসি হাসিলেন।

সহসা বারুণী উৎকর্ণ হইয়া কি শুনিতে লাগিলেন। তাহার পর ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"ওগো সদর দোরের কে যেন কড়া নাড়ালে। একবার উঠে দেখনা...বোধ হয় আমাদের ধম্মা এল।"

"কোথায় কড়া নাড়্‌লে? কই আমি ত কিছু শুন্‌তে পাইনি!"—বলিয়া প্রভাতবাবু রান্নাঘরের চালার দাওয়া হইতে নামিয়া সদর দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। বাহিরে তখন মুসলধারে বৃষ্টি হইতেছিল। সারা বাড়ীটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। মাত্র রন্ধনগৃহে একটী তৈল প্রদীপ ক্ষীণ আলোক-রেখা বিকীর্ণ করিতেছিল।

অন্ধকারে সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়া প্রভাতবাবু ধীরে ধীরে সদর দ্বার উন্মোচন করিলেন; দ্বারটা অল্প ফাঁক করিয়া তিনি ডাকিলেন,—"কে?"

ঠিক সেই সময় চাপা অথচ প্রায় কান্নার মতো সুরে বাহিরে কে বলিয়া উঠিল,—"আমি পথিক ঝড় বৃষ্টিতে পথ হারিয়ে ফেলেছি। যদি দয়া ক'রে আজকের রাতটা এখানে থাক্‌তে দেন তবে বড় ভাল হয়।"

প্রভাতবাবু দ্বার খুলিয়া বলিলেন,—"ভেতরে আসুন।"

দীর্ঘকোটে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া একটী যুবক বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রভাতবাবু পুনরায় দ্বার বন্ধ করিয়া অগ্রসর হইলেন,—"আসুন আমার সঙ্গে,—বড্ড অন্ধকার, দেখ্‌বেন যেন প'ড়্‌বেন না।"

আগন্তুক একটি ছোট্ট কথায় উত্তর দিল—"না।"

প্রভাতবাবু যুবককে সঙ্গে লইয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিলেন। বারুণী সেখানে ধর্ম্মদাসের অপেক্ষা করিতে ছিলেন; সুতরাং প্রভাতবাবু একেবারেই বলিয়া উঠিলেন,—"ইনি পথ হারিয়ে ফেলেছেন, আজকের রাতটা এখানে থাক্‌তে চান্‌। তুমি পিদিমটা নিয়ে এসো।"

অপরিচিতের আগমন সংবাদে বারুণী অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন। প্রদীপ আনিতে গিয়া শয়ন ঘরের দ্বার খুলিলেন। সেই সময় একটা দমকা বাতাস গৃহের দীপ নিভাইয়া দিল! অনুপায়! প্রদীপ জ্বালিবার আর উপায় নাই। ঘরে আগুনও নাই, দেশালাইয়ের শেষ কাঠিটি দিয়া প্রদীপ জ্বালান হইয়াছিল। পীড়িতার গৃহে এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলনা যে দিন থাকিতে তিনি একটা দেশালাই আনাইয়া রাখেন!

বারুণী স্বামীকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিয়া অতি নিম্ন স্বরে বলিলেন "হয়েছে কাজ! ঘরে দেশালাইয়ের কাঠিটি পর্য্যন্ত নেই—এখন উপায়!"

প্রভাতবাবু অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে বলিলেন "তাই ত! অতিথি ঘরে—এ আঁধারে খাওয়া দাওয়া হবে কি করে—অতিথি উপোস কর্‌বেন—তাও কি হয়!"

লোকটা মিহি চাপাসুরে বলিল, "ভাব্‌বেন না আমার জন্যে, খেয়ে এসেছি,—একটুও খিদে নেই। এ দুর্য্যোগে একটু শোবার যায়গাই যথেষ্ট অনুগ্রহ—বড় ক্লান্ত হয়েছি—"

প্রভাত বাবু বলিলেন "সত্যই বিধাতা আজ বাম। চলুন তবে—শোবার যায়গা দেখিয়ে দি।"

আগন্তুক বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রভাত বাবু তাহার অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "তবে চলুন।" পা বাড়াইতেই পুলিন্দার মত একটা কি তাঁহার পায়ে ঠেকিল। তিনি সেটা উঠাইয়া লইতেই বুঝিতে পারিলেন,—কতকগুলা টাকা ও নোটে সেটা পূর্ণ! তাঁহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল; 'এই না অর্থ,—যার জন্য এত!' তাড়াতাড়ি পুলিন্দাটী আগন্তুকের হাতে দিয়া বলিলেন "এটা আপনি যে ফেলে যাচ্ছিলেন।"

একটা দীর্ঘশ্বাস প্রভাত বাবুর অজ্ঞাতে বক্ষ-পঞ্জর ভেদ করিয়া বায়ুস্তরে মিশিয়া গেল।

সাগ্রহে অথচ সেইরূপ স্বরে "ওঃ—দিন দিন" বলিয়া তড়িৎ বেগে সে পুলিন্দা গ্রহণ করিল। প্রভাত বাবু আপন শয়নকক্ষে তাহাকে লইয়া চলিলেন।

একাকী আঁধারে বসিয় বারুণী পুত্রের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। পুত্রের ভাবনায় তিনি পীড়ার যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, স্বামী আগন্তুককে শয়ন করাইতে বহুক্ষণ গিয়াছেন সেটা ভাবিবার মত শক্তি তখন তাঁহার ছিল না। সহসা প্রভাত বাবু কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গাইয়া দিলেন। প্রভাত হাঁপাইতেছিলেন,—নিস্তব্ধ অন্ধকার গৃহে তাঁহার বক্ষের প্রত্যেক স্পন্দন-শব্দ শোনা যাইতেছিল। বারুণী উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন "ভিজে অসুখ কর্‌লো বুঝি?"

প্রভাত বাবু বলিলেন "না!"

উভয়ের বহুক্ষণ নীরব।

বারুণী ভাবিতেছিলেন; ধম্মা এখনও যখন এল না, তখন, এই দুর্য্যোগের রাত্রে সে হয় ত' আর আস্‌বেই না।.........আহা বাছার জন্যে বেঁধেবেড়ে সব ঠিক্‌ঠাক্ ক'রে রাখ্‌লুম.........হয় ত বের হয়ে কোথায় ভিজ্‌ছে?

"চুপ! ঐ কে দোরঠেল্‌ল মা?"

বারুণী ত্বরিত পদে উঠিয়া সদর দ্বারের দিকে চলিলেন। প্রভাত বাবু তখন সেই পোড়া কল্কেটা হুঁকায় তুলিয়া বসিয়া একমনে টানিতে ছিলেন।

কিয়ৎক্ষণ মধ্যে বারুণী পুত্র ধর্ম্মদাসের সহিত কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। পুত্রের নিকট দেশালাই লইয়া প্রদীপ জ্বালিলেন। তাহাকে বসিতে দিয়া প্রশ্ন করিলেন,—"হ্যাঁরে, এত দেরী হ'ল যে তোর আস্‌তে ধম্মা?"

"সকাল সকাল আস্‌ব বলে বেরুতে যাচ্ছি এমন সময় বড় সাহেব ডেকে বল্লেন—ব্যাঙ্কে চুরি হ'য়েছে, চোর আমাদের এই দিকেই এসেছে তার সন্ধান করতে হবে।"

"তা লোকটার কোন সন্ধান পেলি নাকি?"

"না, তবে সে যে এই গ্রামের ভেতরই কোথাও আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ দিকে যে সে এসেছে তার খোঁজ পেয়েছি। গায়ে তার একটা লম্বা কোট, হাতে একটা ছোট বুচ্‌কি আছে। লোকটা ভারি পাকা চোর, বেছে বেছে কেবল গিনি আর নোট চুরি করেছে—যার ভার নেই কিন্তু ধার আছে!"......বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

বারুণী বলিলেন,—"পুঁটুলী টুঁটুলি আছে কিনা দেখিনি বটে তবে একটা লোক এখানে এসেছে।

"এখানে?—আমাদের বাড়ীতে? কখন গো মা?"

"এই খানিক আগে।"

"কে সে? চেন তাকে?"

"তা কি ক'রে চিন্‌বে। আঁধার ঘরে বাতি ছিল না লোকটা বল্লে জলে ঝড়ে সে পথ হারিয়ে ফেলেছে, তাই রাত্রের মত একটু আশ্রয় চাচ্ছিল, উনি তাকে আমাদের শোবার ঘরে শুতে দিয়েছেন। তোকে কিন্তু আজ এই ঘরেই রাত কাটাতে হবে।"

"রাত কাটাবার অবসর কোথা মা? এখনি আমার চোরের সন্ধান বেরুতে হবে।"—তাহার পর পিতার দিকে ফিরিয়া বলিল—"সে এখন কি ক'চ্চে বাবা?"

প্রভাত বাবুর যেন নিদ্রা ভঙ্গ হইল এমনি ভাবে পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কার কথা ব'ল্‌ছিস্?"

"যে লোকটা খানিক আগে এসেছে?"

"সে ঘুমুচ্ছে।"

"লোকটা দেখ্‌তে কি রকম দেখেছেন?"

"আঁধার! আঁধার যে বাপু—আঁধারে কি আর তাকে দেখেছি—"

"আপনি না দেখুন, আমাকে তাকে দেখ্‌তেই হচ্ছে—এ গ্রামে অপরিচিত আগন্তুক যে, তাকে আমাকে দেখ্‌তেই হবে!"

"না—না—সে যে ঘুমুচ্ছে !

"তা হ'লেও দেখ্‌তে হবে আমার।"

"ঘুমুচ্ছে—আমি ব'লছি তবু শুন্‌বি না ?"—প্রভাত বাবুর মুখখানা পাংশু বর্ণ হইয়া গেল।

"না, মাপ কর্‌বেন, আমার কর্ত্তব্য আমার কর্‌তেই হবে ;"

"ধর্ম্মা যাস্‌নে—যাস্‌নে ওদিকে ·····" প্রভাত বাবুর সারা অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

ধর্ম্মদাস সেদিকে কান না দিয়া অগ্রসর হইল।

"কথা শোন ধর্ম্মা—ব'লছি ওদিকে যাস্‌নি !······"

ততক্ষণে ধর্ম্মদাস শয়ন কক্ষের দাওয়ায় উঠিয়াছিল।

প্রভাত বাবু পেট-কাপড় হইতে এক তাড়া কাগজ বাহির করিয়া বারুণীর সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন,—অনেক-গুলো টাকা পাওয়া গেছে বারুণী, এইবার তোমায় কোলকেতায় নিয়ে যাব।"

বারুণী কাগজের তাড়াটা খুলিতেই শিহরিয়া উঠিলেন······"কোথায় পেলে এতটাকা···এ কি এযে অঘোরের রুমাল !······অঘোরের এ রুমাল তুমি কোথা পেলে ?·········"

"অঘোর ? অঘোর কোথা ?······"

"এত টাকা কোথায় পেলে ? কার কাছে এ রুমাল পেলে ? এ যে আমার দেওয়া সেই রুমাল।"

"চুপ কর ঐ লোকটার টাকা !"

বারুণী হস্তদ্বয় থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল,—"তবে সে আমার অঘোর—নিশ্চয় আমার অঘোর। আমি যাই।"

"যাস্‌নি ব'লছি মাগী !"

"যাব না ? আমার অঘোর—বাছা আমার কত দিন পরে বাড়ী ফিরে এসেছে যাবনা—নিশ্চয় যাব !"

"বল্‌ছি বোস্‌ !"—বলিয়া প্রভাত বাবু তাঁহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিলেন।

বারুণী স্বামীর হাতের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন,—"কি ক'রেছ তুমি ?—ঠিক্‌ করে বল, কি করেছ তুমি,—আমার অঘোর—আমার—বাছাকে খুন·········"

"চুপ !"—বলিয়া প্রভাত বাবু সজোরে বারুণীর মুখ চাপিয়া ধরিলেন। চক্ষে তাঁহার তখন উন্মাদের দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। রক্তরঞ্জিত হাত দুইখানি তখন তাঁহার বাতাহত কদলীপত্রের মত কাঁপিতেছিল। তাঁহার হাতের চাপে বারুণী ধীরে ধীরে সজ্ঞা হারাইয়া ভূতলে লুটাইয়া পড়িলেন।

শয়ন কক্ষের দিক হইতে ধর্ম্মদাস সহসা সভয় কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল,—"খুন !"

প্রভাত বাবুর কানে সে কথা প্রবেশ করিল না। তিনি তখন নিম্ন স্বরে বারুণীকে বলিতেছিলেন,—"কাল তোমায় কোলকেতায় নিয়ে যাব, অনেকগুলো টাকা পেয়েছি—অনেকগুলো টাকা !·········"

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়।

চন্দন-ঘষার গান।

——:*:——

দুয়ার খোল গো　　দুয়ার খোল গো
চন্দন-বন-সুন্দরী।
তোমার দুয়ারে　　এলাম আজিকে
সন্ধান করি বন ভরি'।
দেবতা দেউলে শুন' শাঁখ বাজে
এখনো যে আছ রত গৃহকাজে
পরিতেছ বুঝি　　কোষেয় বাস
গঙ্গার জলে স্নান করি' ?
গন্ধ তেলের দীপখানি জ্বালি'
আনো আনো পূজা-পুষ্পের ডালি,
মৃগমদ চূয়া　　উশীরের বাটি
তুলসীর দল মঞ্জরী ॥
তোমার কঠিন কাঠের দুয়ারে
করি করাঘাত, শুন, বারে বারে,
পূজার বেলা যে　　বহে' যায় যায়
রুষ্ট যে হবে শঙ্করী ॥

শ্রীকালিদাস রায়।

সাহিত্যে নীতিশিক্ষা।

——:*:——

সাহিত্যক্ষেত্রে নীতিশিক্ষার স্থান আছে কিনা এবং থাকিলেও কতখানি আছে এ বিষয়ে সমালোচকগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে—এই প্রশ্নটীর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চেষ্টিত হইব। প্রথমতঃ বুঝিবার সুবিধার জন্য আমরা সাহিত্য বিষয়ক কতকগুলি সাধারণ কথায় অবতারণা করিব।

আমাদের প্রথম আলোচ্য বিষয় সাহিত্যের রূপ নির্ণয়।

সত্যপ্রকাশই সাহিত্যের ধর্ম্ম—সুখ-দুঃখ-জড়িত মানবজীবনের অন্তরালে যে সত্য নিজেই নিজকে গড়িয়া তুলিতেছে—সে সত্যই সাহিত্যের উপাদান। একজন বিখ্যাত সমালোচক সাহিত্যকে 'জীবনের সমালোচনা'

বলিয়াছেন। প্রত্যেক বড় লেখক তাঁহার ভাবরাশির ভিত্তিস্বরূপ একটা সংসার সৃষ্টি করেন। সেই সৃষ্ট সংসারের মধ্যেদিয়া তাহারা জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সমস্যাগুলি পূরণ করিয়া থাকেন। সংসারের ঘটনাচক্রে ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সামাজিক জীবনের যে বিরোধ উপস্থিত হয়—কখনও কখনও সাহিত্যে—এই বিরোধের চিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে, আর লেখক আপনার বিষয়বুদ্ধি অনুসারে এই বিরোধের ফলাফল নির্দ্দেশ করেন।

সাহিত্যের কাজ যদি সত্যপ্রকাশই হয়, তবে সাহিত্যে এই সত্য কিভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে ? সত্যপ্রকাশ করিতে হইলে, সত্য বিশ্বময় ছড়াইয়া দিতে হইলে, সৌন্দর্য্য সৃষ্টির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। প্রত্যেক মনুষ্যেরই সৌন্দর্য্যগ্রাহী একটা তীক্ষ্ণ বৃত্তি আছে। এই বৃত্তিটা এতটা তীক্ষ্ণ যে মানুষ অতি সহজেই সুন্দরকে অসুন্দর হইতে পৃথক্ করিতে পারে। সন্ধ্যাকালে আধ-আলো ও আধ-ছায়ার পশ্চাতে আমরা যে সত্যের যেরূপ প্রকাশ দেখিতে পাই সেই সত্য আর কোনও প্রকারে সেই ভাবে প্রকাশিত হইতে পারে না, সে সত্য আর কোনও অবস্থাতেই সেই ভাবে অনুভব করা যায় না। সুখ দুঃখ, আনন্দ বিষাদ, আশা নৈরাশ্য প্রভৃতি মনোবৃত্তির অনুভূতির পরিবর্ত্তনের দ্বারা একটা জীবন পূর্ণ হইয়া উঠে। বিভিন্ন ভাব সুরের সম্মিলনে যে রাগিণীর সৃষ্টি হয়—সাহিত্যে আমরা সেই রাগিণীর আলাপ শুনিতে পাই। যেমন পূর্ণিমার রাত্রিতে গিরিতটলীন নির্ঝরের ঝর ঝর শব্দ আলো ও ছায়ার তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে আমাদের শ্রবণগোচর হয় তদ্রূপ আমাদের এই জীবন নানাপ্রকার ভাব রস সংযোগে কবির কল্পনালোকে উদ্ভাসিত হইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়।

সাহিত্যে বাস্তবিকতা (Realism) এবং ভাবুকতা (Idealism) কি অনুপাতে অবস্থান করে ?

কবি শুধু বসন্তের নিঃশ্বাস, সূর্য্যের আলোর কথা ভাবেন না। ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে তিনি অতীন্দ্রিয় জগতের খবর পান এবং সাহিত্যে তাহাই প্রকাশ করেন। ক্ষীর-সাগরের অপরপারে ঘুমন্তপুরী, সেই পুরীর ভিতর অপরূপ এক রাজকন্যা শুধু এই খবর—আমরা যে কবির কাব্যে পাই তিনি কল্পনা শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিলেও করিতে পারেন বটে কিন্তু তিনি চিরন্তন ভাবরাজ্যের কোন বারতাই বহন করিয়া আনেন না। মানব-হৃদয়-সিন্ধুতলে পলে পলে যে নব মহাদেশ সৃষ্ট হইতেছে তাহার সংবাদ বহন করাই সাহিত্যের কাজ। বড় লেখক তিনি, যাহার সৃষ্টি এবং বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে না বাস্তবতার উপর দণ্ডায়মান হইয়া জীবনের আদর্শকে ফুটাইয়া তোলে, জীবনের সত্যগুলি লোকসমাজে প্রচার করে। কল্পনামূলক—সহানুভূতির সাহায্যে তিনি জীবনের সকল প্রকার তত্ত্ব অনুশীলন করেন এবং সাহিত্যে সেই তত্ত্বগুলি প্রকাশ করিয়া বিশ্বের চিন্তা প্রবাহের এক নূতন পথ নির্দ্দেশ করেন।

মানবজীবনই সাহিত্যের বিশেষ উপাদান এবং—সাহিত্যে—লোকশিক্ষার সহিত সৌন্দর্য্য সৃষ্টির এক অপরূপ সমন্বয় সংঘটিত হইয়া থাকে। সাহিত্যের লোকশিক্ষা যেমন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ব্যতীত ঘটিতে পারে না সেইরূপ সাহিত্যের সৌন্দর্য্যসৃষ্টিও সত্যপ্রকাশ ভিন্ন সম্ভব হয় না। পরস্পর পরস্পরের এতটা মুখাপেক্ষী।

সাহিত্যকে যদি "জীবনের সমালোচনা" বলিয়া গ্রহণ করা হয় তবে জীবনযাত্রার মধ্যে যে সকল নৈতিক শক্তির কার্য্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে—সাহিত্যেও সেই সকলের নৈতিক শক্তির প্রভাব পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হইবে। মানবজীবন একটা বিরাট সত্য। ইহার ভিত্তি এক অখণ্ড নৈতিক শক্তির উপর সংস্থাপিত। জীবনের অসংখ্য কার্য্যের মধ্যে এই শক্তির প্রভাব আপাততঃ দৃষ্টিগোচর না হইলেও যখন সমস্ত জীবনের ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করা যায় তখন উহা স্বতঃই প্রতিভাত হইয়া পড়ে। প্রত্যেক মনুষ্যেরই ব্যক্তিগতজীবন ভিন্ন আর একটা জীবন আছে যাহাকে সামাজিক জীবন বলা হয়। ব্যক্তিগত জীবন অনেক কিন্তু সামাজিক জীবন এক। ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সামাজিক জীবনের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যেক মনুষ্যেরই জীবনে এমন একটা মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়—যখন

তাহার ব্যক্তিগত ধারণা ও অনুভূতি তাহার নিকট এত বড় সত্য হইয়া দাঁড়ায় যে সমাজের বন্ধনটা একটা অনাবশ্যক বন্ধন বলিয়া প্রতীতি জন্মে আর সমস্ত মনপ্রাণ এই সামাজিক বন্ধনগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া উঠে, রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের' ন্যায় 'পাষাণকারা' ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়িতে চায়। মানবজাতির ক্রম উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবনের মধ্যে সংঘর্ষণ এতটা কঠিন হইয়া পড়ে যে উভয়ের মধ্যে শান্তিস্থাপন একটা দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে। যেমন সমষ্টির শক্তির নিকট ব্যষ্টির শক্তির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী তদ্রূপ সামাজিক জীবনের নিকট ব্যক্তিগত জীবনের পরাজয় একটা কঠোর সত্য।

বর্ত্তমান সাহিত্যে এই বিরোধের চিত্রই বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইতেছে। প্রত্যেক বড় লেখকই নিজের ধারণা অনুসারে এই ঘাতপ্রতিঘাতের ফলাফল নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই ফলাফল নির্ণয়ের দ্বারাই সাহিত্যের নৈতিক মূল্য (Moral value) অবধারিত হয়।

বর্ত্তমান বৎসরের আশ্বিনমাসের ভারতবর্ষের 'বর্ত্তমান সাহিত্যের গতি' নামক সুচিন্তিত প্রবন্ধে লেখক প্রসঙ্গক্রমে নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি বলিয়াছেন।

"একজন হিন্দুঘরের বিধবা বাল্যেই স্বামীসম্পর্ক রহিতা হইয়া যৌবনে তাহার আচারবিচার পূজাপদ্ধতি দূরে রাখিয়া সহজে একজন গুণবান্ বুদ্ধিমান্ পরপুরুষের প্রতি আসক্তা হইতে পারে, তাহাকে সত্যই প্রেম দিতে পারে তাহা যে একটা মস্ত পাপও নয়—এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের Symbol."

উপরের কথাগুলি রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালির' সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। একজন হিন্দুঘরের বিধবা পরপুরুষের প্রতি আসক্তা হইতে পারে তাহাকে সত্যই প্রেম দিতে পারে ইহা খুব সম্ভব কিন্তু তাহা যে কি প্রকারে একটা মস্ত পাপ নয়—ইহা আমাদের পক্ষে বুঝা একপ্রকার অসম্ভব। আমাদের মনে হয়—রবীন্দ্রনাথ বিধবার পরপুরুষাসক্তি পাপজনকই মনে করেন এবং 'চোখের বালি'তেও উহাই প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালিতে' একটী স্ত্রীলোকের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সামাজিক জীবনের বিরোধের চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি 'চোখের বালিতে' ব্যক্তিগত জীবন অপেক্ষা সামাজিক জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া—ঋষিজনানুমোদিত মতেই আত্মমত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ জনিত পাপপুণ্য সামাজিক শান্তি ও অশান্তির উপর নির্ভর করে। যে কার্য্যে সমাজের শান্তির ব্যাঘাত ঘটে তাহাই সমাজহিসাবে পাপ। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে বিচার করিয়াই এই পাপপুণ্য নির্দ্ধারিত হয়। এই সামাজিক পাপপুণ্য সংস্কার বশতঃ আমাদের মধ্যে এতটা স্বাভাবিক হইয়া পড়ে যে ইহা অবশেষে বিবেকবাণীতে পরিণত হয়। বিনোদিনীর এই পরপুরুষাসক্তি কি সমাজে একটা বিপ্লব উপস্থিত করে নাই কিম্বা সুখশান্তির ক্রোড়ে সুপ্ত কোনও পরিবারের সুখের অন্তরায় হয় নাই? উক্ত লেখক পাপ বলিতে কি বুঝেন তাহা বুঝিলাম না। তিনি উহা পাপজনক না মনে করিতে পারেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিকট উহা পাপ বলিয়া মনে হইয়াছিল। 'চোখের বালি'র শেষ অংশটা একটু ভাল করিয়া পড়িলেই ইহা বুঝা যাইবে। বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাবে শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সমাজশক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালিতে' সেই ভাবে সমাজশক্তির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন। অপরিহার্য্য নৈতিক-বল 'চোখের বালি'র বিনোদিনীকে সকল প্রকার ব্যর্থতার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে চিত্তশুদ্ধির পথে লইয়া গিয়াছিল। বিহারীর বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া অবশেষে শেষ জীবনটা এক মহৎকার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছিল। ইহা কি একটা কম প্রায়শ্চিত্তের কথা, একটা আশ্চর্য্যজনক পরিবর্ত্তন। যদি রবীন্দ্রনাথ সমাজশক্তির বিপক্ষে এত বড় ধাক্কাটাকে পাপজনক না মনে করিতেন তবে পুস্তকের উপসংহার অন্যরূপ হইত। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এই সামাজিক নৈতিক বলের উপর অগাধ

বিশ্বাসী ছিলেন। 'চন্দ্রশেখর' 'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল" প্রভৃতি উপন্যাসে এই সমাজশক্তির প্রভাবই প্রদর্শিত হইয়াছে। স্ত্রীপুরুষের যৌন সম্বন্ধের উপর সমাজের প্রতিষ্ঠা। এই যৌন সম্বন্ধের পবিত্রতা রক্ষা করাই স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পক্ষেই একটা বিশেষ ধর্ম্ম। যদি কোন স্ত্রী কিম্বা পুরুষ ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির তাড়নায় দাম্পত্যবন্ধন ছিন্ন করিয়া সমাজশক্তির অবমাননা করে, সংযমহীন হইয়া যৌন সম্বন্ধের পবিত্রতা রক্ষা করিতে না পারে তবে সামাজিক নৈতিকশক্তির নিকট সে নিশ্চয়ই দণ্ডনীয় হইবে। সাহিত্যে আমরা এই চিত্রই দেখিতে পাই "কৃষ্ণকান্তের উইল" এ গোবিন্দলাল রূপের মোহে অনন্যপ্রাণা পত্নী ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া বাল-বিধবা রোহিণীর রূপে মুগ্ধ হইয়াছিল। ইহার ফলস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দলালের হস্তে রোহিণীর মৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন। আর গোবিন্দলাল আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া অবশিষ্ট জীবন অনুতাপের অনলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল। 'চন্দ্রশেখরে' শৈবলিনী পরপুরুষানুরাগিণী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিল। পরপুরুষ আর কেহ নয় তাহার বাল্যসঙ্গী প্রতাপ। চন্দ্রশেখরের দ্বারা তাহার ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা মিটিল না। গৃহত্যাগিনী হইলে প্রতাপকে পাওয়া যাইবে এই মনে করিয়া সে গৃহত্যাগ করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকে কিরূপ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শুদ্ধ ও মার্জ্জিত করিয়াছিলেন তাহা সাহিত্যানুরাগী মাত্রেই অবগত আছেন। সকল দেশের সাহিত্যেই এই সমাজশক্তির আত্মপ্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। মহামতি টলষ্টয় "অ্যানা ক্যারেনিনা" নামক সমাজচিত্রের উপসংহারে সমাজশক্তির প্রতিকূলতাচরণের এক শোচনীয় পরিণাম অঙ্কিত করিয়াছেন। দাম্পত্য-বন্ধন অনায়াসে ছিন্ন করিয়া অ্যানা স্বামী-পুত্র ত্যাগ করিয়া ভ্রন্স্কির সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীভাবে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। টলষ্টয় একজন খুব বড় দরের সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। সমাজের বন্ধনকে তিনি অতিশয় পবিত্র মনে করিতেন। তজ্জন্য পুস্তকের শেষভাগে আমরা অ্যানার রেলগাড়ীর নীচে শোচনীয় আত্মহত্যার চিত্র দেখিতে পাই। আমাদের বর্ত্তমান যুগের দুইজন প্রসিদ্ধ লেখিকা—পূজনীয়া নিরুপমা দেবী তাঁহার 'দিদি' উপন্যাসে যে সমাজচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে সামাজিক নৈতিকশক্তির পূর্ণবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজের দিক হইতে দেখিতে গেলে স্বামীর নিকট স্ত্রী নগেন্দ্রর ভাষায় সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী।" ইহাই হইল আমাদের দেশের আদর্শ। 'দিদি'র সুরমা এই আদর্শের অবমাননা করিয়া জীবন যাপন করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সমাজশক্তি নারীজাতির জন্মজন্মান্তরের সংস্কাররূপে তাহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিল। সুরমা বুঝিল যে "নারীর দর্প তেজ অভিমান কিছু নেই, আছে কেবল ভালবাসা,—কেবল দাসীত্ব" কেবল স্বামীর চরণ যুগল 'এইটুকু' আর কিছু নয়। যে নারী দুর্জ্জয় অভিমানের বশে স্বামীর ভালবাসার উপর কোনও মূল্য স্থাপন না করিয়া পিত্রালয়ে গমন করিয়াছিল আর কখনও শ্বশুরালয়ে ফিরিবে না মনে করিয়া, কঠোর সমাজশক্তি তাহার ভুল নিরাকরণ করিয়া দিল, সে স্বামীর পদযুগল ধরিয়া বলিল "কেবল এইটুকু, আর কিছু নয়। আমায় কোথায় যেতে বল? আমার স্থান কোথায়? আমি যাব না।" এই প্রকারে বঙ্কিমচন্দ্র, টলষ্টয় এবং রবীন্দ্রনাথ চিরন্তন সমাজশক্তির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন—সাহিত্যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি এবং লোকশিক্ষা উভয়বিধ উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে।

সাহিত্যের সত্যপ্রকাশ দ্বারা আর একপ্রকারে নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেক মনুষ্যই স্বকীয় কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করিয়া থাকে। ইহার সম্বন্ধে—কয়েকটী কথা বলিয়াই আমি প্রবন্ধ শেষ করিব। নৈতিক জগৎ-এর এই পোষক মতটীকে ইংরাজীতে অনেক সময় poetic justice বলা হয়। অনেক বড় বড় সমালোচক ইহাকে অতি নীচুদরের লেখকের কৌশল বলিয়াছেন। যেখানে এই poetic justice জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া যায় না, একটা বহিঃশাস্ত্ররূপে অবস্থান করে, সেখানে ইহা দোষের হইতে পারে কিন্তু যেখানে কোন লেখক আপনার

বিচারশক্তি বলে ইহাকে জীবনের গতির নিয়ামকরূপে দেখিতে পান এবং আপনার লিপিচাতুর্য্যের বলে জীবনের সহিত ইহার অবস্থিতি একটা স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত করেন সেখানে ইহা কখনই একটা সামান্য কৌশল মাত্র নহে ইহা একটা বিশেষগুণ হইয়া দাঁড়ায় এবং লেখক সমাজচিত্রটীকে এক গম্ভীর সৌন্দর্য্যে মহীয়ান্ করিয়া তোলেন। জর্জ্জ ইলিয়টের অনেকগুলি উপন্যাস ও ডষ্টয়ভেস্কির Crime and Punishment নামক উপন্যাসখানি এই নৈতিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ডষ্টয়ভেস্কির optimism জর্জ্জ ইলিয়টে পাওয়া যায় না। তিনি বিশ্বাস করেন যে এই মেঘের আঁধার এক সময়ে ঘুচিবেই ঘুচিবে। আবার সত্য সুন্দর নির্ম্মল পুণ্যের আলোক জীবনকে এক সার্থকতার শ্রীতে ভরিয়া দিবেই দিবে। ডষ্টয়ভেস্কির এই বিশ্বাসটুকু বড়ই মধুর।

এই প্রকারে জীবনের বড় বড় তত্ত্বগুলি সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। "কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা— কিন্তু নীতি ব্যাখ্যা দ্বারা তাহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও শিক্ষা দেন না। তাহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।" যদি মানবজাতির কল্যাণের জন্য সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে তবে সাহিত্যের চিন্তার এবং চিন্তাপ্রকাশের পবিত্রতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' সাহিত্যের মূলমন্ত্র। বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্যতা সেই সাহিত্যেরই আছে,—যে সাহিত্যে এই ত্রয়ের সংযোগ বিদ্যমান। প্রকৃত সাহিত্য এই ত্রিবেণী-সঙ্গমের পূতবারি।

শ্রীঅশ্রুমান্ দাস গুপ্ত।

কল্পনার প্রতি।

দেবি, হলনাক' বলা ছিল যাহা মনে
মনের মতন করে,
এ মুখের পানে চেয়ে আছ তাই
হাসিতেছ লীলা ভরে!
পথে পথে আমি গান গেয়ে ফিরি
নাহি সুর, নাহি ছন্দ,
হৃদয় কুসুম কাঁটায় পূর্ণ
মোটে নাই তাহে গন্ধ!
নিজেরে ছলিতে মরীচিকা রচি
বুঝিনাক' ভালমন্দ,
আলোক আঁধার সে কিগো বুঝিবে
নয়ন যাহার অন্ধ!

চির বিরহের সঙ্গীত উঠে
আমার হৃদয় হ'তে—
চির মিলনের সুদূর পিয়াসী
সে কার চিত্ত-পথে !

ওগো, তুমি গাহ গান নব আনন্দে
বিচিত্র অতি সুর,
তোমার কণ্ঠে আকাশ বাতাস
হয়ে যায় ভরপুর !
উঠিছে রণিয়া কোলের বীণাটি
কোমল কমল করে,
পুলক আবেশে আকুল কণ্ঠ
নয়নে অশ্রু ঝরে !
জরীর বুনান সোনালি বসনে
মুড়িয়া শরীরখানা,
পরীর মতন উড়িছ মেলিয়া
ইন্দ্রধনুর ডানা !

যদি, তোমার সোনার পরশ লভিয়া
পাই গো নূতন প্রাণ,
তখন হয়ত তোমার মতন
গাহিতে পারিব গান !
এ চির বিরহ হইবে শান্ত
ঘুচিবে হৃদয় ভার,
তখন কণ্ঠে জড়াব যতনে
তোমার কণ্ঠহার !
শূন্য হৃদয় দেখিবে তখন
ফুটিয়া উঠিবে সদ্য
রক্ত কমল চরণের তলে
ভক্ত-হৃদয়-পদ্ম !

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ ।

দুইদিক।

—ঃ*ঃ—

চতুর্থ অঙ্ক।

[দ্বিতীয় অঙ্কের বর্ণিত বাগানবাড়ীর পূর্ব্বাংশ। সম্মুখে একটা পুষ্করিণী। তার বাঁধা ঘাট দেখা যাইতেছে। দূরে একস্থানে বসিবার জন্য গাছের তলে সতরঞ্চ বিছান হইয়াছে। ঘাটের সম্মুখে রাস্তা। রাস্তার দুধারে নানা জাতীয় ফুলগাছের কেয়ারী। বিশেষতঃ season ফুলের ভারি বাহার। ষ্টেজের সম্মুখটা একটা ছায়া করা বাঁধান বৃহৎ পথ। নানা প্রকার marble পাথরের পুতুল স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া আছে। স্থানে স্থানে বসিবার বেঞ্চ ও লোহার চেয়ার। পুকুরের চারিপার্শ্বেই লোকজন বেড়াইতেছে। দূরস্থিত সেই সতরঞ্চের উপর কয়েকজন গানবাজনায় এবং খেলায় মগ্ন।]

(বড় রাস্তায় ষ্টেজের সম্মুখে অনাদি ও শঙ্করের প্রবেশ)

অনাদি। আরে দূর—আর কত বেড়ান যাবে? এই বেঞ্চিখানায় বসি এস, ঘুরে ঘুরে যে—

শঙ্কর। আরে না না—সারা বছরটাইত' বসে কাটাই, আজ একটা দিন না হয় হেঁটেই কাটান গেল।

অনাদি। তার চেয়ে এস এই আমগাছের ডালটায় চড়ে দোল খাওয়া যাক্‌গে।

শঙ্কর। তাতেও রাজি—যেমন করেই হোক্ আজ সারাদিন প্রাণটাকে নেড়ে চেড়ে দোলখাইয়ে জাগিয়ে রাখা চাই—

(উভয়ে ডালে চড়িল)

অনাদি। দে দোল দোল—দে দোল দোল—রাজেনদা দেখ্‌তে পেলে বেশ হয়। ওর হাওয়া ভরা প্রাণে এই দোল খাওয়া দেখ্‌লে বকে বকে অনর্থ বাধাত।

শঙ্কর। আজ ওকে মানে কে? বাস্তবিক অনাদি, এক এক দিন ইচ্ছে হয়, সমাজের সংসারের লাখো রকমের কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য ধর্ম্ম-অধর্ম্ম নিষেধ-বিধির বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্তি দিয়ে একেবারে নিজেকে জানোয়ারের মত ছেড়ে দিতে। অন্ততঃ বছরের মধ্যে একটা দিনও আমাদের মধ্যে যে eternal পশু আছে তাকে ছেড়ে দিতে হয়। দেখি সে কি করে।

অনাদি। কি আবার কর্‌বে? সারাবছর ধরে এই এত বড় সামাজিক মানুষটা বহন করে করে সেটাও ছেকড়া গাড়ির ঘোড়া কিম্বা ধোবাদের গাধা হয়ে গিয়েছে। তার কি আর নড়্‌বার শক্তি আছে—ছেড়ে দিলে বড় জোর দুবার চার্‌বার চাট ছুড়ে চিঁহি করে তারপর রাস্তার পাশের শুক্‌নো ঘাস চিবুবে।

শঙ্কর। দেখ ভাই যাঁরা আমাদের দেবমূর্ত্তি কল্পনা করেছিলেন তাঁরা করেছিলেন ঠিকই—দেবত্বের নীচেই পশুত্ব বটে এবং পশুত্বের ওপরেই দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত বটে, কিন্তু দেবতাদের চব্বিশ ঘণ্টাই বাহনের উপর চড়িয়ে রাখাটা ঠিক্ হয় নি। ওদের সোয়ারহীন অবস্থায় পূজাপাঠের মধ্যে একটু জায়গা দেওয়া উচিত ছিল। দেবতাদের যে অশ্বপৃষ্ঠে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে এতে তাঁদের বাহনদের ওপর অযথা অত্যাচার করা হয়েছে।

অনাদি। কথাটা মিথ্যে দেবতাদেরও ঘুম আছে বৈকি। নিজের মধ্যে যখন দেবতারা ঘুমোন তখনি বাইরের এই বিশাল পশুজগতের ডাক শুন্‌তে পাই আমরা। তখনি "পাখী ডাকা ছায়ায় ঢাকা" তরুতলে ঐ

পশু পাখীদেরই মত ছুট্‌তে হয়। যখন একটু ঢুলুনি আসাতে দশভূজা সংসারের হাতের নাগপাশ একটু খসে পড়ে তখন ঐ নাগপাশের নাগটাই সবুজ ঘাসের মধ্যে এঁকে বেঁকে ছুটে বেরিয়ে পড়ে। তখন ঐ বন্ধনটাই যেন মুক্ত পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে—ঐ বন্ধনটাই যেন সবুজ মাটে, দূর দিগন্তে হারিয়ে যাওয়া পথে, নীল আকাশের কোলের কাছে পালিয়ে গিয়ে আমাদের ডাক্‌তে থাকে। তখন ইচ্ছে করে হাত পা ছেড়ে দিয়ে একেবারে চিৎপাত হয়ে প্রকৃতির কোলে শুয়ে পড়ি আর মায়ের যত রকম আবোল তাবোল কথা আছে, অর্থ-হারা ভাবে-ভরা একেবারে সৃষ্টিছাড়া কথা আমাদের কানে মা বল্‌তে থাকুন। তখন ইচ্ছে করে এমনি করে—

(পতনোন্মুখ)

শঙ্কর। দেখো পড়ো না—সত্যি সত্যি মায়ের কোলে পড়্‌তে হলে ধপাস্ করে ডাল থেকে পড়ার দরকার নেই—ঐরে রাজুদার চর আস্‌ছে ; পালাই চল—

অনাদি। পালাব ? আজ আমরা বীর—বীরহনুমানও বল্‌তে পার। আসুক না যে আস্‌বে—

(সন্তোষের প্রবেশ)

সন্তোষ। বাঃ তোমরা এখানে শাখামৃগ হয়ে দুল্‌ছ এ দিকে গেটের বাইরে রাজেন দা এক লাখ ভিখিরী জুটিয়ে তাল সামলাতে পার্‌ছেন না যে। এস তোমরা—

অনাদি। ও ভাই "যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে"—কে ভাই ওর মধ্যে যাবে। যখন পরিবেশন কর্‌তে হবে তখন না হয় ডেকো এক হাত দেখিয়ে দেব।

শঙ্কর। না—না—তাকি হয় ? ওঁরা কি মনে কর্‌বেন ?

অনাদি। Et tu Brute then fall Caesar (ডাল হইতে লাফাইতে গিয়া পতন এবং সেই ঝোঁকে শঙ্করেরও পতন।)

সন্তোষ। ঐ দেখ্‌লে অনাদি, যার কর্ম্ম তারে সাজে এই কথাটার সত্য কেমন প্রমাণ হ'ল। বাঁদুরে কাজ মানুষের পোষায় ?

অনাদি। (ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে) ভো বালিস ;—এর দ্বারা কি প্রমাণ হ'ল তা জাননা তাই বক্‌ছ।

সন্তোষ। জানি বৈকি, প্রমাণ হল There is but one step between the sublime and the ludicrous নাও ওঠো।

অনাদি। আরে দাঁড়াও, সামলাই,—সারা বছরের কেরাণীগিরীর বাতে ধরা শরীর এতে কি দৌড়ঝাঁপ সয়। শঙ্কর একটু help কর না।

শঙ্কর। নে আর নেওয়াটামিটে কাজ নেই, ওঠ্— এখন ত 'পোলারে পাঠাইছেন বার্ত্তা লইবার তরে' দেরী দেখ্‌লে আপনি এসে ধরে নিয়ে গিয়ে 'ডাহর জলে' চুবিয়ে মারবে।

সন্তোষ। আমি চল্লাম তা হলে—

অনাদি। ঐ আর যেতে হবে না, কর্ত্তা নিজেই আস্‌ছেন গ্রেপ্তার কর্‌তে। আমি এই গ্যাঁট হয়ে বস্‌লেম। ব্যাং দোলা কোরে না নিয়ে গেলে নড়ছি নে।

(দ্রুত রাজেন্দ্রের প্রবেশ)

রাজেন্দ্র। বাঃ অনাদি বেশ ! ডাক্‌তে পাঠালাম তবু সাড়া নেই—

অনাদি। নহি নহি সখি পিচ্ছিল পন্থা ! পিছলে পড়ে ঠ্যাং ভেঙ্গে বসে আছি দাদা।

শঙ্কর। কি করিস্ অনাদি ওঠ না। চলুন রাজেন দা যাচ্ছি।

রাজেন্দ্র। এখন আর গিয়ে দরকার নেই, গেট বন্ধকরে দিয়ে এসিছি। যে গোলমাল কর্‌ছে ওরা!

অনাদি। কারা রাজেন দা?

রাজেন্দ্র। কারা আবার?—ঐ ভিখিরীগুলো—

অনাদি। এঁ ওরা গোলমাল করে? এ রকম অসভ্য ভিখিরী কে জোটালে?

সন্তোষ। আঃ অনাদি কি বকছ?

অনাদি। (অনুচ্চস্বরে) আজ আর কাউকে ভয় করছিনে। রাজেন দা, ভিখিরীদের বসিয়ে দেন না। যা হয়েছে— তাই দিয়ে ওরা আরম্ভ করুক। তারপর যেমন যেমন হবে—

রাজেন্দ্র। তা কি হয়? সব্বাইকে এক সঙ্গে বসালে চলবে না—Group করে batch করে বসাতে হবে।

অনাদি। But who is to bell the cat ঐ rowdy দের সামলে, শৃঙ্খলা কে আনবে। আমিত ঐ সব বুভুক্ষিত worse than —

শঙ্কর। থাম্ অনাদি—যা তা বলিস্ নে—

রাজেন্দ্র। তা তোমরা যদি সাহায্য না কর তা হলে একলা আমি যা পারি তাই করব—

অনাদি না না রাজেন দা ক্ষেপেছেন, আজ ভারী ফুর্ত্তি হয়েছে তাই আপনার সঙ্গে বথামী করছি। কিছু না—কিছুনা—আমি একাই তিনলাখ Boorদের Hunদের Visigothsদের মোয়াড়া নিতে পারব। আরে এই যে বিমল দা। (বিমালার প্রবেশ) তোমারই কথা হচ্ছিল।

বিমল। আমি Boor না Hun? কি আমি?

অনাদি। এঃ আড়িপাতা এর মধ্যে কবে তোমার অভ্যাস হল।

রাজেন্দ্র। থাম অনাদি—তা হলে আর কত দেরী বিমল?

বিমল। কিছু দেরী নেই, কিন্তু আগে বন্ধুদের খাইয়ে তাজা করে নিলে হত না?

সন্তোষ। না—না সে হতে পারে না—

অনাদি। কেন হতে পারে না? কে বাধা দেবে?

শঙ্কর। তার চেয়ে এক কাজ কর, বিমল দা, যাদের খিদে পেয়েছে তারা খেয়ে নেক। তারপর তারা কাঙ্গালীদের পরিবেশন করতে আরম্ভ করুক।

অনাদি। এবং সেই ফাঁকে যাদের বারম্বার খাবার ইচ্ছে থাকে তারা বারম্বার খেতে থাক।

বিমল। তোমার কি ইচ্ছে তাই বল না রাজেনদা—কি ভাব্‌ছ এত? আমি ভাব্‌ছি এ সব manage করি কি করে। কোথায় বসাই, আর কি orderএ কাজ ভাগ করে দি।

বিমল। তোমায় কিছু ভাব্‌তে হবে না। আমি সব ঠিক করে নেব। তুমি কেবল দেখে যাও।

রাজেন্দ্র। আমি কিন্তু দানের সময় থাক্‌ব।. ওদের সে সময়কার হাসি মুখটা না দেখ্‌লে আমার সমস্তই বৃথা হবে।

বিমল। বাপ্‌রে, দানের সময় তুমি না থাক্‌লে চলে? তুমি হলে এ আসরে বর I mean the hero.

রাজেন্দ্র। তা হলে আমি gate খুলে দিই গিয়ে।

বিমল। Of course—

(রাজেন্দ্রের ও তৎপশ্চাৎ সন্তোষের প্রস্থান)

অনাদি। ভাগ্যিস্ বিমলদা এসেছিলে, নইলে প্রাণটা গিয়েছিল আর কি ঐ গোঁয়াড়ের পাল্লায় পড়ে।

শঙ্কর। কিন্তু বিমলদা, আসল ব্যাপারটা কখন ঘট্‌বে বল্‌ব ? রাজেনদার বাবাকে কৈ দেখ্‌তে পেলামনা ত ?

অনাদি। তিনি right momentএ dramatically না ঢুকলে effect হবে কেন ?

শঙ্কর। অর্থাৎ ?

বিমল। সে তখন দেখে নিস্ কি রকম হয়—

শঙ্কর। ঐরে পিল পিল করে পিপড়ের সার ঢুক্‌ছে। ওরে এদিকেও যে আস্‌ছে।

বিমল। এই ও—এই ও—গাছপালা ভেঙ্গো না—রাস্তায় ব'স ব'স—চল চল শঙ্কর তুমি ঐ রাস্তাটায় যাও—অনাদি তুমি এই দিকটায় থাক, আমি সুরেশদের ডেকে আনি।

অনাদি। ডাক্‌তে হবে না দাদা, ঐ দেখ ওদিকেও রাক্ষসরা হানা দিয়েছে—সুরেশ রমেশ ছুট্‌ছে।

(চারিদিকে গোলমাল হৈ চৈ। শঙ্কর ও বিমলের প্রস্থান)

[কয়েকজন ভিখারীর প্রবেশ]

অনাদি। এই তোমরা এখানে বস—এই ছোঁড়া নাম গাছ থেকে—ডালে বসে খাবি নাকি এই rascal, পুকুরে নাম্‌ছিস্ কেন ? পেছল যে পড়ে যাবি। খবরদার ফুল ছিঁড়ো না—

(ভিখারীগণের গণ্ডগোল)

১। ওগো পাতা দাও না—

২। কোথায় বস্‌বো—

৩। উ হু হু হু হু—কানা মাগী, দেখ্‌তে পাস্‌নে—

৪। আমি ত' কানাইরে মিন্‌সে তুইত চোক থাক্‌তে কানা—সরে বস না—

অনাদি। এই ও গোল কর না—পাতা আন্‌ছে—

৫। হেই বাবু আমার একটা খোঁড়া ভাই আছে ঐ দেখুন আস্‌তে পার্‌ছে না, একটু এদিকে এনে দাও না বাবু মশায়—

অনাদি। আরে ও ঐখানেই বসুক না—এই খোঁড়া—এই এই খোঁড়া ছেলেটা আর আসিস্‌নে ঐখানেই বস—

(নেপথ্যে—কোথায় ব'সব বাবু এরা যে সরে না—)

অনাদি। আরে ঐখানেই ব'স না—ঐ যা, দূর হতভাগা rascal ফেলে দিলি বেচারীকে—

(নেপথ্যে একজন—ভ্যাঁ ভ্যাঁ—অনাদি অগ্রসর হইয়া একটী খঞ্জ বালককে লইয়া আসিয়া বসাইয়া দিল।)

৫। আমার কাছে দেন—আয় আয় এইখানে ব'স সিধু—আহা লেগেছে—হতভাগা ডানপিটে রাক্কোস মিন্‌সে—

১। কৈ পাত কৈ ?

অনাদি। ও সুরেশ পাত কৈ ?

(সুরেশের দ্রুত প্রবেশ)

সুরেশ। তাইত—তাইত ? আমিও ত' তাই খুঁজছি—এ সব mismanagment.

২। যাও বাবু পাতা আনো বাবু—

সুরেশ। দাঁড়া বেটারা ঘোড়ায় চড়ে এসেছ—ব'স ঐখানে চুপ করে। ঐযে বিমলদা গন্ধমাদন বয়ে আন্‌ছে।

(বিমল ও তৎপশ্চাৎ একজন চাকর শালপাতা আনিল—এবং এক একখানা করিয়া দিতে দিতে চলিয়া গেল।)

কয়েকজন। জল কৈ জল—জল—

সুরেশ। চোপ, চোপ, ঐ পুকুর আছে জল খাস্ তখন। এখন ভোজ খা।

(দ্রুত সুরেশের প্রস্থান)

(কয়েকজন লোকে আহার্য্য লইয়া আসিল। অমনি কলরব আরও বাড়িয়া গেল।)

১। আমায় মোটে বারখানা ও বাবু—

২। ওগো আমার কম হ'ল যে ঐ বামুন ঠাকুর—ও বাবু—

প্রথম পরিবেষ্টা। দাঁড়ানারে দিচ্ছি—কি উৎপাত—

দ্বিতীয় পরিবেষ্টা। সব্বাই পাবি বাপু গোল করিস্ কেন ?

(পরিবেষ্টাদের প্রস্থান)

অনাদি। ওহে এদিকে আর একজন তরকারী আন না। এঃ আমায় তিঙ্ডুতে দিলে না দেখ্‌ছি—

কয়েকজন ভিখারী। যাওনা বাবু যাওনা—আননা এই মশায়—ও মশায়—

অনাদি। থাম্—থাম্—আস্‌ছে—

(তরকারী লইয়া একজন পরিবেষ্টার প্রবেশ ও তরকারী দিয়া প্রস্থান)

অনাদি। বসে যানা ছোঁড়া কি দেখ্‌ছিস্—

বালক। বসবো কি করে ? পেছনে ইঁট যে—

অনাদি। এগিয়ে বস না গাধা—

(সকলে আহারে ব্যস্ত, মাঝে মাঝে পরিবেষ্টারা আহার্য্য দিয়া যাইতেছে ও ভিখারীরা এ উহার পাত দেখাইয়া পরস্পরের সঙ্গে ও পরিবেষ্টার সঙ্গে ঝগড়া করিতেছে। ইতিমধ্যে হাসিতে হাসিতে রাজেন্দ্রের প্রবেশ)

অনাদি। রাজেনদা এই আপনার দরিদ্র নারায়ণ! এই অনাদি দৈত্য না থাকলে নারায়ণরা এতক্ষণ নিজেদেরই ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতো।

রাজেন্দ্র। (হাসিয়া) হাঁ ভাই এই আমার নারায়ণ দোষ নিয়ে, লোভ নিয়ে, পাপ নিয়ে, মলিনতা নিয়ে এই আমার নারায়ণ!

অনাদি। (অবাক্ হইয়া রাজেন্দ্রের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল) রাজেনদা এত লোকের সাম্‌নে পায়ের ধুলো নেব ?

রাজেন্দ্র। কার? আমার! দুর বোকা—খাও ভাই তোমরা—ও যা তোর পাত যে খালি। ও অনাদি কি কর্‌ছিস্ হাঁ করে দাঁড়িয়ে। ও মাণ, লুচী নিয়ে আয় না।

(মণীন্দ্র লুচী আনিয়া দিয়া চলিয়া গেল)

ভিখারিণী। আহা বাবা বেঁচে থাক, এক শ বচ্ছর পরমায়ু হোক—ও বাবু কিচ্ছু দেখ্‌ছে না—তুমি একটু বলে দেও—

অনাদি। আমলো মাগি কি মিথ্যেবাদী—দেখি তোর ঐ পোঁটলাটা—একরাশ লুচী বেঁধেছে তবু আমায় গাল দিচ্ছে—না দাদা আপনার নারায়ণ আপনিই পূজা করতে পারেন—ও আমার হাড়ে হবে না।

রাজেন্দ্র। আহা রাগ করিস্ কেন অনাদি? নেবেনই ত' নেবেন বলেই ত' নারায়ণ এসেছেন। না নিলে না চুরী কর্‌লে কে ডাক্‌ত তাঁকে। তিনি লুটে নেন না এইত দুঃখু!

(রাজেন্দ্রের প্রস্থান)

প্রথম ভিখারী। কি বলে গেলেন ও বাবু—কি লুট করার কথা বল্লেন—ভাঁড়ার লুট করেছে? শালারা এমনি লুভিই বটে—

চতুর্থ। তুমিও বড় কম কিনা—দুহাতে লুট্‌ছ—

তৃতীয়। থাম্ থাম্ মাগী—খেতে এসেছিস্ খেয়ে যা—

[সন্দেশাদি একে একে দেওয়া হইলে বিমল আসিয়া অনাদির কানে কানে কি বলিয়া গেল।]

অনাদি। খেয়ে উঠোনা তোমরা, কিছু কিছু দক্ষিণা আছে।

১। দক্ষিণে! সেকি বাবু—সেতো বামুনে পায়—

অনাদি। তোরা আজ বামুনেরও বড় যেরে—

[ইতিমধ্যে একজন দীনবেশী ভদ্রলোক আসিয়া একজন ভিখারীর পশ্চাতে একটা বড় গাছের অড়ালে দাঁড়াইলেন]

১ম। এই কে তুমি, কি চুরি করছ? ও বাবু আমার সব নিলে বুঝি—

অনাদি। চোপ্ বেটা দেখ্‌ছিস্‌নে ভদ্রলোক, চুপ্ করে থাক।

২। ভদ্রলোক! তা সাম্‌নে আসুন না,—

অনাদি। দূর rascalরা কি বক্‌ছিস্ চুপ কর ঐ দেখ বাবুরা কম্বল আর পয়সা দিতে দিতে দিতে আস্‌ছেন।

(রাজেন্দ্র ও তৎপশ্চাৎ নগেন্দ্রবাবু, বিমল, শঙ্কর প্রভৃতির প্রবেশ। গোপালও ধীরে ধীরে একটী চাকরের হাতে ভর দিয়া প্রবেশ করিল। একটী চাকরের হাতে কতকগুলি কম্বল এবং রাজেন্দ্রের হাতে পয়সার থলি।)

রাজেন্দ্র। ভাই সব, এই ছেলেটীর কল্যাণের জন্য তোমরা আশীর্ব্বাদ কর—এ মস্ত রোগ থেকে বেঁচে উঠেছে বলে আজ তোমরা খেতে পেলে।

অনেকে। আহা বেঁচে থাক—বেঁচে থাক—

রাজেন্দ্র। এই নাও এক একখানা কম্বল—আর এই নাও দু'আনার পয়সা—

ভিখারীগণ। বেঁচে থাক—আহা হাজারবচ্ছর পরমায়ু হোক—ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হোক—সোণার দোত কলম হোক—

(গোপালকে লইয়া ভৃত্য চলিয়া গেল। ভিখারীগণ আনন্দ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেলে সেই দীনবেশী ভদ্রলোক অগ্রসর হইয়া আসিলেন।)

ভদ্রলোক। বাবা আমায় কিছু দেবে না?

রাজেন্দ্র। একি বাবা? আপনি?—পিসেমশায় একি!—(পিতার পদধূলি গ্রহণ)

নগেন্দ্র। কিছু নয় বাবা, সব ভিখারী বিদায় হল এখন এই দুটো বাকি, এদের বিদেয় কর। সুরেনবাবু ভিক্ষে চান—

সুরেন্দ্র। বাবা রাজেন, আমাদের ভিক্ষে দিবিনে যাদের অর্থ নাই তারাই কি কেবল গরীব,—তারাই কি কেবল দয়া পাবে? আমরাই কি কেবল বঞ্চিত থাক্‌ব?

রাজেন্দ্র। বাবা আমায় ক্ষমা করুন। কি এমন অপরাধ করিছি যে এমন দিনে এমন অবস্থায় আপনি আমায় এমন করে কষ্ট দিলেন? আমি যতই পাপী হই তাই বলে কি এত বড় শাস্তি করতে হয়?

সুরেন্দ্র। শাস্তি!

রাজেন্দ্র। হ্যাঁ শাস্তি বৈকি? আপনি এই ভিখারীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে—উঃ—

সুরেন্দ্র। কিছু দোষ হয় নি রাজেন! এরাই ত তোমার পূজোর দেবতা। বাপমাও ছেলের কাছে ভিখারী। ঐ যারা ভিক্ষে নিয়ে চলে গেল তাদের কতটুকু ক্ষিদে, কিন্তু আমাদের ক্ষিদে সারা জীবনের। যেদিন ভূমিষ্ট হয়েছ সেদিন থেকে বাপ মায়ে হাসিটুকু থেকে আরম্ভ করে,—আধ আধ কথা, তারপর আদর আব্দার দামালি, তারপর হাতে মুখে কালী মেখে পড়্‌তে যাওয়া, তারপর বছরে বছরে পাশ করে সুনাম নিয়ে সুখ্যাতি নিয়ে উন্নতির পথে যাওয়া, তারপর মরবার আগে পর্য্যন্ত তার শ্রদ্ধা ভক্তি যত্ন এবং সবচাইতে তারা বেশী চেয়ে আস্‌ছে ভালবাসা। মা বাপ ছেলের কাছে কবে না ভিক্ষুক। আজ সেই চিরদিনের ভিখারী বাপ তোমার কাছে তোমাকে ফিরে চাইছে—তুই একবার আমার বুকে –

(রাজেন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার পদতলে পড়িয়া বলিল)

রাজেন্দ্র। বাবা—বাবা আর বল্‌বেন না—আমি আপনার কাছ থেকে এসে পর্য্যন্ত কি কষ্টে যে আছি—

সুরেন্দ্র। তা যদি বুঝ্‌তে না পারব তবে আমি কিসের বাবা—কিন্তু বাবা অভিমানটা এমন ডাকাতে জিনিষ যে তার অসাধ্য কাজ কিছুই নেই। ওঠো—এইবার নগেন তোমার ভিক্ষেটাও সেরে নাও।

নগেন্দ্র। তা হ'লে বাবা রাজেন্দ্র আমার ভিক্ষেটাও চাই?

রাজেন্দ্র। আপনারা কেন আমায় লজ্জা দিচ্ছেন। আপনারা যা বল্‌বেন তাই করব। ছি ছি বিমল তোমারই এ সব দোষ? কেন আগে থাক্‌তে আমায় বলনি এ সব কথা? বাবা যান আপনারা আমি দেখি সবাই সব জিনিষ ঠিক পেল কিনা—

(রাজেন্দ্রের প্রস্থান)

নগেন্দ্র। নাঃ ব্যাপারটা too much হয়েছে। আহা বেচারী বড় লজ্জিত হয়েছে।

বিমল। তা হোক্ পিসেমশায় বড়রোগের ওষুধও জোরাল দিতে হয়। দেখুন দিথি কাণ্ডখানা! এমন ব্যাপার কেউ করে?

সুরেন্দ্র। চলহে বেয়াই—কেমন এখন বেয়াই বল্‌তে পারিত নগেন।

নগেন্দ্র। দাদা ত' ছিলেন নি না হয় এই রকমেই ডবল দাদা হলেন। চলুন ওঁরা আবার ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌বেন।

(নগেন্দ্র ও সুরেন্দ্রের প্রস্থান)

শঙ্কর। নাঃ ব্যাপারটা বেজায় tragic হয়ে উঠেছিল—হাঁপ ছেড়ে বাঁচা গেল। উঃ রাজেনদার মুখখানা কি হয়ে গিয়েছিল ভাই!

অনাদি। ধন্যি তোমার বুদ্ধি বিমলদা, এর মধ্যে এত করলে কখন। Situation create করতে তুমি একজন অদ্বিতীয়।

সন্তোষ। তা যাই বল ভাই, বিমলবাবুর এতটা করা ভাল হয়নি। রাজেনদার কাজের যে দিকটা মহৎ সেটাকে এমন করে উপহাস করা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা!—

বিমল। ওগো দয়াল! তোমাদের মত Knight errant বন্ধুদের জ্বালাতেই আমার রাজেনদা দিন দিন শুকিয়ে উঠ্‌ছিলেন। নিজেকে বঞ্চিত করে মিছি মিছি কেবল লাফিয়ে বেড়ালে philanthrop হয় না। যে কাজই কর তার মধ্যে যদি আনন্দটাকে হারাও তা হলে সে কাজের মধ্যে যেটুকু অমৃত আছে তাও দু'দিনের মধ্যে বিষ হয়ে উঠ্‌বে। দেখ দিখি অত্যাচার বলে কিনা যে জগতের লোক হবে সে বাপ মা ভাই বোন কারু নয়—সে বিশ্বের, সে বিশ্বমানবের। হায়রে বিশ্ব, আর হায়রে তার বিশ্বমানব! এই বিশ্বমানবের বিরাট লোলিহান রসনার মধ্যে আপনাকে বলি দাও, তারপর ফুটে উঠ্‌বে কি, না একটা অশ্বডিম্বের ন্যায় হিরণ্যগর্ভ মহামানব! এদিকে যে এই ছোট ছোট সুখ দুঃখ নিয়েই বিরাটের শরীর তা যেতে হবে ভুলে! ছোট ছোট সব একটা মহামারীতে যমের বাড়ী পাঠিয়ে বিশ্ব নিয়ে একটা প্রকাণ্ড শ্মশানে বসতে হবে? কার জন্য? না একটা শবারূঢ়া পরম শূন্যের জন্য! সুখে থাক্‌তে মানুষকে ভুতে কিলোয়। আরে তোরাই যদি তাই হবি তবে বছরের ৩৬৫টা দিন স্ত্রীপুত্র পরিবারের জন্য খেটে মর্‌বে কে? সওদাগরী অফিসের কেরাণী হয়ে জন্মালি কেন? জন্মালিনে কেন এক কবির মাথায়? জন্মালিনে কেন—

শঙ্কর। ওগো বক্তা থাম ঐ দেখ আবার কি বিপদ উপস্থিত! রাজেনদা আর তার পিছনে ও কে—একটী মেয়ে যে—সর্ব্বনাশ ব্যাপার! মেয়েটী কাঁদতে কাঁদতে আস্‌ছে যেন?—

(রাজেন্দ্র ও তৎপশ্চাৎ একটী কিশোর বালকের চক্ষে কাপড় দিয়া প্রবেশ। দূরে কার্ত্তিকচন্দ্র।)

রাজেন্দ্র। এই নাও বিমল, তুমি না আমার দরিদ্র নারায়ণকে বিদ্রূপ করে আমার মাথা ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছ। এই নাও সংসারের সেই চিরন্তন সত্যকে! এই নাও এই ছোট ছেলেটীকে—এর বাবাকে--আমাদের শৈলেশবাবুকে কাল তুচ্ছ ক' টাকার জন্য ধরে নিয়ে গিয়েছে এ তাই আজ এর মা বোন সঙ্গে করে তোমাদের সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসেছে। ভদ্রবাঙ্গালীর ঘরের এই পরিবারদের মুখের পানে চেয়ে দেখ কাহারও এতটুকু দোষের চিহ্ন আছে কিনা? বোঝো কতখানি বিপদে পড়ে আজ এরা সেই ভদ্রগৃহস্থের কুলস্ত্রীরা তোমাদের দুয়োরে স্বয়ং এসে দাঁড়িয়েছেন। বল এখন এদের কি হবে? বল এদের এখন স্থান কোথায়? আমায় তুমি যত ইচ্ছে অপমান করতে পার কিন্তু—

বিমল। রাজেনদা, তোমার পায়ে পড়ি ভাই ক্ষমা কর। তোমায় আমি অপমান করলাম এইটিই তোমার ধারণা হল। নিষ্ঠুর। এই এতদিনকার একত্রবাসে কি তুমি এটুকু বুঝ্‌তে পারনি. যে তোমায় আমি কতখানি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তার চাইতেও তোমার নিষ্ঠুরতা এই হয়েছে যে তোমায় কতখানি ভালবাসি তা তুমি টের পাওনি। তুমি যতবড়ই কাজ কর না কেন, আমার কাছে তোমার চাইতে তোমার কাজ বড় নয়। তোমার সব চেষ্টার মধ্যে একটা যে অস্বস্তি ছিল, একটা গূঢ় ব্যথা ছিল, তা এই সব অন্ধদের কাছে লুকান থাকতে পারে, আমার কাছে পারেনি। তাই আমি তোমায় সুখী কর্‌বার জন্যই এই সব করেছি। কিন্তু এতে যদি তোমার অপমান করেছি মনে কর, তা হ'লে—কি বল্‌ব তোমায়—

রাজেন্দ্র। (বিমলের হাত ধরিয়া) বিমল ক্ষমা কর ভাই—

(কার্ত্তিকচন্দ্র অগ্রসর হইয়া)

কার্ত্তিক। না—না ক্ষমা নেই—তোমায় যখন ও অপমান করেছে তখন তার শোধ নিতেই হবে। উনি যে একটুও তোমার হাওয়া পাবেন না তা হবে না। ওঁকেই philanthrophist হতেই হবে।

বিমল। বুঝিছি ঠাকুরদা এ তোমারই কারসাজি, যাক আমি হার স্বীকার কর্‌লাম। চলুন এর মার কাছে, আমি আজ সবতাতেই রাজী।

শঙ্কর অনাদি। কি কি? ব্যাপার কি?

বিমল। বিয়ে রে rascalরা বিয়ে—এক সঙ্গে দুটো বিয়ে রে—আমার আর রাজেনদার। ফলায় পেকেছে আবার—

(বিমল রাজেন ও বালিকার প্রস্থান)

শঙ্কর। Bravo what a brave philanthrophst! কি চমৎকার Comedy!

অনাদি। চমৎকার! না—না—Most lamentable comedy? Midsummernights dream একেবারে মাটী—

শঙ্কর ও অনাদি। Three cheers for the Great comedian ঠাকুরদাদা The Mighty! hip hip hurray.

কার্ত্তিক। থাম থাম বাঁদরের মত হুপ হুপ করিস নে এখনি ইঁট পাটকেল নিয়ে তাড়া কর্‌বে। চল একবার সুরেনদার সঙ্গে দেখা করে cheers নিয়ে আসি। (সকলের প্রস্থান)

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

যবনিকা।

নদী।

ব'য়ে যাও নদি! ব'য়ে যাও,
সঙ্গীতের তরঙ্গ ছুটাও!—
প্রান্তরে প্রান্তরে বহি' পর্ব্বতের অন্তর-মর্ম্মর
কলধ্বনি নির্ঝরের—সূর্য্য করে ভাস্বর সুন্দর
—সিন্ধুপানে আকুল উধাও
ঝঙ্কারিয়া নদি! ব'য়ে যাও!

ব'য়ে যাও নদি! ব'য়ে যাও!
তীরে তীরে সে বারতা দাও
যে বারতা পেলে তুমি মাতৃকোলে সুখশৈলবাসে
শুভ্র স্বচ্ছ তুষারেতে প্রভাতের স্বর্ণরশ্মি হাসে!—
—নন্দনের আনন্দ বহাও,
উচ্ছ্বসি' উচ্ছলি' তুমি ধাও।

ব'য়ে যাও নদি! ব'য়ে যাও!
মাঠে মাঠে ফুল-গান গাও!
—লক্ষ পুষ্প জেগে উঠে তুলি' মুখ ক্ষুদ্র শিশুসম
শিশির-সুস্নাত শুভ্র নির্ম্মল সুন্দর অনুপম!—
—বনে বনে রোমাঞ্চ জাগাও,
কল্লোলিয়া নদি! ব'য়ে যাও!

হে চঞ্চল মত্ত বারিধারা!
যে কুসুম অরুণ উষার
রক্তরাগে জেগে উঠে সৌন্দর্য্যের জাগা'ল কামনা,
গন্ধ তারি, হিল্লোলিত সিন্ধুবক্ষে ভাসে যে জোছনা
তারে গিয়া দাও উপহার!
—পুলকের বহুক্ পাথার!

তরল অমৃত জলধারা
কলহাস্যে ভাসাও সংসার!
যে আনন্দ নিত্য ঝরে পর্ব্বতের বিহঙ্গ-সঙ্গীতে,
শৈলে শৈলে রাজে আর কুঞ্জে কুঞ্জে সহস্র ভঙ্গীতে,
লোকালয়ে বার্ত্তা গাহ তার,
আনন্দের আন সমাচার।

আজি তব মধু জলধারা
হরষের নাহি নাহি পার!
রূপে গন্ধে ছন্দে গীতে তরঙ্গিত পূর্ণপ্রাণ খানি
প্রশান্ত সিন্ধুর পদে অনন্ত আনন্দে দিবে আনি'!
—সে-আনন্দ-বিন্দু-সুধাধার
জুড়াইবে তৃষিত সংসার!

শ্রীগনেশচন্দ্র রায়।

মঙ্গল-মঠ।

—:*:—

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

——:*:——
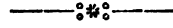
সত্যের সাধনার মধ্যে, ফাঁকি দিয়া মদের নেশায় সমাধি জমাইতে চাহিলে, সমাধির শান্তিলাভ হয় না বটে, কিন্তু নেশার মত্ততা জমিয়া উঠে, প্রাণঘাতী রূপে,—নিরঞ্জন ধীরে ধীরে বুঝিল, কিন্তু বুঝিতে তাহার হৃদ্পিণ্ডটা শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল!

নির্লিপ্ত চিত্তে বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের ধ্যানই শিল্পীর জীবনের ব্রত; ধ্যানলব্ধ ভাবকে রূপে প্রতিষ্ঠিত করাই তাহার কর্ত্তব্য,—সাধন,—অন্তরের অনুভূতির সার্থকতা;—কিন্তু তাহার মধ্যে যদি, এতটুকু অসতর্কতা,—এতটুকু অপরাধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আসিয়া পড়ে,—তবেই সর্ব্বনাশ!

কিন্তু সে কি সত্যই কোন অপরাধ করিয়াছে?—সে কি তাহার রমণীয়তা-ধ্যান-সাধনার আসনে বসিয়া সত্য সত্যই কেবল রমণীত্বকেই প্রাধান্য দিয়া ফেলিয়াছে!—নিরঞ্জন বেদনাহত মর্ম্মে আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিল—সে তাহার চিত্ত-মন্দিরের বরণীয় অধিষ্ঠাত্রী শিল্প সরস্বতীদেবীর ধ্যানাত্মক পূজার মধ্যে, আত্মবিস্মৃত হইয়া বাস্তবিকই কি কোন কামনাত্মক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছে?—

—না না, সে তাহা করে নাই!—তাহা করে নাই!—সে নির্ভীক দৃঢ়তায় উত্তর দিতে প্রস্তুত আছে, তাহার চিত্ত, নীচ ভোগাসক্তিকে ঘৃণা করে, বড় ঘৃণা করে!—তবে মুগ্ধতা? হাঁ—নিঃসঙ্কোচে সে উত্তর দিতেছে, সে মুগ্ধ হইয়াছে, রমণীয়তার উপর রমণীত্বের প্রাধান্য দিয়াছে!—কিন্তু ভগবান জানেন এ প্রাধান্য স্থাপনের জন্য দায়ী কে?—

নিরঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, সচেতন হইয়া চারিদিকে একবার চাহিল। ছুটী হইয়া গিয়াছিল তখন, সঙ্গীরা চলিয়া গিয়াছে, শুধু সেই একলা বসিয়া, তাহার নক্সার ভুলগুলা সংশোধন করিতেছে—সেখানে আর কেউ নাই!

নিরঞ্জন আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, আঃ জীবনটা কি শুধু বেদনাসঞ্চিত দীর্ঘশ্বাসেরই স্তূপ মাত্র?—আর কিছুই নয়?—নিরঞ্জন আবার অন্যমনস্ক হইয়া হাতের যন্ত্র ফেলিয়া দিল, সংশয়াকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া নিস্তব্ধ ভাবে আবার বসিয়া ভাবিতে লাগিল!

কেবলরাম সেইদিক দিয়া কোথায় যাইতেছিল, নিরঞ্জনকে সে সময় একলা সেখানে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "তুমি যে বড় এখনো বসে রয়েছ।"

শুষ্কহাসি হাসিয়া নিরঞ্জন বলিল "কতকগুলো ভুল করেছি কেবলবাবু—"

"কেন?" কেবলরাম বলিল "তুমি ভুল করেছ? কেন!"

তাইত সে ভুল করিয়াছে কেন এমন ভুলের উপরও 'কেন' প্রশ্ন চলিতে পারে, সেটা যে এতক্ষণ সে ভাবিয়াও দেখিতে পায় নাই! তবে?—তাইত ইহার কারণ কি?—তাড়াতাড়ি আসল প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া বলিল "আপনি কোথা যাচ্ছেন?"

"দেয়ানজীর কাছে, একটু দরকার আছে।"

"ওঃ, আসুন—"

"তুমি উঠ্‌বে কখন?—যা রইল কাল এসে শেষ কোরো, বেলা যে গেল—"

"আজ্ঞে এই যে উঠি"- -নিরঞ্জন তাড়াতাড়ি উঠিয়া যন্ত্রপাতি গুটাইতে লাগিল; কেবলরাম চলিয়া গেল;

নিষ্ফলক্ষোভে নিরঞ্জনের সমস্ত চিত্ত জুড়িয়া বেদনার তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ হইল, তাইত তাহার ভুল হয় কেন?—এ ভুলের ক্ষতিপূরণ করিতে কত খেসারত দিতে হয়, তাহা কি সে জানে?

অনুভূতি-প্রবাহ যতক্ষণ অবাধ-স্বচ্ছন্দতায় ছুটিতে পায়, ততক্ষণই সুখময়, কিন্তু নিষিদ্ধতার খাদে আট্‌কাইয়া গতিহীন হইলে—আর তাহার রক্ষা নাই! চারিদিকের বেষ্টনে আহত হইয়া, তাহার স্রোত যতই ঠিক্‌রাইয়া মধ্য কেন্দ্রে পিছু হটিবে—ততই উগ্র-উত্তেজনায় ফুলিয়া উঠিবে, ততই ঘূর্ণবেগ বাড়িয়া চলিবে!

নিরঞ্জন যন্ত্রগুলা পরিষ্কার করিতে করিতে, সাঁড়াশীতে নিজের একটা আঙ্গুল চিম্‌টাইয়া ধরিয়া আবার অন্যমনস্ক হইয়া গেল!—হায় তাহার এ ভুলের জন্য দায়ী কে?

—তাহার এ চিত্তোন্মাদনার মোহ কে—আত্মদ্রোহী মূঢ়ের মত সে কি কেবলই হীনদৃষ্টিতে দেখিবে?—অপরিসীম ক্ষোভে উন্মাদ হইয়া, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চমকিত করিয়া, সারা আকাশটা চিড়াইয়া উগ্রকণ্ঠে নারীসৌন্দর্য্যকে সে একটা প্রকাণ্ড ধিক্কার দিয়া—আপনাকে কাল্পনিক মহনীয়তায় গৌরবান্বিত করিয়া তুলিবে? কিন্তু নাঃ, তাহাতেই যদি সব চুকিয়া যাইত, তাহা হইলে ভাবনা ছিল কি?—তাঁহার চিত্তের সে কমনীয়তা,—তাহার স্বভাবের সে সৌন্দর্য্য সুষমা বিকাশ,—না—না—না!—নিরঞ্জন আর্ত্ত-বিহ্বল চিত্তে অন্তরের মধ্যে লুটাইয়া পড়িল!

ওগো না না না, এ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য! এ পূজনীয়--আরাধনীয় বস্তু!—ইহার মধ্যে অশ্রদ্ধা অবজ্ঞার স্থান নাই!—সে যে মর্ম্মে-মর্ম্মে এ সত্য উপলব্ধি করিয়াছে! সে কেমন করিয়া নিজের দুর্ব্বলতাকে ঢাকিবার জন্য—আপনার চক্ষে আপনি ধূলি দিয়া--আত্মপ্রতারণার মধ্যে, মিথ্যার আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবে?—না সে তাহা পারিবে না, থাকুক তাহার বুক বেদনায় ভরা!—সে এই বেদনাই, গভীর সম্ভ্রমের সহিত, চিরদিন নিঃশব্দ গাম্ভীর্য্যে, হৃদয়ে বহন করিবে!—আপনাকে টানিয়া সাধনার শৃঙ্খলে বাঁধিয়া,--প্রভুত্বের নীচে খাটাইবে! সমস্ত দ্বন্দ্ব দ্বিধা কাটাইয়া নিজেকে সে আত্মার সম্মুখে আবার নির্ম্মল, ভাস্বর করিয়া, নির্ভয়ে গৌরবোজ্জ্বল শীর্ষে দাঁড় করাইবে, কিসের সঙ্কোচ, কিসের শঙ্কা তাহার? সে নির্ভীক!—

উত্তম, নিজের দিক হইতে তো সমস্ত বন্দোবস্ত চুকিল, কিন্তু—

—আবার কিন্তু কি?

অপর পক্ষে?—

ওঃ!—নিরঞ্জনের আবার দীর্ঘশ্বাস পড়িল!—সে চিন্তার অধিকার তাহার আছে কি?

—কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই নিরঞ্জন আত্ম-বিস্মৃত হইয়া গেল!—তাইত—সে যে বড় ভয়াবহ—নির্ঘাৎ চিন্তা!—তাহার মাথার ভিতর ঘোরতর বিপ্লব বাধিয়া উঠিল।

গোলকের দ্বারী, অভিশপ্ত জয়-বিজয় বিষ্ণুর কাছে বর চাহিয়াছিল, জন্মান্তরে যেন তোমায় শত্রু রূপে প্রাপ্ত হই, ইহাই বর দাও,—কারণ শত্রুর মত তীব্র চিন্তনীয় বস্তু পৃথিবীতে আর নাই!—

ভয় যেখানে বেশী, ভাবনা সেইখানেই !—নিরঞ্জন আকুল হইয়া উঠিল, তাহার মনের নেপথ্য প্রদেশে, অসংখ্য দৌরাত্ম্যের তীব্র কোলাহল, দুরন্ত আগ্রহে জাগিয়া উঠিল, নিরঞ্জন যন্ত্রপাতি লইয়া অধীর ভাবে উঠিয়াপড়িল। দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে চলিল।

—না না সে তাহার সমস্ত অনুভূতিকে এবার মন-ত্রাণকারী মন্ত্রে ভরিয়া তুলিবে, আর অন্য চিন্তাকে মনে ঠাঁই দিবে না ! তাহার প্রতিমা পূজার বাহ্যক্রিয়াকলাপ শেষ হইয়া গিয়াছে, এবার বাহিরের দিক হইতে সে বিরাট উৎসবের অবসান করিয়া ফেলিতে হইবে !—এই এক নিমেষের শ্রদ্ধা-মুগ্ধ সঙ্কল্প,—নিষ্ঠাপূত উদ্বোধন, সব ভুলিয়া যাইতে হইবে, এই আড়ম্বরময়ী পূজাস্মৃত,—এই বিশ্ব-উজ্জ্বলা মানসীপ্রতিমার সহিত সমূলে বিসর্জ্জন করিতে হইবে !

তবে আর কি ? এবার দক্ষিণান্ত হইয়া যাক্ !—কিন্তু একি ? দক্ষিণান্তের মন্ত্র উচ্চারণ করিতে একি প্রাণাকুল বেদনায় বুক ভরিয়া উঠে ?—এ দক্ষিণান্তের ব্যবস্থা তো সঙ্কল্পের সঙ্গেসঙ্গেই স্থির হইয়া আছে ! তবে ? তবুও কেন এ নিষ্ফল অনুতাপ !

না না ভুল হইতেছে, এই অনুতাপই বুঝি এ পূজার চরম ফল !—ঠিক্, ইহাতেও কাতরতা দ্বারা অনুনয় করিয়া, কিম্বা শাসনের দ্বারা ভ্রূকুটী দেখাইয়া,—হৃদয়হীনের মত নিষ্ঠুরভাবে দূরে খেদাইয়া দিলে হইবে না,—ইহাকে যে উন্নত-সংযত শুচিতায় জীবনের মত বরণ করিয়া লইতে হইবে,—হৃদয় ভরিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে,—দুর্ব্বলতা দেখাইয়া ইহাকে ফাঁকী দিলে চলিবে না !—

তবে তাই হোক, এই অনুতাপের, স্বস্তি-অঞ্জলি—আজীবন ধরিয়া ঢালিতে থাকুক,—ঐ নিভৃত মর্ম্ম-মন্দিরের, বিসর্জ্জিতা প্রতিমার শূন্য পাদপীঠে !—

নিরঞ্জন অথিতিশালায় আসিয়া সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিতেছে, আদিত্য ও সনাতন তখন উপর হইতে নামিয়া আসিতেছিল, নিরঞ্জনকে দেখিয়া বলিল "বেড়াতে যাবি কন্দর্প ?"

কন্দর্প !—নিরঞ্জন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, কথাটা কানে বড় বিষম অদ্ভুত শুনাইল,—নিজের অজ্ঞাতে, বিস্ময়-বিকল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আবার ? এখনো কন্দর্প ?"

আদিত্য হাসিয়া ব্যঙ্গস্বরে বলিল "তবে কি শিবত্ব চাও, কিন্তু সে তোমার ধাতে সইবে কি ?"

নিরঞ্জন নীরব দৃষ্টিতে তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিল, হঠাৎ তাহার যেন বাক্শক্তি লোপ হইয়া গিয়াছিল !—তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া সনাতন একটু হাসিয়া আদিত্যকে বলিল "কেন ?"

"ওর প্রকৃতিটা যে অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে ধীরোদাত্ত নায়ক গোছের!—ওর মধ্যে নাআছে মড়ার খুলিতে সিদ্ধি-পানের ক্ষমতা, নাআছে সতীশোকে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের তেজস্বিতা !"

সনাতন বলিল "কিন্তু তপশ্চর্য্যায় সমাধি লাভের উৎসাহটা জোর তালে আছে, তার আর ভুল নাই !—

আদিত্য অর্থ-সূচক হাস্যে বলিল "কিন্তু উন্মত্ত মহেশের তপশ্চর্য্যার ফল কি জানিস্ তো ?...পর্ব্বত-রাজ দুহিতা—"

নিরঞ্জন অসহিষ্ণু ভাবে দ্রুতপদে পাশকাটাইয়া উপরে উঠিয়া গেল ; ঘর খুলিয়া, যন্ত্রগুলা বাক্সর উপরে ফেলিয়া, সে দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল !

বিংশ পরিচ্ছেদ।

আগামীকল্য মায়ার বিবাহ। একদিনেই গাত্রহরিদ্রা, কামান, বিবাহ, সমাপ্ত হইবে। স্বয়ং হৃষীকেশ হইতে আরম্ভ করিয়া, অপরাপর সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। দরিদ্রা বিধবার দৌহিত্রীর বিবাহ,—নিতান্তই দায়-উদ্ধার হওয়া মাত্র! ইহাতে ধুমধামের আয়োজন লেশমাত্রও নাই, বিশেষ পাত্র মন্মথনাথও তাহাতে অনিচ্ছুক। জনৈক দুর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের সহিত তিনি অদ্য বৈকালের ট্রেণে বম্বে আসিবেন, এবং উক্ত আত্মীয়ের পরিচিত জনৈক ভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকিয়া বিবাহকার্য্য সমাধা করিয়া পরদিন বধূ লইয়া বরাবর এলাহাবাদ ফিরিয়া যাইবেন। বরযাত্রীর মধ্যে নাপিত, ব্রাহ্মণ এবং বরকর্ত্তা ছাড়া আর কেহই আসিবার নাই,—তবে হৃষীকেশবাবু এখানকার সরকারী অফিসের একজন পদস্থ কর্ম্মচারী—অনেকেই তাঁহাকে চেনে শুনে, সুতরাং তাঁহার বাটীতে বিবাহোৎসবে সহরের দুই দশ ভদ্রলোক অবশ্যই নিমন্ত্রিত হইবেন, সেই জন্য—শুধু হৃষীকেশের নামের খাতিরে, সামান্য একটু গোলমাল হইতেছে মাত্র।

চারিদিকে কর্ম্মকোলাহল, চারিদিকে ব্যস্ত-উদ্বিগ্নতার চঞ্চলস্রোত, বেদান্তবাগীশ মহাশয় হৃষীকেশ ও কেবলরাম বাহিরের সমস্ত ব্যবস্থার তদারক করিয়া বেড়াইতেছেন,—বাড়ীর ভিতর শান্তিদেবী ও বৌদিদি, দিদিমা এবং অপরাপর প্রতিবেশিনী মহিলাগণ নানা কাজে ঘুরিতেছেন। আজ প্রতিকাজেই দিদিমার ভুল হইতেছে, সকল কথাতেই চোখে অশ্রু ঝরিতেছে,—সকলের অনুযোগ, নিষেধ, সান্ত্বনা স্বত্বেও, আজ তাঁহার—বহুদিনের বেদনা-রুদ্ধ শোকোচ্ছ্বাস, গভীর আবেগে উথলিয়া উঠিতেছে! তিনি কোনমতেই আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না;

মায়াকে সাজাইয়া-গুছাইয়া 'কর্ণে' চন্দন পরাইয়া, বৌদিদি ঘরে বসাইয়াদিয়া আসিয়াছেন, প্রতিবেশী বালক বালিকাগণ সেখানে মহোল্লাসে চীৎকার করিয়া লাফালাফি দাপাদাপি করিয়া খেলিতেছিল। মায়ার সমবয়স্কা একটি বালিকা, তাহার গা ঘেঁসিয়া বসিয়া, আবোল-তাবোল মাথামুণ্ড কত কি বকিতেছিল, মায়া বিষণ্ণ গম্ভীর, নীরব। জিজ্ঞাসিত হইয়া মাঝে মাঝে দুই একটা প্রশ্নের উত্তর দিতেছিল,—কিন্তু তাহাও কষ্টসৃজিত স্বাচ্ছন্দ্যের করুণ বেদনাসিক্ত—সংক্ষিপ্ত উত্তর। মায়ার সঙ্গিনী,—মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ কন্যা। সে বিবাহিতা, তাহার নাম মন্বা,—বয়োধর্ম্মে,—স্ফূর্ত্তি সজীবতার মুক্ত-উচ্ছ্বাসে তাহার সমস্ত প্রকৃতি মুখর চঞ্চল। হাস্যোৎফুল্ল মুখে সে মায়াকে কেবলই জিজ্ঞসা করিতেছিল, "বিয়ের নামে তোমার এত লজ্জা কেন বল দেখি?"—মায়া ম্লান হাসি হাসিতেছিল।

কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া মন্বা বলিল "দেখো আমার যখন বিয়ে হয়েছিল, তখন আমি খুব ছোট—কিন্তু বেশ মনে আছে, সেদিন আমার ভারি আহ্লাদ হয়েছিল! এখনও কারুর বিয়ের ধুমধাম দেখ্‌লে আমার ইচ্ছে হয়, সেই পুরোণো বিয়েটাকে আর একবার নুতন করে ঝালিয়ে নিই!" সে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল!

মায়া, ক্ষীণভাবে সে হাসিতে যোগ দিল, কিছু বলিল না। মন্বা তাহার হাতখানি নিজের হাতের উপর টানিয়া লইয়া বলিল, "আজ তোমার মনে খুব আহ্লাদ হচ্ছে, না?"

মায়া অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া উত্তর দিল,—"হতে পারে।"

মন্বা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল "হতে পারে! ওঃ উনি নিজে কিছু জানেন না! ভারী বোকা!"

মায়া হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু হাসিতে পারিল না!—হাঁ সে নির্ব্বোধ,—তাহার অনুভূতির সাড়া সে নিজেই খুঁজিয়া পাইতেছে না! তাহার অনুভূতি-কেন্দ্র আজ মহাব্যাধি আক্রান্ত, অসাড় নিৰ্জ্জীব!—কিন্তু হায়, সে যদি

একটা বিষয়ে,—শুধু জগতের একটীমাত্র স্মৃতিদংশনের যন্ত্রণা অনুভব করিতে—এমনি ভাবে অসাড় থাকিত,—তাহা হইলে মায়া আজ কি মুক্তির আরামেই ধন্য হইত!

অজ্ঞাতে ভিতর হইতে দমক্ দিয়া একটা নিঃশ্বাস ঠেলিয়া উঠিল, মায়া চমকিল! আর কেন? এ অন্তর্বিষের গরলাংশ জগতের নির্ম্মল বায়ু স্তরে ঢালিয়া—কেন এ শান্ত-স্নিগ্ধ বায়ুকে ক্ষিপ্ত-বিক্ষুব্ধ করা! মুহ্যমান অন্তরাত্মার এ নিগূঢ় বেদনা হুঙ্কার,—কেন অকস্মাৎ বক্ষঃপঞ্জর ভাঙ্গিয়া,—অতর্কিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে! আজ কয়দিন ধরিয়া,—কর্ম্মস্রোতের ক্ষণ-পরিবর্ত্তনীয় তরঙ্গ-রঙ্গের উচ্ছল-প্রবাহে প্রাণকে ভাসাইয়া, মায়া কত যত্নে, কত সতর্কতায়; কত শক্তিতে আপনাকে কর্ত্তব্যপথে টানিতেছে,—কিন্তু হায়, তবু তাহার বুকের ভিতর অহোরাত্র সেই প্রচণ্ড স্পন্দন—অবিশ্রাম সমান তালে ধ্বনিত হইতেছে! সে যে লক্ষ চেষ্টাতেও ইহার হাতে নিষ্কৃতি পাইতেছে না!

অন্যমনস্কা মায়ার কোলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সৌহৃদ্যাবেগে স্নেহময় কণ্ঠে মন্বা বলিল "সত্য বল না, তোমার কি মনে হচ্ছে?"

মায়ার ত্রাসাকুল হৃদয়দ্বারে এ প্রশ্ন আবার নির্ঘাৎ জোরে বাজিল! তাহার মুখখানা নিমেষ মধ্যে শবের মত বিবর্ণ নিষ্প্রভ হইয়া গেল, শুষ্ক ঢোক গিলিয়া মায়া বলিল "কই কোথা!—"

তাহার মুখপানে চাহিয়া মন্বার আনন্দোজ্জ্বল মুখ মলিন হইয়া গেল—তাহার মনে পড়িল, প্রশ্নটা অত্যন্তই নির্দ্দয়-প্রশ্ন হইয়াছে! আহা, আজিকার দিনে উহার পিতা মাতা জীবিত নাই! তাঁহাদের বিয়োগ-বেদনা কি আজ উহার বুকে বাজে নাই?—ক্ষুণ্ণ অনুতপ্ত মন্বা সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল "দুঃখ কোরো না মায়া, সবই ভগবানের হাত, বাপ মা কারো চিরদিন থাকে!

মায়া, আহত চকিত নয়নে তাহার মুখপানে চাহিয়া, মস্তক নত করিল! হায়, কোথায় সে স্বর্গীয় তৃপ্তিবাহী শোকের বেদনা,—আর কোথায় এই অভিশপ্ত মনস্তাপের নিদারুণ যন্ত্রণা! এ যে কিছুই নয়, অথচ সব! তাহার সমস্ত বোধাবোধ শক্তিই যে আজ সেই দুর্নিরীক্ষ্য অদৃশ্যের মাঝে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছে! সে যদি আজ তাহার আয়ত্তের মধ্যে সচেতন থাকিত,—তাহাকে যদি সে আজ শোকের চরণে সঁপিয়া দিতে পারিত, তাহা হইলে,—আঃ সে ত বাঁচিয়া যাইত!

নিঃশব্দে মায়ার সমুদয় বুকটা গুঁড়াইয়া, একটা মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদ অন্তরে করুণ-কাতরতায় হাহাকার করিয়া উঠিল! মায়ার মনে হইল অসম্বরণীয় আবেগে সে বুঝি এখনি উচ্চ চীৎকারে কাঁদিয়া উঠিবে! কিন্তু নাঃ, এখন কিছুতেই চোখের জল ঝরিতে দেওয়া হইবে না, তাহার গোপন-মর্ম্মভেদী পরিতাপ-যন্ত্রণা—মিথ্যার কলঙ্ক-মলিন ছলনায় ঢাকিয়া—অপরের দৃষ্টিতে, শোকের স্বর্গশ্রীতে ফুটাইয়া তুলিতে পারিবে না!—সে কপটতা অসহ্য! সে কাঁদিবে না—কিছুতেই কাঁদিবে না!

নির্ম্মম-কাঠিন্য—উচ্ছলিত চিত্তাবেগের সহিত যুঝিয়া, বদ্ধ-বাষ্প-চাপে তাহার বুকের ভিতর যেন নিঃশ্বাস আটকাইয়া গেল, তাহার রক্তশূন্য পাংশু মুখমণ্ডল, মৃত্যুর করাল ছায়া যেন স্পষ্ট বিদ্রূপে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল!—হায়, মরণাহতের আত্মগোপন ছলনা!

শান্তিদেবী কি কাজের জন্য, সেইদিক দিয়া যাইতেছিলেন, দূর হইতে কেবলরাম ডাকিয়া বলিল "দিদি, চট্ করে আমাদের তিনজনকার জলখাবার দাও, আমরা বর আন্‌তে ষ্টেশনে যাব!"

শান্তিদেবী প্রশ্ন করিলেন "তিনজন কে ?—"

কেবলরাম উত্তর দিল "বরের ভগ্নিপতির বন্ধু সৌরীনবাবু, আমি আর নিরঞ্জন।"

"নিরঞ্জন ?"—সমস্ত জগতের বুক চিড়াইয়া যেন ভয়ঙ্করী বজ্র ঝঞ্ঝনা হানিয়া গেল ! রুদ্ধশ্বাসে, উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি তুলিয়া মায়া কেবলের মুখ পানে চাহিল—নিরঞ্জন যাইবে ? কেন যাইবে ? এ কি অদ্ভুত !

কেবলরাম মায়ার দৃষ্টির ভাষা বুঝিল না, কোন উত্তর দিল না, শান্তিদেবীকে ডাকিয়া লইয়া সে ফিরিয়া চলিল। যাইতে যাইতে শান্তিদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ বুঝি ঠাকুরবাড়ীতে ছুটী আছে, তাই নিরঞ্জন এসেছে,—আচ্ছা ওর সঙ্গী ছেলে ছুটিকে ডাকিস্ নি ?

কেবলরাম উত্তর দিল "ছুটির দিনে কি তাদের চুলের টিকি দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তারা কোথা বেড়াতে বেরিয়েছে। নিরঞ্জন একলাটি ঘরে ছিল, ওকে ধরে নিয়ে এলুম, সৌরেনবাবুর বাসায় বরকে পৌঁছে দিয়ে ফির্‌তে রাত হবে, একলা আস্‌ব, তাই সঙ্গী জোটালুম।"

তাঁহারা চলিয়া গেলেন। মায়া হঠাৎ ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "আমি ওঘরে যাই, পান সাজ্‌তে হবে—"

মন্বা বাধা দিয়া বলিল "পান ত ঢের আছে,—সারাদিন পান সেজে চুণ খয়েরে তোমার হাত হেজে খারাপ হয়ে গেছে, বৌদিদি কত রাগ কর্‌ছিলেন, আর পান সাজবার দরকার নেই।—"

"দরকার নাই !—" মায়ার হৃদপিণ্ডের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া ঘা পড়িল,—অসহায় ভীতি-তাড়নায় তাহার সমস্ত বুক জুড়িয়া বিরাট আকুলতা হায় হায় করিয়া উঠিল, হাতপা গুলা স্পষ্ট কাঁপিতে লাগিল,—ব্যাকুল দৃষ্টিতে মায়া চারিদিক চাহিল, তাইত সে তাহা হইলে কি করে ? সে কি-ছুতায় আপনাকে ঢাকিয়া ফেলিয়া এ উৎকণ্ঠা সামলাইয়া লয় !—ব্যস্ত ভাবে বলিল "আমি ছাদের কাপড় ক'খানা তুলে নিয়ে আসি।—"

সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে শুনিল মন্বা আর কাহার উদ্দেশে—নিম্নকণ্ঠে বলিতেছে "মায়ার মুখখানা বড় কান্না কান্না দেখাচ্ছে—নয় ? কেউ ওকে বকেছে না কি ?—"

স্খলিতচরণে মায়া টলিতে টলিতে সিঁড়িতে উঠিতে লাগিল।—বলুক, বলুক, উহাদের যাহা ইচ্ছা উহারা তাহাই বলুক, কি যায় আসে ! উহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া অন্তঃসমুদ্রের এ প্রলয় আলোড়নের কি দেখিতে পাইতেছে ? কিছুই না !—আভাসে অনুমান ?—করুক্ !—সে আর তাহা লুকাইবার জন্য মিথ্যা প্রবঞ্চনায় ঝুটাপাটী করিয়া মরিতে পারে না !—পারিবার শক্তি নাই !

নির্জ্জন ছাদের উপর লুটাইয়া পড়িয়া মায়া রুদ্ধস্বরে কাঁদিয়া উঠিল ! ওগো অন্তরীক্ষবাসীগণ, মার্জ্জনা কর, সে আর কাহারও সাক্ষাতে এ-বোঝা নামাইতে পারে নাই,—এ তাহার নিজের বোঝা বলিয়া ! একান্তই নিজস্ব বলিয়া !—এবার তোমরা ক্ষমা কর, একবার তাহাকে এই নির্জ্জনে নিজের জন্য প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে দাও ! নিজের ?—মায়া, কথাটা ভাবিতে আতঙ্কে শিহরিল,—পরক্ষণে সজোরে মনের কাছে জবাব দিল—হাঁ নিজের জন্যই ত !, না হইলে ইহার জন্য আর কাহার কি ক্ষতি বৃদ্ধি আছে ?

নীচে উৎসব উপলক্ষে সমাগত লোক ব্যস্ত কোলাহলে ছুটাছুটী করিতেছিল, বেদান্তবাগীশ মহাশয় বাড়ীতে ঢুকিয়া কি কাজের জন্য উচ্চকণ্ঠে কন্যাকে ডাকিলেন—"শান্তি—মা—"

শান্তিদেবী ভাণ্ডারগৃহ হইতে উত্তর দিলেন "যাই বাবা, একবার দাঁড়ান—"

মায়া সচেতন হইয়া উঠিয়া বসিল,—না না, নিজের পানে চাহিয়া এমন আত্মহারা হইলে চলিবে না!—চারিদিক হইতে ঐ সাড়া আসিতেছে, নিজের এই নিরানন্দ অসাড়তা পিছনে ফেলিয়া,—চারিদিকের ঐ উদ্দাম-চঞ্চল কর্ম্মস্রোতের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে! অন্তর্জগতের এই বেদনাচ্ছন্ন মূঢ়তা, বাহ্যজগতের ঐ উৎসাহ-মুখর কোলাহল সজীবতার মধ্যে বিসর্জ্জন দিতে হইবে!—এবার আপনার মুখের উপর অবগুণ্ঠন টানিয়া,—সম্পূর্ণরূপে নিজের দৃষ্টিরোধ করিয়া—নিজেকে ভুলিতে হইবে,—শুধু নিজেকে ভুলিবার জন্য সাধনা করিতে হইবে!

মায়া চক্ষু মুছিয়া উঠিল, দুইহাত রগড়াইয়া দৃষ্টি পলকের সমস্ত অশ্রুবিন্দুগুলি শুখাইয়া ফেলিল। ছাদের কাপড়গুলা একে একে তুলিয়া কোঁচাইতে লাগিল। পূর্ব্বদিকের আলিসায় দিদিমার কাপড় দুইখানা শুখাইতেছিল, কাপড় দুইখানা তুলিতে গিয়া সম্মুখস্থ সদরের বৈঠকখানার দিকে মুক্তবাতায়নপথে দৃষ্টি পড়িল, বৈঠকখানায় অনেক লোক বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, বাতায়নসম্মুখে চৌকির উপর জনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন—আর ও-কি—! তাঁহার পশ্চাতে চৌকির পিঠে ঈষৎ হেলিয়া দাঁড়াইয়া,—হাস্য-স্মিত বদনে নীরবে বৃদ্ধকে পাখার বাতাস করিতেছে,—কে-ঐ প্রিয়দর্শন যুবা? বাতায়নপার্শ্বস্থ বৃক্ষের পত্রান্তরালচ্যুত—অস্তগামী সূর্য্যের এক গুচ্ছ স্বর্ণোজ্জ্বল রশ্মি, তাহার বিমল সুন্দর ললাটের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সে কিরণরাগে তাহার বিষণ্ণ-কোমল মুখশ্রী কি মহনীয় সৌন্দর্য্যে অভিষিক্ত হইয়াছে?—মায়ার দৃষ্টি ইন্দ্রজালমুগ্ধ, স্তম্ভিত, নিস্পলক হইল!

মনে পড়িল আর এক দিন,—ঠাকুরবাড়ীতে পূজাগৃহের দ্বার পার্শ্বে—ঐ ব্যক্তিকে,—ঠিক্ অমনই মৃদু-বঙ্কিম-ভঙ্গীতে হেলিয়া দাঁড়াইয়া,----মিথ্যা-অপবাদ-দাতা দুর্ব্বৃত্ত দয়ানন্দের উদ্দেশ্যে উত্তেজনা-ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে বলিতে শুনিয়াছিল,—"মানুষের দুর্ব্বলতার গ্লানি আন্দোলন করতে—উচ্চারণ করতে--আমার বড় ঘৃণা বোধ হয়!" মায়ার মনে আছে, সেদিন ঐ প্রশস্ত-আয়ত দৃষ্টিতে সে কি ক্ষোভ,—কত কি ঘৃণার দীপ্তি দেখিয়াছিল।

তার পর—তার পর, সেই দিনেরই আর এক দৃশ্য মায়ার স্মৃতিপটে উদিত হইল,—সেই পথের ধারে, আত্মহারা ধ্যানে, চিত্রাঙ্কনরত শিল্পীর সমাধিমগ্ন ভাব!—তাহার সে দৃষ্টিতে কি স্বপ্নময় বিভোরতা—কি অপার্থিব সরলতার জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে দেখিয়াছিল, সে মুগ্ধ গরিমাময় দৃশ্য মায়ার বুকের ভিতর উজ্জ্বল ভাবে অঙ্কিত আছে, মায়া তাহা কখনও ভুলিতে পারিবে না!—একদিন সমস্ত জগতকে—সকল মনুষ্যকে ভুলিয়া যাইতে পারে,—কিন্তু মুহূর্ত্তের দেখা,—সেই স্বচ্ছ-সরলতায় স্নিগ্ধ-পবিত্র দুইটি নয়নের শান্ত-মুগ্ধ ভাবানন্দের স্মৃতি, সে ইহ-জীবনে ভুলিবে না!

—সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাতে স্মরণ হইল, সেদিন রাত্রে বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বাসায়,—সেই দৃষ্টিতে ···উঃ!—

উৎকট আতঙ্ক-উত্তেজনায় মায়ার সর্ব্বশরীরের রক্তস্রোত সহসা যেন রুদ্ধ নিশ্চল হইয়া গেল! থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মায়া বসিয়া পড়িল! নারায়ণ, মধুসূদন,—আর কেন? সে স্মৃতি ভুলিয়া যাইতে দাও! মায়াকে আত্মবিস্মৃতি হইবার বল দাও!

কিন্তু হায়! ও কি? অলক্ষিতে আর এক তৃষাকুল বাসনা আবার অন্তর্মধ্যে মর্ম্মভেদী কাতর-দৌর্ব্বল্যে কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল!—ওগো এইবার যে সব-শেষের অঙ্ক! এইবার সমুদয় সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সারাংশে,—লীলা-বৈচিত্র্য বিকাশের কেন্দ্র-উৎসে, চিরদিনের মত অন্ধকারস্তূপ চাপাইয়া দেওয়া হইবে! ব্রহ্মা রচিত পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড অপেক্ষা, উজ্জ্বলদৃশ্যমান যে বিরাট সৃষ্টি তাহার অন্তর্জ্জগতে রচিত হইয়াছে, তাহার উপর এইবার চির-দিনের জন্য নির্ম্মম রক্তাঙ্কিত যবনিকা, সম্পূর্ণরূপে টানিয়া দিয়া, সরিয়া দাঁড়াইতে হইবে! ইহজীবনে আর সে-

দিকে ফিরিয়া চাহিবার অনুমতি পাইবে না! তবে,—তবে একবার এই সুযোগে—সতর্ক নিঃশ্বাসে,—সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অজ্ঞাতে সে তাহার মর্ম্মনিহিত শেষ-আকাঙ্ক্ষা—মুহূর্ত্তের দর্শনস্পৃহাকে, জন্মের শেষ কৃতার্থ করিয়া লউক!—এই এক মুহূর্ত্ত,—ইহাই তাহার অনন্তকালের জন্য শ্রেষ্ঠ, গরিষ্ঠ, মহামূল্য সম্বল হইবে! ইহার পর আর তাহার কিছুই থাকিবে না!

মায়া প্রাণপণ শক্তিতে উঠিয়া দাঁড়াইল; কঠোর বিভীষিকা পীড়িত, আর্ত্ত-ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিল—হাঁ ঐ যে উঁহারা সবাই বাহির হইয়া আসিতেছেন, বৃদ্ধ অগ্রে, তাহার পর সৌরীনবাবু ও কেবলরাম, সকলের শেষে নিরঞ্জন!

তখনও অল্প রৌদ্রতেজ ছিল, সকলে ছাতা খুলিলেন, বৃদ্ধের হাতে ছাতা ছিল না, মাত্র একগাছি লাঠি ছিল, নিরঞ্জন বিনীতভাবে তাঁহার উদ্দেশে কি বলিয়া—নিজের ছাতাটি তাঁহার মস্তকে ধরিয়া,—সঙ্গে সঙ্গে চলিল।—সে কি-শোভনসুন্দর দৃশ্যমাধুর্য্য? যেন উন্নত-গম্ভীর শ্রদ্ধার পাশে তরুণ-সুন্দর সম্ভ্রম,—আন্তরিক ভক্তিতে সেবার মধ্যে আত্মনিবেদন করিয়া চলিয়াছে!

মায়া অভিভূতের মত চাহিয়া রহিল, নিরঞ্জন, মায়ার বরকে অভ্যর্থনা করিতে চলিয়াছে,—হাসি মুখে!—ও কি হাসি? হাঁ হাসিই ত! দুর্ব্বল মূঢ় মায়া, মিথ্যা আশ্চর্য্য হইতেছে! নির্ব্বোধ মায়া, কি বুঝিবে—ঐ শান্তহাসির অন্তরালে,—কি-অদ্ভুত ধৈর্য্য, কি-বিরাট সংযম, প্রসন্নগাম্ভীর্য্যে বিরাজ করিতেছে; ঐ সুগঠিত তরুণ বক্ষের অভ্যন্তরে,—কতখানি কঠিন—কত গভীর, অসহ্য-সহ্য,—দৃপ্ত-পৌরুষ-শৌর্য্যে, স্থির ভাবে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে!—বাহিরের স্থূল বিপ্লব বৈষম্য সংঘাত, বাহিরের দিক হইতে আসুক, যাউক,—নিরঞ্জনের তাহাতে কি? সে ভ্রূক্ষেপহীন, উদাসহীন!......!—

মায়ার বুকের ভিতরকার ক্ষিপ্ত আলোড়ন, দুর্ভর গাম্ভীর্য্যচাপে নিস্পন্দ স্থির হইয়া গেল! নিরঞ্জন হাসিমুখে চলিয়াছে, চমৎকার!—কে বলিবে ঐ হাসির মূল্য কত,—উহার মর্ম্ম কি? সে সুমহান্ তত্ত্বের কোন্ অংশ অধ্যয়ন করিবে, নির্ব্বোধ বালিকা মায়া!—তাহার কতটুকু বুদ্ধি, সে কি-বোঝে? কিছুই না!

—কিন্তু ওগো না, তবু একটা নীরব-অনুভূতি—উদ্যত-চেতনায় তাহারও অভ্যন্তরে সতর্ক জাগ্রত রহিয়াছে! কোন তুচ্ছ ঘটনা, কোন সূক্ষ্ম আঘাত, তাহাকে পরিত্রাণ করিয়া যায় না, সে সব বোঝে!........ কি অকিঞ্চিৎকর ঐ রসনার কোলাহল! কত আড়ম্বরে জাঁকাইয়া, কত শব্দালঙ্কারে সাজাইয়া,—সে অন্তর-সত্যের প্রাণহীন সংস্করণ অপরের হাতে তুলিয়া দেয়,—আপনাকে প্রবঞ্চনায় ঢাকিয়া ছলনায় জিতাইয়া লয়!—কতটুকু ক্ষমতা ঐ মৌখিকতার, ঐ লৌকিকতার, ঐ স্থূল জড়তার!.........উহারা এমন ভাবে অনুভূতির প্রাণমূলকে স্পর্শ করিতে পারে কি?—না না না!

কিন্তু থাক্, সমস্ত আক্ষেপ-বিক্ষেপ সকল বোঝা-পড়া এইখানে সমাপ্ত হউক্!—আর নয়, কাল মায়ার বিবাহ-সংস্কারপূত নবজীবনারম্ভের দিন, কাল তাহাকে জীবনের কর্ত্তব্যব্রতে দীক্ষিত হইতে হইবে—কালিকার পর আর তাহার অবসর নাই,—আজ তাহার শেষ চিন্তার অবকাশ!

প্রণাম দেবতা!—ক্ষমা কর, অকৃতি অধম ভক্ত সে,—মাত্র ভক্তিতেই তাহার অধিকার ছিল,—সেবার কামনা, পূজার স্পর্দ্ধা তাহার ধারণাতীত,—সে অসম্ভব দুঃসাহস তাহার নাই!. ভক্ত জানে তুমি নির্ব্বিকার নিরঞ্জন,—তুমি আত্ম-মহিমার আনন্দ-সুন্দর রশ্মি আলোকে, চরাচর মুগ্ধ মোহাভিভূত করিয়াও,—অকলঙ্ক গৌরবে ভাস্বর, নির্ম্মল! ভক্ত জানে,—নিশ্চয় জানে, তুমি ত্যাগ-গ্রহণাতীত, নির্দ্বন্দ্ব চেতা,—তবু,—হে দেবতা, মুগ্ধতা-বিকার-পীড়িত

ভক্তের হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ক্ষমা কর, এই হতভাগ্যের নিভৃত মর্ম্মের স্বতঃউচ্ছ্বসিত নীরব শ্রদ্ধানম্র ভক্তি নিবেদনের,—কোন শব্দ, কোন স্পর্শ, কোন ঘ্রাণ—চকিতের জন্য কোনদিন তোমার অন্তরে বাঝিয়াছিল কি ? ক্ষণিকের জন্য, কোনদিন তোমায় বেদনা দিয়াছিল কি ?—ভক্তের ভ্রমান্ধ অপরাধ,—কোন মুহূর্ত্তে—দেবতার সমুজ্জ্বল মহত্ব দীপ্তির পাদপ্রান্তে,—বেদনার কলঙ্ক-মলিন নিঃশ্বাস বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল কি ? নির্ব্বোধ ভক্ত,—নিজের মূঢ়তার পরিমাপ জানে না,—তাই আজ অবসানের লগ্নে,—এই একমাত্র সংশয়াকুল-আতঙ্ক তাহার অবসাদ-ক্ষিন্ন প্রাণকে ক্ষোভের কশাঘাতে জর্জ্জরিত করিতেছে !···সেই এক নিমেষের স্মৃতি,—সেই অটুট ধৈর্য্যের বক্ষঃভেদী ক্ষীণ চাঞ্চল্য আভাস······ না না, অসহ্য—আর কোন প্রশ্নে, কোন চিন্তায় তাহার সামর্থ্য নাই !—মায়া বেদনাকুল বক্ষে সেইখানে লুটাইয়া পড়িল !

নীচে হইতে মম্মা ডাকিল, "তোমার কত দেরী মায়া—"

মায়া চমকিল, আবার আহ্বান !—আত্মসম্বরণ করিয়া গলা ঝাড়িয়া উত্তর দিল "আর বেশী দেরী নয়—"

রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখিল,—আর কাহাকেও দেখা যাইতেছে না,—মোড়ের অন্তরালে সকলেই অদৃশ্য হইয়াছেন ! যাউন !

নীচে হইতে আবার ডাক আসিল "শীঘ্র নেমে এস—"

"যাই—" মায়া ক্ষিপ্রহস্তে কাপড়গুলা গুটাইয়া লইল।

না, এবার সত্যই যাইতে হইবে ! হে পূজনীয় আত্মজয়ী দেবতা !—আশীর্ব্বাদ কর, তোমার স্মৃতিনির্ম্মাল্য মস্তকে ধরিয়া, সে যেন অমনই শক্তিতে আপনাকে সগর্ব্বে জয় করিয়া লইতে পারে !—অমনই নিষ্ঠুর-ধৈর্য্যে অন্তরের সমস্ত দ্বন্দ্ব-বিচ্ছেদ কাটাইয়া,—বাহিরের জগতটার সহিত সত্য অন্তরঙ্গতা-যোগ স্থাপন করিতে পারে, জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিতে পারে,—তাহার যেন দম বন্ধ হইয়া না যায় ! তোমার আদর্শ-গরিমা স্মরণ করিয়া,—সে যেন তোমায় ভুলিতে পারে, আপনাকে ভুলিতে পারে,—হৃদ্‌পিণ্ড দ্বিধা-ভিন্ন করিয়া সাধনার চরণে রক্তাঞ্জলি ঢালিতে পারে, আপনাকে আহুতি দিতে পারে !

একবিংশতি পরিচ্ছেদ।

——ঃ-*-ঃ——

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আদিত্য ও সনাতন নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত কাজ করিয়া, চলিয়া গিয়াছে, নিরঞ্জনের জন্য আজ তাহারা এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করে নাই, কারণ সহরের অন্য প্রান্তে কোথায় একদল মহারাষ্ট্র যাত্রা অভিনয় করিতেছে, অতিথিশালার সাধুসন্ন্যাসীগণ সকলেই সেখানে ভগবানের নাম গান শুনিতে যাইবে সুতরাং তাহারা দুইজনেও তাড়াতাড়ি হুজুক দেখিতে বাহির হইয়াছে,—আজ রাত্রে তাহাদের বাসায় ফিরিবার সম্ভাবনা নাই।

মন্দিরের ভিত্তিগাত্রে আর অল্পমাত্র কাজ বাকী আছে। মঠের অন্যত্রও অল্প-স্বল্প কাজ আছে, কিন্তু তাহা শ্রমসাধ্য নহে, মোটামুটি চিত্র ! মূলমন্দিরের এই অংশেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সূক্ষ্ম-শিল্প উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

বুকে হাঁটু দিয়া বসিয়া, ঘাড় গুঁজিয়া নিরঞ্জন কাজ করিতেছিল। সম্মুখে মোমবাতির উজ্জ্বল আলো।—সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, একথা—অনেকে অনেকবার তাহাকে জানাইয়া গিয়াছে, অতিরিক্ত

পুরস্কারের আশায় অতিরিক্ত খাটুনী খাটিলেও পুরস্কারের ফল অনিশ্চিত—একথাও কেহ কেহ তাহাকে ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছে কিন্তু নিরঞ্জনের কোনকিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাই,—সে খাটিতেছে—শুধু অবিশ্রাম খাটিতেছে।

আরতি হইয়া গিয়াছে, দর্শনার্থীরা চলিয়া গিয়াছে, এদিকে আর গোলমাল নাই। পাশে ভোগবাড়ীতে কর্ম্মব্যস্ত পরিচারিকাগণের তীক্ষ্ণ-উচ্চকণ্ঠের অসন্তোষমূলক চীৎকার-ঝঙ্কার মাঝে মাঝে শুনা যাইতেছে, অদূরে পরিচারকগণ কেহ কেহ কর্ম্মব্যপদেশে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, কিন্তু তাহাদের মুখে অনাবশ্যক বকাবকি ছিল না।

প্রাতঃকাল হইতে আসিয়া, আজ নিরঞ্জন সমানে কাজ করিতেছে, দুইবার মাত্র আহারের সময় উঠিয়াছিল তারপর আর নয়। কাজ, কাজ, কাজ,—আজ তাহার এতটুকু বিশ্রাম নাই ; সঙ্গীরা কত রকমে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু নিরঞ্জন গ্রাহ্য করে নাই, এক একবার অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চিন্তাকুল বদনে শুধু উত্তর দিয়াছে আজিকার এই মুহূর্ত্তগুলা কাল ফিরিয়া পাইব না, এগুলা আজ কাজে খাটাইয়া লই, তারপর অন্য কথা !--

মৌননির্জ্জনতার মাঝে নিরঞ্জন একমনে নীরবে কাজ করিতেছে, আজ তাহার কাজে বাধা দিবার, চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাইবার, কেহ কোথাও নাই, এখন সে নির্জ্জনে, নিঃসঙ্গ,--কিন্তু এ সঙ্গীহীনতা তাহার ক্লেশকর নয়।—কর্ম্ম তাহার সম্মুখে--নিরঞ্জন নিশ্চিন্ত, আর কোন সঙ্গীর প্রয়োজন নাই।

সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দূর হইতে অপরিচিতকণ্ঠে কে ডাকিল "কে ওখানে ? সর্দ্দার ভাস্কর !

নিরঞ্জন চমকিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিল—এ নীরবতার মাঝে কোন রব ভাল লাগে না! সৌজন্যের অনুরোধে আত্মদমন করিয়া উত্তর দিল, "আজ্ঞে হাঁ আপনি !—"

উত্তর আসিল "আমি সোমচাঁদ ভট্ট।"

যন্ত্রহাতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিরঞ্জন বলিল "নমস্কার আসুন—"

গৈরিক আলখাল্লা পরিহিত বিশাল দীর্ঘাকার প্রৌঢ় পরিব্রাজক সোমচাঁদ ভট্ট, সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভট্ট, ইতস্ততঃ চাহিয়া ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত বলিলেন "তুমি একলা এখানে কাজ করছ ? তোমার সঙ্গীরা সবাই চলে গেছে ? "

"আজ্ঞে হ্যাঁ—" কম্পিত স্বরে নিরঞ্জন উত্তর দিল "সবাই চলে গেছে !—"

ভট্ট, পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন "তুমি যাওনি কেন ?—"

কণ্ঠ ঝাড়িয়া পরিষ্কার স্বরে নিরঞ্জন উত্তর দিল "আমার কাজ বাকী ছিল।—"

কোথায় ? ভট্ট, নিরঞ্জনের মুখপানে প্রশ্নোৎসুক দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন।—নিরঞ্জন তাহাতে শিহরিল! সত্যই ত সে কাজ কোথায় বাকী ছিল ? এই নিরেট, নিশ্চল পাষাণভিত্তির বুকের উপর,—না তাহার রক্ত-মাংস গঠিত মানবীয় বুকের অভ্যন্তরে !—নিরঞ্জনের দৃষ্টি নত হইল মৃদুস্বরে উত্তর দিল "এইখানেই !—"

দূরে আরও কয়জন লোক কথা কহিতে কহিতে চলিয়া যাইতেছিলেন. ইহাদের কথাবার্ত্তার শব্দ শুনিয়া তাহাদের একজন কৌতূহলীভাবে অগ্রসর হইয়া বলিলেন " ওখানে কারা রয়েছেন ?—"

ভট্ট উত্তর দিলেন ' আমি, সোমচাঁদ ভট্ট, আর সর্দ্দার ভাস্কর—"

দলের ভিতর হইতে জনৈক অল্পবয়স্ক যুবক রহস্যসূচক কণ্ঠে বলিলেন "দুই ভাস্করে, ওখানে কি করছেন ?—

সঙ্গে সঙ্গে তাহারা অগ্রসর হইয়া আসিলেন. তাঁহারা মঠের কাছারীর আমলা—সকলেই অল্পবয়স্ক, তাঁহাদের মধ্যে তিন জন জাতিতে মারাঠি, অপর দুই জন খাস মান্দ্রাজী। ভট্ট, তাহাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন " তোমরা কি এতরাত্রি পর্য্যন্ত কাছারীতে ছিলে ?—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, দুঃখের কথা কেন বলেন, কর্ত্তাদের হুকুম, অধিকারী মহারাজ পরশু মঠে আস্‌ছেন,—এতরাত্রি অবধি তাই কাজ কর্‌ছিলাম, এবার দেব-প্রণাম করে বাড়ী যাব।"

নিরঞ্জন যন্ত্র কুড়াইতেছিল, তাহার দিকে চাহিয়া একজন বলিল "সর্দ্দার কি এখনো কাজ কর্‌ছিলে ?—"

দ্বিতীয়ব্যক্তি বলিল "বাতি জ্বেলে পাথর কাটা !—সাবাস্ চোখ,"

তৃতীয়ব্যক্তি কহিল "তোমার মত অমন ধৈর্য্য থাক্‌লে আমি জীবনে 'এক জন' হতে পার্‌তাম্ !—"

নিরঞ্জন নীরব। সোমচাঁদ ভট্ট পশ্চাদ্বদ্ধ হস্তে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সম্মুখের চিত্রগুলি অভিনিবেশ পূর্ব্ব দেখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া একজন মান্দ্রাজী যুবক সঙ্গীর কাঁধের উপর ভর দিয়া,—আনন্দোজ্জ্বল মুখে অস্ফুট স্বরে কি বলিলেন, কথাটা ভট্টমহাশয়ের কানে গেল. যুবকের দিকে চাহিয়া গম্ভীরস্বরে তিনি কহিলেন "তরুণ ভাস্করের গুরুকে ধন্যবাদ দাও! তিনি ভাগ্যবান্—তাঁর শিষ্য, 'শিষ্যের কর্ত্তব্য পূর্ণমাত্রায় পালন করে, গুরুর গৌরব রক্ষা করে গুরুদক্ষিণা দিয়েচে!"

'শিষ্যের কর্ত্তব্য পূর্ণমাত্রায় পালন !—' আকস্মাৎ নিরঞ্জনের বুকের ভিতর যেন নিঃশ্বাস আটকাইয়া গেল,—আহতনয়নে সে বক্তার মুখপানে চাহিল! হায়, এ প্রশংসা আজ তাহাকে সাফল্য, সৌভাগ্যের আনন্দে লাঞ্ছিত করিল কৈ ?—এ যে শুধু আজ তাহাকে তীব্র বেদনায় নিষ্পীড়িত করিল!—উঠিয়া দাঁড়াইয়া—ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া, ম্লানহাস্যরঞ্জিত বদনে বক্তার উদ্দেশে নমস্কার করিল।—সকলের পানে চাহিয়া বিনীত-সম্ভ্রমে প্রশ্ন করিল " আপনারা সন্তুষ্ট হয়েছেন ?"

একবাক্যে উত্তর হইল "চমৎকার শিল্প উৎরাইয়াছে—মহারাজ আসুন, তোমার পরিশ্রমের যোগ্য পুরস্কার পাইবে!—"

ক্ষীণহাস্যে নিরঞ্জন সৌজন্য জ্ঞাপন করিল, সোমচাঁদের পানে চাহিয়া বলিল " কোথাও ত্রুটি থাকে, আপনি অনুগ্রহ করে উপদেশ দেন,—"

সোমচাঁদ বিস্মিত হইলেন,—অদ্ভুত শিষ্টাচার-জ্ঞান এই বিদেশী যুবার! সামান্য ভাস্কর জ্ঞানে এক দিন তিনি ইহার প্রতিভা-গৌরব অবিশ্বাস করিয়া, তীব্র অবজ্ঞায় উপহাস করিয়াছিলেন, সে কথা সকলেই জানে! তাহার পর অবশ্য ইহার কার্য্য-পরিচয় পাইয়া তিনি মনে মনে লজ্জিত হইয়াছিলেন, নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ব্বলতা বশতঃ সে লজ্জা কাহারও কাছে স্বীকার করিয়া লঘু হইতে পারেন নাই!— তাঁহার নিশ্চয় ধারণা হইয়াছিল, যে তাঁহার সেই অবজ্ঞার উত্তরে—এই ভাস্করও মনে—তাঁহার প্রতি প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ পোষণ করিতেছে! কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এ ব্যক্তি স্বচ্ছন্দে, আজ সকলের সমক্ষে,—অকুণ্ঠিত বিনয়ে তাঁহাকে সম্ভ্রমের অর্ঘ উপহার দিল!

আত্মাভিমানী সোমচাঁদের আত্মশ্লাঘাগর্ব্বে—অলক্ষিতে গূঢ় লজ্জা-ধিক্কার বাজিল!—দীননয়নে চাহিয়া ক্ষুণ্ণস্বরে তিনি বলিলেন "তোমায় উৎসাহ দিতে পারি কিন্তু উপদেশ দেওয়ার স্পর্দ্ধা রাখিনা,—" একটু থামিয়া অপেক্ষাকৃত কোমলকণ্ঠে বলিলেন "তোমার এই সূক্ষ্মশিল্পের সৌন্দর্য্য অনুভব কর্‌তে অভিনিবেশের

প্রয়োজন, —আমরা সহজ দৃষ্টিতে মোটামুটি শিল্প এক নিমেষে বুঝে নিই, তাই এর পানে চাইলে হঠাৎ যেন 'হ-য-ব-র-ল' মনে হয়, কিন্তু যখন মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করে দেখি,—তখন এর মর্ম্ম বুঝি, মন আনন্দে ভরে উঠে!"

কথাগুলি অত্যন্ত তুচ্ছ,—অন্য সময় কতদিন কতবার কত লোকের মুখে নিরঞ্জন এই রকম কত কথা শুনিয়াছে, কিন্তু আজ সোমচাঁদ ভট্টের মুখে ঐ কয়টি কথা তাহার কাছে পরম শ্রদ্ধাবহ, এবং আশ্চর্য্য সত্য বলিয়া প্রতীত হইল! —ক্ষণেক স্তব্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া,—নিরঞ্জন শিরোনমন করিয়া বলিল "রাত্রি হয়ে গেছে আজ তা'হলে বিদায়,—"

আগন্তুক কর্ম্মচারীগণের একজন বলিলেন "সর্দ্দার তুমি কি এখন যাত্রা শুন্‌তে যাবে?—"

ভূমি হইতে মোমবাতি উঠাইয়া লইয়া নিরঞ্জন বলিল 'আজ্ঞে না"

হঠাৎ তিনি সাগ্রহে বলিলেন "ওহে দাঁড়াও, একবার অপেক্ষা কর ভাই, আমি তোমার বাতিটা নিয়ে ঐ নক্সাটা দেখে নিই,—"

তাঁহার আগ্রহান্বিত কণ্ঠস্বরে—সকলেই চকিত নয়নে নির্দ্দিষ্টলক্ষ্যে চাহিলেন, দেখিলেন পার্শ্বে ভিত্তির নিম্নার্দ্ধে কয়েক হস্ত স্থান জুড়িয়া,—সে একটি সদ্যঃ-উৎকীর্ণ সুদীর্ঘ চিত্র! এতক্ষণ নিরঞ্জনের ছায়া-অন্তরালে তাহা অদৃশ্য ছিল, নিরঞ্জনের হস্তস্থ আলোকরশ্মিসম্পাতে এতক্ষণে তাহা গোচরীভূত হইল!

প্রস্তাব-কারকের উক্তি শুনিয়া নিরঞ্জন সহসা বিচলিত হইয়া, মুহূর্ত্তের জন্য ব্যগ্র উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি তুলিয়া—বক্তার বদনের মধ্যে কি-যেন কিসের অনুসন্ধান করিল—তারপর ব্যথিতভাবে নৈরাশ্যব্যঞ্জক মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিয়া—তাঁহার হাতে বাতি দিয়া নীরবে সরিয়া দাঁড়াইল!

সোমচাঁদ ভট্টকে পুরোবর্ত্তী করিয়া আলোক লইয়া সকলে চিত্র সমীপে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সকলেই নির্ব্বাক ভাবে, বিস্ময়মুগ্ধ নয়নে চিত্রের পানে চাহিয়া রহিলেন। বাহবা, কি সুন্দর দৃশ্যমাধুর্য্য, কি জীবন্ত ভাবলীলা!—ভাস্কর শুভক্ষণে যন্ত্র হাতে করিয়াছিল, শুভক্ষণে দুশ্চর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল, তাহার প্রতিভা সার্থক, সাধনা সফল হইয়াছে!—একি মনোরম সুন্দর চিত্র!

মহাভারত অন্তর্গত, কুরুবালকগণের অস্ত্র পরীক্ষার বিষয় লইয়া চিত্রটি বিরচিত হইয়াছে। পরীক্ষা সভার চতুর্দ্দিকে অসংখ্য দর্শক,—স্বাভাবিক দূরত্ব-নিবন্ধন তাহাদের আকৃতি অবস্থান ভঙ্গীতে—সুন্দর সামঞ্জস্য পূর্ণ, অস্পষ্টতার আভাস কৌশলে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। রঙ্গভূমির মধ্যস্থলে পরীক্ষার্থী রাজকুমারগণ, তাহাদের সকলের দৃষ্টি উৎসুক চঞ্চল--সকলেরমুখভাব উত্তেজনা পূর্ণ। সকলের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া আছেন —অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্য এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য পরস্পর সম্মুখীন—ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন এবং সূতপুত্র কর্ণ।

গর্ব্বস্ফীত বক্ষের উপর পরস্পর বদ্ধ বাহুদ্বয় স্থাপন করিয়া রাজকুমার অর্জ্জুন উচ্চশিরে আভিজাত্য দম্ভে দাঁড়াইয়াছেন তাঁহার অধরে বিদ্রূপের হাসি--নয়নে তীব্র তাচ্ছল্য! সূতপুত্রের সহিত অস্ত্রপরীক্ষার প্রতিযোগিতা রাজনন্দনের নিকট অগ্রাহ্যেয়!—অর্জ্জুনের ললাটে আত্মগরিমার প্রোজ্জ্বল দীপ্তি সগর্ব্বে ঝলসিয়া উঠিতেছে, রাধেয়নন্দন কি তাঁহার সমকক্ষ।

আর কর্ণ? তিনি অপমান-রক্ত চক্ষে কঠোর ভ্রূভঙ্গী করিয়া উন্নত গ্রীবায় দণ্ডায়মান! তাঁহার কটাক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষিত হইতেছে অধর দন্ত নিষ্পীড়িত, ললাটে দর্পিত বীরত্ব ভাতি! সর্ব্ব শরীরের পেশী স্ফীত,—দক্ষিণ মুষ্টি অসিমূলে দৃঢ়বদ্ধ। জন্মগত নীচতা-ধিক্কারে অপমানাহত কর্ণ দর্পভরে বামহস্তের তর্জ্জনী উঁচাইয়া

ক্রোধগম্ভীরভাবে প্রতিযোগী অর্জ্জুনের উদ্দেশ্যে কি যেন বলিতেছেন, চিত্রের পাদমূলে শুভ্রপ্রস্তরের বক্ষে সদ্যঃ-আহৃত শোণিতের মত উজ্জ্বল রক্ত-প্রস্তর সংযোগে, পরিষ্কার দেবনাগর অক্ষরে, খোদিত রহিয়াছে —"দৈবায়ত্ত কূলে জন্ম মমায়ত্ত হি পৌরুষম্"

বহুক্ষণ ধরিয়া নির্নিমেষ নয়নে সকলে চিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিলেন, ভাব-গাম্ভীর্য্যে সকলের মন অভিভূত হইয়া উঠিয়াছিল, কেহ কথা কহিতে পারিলেন না,—শেষে, বহুদর্শী বিজ্ঞ প্রবীণ ভাস্কর সোমচাঁদ, উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিলেন "চমৎকার, চমৎকার !"

চতুর্দ্দিকের স্থির নিস্তব্ধতা যেন অকস্মাৎ চমক খাইয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল ! দর্শকগণ সমস্বরে তাঁহার প্রসন্ন মন্তব্যের অনুমোদন করিলেন—মুগ্ধ প্রশংসার স্রোত বহিতে লাগিল, ধন্য শিল্প ধন্য—শিল্পী !

নিরঞ্জন অদূরে বক্ষঃবদ্ধকরে দাঁড়াইয়া, উর্দ্ধমুখে একাগ্র স্থির নয়নে নক্ষত্রখচিত আকাশের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিল, দর্শকগণের একজন তাহাকে বলিলেন "ভাস্কর, এই চিত্র কি তুমি আজ শেষ করেছ ?—"

দৃষ্টি সংযত করিয়া—ধীরভাবে নিরঞ্জন উত্তর দিল "আজ্ঞে হ্যাঁ—"

তিনি পুনরায় ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিলেন—"এই চিত্র দেখেই কি আজ দেওয়ানজী—"

তাঁহার কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে, নিরঞ্জন ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবে গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর দিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

সোমচাঁদ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন "দেওয়ানজীর কথা কি বলছ ?"

কর্ম্মচারী মহাশয় থতমত খাইয়া সকলের মুখপানে চাহিলেন—ইতস্ততঃ করিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন "দেওয়ানজী এই নক্সা দেখে বড় অসন্তুষ্ট হয়েছেন শুনলাম,—"

সোমচাঁদ ভট্ট রূঢ়স্বরে প্রশ্ন করিলেন "কেন ?—"

কর্ম্মচারী মহাশয় নিম্নস্বরে বলিলেন "পুরাণো নক্সা মেজেঘষে উঠিয়ে দিয়ে নূতন নক্সা আগাগোড়া তৈরি করায় খরচ বেশী,—"

ওষ্ঠ আকুঞ্চনে, ঘৃণার হাসি হাসিয়া সোমচাঁদ ভট্ট বলিলেন "এই জন্য !—রক্ষা পেলুম ! আগে এখানে কি ছিল ?—"

উত্তর হইল "বিশ্বামিত্রের তপস্যাভঙ্গ।—"

ভট্ট মহাশয় উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন "খাসা !—"

অপর্য্যাপ্ত কৌতুকে উৎসাহিত হইয়া সকলেই সে হাস্যে যোগ দিলেন ! দেওয়ানজীর কথা লইয়া বেহিসাবী বচনবাজী নিম্নতন কর্ম্মচারীগণের পক্ষে অশোভনীয় বলিয়া, এতক্ষণ সকলে বাধ্য হইয়া চুপ করিয়াছিলেন, এইবার সুযোগ পাইয়া সকলের রসনা খুলিল—বিদ্রূপের স্বরে একজন বলিলেন "গুরুদেব যে আমাদের বিশ্বামিত্রের চেলা !—"

দ্বিতীয় ব্যক্তি শ্লেষের স্বরে বলিলেন "স্বয়ং পরাশর !—"

নিরঞ্জন অগ্রসর হইল, ধীর কণ্ঠেবলিল "ক্ষমা করুন,—অতিরিক্ত ব্যয়বাহুল্যের জন্য—আমি যথার্থই অপরাধী। দেওয়ানজীর অসন্তোষ, দোষাবহ নয়, -প্রভুর কাজে তিনি ন্যায়সঙ্গত কর্ত্তব্য পালন করেছেন ; তবে আমার পক্ষে—"নিরঞ্জনের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল ; ক্ষণেক থামিয়া পুনশ্চ বলিল "শিল্পীর কর্ত্তব্য স্বতন্ত্র ;...আপাততঃ কারো সঙ্গে এ সম্বন্ধে তর্ক আলোচনায় আমি অক্ষম, তবে এটুকু জেনে রাখতে পারেন আজকার পারিশ্রমিকের মূল্য, আমি মঠাধিকারীর তহবিল থেকে গ্রহণ করব না—"

উত্তেজিতভাবে সোমচাঁদ বলিলেন "কেন গ্রহণ করবে না !"

স্থিরকণ্ঠে নিরঞ্জন উত্তরদিল "আমি অন্যত্র পেয়েছি—"

সকলে এক যোগে প্রশ্ন করিলেন "কার কাছে—"

অবিচলিত ভাবে নিরঞ্জন উত্তর দিল "ক্ষমা করুন এ প্রশ্নের উত্তর দানে আমি অক্ষম।"

এবার সকলে স্তব্ধ! সকলের দৃষ্টিতে বিস্ময় সম্ভ্রমের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল! এই স্বল্পভাষী শিষ্টাচার-বিনয়ী নম্রস্বভাব যুবার হৃদয়াভ্যন্তরে,—এত তেজস্বিতা দাঢ়্য! সকলে নির্ব্বাক!

সকলে বুঝিলে, এ ব্যক্তির নিকট এসম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্ন উত্থাপন করা বৃথা। ক্ষণকাল পরে কর্ম্মচারীগণের একজন বলিলেন "—আচ্ছা মহারাজ আসুন তাঁর সিদ্ধান্ত সকলের উপর।—"

আশ্বাসের স্বরে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল "সে ত নিশ্চয়! -"

নিরঞ্জন তথাপি নিরুত্তরে রহিয়াছে দেখিয়া, তৃতীয় ব্যক্তি তাহার উৎসাহ উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিলেন, "কিন্তু বাস্তবিক এ ছবিটির বাহার হয়েছে ভারি সুন্দর!"

বাহার!—মূঢ়-বেদনায় নিরঞ্জনের বক্ষঃ নিষ্পেষিত হইয়া গেল! একটি কথা উচ্চারণ করিতে পারিল না, ব্যথিতদৃষ্টিতে চিত্রের পানে চাহিয়া ক্ষুব্ধ-ম্লানভাবে একটু হাসিল! হায়, ইহারা দেখিতেছে শুধু বাহিরের বাহার!

অজ্ঞাতে তাহার দৃষ্টি চিত্রের পাদমূলে সংলগ্ন হইল!—সহসা সতর্কতার বাঁধভাঙ্গিয়া, একটা উষ্ণ নিঃশ্বাস বুকের ভিতর হইতে ঠেলিয়া উঠিল!—"মমায়ত্ত হি পৌরুষম্!"

হায় কি বুঝিবে ইহারা,—কি প্রলয়ঙ্কর সমস্যার, নিষ্করুণ মীমাংসা বিধানের ইঙ্গিত ঐ চিত্রের মধ্যে! তাহার শোকাহত হৃদয়াবেগ—আত্মবেদনার সংশয়দ্বন্দ্ব পীড়িত আলোড়ন হইতে আপনাকে মরণান্তিক ঔদ্ধত্যে টানিয়া লইয়া—কতখানি নিষ্ঠুর কঠোরতায় উদ্দীপ্ত হইয়া,—কতখানি আত্মহারা ব্যগ্রতায় ঐ বাণী পাষাণের বুকে দাগিয়াছে—তাহা সে জানে আর জানেন অন্তর্যামি!

চিত্রের সহিত হিসাবনিকাশ চুকাইয়া, সে নিজের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট পথ বাছিয়া লইয়াছে! নিস্ফল বেদনার মনোরম স্বপ্নাবেশের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিবে! একলক্ষ্যে, অপ্রতিহত গতিতে চিত্তবৃত্তিকে ছুটাইয়া,—জগতে শিল্পী-জীবনের উন্নত-আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত-সার্থক করিয়া লইবে, এই তাহার স্থির সঙ্কল্প!—আজ হইতে তাহার বিরামের মধ্যে আরামের নির্ভর—একমাত্র ঐ-আশা, ঐ-আনন্দ! তাই সমস্ত প্রাণের সহিত, গভীর নিষ্ঠায় সে আত্মরক্ষার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে—" মমায়ত্তহি পৌরুষম্—"

প্রাক্তনের ফলে, দৈববশে তাহার জীবনের শান্তিস্বচ্ছন্দতা,—রাহুগ্রস্ত, কিন্তু তবু—তবু, বাহিরের এই সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের সসীম সীমার ঊর্দ্ধে, আত্মার দিক দিয়া, আয়ত্তের মধ্যে আছে—তাঁহার পৌরুষ-শক্তি!

নির্ব্বাক, নিষ্পলক দৃষ্টিতে চিত্রার্পিতের মত,—নিরঞ্জনকে চিত্রের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, সকলে বিস্মিত হইলেন। আলোকধারী ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া বলিল " ভাস্কর তোমার আলো নাও—"

"দেন—" চিত্রের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া, হস্ত প্রসারণ করিয়া নিরঞ্জন বর্ত্তিকা লইল।—উজ্জ্বল দীপালোক-রশ্মি তাহার মুখাবয়বের উপর উদ্ভাসিত হইতেই, তাহার মুখভাব লক্ষ্য করিয়া অকস্মাৎ সোমচাঁদ ভড় চমকিয়া উঠিলেন!—একি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন!— এই অল্পক্ষণের মধ্যে নিরঞ্জন কি হঠাৎ পাঁচ বৎসর বয়স ডিঙ্গাইয়া উঠিল!—কোথাগেল সেই তরুণ সুকুমার বদনের কমনীয় লালিত্য? কোথায় সেই ভাবমুগ্ধ নয়নের

স্নিগ্ধ-কোমল দৃষ্টি!—এ যে কঠোর পৌরুষ দর্পিত বীরাচারী সাধকের গৌরব-গর্ব্বোজ্জ্বল বদন,—নির্ভীক তেজস্বী কটাক্ষ! ইহার মধ্যে কোথায় সে সরল আনন্দ লাবণ্য? এ যে কঠোর প্রশান্তিদ্যুতি!—

স্তম্ভিতকণ্ঠে সোমচাঁদ ডাকিলেন "ভাস্কর—"

নম্রস্বরে নিরঞ্জন বলিল, "আসুন আমি আলো দেখিয়ে—অন্ধকারটা পার করে দিচ্ছি—"

আলোকহস্তে নিরঞ্জন অগ্রসর হইল, সকলে নিঃশব্দে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—ঃ*ঃ—

বাসায় আসিয়া দুয়ার খুলিয়া যন্ত্রপাতি রাখিয়া নিরঞ্জন অন্য আলোক জ্বালিল। নিঃশেষ-প্রায় মোমবাতিটা ফেলিয়াদিয়া, গাত্রবস্ত্রাদি উন্মোচন করিয়া শয্যার উপর দেহ প্রসারিত করিল।

সম্মুখে খোলা জানালা। শুক্লা সপ্তমীর স্নিগ্ধ-চন্দ্রালোকে, বহির্দ্দেশ আলোকোজ্জ্বল। অতিথিশালায় আজ কোন গোলমাল নাই,—অন্যদিনের তুলনায় আজ চারিদিক অত্যন্ত নির্জ্জন বোধ হইতেছিল। গতিশীল বায়ু-তরঙ্গে বৃক্ষপত্রের করুণ-মর্ম্মর-তান, নিস্তব্ধ কক্ষমধ্যে ভাসিয়া আসিতেছিল,—বাহিরে চন্দ্রালোক-সমুজ্জ্বল আকাশের নীচে কয়েকটা ক্ষুদ্রকায় চকোরপক্ষী—তৃষিত ব্যাকুলতায় ত্রস্তপক্ষসঞ্চালনে, নীরবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

অদূরে আলোকোজ্জ্বল বিবাহবাটীর উৎসব কোলাহল,—উচ্চ হাঁক ডাক শব্দ, মধ্যে মধ্যে নিস্তব্ধ প্রকৃতির শান্ত-গাম্ভীর্য্য, চমকিত করিয়া তুলিতেছিল। সমস্তদিনের পর এতক্ষণে,—স্পষ্ট হইতে স্পষ্টীকৃত রূপে নিরঞ্জনের স্মরণ হইল 'আজ মায়ার বিবাহ!'

অকস্মাৎ কশাহতের মত নিরঞ্জন শয্যা ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল! হউক, তাহার তাহাতে কি? মুষ্টি-বদ্ধ করিয়া; আপনাকে চক্ষু রাঙ্গাইয়া উগ্র-উদ্ধতভাবে শাসন করিল—সাবধান!

এ কি ভ্রান্তি! সকল শেষের পরেও এমন অশেষ বিড়ম্বনা!

মনস্থির করিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইয়াও—অতর্কিত মূঢ় চপলতায় সে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইতেছে! না, এ অসহ্য অন্যায়!—উন্মাদ ভ্রান্তির দুর্দ্দম্য তরঙ্গাঘাতে, মুহূর্ত্তের জন্য বিপর্য্যস্ত হতবুদ্ধি হইয়া একদিন সে যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিতেছে—সে অনুতাপ ইহজীবনে বিস্মৃত হইবার নহে,—তাহার প্রায়শ্চিত্ত চিরজীবন প্রতিপাল্য।—আজ ঐ উচ্চ শঙ্খনাদে সেই শুভ সম্প্রদানের বিজয়বাণী বায়ুমণ্ডলে বিঘোষিত হইতেছে, ইহার মধ্যে নিরঞ্জনের দীর্ঘনিঃশ্বাসের স্থান নাই!—অতীতের আত্মহারা দৌর্ব্বল্যের পরিতাপ-স্মৃতি স্মরণে কাতর হইবার অবসর নাই!—ঐ শঙ্খধ্বনি-মুখরিত আনন্দময় উৎসব লগ্নকে, তাহারও জীবনের উন্নতির মাহেন্দ্রযোগ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, দীক্ষাপূত জীবনকে সবল শক্তি সাধনার পথে পরিচালিত করিবার প্রবল আদেশ বুঝিয়া,—ঐ মুহূর্ত্তটীকে নতশিরে বরণ করিয়া লইতে হইবে! সে কেন অক্ষম হইবে? মহাশক্তি তাহার সহায়,—"মমায়ত্ত হি পৌরুষম্!"

গতকল্য বৈকালে, নিষ্ঠুর-দুঃসাহসে নির্ভর করিয়া, কেবলরাম প্রভৃতির সহিত সে যখন বর অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে যায়, তখন তাহার হৃদয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থা সবিশেষ স্মরণ না থাকিলেও;—এটুকু বেশ স্মরণ

আছে যে তাহার মনের কোনখানে এতটুকু অশ্রদ্ধা বা বিদ্বেষ ছিল না! যত্নকৃত চেষ্টার প্রভাবেই হউক, অথবা যে কারণেই হউক,—তাহার মন তখন শ্রদ্ধানিষ্ঠ ভাব-গৌরবে পূর্ণ ছিল। ষ্টেশনে যখন ট্রেণ হইতে, উন্নত দীর্ঘাকার সুন্দরকান্তি বর, শান্ত-প্রসন্ন বদনে অবতরণ করিলেন, তখন তাহারপানে চাহিয়া, নিরঞ্জনের প্রাণ সত্য-সত্যই একটা অনাবিল তৃপ্তি-আনন্দ অনুভব করিয়াছিল,—তাহার মনে হইয়াছিল, ইনি যোগ্য-পাত্র বটে!

—কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত, তারপর সে তাহার চিন্তা-প্রবাহ কোন দিকে অগ্রসর হইতে দেয় নাই, কোন যোগ্যতার সহিত, এ যোগ্যতাকে তুলনায় পরিমাপ করিয়া দেখিবার স্পর্দ্ধা রাখে নাই!......

অসহিষ্ণুভাবে নিরঞ্জন কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিল। ঝড়বেগে কত চিন্তা মনের মধ্যে বহিয়া গেল তাহার ইয়ত্তা নাই, নিরঞ্জন আবার বিচলিত, আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িল!

সহসা রুষ্ট-রুদ্রের রুক্ষ-ভ্রূকুটীর মত রূঢ় আলোকচ্ছটা দ্বারদেশে উদ্ভাসিত হইল—শঙ্কাহত নিরঞ্জন শিহরিয়া উঠিল! ক্ষণকাল চক্ষু তুলিয়া চাহিতে পারিল না। দ্বার পার্শ্ব হইতে ভোগরন্ধনাগারের জনৈক পাচক নিরঞ্জনের রাত্রের আহার্য্য লইয়া ঘরে ঢুকিল, "বলিল ভোগের প্রসাদ আনিয়াছি।—"

আত্মস্থ হইতে নিরঞ্জনের বিলম্ব হইল—সহসা কোন উত্তর দিতে পারিল না, পাচক পুনরায় বলিল "আমরা আপনার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করিলাম, শেষে মশালচিকে সঙ্গে লইয়া আপনার গৃহে প্রসাদ পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছি—"

নিরঞ্জনের চৈতন্য হইল, অনুতপ্ত স্বরে বলিল "ক্ষমা কর ভাই তোমাদের অনর্থক কষ্ট দিয়াছি,—আমার ক্ষুধা নাই!—"

পাচক ক্ষুণ্ণ হইয়া আরও দুই চারিবার অনুরোধ করিয়া শেষে আহার্য্য ফিরাইয়া লইয়া গেল। তাহার মশালধারী সঙ্গীও চলিয়া গেল।

ঘরে অবস্থান করা নিরঞ্জনের পক্ষে অসহ্য বোধ হইল, পুস্তক স্তূপ হইতে সাংখ্যদর্শনখানা টানিয়া, আলোক হস্তে বাহিরের ছাদে আসিয়া শুইয়াপড়িল, সাংখ্যের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে তাহার ভিতর মনঃসংযোগের চেষ্টা করিতে লাগিল।

মনের ভিতর একটা দুঃসহ বিস্ময় নিগূঢ় অসহিষ্ণুতায় ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। এ কি অদ্ভুত মানুষের চিত্তগতি!—কয়দণ্ড পূর্ব্বে সে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিয়াছিল—সদর্পে ভাবিয়াছিল, এইবার তাহার সব চুকিল, এখন আর তাহার কোন ভুল ভাবনা নাই কোন ভয় নাই!—কিন্তু এখন দেখিতেছে সেই শেষের মুখেই নূতনের সুর সংলগ্ন রহিয়াছে! এইত আরম্ভ!

হায় ভ্রান্তি!—সংযম-সাধনার তটবন্ধনে অনুভূতিপ্রবাহকে সে উচ্চতত্ত্ব সাধনার জন্য অবাধ স্বচ্ছন্দতায় মুক্তি দিয়াছে, তবুও নিষ্কৃতি নাই? এখনও তাহার মধ্যে এত গভীর কল-ক্রন্দন? এত চক্রাবর্ত্ত দুঃখ!—এ কোন্ অদৃশ্য উপলখণ্ড-বক্ষে সংঘাত বেদনা-জনিত নিষ্ঠুর বিপত্তি-পীড়ন!

হউক!—সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অবহেলায় সে জয় করিয়া লইবে—তাহার আত্মসম্বরণের অমোঘ মন্ত্র প্রভাবে!—"সমারম্ভ হি পৌরুষম্!"

সেই সময় সাংখ্যের একস্থলে তাহার দৃষ্টিবদ্ধ হইল, নিরঞ্জন আগ্রহাকুল চিত্তে পাঠ করিল:—

"ন মলিন চেতস্যুপদেশ বীজ প্ররোহোঽজবৎ
না তাস মাত্রমপিমলিন দর্পণবৎ॥"

তবে তাই কি ? সত্যের সাধনায় এখনও কি সে পরিপূর্ণ নিষ্ঠায় আত্মদান করিতে পারে নাই ? এখনও কি গোপন-অন্তরে কোন মিথ্যার দৌর্ব্বল্যকে ব্যর্থ তৃষাকুল বেদনায় আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে ? বাহিরের দিকে তাহাকে দাবাইয়া রাখিয়াছে শুধু ঘৃণিত আত্মপ্রবঞ্চনার জন্য !—হাঁ বুঝি তাহাই ঠিক্,—নচেৎ এখনও কেন এ-বিপ্লব-ঝঞ্ঝনা জাগিয়া উঠে ?

সাংখ্য বন্ধ করিয়া নিরঞ্জন ক্ষিপ্তবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল ; নাঃ সে পুরুষ মানুষ ! সে তাহার পৌরুষ-উদ্যমকে বাহ্য আড়ম্বরে আবৃত করিয়া অন্তরের দিকে নিষ্ফল 'শূন্য' মাত্রে পর্য্যবসিত হইতে দিবে না ! "মমায়ত্ব হি পৌরুষম্" সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করিয়া চলাই তাহার ধর্ম্ম, পায়ে পায়ে হুচট্ খাইয়া রমণীর মত ভীরু কাতরতায় এলাইয়া পড়া তাহার সাজে না !—তাহাকে উঠিতে হইবে, ছুটিতে হইবে, খাটিতে হইবে—বাঁচিবার জন্য মরিতে হইবে ! ভবিষ্যতকে ফাঁকি দিবার জন্য বর্ত্তমানের কণ্ঠে ছুরিকাঘাত করিলে চলিবে না, সে অমার্জ্জনীয় অপরাধ !—এবার সে মানুষের মত শক্তি, সাহস, সঙ্কল্প লইয়া—সত্যকার মনুষত্ব সাধনা করিবে !

ক্ষিপ্রগতি সাংখ্যদর্শন ও আলোক লইয়া নিরঞ্জন ঘরে ঢুকিল, পুস্তকরাশির উপর বহিখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া জামাটা টানিয়া পরিল—তারপর আলো নিবাইয়া ঘরে চাবি দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া চলিল।—মনুষ্যহস্তের সযত্ন রচিত এই ইট-পাথরে গড়া নিরেট কৃত্রিমতার বক্ষে অবরুদ্ধ থাকিয়া—প্রাণের অকৃত্রিম স্বচ্ছতা মুমূর্ষু নির্জ্জীব হইয়া পড়িতেছে ! একবার সমুদ্রের ধার দিয়া, স্বভাবের বিশাল সজীবতার গম্ভীরমহিমা অভিনন্দন করিয়া—চন্দ্রালোকে বেড়াইয়া আসা যাক্।

বারভূতের আড্ডা অতিথিশালার দ্বার, সমস্ত রাত্রি খোলা থাকে, যাহার যখন খুশী বাহিরে যায় আসে, তজ্জন্য কাহারো কাছে জবাবদিহি করিতে হয় না, নিরঞ্জন অতিথিশালার দ্বার অতিক্রম করিয়া বাহিরে রাস্তায় আসিয়া পড়িল।

নিরঞ্জন অতিব্যস্তে প্রায় ছুটিয়া চলিয়াছিল। মোড় ফিরিতেই দ্রুতপদে আগমনশীল আর একজন পথিকের উপর গিয়া পড়িল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া অপ্রতিভভাবে ক্ষমা চাহিল, পথিক উৎসাহের স্বরে বলিলেন "নিরঞ্জন বাঁচলুম্!—কোথা যাচ্ছ তাড়াতাড়ি—"

নিরঞ্জন চমকিয়া সবিস্ময়ে বলিল ' কেবল বাবু ?"

"হাঁ—কোথা যাচ্ছ তুমি ?"

নিরঞ্জন মুহূর্ত্তের জন্য ইতস্ততঃ করিল, উদ্দেশ্যটা ব্যক্ত করিলে অসঙ্গত শুনাইবে কি ? কিন্তু পরক্ষণে সজোরে গ্রীবা উচাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল ; নাঃ অসঙ্গতির দোহাই দিয়া আপনাকে অক্ষম ভীরুতার আশ্রয়ে আর ঠাসিয়া ধরিবে না !—পরিষ্কার স্বরে উত্তর দিল, সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাচ্ছি—"

কেবলরাম সাগ্রহে বলিল "ওঃ বেড়াতে ! কোন কাজে নয় ত ? আচ্ছা, আগে দিদিকে সঙ্গে নিয়ে একবার বাড়ী যাও, আমি অনেক কাজ ফেলে এসেছি, দেখিগে যাই—ভাগ্যে তোমায় পেলুম !—"কেবল দ্রুতপদে ফিরিয়া গেল। শান্তিদেবী অগ্রসর হইয়া আসিলেন।

ফাঁফরে পড়িয়া নিরঞ্জন স্তব্ধ-বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইল,—একি উৎপাত ! হতাশভাবে বলিল "আবার ফিরতে হবে ?—"

শান্তিদেবী অত্যন্ত ব্যস্তচিত্ত ছিলেন, নিরঞ্জনের ভাববৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিলেন না, বলিলেন "নিরঞ্জন শীঘ্র চল বাবা, আমার এখনি ফিরে আসতে হবে—"

সহসা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া নিরঞ্জন বলিল, "এখনি ফির্‌বেন কেন ?—"

শান্তিদেবী উত্তর দিলেন "বরের আংটি, জোড়, সব বাড়ীতে ফেলে রেখে এসেছি, এখন মনে পড়্‌ল ! এদিকে লগ্নের আর দেরী নাই !—"

"আসুন"—নিরঞ্জন অগ্রসর হইল। অস্ফুটস্বরে তাহার কণ্ঠ হইতে কি আর একটা কথা নির্গত হইল, শান্তিদেবী শুনিতে পাইলেন না, চলিতে চলিতে তিনি প্রশ্ন করিলেন "তুমি এখন বেড়াতে বেরিয়েছিলে কি খাওয়াদাওয়া সেরে ?"

অন্যমনস্ক নিরঞ্জন চমকিয়া বলিল "আজ্ঞে !"

শান্তিদেবী বলিলেন "এতরাত্রে বেড়াতে বেরিয়েছ কি ঘুম হয়নি বলে ?—"

"হাঁ—" বলিতে বলিতে নিরঞ্জন থামিয়া গেল !—না না, 'ঘুম হয়নি' কথাটা যে ভুল হয় ! সে ত নিদ্রার জন্য লেশ মাত্র চেষ্টা করে নাই, তবে 'ঘুম হয় নাই' কথাটা এস্থলে কেমন করিয়া প্রযুজ্য হয় ?

নিঃশব্দাধিকারে নিজেকে উগ্র সতর্ক করিয়া—নিরঞ্জন চারিদিকে চাহিল, নাঃ, সত্যের সাধনায় আত্মোৎসর্গের মাঝে আর এতটুকু অসত্যের অনাবশ্যক ছায়াকে মার্জ্জনা করিলে চলিবে না !—স্থিরকণ্ঠে নিরঞ্জন উত্তর দিল 'না আমি ঘুমাই নি—"

সে জোরের সহিত নিদ্রার উপর স্বীয় কর্তৃত্বের ছাপটি দাগিয়া দিল ! এ সত্যটুকু প্রচার না করিলেও কোন ক্ষতি ছিলনা তাহা সে খুব ভালরকমই জানে, কিন্তু অপ্রয়োজনীয়-সত্যকে বাদ দিয়া চলাও আজ তাহার কাছে ধর্ম্মবিরুদ্ধ মনে হইল ?

তাহার কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে শান্তিদেবী একটু বিস্ময় বোধ করিলেন, কিন্তু তখন অন্য কথা কহিবার সময় ছিল না, তাঁহারা বাসার দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন,—নিরঞ্জনকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া শান্তিদেবী দ্বারের চাবি খুলিয়া ভিতরে ঢুকিলেন,—নিরঞ্জন চিন্তাকুল বদনে উন্মনাভাবে দ্বার সম্মুখস্থ পথে, পশ্চাদ্বদ্ধ হস্তে পাদচারণা করিতে লাগিল।

একটা নীরব-হৃদয়ভেদী আত্মনির্য্যাতনক্রিয়া তাহার অভ্যন্তরে চলিতেছিল ! কিন্তু তাহা বড় গম্ভীর, মৌন, মূক ; ক্ষিপ্ত উন্মাদনার অধীর চাঞ্চল্য আজ তাহার মাঝে আত্ম-প্রকাশ করিয়া,—বুকের বোঝা লঘু করিতে ভয় পাইতেছিল ! যন্ত্রণা নিষ্পীড়িত বক্ষের মধ্যে স্তম্ভিত-ক্রন্দন যেন জমাট পাষাণের মত চাপিয়া বসিয়াছিল, শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়াও নিরঞ্জনের কাছে কষ্টদায়ক বোধ হইতে লাগিল !

উৎসব-মত্ত মানবকণ্ঠের উৎসাহ-উচ্ছ্বসিত কলরব—দূর হইতে তাহার কানে যেন বিভীষিকা-বেষ্টিত করুণ-রোদনের মত শুনাইতেছিল, নিরঞ্জন প্রাণপণে আপনাকে সান্ত্বনা আশ্বাসে প্রবুদ্ধ করিতে চাহিল, সজোরে নিজকে প্রকৃতিস্থ করিতে চেষ্টা করিল কিন্তু হায় মানবীয়-দৌর্ব্বল্য !—নিরঞ্জনের সমস্ত সাহস ক্রমে শঙ্কা-পীড়িত —ভীত হইয়া উঠিতে লাগিল ! এ কি নিগ্রহ !

আবশ্যকীয় জিনিসপত্র লইয়া অবিলম্বে শান্তিদেবী বাহিরে আসিলেন, দ্বারে চাবি দিয়া বলিলেন, "চল বাবা—"

পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইয়া, নিরঞ্জন বলিলেন "আপনি আগে চলুন—"

চন্দ্রালোকে তাহার স্তিমিত-ম্লান দৃষ্টি ও শুষ্ক বিবর্ণ মুখভাব অবলোকন করিয়া স্নেহ-কোমলকণ্ঠে শান্তিদেবী বলিলেন " তোমার বুঝি ঘুম পেয়েছে বাবা ?—

ক্ষীণ হাস্যে নিরঞ্জন মাথা নাড়িল " না "—

শান্তিদেবী বলিলেন " চল না, ও-বাড়ীতে তা হলে বিয়েটা দেখে আস্‌বে "

কপালের শিরা টিপিয়া ধরিয়া যন্ত্রণা বিকৃত কণ্ঠে নিরঞ্জন বলিল—"না আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আমি বাসায় ফির্‌ব, আজ আর বেড়াতে যেতে পার্‌ব না, শরীরে বড় ক্লান্তি বোধ হচ্ছে—"

করুণাবিগলিত কণ্ঠে শান্তিদেবী বলিলেন "আহা তা হবে না? সমস্ত দিন বুকে হাঁটু দিয়ে বসে কি দুর্জ্জয় খাটুনি!—সহজ কষ্ট?"

কষ্টোচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাসের সহিত নিরঞ্জন উত্তর দিল "অত্যন্ত!"

পরিশ্রমের ক্লেশাতিশয্যের কথা উঠিলে নিরঞ্জন চিরদিন হাসিয়া উড়াইয়া দেয়,—কিন্তু আজ সে নিজ মুখে ক্লিষ্ট ভাব স্বীকার করিতেছে সে ক্লেশ—"অত্যন্ত!"—শান্তিদেবীর মাতৃ-মমতা-মণ্ডিত সুকোমল হৃদয় ব্যথিত হইল, নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "যাওনা নিরঞ্জন, খাটুনী রেখে, দিনকতক মার কাছে গিয়ে জিরিয়ে এসনা বাবা—"

নিরঞ্জন কোন কথা কহিতে পারিল না—শান্তিদেবী পুনশ্চ বলিলেন "এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেলে, আমার কাছে দু দিন থেকে তবে তোমরা যেতে পাবে, তোমায় আমি একদিনও খাওয়াতে পারি নি,— শরীর খারাপ শরীর খারাপ, বলে তুমি ভয়ে খাওয়া-দাওয়া কর না, এবার কিন্তু সে কথা শুন্‌ব না,—"

নিরঞ্জন হাসিবার চেষ্টা করিল, ওষ্ঠের হাসি ওষ্ঠেই মিলাইয়া গেল! অবসন্ন বেদনায় তাহার দুই চক্ষু অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল—অভাগা জীবনে এই সামান্য স্নেহ-সৌভাগ্যটুকুও আজ তাহার নিকট দুর্ভাগ্যের পীড়ন বলিয়া প্রতীতি হইল!

বিবাহবাটীর কলরব ধ্বনি ক্রমশঃ তাহাদের কানে স্পষ্টতর হইয়া উঠিল, তাহারা গন্তব্য স্থানের খুব কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিলেন—সেই সময় উৎসব-বাটীর ভিতর হইতে উচ্চ শঙ্খধ্বনি শ্রুত হইল, শান্তিদেবী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "এইবার বাবা তুমি এগিয়ে চল, ওখানে অনেক লোক রয়েছে, শাঁখ বাজ্‌ছে, বোধ হয় বর ছাদনাতলায় এলেন, শীগ্রী চল—"

নিরঞ্জনের বক্ষের ভিতর সুপ্ত-উত্তেজনা তরঙ্গ—অকস্মাৎ সবেগে দোল খাইয়া,—ভিন্নাকারে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল! দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া সে স্খলিত চরণে অগ্রসর হইল! —রক্ষামন্ত্র জপিবার চেষ্টা করিল কিন্তু সে চেষ্টা,—বক্ষের ভিতরকার কম্পন প্রবাহে, প্রতিহত—নিস্তেজ হইয়া, ঘূর্ণীপাকে আবর্ত্তমান তৃণখণ্ডের মত ছিন্নভিন্ন হইয়া বিপন্ন কাতরতায় কোথায় যেন তলাইয়া গেল, শুধু অস্পষ্টভাবে ক্ষীণ প্রতিধ্বনি হইল " মমায়ত্ত হি পৌরুষম!—"

নিরঞ্জন পশ্চাদ্বদ্ধ হস্তদ্বয় খুলিয়া সবলে বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিল; নাঃ, কিসের অধীরতা! সে সবল শক্তি-মান দৃঢ়চেতা পুরুষ! তাহার ভয় কি—সে ভুলিবে না—তাহার সকল নিরুপায়ের মধ্যে উপায় আছে, সমস্ত অসহায় দৌর্ব্বল্যের উপর সহায় শক্তি আছে,—"মমায়ত্ত হি পৌরুষম্!"

কিন্তু বহির্জগতের কোলাহলে চিত্তের সাড়া, মুমূর্ষু নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছিল—নিরঞ্জন যতই প্রকৃতিস্থ হইতে চেষ্টা করুক — তাহার চারিদিকে কিন্তু চঞ্চল উদ্বেগের বিভীষিকা নিদারুণ রূপে জাগিয়া উঠিয়াছিল, চলিতে চলিতে হঠাৎ ত্রস্ত ব্যাকুলভাবে সে একবার ফিরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু পরক্ষণে শান্তি দেবীর উপর দৃষ্টি পড়িল,—না ফিরিয়া পালাইবার পথ নাই! সম্মুখের পথই সম্বল! নিরঞ্জন কম্পিত চরণে অগ্রসর হইল!

সম্মুখেই পুষ্পপত্রাভরণশোভিত আলোকোজ্জল বৈঠকখানায় আসর সজ্জিত। বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীগণ-ফুলেরমালা গলায় পরিয়া, ধুমপান করিতে করিতে, তর্কবিতর্ক গল্পগুজব করিতেছেন ; অভ্যর্থনাকারীগণ ব্যস্ত চঞ্চল হইয়া এদিক ওদিক ঘুরিতেছেন—আসরের মধ্যস্থলে সুসজ্জিত পুষ্পাধার ও প্রজ্জলিত সেজের সম্মুখে, সল্মা-চুম্‌কির ঝকমকে কারুকার্য্য রচিত, রক্তসাটীনের বরাসনখানি শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, বর বাটীর ভিতর গিয়াছেন!

নিরঞ্জনের পদদ্বয় টলিতে লাগিল, মস্তিষ্কের রক্ত প্রবাহে একটা উদ্ভ্রান্ত ঘূর্ণাবর্ত্ত সবেগে গর্জ্জিয়া উঠিল, অসহায় বিকল দৃষ্টিতে একবার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী শান্তিদেবীর পানে চাহিল, একবার সম্মুখের দিকে চাহিল,—নাঃ, ধৈর্য্য হারাইলে চলিবে না; শান্তিদেবী মুখের উপর ঘোমটা টানিয়া কেবল মাত্র তাহাকে লক্ষ্য করিয়া,—দুই পাশের জনসঙ্ঘ অতিক্রম করিয়া আসিতেছেন, এ সময় একচুল পিছাইবার পথ নাই, দায়িত্ব স্কন্ধে—চলিতেই হইবে, যত কঠিন দুঃখের পরীক্ষাই হউক—আজ নিষ্কৃতি নাই!

ভিতরে শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি আরম্ভ হইয়াছিল, মুক্তদ্বার পথে ইতর-ভদ্র নির্ব্বিশেষে বহুলোক গমনাগমন করিতেছিল, পরিদর্শন ভারপ্রাপ্ত হৃষীকেশ বাবুর জনৈক বন্ধু কি-কাজের জন্য বাহিরে আসিতেছিলেন, সহসা ভিত্তিগাত্রস্থ দেয়াল-গিরির আলোকে দ্বার প্রবেশোদ্যত নিরঞ্জনের বিকৃত-বিহ্বল মুখাবয়ব তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, দ্রুত আসিয়া নিরঞ্জনের পথরোধ করিয়া ত্রস্তভাবে তিনি বলিলেন "মশায় কি পাত্র পক্ষীয়! স্ত্রীআচার দেখ্‌তে যাচ্ছেন? ক্ষমা করুন,—"

প্রসারিত হস্তে দ্বারের কিয়দংশ আটক করিয়া, লোক জনের ভিড় ঠেলিয়া, নিরঞ্জন, শান্তিদেবীর গমন পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল, ভদ্রলোকটীর পানে চাহিয়া ধীর-সংযত কণ্ঠে বলিল "আজ্ঞে না, আমি ভেতরে যাব না, অনুগ্রহ করে পথ ছাড়ুন, বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বাড়ী থেকে মা আস্‌ছেন—"

ত্রস্তভাবে সরিয়া দাঁড়াইয়া ভদ্রলোকটী প্রশ্ন করিলেন "আপনি বরযাত্রী নন্?—"

নিরঞ্জন উত্তর দিল "না।"

মাপ করুন মশায়, আমি এখানকার কাউকে চিনিনে.........আসুন মশায়, ভেতরে পায়ের ধুলো দেবেন—" উদ্বিগ্ন হইয়া নিরঞ্জন বলিল "আজ্ঞে না, আমি এইখান থেকে ফির্‌ব,—"

ভদ্রলোকটি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন "সে কি হয়! সাম্‌নের উঠানে অনেক ভদ্রলোক রয়েছেন, মা ঠাকুরুণকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বাড়ীর ভেতর পৌঁছে দিন্—"

নিরঞ্জন বিপন্ন-ব্যাকুল দৃষ্টিতে চারিদিক চাহিল,—না, কেহ নাই; কেবল বাবু, হৃষিকেশ বাবুর কথা দূরে থাক্ একটি পরিচিত বালকেরও দেখা নাই! শান্তিদেবী অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না,—নিরুপায়ভাবে ইতস্ততঃ-পরায়ণ নিরঞ্জনের দিকে চাহিয়া ভদ্রলোকটি বলিলেন "দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছেন কি? আপনি এইখানকার লোক, ভেতরে চলে যান মশাই" ভদ্রলোকটি চলিয়া গেলেন।

অদৃষ্টের বিড়ম্বনা! তাহাকে বাড়ী ঢুকিতেই হইবে! হে ভগবান ধৈর্য্য দাও! তাহার যত্নকৃত আয়োজন,—বড় গর্ব্বের পুরশ্চরণ অসিদ্ধ হইয়াছে,—মন্ত্র চৈতন্যহীন হইয়াছে! আর তাহার "মন্মায়ত্ত হি পৌরুষম্" জপিবার শক্তি নাই,—এবার তুমি তাহাকে রক্ষা কর!—

পিছন হইতে শুনিতে পাওয়া গেল, সেই ভদ্রলোকটি অন্য কাহাকে প্রশ্ন করিতেছেন "বেদান্তবাগীশ মশায়ের বাড়ী থেকে আস্‌ছে, এ ছোক্‌রাকে চেন হে? ওঃ, মদে চুর হয়ে এসেছে!—"

নিরঞ্জন হাসিল ! ভদ্রলোক তাহাকে মাতাল ঠাহরাইয়াছেন। বাঃ তাহার দৃষ্টিশক্তি প্রশংসনীয় বটে ! কথাটা অকাটা-সত্য !

কোনগতিকে ভিড়ের পাশ কাটাইয়া, শান্তিদেবীকে লইয়া নিরঞ্জন অন্তঃপুরের দ্বারে পৌঁছিল, শান্তিদেবী ভিতরে ঢুকিলেন, নিরঞ্জন নিঃশব্দে ফিরিয়া চলিল।

সহসা পিছন হইতে ছুটিয়া আসিয়া কেবলরাম, নিরঞ্জনকে চাপিয়া ধরিল, ব্যস্তভাবে বলিল 'পালালে চল্‌বে না ভাই, পীঁড়ে ধর্‌বার লোক পাচ্ছিনে, শ্রীগ্রী এস !

নিরঞ্জন নির্ব্বাক স্তম্ভিত ! সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে ! এতক্ষণের পর সে বুঝি সত্যই পূর্ণ মাতাল হইয়া উঠিল ! তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা ছাইয়া, কঠোর উন্মত্ততা ভীষণ হুঙ্কার করিয়া উঠিল ! একি দুর্ব্বিষহ দৈব-দুর্ব্বিপাক ! সে চাহে অন্ধকারে মুখ লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিতে !—আর অদৃষ্ট চায়, তাহার মুখের উপর জলন্ত অগ্নিশিখায় বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়া নির্ম্মম কৌতুক রঙ্গ দেখিতে !—

ব্যাকুল ভাবে নিরঞ্জন বলিল "মাপ করুন কেবল বাবু, মাপ করুন" কেবল, তাহাতে দৃক্‌পাত করিল না, তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল, বলিল "লোক নাই ভাই, না হলে তোমায় দুঃখ দিতাম না—"

শুভ্রপট্টবস্ত্র পরিহিত বেদন্তবাগীশ মহাশয়, লগ্নপদে সেই স্থান দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, উভয়কে দেখিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন "কি হয়েছে ?" কেবল বলিল 'পীঁড়ে ধর্‌বার লোক পাচ্ছিনে—এই নিরঞ্জনকে—'

"স্বভাব সিদ্ধ কোমল কণ্ঠে তিনি বলিলেন "বেশত যাও নিরঞ্জন, কতক্ষণের কাজ ?—" বেদান্তবাগীশ মহাশয় ধীরপাদক্ষেপে চলিয়া গেলেন।

করাল-মৃত্যুর প্রলয়-উৎসবের বক্ষে যেন পাষাণ চাপিয়া পড়িল !—সে অতি গুরুভার, অত্যন্ত কঠিন,—কিন্তু তাহার স্পর্শ কি শান্ত, কত শীতল ! নিরঞ্জনের মস্তিষ্কের মধ্যে যে মরণাগ্নির রক্তশিখা হুহু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, আকস্মাৎ তাহা যেন তড়িতাহত -মুগ্ধ অভিভূত হইয়া পড়িল ! সেই অগ্নি-বিদ্যুতের দৃপ্ত-সংঘাতে, একটা অপরিসীম নিষ্ঠুর শঙ্কাঘাত বাজিল,—কিন্তু সেইসঙ্গে একটা গভীর বিশ্বাস নির্ভর—অনন্দময় সান্ত্বনাও প্রাণে আসিয়া পৌঁছিল ! এই সরল স্নেহময় আদেশ,—ইহা প্রতিপালন করা তাহার পক্ষে যত কঠিনই হউক ইহা আশীর্ব্বাদী শীরোপার মত মস্তকে ধরিয়া সে মৃত্যুর অগ্নিপরীক্ষায় পার হইবে, মিথ্যাই সে অন্তরের ক্ষীণ-দৌর্ব্বল্যের চরণে সাধিয়া কাঁদিয়া, তোষামোদের গীত গাহিয়া, নিজেকে বঞ্চনায় ভুলাইয়া, বড় করিয়া দেখিতে চাহিতেছে ! কিন্তু বাস্তবিক সে কি অপদার্থ !—......থাক্, সে গ্লানির বেদনায় অনুতপ্ত হইবার সময় এখন নাই, এখন—উৎসন্ন যাউক তাহার নিজস্ব ক্ষুদ্রত্ব, ঐ—একটি ? "সরল আদেশ মন্ত্রে !—"

অন্তরের ইষ্ট দেবতার চরণে মাথা লুটাইয়া নিরঞ্জন সমস্ত প্রাণের সহিত প্রার্থনা করিল, "হে অন্তর্য্যামী, জীবনের সমস্ত সুকৃতির বিনিময়ে,—আজ একটিমাত্র ধৈর্য্যপূর্ণ অবসর ভিক্ষা দাও—নিজের নিজস্ব ক্ষুদ্রত্ব তোমার চরণে উৎসর্গ করিয়া—মানুষের মত বিশ্বস্ত হৃদয়ে সে যেন একটি—মাত্র-একটি আদেশ প্রতিপালন করিতে পারে ! শ্রদ্ধা-নিষ্ঠ-প্রাণে সে যেন আজ একটি কাজ সম্পাদন করিবার শক্তি পায় !"

অন্তর্য্যামী বুঝি সে প্রার্থনা শুনিলেন—তাহার অন্তরের মধ্যে ধীর গম্ভীর উদাত্ত সুরে, আবেগ-ঝঙ্কার কাঁপিয়া উঠিল,—"মমায়ত্ত হি পৌরুষম্ !"

নিরঞ্জন সমস্ত চিত্তের সহিত আপনাকে সেই মন্ত্রের চরণে নত করিল, কাণ্ডজ্ঞানহীন বর্ব্বর সে, নিজের শক্তি সামর্থ্যের পরিমাণ জানে না, দূরত্বের নির্ভয় ব্যবধানে দাঁড়াইয়া জঘন্য প্রবঞ্চনার বৈভবে নিজের দীনতা আবরণ

করিয়া, আসুরিক গর্ব্বে স্ফীত হইয়া পুরুষাকার মহিমার দম্ভকরে!—এই উৎকট শাস্তিই তাহার উপযুক্ত পরীক্ষা!—এই সত্যের নিরাখে সে নিজেকে কসিয়া,—নিজের দর বুঝিয়া লউক, অভিমানের ক্রন্দনে শক্তি-ক্রীত হয়, কি অন্য মূল্যে শক্তি আয়ত্ত করিতে হয়, তাহা বুঝাইবার জন্যই বুঝি অদৃষ্ট দেবতা তাহার সম্মুখে এই পরীক্ষার আয়োজন করিয়াছেন! ভাল তাহাই হউক!

আর একটী আপত্তি-জনক নিঃশ্বাস ফেলিতে সাহস হইল না। নতশিরে নিরঞ্জন কেবলরামের সহিত চলিল।

বিবাহর স্থল হইতে বরকর্ত্তা উচ্চকণ্ঠে বলিলেন "বড় দেরী হচ্ছে মশাই শীগ্রী স্ত্রী আচার সেরেনিয়ে বরকে ছেড়ে দিতে বলুন,—না হলে এই বার লগ্নভগ্ন হবে!"

সঙ্গে সঙ্গে বহুকণ্ঠে তাড়াহুড়ার ধূম পড়িয়া গেল, কেবল ব্যস্ত হইয়া নিরঞ্জনকে টানিয়া লইয়া ছুটিল। ঘরে পুঁথী কোলে করিয়া, পীঁড়ার উপর রক্ত চেলি মণ্ডিতা কন্যা পাণদিয়া চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া বসিয়াছিল, কেবলরাম পীঁড়ার বামদিক ধরিয়া নিরঞ্জনকে বলিল "গৌরাঙ্গ, ডানদিকটা ধরভাই—"

গৃহাভ্যন্তরে অনেকগুলি মহিলা ছিলেন, নিরঞ্জন ঘাড় বাঁকাইয়া জামার আস্তিনে কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে আসিয়া, নিঃশব্দে কেবলের আদেশ পালন করিল। পীঁড়া তুলিয়া সহসা অসাবধানে তাহার হাতটা কাঁপিয়া গেল, পীঁড়ি একটু ঝুকিয়া আড় হইল,—পতনাশঙ্কায় সন্ত্রস্তা কন্যা, ডান হাতে পীঁড়িবহনকারী একজনের হাত চাপিয়া ধরিল! বামহাতে পাণ দিয়া চক্ষু আচ্ছাদিত ছিল,—সে দেখিতে পাইল না, অবলম্বনের জন্য যাহার হস্তের উপর নির্ভর স্থাপন করিল, সে ব্যক্তি, কে?—

সে ব্যক্তি স্বয়ং নিরঞ্জন!—নিরঞ্জন,--অচঞ্চল স্থির! মরণাহতের চক্ষুতে অশ্রু ঝরিতে পারে, কিন্তু মৃত্যু যাহাকে গ্রাস করিয়াছে,—তাহার চক্ষে অশ্রু বহা সম্ভব নহে, নিরঞ্জনের অবস্থাও বোধ হয় সেইরূপ হইয়াছিল— অথবা অন্য কিছু! নিরঞ্জন নিজেই আশ্চর্য্য হইল,—একি অদ্ভুত? কোথায় গেল তাহার সে দুর্দ্দম্য-চাঞ্চল্য,—কোথায় গেল তাহার সে মরণোন্মাদ উদ্দীপনা! সে ত তাহার মণিবন্ধের উপর, একটা সুকোমল স্পর্শ স্পষ্ট অনুভব করিতেছে, কিন্তু তাহা স্পর্শ মাত্র!—তাহার মধ্যে কোথায় সে ভয়াবহ বিশেষত্ব.--কোথায় সে মরণাকুল আতঙ্ক? কিছুই নাই! কিছুই নাই! এই স্পর্শের মাঝে কিছুই নাই! এ স্পর্শ যে বাহিরের মিথ্যা স্পর্শ মাত্র! অন্তরের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ-যোগ নাই! অন্তর ইহার আহ্বান গ্রাহ্য করে না,—নিঃশব্দ তাচ্ছিল্য প্রত্যাখ্যান করে!—নিরঞ্জন সতর্ক-ধৈর্য্যে দৃঢ়হস্তে পীঁড়া চাপিয়া ধরিল।

দুইজনে পীঁড়া লইয়া ছাদ্‌না-তলায় আসিয়া—যথারীতি বরের চতুর্দ্দিকে সাতপাক ঘুরাইয়া প্রবীণাগণের নির্দ্দেশ-মত নিয়মিত ক্রিয়ানুষ্ঠান পালন করিল। পরস্পর সম্মুখীন বরকন্যার মাথার উপর আচ্ছাদন বস্ত্র ফেলিয়া দিয়া নরসুন্দর, উভয়ের হস্তে ফুলমালা দিয়া বলিল "চারচোখে চেয়ে মালা বদল করুন।"

অজ্ঞাতে নিরঞ্জনের হাত দুইখানা বোধ হয় একটু কাঁপিল, কেবলরাম বলিল "সাবধান—"

পশ্চাত হইতে আর একজন আসিয়া পীঁড়া ধরিল,—তাহার বাহু-অন্তরালে নিরঞ্জনের দৃষ্টি অবরোধ হইল,—নিরঞ্জন চমকিয়া উঠিল, পরক্ষণে আত্মসম্বরণ করিয়া নিঃশব্দে ম্লান হাসি হাসিল, ইহাই ত ভগবানের অনুগ্রহ!

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া সাহায্যকারীর উদ্দেশ্যে অস্ফুট স্বরে বলিল "ধন্যবাদ মশায়, আর একটু অনুগ্রহ করে ধরে থাক্‌বেন—"

নারীকণ্ঠে উলুধ্বনি হইল, উচ্চশব্দে শঙ্খ বাজিল, সঙ্গে সঙ্গে নরসুন্দর যথাবিদ্যা 'ছড়া' আবৃত্তি করিল, রহস্য-প্রিয় কেবলরাম, তাহার কবিতার দুই-দশটা ভুল সংশোধন করিতে ছাড়িল না, নিকটবর্ত্তী অল্পবয়স্কের দল হাসিয়া

কাশিয়া 'বাহবা' দিতে লাগিল, বেশ একটা গোলমাল জমিয়া উঠিল,—নরসুন্দর ব্যর্থচেষ্টায় গোল থামাইবার আবেদন করিয়া,—শেষে উচ্চ চীৎকার করিয়া বলিল "লগ্ন বয়ে যায়, শীঘ্র মালা বদল করুন"

অকস্মাৎ সে চীৎকার নিরঞ্জনের কানে অদ্ভুত—ভয়ানক শুনাইল! হঠাৎ যেন একটা দুরন্ত বিদ্রোহ বৈষম্য-সংঘাতে তাহার বুকের অস্থিসন্ধিগুলা জোড়ে জোড়ে খুলিয়া গেল, স্নায়ুতন্ত্রীগুলা সশব্দে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। নিরঞ্জনের আপাদমস্তক থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, ইচ্ছা হইল, আর্ত্তনাদ করিয়া এখান হইতে ছুটিয়া পলায়!—কিন্তু তখনই মনে হইল—মায়া যদি জানিতে পারে?—আতঙ্কে নিরঞ্জনের আকণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল, নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল,—না না না, সে অসহ্য, নিরঞ্জন নিঃশব্দ-ধৈর্য্যে সমস্ত সহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে!

নিরঞ্জনকে স্পষ্ট বেপথুমান দেখিয়া—পশ্চাৎ হইতে সাহায্যকারী ব্যক্তি আরও অগ্রসর হইয়া সাবধানে পীঁড়া তুলিয়া ধরিলেন,—এবার নিরঞ্জনের দৃষ্টি তাঁহার বাহু অন্তরাল মুক্ত হইল, কিন্তু নিরঞ্জন নিস্পন্দ নির্জ্জীব ভাবে, কুণ্ঠাহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল!—আচ্ছাদনবস্ত্রে বর ও কন্যার সহিত তাহাদের মস্তক আবৃত হইয়াছিল, সুতরাং আনুষ্ঠানিক প্রথামত মাল্য বিনিময়ের উদ্যোগ অভিনয় তাহাদের দৃষ্টির নিকটতর সান্নিধ্যে সংঘটিত হইতেছিল,—নিরঞ্জনের দৃষ্টি ফিরাইতে শক্তি হইল না, চক্ষু মুদিতে সাহস হইল না? বিস্ফারিত, নিষ্পলক নয়নে—হতচৈতন্যের মত চাহিয়া রহিল!

সুপুরুষ সুন্দর যুবা মন্মথনাথ, চক্ষু তুলিয়া আনতমুখী মায়ার পানে চাহিয়া—বেশ শান্ত অবিচলভাবে হাতের মালা ছড়াটি তাহার গলায় পরাইয়া দিলেন; তারপর সকলের প্ররোচনায় উপর্য্যুপরি উৎসাহ বাক্যে,—মায়া, চন্দনবিন্দু পরিশোভিত শুষ্ক-ক্লিষ্ট মুখখানি তুলিয়া—দৃষ্টি বিনিময় জন্য, একবার মাত্র বরের ললাটভাগে চকিত-ম্লান দৃষ্টিক্ষেপ করিল! তারপর হাতের মালাটা ত্রস্তভাবে তাঁহার মাথার উপর ফেলিয়া দিল,—মালাটা মন্মথনাথের মস্তকের পশ্চাদ্দিকে আটকাইয়া গেল, তিনি স্বহস্তে মালাটা সরাইয়া গ্রীবার উপর বিলম্বিত করিয়া দিলেন, মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠিল!

—গতকল্য বর অভ্যর্থনা করিতে যাইবার সময়,—নিরঞ্জন প্রাণের আকুলতার কণ্ঠ চাপিয়া, বড় জোরে নির্ম্মম হত্যা করিয়াছিল! কিন্তু আজ এখন?—আজ এখন মরণান্তিক দুঃসাহসে উদ্দীপ্ত হইয়া, সে সংহত নিষ্ঠার মাঝে সংজ্ঞাহীন, অচেতন!

ছাদনাতলার কাজ শেষ হইল। সাহায্যকারী ব্যক্তি এবার পীঁড়ার সম্পূর্ণ ভার লইয়া—অন্যত্র কন্যা লইয়া চলিলেন। মুক্ত হইয়া নিরঞ্জন সকলের অজ্ঞাতে নিঃশব্দে প্রস্থান করিল, কর্ম্মব্যস্ত কেবলরাম তাহাকে লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইল না।

সমস্তরাত্রে কেহ নিরঞ্জনের কোন সংবাদ পাইল না। পরদিন প্রাতে—সারারাত্রি তামাসা কৌতুক দেখিয়া, সদ্য কর্ম্মস্থান-আগত সনাতন ও আদিত্য যখন বিচিত্র-চমৎকার মারাঠি যাত্রা অভিনয়ের নিরঙ্কুশ সমালোচনা জুড়িয়া, খুব স্ফূর্ত্তির সহিত হাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল—তখন বিদায়ের বেশে সসজ্জ নিরঞ্জন—উত্তেজনা-রক্ত মুখে উর্দ্ধশ্বাসে সেখানে ছুটিয়া আসিল। ঘরের চাবি ফেলিয়া দিয়া ব্যস্ত-উদ্বিগ্ন ভাবে বলিল "দাদার চিঠি পেলুম তিনি দিন-চারেকের মধ্যে আস্‌ছেন, এলে বলিস্ আমি সুরাটে চলে গেছি।"

আদিত্য লাফাইয়া উঠিয়া বলিল "সুরাটে।"

দ্রুত স্বরে এক নিঃশ্বাসে নিরঞ্জন বলিল, "হাঁ মোহন্ত মহারাজের সই কড়া-চিঠি পেলুম, পূর্ণিমার মধ্যে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে হবে, আমি আজই চল্লুম,—যা কাজ বাকী রইল, দাদা এলে তোরা সেরে যাস্—"

আদিত্য হতবুদ্ধির মত চাহিয়া রহিল, সনাতন উত্তেজিত ভাবে নিরঞ্জনের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল "নিরু, তুই কি খেপেছিস্—পূর্ণিমার এখনও ঢের দেরী,—আজ এখানকার অধিকারী মহারাজ আস্ছেন. এতদিন ধরে যে প্রাণপণে খাটলি, তার সম্মান পুরস্কার—"

সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া নিরঞ্জন বলিল, "উচ্ছন্ন যেতে দে! দাদাকে বলিস্ এ মোহ-স্তের আহ্বান!—এই গৌরবের স্বস্তি-আশীর্ব্বাদে,—যদি নিজের অক্ষমতার দৈন্য,—মুমূর্ষতার অবসাদ থেকে নিষ্কৃতি পাই, তার চেষ্টায় চল্লুম,—"

"শোন নিরঞ্জন—" সনাতন উৎকণ্ঠিত ভাবে কি বলিতে উদ্যত হইল—

ক্ষিপ্ত স্বরে নিরঞ্জন বলিল,—"আর নয়, আর পেছু ডাকিস্ না—আমি নিজের অক্ষম-দুর্ব্বলতার জন্য,—আজ জগতের সৌন্দর্য্য-সাধক শিল্পী-জীবনকে অভিসম্পাত দিয়েছি, বিশ্বনাথের শিল্পকে ক্ষোভের ধিক্কারে অপমান করেছি! আমার এ-অপরাধ অমার্জ্জনীয়! সঙ্কীর্ণতার কোটরে আশ্রয় নিয়ে বিশ্বব্যাপী ঔদার্য্য সহনীয়তাকে—হীন দৃষ্টিতে, তুচ্ছ—ক্ষুদ্র দেখ্ছি, অন্তর দ্বন্দ্বের তাড়নায় উদ্ভ্রান্ত বিকল হয়ে ভুলে যাচ্ছি,—আনন্দময় বিধাতার বিশ্বরাজ্যে কোন দৃশ্য অসুন্দর হতে পারে না,—কোন দর্শন অপবিত্র হতে পারে না, যদি দৃষ্টি না অপরাধী হয়!—না সনাতন আর নয় আমি মূর্খ, অপদার্থতার চরম সীমায় এসে দাঁড়িয়েছি, এবার সকলের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করব!—"

নিরঞ্জন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিল।

সনাতন ও আদিত্য হতভম্বের মত পরস্পরের মুখ চাহিয়া রহিল! চিরশান্তচেতা নিরঞ্জনকে তাহার জীবনে কখনও এরূপ উদ্ভ্রান্ত ব্যাকুল হইয়া এত কথা বলিতে শুনে নাই!—অনেকক্ষণ কেহ কথা কহিতে পারিল না, শেষে আদিত্য নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"লক্ষ্মীছাড়া ছোক্‌রা, ঝোঁকের মাথায় শিল্প শিল্প করে—এবার নিজের মগজের মাথা খাবে,—"

সনাতন দুঃখিত ভাবে বলিল, "বাস্তবিক, নিরঞ্জন আজ ভাবনা ধরিয়ে দিলে!—ওর গতিক ভাল নয়!"

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

ক্রমশঃ—

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

পৌষ আগলানো।

——(-:০:-)——

ছেড়না সোনার পোষ, একি তব রঙ্গ
যেওনা গো, যেওনা গো, করি আশা ভঙ্গ।
রাত জেগে ছেলেমেয়ে ওই শোনো ডাকছে
বাহু মেলি পথ তব রোধ করে রাখছে।
করেছ যে আঙিনায় তুমি সোনাবৃষ্টি
করেছে শ্যামল খেত তব শুভ দৃষ্টি।

সারি সারি বিকসিত মটরের ফুল গো
সবুজের সাটিনেতে গোলাপীর ঝুল্ গো।
কালিকার কলাপাতে পড়ে নাই ভাঁজটী
শিশিরেতে ভিজে আছে লক্ষ্মীর পাঁজটী!
তবু তুমি চলে যাবে কাঁদে আজ প্রাণ হে
কে বাগাবে ধান আর কে জাগাবে গান হে
ঘর কর টাব্‌টুব্ রও তুমি নিত্য,
বাঙলার প্রাণ তুমি, কৃষকের বিত্ত।
ছেড়না সোনার পৌষ রাখ তব রঙ্গ
যেওনা গো যেওনা গো করি আশা ভঙ্গ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

বিনিময়।

ঃ*ঃ-

এখন যে মানুষ দুনিয়ার খবর না রাখিয়া, ভালো মন্দের, সত্য অসত্যের বিচার না করিয়া, কতকগুলি ভুল ধারণা লইয়া অন্ধের মতো 'অচলায়তনে' বসিয়া থাকিবে, সে কাল আর নাই। মানুষ চায়—যাচাই করিয়া সত্যকে পাইতে, শ্রেয়কে লাভ করিতে। সকলের মনেই দেশের উন্নতি—রাষ্ট্রীয় উন্নতি, সামাজিক উন্নতি, আর্থিক উন্নতি প্রভৃতির জন্য আশা ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান, প্রভৃতির মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান না থাকিলে তাহাদের সম্বন্ধে পরিস্ফুট ধারণা হওয়া সম্ভব নহে—বরং অনেক সময়ই ভুল ধারণা পোষণ করিতে হয়। এই জন্য সুধী ও বিশেষজ্ঞগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সাধারণ ভাবে ধনবিজ্ঞানের কতকগুলি মূলতত্ত্ব আলোচনার চেষ্টা করিব।

(১)

ধন-বিজ্ঞানের প্রথম আলোচ্য বিনিময়। বর্ত্তমান জীবনে বিনিময় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যত দ্রব্যসম্ভার এখন প্রস্তুত হয় তাহার প্রায় সকলই বিনিময়ের জন্য। ওই যে কৃষক পরিশ্রম করিয়া শস্য উৎপন্ন করিতেছে, ওই যে কাপড়ের কলগুলি কাপড় প্রস্তুত করিয়া স্তূপাকার করিতেছে, ওই যে জুতার ফ্যাক্‌টরী রাশি রাশি জুতা তৈয়ার করিতেছে, ওই যে কর্ম্মকার রাতদিন অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিতেছে—এ সকল কিসের জন্য? এ সকল কি তাহারা নিজেদের ব্যবহারের জন্য তৈয়ার করিতেছে? তাহা নয়। অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, দেখিবেন যে তাহারা হয়তো ইহার কিছুই ব্যবহার করিবে না; আর যদি ব্যবহার করে, তাহা হইলেও উহার অতি অল্প অংশই ব্যবহার করিবে। বাকি সকলই বিনিময়ের জন্য উৎপাদিত হয়। আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি, প্রতিভা ও ক্ষমতা যে খাটাই তাহাও বেশী সময়ই অপরের অভাব পূরণের নিমিত্ত। উকিল যে দিনের পর দিন ওকালতী করিয়া মোকদ্দমা জয়

করিতেছেন, তাহার মধ্যে কয়টা তাঁহার নিজের মোকদ্দমা? ডাক্তার তাঁহার ডাক্তারী বিদ্যার সাহায্যে রোগ আরোগ্য করেন, তাহার মধ্যে অধিকাংশই অন্যের পীড়া, নিজের নহে। এই যে উকিল ও ডাক্তারের কথা বলিলাম ইঁহারা স্ব স্ব গুণ ও কার্য্যতৎপরতার বিনিময়ে অন্য জিনিষ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই রকম প্রায় সকলেই।*

কিন্তু বিনিময়ের অবস্থা এখন যেমন আমরা দেখিতেছি চিরকালই যে এম্‌নি ছিল তাহা নহে। সভ্যতার অনুন্নত অবস্থায় যখন প্রত্যেক পরিবার নিজ নিজ সকল অভাবই নিজেরাই পূরণ করিত—পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিত না, তখন বিনিময়েরও প্রয়োজন ছিল না।

ক্রমশঃ যখন ব্যবসায়ীদের দলের (guild system) সৃষ্টি হইল, তখন ব্যবসা পৃথক পৃথক হইয়া যাওয়াতে বিনিময়েরও সুরু হইল।

এইরূপভাবে বিনিময়ের ক্ষেত্র ক্রমশঃ প্রসারিত হইতে হইতে বর্ত্তমানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International trade) পর্য্যন্ত চলিতেছে।

এই যে বিনিময়ের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত করিলাম, ইহা যে ব্যবসা ও বাণিজ্যের ইতিহাসের সঙ্গে ঠিক্ ঠিক্ মিলিয়া যাইবে তাহা নহে—ইহা কেবল একটা mnemotechnic generalization মাত্র।

(২)

বিনিময় আছে বলিয়া অনেক দ্রব্যসম্ভার মানুষের উপকারে লাগিতেছে; বিনিময় অভাবে সেগুলি অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়া থাকিত। আজ যদি বিনিময়ের নিয়ম না থাকিত তাহা হইলে ঝেরিয়া, রাণীগঞ্জ তাহাদের কয়লা, ক্যালিফোর্ণিয়া তাহার স্বর্ণের দ্বারা কি করিত?

বিনিময়ের আর একটা উপকারিতা এই যে, ইহার জন্যই অনেক উৎপাদিকা শক্তির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেছি, ইহার অভাবে সেগুলি অকেজো হইয়া থাকিত। যদি বিনিময় না থাকিত তাহা হইলে প্রত্যেক মানুষকে তাহার অভাব পূরণের জন্য সকল জিনিষ তৈয়ার করিয়া দিতে হইত। একজন লোকের যদি দশটা অভাব থাকিত তাহা হইলে তাহাকে দশরকম দ্রব্য প্রস্তুত-কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হইত। কাজেই তখন সে প্রবৃত্তি (Aptitudes) অপেক্ষা অভাবের (wants) তাড়নায় চালিত হইয়াই দ্রব্য প্রস্তুত করিতে বাধ্য হইতে। কিন্তু, বিনিময় এ বিষয়ে মানুষকে অনেকটা স্বাধীনতা দিয়াছে; ইহারি জন্য সে তাহার প্রবৃত্তি (aptitudes) অনুযায়ী কাজে লিপ্ত থাকিতে পারে। এখন যে যে-কাজে পারদর্শী সে সেই কাজই করে; অথচ সকলেই জানে যে, তাহারা তাহাদের কাজের অথবা প্রস্তুত দ্রব্যের বিনিময়ে তাহাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারিবে।

(৩)

সভ্যতার অনুন্নত অবস্থায়—যখন মানুষের জীবন সাধাসিধে ছিল, সমাজও এখনকার মতো এমন জটীল ছিল না—তখন মানুষ জিনিষের বদলে জিনিষ লইত।† এই প্রকার বিনিময়কে ইংরেজীতে Barter বলে। এখনো

* প্রায় সকল গুণ ও কার্য্যতৎপরতারই বিনিময় হয়। আবার এমন কতকগুলি গুণ আছে যাহার বিনিময় হয় না; টাকা দিয়া চাকরের পরিচর্য্যা পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু মাতৃস্নেহ পাওয়া অসম্ভব। কোন জিনিষের বা কার্য্যতৎপরতার কি কি গুণ থাকিলে তাহা বিনিময়সাধ্য হয় সে কথা আমরা ভবিষ্যতে আলোচনা করিব।

† সভ্যতার অনুন্নত অবস্থায় কেবল যে Barterই ছিল, অর্থ (money) অথবা ধারে বিক্রয় (credit) ছিল না, এমন নহে। তবে যে একই দেশে এই সবগুলিই ছিল এমনও নহে। এ বিষয়ের উদাহরণের জন্য Herbert Spencerএর "Data of Sociology" এবং Feathermanএর "Social Historyof the Races of Mankind" Vol. I দ্রষ্টব্য। পরে এ বিষয়ে আলোচিত হইবে বলিয়া এখানে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

বাংলাদেশের অনেক পল্লীতে দেখিতে পাওয়া যায় কলু, চাষীকে তেল দেয়, চাষী তাহার বিনিময়ে কলুকে ধান অথবা চাউল দেয়। *

এ প্রকার বিনিময়ের অসুবিধা আছে। টুপিওয়ালার প্রয়োজন চাউল। সে তাহার প্রস্তুত টুপি লইয়া চাউলওয়ালার কাছে হাজির হইল, ইচ্ছা যে, টুপির বদলে চাউল আনিবে। কিন্তু চাউলওয়ালা বলিয়া বসিল "আমার তো এখন টুপির প্রয়োজন নাই; আমার প্রয়োজন ছিল জুতার"; অথবা বলিল "আমার টুপির দরকার ছিল, কিন্তু তোমাকে যে তাহার বদলে চা'ল দিব, সে চা'ল তো আমার এখন নাই।" টুপিওয়ালা বিপদে পড়িয়া-গেল। আমার এমন একজন লোককে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে যে আমার জিনিষটী চায় এবং তদ্বিনিময়ে আমার প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমাকে দিতে পারিবে—সেটা বড় অসুবিধার কথা। ইহা ছাড়া আরো একটী অসুবিধা আছে। বিনিময়সাধ্য দুইটী জিনিষ পরস্পর সমান মূল্যের (equal value) হওয়া চাই; তাহা না হইলে বিনিময় অসম্ভব হইবে।

ওই প্রকার বিনিময়ের (জিনিষের বদলে জিনিষ—barter) অসুবিধা আলোচনা করিতে যাইয়া ক্যামেরণের জীবনের একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। লেপ্টেনেন্ট্ ক্যামেরন্ যখন আফ্রিকায় বেড়াইতেছিলেন, তখন এক সময় তাঁহার একটী নৌকা কিনিবার প্রয়োজন হয়। নৌকা ক্রয় উপলক্ষে তাঁহাকে কিরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল সে কথা তিনি তাঁহার ভ্রমণকাহিনীতে লিখিয়া রাখিয়াছেন। † তিনি লিখিয়াছেন "সৈয়দের লোকের নৌকা আছে জানিয়া তাহার নিকট নৌকা কিনিতে গেলাম। সে বলিল—হাতির দাঁত না হইলে অন্য কোন জিনিষের বদলে আমি নৌকা দিব না। আমার সঙ্গে হস্তিদন্ত ছিল না। তাহার পর শুনিতে পাইলাম মহম্মদ ইবন সলিব নামে এক ব্যক্তির নিকট হস্তিদন্ত আছে। তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া যাহা শুনিলাম তাহাতে মনটা একটু দমিয়াই গেল। সে বলিল—মহাশয় আমার কাপড়ের প্রয়োজন; কাপড় ছাড়া অন্য কোন জিনিষের বদলে আমি হাতির দাঁত দিতে পারিব না। কোথায় পাই কাপড়? খুঁজিয়া খুঁজিয়া অবশেষে শুনিলাম মহম্মদ ইবন ঘরিবের কাপড় আছে। সে তারের বিনিময়ে কাপড় দিতে পারে। সংবাদটা শুনিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমার সঙ্গেই তার ছিল। তারের বদলে কাপড় লইলাম। তাহার পর মহম্মদ ইবন সলিবের নিকট হইতে কাপড়ের বিনিময়ে হস্তিদন্ত পাইলাম। অবশেষে সৈয়দের লোকের নিকট হইতে হাতির দাঁতের পরিবর্ত্তে নৌকা ক্রয় করিতে পারিলাম।"

এই ঘটনাটি হইতে আমরা দেখিতে পাই জিনিষের বিনিময়ে জিনিষ লইবার নিয়ম থাকিলে প্রত্যেক লোককে কত কষ্ট ভোগ করিতে হয় ও অযথা কত সময় নষ্ট করিতে হয়।

এই সকল অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত মানুষ তৃতীয় একটী জিনিষের আবিষ্কার করিল। তাহার প্রয়োজন—বিনিময়ে মধ্যবর্ত্তী হইয়া কাজ করা। ইহাকেই লোকে অর্থ (money) বলে। এক এক জাতি এক একটী জিনিষকে বিনিময়ে 'মধ্যবর্ত্তী' স্থির করিল। যে জাতিতে যে জিনিষটী অর্থ বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, সে জাতির প্রত্যেকেই উহার সহিত স্ব স্ব দ্রব্যসম্ভার বিনিময় করিতে স্বীকার করে। মনে করুন সকল মানুষ স্থির করিল যে,

* দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে ভুটানের সীমান্তে দেখিয়াছি দরিদ্র ভুটীয়ারা জিনিষের বদলে অর্থ (money) অপেক্ষা জিনিষ লওয়াই পছন্দ করে। অথচ ভুটানের রাজমন্ত্রী মহাশয়ের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত পেম্ দরিজ্ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে খাস ভুটানে মুদ্রার প্রচলন আছে।

† Verney and Cameron, "All Across Africa" Vol. I.

স্বর্ণ বিনিময়ে মধ্যবর্ত্তীর কাজ করিবে অর্থাৎ স্বর্ণ অর্থ (money) বলিয়া গৃহীত হইবে। তখন আর টুপিওয়ালা চাউলের প্রয়োজন হইলে চাউলওয়ালার বাড়ী, তেলের প্রয়োজন হইলে তেলীর বাড়ী দৌড়াদৌড়ি করিয়া পূর্ব্বের মতো ক্লেশ ভোগ করিবে না। সে তখন টুপির বদলে কতকটা সোনা লইবে। সে জানে যে তাহার সোনার কোন প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন তাহার চাউলের। তবু সে টুপির বদলে সোনা কেন গ্রহণ করে? সে গ্রহণ করে এই জন্য যে, নূতন ধরণের বিনিময়ের নিয়মে সে যখন চাউল আনিতে যাইবে, তখন চাউলওয়ালাও এই স্বর্ণের পরিবর্ত্তেই তাহাকে চাউল দিবে। প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল সময়েই অর্থের বিনিময়ে মিলে বলিয়া সকল উৎপাদকই স্ব স্ব বিনিময়সাধ্য দ্রব্য অর্থের সহিত বিনিময় করে।

অর্থের (money) আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 'জিনিষের বদলে জিনিষের বিনিময়' ভাঙিয়া বিক্রয় ও ক্রয়ের উৎপত্তি হইল। টুপিওয়ালা এই নূতন নিয়মে, টুপির পরিবর্ত্তে সোজাসুজি ভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ না করিয়া, প্রথমে স্বর্ণের বদলে টুপি বিক্রয় করে, তাহার পর স্বর্ণের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সমূহ ক্রয় করে। অর্থের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বিনিময় ব্যাপারটা একটু জটীলও হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ইহাতে অশেষ কষ্ট ও বহু সময় নষ্টের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে বলিয়া এই জটীলতাও শ্রেয়ঃ।

অর্থের উৎপত্তি, কাজ ও উপকারিতা আমরা দেখিলাম। প্রথমে কোন্ জাতি কোন্ জিনিষকে অর্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তাহার পর কোন্ কোন্ জাতির অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান রূপ ধারণ করিল, কেন পরিবর্ত্তিত হইল,—এক কথায় অর্থের ইতিহাস, এবং অর্থ সম্বন্ধে অন্য কথা আমরা সুযোগ পাইলে ক্রমশঃ আলোচনা করিব।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

কবি-গৃহিণী।

—:*:—

"হাঁড়ি ঠন্‌ঠন্, বাড়ী পড়পড়, ছেলেমেয়ে উপবাসী,
জীর্ণ কুটীরে সম্বল শুধু কবিতার থাতারাশি।
পাওনাদারের হাঁকডাক্ আর বেপারির আনাগোনা,
দিবসে নিশিতে প্রতিবেশীদের কঠোর বচসা শোনা;
ভরাভাদ্রের ঝুপ্‌ঝুপ্ জল, চৈত্রের খর রবি,
পৌষের বিষম কন্‌কনে শীত, গৃহে উন্মাদ কবি,—
সারাটী বছর একা নিশিদিন সয়ে' এত জ্বালাতন,
ফতুর হয়েছি, তবু যমরাজ,—আমারে নিবেনা পণ।"

—রাগে গড়্‌গড়্‌ কবির রমণী চলিলা নদীর কূলে,
যেথায় রয়েছে গৃহ-ভোলা কবি চম্পকতরুমূলে ;
গর্জ্জিতে যত অভাবের কথা বধির শ্রবণে তার,
শুভ্র বিমল চিত্তমুকুরে তুলিতে বেদনা-ভার।

সেদিন মোহিনী চৈত্রসন্ধ্যা নামিয়া এসেছে ধীরে,
এলায়ে পড়েছে বিবশা প্রকৃতি স্তব্ধ তটিনী-নীরে।
খেয়া কোলাহল, বিহগ-কাকলী, কৃষকের কল-গান,
থেমে গেছে সব—উঠেছে মধুর কবির বীণার তান।
স্থির নদীজল, নীরব প্রকৃতি, আকাশে সন্ধ্যাতারা,
মলয় মাধুরী, চাঁদের অমিয়া তাহারে দিয়েছে সারা।
চম্পক তার মরম নিঙারি সুষমা দিয়েছে লুটি',
অন্ধকারের রজনীগন্ধা নীরবে উঠেছে ফুটি'।

ঝঙ্কার তুলি বীণার বক্ষে আলোড়ি' বিশ্ব-প্রাণ,
কোকিলকণ্ঠে উঠিল রণিয়া কবির সন্ধ্যাগান।—

"কবিতার রাণি ! মানস-প্রতিমা ! আমার পরাণ-প্রিয়া !
দুয়ারে তোমার দাঁড়িয়ে ভিখারী, ভয়ে দুরুদুরু হিয়া।
আশাভরা মোর মনোতরীখান্ তোমার চরণ মূলে,
খুলে' দিছি কোন্ অজানা প্রভাতে হেলায় জগৎ ভুলে'।
চাহিনি ধরার সম্পদভার, তুচ্ছ যশের রাশি,
চাহিনি কাহারো করুণা বিন্দু,—কৃপার কৃচ্ছ হাসি।
আমার বেদনা ছড়ায়ে দিয়েছি নিখিল বিশ্বময়,
বিশ্ব-বেদনা সঞ্চিত হৃদে বেদনা করিতে জয়।
ধেয়ান-নিরতা এই তো সন্ধ্যা—অতীত-ব্যাথার বাণী,
জাগায়ে দিয়েছে আমার বক্ষে স্মৃতি-ছায়াপটখানি।
কোন্ আষাঢ়ের প্রথম দিবসে বিরহী যক্ষ সাজি',
গেয়েছিল কবি মধুময় গান—বেদনা-কুসুম রাজি।
অজয়ের কূলে বিরহ বিধুর—বঁধুর চরণ পানে,
দিয়েছিল কবি ব্যথার বারতা, আকুল প্রাণের টানে।
আজি নান্নুর বেদনার পীঠ, বিরহীর ব্রজধাম,
যেথা ভাবময়ী রামীর চরণে পূরিত মনস্কাম।

জনম অবধি রূপ নেহারিয়া নয়ন তৃপ্ত কই !
ক্লেশহীন তবু শতেক মরণ যদি পায় প্রাণময়ী।
অতীতের এই বেদনার গান পরাণে লেগেছে ভালো,
জীবনে মরণ করিয়া বরণ, পেয়েছি আশার আলো।
তোমরা সাক্ষী—উদার আকাশ, নীরব সন্ধ্যাতারা,
ঘোর নদীজল, মৌন প্রকৃতি, আমার সঙ্গী যারা।
হেরিবে যেদিন আমার নয়নে মরণের শ্যামরেখা,
তোমরা সেদিন ধেয়ান ভাঙ্গিয়া, আমারে দিও গো দেখা।
কবিতার রাণি ! মানস-প্রতিমা ! আমার পরাণ-প্রিয়া !
বক্ষে তুলিয়া নিও গো সেদিন স্নেহের পরশ দিয়া।"

গুঞ্জন শুধু গুমরিয়া মরে, থেমেছে কবির বীণা,
নিভৃতে দাঁড়ায়ে কবির গৃহিণী পুলকে বাক্যহীনা।
একি কল্লোল হৃদয়ে তাহার, নয়নে অশ্রুধারা,—
মর্ম্মের তলে কোন্ বিহরিণী আবেশে আত্মহারা !
অভাবের ব্যথা মনে নাহি আর—ধ্বনিছে পরাণময়,
"বিশ্বের কবি, পরাণের কবি, জয় কবি তব জয় !"

শ্রীসুকুমার দাস গুপ্ত।

বৌদি !

—§*§—

কতদিনের কথা,--ভুল্‌তে পারিনি আজও ; জীবনে ভুল্‌তে পার্‌বো কি ? আমি, দাদা, বৌদি নৌকায় পদ্মানদী দিয়া মামাবাড়ী যাচ্ছিলাম। জ্যৈষ্ঠ মাস ;—আমাদের নৌকা যখন পদ্মার মাঝখানে, তখন ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। কি ভীষণ ঢেউ ! নৌকাখানা মোচার-খোলের মত ঢেউয়ে ঢেউয়ে ডুবুডুবু হচ্ছিল। এমন সময় মাঝি বল্লে "নৌকা ত আর বাঁচান দায়—বোঝাই কম হলেও কথা ছিল—ছোট নৌকা—জিনিষ-পত্তর—এত লোক,—এত ভারে এ ঝড়ে কি নৌকা বাঁচে।"

শুনে প্রাণ কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। আমি বল্লেম "বৌদি তুমি আমায় শক্ত করে ধরে রাখ—তা হলে তুমিও ডুব্‌বে না, আমিও ডুব্‌বো না।"

ফিরে দেখি—কাছে বৌদি নাই। ঝুপ্‌ করে শব্দ হ'ল। হায় ! বৌদি আমাদের বাঁচাবার জন্য পদ্মার ভীম গর্জ্জনের মধ্যে আপনাকে ডুবিয়ে দিলেন। দাদা "কি হ'ল" "কি কর্‌লে" বলে মূর্চ্ছিত হলেন ; মনে নাই তখন আমার কি দশা হয়েছিল—সংজ্ঞা ছিল না আমার !

আজও কেবল স্মৃতি বলে "ধন্য দেবী, ধন্য আত্মত্যাগ।"

'জনৈকা বালিকা।'

ভক্তের উক্তি।

—:-*-:—

সৃষ্টি যদি স্রষ্টা প্রভু তোমার হ'ত মাপকাটি
তবুও কি গো প'ড়্‌তে তুমি ধরা ?
অনন্ত এ বিশ্বমাঝে তুচ্ছ নর একলাটি,
তফাৎ কত জন্ম হ'তে মরা !
জীবন লয়ে দু'দণ্ডেরই খেলা,
তবুও কত তোমায় অবহেলা !
জ্ঞানের মহাসাগর পারে কেই বা বল দেয় পাড়ি ?
—বেলায় শুধু দাঁড়িয়ে থাকা সার।
দাম্ভিকেরা স্রষ্টা থেকে সৃষ্টিটুকু লয় কাড়ি,
তোমায় তারা ক'র্‌বেনা স্বীকার।
ক্ষুদ্র কত বুঝ্‌বে নাক' তারা,
বৃহৎ শুধু দম্ভ লয়ে সারা !
রহস্যজাল যাচ্ছে বুনে কাল যে শুধু একটানা—
জাল কি প্রভু কর্‌বে কভু শেষ ?
কোথায় আছি—অন্ত কোথা,—মানব জ্ঞানে নয় জানা,
এ রহস্য বুঝ্‌বে নাক' লেশ।
জ্ঞানের পথে বিঁধ্‌বে গায়ে কাঁটা,
বুদ্ধি ছোট, যায় না কিছু আঁটা।
স্রষ্টা তুমি, দ্রষ্টা তুমি, আলোক-রেখা সঞ্চারি'
ভক্তি পথে লও গো তুমি টেনে,
অসত্য এ, অনিত্য এ—মিথ্যা-মোহ অপসারি'
চল্‌তে পারি তোমায় শুধু মেনে।
কেবল আশা তোমার কৃপা-কণা,
শরণ কোথা চরণ দুটী বিনা ?

শ্রীযতীন্দ্রলাল দাস

প্রবাদ-মালা।

—:※:—

(ঢাকা, বরিশাল ও খুলনা জেলা হইতে সংগৃহীত)

সে ছিল এক ব্যাঙ্—এক সাপের তাড়ায় অস্থির হয়ে লুকিয়ে পড়্লো এককোণায়, সেখান থেকে সে দেখ্লে, সাপটা তাকে না পেয়ে, বিরহে, উনুনে দুধ চড়ান ছিল—খানিকটা চক্ চক্ করে খেয়ে খিদের আগুন নিভাল। সেই দুধ আবার তিন সন্ন্যাসীর জন্য তাদের চেলা চড়িয়ে রেখে সবে বাহিরে গেছে। ব্যাঙ্ ভাবলে তাই ত এই দুধ খেয়ে এই তিন সন্ন্যাসীর আর চেলার ভবের লীলা-খেলা সাঙ্গ হবে দেখ্ছি! আর এই দাঁড়িয়ে দেখা—ব্রহ্মবধের পাপের বোঝাটা ত আমার স্কন্ধেই পড়্বে। কি করি? বিধাতা, ব্রহ্মহত্যার বোঝাটা ফেল্‌তে পার ঘাড়ে—কিন্তু আমায় না দিয়েচ মানুষকে বোঝাবার মত ভাষা—না আছে আমার অক্ষরলিপি জ্ঞান! তা যাক্ আমার কার্য্য আমি করি--এই বলে তখনকার সেই ফুটন্ত দুধে সশব্দে পতন,--আর সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি! চেলা মহাশয় এসে দেখেন এ কি বিপদ! ভেকপ্রবরের নিয়তির শেষ এ কোথায় হয়েচে, কি করা যায়? বাপু মর্‌বি-মর্‌বি, মর্‌বার কি আর জায়গা খুঁজে পেলি না? দুর্গানাম স্মরণ কর্‌তে কর্‌তে সেই ব্যাঙ্‌শুদ্ধ দুধ, ঠাকুরদের কাছে নিয়ে হাজির হলেন—সন্ন্যাসীরা নিতান্ত দুর্ব্বাসা বা অষ্টাবক্র ছিলেন না, চেলাকেও ফুঁ দিয়ে ভস্ম কল্লেন না বা মরা ব্যাঙ্‌টারও অনন্ত নরকের ব্যবস্থার হুকুম দিলেন না। তাঁরা জান্‌তেন কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না—আর দুনীয়ার রহস্যও শুধু তাদের চক্ষু মুদ্রিত কর্‌বার সাপেক্ষ ছিল—ধ্যানে বস্‌লেই সব দেখ্‌তে পেতেন আর হবেই বা না কেন, তাঁরা যে ছিলেন সত্যিযুগের লোক। ব্যাঙের আত্মোৎসর্গের ব্যাপারটা দিব্যচক্ষে বেশ দেখ্‌তে পেলেন। আর তাঁরা গুণের আদর জান্‌তেন, সেই মরা ব্যাঙ্ নিয়ে বিষ্ণুর কাছে হাজির হলেন। বিষ্ণু তাকে একটী পুষ্প কর্‌লেন। সেই ফুলটী দিয়ে সন্ন্যাসীরা ইন্দ্রকে অর্চ্চনা কল্লেন। ইন্দ্রের বরে সেই ফুল অর্থাৎ ব্যাঙ্ ত্রেতার অর্জ্জুন হোলো, সেই—পার্থ, সব্যসাচী, ধনঞ্জয় হোলো, যাঁর সমস্ত গুণের কথা ব্যাসমুনি নিজে বলে ফুরিয়ে উঠ্‌তে পারেন না!

দেখ্‌লে পরের কারণে নিজকে বলি দিলে শেষে কি রকম সুখ হয়! এই রকম অনেক গল্প তোমাদের বল্‌বো, আজ পাখীদের সম্বন্ধে কিছু বলি।

ছেলে যাচ্চেন বর সেজে বে কর্ত্তে! মা-অভাগী তখন বল্লেন, বাবা তুমি ত যাচ্চো বে কর্ত্তে, ঘরে যে একখানা কাঠ নেই। ছেলের তখন রাগটা কি রকম হয় বুঝ্‌তেই পার! সে তখন সেই বর পোষাকেই কুড়ুল মুখে নিয়ে, মনের দুঃখে বনে উড়ে গেল। সেই বরই হচ্চে কাঠুরিয়া পাখী। দেখনি তার মাথায় এখনও টোপর রয়েচে!

বরের গল্প শুন্‌লে এবার একটা বৌ'র গল্প শুনাব? সে বেচারী ভারী দুঃখী, তার আবার ললাট-লিখনটী আবার ছিল এমনি যে সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর যেই ভাতের থালাটী সাম্‌নে নিয়ে বসতো আর এক কুটুম এসে হাজির!—আর সদয়া শাশুড়ীঠাক্‌রুণ বল্‌তেন "বৌ, কুটুম এসেচে ভাত দেও।" হতভাগী বৌ নিজের মুখের অন্ন কুটুমকে এনে দিত! এ ব্যাপার ছিল সে ঘরের এই বৌ'র আমলের চিরন্তন প্রথা!—রোজই ঘটত। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, সে আর সহ্য কর্ত্তে না পেরে পাখী হয়ে উড়ে গেল। আর দেখনা বৌ'রা যখন রাঁধেন দুপুর বেলা, সে তার দুঃখের কাহিনী জানায় 'নিত্য কুটুম' 'নিত্য কুটুম'।

তোমাদের দুঃখু করেনা—আমার কিন্তু ভারী কষ্ট হয়!

'বৌ সর্‌ষে ধোও' 'বৌ সর্‌ষে ধোও' শোননি—সে কে জান? সেও এক গেরস্তর বৌ। তার জ্বালাও শাশুড়ীর জ্বালা! শাশুড়ী সর্‌ষে ধুতে বলে গেছিলেন—এসে দেখেন বৌ সর্‌ষে ধোয়নি আর যাবে কোথা! নিকটে ছিল চালা কাঠ, পিটিয়ে দু'গাল লম্বা! বৌ হাঁড়ীর কালী মাথায় দিয়ে, গায় হলুদের জল ঢেলে পাখী হয়ে উড়ে গেল। আজও সে সমস্ত বন বিদীর্ণ করে তার দুঃখের সাক্ষ্য রাখে—"বৌ সর্‌ষে ধোও" "বৌ সর্‌ষে ধোও।"

তখনকার শাশুড়ীদের ব্যাবহারের প্রতিশোধ এখনকার বৌ'রা বোধ হয় নিচ্চেন।

কাণা কুয়ো (কাণা কোকিল) বা কুক্কার গল্প জানো? এঃ, তোমরা কিচ্ছু শোননি।

সে ছিল এক চাষা। নদীর ধারে, মাঠে হাল চাষ কর্‌তো—তার একটী মাত্র ছেলে সব সময়েই কাছে কাছে থাক্‌ত। ছেলেকে একদিন শৌচ কর্‌তে নিকটের নদীতে পাঠিয়ে দেয়—তখন ছিল ভাটা। হঠাৎ প্রকাণ্ড জোরে জোয়ার এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। চাষা, চাষই করচে—হুঁষ নেই। বাড়ী ফেরার আগে দেখে ছেলে ত কাছে নেই। ছেলে কোথায়? ছেলে কোথায়? খোঁজ ছেলে! ছেলে জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। তখন সে গাইল :—

"ভাটায় দিলাম পূত,
জোয়ারে নিল পূত;
পূত! পূত!! পূত!!!"

এই বলে সে পূত! পূত!! কর্‌তে কর্‌তে পাখী হয়ে গেল! আহা দেখচ্‌না বেচারার এখনও চোক দুটো কত লাল!

তোমরা যদি গ্রীষ্মের ছুটীর দিনে খুব অনেকক্ষণ জলে সাঁতার কেটে কেটে চোক লাল করে ফেল—এখন চোক লাল দেখ্‌লেই পিঠে পিটুনচণ্ডী পড়্‌বে—ডুবিয়েচিস্ বলে—তখন কি কর্‌বে জান! ঐ কুক্কার স্মরণ নেবে—দুই চোক কচুপাতা দিয়ে ঢেকে একজন 'কুক' 'কুক' করে কুক্কাকে ডাক্‌বে তা হলেই তোমাদের চোখের লাল কেটে যাবে। দেখো তোমাদের বাড়ীর বাবুর্চী যেন এসে হাজির না হয়, তা হইলে রেহাই পাবে না সে বলে দেবে।

শ্রীমতী বিমলাবালা রায়।

উষা।

ফুল-ফোটান কিরণ ওগো, অরুণ-রাঙা শিশুর হাসি,
স্বর্গবালার স্বপ্ন তুমি, নগ্ন-মধুর রূপের রাশি!
নিত্য আসি নিশার শেষে আপন মনেই হাস্য কর,
জগৎ যখন নীরব ঘুমে কতই মোহন মূর্ত্তি ধর!

মূর্ত্তি তোমার পবিত্র গো শান্ত-সরল শিশুর মত,
—লুপ্ত যখন দৃষ্টি হ'তে জগতভরা কষ্ট শত,
তারপরেতে জাগ্‌লে শিশু, ভাঙ্‌লে তাহার মধুর নেশা,
মিশায় যেমন সরল হাসি আরম্ভ হয় নতুন পেশা,
তেমনিতর জগত যখন হয় গো নিজ কর্ম্ম-রত
স্বপ্নময়ি, মিলাও তুমি সরল শিশুর হাসির মত!
পশ্চিম গগন উজল ক'রে তুমিই আবার সন্ধ্যাবেলা
শান্তিমাখা মধুর রূপে সাঙ্গ কর দিনের খেলা!
শুকতারাটী তখন তোমার সন্ধ্যাতারা হ'য়েই ফোটে
ক্ষণিক রূপের দরশ লাগি' আকাশ ভেঙে মেঘ্‌রা ছোটে!
এমনি করে' সকাল সাঁঝে নিত্য খেল কতই খেলা
গগন-পটে দেখাও দেবি মানব জীবন সুখের মেলা!
তোমার লীলায় মুগ্ধ আমি ভাবছি "আমার জীবন সাঁঝে,
আসবে কি গো আমার ঊষা এমনি মোহন উজল সাজে!"

"বনফুল"

গ্রন্থ সমালোচনা

মাধবী—শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত প্রণীত। এখানি কবিতা গ্রন্থ। লেখিকার ভাব প্রকাশের উপযোগী ভাষার কোথাও অভাব নাই। কোনখানেই অস্পষ্টতা দোষ দেখা যায় না। ভাব ও উপমাগুলি যে বিশেষ বিচিত্র বা নূতন তাহা নহে, কিন্তু লেখিকার লিখনপ্রণালীতে সেগুলি সুবিন্যস্ত হওয়ায় কাব্যখানি পড়িতে ক্লান্তি আসে না। ভগবানের প্রতি সম্বোধনেই সব কবিতাগুলি রচিত। এই উদ্দেশ্যের ও ভাবের পবিত্রতাই কাব্যখানিকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। প্রকৃত সাধক বা ভক্ত রচিত কবিতা ও আলোচ্য কাব্যখানির কবিতায় অনেক প্রভেদ, কিন্তু তাহা হইলেও কতকগুলি কবিতায় লেখিকার আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। লেখিকা সহজ সরল সুরে মনের কথা প্রকাশ করিয়াছেন, আজকালকার অধিকাংশ লেখিকার মত কোন কবি বা কাব্যের অনুসরণ করেন নাই। এই হিসাবে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য প্রশংসনীয়। কতিপয় স্থলে ছন্দপতন, ভাষা গদ্যাত্মক ও শ্রুতিকটু দোষ হইয়াছে। যথা—"যা রহে শকতি যেটুকু প্রাণ…বিশ্বের সেবায় করিতে দান," "ওগো বিশ্বরাজ তোমার রাজত্বে যা কিছু রচিলে সকলি সুন্দর," "বিচ্ছেদ-বেদনা-দৈন্য-পরিহাস-ঝঞ্ঝা" "কত কাঁটারাশি লক্ষ্য পথ ময়" ইত্যাদি। সম্বল স্থলে

"সমবল," বিয় স্থলে "বিঘন" প্রভৃতিও সুপ্রযুক্ত নহে। "যায় সাধ, যায় আশা" সাধ যায় ব্যবহৃত হয় বটে কিন্তু "আশা যায়" এ ব্যবহার কি-লিখিত কি-মৌখিক কোন ভাষাতেই নাই। "স্মৃতিটি কেবল হিয়ারে," 'হিয়ারে' শব্দ আর কোথাও দেখি নাই। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ থাকিলেও মোটের উপর কাব্যখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

ধ্যানলোক—শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত। এখানিও কাব্য। লেখক বঙ্গ-সাহিত্যে অপরিচিত নহেন। কাব্যখানিতে প্রেমগীতি নাই। এক উচ্চ আদর্শ বা মহাভাবের অনুপ্রেরণা অনেকগুলি কবিতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। 'স্বদেশের প্রতি' নামক কবিতাটি অতিসুন্দর। কবি বলিতেছেন:—

"হে বরেণ্য স্বদেশ আমার!
প্রভাতের স্বর্ণরশ্মি, প্রাণস্পর্শী বিহগ-ঝঙ্কার
এখনো না হতে শেষ—না উদিতে মধ্যাহ্ণ-তপন
আবার আসিছে সুপ্তি—তন্দ্রালস যুগল নয়ন?
সঞ্জীবনী-সুধা লয়ে এখনো যে বহিছে সমীর
এখনো রয়েছে মুক্ত জননীর পূজার মন্দির,
এখনো অযুত ভক্ত অর্ঘ্য হাতে আছে দাঁড়াইয়া
এখনো তড়িৎ খেলে কোটি বক্ষে তরঙ্গ তুলিয়া!...
স্তব্ধ কেন দশদিক্—শান্ত কেন সিন্ধুর গর্জ্জন?
এত নহে শান্তিছায়া, আসে পুনঃ ঘনায়ে মরণ।"

ভগবদ্‌বিষয়ক কবিতাগুলিতে কবির আন্তরিক নির্ভরতা ও উৎসাহবাণী সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"ছিঁড়ে আয় নাগপাশ, ফেলে আয় অভিনয় সাজ
সংগ্রামে বিজয়ী তুই, বরমাল্য দিবে বিশ্বরাজ!
তুই হবি সন্ন্যাসীর যথার্থই সন্ন্যাসী-সেবক
প্রেম-যজ্ঞে হোতা তুই মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি সুগায়ক!
উঠ্, জাগ্, ধূলিলীন! ধূলিশয্যা তোর যোগ্য নয়
শিয়রে দাঁড়ায়ে দেখ্, শঙ্কাহারী শিব মৃত্যুঞ্জয়।"

প্রভৃতি পংক্তিগুলি ইহার উদাহরণ।

'মহারাণী ক্ষেমা' নামক দীর্ঘ কবিতাটি, কাহিনী বর্ণনা করিয়াছে বটে কিন্তু কেবল কাহিনী বর্ণনা কবিতাটিকে তাদৃশ সৌন্দর্য্যদান করিতে পারে নাই। দুই এক স্থলে যেরূপ কবিত্ব প্রকটিত হইয়াছে—

"সিন্ধু-বারি
বাষ্পরূপে যে নীরদ বিশ্বে দান করে
রহে না সিন্ধুর সে কি? অন্তিমে সাগরে
মিশে না সে পুনর্ব্বার? হে প্রেম-জলধি
উপাস্য আরাধ্য মোর! চিন্তি নিরবধি
অসীম প্রেমের তব তুচ্ছ এক-কণা

আমি নাথ, কৃপা তব করিতে ঘোষণা
জগতে বিলায়ে দাও মোরে।"

সেইরূপ অধিকাংশস্থলে থাকিলে কবিতাটি অতি সুন্দর হইত। কাহিনী-বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে কবিত্বের মিশ্রণই এ-শ্রেণীর কবিতার সাফল্য সূচনা করে।

কাব্যখানি পাঠ করিলে কবির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়।

কাব্যখানিতে কতকগুলি শব্দ ব্যবহারে আমাদের আপত্তি আছে।

"হাজার ঢেউ ছুটিয়ে আসে লক্ষ বাহু তুলি
ডাকিয়ে তারে 'আয়রে ওরে আয়!"
কোন্ সে দেশে উড়িয়ে যায় সিন্ধু-কপোতগুলি
সঙ্গী যেন করিতে তারে চায়!"

'ছুটিয়া,' 'ডাকিয়া,' 'উড়িয়া' পদ প্রয়োগ করিলেই ভাল হইত। "ক্ষণে ক্ষণে গ্রাসিবারে ভস্মিবারে চায়।" 'ভস্মিবারে' পদটি অসহনীয়।

"কখন কৈশোরে শুনেছিনু তব
মোহন মধুর মুরলীর রব।"

এ স্থলে "কৈশোরে কবে শুনেছিনু তব" লিখিলে ছন্দ ঠিক্ থাকিত। এইরূপ 'তলাসি' স্থলে 'খুঁজিয়া' লিখিলে ভাল হইত।

"তোমারে জগত মাঝে বিতরি সদায়।"

'সদা' অর্থে 'সদায়' শব্দ প্রয়োগ কোথাও দেখা যায় না। আমরা 'উপাস্যা-প্রতিমা'রও পক্ষপাতী নহি।

কবির এ কাব্যখানি বহুদিন পূর্ব্বে রচিত। তাঁহার আধুনিক কাব্যগুলিতে বঙ্গ-সাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি হইবে এই আশা পোষণ করিতেছি।

বীরবলের হাল-খাতা—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী প্রণীত। "সাহিত্য" ও "সবুজ পত্রিকা"য় "বীরবল" বা লেখকের নামে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, আলোচ্য গ্রন্থখানিতে তাহার অনেকগুলির সমাবেশ হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে ছাপার ভুল অনেক আছে, বিশেষতঃ সংস্কৃত বাক্য, সংস্কৃত ধাতু প্রভৃতির বানান ভুল বেশী দেখিয়া প্রুফ্ সংশোধকের সংস্কৃতভাষায় অনভিজ্ঞতা অনুমিত হয়। কয়েকটিমাত্র উদাহরণ দিতেছি :—"কনাদ" (১৫ পৃঃ) "ধাতু 'ভু' " (১৯ পৃঃ) "পরিত্রাণায় সাধুনাং" (৪৮ পৃঃ) "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরঃ ধর্ম্মো ভয়াবহ।" (৪৯ পৃঃ) "বানিজ্যে বসতি সরস্বতী" (৮৬ পৃঃ) "গৌ তৃণং আত্তি" (৯৩ পৃঃ) "কালোহয়ং নিরবধি" (১২৬ পৃঃ) "অত্মসাৎ" (১৩৬ পৃঃ) "হস্তায়ুর্ব্বেদ" (১৯৩ পৃঃ) "আমুল" (১৯৩ পৃঃ) "ভুগোল" (১৯৩ পৃঃ)। লেখক মহাশয় সংস্কৃত সাহিত্যে অনভিজ্ঞ নহেন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু দুই এক স্থলে তিনি যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। ১১৮ পৃষ্ঠায় আছে "উদয়ন বাসবদত্তার কথা অবলম্বন করে যাঁরা কাব্য রচনা করেছেন, যথা—ভাস, গুণাঢ্য, সুবন্ধু ও শ্রীহর্ষ ইত্যাদি তাঁদের বাদ দিলে সংস্কৃত সাহিত্যের অর্দ্ধেক বাদ পড়ে যায়।" গুণাঢ্য, ভাস ও শ্রীহর্ষ উদয়ন ও বাসবদত্তার কাহিনী অবলম্বনে গল্প ও দৃশ্যকাব্য রচনা করিয়াছেন বটে কিন্তু সুবন্ধু তাহা করেন নাই। সুবন্ধু-রচিত "বাসবদত্তা" নামক একখানা গদ্যকাব্য আছে। শ্লেষের বাহুল্যে তাহা ভারাক্রান্ত। এই গদ্যকাব্যখানির নাম "বাসবদত্তা" বটে কিন্তু ইহার নায়িকা উদয়ন-প্রণয়িনী

বাসবদত্তা নন। ইহার আখ্যানবস্তুর সহিত উদয়ন কথার কোন সাদৃশ্যও নাই। লেখক নিশ্চয় শুধু এই গ্রন্থের নামমাত্র শুনিয়াই উক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, গ্রন্থখানি চক্ষে দেখিলে এরূপ লিখিতেন না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় Macdonell প্রণীত A History of Sanskrit Literature নামক বি, এ পরীক্ষার সংস্কৃতের পাঠ্য করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের ৩৩২ পৃষ্ঠায় আছে "Vâsavadattâ, by Subandhu, relates the popular story of the heroine Vâsavadattâ, princess of Ujjayini, and Udayana, king of Vatsa." প্রমথবাবু যদি এই গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়া থাকেন তাহা হইলে বিশেষ দুঃখের বিষয়। কারণ Macdonell সাহেবও 'বাসবদত্তা' পড়েন নাই তাহা উক্ত লেখা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। প্রমথবাবু যদি ইঁহার কথামাত্র অবলম্বন করিয়া লিখিয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহার ভুলের কারণ বুঝিতে পারি। ম্যাকডোনেলের ভুল প্রমথবাবুতেও আসিয়া পড়িয়াছে।

১১৮ পৃষ্ঠায় প্রমথ বাবু লিখিয়াছেন "কালিদাস বলেছেন যে কৌশাম্বির গ্রামবৃদ্ধেরা উদয়নকথা শুনতে ও বলতে ভালবাসতেন; কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কেবল কৌশাম্বির গ্রামবৃদ্ধ কেন, সমস্ত ভারতবর্ষের আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই ঐ কথা-রসের রসিক।" দুঃখের সহিত বলিতেছি কালিদাস ও-কথা বলেন নাই। মেঘদূতে আছে :—

"প্রাপ্যাবন্তীমুদয়নকথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধান্।"

ইহার অর্থ,—অবন্তী বা উজ্জয়িনীর গ্রামবৃদ্ধেরা উদয়ন কথায় অভিজ্ঞ। অবন্তী বা কৌশাম্বি যে একস্থল নহে, পাশাপাশিও নহে তাহা প্রাচীন ভারতের মানচিত্র দেখিলেই প্রমথবাবুর হৃদয়ঙ্গম হইবে।

কিন্তু এইরূপ ছোটখাট ভ্রমগুলির দীর্ঘ তালিকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। অধিকাংশ স্থলেই লেখক-মহাশয়ের অনবধানতায় ইহা ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠাগুলি হইতে যখন এগুলিকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করিবার জন্য এই গ্রন্থখানির সৃষ্টি, তখন ইহার দোষত্রুটিগুলির সংশোধন প্রয়াসের পরিচয় পাইলেই আমরা সুখী হইতাম।

গ্রন্থখানি একহিসাবে বঙ্গ-সাহিত্যে অপূর্ব্ব। 'মলাট সমালোচনা' 'বইয়ের ব্যবসা' প্রভৃতি প্রবন্ধের বিষয়গুলি লইয়া কাহাকেও আলোচনা করিতে দেখি নাই। এখনও কই কেহ এইরূপ প্রবন্ধ লেখেন না। সমসাময়িক গ্রন্থাদি ও সাহিত্য সম্বন্ধে এই শ্রেণীর প্রবন্ধ সাময়িক পত্রের পাঠকদিগের নিকট অতীব আদরণীয়। প্রমথবাবুর সহজ ও সরস লিখন প্রণালীটিও পাঠকের কৌতূহল ও রসপিপাসা তৃপ্ত করে। অনেক জায়গায় লেখার কেরামতি ওস্তাদী হাতের পরিচয় দিয়া পাঠককে ক্ষণকালের জন্য চমকিত করে। শব্দ নির্ব্বাচন ও প্রয়োগ নৈপুণ্যেই এই লেখার অধিক প্রশংসা প্রাপ্য কারণ যুক্তি তর্কগুলি প্রায়ই তেমন আঘাতসহ নয়। তাহার কারণ আমাদের এই মনে হয় যে লেখক বিশেষ চেষ্টা করিয়া কোন তর্কের বিরুদ্ধে নিজ তর্ক জমাইতে চেষ্টা করেন নাই, দুই চারিটা ব্যঙ্গবিদ্রূপের খোঁচা যেখানে সেখানে মারিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহাতে একদিকে তাঁহার যেমন সাফল্য সূচিত হইয়াছে অপরদিকে তেমনি রচনাগুলির যুক্তিতর্কের মেরুদণ্ডের অভাব ঘটিয়াছে। যাঁহাদিগকে বা যে বিষয়গুলিকে তিনি আক্রমণ করিয়াছেন তাঁহারা বা সেগুলি বিশেষ আহত না হইলেও বহুস্থলেই যে বিব্রত হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিবেন তাহার সন্দেহ নাই। সহজে যুদ্ধজয়ের এ নিপুণতা প্রমথবাবু অবশ্য দাবী করিতে পারেন কিন্তু আমাদের বাঙ্গলা দেশের দুর্ভাগ্য যে তিনি যে ভাবে প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি অল্প বাঙ্গালীপাঠকেরই আছে। তাই আশঙ্কা হয় বাঙ্গালীপাঠক ব্যঙ্গবিদ্রূপের এই চকচকে খেলনার অস্ত্রগুলিকে সকল স্থলেই পাছে যুদ্ধের আয়ুধ বলিয়া মনে করেন।

প্রমথবাবু লিখিয়াছেন আমার মতে ছোট গল্প প্রথমে গল্প হওয়া চাই, তার পরে ছোট হওয়া চাই, এ ছাড়া আর কিছুই হওয়া চাই নে। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে গল্প কাকে বলে তার উত্তর 'লোকে যা শুনতে ভালবাসে।' আর যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন 'ছোট' কাকে বলে—তার উত্তর 'যা বড় নয়।' (২৩৮, ২৩৯ পৃঃ) আমরা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের তর্কশাস্ত্রের পরীক্ষক হইতাম, তাহা হইলে এই উৎকৃষ্ট উদাহরণটি দিয়া ছাত্রদের Definitionএর ভুল বাহির করিতে বলিতাম। প্রমথবাবু লিখিয়াছেন তত্ত্বকথা এর চাইতে আর পরিষ্কার হয় না। আমাদের ভয় হয় পাছে এই অজুহাতে কথাটা কেহ seriously ধরিয়া বসেন।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে গভীর চিন্তাশীলতা, নিপুণ যুক্তিতর্ক নাই। এই হিসাবে এ গ্রন্থের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে বসিলে স্থায়ী সাহিত্যে ইহার আসনলাভের যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে কিন্তু সকল গ্রন্থ এক শ্রেণীর নহে, এক মাপকাঠিতে তাহাদের বিচার হওয়া উচিতও নাই। ব্যক্তিগত যে সকল উক্তির প্রত্যুক্তি বা সাময়িক যে সকল বিষয়ের আলোচনা ইহাতে আছে, তাহা কালক্রমে হয়ত বাঙ্গালীপাঠকের অপরিচিত হইয়া পড়িবে কিন্তু তাহা হইলেও এমন কিছু ইহাতে স্থলে স্থলে থাকিয়া যাইবে যাহাতে ক্লান্ত মন অবসাদ দূর করিবার জন্য সেগুলির রস গ্রহণে উৎসুক হইয়া উঠিবে। সেই স্থায়ী রসভাণ্ডটি প্রমথবাবুর রচনা কৌশলের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে।

প্রমথবাবু ফরাসী সাহিত্যে অভিজ্ঞ। তিনি "রোডঁ্যা" লিখিলে আমরা বাস্তবিকই দুঃখিত হইব। "প্রফেসার জে সি বোস্" পড়িয়া আমরা লেখকের কথাতেই বলি "আমার ইচ্ছে বাঙ্গলা সাহিত্য বাঙ্গলা ভাষাতেই লেখা হয়।"

একটি নূতনত্ব এ গ্রন্থে চোখে পড়িল। লেখক Apostrophe র চিহ্ন বাঙ্গলায় চালাইয়াছেন। যথা—প্রাচী'র (৪০ পৃষ্ঠা।)

রাজবংশীয় ক্ষত্রিয়-সমাজ-সমস্যা—শ্রীজগদিন্দ্রদেব রায়কত রচিত। জলপাইগুড়ি রয়েল প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। কোচবিহার ও তৎসন্নিহিত প্রদেশসমূহে "রাজবংশী" জাতির অবস্থা ও শিক্ষার উন্নতির কতিপয় উপায় ৭ পৃষ্ঠাব্যাপী এই পুস্তিকায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। লেখকের উদ্দেশ্য সাধু ও তাঁহার যথার্থ আন্তরিক-অনুরাগ পুস্তিকাখানি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। দুঃখের বিষয় বহু ব্যাকরণগত প্রমাদ, দুষ্টপ্রয়োগ ও বর্ণাশুদ্ধি এই সাত পৃষ্ঠার মধ্যে বর্ত্তমান। প্রারম্ভে ঐতিহাসিক বিষয়গুলির প্রমাণ উদ্ধৃত করিলে ভাল হইতে।

স্তবক ও কোরক—শ্রীরমণীরঞ্জন সেন গুপ্ত প্রণীত। মূল্য ৸৹ আনা। এখানি কবিতাগ্রন্থ। লেখক "মুখবন্ধে" লিখিয়াছেন "কতিপয় বিশিষ্ট কবির ভাবাবলম্বনে 'স্তবক ও কোরকে'র কয়েকটি কবিতা রচিত হইয়াছে। কাঞ্চন অপরের হইলেও তাহাকে পোড়াইয়া পিটিয়া আপন ছাঁচে গড়াইয়া লইতে চেষ্টার ত্রুটী ঘটে নাই।" আপন ছাঁচে ফেলিবার চেষ্টায় লেখকের মৌলিকতা কোথাও বিন্দুমাত্র পরিদৃষ্ট হয় না। শ্রেষ্ঠ কবির শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলিকে ভেংচান মাত্র হইয়াছে। একটি মাত্র উদাহরণ হইতেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। রবীন্দ্রনাথের "ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে" কবিতাটিকে লেখক নিম্নলিখিত রূপে যথার্থই "পোড়াইয়া পিটিয়া" প্রকাশ করিয়াছেন :—

"ধূপ ওই আপনারে চাহিছে মিলাতে সুবাসে।
গন্ধ সে ধূপেরে চাহে বহিতে সুদূর আকাশে॥
সুর ওই আপনারে প্রকাশিতে ছন্দে চাহিছে।
ছন্দ সে আকুল প্রাণে সুর আশানন্দে গাহিছে॥
ভাব ওই পেতে চায় রূপেরই মাঝারে অঙ্গ।
রূপ সে লভিতে চাহে ভাবেরই নিভৃত সঙ্গ॥" (৭০ পৃষ্ঠা)

এইরূপ কাঞ্চন পিটিয়া শেষে কবি নিজের গিল্টি লাগাইয়াছেন :—

"স্রষ্টার রাজ্যের মাঝে মরি কি অপূর্ব্ব ব্যাপার।
ধন্য তুমি হে বিধাতঃ সার্থক মহিমা তোমার॥"

(৭১ পৃষ্ঠা)

এইটুকু কবির নিজস্ব বটে!

কবি 'কমিক্' কবিতা লিখিতেও প্রয়াস পাইয়াছেন। 'কমিক্' কবিতাগুলি পড়িয়া আমরা হাসি বটে কিন্তু সে হাসির পাত্র স্বয়ং কবি। উদাহরণ :—

"মিঠাই মণ্ডা দিল্লীর লাড্ডু গুড় সন্দেশ দৈই।
আরো কত কি থাইচ্ছে আহা তার ইয়ত্তা নেই॥"

(৫৪ পৃষ্ঠা)

"এইতো হলো পড়ার ফর্দ্দ Daily statement
ধরলুম যা তা পাশ করিয়ে Hat, Coat, Pent."

(১০৫ পৃষ্ঠা)

করুণরস উদ্দীপনকল্পে কবির নিম্নলিখিত প্রয়াস—

"পিসিমা বলনা মোরে　　মা কোঠায় গেছে ছেড়ে
হামারে ডিডিরে আর ডাডাগণে ভুলে ;
মোডেরে নেয়নি কেন যেটে কোলে টুলে॥"

"গডাচরচন্দ্রের" হাস্যরসকেও হার মানাইয়াছে।

কবির কবিত্বের নিদর্শন নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, মিলে এরূপ ব্যর্থ প্রয়াস অল্পই পরিদৃষ্ট হয় :—

"হে মাতঃ পদপ্রান্তে রেখো অধমে
আঁখিনীরে ভেসে ভেসে যাব চুমে॥
সংসার লহর যবে,　　উঠিবেক ভীমরবে
তোমারি চরণ-গুণে যাবে থেমে॥
শোক দুঃখ উর্ম্মিঘাতে　　হইলে বিকার চিতে
দয়া করে দিও মাতঃ! তাহা দমে॥
বিষয়বাসনা কেন　　যদি করে পুণ্যলীন
নিজ-গুণে ক্ষমা করে নিও অন্তিমে॥"

(১৫৫ পৃষ্ঠা।)

এই গ্রন্থখানির নূতনত্ব এই যে মুখবন্ধে লেখক নিজেই নিজের প্রশংসা গান করিয়াছেন। তাঁহার কৃতিত্ব এই :—(১) লেখকের 'ভাব ও গাথা' নামক গ্রন্থের একটি ভূমিকা গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখিয়া দেন ও সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় "আশীর্ব্বাদ" করেন। (২) বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ঐ গ্রন্থের কতকগুলি খণ্ড ক্রয় করেন (৩) 'জ্ঞানাঞ্জন' নামক লেখকের আর একখানি গ্রন্থের ভূমিকা ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন (৪) ঐ গ্রন্থ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগের পাঠ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে (৫) শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির ভূপেন্দ্রনাথ বসুকে অভ্যর্থনার জন্য একটি সভায় লেখকের গলায় পুষ্পমাল্য পরাইয়া দিয়াছিলেন। লেখকের নিজ ভাষায় এই শেষোক্ত কার্য্যে কৃপাশরণ মহাস্থবির মহাশয়ের "উদারতা ও মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা" প্রদর্শিত হইয়াছে।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে লেখক নিজে এইরূপে নিজ কৃতিত্বের ঘোষণা করিলেও তিনি যে এককালে "চারিখানি কবিতাগ্রন্থ যন্ত্রস্থ" করিয়াছেন (যাহার মধ্যে আলোচ্য গ্রন্থ অন্যতম) তাহার বাকি তিনখানির সম্বন্ধে কোন উৎসাহ প্রদান করিতে পারিলাম না। লেখকের এ পথ নহে।

কোচবিহারে সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সম্বর্দ্ধনা।

বিগত ২৫শে পৌষ বিশ্ববিদ্যালয়সংক্রান্ত কর্ম্মোপলক্ষে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কোচবিহার রাজধানীতে আগমন করেন। তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত কোচবিহার সাহিত্য-সভার উদ্যোগে উক্ত দিবস অপরাহ্ন ৪॥• ঘটিকার সময় ল্যান্স্ডাউন্হলে এক সম্মিলনের অনুষ্ঠান হয়। এই উপলক্ষে কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা ও হস্তলিখিত পুথি প্রদর্শিত হইয়াছিল। আবাহন-সঙ্গীতের পরে শ্রীযুক্ত সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্মিলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, তাঁহাকে পুষ্পমাল্যদানে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। কোচবিহার সাহিত্য-সভার পক্ষ হইতে সহকারী-সভাপতি মহাশয় অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। একটী সুদৃশ্য রৌপ্যাধারে তাহা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে প্রদত্ত হয়। তিনি তাহার উত্তর প্রদান করেন। তৎপরে জলযোগান্তে সমবেত ভদ্র মণ্ডলীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি সন্ধ্যার ডাকগাড়ীতে কোচবিহার পরিত্যাগ করেন। আবাহন-সঙ্গীত, অভিনন্দপত্রের প্রতিলিপি ও তাহার উত্তর নিম্নে মুদ্রিত হইল।

আবাহন-সঙ্গীত।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

ভারত গৌরব রবি কর শুভ আগমন।
বিহার সাহিত্যসভা যাচে তব কৃপাকণ ॥

প্রতিভা কিরণদীপ্ত,　　জাগিছে ভারত সুপ্ত,
কীর্ত্তিসুধা পরিমলে আমোদিত সমীরণ ॥

অনাদৃত মাতৃভাষা,　　তুমি হে তার ভরসা,
মুছালে মার তপ্তঅশ্রু করিয়া বহু যতন ;—
বিবিধ বিদ্যার সিন্ধু,　　কোবিদ কুমুদ ইন্দু,
সাহিত্য সেবি চকোর, তৃষা শান্তি নবঘন ॥

প্রাচ্য প্রতীচ্য জগতে,　　গাঁথি নব ভাব সূতে,
জ্ঞানেরি মিলন রাজ্য করিয়াছ সুগঠন ;—
বিনয় চরিত্র গুণে,　　ত্যাগ মণ্ডিত জীবনে,
প্রাচীন ভারতদ্বিজের, সমুজ্জ্বল নিদর্শন ॥

জাতি ধর্ম্ম—অবিশেষে,　　শিক্ষা প্রচারিতে দেশে,
রাজ আনুকূল্য লাভে, করিয়াছ প্রাণপণ,—
আজি এ মাহেন্দ্রক্ষণে,　　তব পুণ্য দরশনে,
আনন্দ লহরী প্রাণে ছুটিতেছে অগণন ॥

হে নব্য বঙ্গের আশা,　　অপূর্ণ এ বঙ্গভাষা,
কেমনে সেবিবে তোমায় অমর বাঞ্ছিত ধন ;—
শিশু সাহিত্যসমিতি,　　নাহি তার কোন বিভূতি,
বিভূতি ভূষিত কান্তি ভারতী বরনন্দন ॥

দেবপূজ্য আশুতোষে,　　কি দিয়ে বা তুষিবে সে,
আধ আধ শিশুভাষে করে প্রিয় সম্ভাষণ ॥

অভিনন্দন পত্রের প্রতিলিপি।

মহামাননীয় মহনীয়চরিত নিখিলগুণনিকেতন বিবিধবিদ্যাবিশারদ অশেষশাস্ত্র-নিষ্ণাত স্বদেশগৌরব শ্রীযুক্ত সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সরস্বতী, শাস্ত্রবাচস্পতি, সম্বুদ্ধাগমচক্রবর্ত্তী, নাইট্, সি.এস্.আই., এম্.এ, ডি.এল্., ডি.এস্.সি., এফ্.আর্.এ.এস্., এফ্.আর্.এস্.ই., এফ্.আর্.এস্.বি., বঙ্গদেশের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণের বিচারপতি মহোদয় সমীপেষু,—

মহাত্মন্,

ভারতের শীর্ষমুকুট শৈলরাজ হিমালয়ের পদাশ্রিত গৌড়বঙ্গের পূর্ব্বোত্তরপ্রান্তে অবস্থিত পুরাণপ্রখ্যাত প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষ এবং মধ্যযুগের মহাপবিত্র কামাখ্যা মহাপীঠাধিষ্ঠিত কামরূপ মহারাজ্যের শ্রেষ্ঠতম অংশ এই কোচবিহার রাজ্যের রাজধানীতে আপনার শুভাগমনে কোচবিহার সাহিত্যসভার সদস্যবৃন্দ অতিমাত্র আনন্দোচ্ছ্বসিতহৃদয়ে সবিনয়ে ও সম্মানসহকারে পুনঃ পুনঃ স্বাগতসম্ভাষণ করিতেছে। কোচবিহার রাজধানীতে আপনার এই প্রথম আগমন আমাদের এই দেশের পক্ষে অতিশয় শুভ এবং গৌরবময় ঘটনা। ইহা এই সাহিত্যসভার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় এবং আমাদের স্মৃতিপটে চিরসমুজ্জ্বল থাকিবে। পরমমঙ্গলময় পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে আপনি অনন্যসাধারণপ্রতিভাবলে প্রাচীন এবং নবীন, দেশীয় এবং বিদেশীয় সাহিত্য, গণিত, দর্শন, বিজ্ঞান, ব্যবহার প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যাবিভূষিত এবং জ্ঞানোজ্জ্বলচরিত্রসমলঙ্কৃত হইয়া স্বদেশের কর্ম্মক্ষেত্রে শিক্ষা, সভ্যতা ও চরিত্রের আদর্শরূপে শোভা পাইতেছেন। বঙ্গদেশের সর্ব্বোচ্চ-ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপতিরূপে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চেন্সেলাররূপে আপনার ন্যায়নিষ্ঠতা, সত্যপরতা এবং দক্ষতার সুযশ ভারতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। আপনার অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেম আপনাকে সমাজের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির নিমিত্ত নিযুক্ত

রাখিয়াছে। দেশের সর্ব্বত্র পাঠশালার নিম্নশিক্ষা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা পর্য্যন্ত নানাপ্রকার সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিভাগের বিদ্যার উন্নতি এবং বিস্তার সম্বন্ধে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গঠন ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিবিধান সম্বন্ধে, নানাপ্রকার উচ্চাবচ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের নানাবিভাগে পাঠ্যপুস্তক এবং বিষয়ের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে, বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার সমাদর সংস্থাপন সম্বন্ধে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রতিভাশালী নিষ্ঠাপর শিক্ষার্থী ছাত্রদিগের উত্তরোত্তর অধ্যয়নস্পৃহা এবং জ্ঞানলিপ্সা সংবর্দ্ধনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আপনি যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য সমগ্রদেশ আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। দেশের ভবিষ্যৎ আশাভরসার স্থল ছাত্রমণ্ডলী যাহাতে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা এবং সাধনায় ঋষিদিগের মহান্ আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রাচ্যের সনাতন সভ্যতার সহিত প্রতীচ্যের নূতন সভ্যতার নিত্য নব নব উন্নতি এবং উন্মেষশীল সামাজিক এবং নৈতিক আদর্শসমূহের সামঞ্জস্য বিধান এবং সংসারক্ষেত্রে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিয়া জগদ্ধাত্রীর বিরাটপরিষদে বিজয়গৌরবে সমলঙ্কৃত হইয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল এবং জন্ম সার্থক করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে আপনার অতুলকীর্ত্তি ভবিষ্যতের অনুকরণীয় হইয়া থাকিবে। আমরা ভারতের এতাদৃশ সুসন্তানকে আমাদের গৃহে পাইয়া ধন্য এবং কৃতার্থ হইয়াছি, ও আনন্দবিহ্বলচিত্তে পুনঃ পুনঃ আপনার অভিনন্দন করিতেছি।

এই পুণ্যভূমি কামরূপের রত্নস্বরূপ কোচবিহাররাজ্যে শিববংশাবতংশ শুভচরিত্র পুণ্যশ্লোক বিদ্বজ্জন-প্রতিপালক বিদ্যারসিক মহাপ্রতাপান্বিত নরপতিগণ সকলেই বিদ্যার এবং বিদ্বানের সমুচিত সমাদর এবং পূজা করিয়াছেন। অর্দ্ধ আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর মহারাজ নরনারায়ণ এবং তাঁহার সহোদর দিগ্‌বিজয়ী বীরচূড়ামণি সেনাপতি শুক্লধ্বজের সভা, সেকালের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতসমূহে সতত সমুদ্ভাসিত থাকিত। মহারাজ প্রাণনারায়ণের পঞ্চরত্ন পণ্ডিতসভা দেশবিখ্যাত ছিল। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী, আজিও রাজকীয় পুস্তকাগারের শোভা এবং সমৃদ্ধিবর্দ্ধন করিতেছে. এবং সাহিত্যসভা ঐ গ্রন্থাবলী, প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ এবং রাজ্যের সর্ব্বশ্রেণীর শত শত বিদ্যালয় মহারাজ নৃপেন্দ্র-নারায়ণের বিদ্যানুরাগের জ্বলন্ত নিদর্শনরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীশ্রীজিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির আশ্রয় এবং তিনিই এই সাহিত্যসভার প্রাণস্বরূপ। তাঁহার সুযোগ্য মধ্যমসহোদর মহারাজকুমার শ্রীল শ্রীযুক্ত ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ মহোদয় আমাদের সভাপতি। তাঁহাদের কৃপাতেই আমরা অদ্য এই রাজধানীতে ভবাদৃশ মহানুভব সজ্জনের প্রতি আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা, সম্মান ও অভিনন্দন অর্পণ করিতে সমর্থ হইতেছি।

আপনার প্রতি আমাদের হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আমরা আপনাকে আমাদের এই সাহিত্যসভার "বিশিষ্টসদস্য" পদে বরণ করিয়াছি এবং আপনি যে কৃপাপূর্ব্বক এই পদ গ্রহণে আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি ইতি।

কোচবিহার,
২৫এ পৌষ, ১৩২৪ } কোচবিহার সাহিত্যসভার বিনীত সদস্যবৃন্দ।

অভিনন্দন পত্রের উত্তর।

কোচবিহার-সাহিত্যসভার সভ্যবৃন্দ এবং ভদ্র মহোদয়গণ,—যে সাহিত্যসভার অভিভাবক কোচবিহারের অধিপতি, যাহার সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রিন্স ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ, যাহারা সহকারী-সভাপতি আমার বহুকালের বন্ধু শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়, সেই সভার বিশিষ্ট সদস্যরূপে নির্বাচিত হওয়া অত্যন্ত সম্মান বলিয়া মনে করিতেছি (করতালি)। আমার যখন রাজকীয় কর্ম্মোপলক্ষে কোচবিহার আসিবার কথা হয়, তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে আপনারা আমাকে এরূপ ভাবে অভিবাদন করিবেন।

আপনারা যে অভিনন্দনপত্র দিয়াছেন, তাহা আমি অন্য সর্ব্বপ্রকার অভিনন্দনপত্র অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করি (করতালি)। ভারতের স্বাধীন রাজ্যসমূহের মধ্যে কোচবিহার প্রধানতম। তাহার কারণ স্বর্গগত মহারাজের উদ্যোগে ও চেষ্টায় কোচবিহার রাজ্যে যেরূপ শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে, সেরূপ কোথাও দেখা যায় না (করতালি)। আমরা ব্রিটীশভারতের অধিবাসী হইয়াও দেখিতেছি যে কোচবিহারে যেরূপ শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে, ব্রিটীশ ভারতে সেরূপ হয় নাই (করতালি)।

আপনারা বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি এবং দেশের ইতিহাসের অনুশীলনের জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে আমি প্রীত হইয়াছি এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যেন আপনাদের এই অধ্যবসায় সফল হয়।

আমার ইচ্ছা ছিল যে অন্ততঃ দুই তিন দিন এখানে থাকিয়া সকলের সহিত আলাপ করিয়া সুখী হই; কিন্তু রাজকার্য্যের উৎপাতে—উৎপাতই—বলিতেছি সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। আজ এখানকার রাজকীয় কাজ শেষ হইয়াছে, এবং আজই আমাকে কলিকাতা যাইতে হইবে। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে কোচবিহারে আমরা যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি (করতালি)।

আমি পুনরায় আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

কোচবিহার ষ্টেট্ প্রেসে শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও কোচবিহার সাহিত্য-সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কম্বোজরাজ যশোধ্বজ ও যোগীবেশী চীনরাজমন্ত্রী। চীনরাজমন্ত্রী। সহচরী। উদাসিনী কম্বোজরাজকন্যা

(ভূতপূর্ব্ব কোচবিহারাধিপতি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ রচিত উপকথা নামক পুঁথির পাটায় অঙ্কিত গল্পের চিত্র।)

চীনরাজ মদনসুন্দরের সহিত কম্বোজরাজকন্যার বিবাহ।

(ভূতপূর্ব্ব কোচবিহারাধিপতি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ রচিত উপকথা নামক পুঁথির পাটায় অঙ্কিত গল্পের চিত্র।)

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

২য় বর্ষ। | ফাল্গুন, ১৩২৪ সাল। | ৪র্থ সংখ্যা।

অভয়।

শক্ত যা তা সহজ হ'ল
নিকট হ'ল দূর,
অন্ধকারেই জ্বল্‌ল বাতি,
পর হ'ল যে আত্ম-সাথী,
সরল হ'ল তরল হ'ল
জটিল নিবিড় সুর।
বিরোধ মাঝেই জাগ্‌ল শেষে
বক্ষ ভরা প্রেম,
ঘুচ্‌ল মনের দুঃখরাশি,
অশ্রু জলেই ফুট্‌ল হাসি,
সরম কঠিন নরম হ'ল,
লৌহ হ'ল হেম।

বাধার মাঝেই মিলন হ'ল,
বাঁধন মাঝেই খোলা,
রুদ্ধ শেষে মুক্তি পেল,
দুর্ব্বলেরই শক্তি এল,
দুখের নিঠুর বুকের মাঝে,
দুল্‌ল সুখের দোলা।
সঙ্কটেরই মধ্যিখানে
শান্তি পেল ঠাঁই,
ঝঞ্ঝা মাঝে লাগ্‌ল আলো,
মন্দ মাঝে জাগ্‌ল ভাল,
শঙ্খ তোমার উঠ্‌ল বেজে
শঙ্কা কিছু নাই।

মঙ্গল-মঠ।

—:*:—

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জগতের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ হাসি-কান্নার তরঙ্গ সহিয়া বহিয়া—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল। আবার নূতন বসন্ত আসিয়া পুরাতন হইয়া গেল, কত শাখায় নবমুকুল মুঞ্জরিত হইল, কত ফুল ফুটিয়া ঝরিয়া গেল, কত ফুল ফলে পরিণত হইল, কত পরিবর্ত্তনের প্রবাহ, অপ্রতিহত বেগে অবিশ্রাম বহিয়া গেল—তাহার ইয়ত্তা নাই, পৃথিবীর অবস্থা ব্যবস্থা যেমন পূর্ব্বাপর চলিতেছিল, এখনও ঠিক তেমনই আছে।

যন্ত্রণা-উৎক্ষিপ্ত চিত্তে নিরঞ্জন যেদিন অকস্মাৎ মঙ্গল-মঠ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল,—তাহার পর আজ দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। নিরঞ্জন আজিও সুরাটে রহিয়াছে। সুরাটে নূতন মঠ স্থাপনের বিপুল আয়োজনের পশ্চাতে আজ দুই বৎসর সে একাধিক্রমে খাটিতেছে,—সঙ্গে আরও অনেক ভাস্কর রহিয়াছে—কিন্তু দায়িত্বের হিসাবে তাহার প্রাধান্য সকলের উপর। আদিত্য ও সনাতন কিছুদিন এখানে আসিয়া কাজকর্ম্ম করিয়াছিল, কিন্তু প্রবাসে সুদীর্ঘ কাল মন টিকাইয়া বাস করা সকলের পক্ষে সহজসাধ্য নহে,—তাহারা দেশে ফিরিয়া গিয়াছে, এখন দেশের কাছাকাছি নানা স্থানে কাজ করিয়া বেড়াইতেছে।

মঙ্গল-মঠের অধিকারী মহারাজ যথাসময়ে মঠে ফিরিয়া—তাহাদের কৃতকার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া, যথোপযুক্ত পুরস্কার দিয়াছেন—কিন্তু নিরঞ্জনের ভাগ্যে তাহা স্বহস্তে গ্রহণ করিবার সুযোগ হয় নাই, অবশ্য ইহার জন্য—পরে মাথা ঠিক করিয়া, নিরঞ্জন ব্যস্ততার অজুহাত দেখাইয়া, দাদার কাছে যুক্তিসঙ্গত কৈফিয়ত দিতে ত্রুটি করে নাই, কিন্তু ক্ষুণ্ণ চিত্তরঞ্জন তাহাতে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই,—শুধু পুরস্কারের জন্য নহে, যদি তিরস্কারের কারণই কিছু ঘটিয়া থাকিত, তবে তাহার জবাবদিহির জন্য—অন্ততঃ কর্ম্মকর্ত্তার সহিত সাক্ষাত করিয়া আসা নিরঞ্জনের উচিত ছিল! সুন্দর-মঠের অধিকারী মহারাজের সহিত সাক্ষাত হইতে দুই একদিন বিলম্ব হইলে বিশেষ কিছু হানি হইত না, একথা তিনি বারবার নিরঞ্জনকে বুঝাইয়া দিয়াছেন কিন্তু নিরঞ্জন তাহাতে কোন সদুত্তর দিতে পারে নাই।—আদিত্য ও সনাতন ভিতরের কথা কিছুই জানিতে না পারিলেও নিরঞ্জনের চিত্ত-বৈলক্ষণ্য কিছু কিছু বুঝিয়াছিল, কিন্তু সেরূপ ভিত্তিহীন আনুমানিক সংবাদ চিত্তরঞ্জনদেবের নিকট প্রকাশ করিবার সাহস তাহাদের ছিল না, সুতরাং চিত্তরঞ্জনদেব কিছুই জানিতে পারেন নাই।

নির্ম্মল-মঠের কার্য্যারম্ভের সময় চিত্তরঞ্জনদেব সুরাটে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু নিরঞ্জনের মানসিক অপ্রকৃতিস্থতা, তাঁহার স্নেহশীল দৃষ্টিতে,—মাত্র শারিরীক দৌর্ব্বল্য ক্লান্তি বলিয়া অনুমিত হয়। নিরঞ্জনের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। প্রতিকার চেষ্টার ত্রুটি হইল না, ব্যথিত নিরঞ্জন মনে হাসিল, -কিন্তু ভয়ে কোন আপত্তি করিল না, বিনা-প্রতিবাদে তাঁহার সকল আদেশ পালন করিয়া চলিল—শুধু একটি বিষয়ে সে নিরস্ত হইল না,—সে বিষয়টি পরিশ্রম!—বিশ্রামের নাম শুনিলে তাহার আতঙ্ক বোধ হইত, চিত্তরঞ্জনদেব কত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নিরঞ্জনকে পারিয়া উঠিলেন না। দিন নাই—রাত্র নাই. নিরঞ্জন একটা-না-একটা কাজে সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকিত তবে সকল কার্য্যেই যে, সে সম্পূর্ণ চিত্তসংযোগ করিতে পারিত তাহা নহে, অনেক সময় অত্যাবশ্যকীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে—নিরঞ্জনের উপযুক্ত যত্নাভাব পরিলক্ষিত হইত. ক্বচিৎ এমনও হইতে দেখা গিয়াছে, যে প্রয়োজনীয় কাজ ফেলিয়া, নিরঞ্জন কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না! কর্ত্তব্য-প্রাণ চিত্তরঞ্জন,—তাহার কার্য্য-অবহেলার দোষে বিস্মিত হইয়াছেন, বিরক্ত হইয়াছেন, কখনও বা ক্রুদ্ধ হইয়া ভৎসনাও করিয়াছেন, কিন্তু নিরঞ্জন সকল বিষয়েই নীরব!—নিশ্চিন্ত ঔদাসীন্যের অভ্যন্তরে জ্বলন্ত অনুতাপের স্রোত বহিয়া গিয়াছে, আত্মকৃত ত্রুটিতে, গ্লানি-ক্ষুব্ধ নিরঞ্জন কখনও বা অধীর হইয়া আত্মহত্যার সঙ্কল্পও করিয়াছে,—কিন্তু তথাপি সে মুখ তুলিয়া কখনও কাহাকে একটি কথা বলে নাই! সকল বিপ্লবের মধ্যে—সে মৌন-গাম্ভীর্য্যে স্থির। ত্রুটি-ক্ষালনের চেষ্টায় কেহ কখন তাহাকে একটি মৌখিক শব্দ উচ্চারণ করিতে শুনে নাই, —সে যত পারিয়াছে, শুধু হাতে হাতিয়ারে খাটিয়াছে। শক্তি বিনিময়ে কর্ত্তব্য-ত্রুটি সংশোধন করিতে চাহিয়াছে।

কিন্তু কর্ত্তব্যের প্রতি এই অযত্ন অবহেলার ভাব তাহার প্রকৃতিতে বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই. প্রাণপণ চেষ্টার বলে শীঘ্রই সে আপনাকে সংযত করিয়া লইয়াছিল, এখন তাহার স্বভাবে—প্রথম জীবনের সেই প্রচণ্ড উৎসাহ আগ্রহ আবার যেন দশগুণ বাড়িয়া নূতন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে. কিন্তু তাহার মধ্যে এখন সে উত্তেজনা চাঞ্চল্য আর নাই,—এখন তাহা—সম্পূর্ণ সংহত-গম্ভীর।

নির্ম্মল-মঠের কার্য্যারম্ভের সময় চিত্তরঞ্জনদেব, প্রধান ভাস্কর রূপে প্রথমে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি সে পদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন না। বিকানীরবাসী কয়জন পরিচিত তীর্থযাত্রাভিলাষী নরনারীর সহিত মিলিয়া ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আসিবার জন্য—বিমাতা আগ্রহ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিলেন। চিত্তরঞ্জন বিপন্ন হইলেন, পুণ্যব্রতা জননীর মনস্কামনা পূরণে প্রতিবন্ধকতাচরণ অসম্ভব, অথচ দূর

দূরান্তরে দুর্গম পথে কেবল মাত্র সহযাত্রীগণের উপর নির্ভর করিয়া, তাঁহাকে একাকিনী প্রেরণ করাও যুক্তিসিদ্ধ নহে, অন্ততঃ উপযুক্ত পুত্রদ্বয়ের একজন তাঁহার সঙ্গী হওয়া উচিত—অনেক ভাবিয়া নিরঞ্জনের সহিত পরামর্শ করিয়া, নিজেই মাতার সহিত যাইতে প্রস্তুত হইলেন। নিরঞ্জন মঠ নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা ভার গ্রহণ করিল। মাতা অনেকদিন নিরঞ্জনকে দেখেন নাই, সেই জন্য নিরঞ্জন কয়দিনের ছুটি লইয়া, চিত্তরঞ্জনের সহিত বিকানীর গেল,—এবং বহুদিনের অদর্শনের পর স্নেহময়ী জননীর তৃষিত আকাঙ্খা অপরিতৃপ্ত রাখিয়া, তাহার শোকতপ্ত অশ্রু অভিষেকের মধ্যে বিষাদ-খিন্ন চিত্তে বিদায় লইয়া—অবিলম্বে বালক ভ্রাতুষ্পুত্র দেবরঞ্জনকে সঙ্গে করিয়া সুরাটে ফিরিয়া আসিল।

বিক্ষোভাহত চিত্তকে আত্ম-বিস্মৃতির অবকাশে মুক্তি দিবার জন্য নিরঞ্জন শিল্প চর্চ্চার মধ্যে প্রাণ ঢালিয়া দিল, কিন্তু তবুও সে অসীম শূন্যতার আকুল হাহাকার নিবৃত্ত হইল না, অভাব কি তাহা স্পষ্ট বোঝা দায়,—কিন্তু স্বভাবের সেই গূঢ়-অস্বস্তি-বৈষম্য—কিছুতেই সাম্য হইল না। কর্ম্মের চাপে প্রাণকে দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টায় নিরঞ্জন সম্পূর্ণরূপে আত্মবিয়োগ করিল। অবিশ্রাম কর্ম্ম ব্যস্ততার স্রোতে ডুবিয়া,—যদি কোন রকমে জীবনের সেই একটা 'ভুল'কে ভুলিতে পারে,-যদি কোনগতিকে অন্তরের এই মহাব্যাধির হাতে নিস্কৃতি পায়, তাহারই সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

দেবরঞ্জনকে কাছে আনিয়া, পারিবারিক জীবনে একটা কর্ত্তব্যবন্ধনে আপনাকে জড়াইয়া নিরঞ্জন অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইল। পিতামহীর স্নেহ-ক্রোড়বিচ্যুত মাতৃহীন বালকের স্নেহ-পিপাসিত হৃদয়টি সে পরম যত্নে নিজের বুকের কাছে টানিয়া লইল, তাহার অষ্টপ্রহরের অভাব-অভিযোগের তত্ত্বাবধান লইয়া,—সময়োপযোগী শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিয়া—নিজের অনবসর সময়কে কাটিয়া ছাঁটিয়া জোরের উপর অবসর সংগ্রহ করিয়া বালকের চিত্তবিনোদনের জন্য—কষ্ট কল্পিত কৌতুকের সৃষ্ট করিয়া,—নিরঞ্জন নির্জ্জীব পাষাণ ও সজীব শিশুর সেবায় দিন কাটাইতে লাগিল; কঠোর শাসনের গণ্ডিতে মনকে পুরিয়া, নিরঞ্জন আপনাকে সাংসারিকতার উপযোগী স্বচ্ছন্দ সরল লঘু করিয়া লইতে যাহিত, কিন্তু ক্লান্তি-পীড়িত হৃদয় তাহাতে সুস্থ তৃপ্ত হইত না,—সময় সময় তীব্র বিতৃষ্ণায় সে উন্মাদ হইয়া উঠিত, তখন আত্মসম্বরণের চেষ্টা নিরঞ্জনের নিকট মৃত্যু যন্ত্রণার অপেক্ষা বেশী বোধ হইত, কিন্তু সে যন্ত্রণাও নিঃশব্দ গাম্ভীর্য্যে বহন করিতে পিছাইত না। কর্ত্তব্য-বিমুখ হৃদয়কে সবলে কর্ত্তব্যের দিকে টানিয়া লইয়া চলিত, 'না' বলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইতে দিত না। পাছে নিজের অবসন্ন অবসাদ সংঘাতে কাহারও স্বাচ্ছন্দ্য স্ফূর্ত্তি আহত হয় বলিয়া নিরঞ্জন সতর্ক ভাবে গনিয়া পা ফেলিত,—মন যখন একান্তই দুর্বিনীত অধীর হইয়া উঠিত—তখন সকলের সংস্রব এড়াইয়া নিরঞ্জন অন্ধকারে সরিয়া দাঁড়াইত।

ভাস্কর-নিবাসে দেবরঞ্জনের কোন কষ্ট ছিল না। দেশদেশান্তর হইতে আগত প্রবাসী ভাস্করগণ সকলেই তাহাকে স্নেহ যত্ন করিত, সমস্ত ভাস্কর নিবাসের মধ্যে সেই একটি মাত্র শিশু, সুতরাং তাহার মনস্তুষ্টির জন্য সকলেই তাহাকে যথাসাধ্য আমোদ দিয়া, তাহার সঙ্গহীনতার অভাব মোচন করিত, ভাস্করগণের সহিত নিরঞ্জন যখন অদূরস্থ মঠের কার্য্যে চলিয়া যাইত, তখন তাহার জন্য স্বতন্ত্র বেতনভোগী ভৃত্য আসিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিত।

এক বৎসর নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বদরিকাশ্রম হইতে ফিরিবার সময় শীত প্রকোপে চিত্তরঞ্জনদেব পথিমধ্যে পীড়িত হন, সহযাত্রীগণও কেহ কেহ পীড়িত হন,—গোকর্ণে পৌঁছিয়া, বিমাতা সহসা এক দিনের জ্বরে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, পীড়িত চিত্তরঞ্জন কোন ক্রমে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করিয়া সহযাত্রীগণের সহিত দেশে ফিরিলেন।

আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিতে তাঁহার অনেক দিন লাগিল কিন্তু রোগ শেষে তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের প্রধান উপায় দক্ষিণ হস্তটি পক্ষাঘাত ব্যাধিতে চিরদিনের মত অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। মাতৃ-বিয়োগ শোকতপ্ত নিরঞ্জন, এই দুঃসংবাদে অত্যন্তই বিপদে পড়িল, সুরাটের কাজ-কর্ম্ম ফেলিয়া দেশে ফিরিতে উদ্যত হইল, কিন্তু চিত্তরঞ্জন দেব তাহাকে নিষেধ করিয়া,—জনৈক বিশ্বস্ত ভৃত্য সঙ্গে লইয়া স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে গেলেন। কয় মাসের পর এখন তিনি স্বাস্থ্যলাভ করিয়া সম্প্রতি সুরাটে ফিরিয়াছেন, কিন্তু তাহার দক্ষিণ-হস্তটি পূর্ব্ববৎ অক্ষম হইয়া আছে।

তীর্থভ্রমণে যাত্রার পর পুরা দেড় বৎসর সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে, এই দেড় বৎসর নিরঞ্জন একলা সকল দিকে খরচ চালাইয়েছে তীর্থ ভ্রমণ, মাতৃশ্রাদ্ধ, চিত্তরঞ্জনের পীড়ার চিকিৎসা ও আপনার এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের ব্যয় নির্ব্বাহ ভার নিজের স্কন্ধে লইয়া. নিরঞ্জনের সঞ্চিত পুঁজি যাহা কিছু ছিল সবই নিঃশেষিত হইয়াছে,- কিন্তু চিত্তরঞ্জন দেবের সঞ্চিত অর্থে অদ্যাবধি সে হস্তক্ষেপ করিতে দেয় নাই।—উভয় ভ্রাতা একান্নবর্ত্তী হইলেও নিরঞ্জন উপার্জ্জন করিতে শিখিয়া অবধি, তাহার নিজস্ব সঞ্চয়ের তহবীল চিত্তরঞ্জন দেব আলাহিদা করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আয়-ব্যয়ের হিসাব, নিরঞ্জনকে দাদার দরবারে নিয়মিত রূপে দাখিল করিতে হইত।

আজ দ্বিপ্রহরে চিত্তরঞ্জন দেব দেড় বৎসরের হিসাবের খাতা লইয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহাদের তীর্থ ভ্রমণের খরচ তাঁহার তহবীল হইতে আবশ্যক মত তুলিয়া পাঠাইবার জন্য তিনি নিরঞ্জনকে আদেশ দিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু আজ হিসাবের খাতা লইয়া দেখিলেন নিরঞ্জন তাঁহার সে আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া নিজের তহবীল সম্পূর্ণরূপে উজাড় করিয়াছে!

উপযুক্ত ভ্রাতাকে বৈষয়িক ব্যাপারে অবাধ্যতার জন্য সকলের সমক্ষে তিরস্কার করা চলে না। চিত্তরঞ্জন দেব, নির্জ্জনে নিরঞ্জনকে কিছু উপদেশ দিবার জন্য—বৈকালে নির্ম্মল-মঠের উদ্যানে বেড়াইতে বাহির হইলেন, নিরঞ্জন তখন সহযোগীগণের সহিত মঠের বহিরাংশে কার্য্য-ব্যাপৃত ছিল, চিত্তরঞ্জন দেব তাহাকে বলিয়া গেলেন যেন ছুটীর পর সে উদ্যানে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাত করে।

কিন্তু নির্জ্জনতার সুযোগ ঘটিল না। মোহন্ত মহারাজ বৈকালিক ভ্রমণের জন্য উদ্যানে আসিয়াছিলেন। তিনি চিত্তরঞ্জনের সঙ্গী হইলেন।

সুবিস্তীর্ণ উদ্যান বাটিকার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। নিদাঘ অপরাহ্ণে অকস্মাৎ আকাশে মেঘাড়ম্বর সঞ্চার হইয়া বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল, তাঁহারা উভয়ে উদ্যানপ্রান্তভাগে 'করগেট' লৌহের ছাদ যুক্ত ক্ষুদ্র বিশ্রাম স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সেখানে কতগুলি সুদৃশ্য প্রস্তরাসন বিরাজ করিতেছিল,—উভয়ে বর্ষণ নিবৃত্তির অপেক্ষায় সেইস্থানে বসিয়া অন্যান্য কথায় প্রবৃত্ত হইলেন।

মোহন্ত মাহারাজ সুভদ্র ভট্ট বয়সে বৃদ্ধ। তাঁহার সুদীর্ঘ বিশাল আকৃতি আজিও যুবজনোচিত শক্তি-সামর্থ্যে সুদৃঢ়। পিতৃমাতৃ পুণ্যে জন্মগত শক্তি ও স্বাস্থ্যের অধিকারী হইয়া– চিরজীবন হিতাহার, মিতাহার, পরিমিত পরিশ্রম ও ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মানুগত ভাবে জীবন যাপনের ফল. তাহার আকৃতি ও প্রকৃতিতে পূর্ণ বিদ্যমান। সৌন্দর্য্যেও তিনি অনিন্দ্যনীয় রূপবান পুরুষ। বদনমণ্ডল শান্ত গাম্ভীর্য্য শোভা স্নাত, অধরে সদানন্দ হাস্য, নয়নে অমায়িক ঔদার্য্য প্রসন্নভাবে বিরাজমান্ সকলের উপর একটা স্নিগ্ধ সারল্য দ্যুতি উদ্ভাসিত হইয়া মোহন্ত মহারাজের সৌম্য মূর্ত্তি—অধিকতর সৌম্য-মনোহর করিয়া তুলিয়াছে।

মোহন্ত মহারাজের দয়াদাক্ষিণ্য ও সৎকীর্ত্তি কাহিনী দেশদেশান্তর বিশ্রুত; ভক্তপ্রবর তুলসীদাসের কথিত— 'জগতের পাঁচ রতন' বাস্তবিকই তিনি জীবনের সার ব্রত বলিয়া অবলম্বন করিয়াছিলেন, সাধুসঙ্গ, সদালোচনা,

দয়া, পরোপকার ও নিরভিমান তাঁহার স্বভাব-অভস্ত ব্যাপার হইয়াছিল; যৌবনে দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু অকালে পত্নী বিয়োগ হওয়ায়—অনাবশ্যক বোধে আর দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন নাই। অনুগত শিষ্য সহচরগণের মধ্যে কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবেন এবং তাহাকেই গদীর উত্তরাধিকারী করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন।

বল্লভাচারী সম্প্রদায়ভুক্ত মঙ্গল-মঠ প্রভৃতি মঠের মধ্যে—সুরাটের সুন্দর-মঠ সম্মানে ও বৈভবে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। সুন্দর-মঠাধিকারী মহারাজগণ পুরুষানুক্রমে—অন্যান্য মঠাধিকারীগণের দীক্ষাদাতা সুতরাং গুরুস্থানীয় বলিয়া ইহারা সকলের নিকট অধিকতর সম্মান্য। অনুরক্ত ভক্ত ও শিষ্যগণের নিকট 'মোহন্ত মহারাজ' আখ্যায় অভিহিত হন। কেহ কেহ অধিকারী মহারাজ বলিয়াও সম্বোধন করে।

মহারাজের পরিধানে বেশভূষায় কোনই আড়ম্বর নাই। অন্য মঠাধিকারীগণের ন্যায় ইহাঁর দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার ব্যবস্থা বিলাসায়োজন পূর্ণ নহে,—তাহা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ। পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষ ব্যতীত তিনি পদোচিত জাঁক জমক পূর্ণ বেশভূষা গ্রহণ করিতেন না। সচরাচর শুভ্র কার্পাস বস্ত্রের উত্তরীয়, বসন, ও উষ্ণীষ ব্যবহার করিতেন। ভ্রমণের সময় পায়ে খড়ম ছাড়িয়া চর্ম্মপাদুকা ও হাতে একগাছি স্থূল যষ্টি লইতেন মাত্র।

চিত্তরঞ্জন দেব তাহার সম্মুখে অন্য প্রস্তরাসনে বসিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন দেব অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব,—যৌবনে তাহার দেহ কান্তি সুপুরুষোচিত থাকিলেও, এখন সাংসারিক শোক-তাপ ও ব্যাধি-পীড়নে তাহার আকৃতি বিবর্ণ মলিন হইয়াছে, বয়সে প্রৌঢ় হইলেও তাঁহাকে, বৃদ্ধ মোহন্ত মহারাজ অপেক্ষা অধিক বয়স্ক দেখাইতেছিল। দুঃখ-নিষ্পীড়ন-ক্লিষ্ট, মুখমণ্ডলে সহিষ্ণু ধৈর্য্যের শান্ত জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছিল। সুপ্রশস্ত বক্ষঃস্থল ও সুগঠিত অবয়বে, অতীতের কর্ম্মকুশল শিল্পীর দৃঢ় শক্তিশালিতার পরিচয় প্রকাশিত,—বিচার-বিচক্ষণতা ও কর্ত্তৃত্ব-গরিমার দীপ্তি আজিও ললাট পট্টের আকুঞ্চণ রেখায় দেদীপ্যমান, দৃষ্টিতে ভোগ-বীতস্পৃহ পবিত্র সরলতা কিরণ বিচ্ছুরিত হইতেছে। চিত্তরঞ্জন দেবের বেশভূষা জাতীয় প্রথানুযায়ী।—ব্যাধিগ্রস্ত অকর্ম্মণ্য হস্তটি গলবন্ধনীযোগে বক্ষের উপর ঝুলিতেছিল, বামহস্ত ক্রোড়দেশে সংন্যস্ত করিয়া পদদ্বয় গুটাইয়া তিনি বসিয়াছিলেন।

ক্রমে বৃষ্টি চাপিয়া আসিল; মহারাজ বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিলেন "ওহে এইখানেই আমাদের বসিয়ে রাখ্‌বে নাকি!"

মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া চিত্তরঞ্জন বলিলেন "সেই রকমই গতিক দেখছি, এ ত ভাল বিপদে পড়া গেল মহারাজ।"

ঈষৎ হাসিয়া, স্নিগ্ধ-রহস্য-কোমল কণ্ঠে মহারাজ বলিলেন "মন্দ নয়, সুখ সম্পদের কোল থেকে, হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে বিপদে পড়ায় আরাম আছে,—নিশ্চিন্ত হয়ে কিছু শিখে নেওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়! এস ভাল করে বসে, জাঁকিয়ে গল্প ফাঁদা যাক—"

চিত্তরঞ্জন হাসিয়া কি একটা কথা বলিবার উপক্রম করিতেছেন—এমন সময় বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল, মহারাজ বিস্মিত হইয়া বলিলেন "একি নিরঞ্জন, বৃষ্টিতে ভিজে আসা কেন?—"

উষ্ণীষ-বস্ত্রে উত্তরার্দ্ধ আবৃত করিয়া, নিরঞ্জন আসিয়াছিল, কিন্তু বৃষ্টির জলে তাহার সর্ব্ব শরীরের বস্ত্রাদি সিক্ত হইয়া গিয়াছিল, কোন অংশ শুষ্ক ছিল না,—তাহার অবস্থা দেখিয়া চিত্তরঞ্জন ভৎর্সনা সূচক স্বরে বলিলেন "ছি ছি, নিরঞ্জন করেছিস্ কি?—"

আচ্ছাদিত উষ্ণীষ-বস্ত্র খুলিতে খুলিতে, ম্লান মুখে একটু সলজ্জ হাস্য ফুটাইয়া নম্রভাবে নিরঞ্জন বলিল "জলটা ধরে গেলেই আস্‌ব মনে করেছিলাম, কিন্তু এখন ছাড়্‌বার লক্ষণ নয় দেখে, বাধ্য হয়ে চলে এলুম।"

মহারাজ তাহার মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি দরকার?"

চিত্তরঞ্জনদেব বলিলেন "গোটাকতক কথার জন্য আমি ওকে ডেকে ছিলাম, কিন্তু এরকম ভাবে ভিজে আস্‌তে বলিনি, এমন নির্ব্বোধ পাগল!—"

ক্ষুব্ধভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া,—চিত্তরঞ্জনদেব ব্যগ্রভাবে বাম হস্তে তাহার মস্তকের কেশরাশি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "চুলগুলা শুদ্ধ অবেলায় ভেজালি ভাই! মাথাটা মুছে ফেল, আঃ জামা দিয়ে দর্ দর্ করে জল ঝরছে!"

আস্তিনের বোতাম খুলিতে খুলিতে নিরঞ্জন মৃদুস্বরে বলিল "জামাটা আগেই ঘামে ভিজে ছিল,—"

ক্ষিপ্রহস্তে চিত্তরঞ্জন তাহার বুকের বোতাম খুলিয়া দিতে লাগিলেন। মহারাজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখুন দেখি মহারাজ এই সব নির্ব্বোধ নিয়ে সংসার চলে? নির্ব্বিচারে শরীরের ওপর অত্যাচার করে চেহারা হয়েছে দেখুন, যেন দুর্ভিক্ষ পীড়িত, দীন! এর সমবয়স্ক সমশ্রেণীর যুবাদের মধ্যে কার আকৃতি এত কৃশ বলুন ত? পরিশ্রম কি কেউ করে না!"

নিরঞ্জন নতশিরে নীরব রহিল। তাহার জামা খোলা হইলে সিক্ত উষ্ণীষ-বস্ত্র নিঙড়াইয়া, নিরঞ্জন মাথা মুছিয়া ফেলিল। পরিহিত বস্ত্রের জল নিঙড়াইয়া, সোজা হইয়া দাঁড়াইতেই চিত্তরঞ্জনদেব নিজের মস্তক হইতে উষ্ণীষ বস্ত্র উন্মোচন করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন "ভিজে কাপড় ছেড়ে এইটে পর—"

ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া নিরঞ্জন অস্ফুট স্বরে বলিল "থাক্ না এখনি বাসায় গিয়ে কাপড় ছাড়্‌ব—"

চিত্তরঞ্জনদেব প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন "না এখনি ছাড়—"

তথাপি নিরঞ্জন ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া চিত্তরঞ্জনদেব ঈষৎ গম্ভীর ভাবে বলিলেন "এটা পর, আমার হুকুম—"

এবার নিরঞ্জন আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না। নিঃশব্দে একপাশে সরিয়া গিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আসিল, চিত্তরঞ্জনদেব নিজের আসনের অন্য প্রান্তে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "এইখানে বস—।"

মহারাজ এতক্ষণ নীরবে তাহার পানে চাহিয়াছিলেন, এইবার কোমল-কৌতুক-স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন "চিত্তরঞ্জন ভাইকে খুব শাসনে রেখেছ!"

স্নেহপূর্ণ নয়নে কনিষ্ঠের পানে চাহিয়া চিত্তরঞ্জনদেব বলিলেন—"বড় অবাধ্য মহারাজ, ওকে একটু শাসন কর্‌বার জন্যেই এখানে নির্জ্জনে ডেকেছিলাম, কিন্তু কেমন সুব্যবস্থায় ভাই আমার, এসে পৌছাল দেখ্‌লেন! একে কি করে শাসন করি বলুন ত?—"

মহারাজ উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন "শাসনের জন্য! ওঃ, অপরাধী তা হলে সুবিচার করেছে,—একেবারে শাসিত হয়েই এসে হাজির! যাক্ অপরাধটা কি শুন্‌তে পাব?—"

"পাবেন বই কি মহারাজ, আপনি বিচার কর্ত্তা, আপনার কাছে গোপনের কিছু নাই—" চিত্তরঞ্জন আম্ বাগ ঘটিত ব্যাপার আদ্যন্ত বর্ণন করিলেন। মহারাজ নীরবে হাস্য স্মিত বদনে, স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে নিরঞ্জনের পানে চাহিয়া রহিলেন, চিত্তরঞ্জনের বক্তব্য সমাপ্ত হইলে হাসিতে হাসিতে মহারাজ বলিলেন "শোন নিরঞ্জন তোমার দাদা আমার ওপর বিচার ভার দিয়াছেন, এবার আমি তোমার কাছে কিছু কৈফিয়ত তলব করি, কি বল?—"

বিনীত হাস্যে নিরঞ্জন বলিল "মহারাজের ইচ্ছা—"

মহারাজ বলিলেন "ইচ্ছা? তবে ত বিপদে ফেল্লে!—" পরক্ষণে হাস্য ত্যাগ করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন "না নিরঞ্জন, রহস্য নয়, যথার্থ বল্‌ছি, তোমার দাদা অসন্তুষ্ট হতে পারেন, কিন্তু আমি তোমার কাজে ভারি সন্তুষ্ট হলেম,—তুমি কর্ত্তব্য পালন করেছ, বেশ করেছ, তোমায় পুরস্কৃত করা আমার উচিত!"

কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাহিয়া নিরঞ্জন নীরবে তাঁহাকে নমস্কার করিল। দাদার হাতে হিসাবের কাগজ তুলিয়া দিয়া আসিয়া অবধি—সে তাঁহার অপ্রসন্ন তিরস্কার আশঙ্কায় এতক্ষণ অত্যন্তই কুণ্ঠিত হইয়াছিল, এইবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। অবশ্য চিত্তরঞ্জনের স্বোপার্জ্জিত সঞ্চয় যাহা আছে, তাহাতে কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া তিনি স্বচ্ছন্দ-আরামে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিতে পারেন, তাহা সকলেই জানে—কিন্তু সেই জন্যই নিরঞ্জনের ভয়, পাছে তিনি তাহার ক্ষুদ্র শক্তির সেবা সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেন!

মহারাজের কথা শুনিয়া চিত্তরঞ্জনদেব ঈষৎ ক্ষুব্ধ ভাবে বলিলেন "না মহারাজ, ঐ অবিবেচক বালককে আর প্রশ্রয় দেবেন না, আপনি শুন্‌লে আশ্চর্য্য হবেন, ওর দশবৎসরের সঞ্চয়ের অঙ্কে—আজ মাত্র দশদিনের পারিশ্রমিক ছাড়া অতিরিক্ত একটি পয়সা অবশিষ্ট নাই!—"

মহারাজ ক্ষণকাল স্তব্ধ রহিলেন, তারপর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "সংসারিকতা হিসাবে এটা খুবই অবিবেচনার কাজ হয়েছে স্বীকার করি, কিন্তু আমার মত অসংসারীর পক্ষে সৎকার্য্যের জন্য সঞ্চয়ের অঙ্ক শূন্য করা সুবিবেচনার কাজ,—আনন্দ সংবাদ—"

চিত্তরঞ্জন বলিলেন "মহারাজ, এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার মত দ্বন্দ্ব নাই, কিন্তু আজ বাদ কাল যাকে সংসারী হয়ে পত্নী-পুত্রের লালন-পালন ভার গ্রহণ করতে হবে, তার পক্ষে এরূপভাবে সর্ব্বস্ব ব্যয় করে রিক্তহস্ত নিঃস্ব হওয়া—"

বাধা দিয়া মহারাজ শান্তভাবে বলিলেন "নিঃস্ব কাকে বল চিত্তরঞ্জন? যার উপার্জ্জন করবার ক্ষমতা আছে, সে শাকান্ন ভোজন করে তৃণ শয্যায় শুয়ে দিন কাটালেও—নিঃস্ব নয়। অকর্ম্মণ্য ধনী, বিলাসী, বাসনাসক্তের দলকে নিঃস্ব বলে গালি দাও—শোভনীয় হবে, কিন্তু পরিশ্রমী কর্ম্মঠকে ওকথা বোল না।"

চিত্তরঞ্জন বলিলেন "মহারাজ নিষ্প্রয়োজনীয় তর্ক থাক, নিরঞ্জনের সমস্ত দুঃসাহসিকতা আমি ন্যায্য বলে স্বীকার করছি, এখন আপনি শুধু অনুগ্রহ করে একটি বিষয়ে ওকে প্রতিশ্রুত করান, আমি নিশ্চিন্ত হই—"

সহসা উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে ভ্রাতার মুখপানে চাহিয়া নিরঞ্জন ঈষৎ উদ্বিগ্ন চঞ্চল হইয়া উঠিল, একটা কিছু কথা বলিবার জন্য সে মনে মনে অসহিষ্ণু হইয়াছিল বোধহয়,—কিন্তু কোন কথা বলিতে পারিল না, ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া নীরবে অধোমুখ হইল। তাহার সে চাঞ্চল্য কেহ লক্ষ্য করিলেন না, চিত্তরঞ্জনদেব আপন মনেই বলিতে লাগিলেন—"ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন, নির্ম্মল-মঠে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হবে, তার আগেই এখানকার কাজ সব শেষ হয়ে যাবে,—মহীশূরে নিরঞ্জন নূতন কাজ পেয়েছে, কিন্তু আপাততঃ তিনমাস সে কাজ বন্ধ থাকবে। আমি নিরঞ্জনকে বল্‌ছি যে এই সময় দেশে গিয়ে দিনকতক থাক্‌বে চল, কিন্তু নিরঞ্জন তাতে সম্মত নয়, ও বল্‌লে গান্ধারের স্থাপত্য শিল্প এই ছুটিতে দেখে আস্‌ব এখন দেশে যাব না—"

নিরঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইল, সবিনয়ে বলিল "গান্ধারের স্থাপত্য শিল্পে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে, জীবনে যে সব শিক্ষার সুযোগ হয়নি, এই অবকাশে যদি—"

মহারাজ বলিলেন "উত্তম প্রস্তাব, চিত্তরঞ্জন এতে আপত্তি করছ কেন?—"

চিত্তরঞ্জন উত্তর দিলেন "মহারাজ আমার শারীরিক অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হয়ে আস্‌ছে, এই সময় নিরঞ্জনের বিবাহকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হয়ে গেলে আমি নিশ্চিন্ত হই,—গান্ধারে স্থাপত্য শিল্প দেখ্‌তে যাওয়ায় আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন ? এর পর মহীশূর থেকে ফিরে এসে—"

নিরঞ্জন অসহিষ্ণু ভাবে বলিল "ভবিষ্যতে সুযোগ হবে কি না তার কোনই নিশ্চয়তা নাই—কিন্তু বর্ত্তমানে—"

মহারাজ সাগ্রহে বলিলেন "সমীচীন মন্তব্য !—না চিত্তরঞ্জন আমি সুবিধার খাতিরে তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলুম না, বরং তোমায় অনুরোধ করছি, তুমি প্রসন্নচিত্তে নিরঞ্জনকে অনুমতি দাও। উদ্যমশীল শিক্ষার্থীর—প্রতিভা বিকাশের পথে অন্তরায় হোয়ো না, সর্ব্বান্তঃকরণে উৎসাহ দাও ! তুমি বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ব্যক্তি—স্মরণ রেখো বিবাহের পর সংসারী যুবকের মস্তিষ্ক নানাচিন্তায় পূর্ণ হয়, সে মস্তিষ্কে উন্নতি বিষয়ক চিন্তার স্থান অল্প।—সে ব্যক্তির পক্ষে উন্নতির প্রতিকূল-বিঘ্ন অনেক !—"

ক্ষুণ্ণভাবে চিত্তরঞ্জন বলিলেন "সব জানি মহারাজ, মাতা জীবিত থাক্‌লে চিন্তার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু এখন আমার শরীর ভগ্ন হয়েছে, পুত্র দেবরঞ্জন বালক,—এ অবস্থায় কতদিন আর নিরঞ্জনকে অবিবাহিত রাখা উচিত ?—নচেৎ, আমারও ইচ্ছা ছিল না যে নিরঞ্জনের কৃশ-ক্ষীণ আকৃতি যথাযোগ্য পুষ্ট পরিণত না হলে ওর বিবাহ দিই, কিন্তু কি করি, নিরুপায়, সকল দিক বজায় রাখা চাই মহারাজ !"

"সে ত নিশ্চয়"—মহারাজ উভয় হস্ত ধৃত যষ্টির উপর চিবুক স্থাপন করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন "সকল দিক বজায় রাখ্‌তে হবে বৈকি।"

নিরঞ্জন নিঃশব্দে ক্ষীণ হাস্য করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। মহারাজ কয় মুহূর্ত্ত নীরবে চিন্তা করিয়া বলিলেন, "বেশ, তবে এক কাজ কর, যত শীঘ্র পার দেশে গিয়ে বিবাহকার্য্য সমাধা করিয়ে ওকে ছেড়ে দাও।" নিরঞ্জনকে লক্ষ্য করিয়া সহাস্যে বলিলেন—শোন হে ভাস্কর, নববধূ নিয়ে আমোদ উৎসবের চিন্তা এখন মনে স্থান দিয়ো না—নিজের কাজে একাগ্র মনোযোগ রেখো, বিবাহ করে তুমি গান্ধারে চলে যাও, তোমার উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য সুন্দর-মঠের কোষাগার থেকে সমুদয় পাথেয় ব্যয় দেওয়া হবে, কেমন এবার ত সম্মত আছ ?"

চিত্তরঞ্জন চমৎকৃত !—নিরঞ্জন স্তব্ধ ! মহারাজের সরস পরিহাস রসিকতা তাহার কানে কর্কশ পরিতাপের শোকধ্বনির মত বোধ হইল !—তাহার ইচ্ছা হইল নিজের মস্তিষ্ক সবলে উৎপাটিত করিয়া মহারাজের পাদপ্রান্তে বিসর্জ্জন দিয়া—অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা, সহ্যসীমার আয়ত্তে ফিরাইয়া আনে, হৃদয়ের ভার লাঘব করে ! কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না, তাহার মুখে শুধু তপ্ত বিষাদের শুষ্ক বিকৃত ভাব ফুটিয়া উঠিল, নত দৃষ্টিতে চাহিয়া নিরঞ্জন মুহ্যমান ভাবে নির্ব্বাক রহিল !

তাহাকে মৌন দেখিয়া মহারাজ বলিলেন "আমি এই মুহূর্ত্তে তোমার কাছে উত্তর চাইছি না,—এখনো ঢের সময় আছে, তুমি ভাল করে ভেবে দেখো, তবে আমার বিশ্বাস এরকম ব্যবস্থায় তোমার বিশেষ কিছু কার্য্যহানি হবে না। অল্প বয়সে তুমি যে রকম কার্য্যকুশলতা, ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছ, তার সম্বন্ধে মৌখিক প্রশংসায় তোমার ওপর অবিচার করব না, তবে এটা আমি বেশ জানি তোমার স্থান সাধারণ যুবকদের উর্দ্ধে ! আমি চাই, তোমার সে ক্ষমতার সদ্ব্যবহার হোক, তোমার উন্নতির ব্যাঘাত যেন কখনো কোন কারণে না হয়,—এখন তুমি নিজে বুঝে দেখো—"

নিরঞ্জন চুপ করিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ রীতিমত ঘনাইয়া আসিল, কিন্তু তখনও বর্ষণ বেগ নিবৃত্ত হয় নাই। মহারাজের ভৃত্য আলোক ও ছত্র লইয়া তাঁহাকে খুঁজিতে আসিয়াছিল,—দূর

হইতে তাঁহাদের দেখিতে পাইয়া দ্রুত সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, অভিবাদন করিয়া বলিল "মহারাজ আমি ছাতা নিয়ে আপনাকে নানাস্থানে খুঁজেছি, সেইজন্য আস্‌তে দেরী হ'ল।"

মহারাজ সহাস্যে বলিলেন "তা হোক বাপু, তার জন্যে জবাবদিহি কর্‌তে হবে না, আমার কোন অসুবিধা হয় নাই।"

তিনি গাত্রোত্থানের উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া চিত্তরঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মহারাজ ভৃত্যের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "ছাতা কি মোটে একটি এনেছ?—"

ভৃত্য বলিল "আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার ছাতা—"

মহারাজ বলিলেন "আচ্ছা আগে এই ভদ্রলোকদের বাসায় পৌঁছে দিয়ে এস,—আমি পরে যাব।"

চিত্তরঞ্জন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "সে কি মহারাজ, ও আদেশ ক্ষমা করুন,—আমরা—"

ভৃত্য সঙ্কুচিত ভাবে বলিল "আমার ছাতাটাও আছে, যদি অনুমতি করেন—"

মহারাজ সাগ্রহে বলিলেন "বেশত তাহলে একটা ছাতা খুলে তুমি চিত্তরঞ্জনকে নিয়ে চল, আর নিরঞ্জন তুমি আমার ছাতার নীচে এস—"

এই সামান্য আহ্বানটুকু সহসা নিরঞ্জনের ক্লিষ্ট-বেদনাতুর হৃন্মর্ম্ম মধ্যে—আকুল পুলকোচ্ছ্বাসের গভীর আনন্দ-তানে ঝঙ্কারিত হইল, হর্ষ-বিস্ময়ের যুগপৎ সংঘাতে উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতায় আত্মবিস্মৃত নিরঞ্জন সহসা দীন করুণ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "আপনার ছত্র তলে মহারাজ?—"

শান্ত দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া মহারাজ বলিলেন "হাঁ তোমার স্থান হবে এস—"

প্রভুর ইঙ্গিতে ছত্র খুলিয়া চিত্তরঞ্জনের মস্তকে ধরিয়া ভৃত্য আলোক হস্তে অগ্রসর হইল,—নিরঞ্জন মহারাজের মস্তকে ছত্র ধরিয়া চলিল। তাহার চিন্তাক্রান্ত বিমর্ষ মুখমণ্ডলে, একটা স্নিগ্ধ সান্ত্বনার শান্তোজ্জ্বল জ্যোতিঃ—ধীরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। চিত্তরঞ্জন ভ্রাতার মুখ পানে চাহিয়া একটু বিস্মিত হইলেন, কিছু বলিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—ঃ*ঃ—

রজনীর দ্বিযাম উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে গ্রীষ্ম-গাম্ভীর্য্যে অবসন্ন—নৈদাঘ-প্রকৃতি যেন স্তব্ধ উৎকণ্ঠিত ভাবে সময়ক্ষেপ করিতেছে, আকাশে একটিও নক্ষত্র নাই।

গৃহ কোণে একটি ক্ষুদ্র দীপ মৃদু আলোক বিতরণ করিতেছিল। ভাস্কর-নিবাসে শয়ন কক্ষের মুক্ত বাতায়ন সমক্ষে যন্ত্রের বাক্সর উপর বসিয়া নিরঞ্জন মাথায় হাত দিয়া নীরবে চিন্তামগ্ন। পার্শ্বে শয্যার উপর ফুল্লেন্দীবর-বিনিন্দিত সুন্দর সুকুমার বালক দেবরঞ্জন নিদ্রা যাইতেছিল, ঘরে আর কেহ ছিল না। চিত্তরঞ্জন দেব পাশের কক্ষে একাকী থাকিতেন।—তাহার ভৃত্য অদূরে বারেণ্ডার প্রান্তে শয়ন করিত।

ওদিকের ঘরে, অন্যান্য ভাস্করগণ সকলে সমবেত হইয়া তাস খেলিতেছে ও গল্প করিতেছে। রুগ্ন চিত্তরঞ্জন দেবের নিদ্রার ব্যাঘাত হইবার ভয়ে তাহারা অপেক্ষাকৃত সংযত ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, তবুও মাঝে মাঝে তাহাদের উৎসাহ-উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে।—আজ মঠের সমস্ত কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে, ভাস্করগণ

সকলেই যথাযোগ্য পারিশ্রমিক ও পুরস্কার লাভ করিয়াছে, আগামী পূর্ণিমার দিন মঠে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার উৎসব অন্তে ভাস্করগণ সকলেই নিজালয়ে ফিরিবে। এ দুই দিন তাহাদের বিশ্রাম, সুতরাং গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত আজ তাহারা তাস খেলার আমোদে মত্ত হইয়াছে।

আজ বৈকালে—মহারাজ নিরঞ্জনকে ডাকিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট পারিশ্রমিক, পুরস্কার ও গাঙ্গুর যাত্রার অগ্রিম পাথেয় সমস্ত মিটাইয়া দিয়াছেন। তাহার ভবিষ্যত উন্নতির জন্য অনেক উৎসাহ সূচক উপদেশ দিয়া—সর্ব্বশেষে সাদরে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়াছেন "দাদার যখন একান্ত ইচ্ছা, তখন বিবাহটা স্থগিত রাখা আর উচিত নয়,—দ্বিধা-আপত্তি কোর না, দেশে গিয়ে বিবাহ কর, তুমি প্রতিভাশালী যুবক—তোমার কোন ভাবনা নাই। তুমি স্বয়ং 'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্,'—বিবাহের সামান্য গোলযোগে তোমার আর কি অসুবিধা হবে?"

বেদনার হাসি হাসিয়া নিরঞ্জন নীরবে চলিয়া আসিয়াছে। সত্যই তাহার কোন কিছুতে অসুবিধা নাই,—কিন্তু পাছে নিজের অক্ষমতার দৈন্যে সে কাহারও সুবিধার হন্তারক হয়, এই তাহার বড় ভয়, এই ভয়ের জন্যই সে সাংসারিক চিন্তার দায়িত্ব হইতে নিজেকে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়া,—নিজের স্বস্তি চায়, অপরের স্বাচ্ছন্দ্য প্রার্থনা করে!—সে যে সংসারের পক্ষে একান্তই অযোগ্য! তাহার দ্বারা যে সংসারের কাহারও কোন উপকার আশা নাই!

কিন্তু,—কেন অযোগ্য, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। হয়ত যোগ্যতার শক্তি দিয়া ভগবান তাহাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু নিজের মূঢ়তায় সে তাহাতে আজ বঞ্চিত হইয়াছে!—হউক তাহাতে কিছু আক্ষেপ নাই, কিন্তু সত্য বঞ্চনাকে,—কেন আর প্রবঞ্চনার কৌশলে ঢাকিয়া, জবরদস্তি করিয়া এ দুর্ভোগের আয়োজন?—ইহাকে পাশ কাটাইয়া গেলেই ভাল হয় না! ভাবিতে ভাবিতে সহসা, সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া নিরঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইল, মুক্ত বাতায়ন পথে বহিঃপ্রকৃতির পানে চাহিয়া নিঃশব্দে ঈষৎ হাসিল,—তাহার উদ্ভ্রান্ত জীবনের এই যে ভ্রান্ত পূজা উৎসব,—ইহাও বুঝি ঐ স্তব্ধ-অন্ধকারময়ী গভীর নিশীথিনীর মত—বিরাট স্তব্ধ, গভীর মৌন,—কিন্তু দিগন্তবিস্তারি স্থির অচঞ্চল! ইহার মধ্যে দেখিবার কিছু নাই, দেখাইবার কিছু নাই,—আছে শুধু অপরিমেয় দুর্নিরীক্ষ্যের অগাধ,—অসীমতা!—নিষ্ফলতার ক্ষোভ, আকাঙ্খার বেদনা; সবই ইহার সান্নিধ্য হইতে সুদূরে অবস্থান করিতেছে, ঈর্ষা বিদ্বেষের কোন কলঙ্ক গ্লানি ইহার কোন অংশ কলুষিত মলিন করে নাই, তবু ইহা এক বিষম বৈষম্য,—বিশেষণ শাস্ত্র বহির্ভূত--অদ্ভুত বিশেষ্য!

নিরঞ্জন ফিরিয়া দাঁড়াইল, ঐ বিরাট অন্ধকারের অসাড় নিস্পন্দতার দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া নিরর্থক প্রহর গণিয়া লাভ কি?—সমস্ত জগত তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দ-কৌতুকে বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছে, দৃষ্টি সম্মুখে জীবনের কর্ত্তব্য রক্তচক্ষে ভ্রূভঙ্গী করিয়া শাসাইতেছে,—তবুও ভ্রান্ত নির্ব্বোধ সে, নিজের ক্লান্ত দৌর্ব্বল্যকে প্রাণাকুল আগ্রহে অন্তরের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া থাকিবে?—কিসের এ মমতা, কেন এ খিন্নতা?—অনায়াসলভ্য সুখের পথে জগত জোড়া সুবোধের দল, উদ্দাম স্বাচ্ছন্দ্যের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে, শুধু একা ক্ষীণজীবি দীন দুর্ব্বল সে, মলিন মুখে অন্যদিকে চাহিয়া থাকে কেন? তাহার কাজ কি জগতে কিছুই নাই? আছে!--যথেষ্ঠ!--নিরঞ্জনের ঘূর্ণমান মস্তিষ্ক মধ্যে তীব্র উত্তেজনা হুঙ্কার করিয়া উঠিল! দ্রুত পদে কক্ষ মধ্যে সে পাদচরণা আরম্ভ করিল, উত্তেজিত হৃদ্‌পিণ্ড সশব্দে বক্ষের মধ্যে ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া লাফাইতে লাগিল,

ললাটের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল, উষ্ণ তাড়িত স্রোত—খরবেগে সর্ব্বশরীরে বহিতে লাগিল, নিরঞ্জন অধীর হইয়া উঠিল।

কতক্ষণ সেই অবস্থায় কাটিল স্মরণ নাই, সহসা দেবরঞ্জন পাশ ফিরিয়া শুইয়া নিদ্রা-জড়িত কণ্ঠে ডাকিল—"কাকা—"

চমকিয়া নিরঞ্জন স্থির হইয়া দাঁড়াইল, সবলে আত্মদমন করিয়া বালকের নিকট আসিয়া, তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া স্নেহময় কণ্ঠে কহিল "কেন বাবা ?—"

বালক বলিল "তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল—"

ঘরেই কুঁজায় জল ছিল, গ্লাসে ঢালিয়া আনিয়া নিরঞ্জন বালকের মুখে ধরিল। জল পানান্তে বালক বলিল "তুমি এখনো শোও'নি ?"

নিরঞ্জন বলিল "না, এইবার শোব. ঘরে আলো জ্বল্‌ছে, তোমার বুঝি কষ্ট হচ্ছে দেবু ?—"

"না কষ্ট কিছুই হয় নি, তুমি পড়্‌বে ত পড় না—" বালক গায়ের কাপড়টি টানিয়া লইয়া, পুনশ্চ নিদ্রার জন্য শুইয়া পড়িল।

পড়ার কথা আজ নিরঞ্জনের স্মরণ ছিল না, বালকের কথায় স্মরণ হইল। পুস্তকাধারের উপর হইতে যোগবাশিষ্ট রামায়ণখানি টানিয়া লইয়া, আলোকটা সরাইয়া আনিয়া শয্যা-শিয়রে রাখিল, বালকের পাশে শুইয়া পড়িয়া, পুস্তকের পাতা উল্টাইতে লাগিল।

কিন্তু মনোমত স্থান বাছিয়া লইয়া, পড়া আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই—তৈলহীন প্রদীপের শূন্য গর্ভে সলিতা জ্বলিয়া উঠিল, দপ্‌ দপ্‌ করিয়া প্রদীপটা নিভিয়া গেল। বিষাদের নিঃশ্বাস ফেলিয়া—আবার নিঃশব্দে হাসিয়া নিরঞ্জন পুস্তক বন্ধ করিল!—এমনই হতভাগ্য নির্ব্বোধ সে! যে শক্তি অবলম্বনে জীবনকে গড়িয়া তুলিতে চায়, সে শক্তির আয়ু কতটুকু—তাহা চাহিয়াও দেখে না!—ঝোঁকের মাথায় অন্ধ হইয়া চলিতে চায়,—তাই চলা হয় না, কিন্তু অন্ধকারে পথ হারাইয়া ফেলার যন্ত্রণাটুকু, পরিপূর্ণ শক্তিতে—অব্যাহত ভাবে অনুভব করিয়া লইতে বাধ্য হয়, এমনই তাহার অদৃষ্ট!

সহসা,—মুষ্টিবদ্ধ করিয়া নিরঞ্জন সজোরে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল,—হউক, অদৃষ্ট, অদৃষ্টেই থাকুন, কিন্তু যাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট,—তাহাকে নিজের জীবনের ভীরু-দৌর্ব্বল্যে কুণ্ঠা-কাতর হইয়া, অপমান করিতে পারিবে না, অবজ্ঞা করিতে পারিবে না! এই ভ্রান্তি উন্মত্ততা কাল্পনিক হউক,—কিন্তু ইহাই তাহার সত্য; এই ভ্রান্তিই তাহার পক্ষে সহজ, এই উন্মত্ততাই তাহার নিকট শ্রেয়স্কর!

চিন্তার উত্তেজনায় নিরঞ্জনের মনের মধ্যে সত্যই মত্ততার নেশা ঘনাইয়া উঠিল,—উদ্ভ্রান্তের মত সে লম্ফ দিয়া শয্যা ত্যাগ করিল, আকস্মিক শব্দে নিদ্রাচ্ছন্ন দেবরঞ্জন চমকিয়া ভীতভাবে অস্ফুট শব্দ করিল,—নিরঞ্জন তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না, উত্তেজিত ভাবে অন্ধকার কক্ষ মধ্যে সবেগে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। বালক নীরবে ঘুমাইয়া অচেতন হইল।

মানুষের স্থূল বুদ্ধি স্থূলত্ব-ই বুঝে ভাল, তাহার অন্তরের এ স্থূলাতীত দুঃখ-দ্বন্দ্ব কেমন করিয়া অনুধাবন করিবে? ভোগাসক্ত, বাসনান্ধ, মানবের সঙ্কীর্ণ অনুভূতির সীমায়—তাহার অন্তরের এই দুর্জ্ঞেয় রহস্যাচ্ছন্ন একত্তাগ্নিতা—কোন মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইবে, তাহা সে জানে,—জানে বলিয়াই সে মানুষের হৃদয়বত্তা, শ্রদ্ধা করিতে পারে না—মানুষের সহানুভূতি-লাভ চেষ্টাকে ঘৃণা করে! মানুষ ক্ষণস্থায়ী হৃদয়াবেগের আতিশয্যে আজ যাহাকে ন্যায্য, গ্রাহ্য

বলিয়া সমস্ত প্রাণের সহিত মানিয়া লয়,—কাল, অস্বস্তি অসুবিধার দায়ে ঠেকিয়া—স্বচ্ছন্দে তাহাকে অবিশ্বাস করিয়া—অবজ্ঞার তুড়িতে উড়াইয়া দেয়! আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতার জন্য, আত্মশ্লাঘার অনুরোধে, তাহারা মনের সত্য মুখে আনিতে ভয় পায়, তাহারা এমনই প্রখর বুদ্ধিমান, এতদূর কঠিন সত্যনিষ্ঠ!— মানুষের তীক্ষ্ণ বক্র বুদ্ধিকে সে কেমন করিয়া বুঝাইবে—জগতের জড় স্থূল ঘটনা সমষ্টির ভিতর দিয়া—অলক্ষ্যে, কত গূঢ় চেতনায়, সূক্ষ্ম চিন্তাধারা বহিয়া, —কোন্ পথে কোন্ স্রোতে চলে, কোন্ পরিণতির মধ্যে সার্থকতা লাভ করিতে চায়! লঘুচেতা, মানব কৌতুক-প্রিয়তাই—সকল আরামের সারসম্পদ বলিয়া গ্রাহ্য করে, তাহাদের উপহাস-পটুতার জয় হউক! কিন্তু তাহাদের মুখ চাহিয়া—নিরঞ্জন নিজের সাধনার মধ্যে অবিশ্বাসী, অপরাধী হইতে পারিবে না! তাহার ভ্রান্ত একজ্ঞায়িতা,—আর যাহাই হউক, কিন্তু সে একনিষ্ঠ! তাহার নিকট নিরঞ্জন চিরদিন অকপট সাহসে,—নির্ভীক হৃদয়ে বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে, নিজের তৃপ্তির জন্য, আত্মবিস্মৃতি খুঁজিতে, সাংসারিক ভোগাসক্তির চরণে, জঘন্য ভাবে আত্মবলিদান করিতে পারিবে না, কখনই না,—কিছুতেই না!

সহসা বাহিরে কে যেন ব্যস্তভাবে চীৎকার করিয়া কাহাকে ডাকিল, চিন্তা-বিক্ষিপ্ত-চেতা নিরঞ্জন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, উৎকর্ণ হইয়া শুনিল—একজন ভাস্কর, চিত্তরঞ্জনদেবের ভৃত্যকে ব্যস্ত-ত্রস্ত হইয়া ডাকিয়া বলিতেছে "শীঘ্রি এসো—"

অনিশ্চিত উদ্বেগে নিরঞ্জন শঙ্কিত হইয়া উঠিল, কক্ষদ্বার খুলিয়া দ্রুতপদে বাহিরে আসিল, শুনিল—চিত্তরঞ্জনদেব গৃহাভ্যন্তরে যন্ত্রণা-ব্যঞ্জক কাতরোক্তি করিতেছেন, তাঁহার ঘর হইতেই উক্ত ভাস্কর তাঁহার ভৃত্যকে ডাকিতেছে!

রুদ্ধশ্বাসে নিরঞ্জন আতঙ্ক-ব্যাকুল হৃদয়ে চিত্তরঞ্জনদেবের কক্ষে ঢুকিল, তাহাকে দেখিয়া ভাস্কর ব্যগ্রভাবে বলিল "এই যে, আপনি এসেছেন—ঘুমন্ত অবস্থায় এঁর বুকে কোন রকম ব্যাথা ধরেছে, না কি বুঝ্‌তে পারছি না,—ডান হাতখানা বুকের ওপর চেপে ধরে ইনি ঘুমের ঘোরেই গোঙাচ্ছিলেন, খেলা রেখে আমি পাশের ঘরে ঘুমাতে এসেছিলাম, শব্দ পেয়ে এ-ঘরে এলুম,—মশারি তুলে ডাকাডাকি করছি সাড়া পচ্ছিনে—দেখুন দেখি, ব্যাপার কি—"

ভাস্কর, হাতের আলোকটা তুলিয়া ধরিল, চিত্তরঞ্জনের যন্ত্রণা-বিকৃত নিষ্প্রভ মলিন মুখের পানে চাহিয়া নিরঞ্জন শিহরিয়া উঠিল,—ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহার গলবন্ধনী খুলিয়া দিয়া, অসাড় দক্ষিণ হস্তটা টানিয়া বুকের উপর হইতে সরাইয়া দিল, চিত্তরঞ্জনের কাতরোক্তি নিবৃত্তি হইল, ঘন-কম্পিত নিঃশ্বাসে হাঁপাইতে হাঁপাইতে দৃষ্টি-উন্মীলন করিয়া জড়িত স্বরে তিনি ডাকিলেন "রামশরণ—রামশরণ—"

সুপ্তোত্থিত ভৃত্য চক্ষু রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিল, চিত্তরঞ্জনের অবস্থা দেখিয়া—প্রত্যুৎপন্ন ভৃত্য তৎক্ষণাৎ উপস্থিত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া, তাঁহাকে পাশ ফিরাইয়া শয়ন করাইল, মুখে জলের ঝাপ্টা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। ক্রমশঃ চিত্তরঞ্জন সুস্থ হইয়া উঠিলেন। অভিজ্ঞ ভৃত্য বলিল গলার বাঁধন না খুলিয়া কর্ত্তা শয়ন করিয়াছিলেন, নিদ্রাঘোরে হৃৎপিণ্ডের উপর হস্তভার চাপা পড়ায় ঐরূপ যন্ত্রণা হইতেছিল—ইহা অন্য কিছু নহে!

ভৃত্যের বাক্য সমর্থন করিয়া চিত্তরঞ্জনদেব বলিলেন "আমারই দোষ, শুয়ে একখানা বই পড়্‌ছিলাম, বড় ঘুম পাওয়ায় গলার বাঁধনটা না খুলেই অমনি শুয়ে পড়ি, তাই এ বিভ্রাট!—"

ভাস্করকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন "বড় উপকার করেছেন, ভাগ্যে আপনি জেগেছিলেন, না-হলে শেষ পর্য্যন্ত হয় ত যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে পড়্‌তাম.........!

নিরঞ্জনের হৃদয়াভ্যন্তরে শত বৃশ্চিক দংশন করিল! সেও ত জাগিয়াছিল, কিন্তু সজ্ঞানে নহে,—অজ্ঞানের মধ্যে, স্বপ্নে! তাই অকর্ম্মণ্য হতভাগ্যের কর্ণে,—এই অতি প্রয়োজনীয় অভাবের কাতরোক্তি পৌঁছায় নাই! হয় ত এই যন্ত্রণা-কাতর ধ্বনি তাহারও কক্ষে গিয়াছিল, হয় ত কোন সচেতন প্রাণী সেখানে থাকিলে, সেও ইহা শুনিতে পাইত! কিন্তু কেহই ছিল না, কাজেই কেহই উত্তর দেয় নাই! কেহই সাহায্য করিতে আসে নাই! অভাবের আহ্বান নিষ্ফল-ব্যর্থতায় প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে, স্বার্থ-ব্যস্ত মানব-হৃদয়, তাহার করুণা ভিক্ষায় কর্ণপাত করে নাই!

জ্বলন্ত-গ্লানি অনুতাপে নিরঞ্জনের অন্তর দগ্ধ-বিদগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল, নিজের অপদার্থতা, অকর্ম্মণ্যতার সুস্পষ্ট পরিচয় আজ এক মুহূর্ত্তে তাহার যন্ত্রণাহত চিত্তের উপর তীব্র ঘৃণা-ধিক্কারে—রূঢ় দীপ্তিতে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল, নিরঞ্জন মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দৌর্ব্বল্য-পীড়িত হৃদ্‌ক্রিয়ার স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য ও সুনিদ্রার জন্য ভৃত্য, প্রভুকে নির্দ্দেশ মত ঔষধ সেবন করাইল; রুগ্ন প্রভুর সঙ্গে থাকিয়া অভ্যাসবশে সেবা শুশ্রূষা ও আকস্মিক দুর্ঘটনার উপযুক্ত চিকিৎসায় সে রীতিমত সুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল; বিপদে মাথা ঠিক রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালনে তাহার অসাধারণ ক্ষমতা,—সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র গুছান ছিল, ভৃত্য নির্ব্বিবাদে নিজের কাজ সমাপ্ত করিয়া স্তব্ধ হতবুদ্ধিভাবে দণ্ডায়মান নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে - আশ্বাসের স্বরে বলিল কোন চিন্তা করবেন না, আরও দুইবার অসাবধানতার জন্য প্রভু এইরূপ অনর্থ ঘটাইয়াছিলেন, কিন্তু আমি নিকটে ছিলাম যন্ত্রণার উপক্রমেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়, সুতরাং প্রভুকে বিশেষ কিছু কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই,—তদবধি আমি সতর্ক হইয়া থাকি······ ইত্যাদি।

নিরঞ্জনের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; চিত্তরঞ্জন তাহাদের নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিতে যাইবার অনুরোধ করিলেন, ভাস্কর চলিয়া গেল, কিন্তু নিরঞ্জন নড়িল না।

চিত্তরঞ্জনদেব ভৃত্যকে বলিলেন "রামশরণ, তুমি আলো দেখিয়ে নিরঞ্জনকে ঘরে পৌঁছে দাও, নিজেও শোওগে,—আমার আর কিছু দরকার নেই, আমি এবার ঘুমাব—"

রামশরণ প্রস্থানোদ্যত হইয়া নিরঞ্জনের পানে চাহিয়া বলিল "আসুন"

নিরঞ্জন রুদ্ধস্বরে বলিল "তুমি শোওগে রামশরণ, আমি একটু পরে যাব—"

চিত্তরঞ্জন বাধা দিতে উদ্যত হইয়া থামিলেন। নিরঞ্জনের মুখপানে চাহিয়া একটু বিশেষ রকম বিস্ময়বোধ করিলেন,—ভাবিলেন অনভিজ্ঞ নিরঞ্জন তাহার অসুস্থতা দেখিয়া বুঝি অত্যন্ত ভীত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে!—তাহাকে কিছু সাহস ও সান্ত্বনা দিবার জন্য অবসর সংগ্রহের অভিপ্রায়ে বলিলেন "ভাল, রামশরণ তুমি যাও।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। অকস্মাৎ নিরঞ্জন,—চিত্তরঞ্জনের শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া ব্যাকুলভাবে তাঁহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিল "দাদা—"

উদ্বিগ্ন হইয়া চিত্তরঞ্জন বলিলেন "কেন, কেন নিরঞ্জন?—"

"আমার একটি প্রার্থনা আছে—"

"কি বল না—"

"আমার বিবাহ দেবেন না,—তার ফল ভাল হবে না।"

চিত্তরঞ্জন মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ রহিলেন, তারপর ক্ষীণভাবে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তুমি কি আমার শরীরের অবস্থা দেখে ভয় পেয়েছ ? ভয় কি ভাই, এ ত আনন্দের কথা ! তোমাদের রেখে যাওয়া আমার সৌভাগ্য, এতে দুঃখ কর্‌বার কিছু নাই, এ জীর্ণ দেহ পৃথিবীর কাজে ঢের খেটেছে, আর এবার বিশ্রামই মঙ্গল—"

অধীর ভাবে নিরঞ্জন বলিল "সে জন্য নয়, অন্য কারণ আছে, কিন্তু আমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বেন না, আমি কোন উত্তর দিতে পার্‌ব না, ক্ষমা কর্‌বেন, শুধু এইটুকু অনুরোধ আমার রাখ্‌বেন—আমার বিবাহ প্রস্তাব আর তুল্‌বেন না—"

নিরঞ্জন উঠিবার চেষ্টা করিল, চিত্তরঞ্জন তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন, স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন "তোমার নিষেধ সত্ত্বেও প্রশ্ন কর্‌ছি, আমি অল্পে সন্তুষ্ট হতে পারি না ! তোমার মত সংসার অনভিজ্ঞ বালকের ক্ষণিক-উত্তেজনা-সৃষ্ট মত বিশেষের উপর নির্ভর করে আমি অযথা মত পরিবর্ত্তন কর্‌তে পার্‌ব না,—তোমার আপত্তি কি খুলে বল।"

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া অনুতপ্ত-বিকল কণ্ঠে নিরঞ্জন বলিল "আমার আপত্তি অনেক, প্রধান আপত্তি—আমি সংসারের অযোগ্য ; আপনি বিশ্বাস করুন, আমি একবর্ণও অতিরঞ্জিত করে বল্‌ছি না,—আপনার ঐ নিরক্ষর মূর্খ সামান্য ভৃত্যটার, সাংসারিকতার উপযোগী যেটুকু শক্তি আছে, আমার আজ তাও নাই ! সংসারের পক্ষে,—সাংসারিকতা সম্বন্ধে, আমি নির্ব্বোধ, একান্তই অকর্ম্মণ্য, শক্তিহীন, দুর্ব্বল,—আমার বাচালতা মার্জ্জনা করুন, কিন্তু ঈশ্বরের শপথ, মুক্ত কণ্ঠে বল্‌ছি বিবাহিত জীবন শুধু আমারই যন্ত্রণার কারণ হবে না, যাকে বিবাহ কর্‌ব সেই নিরপরাধা নারীও আমার জন্য চিরদিন অসুখী হয়ে থাক্‌বে, সাধ করে এ মনস্তাপ বরণ করে নিতে আমি অক্ষম—আমায় ক্ষমা করুন।"

চিত্তরঞ্জনদেব মনের উদ্বেগ গোপন করিয়া, শান্ত স্নেহময় কণ্ঠে বলিলেন, "নিরঞ্জন তুমি বালক, তাই নিজেকে অযোগ্য ভেবে কুণ্ঠিত হয়েছ, সদ্যোজাত শিশু একদিনে পিতা পিতামহ হবার শক্তি নিয়ে পৃথিবীতে আসে না—কিন্তু কালক্রমে সে সকল শক্তির অধিকারী হয়ে উঠে—"

অধীর ব্যাকুলতায় নিরঞ্জন বলিয়া উঠিল, "কিন্তু যে চিররুগ্ন দুষ্টরোগগ্রস্ত বিকলাঙ্গ, হতভাগ্য, তার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র !—আমায় কোন প্রশ্ন কর্‌বেন না, দয়া করে শুধু নিষ্কৃতি দেন, আপনি অনুমতি করুন—আমি জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, আত্মোন্নতিলাভের জন্য, নিশ্চিন্ত হয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে বেরিয়ে পড়ি—"

চিত্তরঞ্জনদেব কয় মুহূর্ত্ত নীরব চিন্তায় অতিবাহিত করিলেন, তারপর ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন "আমি বুঝেছি, কোন কারণে তোমার মানসিক অবস্থা এখন প্রকৃতিস্থ নাই,—আমি আপাততঃ তোমার বিবাহ প্রস্তাব স্থগিত রাখ্‌লাম, কিন্তু তুমি সাবধান, বিকারগ্রস্ত চিত্ত নিয়ে মানুষ,—জগতের, জীবনের, কোন উপকার কর্‌তে পারে না, তার উদ্দেশ্য অসিদ্ধ হয়, জীবন অসার্থক হয়,—যদি উন্নতি চাও আগে মনস্থির কর।"

"আপনি আশীর্ব্বাদ করুন"—বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে নিরঞ্জন দুইহাতে অগ্রজের চরণ বেষ্টন করিয়া পায়ের উপর মাথা নত করিল। চিত্তরঞ্জনদেব অশ্রুসিক্ত-নয়নে, সস্নেহে বাম হস্তে তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া শিরচুম্বন করিলেন, করুণা-কোমল-কণ্ঠে বলিলেন, "নিরু, কেউ জানুক না জানুক তুমি জান,—আমি তোমায় পুত্রাধিক স্নেহ করি।—বৈমাত্রের ভাই বলে নয়, শিক্ষাদাতা শাসনকর্ত্তা বলে নয়, আমি পিতার দায়িত্ব নিয়ে তোমায় প্রশ্ন কর্‌ছি, নিরঞ্জন,—"

—সহসা অৰ্দ্ধ-সমাপ্ত বাক্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া চিত্তরঞ্জনদেব সংশয়-উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে নিরঞ্জনের পানে চাহিলেন, প্রশ্ন তাঁহার কণ্ঠে বাঁধিয়া গেল ?

নিরঞ্জন বুঝিল সে প্রশ্ন কি ?—ঘৃণার হাসি হাসিয়া, স্থির নির্ভীক দৃষ্টি তুলিয়া ভ্রাতার পানে চাহিল, আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "আপনার স্নেহ জীবনের কোন মুহূর্ত্তে বিস্মৃত হবার নয়,—তার মর্য্যাদা চিরদিন স্মরণ রাখ্‌ব ; কিন্তু আপনার পিতৃ-রক্তে যে জন্মগ্রহণ করেছে, আপনার উন্নত শিক্ষায় যে জীবনে প্রথম দীক্ষিত হয়েছে, তার দ্বারা কোন নীচ কলুষিত কাজ কখনও সংঘটিত হয় নাই, কখনও হওয়া সম্ভবপর নয়, এটা স্থির বিশ্বাসে জান্‌বেন !—"

চিত্তরঞ্জন সজোরে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বিগলিত কণ্ঠে বলিলেন, "জানি ভাই ; আমি নিজেকে অবিশ্বাস কর্‌তে পারি কিন্তু তোমায় অবিশ্বাস করি না, তবে ভুল দেবতারও আছে,—ভ্রান্তির হাতে মহাদেবও নিস্তার পান নাই, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি—"

সহসা হাত টানিয়া লইয়া ক্ষিপ্ত-উত্তেজিত ভাবে নিরঞ্জন বলিল "তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন, তবে শুনুন, আমি অস্বীকার কর্‌ব না,—সত্যই আমি ভ্রান্ত ! এ ভুলের মূল আমার—নীরব মুগ্ধতা মাত্র ! জ্বালাময়ী তৃষ্ণা, আকাঙ্ক্ষার সরব আস্ফালন ঝঙ্কারের, কাছে পঙ্গু, অন্ধ, অক্ষম ! মানুষের যে মহত্ত্বকে আমি পূজা করি,—হৃদয়ের যে সৌন্দর্য্যকে আমি প্রণাম করি, একদিন অজ্ঞাত ভ্রমে অন্ধ হয়ে আমি তার শ্রদ্ধা-সম্মান লঙ্ঘন করেছি, সুমহান্ ভাব-গাম্ভীর্য্যে আমার নমস্য, এক করুণাকোমল হৃদয়া, নারীর চিত্তে,—আমার মূঢ়তা সংঘাতে অতর্কিতে ক্ষুব্ধ সন্তাপের বেদনা জাগিয়ে তুলেছি ! এই একটি মাত্র ভুলের জন্য, আমার সমস্ত প্রাণ আত্মগ্লানিতে জর্জ্জর ! এ পরকৃত বঞ্চনার ঈর্ষিত বিক্ষোভ নয়,—এ আত্মকৃত লাঞ্ছনার অস্বস্তি-অভিশাপ !"

নিরঞ্জনের দুই চক্ষু দিয়া দর্ দর্ করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল, স্তব্ধ-নির্ব্বাক চিত্তরঞ্জন চমৎকৃত—হতবুদ্ধি ! নিরঞ্জন দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া স্খলিত চরণে প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রাতে সহকর্ম্মীসঙ্গীগণের কাহাকেও কিছু না বলিয়া, বিমর্ষম্লান চিত্তরঞ্জনের নিকট বিদায় লইয়া নিরঞ্জন গান্ধার চলিয়া গেল। পাছে মোহন্ত মহারাজ তাহাকে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার উৎসব দেখিয়া যাইতে অনুরোধ করেন বলিয়া ভয়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিল না, চিত্তরঞ্জনকে বলিয়া গেল, মোহন্ত মহারাজকে ক্ষমা করিতে বলিবেন, আমি ফিরিয়া আসিয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—ঃ*ঃ—

নিষ্ঠুর-ধৈর্য্য ও আত্ম-সংযমে, আপনাকে কঠোর সুদৃঢ় করিয়া মায়া, জীবনের কর্ত্তব্য সাধনের জন্য প্রস্তুত হইল। তাহার বিক্ষোভ-দংশিত হৃদয়কে শঙ্কা-কম্পিত করিয়া--বিবাহ রাত্রে বেদান্তবাগীশ মহাশয় যখন সম্প্রদানের মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছিলেন, তখন অবসন্ন অনুভূতিকে তীব্র কশাঘাতে বেদনা-চকিত করিয়া—মায়া স্থির কর্ণে প্রত্যেক শব্দটি শুনিয়াছিল। দেব, দ্বিজ, গুরু, অগ্নি, সমক্ষে উভয়ের হস্ত একত্র করিয়া বেদান্তবাগীশ মহাশয় গম্ভীর-কোমল কণ্ঠে যখন শেষ মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, মন্মথনাথ যখন ধীর শান্ত বদনে—স্বীকার মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া, চিরদিনের জন্য পত্নীর ভার গ্রহণে প্রতিশ্রুত হইলেন, তখন মায়ার সংজ্ঞা ছিল না, তবুও সে অতি কষ্টে অবসাদ-আচ্ছন্ন মুমূর্ষু দৃষ্টি তুলিয়া একবার সে দৃশ্য দেখিয়াছিল, প্রাণের সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করিয়া, ক্ষীণ-করুণ মিনতির

স্বরে অন্তরদেবতার চরণে প্রার্থনা জানাইয়াছিল,—যেন, এই দৃশ্যটি তাহার অন্তরের মধ্যে উজ্জ্বল জ্যোঃতিতে চির-জাগ্রত থাকে!—অতীতের সমস্ত দৃশ্য, দর্শন, ইহার অন্তরালে যেন, চির অদৃশ্য হয়! ইহারই বলে যেন—তাহার জীবন, নবীন-কর্ত্তব্য-আলোকে দীপ্ত-সজীব হইয়া উঠে!—

কুশণ্ডিকার পর মন্মথনাথ তাহাকে সঙ্গে লইয়া এলাহাবাদে ফিরিলেন। তাঁহার আত্মীয়-অভিভাবক সংশ্রব-হীন ক্ষুদ্র বাসাবাড়ীতে পাচক ও ভৃত্য ছাড়া আর কেহই ছিল না, মায়াকে বধূ-জীবনের দুর্ভোগ-পোহাইতে হইল না, সে একেবারে গৃহিনীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইল।

অতীত জীবনের স্মৃতি—কোন অশুভ নিদ্রা-বিস্মৃতির, দুঃস্বপ্ন ভীতির মত তাহার চিত্তের অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় নীরব গোপনে অবস্থিতি করিত, সংসারের অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ কার্য্যের দায়িত্ব ভার স্কন্ধে লইয়া, সে প্রাণপণে, নিঃশেষে আপনাকে কর্ত্তব্যের সেবায় উৎসর্গ করিয়া দিল; নারী-জীবনের কর্ত্তব্য—হৃদয়ের একমাত্র ব্রত বলিয়া সমস্ত প্রাণের সহিত সে বরণ করিয়া লইল, তবু তাহারই অবকাশে—অন্যমনস্ক নিঃশ্বাসের ভিতর দিয়া—সময় সময় সেই সুপ্ত বেদনা অকস্মাৎ বুকের মধ্যে চমকিয়া উঠিত! আতঙ্কে যন্ত্রণায় তাহার হৃদ্ ক্রিয়া বন্ধ হইয়া আসিত, স্নায়ু কেন্দ্র নিস্পন্দ অসাড়—অচৈতন্য হইয়া পড়িত,—সে কি দুর্ব্বিষহ ক্লেশ!—কিন্তু তবু ও তাহা নিঃশব্দ-মৌনে সম্বরণ করিয়া লইত। বিদীর্ণ হৃদয়ের ক্ষত মুখে পাষাণ চাপাইয়া দিয়া,—সহিষ্ণু ভাবে আপনার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইত—না, না, মায়ার অস্তিত্ব তাহার মধ্যে আর নাই! সে এখন মন্মথনাথের স্ত্রী, শুধু মন্মথনাথেরই জীবনসঙ্গিনী! কোন দুঃস্বপ্ন-স্মৃতির মোহ-দৌর্ব্বল্যে স্থান তাহার জীবনে নাই, সে এখন অন্য জীবনের অঙ্কে, জাগ্রত প্রভাতালোকের মধ্যে সুস্থ সজীব!—এই জীবনের সকল কর্ত্তব্য এখন তাহাকে একাগ্র-নিষ্ঠ হইয়া সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাহ করিতে হইবে,—কোন অবসাদ-খিন্নতার স্থান এখানে নাই!—

নিঃসম্বল, দরিদ্র-সন্তান মন্মথনাথের অনেক কাজ; পত্নীর সম্বন্ধে অত্যধিক আগ্রহ ঔৎসুক্য প্রদর্শনের অবকাশ ও দুশ্চেষ্টা তাহাকে অন্নচিন্তার পশ্চাতে বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল, আইন-আদালত, পুঁথী-নথি, দলিল-দস্তাবেজ লইয়া তাঁহাকে প্রাতঃকাল হইতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত খাটিতে হইত,—ছিব্লামীতে সময় নষ্ট করিলে তাঁহার মত অবস্থার লোকের অনাহার অনিবার্য্য! মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবন-সংগ্রাম-রত মানুষের পক্ষে,—নাট্যোক্ত নায়কের প্রেমিক জীবনোচিত লীলা-রঙ্গের বাঁধা-গৎ স্মরণ রাখা সম্ভবপর নহে, কাজেই মন্মথনাথের সে সব চিন্তা আদৌ ছিল না; বে-খরচায় পরামর্শগ্রাহী মক্কেলগণ সকাল সন্ধ্যায় তাঁহার গৃহে ভিড় জমাইত, শ্রমশীল মন্মথনাথ বিনা-আপত্তিতে যথাসাধ্য সদ্ব্যবহারে সকলকে সন্তুষ্ট করিতেন। বুদ্ধি এবং পরিশ্রমের গুণে তাঁহার প্রসার-প্রতিপত্তিও বেশ জমিয়াছিল, কিন্তু নূতন উকীলের ভাগ্যে অধুনাতন কালে সচরাচর যাহা ঘটিয়া থাকে—তাঁহার ভাগ্যেও তাই ঘটিয়াছিল, যশের তুলনায় অর্থাগম হয় নাই।

সংসার খরচ বাদে মন্মনাথের আয়ের কিছুই প্রায় উদ্বৃত্ত থাকিত না, যে মাসে যৎকিঞ্চিত বাঁচিত, ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া আইন পুস্তক কিনিয়া ফেলিতেন। তাঁহার জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু অন্যায় লোভ ছিল না; সৎপথে থাকিয়া, আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া, তিনি যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহা যতই অল্প হউক,—নিজের পক্ষে যথেষ্ট মনে করিতেন।

সুন্দরী এবং বয়স্থা বধূ ঘরে আনার পর, তাহার কর্ত্তব্যে অমনোযোগিতার জন্য বন্ধু-বান্ধবের দল যে অবশ্যম্ভাবী ধারণা পোষণ করিয়াছিল,—তাহা সুনিশ্চয় ব্যর্থ করিয়া মন্মথনাথ যখন অত্যধিক মনোযোগে কর্ত্তব্যের উপর নবোদ্যমে ঝুঁকিয়া পড়িলেন, তখন সকলেই সত্য সত্য বিস্মিত হইয়াছিল। অবশ্য মন্মথনাথ যে নির্ব্বিকল্প নির্জ্জিতেন্দ্রিয় উদাসীন, বৈরাগী,—তাহা নহে, তবে গৃহিণীর অপেক্ষা গৃহ-খরচের চিন্তাই তাহার পক্ষে প্রবল ছিল

এবং বাহিরের কাজকর্ম্মের অবকাশে যখন মমতা-করুণ হৃদয়ে সঙ্গহীনা গৃহিণীর প্রতি মনোযোগী হইতেন,—তখন দেখিতেন—কর্ম্ম নিপুণা গৃহিণীও, কর্ত্তা অপেক্ষা কর্ত্তার গৃহের আসবাব পত্রের ব্যবস্থা ও যত্নে সবিশেষ ব্যস্ত-মনোযোগী।—প্রথম প্রথম হাসিয়া বিদ্রূপ করিতেন কিন্তু গৃহিণী লজ্জা-কুণ্ঠিত হাস্যে নিরুত্তরে নিজের কাজে ব্যস্ত বিব্রত হইয়া পড়িত। কখনও বা তাহার বিমর্ষ ম্লান মুখের পানে চাহিয়া মন্মথনাথের মন বিগলিত হইয়া যাইত,—দিদিমা এখানে আসিবেন না, ভাবিতেন মায়াকে তাঁহার কাছে দিন কয়েকের জন্য পাঠাইয়া দিব, কোন দিন বা সহৃদয় ভাবে সে প্রস্তাবও তাহার কাছে উত্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু মায়া নিরুৎসাহ ভাবে নীরব থাকিত, বারম্বার প্রশ্ন-পৃষ্ট হইয়া কোন সময় শুষ্ক ম্লান মুখে উত্তর দিত—"না—"।

মন্মথনাথ বিস্মিত হইতেন, ব্যথিত চিত্তে মনে করিতেন বুঝি দুঃখিনী দিদিমার দারিদ্র্য-স্মৃতি স্মরণ করিয়া মায়া সেখানে গিয়া ভার বৃদ্ধি করিতে অনিচ্ছুক,—লজ্জিত হইয়া গোপনে কেবলরামের সহিত পত্রযোগে পরামর্শ করিয়া দিদিমাকে অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, কিন্তু দৃঢ় আপত্তিতে দিদিমা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন,—তাঁহার চক্ষু ও সামর্থ্য থাকিতে তিনি কাহারও সাহায্যপ্রত্যাশী নহেন, তবে মন্মথনাথের যত্ন তাঁহার আনন্দের বিষয়, অসময়ে তিনি যেন দিদিমার সংবাদ লন, ইহাই কামনা! এখন কাহারও নিকট সাহায্য লইলে হৃষীকেশের অপমান করা হইবে!

অসময়ের অপেক্ষায় ধৈর্য্য ধরিয়া থাকাই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া মন্মথনাথ নিরস্ত হইয়াছেন। কিন্তু অসময় আসিবার পূর্ব্বেই, একদিন দ্বাদশীর প্রভাতে জপাহ্নিক শেষ করিয়া, পূজার আসনে বসিয়া ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিবার জন্য মাথা নোয়াইয়া—দিদিমা আর মাথা তুলিলেন না, চিরদিনের ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া শেষ করিয়া হৃষীকেশ মন্মথনাথকে সংবাদ দিলেন, শ্রাদ্ধের সময় মায়াকে লইয়া বোম্বাই যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সাশ্রুনয়না মায়া সে প্রস্তাবে অকস্মাৎ ব্যাকুল ভাবে স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"ও গো না, না, সেখানে ফিরে যেতে আর বোল না।"

মন্মথনাথ দুঃখিত হইলেন। দিদিমার মৃত্যুর পর সেখানে মায়ার যাওয়ার অনিচ্ছা স্বাভাবিক বুঝিয়া,—হৃষীকেশের প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন। কার্য্য ব্যস্ততার অনুরোধ জানাইয়া—সৌজন্যের সহিত ক্ষমা চাহিয়া হৃষীকেশকে পত্র লিখিলেন এবং শতাধিক মুদ্রা—ঋণ গ্রহণ করিয়া, দিদিমার শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য "যৎকিঞ্চিৎ" পাঠাইলেন।

এই শোকের আঘাত, দম্পতির অলস-নিশ্চেষ্ট দাম্পত্য-ধর্ম্মকে—প্রখর বেদনার উজ্জ্বল, ও পরম সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ গভীর করিয়া, পরস্পরকে পরস্পরের সন্নিকটে টানিয়া আনিল। হৃদয়বান মন্মথনাথ করুণা-কোমল চিত্তে মায়ার শোকাহত—পীড়িত হৃদয়কে অজস্র সান্ত্বনায় অভিষিক্ত করিলেন,—মায়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বস্তি পাইল!—বহুদিনের পর, দুঃখের দুর্দ্দিনে শোকের তরঙ্গাঘাতে—মায়ার যত্নসৃষ্ট কৃত্রিম চেষ্টাবন্ধন, ছিন্নমুক্ত হইয়া—সত্যই তাহাকে একটা অকৃত্রিম নির্ভরের বক্ষে দাঁড় করাইয়া দিল! এতদিন সে মন্মথনাথের 'স্বামীত্ব'কে সম্মান করিয়া আসিয়াছে, স্নেহ-অনুগ্রহকে কৃতার্থ হৃদয়ে অভিনন্দন করিয়া আসিয়াছে,—কিন্তু তাঁহার প্রেমকে অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করিতে ভয় পাইয়াছে! তাহার হৃদয়ের কোনখানে যে একটু খট্‌কা লাগিয়া আছে, সেই দিকে দৃষ্টি পড়িলেই তাহার মন বেদনায় সঙ্কোচে ভরিয়া উঠে!—সেই মুহূর্ত্তে সে নিজের কাছে,—সমস্ত বিশ্বের কাছে আপনাকে অপরাধ-পীড়িত করিয়া তুলে!......অকপট হৃদয়ে বিশ্বাস করিয়া, স্বামীর, হৃদয়ের সমস্ত প্রেম তাহার উপর ন্যস্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন কিন্তু সে কোন্ সাহসে নিজেকে তাহার সুযোগ্য অধিকারী বলিয়া মনে করিবে!—কুণ্ঠা-নিষ্পীড়িতা মায়া ক্রমাগত আতঙ্কে পিছু হটিত।

কিন্তু সহানুভূতি মানুষের বিমুখ মনকে আকর্ষণ করে, বিদ্রোহী প্রাণকে বশীভূত করে,—মন্মথনাথের সহৃদয় ব্যবহার এত দিন মুগ্ধতার দিক হইতে মায়াকে পীড়িত করিয়াছিল,—স্বস্তির দিক হইতে শাস্তি দিয়াছিল,—কিন্তু এই মর্ম্মভেদী শোক প্রস্রবণ যখন একদিনে জীবনের সমস্ত দ্বিধা-জড়তা কাটাইয়া,—লঘু স্রোতে তাহাকে বিকল বেদনার মধ্যে অসহায় ভাবে টানিয়া আনিল, এবং সেই মুহূর্ত্তে অকৃত্রিম সমবেদনা পূর্ণ বক্ষে পরম সহায় রূপে যিনি আসিয়া সস্নেহে তাহাকে হৃদয়ে তুলিয়া লইলেন,—মায়া চাহিয়া দেখিল—তিনি স্বর্গের দেবতা!—নিজের অযোগ্যতা, দুর্ব্বলতা, স্মরণ করিয়া—তখন সরিয়া দাঁড়াইবার সামর্থ্য মায়ার ছিল না, সঙ্কোচের খেদে সভয়ে দৃষ্টি ফিরাইবার সাহসও লোপ হইয়াছিল,—মায়া অবসন্ন প্রাণ লইয়া তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িল। শোক-সংঘাতে দম্পতির প্রাণে স্বর্গের স্নিগ্ধতা সৃষ্ট হইল, বেদনার আলোকে দুইজনে দুইজনকে সর্ব্ব প্রথমে নিকটতম আত্মীয় বলিয়া অনুভব করিল!

তার পর কয়েক মাস কাটিয়াছে। শোক-বেগ সংযত-হৃদয় লইয়া, মায়া আবার সংসারের কাজে ভিড়িয়াছে, মন্মথনাথ বাহিরের কর্ম্ম কোলাহলে মিশিয়াছেন। সংসারের খুটিনাটি কাজকর্ম্ম লইয়া মায়া অষ্টপ্রহর ব্যস্ত থাকে, তাহার উপর পাড়া-প্রতিবেশী দীন-দুঃখীগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপকার আছে—অনুরোধ এড়াইতে পারা যায় না! পড়াশুনায় আর ঝোঁক নাই, সে সব উৎসাহ ফুরাইয়া গিয়াছে—তবে সময় বিশেষে,—দুঃসহ অস্বস্তির হাতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য পুঁথী-পত্র নাড়া-চাড়া করিত মাত্র। সে আত্মজয়ের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, মহান্ কর্ত্তব্য পথে, অপ্রতিহত উদ্দাম স্রোতে ভাসিয়া চলিবার জন্য যাত্রা করিয়াছে, তবুও অলস-ঔদাস্য তাহাকে পায়ে পায়ে বিঘ্নাহত—বিপন্ন করিতেছে! বিস্মৃতি চেষ্টা ও স্মৃতির দংশনে দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে, তাহারই মাঝে কুণ্ঠা-কাতর অপরাধী সে—নিরুপায় বিড়ম্বনা ভোগ করিতেছে! জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত ক্ষতি ও ক্ষোভের মধ্যে দাঁড়াইয়া—দুই-দিকের নিষ্পীড়ন চাপ নিজের স্কন্ধে চাপাইয়াছে,—অথচ সে গুরুভার বহিয়া অগ্রসর হওয়াও কঠিন দুঃসাধ্য এবং পিছাইয়া আসাও ততোধিক ভয়ানক, এবং তদপেক্ষা অসাধ্য! এক এক সময় মনে করিত—অন্তরের সমস্ত দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, দূরে খেদাইয়া সহজ মানুষের মত সরল লঘু হইয়া—প্রাণের মুক্ত উচ্ছ্বাসে জগতের হাসি, কান্না, সুখ, দুঃখের মধ্যে মিশিয়া আত্মহারা হইবে,—কিন্তু পরক্ষণেই অনুতপ্ত চিত্তে বেদনার আঘাতে স্মরণ হইত, তাহার মত হতভাগ্যের পক্ষে—সেই আত্মবিস্মৃতির চেষ্টা সব চেয়ে ভয়ানক যন্ত্রণা!—মুমূর্ষু কাতরতায় তাহার অন্তরাত্মা নিঝুম হইয়া পড়িত—আপনার মধ্যে সে অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য বিকলতা অনুভব করিত!

সে দিন রবিবার, আদলত বন্ধ, অন্য কাজও তেমন কিছু ছিল না। মন্মথনাথ ঘরে ছিলেন,—কেদারার উপর আড় হইয়া শুইয়া একখানা বই পড়িতেছিলেন। বর্ষা-দ্বিপ্রহরে বাহিরের সমস্ত আকাশটা মেঘাচ্ছন্নতায় বিমর্ষ-ম্লান হইয়া ঝিমাইতেছিল; সকাল হইতে অনেক বেলা পর্য্যন্ত টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িয়াছে—এখন বৃষ্টি ধরিয়াছে বটে, কিন্তু আকাশময় ফিকা-ছাই-বর্ণের মেঘস্তূপ জমা হইয়া রহিয়াছে, বোধহয় শীঘ্রই আবার বৃষ্টি আসিবে।—বর্ষা-সজল বায়ু থাকিয়া থাকিয়া হু হু শব্দে হুঙ্কার দিয়া ছুটিতেছিল।

ধীর-কোমল পাদক্ষেপে মায়া কক্ষে ঢুকিয়া—সন্তর্পণ-চকিত নয়নে অধ্যয়নরত মন্মথনাথের পানে চাহিয়া, নীরবে দৃষ্টি ফিরাইল। টেবিলের: কাছে আসিয়া হাতের সেলাইটা রাখিয়া দিল, অন্য খানিকটা নূতন কাপড় ও কাঁচি লইয়া;—বিছানার কাছে সরিয়া আসিয়া বালিশের ওয়াড় মাপিয়া কাটিল, তারপর সূঁচ সুতা লইয়া নীরবে প্রস্থানের উপক্রম করিল।

বইখানা মুড়িয়া কোলের উপর রাখিয়া, মন্মথনাথ সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন "কোথা যাচ্ছ! এখনো কাজ শেষ হয়নি?"

এমন অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের আশা আদৌ ছিল না,—চৌকাঠের সমীপবর্ত্তিনী মায়া ঈষৎ বিচলিত ভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইল,—ইতস্ততঃ করিয়া মৃদু স্বরে বলিল—"আমার কাজ সব শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু ঠিকে-ঝি এখুনি কাজ কর্‌তে আস্‌বে, দেখি গে—"

"ওঃ, আচ্ছা যাও—" মন্মথনাথ পুস্তকখানা তুলিয়া পুনশ্চ পাঠে মনোযোগী হইলেন। মায়া ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া—বলিল "কোন দরকার আছে ?"

মন্মথনাথ পুস্তকের উপর দৃষ্টি রাখিয়া অন্যমনে বলিলেন "না দরকার এমন কিছু নয়।"

মায়া নিশ্চিন্ত হইল ; মন্মথনাথের আগ্রহান্বিত কণ্ঠস্বরে সে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল, এবার বুঝিল তাহা আগ্রহ নহে, ঔদাস্য !—কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া—বলিল "বিশেষ যদি কিছু কাজ না থাকে, মাস্‌কাবারি সংসার খরচটা আজ একবার দেখ্‌বে ?"

পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া সস্মিত বদনে মন্মথনাথ বলিলেন—"চাল, ডাল, নুন, তেল, লঙ্কা, ফোঁড়নের হিসাব ! মাসে মাসে প্রত্যেকবার কত দেখ্‌বো ? ওটা তোমারি জিম্মায় থাক্—"

কুণ্ঠিত হইয়া মায়া বলিল, "তবু কম-বেশী পরিমাণটা—"

মাথা নাড়িয়া মন্মথনাথ বলিলেন "নিষ্প্রয়োজন ; হরে-দরে এক হাঁটু জলই দাঁড়ায় দেখি ! এ মাসে একখানাও বই কিন্‌তে পার্‌লুম না,—দর্‌জির দেনাটা শোধ কর্‌তে সব শেষ হয়ে গেল !

মন্মথনাথ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কেদারা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মায়া স্তব্ধ হইয়া ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। হাতের বইখানা টেবিলের উপর রাখিয়া আলস্য ভাঙ্গিয়া মন্মথনাথ বলিলেন "এক এক সময় দিক্ ধরে যায়, ভাবি অনিশ্চিত উপার্জ্জনের আশা ছেড়ে, অল্প স্বল্প মাইনেতে—যাই হোক্ একটা স্কুলমাষ্টারী কি কিছু চাকরী নিয়ে নিশ্চিন্ত হই, দ্যাখো না, এ মাসের প্রথম ক'দিন বেশ চলেছিল,—কিন্তু শেষের দিকে এই ক'দিন ত চুপ্ চাপ্ বসে আছি, কাজকর্ম্ম নেই, মন ভারি খারাপ হয়ে যায় !—"

মায়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মন্মথনাথ বলিলেন "আর কিছু নয়, সংসার-খরচের জন্যে দেনা কর্‌তে হলেই ত ভাবনার কথা ! বিশেষ আমার মত অবস্থার লোকের পক্ষে,—যাকে শুধু ব্যবসার মুখ চেয়ে গ্রাসাচ্ছাদন যোগাড় কর্‌তে হয়,—তার পক্ষে আমার মত দুঃসাহস প্রকাশ করা বড়ই অন্যায় কাজ !"

দারিদ্র্য ও অভাবের আশঙ্কায় চিন্তা-তপ্ত স্বামীকে কিছু সান্ত্বনা বা সময়োচিত আশ্বাস দিবার জন্য—ভিতরে ভিতরে মায়ার মন অতিষ্ট-ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কিন্তু কোন কথা বলিতে—তাহার শক্তি জুটিল না। বেদনাঙ্কিত বিমর্ষ দৃষ্টিতে চাহিয়া নতশিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

অর্থাভাব দুশ্চিন্তার মাঝে, নিরুপায় মায়ার যে কোনই সদুত্তর দিবার ক্ষমতা নাই, তাহা মন্মথনাথের স্মরণ হইল।—টেবিলের উপরকার পুস্তকরাশির পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অন্যমনস্ক ভাবে ডাকিলেন "মায়া—

মায়া শুষ্ককণ্ঠে বলিল "কেন ?"

মন্মথনাথ বলিলেন "তোমায় কি এখনি যেতে হবে ?"

ইতস্ততঃ করিয়া মায়া বলিল "একটু পরে গেলেও বোধ হয় চলবে—ঝি এখনো আসেনি—"

মন্মথনাথ বলিলেন "তবে একটু বোস না—"

মায়া দ্বিরুক্তি না করিয়া ফিরিয়া আসিয়া শয্যার উপর বসিল, মন্মথনাথ টেবিলের উপর হইতে একখানি বই তুলিয়া লইয়া, মায়ার নিকটে আসিয়া বসিলেন। সূচে সূতা পরাইতে-পরাইতে মায়া মৃদু স্বরে বলিল "কাল অত রাত্রি পর্য্যন্ত জেগে যে সব কাগজপত্র দেখ্‌ছিলে, সে সব কাগজ কার? —"

বিষাদের হাসি হাসিয়া মন্মথনাথ বলিলেন "শ্রীশবাবুর—"

মায়া বলিল "তিনি ত প্রায়ই তোমার কাছে ওরকম কাগজ পাঠান,—"

মন্মথনাথ বলিলেন "শুধু তিনি কেন, আরও অনেকে পাঠান, ওগুলি আমার ব্যাপারের সৌভাগ্য,—কর্ম্মহীন সময়, তাতে তবু অন্যমনস্কতায় কাটে,—কিন্তু এরকম অলস জীবন ভাল লাগ্‌ছে না, কি করি বল দেখি মায়া!"

মায়া নিবিষ্টচিত্তে সেলাই করিতে লাগিল, কোন উত্তর দিল না। মন্মথনাথ পুস্তকের পাতা উল্টাইতে-উল্টাইতে বিষন্ন-গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন "অনিশ্চিতের ওপর নির্ভর করে, কোন কাজে এগোতে নেই,—তোমায় বিয়ে করে বড় অন্যায় করেছি, নয় মায়া?—"

ত্রস্ত-চমকিত দৃষ্টি তুলিয়া মায়া বলিল "কেন?—"

মন্মথনাথ বলিলেন "নূতন জীবনে আপনার ক্ষমতার ওপর অনেক বিশ্বাস রেখেছিলাম, কিন্তু এখন দিনে দিনে হতোদ্যম হচ্ছি—তোমায় হয় ত কখনো সুখী কর্‌তে পারব না মায়া—"

মায়া আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল, মৃদু অবজ্ঞার হাসি তাহার অধরপ্রান্তে ফুটিয়া উঠিল, কোমল-কণ্ঠে বলিল "শুধু পয়সায়?"

মন্মথনাথ বলিলেন "নয় কেন মায়া, অবস্থার অসচ্ছলতা সমস্ত উচ্চচিন্তাকে আহত করে,—" কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মন্মথনাথ অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন, গম্ভীরভাবে গুম্ফ মর্দ্দন করিতে-করিতে চিন্তাকুল বদনে কি যেন ভাবিতে লাগিলেন।

মায়া উত্তর দিবার মত কিছু খুঁজিয়া পাইল না, হেঁট হইয়া নিজের কাজ করিতে লাগিল। নীচে হইতে ঝি ডাকিল, মায়া সেলাইয়ের সরঞ্জাম লইয়া উঠিয়া-পড়িবার উপক্রম করিল,—কিন্তু তখনই কি ভাবিয়া আবার সেগুলা রাখিল; নীচে গিয়া ঝিকে আবশ্যকীয় কাজের উপদেশ দিয়া অবিলম্বে ফিরিয়া আসিল। দেখিল মন্মথনাথ তখনও গম্ভীর বদনে অন্যমনে কি ভাবিতেছেন।—মনের ক্লিষ্টতা গোপন করিয়া মায়া প্রফুল্লমুখে আসিয়া তাঁহার নিকটে বসিল, সেলাইটা হাতে তুলিয়া লইয়া আপন মনে বলিল, "ভগবানের ইচ্ছায় দু'বেলা দু'মুঠ অন্ন জুট্‌ছে এই ঢের,—বেশীর দরকার কি?—আর চিরদিনই কি এমনি যাবে?"

ঈষৎ হাসিয়া মন্মথনাথ বলিলেন "ভবিষ্যতকে বিশ্বাস নাই, আমিও বেশীর আকাঙ্ক্ষা করি না, তবে যা অত্যাবশ্যক তা চাই বই কি! এই দ্যাখো, ব্যবসার জন্যে আইনের বইগুলো বড়ই দরকারী, কিন্তু খরচে কুলিয়ে উঠ্‌তে পার্‌ছি না,—মাসে একখানা বই, তাও কিন্‌তে পার্‌ছি না!—তাই ভাব্‌ছি, ওকালতী ছেড়ে দিয়ে চাকরী করি!"

মন্মথনাথ সমসাময়িক নব্য উকীলগণের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—"এদের অবস্থা দেখে আরও ঘৃণা জন্মে গেছে, ওকালতীর ওপর নির্ভর করে আর সময় নষ্ট কর্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে না,—"

মায়া বলিল "ধৈর্য্য ধরে আর কিছু দিন চেষ্টা কর,—পরিশ্রমের পুরস্কার আছে বৈকি! ভগবান কি এমনই কর্‌বেন?"

ঈষৎ হাসিয়া মন্মথনাথ বলিলেন "তোমার মত সরল বিশ্বাসে ভগবানের ওপর নির্ভর কর্ত্তে পারলে খুবই নিশ্চিন্ত হতুম মায়া,—কিন্তু বিয়ের পর থেকে – তোমার জন্যে ভাবতে হচ্ছে, এখন আমার যে রকম অবস্থা, তাতে আজ যদি হঠাৎ মারা যাই, কি অসুখ হয়ে দু'মাস পড়ে থাকি,—তা হলেই ত চক্ষু স্থির !"

মায়ার বুকের মধ্যে ব্যাকুলতার অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিল,—বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সে হতবুদ্ধির মত মন্মথনাথের পানে চাহিয়া রহিল !—একটা বেদনাকুল আতঙ্কের দীপ্তি তাহার দৃষ্টিতে জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল, মায়া কথা কহিতে পারিল না।

মন্মথনাথ অপ্রতিভ হইলেন,—কাল্পনিক অবস্থা-ব্যবস্থার নির্দ্দয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া, নির্ব্বোধ মায়াকে ভীত করিয়াছেন বলিয়া নিজের উপর ক্ষুব্ধ হইলেন,—তাড়াতাড়ি সস্নেহে তাহার হাত দুইটি ধরিয়া নিকটে টানিয়া আনিয়া সহৃদয় ভাবে বলিলেন "আমি কথার-কথা বল্‌ছি,—কিন্তু পৃথিবীতে অসম্ভব ত কিছুই নেই,—যাক্ এখন সে সব বাজে কথা, একটু পড়াশুনার চর্চ্চা করা যাক্ এস, বাদলার দিনে কিছুই ভাল লাগে না, কি পড়ি বল দেখি—"

ক্ষীণ কণ্ঠে মায়া বলিল "যা তোমার খুসী—"

ক্ষুণ্ণভাবে ভর্ৎসনার স্বরে মন্মথনাথ বলিলেন, "তোমার মন বড় দুর্ব্বল মায়া,—তুচ্ছ কথায় একেবারে মুস্‌ড়ে পড়, সামান্য ঘটনায় কি অমন দমে গেলে চলে, ছিঃ !"

মায়া মুখে হাসিল, কিন্তু দৃষ্টি তাহার অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, আত্মসম্বরণের জন্য তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। শয্যাপ্রান্তে একখানা বাঙ্গলা উপন্যাস পড়িয়াছিল, সেইখানা টানিয়া লইয়া,—যথেচ্ছ ভাবে তাহার মাঝখানটা খুলিয়া, সেইদিকে দৃষ্টি স্থির বদ্ধ করিল। মন্মথনাথ তাহার স্কন্ধের উপর ঝুঁকিয়া বইখানা দেখিলেন,—হাসিয়া বলিলেন—"আনন্দ-মঠ পড়্‌ছ ?—একি শান্তি ও জীবানন্দের সাক্ষাৎ ?"

মায়া সংক্ষেপে উত্তর দিল "হ্যাঁ—"

মন্মথনাথ বলিলেন "আচ্ছা বল দেখি আমি এইখানটায় লাল পেন্সিলে দাগ দিয়ে রেখেছি কেন ?"

মায়া উদাসভাবে বলিল "কি জানি কেন ?"

মন্মথনাথ তাহার কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিবার জন্য, প্রশ্নটা নানারকমে ঘুরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু মায়া সেলাইটা দৃষ্টি সম্মুখে তুলিয়া,—অন্যমনস্ক, নিরুৎসাহভাবে, শুধু 'জানি না' 'বুঝি না' বলিয়া তাহা উড়াইয়া দিল।—মায়াকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য মন্মথনাথ কৃত্রিম বিরক্তির সহিত বলিলেন "মায়া শুন্‌ছ ?—"

ত্রস্ত-চঞ্চল দৃষ্টি তুলিয়া মায়া বলিল "বল না শুন্‌ছি—"

উকীলি-জেরার ধরণে মন্মথনাথ বলিলেন "শান্তির সঙ্গে দেখা হবার নামে জীবানন্দ সন্ন্যাসী হেসে উড়িয়ে দিলে—কিন্তু মামলা জিতে নিমাই যখন শান্তিকে আন্‌তে গেল, তখন জীবানন্দ বেচারা অমন করে বসে কাঁদলে কেন ?"

সূত্রপ্রান্তে গ্রন্থি দিতে-দিতে মায়া বলিল "কি জানি—"

উৎসাহের লক্ষণ না দেখিয়া মন্মথনাথ অসহিষ্ণু ভাবে তাহার সেলাই কাড়িয়া লইলেন, বলিলেন "শুন্‌ছ ?—"

বিষণ্ণ-ম্লান ভাবে হাসিয়া মায়া বলিল "শুন্‌ছি বল,—"

নিরুপায় মন্মথনাথ একতরফা ডিক্রির চেষ্টা ধরিলেন, বলিলেন "এই কথা নিয়ে একদিন আমার সঙ্গে—শ্রীপতির তর্ক হয়েছিল, সে যা বলেছিল তা আর শুনে কাজ নাই, কিন্তু আমার যা মনে হয়েছিল,—তার চুম্বকটা মার্জ্জিনে নোট করে রেখেছি ! কি মনে হয়েছিল বল দেখি ?"

মায়া বলিল "বল্‌তে পার্‌লুম না, তুমি বল—"

প্রশ্নোৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া মন্মথনাথ বলিলেন "জীবানন্দের মত লোকের পক্ষে এখানকার ব্যবস্থাটা খাপছাড়া হয়েছে বলে মনে হয় না ?"

মায়া মৃদু স্বরে বলিল "হতে পারে—"

মন্মথনাথ সকৌতুকে মায়ার মুখের পানে স্থির দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বলিলেন, "হতে পারে ! কেন হতে পারে বল দেখি ?"

মূঢ়ের মত মায়া উত্তর দিল "তা জানি না।—"

মন্মথনাথ হাসিয়া বলিলেন "জান না, অথচ বল্‌ছ ?—বাঃ—"

অপ্রস্তুত মায়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিল "আচ্ছা তুমি বুঝিয়ে দাও।"

মন্মথনাথ বলিলেন "ভাল, সরে এস,—ভাবুকের দৃষ্টি অবশ্য ফরমাসের মাপে তৈরী হয় না, কিন্তু যেমন করেই হোক্,—তার মধ্যে—সামঞ্জস্যের সুর একটা থাকে !···জীবানন্দকে গোড়া থেকে আরম্ভ করে এতদূর পর্য্যন্ত দেখ্‌লুম, সদানন্দ, বেপরোয়া, বেদরদী, আধপাগলা ছেলেমানুষ, কেমন ত ? কিন্তু এইখানে আমরা লোকটাকে হঠাৎ আশ্চর্য্য ভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখ্‌লুম, নয় কি ?—"

মায়া এ সকল অনাবশ্যক তত্ত্ব লইয়া, কোনদিন মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিয়াছিল কি না,—তাহা নিজেই স্মরণ করিতে পারিল না। তাহার সমশ্রেণীস্থ পাঁচজনে যেমন সময় কাটাইবার জন্য পুঁথী-পত্র লইয়া সখের মাথায় অনুগ্রহ পূর্ব্বক নাড়াচাড়া করে,– পড়িতে হয় তাই পড়ে—সেও বোধ হয় সেইরূপ ভাবে পড়িয়াছিল, কোন কিছু—বোঝাবুঝির দুশ্চেষ্টা তাহার ছিল না,—তাহার চেষ্টা-চর্চ্চার প্রাণ যে বহুদিন পূর্ব্বে ফুরাইয়া গিয়াছে !—আভ্যন্তরিক উৎসাহ উদ্যমের আবেগে, একদিন সে জগতের বিচিত্র সৌন্দর্য্য সুষমাপুষ্ট, সুবিমল আনন্দ-মাধুরী-স্নাত ওজস্বী-দীপ্তি-গরিমার পানে, উৎসুক-বিস্ময়ে চাহিয়া—অতর্কিতে মুগ্ধ-ভ্রমে আত্মবিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবিয়াছিল, প্রাণাকুল ব্যগ্রতায় আত্মহারা উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছিল,—সে মর্ম্মান্তিক বিক্ষোভ অনুতাপ যে ইহজীবনে ভুলিবার নয় ! সরলা কিশোরীর মাধুর্য্য-কোমল হৃদয়ের অকুণ্ঠিত করুণা লইয়া যেদিন সে জগতের সম্মুখে শান্ত-নির্ম্মল দৃষ্টি তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—সেদিন আজ নাই ! সম্ভ্রম-গৌরবের উন্নত মহিমায় যেদিন সে আপনার কাছে আপনাকে মাননীয়া বৈভবাধিষ্ঠাত্রী বলিয়া নিঃশঙ্ক ছিল—সেদিন আজ সুদূর অতীতের পরপারে ! আজ তাহার অদৃষ্ট অভিশপ্ত, হৃদয় পরিতপ্ত,—জীবন, অদৃশ্য-যন্ত্রণায় বিড়ম্বনা-বিক্ষত ! কিন্তু সে বাঁচিয়া না থাকিলেও, এখনও তবু মরে নাই,—কর্ত্তব্যের দীক্ষায় অন্তরাত্মাকে অনুপ্রণোদিত করিয়া—কর্ত্তব্যের ইঙ্গিতে প্রেত-বাহিত ভাবে আপনাকে পরিচালন করিতেছে !

মন্মথনাথ ভাবিয়াছিলেন, তাহার কথার উত্তরে, বিস্ময়-বিমূঢ়া মায়া আবার যাহা খুসী উত্তর দান করিয়া,—অসাবধানে বিদ্রূপভাজন হইবে ! কিন্তু মন্মথনাথ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, মায়া অত্যন্ত উন্মনা ভাবে নীরবে বাহিরের দিকে চাহিয়া, কি যেন ভাবিতেছে,—উত্তর প্রত্যাশায় কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া মন্মথনাথ বলিলেন—"কেমন, আমি যা বল্‌ছি, সব ঠিক্ ত মায়া ?—"

মায়া চিন্তাকুল দৃষ্টি ফিরাইয়া মন্মথনাথের মুখের উপর স্থাপন করিল, তারপর অকস্মাৎ সজোরে বলিয়া উঠিল "হাঁ ঠিক্, নিশ্চয় সব ঠিক্ !—"

উৎসাহ প্রকাশ করিয়া মন্মথনাথ বলিলেন "বুঝেছ মায়া ? এখন ভেবে দেখ,—এইখানে ক্ষুদ্র-সংঘাতে, তাঁর চিত্তের বহিরাবরণ ছিন্ন হয়ে, শোকাকুল হৃদয়ের স্পষ্ট মূর্ত্তিটার—যথার্থ আত্মপ্রকাশ ! অতৃপ্ত-আকাঙ্ক্ষায়

আর্ত্তনাদকে,—বাইরের ভিড়ে শক্ত করে দাবিয়ে রেখে—এতক্ষণ বাইরের ব্যাপার নিয়ে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন,—কিন্তু এইখানে এতটুকু ঘা খেয়ে সব পরিস্কার !.........,"

মন্মথনাথ তাঁহার বক্তব্যের বিশদ-ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন কিন্তু মায়া আর একটি কথাও শুনিতে পাইল না, তাহার বুকের ভিতর গভীর আকুলতা হায় হায় করিয়া উঠিল, —ওগো নির্ব্বোধ অভাগো সে,—সেও যে এমনি করিয়া দৃশ্য ও অদৃশ্য দ্বিধা-বেদনার মধ্যে দাঁড়াইয়া,—আপনাকে বাঁচাইবার জন্য নির্ম্মম-আত্মপ্রবঞ্চনায় আপনাকে আবরণ করিয়া চলিতেছে !

সন্তপ্ত-বিবর্ণ মুখের উপর বাহু অন্তরাল করিয়া মায়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল. অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে পড়িয়া রহিল—বক্তব্য শেষ হইলে মন্মথনাথ বলিলেন "বুঝেছ মায়া ?—"

"বুঝেছি—" অত্যন্ত ধীর গম্ভীর ভাবে উত্তর হইল "বুঝেছি।"

টেবিলের উপর হইতে 'ঈরেজার'টা আনিয়া—পুস্তকের সেই পৃষ্ঠায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইংরেজি অক্ষরে পেন্সিলে লিখিত পার্শ্বটীকাগুলি ঘষিয়া উঠাইতে উঠাইতে মন্মথনাথ সহাস্যে বলিলেন, "তখন ফার্ষ্ট আর্ট্স্ পড়্তাম, শ্রীপতিবাবুর সঙ্গে তর্কের ধাক্কায় মাথায় যে সব যুক্তির উদয় হয়েছিল, ঝোঁকের মাথায় তখনি 'নোট' করে নিয়েছিলাম, কিন্তু আর এখন এগুলো রাখার কোন দরকার দেখি না—"

মন্মথনাথ পেন্সিলের দাগগুলার উপর রবার ঘষিতেছেন, —মায়া স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিল "আচ্ছা, পেন্সিলের দাগ ত তুল্‌ছ—কিন্তু এই ছাপার কালীর দাগ,—এই অক্ষরগুলা, এগুলা কি তুলে ফেল্‌তে পার ? পাতাটা একেবারে পরিষ্কার সাদা কর্‌তে পার ?"

বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া মন্মথনাথ বলিলেন "কেন ?"

হঠাৎ মায়ার স্মরণ হইল তাহার বক্তব্যের অর্থ অত্যন্ত অদ্ভুত দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে ! থতমত খাইয়া দৃষ্টি নামাইল, —জড়িতস্বরে বলিল "তাই বল্‌ছি—"

মন্মথনাথ বলিলেন "ওগুলো তোল্‌বার দরকার নাই, ওযে গ্রন্থকর্ত্তার রচনা ! আমি শুধু আমার রচনাটুকু তুলে দেব,—ছাপার দাগ কি তোলা যায়, পাতাশুদ্ধ যে ছিঁড়ে যাবে ?"

"অ !"—মায়া অত্যন্ত নিরুৎসাহ ভাবে ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া মন্মথনাথ সহসা উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন "তোমার কি ছেলেমানুষী বুদ্ধি মায়া !—এ দাগগুলা শুদ্ধ—!"

নিঃশব্দে মায়ার দৃষ্টি অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল ! এই ছাপার হরফ, ইহাকে কিছুতেই উঠাইবার যো নাই—ইহা গ্রন্থকর্ত্তার রচনা ! ইহা পাষাণের বুকে খোদাই করা চিত্রের মতই নিস্পন্দ নিশ্চল, পর্ব্বতের মতই অটুট সুদৃঢ় ! ইহাকে সরাইবার, নড়াইবার উপায় নাই !—তবে ইহার পাশে—ঐ স্বহস্ত অঙ্কিত যাহা কিছু,—তাহাকে নিজের চেষ্টায়—ঘষিয়া-মাজিয়া অবলুপ্ত করিতে পারা যায় !—

তাহাকে স্তব্ধ-নিরুত্তর দেখিয়া, মন্মথনাথ স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বলিলেন "মায়া, কি ভাব্‌ছ ?"

মায়া চকিত-নয়নে ফিরিয়া চাহিল,—মাথা নাড়িয়া জানাইল 'কিছুই না—'

কিন্তু পরক্ষণে—তাহার হৃদয়াভ্যন্তরে অকস্মাৎ নির্ঘাৎবেগে তীব্র বিদ্যুৎ কশা বাজিল ! হতভাগ্য মুর্খ সে—বুদ্ধির ভুলে আত্মঘাতী হইয়া ভীতির অন্ধকারে—দুঃসহ যন্ত্রণাময় প্রেতজীবন বহন করিয়া ফিরিতেছে ! অপরাধ গোপন করিবার জন্য—কেবলই অপরাধের বোঝা বরণ করিয়া লইতেছে ! না, সে আর পারে না, এবার শাস্তির হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া সে আপনাকে মুক্তি দিবে !

বাহিরে প্রবল বেগে বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছিল, মন্মথনাথ তাঁহার অফিস-ঘরের জানালা বন্ধ করিয়া আসিবার জন্য উঠিয়া গেলেন, মায়া কক্ষতলে ধূলার উপর লুটাইয়া পড়িয়া মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল!—আরও একদিন সে এমনই করিয়া—উচ্ছ্বসিত বেদনায় বিহ্বল হইয়া কাঁদিয়াছিল,—কিন্তু সেদিন বিচ্ছেদের বেদনা-ঘোর, তাহার জীবনের নৈতিক কর্ত্তব্যকে—অন্তরের বিবেক বিশ্বাসকে,—রক্তোজ্জ্বল গৌরব মহিমায় মহিমান্বিত করিয়াছিল!—কিন্তু আজ? আজ—ইহা সত্য আত্মহত্যার শোক বুকের মধ্যে চাপিয়া, মিথ্যা আত্মশ্লাঘায়—প্রবঞ্চনার নিষ্ফল প্রয়াসে তাক্ত-বিরক্ত অবসাদ-বিকার!—তাহার সজীব মনের পশ্চাতে যে নির্জ্জীব হৃদয়টি অহরহ, বিশ্বব্যাপী পরিতাপ নিষ্পেষণে, ক্লিষ্ট-অবসন্ন হইয়া উঠিতেছে—এ যে তাহারই বেদনা-ব্যাকুল ক্রন্দন! তাহার জীবন্মৃত হৃদয়ের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া আজ অকপট আকুলতায়—অপরিসীম শোকের আর্ত্তনাদ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে!—ওগো অসহ্য, অসহ্য!—এবার এ জীবন্ত শ্মশান-শোকের সমাধি নির্ব্বাণ হউক, এবার তাহার মুক্তি ফিরিয়া আসুক!—হে জগদীশ্বর, হে জগৎ কবি,—ক্ষুদ্র কীটাণুকীটের স্পর্দ্ধা-দুঃসাহস ক্ষমা কর! আজ তাহার সকল শক্তি লোপ হইয়াছে, আজ সে মৃত্যু-বেদনাচ্ছন্ন, মরণাহত!—তোমার রচনা যাহা কিছু তাহা সবই অব্যর্থ—সমস্তই অমোঘ অখণ্ডনীয়!—কিন্তু তাহার আশে-পাশে, আপনার দিক হইতে সে যাহা কিছু রচনা করিয়াছে—হে দীননাথ শক্তি দাও, সে সমস্ত একেবারে মুছিয়া ফেলিতে—ইহজন্মের মত একেবারে ভুলিয়া যাইতে সাহস দাও! সে আপনার রচনাবর্ত্তের দুরন্ত ঘূর্ণনে পড়িয়া,—ক্লান্তি-বিকলতায় হাঁপাইয়া উঠিয়াছে, চতুর্দ্দিকে কেবলই মাথাঠুকিয়া মরিতেছে! হে ভগবান তাহাকে মুক্তি দাও, আপনার আবর্ত্ত চক্র হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার শক্তি দাও! সকল দেনা-পাওনার দ্বন্দ্ব-পীড়ন হইতে তাহাকে মুক্ত কর!—তোমার রচনাপূর্ণ এই জীবনের একটি পৃষ্ঠা—অতীত গর্ভাঙ্কের এতটুকু স্মৃতিলিপি—সে যেন নিজের অসহনীয় দুর্ব্বলতায়, ক্ষিপ্ত-ক্ষোভের ঘর্ষণে বিলুপ্ত করিবার জন্য—ভ্রমের ঘোরে জীবনের অঙ্গহানি করিয়া না বসে! অকপট-চিত্তে সে এবার শাস্তির হাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, এবার তুমি তাহাকে মুক্তি দাও! তোমার দান সে অবহেলায় নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল—এবার আশীর্ব্বাদ কর,—তাহার পরিপূর্ণ সার্থকতা সে যেন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিবার শক্তিতে বঞ্চিত না হয়!—হে অন্তর্যামী তুমি জান, কায়মনে আত্মত্যাগের সাধনায় সে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, এবার তুমি তাহাকে—আত্মজয়ের শক্তি দাও!

মায়া চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিল; বাহিরে বৃষ্টি তখন থামিয়া গিয়াছিল,—আকাশ পরিস্কার হইয়া আসিয়াছিল; মায়া স্থির নিষ্পলক নয়নে, ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

একখানা বই হাতে করিয়া মন্মথনাথ ঘরে ঢুকিলেন, বলিলেন, "বাঃ, তুমি যে এখনো বসে আছ, আমি বাইরের ঘরের সার্শি বন্ধ করে মিছেই এতক্ষণ আইনের বই পড়ে সময় নষ্ট করলুম!"

তিনি আসিয়া মায়ার পাশে দাঁড়াইলেন; মায়ার দৃষ্টি-লক্ষ্যে আকাশ পানে চাহিয়া বলিলেন "এক পশলা বৃষ্টিতে আকাশটা কেমন সুন্দর পরিস্কার হয়ে গেল দ্যাখো,—সমস্ত দিনের পর এতক্ষণে পশ্চিমে সূর্য্য উঠ্‌ছে, বাঃ!"

মায়া শান্ত-স্বচ্ছ দৃষ্টি তুলিয়া, স্থির নয়নে মন্মথনাথের পানে চাহিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। মন্মথনাথ তাহার পাশে বসিয়া-পড়িয়া স্নেহময় কণ্ঠে ডাকিলেন "মায়া—"

ক্রমশঃ—

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

ঋতু সংহার।

বসন্ত।

কিশোরী প্রকৃতি-বুকে চারু-শ্যাম বাস
কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে আবেগের ভরে;
দিকে দিকে পিককুল কাকলীর স্বরে,
শত নব বাসনার দিতেছে আভাস;
চঞ্চল সমীরে বহে ব্যাকুল নিশ্বাস,
অশোকে, বকুলে, চূত-মুকুলের থরে
অমৃত-সুরভি-প্রেম কুসুম-অক্ষরে
কত ছলে আপনারে করিছে প্রকাশ!

কি লাবণ্য কি সুষমা অঙ্গে অঙ্গে ফোটে!
লজ্জা-নম্র স্মিত-হাসি ভাসিছে নয়ানে;
কি আনন্দ কি বেদনা শিহরিয়া ওঠে
বিমোহিতা কিশোরীর বিভল পরাণে;—
কত বর্ণ-বিভাময় স্বপ্ন আসি জোটে
গোপন হৃদয়-তলে, আপনি না জানে!

গ্রীষ্ম।

প্রজ্বলন্ত জ্বালাময় প্রথম যৌবনে
অতৃপ্ত-কামনা-পূর্ণ প্রদীপ্ত প্রণয়
দগ্ধ করে প্রকৃতিরে, রবি-রশ্মি-চয়
অন্তরের বহ্নিশিখা আরক্ত-আননে।
উচ্ছ্বাসে নিশ্বাস উঠে প্রমত্ত পবনে,
আবর্ত্তিত আকাঙ্ক্ষায় ঘূর্ণ-ঝঞ্ঝা বয়;
বুভুক্ষু প্রবৃত্তি কাঁদে, তৃষিত হৃদয়!
নিরাশা-নিস্বন জাগে দগ্ধ বনে বনে।

কোথা বারি? কোথা ছায়া? কোথা শান্তি হায়!
প্রকৃতির বক্ষ ভেদি ধ্বনি অনিবার!—
কোথা যাই! কোথা যাই! কারে'প্রাণ চায়?
কার স্পর্শ কার প্রেম অমিয়-আসার
আনিবে প্রশান্তি এই জ্বলন্ত হিয়ায়?
কোথা হায়! কোথা ওগো বাঞ্ছিত আমার?

বর্ষা।

পরিপূর্ণ যৌবনের ভরা তরঙ্গিণী
পারে না রাখিতে ধরি আর আপনায়;
অগাধ উচ্ছল বারি দু'কূল ডুবায়,—
তরঙ্গি' দুলিয়া উঠে রহস্য-রঙ্গিণী!
গিরি শিরে নীল-নব-ঘন-কুন্তলিনী,—
বিষাদের স্নিগ্ধ শান্তি কজ্জল-আভায়
অপলক নেত্র 'পরে;—সদা বয়ে' যায়
প্রীতি-বিগলিত ধারা বর্ষা-স্বরূপিণী!

কেতকী-আসবে সাজি যুল্ল-নীপ-হারে,
ঝিল্লীর মঞ্জীর পরি, কার পথ পানে
প্রকৃতি উদ্বিগ্না চাহি, সন্ধ্যা-অন্ধকারে?
—নিবিড় গোপন প্রেম কেহ নাহি জানে!
স্তব্ধ কৃষ্ণ-আকাশের দূর পর-পারে
কেহ কি বাঞ্ছিত গেছে স্মৃতি রাখি প্রাণে?

শরৎ।

প্রসন্ন সুষমাভাস ঊষার আকাশে,—
পবিত্র প্রেমের প্রভা নিষ্কাম নির্ম্মল;
লালসা-বিক্ষোভ নাই অশান্তি চঞ্চল,
—শুদ্ধ সত্ত্ব-ভাবময়ী জ্যোতি পরকাশে!
শুভ্র খণ্ড লঘু অভ্র কদাচিৎ ভাসে
অতীতের ক্ষীণ-স্মৃতি; শুভ্র শতদল
শুভ্র সেফালীর দাম স্নিগ্ধ-পরিমল,
সাজায় প্রকৃতি আজি অর্চ্চনার আশে।

রূপসী মোহিনী আজি তপস্বিনী উমা,
আত্ম-উৎসর্জ্জন-রতা দয়িত-চরণে;
কি তৃপ্তি-আনন্দ-হাসি হাসে নিরুপমা,—
বিমল বিভাস তার যুল্ল-কাশ-বনে!
শান্ত-স্বচ্ছ-নীরা অই স্রোতস্বিনী-সমা
প্রীতির-পীযূষ-ধারা অন্তরে গোপনে!

হেমন্ত।

গৃহিণী গৃহের লক্ষ্মী কল্যাণী জননী ;
শিশির-শীতল স্নেহ-সন্তানের তরে ;
করোষ্ণ উত্তাপ শুধু মৃদু-সূর্য্য-করে
জানায় রমণী-প্রাণ—পতি-প্রণয়িনী !
হেমাঞ্চল-বিভূষিতা কাঞ্চন-বরণা
সম্পদ-সঞ্চয় চাহি নিত্য আনে ঘরে
পক্ক-শীর্ষ-ধান্য-রাশি বিত্ত থরে থরে,—
ইন্দিরা ঐশ্বর্য্য-রাণী সম্পন্না ধরণী।

দিনান্তে কর্ম্মের ক্লান্তি গ্লানি-ম্লানি যত
জেগে উঠে চিত্ত ধীরে ; প্রয়াস-উল্লাস
অনুদ্যম অবসাদে ধীরে পরিণত ;
কখনো জড়ায়ে-দেহে কুয়াসার বাস
শিহরি কাঁপিয়া উঠে ভাবি কত শত,—
হিম হয়ে' আসে ধীরে হৃদয়-আকাশ।

শীত।

জরার্ত্তা প্রকৃতি আজি। জীর্ণ দেহখান
ক্ষণে ক্ষণে ভাঙি পড়ে, গ্রন্থি যায় খসি' ;
সর্ব্বাঙ্গ শিথিল ; মৃত্যু-প্রতীক্ষায় বসি ;
—আলোহীন আশাহীন স্পন্দহীন প্রাণ !
অসাড় অবশ রক্ত হিমানী-সমান ;
কুজ্‌ঝটীকা-অন্ধ আঁখি,—আসন্ন-তামসী
তুষার পবনে শুধু কাতরে নিশ্বসি'
জানাইছে হয় নাই সব অবসান।

যৌবন-সৌরভ-শোভা সর্ব্ব-অবশেষে
গাঁদা আর কুন্দ দুটী অতীতের কথা ;
গীতি-গন্ধ কোথা কোন বিস্মৃতির দেশে,
অমানিশা-অন্ধকারে গত স্বপ্ন যথা।
বিশীর্ণা প্রকৃতি হায় ! শ্মশানের বেশে
বহিছে নিশ্বাস ভার মরণ-আহুতা।

শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা।

বাঙ্গলা ভাষা।

(আলোচনা)

শ্রীযুক্ত দীনেশ্বর সেন মহাশয়ের বাঙ্গলাভাষা সম্বন্ধে অগ্রহায়ণ মাসের "পরিচারিকা"য় যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, সম্পাদিকা, সকলকে সে বিষয়ে উপযুক্ত আলোচনা করিতে আহ্বান করিয়াছেন, আমি সে বিষয়ে যথাসাধ্য আলোচনা করিতেছি, তবে তাহা উপযুক্ত হইবে কি না তাহা সম্পাদিকাই বিবেচনা করিবেন।

বঙ্গভাষার প্রকৃতি ও গঠন প্রণালী সম্বন্ধে সেন মহাশয় বলিয়াছেন "ইংরেজী, সংস্কৃতে, হিন্দী প্রভৃতি অপেক্ষা বঙ্গভাষা স্বভাবতঃ কিছু দীর্ঘায়ত। অর্থাৎ একই অর্থ প্রকাশ করিতে অন্য ভাষায় যতগুলি স্বর বা Syllableএর প্রয়োজন হয় বঙ্গভাষায় তাহা অপেক্ষা অধিক স্বর লাগে।" ইহার জন্য তিনি একটি ইংরাজী বাক্য লইয়া তাহার বাঙ্গলা করিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার ভুল হইয়াছে। আমি একখানি অনুবাদ পুস্তকের (Matriculation Translation by S. C. Dutta. P. 106) যদৃচ্ছা উন্মোচিত স্থান হইতে উদাহরণ লইয়া দেখাইতেছি বাঙ্গলা অপেক্ষা ইংরাজীতে অধিক স্বর লাগে। বাঙ্গলা—করকোষ্ঠী গণনা করিতে জানিতেন = ইংরাজী—Could read the destiny from the lines on the palm of the hand. এই দৃষ্টান্তে দেখিতে পাইতেছি বাঙ্গলায়

১৩ সীলেব্‌ল্ ইংরাজীতে ১৫ সীলেব্‌ল্। বাঙ্গলা, ইংরাজী, সংস্কৃত ও হিন্দীর মধ্যে সাধারণতঃ সংস্কৃত সর্ব্বাপেক্ষা স্বর-বহুল এবং ইংরাজী ও হিন্দী সর্ব্বাপেক্ষা হসন্ত বহুল। বাঙ্গলা, এই উভয়ের মাঝামাঝি স্থান অধিকার করিয়াছে। কারণ বাঙ্গলায় বহু সংস্কৃত শব্দের অবিকল উচ্চারণ প্রচলিত আছে। সংস্কৃতের অধিকাংশ বিশেষণই বাঙ্গলায় অকারান্ত উচ্চারিত হয় যথা—প্রিয়তম, প্রচলিত। কিন্তু হিন্দুস্থানীরা সেগুলিকে হসন্ত উচ্চারণ করিয়া থাকে। তবে হিন্দুস্থানীর উচ্চারণও দুই প্রকারের হয়। যাহারা উর্দ্দু পড়ে তাহারা হসন্ত উচ্চারণ করে, আর যাহারা সংস্কৃত পড়ে তাহারা অনেকটা অকারান্ত উচ্চারণ করে।

সংস্কৃতের অকারান্ত বিশেষ্যকে আমরা বাঙ্গলায় প্রায় হসন্ত উচ্চারণ করিয়া থাকি। "রাম" কথাটায় সংস্কৃত উচ্চারণে দুইটি স্বর কিন্তু বাঙ্গলায় মাত্র একটি। হিন্দুস্থানীরা রামায়ণের "রাম" উচ্চারণ করিতে গিয়া সংস্কৃতের অনুকরণে এমনি ভাবে অকারান্ত করে যে আমাদের কানে একেবারে 'রামা" শোনায়। কিন্তু কাহাকেও ডাকিতে গেলে, "রাম্" বলে।

ইংরাজী ও হিন্দী অপেক্ষা বাঙ্গলার এক বিষয়ে জিত আছে। ইংরাজী ও হিন্দীতে যেমন Copula (সংযোজক ক্রিয়া ?) না থাকিলে চলে না, বাঙ্গলায় সেরূপ নহে। বাঙ্গলায়—রাম ভাল ছেলে=ইংরাজী—Ram is a good boy=হিন্দী—রাম আচ্ছা লড়্‌কা হ্যায়। এই ইংরাজীর is ও হিন্দীর "হ্যায়"এর আপদ-বালাই বাঙ্গলায় নাই। এইগুলিতে ইংরাজী হিন্দীকে জবরজঙ্গ করিয়াছে বলা যাইতে পারে।

যে সকল ভাষায় কোন সাদৃশ্য নাই অথবা সাদৃশ্য অল্প, সেখানে সাধারণতঃ এক ভাষায় যে ভাব প্রকাশ করিতে অল্প কথা লাগে, অন্য ভাষায় তাহা অনুবাদ করিতে অধিক কথার দরকার হয়। বাঙ্গলায়—আমি যাই (অনুজ্ঞা) কাগজ চাই ; ইংরাজীতে Let me go, I want a piece of paper. আবার ইংরাজীতে Wind the watch. বাঙ্গলায়, ঘড়িতে দম দাও। যে দ্রব্য যে দেশে উৎপন্ন হয় বা আবিষ্কৃত হয়, তাহার নাম বা সেই সম্বন্ধে পারিভাষিক শব্দ যত সংক্ষেপে হয়, অন্য ভাষায় তত সংক্ষেপে হয় না। আমাদের দেশের আম ও তেঁতুল ইংরাজীতে Mangoe ও Tamarind. আবার ইংরাজীর School ও Steamer আমাদের বাঙ্গলায় পাঠশালা বা বিদ্যালয় ও বাষ্পীয় যান।

ইংরাজীতে যে সকল শব্দ লাটিন বা গ্রীক হইতে আসিয়াছে সেগুলি অধিকাংশই দীর্ঘ, তেমনই বাঙ্গলায় যে সকল শব্দ সংস্কৃত জাত তাহাও দীর্ঘ। ইংরাজীর Anglo-Soxon কথাগুলি ছোট, বাঙ্গলায় খাঁটি বাঙ্গলা বা প্রাকৃত-জাত শব্দগুলিও ছোট। পূর্ব্বে লোকে সংস্কৃতের অনুকরণে "প্রহার করিল" "অনুসন্ধান করিল"ই লিখিত, এখন "মারিল" "খুঁজিল" লেখে। তাহাতে ভাষা বেশ সরল হয় বটে, কিন্তু শব্দ-সম্পদের দৈন্য ভাষায় প্রার্থনীয় কি ? এক অর্থদ্যোতক বিভিন্ন শব্দের মধ্যেও কিছু কিছু পার্থক্য থাকে, সেরূপ স্থলে ভাষার সরলতার জন্য একটি-মাত্র শব্দকে স্থান দিয়া অন্যগুলিকে অভিধান হইতে তাড়াইয়া দিলে অভিধান ছোট হইতে পারে, স্বল্প স্বর বিশিষ্ট শব্দ লইলে উচ্চারণে শ্রমলাঘব হইতে পারে, কিন্তু ভাষা তাহাতে উন্নত হইবে বলিয়া মনে হয় না। এক "রাত্রির" জন্য সংস্কৃতে "শর্ব্বরী, নিশা, নিশিথিনী, রাত্রি, ত্রিযামা, ক্ষণদা, ক্ষপা, বিভাবরী, তমস্বিনী, রজনী, যামিনী," প্রভৃতি বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার হয়। তন্মধ্যে বাঙ্গলায় সাধারণতঃ আটটি শব্দের ব্যবহার আছে ইংরাজীতে এক Night ভিন্ন অন্য কোন শব্দ নাই। স্বল্পস্বর বিশিষ্ট শব্দের ব্যবহার করিতে হইলে "রাত" কথাটার ব্যবহার করিলেই সকল লেঠা চুকিয়ে যায়। কিন্তু তাহাতে ভাষা যে-সম্পদ হারাইবে তাহার তুলনায় উচ্চারণ-সৌন্দর্য্য কিছুই নহে।

সেন মহাশয় লিখিয়াছেন "অধিক স্বর লাগে বলিয়াই ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং টেলিগ্রাফের ভাষা বাঙ্গলা হওয়া কঠিন।" টেলিগ্রাফের ভাষা বাঙ্গলা হওয়া কঠিন স্বীকার করি, কিন্তু যে সকল বাঙ্গালী ব্যবসায়ী ইংরাজী জানে না তাহারা কি বাঙ্গলা ভাষায় ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতেছে না?

"ক্রোধ বা মদ্যের উত্তেজনা বশতঃ মনোভাব যখন দ্রুত বাহির হইতে চাহে তখন যাঁহারা ইংরাজী জানেন তাঁহারা ইংরাজীই বলিয়া থাকেন।" সেন মহাশয়ের এ কথাও একপক্ষে ঠিক নহে। কেহ কেহ ইংরাজীও বলেন আবার কেহ কেহ হিন্দীও বলেন। ইহার প্রধান কারণ এই যে, বাঙ্গলার বিশেষতঃ দক্ষিণ বাঙ্গলার লোকে স্বরের সংবৃত উচ্চারণের পক্ষপাতী (অর্থাৎ মুখটা যাহাতে বেশী ব্যাদান করিতে না হয়) মহাপ্রাণ বর্ণগুলিও তাঁহারা ভাল উচ্চারণ করিতে পারেন না। অর্থাৎ "জুতা" কথাটি তাঁহারা "জুতো" বলিয়া এবং "রাখিয়া" কে "রাকিয়া" বলিয়া উচ্চারণ করেন ইহাতে ভাষা ক্রমেই কোমল হইয়া পড়ে। তাই উত্তেজনার সময় হিন্দী বা ইংরাজী ভাষার আশ্রয় লইতে হয়। বড়লোক যখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন "কোই হ্যায়"—তখন বাঙ্গলায় "কেও আছে" বা ইংরাজীর "Is there any one" এই দুয়ের কোনটাতেই সেরূপ জোর প্রকাশ করিতে পারে না।

সেন মহাশয় বলেন "বাঙ্গলা অক্ষর লিখিতে ইংরাজী অপেক্ষা অধিক সময় ও শ্রম ব্যয়িত হয়।" কথাটা কি ঠিক? ইংরাজীর ছাপার অক্ষরের মত অক্ষর লিখিতে অধিক শ্রম ও সময় লাগিবে বলিয়া, ইংরাজীর হাতের লেখা দ্রুত লিখিবার জন্য অন্যরূপ করা হইয়াছে, তথাপি বাঙ্গলা কথায় উচ্চারণ প্রকাশ করিতে সময়ে সময়ে ইংরাজীতে লিখিতে গেলে বাঙ্গলা লেখা অপেক্ষা অধিকাংশ স্থলে অধিক সময় লাগে। বাঙ্গলা "শ্রম" কথাটা ইংরাজীতে লিখিতে গেলে Shram তখন কি অধিক সময় লাগে না? বাঙ্গলার "ভট্টাচার্য্য" ইংরাজীতে লিখিতে গেলে অধিক স্থান, শ্রম ও সময় লাগে যথা—Bhattacharya.

সেন মহাশয় বলেন "বাঙ্গলাভাষায় (?) এইরূপ দুর্ব্বহ হইবার অন্যতম কারণ এই যে, ইহাতে ক্রিয়া বিশেষণ পদ প্রস্তুত করিতে হইলে বিশেষণের সহিত "করিয়া" "ভাবে" "রূপে" প্রভৃতি একাধিক স্বর বিশিষ্ট প্রত্যয়ের একটা না একটা যোগ করিতে হয়। ইংরাজীতে ক্রিয়াবিশেষণ প্রস্তুত করিতে হইলে বিশেষণ পদে একটি একস্বর প্রত্যয় ly যোগ করিলেই হয়। সংস্কৃতে ম্ বা অনুস্বার যোগ করিলেই হয় অর্থাৎ মোটেই লাগে না।" আমি দুই, একটি উদাহরণ দিতেছি যেখানে বাঙ্গলার ক্রিয়া বিশেষণে স্বর বা ব্যঞ্জন মোটেই লাগে না যথা—শীঘ্র এস, ঠিক রেখো, চটপট্ খাও ইত্যাদি। বাঙ্গলায় যেখানে সংস্কৃত শব্দকে ক্রিয়ার বিশেষণ করা যায় সাধারণতঃ সেইখানেই "ভাবে," "রূপে" ইত্যাদি যোগ করিতে হয়। ইংরাজীতে বিশেষণ হইতে সাধারণতঃ ক্রিয়ার বিশেষণ হয় যথা Cautious হইতে Cautiously কিন্তু বাঙ্গলায় অনেক স্থলে বিশেষ্য হইতেই ক্রিয়ার বিশেষণ হয় যথা—সাবধানে চলে। সুতরাং ক্রিয়ার বিশেষণের জন্য বাঙ্গলা ভাষাটা দুর্ব্বহ হইয়াছে—এ কথা ঠিক নহে।

সেন মহাশয় বলেন "বাঙ্গলা দীর্ঘায়ত হইবার আর একটি কারণ এই যে, ইহাতে ক্রিয়াপদের বড় অপ্রচুরতা। * * * বহুতর ক্রিয়াপদ সেই সেই ক্রিয়াজ্ঞাপক সংজ্ঞার সহিত কৃ ও ভূ ধাতুর যোগ হইয়া নিষ্পন্ন হয়।" ইহাও ঠিক নহে। ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর বিদ্যানিধি এম্ এ, মহাশয়ের বাঙ্গলা ব্যাকরণের ১১২ পৃঃ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। "বাঙ্গলায় ৮ শত ধাতুর প্রচলিত আছে। চলিত সংস্কৃতেও ধাতুর সংখ্যা প্রায় এই। বাঙ্গলা প্রযোজক ধাতু (ণিজন্ত) গণিলে প্রায় এগার শত হইবে। (দ্বিরুক্ত ধাতু ধরিলে) বাঙ্গলায় প্রায় ১৫০০ ধাতু প্রচলিত আছে। বাঙ্গলা ভাষা দীনভাষা নহে।" তিনি kick শব্দের প্রতিশব্দ পদাঘাত করা বা লাথিমারা ভিন্ন জানেন না। কিন্তু "লাথিয়ে মুখ ভেঙ্গে দিব"—এরূপ প্রয়োগ বোধ হয় দক্ষিণ বঙ্গের

সকলেই জানেন। অভ্যাসের অভাবে অনেক শব্দই শ্রুতিকটু হয়—সুতরাং ভাষাবিৎ কোন পদকেই শ্রুতিকটু বলিতে পারেন না।

সেন মহাশয় বলিয়াছেন "বাঙ্গলায় যখন অন্য ধাতুর সহিত কৃ ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন রূপের যোগ করিয়া ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন করিতে হয় তখন তাহাতে যে কোন নাম ধাতুরূপে ব্যবহৃত হইয়া তাহা হইতে ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হইবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে না।" শোকের নাম হইতে বাঙ্গলায় নাম ধাতু নিষ্পন্ন হয় না এ কথা ঠিক বটে কিন্তু বাঙ্গলায় যত নাম ধাতু প্রচলিত আছে এত ধাতু সংস্কৃতে নাই। দুধ টকিয়া যায়, তেল লাগিলে ফোড়া বিষিয়ে উঠে, আমরা পরের দ্রব্য হাতাই, দুষ্টলোককে জুতাই, ছাত্রকে বেতাই, তাশ খেলিতে তাশাই—ইত্যাদি স্থলে অনেক পদার্থের নাম হইতে আমরা নাম ধাতু নিষ্পন্ন করিয়া থাকি।

সেন মহাশয়ের মতে "বাঙ্গলাভাষায় আরও কয়েকটা অভাব আছে। ইহাতে সর্ব্বনামের স্ত্রীপুরুষ ভেদ নাই। তিনি এবং সে স্ত্রীলিঙ্গেও ব্যবহৃত হয়, পুংলিঙ্গেও হয়। এই অভাব অনেক সময়েই অনুভব করিতে হয়।" অভাবটা মোটেই গুরুতর নহে বলিয়া আমার মনে হয়। উত্তম ও মধ্যম পুরুষের লিঙ্গ ভেদ কোন ভাষায় নাই। সংস্কৃতে ১ম পুরুষের অনেক সর্ব্বনামের লিঙ্গ ভেদ থাকিলেও ইংরাজী ও হিন্দীতে কেবল তিনি বা সে এই একটি মাত্র সর্ব্বনামের লিঙ্গ ভেদ প্রচলিত আছে। হিন্দীতে আবার ক্রিয়াতেও লিঙ্গ ভেদে ভিন্নরূপ বর্ত্তমান। তাহাতে হিন্দী ভাষার অসুবিধাই হইয়াছে। হিন্দীতে অচেতন পদার্থেরও (সংস্কৃতের ন্যায়) স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ ভেদ আছে। ইহাতে হিন্দীভাষা কঠিন হইয়াছে, কোন সুবিধাই হয় নাই। সুতরাং এ অভাবে বাঙ্গলাভাষার যে কোন ক্ষতি হইয়াছে এমন মনে হয় না। শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার শ্রীচন্দ্রশেখর কালী মহাশয় পুংলিঙ্গে "সে" ও স্ত্রীলিঙ্গে "সা" সর্ব্বনামের ব্যবহার করিয়া কর্ত্তা কর্ম্ম ও সম্বন্ধে "সা, সাকে ও সার" প্রয়োগ করিয়া একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি, পুস্তকখানি অবশ্য ছাপান হয় নাই।

সেন মহাশয় বলিয়াছেন, "ইংরাজীতে যৎ শব্দ (Relative pronoun) দিয়া যে বড় বড় বিশেষণ বাক্য (Adjective sentence ?—না, clause ?) রচিত হয় বাঙ্গলায় তদ্রূপ হয় না, ছোট ছোট বিশেষণ বাক্য রচিত হইলেও বিশেষ্যকে পুনরাবৃত্তি করিতে হয়।" বাঙ্গলাভাষার এই বিশেষত্ব সম্বন্ধে ১৩২২ সালের ১৩ই ফাল্গুনের হিতবাদীতে 'বর্ত্তমান বঙ্গভাষার প্রকৃতি" নামে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি :-

"বাঙ্গলাভাষার পদ বিন্যাস প্রণালীর বিশেষত্ব এই যে, যে বিশেষণ বিধেয় নহে তাহা বিশেষ্য, বিশেষণ এমন কি সাধারণ ক্রিয়ারও পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয়। এজন্য বাঙ্গালী লেখককে চিন্তার প্রণালীরও পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। হিন্দী ও ইংরাজীতে বিশেষণ পদ বহুল হইলে বিশেষ্যের পরে ব্যবহৃত হয়। এই সকল ভাষার লেখকগণের মনে বিশেষ্যটি প্রথমে উদিত হয়, তাহার পরে বিশেষণটি মনে পড়িলে লেখক বিশেষণগুলি ক্রমে লিখিয়া ফেলেন। *** (কিন্তু বাঙ্গলায় বিশেষ্যটি লিখিবার পূর্ব্বে) তাহার সমুদায় বিশেষণগুলি মনে মনে স্থির করিয়া লইয়া অগ্রে লিখিয়া ফেলি।"

এই বিশেষত্বে কোনরূপ দোষ নাই বরঞ্চ ইহাতে সুবিধা আছে। ইংরাজীতে বিশেষ্য পদটির পরে দীর্ঘ বিশেষণ বাক্য বলিতে বলিতে অনেক সময়ে মূল বক্তব্যটি ভুলিয়া যাইতে হয় ফলে কর্ত্তার ক্রিয়া দিতেও অনেক সময়ে ভুল হয়। কিন্তু বাঙ্গলায় সংস্কৃতের অনুকরণে যখন প্রারম্ভে "যৎ" শব্দ দিয়া দীর্ঘ বিশেষণ বাক্য আমরা ব্যবহার করি তখন একটা "তৎ" শব্দের ব্যবহার না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি না সুতরাং বাঙ্গলায় ইংরাজীর

ন্যায় ভুল হয় না। যাঁহারা অনবরত ইংরাজী পড়িয়া বাঙ্গলার এই বিশেষত্ব ভুলিয়া গিয়াছেন তাঁহারাই ইংরাজীর অনুকরণে ওলটপালট করিয়া বাঙ্গলা লেখেন। যথা "অথচ শ্রোতাদের শিক্ষা দিতে হলে আমাদের পক্ষে সেইরূপ বক্তৃতা করা আবশ্যক যা সকলের পক্ষে উপযোগী।" (সবুজপত্র ২য় বর্ষ দশম সংখ্যা ৬৮২ পৃঃ) এবং "প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সেই সকল বিদ্যারই চর্চ্চা হইত যাহা দ্বারা মানুষের জ্ঞান বাড়ে।" (প্রবাসী ১৩২২ ফাল্গুন ৪৪৭ পৃঃ।) ইংরাজীর এইরূপ বাক্য-বিন্যাস প্রণালী এই লেখকগণ অনায়াসে বাঙ্গলায় আমদানী করিতেছেন। ইংরাজী হইতে বাঙ্গলায় অনুবাদ করিবার সময় ইঁহাদিগকে কোনরূপ ভাবিতে চিন্তিতে হয় না। যদৃষ্টং তল্লিখিতং করিয়া গেলেই হইল।

"বাঙ্গলায় ক্রিয়াপদ বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়। ইহা অস্বাভাবিক। প্রথমে কর্ত্তা, কর্ত্তা হইতে ক্রিয়ার উৎপত্তি এবং কর্ম্মে তাহার অবসান। সুতরাং প্রথমে কর্ত্তা, মধ্যে ক্রিয়া এবং সর্ব্বশেষে কর্ম্ম, ইহাই স্বাভাবিক ক্রম।" সেন মহাশয়ের এই উক্তিরও মর্ম্ম বুঝা গেল না। বাক্যে কর্ত্তা ও ক্রিয়াই প্রধান অঙ্গ। কর্ত্তা ও কর্ম্ম অনেক স্থানে বাঙ্গলায় উহ্য থাকে। সুতরাং ক্রিয়াই শ্রেষ্ঠ অঙ্গ ইহা একপার্শ্বে মূলের ন্যায় থাকিবে। ক্রিয়া শুনিলেই বুঝা গেল বাক্যের শেষে আসিয়াছে। মূলের পরেও কর্ম্মের বা বাক্যের কোন অংশ থাকাই অস্বাভাবিক।

সেন মহাশয় ইংরাজী ভাষার সহিত তুলনা করিয়া আমাদের বাঙ্গলাভাষার ত্রুটি ও অঙ্গহীনতা দেখাইতে গিয়াছেন কিন্তু সেই ইংরাজী ভাষার Article, ভবিষ্যৎকাল সূচক Shall Will অতীতকালে বিভিন্ন ক্রিয়ার বিভিন্নরূপ, Has Had প্রভৃতির ব্যবহারের জন্য যে ইংরাজী ভাষা শুদ্ধরূপে ব্যবহার করা কত কঠিন সে কথা তিনি ভাবেন নাই। তাহা হইলে বলিতেন বাঙ্গলার তুলনায় ইংরাজী একটি জবরজঙ্গ ভাষা।

অতঃপর সেন মহাশয় বর্ণমালা সম্বন্ধে বলিয়াছেন "বোধ হয় কোন ভাষার বর্ণমালা সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ নহে। আরবীতে গ (এটা বোধ হয় ছাপার ভুল) ও চ নাই। * * * যখন বহু অনুশীলিত ভাষাগুলিরও বর্ণমালা এইরূপ অসম্পূর্ণ তখন আমাদের বর্ণমালা যে অসম্পূর্ণ হইবে তাহা বিচিত্র নহে।" বরঞ্চ তাঁহার বলা উচিত ছিল "আমাদের বা সংস্কৃত বর্ণমালায় যখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বর্ণ থাকাতেও, পৃথিবীর সকল ধ্বনি প্রকাশ করা যায় না সুতরাং অসম্পূর্ণ, তখন যে অন্য ভাষার বর্ণমালা আরও অসম্পূর্ণ হইবে তাহা বিচিত্র নহে।" বর্ণমালার কথা বলিতে গেলে বাঙ্গলার বর্ণমালা সংস্কৃত হইতে গৃহীত। সংস্কৃতের ন্যায় আরবী, পারসী, ইংরাজী বা ইটালীয়ান ভাষাকে বহু অনুশীলিত ভাষা বলা যায় না। আরবীতে শুধু গ ও চ বলিয় নহে, ট ও ড অক্ষরও নাই।

ইংরাজীর ২৬টা অক্ষরেই কাজ চলিয়া যাইতেছে এ কথা ঠিক নহে। নিজের ভাষার ধ্বনি প্রকাশ করিবার জন্য সকল ভাষার বর্ণমালাতেই কাজ চলিয়া যায় কিন্তু অপর ভাষার ধ্বনি প্রকাশ করিতে হইলে অনেক স্থানে কাজ অচল হইয়া উঠে। বাঙ্গলার ত, দ ও ড় ধ্বনি প্রকাশ করিতে হইলে ইংরাজীতে চিহ্নিত T D ও R দেওয়া হয়। কিন্তু সাধারণ ছাপাখানায় সেগুলি থাকে না বলিয়া অচিহ্নিত অক্ষরই ব্যবহৃত হয়। তাহার ফলে অজ্ঞাত বাঙ্গালীয় নাম বাঙ্গালীর নিকটেই উচ্চারণে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, ইংরাজের তো কথাই নাই। "মুড়োরই" ষ্টেশন ইংরাজী অক্ষরের কৃপায় "মুরারই" হইয়াছে এবং পরীক্ষার ফল বাহির হইবার সময়ে "হাটি" উপাধিধারী বালক বাঙ্গলা কাগজে "হাতী" উপাধি পাইয়াছে। চিহ্নিত অক্ষর ও পৃথক অক্ষরে বড় বেশী বিভিন্নতা নাই। উভয় ক্ষেত্রেই ছাপাখানার অক্ষর বাড়ে। আর হাতের লেখায় চিহ্নিত অক্ষর অনেকেই চিহ্ন দিতে ভুলিয়া যান অথবা মনে করেন, পাঠক চিন্তাভাবেও ঠিক পড়িয়া লইবে।

বর্ণমালার পরিবর্ত্তন লইয়া দুইটি পৃথক্ প্রকারের সমস্যা দাঁড়াইয়াছে। (১) যে ধ্বনি আমাদের বর্ণমালায় নাই অথচ আরবী ফার্সি ও ইংরাজীর সংশ্রবে আসিয়া আমাদের বর্ণমালার দ্বারা সেই ধ্বনি প্রকাশের আবশ্যকতা দাঁড়াইয়াছে, তাহা প্রকাশের জন্য একটা কিছু উপায় করা। (২) আর এক সমস্যা ছাপাখানায় সুতরাং ভাষার অসংখ্য প্রকারের সাধারণ ও যুক্তাক্ষর থাকায় ভাষাটা টেলিগ্রাফ বা টাইপরাইটিংএর অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে সুতরাং ইহার অক্ষর সংখ্যা কমাইতে হইবে। রায় বাহাদুর শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় এ সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়াছেন। বাঙ্গলায় ইংরাজীর সংশ্রবে প্রধানতঃ তিনটি ধ্বনির বর্ণের অভাব ঘটিতেছে "বেটায়" (ব্যাটা) একারের বক্র উচ্চারণ এবং ইংরাজী Z ও W এর ধ্বনি প্রকাশের কোন বর্ণ বাঙ্গলায় প্রচলিত নাই। অন্তঃস্থ "ব" বা ইংরাজী W এর ধ্বনির জন্য তিনিও দেবনাগরী ৰ চালাইতে চাহেন। "Z" এর ধ্বনির জন্য তিনি কোন প্রকার ব্যবস্থা করিতে চাহেন না। ইহার কারণ ইহাই অনুমিত হয় যে, বাঙ্গলার জ এর উচ্চারণ রাঢ়ে ঠিক "জ" কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে "Z"। সুতরাং "Z" এর ধ্বনিবাচক "বর্ণ" এর উচ্চারণ পূর্ব্ববঙ্গে ঠিক হইবে কিন্তু রাঢ়ে হইবে "জ" অর্থাৎ বর্ত্তমান বর্গীয় "জ" ও "Z" এই উভয় প্রকার অক্ষরেরই এক উচ্চারণ হইবে রাঢ়ে, অন্য প্রকার হইবে পূর্ব্ববঙ্গে। "বেটা" য় "এ"র বক্র উচ্চারণ প্রকাশ করিবার জন্য তিনি প্রথমে প্রস্তাব করেন যে, ছাপাখানার অক্ষর না বাড়াইয়া " ে " উল্টাইয়া দিয়া এই ধ্বনি প্রকাশ করা হউক। কিন্তু তিনি শেষে এ প্রস্তাবও পরিত্যাগ করেন, শব্দদোষে এরূপ উল্টান একারের প্রয়োগ নাই। ইহারও কারণ ইহাই অনুমিত হয় যে, কোন কোন শব্দের "এ" কারের এক স্থানে সাধারণ উচ্চারণ অন্য স্থানে বক্র উচ্চারণ। যোগেশবাবু আর একটি সমস্যা দাঁড় করাইয়াছেন—তিনি বলেন "গু" না লিখিয়া "গু" এবং "ক্ত" না লিখিয়া "ক" এর নীচে একটা "ত" লিখিয়া একটা পরিবর্ত্তিত যুক্তাক্ষর করিলে প্রথম প্রকারে অক্ষর সংখ্যা অল্প হইবে আর ২য় প্রকারে যুক্তাক্ষরের রূপ প্রথম শিক্ষার্থীর সহজে আয়ত্ত হইবে। সুতরাং দেখিতে গেলে আমাদের বর্ণমালা লইয়া তিনটি সমস্যা দাঁড়াইয়াছে। তিনটির একসঙ্গে সমাধান করিতে হইলে দাঁড়ায় এই যে, বর্ণমালার সংখ্যা কমাইতে হইবে অথচ প্রয়োজনীয় নূতন ধ্বনিও প্রকাশ করিতে হইবে। আবার হাতের লেখায় দুটি অক্ষরে গোলমাল না হয়, সহজে পড়া যায় অথচ দ্রুত লেখা যায়। এদিকে আবার যুক্তাক্ষরের রূপ এমন হইবে যে প্রথম শিক্ষার্থী সহজেই দুটি অক্ষরের যোগ দেখিয়া পড়িয়া ফেলিবে। অর্থাৎ এক কথায় "ব্রাহ্মণের গরু" হইবে, খাইবে কম অথচ দুধ দিবে বেশী। এই তিন সমস্যার পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা করা যাউক।

ইংরাজীতে দেখা যায় "চ" ধ্বনি ছিল না, বর্ণও ছিল না পরে দুই বর্ণে মিলিয়া "চ" হইয়াছে। সংস্কৃত বর্ণমালার সমস্ত ধ্বনি প্রকাশ করিবার জন্য Transliteration (লিপ্যন্তর) এর একটা মোটামুটি নিয়ম উইল্‌সন্ সাহেব না কে করিয়াছিলেন তাহাতে কতকগুলি চিহ্নিত অক্ষর দ্বারা কাজ চালাইবার ব্যবস্থা হয় কিন্তু কার্য্যতঃ দেখিতে পাই সে চিহ্নগুলি বড় একটা কেহ ব্যবহার করেন না যথা অকার ও আকার উভয় স্থলেই আমরা এখন ইংরাজীর অচিহ্নিত a দিয়া থাকি। বিলাতের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় এখন "চ" ধ্বনি প্রকাশ করিতে "c" অক্ষর দেওয়া হয় এবং ১১টি চিহ্নিত অক্ষর দ্বারা ঋ, ঙ, ঞ, ট, ড, প্রভৃতি ধ্বনি প্রকাশ করা হয়। এইরূপ ১১টি চিহ্নিত অক্ষর দিয়া আরবীর কতকগুলি ধ্বনি এবং আরও তিনটি চিহ্নিত অক্ষর দ্বারা পারসীর ধ্বনি প্রকাশের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং বলিতে গেলে ইংরাজীতে ২৬টি অক্ষর ব্যতীত এই ২৫টি অতিরিক্ত অক্ষর হইয়া দাঁড়াইতেছে; কারণ এগুলি বাস্তবিকই পৃথক টাইপ।

ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় ২৩শ ভাগ ৪র্থ সংখ্যা পরিষৎ পত্রিকায় "বঙ্গাক্ষরের সাহায্যে আরবী ও

১০টি ধ্বনি বাঙ্গলা অক্ষরের নীচে চিহ্ন দিয়া প্রকাশ করা হউক। তিনি "ফে" অক্ষরটির ধ্বনি বাঙ্গলা "ফ" দিয়া প্রকাশ করিতে চাহেন। ইহা ঠিক নহে। ইহার জন্য আর একটা চিহ্নিত অক্ষর ব্যবহার করিলে মোট ১১টি দাঁড়ায়। ইহার উপর ইংরাজীর a র short উচ্চারণ, w, v এবং আরবীর "আয়েন" অক্ষরের ধ্বনি প্রকাশ করিতে আরও ৪টি চিহ্নিত অক্ষর ব্যবহার করিলে মোট ১৫টি চিহ্নিত অক্ষরে কাজ চলিবে। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বর্ত্তমান বৎসরের বৈশাখ মাসের প্রবাসী পত্রিকায় "বাঙ্গলা বানান সংস্কার" নামক প্রবন্ধে একটি প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে তিনি ৬টি চিহ্নিত অক্ষরদ্বারা ইংরাজী, আরবী ও পার্শীর যে ধ্বনি বাঙ্গলায় নাই তাহা প্রকাশ করিতে চাহেন। সুনীতি বাবু অক্ষরের দক্ষিণ পার্শ্বে একমাত্র ফুলষ্টপ্ চিহ্নদ্বারা কাজ সারিতে চাহেন। ইহাতে এক পক্ষে বেশ সুবিধা, ছাপাখানার অক্ষর বাড়িবে না। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় তাঁহার নব প্রকাশিত বাঙ্গলা ভাষার অভিধানে ১৮টি চিহ্নিত অক্ষর দ্বারা বিভিন্ন ভাষার ধ্বনি প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইনিও পার্শ্বে ফুলষ্টপ্ দিয়াই কাজ সারিয়াছেন কিন্তু জ্ঞানেন্দ্র বাবু বা সুনীতি বাবু কেহই একারের বক্র উচ্চারণের দিতে অনুগ্রহ দৃষ্টি করেন নাই। ইহার ফলে জ্ঞানেন্দ্র বাবুর অভিধানে "এক"র উচ্চারণ স্থলে লেখা হইয়াছে অ্যাক আবার কেহ ইহার উচ্চারণ স্থলে লিখিয়া থাকেন "য়্যাক"। আমার মনে হয় "এক"র উচ্চারণ "য়াক" লিখিলেই ঠিক হইত। যাহা হউক এই অবান্তর কথা ছাড়িয়া মূল বিষয়ের অবতরণা করা যাউক। নীচে চিহ্ন দিলে অক্ষর সংখ্যা বাড়ে বটে কিন্তু পার্শ্বে চিহ্ন দিলে হাতের লেখায় চিহ্ন পড়া বড় সহজ হইবে না। অতি সাবধানে লিখিলে চিহ্নগুলি পড়া যাইতে পারে কিন্তু দ্রুত লেখা ও সাবধানে লেখা এই উভয় কার্য্য পরস্পরের বিরোধী। সুতরাং দুষ্পাঠ্য উর্দ্দু লেখার ন্যায় চিহ্নিত অক্ষরগুলির দুর্দ্দশা হইবে। কারণ আলস্যবশতঃ অনেকেই চিহ্ন দিবে না। তাই আমার মনে হয় অভিধানকার যতগুলি ইচ্ছা চিহ্নিত অক্ষর ব্যবহার করুন না কেন, সাধারণ লেখা-পড়ায় ৫।৬টির অধিক চিহ্নিত অক্ষর ব্যবহার করিলে বাঙ্গালীর নিকট অনাদৃত হইবে। ইংরাজীর a র short উচ্চারণ, w ও z র জন্য তিনটি এবং আরবী পার্শীর বড়িকাফ, খে ও গায়েনের জন্য ৩টি। আর চিহ্নগুলি বিন্দু চিহ্ন না করিয়া নীচে ড্যাশ চিহ্ন করা ভাল। এই চিহ্নিত অক্ষরগুলির দেশময় প্রচলন করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া বর্ণপরিচয় পুস্তকে প্রথম ৩টী এবং প্রথমশিক্ষা ভারত ইতিহাসে শেষের ৩টি চিহ্নিত অক্ষরের প্রচলন শুরু করা উচিত।

এইবার অক্ষর সংখ্যা কমাইবার কথা বলিব। ৠ, ঌ, ৡ এই তিনটি অক্ষরের বাঙ্গলায় প্রচলন নাই সুতরাং এগুলি বর্ণমালায় নাই বলিলেই হয়, দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণ বাঙ্গলায় নাই বলিয়া কেহ কেহ প্রস্তাব করিতেছেন ঈ, উ বাঙ্গলা হইতে উঠাইয়া দিলে চলে। কিন্তু তাহা হইলে সংস্কৃতের সহিত পার্থক্যটা বড় বেশী রকমের দাঁড়াইবে, এখন বাঙ্গালীর ছেলের সংস্কৃত পড়িতে তেমন কষ্ট হয় না। এরূপ বানান পরিবর্ত্তন করিবার আগে দেখা উচিত অন্য ভাষায় কে কি করিতেছে। উর্দ্দু লেখা ভাল পড়া যায় না বলিয়া যুক্তপ্রদেশে স্কুল কলেজ ও আদালতে রোমান অক্ষরে উর্দ্দু লেখাপড়া করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাতে প্রধান আপত্তি হয় যে, উর্দ্দুর ৩।৪ রকমের "স" এক ইংরাজী s দিয়া লিখিলে উচ্চারণ কিছু বিগড়াইবে এবং আরবী পার্শীর মূল ধরিতে পারা যাইবে না। ইংরাজ স্বয়ং কি করিয়াছেন? ইংরাজীতে লেখা asked কিন্তু পড়া যায় "আস্কট"। এই d এর স্থানে t করিতে ইংরাজ কিছুতেই রাজি হয় নাই। তবে আমরাই বা সংস্কৃতের পুরাতন বানান ছাড়িব কেন? তবে ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে বোধ হয় য় কিম্বা য বাদ দেওয়া যাইতে পারে। হিন্দীর ন্যায় যেখানে "জ"র ধ্বনি সেখানে "জ" এবং যেখানে "ইয়" (ya) ধ্বনি সেখানে য় কিম্বা য এই দুয়ের একটী রাখা যাইতে পারে। কলিকাতার উচ্চারণে "ঢ়" নাই। কলিকাতার লোকে লেখেন "আষাঢ়" কিন্তু পড়েন "আষাড়"। সুতরাং সংস্কৃতের বানানের

দোহাই না দিলে "ঈ ঊ" এর ন্যায় "ঢ়"কেও বাদ যাইতে পারিত। "ঞ"র পৃথক্ ব্যবহার বাঙ্গালায় নাই। চ বর্গের সহিত যুক্তাক্ষরে আছে। তবুও যুক্তাক্ষরের খাতিরে ইহাকে রাখিতে হইবে। তবে হিন্দীর ন্যায় বর্গের পঞ্চম বর্ণের দ্বিত্ব স্থলে প্রথম বর্ণের পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র বৃত্তের ন্যায় একটি গোল বিন্দু দিয়া লেখা যায় তবে ঞ এবং ঙ্গ, ন্ন, ম্ম বর্ণমালা ও যুক্তক্ষর হইতে বাদ পড়িতে পারে। যথা বা ০ ছা=বাঞ্ছা, ত ০ ন=তন্ন। এরূপ গোল বিন্দুকে ং র স্থানে বসাইয়া অনুস্বার বলা যাইতে পারে। ইহাই যোগেশবাবুর পরামর্শ। আমার মনে হয় ইহা সমীচীনও বটে।

যোগেশবাবু কতকগুলি যুক্ত বর্ণের রূপসম্বন্ধে বলিয়াছেন "রু শু গু রূ হৃ শ্রু ত্রু" প্রভৃতি রূপ না লিখিয়া "রু শু গু রূ হৃ শ্রু ত্রু" রূপ হওয়া উচিত। কিন্তু ইহার সম্বন্ধে দুই দিক দিয়া আপত্তি চলে। তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিলে কম্পোজিটারের টাইপের ঘর কমিবে কিন্তু তাহার পরিশ্রম বাড়িবে। সে "রু" এই একটী অক্ষর দিয়া কাজ চালাইত, সেখানে তাহাকে "র" ও "ু" এই দুইটী অক্ষর বসাইতে হইবে।*

আবার হাতের লেখায় "গু" লিখিতে একটান লাগে, "গু" লিখিতে দুইবার কলম তুলিতে হয় তাহাতে সময় লাগে। "হ" এর নীচে ঋকার দিলে পংক্তির বহু নিম্নে ঋকার আসিয়া নিম্নের পংক্তির সহিত মিলিয়া যাইবে। প্রায় প্রত্যেক অক্ষর সম্বন্ধেই এক একটা সুবিধা দেখিয়া এইরূপ পৃথক্ আকার প্রচলিত হইয়াছিল। তবে যদি সরলরূপ রাখিবার ব্যবস্থাই হয়, তবে ছাপাখানায় চলুক, হাতের লেখা যেমন ছিল তেমনই থাকুক। ইংরাজীতে ইহার নজীর আছে।

সেন মহাশয় বলেন "পূর্ব্ববঙ্গে ও আসামে চ ও ছ স বা s রূপে উচ্চারিত হয়, "কিন্তু কথাটা আমার ঠিক বলিয়া মনে হইতেছে না "চ"র রাঢ়ের ধ্বনি তালব্য এবং পূর্ব্ববঙ্গের ধ্বনি দন্ত্য-তালব্য। সেই জন্য পূর্ব্ববঙ্গের "চ" এর উচ্চারণ "স" এর কাছাকাছি তবে ঠিক "স" নহে। একটু উচ্চারণে পার্থক্য আছে। রাঢ়ের "চ" উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগের পরবর্ত্তী অংশ ঠিক সেই স্থান স্পর্শ করে, আর অগ্রভাগ যুক্ত থাকিয়া তালু ও দন্তের মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে যৎসামান্য দূরে থাকে। কিন্তু "স" উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ দন্তের অতি নিকটে থাকে আর কোন অংশই তালু স্পর্শ করে না! সেন মহাশয় বলিয়াছেন "পূর্ব্ববঙ্গের অশিক্ষিত লোক কোন বর্গের চতুর্থ বর্ণ উচ্চারণ করিতে পারে না। যথা তাঁহারা লেখেন "দেখা" "বাঘ" কিন্তু পড়েন "দ্যাকা" "বাগ"।

সেন মহাশয়ের প্রবন্ধের যে অংশ পৌষের পরিচারিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে "সক্ষম" কথাটিকে অশুদ্ধ বলা হইয়াছে। কিন্তু স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে সমর্থ অর্থে সক্ষম কথাটি শুদ্ধ। তাঁহার "ভ্রান্তিবিনোদ" পুস্তকের (২য় সং) ১৫১ পৃষ্ঠার পদটীকায় আছে, "ক্ষম শব্দ 'শেষও বিশেষ' এর ন্যায় কখনও বিশেষ্য কখনও বিশেষণ। কর্ত্তৃবাচি অচ্ প্রত্যয়ান্ত ক্ষম বিশেষণ, অর্থ সমর্থ। ভাববাচি ঘঙ্ প্রত্যয়ান্ত ক্ষম বিশেষ্য অর্থ সামর্থ শক্তিমত্তা (মত্তা হেতু উপান্ত আকারের বৃদ্ধি নিষেধ) সুতরাং সক্ষম ও সামর্থ এই উভয় একার্থবোধক।"

সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা লইয়া বহু তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। ইহার শেষ আপীলে স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রকারান্তরে সাধুভাষাকেই ডিক্রি দিয়াছেন কারণ তাঁহার "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" "আমার ধর্ম্ম" প্রভৃতি প্রবন্ধ (আমার যতদূর স্মরণ হয়) এই সাধুভাষায় লিখিত। "আলালের ঘরের দুলাল" ও "হুতোম পেচার নক্সা"র

* ইংরাজীতেও কম্পোজিটরের শ্রম লাঘবের জন্য ct, fi, fl, ffl প্রভৃতি যুক্তাক্ষর আছে।

পরে বোধ হয় আর কেহ সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক চলিত ভাষায় পুস্তকে লিখিবার জন্য বহুদিন চেষ্টা করেন নাই। পরে স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশামৃত তাঁহার স্বকীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়। স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের নাটকেও প্রথম প্রথম চলিত ভাষা থাকিত না, শেষে বোধ হয় তিনি সামাজিক নাটকে ঘটনাকে বাস্তব করিবার জন্যই কথোপকথনে চলিত ভাষার প্রয়োগ করিয়াছিলেন।* রবীন্দ্রনাথের "ছিন্নপত্র" প্রকাশিত হইলে তাঁহার শিষ্যদল একটা কিছু নূতন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। তাহার ফলেই ক্রিয়ার ভাঙাযোড়া রূপ সাহিত্যে প্রচলন হইতে আরম্ভ হইল এবং "হালুম', প্রতায়ান্ত "খেলুম" বাঙ্গালীর কুঞ্জে দর্শন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র পড়িয়া একটা বেশ আনন্দ পাওয়া যায়, তিনি কবি মানুষ, বেশ সরল করিয়া চিঠিগুলি লিখিয়াছেন কিন্তু তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যদল হইতে যে সবুজভাষার জন্ম হইয়াছে তাহা এতই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলা হয় যে রস সৃষ্টির পরিবর্ত্তে রস জমিয়া জমিয়া কঠিন প্রস্তরের সৃষ্টি হয়। তখন সাধারণ লোকের ত কথাই নাই, সাহিত্যিকের পক্ষে দন্তস্ফুট করা সাধ্যাতীত হইয়া পড়ে। কলিকাতার ভাষায় প্রকাশিত শিশুপাঠ্য সরল পুস্তকের সহিত পাছে ইহা একশ্রেণী-ভুক্ত হইয়া পড়ে, তাই এই ভাবের হেঁয়ালীর জন্ম। তাহাতে ভাষার প্রধান উদ্দেশ্য—অপরের নিকট নিজের মনোভাব প্রকাশ ব্যক্ত হইয়া পড়ে। সাধুভাষার কোন স্থানে বুঝিতে না পারিলে অভিধানের সাহায্য পাওয়া যাইত। ইঁহাদের ভাষার বেলা সে উপায়ও নাই।

এই "বাংলা" ভাষার লেখকগণ ভাষা জননীকে আটপৌরে বেশ পরাইতে চাহেন কিন্তু নিজের নামটি বেশ সাধুভাবে লিখিবেন "শ্রীসত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।" অথচ তাঁহাকে হয় ত পাড়ার লোকে বলে "সাতু", বাড়ীতে বলে "ভুতো" আর ইতর লোকে বলে "বাঁড়ুজ্জে মোশায়।" এমন কি স্যর কবীন্দ্র রবীন্দ্রকেও আমরা চলিত কথায় বলি "রোবি ঠাকুর।" (কবিবর আমাকে ক্ষমা করিবেন।) তবে বাঙ্গলাদেশের ভাঙাযোরা ক্রিয়াগুলিকেই কেন এত জোর করিয়া ইঁহারা পুস্তকের মধ্যে স্থান দিতে চাহেন ইহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না।

প্রাদেশিক চলিত ভাষায় পক্ষে একটা খুব বড় যুক্তি এই যে, ইহা চলে সুতরাং সাধুভাষাটা অচল অর্থাৎ জড় অর্থাৎ মৃত। কিন্তু মৃত সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যের সৌন্দর্য্য জগৎ প্রসিদ্ধ। আর চির-পরিবর্ত্তনশীল সচল প্রাকৃতের সাহিত্য অতীতের সমাধি হইতে কীটদষ্ট অবস্থায় দুই এক খানি করিয়া বাহির হইতেছে। সৌন্দর্য্য সৃষ্টির জন্য ভাষা সচল না হইয়া সিংহাসনে বসিয়া থাকুন আমরা যাহার যেমন সাধ্য বেশভূষা পরাইয়া সুন্দর করি আর সচল ভাষা আমাদের গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত থাকুন। তিনি আমাদের আটপৌরে ভাষা। এ ভাষা লইয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে দশজনের সাক্ষাতে বাহির হইতে আমাদের স্বতঃই কেমন কুণ্ঠা হয়।

শ্রীরাখালরাজ রায়।

* মিত্র মহাশয় বা স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কেহই চলিত ভাষায় সবুজপত্রের "খেলুম" ক্রিয়া প্রয়োগ করেন নাই

একাগ্রতা।

——(*)——

(চীনা কবি ছু-কঙ হইতে)

রহ—'হাও' পাহাড়ের সারসের মত এক পায়ে এক
কর—'হুয়া' পাহাড়ের মেঘের মতন বিরলে অশ্রুবৃষ্টি।
রহ—তার পথ চেয়ে অসীম ধৈর্য্যে— এমনি দিবস রাত্র,—
তবে—একদিন বুকে ধরা দিবে তব চির প্রণয়ের পাত্র।
সে যে—পড়ে নাক ধরা মত্ত ব্যাকুল প্রয়াসে পিয়াসে বক্ষে.
সদা—ধরা পড়'-পড়' পরশ দিয়েও ধূলি দিয়ে যায় চক্ষে।

শ্রীকালিদাস রায়

বিদ্যারণ্য।

-:*:-

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

নর—

মাধবাচার্য্য ... ... ভাবী বিদ্যারণ্য স্বামী; স্বনাম প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও ধর্ম্মপ্রচারক।

বিদ্যাশঙ্কর তীর্থ ... শৃঙ্গেরি মঠের বর্ত্তমান শঙ্করাচার্য্য, বিদ্যারণ্যের গুরু।

মহারাজা জম্বুকেশ্বর ... বিজয় নগরের রাজা।

হরিহর রায় ... যাদববংশীয় রাজকুমার, পরে বিজয় নগরাধিপ।

বিনায়ক রায় (বুক্কা রায়)... ঐ পরে রাজসেনাপতি।

মক্তবুব খাঁ ... ... পাঠান সেনাপতি।

কম্প, মারপ্প, মুদপ্প ... রাজ ভ্রাতাত্রয়।

দয়াল রায় ... ... সর্দ্দার, কিছুদিনের জন্য রাজা।

মন্ত্রী, সেনাপতি, সেনানায়ক, পারিষদবর্গ, সৈন্যগণ, নাগরিকগণ, যতিবৃন্দ, প্রতিহার ইত্যাদি।

নারী—

নাগাম্বিকা ও অম্বিকা ... বিজয়নগরের রাজমহিষীদ্বয়।

সত্যবতী ... ... ঐ কন্যা।

অম্বালিকা ... ... অনাথা রমণী।

অলোকা ... ... ঐ কন্যা।

মাধবী, মুরজা, ঐন্দ্রিলা, যমুনা, ঊর্ম্মিলা প্রভৃতি দেবদাসীগণ, নর্ত্তকীগণ, রমণী, বালিকা, গ্রাম্যরমণীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম দৃশ্য।

(প্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বরী দেবীর বিশাল মন্দির, পুরোহিত সায়ন বৃদ্ধ, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পণ্ডিত মাধবাচার্য্য উত্তরাধিকার সূত্রে পৌরোহিত্যে ব্রতী হইয়াছেন। মাধব নানাশাস্ত্রজ্ঞ সুলেখক ও তত্ত্বজ্ঞানী, কিন্তু দারিদ্রক্লেশে পরিক্লিষ্ট।)

(মন্দিরাভ্যন্তর—সম্মুখে দেবীপ্রতিমা,)

পুজাপরায়ণ মাধব। "দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্।
বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্॥
বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশোদেহি দ্বিষোজহি।"

(বদ্ধাঞ্জলী হইয়া সকাতরে) -মা, মা, জননি! আর কত কাল—আর কত কাল এই দারিদ্র কুম্ভিপাকে পাক খাওয়াবি মা? ব'লে দে জননি! কৃপা ক'রে আজ ব'লে দে, কোন দিন এ যন্ত্রণানলের নির্ব্বাণ ঘট্‌বে কিনা? এইটুকু শুধু বল্! কালধর্ম্মে দেশের প্রধান যারা তারা ঐশ্বর্য্য মদান্ধ! স্বার্থানুসন্ধানে ব্যাপৃত! দেশে গো-ব্রাহ্মণ দরিদ্র ও সাধুসেবা বিলুপ্ত প্রায়। আর কার নিকট প্রাণের ব্যথা জ্ঞাপন করতে যাব? তাই তোমার দ্বারে এ'সেছি মা! মা কখন সন্তানের সুখ দুঃখে উপেক্ষা করতে পারেন না, অধীত বিদ্যা অন্নাভাবে বিস্মৃত প্রায়। সাধন ভজনে মন দিতে পারিনে। ইহ-পর কোন লোকেরই সম্বল সংগৃহীত হ'ল না; দাও মা, বাঞ্ছাপূর্ণকারিণি! বাঞ্ছিত ধনদানে এ দারুণ দারিদ্র বিপাক হ'তে উত্তীর্ণ ক'রে দাও। ইষ্টদেবি! বরপ্রদা হও। (ধ্যানমগ্ন—কিয়ৎকাল পরে চক্ষু মেলিয়া—) একি! এ কে আমার কানের কাছে—আমার মনের মধ্যে, এ কি মধুর বংশী রবে, আমার নাম ধ'রে ডে'কে এ কি কথা ক'য়ে গেল! বিদ্যুতের চকিত স্ফুরণের মতই তাঁর ক্ষণাবির্ভাব এক নিমেষে যেন আমার এই অবসাদ অভাবগ্রস্ত হৃদয়টাকে কি এক অপূর্ব্ব আনন্দালোকে আলোকিত ও পুলকিত ক'রে ফেলেছিল। শত বিশোকা জ্যোতিঃ এক সঙ্গে দীপ্তিময়ী হ'য়ে উ'ঠে সে এক আলোক তরঙ্গেরই সৃষ্টি করলে। সেই আলোর মধ্যে আরো উজ্জ্বল সমধিক প্রদীপ্ত সেই মূর্ত্তি! কোটি চন্দ্র-সূর্য্যও তাঁর দেহ-জ্যোতিঃর কাছে হার মানিতে বাধ্য হয়। সে আমার সর্ব্বসৌন্দর্য্যের সারভূতা সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী মাতৃমূর্ত্তি। মার মুখে সদানন্দময় অভয় হাস্য তথাপি যেন কি একটু বিষাদেরও ছায়া, মা আমার পানে চেয়ে ব'ল্লেন—মাধব! এ দেহে তোমার ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি অসম্ভব! সে আশা পরিত্যাগ কর। কিন্তু আমার বরে দেহান্তরে তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হবে।" মুহূর্ত্তে বিদ্যুৎবরণী বিদ্যুতের মতই মিশিয়ে গেলেন। মা, মা মাগো! আর একবার আয়, ফিরে আয় মা! তোর ঐ কোটিশশীলাঞ্ছিত অপরূপ রূপরাশি বারেকের জন্য প্রদর্শন করে, এ জীবন সফল করি। সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ি! কি ছার ঐশ্বর্য্য কামনায় মূঢ় আমি এতদিন বৃথা কাল ক্ষেপণ করলাম। তোর ঐ রক্তকোকনদ চরণ ছায়াতলে, বিশ্বের সমস্ত ঐশ্বর্য্য যে লজ্জা-ম্লানমুখে পতিত রয়েছে! ঐ অবিনশ্বর চরণে শরণ না নিয়ে, তুচ্ছ নশ্বর-পদার্থের সাধনায় এত বড় মানব জন্মের অমূল্য সময় নষ্ট

করলি ? আরে অভাগা মাধব ! তোর মত হতভাগা এ সংসারে আর কয়জন আছে ? (যুক্তপাণি) মাগো ! নেত্রহীন সন্তানের জ্ঞাননেত্র প্রদান করেছিস্, তবে আর যেন সে নেত্রে মোহাঞ্জন লিপ্ত করে দিস্‌নে। আজ হ'তে মাধবের নবজীবন হোক। তার এই মূঢ় বিষয়-বাসনা, চির অস্তমিত হ'য়ে, এ হৃদয়ে একমাত্র জ্ঞান-পিপাসা মাত্র স্থান লাভ করুক। অনেক সময় বৃথা নষ্ট করেছি—আর যেন না করি মা !

"প্রাগ্দেহস্থো যদাসং তব চরণযুগং নাশ্রিতো নার্চ্চিতোঽহম্।
তেনাহং দুঃখবর্গৈ র্জঠর জননজৈর্বাধ্যমানো বলিষ্ঠঃ।
নীত্বা জন্মান্তরং মে পুনরিহ ভবতা ক্বাশ্রয়ো নেতি জানে।
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে ॥"

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান শৃঙ্গেরি, কাল অপরাহ্ন।

[সন্ন্যাসাবেশে পাষাণোপরি উপবিষ্ট মাধব]।

মাধব। (আত্মগত) কি নির্ম্মল শান্ত ! এই শান্তময়ী তপোবনটী যেন আমার অন্তরেরই প্রতিরূপা ! এর কোথাও কোন শব্দ নাই, বায়ুও যেন এখানে সাড়া দিতে ভয় পায়। না ভয়ের এখানে স্থান কোথায় ? এখানে কোনরূপ চাপল্য যেন আত্মপ্রকাশ করতেই অক্ষম। এই সানন্দা প্রকৃতির মধ্যে বিন্দুমাত্রও লঘুত্ব নাই। পাখিরা পুলকে নাচে, জীব-জন্তু আনন্দে ক্রীড়া করে, কিন্তু কদাপি এখানের অবিচ্ছিন্ন শান্তি ভঙ্গ করে না। তপস্যার কি আশ্চর্য্য প্রভাব ! এই শৃঙ্গেরির উপত্যকায় আজ আমি স্বচক্ষে দে'খেছি, চিরহিংস্র বনের ব্যাঘ্রও তার স্বভাব-হিংসা পরিত্যাগ করে, আমার পদপ্রান্তে যেন প্রণত হ'তে এ'লো। আর এও এক অভূতপূর্ব্ব কাণ্ড ! আমার নিজের চিত্তেও ত কই পূর্ব্বের ন্যায় সেই করাল-কাল-স্বরূপ ভীষণকায় নর-রক্তলোলুপ ব্যাঘ্র দর্শনে ভীতির উদ্রেক মাত্র হয়নি ! বরং সেই ব্যাদিত-বদন শার্দ্দূলকে তীব্রবেগে আমার দিকে ফিরতে দেখে, যেন কি একটা প্রচ্ছন্ন বাৎসল্যরসে আমার সমস্ত হৃদয় আপ্লুত হ'য়ে গেল। অন্তরাত্মা যেন ডেকে বল্‌ল—আয় বৎস ! কোথা শান্তিহারা হ'য়ে একা ভ্রমণ করছিস্ ! আমার কাছে আয় শান্তি পাবি ! মুহূর্ত্তে উন্নতশির অবনমিত করে সেই পরাক্রান্ত শার্দ্দূলরাজ নমস্পর্শ সেবকের মত আমার পদপ্রান্তে পতিত হ'লো ! ধন্য যতিরাজ ! ধন্য তোমার পুণ্য বল ! তোমার যোগপ্রভাবের সীমা নাই ! আমারও জীবন সহস্রবার ধন্য। যেহেতু এমন যোগীশ্বরের শিষ্যরূপে আজ আমার এ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবন উৎসর্গিত। মা ভুবনেশ্বরি ! সপ্তকোটি সম্রাটের ঐশ্বর্য্যাপেক্ষাও এ মহৈশ্বর্য্য দান করে, এ দাসানুদাসকে তুমিই ধন্য ক'রেছ, তাই বলি—জননি ! সর্ব্বাপেক্ষা ধন্যা তুমিই !

[বিদ্যাশঙ্কর তীর্থের প্রবেশ]।

বিদ্যা-তীর্থ। মাধব ! আজ এই চলনোন্মুখ প্রবীন তপনের লোহিতাভা সাক্ষাতে, তোমায় তোমার ঈপ্সিত সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা দান করতে এ'সেছি। তোমার ব্রত সফল।—ঐ দেখ ! তোমার অদূরে—সিংহী, মাতৃহারা মৃগশাবককে স্তন্য পান করাচ্ছে ! ওখানে ঐ শার্দ্দূল-শিশু সকল বিরোধ বিস্মৃত হ'য়ে শশকমণ্ডলী বেষ্টিত

ক্রীড়া-পরায়ণ হাস্যময়ী সান্ধ্যপ্রকৃতি কুজনহীন পাখিগণের নীরব আনন্দে যেন অধিকতর সুপ্রসন্না, এ সকলই তোমার যোগসিদ্ধি লক্ষণ।

মাধব। (সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া) দেব! সিদ্ধি লাভে স্পৃহা নাই। ব্রত উদ্‌যাপনের ইচ্ছা লইয়া ব্রত ধারণ করিতে আসি নাই, প্রভো! ব্রতের সুখে চিরদিনই যাতে ব্রত পালন ক'রতে সক্ষম হই, কেবল মাত্র তাই আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার আশীর্ব্বাদ অব্যর্থ, তাই মনে মনে ঈষৎ শঙ্কানুভব কর্‌ছি। আমি শুনেছি—সাধকের সাধনায় বিঘ্নস্বরূপ অবিদ্যার যত প্রকার প্রকাশ আছে; সিদ্ধৈশ্বর্য্যই তাদের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান! এই সিদ্ধির বলে—মানব জড় প্রকৃতির উপর কিছু আধিপত্য লাভে সক্ষম হয়, এবং সেই ক্ষমতা-গর্ব্বে বিলুপ্ত-চেতন হ'য়ে অবশেষে দাসত্বের কঠিন নিগড়ে, সেই পরাজিতা জড়া প্রকৃতির পদতলেই আপনাকে বিকাইয়া দিতেও কাতর হয় না।

বিদ্যা-তীর্থ। মাধব! না—আজ হ'তে তোমার সন্ন্যাসাশ্রমভুক্ত নূতন নামেই তোমায় সম্বোধন করি,—বিদ্যারণ্য! তোমার কামনা পূর্ণ হোক বৎস! গাত্রোত্থান কর। (মাধবের তথা করণ) তোমার একাগ্র সাধনায় ইষ্টদেবী সুপ্রসন্না হ'য়েছেন। 'যোগৈশ্বর্য্য' এই সংবাদটি সাধকের কর্ণে বহন করে আনে, যে সাধক জড়ের প্রভুত্ব লাভেই সিদ্ধিলাভ মনে করে, সাধনায় নিরস্ত হয় ও অণিমাদি ঐশ্বর্য্য সহযোগে রাজত্ব, ইন্দ্রত্ব প্রভৃতি ভোগ-সুখাদিতে মনোনিবেশ করেন। তাঁরা যোগ ভ্রষ্ট হ'য়ে বহুদিনের জন্য, এমন কি কেহ কেহ কল্পান্ত-কালের মতও নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু যে দৃঢ়ব্রত-সাধক, পিপাসী চাতকপক্ষীর মত নব বর্ষাগমের সুসংবাদের ন্যায়, এই ইষ্টলাভ জানতে পেলে, সমধিক আনন্দে আগ্রহে আপনার সর্ব্বস্ব, সেই সুপ্রসন্ন ইষ্টদেব চরণে সমর্পণ করে অধিকতর উচ্চমার্গে উত্তরোত্তর অধিরোহন করতে থাকেন তাঁর পক্ষে কি এ সংবাদের প্রয়োজনীয়তা নাই বল্‌বে?

মাধব। (অস্ফুট স্বরে) আছে।

বি-তীর্থ। বিদ্যারণ্য! তোমার জন্ম-জন্মান্তরের পূর্ণ সাধনা আজ ফলবতী হয়েছে—আজ আমি তোমার জগন্মান্য শৃঙ্গেরি মঠের দ্বিতীয়াচার্য্য পদে বরণ করলেম। আজ হ'তে তোমার নাম বিদ্যারণ্য; মাধবের আজ মৃত্যু হ'লো। জীবন্মুক্ত যতিগণ মধ্যে, এই কলিযুগে তুমি অগ্রণী হবে।

মাধব। (প্রণাম)

বি-তীর্থ। তোমার তপস্যা নির্ব্বিঘ্ন হোক। (প্রস্থান)

মাধব। "মৃত্যু হ'লো!" মাধবের মৃত্যু! "দেহান্তরে অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি ঘট্‌বে!" মা-ভুবনেশ্বরি! পার্থিব ঐশ্বর্য্যস্পৃহায় মৃত্যু যে মাধবের বহু পূর্ব্বেই ঘটে গেছে মা! দেখিস্ তাকে মোক্ষমার্গ হ'তে টেনে নিয়ে, আবার যেন পুনর্জন্ম বিপাকে নিক্ষেপ করিস্ নে! আজ বড় শান্তিতেই মন ডুবে গেছ্‌লো, আজ শান্তিময়কে যেন নিজের অন্তরাত্মা মধ্যে অপরোক্ষ ভাবে অনুভব কর্‌তে সমর্থ হয়েছিলাম। তাই ভয় হচ্ছে; পাছে এই অতুল-শান্তি থেকে আবার মায়া-মোহের তাড়নায় প'ড়ে, বঞ্চিত হই। নাঃ—কিসের ভয়! 'মাধবের মৃত্যু!' তয় হোক্, তার পূর্ব্বাকাঙ্ক্ষাও তো এখনে সমাধিগতলীন। মা রয়েছেন তবে কি জন্য? যদি সন্তানকে রক্ষাই কর্ব্বেন্ না!

"শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥"

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান বিজয়নগর, মন্ত্রণা-কক্ষ।

রাজা জম্বুকেশ্বর, মন্ত্রি, আমাত্যগণ, সেনাপতি প্রভৃতি।

রাজা। এ-পত্রের এ-ভিন্ন আর দ্বিতীয় উত্তর কি আছে মন্ত্রি? কোন্ হিন্দু সন্তান ধমণীতে পবিত্র আর্য্য-শোণিত প্রবাহিত থাকৃতে এ রকম ঘৃণাকর প্রস্তাবের অনুমোদন করে নিজের ক্ষত্র নামের অমর্য্যাদা করবে! সুলতান কি আমাদের এতটাই দুর্ব্বল মনে করেছেন নাকি? যে তাঁর বিশ্বাস আমরা নিজেদের এতখানি অবনত করেও, তাঁর এই ধৃষ্টতা-পূর্ণ অধীনতা গ্রহণ-প্রস্তাব অনুমোদন কর্ব্বো! না অমাত্যবর, তা আমি কর্ব্বো না, তা' এর জন্য যদি আমার জন প্রাণী-পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করতে হয়; বরং তাও কর্ব্বো, আপনার কি উচিৎ বোধ হয়, কৃষ্ণদেব, আর অপনার দেবল রায়?

মন্ত্রি। আপনার সকল কথাই সত্য মহারাজ, কিন্তু—

কৃষ্ণদেব। হ্যাঁ সত্য যে তাতে কোন্ সন্দেহই নেই, কিন্তু দেখুন পা—

রাজা। (অধৈর্য্যসহ) যদি সত্য বলেই স্বীকার করছেন; তবে আবার এরি মধ্যে কিন্তুকে স্থান দিচ্ছেন কেন? যা ব্যভিচারী তা সত্য নয়, সত্য অব্যভিচারী যদি এ যুক্তির সত্যতা অঙ্গীকৃত হয়, তবে আর তাহা 'কিন্তু' দ্বারা বাধিত হওয়া বিধেয় নয়।

মন্ত্রি। (বিজড়িত ভাবে) কিন্তু এই জন্য যে, আমাদের প্রতিপক্ষ অত্যন্ত প্রবল তাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে গেলে; আমাদের সমূলে ধ্বংস হওয়াই অনিবার্য্য, অকস্মাৎ উত্তেজনা বশে কোন কার্য্যই ত্বরিত সম্পাদন করিয়া ফেলা উচিৎ নয়। এ বিষয়ে শাস্ত্র বচনও আছে—"সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্।"

দেবল। একবারে ধ্বংস হওয়ার চাইতে, বরং—

রাজা। হীন হয়ে বেঁচে থাকাও ভাল? না অমাত্যবর! আমি আপনার এ মন্ত্রণার সমর্থন করতে পারলেম না, পাঠান হস্তে স্বাধীনতা অর্পণ করাপেক্ষা ধ্বংসের হস্তে আত্মদান শ্রেয়।

মন্ত্রি। (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া,) তবে আর কি বলবো মহারাজ! আমরা আপনার আজ্ঞাধীন ভৃত্য মাত্র।

রাজা। আপনারা মনে কোন ক্ষোভ রাখবেন না। আমার চিত্ত বড়ই উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছে। তা' আমাদের ধ্বংসই বা হবে কেন? বিজয়নগরের সৈন্যবল তো অল্পও নয়! আমাদের সৈন্য সংখ্যা কত, সেনাপতি!

সেনাপতি। আমাদের প্রায় পঞ্চাশ সহস্র অশ্বারোহী, চতুঃসহস্র গজসৈন্য, আর পদাতিসৈন্য বলিতে গেলে—প্রায় অসংখ্যই।

রাজা। (হৃষ্ট-চিত্তে) ঐ শুনুন! তবে আর এত ভাবনা কিসের? সুলতানের দূতকে যথোচিত আপ্যায়-নান্তর, পাঠান রাজ প্রেরিত তরবারিখানি গ্রহণ করে, অপর সমস্ত প্রতিপ্রেরণ করা হোক্। বিজয়ধ্বজ-বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা, বিধর্ম্মীর পদে পূজক রূপে নামমাত্র স্বাধীনতা রক্ষা করায় ঘৃণানুভব করে। তার চেয়ে মৃত্যু ভাল। আচ্ছা এখন হ'তে আপনারা এই মত সমুদয় বন্দোবস্তে মনোযোগী হবেন। আর বিলম্বে নিষ্প্রয়োজন।

মন্ত্রি। যে আদেশ।—(অভিবাদনান্তর সকলের প্রস্থান)

রাজা। (স্বগত) এই গগনভেদী গিরিমালার ন্যায় সুদৃঢ় সুরক্ষিত দুর্গমালা, কবিকল্পিত ইন্দ্রপুরী বিনিন্দিত বৈভব শোভাময়ী বিপুল সুরম্য রাজপ্রাসাদ সমূহ, নগর বক্ষঃপ্রবাহিনী বহুল জল-প্রবাহিকা, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর মুখরিত শ্রীবিগ্রহগণ অধ্যুষিত দেব মন্দির সমূহ, এই সমুদয়ই হয়ত এই যুদ্ধ ঘোষণার ফলে বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। হয়ত আমার সুখ-নন্দনে দৈত্য বিরাজ করবে। কিন্তু তা বলে কি করবো? এই দাসত্ব পণে আত্মবিক্রয় করার চেয়ে, এ মস্তক যুদ্ধক্ষেত্রের তীর্থভূমে লুণ্ঠিত হয়, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তাও শ্লাঘনীয়।

(মহারাণী অম্বিকা ও তৎপশ্চাতে বালিকা রাজকুমারী সত্যবতীর প্রবেশ)

রাণী। মহারাজ! এ কি শুনি? আপনি নাকি সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন্?

রাজা। শান্ত হও দেবি, নিজেকে অত উতলা করোনা, যদি রণ-ঘোষণাই করা হয়ে থাকে; তাতে এমন ক্ষতি কি?

রাণী। ক্ষতি কি? কি বলছেন মহারাজ। ক্ষতি কি নয় তাই বলুন্! এই সুখৈশ্বর্য্যশালিনী বিচিত্রা পুরী যে, পাঠান হস্তে বিচূর্ণিত হয়ে যাবে; তা'কি একবার স্মরণও করছেন না? শুনেছি—তারা নাকি ধর্ম্মের সম্মান, নারীর মর্য্যাদা কিছুই রক্ষা করে না।

রাজা। যা শুনেছ তা মিথ্যা নয়। শুধু সেই ভয়েই, এ রাজ্যে তাদের প্রবেশাধিকার দিতে চাই নে।

রাণী। না, না, মহারাজ! তা কর্ব্বেন না। রাজ্যের দূর-ভবিষ্যতের জন্য আপনি আমার এ সর্ব্বনাশ করবেন না। আমার এই ননীর পুতুলটীর দিকে চেয়ে দেখুন। আমার এই নারীজন্মের গৌরব—সীমন্তের সিন্দুরটুকু আমায় ভিক্ষা দিন। আমায় এমন করে আপনি সর্ব্বহারা করবেন না। মহারাজ! আমার এ গৌরব-চূড়া ভেঙ্গে দেবেন না। (রোদন)

রাজা। একি! একি!! কেন? কেন? এমন উতলা হওয়া কি তোমার সাজে? মন্ত্রেশ্বরী তুমি! (অশ্রু মুছাইয়া) বিপদে ধৈর্য্য যেমন পুরুষের, তেমনি নারীরও অবলম্বনীয়।

রাণী। মন আমার কিছুতেই যে ধৈর্য্য মান্‌চে না। কেবল অমঙ্গলের কথাই মনে আস্‌চে। না, না, বলুন আপনি যুদ্ধঘোষণা নিবারিত করবেন?

রাজা। (হাসিয়া) সে কি হ'তে পারে? হাঁ৷ মা সত্যবতি! তোর বাবা কি এমনি কাপুরুষ যে প্রাণ ভয়ে ক্ষাত্র-ধর্ম্মে জলাঞ্জলী দেবে?

সত্যবতী। বাবা! তুমি যুদ্ধ করবে বাবা? আমিও যুদ্ধ করবো।

রাজা। শোন মহিষি! শোন তোমার মেয়ের কথা। করবি মা, তুই যুদ্ধ করবি বই কি! তুইই যে এখন এই আনগুণ্ডির সম্মান মুকুট, এবং ভবিষ্যৎ আশা, চিত্রাঙ্গদার ন্যায় তুই এই অপুত্রকের পুত্র! তাই মা ভুবনেশ্বরী তোকে এই সাহস দান করেছেন।

সত্য। বাবা! আমার ত ঘোড়া নেই, তলোয়ার নেই, কি দিয়ে যুদ্ধ করবো? আমায় তুমি তোমার মত একটা সাদা ঘোড়া দিতে বলে দেবে?

রাজা। আচ্ছা, আচ্ছা দোবো। দেখ মহিষি! আঃ তুমি আবার কাঁদচো? তোমার চেয়ে এই কচি মেয়ের আমার সাহস! কান্না কিসের? গৌরব বোধ কর, এই তো—বীরের ধর্ম্ম,—পতির ধর্ম্ম পালনে সতী সহায় হও।

রাণী। বীরের কি-ধর্ম্ম—তা' জানিনে মহারাজ! আমি জানি—আমার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সবই আপনি,—আপনার মান, কীর্ত্তি, যশ, গৌরব এ সব আপনার নিকট হয় ত খুব বড় হ'তে পারে; কিন্তু আমার কাছে আপনাকে ছেড়ে এদের কোন মূল্যই নেই। আমি, আপনার সাম্রাজ্যের তো দাসী নই; আমি যে দাসানুদাসী আপনার ঐ শ্রীচরণের। (নত জানু) আমায় দয়া করুন; ভিক্ষা দিন, যুদ্ধ ঘোষণা পরিত্যাগ করুন!

(নাগাম্বিকার প্রবেশ।)

নাগাম্বিকা। ছি! ছি!! মহেশ্বরি! ক্ষুদ্রা নারীর ন্যায় এ কাতরতা কি রাজমহিষীর যোগ্য. উঠ! শান্ত হও, স্বামীর ধর্ম্মে, রাজার ধর্ম্মে বাধা দিওনা. স্বামীর গৌরবে যে স্ত্রী গৌরবান্বিতা না হয়, সে-স্ত্রী তাঁর ধর্ম্ম-পত্নীই নহে।

রাণী। মহারাণি! রাজাকে কোথায় তুমি নিরস্ত করবে; তা না হয়ে তুমি শুদ্ধ ওঁর বাতুলতায় যোগদান করতে এলে! তুমি কি ওঁর পত্নী নও! নারীত্ব কি তোমাতে নেই!

বড়রাণী। আছে বোন্; নারীত্ব কি নারীকে পরিত্যাগ করতে পারে? কিন্তু আমরা নারী হলেও তো, যে-সে নারী নই, বীর-নারী! আমাদের কর্ত্তব্য তো আমরা জীবনের কোন সঙ্কট-মুহূর্ত্তেই বিস্মৃতা হতে পারিনে দিদি! প্রভো! আপনি আজ আমাদের স্বামী-গৌরব শতগুণেই বৃদ্ধি করেচেন, আপনাকে আর কি দিতে পারি, আপনারই তো সব, এই প্রণামটী নিন্।

রাজা। (সহাস্যে) সাবিত্রী সমা হও। কেমন-মনোমত আশীর্ব্বাদ লাভ হয়েছে তো? (নেপথ্যে ভেরি বাদন) ঐ শোন! দূতকে বিদায় দিয়ে সৈন্য সমাবেশের সঙ্কেত করা হচ্ছে, আমারও অতিসত্বর ওদের সঙ্গে সম্মিলিত হওয়া প্রয়োজন। এখন তবে বিদায়! মহারাণি! ছোট রাণীর সান্ত্বনা ভার আমি তোমার হাতেই দিয়ে যাচ্ছি।—সত্যবতি!—মা আমার! তোর যুদ্ধাস্ত্র তুই প্রস্তুত করে রাখ্ গে আয় কাছে আয়, আদর করে যাই। (প্রস্থান)

ছোটরাণী। দিদি! দিদি! কি কঠোর প্রাণ তোমার! তুমি একবার বাধাও দিলে না! হোক্ সপত্নীর স্বামী, তবু তোমারও তো!

বড়রাণী। ছোট রাণি! তুই আত্ম মোহে পাগল হ'য়েছিস্। সেই জন্যই আমায় এমন কথা বলতে পারলি। আজ আমায় তোর সতীন বোধ হলো? স্বামীর—পুত্র লাভাশায় আপনি সাধ ক'রে এ'নে কে তোকে স্বামীর হাতে স'পে দিয়েছিল? এ স্বামী কার? আমার স্বামীর অংশ, আমি তোকে কৃপা করে একটু দান করেছি বলেই না আজ তুই আমায় সেই স্বামী-সম্বন্ধেই অতবড় শক্ত কথাটা বলে ফেল্লি!

ছোট রাণী। দিদি! দিদি! আমায় ক্ষমা কর। আমি সত্যি সত্যি পাগল হ'য়েছি। আমার...... আমাদের কি হবে দিদি? যুদ্ধ কি বন্ধ করা যায় না?

বড়রাণী। না দিদি! যায় না। তা হোক্ না যুদ্ধ! আমরা শুধু অমঙ্গলের কথাই বা ভাব্‌বো কেন? এসো, দু'জনে তাঁর আর তাঁর রাজ্যের কল্যাণ-কামনায়, মা ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে যাই। সতি মা! তুইও আমাদের সঙ্গে যাবি আয়। তিন জনেই আমরা মা কে ডেকে ডেকে কাঁদবো। মা দয়া করবেন।

সত্যবতী। বড় মা! আমি কাঁদবো না—আমি যুদ্ধ করবো।

ছোটরাণী। মা, ভুবনেশ্বরি! রক্ষা করো, রক্ষা করো মা! প্রাণ আমার যেন ভয়ে অবসন্ন হয়ে যাচ্ছে।

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান শৃঙ্গেরি মঠাভ্যন্তরস্থ প্রাঙ্গন।

বিদ্যারণ্য।

বিদ্যারণ্য। সন্ন্যাসীর ধর্ম্মে এ তে আঘাত করে কিনা জানি না, কিন্তু মানবের মানবত্ব যেন এ শব্দ শুনে, — অন্তর হ'তে সাড়া দিয়ে উঠে! মনে বিশ্বাস জন্মেছিল—এ পৃথিবীর সঙ্গে আমার আর কোন দেনা-পাওনার সম্পর্ক নেই। আমি সন্ন্যাসী, সর্ব্বত্যাগী। যে ভূ-ভূর্বঃ-স্ব সবই ত্যাগ করেছে, যার কাছে অপার্থিব ধন, স্বর্গ, ব্রহ্মলোকাদিও তুচ্ছ,—এ জগতের কোন কিছুর মধ্যেই তার কোন আকর্ষণকে কল্পনা করতে পারে? জননীর মৃত্যু সংবাদ শুনেছিলাম; শোকানুভব কিছুমাত্র হয় নাই। কনিষ্ঠ সায়ন—বেদভাষ্যকার 'সায়নাচার্য্য' নামে খ্যাতি লাভ করেছে, সংবাদ পেয়েছি; অহঙ্কৃত হয়েছি, তা 'তো কই মনে হয় না। কিন্তু আজ সে বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত হ'য়ে গেল। বিজয়নগর আজ শ্মশানে পরিণত! পাঠান আক্রমণে আনগুণ্ডিরাজ জম্বুকেশ্বর নিহত। বিজয়নগরের অতুল ঐশ্বর্য্য, বিজয়ী সুলতানের সৈন্য কর্তৃক লুণ্ঠিত, রাজ্য বিপর্য্যস্ত, প্রজা নিপীড়িত, আর দেশ ধর্ম্ম-হীনতায় কলুষিত! হায়! সন্ন্যাসীর প্রাণ! কই? এদের তো তুই তুচ্ছ করতে পারলিনে! স্বধর্ম্ম! স্বদেশ! তুমি কি ব্রহ্মপদাপেক্ষাও অধিকতর বাঞ্ছিত?

[বিদ্যাতীর্থের প্রবেশ]

বিদ্যাতীর্থ। বিদ্যারণ্য! রাজধানীর সংবাদ বোধ করি তোমায় একান্ত ব্যথিত করেছে?

বিদ্যারণ্য। প্রভো! যথার্থই অনুমান করেছেন, মহারাজ জম্বুকেশ্বর পাঠান হ'তে নিহত, এ সংবাদ বহুদিন শুনেছি, কিন্তু বিজয়নগরে ঘোর অরাজকতায় ধর্ম্মহীন ঘট্‌ছে, এই সংবাদ শুনে অবধি—আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। সেই অবধি অনবরত কে যেন সেই সুদূর রাজধানীর ধ্বংসরাশির মধ্য হ'তে আমায় উচ্চকণ্ঠে ডেকে বল্‌ছে "ফিরে আয় ফিরে আয়, ওরে মাধব আমার ঋণ শোধ কর্‌তে এখনও তোর বাকি আছে। মা ভুবনেশ্বরী তোকে আমার কার্য্যে নিযুক্ত হ'তে আহ্বান করেছেন, তাই শীঘ্র আয়।" কে এ আমায় বারে বারে অমন কাতর কণ্ঠে আহ্বান কর্‌ছে? ঐ অশ্রুপরিম্লানা বিধবানারী কি আমার জগৎপূজ্যা দেশলক্ষ্মী! অনাথা অভাগিনী রূপে বিষাদাশ্রু মোচন কর্‌তে-কর্‌তে বিধবার শেষাবলম্বন সন্তানগণের মুখপানে চেয়ে মর্ম্মান্তিক জ্বালা জ্ঞাপন কর্‌ছেন। আমি যেন এক অচ্ছেদ্য-আকর্ষণ সেই দুর্ভাগ্য দেশবাসীর প্রতি অনুভব কর্‌ছি, গুরুদেব! এ কি মোহের কুহক-পাশ?

বি-তীর্থ। না, করুণার পাশ। মহতের নিকট হ'তে ভাগ্যহীনের অবশ্যপ্রাপ্য সহানুভূতি মাত্র।

বিদ্যারণ্য। (সাগ্রহ কণ্ঠে) করুণার পাশ! অবশ্য প্রাপ্য! তবে আমার এই আকর্ষণ সন্ন্যাসাশ্রম বিগর্হিত ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য নয়? এতে আমার ব্রতভঙ্গ কর্‌বে না?

বি-তীর্থ। না, তোমার ব্রতপূর্ণ কর্‌বে। শুন বৎস! প্রত্যেক মানবই জগতে জন্মগ্রহণ করে কয়েকটি ঋণ-গ্রস্ত হয়। প্রথমে "পিতৃ-ঋণ", তৎপর "দেব-ঋণ" ইহার পর "ঋষি-ঋণ।" এই তিনটি ঋণেরই অন্তর্গত আর একটি ঋণে সকলেই বদ্ধ থাকে, সেটী হচ্ছে—"দেশ-ঋণ।"—পিতৃ-ঋণ—সুপুত্র জন্মাইয়া অন্যথা বহু শিষ্যের জনক অর্থাৎ বহু শিষ্যকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান দ্বারা নব জীবন দিয়ে পরিশোধ হয়। দেব-ঋণ পরিশোধ যজ্ঞাদি দ্বারা, ঋষি-ঋণ বেদাদি পঠন-পাঠন পূর্ব্বক শোধ করা যায়; কিন্তু দেশ-ঋণ শুধু নিজের ব্যক্তিগত উন্নতিতেই সমাধা হয় না। এবং মহাপ্রাণগণের দেশ ও কোন পরিচ্ছিন্ন দেশ অর্থাৎ নিজ কর্ম্মভূমি মাত্রই নয়। তাঁদের

"স্বদেশোভুবনত্রয়ম্।" কিন্তু সাম্রাজ্যের সমস্তটাই তাঁদের স্বদেশ, এবং সকলেই তাঁদের স্বদেশী। এইরূপ দেশবাসীর উন্নতিকল্পে অর্থাৎ বিশ্ববাসীরই কায়-মন-প্রাণ অর্পণে দেশ-ঋণ পরিশোধ হয়। এ ঋণ থাকৃতে সন্ন্যাসীরও মুক্তি নেই।

বিদ্যারণ্য! তবে কি নিজ জন্মভূমির প্রতি আকর্ষণ সঙ্কীর্ণতা?

বি-তীর্থ। না বৎস! মাকে ভাল না বাসিলে কি অন্য নারীকে মাতৃবৎ দেখা যায়? মাতৃভক্তির বিস্তৃতিই দেশভক্তি এবং তাহারই অতিবিস্তারে বিশ্বপ্রেম! এই প্রেমাতিশয্যে কেহ কেহ মোক্ষ লাভ শক্তি সত্বেও, অন্যের উদ্ধার জন্য জন্ম পরিগ্রহ করে থাকেন। তাই সংসারী অপেক্ষা বীতরাগীর দেশঋণের মাত্রা অধিক কারণ কর্ম্ম-ক্ষমতা তাঁরই সমধিক। এবং কর্ম্ম-সাফল্যের আশা তাঁর দ্বারাই যথেষ্ট। যে নিজে বদ্ধ সে অপরের বন্ধন মোচন করবে কেমন ক'রে? অন্ধ কখনও অন্ধকে পথ প্রদর্শন করতে পারে না। শঙ্করাচার্য্য ভিন্ন কোন্ অল্পশক্তিমানের দ্বারা এই আসমুদ্র হিমাচল পূর্ণ-ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্ম স্থাপন সম্ভব হ'তো? বৎস! ঋষিগণ জীবন্মুক্ত থে'কেও তাঁদের অলৌকিকতা শক্তিসমুদ্র মন্থিত অসংখ্য জ্ঞান বিজ্ঞানের অতুল কৌস্তুভ পারিজাত দেশবাসীর অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করণার্থ কোন্ অনাদি যুগ হ'তে আজ পর্য্যন্ত প্রদান করছেন। এই যে মহান্ শাস্ত্র সমূহ, বেদ, বেদান্ত, শ্রুতি, স্মৃতি, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পুরাণ, উপপুরাণ, শস্ত্র, চিকিৎসা, রসায়ন, বৈয়াকরণ এই সকল সেই যুগ যুগান্তরে কল্পান্তজীবি সূর্য্যসমতেজা মহর্ষিগণের দেশপ্রীতির ফল ভিন্ন কোথা হ'তে এই মনুষ্য সমাজে আগমন করিল? মহাপ্রাণেই মহাপ্রেমের সৃষ্টি হয়। সমুদ্র বাষ্পেই মেঘের জন্ম! ক্ষুদ্র ব্যাপি-তড়াগের শক্তি কতটুকু? যাও, যাও বৎস! তোমার জন্য তোমার অধর্ম্ম-অধ্যুষিত দেশবাসীগণ পথ চেয়ে আছে। শুদ্ধ চিত্তে দেশ-ঋণ মোচনের চেষ্টা করগে যাও। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী" এ পূজার এই বীজ মন্ত্র।

বিদ্যারণ্য। আপনার আশীর্ব্বচন আমার কার্য্যে সর্ব্বত্রই বিজয়া হবে।

বি-তীর্থ। প্রভু শঙ্কর তোমার সহায় হোন্।

(উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান তুঙ্গভদ্রা নদী তীরস্থ বিজন রাজপথ।

হরিহর ও বিনায়ক রায়ের প্রবেশ।

হরিহর। জাতি হোক্ তবু তো তারা আমাদেরি ভাই। এক প্রপিতামহ-শোণিত তো উভয়েরি ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে। কি তুচ্ছ বস্তু রাজত্ব যে তার জন্য সেই ধমনীকে ছিন্ন ক'রে সেই রক্তে মৃত্তিকা ধৌত করতে হবে! তার চেয়ে চিরদিন বনবাসী হয়ে কন্দ-ফল-মূলে জীবন ধারণ করাও শত গুণে শ্রেয়।

বিনায়ক। রাজ্য লোভ আমার চিত্তেও নেই। কিন্তু লোকাপবাদ তুচ্ছ করি কেমন করে? ভেবে দেখুন লোকে বিদ্রূপ করে বলবে না কি যে, রাজ পুত্র হ'য়ে শত্রু ভয়ে যারা স্বীয় রাজত্ব নির্ব্বিবাদে ত্যাগ করে পালায় তারা ক্ষত্রিয় নয়, ক্লীব!

হরিহর। ভাই! লোকে কি বলবে, সেটা বিবেচ্য নয়। ধর্ম কি নীতিবিরুদ্ধ সেইটেই প্রধান। ক্ষমায় অপৌরুষ নাই।

বিনায়ক। ক্ষমা, ব্রাহ্মণের ধর্ম—ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়।

হরিহর। (সহাস্যে) বুঝলাম ভাই! যদি ব্রাহ্মণের ধর্মই হয়, তা হলেও এইটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম! কিন্তু তা নয়। হিংসাদি হতে বিরত থাকা কোন বিশেষ ধর্ম নয়। এটা সাধারণ ধর্ম।

(বিদ্যারণ্যের প্রবেশ)

সন্ন্যাসী দেখছি যে! কি তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি! কি সৌম্য-মধুর দৃষ্টি! এস এঁর পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করি। ইনি নিশ্চয়ই সামান্য কেহ নন। (অগ্রসর হইয়া) ঠাকুর! প্রণত হই।

বিদ্যারণ্য। (স্বগত) স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ যথাসাধ্য যত্নশীল হওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। বিজয়নগর আর বেশী দূর নয়—কে এরা? রাজচক্রবর্ত্তী লক্ষণাক্রান্ত পুরুষদ্বয় দেখছি যে! (প্রকাশ্যে) কল্যাণ হোক, কে তোমরা বৎস?

হরিহর। রাজ্যভ্রষ্ট যাদব রাজকুমার আমরা প্রভু!

বিদ্যারণ্য। হতে পারে আজ তোমরা রাজ্যভ্রষ্ট; কিন্তু আমি প্রত্যক্ষ করছি তোমরা উভয়েই এক ভবিষ্যৎ মহাসাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট!

উভয়ে। (বিস্ময় বিমূঢ়বৎ) দেব! এ কি মহা আশীর্ব্বাদ!

বিদ্যারণ্য। এ আশীর্ব্বাদ এ দীন সন্ন্যাসীর নয়, এ আশীর্বচন স্বয়ং বিশ্altবিধাতা তোমাদের ঐ ললাটফলকে সুস্পষ্টাক্ষরে লিখে রেখেছেন!

হরিহর। দেব! আমরা এই অসি মাত্র সহায়ে চিরদিনের মত জন্মভূমি পরিত্যাগ করে এসেছিলাম, ইচ্ছা ছিল, এই অসি সহায়েই শ্বাপদ সঙ্কুল বন বিদীর্ণ করে নব-সাম্রাজ্য স্থাপন করব, ভ্রাতৃ শোণিতে ভূমি রঞ্জিত করার এ পৃথিবীতে কোন আবশ্যক করে না। কারণ এ বিশাল জগতে, কত নব নব দেশ অনাবিষ্কৃতই রয়েছে। সেই সকল অনুন্নত বন্য জাতিকে জয় করে তাদের মনুষ্যত্ব দান করতে পারলে, যখন রাজ্যস্পৃহা এবং মনুষ্য জীবনের সফলতা এক সঙ্গে দুইই লাভ করা যায়, তখন একটুখানি জমি নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে কাড়াকাড়ি করি কেন?

বিদ্যারণ্য। ত্যাগ, ধৈর্য্য, ক্ষমা, এবং তৎসঙ্গে নব নব উদ্যম ইহাই যথার্থ ক্ষত্র-ধর্ম। অসহায়তা পৌরুষ নয়, শক্তিমানের প্রতিশোধ-স্পৃহা পরিত্যাগই পৌরুষ, বৎস! তোমরা নিশ্চয়ই জগতে জয়যুক্ত হবে।

হরিহর। আপনার আশীর্ব্বাদ ও উপদেশে, কৃতকৃতার্থ হলেম। আপনাকে গুরুরূপে গ্রহণ করে, এই মুহূর্ত্তে আমি আপনার সেবকাধম শিষ্যরূপে যথাসর্ব্বস্ব ঐ পাদপদ্মে সমর্পণ করলেম। (নতজানু) আজ হতে এ শরীর, মন ও তরবারী আপনারি সেবায় অর্পিত হলো।

বিদ্যারণ্য। স্বস্তি! আমি গ্রহণ করার একান্ত অযোগ্য হলেও, এ মহৎ উপহার ত্যাগ করতে পারলেম না। বৎস! আমি বিশেষ প্রয়োজনে আপাততঃ হাম্পি নগরে গমন করছি, যদি আবশ্যক হয়, সেইখানে দেবী ভুবনেশ্বরী মন্দিরে গমন করলে পুনঃ সাক্ষাৎ লাভ হবে।

হরিহর ও বিনায়ক। যে আজ্ঞা!

বিদ্যারণ্য। এক্ষণে বিদায় বৎস! ভগবানের ইচ্ছা থাকে আবার দেখা হবে।

হরি ও বিনা। এ দাসানুদাসেদের স্মরণ রাখবেন। (প্রণাম)

বিদ্যারণ্য। স্বস্ত্যস্তুতে কুশলমস্তু চিরায়ুরস্তু, গো-বাজি-হস্তি-ধন-ধান্য-সমৃদ্ধিরস্তু; আরোগ্যমস্তু, বলমস্তু, রিপুক্ষয়োঽস্তু, বংশে সদৈব ভবতাং হরিভক্তিরস্তু। (প্রস্থান)

হরিহর। বিনায়ক! এসো আমরাও ওঁর পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হই।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—:*:—

(স্থান হাম্পি নগর। ভুবনেশ্বরী মন্দিরের বহির্ভাগ)

দেবদাসীগণ।

প্রথমা। সত্যি ভাই! রাজা না থাকিলে, রাজ্য যেন ঘোর অরণ্যে পরিণত হয়। মহারাজার চিতায়, শুধুই যে মহারাণী নাগাম্বিকাই পু'ড়ে মরেছেন, তা' নয়; এ রাজ্যটা-শুদ্ধ সে দিন রাজার সহমরণে গেছে। কি ছিল! আর কি হ'লো! যত হাসি-খুসি গাওনা-বাজানা, সবই এক্কেবারে নিরানন্দে যেন ডুবে গিয়েছে। দেশের শ্রীছাঁদ দেখ্‌লে ডাক ছেড়ে কাঁদ্‌তে ইচ্ছা করে।

দ্বিতীয়া। (সনিঃশ্বাসে) আর কান্না! কাঁদার দুঃখ আর এ রাজত্বে কারু থাক্‌বে না, এখন কান্নারই পালা। যে যত কেঁদে ভাসাতে পারো। মহারাজ তো সম্মুখ যুদ্ধে শত্রু মেরে বীরলোক প্রাপ্ত হ'য়েছেন, আমাদের বড় মহারাণীও পরম তেজস্বিনী, বিপদ আসন্ন দে'খে অটল সাহসে নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য চালনা ক'রেও যখন শত্রুর আক্রমণ রোধ কর্‌তে পার্‌লেন না; তখন ফিরে এ'সে স্বামীর চিতায় সতীলোক প্রাপ্ত হ'লেন। তা' তাঁর জন্য তো আর দুঃখ কর্ব্বার নেই। ছোট রাণীমার জন্যই আমাদের কষ্ট, আহা! এত বড় একটা রাজ্যের রাজমহিষী, হ'য়ে; বাসাভাঙ্গা পাখিটীর মত, বাচ্চাটী বুকে নিয়ে, কোথায় কার দোরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কে কি কর্‌লে, কি অবস্থায় বিঘোরে হয়ত দুটীতে জীবন বিসর্জ্জন দিলেন; সেই অবধি তো কেউই কোন সংবাদও পায়নি। এখন থাক্‌লে তো তাঁরাই এ সিংহাসনে ব'স্‌তেন।

প্রথমা। তুই থাম্ মুরজা! তাঁদের কিনা ঐ পাষণ্ড সর্দ্দারগুলা একদিন এ পৃথিবীতে থাক্‌তে দিত! একটা মৃত দেহ পেলে, শৃগাল কুকুরগুল' যেমন সেটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়; এরাও দেখ্‌ছিস্ না সেইরূপ সিংহাসন নিয়ে, ছেঁড়া ছিঁড়ি করে মর্‌ছে! এই কয় বছরে কত হাতই না বদল হ'য়ে গেল। হায়! মহারাজ!

মুরজা। তা সত্য! আমাদের মহারাজের পর, সুলতানের সেনাপতি কিছুদিন ধরে রাজপ্রাসাদ, আর যত মহাজন ধনীর ঘর তন্ন তন্ন করে, যেখানে যা কিছু ছিল সর্ব্বস্ব তো লুট কর্‌লেন। কি ভাগ্য যে মন্দিরের মধ্যে ঢোকা না হয়ে, পুরোহিতেরদ্বারা দেবীর নাকের নথ্‌টী শুদ্ধ খুলিয়ে নিয়েই খুসি হ'য়েছিলেন! একখানি তৈজস পর্য্যন্ত, রাজগৃহে, দেবমন্দিরে বা গৃহস্থ ঘরে অবশিষ্ট রইল না। তারপর কিছুকাল রাজ্যটা মুসলমান সম্রাটের অধীনে নামে মাত্র রইলো। আসলে হলো অরাজক।—দস্যু-তস্করের মহেন্দ্রযোগ! আবার এই কয় বৎসরের মধ্যে পাঁচজন রাজা বদল হ'য়ে, গত বৎসর হতে, রাজসিংহাসন শূন্যই প'ড়েছিল। আবার ঐ দয়াল রায় এখন রাজা হ'য়ে বসেছেন। অন্ন নেই, ধান্য নেই, তথাপি যুদ্ধেরও বিরাম নেই। যে যাকে পাচ্ছে, দু'ঘা পিটিয়ে হাতের সুখ করে নিচ্ছে। সকলেরই ইচ্ছেটা যে, সেই রাজা হয়। কাজেই কেউ কাকেও সে ভারটা দিতে সম্মত হতে পারচে না।

প্রথমা। থাম্ মুরজা! তুই আর একে যুদ্ধ নাম দিস্‌নে। ঐ যা বল্লাম—মরা নিয়ে শিয়াল-কুকুরের টানাটানি। যাক্ ভাই! ওসব রাজারাজ্‌ড়ার কথায় আমাদের কাজ কি? নে একটা প্রদীপ জ্বাল, পুরুৎ ঠাকুর তো সেদিন সর্দ্দার দয়াল রায়ের সিংহাসনে বসা দেখেই প্রাণ নিয়ে পালিয়েছেন। দয়াল রায়ের সঙ্গে তাঁর চিরদিনের মনান্তর। সর্দ্দারও তেম্‌নি; এখন তিনিই তো রাজা, অথচ এই যে আজ সাতদিন ধরে মায়ের পূজার ব্যবস্থা নেই, সেদিকে দৃষ্টি দেয় কে? ব'লে 'আমি শৈব'। মায়ের পূজা হোক্ না হোক্, তাতে আমার কিছু এসে যায় না। মায়ের উপরও'লা 'বাবা' খুসি থাক্‌লেই হ'লো। আয় ভাই! নর্ম্মদা, উর্ম্মিলা, আমরা যে টুকু পারি, নিয়ম রক্ষা করি আয়, আমরা যে মায়ের দাসী।

(দেবদাসীগণের মন্দিরদ্বারোদ্ঘাটনপূর্ব্বক ভিতরে
প্রবেশ ও দীপ প্রজ্বালন।)

প্রথমা। যমুনা! তুই চামর নে। উর্ম্মিলা! জলের ঝারি ভরা আছে তো? মুরজা বীণা বাজা, ঐন্দ্রিলা সারেঙ্গীতে সুর বাঁধ। আমরা যতক্ষণ আছি, আমাদের মায়ের সেবা আমরাই করি। তা নইলে আমরা কিসের দেবদাসী?

(সকলের আরত্রিক-দ্রব্যাদি লইয়া আরতি, এবং মুরজা
ঐন্দ্রিলার আজ্ঞাবৎ কার্য্য, সমবেত-কণ্ঠে গীতি।)

গান।

মা মা ব'ল এস ডাকি কাতরে,
দেখি মা কেমনে থাকিতে পারে,
হোক্ না পাষাণের মেয়ে, পাষাণে তার গড়া হিয়ে,
এবার ছেলের টানে, মায়ের প্রাণের পাষাণ যদি বিদরে।
শুনি মা মা বলে ডাক্‌লে ছেলে, মায়ের বুকে ক্ষীর ঝরে॥

(বিদ্যারণ্যের প্রবেশ ও দেবীর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত)

বিদ্যারণ্য। কে তোরা মা! এই শ্মশানভূমে এমন মধুময়ী মাতৃনাম সুধা বিতরণ করছিস্? আহা! পিপাসাতুর কর্ণ এ পর্য্যন্ত কেবল আহতের আর্ত্তনাদ, গৃহহীনের অভিসম্পাৎ, অত্যাচারিতের মর্ম্মচ্ছেদী হাহাকার, শুন্‌তে শুন্‌তে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। যে বিজয়নগর রাজধানী সুখ-বিলাসের লীলাস্থল ছিল, আনন্দোৎসবের সমারোহে যাহার সর্ব্ব শরীর দিবস রজনী ঝল্‌মল্ কর্‌তো, হাস্যে-লাস্যে-গীত-বাদ্যে যার আকাশ চিরধ্বনিত থাক্‌তো; আজ সেই আনন্দময় রাজধানী ভীষণ অরণ্যের মত গভীর নিস্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে শ্বাপদসঙ্কুল বনানী হ'তে যেমন নিরীহ জীবজন্তুর প্রতি দুর্দ্দান্ত হিংস্র পশুর আক্রমণ-গর্জ্জনে ক্ষীণ আর্ত্তস্বর ডুবে যায়, এখানেও তার অনুকৃতি চল্‌ছে। এত বড় অরাজকতা আর কখনও বোধকরি পৃথিবীর ইতিহাসে লিখিত হয়নি! উঃ কে মনে কর্‌তে পারে যে, এই সেই মহারাজ জম্বুকেশ্বরের সুখসমৃদ্ধিশালী বিজয়-নগর! সর্ব্বধ্বংসীকাল, তোমার এই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তিকে নমস্কার! তুমি যদুপতির মথুরা, রঘুপতির কোশলকেই যখন ধ্বংস কর্‌তে পেরেছ, তখন এ সব কোন্ ছার! বিশেষতঃ যখন রাজা এবং রাজকর্ম্মচারী প্রধানবর্গ বিলাসিতার অঙ্কাশ্রয়ী ও পরানুকরণে আসক্ত-চিত্ত হয়ে, নিজের স্বাতন্ত্র্য পর্য্যন্ত হারিয়ে বসে; বহিঃশত্রুকে ভিতরে ডে'কে আত্মীয়জনের সহিত বিচ্ছেদ ঘটায়

তখন সেই স্বজাতি ও স্বধর্ম্মদ্রোহীর ভিতর তো পতন অনিবার্য্যই।" আপনার ভাইকে যে লুণ্ঠন করতে ছাড়ে না, স্বধর্ম্মী সন্তানসমতুল্য প্রজার রক্তশোষণ করতে কুণ্ঠানুভব করে না; সে জাতি ধ্বংস হতে আপনাকে কদিন বাঁচাবে? (ভয়ত্রস্ত দেবদাসীগণের প্রতি) তোরা চুপ্ করলি কেন মা? ডাক্ ডাক্ প্রাণভরে মাকে আহ্বান কর্। নিজের বুক চিরে উষ্ণ শোণিতধারা ঢেলে দিয়ে, আবার তাদের বিমুখী জননীকে ফিরিয়ে আন্। আর তোদের সঙ্গে আমিও এই দুঃখ-দগ্ধ দেশবাসীর কল্যাণ কামনায় দেশজননীকে আহ্বান করি।

প্রথমা। (অগ্রসর হইয়া) চিনেছি, আপনি মাধব ঠাকুর। ঠাকুর! আপনি দেশ ছেড়ে গিয়েই তো রাজ্যের এত অশান্তি! আপনি যখন ফিরে এসেছেন তখন আবার সব ভাল হবে।

বিদ্যারণ্য। মাকে ডাক মাণ্ডবী! মা-ই সকল বিপদ নিবারণ করবেন। এসো এখন আরব্ধ কার্য্য সমাপ্ত করা যাক্। (বিদ্যারণ্য আরাত্রিক-প্রদীপ গ্রহণ করিলে, দুই পার্শ্বে দেবদাসীগণ শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর প্রভৃতি হস্তে দাঁড়াইল।)

গীত।

সিন্ধু, কাফি।

জাগো জাগো জননি! অন্নে অন্ন দে মাগো অন্নদায়িনি!
অনাহারে অকালে নিপীড়িত সন্তান করো দুঃখ অবসান, দুঃখ হারিণি॥
সুখদে বরদে মাগো বিঘ্ন হারিণি।
ঘুচা মা এ মহা ভয় দেখা মা ধর্ম্মের জয়, নাশিয়া এ মহাদৈত্য দৈত্য নাশিনি।
যোগ নিদ্রা দে মা ছেড়ে, জাগিয়া উঠুন হরি, নাশিতে দুরন্ত অরি কৃপাণ পাণি॥
(সকলে দেবী চরণে প্রণিপাত)
সর্ব্ব স্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্ব শক্তি সমন্বিতে।
ভক্তাভীষ্ট প্রদে মাতঃ মহাদেবী নমোহস্তুতে॥

বিদ্যারণ্য। মাণ্ডবি! যাও মা, দেশের দুর্দ্দিন দূরীকরণার্থ, সকলে যেন এক চিত্তে মা বিশ্বজননীর চরণে কাতর-প্রার্থনা জানাও গে। এ মন্দিরের দ্বার যতদিন আমি নিজ হাতে না মুক্ত করবো, ততদিন কেউ যেন এখানে প্রবেশ চেষ্টা করে না, লক্ষ্য রেখো।

মাণ্ডবী। যে আদেশ।

(প্রথমে দেবীকে পরে বিদ্যারণ্যকে প্রণাম করিয়া, সকলের মন্দির হইতে নিষ্ক্রমণ)

বিদ্যারণ্য। দেখি তুই কত বড় পাষাণী! এমন সোনার দেশকে তুই শ্মশানে পরিণত করে, তোর ডাকিনীদের লীলাভূমি তৈরি করে দিয়েছিস্!

ক্রমশঃ

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

সমুদ্র-মন্থন।

—:※:—

(১)

ঘন কুজ্‌ঝটিকা ঘেরা প্রভাতের সাগর অপার,
লক্ষ্য নাহি হয় বক্ষ তার ;
শ্রবণেতে পশে' শুধু মৃদুশ্বাসে স্পন্দন তাহার,
সুষুপ্তির নীরব আগার।
সাগর-সলিল-তলে তিমি গ্রাসে ক্ষুদ্র জলচর,
বাড়ব অনল কোথা থাকি থাকি জ্বলে নিরন্তর ;
জ্ঞানগম্য নহে সে বারতা,
কহে যদি কেহ, হাসি বলে তারে 'একি বাতুলতা !'
উদিল অরুণ—ধীরে সরে গেল কুহেলি তরল,
তখনও বুঝেনি তলে কি চাঞ্চল্য বহে অবিরল।

(২)

শান্তির বাসন্তী বাসে পরিবৃতা রুষিয়া-রমণী
রেখেছিল ভুলায়ে নয়নে ;
কভু শুনিয়াছে শ্বাস, তৃপ্তির উচ্ছ্বাস তারে গণি
হাসিয়াছে জগতের জনে।
উৎসবের মধুবাদ্যে শুনে নাই রোদন প্রবল,
সাইবিরিয়া শুষিয়াছে বিদ্রোহীর নয়নের জল,
দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার,
শোণিত শোষণে মরে দীন প্রজা, নাহি ভাষা তার ;
কঠোর-শাসন-রূপ মায়া-যষ্ঠি করেছে পরশ
পাষাণ-সমান তাই সহিয়াছে অন্তর বিবশ।

(৩)

সমর-সমীর যবে উড়াইল রঙ্গীন গুণ্ঠন,
নেহারি সে কঠোর বদন
তখনও বুঝেনি হৃদে নিদারুণ গভীর বেদন
ক্ষণে ক্ষণে ফুলিছে সঘন।

দেবতা দানবে মিলি রত হ'ল সাগর-মন্থনে,
বাসুকি ছাড়িল শ্বাস, আবর্ত্তিত মন্দর সঘনে,
এ কি ? আজ সব সুপ্রকাশ,
কর্দ্দম, বালুকারাশি, শঙ্খ, শুক্তি ছাইল আকাশ।
স্বাধীনতা অমৃতের পিয়াসায় ব্যাকুল-নয়ন—
এই তবে সে রুষিয়া ? রাজদণ্ড খসিল তখন।

(৪)

আবার—আবার দৃঢ় আবর্ত্তিত করিল মন্দর,
আশা মনে অতি বলবতী,
উঠিয়াছে ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা, শশাঙ্ক সুন্দর,
উঠে লক্ষ্মী মধুর মূরতি,
উঠিল অমৃত ; তবু তৃপ্ত নহে আকাঙ্ক্ষা প্রবল,
নিরন্তর আলোড়নে সংক্ষুভিত সাগরের জল।
সাবধান ওরে সাবধান,
বিপ্লবের কালকূট গরজিয়া উঠে সুমহান।
"রক্ষা কর—রক্ষা কর"—ভয়ে সবে কাঁপে থর থর
এস—এস—এস ত্বরা, কোথা তুমি কোথা হে শঙ্কর ?

(৫)

কে আসিবে ? কে রক্ষিবে ? জগতের জন সভামাঝে
এ সঙ্কটে কে হবে শরণ ?
মুক্তবেণী যাজ্ঞসেনী দাঁড়ায়েছে অবনতা লাজে
আশঙ্কায় ব্যাকুল নয়ন।
দেব-অংশ-জাত পতি কাপুরুষ-সম যে নিশ্চল,
ভীষ্ম দ্রোণ গুরু তার মুদিয়াছে নয়ন-যুগল ;
দুঃশাসন টানিতেছে বাস,
বিদ্রূপ কুটিল হাস্যে করিতেছে কত উপহাস ;
রক্ষিতে এ পাঞ্চালীরে কেহ নাই ; এস নারায়ণ !
জগৎ-সভার মাঝে লজ্জা রাখ লজ্জানিবারণ !

'সিদ্ধি'—রচয়িতা।

কোচবিহার সাহিত্যের একটি বিস্মৃত অধ্যায়।

কোচবিহার-অধীপ মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের রচনা সম্বন্ধে যৎ কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার আদর্শ, প্রসাদ ও আনুকুল্যে কাব্য, কথা, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি নানাবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ সংস্কৃত হইতে (বাঙ্গলা) ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল।—প্রাকৃত ব্যক্তিগণের দেবভাষায় অধিকার না থাকায় তাহারা সেই ভাষায় লিখিত পুস্তকরাজির মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ হইয়া শাস্ত্রান্তর্গত ধর্ম্মতত্ত্বের মধুর আস্বাদ গ্রহণে বঞ্চিত ছিল। তাই মুমুক্ষু জনের ধর্ম্মপিপাসা নিবৃত্তি পরিকল্পে সংস্কৃত ভাষার পাশ হইতে মুক্ত করিয়া শাস্ত্রীয়তত্ত্ব ও উপদেশ সমূহকে সুখবোধ্য "প্রাকৃত" ভাষায়, 'পদ প্রবন্ধে,' ধরিয়া রাখা হইয়াছিল। সেই অনুবাদ গ্রন্থগুলির কিছু পরিচয় দিবার জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। পুঁথিগুলির যে তালিকা দিতেছি তাহা সম্পূর্ণ নহে। তদানীন্তন কোচবিহার—(বাঙ্গালা) সাহিত্যের যথাসম্ভব পরিস্ফুট প্রতিকৃতি দিবার মানসে অনুবাদ হইতে দুই চারি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিব। মূল পদগুলির বানান ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলাম।

১। হিতোপদেশ—(পঞ্চতন্ত্র) ব্রজসুন্দর শর্ম্মা কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

....

পদবন্ধে এ কারণ করিবো রচন।
মনের কৌতুকে যেন* বুঝে সর্ব্বজন॥
জয় জয় নরেন্দ্র হরেন্দ্র নারায়ণ।
হরনর অবতার কহে শাস্ত্রগণ॥
বিতুল বিক্রমী বীরবর ধুরন্ধর।
বিশ্বসিংহ কুল কমলিনী দিনকর॥

... ...

কবিতা কামিনী কান্ত শান্ত শিরোমণি।
গুণীগণ গণনায় অগ্রে যাক গণি॥
হেন মহারাজার করিতে সুগোচর।
প্রবন্ধে রচিলো এহি কথা মনোহর॥
হরনেত্র পক্ষ সিন্ধু শশীতে শোভন।
এহি শাকে সুখে পদ করিলো রচন॥

"হরনেত্র-পক্ষ-সিন্ধু-শশী" = ৩২৭১ = ১৭২৩ শকাব্দে (অঙ্কস্য বামা গতি) = ১৮০১ খৃঃ = ১২০২ বঙ্গাব্দ = ২৯২ কোচবিহার রাজশক।

অনুবাদের নমুনা দিতেছি।—

শ্লোক। উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী
দৈবেন দেয়ংমিতি কাপুরুষাঃ বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরষমাত্ম শক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥

* যাহাতে।

সিংহ প্রায় যেহি জন, সদা উদ্যোগিত মন
কমলা সতত তার ঘরে।
দৈবে দেয় হেন কয়, কাপুরুষ সেহি হয়
লক্ষ্মী তাক ছাড়েন সত্বরে ॥
দৈবক* করি হনন, পুরুষার্থে সুযতন
ভুবনে করিবে বীর জন।
সুসিদ্ধি না হৈলে যত্নে, তবে সে পুরুষরত্নে
দোষ নাহি জানা† কদাচন ॥

সংস্কৃত—অস্তি গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলী তরু ইত্যাদি—

আছিল শাল্মলী তরু গোদাবরী তীরে।
থাকে নানাদেশী পক্ষী তাহার উপরে ॥
কুমুদের বন্ধু ইন্দু গেলো অস্তাচল।
গেলো বিভাবরী, দিবা হৈলো নিরমল ॥
হেন কালে সে বির্থের (বৃক্ষের) কাক বিচক্ষণ।
লঘুপতনক নামে পাইলো চেতন ॥ ইত্যাদি—

অনুবাদক বলিতেছেন—

পঞ্চতন্ত্র অন্য গ্রন্থ করিয়া বিচার।
প্রস্তাবে প্রশস্ত কথা করিলো‡ প্রচার ॥
....
শ্রীব্রজসুন্দর সতা, তস্যাদেশে§ বিরচিতা
শৃণু কথা উদার সজ্জন।

হিতোপদেশ অনুবাদের আর এক খণ্ড আছে। দ্বিজ ব্রজসুন্দর ইহাতে তাঁহার পিতার নামের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে হরেন্দ্র নারায়ণ নামের নিপুণ ব্যুৎপত্তিও দেখিতে পাইবেন।

হর প্রায় প্র সংহারে বিপুল রিপুকুল।
ইন্দ্রের সমান জত ঐশ্বর্য্য অতুল ॥
নারায়ণ প্রায় জাত‖ সজ্জন পালন।
এ হেতু নাম শ্রীশ্রীহরেন্দ্র নারায়ণ ॥
....
বিহারের মহারাজা হর অবতার।
ছিল বিপ্র মহাশয় দেশত তাহার ॥
দর্প-নারায়ণ নাম স্বধর্ম্ম নিপুণ।
জগজ্জনে গায় যার অশেষ সদগুণ ॥
....

* দৈবকে
† জানিবে।
‡ করিলাম।
§ মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের আদেশে।
‖ যাহাতে

তস্য নন্দনেন ব্রজসুন্দর শর্ম্মণা।
হিতোপদেশস্য পদাবলী বিরচনা॥

২। অরণ্যকাণ্ড—রামায়ণ। দ্বিজ রুদ্রদেব কর্তৃক অনুবাদিত। গ্রন্থকার মহারাজাকে পঞ্চ পাণ্ডবের সহিত ক্রমান্বয়ে তুলনা করিয়াছেন।

বিহার বিহারী শ্রীমদ্ধরেন্দ্র ভূপাল।
শিষ্টের পরম ইষ্ট দুষ্ট জন কাল॥
সামদান দণ্ড ভেদ পরম গম্ভীর।
সত্য শৌচ দয়া ধর্ম্মে যেন যুধিষ্টির॥
কার্য্যে বীর্য্যে শৌর্য্যে যেন মধ্যম পাণ্ডব।
কিঞ্চিৎ না সহে অরি কুলের তাণ্ডব॥
গুনীগণ গণনাতে যেন ধনঞ্জয়।
স্মরণ লইলে দেন শত্রুক অভয়॥
নকুল সমান অতি সুন্দর শরীর।
সহদেব সমান শাস্ত্র মধ্যে মহাবীর॥

আদ্য কাব্য আর্ষ সপ্তকাণ্ড রামায়ণ।
রামের চরিত্র চিত্র পবিত্র কথন॥
সে সবার মধ্যে পদ অরণ্য কাণ্ডের।
সমাপ্ত হইল সপ্ত সপ্ততি সর্গের॥
ভুবন বিজয়ী শ্রীল শ্রীহরেন্দ্র ভূপ।

....

তার দেশবাসী সুর গুরুর সমান।
আছিলো ভূদেব নাম ভূদেব প্রধান॥
তার সুত অতি মূঢ় রুদ্রদেব নাম।
রচিলেন পদ শিরে প্রণমিঞা রাম॥

শাকে গ্রহকর মুনি শশি পরিমিতে।
মধ্যে সুরগুরৌ ত্রয়োদশ্যাং পক্ষেঽসিতে॥
শ্রীরুদ্র শর্ম্মণা গুরং নত্বাং নৃপাজ্ঞয়া।
রামায়ণ পদম্ বিরচিতম্ স্বভাষয়া॥

"শাকে গ্রহ কর মুনি শশী"—৯২৭১=১৭২৯ শকাব্দ=১৮০৭ খৃঃ=১২১৪ বঙ্গাব্দ=২৯৮ রাজশক। বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশী, কৃষ্ণপক্ষে সমাপ্ত।

৩। নৃসিংহ পুরাণ—(ক) প্রথম খণ্ড—দ্বিজ রামনন্দন কর্ত্তৃক অনুবাদিত। (পুঁথির পাতা—৬১)
(খ) দ্বিতীয় খণ্ড ব্রজসুন্দর শর্ম্মা কর্ত্তৃক অনুবাদিত। (পুঁথির পাতা—৭৬) একুনে ১৩৭ পাতা।
(ক) অনুবাদের কাল নিম্নলিখিত পদ হৈতে নির্ণীত হইতেছে।

জয় জল্পিশের অংশে অবনী ঈশ্বর।
শ্রীহরেন্দ্র নারায়ণ রূপে পঞ্চশর॥
তাহার আজ্ঞায় দ্বিজ শ্রীরামনন্দন।
মুনি বহ্নি শৈল শশী শাকে সুশোভন॥ ইত্যাদি—
তদাদেশে নৃসিংহ পুরাণ পদ গায়।
শ্রীরামনন্দন দ্বিজ স্বদেশ ভাষায়॥

"মুনি বহ্নি শৈল শশী" ৭৩৭১=১৭৩৭ শকাব্দ=১৮১৫ খৃঃ=১২২২ বঙ্গাব্দ=৩০৬ রাজশক।

(খ) জয় জয় শ্রীহরেন্দ্র নরেন্দ্র কেশরী।
ভুজবল প্রতাপে কম্পিত বৈরী করি॥

বসুবহ্নি বারিধি রামেশ বিভূষণ।
এহি শাকে সুখে পদ করিলো রচন॥
নৃসিংহ পুরাণ পদ অতি মনোহর।
রাজাজ্ঞায় বিরচিল শ্রীব্রজসুন্দর॥
ভজ মন রাম নবঘনশ্যাম হরি।
ভব নিবারণ মোক্ষ কারণ মুরারি॥

"বসুবহ্নি বারিধি রামেশ"=৮৩৭১=১৭৩৮ শকাব্দ=১৮১৬ খৃঃ=১২২৩ বঙ্গাব্দ=৩০৭ রাজশক।

৪। দ্বিজ রামনন্দন শল্য ও গদাপর্ব্বেরও অনুবাদ করিয়াছিলেন।

জয় জল্পিশের অংশে অবনী ঈশ্বর।
শ্রীহরেন্দ্র নারয়াণ জেন পঞ্চশর॥

তাহার আশ্রিত দ্বিজ শ্রীরামনন্দন।
আজ্ঞা অনুসারে পদ করিল রচন॥

তাতে শৈল (শল্য) পর্ব্ব মধ্যে গদাযুদ্ধ সার।
সমাপ্ত হৈল পদ আদেশত যার॥

৫। কোচবিহার নিবাসী মনোহর দাস কর্ণপর্ব্বের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

বিরিঞ্চি বন্দন নন্দনন্দন মুরারী।
ভকত জনার ভব ভয় দুঃখহারী॥
তস্য ভৃত্য কমতা নায়ক নরপতি।
হরেন্দ্র নারায়ণ নাম মদন মুরতি॥

তদীয় নিদেশ বাসী মনোহর দাস।
কায়স্থ কুলত জাত বিহারত বাস॥
নৃপতি আদেশত কর্ণপর্ব্ব পদ।
লিখিয়া করিল সাঙ্গ শুন সভাসদ॥

৬। ভীষ্মপর্ব্ব – দ্বিজ রঘুরাম দ্বারা অনুবাদিত।

পদাবলী ভারত ভীষ্ম পর্ব্বনো
নৃপাজ্ঞয়া ভাষাতে ভাষয়া॥
গোবিন্দ মহিমাসক্ত ভক্ত গুণাধার।
শ্রীহরেন্দ্র নারায়ণ রাজা কমতার॥

বেদার্থ সম্পন্ন ঋষি ব্যাসের বচন।
তার ব্যাখা করিতে সমর্থ কোন জন॥
ভারতী পদারবিন্দে করিয়া প্রণাম।
প্রাঞ্জলি হইয়া কহে দ্বিজ রঘুরাম॥

৭। দ্বিজ রঘুরাম শান্তিপর্ব্বেরও অনুবাদ করিয়াছিলেন। দ্বিজ ব্রজসুন্দরের ন্যায় ইনিও হরেন্দ্র নারায়ণ নামের ব্যাখা করিয়াছেন।

শিব বংশ জাত বিশ্বসিংহ কুলপতি।
শ্রীহরেন্দ্র নারায়ণ নাম মহামতি॥
হর ইন্দ্র নারায়ণ তিন অংশে জাত।
সত্য শৌচ দয়া ক্ষমা ধর্ম্ম চারি পদ॥
দেবতা ব্রাহ্মণ গুরু তিন পরায়ণ।
এ কারণ নাম শ্রীহরেন্দ্র নারায়ণ॥
ভূমণ্ডলে পুণ্যভূমি কমতা বিহার।
শ্রীহরেন্দ্র নারায়ণ ভূপতি তাহার॥

যার ধর্ম্ম কীর্ত্তি যশ খ্যাত সর্ব্বদেশে।
রঘুরাম নাম দ্বিজ তাহার আদেশে॥
মতি অনুসারে নানা ছন্দে ভাষা বন্ধে
শান্তিপর্ব্বে রাজধর্ম্মে কহিল প্রবন্ধে॥

....

বিহার নগর কামরূপ মধ্যে সার।
শ্রীহরেন্দ্র নারায়ণ ভূপতি তাহার॥
শিব বংশে জাত বিশ্বসিংহ বংশধর।
প্রচণ্ড প্রতাপ মহীমণ্ডল ঈশ্বর॥

তার নিজ দেশবাসী রঘুরাম নাম।
দ্বিজ যার নিবাস মএনা (ময়না) গুড়ি গ্রাম ॥
আরম্ভিল ভারতের শান্তিপর্ব্ব পদ।
রাজার নিদেশে রাজধর্ম্ম সভাসদ ॥

গজ গগণ হুতাশ সসম্মিতে
বিশ্বসিংহ নৃপতেঃ শকাব্দকে।
শ্রীহরেন্দ্র নৃপতেরনুজ্ঞয়া
কৃতমিদং রঘুশর্ম্মণা ময়া ॥

"গজ গগণ হুতাশ" = ৮০৩ = ৩০৮ রাজশক = ১৮১৭ খৃঃ = ১৭৩৯ শকাব্দ = ১২২৪ বঙ্গাব্দ। পুঁথির ১১১ পৃষ্ঠা হইতে একটা অনুবাদ পদ উদ্ধৃত করিতেছি।

পুরুষার্থ শীল হয় বন্ধু মিত্র যার।
সে রাজা উত্তম হয় সকল রাজার ॥
অজস্র সহস্র চর থাকে যে রাজার।
বীরচয় বাস হয় হিত চিন্তে আর ॥
মনুষ্যে গ্রহণ করে আদেশ যাহার।
সে রাজা সকল মহী পারে জিনিবার ॥
এমত বলিয়া ভীষ্ম করিল বিরাম।
হরেন্দ্র প্রসাদে বিচরিল রঘুরাম ॥

৮। আশ্রমবাসিক পর্ব্ব—দ্বিজ কীর্ত্তিচন্দ্র কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

ইতি মহাভারত ভারতী গঙ্গানীর।
শত সাহস্রিক সংহিতাতে সুরুচির ॥
ব্যাসের রচিত অতি পবিত্র কথন।
আশ্রমবাসিক পর্ব্ব হৈল সমাপন ॥

মৃকণ্ডু সুতের বর দানের সময়।
যে নাম পাইছে সদা শিব দয়াময় ॥
সে নামের পূর্ব্বার্দ্ধেতে যাহাকে বুঝায়।
নরেন্দ্র ভূপের রিপু তাক যেন পায় ॥
সে নামের পরার্দ্ধে যে হয় উচ্চারণ।
থাকুক সে যুক্ত হইয়া হরেন্দ্র রাজন ॥
যার অন্ন জলে এহি শরীর আমার।
যার আজ্ঞা মতে হইল পয়ার তৈয়ার ॥

বেদ বান ঋষি শশী শকার জৈষ্টোতে।
আরম্ভ হইয়াছে পদ ভূপের আগেতে ॥
শর ভূত নাগ মহী শকার জৈষ্টোতে।
হইল সমস্ত পদ গুরুর কৃপাতে ॥
যে বৎসরে হৈল মহা উল্কার পতন।
মহার্ঘ হৈল নষ্ট কত প্রাণীগণ ॥
সেই সনে ভারতের পয়ার মধুর।
আরম্ভ কৈরাছে কার্ত্তিচন্দ্র ক্ষিতীপুর ॥

"বেদবান ঋষি শশী" = ৪৫৭১ = ১৭৫৪ শকাব্দ = ১৮৩২ খৃঃ = ১২১৯ বঙ্গাব্দ = ৩২৩ রাজশক।

"শর ভূত নাগ মহী" = ৫৫৭১ = ১৭৫৫ শকাব্দ = ১৮৩৩ খৃঃ = ১২৪০ বঙ্গাব্দ = ৩২৪ রাজশক।

শকার জ্যৈষ্ঠ = ৩০শে জ্যৈষ্ঠ।

অনুবাদ বড় মিষ্ট হইয়াছে। পুঁথিখানিতে মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের পূর্ব্বপুরুষগণের একটী সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। অনুবাদক কোচবিহার সদরের উপকণ্ঠে অবস্থিত স্বীয় বাসভূমি ব্রাহ্মণবহুল খাগড়াবাড়ী গ্রামের বিস্তৃত বিবরণ ও স্বীয় বংশের পরিচয় দিয়াছেন।

পদ হইতে অনুমিত হইতেছে যে ৩২৩ রাজশকে কোচবিহারে উল্কাপতন হইয়াছিল।

নিম্নের পংক্তিগুলি কিরূপ সুমধুর শ্রোত্রসুখ ললিতছন্দে নৃত্য করিয়া চলিয়াছে দেখুন।

প্রণমামি কালী কাল ভয়হরা।
হর উরপর সদা নৃত্যপরা ॥
পরমা সুভীমা ভীমভয় জয়ে।
জয়দায়িনী তারিণী মহামায়ে ॥
—কলি কিল্বিষ নিঃশেষ নাশ করা।
করে অসি শিবাভয় বরধরা।
ধরা চুম্বিত লম্বিত কেশজালে।
জলধর যেন তম নিশা কালে ॥
কালবরণী কামিনী নিরমলা।
হসনে দশনে চমকে চপলা ॥
ললিত লোলিত দোলিত বসনা।
আসব অশনে সঘনে মগনা ॥
শিবমালিনী তারিণী ত্রিলোচনা।
কটী নিকর নৃকর বিভূষণা ॥
শিশু গতাসু যুগল কর্ণপরা।
মুখ গলিত আপাদ রক্তধারা ॥

পদনলিনী নলিনী মানহরে।
বিধি বিষ্ণু হরে যারে সেবা করে॥
ভবতারণ কারণ জ্ঞানরূপা।
হরসুন্দরী শঙ্করী কর কৃপা॥

....

মহাভারত ভারতী পুণ্য ধাম।
তাহে আশ্রমে বাসিক পর্ব্ব নাম॥ ইত্যাদি।

প্রথম পঙ্‌ক্তির শেষ কথাটী লইয়া দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির প্রথম কথা, ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির শেষ কথা লইয়া তৃতীয় পঙ্‌ক্তির প্রথম কথা এইরূপ পর পর পদ যোজনায় বেশ একটী শৃঙ্খলা রহিয়াছে। আবৃত্তি করিতে করিতে মনে হয় যেন নূপুরধ্বনির অনুরণনা হিল্লোলিত হইয়া ভাসিয়া চলিয়াছে—ভারতচন্দ্রের শঙ্কমন্ত্রের কথা স্মরণ হয়। ভারতচন্দ্র যে সমস্ত সংস্কৃতচ্ছন্দকে বাঙ্গালা ভাষার সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তোটক হইতেছে একটী। উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলিতে তোটকের প্রতিধ্বনি শ্রুত হইতেছে।

৯। শ্রীমদ্ভাগবত—ষষ্ঠস্কন্ধ—দ্বিজ জগন্নাথকর্ত্তৃক অনুবাদিত।
(প্রত্যেক স্কন্ধেরই অনুবাদ হইয়াছিল)।

শ্রীল শ্রীহরেন্দ্র নারায়ণ নৃপবর।
শিব জীব শিবমূর্ত্তি শিব নতি কর॥
যোগীন্দ্র যোগেশ জে নরেশ নিরাময়।
জীবরূপে অবনীতে বিরাজ করয়॥
তদীয় নিদেশবর্ত্তী জগন্নাথ ভনে।
তরিতে চিন্তিত তার পারাপার হনে॥

ইতি ষষ্ঠস্কন্ধে শুকমুখের বচন।
মঙ্গলদায়ক তিনি অধ্যাসমাপন॥

১০। কবি কালিদাসের ঋতুসংহারের অনুবাদ দ্বিজ ভূতনাথদ্বারা রচিত হইয়াছিল—নাম ষড়্‌ঋতু বর্ণনা

....

শক্র গর্ব্ব চক্রপাণি বক্র করিলেন।
গোপ উদ্ধরণে গোবর্দ্ধন ধরিলেন॥
পূর্ণ অংশ ধ্বংস কৈল কংস অহঙ্কার।
কুরুকুল কুতুহলে করিলে নিস্তার॥
বিহার নৃপতি শুদ্ধমতি গুণধাম।
শ্রীহরেন্দ্র নারায়ণ সুদুর্লভ নাম।

তারানামে তার সদা রসনা রঞ্জিত।
যার দেশে নাহি পাপ কিঞ্চিত সঞ্চিত॥
....
নৃপতির নিজপোষ্য দ্বিজ দীনহীন।
অল্পমতি নাম ভূতনাথ বুদ্ধিক্ষীণ॥
....
কালিদাস ভাষে করি প্রিয়া সম্বোধন।
ষড়ঋতু বন্ধ কথাচয় সুশোভন॥
নিদাঘ বরষা ঋতু শরত মনোময়।
শিশির হেমন্ত শান্ত বসন্ত সময়॥

শরতের বর্ণনা।

শরত সময়, প্রভাতে চলয়
সুশীতল সমীরণ।
কহ্লার কমল, প্রফুল্ল উৎপল
করায়া তারে কম্পন॥
শরত কালত অঙ্গনার যুত (যূথ)
অঙ্গ ভঙ্গ সুশোভন।
সুললিত গতি, বলি তার অতি
জিতিল মরালগণ॥
জন মন লোভা, মুখশশী শোভা,
জিতিল পঙ্কজলে।
বিলোল লোচন, খঞ্জন গঞ্জন,
জিতিল নীল উৎপলে॥
অনঙ্গ সারঙ্গ, চারু উরু ভঙ্গ
তোয় তরঙ্গে জিতিল।
ভুজ সুললিত, ভূষণে ভূষিত
শ্যামা লতায় হরিল॥ ইত্যাদি—
শরত কালে জলাশয়, পরিপূর্ণ বারিচয়,
মরকত মণির প্রকাশ।
কুমুদিনী বিকশিত, তোয়াশয় বিরচিত,
রাজহংস করে সদা রাগ॥

ক্ষীণ হইল জলধর, দিনচয় মনোহর
সুপ্রসন্ন হইল সকল।
তোয়চয় পরিপুর, কলুষ হইল দুর
শুষ্ক পঙ্কে শোভে ধরাতল।

বসন্তের আগমন

আইলেন দুরন্ত বসন্ত মহাবীর॥
করে করি চুতাঙ্কুর ক্রূর অতিশয়।
অলির আবলি ধনুর্গুণ মনোহর॥
কোকিল কাকলী অলি সুধীর সমীর।
সঙ্গে করি রঙ্গে প্রিয়া আইলেন বীর॥
সকুসুম হৈল দ্রুম সকমল জল।
সকাম কামিনী কুল আকুল সকল॥
....
বসন্ত সময়ে কান্ত বিলাসিনীগণ।
মনোরঙ্গে করে সবে অঙ্গ বিরচন॥
সুনবীন পীন পয়োধর মনোহর।
চর্চ্চিত চন্দন চন্দ্রহার তদুপর॥
ভুজযুগে অঙ্গদ বলয়া বিভূষণ।
জঘনে শোভিছে কাঞ্চি কাঞ্চন রচন॥
....
কর্ণে নব কর্ণিকার করে বিভূষণ।
সুনীল অলকে করে অশোক রচন॥
কনক কমল যেন বদন সকল।
বিরচিত বরপাত্র করয় উজ্জ্বল॥
ভেদ করি স্বেদ বিন্দু বদনে উঠিছে।
কনক কমলে যেন মুকুতা রচিছে॥
....
তাম্রবর্ণ আম্রদ্রুম শাল কুসুমিত।
সুধীর সমীর তারে করেন কম্পিত॥
বকুলে কাকলি করে কোকিলা সকল।
ভ্রমর ভ্রমরাগণ হ'য়া কুতূহল॥

মধুপানে মধুকর মধুর গুঞ্জরে।
সখিসঙ্গে মনোরঙ্গে বিহঙ্গ বিহরে॥
কুসুমে আনম্র আম্রদ্রুম মনোহর।
কিসলয় কিশোর সুন্দর তরুবর॥

বসন্তাগমে চূত মুকুলাস্বাদনে পিকবধূর মধুর-কাকলী ও পরাগশোভিত দ্বিরেফের মোহময় গুঞ্জন যেন পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে অনুপ্রাস পূর্ণ ছন্দে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে। স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারা যায় যে পূর্ব্বোদ্ধৃত রচনাগুলি কবিত্ব সম্পদে সমসাময়িক কোনও বাঙ্গালা রচনা হইতে ন্যূন গৌরব নহে। শরত কালের বর্ণনায় একটা স্বচ্ছ, শান্ত, অনাবিল ভাব বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

১১। শ্রীকৃষ্ণ জন্ম রহস্য—১৭৩১ শকাব্দে রচিত=১৮০৯ খৃষ্টাব্দে=১২১৬ বঙ্গাব্দ=৩০০ রাজশকা ইহা তালপত্রে লিখিত হইয়াছে। অক্ষরগুলি দেখিতে দেবনাগরীর মত।

সভাপর্ব্ব, সুবর্ণ ঘটিকাপদ, ইত্যাদি বহুবিধ রচনা দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকলের উল্লেখে আর প্রয়োজন নাই।

গ্রন্থারম্ভে ও শেষে কবির ভনিতায় অনেক সমসাময়িক ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। অধিকাংশ পুঁথির কাষ্ঠাবরণফলকে সুন্দর চিত্র লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থান্তর্নিবিষ্ট বিষয়গুলি চিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। চিত্রগুলিতে উচ্চ অঙ্গের পরিকল্পনার স্ফূর্ত্তি না দেখিতে পাইলেও, সৌন্দর্য্য আছে। সওয়াশত দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে কুচবিহারে চিত্রবিদ্যা ও চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি কিরূপ ছিল তাহার নিদর্শন স্বরূপ চিত্রগুলির সংরক্ষণ আবশ্যক। কুচবিহারের মত স্যাঁৎসেঁতা জায়গায় থাকিয়াও সে চিত্রগুলির প্রাথমিক রং এখনও প্রায় অবিকৃত আছে তাহা অনু-ধাবন যোগ্য। উহারই মধ্যে উভয় চিত্রের প্রতিলিপি chromatic lenses সাহায্যে লইয়া সংরক্ষিত হওয়া উচিত।

কুচবিহারে রাজসীমন্তিনীগণেরও সাহিত্যানুরাগ কম ছিল না। তাঁহাদের আদেশে দেশীয় কবিগণ দু এক খানি অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন। মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের মহিষী কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া মণিরাম দাস গরুড় পুরাণের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

এহি ব্রহ্মা এহি বিষ্ণু এহি মহেশ্বর।
সংসারে অপর যত তাহার কিঙ্কর॥
ত্রৈলোক্য বিজয় প্রভু এহি তিনজন।
তিনজন এক হৈলে নিত্য নিরঞ্জন॥
এহি তিন জনাতে আছয়ে মোক্ষ কাম।
একভাবে পক্ষিরাজে ভজ অবিশ্রাম॥
মণিরাম দাস কহে ত্যজ আনকাম।
জন্মের সাফল হউক বোলা রাম রাম॥

বিহার অমরাবতী পতি নরেশ্বর।
শ্রীহরেন্দ্র নারায়ণ ভোগে পুরন্দর॥

তার বড় মহিষী রূপসী শিরোমণি।
পদ্মিনী স্বরূপা পদ্মনাথের নন্দিনী ॥
কৃষ্ণের রুক্মিণী যেন পরম দুর্ল্লভা।
সেই রূপে রাণী আঙ্গী নৃপের বল্লভা ॥

কোচবিহার রাজ বংশ কোহিনুর মহারাজা কর্ণেল স্যর্ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর G. C. I. E, C. B. এর পিতা মহারাজা শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণের মাতা পিযু আই কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া কামরূপ নিবাসী দ্বিজ ধর্ম্মেশ্বর মার্কণ্ডের-পুরাণের অনুবাদ করিয়াছিলেন। (ইহার অনেক পূর্ব্বে মার্কণ্ডেয় পুরাণের আর একটী অনুবাদ হইয়া গিয়াছিল)।

এহি রাজমাতা পিযু আই নামে খ্যাতা।
দয়াশীলা দীন জনে পোষণেতে রতা ॥
তাহার আদেশে মার্কণ্ডের পুরাণ।
যত্নে লিখিলাম দ্বিজ ধর্ম্মেশ্বর নাম ॥
পূর্ব্ব দেশে কামরূপ নিবাস আমার।
আশীর্ব্বাদ করিলাম জোড় করি কর ॥
শাকসিন্ধু মুনিধর বিধু পরিমাণে।
সমাপন হইল পুঁথি বিরাম লিখনে ॥

১৭৭৭ শাক=১৮৫৫ খৃঃ=১২৬৩ বঙ্গাব্দ=৩৪৩ রাজশক।

সরলান্তঃকরণ কবি নরেন্দ্রনারায়ণের বাল্যজীবনের একটি ছবি দিয়াছেন। তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই নিবন্ধের পরিসমাপ্তি করিব।

তার পুত্র মহা বিজ্ঞ অতি বিচক্ষণ।
সর্ব্ব দেশে খ্যাত নাম শিবেন্দ্রনারায়ণ ॥
....
সে সব গুণের কথা কহা নাহি যায়।
অন্তে যার অবিমুক্ত কাশী লাভ হয় ॥
তার পুত্র শ্রীশ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ।
পঞ্চ বর্ষে কাশী ক্ষেত্রে রাজা যিনি হন ॥
পিতার আদেশ ছিল কম্পানীর প্রতি।
রাজ কার্য্যে সুশিক্ষিত করিবে সম্প্রতি ॥
কত কাল পরে রাজা কাশী ক্ষেত্র হইতে।
আসিয়া স্বকীয় পুরে কিছুকাল গতে ॥
এজেণ্ট নামেতে এক গবর্ণর প্রধান।
আসি উপনীত রাজার—নয়ন কারণ* ॥

* লইয়া যাইবার জন্য।

বাঙ্গালা মুল্লুকে কলিকাতা যে নগর।
নিরুপম যার সম নাহি সুসহর ॥
সে স্থানেতে লাট নাম গবর্ণর বাহাদুর।
সেহি স্থানে চলিলেন বিহারের ভূপ ॥
নরমধ্যে ইন্দ্রতুল্য নরেন্দ্র রাজন।
সসৈন্যে চলিলেন যেন শ্রীকৃষ্ণগমন ॥
ক্রমাগত মহারাজ অমাত্য সহিত।
কলিকাতা সহরেতে হইল উপস্থিত ॥
তৎপরে মহারাজায় সাক্ষাৎ করিতে।
লাট বাহাদুর লোক পাঠায় ত্বরিতে ॥
বিবেচনা করি রাজমন্ত্রী মহাশয়।
বাগী* পরে রাজাসহ চলিলেন তায় ॥
লাটের বাসায় মহারাজা উপস্থিত।
টুপি খুলি লাট সাহেব উঠিল ত্বরিত ॥
অতি সমাদরে গিয়া রাজহস্তে ধরি।
বসাইল নিজ তক্তায় ক্রোড়ের উপরি ॥
মঙ্গলাদি বার্ত্তা জিজ্ঞাসিল পরস্পর।
পঠনের আলাপন হইল তৎপর ॥
লাট বাহাদুর বলে উপযুক্ত স্থান।
শ্রীকৃষ্ণ নগর বটে গঙ্গা সন্নিধান ॥
সে স্থানেতে রাজা আছে ব্রাহ্মণতনয়।
সেই স্থানে আপনার বাস যুক্ত হয় ॥
এহি সব কথাবার্ত্তা কহিয়া তৎপর।
গমন করিল রাজা শ্রীকৃষ্ণ নগর ॥
সে স্থানের রাজা দেখি চমকিত হইল।
আগবারি (ড়) গিয়া রাজা সম্ভাষণ কৈল ॥
আপনারে ধন্য মানি স্বকীয় দালান।
বাসস্থান দিল তাহে অতি সুশোভন ॥
সসৈন্য অমাত্যসহ এথায় নিবাস।
করিলেন মহারাজা প্রফুল্ল মানস ॥
অতঃপর মহারাজা পাঠ আরম্ভিল।
ক্রমে ক্রমে পাঠে মন নিমগ্ন হইল ॥

* বগী—Buggy.

বাটী আগমন চেষ্টা সকলেই করে।
সে চেষ্টা রাজার নাহি চেষ্টা পাঠান্তরে॥
এ সব বৃত্তান্ত শুনি রাজা জমিদার।
ধন্য ধন্য মহারাজা ধন্য যে বেহার॥
নবদ্বীপ নিবাসীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
লাটের তক্তায় বৈসা শুনি চমকিত॥
প্রত্যহ আসিয়া রাজা করে আশীর্ব্বাদ।
যথাযোগ্য মন্ত্রিদাস দেন অবিচ্ছেদ॥ ইত্যাদি—

যে সকল অনুবাদকের উল্লেখ করিয়াছি তাঁহারা কোচবিহার ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলের অধিবাসী তাঁহারা মহারাজেরদ্বারা পালিত ও তাঁহার "নিজ দেশবাসী"। বুড়াইর হাট (বুড়ীর হাট ?), ভিলাকুরা, মএনাগুড়ি (ময়নাগুড়ি) ও খাগড়াবাড়ীর নাম পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকৃত কোচবিহারের রেভেনিউ ইতিহাসের মানচিত্রে রংপুরের ভিতর ময়নাগুড়ি দেখিতে পাই। রংপুরের নিকট এক বুড়ীর হাট আছে তথায় গবর্ণমেণ্টের কৃষিক্ষেত্র আছে। ময়নাগুড়ি কোচবিহার নগরের কয়েক মাইল পশ্চিমে। জলপাইগুড়ি এলাকায় আর এক ময়নাগুড়ি আছে! তথায় খাসমহালের তহশীল কাছারি অবস্থিত, মার্কণ্ডেয় পুরাণের অনুবাদকের নিবাস "পূর্ব্বদেশ—কামরূপ"।

শ্রীকালীপদ মিত্র।

স্বপ্ন।

—§*§—

স্বপ্ন আমার নরক ওগো, স্বপ্ন আমার স্বর্গ,
সান্ত্বনারি সৌদামিনী, চোরা বালির চর গো
বিন্দু সুখের ইন্দ্রধনু,
শুষ্ক তরুর পুষ্পরেণু,
হারা বাঁশীর সাড়া আমার—
চেনা গলার স্বর গো।
স্বপ্ন মরুর কল্পতরু, বেদন বঁধুর অঙ্ক,
শ্মশান চিতার ধূম্র আমার, উল্লাসেরি শঙ্খ।
সম্মিলনের কুম্ভমেলা,
বিচ্ছেদেরি প্রভাস বেলা,
অশ্রু ধারার কাম্যকূপ ও
রক্ষা কালীর খড়্গ।

স্বপ্ন স্মৃতির সারনাথ আমার, গুপ্ত গুফা লক্ষ ;
বক্ষের আমার তক্ষশীলা, যক্ষ রাজের কক্ষ।
পিছল পথের পান্থশালা,
কণ্টকেরি কণ্ঠমালা,
জ্বালার আমার জ্বালামুখী,
শোভার সরোবর গো।
সত্য দিয়া মিথ্যা গড়ে, মানুষ ভেঙে চিত্র,
কান্তি দিয়ে ভ্রান্তি রচে, শত্রু না সে মিত্র।
হারার সে যে কোমল কারা'
নিস্বঃ আমার বিশ্ব সারা,
নিত্য লভে নেত্রধারা
দুই জগতের অর্ঘ্য !

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

অর্থের ইতিহাস।

——(-ঃ০ঃ-)——

বর্ত্তমানে আমরা দেখিতে পাই পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই বিনিময়ে মধ্যবর্ত্তী হইয়া কাজ করিবার জন্য দুই রকম অর্থের প্রচলন আছে। একরকম ধাতুমুদ্রা (Metallic-coins) যেমন স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা, তাম্রমুদ্রা ইত্যাদি ; আর এক রকম কাগজের অর্থ (Paper-money) যেমন বিল্ অব্ একচেঞ্জ্, ব্যাঙ্কনোট, হুণ্ডি প্রভৃতি। প্রথমে আমরা মুদ্রার কথা বলিয়া পরে কাগজের অর্থের আলোচনা করিব।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি যে, জিনিষের বদলে জিনিষ লওয়ার অসুবিধা হওয়াতেই, মানুষ, বিনিময়ে মধ্যবর্ত্তী হইয়া কাজ করিবার জন্য অর্থের আবিষ্কার করিতে বাধ্য হয়। Prof. Hildebrand বলেন যে অর্থের অভিব্যক্তির ধারাকে তিনটী সুস্পষ্ট বিভিন্ন যুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তাঁহার মতে প্রথম যুগ ছিল "জিনিষের বদলে জিনিষ" (Barter) লওয়ার যুগ। অর্থের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ হইল ; কাজেই এই যুগের নাম করা যাইতে পারে অর্থব্যবহারের (Use of money) যুগ। তৃতীয় যুগের বিশেষত্ব ধারে বিনিময় (Credit).

অর্থের ইতিহাসের কথা বলিতে যাইয়া Prof. Hildebrand এই যে অর্থের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে মতবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, নূতন গবেষণার ফলে এখন আর তাহাকে খাঁটি সত্য বলিয়া মানা যায় না। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, কি অসভ্য, কি সভ্য সমাজে সর্ব্বত্রই সোজাসুজিভাবে জিনিষের বদলে জিনিষ বিনিময় (Barter), অর্থের ব্যবহার (Money) এবং ধারে বিনিময় (Credit)—এই তিনটী পাশাপাশি বর্ত্তমান। তবে প্রত্যেক দেশেই যে সবগুলিই বর্ত্তমান ছিল বা আছে এমন নহে। কোনো দেশে 'জিনিষের বদলে জিনিষ বিনিময়' (Barter),

ও অর্থ (Money) উভয়ই ; কোনো দেশে অর্থ ও ধারে বিনিময়, আবার কোনো দেশে জিনিষে-বিনিময়, অর্থ ও ধারে বিনিময় এই তিনটীরই প্রচলন ছিল।

কিন্তু অর্থ আবিষ্কারের প্রথমেই যে ধাতুমুদ্রা অর্থের কাজ চালাইতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহা নহে। পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস পড়িলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অতি পূর্ব্বকালে মুদ্রার প্রচলনই ছিল না, তখন অন্যান্য জিনিষ অর্থের কাজ চালাইত। সে সকল জিনিষের একটা সাধারণ বিশেষত্ব ছিল এই যে, যে দেশে যে জিনিষটী অর্থ বলিয়া স্থিরীকৃত হইত, সে দেশের প্রত্যেকেই উহার সহিত স্ব স্ব দ্রব্যসম্ভার বিনিময় করিতে স্বীকার করিত। প্রাচীনকালে এই সকল জিনিষ বিনিময় মধ্যবর্ত্তী যে, সকল দেশে ও সকল সময়ে একই বস্তু ছিল তাহা নহে ; যেমন—জাপানে ছিল চাউল, মধ্যএশিয়াতে চায় পুরিয়া, মধ্যআফ্রিকায় লবণ ইত্যাদি।* কোথাও দেখিতে পাই জীবনের একটী নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী আবার কোথাও বা একটী সখের অলঙ্কার বিশেষ অর্থের এই কাজ চালাইত। তবে এটা লক্ষ্য করিবার যে এক শ্রেণীর জিনিষ—সোণা, রূপা, তামা প্রভৃতি ধাতু—অতি প্রাচীনকাল হইতেই সভ্য সমাজে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এগুলি অর্থরূপে ব্যবহৃত অন্যান্য-জিনিষের স্থান অধিকার করিয়া অর্থের কাজ চালাইতে লাগিল। এখানে একটা প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে, সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্য জিনিষের পরিবর্ত্তে ধাতুই যে অর্থের কাজ চালাইতে আরম্ভ করিল,—ইহার কারণ কি ?

এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাদিগকে দুইটী বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিতে হইবে। প্রথম বিবেচ্য, বেশ ভাল ভাবে অর্থের কাজ চালাইবার জন্য একটী জিনিষের কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন ; দ্বিতীয়তঃ ধাতুতে সে সকল গুণ পূর্ণমাত্রায় আছে কিনা। আমরা আগে প্রথম বিষয়টীর অনুসন্ধান করিব। অর্থের কাজ চালাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইতে হইলে একটী জিনিষের (১) মূল্য (Value) থাকা প্রয়োজন, সেই মূল্য পরিমাপযোগ্য ও সঞ্চিত হইবার (Store) উপযুক্ত হওয়া চাই।

(২) এই মূল্য স্থায়ী হওয়া দরকার। কারণ আজ আমি আপনার নিকট হইতে ১০৲টী টাকা ধার লইলাম, একমাস পর যখন উহা আপনাকে শোধ দিতে যাইব, তখন যদি প্রত্যেকটী টাকার মূল্য কমিয়া আট আনার সমান হয়, তাহা হইলে তো ওই সমপরিমাণ টাকা তখন ফেরৎ দিলে চলিবে না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য অর্থের মূল্য স্থায়ী হওয়া আবশ্যক।

(৩) ইহা সহজে বিভাগযোগ্য ও একজাতীয় (Homogeneous) হইবে। এখানে বিভাগযোগ্য শব্দের দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে না যে, উহা টুকরা টুকরা হওয়ার উপযুক্ত। বিভাগযোগ্য শব্দের অর্থ এই বুঝিতে হইবে যদি কোনও এক বিশেষ পরিমাণ অর্থকে বহুভাগে বিভক্ত করা যায় তাহা হইলে উহার প্রত্যেক অংশের মূল্য সমগ্রের অনুপাতে বজায় থাকিবে ; আবার ওই সকল অংশগুলি একত্র করিলে উহার সমষ্টির মূল্যের সমান হইবে।

(৪) এ জিনিষটী যাহাতে অনায়াসে ও তাড়াতাড়ি চিনিয়া লইতে পারা যায় এরূপ গুণবিশিষ্ট হওয়া প্রয়োজনীয়।

(৫) অল্প আয়তনে অধিক মূল্যবান হওয়া উচিত। এখন আমরা একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইব যে, অর্থের কাজ ভালভাবে চালাইবার জন্য অন্যান্য জিনিষ অপেক্ষা ধাতুরই উপরের লিখিত গুণগুলি বেশী পরিমাণে আছে। এই জন্যই একাজে কৃষিজাত দ্রব্য অথবা অন্যান্য জিনিষ অপেক্ষা ধাতুমুদ্রার প্রাধান্য।

* এখনো ঢাকা সহরে কড়ির বিনিময়ে জিনিষের ক্রয় বিক্রয়াদি চলে।

ইহা ত হইল—আচ্ছা, ধাতুমুদ্রার প্রাধান্য না হয়—বোঝা গেল; কিন্তু ধাতুমুদ্রা এখন যে আয়তনে, যে ওজনে, যে চেহারায় ব্যবহৃত হয়, উহার আদি হইতেই কি ঠিক এই ভাবে চলিয়া আসিতেছে? অবশ্যই না—প্রথমে ধাতু পিণ্ডাকারে ব্যবহৃত হইত। প্রত্যেকবার বিনিময়ের সময় ধাতুপিণ্ডকে ওজন করিয়া এবং উহার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিয়া লইতে হইত। বর্ত্তমান যুগের প্রারম্ভেও চীনদেশে এই প্রথা প্রচলিত থাকায় তথাকার বণিকগণ দাঁড়িপাল্লা ও কষ্টিপাথর সঙ্গে লইয়া ঘুরিত।

ইহাতে বড় অসুবিধা হইত। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য মানুষ পরে বুদ্ধি স্থির করিল যে, ধাতুকে অর্থরূপে ব্যবহার করিবার সময় পিণ্ডাকারে ব্যবহার না করিয়া কাটিয়া অন্য আকারে ব্যবহার করা হউক; এবং গভর্ণমেণ্ট উহার প্রত্যেক টুকরার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিয়া এবং ওজনে ঠিক করিয়া উহাতে এক একটা গভর্ণমেণ্টের ছাপ দিয়া দিউন, যেন প্রত্যেকবার বিনিময়ের সময় আর দাঁড়িপাল্লা ও কষ্টিপাথরের সাহায্য লইয়া কষ্ট পাইতে না হয়। সেই হইতেই ওই প্রস্তাবানুযায়ী কাজ চলিতে লাগিল। ৮০০-৭০০ খৃঃ পূঃ মধ্যে লিডিয়ার (Lydia) এক রাজা এক প্রকার ধাতুমুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন, এই মুদ্রন আকৃতি ছিল কতকটা শিম ও বরবটীর মত। উহার কয়েকটী নমুনা এখনো বৃটিশ মিউজিয়ামে (British Museum) রক্ষিত আছে।

কিছুদিন পরে দেখা গেল যে, এই দ্বিতীয় প্রস্তাবও বড় সুবিধার নয়। গভর্ণমেণ্ট মুদ্রার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিয়া, ওজন ঠিক করিয়া ছাপ দিয়া দিলে কি হইবে? জগতে তো আর প্রবঞ্চকের অভাব নাই। কেহ কেহ সুকৌশলে মুদ্রাগুলির যে পিঠে ছাপ নাই সে স্থান হইতে, এবং কিনার হইতে চাঁছিয়া চাঁছিয়া ধাতু সংগ্রহ আরম্ভ করিয়া দিল। সুন্দর ব্যবসা!! যখন এই 'সুখের ব্যবসার' খবরটা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, তখন সকলেই আবার দাঁড়িপাল্লা ও কষ্টিপাথরের আশ্রয় গ্রহণ করিল। না করিয়া করে কি?—এদিকে চাঁছিবার গুণে যে প্রত্যেক মুদ্রার ওজন অনেক কমিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া নূতন নিয়মে মুদ্রা তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিলেন। এই নূতন নিয়মে সকল মুদ্রাই হইল গোলাকার। উহার দুই পিঠেই গভর্ণমেণ্টে ছাপ সংযুক্ত হইল, এবং কিনারটা কাচা কাচা করিয়া কাটা (Relief impressions) হইল। কাজেই প্রবঞ্চকের উহাতে হাত দিবার সুযোগ রহিল না। এই আকৃতির মুদ্রাই বর্ত্তমানে চলিতেছে। জালের তবু অবধি নাই—ইহার পর আবার মুদ্রা কোন মূর্ত্তি ধরিবেন তাহা অর্থবিদ্‌গণই জানেন!" ক্রমশঃ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

খাঁচার পাখী।

——:-:——

খাঁচার পাখী পোষ মানেনি ফাঁক্ পেয়ে সে উড়্‌ল বলে,
আগল দিয়ে এক্‌লা ঘরে বুক ভাসালি নয়ন জলে!
আকাশ পানে তাকাস্ নিরে, উড়্‌লে সে কি আস্‌বে ফিরে?
গাইবে না আর তেমন করে, অমন করে ডাকাই মিছে—
সকল বোঝা নামিয়ে গেছে ধূলোয় ভরা খাঁচার নীচে!

দেখিস্ না যা' ধূলায় মিশে, পূর্ণ তাহা সুধায় বিষে,
উড়ে যাবার, ঝরে যাবার, চলে যাবার এই যে ব্যথা,—
মনের মাঝে কান্ পেতে শোন্, শুন্‌তে পাবি আশার কথা !
জন্ম নাচে, মৃত্যু নাচে, হের কাহার পায়ের কাছে,
চিরদিবস দেখায় সে যে, যায় না দেখা সরল চোখে—
বাজায় ভেরী মাভৈঃ রবে অবিশ্রান্ত সর্ব্বলোকে !
যাত্রা পথে নিষেধ মানা, কেউ শোনেনা, কেউ শোনেনা,
বাতাস আনে আকাশ হতে বার্ত্তা নব মনের মত,
রঙান নেশা, পুলক লাগা, জাগায় প্রাণে স্বপ্ন শত !
জ্ঞান দিয়ে যা যায় না বোঝা, গানের সুরে হয় সে সোজা,
যাদুকরের মন্ত্রবলে মরণমুখী অন্ধকারে—
নবজীবন দীপ্ত হয়ে জ্বলে সোনার দীপ্ আঁধারে !

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ

সেবিকা।

—:*:—

(১)

গৃহ-প্রতিষ্ঠিত দেবতা শ্রীগোপাল বিগ্রহের সেবার জন্য একটী সেবিকার প্রয়োজন। যখন স্বর্গীয় জমিদার প্রৌঢ় বয়স পর্য্যন্ত সন্তানহীন নিরানন্দ জীবন যাপন করিয়া কুল-গুরুর আজ্ঞায় গোপাল প্রতিষ্ঠার পর সন্তানবান্ হইলেন, তখন গৃহিণী সেই গোপাল-স্বরূপ গোপাল কোলে পাইয়া নিয়ম করিলেন, বিগ্রহের সেবার জন্য একটী করিয়া অবীরা ব্রাহ্মণ কন্যাকে আশ্রয় দিবেন। কয়দিন সেবিকা অভাবে একজন ব্রাহ্মণ দ্বারা কাজ নিষ্পন্ন হইতেছিল।

অতি প্রত্যূষে, তখনো মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত হয় নাই, সেই সময় সেবক-ব্রাহ্মণ মন্দিরের বাঁধানো প্রাঙ্গনে আসিয়া দেখিতে পাইল, শুভ্রবেশা সদ্যস্নাতাঃ একটি নারীমূর্ত্তি সেইখানে নত মস্তকে দাঁড়াইয়া আছে, সে যেন পূর্ব্বাকাশের জ্যোতিঃ উদ্ভাসিতা অরুণার মত। সে যে অবীরা বিধবা তাহা তাহার ম্লান মুখ আর বেশ-বাসে প্রকাশ পাইতেছিল। মুণ্ডিত মস্তক, সমস্ত দেহ মনে তাহার একটা কুণ্ঠিত লজ্জিত ভাব, জীবনে বুঝি সেই তার সর্ব্ব প্রথম অপরিচিতের সম্মুখে প্রকাশ হওয়া। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি এই মন্দিরের সেবিকার কর্ম্ম প্রার্থিনী ?" সে তেমনি নতমুখে নীরবে মাথা নাড়িয়া সম্মতি দিল। "হাঁ তুমি ব্রাহ্মণ কন্যা তো মা ?" সে তেমনি ভাব জানাইল—।

সেই দিন হইতে সে দেহমনে এই মন্দিরের সেবিকা; সে থাকিত মন্দির সংলগ্ন ছোট একখানি কুটীরে, নিভৃত সে স্থান; পূজারী পুরোহিত ছাড়া অন্য কেহ কখনও তাহার কণ্ঠ-স্বর শোনে নাই। পুরোহিত যখন নিতান্ত প্রয়োজনীয় কোন প্রশ্ন করেন, তখনই সে যেন কোথা হইতে কয়েকটা শব্দ সংগ্রহ করিয়া নিতান্ত অনিচ্ছায় উত্তরটা যোগাইয়া দেয়। আর কাহারও সহিত তাহার বড় সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু যখন সে কুটির হইতে মন্দিরে, বা মন্দির হইতে পুষ্করিণীধারে গিয়া দাঁড়াইত তখনি নিকটস্থ লোক তার সেই অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত জ্যোতিঃশিখার মত মূর্ত্তি দেখিয়া অননুভূত শ্রদ্ধাভরে চাহিয়া দেখিত, সে প্রস্থানের পর মনে হইত সঙ্গে সঙ্গে যেন রুদ্ধদ্বার মন্দির খুলিয়া একটা নির্ম্মাল্যের ফুল চন্দনের স্বর্গীয় সৌরভভারাকুল বাতাস বাহিয়া গেল। রাত্রে সন্ধ্যা-আরতির পর বাদ্য থামিলে সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মন্দিরদ্বার বন্ধ করিবার ভার সেবিকার উপর ছিল, পুরোহিত কেবল মাত্র বিগ্রহকে শয়ন করাইয়া দ্বার ভেজাইয়া দিয়া চলিয়া যাইতেন; কিন্তু কেহ কেহ গভীর নিশিথেও রুদ্ধ দ্বার মন্দির মধ্যে সেবিকার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইত। আর সেবিকা! সে নিষ্পলক নেত্রে সমস্ত রাত বিগ্রহের সেই বাল্য চাপল্য মাখা হাসিমুখ, সেই দুষ্টামি ভরা চটুল নয়ন, নিটোল নধর শরীর, সেই সুগঠিত মূর্ত্তি,--সে অতৃপ্ত চক্ষে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত। সে আজ দুইটী বৎসর হারাইয়াছে, ওগো এমনি ছিল তার খোকা, তার সাত-রাজার-ধন মাণিক গোপাল, এমনি করিয়াই সে উপর পানে তাকাইয়া হামা দিয়া আসিয়া তার পিঠে ভর দিয়া দাঁড়াইত, এমনি হামা দিয়া আসিয়া সে মায়ের পাতের ভাত তুলিয়া মুখে পুরিত, এমনি ছিল সেও দুষ্টু, মা তো তাকে চোখে চোখে রাখিয়াও হারাইয়াছে। সুদীর্ঘ দুইটী বৎসর প্রতি মুহূর্ত্ত গুণিয়া কাটাইয়াছে, তবু সে যে পলাইয়াছে আর ফেরে নাই! কতবার মা তার শূন্য অশ্রুসিক্ত বুকে হাত রাখিয়া রাখিয়া চমকিয়া দেখিয়াছে, নাই—কই আর ত তাহার হাসির লহর,--খোকা তার বুক জুড়াইয়া নাই, শুধু বিরাট শূন্যতা নিরেট পাথরের মতই তার শূন্য মাতৃ-হৃদয় চাপিয়া আছে! "ওরে আমার নিষ্ঠুর গোপাল, তুই তো তোর মাকে ফাঁকি দিয়া পলাইয়াছিস্ কিন্তু মায়ের প্রাণকে ত ফাঁকি দিতে পারিস্ নাই, সে আজ তোকে খুঁজিয়া পাইয়াছে, তাই কি এখন শুধু নীরবে, মায়ের পানে চেয়ে হাসিস্? তাই তো--গোপাল তাই--তুই তো শুধু মায়ের ধন নস--তুই কেমন করিয়া আর এই মায়ের ছোট বুকে থাকৃবি--থাক্ বাবা ওই রত্ন-খচিত সিংহাসনে, আমি শুধুই তোকে দেখি বাছা,—কতকাল যে দেখি নাই রে, তবু সাধ যায় একটী বার বুকে জড়াইয়া ধরিতে, সেই কোমল মধুর স্পর্শ, বাবা আমার, —" বিগ্রহ হইতে কি মধুর স্নিগ্ধ জ্যোতিঃকণা বিচ্ছুরিত হইয়া সেই শোকাতুরা মার প্রাণে যেন কি এক সাম্য শান্তি অনাবিল ভাবে মাখাইয়া দেয়—তাই দিন দিন সে যেন সমস্ত অন্তর দিয়া সে সেই মন্দিরকে জড়াইয়া ধরিতেছিল।

(২)

বৈশাখ মাস, গৃহকর্ত্রী প্রত্যহ পুরোহিতের কণ্ঠোচ্চারিত শ্রীমদ্ভগবত গীতা শ্রবণ করেন। নববর্ষের প্রথম সূর্য্য কিরণ যেন সমস্ত কলুষ মুক্ত শুচি-শুদ্ধ নূতন হইয়াই মানুষের প্রাণে নব জীবনের নূতন আভাস দেয়। পূর্ব্ব গগনে নবারুণ রাগ প্রকাশিত হইবার বহু পূর্ব্বেই সেবিকা অন্যান্য কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া চন্দন লইয়া বসে, তৃষিত চক্ষে গোপালের অনুপম রূপশ্রী দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়া যায়।

অন্দরে পুরোহিত উচ্চকণ্ঠে গীতা পাঠ করিতেছিলেন, অকস্মাৎ সেবিকার বিগত স্মৃতি জাগিয়া উঠিল; সে ব্রাহ্মণকন্যা, এ-সমস্ত শ্লোক তাহার অধীত, সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল যেন তার গোপালেরই কণ্ঠোচ্চারিত ধ্বনি! মুগ্ধা দৃষ্টি বন্ধ করিয়া শুনিল "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি" ইত্যাদি--তাই তো! সেবিকা চমকিয়া আপনিই তাহার রুদ্ধপ্রায় বাণী ফুটাইয়া বিগলিত কণ্ঠে বলিল, "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি,

তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥" "হাঁ তাই তো, বাবা এ যে তোর নতুন বাস, তুই কি আমার হারাবার ধন—এ যে আমার বুক,—তোর মায়ের বুক বাবা, কোথা যাবি তুই এ ছেড়ে"—গৃহাভ্যন্তরে পঠিত হইতেছিল,—নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনংদহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ আর তো কোনই সংশয় নাই, কোনও কিছুতেই যার হানি করিতে পারেনা। এই সেই আমার গোপাল। রাহু-মুক্ত সূর্য্য প্রকাশের মত সহসা অনেকখানি আলোক তাহার মাতৃস্নেহ মহিমান্বিত চিত্তে ভাসিয়া উঠিল, সে তন্ময় হইয়া তাহাই উপভোগ করিতে লাগিল। সে দিন সমস্তদিন সে প্রাণটাকে বড় লঘু বোধ করিতেছিল ; কিন্তু যখন সন্ধ্যায় আবার অস্তমান কিরণে সমস্ত আকাশ চিতাগ্নির লেলিহান রক্ত-রাগ-রঞ্জিত হইয়া উঠিল, আবার তাহার মনে পড়িল, এমনি রক্তসন্ধ্যায় একদিন রোগ-যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট খোকা তাহার, তাহারি বুকে সকল অস্থিরতা হইতে মুক্ত হইয়া তাহার প্রাণে এমনি চিতার আগুন জ্বলিয়া গিয়াছিল। বড় বেদনায় নিজের বুকের স্তন্য সুধা, যাহা ভগবান শুধু খোকার জন্যই তাহাকে দিয়াছিলেন, তাহা সে মুখে পুরিয়া দিয়াও বাছাকে খাওয়াইতে পারে নাই। আবার, বুক তেমনি ভারি—উদাস হইয়া সে মন্দিরের ভিতর গিয়া সন্ধ্যারতির উদ্যোগ করিতে লাগিল।

আজ কেবলি তাহার মনে হইতে লাগিল এই তো তাহার সেই গোপাল, প্রাণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহারি স্পর্শ প্রার্থনা করিতেছে, তাহাকেই কোলে লইবার জন্য বাহু চঞ্চল হইতেছে. মনে পড়িল তাহার সেই কোমল, তপ্ত মধুর প্রাণময় স্পর্শ! সে জানিতে পারে নাই, কখন আরতি শেষ হইয়া গিয়াছে, পুরোহিত চলিয়া গিয়াছেন। মন্দির জনহীন, কেবল বিগ্রহ তাহার গোপালের মত হাসিতেছে। সে আর থাকিতে পারিল না ; বিপুল আবেগ ভরা প্রাণে, সে বিগ্রহকে বক্ষের মাঝে চাপিয়া ধরিল. অস্ফুট স্বরে বলিল "বাবা গোপাল আমার--" সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছিতার পতন শব্দে, সদ্য নিষ্ক্রান্ত পুরোহিত ফিরিয়া আসিয়া শিহরিয়া উঠিলেন! সর্ব্বনাশ! নারীর স্পর্শে গোপাল অপবিত্র হইয়াছেন! সেবিকার একি কর্ম্ম!

কর্ত্রীর বিচারে সেবিকা কর্ম্মচ্যুতা হইল। হায় এযে তার জীবিকার জন্য কর্ম্ম নয়, এযে তার প্রাণ গোপালের সেবা! যখন সে শূন্য উদাস প্রাণে বিশ্বসংসার অন্ধকার দেখিয়া পথে গিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন তাহার নিষ্প্রভ নয়নের দৃষ্টি পড়িল কর্ত্রীর ক্রীড়ারত বালকের উপর ; এ এখানেও কি!—আবার সেই—সেই তাহারি গোপাল! সে যেমন আহগ্র ভরে তাহার প্রাণের ধন গোপালকে কোলে লইত,-- বিগ্রহকে যে আবেগে কোলে লইয়াছিল – তেমনি আবেগে উন্মত্তার মত বালকটিকে বক্ষে তুলিয়া লইল—কৈ এ গোপাল ত নারী স্পর্শে অপবিত্র হইল না!—

গোপাল গোপাল--নারী যে মাতা!

শ্রীনীহারবালা দেবী।

মুক্ত।

—ঃ*ঃ—

রাজা আমি নহি তবু মম প্রাণ বন্ধন-বাধাহীন,
প্রভু নহি কারো, তবু কারো কাছে কভু নহি আমি দীন ;
'আখের ভাবনা' নাইক আমার ডাকিনি অতীত শোকে ;
তাই,—জীবন আমার বহে চ'লে যায় সুদূর কল্প-লোকে।
ভোগ-লালসার ক্ষিপ্ত-দুরাশা নাহি পায় হৃদে স্থান ;
তাই,—ব্যর্থতা নাই এজীবন মাঝে শান্ত-মুক্ত প্রাণ!

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

খাঁচায় ও বাহিরে।

(চিত্র)

তখন বর্ষা নেমেছে! সকাল থেকে বৃষ্টির বিরাম ছিল না, একটা অবিশ্রাম রিম্‌ঝিম্ শব্দে চারিদিক্ মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌ছিল! তরুলতা দুলে দুলে যেন মাথার উপরে আশীর্ব্বাদের অমৃত ধারা বহন কর্‌ছিল! সে তার নির্জ্জন ঘরের দুয়ার ধ'রে ব'সে বাহিরের দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল, ঐ মেঘের অন্ধকার যেন তার ঘরের অন্ধকারকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। সে কোন দিন গৃহের বাহিরে পদার্পণ মাত্র করে নি, যেদিন সে বাহিরকে পেতে চেয়েছিল সেদিন সে সম্পূর্ণ ঘরের ভিতর থেকেই তাকে আহ্বান করে নিয়েছিল! কে তার পিতামাতা, কোথায় তার জন্ম, কোথায় তার স্বদেশ তা সে জান্‌ত না, সে শুধু জ্ঞানোদয় থেকে জেনেছিল এই গৃহই তার ঘর, এ আশ্রয়ই তার আশ্রয়। আত্মীয় তার কেহই ছিল না, অনাত্মীয়ের কিন্তু অভাব নেই, সে নিজেই ছিল তার পরম আপন, আর পরকে নিয়েই তার ঘর—তার সংসার। এমন দিন যেত না যেদিন তার ঘরে অতিথি না আস্‌ত, কত নরনারী অতিথি হ'য়ে তার ঘরে বৎসরের পর বৎসর যাপন ক'রে গেছে, তারপর যেদিন মায়া ছিন্ন কর্‌বার দিন এসেছে সেদিন তারা অনায়াসে মায়া কেটে পিঞ্জরমুক্ত পাখীর মত কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছে—সে আর তার কোন সন্ধান পায় নি। সে হয় ত দু'দিন তাদের স্মরণ ক'রে অশ্রু বিসর্জ্জন করেছে—তারপর আবার নয়ন মার্জ্জনা ক'রে আপনার কর্ত্তব্য-কর্ম্মে মন দিয়েছে, নূতন অতিথিকে পরম যত্নে, পরম আদরে আহ্বান ক'রে নিয়েছে! সে সেই আঁধারকরা, বৃষ্টিঝরা দিনে এই কথাই চিন্তা কর্‌ছিল; সহসা বজ্রগর্জ্জনে তার চমক্ ভেঙ্গে গেল, একবার বহিঃপ্রকৃতির দিকে দৃষ্টি পড়্‌ল। একবার সে আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখ্‌লে, তার মনে হ'ল—তার শ্রান্ত-অন্ধকার মনও যেন এমনি আর্ত্তনাদে বিদীর্ণ হ'য়ে গ'লে ঝ'রে পড়্‌তে পার্‌লে বাঁচে! ঐ যে আকাশখানা এমন ক'রে ধূসর আবরণ টেনে দিয়েছে তার আড়ালে কি আছে তাই দেখ্‌বার জন্য তার অন্তরটি ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ল। সেদিন সে ঝড়-বাদলের দিনে কেহই তার ঘরে আতিথ্য নিতে আসে নি, শুধু আস্‌ছিল একটা ভিজে-মাটির গন্ধ-মাখা জলো-বাতাস আর গুরু গুরু মেঘ-গর্জ্জন, আর কদমফুলের একটা মিঠে মৃদু গন্ধ! ঐ গম্ভীর-ধ্বনি, ঐ করুণ-স্পর্শ আর ঐ মধুর-গন্ধ যেন তাকে উদাস ক'রে দিচ্ছিল, তাকে একেবারে বাহিরের দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির মাঝে টেনে আন্‌তে চাইছিল! বাহির যে এমন ক'রে ভিতরকে আহ্বান করে তা সে কখনও জানে নি, এই প্রথম অনুভূতিতে সে কেমন যেন বিহ্বল হ'য়ে পড়্‌ছিল।

সেদিন তার প্রথম মনে হ'ল সে পৃথিবীতে একেবারে একা, তার প্রথম মনে হ'ল সে প্রবাসিনী; এ-ঘর তার ঘর নয়, এ-দেশ তার স্বদেশ নয়, এ-ভাষা তার মাতৃভাষা নয়! সে একা—সে একা এ-কথা ভাব্‌তেই শোকাতুরের মত চীৎকার ক'রে তার মন কেঁদে লুটিয়ে পড়্‌ল, আর বাতাস তার স্রস্ত অঞ্চলে আর মুক্ত কেশে জলকণা ছিটিয়ে গেল! সে একবার তার চির পরিচিত প্রিয় কক্ষের ভিতরে দৃষ্টিপাত কর্‌ল, তার মনে হ'ল সে ঘর যেন একটা ভীষণ দৈত্যের মত বদন ব্যাদান ক'রে তাকে গ্রাস কর্‌তে ছুটে আস্‌ছে, সে তাড়াতাড়ি নয়ন আবৃত ক'রে বাহিরের দিকে চাইল, আর অমনি এক মুহূর্ত্তের মাঝে তার ভয়-বিহ্বল মন শান্তি লাভ কর্‌ল, সে গ্লানিকাতর হৃদয় জুড়িয়ে গেল! তবু তার কেবলি মনে হ'তে লাগ্‌ল—সে একা, এত বড় পৃথিবীতে তার আত্মীয় কেহই নেই, সে একেবারে নিঃসঙ্গ নিরাশ্রয়—নিছক একা! চারিদিকের দেয়াল যেন তাকে পরিহাস কর্‌ছে, সে বিদ্রূপ হাসি যেন তার বুকের পাঁজরে এসে ধাক্কা দিয়ে গেল! তার মনে হ'ল, তার চরণতলার মাটি যেন ক্রমে স'রে স'রে যাচ্ছে, দাঁড়াবার মত আশ্রয়ও তার নেই! সে দেখ্‌ল এ মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার আকাশের তলায় একটী পান্নার মণিমালার মত এক সার

শুকপাখী চীৎকার ক'রে উড়ে গেল, তার ইচ্ছা হ'ল সেও অমনি অজানার উদ্দেশে উড়ে যায়, ঘরের দিকে আর না ফিরে দেখে ! ক্রমে সে পাখীগুলির কলরব দূরতর হ'তে লাগ্‌ল, আরও দূরে,—আরও দূরে, শেষে এমন হ'ল যে আর শোনা যায় না, কিন্তু তথাপি কতক্ষণ সে ধ্বনি তার বক্ষের মাঝে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগ্‌ল। তার মনে হ'ল ঐ আকাশ কবে এমনি ক'রে তাকে আহ্বান ক'রে নেবে, এ পিঞ্জর থেকে ? সে তৃণশ্যামল পৃথিবীর দিকে উৎসুক হ'য়ে চাইল, তার মনে হ'ল সে যেন তাকে ইঙ্গিত ক'রে ডাকৃছে, ঐ পথের ধূলি, ঐ হরিৎ তৃণদল, ঐ তরু, লতা, গুল্ম, ঐ বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটাগুলি পর্য্যন্ত যেন তাকে আহ্বান কর্‌ছে, সেই সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার যেন তার দিকে আলিঙ্গন বাড়িয়ে আছে !

তার সহসা মনে হ'ল ঐ বাদ্‌লা বাতাস যেন তার আপন ঘরের সন্ধান জানে, এখনি সে ঐ বাতাসের সঙ্গে বাহির হ'তে পার্‌লে স্বদেশে ফিরে যেতে পার্‌বে, ঐ আকাশ যেন তার জীবনের কোন্ রহস্য গোপন ক'রে রেখেছে, সে একবার আকাশের বুকের কাছে যেতে পার্‌লে তার পুরাণ স্মৃতিকে উদ্ধার ক'রে নেবে। তারও যেন একজন পুরাণ মনের মানুষ লুকিয়ে আছে, এই বর্ষা-রাতের অন্ধকার পৃথিবী, সে যদি একবার এই পৃথিবীর মাঝে ছাড়া পায়, তবে সে যেন তার বাঞ্ছিতের উদ্দেশ খুঁজে পায়। অন্ধকার যত জমাট বাঁধ্‌তে লাগ্‌ল, তার ততই যেন মনে হ'তে লাগ্‌ল—তার বাঞ্ছিত যেন তার মিলনের জন্য উৎসুক হ'য়ে আছেন, কিন্তু তিনি কোথায়,—তিনি কোথায় ? এই একটা চিন্তার মাঝে তার সমস্ত থেইহারা মন একেবারে তলিয়ে ডুবে গেল ! তমিস্রা রজনী যতই গভীর হ'ল, বৃষ্টি যতই চেপে এল, তার মনে হ'ল শুধু যে তার বাঞ্ছিত তার জন্য অধীর হয়েছেন তা নয়, সেও যে তাঁর জন্য কতখানি উৎসুক হয়েছে, তা এক মুহূর্ত্তে তার কাছে প্রকাশ হ'য়ে পড়্‌ল ! ক্রমে বাতাস প্রবল হ'ল, দুরন্ত শিশুর মত তার আঁচল নিয়ে টানাটানি কর্‌তে লাগ্‌ল, আর তার মনে হ'ল,—না, না, তার বাঞ্ছিত তাকে আজ যদি বিস্মৃত হ'য়েও থাকেন, তবু আজ সে তাঁকেই চায় ; ক্রমেই তার মিলন-লালসা তাকে এমনি চঞ্চল ক'রে তুল্‌ছিল !

সে-রাত্রে আর প্রদীপ জ্বালা হয় নি, কখন যে রাত্রি দ্বিপ্রহর হয়েছে তার খেয়াল ছিল না, শুধু সে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে এতক্ষণ বসেছিল ! তার মনে হচ্ছিল এই সেই মিলন-রজনী,—যার জন্য সে আজন্ম বিরহ ভোগ ক'রে আস্‌ছে, আজন্ম প্রতীক্ষা ক'রে বসে আছে ! ঐ যে তার প্রিয়তম, মেঘের মাঝে ধূসর হ'য়ে,—শ্যামলের মাঝে শ্যাম হ'য়ে,—অন্ধকারের মাঝে নিবিড় হ'য়ে তাকে ডাকৃছেন ! এমনি ক'রে মিলন বাসনা যখন অসহনীয় হ'য়ে উঠ্‌ল, তখন সে কালবিলম্ব না করে উঠে দাঁড়াল, তার হাতের কঙ্কণ, তার কাণের কুণ্ডল, তার মাথার সিঁথি, তার গলার হার, তার পায়ের নূপুর টেনে খুলে ফেল্‌লে, এ সব যে তাঁর মিলনের বাধা ! কোথায় গেল তার কম্পিত লাজ, কোথায় গেল তার মাথার গুণ্ঠন, সে ছুটে বাহির হ'য়ে এল। সহসা একটা বিদ্যুতের আলো যেন বিবাহ-সভার ঝাড়-লণ্ঠনের মত দপ্‌ দপ্‌ ক'রে জ্বলে উঠ্‌ল, একটা গম্ভীর বজ্রনিনাদ যেন শঙ্খধ্বনির মত বেজে উঠ্‌ল, আর সে একটা ঝড়ো হাওয়ার মত তার প্রিয়তমের উদ্দেশে অভিসারে বাহির হ'য়ে পড়্‌ল! পর মুহূর্ত্তে দ্বিগুণ গভীর তমসা যেন পৃথিবীখানাকে অন্ধকার গহ্বরের মাঝে বিলুপ্ত ক'রে দিলে !

নিবেদন;—

স্থানাভাবে এবারে গ্রন্থ-সমালোচনা দেওয়া গেল না, গ্রন্থকারগণ ক্ষমা করিবেন।

কোচবিহার ষ্টেট্‌ প্রেসে শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও কোচবিহার সাহিত্য-সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

স্নেহের পরশ।

চিত্রকর—শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)
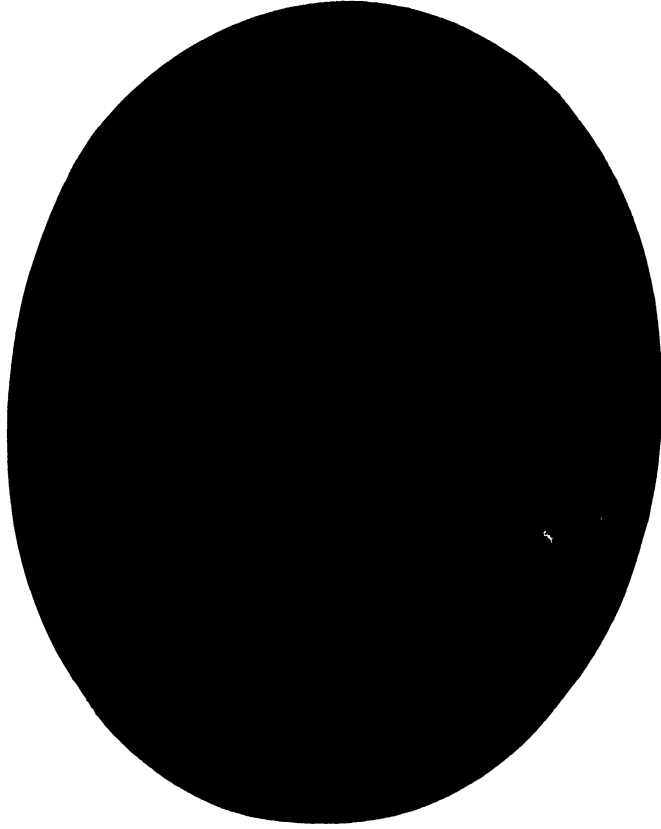
"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।'

২য় বর্ষ। { চৈত্র, ১৩২৪ সাল। ৫ম সংখ্যা।

বেঁচে র'ব।

—:*:—

" 'কিছু' করে' যাব, যেতে দিব না বিফলে
দুর্ল্লভ এ জন্ম মম।"—ভাসি অশ্রুজলে
কহিয়াছি, "কোথা তুমি, ওহে জ্ঞানময়
জীবনের সার্থকতা কিসে মোর হয়
জানাও দাসেরে।"
গেল কত সম্বৎসর
বিনা কাজে, ভয়ে লাজে। প্রাণের ভিতর
প্রচ্ছন্ন বাসনা মোর কাঁদিত কেবল—
"আমার জীবন যে গো হইছে বিফল!"

সুখ এল। কহিলাম, "এ সুখের তরে
নহে শুধু মোর জন্ম।" অতৃপ্ত অন্তরে
বিমুখ করিনু সুখে। দুঃখ সে কঠোর
এল যদি, কহিলাম, "এ জীবন মোর
দগ্ধ, ক্ষত, কেমনেই লাগাইব কাজে?
যেথা যাই প্রতিপদে বুকে ব্যথা বাজে।
আশা বিনা, হর্ষ বিনা, বর্ষ মিছা যায়
বর্ষ পরে, কর্ম্ম-সুপ্ত বাসনা-শয্যায়।"

সুখ দুঃখ আসে যায়, আশা হয় হত,
জন্মে পুনঃ নিদ্রাগর্ভে স্বপনের মত,
এমনি কাটিছে কাল; পৃথিবীর দিন
আসিতেছে ফুরাইয়া; চক্ষে দৃষ্টি ক্ষীণ
হাতে নাই বল আর, কে করিবে কাজ ?
ঊষা দিয়া যায় চেষ্টা, সন্ধ্যা দেয় লাজ
ব্যর্থতার। অবশেষে, চিন্তা চেষ্টা যবে
ফেলিয়া দিলাম দূরে, তুমি এলে তবে।

তুমি এলে। অবারিত, অসীম প্রসার
মহাকাশে শুনিলাম বচন তোমার,
মেঘমন্দ্রে, বৃষ্টিধারে, নদী-কল-তানে,
বৃক্ষপত্রে, ফুলে, ফলে, বিহঙ্গের গানে,
ভ্রমর গুঞ্জনে আর উজ্জ্বল তারায়—
সার্থক জীবন তার আপনা হারায়
জগৎজীবনে যেই। জীবনের কাজ
জীবন জাগায়ে রাখা।" বুঝিলাম আজ।

প্রদীপ সার্থক হয় প্রদীপ হইয়া
আপনারে প্রকাশিয়া আর আলো দিয়া;
নদী বহে যায় শুধু সাগরের পানে
যেতে যেতে দুই কূল ভরে ধনে ধানে,
কি করিব, কি করিব ডাকি পথে পথে
ধায় না সে হেথা হোথা, ফিরে না পর্ব্বতে।
জীবন দিয়াছ তুমি, মুখ চেয়ে তব—
যে ক'দিন রাখ ভবে আমি বেঁচে র'ব।

৩০-৪-১৪

শ্রীকামিনী রায়।

মামেকং শরণং ব্রজ।

—:*:—

গীতায় ভগবান সন্দেহান্দোলিতচিত্ত অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' এমন করিয়া অভয় দিয়া কে আর ডাকিয়াছে? কি জোরের কথা! কি শাশ্বতী শান্তির স্নিগ্ধ-আহ্বান। সব ধর্ম্ম ছাড়িয়া আমার শরণ লও; আমাকে ভজনা কর; আমাকে জানো—আমি সকল ধর্ম্মেরই পরমং বেদিতব্যং, কাজেই আমাকে পাইলেই সকলকে পাওয়া হইবে, আমাকে জানিলেই সকলকে জানা হইবে। সত্যই কি তাই নয়? স্বয়ং ভগবানের শরণ লওয়ার অপেক্ষা অভয়ের অন্য উপায় আর কোথা? ছয় জনের কথা শুনিতে হইবে না, নানা জনের খোসামুদি করিতে হইবে না, মত লইয়া মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করিতে হইবে না; 'উপ,' 'অপ'-দের দ্বারস্থ হইতে হইবে না; বিধি-নিষেধের বাঁধাবাধি নাই; অধিকারী অনধিকারী বিচারে ব্যস্ত হইতে হইবে না—একেবারে সোজাসুজি তাঁর শরণ,—'চরণ যাঁর, ভব তরনে মহাতরণী'। আরো শোনো—স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ! এ ধর্ম্মের একটুখানি লাভ হইলেই মহাভয়ের বিনাশ! একি কম লাভ? কম সান্ত্বনার কথা? শত জন্মব্যাপী শত যজ্ঞের সাধনা চাই-না; ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া বনে-জঙ্গলে বসিয়া কৃচ্ছ্র সাধনের আবশ্যক নাই।—এ অমৃতের বিন্দু মাত্র আস্বাদনে সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ অবশ্যম্ভাবী। "মামেকং শরণং ব্রজ—" শুধু আমার শরণ।—ভগবানের শরণ আর কাহারো নয়।

এ কি-ধর্ম্ম? ইহাতে কি-চায়? কিছুই না এমন—শক্তও কিছু নয়। যেমন আছ তেমনি থাক; যা করিতেছ তাহাই কর, কেবল তোমার করণীয় কার্য্য তোমার নয় বুঝিয়া--ভগবানের কার্য্য ভগবানের করণীয় এই বুঝ। সাফল্য বৈফল্য যা ঘটুক তাও তাঁতে অর্পণ কর। এ বিশ্ব-যজ্ঞাগারে তুমি তাঁহার একজন সেবক মাত্র—যজ্ঞেশ তিনি, যজ্ঞফলভোজী ভগবান স্বয়ং নিজে। তোমার কাছে চাই মাত্র একটু ভক্তি। স্ত্রী হও, শূদ্র হও, অধিকারী হও, অনধিকারী হও কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; শুধু চাই তোমাতে একটু ভক্তি, আর অনন্য মনে, তাঁহাতে শরণ--তিনি কর্ত্তা তুমি সেবক—এই অনন্ত দেশকালব্যাপী এই বিশ্ব যজ্ঞাগারে তুমি একজন সাহায্যকারী। পাপ-পুণ্য তোমায় ছুঁইবে না, সুখ দুঃখ তোমার নয়, লাভালাভ তোমার নয়, সিদ্ধি অসিদ্ধি তোমার নয়, সব সেই যজ্ঞেশ্বর হরির। তুমি আত্মাকে জান, তোমার আত্মবোধ হউক। পরমাত্মার সঙ্গে, আর আরো সব অসংখ্য জীবাত্মার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি তাই ভাল করিয়া বোঝ—এই বোঝার জ্ঞানটুকু হইলেই তুমি সর্ব্বকাম্য লাভ করিবে। এই আত্ম-বোধই ভগবানের কথিত সেই ধর্ম্ম, যার বিন্দু আস্বাদনে মহাভয়ের শান্তি।

'তুমি' 'আমি' 'সে' আর আর কোটী কোটী এই যে পরিচ্ছিন্ন আপাততঃ ভিন্ন জীব পশু, পক্ষী, জন্তু, ইট্, কাট গাছ, পাতা, সবই জীব। সবারই আত্মা আছে। দেখিতে সব স্বতন্ত্র—তফাৎ তফাৎ, কিন্তু মূলে সব এক—এক মহা-বিরাট আত্মারই অংশ মাত্র। তরঙ্গ যেমন সিন্ধু হইতে তফাৎ হইয়াও এক, সমস্ত জীবাত্মাও তেমনি দৃশ্যতঃ তফাৎ হইয়া একই আত্মার ব্যষ্টি বিকাশ। যেমন একই সমুদ্রের জল সর্ব্বতোবিস্তারী, তারই অংশ বিশেষ নাম, রূপ ধরিয়া তরঙ্গ হইয়াছে। তেমনি একই পরমাত্মার অংশ বিশেষ নামরূপ লইয়া, জড়, উদ্ভিদ, কীট পতঙ্গ জন্তু, মানুষ হইয়াছে। তরঙ্গ যেমন সমুদ্রজলে মিশাইলে নামরূপ হারাইয়া এক হইয়া যায়—জীবও তেমনি মৃত্যুতে নামরূপ হারাইয়া ব্রহ্মে মিশাইয়া যায়।

পরিমিত জড় ও শক্তি লইয়া জীব—আর বিশ্বের ও বিশ্বাতিরিক্ত সমস্ত জড় ও শক্তির একাকার সমষ্টিই ব্রহ্ম। এই জড় ও শক্তি একই নির্বিশেষ পদার্থের দ্বিধা বিকাশ। ভগবানের পরা ও অপরা প্রকৃতি। 'ক্ষেত্র' ও 'ক্ষেত্রজ্ঞ'। নির্গুণ ব্রহ্ম কিনা দেশকালাতীত নির্বিশেষ (undifferentiated) অব্যক্ত পরম (absolute) পদার্থ জড় ও শক্তিতে দ্বিধা বিকৃত বিভক্ত হইয়া হইলেন সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর (Substance, Conditioned and limited) ঈশ্বর মনযুক্ত হইলেন, ঐক্ষত,—এক আছি বহু হইব—'মহতে' পরিণত হইলেন—মহৎ কিনা cosmic mind। তা না হইলে কাঁহার ইচ্ছায় এক হইতে বহু? তার পর ঈশ্বর হইতে আসিল দেবতা। ইহারাই তন্মাত্র—(Subtlest manifestations of primal matter and energy)। তন্মাত্র ঘনীভূত হইতে হইতে নানারূপে নানা নামে হইল জীব। এই সৃষ্টি। এই অসংখ্য কোটী কোটী জীব কেমন ধীরে ধীরে দেবতা হইতে, দেবতা আবার কেমন ঈশ্বর হইতে আর ঈশ্বর কেমন ব্রহ্ম হইতে—স্রোতের মত নামিয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে। জীব মরিবে মরিয়া তন্মাত্রায় লয় হইবে, তন্মাত্র আবার ধীরে ধীরে ঈশ্বরে মিশিবে, ঈশ্বর আবার ব্রহ্মে গিয়া অস্তিত্ব ডুবাইয়া দিবে। এই প্রলয়।

ব্রহ্মে এই সৃষ্টি ও প্রলয় শ্বাস ও প্রশ্বাসের মত ক্ষণে ক্ষণে হইতেছে। খণ্ড-জীবের এই যে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে লয় ইহাই তাহার মৃত্যু। আবার একটী গ্রহের কল্পান্তে যে ধ্বংস তাই তার ক্ষুদ্র প্রলয়। আবার সমস্ত সৌর-জগতের যে ধ্বংস তাই হইল মহাপ্রলয়। কি জীব, কি দেবতা, কি ঈশ্বর, সকলেরই স্বরূপ লয় হয় মাত্র ; আত্যন্তিক ধ্বংস হয় না। এই স্বরূপ লয় অর্থেই হইতেছে—নির্বিশেষভাবে বীজরূপে ব্রহ্মে স্থিতি। কাল সহকারে আবার ফুটিবে, আবার জীব দেবতা—ঈশ্বর লীলা আরম্ভ করিবে।

"অনন্ত কাল ধরিয়া একি লীলা গো!
দুলিছ, দোলা দিতেছ হে—"

বিশ্বের সহিত 'আমার' 'তোমার' এই সম্বন্ধ। আমার সহিত তোমার—'তোমার-আমারে'র সহিত ঈশ্বরের ও তোমার-আমার-ঈশ্বরের সঙ্গে ব্রহ্মের এই সম্বন্ধ। এটী বুঝিলেই শুধু বুদ্ধির দ্বারা নয় বোধির দ্বারা (intellectually নয় intuitively) বুঝিলেই কাজ হইল। অন্তত একটু বুঝিলেও অনেক লাভ, অনেক শান্তি, অনেক ভয়ের উপশম। আমি একা নই—অসংখ্য আমার সাথী ও স্বজাতি-দেবতা-ঈশ্বর-এঁরা আমাদেরই মত এক আদিপুরুষ—ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। ভগবান সাধে কি বলিয়াছেন. "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ?"

এই বোধ হইতে আসিবে—'তবেই ত বটে! আমি বিশ্বের জন্য—বিশ্ব আমার জন্য নয়! আমার আমিটার বিশ্বজুড়িয়া বসিয়াও স্থান কুলাইতে ছিলনা, এখন ত দেখিতেছি আমি কতটুকু! আমার স্থান কোথায়? আবার ঘুরাইয়া দেখ—আমি-ই ত সব—জলস্থল, ব্যোম্ পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ তরুলতা তৃণ, সবই ত আমি—অর্থাৎ আমি-যে-বস্তু সেই বস্তু সবের ভিতর। যে বস্তু নামরূপের যোগে তৃণ, কীট, জন্তু, দেবতা হইয়াছে সেই বস্তুই—নাম-রূপের যোগে 'আমি' হইয়াছি। সমস্ত বিশ্বই এই আমি-বস্তুরই লীলা।

এই সর্ব্বভূতে নিজের স্বজাতিত্ব বোধ বা একত্ব বোধ হয় জ্ঞানে। আধুনিক বিজ্ঞানালোচনা এই বোধটী অতি সুন্দর ভাবে জাগরিত করে। আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্বকে সব দিক দিয়া সহজজ্ঞানে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছে। ফলে বিজ্ঞান যে সিদ্ধান্তে আসিয়াছে তাহা ভারতীয় অদ্বৈতবাদেরই সাধনলব্ধ ফল। বিজ্ঞান জড়কে ও শক্তিকে দুই দিক দিয়া স্বতন্ত্রভাবে আক্রমণ করিয়া পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়াছে। বিজ্ঞান প্রতিপন্ন করিয়াছে সমস্ত নামরূপধারী জড়মূর্ত্তি এক আদিম নামরূপহীন জড়পদার্থেরই

রূপান্তর, আর সমস্ত শক্তির দৃশ্যমান রূপই এক আদিম মূল শক্তিরই রূপান্তর। বিশ্ব এক মূল জড় ও মূল শক্তিরই মিলন ঘটিত ব্যাপার। অধ্যাত্ম বিদ্যার প্রকৃতি ও পুরুষ, শিব ও শক্তি আর জড়বিদ্যার পদার্থ ও শক্তি একই কথার বিভিন্ন নির্দ্দেশ। বিজ্ঞান এই দ্বৈতবাদে সন্তুষ্ট নহে, বিজ্ঞান এখন বলিতে চাহিতেছে "জড়কে জড় বলিয়া, শক্তিকে শক্তি বলিয়া তফাৎ করিবার আর হেতু দেখা যায় না। বস্তুতঃ জড় শক্তিতে যে তত্ত্বগত কোনো ভেদ আছে মনে হয় না; জড় এমন যায়গায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে যে আর শক্তি হইতে তাহাকে ভিন্ন বস্তু বলিয়া ধারণা হইতেছেনা।" সুতরাং বিজ্ঞান এখন বলিতে চাহে—"জগতে একমাত্র বস্তু আছে; তাহার দুই মূর্ত্তিতে বিকাশ, শক্তি ও জড়। শক্তিই জড়ে রূপান্তরিত হইতেছে। এবং সেই জড় নানা-রূপ অবলম্বন করিয়া এই দৃশ্যমান অসংখ্য জীব ও অজীব মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। এই আদিম নির্ব্বিশেষ নামরূপহীন একপদার্থ (Substance) হইতেই বিশ্বের বিবর্ত্তন এবং ইহাতেই বিশ্বের চরম লয়। এই বিবর্ত্তন ও আবর্ত্তন, সৃষ্টি ও লয় দেশে ও কালে অনন্ত। শেষও নাই আরম্ভও নাই।" এ সব উক্তিতে বুঝা যায় যে পাশ্চাত্যবিজ্ঞান ও ভারতীয় অধ্যাত্ম-দর্শন একই সত্যের দুইভাবে সন্ধান পাইয়াছে। সুতরাং বিজ্ঞানের সাহায্যে দর্শনের সত্য উপলব্ধি যদি সুকর হয় তাহাতে ত আমাদের সুবিধাই আছে। সাধারণের মধ্যে একটা ভয় ও ভ্রম আছে যে পাশ্চাত্যবিজ্ঞান পড়িলে লোকে নাস্তিক হইবে। ভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাস থাকিবেনা। সে ভয় মিথ্যা ও হেতুহীন। জ্ঞান যখন আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার সহায়তা করে তখন আধুনিক বিজ্ঞান তাহা পারিবেনা ইহা যুক্তিই নয়। একটু আধটু অল্পবিদ্যায় সে ভয় হইতে পারে, কিন্তু সমস্ত অল্পবিদ্যাই ভয়ঙ্করী। ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্র একসঙ্গে আলোচনা করিলে এ ভয় আর থাকিবেনা। অধ্যাত্মশাস্ত্র তত্ত্বভাবে যাহা বলিয়াছে, বিজ্ঞান সত্যভাবে তাহা বুদ্ধিগ্রাহ্য করিয়া দিবে। বুদ্ধি (intellect) ও বোধি (intuition) উভয়ে মিলিয়া একটা সত্যকে উপলব্ধি করিলে, ফল কত সুন্দর হয়। তার পর এক কথা—পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকরা যে নাস্তিক ও নাস্তিক্যধর্ম্মের প্রচারক ইহা অত্যন্ত ভুল ধারণা, সে কথা বারান্তরে আলোচ্য।

ফল কথা, মুক্তি সর্ব্বাপেক্ষা সহজলভ্য তখন,--যখন মানুষ সমস্ত মানুষ-গড়া আচার-ভারাক্রান্ত ধর্ম্মত্যাগ করিয়া শুদ্ধ সেই জ্ঞানরূপী ভগবানের শরণ গ্রহণ করে। খাঁটী একবিন্দু আত্মজ্ঞান সহস্র অনুষ্ঠান—জটিল মতধর্ম্মের অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ। এই জন্য পূর্ণজ্ঞানের অবতার শ্রেষ্ঠাধিকারীকে ভরসা দিয়াছেন—

স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ।

এবং সব ছাড়িয়া　"মামেকং শরণং ব্রজ"—"আমার শরণ লও।"

শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত।

চণ্ডীদাস।

—§*§—

ষণ্ডা গোঁয়ার গুণ্ডা তুমি, শাক্ত তুমি শক্ত হে,
ব্রাহ্মণ এবং ব্রহ্মচারী, বৈষ্ণব এবং ভক্ত হে।
নষ্ট তুমি দুষ্ট তুমি, ভ্রষ্ট তুমি লোক চোখে,
অচ্ছ তুমি, স্বচ্ছ তুমি, গঙ্গাবারি তক্‌তকে।

নাম্‌লো অভিসারের পথে পুষ্পক রথ ঝল্‌মলে,
ফুটলো পাণিফলের বনে রক্ত-কমল ঢল্‌মলে।
ছিল কবি কল্‌কে তোমার কমণ্ডলুর কোল্ ঘেঁসে,
পারিজাতের পরাগ নিয়ে ফুটেই ছিল 'গল্‌ঘসে'।
রূপের মাঝে অরূপ পেলে, ভোগের মাঝে মোক্ষ হে,
মন্দির হায় কর্‌লে কবি, রামীর শয়ন-কক্ষকে।
গঞ্জিকারি ধূম্র হ'ল বিসর্জিতের হোম-শিখা
কলঙ্কেরি উল্‌কি হ'ল বিধির দেয়া রাজটীকা।
মদ্য পানের পাত্র হ'ল, কড়ঙ্গ যে বৈবাগের,
"দেওতা" দিঘীর পৈঠা হ'ল সঙ্গম-ঘাট পৈরাগের
আন্‌লে প্রেমের মন্দাকিনী সব অভিশাপ্ খণ্ডালে,
ভাষার গোড়া ভাবের গোরা কোল দিলে আচণ্ডালে।
ব্রজের রজে ডুবিয়ে দিলে অনঙ্গেরি অঙ্গকে,
ধন্য তুমি কর্‌লে ধরা ভারত এবং বঙ্গকে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

মঙ্গল-মঠ।

—:❋:—

দ্বিতীয় খণ্ড।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দেড় বৎসরের পর নিরঞ্জন আজ আবার সুরাটের সুন্দর-মঠে ফিরিয়া আসিয়াছে। বৎসরাধিক কাল হইল, চিত্তরঞ্জন দেবের মৃত্যু হইয়াছে,—দেবরঞ্জন এখন জয়পুরে শিল্পবিদ্যালয়ে শিল্পবিদ্যা শিখিতেছে।

গান্ধার হইতে ফিরিয়া নিরঞ্জন, মহীশূর, রেওয়ার, ও অন্যান্য স্থানে কাজ করিয়া বেড়াইয়াছে—অদ্ভুত অধ্যবসায় বলে সে এখন আর্য্যাবর্ত্তের ভাস্কর সমাজের প্রথম স্থানীয় একজন গৌরবশালী ভাস্কর, দেশ-বিদেশে তাহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নবীন ভাস্করের আশ্চর্য্য প্রতিভায়—খ্যাতি প্রতিষ্ঠাশালী প্রসিদ্ধ ভাস্করগণ মুগ্ধ বিস্মিত।

দ্বিপ্রহরে মহারাজ কাছারীতে কাজ কর্ম্ম দেখিতেছিলেন, পথ-পর্য্যটন-শ্রান্ত নিরঞ্জন ধূলা পায়ে আসিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিল। তাহার কেশরাশি রুক্ষ বিশৃঙ্খল,—মুখভাব শুষ্ক মলিন, আকৃতি ঠিক পূর্ব্বের মতই কৃশ, দীর্ঘ! মহারাজ তাহার দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইলেন, স্বাগত প্রশ্নাদির পর, চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু জন্য দুঃখ সূচক মন্তব্য ও সময়োচিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া,—ভৃত্যের সহিত তাঁহাকে স্নানাহার ও বিশ্রামের জন্য বিদায় দিলেন, বৈকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাত্‍ করিতে বলিলেন।

মঠে পরিচিত অনেকের সহিত সাক্ষাত হইল, নিরঞ্জনের প্রশংসা খ্যাতি সকলেই শুনিয়াছিল,—উৎসুক-আগ্রহে সকলে নিরঞ্জনকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আলাপের হুড়াহুড়ি জমাইল।—সকলেই এক বাক্যে বলিল, নিরঞ্জনের যশঃ-সৌরভ-খ্যাতি দূরদূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে সেজন্য তাহারা সকলে বড়ই আনন্দিত।—নিরঞ্জন ম্লানমুখে হাসিয়া বিনীত নমস্কার করিল।

নিরঞ্জনের চরিত্রের সম্ভ্রম সংযত শিষ্ট ব্যবহারগুণে সকলেই তাহার উপর প্রীত-সন্তুষ্ট ছিল, কেহ কখনও তাহার স্বভাবে অহঙ্কার ঔদ্ধত্যের নাম-গন্ধ খুঁজিয়া পাইত না। কিন্তু তবুও সে বহু জনাকীর্ণ লোক-সমাজের মধ্যে বাস করিয়াও—এমন একটা অনাড়ম্বর সূক্ষ্ম-স্বাতন্ত্র্য গণ্ডি নিজের চতুর্দ্দিকে সৃষ্টি করিয়াছিল যে—অতিবড় কৌতূহলী প্রাণীও সে গণ্ডি অতিক্রম করিয়া তাহার নাগাল ধরিতে পারিত না। যাহারা দূর হইতে তাহার সৌভাগ্য গৌরবের খ্যাতি শুনিয়া, কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয়ে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইত,—নিরঞ্জনের নিকটে দাঁড়াইয়া তাহারা—তাহার আকৃতির নিষ্প্রভ ম্লানিমা ও প্রকৃতির মৌন-নিরীহতা ছাড়া আর কিছুই বিশেষ খুঁজিয়া পাইত না—সকলে আশ্চর্য্য বোধ করিত।

কয়দিন পূর্ব্বে সে জয়পুরে গিয়া দেবরঞ্জনকে দেখিয়া আসিয়াছে, শিল্পবিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট চিত্তরঞ্জনের যথেষ্ট সম্মান ছিল,—উদীয়মান প্রতিভাশালী ভাস্কর নিরঞ্জনও সেখানে গিয়া এবার প্রচুর সমাদর লাভ করিয়াছে; গুণগ্রাহী বিদ্যালয় অধ্যক্ষ মহাশয় তাহার নৈপুণ্য পাণ্ডিত্যে ও একাগ্র অধ্যবসায় চেষ্টার পরিচয় পাইয়া প্রীত হইয়া—অযাচিত আগ্রহে দেশ বিদেশের প্রসিদ্ধ ভাস্কর ও তাহার পরিচিত গণ্য মান্য রাজা মহারাজা এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নামে পরিচয় পত্র দান করিয়াছেন। নিরঞ্জনের হাতে এখন কাজকর্ম্ম তেমন কিছু নাই—সে দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছে।

বৈকালে মহারাজের অবসর সময়ে তাঁহার ভৃত্য আসিয়া নিরঞ্জনকে ডাকিয়া লইয়া যাইবে কথা ছিল—কিন্তু বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও নিরঞ্জন ভৃত্যের দেখা পাইল না, নিশ্চেষ্টভাবে সময় কাটান অসাধ্য,—নিরঞ্জন নির্জ্জন বিশ্রাম কক্ষে বসিয়া অধ্যক্ষ মহাশয় লিখিত পরিচয়-পত্রগুলি ভাল করিয়া পড়িতে আরম্ভ দিল।

কি প্রশংসা পরিচয়, কি সম্মান,—সাত ছত্রের বেশী নিরঞ্জন পড়িতে পারিল না। মর্ম্মান্তিক আক্ষেপে, তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, দৃষ্টি অশ্রুপ্লুত হইল। ছিঃ, হতভাগোর অদৃষ্টে এত পরিতাপ, লাঞ্ছনাও ছিল! একি সম্মানের অর্ঘ্য?—না না, এ যে ক্ষোভের ভ্রূকুটি পীড়ন!.......... কেহ জানেনা, জানে শুধু সে! তাহার শিল্প-সাধনা যে কতখানি প্রবঞ্চনা ধিক্কারে কলঙ্কিত, কতখানি অপরাধে অভিশপ্ত—তাহার পরিমাণ জানেন অন্তর্য্যামী! মানুষ শুধু তাহার বাহ্য সফলতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বাহবা দিতেছ, কিন্তু হায় আভ্যন্তরিন্ অবস্থা..................!

পরিচয়-পত্রগুলা ফেলিয়া নিরঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার ইচ্ছা হইল সে একবার চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে,—কিন্তু পারিল না! হায়, কোথায় আজ তাহার সেই পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের নিষ্কলঙ্ক, নিশ্চিন্ত, নির্ভয়,—নগণ্য শিল্পীজীবন! সে জীবন তাহার খ্যাতি-প্রতিপত্তিহীন ছিল বটে, কিন্তু সে জীবন তাহার স্বর্গের অপেক্ষা অধিক শান্তিময় ছিল! নিজস্ব ভয় ভাবনার স্থান হৃদয়ে ছিল না,—যাহা ছিল তাহা পরস্ব সুখদুঃখের চিন্তা, উদার সহানুভূতি, অকপট সহৃদয়তা!—নিষ্ঠা, ভক্তি, প্রেমের আরাধ্য বিশ্বনাথের, বিশ্বের চিরন্তন বৈচিত্র্য-মাধুর্য্যের দীপ্তি তখন তাহার নবোন্মেষিত দৃষ্টিতে সদ্যঃ প্রতিভাত হইয়াছিল! বিমল-সুন্দর তরুণ জীবনকে অপূর্ব্ব বিস্ময় মুগ্ধতায় অফুরন্ত আনন্দোৎসাহে মাতাইয়া তুলিয়াছিল, সে কি দিন!

কিন্তু তারপর ?—না, তারপর তাহার চিন্তাশক্তি লোপ হইয়া যায় !......... কি প্রকাণ্ড ভ্রান্তির কুহকে সে জড়াইয়া পড়িয়াছে !

নিরঞ্জন অধীর ভাবে কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিল ! হায় রে জীবনের শ্রদ্ধা, সংযম, সাধনা—শিল্পপূজা ! কপটাচারী মানব-হৃদয়ের দুর্বিনীত অনুভূতি-বোধকে অভিশাপ দিলে—অভিসম্পাতের অবমাননা করা হয়, ধিক্ !—আর ততোধিক ধিক্কার, তাহার শিল্পী-জীবনকে ! হতভাগ্য নিরঞ্জন, কুক্ষণে সৌন্দর্য্য-বৈচিত্র্যের বিশেষত্ব দেখিবার জন্য, বাহিরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াছিল, তাহার চক্ষে অগ্নি-ইন্দ্রজালে মহানেশার ঘোর জমিয়া গিয়াছে,—সে নেশা—বিশ্বগ্রাহী ক্ষুধার মাঝে, আত্মতৃপ্তি চাহে ! সে বড় ভয়ানক ! নিরঞ্জন কিছুতে তাহার হাতে নিষ্কৃতি পাইতেছে না, শত চেষ্টায় নয়,—সহস্র যত্নে নয়,—লক্ষ সাধনায় নয় ! তাহার সব শ্রম পণ্ড হইয়া যাইতেছে।

কিন্তু তার জন্য দুঃখ করিবার শক্তিই বা তাহার কই ? বিরাট বেদনাস্তূপ স্কন্ধে লইয়া, নিজের সাধনার মাঝখানে সে নিজেই প্রবল অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—সাফল্য আসিবে কোথা হইতে ? যে উন্নত মহামহিমার দিকে দৃষ্টি তুলিয়া চাহিতে—সম্ভ্রমে শির নত হইয়া আসে,—বর্ব্বর অপরাধী সে,—তাহারই প্রাণ মূলে,—স্বভাব মহত্বে মহিমাময়ী দেবীর অন্তরে--কোন অজ্ঞাত চাঞ্চল্যে জাগ্রত চেতনাময়ি নারী চিত্তের, সতর্ক-উন্নত অনুভূতিতে,—নিজের মূঢ় বেদনার সংবাদ, এক মুহূর্ত্তের ভুলে, অতর্কিতে অনুভব করাইয়া দিয়াছে,—এ মনস্তাপ রাখিবার স্থান তাহার পৃথিবীতে নাই ! নিরঞ্জন সেই সুমহান বিক্ষোভ-বেদনাহত স্মৃতিকে ভুলিবার জন্য পাগল হইয়াছে, কিন্তু পারিতেছে কই ?—মত্ততার ঝোঁকে চেষ্টার পর চেষ্টা, চিন্তার পর চিন্তার স্তূপ নির্ম্মাণ করিতেছে, উন্মাদের মত স্থান হইতে স্থানান্তরে ছুটিয়া বেড়াইতেছে—সংস্কার-প্রাবল্যে শিল্পতত্ত্বের উপর ঝুঁকিয়া আত্মবিস্মৃতি খুঁজিতেছে, প্রতিভার আলোকে উৎকর্ষের পর উৎকর্ষতার সৃষ্টি করিতেছে, কিন্তু—কোথায় শান্তি ! কর্ম্মদায়িত্বের মধ্যে পড়িয়া, আত্মহারা ধ্যানে, একাগ্র চেষ্টায় খাটে,—চেষ্টা সফল হয়, ধ্যান সমাপ্ত হয়—জাগিয়া, মাথা তুলিয়া দেখে যেখানকার জগৎ সেইখানে আছে, হতভাগ্য নিরঞ্জন হতভাগ্যই রহিয়াছে !—এ কি অসহনীয় অবস্থা-দ্বন্দ্ব !

উৎসাহিত পাদক্ষেপে হাস্যোৎফুল্ল বদনে এক ব্যক্তি ঘরে ঢুকিয়া সাগ্রহে বলিল "নমস্কার ভাস্কর,—পুরাতন বন্ধুকে স্মরণ কর্‌তে পার ?"

চিত্তের সমস্ত বিক্ষিপ্ত সবলে সংযত করিয়া নিরঞ্জন সোজা হইয়া দাঁড়াইল, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল "না—কে আপনি ?"

আগন্তুক যুবক বিস্মিত হইয়া বলিল "চিন্‌তে পার্‌লে না ? আমি সহদেব,—সুন্দরমঠের দেওয়ান রঘুদেবের পুত্র—"

চমকিয়া নিরঞ্জন বলিল "হাঁ হাঁ স্মরণ আছে, দুই বৎসর পূর্ব্বে আপনাকে দেখেছি, আপনি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।"

ঈষৎ হাসিয়া যুবক বলিলে "হাঁ বন্ধু,—"

দুইজনে সংক্ষিপ্ত কুশল প্রশ্নাদি হইল, যুবক তাহার শিল্প-প্রতিভার প্রশংসা গৌরবের খ্যাতি উল্লেখে আনন্দ প্রকাশ করিয়া নানা কথা বলিল, অন্যমনস্ক নিরঞ্জন বাতায়ন-পার্শ্বে দাড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া নিস্তব্ধ রহিল,---মনে মনে হাসিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া "তাহার সৌভাগ্যের সংবাদে দূর দূরান্তরের পরিচিত, অপরিচিত, স্বল্প পরিচিতগণ আনন্দিত, কিন্তু সে ? সে এই আনন্দে যোগদিবার সামর্থ্যেও বঞ্চিত !—সে যে প্রায়শ্চিত্তব্রতী, অপরাধী !"

ইতিমধ্যে নিরঞ্জনের পরিত্যক্ত পরিচয়-পত্রগুলির উপর কৌতূহলী যুবকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল, কথার মাঝখানে থামিয়া সে, সাগ্রহে সেইগুলি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল; অন্যমনা নিরঞ্জন চাহিয়া দেখিল না, কিছু বলিল না। যুবক পড়িতে পড়িতে সহসা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বাঃ, বাঃ, আমরা অব্যবসায়ী শিল্পবিদ্যার মর্ম্ম বুঝি না, কিন্তু যাঁরা এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রস বিচারে নিপুণ, —তারাও তরুণ ভাস্করের প্রতিভায় মুগ্ধ ?—আশ্চর্য্য, নিরঞ্জন তোমার অদ্ভুত শক্তি !"

বিস্মিত দৃষ্টি ফিরাইয়া নিরঞ্জন বলিল "কি ?"

বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া যুবক বলিল "শিল্প কৌশলে তুমি অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ করেছ !"

নিরঞ্জন উদাসভাবে হাসিল,—ধীর কণ্ঠে বলিল "হাঁ মহাশয়, অদ্ভুত ক্ষমতা! জন্মগত সংস্কার-মাহাত্ম্যে অনুভূতির মধ্যে তীব্র চেতনা বিদ্যমান—শিল্পকৌশলে বর্ব্বরতা প্রকাশ অসম্ভব যে! কিন্তু যদি শাণিত ছুরিকা সঞ্চালনের কৌশল অভ্যাস করতেম তা হ'লে আজ,—পৃথিবীর সজীব আবেগমত্ত হৃদ্‌পিণ্ডগুলাকে রক্তমাংসে গড়া—বক্ষঃপঞ্জরের বেষ্টন-পীড়া থেকে মুক্তি দেওয়ায়, স্বাধীনতা দেওয়ায়,—আমার আরও অদ্ভুত দক্ষতা দেখ্‌তেন !"

বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া যুবক বলিল, "ভাস্কর তোমার স্বভাব বড় অদ্ভুত !—তোমার ভাষা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য !—"

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিল "নিশ্চয় !"

দ্বারের নিকটে জুতার শব্দ হইল, নিরঞ্জন চাহিয়া দেখিল মহারাজ আসিতেছেন। সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বলিল "আপনার ভৃত্যের অপেক্ষায় আমি এতক্ষণ বসেছিলাম মহারাজ—"

ঈষৎ হাসিয়া মহারাজ বলিলেন, "কারুর অপেক্ষায় বসে থেকে অকারণ সময় নষ্ট করা নির্ব্বোধের কাজ,—অনভিজ্ঞেরদল, সাবধান !"

নিরঞ্জন হাসিল,—সত্যই ত সে অত্যন্ত নির্ব্বোধ! উদ্দেশ্যহীন হৃদয়ে অজ্ঞাত প্রতীক্ষার পথ চাহিয়া—অকারণে কত সময় নষ্ট করিতেছে! বাধ্যতার তাড়নায় চোখ কান বুজিয়া কর্ত্তব্য পথে যাত্রা করিয়াছে, কিন্তু এ ভ্রমণে তাহার না আছে শান্তি, না আছে তৃপ্তি, না আছে আনন্দ!—তবু ইহাই তাহার একমাত্র সম্বল !

মহারাজ তাঁহার যুক্তিযুক্ত কৌতুকের উত্তরে কোন একটা সরস বাক্য শুনিবার প্রত্যাশায় সহদেবের মুখপানে চাহিলেন,—তাঁহার সরল পরিহাস-প্রবণ, মুক্ত সুন্দর হৃদয়ের নিকট যুবা, বৃদ্ধ, উচ্চ, নীচ কিছুরই দ্বিধা-বিচার ছিল না—সকলেই তাঁহার আনন্দ-সহচর!—কিন্তু সহদেব তাঁহার কথার উত্তরে কিছু বলিল না, সে তখন অত্যন্ত মনোযোগের সহিত হস্তস্থ পরিচয়-পত্রগুলির ধূলা ঝাড়-ফুঁক করিয়া সযত্নে সে গুলিকে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া—একাগ্র দৃষ্টিতে তাহার অক্ষর মালার সসজ্জ বিন্যাস ভঙ্গী অবলোকন করিতেছিল,—মুগ্ধ তন্ময়তায় সে নিজের কার্য্যে ব্যাপৃত রহিল, একবার দৃষ্টি তুলিয়া চাহিলও না!

মহারাজ তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "কি ওগুলা? দেখ্‌তে পারি?"

সহদেব সসম্ভ্রমে, আনন্দ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল "অবশ্য! নিশ্চয় দেখ্‌তে পারেন, দেখুন মহারাজ কি সুন্দর প্রশংসা পত্র !"

মহারাজ তাহার হাত হইতে পরিচয় পত্রগুলা লইয়া নীরব গম্ভীর বদনে পাঠ করিলেন, তারপর নিরঞ্জনের দিকে চাহিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন "তোমায় স্নেহ করতে ভয় হয় নিরঞ্জন, তুমি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের সম্মান-পাত্র—"

আহত কণ্ঠে নিরঞ্জন বলিল "অদৃষ্টের বিদ্রূপ মহারাজ!—উৎসন্ন যাক্—" তারপর হঠাৎ সে কথা উল্টাইয়া লইয়া ব্যস্তভাবে বলিল "আপনি নির্ম্মল-মঠে সাধু-সম্ভাষণে যাবেন ?"

গোপন-বিস্ময় নীরবে দমন করিয়া মহারাজ বলিলেন "হাঁ তুমি যাবে ত, চল তা হ'লে।"

"চলুন"—নিরঞ্জন পাগড়ী উঠাইয়া লইয়া অগ্রসর হইয়া বলিল 'চলুন মহারাজ—"

মহারাজ তাহার নগ্ন-চরণের দিকে চাহিয়া বলিলেন "জুতা ?—"

সবিনয়ে নিরঞ্জন বলিল "সাধু দর্শনে—"

বাধা দিয়া মহারাজ বলিলেন "হলোই বা!, পথ চিরদিনই কঙ্কর-প্রস্তরাকীর্ণ সুকঠিন পথ, বিনামার প্রয়োজন পথে ভ্রমণের জন্যই,—দেবমন্দিরের দ্বারে গিয়ে জুতা ত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ!"

সহদেব সোচ্ছ্বাসে "ঠিক্ ঠিক্" বলিয়া নিরঞ্জনের পানে চাহিল,—নিরঞ্জন ম্লান হাসি হাসিয়া বিমর্ষ চিন্তাকুল বদনে জুতা পরিতে লাগিল। সহদেব বলিল "তুমি হাস্‌ছ ভাস্কর ?"

নিরঞ্জন উত্তর দিল "নিজের দুঃখে! আসল হারিয়ে, নিশ্চিন্ত আরামে সুদের হিসাবে ব্যতিব্যস্ত থাকায় কোন লাভ আছে কি না, তাই ভাব্‌ছি!—"

রহস্য ভাবিয়া সহদেব সকৌতুকে বলিল "প্রয়োজনীয় চিন্তা! কিন্তু যাঃ, সত্যই ভুলে চল্লে,—তোমার পত্রগুলা নিয়ে যাও!"

গমনোদ্যত নিরঞ্জনের সম্মুখে আসিয়া সহদেব তাহার বুকপকেটে পত্রগুলা রাখিয়া দিতে গেল, নিরঞ্জন বাধা দিয়া বলিল "ওখানে নয়, পাশের পকেটে,—"

আপত্তি-সূচক কণ্ঠে সহদেব বলিল "আহা না, এগুলা দরকারী জিনিস, সাবধানে রাখা চাই— বুকপকেটে • ..."

হতাশ-করুণ কণ্ঠে নিরঞ্জন বলিয়া উঠিল, "ওটা ছেঁড়া বন্ধু ছেঁড়া,—সম্পূর্ণই ছেঁড়া! ওখানে স্থান নাই, পাশের পকেটে রাখ,—"

. মহারাজ বিস্মিত নয়নে নিরঞ্জনের পানে চাহিয়া রহিলেন। সহদেব অপ্রতিভ হইয়া যথানির্দ্দেশ মত কাজ করিল. নিরঞ্জন—মহারাজের পশ্চাতে নিঃশব্দে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, সহদেব অন্য কাজে চলিয়া গেল।

মহারাজ নীরবে কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া, সহসা কি যেন মনে পড়ায় ব্যগ্রভাবে বলিলেন "নিরঞ্জন, আমার নূতন শিষ্য মদনকে দেখেছ ?"

নিরঞ্জন বলিল "না মহারাজ, তিনি কোথায় থাকেন ?"

মহারাজ বলিলেন "নির্ম্মল-মঠে ব্রহ্মচারী পণ্ডিতগণের সঙ্গে বাস করতে তার বড় আগ্রহ,—সে সেইখানেই থাকে। সে অল্পবয়স্ক, বিদ্যারাধনায় শাস্ত্রচর্চ্চায় তার বড় উৎসাহ,—হাঁ, তার মানে সে আজও অবিবাহিত,—তা ছাড়া সংসারে ত্রিকুলে তার কেউ নাই········"

প্রতিধ্বনির মত নিরঞ্জন বলিল "কেউ নাই ?—"

মহারাজ বলিলেন "না কেউ না, সে কলেজে লেখাপড়া শিখেছিল, এখন ছেড়ে দিয়েছে, সংস্কৃত চর্চ্চা করছে, তার মন কত সরল, চরিত্র বড় নির্ম্মল!—কিন্তু তার হৃদয়-মন আজও অত্যন্ত অপুষ্ট—অপরিণত, তাকে বিশ্বাস করতে ভয় হয়,—না হলে আমার বড় ইচ্ছা যে—" মহারাজ সহসা থামিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন।

নিরঞ্জন উৎসুক নয়নে চাহিয়া বলিল "কি ইচ্ছা মহারাজ ?"

চলিতে চলিতে মহারাজ বলিলেন "তার মত শিক্ষান্বেষী—উন্নতচেতা, সাংসারিকতার প্রলোভন-স্পর্শমুক্ত কৌমার-ব্রহ্মচারী কোন বিশ্বাসী ব্যক্তিকে যদি পাইত, আমাদের সম্প্রদায়ের—ন্যায়ানুমোদিত সংস্কার-কল্যাণ সাধনে

উৎসর্গ করে দিই! তার উদ্যম-প্রফুল্ল তরুণ মুখখানির পানে চাইলেই আমার এই কথাটি মনে হয়,—কিন্তু বলেছি তোমাকে, সে অনভিজ্ঞ তাকে বিশ্বাস করতে আমার ভয় হয়!"

ঈষৎ উত্তেজিত ভাবে নিরঞ্জন বলিল "অনভিজ্ঞ অর্থাৎ কোন বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা আপনি চান?"

প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া মহারাজ বলিলেন "তার হৃদয়-মনের শিক্ষণীয় যত কিছু বিষয় আছে, সে সমস্ত সম্বন্ধে যথাবশ্যক জ্ঞান, কিন্তু না নিরঞ্জন, —কিছুদিন পরে তার শক্তির ওপর নির্ভর স্থাপন করা সহজ হ'তে পারে, কিন্তু এখন,—না সে বড় অল্পবয়স্ক! শিক্ষা-সংসর্গে তার স্বভাব উন্নত-মার্জ্জিত, বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণ উত্তেজিত হয়েছে বটে, কিন্তু তার অন্য শিক্ষা—না, অবিশ্বাস্য!"

"মহারাজ!—" অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত আবেগে কি বলিতে উদ্যত হইয়া,—ক্ষণ মধ্যে কুণ্ঠিত ভাবে নিরঞ্জন থামিল! মহারাজ বিস্মিত হইয়া বলিলেন "কি বলতে চাও নিরঞ্জন বল—"

ইতস্ততঃ করিয়া অপরাধির মত কুণ্ঠিত ভাবে নিরঞ্জন বলিল,—"স্পর্দ্ধা, দুঃসাহস ক্ষমা করুন মহারাজ, প্রয়োজনের আহ্বান শুনিলেই আমার চিত্ত উন্মুখ-আগ্রহে ছুটে যেতে চায়, নিজের মূঢ়-অযোগ্যতার কথা স্মরণ করে সে সংযত হতে জানে না,—"

বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া মহারাজ বলিলেন "বামনের চন্দ্র আকিঞ্চন হাস্যাস্পদ মূঢ়তা সন্দেহ নাই, কিন্তু আকাঙ্ক্ষাটা সত্য মহারাজ!"

ব্যগ্র-অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চাহিয়া মহারাজ বলিলেন "শিল্পবিদ্যার ওপর কি তোমার আর আগ্রহ নাই?"

সজোরে নিরঞ্জন বলিল "কিছু না মহারাজ কিছু না,—আমার ঘৃণা জন্মে গেছে, ধিক্কার বোধ হয়েছে,—বিতৃষ্ণায় জীবন জর্জ্জর হয়েছে!—"

স্তম্ভিত স্বরে মহারাজ বলিলেন "কেন নিরঞ্জন?"

"জানিনে মহারাজ, অথবা যদিও কিছু জানি, তাও আপনাকে জানাতে অক্ষম বোধহয়! কিন্তু আপনি অবিশ্বাস করবেন না,—" সহসা ফস্ করিয়া পকেট হইতে পত্রের গোছা টানিয়া বাহির করিয়া,—চক্ষের নিমেষে নিরঞ্জন খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল, পথের ধূলায় ছিন্ন পত্রাংশ ছড়াইয়া দিয়া অবিচলিত বদনে বলিল "আবর্জ্জনা দূর হোক!—সম্মানের রত্নপীঠের নীচে, আপনাকে সমাধিস্থ করে নিশ্চিন্ত উল্লাসে, জগতের হাস্য-কৌতুকে যোগদান করে বেশ সহজে দিন কাটাচ্ছি, কিন্তু শান্তি নাই মহারাজ, আমার কোথাও শান্তি নাই!"

সহসা মহারাজের বিস্ময়াহত দৃষ্টির উপর নিরঞ্জনের চক্ষু পড়িল, সে থতমত খাইয়া থামিল!—আত্ম সম্বরণ করিয়া, কুণ্ঠা-নম্র মস্তকে বলিল "মহারাজ, আমার প্রগল্‌ভ বর্ব্বরতা ক্ষমা করুন,—বোধহয় কোন রকম আকস্মিক উত্তেজনায়—"

বাধা দিয়া মহারাজ বলিলেন "থাম, থাম নিরঞ্জন,—আমায় ভেবে নিতে দাও—"

সংশয়-সঙ্কুচিত নিরঞ্জন, আর কথা কহিতে পারিল না। নীরবে উভয়ে পথাতিবাহন করিয়া চলিলেন। নির্ম্মল-মঠ বেশী দূর নহে,—শীঘ্রই তাহার মঠের উদ্যান-বাটিকার দ্বারে আসিয়া পৌছিলেন। চিন্তারত মহারাজ দ্বার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন,—নিরঞ্জনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "নিরঞ্জন ও-প্রসঙ্গ এখন থাক,—হাঁ আমি তোমায় মদনের কথা বলছিলেম, সে বুদ্ধিমান—তার উদ্দেশ্যও উচ্চ, কিন্তু পরীক্ষা করে দেখেছি, তার স্বভাবটি সরল শিশুর ক্ষণস্থায়ী কৌতূহল চাঞ্চল্যে ভরা!—ভাল কথা, অধিকারী-ভেদে সাধন-ভেদ, এ কথা তুমি মান কি?—"

দৃঢ়স্বরে নিরঞ্জন বলিল "মানি মহারাজ, খুব মানি, অনধিকারী অযোগ্যের পক্ষে………" ত্রস্তে অন্তরের সুপ্তোত্থিত আবেগ সজোরে দমন করিয়া নিরঞ্জন বলিল, মহারাজ ক্ষমা করুন, আমি প্রশ্নের অযোগ্য !"

মহারাজ সে কথায় কান দিলেন না, আপন মনে বলিতে লাগিলেন—"আমার যতদূর অনুমান, তাতে বল্‌তে পারি,—মদনের অন্তরে ধর্ম্মপিপাসা জাগ্রত হয়েছে, কিন্তু সে পিপাসা পরিতৃপ্তির জন্য সংসার ত্যাগ করা যে তার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য, এ কথা মান্‌তে পারিনে, 'যথার্থ-সন্ন্যাসীর' সাধন আর 'যথার্থ-সংসারির' সাধন যে একই, কেবল বাহ্য-ক্রিয়ানুষ্ঠানগত পার্থক্য ছাড়া এর মধ্যে আর কোন দ্বন্দ্ব নাই, এ কথা বোধহয় তুমি অস্বীকার কর না, নিরঞ্জন ?"

নিরঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, সে ত অস্বীকার কিছুই করে না, কিন্তু স্বীকার করিবার শক্তিই বা তাহার কই ?—সে না চেনে সংসারকে, না জানে সন্ন্যাসকে, অথচ—ভাগ্যহীন সে, উভয়ের মধ্যে অবস্থা-বৈষম্যের-দ্বন্দ্বে, তীব্র-নিষ্পীড়িত !

উভয়ে আসিয়া উদ্যান মধ্যস্থ লতামণ্ডপ নিকটবর্ত্তী হইলেন। লতামণ্ডপ মধ্যে দুই তিন ব্যক্তির কথোপকথন শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল, মহারাজ বলিলেন "চল, ঐখানে যাওয়া যাক মদনের কথা শুন্‌তে পাচ্ছি—"

উভয়ে লতামণ্ডপ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, মহারাজকে দেখিয়া উপবিষ্ট ব্যক্তিত্রয় সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন.—নিরঞ্জন দেখিল তাহাদের মধ্যে দুই ব্যক্তি বয়স্ক,—দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়া অনুমান হয়, অপর ব্যক্তি তরুণ যুবা, তাহার ওষ্ঠদেশে সদ্যঃ রোমাবলী রেখা প্রকটিত হইয়াছে,—তাহার বেশভূষাও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতজনোচিত নহে, কলেজ ফেরতা নব্য-যুবকের ভব্য-সংস্করণ তাহাতে স্পষ্ট বিদ্যমান। নিরঞ্জন বুঝিল, এই ব্যক্তিই মদন।—নিরঞ্জন ভাল করিয়া তাহার মুখপানে চাহিল, মনে বড় প্রীতি অনুভব করিল,—মহারাজ সত্যই বলিয়াছেন, এ মুখ অতি সরল, অতি পবিত্র,—কোন নীচ-কুৎসিত ভাবের ছায়া তাহার অম্লান দীপ্তিকে এতটুকু মলিন করে নাই,—কৈশোরের স্নিগ্ধ-লাবণ্য আজও তাহরে মুখে-চোখে সহজ সুকুমার আনন্দে বিরা[illegible] করিতেছে !

যথাবিধি স্বস্তি-উচ্চারণ, অভিবাদন-পর্ব্ব শেষ হইলে মহারাজ নিরঞ্জনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "ইনি-ই আপনাদের নির্ম্মল-মঠ নির্ম্মাতা ভাস্কর নিরঞ্জনদেব—" নিরঞ্জনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "এই ছোকরা মদন,—ভাল কথা নিরঞ্জন তোমায় বল্‌তে ভুলে গেছি, মদন সম্প্রতি মঙ্গল-মঠ থেকে বেড়িয়ে ফিরে এসেছে, সেখানে বেদান্তবাগীশ মশায়ের সঙ্গে ওর খুব আলাপ হয়েছে, তিনি ওর উপর ভারি সন্তুষ্ট —"

—অকস্মাৎ বহুদিন পরে নিরঞ্জনের বক্ষের মধ্যে কোন একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন আবেগ, সজোর ধাক্কায় জাগিয়া তৃষ্ণাকুল দৃষ্টিতে তাকাইল! নিরঞ্জনের আত্মবিস্মৃতি ঘটিল, —কয় মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া ধীরে স্খলিত কণ্ঠে বলিল "নমস্কার বেদান্তবাগীশ মহাশয় শারীরিক কুশলে আছেন ?"

অতি নমস্কার করিয়া, মদন বলিল "আজ্ঞে হাঁ—"

—তারপর অসঙ্কোচে কৌতূহল-ব্যগ্র দৃষ্টিতে নিরঞ্জনের আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করিয়া সসৌজন্যে বলিল "আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়া সৌভাগ্যের বিষয়; মঙ্গল-মঠ অবস্থান কালে মহাশয়ের যথেষ্ট সুযশ সুখ্যাতি শুনেছিলাম……আপনার ভাস্কর্য্য প্রতিভার গৌরব নিদর্শনও নানা দেশে দেখেছি, আপনি কীর্ত্তিমান্ ব্যক্তি !—"

শেষের কথা নিরঞ্জনের কানে ঢুকিল না,—মঙ্গল-মঠের অতীত-স্মৃতি-মদিরা এক নিমেষে তাহার মনকে উগ্র মত্ততায় মাতাইয়া দিয়াছিল,—একটা অজ্ঞাত-ব্যাকুলতার করুণ সুর তাহার বুকের মধ্যে ঝঙ্কৃত হইয়া ঘুরিতে লাগিল,—বাক্যালাপের আবরণে নিজের বিচলিত ভাবটা, অপরিচিত ব্যক্তির দৃষ্টি হইতে গোপন করিবার জন্য

নিরঞ্জন বলিল "কেবলবাবু,—বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র কেবলবাবু, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে?—তিনি ভাল আছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ?—তিনি চমৎকার লোক, আমার ওপর তাঁর অত্যন্ত অনুগ্রহ,—আর মাসিমা,—বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কন্যা—মহাশয় বোধহয় ...." মদন বাকী কথা অসমাপ্ত রাখিয়া কৌতূহল-উৎসুক নয়নে নিরঞ্জনের পানে চাহিল।

নিরঞ্জন দেখিল, মদন নিতান্তই স্বচ্ছ-সরল হৃদয় স্নেহময় শিশু!—করুণাময়ী শান্তিদেবীর নামের পর নিরঞ্জনের মুখপানে চাহিয়া সে যেরূপ আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে নিরঞ্জনের মন আর্দ্র না হইয়া থাকিতে পারিল না,—বিনা আহ্বানেই নিরঞ্জন তাহার পাশে বসিয়া-পড়িয়া দ্বিধাহীন চিত্তে, যেন কতকালের পরিচিতের মত আনন্দ-বিস্ফারিত নয়নে বলিল "আপনি ত তা হলে পর নন,—আমার ভ্রাতৃস্থানীয় আত্মজন! বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কন্যা—আপনার মাসিমা,—"

মদন সাগ্রহে নিরঞ্জনের হাত চাপিয়া ধরিয়া হর্ষোজ্জ্বল বদনে বলিল, "হাঁ শুনেছি, আপনি মাসিমার স্নেহাস্পদ পুত্র! আপনার সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বল্লেন, সম্প্রতি তাঁরা মহীশূরে বেড়াতে গেছ্‌লেন—ভাগ্যক্রমে আমিও সঙ্গে ছিলাম, সেখানে আপনার শিল্পকার্য্য কতকগুলি দেবালয়ে দেখ্‌লুম,—সকলেই ধন্য-ধন্য সুখ্যাতি কর্‌ছেন!"

নিরঞ্জন বিমর্ষভাবে চুপ করিয়া রহিল,—এ প্রশংসা আবার হঠাৎ যেন তাহাকে কশাঘাতের মত আহত করিল। মহারাজ স্নিগ্ধ-স্মিত হাস্যে বলিলেন, "মন্দ নয়, তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে,—আমরা অপরিচিত হয়ে ঠ'কে গেলুম! তোমরা ত চমৎকার জমিয়ে তুলেছ!"

মদন সপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিল, "আপনারই প্রসাদাৎ মহারাজ!—"

তারপর অন্যমনস্ক নিরঞ্জনের পানে চাহিয়া—প্রশ্নের অপেক্ষা মাত্র না করিয়া বলিল "মঠের অধিকারী মহারাজ দেহরক্ষা করেছেন, তাঁর পুত্র দেবকীনন্দন এখন মঙ্গল-মঠের অধিকারী মহারাজ হয়েছেন, শুনেছেন?"

নিরঞ্জন তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইল, কিন্তু তাহার মুখভাব পর্য্যবেক্ষণে যে নিরঞ্জনের আগ্রহ আছে, তাহা বুঝাইল না। মদনের বাক্যের উত্তরে—ধীরভাবে বলিল "দেবকীনন্দন?—কতদিন?"

"বৎসরাধিক কাল হবে, কিন্তু তিনি লোক ভাল নন, দুশ্চরিত্রতা, বিলাসিতায় তিনি অধঃপাতে গেছেন,—মঠের সম্পত্তি সব উৎসন্ন যাবার যো' হয়েছে,—তাঁর দেওয়ান-টেওয়ান সাঙ্গোপাঙ্গগুলিও সব সেইরকম জুটেছে, অত বড় মঠের মধ্যে এক মানুষ আছেন বেদান্তবাগীশ মহাশয়,—তিনিও বিরক্ত-অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন, ত্রাহি ত্রাহি কর্‌ছেন, কিন্তু তিনি কাজ ছাড়্‌লেই এখন মঠের সর্ব্বনাশ হবে!—বেদান্তবাগীশ মহাশয় বিজ্ঞ, ন্যায়পরায়ণ লোক, তিনি বল্‌ছেন, আমায় নিজের মান-অপমান সুখ-সুবিধার মুখ চেয়ে সরে দাঁড়ালে চল্‌বে না, মঙ্গল-মঠের জন্য অনেক খেটেছি,—বিপদের দিনে অর্ব্বাচীন অপদার্থগুলার হাতে মঙ্গল মঠের সর্ব্বনাশের ভার দিয়ে আমি অকৃতজ্ঞের মত সরে পড়্‌তে পারি না!"

উৎসাহের ঝোঁকে এক নিঃশ্বাসে এতগুলা কথা বলিয়া মদন উদ্‌গ্রীব হইয়া নিরঞ্জনের পানে চাহিল। নিরঞ্জন কিন্তু এত সংবাদের উত্তরে বলিবার মত মন্তব্য কিছুই খুঁজিয়া পাইল না,—অন্যদিকে চাহিয়া উন্মনাভাবে কি যেন ভাবিতে লাগিল।

দ্রাবিড় পণ্ডিত দ্বয় পুঁথি হাতে লইয়া গম্ভীরভাবে বসিয়াছিলেন। মহারাজ স্নিগ্ধ-কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টিতে মদনের মুখভাব নিরীক্ষণ করিতেছিলেন,—এইবার সস্নেহে হাসিয়া পার্শ্ববর্ত্তী পণ্ডিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন

"পণ্ডিতজি,—বালক মদন যে দীক্ষার উপযুক্ত, তার কোনই সন্দেহ নাই,—কিন্তু নীলাচলে শ্যামানন্দ আচার্য্যের আশ্রম কি এর উপযুক্ত স্থান ? না, এর সন্ন্যাস-সাধনার স্থান অরণ্য ?"

পণ্ডিত সহাস্যে বলিলেন "কি বল্‌ব মহারাজ ? উনি ইংরেজি পড়ে তাকিক হয়েছেন,—এখনি তর্কের ঝড়ে আমাদের নাস্তানাবুদ করে তুল্‌বেন, কিন্তু অস্বীকার কর্‌তে পারি না মহারাজ, খুব বুদ্ধিমান লোক !—"

মদন লজ্জিত হইল, ক্ষুণ্ণ দৃষ্টিতে মহারাজের পানে চাহিয়া বলিল "মহারাজ আমার পক্ষে গুরু-করণের প্রয়োজনীয়তা কি—"

বাধা দিয়া মহারাজ বলিলেন "হাঁ, অবশ্য আছে, কিন্তু বৎস জীবনের লঘু-করণ শিক্ষাটা আগে সমাপ্ত করা চাই ! তুমি ঝঞ্ঝাটের দুঃখে সংসারাশ্রমে বীতস্পৃহ হয়েছ, কিন্তু জান না, তোমার শিক্ষা-সাধনার জন্য কত কর্ম্ম, কত জ্ঞান সেখানে সঞ্চিত আছে ! মহৎ সাধন-ক্ষেত্র বলেই গার্হস্থ্যাশ্রমের অন্য নাম জ্যেষ্ঠাশ্রম !

মদন সবিনয়ে বলিল "প্রকৃত গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন, খুব অল্প লোকের শক্তিতে সম্ভবে—বড় কষ্টসাধ্য ব্যাপার—"

মহারাজ বলিলেন "কষ্টসাধ্য হ'তে পারে, কিন্তু অসাধ্য নয়,—বাইরে আসক্ত, মুগ্ধ, ঘোর কর্ম্মী,—অন্তরে অনাসক্ত, উদাসীন, নির্ব্বিকার ! কর্ম্ম-সন্ন্যাস, জ্ঞান-সন্ন্যাস, এর সাধনা সকলের আগে চাই—"

মদন বলিল "সে সংসারে থেকে ক'জন মানুষ পারে ?"

মহারাজ হাসিয়া বলিলেন 'মানুষ' পদবাচ্য যে কয়জন সেই কয়জনই পারে !—তুমি বালক চমকিত হোয়ো না,—কিন্তু সন্ন্যাসী স্বার্থপর—আত্ম-চিন্তায় বিভোর ! জগৎ-পিতার সুন্দর জগত;—সয়তানের কুৎসিত লীলা-নিকেতন ব'লে, তারা ঘৃণার ভয়ে দূরে চ'লে যায় ! অবশ্য সেই 'যাওয়া' মিথ্যা হয় না, অসার্থক হয় না, তাদের অজ্ঞানের-মোহ চোখের ওপর যে দুর্ব্বলতার অন্ধকার ঘনিয়ে তোলে,—সে অন্ধকারকে কাটিয়ে দেবার জন্য উগ্র অগ্নিজ্যোতিঃ সংস্পর্শের প্রয়োজন,—কিন্তু তাদের দৃষ্টির অন্ধকার কাট্‌লে সকলের শেষে তারা দেখ্‌তে পায়,—জগত, সয়তানের লীলা-নিকেতন নয়, সয়তান-স্রষ্টার কৌতুক-আনন্দের বিচিত্র-সৌন্দর্য্যশালী বিহার-নিকেতন !—"

মহারাজ থামিলেন। তাঁহার বাক্যমর্ম্মকে কি ভাবে গ্রহণ করিল, বুঝা গেল না,—সকলে নীরব রহিল।

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া মহারাজ পুনরায় বলিলেন—"কিন্তু সংসারীর ধর্ম্ম—ত্যাগে লাভ ! সংসারীর কর্ম্ম-সন্ন্যাস পরোপকার ব্রতে সার্থক, সংসারীর জ্ঞান-সন্ন্যাস বিশ্বহিতের আনন্দে পরিতৃপ্ত !

নিরঞ্জনের চিত্তের কোন নিভৃত অংশ স্থিত—জমাট কঠিনতার বুকে হঠাৎ যেন প্রলয়ের তরঙ্গাঘাত বাজিল ! চমকিয়া সে মহারাজের মুখপানে চাহিল, কি একটা ব্যাকুল প্রশ্ন তাহার বুকের মধ্যে ঠেলিয়া উঠিল, কিন্তু নিরঞ্জন কথা কহিতে পারিল না, শবের মত বিবর্ণ—ভাবহীন বদনে, নিষ্প্রভ-স্তিমিত নয়নে নির্ব্বাকভাবে সে শুধু চাহিয়া রহিল।

মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য আত্মোন্নতি সাধন; বাহ্য-সন্ন্যাসেই যে সে সাধনা সিদ্ধ হবার একমাত্র উপায়, তার কোন মানে নাই— যদি সংসারে থেকে সে সাধনা সিদ্ধ হয় তবে সংসার ত্যাগের আড়ম্বর অনুষ্ঠানে কোন প্রয়োজন নাই !—"একটু থামিয়া, কি যেন ভাবিয়া লইয়া মহারাজ অপেক্ষাকৃত কোমল-কণ্ঠে বলিলেন, "বিসর্প, বিসূচিকা, বাতশ্লেষ্মা,—সবই ব্যাধি বটে, কিন্তু একজাতীয় ব্যাধি নয়, ও-সবের চিকিৎসা ব্যবস্থাও ভিন্ন বিধানানুসারে হওয়া কর্ত্তব্য। কিছু মনে কোর না মদন, তোমার চিত্তভাবের গতি-প্রবণতা লক্ষ্য করে,—আমি নিজের অভিজ্ঞতায় যতটুকু বুঝেছি, তাতে তোমায় এই পর্য্যন্ত পরামর্শ দিতে পারি যে সংসারই তোমার উপযুক্ত সাধন ক্ষেত্র। তোমার মধ্যে শক্তি বিদ্যমান আছে, সংসারের পথেই সে তোমাকে বাঞ্ছিত সফলতা দান কর্‌বে !"

নিরঞ্জন দুই হাতের মধ্যে নিজের উষ্ণ-তপ্ত বদন আচ্ছাদিত করিয়া, নতশিরে বসিয়া রহিল,—তাহার মনে হইল, চারিদিকে যেন জটিল বিপ্লবের গোলমাল বাধিয়া গিয়াছে!

তাহার হৃদয়ের দুর্দ্দান্ত আবেগ-আলোড়ন কেহ জানিল না, আলাপ যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে লাগিল। মহারাজের কথার উত্তরে দ্রাবিড় পণ্ডিতদ্বয়ের একজন বলিলেন "তা ত বটেই, সংসারকে না জেনে, না চিনেই তাকে ফাঁকী দেবার জন্যে সন্ন্যাসী সাজা, নিতান্ত ভুল!"

দ্বিতীয় পণ্ডিত তাঁহার বাক্য সমর্থন করিয়া বলিলেন—"আর এটাও ঠিক যে,—ভুক্ত-ভোগীর প্রতিজ্ঞা বরং টেকে, কিন্তু অভুক্তের সংযম একেবারেই অসম্ভব।

মদন ঈষৎ উত্তেজিতভাবে বলিল "আমার পক্ষেও ওর ঠিক পাল্টা জবাব আছে, পণ্ডিতজি,—আমি বল্‌ছি, বরং অভুক্তের প্রতিজ্ঞা টেকে, কিন্তু ভুক্ত-ভোগীর টেকে না!—কারণ তার পূর্ব্ব ভুক্ত-সংসার কার্য্যকালে,—অর্থাৎ প্রলোভনের সম্মুখে, পরীক্ষাক্ষেত্রে তার সুপ্ত-প্রবৃত্তিকে আবার পূর্ব্ব অভ্যাসের মধ্যে সবেগে উদ্বোধিত করে তোলাই, জোরাল সম্ভবপর।—এই ধরুন যে ব্যক্তি কখনও মদ খায় নি—"

পণ্ডিত বাধা দিয়া বলিলেন "মদ্যের সম্বন্ধে একটা অদম্য কৌতূহল থাকা, তার পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ—"

বিরক্ত ভাবে মদন বলিল, "কৌতূহল মাত্রেই যে অদম্য তা কেমন করে বল্‌ব? তবে হাঁ, অনুভূতির উত্তেজনাকে প্রশ্রয় দেওয়া না-দেওয়া, সে ইচ্ছা-শক্তি সাপেক্ষ!—আমি ইচ্ছা-শক্তির প্রাধান্য সকলের ওপর জানি,—বিবেক-বিচার-প্রবুদ্ধ চিত্ত অজ্ঞাত কৌতূহলকে অবহেলায় জয় করিতে পারে, কিন্তু অভ্যস্ত সংস্কার—অর্থাৎ জানা শোনা ব্যাপার, এই মস্তিষ্কের প্রতি কোটরে-কোটরে যার আস্বাদ-লালসা,—পূর্ব্বানুভূতি ক্রমাগতই ঘুরে ঘুরে মূর্ত্তিমান হচ্ছে, সেটা আরো মারাত্মক নয় কি?"

পণ্ডিত, বিদ্রূপ পূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন "বিবেক-বিচার-প্রবুদ্ধ-চিত্ত কাকে বল! এই পুঁথিগত বিদ্যাড়ম্বরময়ী একজ্ঞায়িতাকে?"

মদন ক্ষুব্ধভাবে বলিল, "বিবেক-বিচার-প্রবুদ্ধতা, কোন দ্বন্দ্ব সহযোগে উৎপন্ন হয়, জানেন কি?—বিচার পূর্ব্বক বিষয় ভোগে!

—নির্ব্বিচার উপভোগে নয়,······ যে তত্ত্ব জিজ্ঞাসু,—যে প্রাণের আবেগে শিক্ষা-অন্বেষণ করে,—সে ব্যক্তি মহারাজের পায়ের তলার ঐ দুর্ব্বাটির মধ্য থেকেও, তত্ত্বোপদেশ লাভ করতে পারে, মানেন কি?"

নিরঞ্জন করাচ্ছাদন খুলিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল।—সকল সংশয়ের দ্বন্দ্ব ছিঁড়িয়া, তাহার প্রাণে সহসা যেন আশ্বাসের অমর সান্ত্বনা আসিয়া পৌঁছিল!—উঠিয়া, সে বিনাবাক্যে প্রস্থানোদ্যত হইল।

নিরঞ্জন লতামণ্ডপের বহির্ভাগে পদক্ষেপ করিয়াছে,—এমন সময় মহারাজ বলিলেন "কোথা যাও নিরঞ্জন?" সহসা যেন তীব্র বিঘ্নাহত হইয়া—শঙ্কিত দৃষ্টিতে নিরঞ্জন ফিরিয়া দাঁড়াইল, ম্লানমুখে বলিল, "দেবদর্শনে মহারাজ।"

মহারাজ বলিলেন "আমরাও যাব, চল—"

নিরুৎসাহ নিরঞ্জন ক্ষীণকণ্ঠে বলিল "চলুন।"—হায়রে, পিছনের আহ্বান!

ক্রমশঃ—

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

সিন্ধু দর্শনে। (পুরী)

-(ঃঃ)-

(১)

হে বিরাট, হে মহান্, হে অনন্ত অসীম প্রকৃতি
আজি আমি তব পদ মূলে;
কাঁপে অঙ্গ থরথর প্রভঞ্জনে বেতসের মত
দাঁড়াইয়া অনন্তের কূলে।
ভগবন্! একি তব, একি মূর্ত্তি সম্বর, সম্বর,
একি তব সেই বিশ্বরূপ ?
অব্যক্ত ভৈরবানন্দে একি তব তাণ্ডব নর্ত্তন,
ভোলানাথ, ওগো বিশ্বভূপ!
না-না একি মহামায়া অঘটন ঘটন নিপুণা
না-না, একি দৃষ্টি-সম্মোহন ?
সুপ্ত কি জাগ্রত আমি? দেহবন্ধ ছাড়িয়া অথবা
আত্মারূপে করি'ছি ভ্রমণ ?
মুছে দাও, মুছে দাও, নয়নের কুহেলি-অঞ্জন
দিব্য দৃষ্টি দাও দয়াময়,
সান্ত রূপে শান্ত হ'য়ে এস তুমি, তোমারি চরণ
আঁকরিয়া ধরিবে হৃদয়।

(২)

হে অনাদি তুমি বুঝি মহামৌনী, দিগন্তের পারে
তপস্যায় ছিলে সমাহিত,
রুদ্ধ করি ইন্দ্রিয়ের সর্ব্বদ্বার নিস্পন্দ নীরব
আপনাতে আপনি নিহিত।
কবে কোন্ শতাব্দীর শেষ ভাগে সহসা তোমার
জাগরণ মৃদঙ্গ নিনাদে;
দিগন্তের দ্বার ভাঙি' ছুটে এল অস্থির পুলকে
তপঃ ফেলি প্রেমের উন্মাদে।
সেই হ'তে তব নিতি প্রেমানন্দে মহামহোৎসব
চির মত্ত এ মহাকীর্ত্তন।
এ পুণ্য ভূমির' পরে, ছুটে ছুটে লুটিয়া পুটিয়া
সেই হ'তে এ ভক্তি নর্ত্তন।
গগন পড়েছে নমি' মহোৎসবে, তপনের সহ
প্রেমভরে আনন্দ হিল্লোলে,
সুধাকর আলিঙ্গিয়া আবেশে যে পড়েছে গড়ায়ে
নাচে গোত তোমার কল্লোলে।

(৩)

তুমি শুধু নহ দেব প্রেমমত্ত ক্ষিপ্ত আত্মহারা
তুমি যে গো জ্ঞানের পাথার,
বিরিঞ্চির কমণ্ডলু উথলিয়া তোমাতে ওঙ্কারে
সর্ব্ব বেদ দিতেছে সাঁতার।
তরঙ্গিয়া তরঙ্গিয়া ব্রহ্মজ্ঞান করিয়া বহন
আঘাতিছে নর চিত্তকূলে
পাশরিয়া অহংজ্ঞান লভে নর অনন্ত আভাষ
আপনা হারায় পাদমূলে।
সর্ব্ব তুচ্ছ দ্বিধা দ্বন্দ্ব বাধাবন্ধ সব দূরে যায়
সর্ব্ববিধ সংকীর্ণ নীচতা,
বিস্তীর্ণ আত্মায় তব ঝাঁপ দিতে চাহে আত্মা মম
শুনি তব আনন্দ বারতা।

(৪)

কর্ম্মের গম্ভীর মন্ত্র মর্ম্মরিয়া উঠে তব প্রাণে,
মহামন্ত্রে জগতে জাগায়,
কোটি ভক্ত মুক্তাত্মার কর্ম্মপুঞ্জ ধাতার চরণে
সমর্পিত, একত্র হেথায়।

কোন্ আদি রাত্রিশেষে ব্রহ্মাণ্ডের সিংহদ্বার 'পরে
প্রভাতের দুন্দুভি নিনাদে,
ছুটিয়া বাহিরে এলে বিধাতার হে জ্যেষ্ঠ সন্তান
ভরি বিশ্ব সৃষ্টির সংবাদে।
সেই হ'তে নাহি তব নিদ্রা, শ্রান্তি, নাহিক বিরাম
শক্তির বিরাট যন্ত্রবলে
কোটী কোটী হস্তী অশ্ব সুবিরাট তোমার প্রাঙ্গনে
দিগ্ দিগন্তে ছুটিতেছে হেরি
উদ্বেলিয়া নভোরাজ্য, আলোড়িয়া বিশ্ব-কোলাহল
বাজিতেছে তব জয়-ভেরী।

(৫)

কত যুগযুগান্তর মন্বন্তর জাগিল, মিশিল
তুমি কিন্তু রূপান্তর হীন।
কত বিশ্ব গ্রহতারা কত সৃষ্টি তোমাতে ডুবিল
তুমি শুধু আছ হে নবীন।
এ বিশ্ব বুদ্বুদ সম তব বুকে উঠিয়াছে ফুটি
নিমেষেতে যাইবে টুটিয়া।
যুগান্তের যোগ নিদ্রা শেষ হ'লে পুনঃ তব বুকে
শত বিশ্ব উঠিবে ফুটিয়া।
হে মহাশক্তির রথ বুকে ধরি বিশ্ব বিধাতায়
রুদ্র তব চক্রের তাড়না
চরাচর কীটসম চক্রতলে উঠিছে, পড়িছে
কে তাহার করিবে গণনা ?
তুমি শুধু আপনার সর্ব্বধন সব প্রেমপ্রীতি
সেই একে করেছ অর্পণ,
রচিয়াছ ফুটাইয়া ভক্তিরক্ত হৃদয় কমল
রমা সহ তাঁহারি শয়ন।

(৬)

হে বিরাট, হে বিপুল, বিধাতার হে প্রিয় সেবক
তবু তব নাহি অহঙ্কার
মানবে কর না ঘৃণা বক্ষে করে' লয়ে যাও তারে
দেশে দেশে ওগো পারাবার,
বিষ্ণুরে ইন্দিরা দেছ বিশ্বেরে দিয়েছ নিশাপতি,
দেবতারে সুধাপুষ্পরাজ,
মানবে দিয়াছ রত্ন কত ধন, ক্ষুদ্র জগতের
দাসত্বেও নাহি তব লাজ।
শুক্তি লয়ে কড়ি লয়ে তোমাসহ বৃদ্ধ পিতামহ
পৌত্র আমি করিতেছি খেলা,
আমার বালুর ঘর ভেঙ্গে দিয়ে হেসে চলে যাও,
বালকের মত সারা বেলা।
অজ্ঞেয় বিরাট তুমি তবু তুমি আপনার জন
তোমা হেরে নাহি কিছু ভয়,
বৃদ্ধ যুবা, জ্ঞানী, মূর্খ তব সহ শিশুর মতন
ফিরে ঘুরে ওগো প্রেমময়।

(৭)

আমি আজি নহি তুচ্ছ হে অব্যক্ত তব সন্নিধানে
দাঁড়াইয়া অনন্তের কূলে,
সংসারের তাপজ্বালা, বাধাবন্ধ নীচতা ক্ষুদ্রতা
তোমা হেরি সব গেছি ভুলে।
সম্মুখে শুধুই হেরি সীমাহীন অনন্ত অনাদি
অব্যক্ত অজ্ঞেয় কূল হারা
উঠে ডুবে চন্দ্র সূর্য্য ঢলে পড়ে অসীম আকাশে,
জেগে উঠে সংখ্যাহীন তারা।
কোটী কোটী তরঙ্গিণী ধুয়ে নিয়ে বিশ্বের সম্পৎ
আপনারে করিছে অর্পণ,
ঐ অনন্তের মাঝে সংখ্যাহীন রবিশশীতারা
আপনারে করে নিমগন।
রজোমুক্ত আত্মা মম এর মাঝে দেহ বন্ধ ছাড়ি
অনন্তে ছুটিয়া যেতে চায়

অনন্তে আঁকরি ধরি দিতে ঝাঁপ অসীমের মাঝে
মিশে যেতে মহামহিমায়।

(৮)

আজি এ স্বাধীন আত্মা অনন্তের কূল-দেশ হ'তে
কেমনে ফিরিয়া যাবে চলে?
পাষাণ-প্রাচীর ঘেরা সংসারের কারাগারে পুনঃ
ফিরে যেতে আঁখি ভরে জলে।
বহু সাধনায় আজি সিন্ধু তব দরশন তরে
আসিয়াছি আজন্ম পিয়াসী
তৃষিত নয়নদুটি চাহে আজি পিয়ে নিতে তব
পূর্ণাবেগে সব জলরাশি।
কতনিশি তোমা সিন্ধু কল্পনায় ভেবেছি গড়েছি
আজি তব প্রত্যক্ষ-প্রকাশ
আজিকে কেমনে ফিরি দুই ফোঁটা আঁখি জল ঢালি
দিয়া শুধু দুটি দীর্ঘ শ্বাস।
ক্ষণেকের দেখাশুনা তাহাতেই এত ভালবাসা
হ'লে তুমি এতই আত্মীয়,
তব প্রতি বিশ্বখানি বুকে আঁকি স্মৃতির আঁখরে
কেমনে ফিরিব ওগো প্রিয়?

শ্রীকালিদাস রায়।

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গীতাবলী।

বোধ হয় একবৎসরও অতীত হয় নাই, নবপ্রতিষ্ঠিত কোচবিহার সাহিত্য-সভার একটি অধিবেশনে আমি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলীর প্রতি সভার সদস্য ও উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। সেই সময় কোচবিহার ষ্টেট্ লাইব্রেরী ও দ্বার আফিসে রক্ষিত সমস্ত পুঁথিগুলিই আমি মোটামুটি দেখিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ রচিত যে কয়খানি গ্রন্থ ছিল তাহার পরিচয় আমার 'মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রদান করিয়াছিলাম। 'অর্চ্চনা'র পাঠকগণ ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া থাকিবেন।* প্রবন্ধশেষে পুঁথিগুলির মুদ্রণের জন্য সাহিত্য-সভার মনোযোগ প্রার্থনা করি।

গত বৎসরে কোচবিহার সাহিত্য-সভার বার্ষিক অধিবেশনে কোচবিহারাধিপতি হিজ্ হাইনেস্ মহারাজ জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি ঐ সভাতেই এককালীন এক সহস্র মুদ্রা ও মাসিক ২৫৲ টাকা কোচবিহার সাহিত্য-সভার উন্নতিকল্পে সাহায্য ঘোষণা করিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত সভার স্থায়িত্ব ও কার্য্যশক্তি সুদৃঢ় করেন। কোচবিহার সাহিত্য-সভা সর্ব্বপ্রথমে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের পুঁথিগুলি মুদ্রিত করিবার সংকল্প করেন ও আমার উপর সেগুলির সম্পাদনের ভার অর্পিত হয়। মুদ্রণের জন্য 'ক্রিয়াযোগসার' এখন যন্ত্রস্থ।

* অর্চ্চনা ১৪শ বর্ষ, ২য়, ৫৯ ও ৯১ পৃঃ।

আমার প্রবন্ধে আমি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গীতানুরাগ, সঙ্গীতপটুতা ও সঙ্গীত রচনার কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। মহারাজের অধীনস্থ কর্ম্মচারী জয়নাথ মুন্সী বিরচিত 'রাজোপাখ্যান' (প্রথম খণ্ড) হইতে মহারাজের জীবনীর অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া ইহার প্রমাণ দিয়াছিলাম। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কৌতূহলী পাঠক উক্ত প্রবন্ধের সেই অংশ দেখিয়া লইতে পারেন। কিন্তু মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গীত সম্বলিত কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই। নানা প্রকার গীতকারকদের সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া যে সকল পুস্তক সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহার একখানি পুস্তকে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের ভণিতা যুক্ত দুইটি মাত্র সঙ্গীত পাই কিন্তু উহা যেরূপভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল তাহা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল যে মূল গীতটি স্থলে স্থলে বিকৃত ও খণ্ডিত হইয়া সংগ্রহ মধ্যে স্থান পাইয়াছে। এরূপ হওয়াও বিচিত্র নহে। লোকমুখে প্রচলিত সঙ্গীতের এইরূপ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের অন্যান্য গীতাবলী লোকমুখ হইতে সংগ্রহ করিবার জন্য আমি তৎকালে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে অনুরোধও করিয়াছিলাম। আশা ছিল অন্ততঃ কয়েকটিও সঙ্গীত সংগ্রহ হইতে পারিবে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আশার অতীত একটি ঘটনা ঘটিয়া গেল। কোচবিহারের মহাফেজখানার প্রাচীন দপ্তরগুলির মধ্য হইতে একখানি খাতা আবিষ্কৃত হইয়া পড়িল। উহাতে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের বহু সঙ্গীত নকল করা রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া গেল। কোচবিহার সাহিত্য-সভার সভাপতি ও প্রাণস্বরূপ মহারাজকুমার ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ এই খাতাখানি প্রাপ্ত হইয়া ইহার মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। ইহার সম্পাদনভারও আমার উপর অর্পিত হইয়াছে। অতি সত্বরই এই সঙ্গীতগুলি কোচবিহার সাহিত্য-সভার গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইবে। তৎপূর্ব্বে সাধারণ পাঠকগণ যাহাতে এই মনোহর ভক্তিরসপূর্ণ সঙ্গীতগুলির কিঞ্চিৎ রস আস্বাদন করিতে পারেন তন্নিমিত্ত এই প্রবন্ধের অবতারণা।

বঙ্গ-সাহিত্যের দিক দিয়া এ আবিষ্কার বহুমূল্য। বঙ্গ-সাহিত্যের গীতি-শাখায় যে সকল প্রাচীনতম রচয়িতার নাম উল্লেখযোগ্য, মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ তাহাদের মধ্যে একজন। এক রামপ্রসাদের কথা ছাড়িয়া দিলে, এ পর্য্যন্ত যে সকল গীতিকারের গীত পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে সকলেই প্রায় মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল ১৭৮৩—১৮৩৯। ইহা বোধ হয় বলিতে হইবে না যে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ কোচবিহারের অধিপতি ছিলেন। রাজোপাখ্যানের ইংরাজী অনুবাদ অনুসারে ১১৮৬ সালে মহারাজের জন্ম, ১১৯০ সালে রাজ্যপ্রাপ্তি ও ১২৪৬ সালে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। প্রাচীন প্রসিদ্ধ গীতি রচয়িতাগণের সময় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' অনুসারে নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কবিওয়ালা রামবসু—১৭৮৬—১৮২৮ খৃঃ।
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য—১৮০০ খৃঃ।
রামদুলাল রায়—১৭৮৫—১৮৫১ খৃঃ।
দেওয়ান রঘুনাথ রায়—১৭৫০—১৮৩৬ খৃঃ।

এতদ্ব্যতীত মৃজ্জা হুসেন আলি সৈয়দ জাফর খাঁ রচিত শ্যামাসঙ্গীতও পাওয়া গিয়াছে।

পাঁচালীওয়ালাদের মধ্যে যাঁহারা শ্যামাবিষয়ক গান রচনা করিয়াছিলেন দাশরথি রায় (১৮০৪—১৮৫৭ খৃঃ) তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হরুঠাকুর (১৭৩৮—১৮১৩ খৃঃ) নিত্যানন্দ দাস (১৭৫১—১৮১৩ খৃঃ) রামনিধি রায় বা নিধুবাবু (১৭৪১—১৮৩৪ খৃঃ) প্রভৃতি বৈষ্ণব গীতি ও প্রেমগীতিকারদিগের বিস্তৃত তালিকা দিবার আবশ্যক নাই। কারণ মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীতই আমরা বহুল পরিমাণে পাইয়াছি। উদ্ধৃত

সনগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের নবাবিষ্কৃত গীতাবলী কত মূল্যবান। বঙ্গ-সাহিত্যের গীতিশাখার প্রাচীনতম যুগের ইতিহাসের এগুলি অপরিহার্য্য উপকরণ।

এতদিন কিন্তু মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের নামও বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের ন্যায় অন্যান্য যে সকল রাজা মহারাজা শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম আছে বটে কিন্তু মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের নাম বঙ্গ-সাহিত্যে অপরিচিতই ছিল। দীনেশবাবু 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' লিখিয়াছেন—"বঙ্গদেশের কয়েকজন রাজা ও মহারাজাও শ্যামাবিষয়ক সংগীত রচনা করিয়াছেন। প্রচলিত সংগীত সংগ্রহগুলিতে কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, শ্রীশচন্দ্র, নাটোরাধিপতি রাজা রামকৃষ্ণ, প্রভৃতি রাজন্যবর্গের রচিত বলিয়া অনেক গান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।" (৩য় সংস্করণ ৭২৮ পৃঃ) পাঠক দেখিবেন ইহার মধ্যেও মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের নাম নাই।

কোচবিহারে পর্য্যন্ত যখন মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রচনার কথা অল্পদিন পূর্ব্বেও অজ্ঞাত ছিল, তখন অন্যত্র তাঁহার নাম না থাকিবারই কথা। যত্নের অভাবে কোচবিহারের বহু প্রাচীন পুঁথি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অধিবাসীদিগের গৃহ প্রায়ই তৃণাচ্ছাদিত বলিয়া অগ্নিকাণ্ডে বহু পুঁথি ধ্বংস হইয়াছে। কোচবিহার ষ্টেট লাইব্রেরীতে যে পুঁথিগুলি আছে, সেইগুলি হইতেই প্রাচীনকালে কোচবিহারে বিদ্যাচর্চ্চার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সংস্কৃত, বাঙ্গলা ও আসামী এই ত্রিবিধ ভাষার পুঁথিই আছে। দীনেশ বাবু 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের বহু অনুবাদকের নাম দিয়াছেন। কোচবিহারের পুঁথিগুলি দেখিলে আরও বহু লেখকের নাম দিতে পারিতেন। সুখের বিষয় কোচবিহার সাহিত্যসভা এগুলির রক্ষা ও প্রচার কল্পে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আশা করা যায় অনতিদীর্ঘকালের মধ্যেই এগুলি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস সঙ্কলনে মূল্যবান উপাদানস্বরূপ ব্যবহৃত হইবে।

এখন আমরা মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গীতগুলির পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইব। যে খাতাখানি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার প্রারম্ভে "শ্রীশ্রীদুর্গা রক্ষা কর। শ্রীবম ভোলা।" ইহার পর নিম্নলিখিত প্রথম গীতটি প্রদত্ত হইয়াছে :—

আগমনী।

নং ১

শুন গিরিরাজ গগনপরে, উমা জয়ধ্বনি করে অমরে,
বাজে সজল জলদ গভীর দেব দুন্দুভি বীণা মুরজ সপ্তস্বরা। (চিতান)
আসিতেছেন ভবরাণী ভববন্দিনী তব নন্দিনী যিনি। (ধুয়া)
চল চল সুমঙ্গল সকল সহকারে,
কুলপুরোহিত পুরঃসরে, বর যাইয়া হরপ্রিয়া উমা মারে
চিরদিনান্তরে আন তারে ঘরে
কর ধন্য ধরা হে নগমণি,
হবে ধন্য তব এ ভবন
হবে ধন্য তুমি এনে ব্রহ্মসনাতনী॥ ১

তখন নগেন্দ্র নিকেতনে
ভবানী আগমনে
ভাসিল ত্রিভুবন আনন্দ সাগরে।
মায়ের এরূপ অপরূপ হেরে পরে
ভাবনা যা মনে সেইরূপ দর্শনে
শ্রীহরেন্দ্র চেয়ে রইল অমনি
বহে নয়নে নীরধারা সারা প্রেমে হাসে
কাঁদে কত লোটায়ে অবনী ॥ ২

খাতাখানির শেষ এই:—

নং ১৭৮ তারাপদ অন্তে যেন পাই, সদাশিবের দোহাই
আমি গো অধমাধমা, আমায় কৃপা কর শ্যামা
ঐ পাদপদ্ম বিনে আর গতি নাই ॥ ১
ভজনবিহীন আমি, অগতির গতি তুমি
শ্রীহরেন্দ্র ভূপ মনে সদা ভাবে তাই ॥ ২

নকল শোধ মারফৎ
বিপিনবিহারী সরকার
সন ১২৬৫ সন তাং ২৭ কার্ত্তিক।

আমরা কেবল বর্ণাশুদ্ধিগুলি সংশোধন করিলাম। কোচবিহার সাহিত্যসভা হইতে অবিকল পুঁথি বর্ণাশুদ্ধি সমেত মুদ্রিত হইবে। আমরা ভাষার কোন পরিবর্ত্তন করিলাম না।

খাতাখানির প্রারম্ভে একটি সূচী আছে। উহাতে ১৭৮টি গানের প্রথম পংক্তিগুলি প্রদত্ত হইয়াছে। খাতার শেষ পৃষ্ঠাতেও ১৭৮ সংখ্যক গান আছে। কিন্তু খাতার মধ্যে ১০ হইতে ১৫ পর্য্যন্ত সঙ্গীতগুলি নাই। খাতার যে পৃষ্ঠা বা পৃষ্ঠাগুলিতে এই সঙ্গীতগুলি লিপিবদ্ধ ছিল তাহা হারাইয়া গিয়াছে। গানগুলি অবশ্যই ছিল, নহিলে সূচীতে তাহাদের প্রথম কলি থাকিত না। সূচী হইতে সেই গানের প্রথম পংক্তিগুলি উদ্ধৃত হইল। এই গান যদি কাহারও জানা থাকে জ্ঞাপন করিলে সংগ্রহটি সম্পূর্ণ হইতে পারিবে।

১০ নং—কি ঘটা মদোৎকটা মাথায় জটা কারো
ওমা কালীতারা কি বিরাজ কৈর‍্যাছে মৃতাঙ্গে।
১১ নং—হায় যেমন নীলমণি নীলকাদম্বিনী জিনি
অমাবস্যা নিশি অঞ্জন কেশপাশে।
১২ নং—হরহৃদি সরোজে কে বিরাজে নীলকমল।
১৩ নং—ভবার্ণব তরণী নাম কালী তারা।
১৪ নং—ও যে বিপরীত হেরি হর উরে বিরাজ মা।
১৫ নং—আমি মিছা ভাবনা করি আমার আমার কোথা।

সুতরাং ১৭৮ খানা গানের মধ্যে ৭ খানা গান নাই। বাকি ১৭১ খানা গানও সব মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রচনা নহে। তিনটি সঙ্গীতে দুর্গাপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তির ভণিতা পাওয়া যায়। ৬৬, ১৬৪, ১৬৯ সংখ্যক গীত

দুর্গাপ্রসাদের রচনা। আমরা যতদূর জানি, প্রাচীন গীতকারকদের তালিকার মধ্যে দুর্গাপ্রসাদের নাম উল্লিখিত নাই। এই দুর্গাপ্রসাদ কে তাহা ভণিতা হইতে নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই। কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত উলা গ্রামে দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নামক এক কবি প্রায় শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। দুর্গাপ্রসাদের পিতা আত্মারাম মুখোপাধ্যায়। মাতার নাম অরুন্ধতী দেবী। দুর্গাপ্রসাদের স্ত্রী হরিপ্রিয়া দেবী স্বপ্নে গঙ্গাদেবীর প্রত্যাদেশ পাইয়াছিলেন, 'তোমার স্বামীকে আমার মাহাত্ম্য প্রচার করিতে বল।' তদনুসারে এই কাব্য রচিত হয়। গীতরচয়িতা দুর্গাপ্রসাদ ও গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী-কার অভিন্ন কিনা নিশ্চিতরূপে বলিবার উপায় নাই। তবে এই দুর্গাপ্রসাদ হরেন্দ্রনারায়ণের সমসাময়িক বলিয়া গীতগুলির রচয়িতা হইলেও হইতে পারে।

দুর্গাপ্রসাদ নামক এই প্রাচীন গীতরচয়িতার সঙ্গীত এ যাবৎ দেখা যায় নাই বলিয়া, যে তিনটি গীত এখন পাওয়া গেল, তাহা আমাদের আদরণীয়। ঐ তিনটি গীত এখানে উদ্ধৃত হইল।

(১)

কভু নাহি হেরি হেন একি নারী ভয়ঙ্কর।
চলিতে চরণভরে কাঁপে ধরণী,
নিতান্ত কৃতান্ত বামা কালরূপিণী,
মুক্তকেশী, শশী ভালে, নরশিরমালা গলে,
প্রাণ কাঁপে নিরখিলে, গ্রাস করে করিবর।
এ বামার সনে রণে প্রাণে বাঁচা ভার
বুঝিলাম, বিবাদের সাধ ঘুচিল আমার।
অসম্ভব করে রণে, হুহুঙ্কার ঘনে ঘনে,
প্রচণ্ড পাবক যেন, শশঙ্কিত কলেবর।
ফিরিছে দনুজদলে তমগুণেতে
ক্ষরিতেছে হুতাশন ত্রিনয়নেতে
এ বামার রূপ হেরি, চমকিত সুরপুরী,
লাজ নাহি দিগম্বরী, পদতলে দিগম্বর।
করালবদনা দিগ্‌বসনা কে রণে,
দিতিকুলনাশিনী এই নিতেছে মনে,
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ভণে, দৃঢ় ইহা আছে মনে,
আন্তমে অন্তক ভয়ে হব না কভু কাতর॥

(২)

প্রদোষ সময়ে অতিথি।
(ওগো তারা আমি)— (ধুয়া)
হেদে গো করুণাময়ি ক্ষণ ও চরণে দেহি ময়ি স্থিতি॥ (চিতেন)
জনম মরণ পথে, পুনঃ পুঃন যাতায়াতে
সুজন কুজন কেউ নাহি সাথী
অনাথ আতুর আমি কৃপানাথ দারা তুমি
কর কৃপা অসম্বল প্রতি ॥ ১

একে বয়োগত কাল　　তাহে বন্দী রিপুজাল
ভাবি ভয়ে ছন্নমতি
শ্রীদুর্গাপ্রসাদে কয়,　　তারা যা উচিত হয়
কর তার বিধান সম্প্রতি ॥ ২

এই গীতটির উপর খাতায় নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ আছে "দুর্গাপ্রসাদী ভবানী বিষয়।"

(৩)

চলরে মন কালী ব'লে, সুবাতাসে বাদাম তুলে
পড়িলে তুফানে তরী, তরে যাবে অবহেলে
সংসার কুহক নিশি তাহে রহিলে বসি
জ্ঞানের সাধন ছেড়ে অজ্ঞানে কি রৈলে ভুলে ॥ ১
ডুবু ডুবু হৈল ভরা, চালাও তরা ক'রে ত্বরা
কুজন ছ'জন যারা, তাদের দেহ 'ভাড়ে' ফেলে
আপনি কাণ্ডারী থাক, দুর্গা দুর্গা বলে ডাক
জাগন্ত ঘরেতে চুরি হয়েছে কি কোনকালে ॥ ২
হৃৎপদ্ম ছই-ঘরে, ব্রহ্মময়ী পরাৎপরে
স্থাপনা করহ তারে রাখহ মন কুতূহলে
পঞ্চজন আছে যারা, গুণ টেনে যাউক তারা
অবশ্য হইবে লাভ, শ্রীদুর্গাপ্রসাদে বলে ॥ ৩

এই তিনটি সঙ্গীত হইতে দুর্গাপ্রসাদের তিন প্রকার রচনানৈপুণ্য প্রকটিত হইতেছে। প্রথমটিতে কালীর চণ্ডমূর্ত্তি বর্ণনা করিতে সংস্কৃত-বহুল শব্দের প্রয়োগে গানটিতে বেশ গাম্ভীর্য্য প্রকটিত হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে ভক্তের কাতর নিবেদন সরল ভাষায় প্রকটিত। তৃতীয়টিতে একটি সুন্দর উপমার প্রয়োগ বিদ্যমান। গানগুলি বোধ হয় মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের অতি প্রিয় ছিল, তা না হইলে তাঁহার নিজ গীত সংগ্রহের মধ্যে এগুলি স্থান পাইত না।

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে গতানুগতিকতা বড় প্রবল ছিল। কতকগুলি বাঁধা বিষয় লইয়া সকল কবিই কিছু না কিছু লিখিয়াছেন। বারমাস্যা, চৌত্রিশ অক্ষরে স্তুতি প্রভৃতি বহু কাব্যে বহু প্রকারে লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই এক স্রোতের প্রবাহে মৌলিকতা প্রদর্শন করিতে অতি অল্প লেখকই পারিয়াছেন। সত্য বটে ভারতচন্দ্রের ন্যায় শক্তিশালী লেখক যাহাদের অনুকরণ করিয়াছেন তাহাদের যশ অপহরণ করিয়া নাম ডুবাইয়া দিতে পারিয়াছেন, কিন্তু সে ক্ষমতা সকলের ছিল না। কাব্যে যেমন সংগীতেও তেমনি বাঙ্গলাদেশের কতকগুলি বাঁধা বিষয় ছিল। বঙ্গের তৎকালীন সমাজ প্রথাই সেই বাঁধা বিষয়ে উৎসাহরস সিঞ্চন করিত। আগমনী সঙ্গীত এই বাঁধা বিষয়গুলির মধ্যে একটি।

"বঙ্গদেশের কতকগুলি গভীর প্রাণের কামনা ছিল,—শিশু কন্যার পিতৃগৃহ হইতে গমন, দুধের মেয়ে অষ্টমবর্ষে গৌরী সাজিয়া গৃহ ছাড়িয়া যাইত, তাহার ধূলিখেলা সাঙ্গ করিয়া অবগুণ্ঠনবতী যুবতী বধূর অভিনয় করিতে হইত, মাতৃবিরহে বালিকা ঘোমটা ঢাকা সুন্দর মুখখানি চক্ষুজলে প্লাবিত করিয়া পথের পানে তাকাইয়া থাকিত; মায়ের রাত্রিও সুখে প্রভাত হইত না,— ক্রোড়ের শিশু ছাড়া মা স্বপ্ন দেখিয়া পাগলিনীর ন্যায় কাঁদিয়া বলিতেন—

"উমা আমার এসেছিল।

স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে, চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকাল॥

বহুদিনের অশ্রুসিক্ত এই বিরহব্যাপারের পর যখন বালিকা ফিরিয়া আসিত তখন কত সুখ—

'আমার উমা এলো বলে রাণী এলোকেশে ধায়'

এই সকল গানের সরল কথার শ্রোতা অশ্রুজলে গলিয়া পড়িতেন, এগুলির রঙ্গভূমি বস্তুতঃ কৈলাস বা হিমালয়পুরী নহে, প্রতি গৃহস্থের হৃদয় ইহার অনুভূতিক্ষেত্র।...গানগুলি শ্রোতার হৃদয় ছুঁইত ও চক্ষু অশ্রুপূর্ণ করিত--ইহা গৃহস্থের ধূলিমাখা আঙ্গিনার কথা, কিন্তু ইহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নির্ম্মল স্বর্গের প্রতি—কারণ স্বার্থশূন্য পবিত্র স্নেহ পৃথিবীর কথা হইয়াও স্বর্গের কথা।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৩য় সংস্করণ ৬২১—৬২২ পৃষ্ঠা)

এই মাতৃস্নেহের বিকাশের চিত্রই বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ধ চিরনবীন আগমনী সঙ্গীতগুলি। শারদীয়া পূজার আগমনে বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে আগমনী সংগীতের তানে যে নরনারীর হৃদয় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে তাহার মূল কারণটি এইখানেই লুক্কায়িত। আজ গৌরীদানের প্রথা বিরল হইলেও প্রবাসী পুত্রকন্যার প্রতীক্ষা ঘরে ঘরে জাগিয়া ওঠে, গিরিরাণীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আপন আপন প্রাণের সন্তানের মিলন সম্ভাবনা ফুটিয়া উঠে। তাই এখনও আগমনী গীত বাঙ্গলাদেশ মজায় বাঙ্গালীর প্রাণ মাতায়।

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণও আগমনী গীত রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে রামপ্রসাদ যে পথে চলিয়াছিলেন, হরেন্দ্রনারায়ণও সেই পথের অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গীত সংগ্রহে গানগুলি বিষয় অনুযায়ী সজ্জিত নাই, কিন্তু সঙ্গীতগুলি বিষয় অনুযায়ী সাজাইয়া লইতে আমরা একে একে আগমনীর সকল অংশেরই বিকাশ দেখিতে পাইব।

রামপ্রসাদের

'উমা আমার এসেছিল'

সঙ্গীতের ন্যায় হরেন্দ্রনারায়ণ রচনা করিয়াছেন—

ব্যাকুলিত হিয়া নাথে সম্বোধিয়া
কহিছে কাঁদিয়া নগেন্দ্ররাণী,
আজির স্বপনে দেখেছি নয়নে
আমার ভবনে আইলা ভবানী।
তার ত্রিনয়নেতে জলধারা আমায় বলে উঠগো জননী। (চিতেন)
ত্রিভুবনে ধন্যা, আমার সে কন্যা,
রূপে সুলাবণ্যা, কি দশা তার;
দিনান্তে আহার, ফল মূল তার,
বিধির অবিচার, হে নগমণি।
নারদে কি কব, কিবা মতি তব,
পিতা হইয়া হত্যা করিলে নন্দিনী॥ ১
জামাতা পাগল, কি তার সম্বল,
খায়েন গরল আভরণ ফণী।

নামে সুরধুনী, অপর রমণী,
জটামাঝে রাখেন এমন গুণী।
ভূপে ভাসিছেন, শিব নিন্দা কেন,
করিতেছ মোহ মনে মহারাণী ॥ ২ (২৯ নং গীত)

বহুপত্নীক কুলীনের করে কন্যা সম্প্রদান করিয়া মায়ের যেন এ ব্যাকুলতা। গুণহীন জামাতার করে কন্যার ক্লেশ যেন ইহাতে মূর্ত্তিমান। এইরূপ :—

"আমার জামাতা, বিহীন মমতা, সর্ব্বত্র সমতা
দেখেন তিনি
আহার তাহার, চূর্ণ ধুতুরার, সিদ্ধি ঘোটা আর
হে নগমণি।" (৩১ নং গান)

নির্গুণ জামাতার পরিচয়। স্বপ্নদর্শনে স্মৃতির উদ্রেক। তারপর :—

নগেন্দ্র চরণ করিয়া বন্দন মেনকা রাণী
কাঁদিয়া কহিছে, নয়ন বহিছে পরাণ দহিছে
স্মরি' নন্দিনী।
শুন নগেন্দ্র নিবেদি তোমারে
আন যেয়ে আমার উমা মারে
দেখিতে চাই তারে।
তার দুঃখে যায় দিন সুখভোগহীন
গিরীন্দ্র নিবেদিব কত,
পতিব্রতা, আমার সুতা
পতিধর্ম্মে রত অবিরত
অন্য আচ্ছাদন হীন পঞ্চানন
অজিন বসন বাঘাম্বর পরে,
আমার গৌরী সেইরূপ সদা
দিন যাপেন ফলমূলাহারে
একি হৈতে পারে ! ১
যার রত্ন অট্টালয়, শয্যা রত্নময়, চরণ সেবে সহচরী,
তার শয়ন বিল্বমূলে কভু শ্মশানে এই দুঃখে মরি,
জন্ম সৌভাগিনী রাজার নন্দিনী সেজন ভিখারিণী বলিব কারে
শুনে হরেন্দ্র কহে শুন রাণী কালী ব্রহ্মময়ী জেনে তারে
খেদ কর কারে ॥ ২ (৩৩ নং গীত)

এইরূপেই মেনকা আবার অনুরোধ করিতেছেন :—

গিরিরাজ আন উমা মারে
চিরদিনান্তরে দেখিতে চাই তারে। (ধুয়া)

আমি শুনেছি লোকের মুখে,
গৌরীর দিন যায় দুখে
ভিখারী পতি সঙ্গ হয়ে
নিজে সে ভাঙ্গড় ফিরে জগতে উলঙ্গ হ'য়ে
কুরঙ্গ-নয়না, পদ্মপত্রেক্ষণা,
আমার দুহিতা সে যে বিমনা ;
হাসি হরেন্দ্র কহিতেছে
রাণী ভাল মিলিয়াছে
উভয় সব প্রকারে ॥ (৩১ নং গীত)

শুধু অনুরোধে যখন হইল না, তখন মেনকা তিরস্কার করিতে লাগিলেন :—

গত সম্বৎসর, ওহে গিরিবর, মনেতে না কর প্রাণ উমারে।
ধন্য দেখি একি তোমারে,
তুমি কি সুখে আছ নাথ ঘরে
তারে মজাইয়া দুঃখ পারাবারে। (চিতেন)
তুমি পাষাণ, পাষাণ হৃদয় তোমার
এ তাপে তাপিতে কি পারে। (ধুয়া)
জামাতার গুণ, শুন কি শুন, ক্ষেপা সে দারুণ
উলঙ্গ বেড়ায়
শ্মশানে বিহার, ভূত সঙ্গে তার, চিতাভস্ম ফণী
আভরণ গায়
কি বুঝে তাহারে, দিলে হে কন্যারে
দুঃখার্ণবে কেবল ডুবালে আমারে। (১১৯ নং গীত)

ওদিকে কন্যাও মাতার নিকট যাইতে ব্যাকুল। স্বামীর নিকট অনুমতি চাহিতেছেন :—

ভবে সম্বোধন করি নিবেদন করে ভবানী
শুন নাথ গঙ্গাধর হর শঙ্কর শূলপাণি
যদি আজ্ঞা হয় দয়াময় তবে যাইতে চাই জনক-ভবনে. (চিতেন)
কর অনুমতি কৃপা মনে (ধুয়া)
আমি এক কন্যা তার, পুত্র কি কন্যা আর নাহি অপর দিগম্বর
মমাগ্রজ কেবল সে যে মৈনাক মহীধর
ইন্দ্র হ'তে ভয়, পাইয়া অতিশয়
ভ্রাতা আমার যাইয়া, লুকাইয়া জলধির জলে
তিনি রয়েছেন অতি সঙ্গোপনে ॥ ১

শুনে ভবানী ভারতী, ভব তুষ্ট মতি
বলিছে উমা সম্বোধিয়া
চল চল সুমঙ্গলে হে বিমলে ত্বরা আইস যাইয়া
ভব নিদেশনে উমা হর্ষ মনে করে গমন
হৈল তিনলোকে সু জয়ধ্বনি শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ ভণে ॥ ২

পতির অনুমতি পাইয়া উমা পতিগৃহে যাত্রা করিলেন। পিতৃভবনের নিকটস্থ হইলে তাঁহার পিতার নিকট সংবাদ গেল।

নগরে কোলাহল সুমঙ্গল জয়ধ্বনি. (চিতেন)
তব ভবনে গিরিরাজ আইলা ভবরাণী (ধুয়া)
চল সত্বর যাইয়া বর হর-গেহিনীরে
আন ভবনে, হের নয়নে তার বিভূতিরে।
(৫০ নং গান)

তখন মাতা পাগলিনীর ন্যায় কন্যাকে দেখিতে বাহির হইলেন।

হায় ধেয়ে হেরিয়া রাণী ভুবনে ভবানী বরিয়া লইল ঘরেতে,
আরম্ভিল আসি যত পুরবাসী বরিষে ফুল পুরোহিতে।
(৭১ নং গান)

তখন :—

অন্ধের নয়ন তারাবার ধন পাইয়া উমারে
ধাইয়া যাইয়া মেনকা গৌরীমুখ হেরি দুখ উথলে,
কাঁদিয়া বলে বল কেমন আছ মা
ভিখারী সে ভবের ভবনে। (চিতেন)
আইস মা, মা, আইস মা। (ধুয়া)
উমা তোমা বিনে, আমি নিশি দিনে
বুঝি না এ দিবা কি রজনী
মনে বুঝতে পাই, প্রাণ যেন ঘটে নাই ওহে ভবানী
আজ তোমায় পাইয়া মা পাইল যেন জীবন জীবনে ॥ ১
(৩১ নং গান)

আবার :—

কেঁদে গিরিরাণী কহিছে উমা,
দিনান্ধ হয়েছি না দেখে তোমা,
আমার দেহ হয়েছে প্রাণ ছাড়া
হারা হয়েছি নয়নের তারা। (চিতেন)
শুন ভিখারী শঙ্কর দারা। (ধুয়া)

ভব বিভব বিহীন তপে তনু ক্ষীণ, নিশিদিন শ্মশানেতে
জটা কেশ যোগীর বেশ মাথে চিতাভস্ম অঙ্গেতে
নবীনকোমলা, কোটিচন্দ্রকলা, মা তুমি অবলা, জন্ম দুখিনী
তোমার কপালে লিপি এই ধারা
দুঃখে আমি হইলাম মাত্র সারা। ১
নারদের বাক্যে ভুলে, মা তোমায় হাতে তুলে
করেছি নিক্ষেপণ যেমন অনলে,
পতি পাগল দিলেন তোমায় পাগলে।

(২ নং গান)

তারপর মিলনানন্দে বিভোর হইয়া মেনকা গিরিরাজকে বলিলেন :—

আজি সুপ্রভাত ওহে নগনাথ, প্রসন্ন বিধি চিরদিনান্তরে
পাইলাম যেন করে হারাবার নিধি সে
ভবভাবনী আইল ভবনে
আমার প্রাণে প্রাণ পাইল
গেল দৈন্য হ'লাম ধন্য আজি হনে।*
এই উমা লাগিয়া যোগযাগ ক্রিয়া
নারায়ণ প্রীতে করিলাম যত
হইল সফল সে কর্ম্ম সকল
অবিচ্ছেদ খেদ হইল গত
হের আঁখি ভরি চন্দ্রবদনে। ১

(১১২ নং গান)

এই মিলনানন্দের উপরই যবনিকা পড়ুক।

এই হৃদয়দ্রবকর সরল সহজ কথায় আগমনী সঙ্গীত যেমন একদিকে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের লেখনীনিঃসৃত হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি শব্দচ্ছটাপূর্ণ শিব বা কালিকা স্তুতিগুলি গাম্ভীর্য্যে ও শব্দাড়ম্বরে শোভামান হইয়াছে। মাতৃস্নেহের এই সঙ্গীতগুলি পড়িতে পড়িতে সেই সঙ্গীতগুলির উপর নেত্র পড়িলেই মনে হয়, এ কি একই হাতের রচনা ? দুই একটি উদাহরণ দিই :—

প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে কাঁপে রণ ধরণী †
রণরসরঙ্গিণী কে রণে রমণী
অঞ্জন গঞ্জন তনু কেমন রঞ্জন হায়।
খঞ্জন নয়নী জিনি দামিনী সঞ্চরে তায়।

* হনে—হইতে।

† রণধরণী—সংগ্রাম ভূমি।

লুলিত শোণিত ধারা গলিত বদনে,
দলিত চরণে ধরা চলিত সঘনে,
নিবিড়-তিমির নীল নীরদ-গঞ্জন,
বিমুক্ত কুন্তল জালে ঠেকেছে রণধরায়।
জিনিয়া কৃশানু ভানু রোহিণী-রমণ
ঐ শ্যামা বামার শোভা করে ত্রিনয়ন,
ধরেছে চরণ হৃদে প্রভু পঞ্চানন,
কে বটে রমণী এটা কালান্তক কাল প্রায়।

(১১২ নং গীত)

যেমত অঞ্জন জীমূত সবিদ্যুত গগনে
তেমনি রমণীরূপা কে রণাঙ্গনে
বিবসনা কে লোলরসনা সমরে একায়।*
কালান্তক কালরূপা কামান্তক উরে হায়। (ধুয়া
তড়িত-জড়িত হাসি তড়িত গামিনী,
নখর-নিকরে যেম নিশাকর শ্রেণী,
নৃকর কিঙ্কিণী ক্ষীণ কঙ্কালে বিরাজে,
বামে অসি, ভালে শশী কি শোভা হয়েছে তায়॥ ১॥
গভীর গরজে যেন অশনি সম্পাত,
বিদীর্ণ করিছে ধরা পড়িছে নির্ঘাত,
ফুটিল ব্রহ্মাণ্ড বুঝি ঘটিল প্রমাদ
টুটিল বিবাদের সাধ, বামায় হেরে প্রাণ যায়॥ ২॥

(৮ নং গীত)

অনেকগুলি সঙ্গীতের উপর রাগ বা রাগিণী লিখিত আছে। বসন্তরাগ (উপরে উহাতে ৮ নং গীত) বেহাগ, সারঙ্গ-রাগিণী, ভৈরব বা ভৈঁরো রাগ, জয়জয়ন্তী আমেজ বেহাগ রাগিণী, রাগিণী জয়জয়ন্তী মল্লার তাল সওয়ারি, সাবরপ্রদা রাগিণী আড়া তেতালী, রাগিণী ছরপরদা তাল জল্দ তেতালা, বিভাস রাগিণী, ললিত রাগিণী, ঝিঁঝিট, রামপ্রসাদী সুর, টপ্পা সুর প্রভৃতি মন্তব্য বিবিধ গীতের উপর লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ হরেন্দ্র-নারায়ণের জীবনী লেখক লিখিয়া গিয়াছেন যে মহারাজ বিবিধ রাগরাগিণীতে সঙ্গীত সকল রচনা করিতেন।† তিনি একজন নিপুণ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, বড় বড় কালোয়াৎ সকলেও তাঁহার সমক্ষে সাবধানে গান করিতেন, পাছে কোন ত্রুটি হয়।‡ রাগরাগিণীগুলি যে কিরূপ সুপ্রযুক্ত হইত তাহা ভৈরব রাগের নিম্নলিখিত উদাহরণটি হইতেই সঙ্গীতজ্ঞ পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন।

* একায় = একা।

† "He used also to write songs set to various styles of music."
(Râjopakhyân. Tarns. by Rev. R Robinson, Chap. XIII., Page 185.

‡ He was a skilled musician, and so well understood the various modes of music, that he could appreciate the performances of the finest singers" (Do. Chap. VIII, Page. 155.

এ অনুবাদ ঠিক্ হয় নাই। মূল পুঁথিতে (রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত) বড় বড় কালোয়াৎ হুজুরের সাক্ষাতে সাবধানে গান করেন এই মর্ম্মের বাক্য আছে।

শিব শিব শঙ্কর শম্ভু জটাধর
স্মর হর হর বরদ ; দুঃখহারী
নীলকণ্ঠ দিগম্বর সুন্দর
কৈলাস-কন্দর সদা বিহারী।
সতীপতি গতিমতিদাতা ত্রাতা
পঞ্চবদন ত্রিলোচন ধারী,
শ্বসন-অশন-কর উত্তরীধারী
গরল-কবল-কর ত্রিপুরারি,
জয় মৃত্যুঞ্জয় ভব-ভয়-হারী,
নমো পঞ্চানন নির্ব্বিকারী
শ্রীহরেন্দ্রে ও পদদ্বন্দ্বে
স্থান দি'ও যবে এ দেহ ছাড়ি ॥

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

আশা।

—:*:—

(১)

দেখেছিনু গৃহকোণে ক্ষুদ্র খদ্যোতিকা
পক্ষ তলে মণি চূর্ণ নিমেষে নিমেষে
জ্বলে ওঠে বায়ু-দীপ্ত অনল-কণিকা
সঞ্চলিত তারাপুঞ্জ নিশার উরসে!—
বিভ্রমের মরিচীকা, মিথ্যা শূন্য-সার
ধরিতে দেয় না ধরা মিলায় পলকে
উড়াইয়া দিনু তারে মুক্ত করি দ্বার—
ফিরে দেখি দীপ্ত-শীর্ষ চঞ্চলি ঝলকে
রুচির কণক-দীপ অগুরু-মোদিত ;
অন্তরাল-লীন তমঃ ক্ষীণ ছায়া সার,
নৃত্যপরা স্বর্ণদ্যুতি গতি লীলায়িত,—
সহসা আসিল বাত্যা ; সব অন্ধকার
প্রাণীর শিয়রে হাসে তরুণ তপন,
নিম্নে দাঁড়াইয়া নিশা করে নিরীক্ষণ

(২)

কাঞ্চন কিরীট মাথে পূর্ব্বাসার পথে
উদেছিল দ্যুতিমান তরুণ তপন
ভাস্বর ময়ূখমালী অরুণের রথে,
দিবসের রশ্মি হাতে উদগ্র গমন
সন্ধ্যায় বিলীন অস্ত-সাগরের নীরে !
দেখিয়া জ্বালিনু দীপ অঞ্চলে আবরি
স্বর্ণ-শিখা স্পর্শ লভি তিমির শিহরে—
নিভিল বায়ুর শ্বাসে কাঁপি থরথরি।
ক্ষুদ্র সে খদ্যোত এক মুক্ত বাতায়নে
পক্ষ তলে জ্যোতিবিন্দু, আসিল উড়িয়া,
মুহুর্মুহু পেতে আলো অস্থির স্ফুরণে
মণি চূর্ণ তমঃ-স্রোতে চলেছে ভাসিয়া—
আগ্রহে বাড়ানু কর, মিলাইল ত্বরা
অনন্ত তিমির মাঝে নিমগন ধরা।

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

প্রতীক্ষায়।

স্বামী আমার ব্রাঞ্চ পোষ্টমাষ্টার। গ্রামের একপ্রান্তে ছোট একখানি আটচালা ঘরে পোষ্টআফিস। ঘরের অর্দ্ধেকটি আফিস, অর্দ্ধেকটি আমাদের বাসা। স্বামীর সঙ্গীর তেমন অভাব না হইলেও বেচারী আমাকে কিন্তু সঙ্গীর অভাব যথেষ্টই অনুভব করিতে হইত। তিনটি প্রাণী আমরা, সংসারের কাজই বা কত? অনাবশ্যক অবসরের দিনগুলি কিছুতেই কাটিতে চাহিত না। বসিয়া বসিয়া বাঁশের বেড়ার ছিদ্র পথ দিয়া আফিস ঘরের দিকে চাহিয়া থাকিতাম, কত লোক আসিত যাইত। তাহার মাঝে একখানি মুখ আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল,—তাহার কথাই বলিতেছি। তাহাকে দেখিতাম, প্রতিদিন ডাকের সময়ে নিয়মিত আসিতে; তাহার আগ্রহ ও উদ্বেগপূর্ণ নয়ন দুটি যেন আমাকে বলিয়া দিত কিসের প্রতীক্ষা, কাহার আশা তাহাকে এখানে টানিয়া আনে। স্বামীকে জিজ্ঞসা করায় তিনি তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিলেন—"ও একটা পাগলী, ওর চিঠি আস্‌বে না, তবু ওর চিঠি চাই!"

চিঠির প্রতীক্ষা যে কি তাহা জানিতাম, মনটা আপনা হইতেই ভিজিয়া উঠিল। মনে হইল ইহার মাঝে একটা কিছু আছে। পরদিন খোকাকে দিয়া তাহাকে ডাকাইয়া আনিলাম : তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সে নিরাশার তপ্ত-শ্বাস ফেলিয়া বলিল "মাই সে কথা শুনিয়া কি হইবে?" তাহার কথায় আমার আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পাইল, আমি তাহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলাম "আমার কাছে লজ্জা কি—তোমার কথা বলিতেই হ'বে।" সে বলিল "কথা আর কি? সে, আমার স্বামী--বিদেশে যাইবার সময়ে বলিয়া গিয়াছিল আমায় চিঠি দিবে, সেই আশায় মাই, রোজ আসি—কিন্তু কই চিঠি ত আসে না" রমণী অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিল। আমি বলিলাম "তাই ত, তুমি তাকে এত ভালবাস; সে কি তোমায় ভুলবে?" রমণী বলিল "ভুলবার ত কথা নয় মা—তিন বছর যখন আমার বয়স, সেই সময় আমার বিয়ে হয়। স্বামী দেখিতে কেমন, সুরূপ বা কুরূপ তাহা আমি জানিতাম না, বিবাহটা কি তাহাও তখন বুঝি নাই। দশ বৎসর অবধি এমনি ভাবেই কাটিয়া যায়। আমার মা বামুনবাড়ী দাসী-বৃত্তি করিতেন। মনে পড়ে, বাড়ীতে আমি এবং আমার অপেক্ষা দুই বৎসরের বড় সতীশ দা সারাদিন খেলিয়া, দৌড়িয়া কাটাইয়া দিতাম। দশবৎসর যখন আমার বয়স, সেই সময় মা একদিন দাদাকে বলিলেন—"সতীশ, কাল তোকে গোপালপুরে জামাইবাড়ী যেতে হবে।"

সেই প্রথম মার মুখে আমার স্বামীর উল্লেখ শুনিলাম। পাড়ায় আমার সমবয়সী সকলেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছিল; কেহ কেহ সেই বয়সেই স্বামীর ঘর করিতে গিয়াছিল, আবার কেহ কেহ তখনও বাপের বাড়ীতেই ছিল, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাহারা স্বামীর দর্শন পাইত, আমি সেই দশবৎসর বয়স অবধি কোনদিন তাহা পাই নাই। বিবাহের নিদর্শন স্বরূপ শুধু হাতে লোহা এবং কপালে সিঁদূর ছিল। তাই, মা যখন দাদাকে গোপালপুর যাইবার কথা বলিলেন তখন একটা অজানা ভয়ে আমার বুকটা একবার হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল।

দাদা যাইবার ঠিক দুইদিন পরে আমার স্বামী প্রথম শ্বশুরবাড়ী আসিলেন। মা সেদিন কাজে যান নাই, জামাইকে অভ্যর্থনা করিবার জন্যই কামাই করিয়া ছিলেন। জামাই আসিতেই দাওয়ায় একখানা মাদুর পাতিয়া বাসতে দিলেন, তাহার পর বাতাস করিতে করিতে প্রশ্ন করিলেন—"বেশ ভাল ছিলে ত' বাবা গৌর?"

"হাঁ!"—মোটাগলায় কে উত্তর দিল। মা—"ঐ বুঝি জামাই আসছে লো!" বলিবামাত্র আমি ঘরের মধ্যে গিয়া লুকাইয়া ছিলাম; এখন কিন্তু একবার লোকটিকে দেখিবার জন্য বিশেষ কৌতূহল জাগিয়া উঠিল। দ্বারের পার্শ্ব হইতে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, মিশ কালো রংয়ের ষোল সতেরো বছরের একজন মা'র সহিত বসিয়া কথা কহিতেছে। মাথায় তাহার একরাশ ঘন কৃষ্ণবর্ণের চুল, পরনে একখানা কোরা ধুতি, গায়ে একটা ধোয়া পাঞ্জাবী। লোকটিকে দেখিয়া আমার যে একটুও ভয় হয় নাই এমন কথা বলিতে পারি না।

রাত্রে সেদিন আহারাদি করিতে অন্যাদনের অপেক্ষা একটু বিলম্ব হইয়া গেল। আমি আহারাদি সারিয়া উঠিতেই মা আমায় ঘরে যাইতে বলিলেন। একখানি মোটে আমাদের শয়ন ঘর ছিল! মা ও দাদা সে রাত্রির মত রান্নাঘরের দাওয়ার উপর শয়নের ব্যবস্থা করিয়া আমাদের ঘরখানি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ঘরে যাইবার জন্য ঔৎসক্য ত' আমার মোটেই ছিল না বরং কেমন যেন একটা ভয় আমার মনের মধ্যে মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। মা কিন্তু সে সকল কথা কানেই তুলিলেন না, কতকটা জোর করিয়াই আমায় ঘরের মধ্যে ঠেলিয়া দিলেন।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া ঠিক জড় কাঠের পুতুলের মত হইয়া গেলাম, এক পা নড়িবার শক্তিও যেন আমার লোপ পাইয়াছিল। স্বামী দুয়ার বন্ধ করিতে বলিলেন—একবার, দুইবার, তিনবার, কিন্তু না, আমি ঠিক স্থাণুর মত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম, তাঁর কথা রাখিবার সামর্থ্য আমার ছিল না। অবশেষে তিনি নিজেই উঠিয়া দ্বার বন্ধ

করিলেন এবং আমার হাত ধরিয়া শয্যায় লইয়া গেলেন। দাদা আমার হাত ধরিয়া অনেকদিন বেড়াইয়াছে, পাড়ায় আমার সমবয়সী অনেক ছেলের সহিত আমি হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইয়াছি কিন্তু সেদিন তাঁহার স্পর্শে আমার শরীরে যে বিদ্যুৎ বহিয়া গিয়াছিল তেমনটা ত' কই কোনদিন হয় নাই! শয্যায় শয়ন করিয়াই আমি পাশ ফিরিয়া বালিসের মধ্যে মুখ গুঁজিলাম; মাথা হইতে পা অবধি কাপড়খানা ঢাকা দিয়াছিলাম। স্বামী ডাকিলেন—"মতি—ও মতি!—"

আবার তাঁহার স্পর্শ!

আমি সে স্পর্শে বার বার শিহরিয়া উঠিলাম। ভয়ে আমার কণ্ঠ ও ওষ্ঠ শুখাইয়া উঠিতেছিল, সারা অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, মনে মনে মাকে অনেক গালি দিলাম, কিন্তু নিষ্কৃতির উপায় কি?

বারম্বার ডাকিয়াও তিনি যখন আমার সাড়া পাইলেন না তখন হাত ধরিয়া টানিয়া তাঁহার দিকে ফিরাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিপদে পড়িলে অনেক সময় ভীরুও সাহসী হইয়া উঠে, আমারও তাহাই হইল; আমি চাপাগলায় বলিলাম,—"বার বার এমন ক'রে বিরক্ত ক'র্‌লে আমি মাকে বলে দেব!"

একটা অস্পষ্ট চাপা হাসির শব্দ আমায় জানাইয়া দিল যে আমার সে ভয় প্রদর্শন একেবারেই ব্যর্থ! নিরুপায় আমি তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া বিছানাটাকে দুইহাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া পাশ ফিরিবার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম; ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া তিনি অবশেষে নিদ্রায় মন দিলেন, আমিও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

পরদিন সকালেই অনেক কাজ আছে বলিয়া তিনি বিদায় লইলেন। মাতার শত অনুরোধ, এমনকি অশ্রু জল পর্য্যন্ত তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

তাহার পর পাঁচবৎসর মা জীবিতা ছিলেন। এই পাঁচবৎসরের মধ্যে আর একদিনও কিন্তু তিনি জামাই আনিবার কথা মুখে আনেন নাই;—তিনিও আমাদের কোন খোঁজ-খবর লয়েন নাই। মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া মা নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, আমরা দুইটী ভাই-বোন যে তাঁহার অভাবে কতদূর নিরাশ্রয় হইব তাহা মনে করিয়া দুই চক্ষে তাঁহার অশ্রু বহিতে লাগিল। দাদার হাতে ধরিয়া তিনি বলিলেন,—"সত্য, আমার মৃত্যুর পর তোরা জামাই বাড়ী গিয়ে থাকিস্, দেখিস্ বাবা তাকে যেন অনর্থক রাগিয়ে একটা বিভ্রাট বাধাস্ নি।"

মাতার মৃত্যুর পর আমরা তাঁহারই ইচ্ছামত গোপালপুরে গেলাম। আমার শাশুড়ী ছিলেন না, সংসারে শ্বশুর, স্বামী এবং এক বিধবা ননদিনী। আমাদের দেখিয়াই ননদিনী অভ্যর্থনা করিল,—"কি লা বড় লোকের ঝি, এতদিন পরে এ মুখো যে, ব্যাপার কি?"

দাদা, শ্বশুরের নিকট সকল কথা বলিল। প্রত্যুত্তরে তিনি মাত্র বলিলেন,—"বেশ থাক।"—পরে বুঝিলাম সংসারের কোন বিষয়েই তিনি বড় একটা থাকিতেন না, সারাদিন কলেই কাটিয়া যাইত। সংসারের যাহা কিছু করিবার তাহা আমার স্বামী ও ননদিনীই করিতেন।

সেদিন আর আমি বালিকা ছিলাম না; স্বামী চিনিতে আমার বিলম্ব হইল না। একটু একটু করিয়া কবে কখন যে তাঁহাকে সমস্ত প্রাণ দিয়া ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছিলাম তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না; কিন্তু সমস্ত প্রাণের ভালবাসা দিয়াও তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিলাম কই? একদিন তিনি আমায় সাধিয়া ছিলেন আমি পাষাণে বুক বাঁধিয়া তাঁহার কথাগুলা কানে তুলি নাই, দর্পহারী মধুসূদন তাই আজ আমায় সাধিবার পালা দিলেন। স্বামী কলে চাকরী করিতেন, সারাদিনের মধ্যে মাত্র দুই ঘণ্টা বাড়ীতে থাকিতেন অবশিষ্ট সময়টা কাজের মধ্যে কাটিত। আবার অনেকদিন রাত্রেও বাড়ী আসিতেন না, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "ওবার টাইম্" কাজ

হবে। এই "ওবার টাইন্" কাজটা যে কি তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না। একদিন ননদিনীকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছিল,—"বৌয়ের চাঁদ মুখ দেখ্‌লে ত' পয়সা আস্‌বে না, রেতে খাট্‌লে দেড়া রোজ আস্‌বে।" তাহার পর আর কোনদিন তাহাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই।

মাস ছয়েক পরে কিন্তু এই "ওবার টাইন্" কথাটার পরিষ্কার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। সেদিন রবিবার। শনিবার রাত্রে "ওবার টাইন্" কাজের জন্য স্বামী বাড়ী ছিলেন না। সকালে জনকতক লোকে "পাঁজা কোলা" করিয়া তাঁহাকে বাড়ী লইয়া আসিল; সর্ব্বনাশ মাথা তাঁর ফাটিয়া গিয়াছে—অত্যধিক রক্তপাতে একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, অন্তরআত্মা আমার শুকাইয়া গেল। শুনিলাম, গুণ্ডারা—কুপথের সঙ্গী তাঁর—নেশার ঝোঁকে তাঁর এ দশা করিয়াছে।

দিনরাত্রি সমান করিয়া, আহার নিদ্রার কথা ভুলিয়া আমি তাঁহার সেবা করিলাম; একটু একটু করিয়া তিনি সারিয়া উঠিতে লাগিলেন, আমি তাঁহাকে হাতে ধরিয়া সাধিলাম, পায়ে ধরিয়া কাঁদিলাম,—"ওগো, আর তুমি এমন কাজ ক'র না!—আর কোথাও যেও না।"

আমার হৃদয়-শোণিত তুল্য অশ্রুরাশি বোধহয় তাঁহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিল, কিয়ৎক্ষণ আমার দিকে নীরবে চাহিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন—"আচ্ছা, এবার থেকে ভাল হ'তে চেষ্টা করব। কিন্তু মতি, আমার এ অধঃপতনের কারণ কে জান?—তুমি! তুমি ইচ্ছে কর্‌লে একদিন আমায় স্বর্গের দেবতা কর্‌তে পার্‌তে কিন্তু তা না ক'রে আমায় নরকের কীট ক'রে তুলেছ!"

বিস্ময়ে দুঃখে, মর্ম্মবেদনায় অন্তর আমার হাহাকার করিয়া উঠিল। আমার স্বামীর অধঃপতনের কারণ আমি! হা ভগবান! এ কি মর্ম্মন্তুদ কথা! এ কি বিষের জ্বালা অন্তরে আমার জ্বালিয়া দিলে!

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন—"বিশ্বাস হ'চ্ছে না কথাটা? বোধহয় বুঝ্‌তে পার নি?—আচ্ছা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। সেই বছর-কতক আগে একবার তোমাদের বাড়ী গেছ্‌লুম মনে আছে মতি?—সে রাত্রের কথাগুলো কি মনে করিয়ে দেব? তখন আমি ভাল-ছেলেই ছিলুম; যৌবনের প্রথম সমাগমে অন্তর তখন আমার উচ্ছ্বসিত—পরিপূর্ণ! সেদিন সেই উচ্ছ্বাসিত হৃদয়ের প্রেমের শূন্য-সিংহাসনে তোমাকেই বসাতে চেয়েছিলুম—সেদিন যদি অমন ক'রে লাথি মেরে দূরে সরে না যেতে·········যদি ব'সতে মতি, যদি···ওঃ! তা হ'লে আজ আমার এমন দশা হবে কেন? হতভাগিনী আপনার হাতে তুমি তোমার সুখের মূলে কুঠারাঘাত ক'রেছ—দোষ আমার নয়,—দোষ তোমার। পাঁচ বছর পরে মেঘ না চাইতে জলের মত তুমি যখন আপনি এসে দেখা দিলে তখন আমি শূন্য হৃদয়ের হাহাকার—যৌবনের উদ্দাম-লালসা তৃপ্ত করবার জন্যে নরকের পিচ্ছিল পথে অনেক অগ্রসর হ'য়েছি—তখন আর ফের্‌বার উপায় ছিল না, তাই সে চেষ্টাও করি নি।"—একসঙ্গে অনেকগুলি কথা বলিয়া সে অবসন্ন হইয়া পড়িল।

[illegible]সিয়া বসিয়া আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম, সেদিনকার সে দোষের জন্য আমি কত দায়ী, কিন্তু কে আমার কথার উত্তর দিবে? দশবৎসরের বালিকার অন্তরে স্বামীর জন্য কতটা স্নেহ প্রীতি প্রেম জাগিতে পারে? দোষ কার? শুধুই কি আমার?—অথবা সমাজের, অথবা—অথবা আমার অদৃষ্টের, কে বলিয়া দিবে?

সেইদিন আমি রুগ্ন স্বামীর পদপ্রান্তে বসিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, একদিন হেলায় যে সুখের মূলচ্ছেদ করিয়াছি আজ হইতে আপনার সমস্ত অস্তিত্ব স্বামীতে [illegible]লাপ করিয়া দিয়া সেই সুখ ফিরাইয়া আনিব।

তাহার পর পাঁচ ছয় বৎসর কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে শ্বশুর ও ননদিনী সংসার হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। এই দীর্ঘকাল আমি প্রাণপণ যত্নে আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছি, কিন্তু হায়, যে তরুর একবার মূলচ্ছেদ হইয়াছে, তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করা দুরাশা মাত্র! আমার চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই, কিন্তু তথাপি নিরাশ হই নাই; প্রাণ ভরিয়া ডাকিলে ভগবানকে পাওয়া যায়, আর আমি আমার উন্মুখ হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা দিয়াও আমার স্বামীকে আমার করিতে পারিব না?—মন বলিয়াছে অবশ্যই পারিব, তবে সেটা বোধহয় সময় সাপেক্ষ, যতদিন না প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয় ততদিন তাহা হইবে না।"

মতির কাহিনী শুনিয়া মনটা আমার কেমন হইয়া গিয়াছিল; বলিলাম "ঠিক্ মতি, তোমার মত সতীকে স্বামী পেতেই হবে, তা না হ'লে সংসারে ধর্ম্ম ব'লে কিছু থাকেনা যে।"

মতি বলিল "পেয়েছি মাই,—সত্যিই সে এখন দাসীকে চরণে স্থান দিয়েছে, কিন্তু তাকে পেতে অনেক হারাতে হয়েছে! দেখ্‌ছেন না এই ছেঁড়া ন্যাকড়া! এখন এই অবস্থা,—মাথা লুকাবার ঘর নাই—পেটে দেবার চা'ল মুঠি নাই, তবু ভাল সে-যে আমার প্রাণে বেঁচেছে!"

বলিলাম "কি হয়েছিল তার?"

মতি বলিল "কি আর হবে মাই,—সেই পাপের ফল—নানা অসুখ,—একেবারেই মানুষের বা'র হয়েছিল, সব বেচে কিনে, কত ঔষুধ-পত্র করে, তবে প্রাণ বাঁচ্‌ল। দেশের লোক দেশে থাক্‌লে এ অবস্থাতেও সুখ ছিল মা! তা-না সে বিদেশে বেরিয়ে পড়্‌লো,--যাবার কালে বলে গেল, "আর না মতি, এমন করে না খেয়ে মরা আর দেখ্‌তে পারা যায় না। দেশের লোকের বিশ্বাস আমি নিজ দোষে হারিয়েছি--বিদেশে না গেলে ভাত জুট্‌বে না।" মুখে কোন উত্তর দিতে পার্‌লেম না—চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে গেল। সে নিজ হ'তে চোখ মুছিয়ে বল্লে কাঁদ কেন,--চিঠি-পত্র সর্ব্বদা দেব—"কৈ—মাই—সে চিঠি ত আসে না! সে যে ছ' মাস গিয়েছে।"

বলিলাম 'একখানা চিঠিও পাও নাই!'

মতি মুখ তুলিয়া কহিল "পেয়েছিলাম মা—বাড়ী হ'তে গিয়ে—দু মাস পরে দশটা টাকা পাঠিয়েছিল—লিখেছিল—দু মাস পরে সে বাড়ী ফির্‌বে, আজ দু' মাসের কাছে চা'র মাস হয়ে গেল—তবু তার আর সংবাদ নেই,—পোষ্টমাষ্টার বাবু তখন ১০৲ টাকার একখানা নোট দিয়েছিলেন—সে খানা মা তেম্নি করে রেখেছি।"

আমি বলিলাম "কেন?—টাকা হাতে রেখে এত কষ্ট পাচ্ছ!"

তাহার চক্ষু অশ্রু পূর্ণ হইয়া আসিল সে বলিল "এ যে তার চিহ্ন মাই—সেটা নিয়েই বেঁচে আছি।"

বুকের ভিতর হইতে সে নোটখানা বাহির করিয়া বলিল "এই যে মাই,—তার নোট!"

অন্ধকার হইয়া—আসিয়াছিল। মতি বিদায় হইল। তাহার পরও প্রতিদিন মতিকে পত্রের প্রতীক্ষায় আসিতে দেখিয়াছি,—সে ডাকঘরে আসিলেই আমার সঙ্গে দেখা করিত,--তাহার নিরাশ হৃদয়ের হাহাকার ধ্বনির অংশী আমাকে সে করিয়াছিল—আমি তাহার জন্য অনুশোচনা করিতাম!

সহসা তাহার আগমন বন্ধ হইয়া গেল। এক দিন দু দিন করিয়া—সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলিয়া গেল তবু তাহার আর দেখা নাই—স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম "তার অসুখ!"

বড় ইচ্ছা হইত তাকে এক বার দেখিয়া আসি—বড় দূরে তার বাড়ী—যাইবার সুযোগ হইত না। এক দিন ডাকের পর স্বামী ছল্‌ছল্ নেত্রে বলিলেন, "এত দিনে তোমার সেই পাগলীর চিঠি এসেছে!"

আমি আগ্রহে অধীর হইয়া তাড়াতাড়ি বলিলাম "হতভাগী আর যে আস্‌তে পারে না—দাও তার চিঠিখানা এখনি পাঠিয়ে দাও—"

স্বামী বলিলেন "সে-যে চিঠি পাবার প্রতীক্ষায় আর নাই, সব সুখ-দুঃখের হস্ত এড়িয়ে চলে গেছে!—স্বামী তার লিখ্‌ছে—বাড়ী আস্‌ছে—কিন্তু যার প্রতীক্ষায় সে সব ভুলেছিল,—আজ তাকে ভুলেও সে পরপারে।"

স্বামী চক্ষু মুছিলেন, আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না—"আয় মতি—ফিরে আয়, স্বামী যে তোর বাড়ী ফিরছে।"

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিশ্ব-বীণা।

—:*:—

প্রকৃতি আজিকে শুধু সঙ্গীত-রূপিণী!—
ফুল্ল বসন্তের এই উজ্জ্বল উষায়
শুধু ধ্বনি, শুধু বাণী বিশ্ব-বিনোদিনী,
শত শত কলকণ্ঠ দিগন্তে মিশায়।

কত গান, কত তান, কত যে ঝঙ্কার,
কত সুর, কত লয়, কতই মূর্চ্ছনা
বনে বনে বংশীরব ভাসে অনিবার,
অনন্ত আকাশময় মধুপ-গুঞ্জনা।

ধ্বনিয়া উঠিছে প্রাণ সহস্র বীণায়;
প্রতিশিরা স্পন্দিতেছে স্বর্ণ-তন্ত্রী সম;
কোন্ বীণাপাণি আজি কোথা হ'তে গায়?
জাগে কি রে প্রতিধ্বনি হৃদিতলে মম,
সেই গীতে বিশ্ব কি রে মিলাইতে চায়
তাহার বীণার তান ছন্দ নিরূপম?

শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা।

বিদ্যারণ্য।

—:*:—

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান বিজয়নগর। কাল অপরাহ্ন, অম্বালিকা ও অলোকা কুটীর সম্মুখে দণ্ডায়মানা,
সম্মুখে রাজপথে জন-প্রবাহ প্রবাহিত। সকলেরই ত্রস্তভাব, সঙ্গে নারী,
শিশু এবং স্কন্ধে, পৃষ্ঠে ও মস্তকে বোঝা, হস্তে যষ্টি।

অম্বালিকা। ঐ দেখ্ অলোকা! এখনও তুই এ দেশ ছাড়্তে দ্বিধা কর্‌ছিস্? দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না, দু-চার দিনের মধ্যেই যে রাজধানী আবার শ্মশানে পরিণত হ'য়ে যাবে। দলে দলে নাগরিকগণ দাবানল ব্যাপ্ত বনভূমির ভীত পশুর ন্যায়, প্রাণ রক্ষার্থ পালাচ্ছে! চল, আমরাও এই বেলা ওদের সঙ্গে মিলিত হই।

অলোকা। (হাসিয়া) মায়ের আমার সর্ব্বদাই বিপদের ভয়। আমরা দুঃখী প্রাণী দিন-এনে দিন-খাই,—না আছে অঙ্গে অলঙ্কার, না আছে পেটরা ভরা টাকা, আমাদের আবার বিপদের ভয় কিসের মা? বিজয়নগর শ্মশানে পরিণত হ'তে বাকী কতটুকুই বা আছে? আর যদিই বা কিছু থাকে, তা সেটুকু পূর্ণ হোক্ না মা। আমাদের মত লোকেদের পক্ষে, রাজধানীর চেয়ে শ্মশান ত বেশী মন্দ বোধ হয় না? তবে অনর্থক ব্যাধ-বিতাড়িত পশুর মত পালাতে যাবো কিসের ভয়ে?

অম্বালিকা। কিসের ভয়ে? তুই জানিস্‌নে অলোকা, কচি মেয়ে তুই, বুঝ্‌বিনে। অরক্ষিতা অসহায়া নারীর কিসের ভয়! রাজপুতের মেয়েরা দলে দলে জ্বলন্ত অনলে ঝাঁপ দিয়ে যে ভীষণ জহর-ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, সে কি অর্থ-অলঙ্কার নাশের ভাবনায়? মহারাজের এক সন্তান-স্নেহাতুরা অভাগিনী রাণী ব্যতীত, অপরা এক ভাগ্যবতী মহিষী ও রাজকুলবধূগণ কিসের আশঙ্কায় পরাজয় সংবাদের মুহূর্ত্তে আত্মবলি প্রদান করেছিলেন? যে দেশে রাজা আছে, রাজার ন্যায় বিচার রূপ বাহু যুগল, অবলম্বন পূর্ব্বক প্রজা যেখানে আপদ হীন, আমরাও সেখানে আশ্রয় নিতে যাই।

অলোকা। মা কেন কে জানে, বিজয়নগর ত্যাগ করার কথায়, আমার বুকে যেন শেল বেঁধে। জানিনে, কেন মনে হয়, এইখানেই আমাদের প্রকৃত স্থান। এই যে দেশ ব্যাপি অরাজকতা শোণিত স্রোতে, অত্যাচারের স্রোত নদী স্রোতের মতই বয়ে যাচ্ছে। এর প্রতিবিধান চেষ্টা যেন মনে হয় আমাদেরি কর্‌বার কথা। বিপন্ন প্রজার হাহাকার, যেন আমার বুকের মধ্যে দিবারাত্র বিষাক্ত ছুরিকাঘাত করে, সে বিপদের প্রতিকার উপায় উদ্ভাবন করতে কেমন আমায় আদেশ দেয়। জানিনে এ শুধু আমার কল্পনা কি না! তথাপি আমি এই অনশন-ক্লিষ্ট দুঃস্থ প্রজাবর্গের প্রতি, কি যে অচ্ছেদ্য আকর্ষণ অনুভব করে থাকি, সে বন্ধন-পাশ কর্ত্তন করা আমার সাধ্যায়ত্ত নয়। আর কিছুই না পারি, একত্রে ওদের সঙ্গে তো কাঁদ্‌তেও পার্‌বো!

অম্বালিকা। [সভয়ে] ও মা! ও কথা বলোনা মা। দুঃখী অনাথার মেয়ে তুমি রাজ্যের প্রজার সুখ-দুঃখে তোমার আবার অংশ কিসের? এখনি কে কোথা দিয়ে শুন্‌বে! ও কথা আর মুখেও এনোনা। না মা! এত বড় বিপদের মাঝখানে আমি তোমায় রাখ্‌তে পার্ব্বোনা। চল, আজই আমরা এখান থেকে চলে যাই।

দয়ালরায়ের দল, শুন্‌ছি আজ সমস্ত সহর বিধ্বস্ত কর্‌চে। গৃহস্থের মেয়েরা পর্য্যন্ত নাকি তাদের কাছ থেকে অপমানের হাত ছাড়াতে পার্‌চে না।

অলোকা। দুঃখী হই, বা যা হই আমরাও ক্ষত্রিয়ের মেয়ে, ক্ষত্রিয় কন্যা নিজের ইজ্জত নিজে রক্ষা করতে পারবে না মা? কে কোথাকার একটা ক্ষুদ্র দস্যুর ভয়ে, চোরের মত লুকিয়ে বেড়াবো, না মা! আমি যাবো না।

অম্বালিকা। ওরে বোকা মেয়ে! ওই কচি হাতে তোর কত বল, বল দেখি! এক টুক্‌রা অস্ত্রও যে আমাদের কাছে নেই। দস্যুদলন দূরের কথা, একটা শৃঙ্গী নখী জন্তুকে বাধা দিবার সাধ্যই কি আছে? ভেবে দেখ্‌ দেখি কত বড় অরক্ষিত অসহায় আমরা! যা সামান্য কীট পতঙ্গাদির আত্মরক্ষার জন্য আছে; আমাদের তাও নেই।

অলোকা। [ক্ষণ পরে সহর্ষে] তবে এসো এক কাজ করি। সবটাই ভগবানের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে তাঁরই শরণাগত হই।

অম্বা। [অধীর ভাবে] ওরে না, না, ও সব কথা বলে, আমায় ভোলাতে চেষ্টা করিস্‌নে। আমি কাকেও আর বিশ্বাস করিনে। কেনই বা মর্‌তে এতকাল পরে আবার এই অভিশপ্ত বিজয়নগরে প্রবেশ করেছিলাম!

[অবসন্ন ভাবে উপবেশন]

অলোকা। মা! বিপদে অধৈর্য্য হ'তে নেই। এসো আমরা বিপদভঞ্জনকে ডাকি।

গীত।

বেহাগ।

সকল সুখে সকল দুঃখে সকল শোকে ভয়,
অশরণের শরণ তুমি যেন মনে রয়,আমার যেন মনে রয়॥
আমায় ডুবিওনা কো তুচ্ছ সুখে দুঃখ শীলা চাপিও বুকে,
কেবল ফিরিও নাকো লক্ষ্য থেকে, এইটুকু অভয়—দিও এইটুকু অভয়॥
সকল দিনে সবার মাঝে ছোট বড় সকল কাজে
যেন প্রাণের মধ্যে সদাই রাজে, অচ্যুত অক্ষয়॥
তোমার রূপ তোমার বাণী অমৃত নিলয়॥
বিপদ সেও তোমারি দান বিপদে আছে মহত মান,
তোমায় সঁপিতে যেন পারি হে প্রাণ, ত্যজিয়া মোহ ভয়।
যেন ওপদ স্মরি বুঝ্‌তে পারি, বিপদ কিছু নয়॥

[নেপথ্যে ঘোর কোলাহল অস্ত্র ঝন্‌ঝনা, আর্ত্তনাদ সহকারে নাগরিকগণের দ্রুত পলায়ন, পশ্চাতে সসৈন্য সর্দ্দার সেনা-নায়কের প্রবেশ।]

সেনা-নায়ক। রাজার হুকুম, যেখান হ'তে যেমন ক'রে হয়, আজকের মধ্যে, বিজয় নগরের অবশিষ্ট ধন রত্ন তাঁর ভাণ্ডার-জাত কর্‌তে হবে। এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, এই সারা রাজধানী বিপর্য্যস্ত করেও, যে সম্পত্তি লাভ কর্‌লেম, তা একটা ভিক্ষুকের পক্ষেই যথেষ্ট। একজন সিংহাসনাসীন ভূপতির পক্ষে কিছুই না! বিজয় নগরের আজ এমনি দুর্দ্দশা! এও তো একটা ভিক্ষুকেরই পর্ণ কুটীর দেখ্‌ছি। এখানেও তো তা'হ'লে বড়ই লাভের আশা! [অগ্রসর হওন]

অম্বা। [তাড়াতাড়ি উঠিয়া] অলোকা! অলোকা! ছুটে আয়, ওরে অভাগি! আর বুঝি তোকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌লেম্ না। [অলোকার হাত ধরিয়া গমনোদ্যত]

সে-না। (সম্মুখে আসিয়া সহর্ষে) কি সুন্দর! এই দাবাগ্নি দগ্ধ ভীষণ অরণ্য তুল্য বিজয় নগর মহা মরুভূমে একি মৃগতৃষ্ণিকা! ভাল! এই রত্ন আহরণ করেই রাজার ক্রোধ-বজ্র হ'তে আজ আত্মরক্ষা করি। [অলোকার প্রতি] কারে ভয় কর্ব্বার কোন কারণ নেই। এসো! আজ হ'তে তোমার এই দারুণ দারিদ্র-ক্লেশ ঘুচিয়ে দেবো। যেথানের যোগ্য তুমি, সেইখানেই তোমায় স্থাপন কর্ব্বো। [হস্ত ধারণ]

অম্বা। [গভীর আর্ত্তনাদে] অলোকা! অলোকা! বাছারে আমার! অবশেষে এই তোর ভাগ্যে ছিল? এও আমার ভাগ্যে ছিল? এই সুদীর্ঘ কাল পক্ষ-পুটে ঢেকে নিয়ে অসহায় ক্ষুদ্র পক্ষী শাবকটীর মতই যে তোকে দুরন্ত ব্যাধ হস্ত হ'তে রক্ষা করে এসেছিলেম। এত দিনের সকল ক্লেশ, সব অপমান, সমুদয় নির্য্যাতন আমার বৃথা হ'লো! এই না তুমি বিপদভঞ্জনকে ডাক্‌ছিলি! এই না বল্‌ছিলি নিশ্চয় তিনি সকল বিপদ হতে রক্ষা কর্‌বেন? ওরে মা আমার, কই তোর বিপদভঞ্জন বিপদে সহায় হলেন? এখন কোথায় তিনি? এই দয়া-লেশহীন নির্ম্মমকেই লোকে এত বড় নির্ভরতা দান করে?—কেন করে?—কেন ডাকে? তিনি শক্তিমানের সহায়—অনাথ অভাগার তিনি কেউ নন! তবে কেন তাঁর নাম অনাথনাথ! এ নাম নিতে তাঁর কিসের অধিকার, যদি এ নামের মর্য্যাদা তিনি রক্ষা করেন না!

[শিবিকা লইয়া সৈন্যগণের পুনঃ প্রবেশ।]

সে-না। [অলোকার হস্তাকর্ষণ পূর্ব্বক] এসো, এসো! বিজয় নগরের অবশিষ্ট এবং শ্রেষ্টরত্ন! এ হীন কুটীর তোমার পদ স্পর্শেরও যোগ্য নয়।

অলোকা। [হস্ত মুক্ত করনের নিষ্ফল চেষ্টা সহকারে] তথাপি আমি জানি, তুমি বিপদ-ভঞ্জন, অনাথার একমাত্র আশ্রয় স্থল। মা, তাঁকেই আশ্রয় করো, নিশ্চয়ই তিনি আমাদের সর্ব্বাপদ বিনির্ম্মুক্ত কর্‌বেন।

সে-না। হ্যাঁ হ্যাঁ কর্ব্বেন বই কি! এখন তুমি ভালমেয়েটির মত শিবিকারোহণ কর দেখি! [স্বগতঃ] এরও রূপ কম নয়! তবে বয়েসও হয়েছে, আর নেহাতই প্যান্‌পেনে। উঃ, কি রূপের জ্যোতিঃ এই মেয়েটার! আর তেমনি কি সাহস! মনে একতিল ভয় ডরও নেই! সরর্দ্দারকে এমন জিনিসটী দিতে মন উদাস হয়ে যায়। অথচ লুণ্ঠন দ্রব্যের অল্পতায় বেটা যখন সাপের মত ফুস্‌'তে থাক্‌বে, তখন থামাবোই বা কি দিয়ে? যাক্ বরাতে নেই! ডুবুরি সমুদ্রে নেমে মুক্তা আহরণ করে, বানরের গলায়ও তার হার কখনও কখন উঠেছে বলে শোনা গেছে; তথাপি তার নিজের ভাগ্যে জুটে নি।

অলোকা। আমায় তুমি কেন এমন করে মার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছ? ধন-রত্ন মণি-মাণিক্যাদিই তো চিরদিন দস্যু-তস্করের লুণ্ঠনীয় বলে গণ্য ছিল, নারী মাংসে তোমাদের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হবে দস্যু?

সে-না। (হাসিয়া) মণি-মাণিক্য তো যত্র তত্রই পাওয়া যায়, এ অমূল্য নিধি প্রাপ্তি দৈবায়ত্ত। তা ভিন্ন আমাদের দস্যু বলে যে আপনি ভ্রম করেছেন, সেবিষয়েও আমার উচিৎ যে, আপনার সে ভ্রম নিরসন করে দেওয়া। আমরা দস্যু নই, রাজ কর্ম্মচারী, আপনাকে আমরা আমাদের রাজার কাছে উপহার দিতে নিয়ে যাচ্ছি। বুঝেছেন তো? রাণী হ'তে চলেছেন। (হাস্য)

অলোকা। বুঝ্‌তে পারি নি দস্যু! ক্ষমা করো।

সে-না। হা-হা-হা তাতে কি তাতে কি ; ক্ষমা কিসের ? ক্ষমা আমি পূর্ব্বেই করেছি। এখন তুমি এসো !

অলোকা। বিপদ ভঞ্জন। রক্ষা করো, রক্ষা করো,—অনাথার নাথ। [প্রাণপণে বাধা দান] সত্য সত্যই কি তবে আমায় এত বড় বিপদ দিলে ? দয়া করো তুমিও তো মানুষ, আমার মার মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখো !

সে-না। এই সুরক্ষিতই হলে যে,—তোমার সাক্ষাতে কি তোমার মা চক্ষে দেখ্‌বারও যোগ্য ? কত কেলে সত কেলে বুড়ী তায় কাঁদুনের একশেষ ! [অলোকাকে শিবিকায় উঠাইয়া সকলের প্রস্থান]

অম্বা। পৃথ্বীশ্বর ! আজ কোথা তুমি ? এ দৃশ্য দেখ্‌তে পার্ব্বো কি ?

[মূর্চ্ছা]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান হাম্পি, ভুবনেশ্বরী মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ। প্রতিমা সম্মুখে পূজা-পরায়ণ বিদ্যারণ্য।

বিদ্যারণ্য। ভ্রান্তি-মদ-মত্ত, অভাগাদের ভ্রান্তি দূর করে, তাদের দিব্য-নেত্র প্রদান কর জননি ! তোর এই সাধন-ক্ষেত্র পৃথিবীর পূণ্যভূমি হ'তে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ বিতৃষ্ণা, ঘুচিয়ে দিয়ে, এই কর্ম্মভূমিকে আবার সেই ধর্ম্মভূমিতে পরিণত করে দে ! দ্বেষ হিংসা কলহ অসূয়া ভুলে গিয়ে সেই সনাতন ঋষিযুগের ন্যায়, উদার মহৎ চিত্ত লাভ করে, তারা এই ভাব যথার্থরূপে হৃদয়ে পরিপোষণ করতে সক্ষম হোক্।

সর্ব্বেত্র সুখিনঃ সন্তুঃ সর্ব্বে সন্তুঃ নিরাময়াঃ।
সর্ব্বে ভদ্রানি পশ্যন্তি মা কশ্চিৎ দুঃখমাপ্নুয়াৎ ॥

[সহসা দেবী মূর্ত্তির চারিদিকে অত্যুজ্জ্বল অলোকমণ্ডলীর প্রকাশ]

বিদ্যারণ্য। এ কি ! এ যে সেই দিনেরই মত শতকোটি গ্রহরাজ বিনিন্দিত অতুল জ্যোতির্ম্মণ্ডলীর মধ্যবর্ত্তিনী হাস্যাধরা, অভয়-বর করা, জননীর সন্দর্শনে জন্ম-জন্মান্তরের অনাদি কলুষরাশি বিধৌত হয়ে, হৃদয়ে অতুলনীয় শান্তি রাজ্যের সংস্থাপন ঘট্‌লো !

[আলোকমণ্ডলীর মধ্যে ক্রমশঃ শতদল পদ্মোপরি, রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তির আবির্ভাব]

বিদ্যা। মা ! মা ! মা ! [সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত]

দেবী। বিদ্যারণ্য !—পুনর্জ্জাত মাধব ! কাল পূর্ণ হয়েছে। তুমি সংসার-ধর্ম্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করায়, নবজীবন লাভ করেছ। সুতরাং গার্হস্থ্য জন্মের পক্ষে ইহাই তোমার পুনর্জ্জন্ম ! এক্ষণে আমার বরে তুমি এই নষ্ট-রাজ্য পুনরুদ্ধার ও এই স্থানে ধর্ম্ম দ্বারা সংগঠিত শান্তিময় মহাসাম্রাজ্যের সংস্থাপন কর। দেশের এ মহাঅশান্তি বিদূরিত কর্ব্বার শক্তি একমাত্র তোমাতেই সম্ভবে। দেশবাসীর এ অজ্ঞান জড়তান্ধকার নাশ পূর্ব্বক, বিচ্ছিন্ন বিরোধ ভাব যুক্ত দেশবাসীগণের সম্মিলন-সূত্র বন্ধন করতে, বিমুখী দেশ-লক্ষ্মীকে ফিরিয়ে আন্‌তে সর্ব্ব-ত্যাগীর মহৎ হৃদয়ের আবশ্যক। এ মহাপূজার পূজারিত্ব, মহাযজ্ঞের হোতৃত্ব—ক্ষুদ্র প্রাণের দ্বারা সম্ভব নয় ! তুমিই এ মহাকার্য্যের যোগ্যপাত্র। কার্য্যারম্ভ করো, আশীর্ব্বাদ করছি সফল হবে। যদি আর কিছু তোমার কার্য্য থাকে, তাও গ্রহণ করো।

বিদ্যা। [যুক্ত করে] মা, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনি ! তোমার দর্শনেই আমার চিত্ত হ'তে সকল কামনা বীজের ধ্বংস হয়ে গেছে। আর তো কিছুই কার্য্য নেই। আর কি চাইবো মা ! যা চেয়েছিলাম তাও দিয়েছ। যা না চেয়েছিলাম, তাও তো মা, দিতে তুমি বাকি রাখ নি।

দেবী। বৎস! আমি যখন এসেছি, তখন সামান্য কিছুও তোমায় নিতে হবে। এই যতীদেহে তোমার সহস্র রাজৈশ্বর্য্য প্রাপ্তি লিখিত আছে। বল! কোথায় কি ভাবে, তা তুমি গ্রহণ কর্‌তে চাও!

বিদ্যা! ধন দেবে মা! তবে এই ধন-ধান্য-হীন-দেশে সুবৃষ্টি এবং স্বর্ণ বৃষ্টি হোক্। এ দেশ, আবার ধনে-ধর্ম্মে, জ্ঞানে ও শক্তিতে উন্নততর হয়ে উঠুক।

দেবী। তথাস্তু! [অন্তর্দ্ধান]

বিদ্যারণ্য। [পুলক নিমিলিত নেত্রে] "তুমিই এ মহাভারের যোগ্য পাত্র!" আহা! করুণাময়ী! ওই কথাগুলিতে, এ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সন্তানের প্রতি তোর কি অসীম স্নেহই সূচিত হলো মা! মাগো! এই দৃষ্টিতেই বুঝি পার্থিব জননী অন্ধ পুত্রকেও পদ্মলোচন আখ্যায় আখ্যায়িত ক'রে থাকেন? তা' না হ'লে—এ অযোগ্য অভাজনকে তোর এত বড় যোগ্য কেন বিবেচিত হলো, বল দেখি! [সহাস্যে] তুই বড় সেয়ানা বেটি! তোর চালাকি আমি বুঝেছি। ছোট ছেলেরা দুধ খেতে আব্দার ধর্‌লে, মায়েরা যেমন তাদের ভুলিয়ে, কাজ নেবার জন্য বলেন—'আমার সোনার গলায় কেমন বান ডাকে, এখনি সব দুধ কোথায় চলে যাবে?' শিশু সেই প্রশংসায় গলে, যথার্থই কণ্ঠে বান ডাকিয়ে ফেলে। এও বোধ করি তেমনি প্রশংসার স্তোকে, উৎসাহ দিয়েছিস্! তা' বেশ করেছিস্ মা! মার কাছে উৎসাহ না পেলে, কি ছেলে কোন বড় কাজে অগ্রসর হতে পারে? মায়ের আশীর্ব্বাদের বল যে, দেবতাদেরও হরণ কর্‌বার শক্তি নেই। যে অঙ্গে মাতৃ হস্তের রক্ষা কবচ বাঁধা থাকে, তা' অস্ত্রেরও অভেদ্য। দুর্য্যোধন অধর্ম্ম বশতঃ বুদ্ধিহারা হয়ে নিজ শরীরের অংশতরকে মাতৃ-হস্তের লৌহ বর্ম্মে বঞ্চিত না করলে, তাকে নষ্ট করা শত ভীমেরও অসাধ্য ছিল। [চিন্তিত ভাবে] মায়ের আদেশ, আশীর্ব্বাদ, গুরুদেবের কৃপা ও উপদেশ, এই দুই অক্ষয় ধনে ধনী হয়ে ভিখারী মাধব আজ প্রবল প্রতাপ বিপক্ষ পক্ষের সম্মুখীন হতে চ'ল্লো! অধর্ম্ম, অত্যাচার, দারিদ্র, অজ্ঞতা ও স্বার্থান্ধকারের সহিত যুদ্ধ করে, তাকে এই মহাশ্মশানে প্রতিষ্ঠা করতে হবে—ন্যায়, ধর্ম্ম, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও আত্মত্যাগ! মূর্খ বুভুক্ষু জনগণ নিজ নিজ স্বার্থান্বেষণে ব্যাপৃত হ'য়ে—নিজের মাতৃগর্ভ জাত সোদর অথবা সেই একই প্রকার সম্বন্ধে সম্বদ্ধ মানব, ভ্রাতৃগণের বক্ষ বিদীর্ণ করে, ভীমের ন্যায় রুধির পান কর্‌তেও কুণ্ঠিত নয়। অধীনতার অবশ্যম্ভাবী ফল, এদের মধ্যে ইতি মধ্যেই ফলেছে। একজন অপরকে আপনার সঙ্গে তুল্যাংশে অভাব-অত্যাচার সহ্য কর্‌তে দেখ্‌লে বরং তার প্রতি কথঞ্চিৎ সমবেদনা অনুভব কর্‌তে পারে, কিন্তু কাকেও নিজাপেক্ষা শ্রীমান্ বা সুখী দেখা সহিতে পারে না। ন্যায়, সত্য, সৎসাহস, ত্যাগ, শ্রদ্ধা ও একতা প্রভৃতি সমুদয় সাত্ত্বিক ভাব এ দেশ হ'তে বিদূরিত হয়ে, এদের স্থান আজ রজঃ ও তম পূর্ণ-বিক্রমে রাজত্ব করছে! অন্যায়, আলস্য, অসত্য, অসূয়া, ভীরুতা, ক্ষুদ্রানুকরণ ও পরশ্রীকাতরতা মাত্র বিরাজ কর্‌ছে। বাণিজ্য বন্ধ বণিক—দেশ-ত্যাগী! শিল্প ধ্বংস প্রাপ্ত—শিল্পী বিলুপ্ত! বিদ্যা অপ্রচারিত-প্রচারকের অভাব! উৎসাহাভাবে আর এ দেশে বিদ্বান জন্মিতে পারে না। যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও গুণগ্রাহীর অভাবে দেশত্যাগী। এই সর্ব্বদৈন্যের মাঝখানে, সর্ব্বৈশ্বর্য্যের উদ্বোধন কর্‌তে হবে। অতি কঠিন! অতি দুরূহ!! [সোৎসাহে] কিসের কঠিন! কেন দুরূহ? নিশ্চয়ই এই তামসিকতা অপসারিত এবং সত্ত্ব-রজের আবির্ভাবে এ দেশ পুনরপি ধন্য হবে! যে মহামহিমময়ী বিশ্বেশ্বরীর শক্তি কণিকামাত্র হয়েও এ জড়-জগতের রাজাধিরাজ রূপে সবিতা এই প্রকাণ্ড বিশ্বকাণ্ড অলঙ্ঘ্য নিয়ম শৃঙ্খলায় পরিচালিত করছেন, সর্ব্বশক্তির অণুকণা মাত্র লাভে এই জাতবেদাঃ অগ্নি, এই সর্ব্বত্রগঃ বায়ু, প্রভৃতি মহাভূত সকল অসীম শক্তিমান্, সেই শক্তির অংশ যার মধ্যে আছে, যত ক্ষুদ্রই হোক্, সে কি-না কর্‌তে সক্ষম? আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রামই যদি কেবল মাত্র আমাদের সম্বল হতো, তবে শারীর বলে প্রধান সর্ব্বাপেক্ষা পশু প্রকৃতি পর্ব্বতারণ্য

বাসী অসভ্যগণই মানব সমাজের প্রভু হতো। কিন্তু তা হয় না। জাতীয় দুর্ব্বলতা শুধু শারীর বল হানীর উপরই নির্ভর করে না। আর করিলেও সে বল হানী আবার নির্ভর করে নৈতিক চরিত্র-বলের উপরেই। যে জাতির মধ্যে যতখানি ধর্ম্ম-জ্ঞান:ইন্দ্রিয় সংযম, পরহিতৈষিতা, স্বজাতিপ্রেম, স্বধর্ম্মভক্তি, দয়া, সত্য, ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ন্যায়ের সমাদর, সংরক্ষিত হয়, সে জাতিই সকলের শীর্ষস্থানে অধিকার স্বয়ং জগদ্বিধাত্রীর নিকট হ'তে প্রাপ্ত হ'য়ে থাকে। নির্ম্মল আধারেই চিৎপ্রতিবিম্ব সমধিক প্রকাশমান, যেখানেই ঐশী শক্তির সমধিক আবির্ভাব, জয় শ্রীও সেইখানেই চির অচঞ্চলা! তবে এ ভাবনা কেন? মায়ের নিজ মুখের আদেশ পেয়েছি, কিসের ভয়? এখন—এসো তুমি! হে বিশ্বকর্ম্মন্! এ দেশের বিধ্বস্ত শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান, ধর্ম্ম, পুনরানয়নে তোমার বাহু আমার সহায় হোক্। তুমি আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে,—হে আমার হৃদিস্থিত হৃষীকেশ! আমার বুদ্ধিকে সফলতার দিকে পরিচালিত কর।

"জীবানাস্তু গতির্নিত্যং নিম্নগাস্তি নিসর্গতঃ।
পতিতোদ্ধরকস্তঞ্চ স্মারয়ামি ততোঽভিধাম্॥
মোহ নিদ্রা তমো ব্যাপ্তে সদার্য্য হৃদয়ে যথা।
জ্ঞানর্জ্যোতির্বিকাশঃস্যাজ্ জ্ঞানমূর্ত্তে তথা কুরু॥
আধ্যাত্মিকং সার্ব্বভৌমমেকদেশত্ব বর্জ্জিতং।
সাত্বিকং জ্ঞানমার্গেষু জ্ঞানাত্মনঃ প্রকাশয়॥
নিজানাঞ্চির ভক্তানাং ভক্তচিত্তৈক সদ্মগং।
হৃৎকপাটমপাবৃত্য রম্যাং মূর্ত্তিং প্রকাশয়ঃ॥
যেনৈতেত্বামবিস্মৃত্য হৃষিকেশ প্রবোধিতাঃ।
ন ভবেয়ু স্বার্থপরা ভূয়োপোন্দ্রিয় লোলুপাঃ॥
তপোমূর্ত্তে তৎ প্রভাব বিস্মৃত্যা দুর্গতামপি।
সন্তু তৎ কৃপয়াঽকাম ব্রতা দ্বন্দ্ব সহিষ্ণবঃ॥
ব্যবহার রতাশ্চাপি প্রবৃত্তিঞ্চানুগামিনঃ।
সত্যেন লোকা বিজিতা ভবন্তীতি মতং স্থিতম্॥
নাচ্যুতা মোক্ষ পদতো যে বিপ্রাস্তেঽধুনা প্রভো।
বিচলন্তোঽবলোক্যন্তু সত্যাত্মন কিন্নরক্ষসি॥
অতোঽত্যহপশ্য ভগবন্ তেজোরূপো বিপদ্দশাম্।
নিস্তেজস্কা নিরুৎসাহা রুগ্না জাতা জনাঃ ইমে॥
তস্মাদ্বৈর্য্য মনঃ প্রাণেন্দ্রিয় শক্তি নিয়ামকম্।
বিতীর্য্যাস্তু পুনঃস্তার্য্যাস্তেজো বর্দ্ধয় বর্দ্ধয়॥
প্রচীয়তাঞ্চ বাণিজ্যং সর্ব্ব বৃত্তি নিবন্ধনম্।
যেনৈতদ্ ভারতং ভূয়ো লীলাভূমির্ভবেত্তব॥
সাক্ষাৎ যাতা বিশ্বকর্ম্মন্ শিল্পবিদ্যাত্বধোগতিম্।
করার্পণেন ভগবন্! নিজাং স্বত্বা সমুদ্ধর॥

অতোঽধুনা স্বহৃকুস্য গীতোপনিষদি প্রভো !
কর্ম্মযোগস্য বিজ্ঞানপ্রসারস্তু মহীতলে ॥
অকুণ্ঠং সর্ব্ব কার্য্যেষু ধর্ম্ম কার্য্যার্থমুত্তম্ ।
বৈকুণ্ঠস্য হি যদ্রূপং তস্মৈ কর্ম্মাত্মনে নমঃ ॥

তৃতীয় দৃশ্য ।

—§*§—

স্থান হাম্পি, ভুবনেশ্বরী মন্দিরের সম্মুখ । একজন নাগরিকের ক্লান্ত ভাবে প্রবেশ ।

নাগ । উঃ, সারা পথটা একরকম দৌড় কাটিয়া এনেছে ! ঘামে কাপড়চোপড় ভিজে সপ্ সপ্ কর্‌ছে, পা দুটোতেও আর পদার্থ নেই । এইখানেই একটু ব'সে হাঁপ্ জিরিয়ে নিই । [মন্দির চত্বরে উপবেশন] বা ব্বা ! এর নাম রাজা ! কিছুদিন এই রকম রাজা-রাজা খেলা হ'তে থাক্‌লেই, এ রাজ্যের নাম পর্য্যন্ত তুঙ্গভদ্রার জলের তলায় তলিয়ে যাবে । আঃ বেশ হয়, বেশ হয়, তাই যাক্ না, বাঁচা যায় ;—একিবারে হাঁড় জুড়িয়ে গিয়ে বাঁচা যায় । বিজয়নগরের নাম, এ পৃথিবী থেকে লোপ্ হয়ে যাক্, আর এমন দেশের প্রজা, হয়ে যারা মরণের অভাবেই শুধু বেঁচে আছে—সঙ্গে সঙ্গে একটা কোন রকম বিপ্লবে —এই ধরো মহামারি ; উঁহুঃ—মহামারি তো অর্দ্ধাহারের সৃষ্টি হয়ে পর্য্যন্তই বছর বছরই লেগে আছে । তাতে হুড় হুড় করে কমে বটে, কিন্তু একেবারে শেষ হয় না । ভুমিকম্প আর জলোচ্ছাস এই দুটী ভগ্নিতে একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে এসে, একবার এই অভাগা রাজ্যটাকে আক্রমণ করুক । এই অত্যাচারিত, আত্মবিরোধ-দুর্ব্বল, ঘৃণ্য বিজয়নগর বাসীর সঙ্গে হতভাগ্য বিজয়নগরের নাম, বিস্মৃতি সাগরের অঙ্কাশ্রিত হোক্ । হায়, মহারাজ !

(একটী শিশুকক্ষা নারী সঙ্গে মোট ঘাড়ে ও অপর একটি বালিকা সহিত, আর একজন নাগরিকের অধিক্লিষ্ট ভাবে প্রবেশ)

বালিকা । (কাতর স্বরে) বাবা ! একবার কোলে নাও না । আর যে আমি চল্‌তে পার্‌ছিনে । আমার পা যে কাঁপ্‌চে । আর এম্নি তেষ্টা পেয়েছে !

পিতা । (ধমক দিয়া) "কোলে ন্যাও, কোলে ন্যাও,"—কেমন করে কোলে নিই, বল না ? দেখ্‌ছিস্‌নে, একটা সাত মুনে বস্তা আমার কাঁধে, চল্ চল্ ফুর্ত্তি ক'রে চ'লে চল । এ রাজ্যের সীমানার মধ্যে আর দাঁড়ান নয় ! একেবারে দেশের বা'র হয়ে তবে মুখে জলদিস্ তখন ।

(বালিকা পিতার আকর্ষণে চলিতে গিয়া, অস্ফুট কাতরোক্তি করিয়া পথের উপর পড়িয়া গেল । পিতা সক্রোধে ঝাঁকানি দিয়া তুলিতে গেলে, জননী সসব্যস্তে ছুটিয়া আসিল)

মাতা । আহা হা, বাছারে ! ওঠ মা ওঠ, আয় দুজনে এইখানে একটু, বসি । হা ভগবান ! কপালে এত লেখাও ছেল । এসো না গা ! তুমিও তো হাঁপাচ্ছো, এইখানে মায়ের মন্দিরের পাশে একটু বসে জিরিয়ে নাও না।

(চত্বরাভি মুখে অগ্রসর হওন)

দ্বি·নাগ । (সরোষে) আহম্মক মাগী কোথাকার । এক্ষুণি নতুন রাজার সেনারা এসে, এত কষ্টে যা কিছু বাঁচিয়ে এনেছি, সব লুটে নিয়ে যাক্ । তা যদি যায়, তা হ'লে তো মাগীদের ঐখানে ফে'লে, আমিও যে দিকে

ছু' চক্ষু যায়, বিরাগী হয়ে একদিকে চলে যাবো। রাত পোহালে এতগুলো রাক্ষুসে পেট ভরাবো কি দিয়ে। তখন তো কন্যেপুত্তুর আবার নাকে কাঁদ্‌তে বস্‌বে,—বাঁবা', ক্ষিঁদে পেয়েছে!—ব্যাস্ তখন বাবার মাথা!

নারী। [কাতরস্বরে] ওগো! আর যে আমরা পার্‌চিনি, কি করি!

প্রঃ-নাগ। (উঠিয়া আসিয়া) বিশ্বেশ্বর! স্ত্রী হত্যা করিস্‌নে ভাই! বৌমাকে খুকিকে একটু দম নিতে দিয়ে, নিজেও একবার পা-টা মেলে নে। তার পর যা আছে কপালে! এই দেখ্! আমি ও এই অবধি এসে, ব'সে পড়েছি। আর পেরে উঠিনি।

[সকলের উপবেশন]

দ্বি-নাগ। আঃ—

বালিকা বাবা! জল।

দ্বি-নাগ। [মুখ খিঁচাইয়া] যা যা, আর জল খায় না। এ যে দেখ্‌চি খেতে পেলে শু'তে চায়।

নারী। [মিনতি করিয়া] আহা! অমন করে বকোনা। একটু খুঁজে দাও না। মরে যাবে যে।

দ্বি-নাগ। [উদ্ধত স্বরে] যায় যাবে, আপদ যাবে, বলে 'আপনি শু'তে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাক!' নিজেদের একটা দাঁড়াবার ঠাঁই নেই, আবার সঙ্গে সাত গণ্ডা ছেলে মেয়ে, গলায় কলসী বেঁধে অগাধ জলে ঝাঁপ দেওয়া!

নারী। [মুখে কাপড় ঢাকিয়া পিছন ফিরিল]

বালিকা। [শুইয়া পড়িয়া] ওমা, মা! একটু জ—ল!

নারী। [উঠিয়া] যাই দেখি, কোথা জল মেলে দেখি। (গমনোদ্যতা)

প্রঃ-নাগ। উঠিয়া এই যে আমিই যাচ্ছি।

[প্রস্থান ও দেবদাসী সহ পুনঃ প্রবেশ।]

এই জল নাও বাছা! এঁরা জল এনেছে।

মাণ্ডবী। তুমি জল খাবে? এই নাও [পাত্র প্রদান]

নারী। আহা, কে মা তোমরা করুণাময়ি! এই মন্দিরের দেবতা বুঝি! [জল পান করাইয়া] বাঁচালে মা, ছেলে মেয়ে ছুটী কাল থেকে খেতে পায়নি, তার ওপর এই পথখানি ওই ছুধের বাছা হেঁটে এসেছে। আর কি পারে মা?

মাণ্ডবী। আ-হা-হা, হে মা ভুবনেশ্বরি! কবে তোমার কৃপা হবে মা! ঠাকুরমশাই কি এখনও মাকে প্রসন্না কর্ত্তে পার্‌লে'ন না! উর্ম্মিলা! তিনি তো মহাযোগী, তাঁর তপেও যদি মা প্রসন্না না হন, তবে আর কিসে হবেন?

(উন্মাদিনী বেশে অম্বালিকার প্রবেশ)

অম্বা। মা কিসে প্রসন্না হবেন? হবেন-হবেন,—এইবার হবেন, এত দিনে সে রাক্ষসীর মনস্কামনা সর্ব্বতোভাবেই পরিপূর্ণ হয়েছে, আর কিছুই বাকি নেই। এই বার নে, শোণিত-পিপাসিনি! এই জ্বালাময় উষ্ণ-শোণিত-ধারা নিজের হাতে তোর পায়ে ঢেলে দিতে এসেচি,—পান করে তোর ও ছুরন্ত তৃষ্ণা নিবারণ কর!

(মন্দিরের দ্বারে করাঘাত)

খোল্ সর্ব্বনাশি, আমার সর্ব্বনাশ করে লুকিয়ে রইলি! (বারম্বার আঘাত, দেবদাসীগণের বাধা প্রদান) কে তোরা? ডাকিনী-যোগিনী বুঝি? সরে যা, সরে যা, নৈলে এখান এই তরবারি তোদের বুকে বসিয়ে দিয়ে, রক্ত পান কর্‌বো! পাষাণে তো ও রক্ত নেই, না হ'লে আজ পাষাণীর পাষাণ-বক্ষেই এর ধার পরীক্ষা কর্‌তেম্।

(ভিতর হইতে দ্বার মুক্ত করিয়া বিদ্যারণ্যের নিষ্ক্রমণ,)

বিদ্যারণ্য। (অম্বালিকার প্রতি) শান্ত হও মা! মা প্রসন্না হয়েছেন। বৎস মাওবি! বিজয়নগর-ভাগ্যাকাশ হ'তে পাপগ্রহগণ অন্তর্হিত প্রায়, মা বরদা হয়েছেন, আর ভয় নেই।

(প্রথমে দেবদাসীগণ ও দেখা-দেখি অম্বালিকা ব্যতীত অপর সকলের মন্দিরাদ্দেশ্যে প্রণত হওন)

সকলে। মা সর্ব্বমঙ্গলা! মঙ্গল কর মা, এ রাজ্যের মঙ্গল কর।

অম্বা। (অট্টহাস্য) মঙ্গল কর মা!—ভস্ম কর মা! তোর ও সংহার মূর্ত্তি আর সম্বরণ করিস্‌নে, ঐ রক্তনেত্রের অনলোদ্গারে সারাদেশের সতীর প্রাণ, মায়ের বুক, পিতার হৃদয় ছাই করে দে!—পুড়িয়ে দে!

বিদ্যারণ্য। (নিকটে আসিয়া) অভাগিনি! কিসের এ পরিতাপ? শান্ত হয়ে মায়ের নিকট সকল বেদনা নিবেদন করে দাও, প্রতীকার পাবে।

(দুই জন যোদ্ধা পুরুষের প্রবেশ ও বিদ্যারণ্যকে প্রণাম।)

অম্বা। (আর্ত্তনাদ সহকারে দূরে সরিয়া গিয়া) ঐ দেখ! আমার বুকের নিধি আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়েও, পিশাচদের তৃপ্তি হয়নি, আবার এখানেও এসেছে! ওরে মা আমার, অলোকারে! সিংহ শিশু আজ শৃগালের গহ্বর-শায়ী হলো! সব যেমন গিয়েছিল,– কেন তেম্‌নি তুইও মৃত্যুর নিকট গেলি না!

বিদ্যারণ্য। বুঝেছি, মা ওসব প্রলাপ বাক্য মুখে উচ্চারণ যোগ্য নয়, হরিহর, বিনায়ক এমন সুসময়ে তোমরা দৈব প্রেরিত হ'য়েই এখানে এসেছ, এতেই মনে হচ্ছে আমাদের কার্য্য অতি শীঘ্র এবং সহজেই সম্পাদিত হবে, স্বকর্ণেই ত সব শুন্‌লে? এই অত্যাচার প্রপীড়িতা নারী, যাদব-রাজকুমার তোমাদের চিন্‌তে না পেরে অত্যাচারী সর্দ্দারের লোক মনে করে, অভিসম্পাত কর্‌ছিলেন। বৎস! শৃঙ্গেরির প্রত্যাবর্ত্তন পথে, যখন তোমাদের সঙ্গে অতর্কিত সাক্ষাৎ ঘটে, তখনি তোমরা আমার প্রতি অকস্মাৎ প্রীতিমান হ'য়ে তোমাদের বাহু ও অসি আমায় উৎসর্গ কর্‌তে চেয়েছ?

হরিহর। আপনার সহিত সাক্ষাৎ-মুহূর্ত্তেই বুঝেছি, আমাদের স্বার্থ-পরমার্থ সমুদয়ই আপনার পাদপদ্মে! সেই মুহূর্ত্ত হতে এই বাহু এবং এ জীবন আপনাকেই অর্পণ করে, আপনার ঐ শ্রীচরণের দাসানুদাস হয়েছি।

বিদ্যা। বৎস তোমার মধুর বচনে পরিতৃপ্ত হ'লেম। তবে অদ্যই পরীক্ষা দাও। এই শোকাকুলা নারীর শোকাশ্রু মুছিয়ে, সেই মহাপুণ্যকে তোমাদের ভবিষ্য সাম্রাজ্যের ভিত্তিরূপে সংগ্রহ করো।

হরি-বিনা। প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য!

অম্বা। যদি ফেরাতে নাও পারো, আমায় নিয়ে চলো। তার মৃত মুখে শেষ চুম্বন করে আস্‌বো। এখন তাও সহ্য হবে। আজ আমি আশীর্ব্বাদ পেয়েছি।

বিনা। কোন প্রয়োজন নেই মা! নিঃসন্দেহ আপনার কার্য্য সংসাধিত হবে।

(অম্বালিকার সহিত হরিহর ও বিনায়কের প্রস্থান)

বিদ্যা। (বিস্ময়-বিমূঢ় জনগণের প্রতি) তোমরাও সব অত্যাচার নিপীড়িতের দল!—কোথা যাচ্ছ বৎসগণ? আর তোমাদের কোথাও যাবার প্রয়োজন নেই। এইখানে মায়ের চরণাশ্রয়ী হ'য়ে নির্ভাবনায় বাস করো। ক্ষুৎপিপাসাতুর তোমাদের সকল ভারই অদ্যাবধি মা ভুবনেশ্বরী নিজে গ্রহণ করলেন।

পথিক দ্বয়। (অর্দ্ধ অবিশ্বাসে) আপনার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। কিন্তু এ দেশের রাজা তো আর একটী নন। দয়াল আজ আছেন, কাল হয় ত তিপ্পন্ হবেন। পরশু হবেন রুদ্রমল, কার লোক কখন হর্ণ্যে হ'য়ে ছুটে আসে তার ঠিক্ কি ?

দ্বি-না। সারা বছরটা ধ'রে গতর ক্ষয় করে, যা চাষ-আবাদ কর্‌লাম, দশহাজার সৈন্য মিলে আমার সেই বুকের রক্তটুকুনের সঙ্গে, ওমনি আরো পাঁচশো চাষার যথাসর্ব্বস্ব লুটে নে গেল। তা' তাদেরই বা বল্‌বো কি বলুন। একে ওরা কারু কাছে মাইনেও পায় না, নিজেরাই বা খায় কি? তার ওপর যেমন হুকুম পায়, তেমনি করে। হুকুমের চাকর বৈ তো না?

বিদ্যা। আহা! অরাজকতার শ্মশানে বসে, তোমরা অত্যাচারের চরম দেখেছ! এইবার তোমাদের এ মহাপরীক্ষার শেষ হয়েছে। আর কোন ভয় নেই। আমায় বিশ্বাস কর, আমি বল্‌ছি,—যা তোমরা হারিয়েছ, তার চতুর্গুণ লাভ কর্‌বে। আজ হ'তে যতদিন না এ দেশ সরাজক হয়, ততদিনের জন্য আমি তোমাদের ভার নিচ্ছি।

দ্বি-নাগ। তুমি রাজ্যিশুদ্ধুর ভার তো নিচ্ছো ঠাকুর! কিন্তু শুধু তো ভার নিলেই হবে না, খে'তে দেবে কি? না খেয়ে তো ঠাকুর, রাজ্যিশুদ্ধু লোক তোমার চ্যালাগিরি কর্‌তে পার্ব্বে না। তুমি নিজে তো সন্ন্যাসী ফকির মানুষ! দুটো-দশটা দিন বাতাস খেয়েই কাটিয়ে দেবে। আমরা তো সে পার্ব্ব নি।

বিদ্যা। আমি খাওয়াবার কে বৎস! যিনি বিশ্বের অন্নদাত্রী সেই অন্নপূর্ণাই বুভুক্ষিতকে অন্ন দান কর্ব্বেন। তোমরা শুধু গ্রহণ কর্‌বার উপযুক্ত হ'য়ে, গ্রহণ করে যাবে।

জনৈক পথিক। তিনি তো আর আপনি এসে দেবে না? এ দেশেতে এখন পুরো আকাল না ধান--না ধন! তা সে কি আর তোমার তপিস্যের বলে আকাশ থেকে পড়্‌বে ঠাকুর?

(সহসা অন্তরীক্ষ হইতে স্বর্ণ বৃষ্টি)

সকলে। এ কি! এ যে দেখ্‌ছি ধারাকারে স্বর্ণ বর্ষিত হচ্ছে! তুমি সাক্ষাৎ শিবঠাকুর! নিশ্চয়ই মায়ের অনুরোধে কৈলেস হ'তে এখেনে অবতীর্ণি করেছ। আমরা তোমার শ্রীচরণেই আশ্রয় নিলেম।

বিদ্যা। ওঠ বৎসগণ! স্বয়ং বিশ্ব-সম্রাজ্ঞী তোমাদের সহায় হয়েছেন, তাঁকে স্মরণ নাও।

সকলে। মা ভুবনেশ্বরীর জয়! বাবা বিশ্বনাথের জয়!

দ্বি-নাগ। আর ভয় কিরে ভাই! বাবা নিজে এসে আমাদের ভার নিচ্ছেন।

বালিকা। (সহর্ষে) দেখ্‌লি মা! বাবা—ভাগ্যি আমি জল চেয়েছিলুম্।

চতুর্থ দৃশ্য।

—:*:—

স্থান বিজয়নগর রাজ প্রাসাদস্থ কক্ষ। দয়াল রায় ও পারিষদ বর্গ।

দয়াল। রাজা হয়েছি, পাঁচ হাতিয়ার বেঁধেছি, মাথায় মুকুট হাতে রাজদণ্ড নিইছি, তা বলে তো আর চোর দায়ে ধরা পড়ি নি, যে রাত্রিদিন ইতর সাধারণের অভাব অভিযোগ শুনতে শুনতেই জীবন গোঙাবো!

পারি-গণ। ঠিকই তো! চোর দায়ে ধরা তো আর পড়েন নি?

দয়াল। সৈন্যরা সর্ব্বস্ব লুটে নিচ্ছে, এই এক ধুয়ো তুলে, না হোক দশহাজার লোক তো কাল রাজসভার দ্বারে জমা হয়েছিল। ভা-রি তো তোদের "স্বর্ব্বস্ব!" তাই আবার 'লুটে নে যাচ্ছে' বলে চেঁচানি! লুটা কাকে বলে জানিস্ তোরা? তোদের মত পিপড়েকে টেঁপে, লুটে না। হ্যাঁ লুটা বলো তো আমাকে!—এই তোদের রাজাকে যদি লুটতে আসে,—তবে বুঝ্লাম যে লুটলে!

প্রঃ-পারি। তা' না, তাকেই বলি লুট! মাথা থেকে ঝাঁ করে হীরের মুকুটখানা টেনে নিয়ে, দু গালে ধাঁ করে দুটো থাবড়া লাগিয়ে দিয়ে, গলার মতির মালাগাছা চড়্চড়িয়ে ছিঁড়্লে, তবেই না কিছু হ'লো বলে বোঝা গেল। তা' সে রকম লুট তোরা কখন চোখে দেখেছিস্?

দ্বি-পারি। না কানে শুনেছিস্?

দয়াল। বল তো! এসব কথা শুন্লে হাসি পায় কি না পায়? বড় জোর তোদের দুটো চুম্কি ঘটি, একটা হাঁড়ি, আর ঘরের মধ্যে এক মহিষমর্দ্দিনীর মত কাল মোটা মাগীর কানে দুটো রূপোর তর্কি, আছে,— কি, না আছে! সে আর থাক্লেই কি, গেলেই কি? তারই জন্যে দেশ শুদ্ধ কি-না কি-কাণ্ডই একটা হচ্ছে! অথচ যদি ভেবে দেখে, তাহলে এ-থেকেও অনেক ভাল জিনিষ ওরা দেখ্‌তে পায়।

তৃ-পারি। হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেখ্‌তে পায়। দেখ্‌তে জান্লেই দেখ্‌তে পায়।

চ-পরি। ইচ্ছে থাক্লেই দেখ্‌তে পায়, আর চোখ্ থাক্লেই দেখ্‌তে পায়।

দ্বি-পারি। উঁহু চোখ্ না থাক্লেও দেখ্‌তে পায়, এ ত ঐ বাতির আলোর মতই দেখা যাচ্ছে!

দয়াল। নাঃ, সত্যি কথা বল্‌তে কি? আমারও ওদের উপরে ঘৃণা ধরেছে। আমিও তাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, অকৃতজ্ঞদের জন্য কিছুই কর্ব্বো না। দেখো! এ প্রতিজ্ঞা আমি ঠিক্ রাখ্‌বো, মনে কচ্চো কি পার্ব্বো না?

প্রথম-পা। সে কি? আপনি পার্ব্বেন না? এ ভীমের মত অটল প্রতিজ্ঞা যে, দুঃশাসনের রক্ত পান না হয়ে এ ভাঙ্‌বে না। সে আমি ঠিক্ জানি।

দয়াল। তাই আমি স্থির করেছি, রাজ-সভায় গিয়ে বৃথা কালক্ষেপের প্রয়োজন নেই। এখন থেকেই নাচ গান সুরু হ'য়ে যাক্। রাজা হ'য়েছি, রাজার মতই থাকা শোভা পায়। আর যে-সে রাজা নয়—মদ্রেশ্বর!

সকলে। মদ্রেশ্বর দয়াল রায় মহারাজের জয়!

দয়াল। আচ্ছা ত্রিবিন্দম্! তুমি তো জম্বুকেশ্বরকেও দেখেছ, পাঠান রাজত্বও দেখেছ, আর আর সকলকেও দেখেছ, আমার মাথার মুকুটের মত মুকুট, তুমি কারু মাথায় মানা'তে দেখেছ?

দ্বি-পারি। সে আর কি বল্‌বো মহারাজ! আপনার মাথার মুকুট, যেন রাবণের মাথার মুকুট! এ রকম আর কাকে মানাবে?

দয়াল। তবে নর্ত্তকীদের আবাহন করো, আর বিলম্ব কি?

প্রথম। যে আদেশ।

(প্রস্থান ও নর্ত্তকীবৃন্দ সহ পুনঃ প্রবেশ)

দয়াল। আচ্ছা আরম্ভ হোক্।

নর্ত্তকীগণ —

গীত।

মধুর হাসি হাসিয়া শশী করগো সুধা দান।
মধুর বায়ু বহিয়া যারে জুড়ায়ে দেহ প্রাণ ॥
হৃদয় ভরা লইয়া মধু ওঠ্ লো ফুটে কুসুম বঁধু,
মধুপ এসে মধুর হেসে কররে মধু পান।
পাপিয়া পিক্ ভরায়ে দিক্ মধুরে গাহো গান ॥

দয়াল। বাঃ বাঃ বেশ ! বেশ ! আবার চলুক !

(সর্দ্দার সেনা নায়কের দুইজন সৈন্য সহ, অলোকাকে লইয়া প্রবেশ)

একি ! তোরা কেন্ এখানে নফর ! শূলে যাবি বলে ? (অলোকাকে দেখিয়া) ওঃ এসো এসো এত রূপ ! একি মানবী ? না অপ্সরা ?

সে-না। সমস্ত বিজয় নগর চষে ফেলে, এই কৌস্তভ রতন ভিন্ন আর কিছুই মিলেনি। এই আমার আজকের উপঢৌকন মহারাজ !

দয়াল। এই আমার শত সাম্রাজ্য ! যাও, তোমার রাজা খুসি হয়েছেন। এর বেশী কি পুরস্কার তুমি আশা করো ? (সেনা নায়ক ও সৈনিকদ্বয়ের অভিবাদনান্তর প্রস্থান) কাছে এসো সুন্দরী ! তোমার ঐ রূপের সুধা পান করে, আমার এ চিত্ত-চকোর পরিতৃপ্ত হয়ে যাক্।

প্র-পারি। এসো ! এসো ! রাজার আদেশে কি বিলম্ব কর্‌তে আছে ?

অলোকা। (আত্মগত) কত কথাই যেন স্বপ্নের মত মনে আস্‌তে চাচ্ছে। কতই না অদ্ভুত আশ্চর্য্য সে স্বপ্ন ! যাক্ সে সব কাল্পনিক ভাবনার অবসরই বা কোথায় ? (প্রকাশ্যে) তুমি রাজা ?

দয়াল। হুঁ উ আমি রাজা। সমুদয় মদ্র-মণ্ডলেরই অধিপতি হচ্ছি।

অলোকা। অসহায়া নারী প্রতি মর্য্যাদা হানিকর বাক্য প্রয়োগ কি রাজধর্ম্ম মহারাজ ?

দয়াল। হা-হা-হা ! তিপ্পন্ ! রূপসী শুধু রূপসিই নন। আবার বিদুষী। সায়ন ঠাকুরের বুঝিবা চেলা চৈলাই হন ! রাজধর্ম্ম শিক্ষা দিতেও বেশ জানেন। অয়ি প্রেয়সি ! আপাততঃ আপনার মৎসমীপে আগমনং শ্রেয়সি। হা-হা-হা আমিও দেখ কেমন বিদ্যা প্রকাশ কর্‌লাম !

অলোকা। রাজা প্রজার পিতৃতুল্য, তার উপর আপনি হিন্দু, ক্ষত্রিয় বংশে জন্মেছেন, এ সব সত্বেও আপনি এইরূপ অনাচার অত্যাচারের জনক হয়ে, অপরকেও অসদাচারী তৈরি কর্‌ছেন ? আবার গর্ব্ব করে বল্‌ছেন আপনি রাজা !

দয়াল। হ্যাঁ রাজা ! একশোবার রাজা.—লক্ষবার রাজা।

পারিষদগণ। আর যে সে যেমন তেমন রাজা নয় ! রাজার মতন রাজা,—মদ্রেশ্বর রাজা !

অলোকা। (পারিষদের দিকে ফিরিয়া) একে রাজা বলে না, দস্যু,—দস্যুপতি বলে।

দয়াল। কি—ই !

অলোকা। দস্যুপতি।

দয়াল। এত বড় স্পর্দ্ধা ! কুত্তির কুত্তি ! জানিস্, এখনি তোকে—

অলোকা। কি? শূলে চড়াতে পারো?

দয়াল। শূ-শূ-শূলে না, কি-কি-কি-কর্‌তে পারি—তিপ্পন্? ত্রিবিক্রম্! কি-কি-কি-পারি?

দ্বিতীয়। কুকুরের মুখে, হাতীর পায়ে, দিতে পারেন। বাঘের মুখে, এমন কি জীবন্তে আগুনে দগ্ধ করাও আপনার ইচ্ছাধীন। পাঠান রাজারা এ রকম হামেসাই ক'রে থাকেন।

দয়াল। হাঁ বেশ তা। (সহসা অলোকার মুখের দিকে চাহিয়া নিরুত্তর,)

অলোকা। কি দস্যুপতি! থাম্‌লে কেন? সাহস হচ্ছে না?

দয়াল। না, তোর মৃত্যু ভয় নেই, তোকে মার্‌বো না। যাতে তোর উচিৎ দণ্ড হবে তাই তোকে দেবো। তুই মদ্রের মহিষী হ'তে পার্‌তিস্, তা হতে পাবি না। আমার বিলাস-কাননের কিঙ্করী হবি।

অলোকা। (স্বগতঃ) অনাথের নাথ! তুমিই শুধু অনাথার সহায়। তুমি আমাকে এ বিপদে রক্ষা করবে তা আমি এখনও জানি, এ বিশ্বাস আমার যে এখনও যাচ্ছে না। (প্রকাশ্যে হাসিয়া) ওঃ বুঝেছি, তোমরা শুধু দস্যু নও? নর-পিশাচ!

দয়াল। (দৃঢ় মুষ্টিতে হাত ধরিয়া) দস্যু হই, পিশাচ হই, তোর প্রভু!

অলোকা। (সকাতরে) কোথা দীনবন্ধু! অশরণের শরণ! কাঙ্গালিনীর সখা! এখনও দেখা দেও!

(নেপথ্যে) এই যে তিনিই আমাদের পাঠিয়েছেন। ভয় কি? (অম্বালিকা ও তৎপশ্চাতে বিনায়ক ও হরিহরের উর্দ্ধশ্বাসে প্রবেশ। সপারিষদ দয়ালরায়ের সভয়ে অলোকাকে ত্যাগ করিয়া দূরে অপসরণ।)

অম্বা। অলোকা রে! মা আমার! আছিস্ কি?--বেঁচে আছিস্ কি?--বেঁচে থাক্‌বার যোগ্য আছিস্ কি? এই যে নিগড়বদ্ধা সিংহ শিশু কেশর ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! আঃ, আছে, আছে--বেঁচে আছে,—নির্ম্মল আছে। না হ'লে এ তেজও থাক্‌তো না! মা ভুবনেশ্বরি! তুমি পরম করুণাময়ী। পাষাণী নও মা! পাষাণী নও,—মাগো! (মূর্চ্ছা)

অলোকা। (বিনায়কের নিকটস্থা হইয়া) বীর! তোমার উপরেই আমার কৌমার সম্মান রক্ষার ভার দিচ্ছি। জানি নে তুমি কে? শত্রু বা মিত্র, কি ভাবে এসেছ; তাও ভালরূপ জানি নে,—কিন্তু কে জানে কেন তোমাকে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর্‌তে, নির্ভর কর্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে। মনে হচ্ছে তুমি যেন আমার চিরন্তন আত্মীয়!

বিনায়ক। এই অসি স্পর্শে প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, আমি আমার ঐ উচ্চ সম্মান হ'তে কখন বিচ্যুত হবো না। আপনি আপনার অতর্কিত আনন্দে মূর্চ্ছিতা জননীকে দেখুন। এখানে আমরা আপনার রক্ষক থাক্‌তে, কাকেও আপনার ভয় কর্ব্বার প্রয়োজন নেই।

অলোকা। (উর্দ্ধে চাহিয়া) তোমায় সহস্র প্রণিপাত, কৃপাময়! আর আপনাকেও বীর! (অম্বালিকার নিকটস্থ হইয়া) মা, মা! দুঃখিনী জননী আমার! এ কি! মায়ের সমস্ত শরীর যে নিস্পন্দ!

দয়াল। (প্রকৃতিস্থ হইয়া সরোষে) কে তোরা চোর! আমার রাজপুরীতে কি জন্য অনধিকার প্রবেশ করেছিস্?

প্রঃ-পারি। হ্যাঁ বল্ তো! কি জন্য—কি জন্য?

২য় ঐ। হ্যাঁ হ্যাঁ বল্! বল্‌তেই হবে তোদের। না বল্লে ছাড়্‌ছিনে, শীগ্‌গির বল্।

বিনায়ক। (ঘৃণাভরে) কি জন্য? তা' কি এখনও বুঝ্‌তে পার নি সর্দ্দার! যদি না পেরে থাকো, শীঘ্রই পারবে।

সর্দ্দার। কি? সর্দ্দার! আমি না রাজা!—মদ্র-মণ্ডলের রাজচক্রবর্ত্তী রাজা।

পারিষদগণ। বটেই তো রাজা,—চক্রবর্ত্তী রাজা। এখানে সর্দ্দার কে?

অলোকা। মা মা মাগো! ওগো দেখ, দেখ, মা যে ক্রমে ক্রমে শীতল হ'য়ে আস্‌চেন, মা কি তবে আমার জীবিতা নাই?

হরিহর। (অম্বালিকার দেহ স্পর্শ করিয়া) না, শোক-তপ্ত মাতৃ-হৃদয় এ অপ্রত্যাশিত আনন্দের আঘাতে শান্তির শীতলতায় একেবারে চিরদিনের মতই তলিয়ে গিয়ে জুড়িয়ে গেছে।

অলোকা। মাগো মা! মা আমার!

দয়াল। কি! সে কি ম'রে গেছে?

হরিহর। বিনায়ক! এসো আমরা অনর্থক সময় নষ্ট করবো না। এঁর ঔর্দ্ধদৈহিকক্রিয়া যথাযথ ভাবে সমাপন করা এখন আমাদেরই কর্ত্তব্য। (অলোকার প্রতি) ভগ্নে! আপনিও এক্ষণে শোক পরিহার করে, আমাদের সমভিব্যাহারিণী হোন্‌।

অলোকা। (উত্থিতা হইয়া গমনোদ্যতা)

দয়াল। (অগ্রসর হইয়া) তুমি কোথা যাবে সুন্দরি! ওই ছিন্নবসনা শীর্ণাঙ্গী একটা বৃদ্ধার জন্য শোক করতে করতে শ্মশানে যাওয়া কি তোমার সাজে? তুমি যে এখন মদ্রেশ্বরী!

বিনা। (অসি নিষ্কাসিত করিয়া) পাপিষ্ঠ! পিশাচ! নিতান্তই মৃত্যু তোর সমীপাগত হয়েছে দেখ্‌ছি। (আক্রমণোদ্যত)

দয়াল ও পারিষদবর্গ। (অগ্রসরে বিরত হইয়া চীৎকার শব্দে) প্রহরি! প্রহরি! (বেগে প্রহরীগণের প্রবেশ) তোরা সব কাপুরুষ। তোদেরি সাক্ষাতে, তোদের রাণী লুণ্ঠিতা হচ্ছেন, তোরা কেউ বাধা দিচ্ছিস্‌নে?

(প্রহরীদ্বয়ের হরিহর বিনায়ককে আক্রমণ, বিনায়কের একজন প্রহরীকে আঘাত ও প্রহরীর পতন, তদ্দৃষ্টে অপর সকলের পলায়ন। ইত্যবসরে হরিহর ও বিনায়কের শব লইয়া প্রস্থান, অলোকার পশ্চাদ্বর্ত্তী হওন)

পঞ্চম দৃশ্য।

—:*:—

ভুবনেশ্বরী মন্দির, বিদ্যারণ্য ও মাণ্ডবী।

মাণ্ডবী। দেশের তিন ভাগ লোক আপনার দিকে দাঁড়াবে। আপনার হুকুমে তারা প্রাণ দিতে বল্লেও 'না' বলবে না। আজ যে আপনি 'অন্নকুট-যজ্ঞ' অনুষ্ঠান করেছেন, অনাহারী প্রজাগণ যে আনন্দভরে মুখে অন্নগ্রাস তুলেছিল, আহা, সে দৃশ্য দেখে প্রভু! আনন্দে আমরা অশ্রুজলে ভেসে যাচ্ছিলাম। তা' এতেও লোকে আপনার দিকে দাঁড়াবে না একি হ'তে পারে?

বিদ্যা। আমার দিকে নয় বৎসে. ধর্ম্মের দিকে বল্‌তে পার। তা অধর্ম্মের যে নাশ হবে, এ তে আর বৈচিত্র কি? যখনই পাপের ভরাপরিপূর্ণ হয়,—তখনি তা নাশ কর্‌বার জন্য, তিনি নিজেকে সৃষ্টি করে থাকেন। এ কথা তিনি তো নিজেই বলেছেন:—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহম্‌॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

(হরিহর বিনায়ক ও তৎপশ্চাৎ অলোকার প্রবেশ ও বিদ্যারণ্যকে প্রণাম)

বিদ্যা। সর্ব্বত্র বিজয় লাভ কর!

হরি। এই নিন দেব! আপনার পাদপদ্মে, এই অনাথা সহায়হীনা বালিকাকে প্রদান কর্‌তে এনেছি। আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে দয়ালরায়ের হস্ত হ'তে এঁকে অনায়াসেই মুক্ত কর্‌তে পারা গেছে। কিন্তু কন্যাকে বিপদমুক্ত দেখে, আনন্দাতিশয্যে, অকস্মাৎ সেইখানেই এঁর জননীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া তুঙ্গভদ্রার তীরে সমাধা করে, আমরা আপনার কাছেই এঁকে আনয়ন করেছি। (অলোকার প্রতি) ভদ্রে! ইনিই আমাদের পরম কারুণিক গুরুদেব! ইঁহারই আদেশে আমরা আপনাকে সর্দ্দারের গৃহ হ'তে মুক্তিদান কর্‌তে গিয়েছিলেম।

অলো। (বিদ্যারণ্যকে প্রণাম)

বিদ্যা। চিরায়ুষ্মতী হও বৎসে! (হরিহর ও বিনায়কের প্রতি) যাও বৎস! তোমরা অনেক পরিশ্রম করেছ, এক্ষণে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দ্বারা ক্লান্তি অপনোদন করগে। (মাণ্ডবীর প্রতি) বৎসে মাণ্ডবি! তুমি এঁদের বিশ্রাম স্থান এবং আহার্য্যাদির সুবন্দোবস্ত করে দাও।

(বিদ্যারণ্যকে প্রণামান্তর হরিহর বিনায়ক ও মাণ্ডবীর প্রস্থান।)

অলোকা। পিতা, প্রভু! এই আমি আপনাকেই আশ্রয় কর্‌লেম। আমার ইহলোকে আপনি ব্যতীত আজ আর কেউ নেই।

বিদ্যারণ্য। আমি উপলক্ষ্য মাত্র বৎসে! যিনি সর্ব্বতশ্চক্ষু: তিনিই তোমার দ্রষ্টা এবং পিতা—ভয় কি!

অলোকা। ভয়? না প্রভু! ভয় ইতঃপূর্ব্বে আর কখন কর্‌তে হবে ব'লে জানা ছিল না। ভয়কে চিরদিন উপহাস করেই এসেছি। কেবল এ জীবনে শুধু এক নিমিষের মত ভয়ের দর্শন পেয়েছিলাম। বিদ্যুৎস্ফুরণের চেয়েও চকিত মাত্র তার প্রকাশ, আর তার পর মুহূর্ত্তেই ভয়হারীর অভয় মূর্ত্তির আবির্ভাবে চিরদিনের মতই তার অন্তর্দ্ধান! আমি কি বুঝিনি প্রভু, তিনি কি? যিনি এক নিমিষে এত বড় বিপদের অশনিকে বর্ষার মঙ্গল ধারায় পরিবর্ত্তিত করে দিলেন। তবে আর কাকে ভয়?

বিদ্যা। ধন্যা তুমি বালিকা! এ বয়সে এত বড় ভগবৎ-নির্ভরতা বহু জন্মের সাধনা-লব্ধ ফল! মা! তোমার স্বর্গীয়া জননীর জন্য বড় বেশী কষ্ট বোধ হচ্ছে না তো?

অলোকা। কষ্ট? না প্রভু! আমি জানি তাঁর ভালই হয়েছে। সেখানে তিনি চিরশান্তি লাভ কর্‌তে পেরেছেন, এতে আর আমার দুঃখ কর্ব্বার কি আছে? এখানে তাঁর তো কোন সুখই ছিল না। তাঁর প্রাণে সর্ব্বদা কি অশান্তির আগুন জ্বল্‌তো, রাত্রে ঘুমের ঘোরেও কি কাতর আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌তেন। এই আমারই জন্য কি ভয়—কি মহৎ ভাবনা! আমার জন্য কালের কথা, সমস্তই যেন একটা ইন্দ্রজালের মত অস্পষ্ট মনে হয়। যা সত্য. তা আমার স্মৃতি থেকে মুছে গেছে। আর যা সত্য নয়, তাকে মুগ্ধ-লুব্ধ চিত্ত আমার সত্য বোধে আশ্রয় কর্‌তে ছুটে যেতে চায়! সেই সব কথা মাকে বল্‌তে গেলে, মা যেন আতঙ্কে পাগল হ'য়ে যেতেন। সে যে কি ভয়! কেউ তা কল্পনা কর্‌তেও পারে না। সেখানে বোধ হয় সে সব কিছুই নেই! আছে কি প্রভু?

বিদ্যা। না মা, কিছু ভেবো না। সে কেবল এক আনন্দের রাজ্য! আনন্দ ব্যতীত সেখানকার প্রজারা আর কিছুই জানে না।

অলোকা। আঃ, তবে সে আনন্দ তাঁর অটুট হোক!

(নেপথ্যে সহসা) গেল, গেল, সমস্তই ভস্মসাৎ হয়ে গেল! সর্ব্বনাশ কর্‌লে রে,—সর্ব্বনাশ কর্‌লে!

অলোকা। (চমকিয়া) এ কি! ঐ যে ঐ দিকে ঊর্দ্ধশিখ হয়ে বাড়বানল সদৃশ অগ্নিরাশি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে! কারো গৃহ দাহ হচ্ছে নাকি?

(ছুটিয়া এক ব্যক্তির প্রবেশ)

আগন্তুক। (উচ্চকণ্ঠে) মানুষের চামড়া এদের গায়ে নেই, দয়া মায়া পরলোকের ভয় কিছু নেই!

বিদ্যারণ্য। কি হয়েছে?

আগ। আর কি হয়েছে! রাজশ্রী শ্রেষ্ঠীর নিকট সর্দ্দার-রাজা এক অযুত স্বর্ণ-মুদ্রা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন; কোথা থেকে অত টাকা সে বেচারি দেবে? লুণ্ঠতরাজে সবই তো তার নষ্ট হ'য়ে গেছে, যা ছিল দিতেও তা চেয়েছিল, তা' তার পছন্দ হয় নি, হুকুম হয়েছে সপরিবারে বেড়া আগুনে তাদের পুড়িয়ে মার্‌বার, কাজেও হয়েছে তাই, সৈন্যেরা বাড়ী ঘেরাও করে তাতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, জন-প্রাণীও বাড়ী থেকে বা'র হ'তে পার্‌চে না, বা'র হ'তে চেষ্টা কর্‌লেই সৈন্যেরা তীর ছুঁড়ে মার্‌চে বনের পশুদেরও এমন নৃশংস হত্যা করে না।

(প্রস্থান)

অলোকা। প্রভু!

বিদ্যা। বিশ্বদেব! সহায় হও, আর না, ভরা পূর্ণ হয়েছে। (প্রস্থান)

অলোকা। ঐ শোনা যাচ্ছে অনলের হুহুঙ্কার! আর ঐ যে অতি করুণ আর্ত্তনাদ, অগুনের হুঙ্কার সঙ্গে তারি মত তপ্ত স্রোতে ছুটে আস্‌ছে। (নেপথ্যে রক্ষা কর—রক্ষা কর।) এতেও এ পাপ রাজ্যের পাতকী সমূহ ধ্বংস হবে না!

ক্রমশঃ—

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

আসামী।

—:*:—

ফসল এবার ফলেনি জমিতে, গোলাতেও নাই ধান,
　　দুঃখের নাহি ওর,—
দু'সনের বাকী খাজনা আমার, পেয়াদার পীড়াপীড়ি
　　রাত না হইতে ভোর!
কাঙ্গালের নাই. বাঙ্গাল তা শুধু মরমে মরমে বুঝে
　　আর ত বুঝে না কেহ;
ক্ষুধার কি জ্বালা বুঝিবে কেমনে, উপাদেয় রাজ-ভোগে
　　পুষ্ট যাহার দেহ?
পাঁজর ভাঙ্গিয়া নিশ্বাস শুধু বহে' যায় অকারণ,
　　চোখের জলের সাথে;
করুণা জাগাতে বৃথা পায়ে ধরা, বুকে কর হানাহানি,
　　পরের কি ক্ষতি তা'তে?
পর শুধু বুঝে নিজের কড়ির সূক্ষ্ম হিসাব ভাল,
　　তা'তে নাই তার ভুল;
বেজায় 'সেয়ানা', নিজের বেলায এদিক ওদিক তার
　　হ'য় না'ক এক চুল!
আমার দুঃখ আমার ব্যথার একটুকু যদি হায়
　　বাজিত তাদের বুকে,—
বাক্য জ্বালায় হৃদয় আঘাতি, নিজের পাওনা তবে
　　চাহিত কি রাঙা মুখে?

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

গুরু রামদাস।

—:-*-:—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রণীত "কথা ও কাহিনী" গ্রন্থে "প্রতিনিধি" নামক কবিতায় আমরা শিবাজির গুরু রামদাসের সহিত পরিচিত; ইহা ভিন্ন তাঁহার জীবন-কথা আর বড় কোথাও দেখিতে পাই না। কিন্তু ঐটুকুর ভিতরে তিনি আমাদের হৃদয়ে যে একটি বৈরাগ্যসুন্দর ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহাতে যেমন একদিকে গুরু রামদাসের নিজের ধর্ম্মগভীর বাণী, তেমনি আবার কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টিকৌশল প্রকাশ পাইয়াছে।

১৬০৮ খৃষ্টাব্দে গোদাবরী তীরে এই সাধুর জন্ম হয়। ইঁহার পূর্ব্ব নাম ছিল নারায়ণ, এই নাম পরে পরিবর্ত্তিত হইয়া রামদাস হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই রামদাস ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন এবং ১৬২০ খৃষ্টাব্দে ইনি বিবাহমন্ত্র উচ্চারিত হইবার সময়ে বিবাহমণ্ডপ হইতে পলায়ন করেন। ইহার পর চব্বিশ বৎসর ইনি নিরুদ্দেশ ছিলেন, এমন কি ইঁহার পিতামাতাকেও কোন সংবাদ দেন নাই। ইহার মাঝে দ্বাদশ বর্ষ নাসিকের নিকট কোন স্থানে কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা ধর্ম্মাভ্যাস করিয়া ভারতবর্ষের তীর্থস্থান সকল পরিভ্রমণ করেন! বারাণসী, অযোধ্যা, মথুরা, শ্রীক্ষেত্র, রামেশ্বর প্রভৃতি স্থান পরিদর্শনের পর ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে ইনি নিজদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বৃদ্ধা জননীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। 'উম্রাই' এবং 'মাছলি' নামক এই দুই স্থান ইঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল; এখানে ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে শিবাজির সহিত ইঁহার প্রথম পরিচয়। পাণ্ডারপুর নামক স্থানে বিঠোবার মন্দিরে বিঠোবার মূর্ত্তি দেখিয়া ইনি রামচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন "ঈশ্বর এক, কিন্তু জ্ঞানীগণ তাঁহাকে অনেক নামে ডাকেন।"

শিবাজি ক্রমে ইঁহার ভক্ত হইয়া উঠিলেন এবং ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে ইঁহাকে গুরুর পদে বরণ করিলেন। তখন হইতে রামদাস সাতারার নিকটবর্ত্তী পারালি নগরে বাস করিতে আরম্ভ করেন। ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে যখন রামদাস ভিক্ষা চাহিতে বাহির হইয়া শিবাজির দ্বারে উপস্থিত হইলেন, শিবাজি তখন তাঁহাকে আপন রাজ্যদান করিলেন। রামদাস তাহা গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু পুনর্ব্বার তাহা ফিরাইয়া দিয়া শিবাজিকে :—

"গুরু কহে তবে শোন্ করিলি কঠিন পণ
অনুরূপ নিতে হবে ভার,
এই আমি দিনু ক'য়ে মোর নামে মোর হ'য়ে
রাজ্য তুমি লহ পুনর্ব্বার।
তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন,
পালিবে যে রাজধর্ম্ম জেনো তাহা মোর কর্ম্ম
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।
বৎস তবে এই লহ মোর আশীর্ব্বাদ সহ
আমার গেরুয়া গাত্রবাস,
বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিও" (কথা ও কাহিনী)

এই বলিয়া রামদাস আপনার গাত্রবাস তাঁহাকে দান করিলেন। ইহার পর হইতে রামদাস ও শিবাজি প্রসঙ্গ বেশী কিছু জানা যায় নাই।

রামদাস প্রণীত "দাসবোধ" নামে যে গ্রন্থ আছে তাহাতে ইনি জীবনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন, এবং রাজনৈতিক ভাব অপেক্ষা দার্শনিক ভাবেই বলিয়াছেন। এই সময়ে মারাঠাদিগের মাঝে যে তিনটি কবির উদয় হয় তাহার মধ্যে একনাথ সাহিত্যিক, তুকারাম ভাবপ্রবণ এবং রামদাস কর্ম্মদক্ষ ছিলেন, এ জন্য মারাঠাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে রামদাসই গোপনে থাকিয়া শিবাজিকে শক্তিদান করিতেন।

১৬৮০ খৃষ্টাব্দে শিবাজির মৃত্যুর পর শম্ভুজির রাজত্বকালে উচ্ছৃঙ্খলতার কথা শুনিয়া রামদাস বহু উপদেশ দান করেন এবং ইঁহাকে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে বলেন কিন্তু সবই বিফল হইল।

ঢুলিয়ায় "সৎকার্য্যোত্তেজক সভা" রামদাসের অন্যান্য রচনা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতেছেন ও সম্প্রতি তাঁহার প্রিয় শিষ্য কল্যাণ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত একটি হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। পুণার "ভারত ইতিহাস সংশোধকমণ্ডল" বলেন তাঁহারা কয়েকখানি মূল পত্র ও দলিল ইত্যাদি পাইয়াছেন। তাহা এখনও দুষ্প্রাপ্য। ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে শিবাজি যখন রামদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মাহুলিতে গিয়াছিলেন তখন রামদাস চাফলে ছিলেন কিন্তু সেখান হইতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে।—

(১, ২) যিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, প্রজাপালক, গুণশালী, চিন্তাশীল, ধর্ম্মপথগামী এবং উদারচিত্ত কে তাহার সমকক্ষ এ পৃথিবীতে আছে ?

(৬) হে সাহসি, স্থিরপ্রকৃতি রাজন্, তুমি নিজগুণে সকলকে লজ্জিত করিয়াছ।

(৮) গো ব্রাহ্মণ এবং দেবগণ ও ধর্ম্মবিশ্বাস এই চতুষ্টয় রক্ষা করিবে, সেই জন্যই বিধাতা তোমায় সৃজন করিয়াছেন।

(১০) ভূমণ্ডলে এমন কেহ নাই যে এই ধর্ম্মকে প্রকৃত ভাবে রক্ষা করিতে পারে, একমাত্র তুমি ইহা কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছ।

(১১) তোমার জীবনে ধর্ম্ম পুনর্জীবিত হইতেছে, হে জগৎ বিখ্যাত রাজন্, অনেকেই তোমার গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া তোমার প্রতি আশানেত্রে চাহিয়া আছে।

রাজার কর্ত্তব্য।

(১) রাজার কর্ত্তব্য প্রজাগণের সামর্থ্য নির্ণয় করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিকে কর্ম্মে নিযুক্ত করা এবং অযোগ্যকে প্রত্যাখ্যান করা।

(৭) বিশ্বাসঘাতকতা একেবারেই দূর কর এবং অপ্রকাশিত সত্য খুঁজিয়া বাহির কর।

(৮) যে প্রজারঞ্জক সে ভাগ্যশালী ; চাটুকার দিগকে দূরে রাখাই শ্রেয়ঃ।

(১১) যে কর্ম্মে ক্লান্ত হইয়া পড়ে সে দুর্ভাগা, সে ভীরু যে শেষ মুহূর্ত্তে পশ্চাৎপদ হয়।

(১৮) রাজা রাজকীয় কর্ত্তব্য, যোদ্ধাগণ সৈনিকের কর্ত্তব্য এবং ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মাচরণ বিধিমতে পালন করিবেন।

রামদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পর শিবাজি সংসার ত্যাগী হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন কিন্তু রামদাস বলিলেন তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য এখানে নহে, আপন রাজ্যে প্রজাদিগের মাঝে, এবং তাঁহাকে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে উপদেশ দিলেন তাহার অনুবাদ নীচে দেওয়া হইল।

যোদ্ধার কর্ত্তব্য।

(২) যে ভীরুস্বভাব তাহার পক্ষে সৈনিকের বৃত্তি ত্যাগ করিয়া অন্যরূপ জীবিকা অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ।

(৪) যোদ্ধার কর্ত্তব্য যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন দান করিয়া স্বর্গারোহণ করা অথবা প্রাণপণে চেষ্টার পর জয়ের পুরস্কার লাভ করা।

(১২) বিশ্বাসহীন জীবন অপেক্ষা মরণই শ্রেয়ঃ, ধর্ম্ম শূন্য জীবন বহন করিয়া লাভ কি ?

(১৩) মারাঠাদিগকে একত্র করিয়া ধর্ম্ম পুনর্জ্জীবিত কর, নহিলে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ স্বর্গ হইতে অবজ্ঞা করিবেন।

(১৫) যদি বংশমর্য্যাদাজ্ঞান থাকে তবে এস সমরে অগ্রসর হও ; যদি এ পথ ত্যাগ কর তবে অনুতাপের সীমা থাকিবে না।

(১৭) ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাসীদিগকে ঘৃণার্হ মনে করিয়া দূরে রাখিবে। যে তাঁহার সেবক সে চিরজয়ী এ কথা সুনিশ্চিত।

(১৯) হিতাহিত বোধ, দূরদর্শিতা, এবং কর্ম্মেচ্ছা এইগুলি তোমার গুণ হউক্।

শিবাজি কর্ত্তৃক আফজাল খাঁ পরাজিত হইবার পর রামদাস তাঁহাকে নিম্নলিখিত উপদেশ দান করেন ; এই উপদেশগুলি ঢুলিয়ায় "দাসবোধ" নামক গ্রন্থে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।

(১, ২) মণি মুক্তায় সুশোভিত দেহ অপেক্ষা জ্ঞান ভূষিত হৃদয় শতগুণে শ্রেষ্ঠ ! যাহার অন্তরে জ্ঞানের বীজ নাই, শত শত বাহ্যিক অলঙ্কার সত্ত্বেও সে অপদার্থ।

(৭) অতিরিক্ত পরিহার কর, মিতাচারী হও, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কখনও অবাধ্যতাচরণ করেন না।

(৮) অবাধ্যতাই সকল বিবাদের মূল, মতদ্বৈতের ফলে একটি অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

(১০) বিচক্ষণ ব্যক্তিকে সতর্ক করিবার আবশ্যক নাই, তথাপি তাহার সর্ব্বদা সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য।

(১১) সম্রাট বহু প্রজার প্রভু, সেজন্য তাঁহার বিচক্ষণতার প্রয়োজন অধিক, কারণ তিনি সকলেরই আশার স্থল।

(১৩) ভগবানই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা, যাহার উপর তাঁহার করুণা সেই প্রকৃত সুখী।

(১৪) ন্যায়পরতা এবং চিন্তাশীলতা, সদ্বিবেচনা এবং সঙ্কটকালে ও মহৎ কার্য্যে সাহসিকতা এইগুলিই ঈশ্বরের প্রকৃত দান।

(১৬) যশ গৌরব এবং অসামান্য ধর্ম্মনিষ্ঠা এইগুলিই ঈশ্বরের প্রকৃত দান।

(১৭) চিন্তা, কর্ম্ম, সার্ব্বজনীন প্রেম, এবং দানশীল হৃদয় এইগুলিই ঈশ্বরের প্রকৃত দান।

(১৮) ইহকাল এবং পরকালের চিন্তা, দূরদর্শিতা এবং সহিষ্ণুতা এইগুলিই ঈশ্বরের প্রকৃত দান।

(১৯) ঈশ্বরের বিধান বোধ, ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধা, নরনারীকে রক্ষা ও পালন এইগুলিই ঈশ্বরের প্রকৃত দান।

(২০) অবতারগণ এবং ধর্ম্মবিশ্বাসীগণ ঈশ্বরের প্রকৃত দান।

(২১) গুণগ্রাহিতা, ভগবদ্ভক্তি এবং শুদ্ধ জীবন এইগুলিই ঈশ্বরের প্রকৃত দান।

(২২) যুক্তিই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ গুণ, ইহারই বলে আমরা জীবন-সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারি।

স্বরলিপি।

ওরে সাবধানী পথিক, বারেক
পথভুলে মর্ ফিরে
খোলা আঁখি দুটো অন্ধ ক'রে দে
আকুল আঁখির নীরে।
সে ভোলা পথের প্রান্তে রয়েছে
হারানো-হিয়ার কুঞ্জ
ঝরে পড়ে আছে কাঁটা তরুতলে
রক্ত-কুসুম পুঞ্জ
সেথা দুই বেলা ভাঙ্গাগড়া খেলা
অকূল সিন্ধুতীরে।
সাবধানী পথিক বারেক
পথ ভুলে মর্ ফিরে।
অনেক দিনের সঞ্চয় তোর
আগুলি আছিস্ বসে;
ঝড়ের রাতের ফুলের মতন
ঝরুক পড়ুক খসে',
আয়রে এবার সব হারাবার
জয় মালা পর শিরে।
ওরে সাবধানী পথিক, বারেক
পথভুলে মর্ ফিরে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কথা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ঠাকুর।

গা মা II পধা -ণা ধা | পমা -গরা গা | মা পা -া |

ও রে সা • ব ধা • নী প থিক্ •

র গ

ধা গা -া I সা -া রা | গা -া -া | রা -া গা | মা -া -া I

বা রেক • পথ • ভো লো • • পথ • ভো লো • •

ম ধ প র্সা

I গা -া মা | পা -া -ধা | পা র্সা ণা | ধা গা মা I

পথ • ভু লে • • ম র ফি রে ও রে

I পধা -ণা ধা | পমা -গরা গা | মা পা -া | -া মা গা I

সা • ব ধা • নী প থিক • • খো লা

গ [পা]

I {মা -ধা ধা | ধা -া ধা | ধণা -র্সা ণা | ধা পা (মগা)} I

আঁ • খি ছু • টো অ • ন্ধ ক রে দে

প ম

I সা -া সা | রা -া গা | মা -া পা | গা -া মা I সা -া রা |

আ • কু ল • আঁ খি • র নী • রে পথ • ভো

গ ম

I গা -া -া | রা -া গা | মা -া -া I গা -া মা | পা -া ধা |

লো • • পথ • ভো লো • • পথ • ভু লে • •

ধ প র্স ম

I পা র্সা ণা | ধা গা মা II

ম র ফি রে "ও রে"

প র্স র্স

না না না II না না না | না -া র্সা | না -া র্সা | না না র্সা I

সে • • ভো লা প থে • র প্রা • ন্তে র য়ে ছে

র্স ন র্স

I না র্রা র্সা | ণা ধা পা | মপা -ধণা ধা | -া -া -া I

হা রা নো হি য়া র কু • ঞ্জ • • •

ধ ধ ধ

I ণা র্রা র্সা | ণা ধা ধা | ধা র্সা ণা | ধা পা পা I

ঝ রে' প ড়ে আ ছে কাঁ টা ত রু ত লে

প

I সা -া -া | রা -া গা | মা -া পা | গা -া মা I র্সা র্সা র্সা |

র • • ক্ত • কু সু • ম পু • ঞ্জ সে থা হ

গা´ গা´ গা´ | গা´ মা´ রা´ | রা´ সা´ সা´ I না না -া | সা´ -া সা´ |
ই বে লা ভা ঙা গ ড়া খে লা অ কূ • ল • সি

| না -স´রা´ সা´ | ণা -ধা -া I সা -া রা | গা -া -া | রা -া গা |
ন্ধু • তী রে • • পথ • ভো লো • • পথ • ভো

| মা -া -া I গা -া মা | পা -া ধা | পা সা´ ণা | ধা গা মা II
লো • • পথ • ভু লে • • ম র ফি রে "ও রে"

-া -া -া II সা সা -া | রা রা -া | গা -রা গা | মা গা -া I
• • • অ নে ক• দি নে র• স • ঞ্চ য় তোর •

I রা গা মা | পা মা -গা | রা গা -া | -মা -পা -া I
আ গু লি আ ছিস্ • ব সে • • • •

I সা´ মা´ গা´ | রা সা´ ণা | ধা পা পা | ক্ষা পা -া I
ঝ ড়ে র রা তে র ফু লে র ম তন •

I সা সা -রা | গা -া -া | রা রা -গা | মা -া -া I গা গা -মা |
ঝ রুক্ • রে • • ঝ রুক্ • রে • • ঝ রুক্ •

| পা ধা -া | ধা না -া | -া -া -া I সা´ -া সা´ | না সা´ -া |
প ড়ুক • খ সে • • • • আয় • রে এ বার •

| নসা´ -র´গা´ রা´ | স´না সা´ -া I না রা´ সা´ | ণা ধা পা |
সব • হা রা বার • জ য় মা লা প র

| মা -পধা ণা | ধা -া -া I সা -া রা | গা -া -া | রা -া গা |
শি • • রে • • পথ • ভো লো • • পথ • ভো

| মা -া -া I গা -া মা | পা -া -ধা | পা সা´ ণা | ধা গা মা II
লো • • পথ • ভু লে • • ম র ফি রে "ও রে"

মতি ও গতি।

——:*:——

(ছোটর কথা)

আধার অনুযায়ী আধেয়, মন অনুযায়ী মতি। কণিকা আমরা, অতি ক্ষুদ্র; ক্ষুদ্র মতির সকলি ক্ষুদ্র,—দৃষ্টি ক্ষুদ্র, চিন্তা সীমাবদ্ধ, কথা তুচ্ছ বিষয় লইয়া; তাহা তোমাদের ভাল লাগিবে কি? ভাল লাগুক বা না লাগুক, অন্ততঃ তোমাদের মঙ্গলের জন্যই তোমাদের তাহা শোনা উচিত,—প্রকৃতই যদি বড় হও তোমরা। শুনি,—বড়র চিন্তাক্ষেত্র অতি বড়,—কত প্রসারিত,—আকাশ পাতাল পৃথিবী, গ্রহ উপগ্রহ, ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান, আরও কত কি আলোচ্য তোমাদের,—ক্ষুদ্রের মনস্তত্ত্ব কি তাহার বাহিরে? তাহা কি তোমাদের গবেষণার অন্তর্ভূত হওয়া উচিত নহে? উচিত ত! কিন্তু সংসারে অনেক উচিতেরই বাস্তবে অস্তিত্ব নাই—কার্য্যতঃ তাই ক্ষুদ্র তোমাদের দৃষ্টির বাহিরে! কেন? তবে কি তোমরা আমাদের কল্পিত সেই ভূমার প্রাণ—বড় নও? তোমাদের জগত কি তবে ভিন্ন? কেবল কি তাহা তোমাদের দৃশ্যমান পরিধি লইয়া! চিন্তা কি তবে আত্মবিলাসে? মস্তকটা সত্যই তোমাদের উষ্ট্রের মত অনেক উচে—সেই সঙ্গে কি নিজের নিম্নাঙ্গটা পর্য্যন্ত দেখিবার শক্তি হারাইয়াছ—ফাঁকা আসমানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে রাখিতে কি বিস্মৃত হইয়াছ—পদ তোমাদের কোথায়? কাহার বক্ষে,—কাহার বক্ষ-রক্ত নিয়ত ক্ষরিত হইয়া তোমাদের জীবন-প্রবাহ অক্ষুন্ন রাখিতেছে? নতুবা ভুলিতে না—কণিকা বিশ্বের বালুকা, সেও যে পৃথীর অংশ, বৃহত্তমের ক্ষুদ্রতম অঙ্গ সে যে! হ'ক ক্ষুদ্র, হ'ক তুচ্ছ, তবু সে যে তোমাদেরি,—স্বনামধন্যের নগণ্য অংশ। বলিতে পার, হ'ক অংশ, যে অংশ এত ক্ষুদ্র—অস্তিত্ব যাহার অনুভবে আসে না—তাহার চিন্তার লাভ? লাভ কি ক্ষতি সেই হিসাব নিকাশ লইয়াই ত এত গোল—আমাদের সেইটাই জীবন-সমস্যা! আমাদের সমস্যায় তোমাদের কি! পরের ভালমন্দে তোমাদের আসে যায় কি?—তোমরা সে হিসাব নিকাশের বাহিরে—সেইটাই তোমাদের বড়র—আদর্শের মূলে। তোমাদের মনের ভাবের তর্জ্জমা—'বড় আমি, আমরা আবার পরের কাছে জবাবদিহি,—নিজের কাজের জন্য হিসাব নিকাশ কাহার কাছে? আমার সঙ্গে অন্যের তুলনা?' তোমাদের মতে আত্মকার্য্যের জন্য অন্যের নিকট যার যত কম দায়িত্ব—সে তত বড়! দশের সঙ্গে এক নও তোমরা,—তোমার নও তুমি—ওটুকুর মধ্যেও আবার স্বাতন্ত্র্য। আমরা ক্ষুদ্র—চিন্তা আমাদের ভিন্ন প্রকারের; ক্ষুদ্রের একার আর অস্তিত্ব কি,—শক্তিইবা কতটুকু—একা আমরা কিছু নই—অণুতে অণুতে পরমাণু,—বারিবিন্দুতে বারিধি—এই ত আমাদের হিসাব, নিত্য পরের নিকট প্রতি কার্য্যে জবাবদিহি, তাহাতে আমরা বাধ্য, কারণ প্রাণ আমাদের সমষ্টিতে। আমাদের তাই দেহপ্রাণে প্রার্থনা সমগ্রের সাহচর্য্য,—যে শিক্ষায় সে প্রবৃত্তি উদ্ভূত হয় তাহাই। তা' না একি! কেবল আত্মম্ভরিতা,—শিক্ষা কোথায় ভূমাকে এক করিবে,—প্রাণে প্রাণে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া শিক্ষা কোথায় সার্থকতা লাভ করিবে, তা' না শিক্ষিতের লক্ষ্য কেন ব্যষ্টিতে,—"এ মূর্খ ও-অবোধ,—বড় বড় বুলির মালেক আমি—আমার ভাব ও কি বুঝিবে,—মূর্খের দল!—" দেশের চৌদ্দ আনা প্রাণহ তোমাদের অবজ্ঞার! বিধাতার কোন অভিশাপে অমৃত-বৃক্ষে এ বিষ ফল! বিশ্ববিদ্যালয়—একের নয়, দুয়ের নয়, সকলের—বিশ্বের। তাহার উর্ব্বর ক্ষেত্রে 'আলোকলতা' কোথা হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে দেখা দিল,—নিজের নাই বলিতে কিছু নাই,—মূল নাই, পত্র নাই—শক্তি নাই, সামর্থ নাই,—আত্মরক্ষা করিবার কণ্টকটি পর্য্যন্ত নাই—পরের দয়াতে জীবন যাহার,—তাহার একি আশ্রিতের মস্তকে উঠিবার প্রয়াস,—উপকারীর

অপকার করিয়া স্বতন্ত্র হইবার প্রবৃত্তি। কেবল তুচ্ছ বর্ণ ঐশ্বর্য্যে জগত জয়ের চেষ্টা! উদ্বাহু বামনের চন্দ্র পাইবার সাধ;—কেবল প্রবৃত্তির খেলা! দেহ রক্ষায় যাহার দৃষ্টি নাই—সামর্থ্য নাই—যে জানে না কিসে তাহার দীর্ঘ জীবন,—যে জীবনদাতার জীবন পৃষ্ট করিয়া তুষ্ট; ভবিষ্যতের ভাবনা যাহার নাই—গর্ব্বান্ধ হইয়া যে আপনার মূলতত্ত্ব বিস্মৃত, ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াও যে বুঝে না—তাহার তুচ্ছ নখাগ্রের পীড়াও তাহার পীড়া—তাহার আবার শিক্ষা, অস্তিত্ব!—সে বুঝে না ঐযে সমাজ দেহের অন্ধকারাচ্ছন্ন পল্লীর নিম্নস্তরে, জীর্ণচীর পরিহিত, বর্ণহীন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত, মরণোন্মুখ 'ছোটলোক'—অজ্ঞ কৃষক—অনশনক্লিষ্ট তাঁতি, জোলা, অস্পৃশ্য চণ্ডাল—অতি নগণ্য নিত্য অবজ্ঞায়িত অঙ্গ—তাহাদের বৈকল্যে সমগ্র দেহে মৃত্যু সংক্রমণের পূর্ব্ব অবস্থা! ব্যক্তিত্বের সমষ্টিই সমাজ—ব্যক্তির উন্নতি অবনতিতে সমাজের উন্নতি অবনতি,—ব্যক্তিত্বের বিকাশে সমাজে অভিব্যক্তি—তাহা বুঝিবার,—অনুভব করিবার কি কেহই নাই? নিজের দোষ ঢাকিয়া কি করিব? ক্ষুদ্র আমরা, অজ্ঞ আমরা, অত বড় কথা কানে আসে,—হৃদয় সাড়া দেয় না,—তোমাদেরও কি তাই? খাই দাই দিন যায়,—যে দিন না মিলে,—কাঁদি, তোমাদের দ্বার হইতে বিতাড়িত হইয়া ভিক্ষা হইতে মৃত্যুকে সুখের ভাবি,—তখনও ভাবিতে পারি না,—এ দুঃখ কেবল আমার নয়—আমাদের; যে তাড়িত তাহারও ও যে তাড়াইতেছে তাহারও,—সকলের,—সমাজের। এক সূত্রে গাঁথা সকলে,—কে কাহাকে ছাড়িয়া যাইবে—মতি যাহাই হউক—গতি ঐ এক পারাবারে।

এই মহান্ সত্যের অনুভব শক্তি হারাইয়াই ত অজ্ঞের এত গর্ব্ব! স্বাতন্ত্র্য? তুচ্ছ সে ধারণা! ওই না—সাগর বক্ষের তরঙ্গ—অতি অন্তরঙ্গ তাহার,—বড় আদরের; জলধির শক্তিতে তাহার শক্তি, সে কথা মদগর্ব্বে বিস্মৃত হইয়া সে নিজেকে ভাবিয়াছিল, সাগর হইতে স্বতন্ত্র! বড় গর্ব্বে উন্নত মস্তক হেলাইয়া দুলাইয়া গম্ভীর নিনাদে স্বাতন্ত্র্যের জয়গান গাহিতে গাহিতে স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল বেলাভূমে, সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদে, নাম হইয়াছিল সরোবর,—না ডোবা! বড়ই আনন্দ,—সুখের চরম,—একছত্র রাজা সে তাহার সেই দৃশ্যমান্ জগতে। (মোহান্ধ নয়ন বিশ্বসংসার চক্ষে পড়িলে ত!) ঐশ্বর্য্য তাহার কত! প্রজা তাহার অগণিত—ঝিনুক! শম্বুক পঙ্কিল বারিপায়ী বেঙ্গাচী; মস্তকে তাহার বিচিত্র ছত্র—কুমুদ কহ্লার, ধনীর অসীম ধন সুখ। কিন্তু প্রবাহহীন জীবনের অস্তিত্ব কয় দিন! ব্যাধিগ্রস্ত মন,—কম্পহীন জীবন,—সঞ্চরণহীন দেহের অস্তিত্ব কতক্ষণ? স্বাতন্ত্র্যহীনের স্বতন্ত্র থাকিবার চেষ্টা যে বৃথা! তপন যে তাহাকে নিয়ত টানিতেছে,—নিত্য ক্ষীণ সে বাষ্পাকারে—গগন ঘুরিয়া ফাঁকা আসমানে অনর্থক আশ্রয়ের জন্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া আবার তাহার সমুদ্রে গতি—কোথায় স্বাতন্ত্র্য তাহার? মানবকুলে জন্মিয়া মহামান্য সমাজকে উপেক্ষা! যে ব্যথা অঙ্গুলের সে ব্যথা হৃদয়ের—সে বেদনা সর্ব্বাঙ্গের! সত্যই সমাজ অসার, বোধহীন, বোধ-ইন্দ্রিয়ের অভাব তাহার! There is no social sensorium—সমাজের অনুভূতির ইন্দ্রিয় নাই! সমাজের বেদনা ব্যক্তি-বিশেষ বুঝেনা, সকলেই ভাবে তাহার দিন কাটিয়া যাইবে;—মুখে যাহাই বল আমরা ভাবি সমাজের বিপদ অন্যের,—যে সে অবস্থায় বর্ত্তমানে পতিত তাহা তাহার একার। কন্যাদায়গ্রস্তের বিপদ বর-পণে, কন্যায় পিতা মাতা নয় যাহারা, তাহাদের সে সামাজিক আপদে কি! শিশু-মৃত্যু দ্বিগুণ হারে বাড়িয়া চলিয়াছে,—আমার কি, আমার ত একটিও মরে নাই; আশা মরিবেও না—তাহাদের যত্ন লইবার,—ভালভাবে রাখিবার, লালনপালন করিবার আমার শক্তি আছে, আমার ভয় কি? অপারগ যে—সমাজের কলঙ্ক যে—অযোগ্য পিতামাতা যাহারা, তাহাদের বিপদ হওয়াই উচিত। সমাজ মরণোন্মুখ হইয়াও সমাজ-অঙ্গ 'ব্যক্তিত্বে'র এই চিন্তা! কি মোহে? প্রকৃত স্বার্থ কি—কিসে আমাদের দীর্ঘ-জীবন—আমরা ধারণায় আনিতে পারিনা বলিয়া। আত্ম-সর্ব্বস্ব আমরা আপনার

সুখদুঃখে ডুবিয়া ভুলিয়া যাই, জগৎ ব্যষ্টির নহে,—সমষ্টির। তোমাকে ছাড়িয়া আমার অস্তিত্ব কোথা! এ অনুভূতি আমাদের নাই; নাই বলিয়া কি কাহারও নাই? তুমি আমি না ভাবি,—সে ভাবনা কেহই যদি না ভাবে, সমাজের বেদনা কাহারও প্রাণে যদি না স্পর্শে, তবে যে জ্ঞানের মূল্য, প্রাণের মূল্য থাকে না,—শিক্ষা বন্ধ্যা হয়! প্রকৃত জ্ঞানী যে—বড় যে,--উন্নত হইয়াও যে নত, সাধারণ হইতে স্বতন্ত্র, বিশিষ্টতা লাভ করিয়াও সমষ্টি যাহার প্রাণ স্বরূপ, সার্ব্বজনীন মঙ্গলে যাহার মঙ্গল, যাহার সুমতিতে সমাজের গতি—সে কি ছোট-বড় সকলের জন্য না ভাবিয়া পারে? কোথায় সে? তাহার মুখ চাহিয়াই আধিব্যাধিগ্রস্ত নিপীড়িত ক্ষুদ্র আমরা বাঁচিয়া আছি। এস সখা! এস মহান্! বিশল্যকরণী লইয়া এস! সমস্ত দেহে শক্তি সঞ্চারিত হউক্! আমাদের বড়দের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দাও—কেবল দাম্ভিকতায়,—স্বাতন্ত্র্যে জীবন নাই—জীবন একতায়। শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য—জ্ঞানীর সাধারণ হইতে বিশিষ্টতা,—বিকাশ তাহার সমষ্টিতে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিই উন্নতি—সমাজ-দেহের তাহাই পূর্ণপরিণতি।

রেণু।

বাঙ্গলা ভাষা।

—:*:—

শ্রীযুক্ত রাখালরাজ মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িয়া বোধ হয় যেন তিনি আমার প্রত্যেক কথারই প্রতিবাদ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা লিখিতে বসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যেক প্রতিবাদের উত্তর দিয়া আমার সময় ব্যয় করিবার ইচ্ছাও নাই, তদুপযোগী স্বাস্থ্যও নাই। মাত্র কয়েকটা প্রতিবাদের উত্তর দিতেছি। অপরগুলির বিচারের ভার পাঠকগণের প্রতিই অর্পণ করিলাম।

রায়মহাশয় একখানি অনুবাদ পুস্তকে পড়িয়াছেন যে "করকোষ্ঠী গণনা করিতে জানিতেন" এই বাক্যটীর ইংরেজী অনুবাদ Could read the destiny from the lines on the palm of the hand. এই দৃষ্টান্ত হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে একার্থবোধক ইংরেজীবাক্য অপেক্ষা বাঙ্গলাবাক্যে অল্প স্বর থাকে। সিদ্ধান্তটী উপভোগ্য বটে। রায়মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি তিনি কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে ইংরেজীবাক্যটা কি বাঙ্গলা-বাক্যের অনুবাদ না ব্যাখ্যা? আমার স্থূল বুদ্ধিতে ত বোধহয় যে বাঙ্গলা বাক্যটার প্রকৃত অনুবাদ এই :— Knew palmistry. ব্যাখ্যার হিসাবে অনুবাদক বাক্যটা নিম্নলিখিত রূপেও বাড়াইয়া লিখিতে পারিতেন Knew the destiny from the lines on the palm of the hand of a human being and not of an orang outang.

"প্রচলিত" শব্দটা যে কোন কোন স্থানে স্বরান্ত করিয়া উচ্চারিত হয় তাহা জানিতাম না।

"যোজক ক্রিয়াপদ ইংরেজীতে আছে, হিন্দীতেও আছে বাঙ্গলায় নাই, অতএব বাঙ্গলায় ই জিত" এ তথ্যটাও জানিতাম না। ভাষাতত্ত্ববিৎ বলিলেন Varithra is vritra. এই ইংরেজী বাক্যটী বাঙ্গলায় "বরিথ্র বৃত্র" বলিলে কি ঠিক্ হইবে? না "বরিথ্র ই বৃত্র" বলিতে হইবে? যদি তাহা হয় তাহা হইলে কি "ই" কে "হয়" স্থানীয় বলিতে হইবে না?

একার্থদ্যোতক অনেক শব্দের একটী রাখিয়া অপরগুলিকে বাদ দিবার প্রস্তাব আমি করি নাই। সুতরাং রাখালবাবুর সে বিষয়ে তর্ক উত্থাপনের কোন সার্থকতা নাই।

অনেক কথাই জানিতাম না। দক্ষিণ বঙ্গের লোকে যে "রাখিয়া" কে "রাকিয়া" বলে এটাও আমার অজানা ছিল।

ইংরেজী অক্ষর লিখিতে অধিক সময় লাগে কি বাঙ্গলা অক্ষর লিখিতে অধিক সময় লাগে তাহা রায়মহাশয় নিজেই নিম্নলিখিত প্রকারে পরীক্ষা করিয়া লইবেন। পাঁচজন লোককে খুব দ্রুতভাবে এক সময়ে আরম্ভ করিয়া a b g h j l m n এই কয়েকটা অক্ষর কুড়িবার লিখিতে বলিবেন। লেখা শেষ হইলে ঘড়ী ধরিয়া দেখিবেন কতক্ষণ লাগিল। তাহার পর বাঙ্গলায় সেইরূপে অ ব গ হ জ ল ম ন লেখাইয়া আবার ঘড়ী দেখিবেন।

ক্রিয়াবিশেষণ বাঙ্গলা ভাষায় যে দুই চারিটা আছে আমি তৎসম্বন্ধে কিছুই বলি নাই। আমি ক্রিয়াবিশেষণ প্রস্তুত করার কথাই বলিয়াছিলাম। সুতরাং রায়মহাশয় সে সম্বন্ধে যে প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহা খাটে না। "বাঙ্গলাভাষা" স্থলে যে "বাঙ্গলাভাষায়" হইয়া গিয়াছিল তাহা ছাপার ভুল। "মোটেই লাগে না" স্থলে "স্বর মোটেই লাগে না" হইবে।

লাখি ধাতুর অসমাপিকা ক্রিয়ায় "লাথিয়ে" হয় কিন্তু রায়মহাশয় ইহার সমাপিকা ক্রিয়াগুলির রূপ বলিয়া দিবেন কি? দক্ষিণ বঙ্গের প্রচলিত রূপগুলি জানিতে চাহি। বিষ ধাতুর রূপ কয়েকটাও জানিতে ইচ্ছা করি। পরের দ্রব্য হাতান, লোককে ধরিয়া জুতান শিষ্ট প্রয়োগ বলিয়া বোধ হয় না। অন্তত শিষ্ট সাহিত্যে হয় না।

বাঙ্গলায় বিশেষ্যের পূর্ব্বে বিশেষণ ব্যবহৃত হয় আমি এই কথাটাই বলিয়াছিলাম। ভাল মন্দর কথা বলিয়াছিলাম এরূপ মনে পড়িতেছে না। তথাপি সে সম্বন্ধে রায় মহাশয় কয়েকটা কথা বলিতে ছাড়েন নাই। কথাটা যখন তিনি তুলিয়াছেন তখন আমিও দুই একটা কথা তৎসম্বন্ধে বলিতে ইচ্ছা করি। (১) স্বাধীনতা যত থাকে ততই ভাল। সংস্কৃত এবং ইংরেজীতে বিশেষণ কখন কখন বিশেষ্যের পূর্ব্বেও ব্যবহৃত হয় কখন কখন পরেও হয়। মহারাণী স্বর্ণময়ীকে ইংরেজেরা The lady Bounteous বলিতেন। Alexander the Great. George V, Victoria the Good, Richard the Lion hearted প্রভৃতি কথায় বিশেষ্যের পরে বিশেষণ ব্যবহার দেখা যায়। কালিদাস প্রথমে হিমালয়ের নাম করিয়া পরে যৎ শব্দ দিয়া "যং সর্ব্বশৈলাঃ পরিকল্প্য বৎসম্" "অনন্ত রত্ন প্রভবস্য যস্য" প্রভৃতি বহু বিশেষণ বাক্য বলিয়াছেন। এই সকল বাক্যে "তৎ" শব্দ মোটেই নাই। কিন্তু বাঙ্গলায় "বেগুন পোড়া" "আলু ভাতে" "ছোলা ভাজা" প্রভৃতি কয়েকটা কথা ব্যতীত অন্যত্র বিশেষ্যের পূর্ব্বে বিশেষণ বসিতে পারে না। ইহাতে কি বাঙ্গলাভাষার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে বলা যায়? (২) আমাদের প্রথমে সাধারণ জ্ঞান হয় পরে বিশেষ জ্ঞান জন্মে। প্রথমে আমরা সাধারণ ভাবে মনুষ্য চিনি, ধান চিনি, বাঁশ চিনি। পরে জ্ঞান বৃদ্ধি হইলে কৃষ্ণকায় মনুষ্য, শ্বেতকায় মনুষ্য, উড়ি ধান, আমন ধান, শালি ধান, তল্লা বাঁশ প্রভৃতি চিনিতে পারি। সুতরাং বিশেষ্যের পরে বিশেষণের প্রয়োগই স্বভাবানুযায়ী। কিন্তু আমরা এই স্বাভাবিক রীতির অনুসরণ করিতে পারি না। ইহা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা হীনতার অন্যতম লক্ষণ মাত্র। আমরা যাহার তাহার অন্ন গ্রহণ করিতে পারি না, যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে মুখ করিয়া ভোজনে বসিতে পারি না, রবি শুক্র বারে পশ্চিম দিকে যাইতে পারি না এইরূপে সর্ব্ব প্রকারে আমরা ইচ্ছা মত কার্য্য করিবার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইয়া আছি। সুতরাং ভাষাতেও যে আমরা অনেক অস্বাভাবিক রীতি অবলম্বন করিব তাহাতে আশ্চর্য্য কি? লাটিন ও খাসিয়া ভাষায় বিশেষ্যের পরে বিশেষণ বসিয়া থাকে।

আমি লিখিয়াছিলাম আরবীতে গ নাই। রায়মহাশয় ভাবিয়াছেন সেটা ভুল। এরূপ ভাবিবার পূর্ব্বে কোন মৌলবীকে জিজ্ঞাসা করিলেই পারিতেন।

বর্গের চতুর্থ বর্ণ উচ্চারণ করিবার অক্ষমতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি নাকি লিখিয়াছি "তাঁহারা লেখেন দেখা বলেন দ্যাকা।" রাখালবাবু নিশ্চয়ই ইহা ধ্যানে জানিয়াছিলেন।

কেহ বলেন "ইংরেজ" কেহ বলেন "ইংরাজ।" ইহার কোন্‌টা শুদ্ধ। ইংরেজী শব্দ ইংলিশ্। ফ্রান্সে বলে আংগ্লেজ anglaise. মুসলমানেরা বলেন আংগ্রেজ। "ইংরেজ" শব্দ এই গুলির কাছাকাছি না "ইংরাজ?"

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

বাঙ্গলা ভাষা।

—ঃ*ঃ—

উত্তর।

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয় আমার আলোচনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন "তিনি আমার প্রত্যেক কথারই প্রতিবাদ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিলেন।" কোন বিষয়ে সত্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, সে বিষয়ের পক্ষে ও বিরুদ্ধে যত প্রকার যুক্তি তর্ক প্রযুক্ত হইতে পারে সকলগুলিই বিবেচনা করিতে হয়। আর ঠিক সকল কথারই যে বিরুদ্ধে বলিয়াছি এমনও নহে। তিনি বলিয়াছেন "ইংরেজী অভিধানে যেমন প্রত্যেক অক্ষরের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ প্রদর্শন করিবার জন্য সাঙ্কেতিক চিহ্ন থাকা ভাল বলিয়া বোধ হয়।" আমি এই চিহ্ন ও অক্ষর সংখ্যা লইয়া বহু আলোচনা করিয়াছি। আমিও চিহ্নিত অক্ষর প্রচলনের প্রস্তাব করিয়াছি। একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দিলাম। তদ্ভিন্ন তাঁহার অনেক কথা সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করি নাই।

আমি ঠিক এ সিদ্ধান্ত করি নাই যে "একার্থ বোধক ইংরেজী বাক্য অপেক্ষা বাঙ্গলা বাক্যে অল্প স্বর থাকে।" আমার সিদ্ধান্ত এই, "যে সকল ভাষায় কোন সাদৃশ্য নাই অথবা, সাদৃশ্য অল্প সেখানে সাধারণতঃ এক ভাষায় যে ভাব প্রকাশ করিতে অল্প কথা লাগে, অন্য ভাষায় তাহা অনুবাদ করিতে অধিক কথার দরকার হয়।"

"একার্থদ্যোতক অনেক শব্দের একটি রাখিয়া অপরগুলিকে বাদ দিবার প্রস্তাব" সেন মহাশয় করেন নাই। আমার প্রবন্ধে আমি কোথাও সে কথা বলি নাই। যাঁহারা ভাষাকে সরল করিবার প্রস্তাব করেন। ইহা তাঁহাদেরই প্রতি উক্তি। বাঙ্গলা ভাষার আলোচনা-প্রসঙ্গে একথা উঠিয়াছে।

দক্ষিণ বঙ্গের লোকে "রাখিয়া" কে "রেকে" বলেন। "রাকিয়া" ছাপার ভুল বা আমারই লেখার ভুল। বর্গের চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণের অক্ষমতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ সেন মহাশয় লেখেন নাই যে, "তাঁহারা লেখেন দেখা, বলেন দ্যাকা।" আমি লিখিয়াছিলাম "সেন মহাশয় বলেন পূর্ব্ববঙ্গের অশিক্ষিত লোকে কোন বর্গের চতুর্থ বর্ণ উচ্চারণ করিতে পারে না।' দক্ষিণ বঙ্গের শিক্ষিত লোকেও বর্গের ২য় ও ৪র্থ বর্ণ ঠিক উচ্চারণ করিতে পারেন না। যথা তাঁহারা লেখেন, দেখা, বাঘ, কিন্তু পড়েন দ্যাকা, বাগ।" ইহার মধ্যে "দক্ষিণ" হইতে "পারেন না" পর্য্যন্ত অংশ ছাপাখানার দৌরাত্মে ছাপান হয় নাই। "পারে না" ও "পারেন না"য় গোল হইয়াছে।

বাঙ্গলা অক্ষর অপেক্ষা ইংরেজী অক্ষর লিখিতে অল্প সময় লাগে এ কথার ঠিক প্রতিবাদ করি নাই। যুক্তিটা সংক্ষেপে সারিয়াছি বলিয়াই যেন অসম্পূর্ণ হইয়াছে। তাই ভাল করিয়া বলি—

তিনি ইংরেজীর সহিত তুলনা করিয়া প্রথমে বলিয়াছেন "একই অর্থ প্রকাশ করিতে ইংরেজীতে বাঙ্গলা অপেক্ষা অল্প স্বর লাগে।" ইহার জন্য তিনি ইংরেজীর যে বাক্য লইয়া বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গলায় অধিক স্বর লাগিয়াছে। আমি তদুত্তরে একটা বাঙ্গলা বাক্য লইয়া ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া দেখাইয়াছি (ইহা অনুবাদ পুস্তক হইতে গৃহীত) যে স্থল বিশেষে বাঙ্গলা অপেক্ষা ইংরেজীতে অধিক স্বর লাগে। ইহা হইতে এমন সিদ্ধান্ত করি নাই যে, সর্ব্বত্র বাঙ্গলা অপেক্ষা ইংরেজীতে অধিক স্বর লাগে। স্বর অল্প লাগিলেই যে সর্ব্বত্র সুবিধা হয় এমন কথাও বলা চলে না। শব্দ হসন্ত বহুল হইলে উচ্চারণ ও বানান করিতে এবং লিখিতে অসুবিধাই হয়। যথা—ইংরেজীর strength কথায় একটি স্বর, আর "শক্তি" এই কথায় দুটি স্বর। এখানে কাহার পক্ষে সুবিধা? ইংরেজীতে স্বর একটি লাগিল বটে কিন্তু অক্ষর সংখ্যা ইংরেজীতে ৮ আর বাঙ্গলায় ৩ কি ৪। সেইরূপ ইংরেজীর এক একটা অক্ষর লিখিতে বাঙ্গলা অপেক্ষা অল্প সময় লাগে বটে কিন্তু কোন একটা শব্দ বাঙ্গলা ও ইংরেজী উভয় অক্ষরে লিখিতে গেলে কি সর্ব্বত্রই ইংরেজীর জিত হইবে? আমি "শ্রম" ও "ভট্টাচার্য্য" এই দুইটি শব্দ লইয়া দেখাইয়াছি ইংরেজীতে লিখিতে বাঙ্গলা অপেক্ষা অধিক সময় লাগে। আবার এমন অনেক ইংরেজী শব্দও আছে যাহা বাঙ্গলায় লিখিতে অধিক সময় লাগে। ইহা হইতেও আমি এমন সিদ্ধান্ত করি নাই যে বাঙ্গলা অক্ষর লিখিতে ইংরেজী অপেক্ষা অল্প সময় লাগে। অক্ষর সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত এই যে, যে ভাষার শব্দ সেই ভাষাতে যত অল্প সময় লাগে সাধারণতঃ অপর ভাষায় লিপ্যন্তর করিলে তদপেক্ষা অধিক সময় লাগে।

সেন মহাশয় লিখিয়াছিলেন "আরবীতে গ ও চ নাই। * * * ইংরেজীতে ত, থ, দ, ধ, নাই। ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান প্রভৃতি ভাষায় ট, ঠ, ড, ঢ নাই।" আমি আলোচনায় বলিয়াছিলাম "গ" বোধ হয় ছাপার ভুল। সেন মহাশয়ের ভুল বলি নাই। তবে "গ" স্থানে "প" হইবে এইরূপ লিখিয়াছিলাম (কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে "প" ছাপার ভুলে "গ" হইয়াছে) তাহার কারণ এই যে পারসীর বর্ণমালার সহিত আরবীর বর্ণমালা তুলনা করিলে প্রথমেই দেখা যায় যে আরবীতে "প" বর্ণ নাই। আর সেন মহাশয় বলেন যে, "আরবীতে "গ" নাই। এটা ভুল নহে।" তজ্জন্য আমাকে কোন মৌলবীকে জিজ্ঞাসা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সামান্য উর্দ্দু বর্ণমালার জ্ঞান হইতেই আমি বুঝিতেছি যে, আরবীতে প, চ, ট, ড, বর্ণ নাই। আর বাঙ্গলার গ আরবীতে নাই বটে। কিন্তু বাঙ্গলার "গ" এর স্থানে আরবীর "গায়েন" অক্ষরই লেখা হয়, আর আরবীর "গায়েন" এর স্থলে বাঙ্গলায় "গ" লেখা হয়। যথা—গিয়াসুদ্দীন।

সেন মহাশয় বলিয়াছেন "ইংরেজীতে যৎ শব্দ দিয়া যে বড় বড় বিশেষণ বাক্য রচিত হয় বাঙ্গলায় তদ্রূপ হয় না, ছোট ছোট বিশেষণ বাক্য রচিত হইলেও বিশেষ্যকে পুনরাবৃত্তি করিতে হয়।" ইহার উত্তরে আমি যাহা লিখিয়াছিলাম তাহাতে আসল কথাটি আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি নাই। বাঙ্গলায় দীর্ঘ বিশেষণ বাক্য খুব চলে। যথা—যাঁহার ভুজ বলে সসাগরা পৃথিবীর রাজগণ অবনত মস্তকে সিংহাসনে আরূঢ় রহিয়াছেন, যাঁহার কীর্ত্তিগাথা জগতের সর্ব্বত্র উচ্চরবে গীত হয় সেই যুধিষ্ঠিরের ইত্যাদি স্থলে দুইটি বিশেষণ বাক্য রহিয়াছে। এখানে কোন বিশেষ্যেরই পুনরাবৃত্তি হয় নাই। ইংরেজীতে বিশেষণ বাক্য বিশেষ্যের পরে ব্যবহৃত হয় আর বাঙ্গলায় আগে বসে। ইহাই বাঙ্গলার বিশেষত্ব। ইংরেজীতে Restrictive বিশেষণ সাধারণতঃ বিশেষ্যের পূর্ব্বে বসে কিন্তু Restrictive বিশেষণ বাক্য বিশেষ্যের পরে বসে ইহাতে কর্ত্তা ও ক্রিয়ায় দূরান্বয় ঘটে। বাঙ্গলায় বিশেষণ ও

বিশেষণ বাক্য Restrictive হইলে উভয় স্থলেই বিশেষ্যের পূর্ব্বে বসে। ইহা না বুঝিয়া অনেকে অনুবাদে ইংরেজীর অনুকরণে বিশেষ্যের পরে বিশেষণ বাক্য দিতে গিয়া একটা খিঁচুড়ী পাকাইয়া ফেলেন। ইহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ সবুজপত্র ও প্রবাসী হইতে ২টি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। ইংরেজীতে বিশেষণ বাক্যটি বিশেষ্যের অব্যবহিত পরেই বসে কিন্তু ইঁহারা ক্রিয়ার পরে বিশেষণ বাক্যটি দিয়া থাকেন।

Richard the Great প্রভৃতি যে কয়েকটি ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যের পরে বিশেষণের ব্যবহার সেন মহাশয় দেখাইয়াছেন সেগুলি ব্যতিক্রমস্থল। Lords Spiritual প্রভৃতি আর ২।৪টি ব্যতিক্রম স্থল আছে।

সংস্কৃতে পদের প্রয়োগের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। পদটা ওলট পালট করিয়া রাখিলেও বিভক্তির গুণে ধরা পড়ে। তাহার উপর আবার পদ্য। ইহাতে যৎ শব্দের পরে তৎ শব্দ নাই বলিয়া আমার মন্তব্যের ভুল ধরা পড়ে না। গদ্যে সাধারণতঃ যৎ শব্দের পরে তৎ শব্দ থাকে। তদ্ব্যতীত আমার বলিবার উদ্দেশ্য ছিল যে, এই দীর্ঘ বিশেষণ বাক্যের ব্যবহারটাই সংস্কৃতের অনুকরণে।

কোন একটা পদকে বাক্যের মধ্যে যেখানে সেখানে ব্যবহার করিবার অধিকার সংস্কৃতের খুব ছিল, কিন্তু তজ্জন্য বিভক্তি ব্যবহার করিতে হইত। ইহাতে একটা প্রকাণ্ড ব্যাকরণ করিতে হইয়াছিল। এমন পদ ব্যবহারের স্বাধীনতা সত্ত্বেও সংস্কৃত ভাষা মৃত।

সংস্কৃতের ত বা ইত প্রত্যয়ান্ত পদ মাত্রেই অকারান্ত উচ্চারিত হয় ইহাই আমার জানা আছে। কেবল "চলিত" কথাটা কোথাও কোথাও কথ্যভাষায় "চলিৎ" রূপে উচ্চারিত হয়।

শ্রীরাখালরাজ রায়।

গ্রন্থ সমালোচনা

মোহ মুদ্গর,—মূল ও বাঙ্গলা পদ্যানুবাদ, অনুবাদক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য। অনুবাদে মূলের ভাব অক্ষুন্ন আছে; ভাষাও সরল ও সুখপাঠ্য। মোহ-মুদ্গরের ন্যায় নিত্যপাঠ্য সদ্গ্রন্থের (মূলসহ) সুন্দর অনুবাদ হিন্দুর গৃহে গৃহে আদৃত হইবে আমাদের আশা। মূল্য এক আনা। প্রাপ্তিস্থান – ১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা গ্রন্থকারের নিকট।

মুকুল—(কবিতা পুস্তক) শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ৯০ পৃষ্ঠা মূল্য ॥০। 'মুকুল' মুকুলই,—প্রস্ফুটিত পুষ্প নহে। পুষ্পের সৌন্দর্য্য ও সৌরভ মুকুলে সম্ভবে না, তথাপি মুকুলে ভবিষ্যৎ পুষ্পের পরিচয়। এ মুকুল গুচ্ছে সুপুষ্পের প্রাণ আছে,—গন্ধ আছে,—বর্ণ আছে; যত্নে বর্দ্ধিত হইবার সুবিধা পাইলে ইহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হয়। কবির আশাও উচ্চ;—

"একসুরে একপ্রাণে, গাব পূর্ণ করি দিশি
জননী জনমভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

মা, তাঁহার সে সাধ পূর্ণ করুন। কাব্যকে কিন্তু সাধনা করিতে হইবে কঠোর। তাঁহার বক্তব্য অনর্থক শব্দালঙ্কারে ভারাক্রান্ত বা জটিলতা দোষে দুষ্ট না হইলেও তাঁহার লিখিবার ভঙ্গীটি ঠিক একালের মত নয়। এই কবিতা-কলার ছন্দ তালের বৈচিত্রের দিনে, 'অশোক তরুর' কবির ভঙ্গীতে,—

কে তুমি বিহগবর! বলত আমায়;
ভাবেতে বিভোর হয়ে, সুধাধারা বিলাইয়ে,
দিবা নিশি একই সুরে গাহিয়া বেড়াও।"

গাহিয়া বেড়াইলে তাঁহার পক্ষে প্রতিষ্ঠালাভ সহজ হইবে না।

সাতনর'র—শ্রীমতী প্রফুল্লনলিনী সরস্বতী প্রণীত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, পাইকা অক্ষরে ১২৫ পৃষ্ঠা; সুন্দর রেশমী কাপড়ে বাঁধাই; মূল্য ১৷০ পাঁচ সিকা। প্রকাশক—শ্রীযতীশচন্দ্র দাস, ৫৯।২ শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। 'সাতনরে' সাতটি ছোট গল্প। পুস্তকখানির রক্ত-রাঙ্গা রেশমী মলাটে রৌপ্যবর্ণে অঙ্কিত একটি 'সাতনরের' চিত্র;—গল্পসপ্তক যেন তাহারই অনুকৃতি। হারের ছোট বড় নরের মত গল্প কয়টির আকারও অপেক্ষাকৃত ছোট বড়; প্রত্যেকটি নরের কলা-চিহ্ন যেমন বিভিন্ন ভঙ্গিমার, প্রত্যেকটি গল্পেও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন শিল্প-সৌন্দর্য্য মনোমদ করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু শিল্পীর ঐকান্তিক অনুরাগ সত্ত্বেও অনভ্যস্ত কম্পিত হস্তের দৌরাত্ম্য-চিহ্ন সর্ব্বত্র বিদ্যমান; নবব্রতী, রেখার পর রেখা অঙ্কিত করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। আশা—আর একটি রেখায়, আর একটু আলো-ছায়া-সম্পাত-চিহ্নে, বুঝি চিত্র-সৌন্দর্য্য বহুগুণে বর্দ্ধিত হইবে,—আত্মকার্য্যে আস্থাহীন অনিশ্চিতমনা তরুণ-হৃদয়ের সেই অনুরাগই তাঁহার সাফল্যের অন্তরায় হইয়াছে! নতুবা চেষ্টা-যত্ন আয়োজনের ত্রুটি নাই,—প্রেম, আত্মত্যাগ, বান্ধবতা, ঈর্ষা, অভিমান, "ভ্রান্তি", কুস্থানের পঙ্কিল প্রেম বা পূতিগন্ধ, আত্মহত্যা, অশরীরির প্রেম-অভিনয়, ভৌতিককাণ্ড—জাতি-সমাজ-বন্ধনহীন অবাধ-স্বাভাবিক প্রেম,—'প্রেমের কবর', প্রেমিক প্রেমিকার নদী বক্ষে সন্তরণ, 'মৃত্যু-মিলন', 'স্বভাবদুহিতা', সন্যাসী, 'আরাধনা' যুবক, যুবতী, 'জনতাপূর্ণ বিচারালয়ে ফাঁসির হুকুম' 'হরিষে বিষাদ,' হিন্দু রমণীর সতীত্ব এবং অনেক প্রকারের ভাল ভাল কথা,—ফলে বাঙ্কিমী আমল হইতে এক'লের উপন্যাসের সমস্ত জমকাল উপকরণই আবশ্যকের অতিরিক্ত পরিমাণে ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। 'বালিকা গ্রন্থকর্ত্রী' এতগুলি মালমসলা হাতে লইয়া, 'বাঁশবনে ডোম কানার ন্যায়' কোন্‌টি গ্রহণীয়, কোন্‌টি অবশ্য বর্জ্জনীয়, কোন্‌টি কোথায় সংযোজিত হইলে শিল্প-চাতুর্য্য প্রকাশ পায়, বহুদর্শীতার অভাবে তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। এত ভিঁড়ে, বাহিরের এত গণ্ডগোলে, বহু নভেল পাঠের ফলে, 'হিন্দু-ঘরের অনূঢ়-বালিকা' নিজের আদর্শ হারাইয়া ফেলিয়া, দুই একটি এমন প্রেম চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, যাহা কিছুতেই তাঁহার অন্তরের বস্তু হইতে পারে না,—তাহা পরের, বৈদেশিক;—ভারতের, বিশেষতঃ হিন্দু-ঘরের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। হিন্দুর জাতীয়ত্ব রক্ষার প্রধান সহায় স্থিতিস্থাপকগুণযুক্তা হিন্দুরমণী, জাতিনাশা যে প্রেম, তাহা তাঁহার চিন্তার বাহিরে, বালিকা কেন বৃদ্ধারও তাহা কল্পনায় আনিবার অধিকার নাই। সেই অবাধ স্বাভাবিক প্রেম হিন্দু রমণীর পক্ষে অস্বাভাবিক,—পাশ্চাত্য শিক্ষার জড়সর্ব্বস্ব বাহ্যিক চাকচিক্যের প্রভাব যতদিন পর্য্যন্ত না হিন্দুসমাজে পূর্ণভাবে বিস্তার হইতেছে ততদিন অন্ততঃ অস্বাভাবিকই থাকিবে। 'সাতনর'ই তাহার প্রমাণ—গ্রন্থকর্ত্রী সেই অবাধ প্রেম চিত্র নূতন নভেলী ভাব-গঙ্গার প্রবাহে মহিমময় করিয়া চিত্রিত করিতে চাহিলেও যেটি বঙ্গললনার স্বভাবিক আদর্শ, মনের গতি, তাহা অসম প্রেমের মধ্যেও মাথা তুলিয়াছে,—তাঁহাকে তাহার শেষ পরিণাম দেখাইতে হইয়াছে,—হিন্দুর চিরহেয় আত্মহত্যায়! হিন্দুরমণী সে পরিণাম দেখিয়া শিহরিবেন—আকৃষ্টা হইবেন না নিশ্চয়ই! শুনুন—

'সুরথলাল, দিলদারনগরের বাদসাহের একজন শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারী; দর্পিত গর্ব্বিত রাজপুতবংশীয় পরম সুপুরুষ যুবা। সে ভালবাসাকে ভাবিত শুধু একটি বাজে 'সেন্টিমেণ্ট', বড় বিশ্বাস ছিল তাহার হৃদয়ে কখনও রমণীর ছায়া পড়িবে না। কিন্তু এক নিষ্ঠুর, অশুভ মুহূর্ত্তে একবার শুধু এক বিদ্যুতের মত চকিত দৃষ্টিতে দিলদারনগরের নবাবজাদী সখিনার অপ্সরানিন্দিত ভুবন-বিজিত রূপচ্ছবি সুরথলালের নয়ন গোচর হইয়া বিষম উন্মাদনায় তাহার সে দৃঢ়তা, আপনার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস' সৌন্দর্য্য-মোহে না প্রবৃত্তির বশে—কোথায় ভাসিয়া গেল। সুরথ রাজপুত, সখিনা মুসলমানী, কিন্তু অদৃষ্টের (না দুরদৃষ্টের) 'পথ কে রোধ করিবে? 'দাসীর কৃপায় প্রেমিকপ্রেমিকার হৃদয়-ভাব দুজনের কাহারও নিকটে গোপন থাকিল না। 'সুরথ ভুলিয়া গেল সখিনা সাহাজাদী, সখিনা যবনী

ভূত-ভবিষ্যতের চিন্তা তাহার মনে আসিল না', প্রেমিক ও পাগল এক কি না! 'সখিনাও মর্ম্মর কক্ষে মকমলের শয্যায় শুইয়া ভাবে,—তাহার এ কি হইল? চাঁদের আলোয়, পাপিয়ার গানে, ফুলের গন্ধে সখিনা কাঁদে,—কেন সে বাদ্‌সাজাদী হইল!'

'প্রেম কি প্রমাদ গুপ্ত কিছুই থাকে না। প্রেম-কাহিনী ক্রমে বাদসাহের কানে উঠিল; তিনি সুরথের প্রাণ-দণ্ডের আজ্ঞা করিলেন; সখিনা কাঁদিয়া কাটিয়া পিতার পায়ে ধরিয়া' অত ক্রোধাগ্নি চক্ষের জলে জল করিয়া 'তাহার প্রাণ ভিক্ষা করিয়া লইল। দারুণ মর্ম্মদুঃখে ও অপমানে সুরথ দিলদারনগর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এক হাফিজ, অপমানিত সুরথকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন "প্রেম ভালবাসা প্রণয় অনুরাগ স্বর্গীয় পদার্থ— হৃদয়ের জিনিস--আর মন ত কাহারও শাসনের বশ নহে।' সুরথের প্রেমিক-মন কিছুতেই বশে আসিল না, সে লক্ষ্যভ্রষ্ট পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল!

'তিন বৎসর পরে সুরথ আবার দিল্‌দারনগরে ফিরিয়া আসিল। শান্তির দীন ভিক্ষারী এতদিন শান্তির আশায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুঝিয়াছে যে আগুন জ্বলিয়াছে, তাহা নিভিবার নহে,—জগতে তাহার শান্তি নাই! সেই হাফিজের নিকট সুরথ শুনিল, তাহার যাইবার পর দিবসেই সাহাজাদী আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাহার মৃত্যুর পর হইতেই সমগ্র প্রাসাদে এক অদ্ভুত ভৌতিককাণ্ডের আরম্ভ—ভয়ে নবাবস পরিবারে প্রাসাদ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছেন' এখন প্রত্যহ (!) রাত্রে সেই বাড়ীর ভিতর হইতে কাহার অদৃশ্য কণ্ঠস্বর (!) শুনা যায়—"দরজা বন্ধ করিও না, সে যেন আসিয়া ফিরিয়া না যায়!" অশ্রু কাতর কণ্ঠে ডাকে "এস, আমার লাঞ্ছিত, পরাণ বল্লভ প্রিয়তম।"

প্রেমিকের মন কি আর প্রবোধ মানে? সুরথলাল নির্ভীক চিত্তে একেবারে সাহাজাদীর কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল। যাহার জীবনে সুখ নাই—বাঁচিতে সাধ নাই,—তাহার কিসের ভয়? সুরথ শুনিতে পাইল– কে অলক্ষ্যে থাকিয়া এস্‌রাজের সুর মিলাইয়া গাহিতেছে:—"তেরে লিয়ে মেরা দিল্ হ্যায় দেওয়ানী জান্।"
সুরথের গণ্ড বহিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে বলিল—"সখিনা, এই ত এসেছি সখিনা। তোমারই আশায় এসেছি,—তোমারই জন্য তোমারই মত মৃত্যুকে শরণ করতে এনেছি;—জীবনময়ী কাছে এস,—ভাল করে দেখি।"

সখিনা বলিল "আমি যে মৃত, জীবিতের কাছে যাইবার অধিকার হারাইয়াছি! আমার হজরত! স্বামী! তুমি যদি মরিতে পার—তাহা হইলে, আমার সহিত মিলিতে পারিবে। এস প্রিয়তম, এস মনোরম!"

সুরথ কি সে অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারে? বলিল "বল সখিনা, কেমন করিয়া মরিব।"

সখিনা বলিল "নদী গর্ভে ঝাঁপাইয়া পড় প্রিয়তম!" সুরথ নদী বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল,—নদীবক্ষে যবনী প্রণয়িনীর জন্য' রাজপুত 'সুরথলালের হইল' আত্মহত্যায় 'প্রেমের কবর।'

আর একছিল স্বভাবদুহিতা, ভীলের ঘরে স্বর্ণ-প্রতিমা নাম বুনি। বুনি জব্বলপুরে নর্ম্মদা তীরস্থ জঙ্গলে তাহার ভাই বুনোর সহিত খেলিয়া বেড়াইত। প্রফুল্লকুমার--শিক্ষিত যুবক,—কলিকাতায় "সিটি কলেজের" শিক্ষক, বনে বেড়াইতে আসিয়া 'তাহার সুন্দর নীলোৎপল নয়নের সরল চাহনি দেখিয়া' ফাঁদে পড়িল। বুনির সাধের নাম রাখিল 'বনশোভা'। 'বনবাসিনী সরল-স্বভাবা বনশোভা আপনার মনের কথা বুঝিল না। বিংশতিবর্ষীয় যুবক প্রফুল্লকুমার তাহার মনের ভাব বুঝিল।' কিন্তু বিদায় কালে 'সহসা বনশোভার চক্ষু হইতে এক ফোঁটা অশ্রু পড়িল।' তারপর প্রতিদিন প্রফুল্ল, বনশোভাতে দেখা সাক্ষাৎ,—'হাত ধরিয়া পাহাড়ে' ভ্রমণ। আলাপ পরিচয় বেশ জমিয়া উঠিল। প্রফুল্লের দিদির নাম বাসন্তী। বাসন্তী প্রায় বৎসর হইতে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছে। বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য তাহার স্বামী হিরণকুমার, সশ্যালক জব্বলপুরে আসিয়াছেন। বাসন্তী একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন প্রফুল্ল আজ তোর এত দেরী হল?" প্রফুল্লকুমার ভগ্নীর নিকট বসিয়া ভীলবালার সমস্ত কথা বলিল। ভীলবালার

এত রূপ শুনিয়া বাসন্তী আশ্চর্য্য হইয়া বুনিকে দেখিতে চাহিল। পরদিন বুনিকে হাজির করিলে বাসন্তী, তাহার মুখ দেখিয়া মুগ্ধ হইল; তাহাকে স্নানাগারে লইয়া গিয়া সাবান মাখাইয়া স্নান করাইয়া, একখানি 'শৈলধনি শাড়ী' পরাইয়া দিল।' 'জবাকুসুম তৈল' তাহার মাথায় ঢালিয়া দিয়া, চুল আঁচড়াইয়া সুন্দর করিয়া বিবিয়ানা খোঁপা বাঁধিয়া দিল।' কিন্তু মুক্তকুন্তলা বুনি যত সুন্দর, বদ্ধকুন্তলা বুনি তেমন নয়,—বাসন্তী তাহার বেণী খুলিয়া দিল। বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিল—"বনু তোর বিয়ে হয়েছে?" সে ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল 'না।'

'বাসন্তী বনশোভাকে লইয়া যে ঘরে হিরণ ও প্রফুল্ল বসিয়াছিল, তথায় আসিয়া বলিল "দ্যাখ দেখি কি সুন্দর মুখ।' হিরণকুমার বলিলেন "তাই ত' দেখে অবধি আমি অবাক হয়ে গেছি, এত ভীলবালা নয়, যেন দেববালা।"

ভ্রাতা ভগিনী একমন। একদিন বাসন্তী স্বামীকে বলিল "প্রফুল্লর সঙ্গে বুনুর বিয়ে দাও,—আমি ত তোমায় বলেছি, আমার ঐ একটী ভাই।"

হিরণ বুনুকে দেববালা সদৃশ জানিলেও, কর্ত্তব্য বুদ্ধিহারা হন নাই। আজ কালকার দিনেও স্ত্রীর কথা উপেক্ষা করিয়া তিনি উত্তর দিলেন "বাসন্তী, প্রফুল্ল ত পাগল হয়েছেই; আবার তুমিও পাগল হ'লে। ভীলের মেয়ের সঙ্গে প্রফুল্লর বিয়ে দিলে' সমাজ কি বল্‌বে?"

বাসন্তী তবু স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল 'দ্যাখ, আমি ত আর বেশী দিন বাঁচব না। তুমি আমার এ সাধটী কি পূর্ণ কর্‌বে না।'

চিন্তিত হিরণ বলিলেন—'আমি কি কর্‌ব বাসন্তী?' নিরুপায় হিরণ প্রফুল্লকে নানা প্রকারে বুঝাইলেন. "ভীলের মেয়ে বিয়ে কর্‌লে জাত, সমাজ, মানসম্ভ্রম সব হারাতে হবে। আর বনশোভা বনেই শোভা পায়। ঘরে বদ্ধ করে রাখ্‌লে সে সুখী হবে না,—তার জীবন অশান্তিময় হয়ে উঠ্‌বে।"

তার জীবনে অশান্তিময় হবে প্রফুল্লের তাহাতে কি? চোরা কি শুনে ধর্ম্মের কাহিনী? প্রেমোন্মাদ প্রফুল্ল ললাট কুঞ্চন করিয়া কহিল "কেন জামাই বাবু আপনি ত জানেনই আমি জাত সমাজ কেয়ার করি থোড়াই। জাত সমাজ নিয়ে কি হবে, সমাজ কি আমার সুখ দুঃখের ভাগী?" ইহার উপর আর যুক্তি নাই। হিরণ বলিলেন "তোমাদের নিজেদের যা ইচ্ছে হয় করগে। আমি কিন্তু ভীলের মেয়ের সঙ্গে কখনো তোমার বিয়ে দেব না।"

'প্রফুল্ল সদর্পে থিয়েটারী ভঙ্গিতে বলিল "আচ্ছা, জামাই বাবু, আপনি ইহলোকে আমাদের মিলতে দেবেন না; কিন্তু পরলোকেও কি আপনার অধিকার?"

তাহার পর এ প্রেমের পরিণাম যাহা হয় তাহাই ঘটিল। বাসন্তীর অসুখ হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রফুল্ল বনশোভায় একদিন সাক্ষাৎ ঘটিল না। প্রফুল্ল ভাবিতে লাগিল, "আমি যাই নাই, নিশ্চয়ই সে নদীর ধারে আমার জন্য বসিয়াছিল, আহা! বনশোভা কত কষ্ট পাইতেছে! অতি প্রত্যূষেই প্রফুল্ল চলিল নদীতীরে। তথায় আসিয়া দেখিল—বনশোভা তটিনীনীরে ভাসিতেছে। প্রফুল্ল ডাকিল "বনশোভা!" "কি?" "বনশোভা! এত ভোরে জলে কেন? অসুখ কর্ব্বে!" "না, আমাদের অসুখ করে না। কাল তুমি এলে না" কি মর্ম্মান্তিক অনুযোগ! "জল থেকে উঠে এস বুনি।" টিপি টিপি হাসিয়া বনশোভা বলিল, তুমি নদীতে ভয় পাও? আমি ভয় পাই না!" বনশোভা প্রায় নদীর মধ্যস্থলে গিয়াছে। প্রফুল্ল ডাকিল "বনশোভা, ফিরে এস, আর যেওনা।" হাসিয়া বনশোভা বলিল "আমি ফিরিব না, তুমি এস।" প্রফুল্ল "বনশোভা" "বনশোভা" বলিতে বলিতে নদীবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সাঁতার কাটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিল। বনশোভা ডুবিল। তাহার হাত ধরিয়াছিল—প্রফুল্ল কুমার। সেও ডুবিল। নর্ম্মদাবক্ষে আত্মহত্যায় হইয়া গেল "মৃত্যু-মিলন।"

আর একটি গল্প "ভ্রান্তি"—জীবন দিয়া ভুল ভাঙ্গান। বিনয় কুমারের উপর রমার সামাজিক কোন দাবী দাওয়া ছিল না, ছিল কেবল স্নেহের দাবী। তাহার কেহ নাই সম্বল মাত্র "বিনয় দাদা।" বিনয়ই তাহার বন্ধু, বিনয়ই তাহার গুরু। রমা বিনয়ের আশ্রয়ে পালিত। দিন কাটিতেছিল বেশ! বিনয় বিবাহ করিল; নববধূ ভবতারা রমাকে দেখিতে পারিত না। সে বিনয়ের মন ভাঙ্গাইয়া দিল। ভ্রান্ত বিনয় স্ত্রীকে বলিল "তুমি যা বলেছ তা সত্যি—এজগতে কাহারও ভাল করতে নেই!

ভবতারার কৌশলে মুগ্ধ বিনয় কোন কথা না বলিয়া, নিষ্ঠুর নির্ম্মমভাব রমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সম্বলপুরে সম্বলহীনা রমা পড়িয়া রহিল। সর্ব্বনাশ হইয়াছে, বিনয়ের বড় ব্যারাম। ডাক্তারেরা সব জবাব দিয়াছে—এ যাত্রা আর রক্ষা নাই। তান্ত্রিক সাধক কল্যাণী দেবীর পূজারী তাহাকে দেখিতে আসিলেন। ভবতারা সাধকের খড়মে গলার মুক্তামালা দিয়া বলিল "পূজোরী জী, রক্ষা কর ঠাকুর—আমার সিঁতের সিন্দুর বজায় রাখার ব্যবস্থা কর ঠাকুর!" পূজারী বলিল "বড় শক্ত ব্যারাম! যদি পরঘাটা করতে পারা যায় তা হলে উনি এখনি ভাল হন কিন্তু মা, প্রাণের পরিবর্ত্তে প্রাণ দিতে হবে। আমি পূজো করে উঠে যার নাম ধরে ডাকব, সে যদি প্রথম ডাকেই উত্তর দেয়, তা হলে তখনি বাবু ভাল হয়ে উঠবেন,—যে উত্তর দেবে সে তখনি মরে যাবে। ভবতারা শিহরিয়া উঠিল "প্রাণ দেবে কে, পূজোরী জী"! গোলমালের ভিতর হইতে স্নেহ-কোমল-কণ্ঠে ধ্বনিত হইল "আমি দিব।" ভবতারা বিস্মিতা স্তম্ভিতা—কে এ ভিখারিণী! পূজা আরম্ভ হইল। পূজা শেষে পূজারী ডাকিলেন 'রমা।' স্থির কণ্ঠে উত্তর হইল "যাই।" কক্ষান্তরে রমার দেহ ভূমি চুম্বন করিল। রমা মরিল। বিনয়কুমারও পালঙ্কের উপর উঠিয়া বসিল। গৃহে আনন্দ স্রোত বহিয়া গেল। বিনয় সমস্ত শুনিয়া ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন—"রমা রমা!" রমা তখন মহাশূন্যে!

অবশিষ্ট গল্প চারিটিও বেশ Sensational—ঔৎসুক্য উত্তেজক—অনেকেরই ভাল লাগিবে; তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি,—আমাদের নিকট হইতে কয়েকজন পুস্তকখানি লইয়া পাঠ করিয়াছেন,—প্রশংসাও করিয়াছেন; তবে যে সকল পাঠকপাঠিকা সোনারূপোর পার্থক্য বিবেচনায় আনেন না—অলঙ্কারের জমক, চাকচিক্য থাকিলেই তাঁহারা তুষ্ট—সেই শ্রেণীর পাঠকই তাঁহাদের মধ্যে অধিক। শ্রীমতী সরস্বতীর প্রতি সরস্বতীর কৃপা আছে, তাঁহার ভাষা, বলিবার ভঙ্গি সুন্দর—যিনি এই বালিকা বয়সে এরূপ সুন্দর লিখিতে পারেন তাঁহার ভবিষ্যত নিশ্চয় উজ্জ্বল। বাঙ্গালীর সংসার,—মহিলা কেন পুরুষেরও সাহিত্য সাধনার সুযোগ দুর্লভ। মা বীণাপাণী শ্রীমতী সরস্বতীর সহায় হউন। তাঁহার আদর্শ সুনিয়ন্ত্রিত হউক,—কর্ত্তব্য অনুরোধে আমরা তাঁহার আদর্শের ত্রুটি সম্বন্ধে ২।১ কথা বলিতে বাধ্য হইলেও, তাঁহার লিখন ভঙ্গি ও ভাষার মিষ্টত্বের আশা করিয়া থাকিলাম—ভবিষ্যতে তাঁহা হইতে বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টি দেখিতে পাইব।

সেখ আন্দু—(উপন্যাস) শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ২০১ পৃষ্ঠা। দুই রংয়ের কাপড়ে সুন্দর বাঁধাই মূল্য ১॥০ টাকা। প্রকাশক—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

'আন্দু' বঙ্গ-সাহিত্যামোদীর নিকট অপরিচিত নহে। 'প্রবাসী' যখন এই 'পৌরুষকঠিন' অথচ লাবণ্য উদ্ভাসিত, বিশালবক্ষ, আজানুলম্বিত বাহু, সর্ব্বশরীর পেশীসবল, পুষ্টসুন্দর, নম্র স্নিগ্ধ নির্ম্মল-নয়ন, রেশম-কোমল মসৃন কেশদাম শোভিত, স্থপতির আদর্শ, ভাগলপুরী মুসলমান যুবকটিকে বঙ্গীয় পাঠকপাঠিকার সহিত প্রথম পরিচিত করিয়া দেন, তখন অনেকেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অনুরাগ বশে, তাহাকে সাদর সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

এই কর্ম্ম-পাগল যুবার বিবিধ কর্ম্ম কুশলতার মধ্যে তাহার খাঁটি মমতাশীল হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া, তাহার সরল সুন্দর মধুর ব্যবহারে, কোমল (!) সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়া অনেকেই মিঞাজীকে আত্মীয়রূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। যাহার আত্মপর অভিন্ন, অন্তর বাহিরের ব্যবধান অজ্ঞাত, প্রকৃতিই যাহার পরার্থ, বসুধৈব কুটুম্বক যে, আত্মসম্মানে যে অটুট, তাহার বিরাট বান্ধবতা, জাতি সম্প্রদায়, ব্যবসাগত স্থান, কালের প্রতীক্ষা রাখে না, নির্ব্বিচারে অন্যকে আপন করিয়া লয়, অন্যও কোন মাদকতায়, তাহার সহৃদয়তা, সংসর্গে, মনুষ্যত্বের সম্ভ্রম আকর্ষণে এমনি আত্মহারা, এক হইয়া যায় যে তাহার তখন বিচার বুদ্ধি জাগ্রত হইবার অবসর আদৌ থাকে না। আব্দু সেখ্, সেই গুণেই হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টানের, ছোট বড় সকলের হৃদয় জয় করিয়া বসিয়াছে, বন্ধু সে সকলের। কিন্তু বহুর সখা যে, তাহাকে লইয়া অনেক বিড়ম্বনা, সে নিজে নির্লিপ্ত হইলেও তাহাকে লইয়া অনেক দ্বন্দ্ব। বন্ধুর মানন তাহাকে ঘিরিয়া;—বন্ধু বিশেষের নিকট যেটী তাহার সমাদর, অন্য বন্ধুর চক্ষে তাহাই তাহার হতাদর। প্রেমিকের খেয়াল, আপনার আদর্শ তুলায় প্রাণ লইয়া পরখ! পরখকারী সমস্তই প্রেম-অন্ধ। তাহার কোনটি শ্রেয়, কোনটি প্রেয়—কোনটি ত্যাজ্য পরিহার্য্য কে স্থির করে! অন্ধের দ্বন্দ্বে সমস্ত পৃথক করিতে প্রয়াস পাইলেও একাকার! কেন্দ্রে বহু-সখার সেই বিরাট বান্ধবতা, মানবিকতা। বাহিরের দ্বন্দ্ব কোলাহল, আলোচনা সমালোচনা, বাদ প্রতিবাদ, তাহারই সজীবতা, সমপ্রাণতা, জীবন শক্তির পরিচায়ক। আব্দুর ভাগ্যে সে পরিচয় ঘটিয়াছে। কেহ বা তাহাকে একেবারে অন্দরে, ভোজনাগারে সর্ব্ববিষয়ে আপনার মধ্যে টানিয়া লইয়া, নিজকে উদারপন্থী কল্পনা করিয়া আত্মপ্রসাদে আত্মহারা; আবার রক্ষণশীল, ব্রতচারী, নিয়ম-নৈষ্ঠিক, সমাজ-সাশন-অনুমোদনকারী কোন বন্ধু, উদারপন্থীর আচার নিন্দার চক্ষে দেখিয়া, একাকারের অপকার আশঙ্কায় আতঙ্কিত;—আব্দু তাঁহার প্রিয় হইলেও, তাহার স্থান তাঁহার বহির্প্রাঙ্গনে। নৈষ্ঠিকের অনুদারতায় উদারপন্থী কাতর, কিন্তু নির্লিপ্ত আব্দুর তাহাতে কি! সে যে সকলের সকল অবস্থায় বন্ধু,—যে বান্ধবতা মহাপ্রাণতায় প্রতিষ্ঠিত,—তাহার অটল ভিত্তিকে নাড়া দিবার শক্তি ব্যবহারিক সম্মান অসম্মানের নাই—এ সকল ক্ষুদ্রতা সংকীর্ণতার বহু ঊর্দ্ধে সে,—তাহার বান্ধবতা বিরাট—সে বিপদেও বন্ধু, আত্মীয়তার উষ্ণতায়ও সে বন্ধু, ঘৃণা দ্বেষ লাভ করিয়াও তিতিক্ষু—সে সর্ব্বক্ষেত্রে উন্মুখ বন্ধু—উপকারী; অন্যে তাহাকে লইয়া দ্বন্দ্ব করুক—সে সর্ব্বদ্বন্দ্বের বাহিরে—তাহাই তাহার বিশেষত্ব! এমন সর্ব্বসুন্দর মানুষটিতে যে যেমন ভাবের ভাবুক তাহার সেই ভাবটির সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে যদি কেহ আকৃষ্ট হয়,—সে দোষ আব্দুর নহে,—স্বভাবের, মানবের অন্তর্প্রকৃতির—মনুষ্য ধর্ম্মের। সে আকর্ষণে অন্যায় যেটি, অপকার অশুভ যাহাতে, সেটিকে যদি আব্দু ভ্রমেও প্রশ্রয় দিত, তবে না তাহার অপরাধ! অতি শত্রুও তাহাকে সে অপরাধে অপরাধী করিতে পারে নাই। আব্দু রচয়িত্রীর সুনিপুণ হস্ত যাহা অতি স্বাভাবিক সত্য, শিব, সুন্দর তাহাই অতি সতর্কতার সহিত মনোনয়ন করিয়া চিত্রণে যেরূপ কৃতিত্বের ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার, শ্রদ্ধার। পাকা লেখার পাকা পরীক্ষা তাঁহার সংঘাত-চিত্রগুলিতে। অবাধ-অসম-প্রেম চিত্রণে অন্যে যে স্থলে নিন্দিত, আব্দু রচয়িত্রীর সেই চিত্রেই কৃতিত্ব! 'ক' দেখিয়াই কৃষ্ণ প্রেমে 'দশা' ধরে যাঁহারা তাঁহাদের সমস্যা অন্য—কিন্তু যাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত সন্ধানে থাকিয়া দেখিবার ধৈর্য্য রাখেন, তাঁহারা স্পষ্টই দেখিয়াছেন, আব্দুতে রচয়িত্রী অসামাজিকতার, উশৃঙ্খলতার কুত্রাপি প্রশ্রয় দেন নাই—গতানুগতিক বিধি ভঙ্গ, করেন নাই—তাহার দৌর্ব্বল্যকেও অন্ধ-স্নেহ বশে পোষণ করেন নাই,—অবিধির অশুভ, সংস্কারবদ্ধের সংকীর্ণতা, শিক্ষা-সঙ্কট, অল্প শিক্ষিতের দাম্ভিকতায় তিনি নির্ম্মম ভাবে অকম্পিত হস্তে তীক্ষ্ণ অস্ত্রোপচার করিয়াছেন মাত্র—তাহাতে সাময়িক যন্ত্রণায় অস্থির হইতে হইয়াছে অনেককেই,—কিন্তু তাহার শুভ পরিণামে শান্ত তুষ্ট হইবেন সকলেই।

সত্যই লেখিকার দুঃসাহসিকতা অপরিমেয়, তিনি খাতির-নাদারৎ,—তিনি যেরূপ ভাবে মানব-আত্মার বৃত্তি-গুলিকে আবরণ উন্মুক্ত করিয়া যে ভাবে সর্ব্বজন সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহা সকলের সাহসে কুলাইত না। তাঁহাতে এ বিষয়ে চক্ষুলজ্জার 'ল'টি মাত্র নাই। আপনার দোষ, আত্মীয়ের অপরাধ কি এমন করিয়া দেখায়! তাঁহার মানসপুত্র আন্দুর অপরাধকেও তিনি ক্ষমা করিতে পারেন নাই অন্যের ত দূরের কথা! তাহার যে দৌর্ব্বল্য তাহা যেমন ভাবে প্রদর্শিত হওয়া উচিত তদ্রূপ ভাবেই প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট কাহারও ক্ষমা নাই। আন্দু বহু গুণশালী হইয়াও অসহিষ্ণু,—কার্য্য উদ্ধারে তাহার বিরক্তিহীন অনুরক্তি, কিন্তু তাহা যত দিন সে দিকে ঝোঁক থাকে ততদিন,--তাহার পর সে বিদ্যা তাহার আকর্ষণের বাহিরে; অধ্যবসায়, একনিষ্ঠা অখণ্ডিতভাবে তাহাতে বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও সে একটি বন্ধন অভাবে অসহিষ্ণু, তাহার কার্য্যের ফলাফল অন্যে স্পর্শে না—জীর্ণ-দীর্ণ বস্ত্রের মত যখন ইচ্ছা, যে ভাবে ইচ্ছা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে সে স্বাধীন,—তাহার জন্য জবাবদিহি তাহার কাহারও নিকটে নাই;—সর্ব্বপ্রাণে যুক্ত হইয়াও স্বাধীন সে,—কিন্তু এ স্বাধীনতা সমাজে অপরাধ,—সমাজে তাহার সে জন্য শাস্তি অনিবার্য্য;—আন্দুও সে ভোগ হইতে অব্যাহতি পায় নাই—এক দোষে তাহার কত ভোগ! আন্দু প্রেমময় হইয়াও দাম্পত্য-সুখে আস্থা হীন—পরিণাম ফল তাহার—তাহাকে লইতে হইয়াছিল হাতে-হাতে। সংসারের বাহিরে অতি দূরে দাঁড়াইয়াও তাহাকে স্বহস্তে হৃদপিণ্ড ছিঁড়িয়া বলি দিয়া যুক্ত করে ভক্তিভরে গাহিতে হইয়াছে—দাম্পত্য-জীবনের জয় হউক্—তাহার শক্তি অটুট রহুক্--নিষ্কলঙ্ক 'জ্যোৎস্নার'—পৌর্ণমাসীর নির্ম্মল পবিত্র ধারা তাহার স্বামীর প্রেমে বিলীন হইয়া সমস্ত জগৎ-সংসার বিশ্ব-দেবতা বিস্মৃত হইয়া যাক্,--প্রকটিত হউক্—সেই দাম্পত্য-প্রেমের পূর্ণ-প্রভাব! জ্যোৎস্না যে বলে সর্ব্বজয়ী—আন্দু হইতেও জয়ী—শক্তিশালিনী, সে প্রেমের জয় হউক্।

হিন্দুরমণী, উদার লেখিকা, বিবিধ সমাজসংস্কার সমস্যা আন্দুতে উত্থাপন করিলেও তিনি হিন্দুর জাতীয়তা, তাহার বিশেষত্বে, কুত্রাপি অবিবেকীর ন্যায় নির্ম্মম আঘাত করেন নাই, হিন্দুর প্রাণ,—মূল মন্ত্র তাঁহার সুনিপুণ হস্তে, মহাপ্রাণতার মাহাত্ম্যে, মানবিকতার তেজ মহিমায় আরও গৌরবোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, ম্লান হয় নাই কখনই,—সে সন্দেহ ভিত্তিহীন, নিরর্থক! তাঁহার চিত্রিত সজীব চরিত্রগুলির আলোচনা করিলেই তাঁহার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। বোর্ডিং যে শিক্ষাপ্রাপ্তা, বড় লোকের বন্নাছাড়া কন্যা, চিত্তবৃত্তিপ্রবলা লতিকার,—কর্ম্মী, সাহসী, পুষ্ট-সুন্দর, মমতাশীল, পুরুষোচিত সর্ব্বগুণযুত আন্দুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে প্রার্থনা, জ্যোৎস্নার প্রতি তাহার রূঢ় ব্যবহার,—দাদাজীর উদার স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ের প্রেম রাজত্বের অনিন্দ্য-চিত্র,—জ্যোৎস্নার হৃদয়ের উদারতা, গভীরতা, গাম্ভীর্য্য,--কোমলা দৃঢ়া জ্যোৎস্নার সহিষ্ণুতা কত স্বাভাবিক ভাবে 'আন্দু'তে চিত্রিত,—সর্ব্বোপরি ভগবানের পদে,—তীর্থে,--মক্কায়,—কি শান্তি,—প্রেমিক কিরূপে, কোন্ "মরণের অবলম্বনে নিজেকে নিশ্চিন্ত শান্তিতে সার্থক করিয়া তুলে"—তাহার যথোচিত আলোচনা করিবার শক্তিও আমাদের নাই,—স্থানেরও অভাব, সহৃদয় পাঠকপাঠিকা 'আন্দু'কে গৃহে-গৃহে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে বুঝুন -এই আমাদের প্রার্থনা।

কোচবিহার ষ্টেট্ প্রেসে শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও কোচবিহার সাহিত্য-সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত

কুচ জকীর পুস্তক ক প্র চত্র
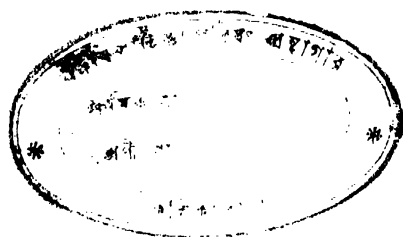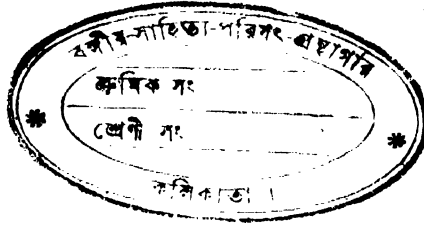
পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

২য় বর্ষ | বৈশাখ, ১৩২৫ সাল। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

ধর্ম্ম।

—:*:—

ওরে মোর বঙ্গ-বাসী ধর্ম্মভীরু প্রাণ, তুই জাগ্
পূর্ণ করি ভরি নিয়ে পুণ্য জ্যোতিঃ দীপ্ত অনুরাগ,
একবার দৃপ্ত তেজে উঠে তুই দাঁড়া সাহসিকা,
আপন আগুন দিয়ে প্রাণে প্রাণে জ্বালাইয়া শিখা
নিরাশার অন্ধকারে, মৈত্রেয়ীর মত পুণ্য বলে
সঞ্জীবিত করি তোল্ অমৃতের শান্তি-মন্ত্র-জলে!

এবার ডুবিল বিশ্ব, এবার মরিল সর্ব্বপ্রাণী,
এর মাঝে কে শুনাবে স্বরগের আশা-মন্ত্রবাণী,
কে বলিবে পুণ্যকথা? চারি দিকে শুধু অবিশ্বাস,
শুধু হিংসা, শুধু দ্বন্দ্ব ফেলিতেছে প্রলয়ের শ্বাস;
মুখে করে আস্ফালন,—সংশয় দোলায় প্রাণ দোলে,
তোমারে ছাড়িয়া এরা নিজ নিজ ধর্ম্ম গড়ি তোলে!

একি ধর্ম্ম ? সে ত নয় নিন্দা প্রশংসার কোন ধন,
সে ত নয় জোগাইয়া চলা শুধু সমাজের মন,
সে ত নয় মানুষের হাতে গড়া গণ্ডী দিয়ে ঘেরা,
তাই নিয়ে দর্প ক'রে, স্পর্দ্ধা ক'রে বেড়াইছে এরা
প্রশংসার আশে আশে ; এতটুকু নাহি প্রাণে ভয়
ভাবে এরা তর্ক করি—দম্ভ করি কেড়ে নিবে জয় !

কি বলিব হে দেবতা, মুখে আজ বাক্য নাহি সরে,
বক্ষ ভেসে যায় শুধু বেদনার অশ্রুর নিঝরে,
মর্ম্ম-বেদনায় ফাটে বুক ; সাধ যায় উঠি তবে
শেষ চেষ্টা দিয়ে আজ অন্তরের বিপুল গৌরবে
বাহিরে দাঁড়াই এসে, একবার ফাটাইয়া প্রাণ
ডেকে দেখি এ জগতে, একবার করি আত্মদান
সুখ, শান্তি, সাধ, আশা ; একবার সর্ব্বস্ব তেয়াগি
দেখাই জীবন মোর সে কেবল তব প্রেম লাগি ।
দেখাই তোমার প্রেমে ডুবে আছি,—আমি মজে আছি,
ধর্ম্মের সমুখে প্রাণ তুচ্ছ হ'তে তুচ্ছ তৃণগাছি,
আরো কি যে সাধ যায়, ভাষা নাই,—তার ভাষা নাই,
সাধ যায় মোর মত সকলের হৃদয় মজাই
তোমার পাগল প্রেমে, সবার জীবন গড়ে' তুলি
পরের জীবন লাগি', সবার হৃদয় দ্বার খুলি
জাতি ধর্ম্ম ভুলে গিয়ে এ জগতে ভাবিতে আপন,
ভিতরে বাহিরে রচি নব প্রেমে নব-বৃন্দাবন ।

কাব্য ও কবি ।

-:*:-

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ ।
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেক মবধীঃ কামমোহিতম্ ॥

কাব্যের প্রথম সৃষ্টি হইল হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ব্যথা বা উচ্ছ্বাসের নীরব পরিস্ফুটন—অশ্রুতে । সুতরাং অশ্রুই কাব্যের প্রাণ আর উহা প্রকাশের যে ভাষা তাহাই হইল কাব্যের দেহ । মহর্ষি বাল্মীকি ব্যাধের নৃশংস ব্যবহার

দর্শন করিয়া হৃদয়ে যে অপার বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন তাহা তিনি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার অন্তর যেন দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। তাই তিনি অশ্রুসিক্তকণ্ঠে হৃদয়ের প্রবলোচ্ছাসে বলিয়া ফেলিলেন, "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ" ইত্যাদি। তিনি যে কি বলিয়া ফেলিলেন তাহা তিনি নিজেই বুঝিতে পারিলেন না। কাব্য বলিয়া পরিচিত হইল তাহাই, যাহা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নয়নদ্বয় সিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

"Our sweetest songs are those that tell of saddest thought." "সব চেয়ে সুমধুর গান—সব চেয়ে দুখের কথাই।" যথার্থই যে তাই। মা তার প্রাণাধিক শিশুপুত্রের অকালমৃত্যুতে পাগল হইয়া কাঁদিতেছেন :—

ও খোকা তোর অঙ্গ পরশ,
　　　　স্বর্গ-সুখ যে দিত,
তোর হাসিতে পরাণ মাঝে,
　　　　ওরে কুমুদ ফুটিত।
আজ কিনা তুই, ছাড়লি মোরে,
　　　　গেলিরে স্বপনদেশে
ফেল্‌লি মোরে শোক্‌-সাগরে;
　　　　রাখ্‌লি পাগল বেশে।

প্রিয়তমা পত্নীর প্রাণবিয়োগের পর জনৈক কবি একদিবস মৃতপত্নীর গ্রামের পার্শ্ব দিয়া নৌকায় যাইতেছিলেন। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে পৃথিবীগাত্রে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। নদী তখন স্থির। মন্দ মন্দ পবন বহিতেছিল। বিহগকুল কুলায় ফিরিতেছিল। নদীর ঘাটে পল্লীবালারা কলসী ভরিয়া জল লইয়া যাইবার জন্য সমাগত হইতেছিল। কবির মনে পড়িয়া গেল যে তাঁহার প্রিয়াও অনেকদিন এই প্রকার জল লইতে আসিয়া হঠাৎ তাঁহাকে নৌকা হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়া ঘোমটা দিয়া দ্রুতবেগে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিত। তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তিনি অশ্রুপূর্ণনয়নে নৌকার মাঝিকে সম্বোধন করিয়া গাইলেন :—

"মাঝি ভিড়ায়ো নাকো
　　　　চলুক তরী নদীর মাঝে।
তরী হোথায় বাঁধ্‌বো নাকো
　　　　আজিকে এ সাঁঝে।

*　　*　　*　　*

"ও নদীর ওই ঘাটেতে,
　　　　এম্‌নি সাঁঝে আমার প্রিয়া
যেত ছোট কল্‌সীটিকে
　　　　কোমল তাহার কক্ষে নিয়া।
সোহাগে জল উথ্‌লে উঠি,
　　　　বক্ষে তাহার পড়ত লুটি
পথে প্রিয়া দেখে আমায়
　　　　ঘোম্‌টা দিত হর্ষে লাজে।"

† শ্রীরামচন্দ্র বাসন্তীসহ গোদাবরী তীরস্থ পঞ্চবটীবনে বসিয়া সীতা-বিরহ-দুঃখ-জনিত বিলাপ করিতেছিলেন। বাসন্তী ধীরে ধীরে রামহৃদয়ে সীতার স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতেছিলেন। রামচন্দ্রের শোকপ্রবাহ তখন অসহনীয় হইল। তিনি "সীতে! সীতে!" বলিয়া রোদন করিতে করিতে সীতার উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেন, "আমি অনেক সহ্য করিয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" বাসন্তী রামকে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে বলিলেন। রাম বলিলেন, "সখি, আবার ধৈর্য্যের কথা কি বল? আজি দ্বাদশ বৎসর সীতাশূন্য,—জগতে সীতানাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে—তথাপি বাঁচিয়া আছি, ধৈর্য্য আবার কাহাকে বলে?" রামের অত্যন্ত যন্ত্রণা দেখিয়া, বাসন্তী তাঁহাকে জনস্থানে অন্যান্য প্রদেশ দেখিতে অনুরোধ করিলেন। রাম উঠিয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাসন্তীর মনে সখী বিসর্জ্জন দুঃখ জ্বলিতেছিল কিছুতেই ভুলিলেন না। বাসন্তী দেখাইলেন—

"অস্মিন্নেব লতাগৃহে ত্বমভবস্তন্মার্গদত্তেক্ষণঃ
সা হংসৈঃ কৃতকৌতুকা চিরমভূদ্গোদাবরী-সৈকতে।
আয়ান্ত্যা পরিদুর্ম্মনায়িতমিব ত্বাং বীক্ষ্য বদ্ধস্তয়া
কাতর্য্যাদরবিন্দকুট্মলনিভো মুগ্ধঃ প্রণামাঞ্জলিঃ॥

(সীতা গোদাবরী সৈকতে হংস লইয়া কৌতুক করিতে করিতে বিলম্ব করিতেন, তখন তুমি লতাগৃহে থাকিয়া তাঁহার পথ চাহিয়া রহিতে। সীতা আসিয়া তোমাকে বিশেষ দুর্ম্মনায়মান দেখিয়া প্রণাম করিবার জন্য পদ্মকলিকাতুল্য অঙ্গুলিদ্বারা কি সুন্দর অঞ্জলিবদ্ধ করিতেন)। ইহাতে রামের দুঃখানলে ঘৃতাহুতি পড়িল। রাম আর সহ্য করিতে পারিলেন না। ভ্রান্তি জন্মিতে লাগিল। তখন উচ্চৈঃস্বরে রাম ডাকিতে লাগিলেন, "জানকি, এই যে চারিদিকে তোমায় দেখিতেছি—কেন দয়া করনা? আমার বুক ফাটিতেছে, দেহবন্ধ ছিঁড়িতেছে; জগৎ শূন্য দেখিতেছি; নিরন্তর অন্তর জ্বলিতেছে, আমার বিকল অন্তরাত্মা অবসন্ন হইয়া অন্ধকারে ডুবিতেছি, মোহ আমাকে চারিদিক হইতে আচ্ছন্ন করিতেছে; আমি মন্দভাগ্য এখন কি করিব?" বলিতে বলিতে রাম মূর্চ্ছিত হইলেন। রামায়ণের এই চিত্রই সর্ব্বাপেক্ষা আমার নিকট ভাল লাগে। আরও করুণ—ভবভূতির রামচন্দ্রের বিলাপ:—

"হা দেবি দেবজনসম্ভবে! হা স্বজন্মানুগ্রহ-পবিত্রিত-বসুন্ধরে! হা নিমিজনকবংশনন্দিনি! হা পাবক-বশিষ্ঠারুন্ধতীপ্রশস্তশীলশালিনি! হা রামময়জীবিতে! হা মহারণ্যবাসপ্রিয়সখি! হা প্রিয়স্তোকবাদিনি! কথমেবং বিধায়াস্তবায়মীদৃশঃ পরিণাম?"*

এই ত গেল রামায়ণের কথা। শকুন্তলা নাটকে দেখিতে পাই মহামুনি কণ্বনেত্র শকুন্তলাকে বিদায় দিবার সময় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল।

কণ্ব এই বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন:—

ভূত্বা চিরায় সাদিগন্তমহীসপত্নী
দৌষ্যন্তমপ্রতিরথং তনয়ং প্রসূয়।
তৎসন্নিবেশিতধুরেণ সহৈব ভর্ত্রা
শান্তে করিষ্যতি পদং পুনরাশ্রমেঽস্মিন্॥

বঙ্গদেশে বিবাহান্তে কন্যাকে স্বামিগৃহে পাঠাইবার সময় মাতাপিতার কি অবস্থা হয় তাহা আর বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু সে দুঃখ কি মধুর!

† —* এই দুই চিত্রের মধ্যবর্ত্তী প্রায় অংশই বঙ্কিমবাবুর বিবিধ প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল সারা প্রাণ।" কাব্য অনুভূতির উচ্চাবস্থাই ত ঐ। এ কেবল উপর উপর বুঝিলে চলিবে না—বুঝিতে হইবে অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা—কাঁদিতে হইবে অন্তরে—যে দুই ফোঁটা জল পড়িবে তাহা হৃদয়ের ময়লা মুছিয়া দিবে। তখন সে অনিমেষ নয়নে কাব্যপ্রণেতার দিকে তাকাইয়া থাকিবে কিন্তু সে দৃষ্টি পৌছিবে—সেই মহামানবের খেয়ার ঘাট পর্যান্ত।

কাব্য লইয়াই কবি। আকাশের দিকে তাকাইয়া মনে মনে খুব কবিত্ব অনুভব করিলাম কিন্তু ক্ষণেকপরে সে ভাব বিলুপ্ত হইল। ইহা হইতেছে কবিত্ব বিকাশের 'অনুপান' অথচ শুষ্কতা ও অপূর্ণতা। প্রকাশই যে কবিত্ব; কাঁদান, হাসান, মাতান ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করাতেই কবির বাহাদুরী। কবিতা যদি

"তার সীঁথায় রাঙা সিঁদুর দেখে
রাঙা হ'ল রঙণ ফুল,
তার সিঁদুর টিপে খয়ের টিপে
কুঁচের শাখে জাগ্‌ল ভুল!

নীলাম্বরীর বাহার দেখে
রঙের ভিয়ান্ লাগ্‌ল মেঘে,
কাণে জোড়া দুল্ দেখে তার
ঝুম্‌কো-জবা দোলায় দুল।
তার সরু-সীঁথার সিঁদুর মেখে
রাঙা হ'ল রঙণ ফুল!"

অথবা

"সে ঘাটে ঘট ভাসায় নিতি
অঙ্গ ধুয়ে সাঁঝের আগে,
সেথা পূর্ণিমা-চাঁদ ডুব দিয়ে নায়
চাঁদ-মালা তায়, ভাস্‌তে থাকে।

জলের তলে খবর পেয়ে
বেরিয়ে আসে মৃণাল মেয়ে
কল্‌মীলতা বাড়ায় বাহু
বাহুর পাশে বাঁধতে তাকে;
তার রূপের স্মৃতি জড়িয়ে বুকে
চাঁদের আলো ভাস্‌তে থাকে!"

এইরূপ হয়—সৌন্দর্য্য যদি এমন ভাবে বিকশিত হয়; তবেই ত মন আকৃষ্ট হইবে। কবির প্রধান উদ্দেশ্যই যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি। ধর্ম্মব্যাখ্যা বা প্রবন্ধমালার মত নীতি-মূলক উপদেশ দিয়া কবিতা লেখাই কবির উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু এ কথা বলিতে পারিনা যে কবিগণ ধর্ম্ম বা নীতি হইতে দূরে অবস্থান করিবেন। কাব্যের উদ্দেশ্য ও নীতির উদ্দেশ্য একই। ধর্ম্মোপদেশক বা নীতিবেত্তা যাহা ধর্ম্ম ও নীতির দোহাই দিয়া করিতে পারিবেন না, কবি তাহা

আদর্শ চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া ও তাহার মধ্যে সৌন্দর্য্যের সমাবেশ করিয়া অনায়াসসাধ্য করিয়া তোলেন। কিন্তু উক্ত তিন জনের উদ্দেশ্য একই।*

কবিগণ কাব্য সৃজন করিবেন এবং সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের মধ্য দিয়া ধর্ম্ম ও নীতির সম্বন্ধ রাখিবেন কিন্তু সে সব থাকিবে ভাবের ঘোরে ও পাঠকের চিন্তা শক্তির উপর। যেমন—

মূত্র-ত্যজিয়া তুলসী'পরে,
কুকুর হর্ষে চলিয়া যায় ;
ভাবুক তাহারে কয়না কিছু,
নির্ব্বোধ রাগে মারিতে ধায়।

কবির সৃষ্টি মধ্যে Epi-grammatic force থাকিলে, সৌন্দর্য্য আরও ফুটিয়া উঠে।

কবির বাহাদুরী সেইখানে—যেখানে তিনি একটী তৃণের সহিত সারা বিশ্বের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দর্শাইতে সক্ষম হইবেন—যেখানে তিনি একটী অপরিচিত বস্তুকে আদর্শ করিয়া এক নূতন জিনিষের সৃষ্টি করিতে পারিবেন—যেখানে তিনি হাসির ভিতর কান্না আনাইতে পারিবেন, জড় পিণ্ডকে মানুষের মত কথা কহাইতে পারিবেন এবং সারা বিশ্বকে আপনার করিয়া লইয়া বলিতে পারিবেন—

সবাই আমার আমিও সবার
এই মহা-সাগরের তীরে

আর যেখানে তিনি নিদাঘ তপনের লোহিত কিরণ মালার অপসরণে, গরবিনী কুমুদিনীর প্রাণনাথ সেই চন্দ্র দেবের প্রথম রজত-কিরণ-ছটায় আম্র মুকুলের সৌগন্ধে অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিতে পারিবেন,—

"আজি আম্রমুকুল সৌগন্ধে
নব-পল্লব-মর্ম্মর-ছন্দে
চন্দ্র-কিরণ-সুধা-সিঞ্চিত অম্বরে
অশ্রু-সরস মহানন্দে
আজি পুলকিত করে পরশনে
(আজি) গন্ধ-বিধুর-সমীরণে।"

শ্যাম বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধা যখন দেখিলেন যে শ্যামরায় তাঁহাকে কিছুতেই ধরা দিতেছেন না, তখন তিনি এই বলিয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পন করিলেন।

"মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দএ তুলসী তিল, দেহ সোঁপল
দয়া জনু ছোড়বি মোয়।
গণইতে দোষ, গুণলেশ ন পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহাওসি
জগবাহির নহ মোঞে ছার॥"

* বঙ্কিম বাবুর বিবিধ প্রবন্ধ হইতে।

কবির এই ভাবেরই বিকাশই কবিত্বের পূর্ণ বিকাশ ও কবির সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য প্রণয়ন।

যখন বিজ্ঞান, দর্শন জগতে ছিলনা তখন কাব্যের প্রথম রেখাপাত। কবি এইজন্য জগতে নূতন নূতন তথ্যের আবিষ্কারক। ভাব ও সৌন্দর্য্যে তিনি চির নূতন। কবি কতগুলি ভাব (ideas) লইয়া জগতে আসেন, সেগুলি তাহার নিজস্ব, তাহার বড়াই তিনি করিতে পারেন এবং তাঁহার দেহান্তের পরেও সে ভাবগুলি জগতে চিরোজ্জ্বল। কারণ তাঁহার কাব্যের সামগ্রী সত্য, ধ্রুব ও অমর সুতরাং কবি অমর। জগৎ কবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আমি যাহা চিন্তা করিয়াছি, আমি যাহা অনুভব করিয়াছি তাহা মরিবে না, তাহা মন হইতে মনে, কাল হইতে কালে চিন্তিত হইয়া, অনুভূত হইয়া প্রবাহিত হইয়া চলিবে। আমার বাড়ী ঘর, আমার আসবাব পত্র, আমার শরীর মন, আমার সুখ দুঃখের সামগ্রী সমস্তই যাইবে—কেবল আমি যাহা ভাবিয়াছি, যাহা বোধ করিয়াছি, তাহা চিরদিন মানুষের ভাবনা, মানুষের বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া সজীব সংসারের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবে।"

আর কাব্য কবির বুকের ধন। অশ্রু তাহার হৃদয়ের মাণিক—সৌন্দর্য্য তাহার নয়নের মণি ও ভাব তাহার সকলের উপরে--কবিত্ব বিকাশের—কাব্য প্রণয়নের পরম সহায়।

শ্রীভবতারণ গুহ ঠাকুরতা।

পল্লীভ্রষ্ট।

—:*:—

আমরা হলাম্ হা' ঘরে সব
কোন্ বিধাতার নিদেশে,
ঘুর পাকেরি চাকরী করি
নিত্যি ঘুরি বিদেশে।
সুখের ঘরে উই ইঁদুরে
আপোষ করে বাস করে,
দুদিন পরে 'উঠান' বিলি,
কর্‌তে হবে 'ঘাস করে'।
সব দুয়ারে কুলুপ চাবি
সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালবে কে,
গ্রীষ্ম কালে তুল্‌সী তলে
গঙ্গা সলিল ঢাল্‌বে কে,

লক্ষ্মী পূজায় আর কি হেতা
পরবে কভু আল্‌পনা
জন্মভূমি স্বর্গসমা
গল্প না হয় কল্পনা।
সদয় যারা বছর পরে
দুদিন আসি যাই চলে
গ্রামের গরিব দুখীর পানে
কজন চাহি ভাই বলে।
সহর ভিতর সহর বাহির
সহর কথা বার্ত্তাতে,
গ্রামের প্রাণে মিশ্‌তে নারি
নাইক দাবী আর তাতে।
গ্রামের ধূলা গায়ের সাথে
মিশ্‌তে নারে ভয় করে,
বুক জুড়ানো গাঁয়ের হাওয়া
নেয় না ত বুক জয় করে।
সাজ্‌তে কুটুম নিজের ঘরে
হয় না মোদের লজ্জা গো
এম্‌নি মোদের বিলাস লালস
নিত্যি নূতন সজ্জা গো।
সহর সুখের বহর ভেবে
সবাই মোরা সরবো কি,
'শীতল গাঁয়ের' হা'ঘারে সব
ঘুরেই কেবল মরবো কি?

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

মঙ্গল-মঠ।

—:*:—

দ্বিতীয় খণ্ড।

—:-*-:—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরদিন নিরঞ্জন সুন্দর-মঠ হইতে গমনোদ্যোগ করিল, কিন্তু মহারাজ তাহাকে ছাড়িলেন না, অন্য সকলেও অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল—সে যখন দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছে তখন তাড়াতাড়ি চলিয়া যাওয়া কেন?—নিরঞ্জন কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ দেখাইতে পারিল না, অগত্যা থাকিয়া গেল।

কিন্তু কয়দিনের মধ্যেই সে স্পষ্ট বুঝিল থাকাটা ভাল হয় নাই। সকলের অজস্র যত্ন, আদর, আপ্যায়নের ভিড়ে সে যেন হাঁপাইয়া উঠিবার যো' হইল,—তাহার উপর চিত্তবিক্ষেপক উপদ্রবও যথেষ্ট ঘটিতে লাগিল। নির্ম্মল-মঠ নির্ম্মাতা নিরঞ্জন ভাস্কর আসিয়াছে শুনিয়া, সহরের অকর্ম্মা, সকর্ম্মা, বিস্তর কৌতূহলী ভদ্রলোক আলাপচারি করিবার জন্য তাহার নিশ্চিন্ত চিন্তার পথে অত্যন্ত উৎপাত জমাইয়া তুলিলেন।—শিল্প-বিলাসী সৌখীন যুবকগণ তাহাকে সমবয়স্ক দেখিয়া, মহা উৎসাহে অসঙ্কোচে শিল্পতত্ত্বের সম্বন্ধে অনাসৃষ্টি জেরার সৃষ্টি করিয়া তাহাকে তিক্ত বিরক্ত করিয়া তুলিত, সৌজন্যের অনুরোধে, ভদ্রসন্তানগণের এই অভদ্র অত্যাচার নিরঞ্জন নিঃশব্দে সহিত। কিন্তু তাহার খ্যাতি-গৌরবে মুগ্ধ সদ্যঃ শিক্ষার্থী ভাস্করগণের কেহ কেহ—যখন সন্ধান পাইয়া 'যৎকিঞ্চিত উপদেশের' আশায় তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইত—তখন বাস্তবিকই নিরঞ্জন বড় অসহায় বিপন্নতা অনুভব করিয়া ক্ষুব্ধ হইত! কোন রকমে আত্মসংযম রক্ষা করিয়া হয় ত কাহাকেও দুইটা কথা বলিত,—নচেৎ অকস্মাৎ শিক্ষা-সদালাপ সভার সম্ভ্রম গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিয়া,—যুক্ত করে ব্যাকুল মিনতিতে বলিয়া উঠিত,—"ক্ষমা করুন,—আমার নিজের শিক্ষা সবই অসম্পূর্ণ,—শেখাবার মত কোন কিছু আজও শিখি নাই!"

রসভঙ্গে বিরক্ত ছাত্রগণ বিদায় লইত। কেহ বা স্পষ্ট অপমান কল্পনায় বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিত। নিরঞ্জন নিজের অক্ষমতায় ক্ষুব্ধ মর্ম্মাহত হইয়া,—ধিক্কার-লাঞ্ছনায় আপনাকে ক্ষতবিক্ষত করিত! ছিঃ এমন অপদার্থ সে, সংসারের এত অযোগ্য তাহার শক্তি!

সংশয়, উৎকণ্ঠা ও আত্মগ্লানিতে তাহার মন যখন একান্ত অধীর হইয়া উঠিল, তখন নিরঞ্জন সকলের স্নেহবন্ধন কাটাইয়া,—গোঁয়ারের মত যুক্তির জাল ছিঁড়িয়া কড়া-জেদের উপর, পলায়নের জন্য সঙ্কল্প স্থির করিল!—সত্যই ত কাজ নাই, বলিয়া সে কি সুন্দর-মঠে আরামের কোলে বসিয়া বসিয়া মিথ্যাই অন্ন ধ্বংস করিবে? অত সহগুণ তাহার নাই।—প্রয়োজনের অনুরোধে;—একজনের জুতা সাফ করিয়াও যদি শরীরের পেশী ও মনের স্বাচ্ছন্দ্যের অব্যাহত সঞ্চালনের সুযোগ থাকে, সেও ভাল,—কিন্তু এ কি হইতেছে? শুধু মানুষের পর মানুষ আসিয়া, অর্থহীন কৌতূহলে, বাজে তর্ক, নিষ্প্রয়োজনীয় যুক্তি ও অসার প্রলাপের প্রশংসা গুঞ্জন শুনাইয়া, তাহাকে অশান্ত—ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছে! এ—অসহ্য কষ্টকর দুর্ভোগ!

কিন্তু এই অসহ দুর্ভোগের মাঝে তবু একটা স্নেহের নেশা তাহাকে অজ্ঞাতে প্রীতিমুগ্ধ করিয়া তুলিতেছিল,—সে মদনানন্দ! প্রত্যহ বৈকালে মহারাজের সহিত নির্ম্মল-মঠে বেড়াইতে যাইবার সময় তাহার মন একটি উন্মুখ-আগ্রহে সচেতন হইয়া উঠিত।—সারাদিনের নিজ্জীব-যন্ত্রত্বের যন্ত্রণা,—সেই সময় যেন আরামের তৃষ্ণায় প্রাণ পাইয়া

বাঁচিয়া উঠিত। মদনকে দেখিলেই কেমন একটা গভীর স্নেহানন্দ তাহার মনকে স্নিগ্ধ করিয়া তুলিত। তর্ক, উপদেশ, শাস্ত্রালাপের মধ্যে, সে নির্নিমেষ নয়নে নির্ব্বাকভাবে মদনের মুখপানে তাকাইয়া থাকিত,—আহা, সংসার অনভিজ্ঞ তরুণ কচি প্রাণ! কি আগ্রহ, কত উৎসাহ, কত উদ্যম বুকে করিয়া সে সরল নির্ভীক হৃদয়ে মহৎ কর্ম্মের সন্ধানে যাত্রা করিয়াছে! কি নির্ম্মল উহার চিত্ত?

মদনের মুখপানে চাহিয়া তাহার স্নেহার্দ্র হৃদয় এক এক সময় অকারণ-উৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া উঠিত, আহা, অবোধ শিশু! নিরঞ্জনের ইচ্ছা হইত দুই বাহু মেলিয়া সে মদনকে নিজের জীর্ণ-বুকের কাছে টানিয়া লইয়া,—গোপনে তাহাকে বলিয়া দেয়, সাবধান বন্ধু, দেখিও যেন হুঁচট খাইও না,—সংসারের পথ বড় বন্ধুর!

নির্ম্মল-মঠে বাজে লোকের হট্টোগোল নাই, উচ্চশ্রেণীর সাধু, সন্ন্যাসী, যতি, ব্রহ্মচারীগণ সেখানে থাকিতেন, বাকী অতিথি অভ্যাগতগণ সুন্দর-মঠে আশ্রয় পাইতেন। নিরঞ্জন সুন্দর-মঠে থাকিত।—প্রত্যহ মহারাজের সহিত বৈকালে নির্ম্মল-মঠে বেড়াইতে গিয়া, সন্ধ্যারতি দেখিয়া, সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিত। মহারাজ সমস্ত দিন পূজা, অর্চ্চনা, আহুত, অনাহুত,—অর্থী, প্রত্যর্থী, কত লোকের সহিত আলাপ আলোচনা, ও বৈষয়িক কার্য্য ব্যবস্থা সম্পাদনের জন্য ব্যস্ত থাকিতেন,—বৈকালে তাঁহার অবসর। কাজেই সারাদিন নিরঞ্জন এদিক ওদিক ঘুরিয়া; সমাগত ভদ্রলোকগণের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া, এবং নিজের পুঁথি পত্র ঘাঁটিয়া,—নিরুৎসাহে অস্বস্তিতে সময় কাটাইতে বাধ্য হইত। কিন্তু এরূপে অলস-শ্রান্তিতে দিন যাপন, আর তাহার ভাল লাগিতেছিল না।

নিরঞ্জনের নীরব স্নেহ আকর্ষণেই হউক, অথবা স্বাভাবিক কৌতূহলপ্রবণতা মাহাত্ম্যেই হউক, মদন ধীরে ধীরে নিরঞ্জনের প্রতি আকৃষ্ট মুগ্ধ হইতে লাগিল; নিরঞ্জনকে তর্কে ভিড়ান যায় না, আলাপে জমান যায় না,—সে কোন বিষয়েই বেশী কথাবার্ত্তা কহে না,—অথচ কোন কিছু ব্যাপারে তাহার অসন্তোষ অপ্রসন্নতা তেমন দেখা যায় না। সর্ব্বদাই সে নিস্তব্ধ,—সকল সময়েই তাহার অধরে স্নিগ্ধ লাবণ্য প্রলেপের মত,—বেদনা-নম্র ক্ষীণ হাস্য বিদ্যমান! মদন যতই তাহাকে দেখিত, ততই আশ্চর্য্য হইত, ততই তাহার ঔৎসুক্য বাড়িত।—নিরঞ্জন এ কি অদ্ভুত মানুষ?—

সেদিন শুক্লা দ্বাদশীর সন্ধ্যা; নিরঞ্জন, মদন ও নির্ম্মল-মঠের প্রধান পণ্ডিত বৃদ্ধ শঙ্করদেব, নির্ম্মল-মঠের অট্টালিকা সম্মুখস্থ প্রশস্ত মর্ম্মর চত্বরে বসিয়া নানা কথা কহিতেছিলেন। মহারাজ বিরলে অন্য কয়জন পণ্ডিতের কাছে বসিয়া,—নির্ম্মল-মঠে একটি ছাত্রাশ্রম খুলিবার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় পরামর্শে ব্যাপৃত ছিলেন। অল্পক্ষণ পূর্ব্বে মন্দিরে আরতি শেষ হইয়া গিয়াছে।

রৌদ্র-রাগ-দীপ্ত নির্ম্মল-হীরক খণ্ডের স্বচ্ছোজ্জ্বল দীপ্তির মত জ্যোৎস্না ঠিক্‌রাইয়া আসিয়া মাটীর বুকে পড়িয়া শান্তহাসি হাসিতেছিল—মঠের চতুর্দ্দিকে সুদূরব্যাপী উদ্যান বাটিকার শান্ত-নিস্তব্ধতা বড় মনোরম,—বড় মধুর বোধ হইতেছিল। নৈদাঘ প্রকৃতির শোভা যেন স্মিত-গাম্ভীর্য্য-শোভন। একটা গূঢ়-অলসতা ঔদাস্যের নিঃশ্বাস ছাড়িয়া,—ক্লান্তভাবে যেন ঝিমাইতেছিল ঝিল্লির ক্ষীণ-করুণ তন্দ্রালস তান, সন্ধ্যার ঝোঁকে অবসন্ন শ্রান্তিতে মৃদু ঝঙ্কারে ধ্বনিত হইতেছিল। জ্যোৎস্না বিভাসিত বিশ্ব-প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-শোভন আকৃতির মাঝে যেন কেমন একটা বিষণ্ণ-ম্লানিমা নির্লিপ্ত ভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছিল। চত্বরের একপাশে নিরঞ্জন পা ঝুলাইয়া বসিয়া,—শ্লথ-বিন্যস্ত হস্তদ্বয় জানুর উপর রাখিয়া,—সম্মুখ দিকে চাহিয়া নির্ব্বাক ভাবে বসিয়াছিল,—পণ্ডিত মহাশয় মদনকে

বুঝাইতেছিলেন,—যতিরাজ রামানুজাচার্য্য প্রণীত 'বেদান্ত- দীপিকার' সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা--বিশ্লেষণ,—ও গূঢ়তম অর্থ।

কথায় কথায় পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন "নীলাচলে শ্যামানন্দ আচার্য্য মহাশয় বেদান্তদীপিকার অদ্বিতীয় মর্ম্মার্থ-বিদ্,—তাঁহার নিকট বেদান্ত দীপিকা, ও ঈশাবাস্যোপনিষদ্‌ভাষ্য আমি কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, তাঁহার পাণ্ডিত্য অতি চমৎকার, তিনি এখন অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছেন, বিদেশে গমনাগমন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব,—কিন্তু নির্ম্মলমঠে তাঁহার মত ব্যক্তির অধিষ্ঠান একান্ত প্রার্থনীয়।"

মদন বলিল "মহারাজ কি তাঁর কাছে পাঠাবার জন্যই উপযুক্ত ছাত্র খুঁজ্‌ছেন ?"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন "খুঁজছেন বটে, কিন্তু সে রকম ছাত্র মেলা দুর্ঘট,—সে সব কাজের উপযুক্ত, 'লাখে-এক' মানুষ, খুঁজ্‌লেই পাওয়া যায় না !—"

অন্যমনস্ক নিরঞ্জন চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল "কি খুঁজলেই পাওয়া যায় না ?"

পণ্ডিত বলিলেন "সাধনার উপযুক্ত সাধক !--যার শক্তি আছে, সে সাধনায় অনিচ্ছুক, যার সাধন-স্পৃহা আছে, সে শক্তিতে অক্ষম, এ রকম লোক যথেষ্ট দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে,—কিন্তু যে দুকূল বজায় রেখে কাজ হাসিল করে, এমন শক্তিমান, একনিষ্ঠ, আত্ম-প্রত্যয়শীল সাধক, কোথায় পাব,—"

মদন সাগ্রহে বলিল "গড়ে নিতে কি পারা যায় না ?"

পণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন "যিনি ভাঙ্গাগড়ার কর্ত্তা তিনিই এর জবাব দিতে পারেন, আমি কি বলব বাবা ?"

নিরঞ্জনের নয়নে একটা আশান্বিত উৎসাহের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল,—তাহার মনে পড়িয়া গেল, মদনের সেদিনকার সেই কথা, যে যথার্থ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু সে তৃণের নিকটও উপদেশ লাভ করিতে পারে !—

হঠাৎ নিরঞ্জন উঠিয়া চত্বর হইতে নামিয়া পড়িল। মঠের তোরণ দ্বারের নিকট গিয়া,—চন্দ্রালোক উদ্ভাসিত ভিত্তিগাত্রে—উৎকীর্ণ শিল্প চিত্রগুলা, সংশয়-উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে—মনে মনে কি যেন একটা কঠোর সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতে লাগিল।

মদন নিরঞ্জনের পানে চাহিয়া আশ্চর্য্যভাবে বলিল, "ঐ একটি অদ্ভুত মানুষ দেখুন,—কথাবার্ত্তা আলাপ আলোচনার মাঝখান থেকে হঠাৎ উনি অমনি করে উঠে চলে যান,—আর একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করুন, কি আশ্চর্য্য ওঁর মুখের ভাব !—নিঃশব্দে চলন্ত ছায়ার মত কেমন ঘুরে বেড়াচ্ছেন দেখুন।"

পণ্ডিত মহাশয় নিরঞ্জনের দিকে চাহিলেন,—ক্ষণেক কি ভাবিলেন, তারপর—বিস্মৃতি-স্মরণে কৃতকার্য্যতার সাফল্যে, সহসা বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"হাঁ হাঁ নিরঞ্জন ভাস্কর ত ? বটে,—আমার মনে পড়েছে, মাস-কতক আগে একজন প্রবীণ ভাস্কর নির্ম্মল-মঠের গঠন-পারিপাট্য দেখ্‌বার জন্যে এসেছিল, লোকটা বিদ্বান এমন কিছু নয়, তবে রসজ্ঞ বটে, সে অনেক দেশ দেশান্তর ঘুরে অনেক দেখেছে শুনেছে, এখনও চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সঙ্গে দুটি শিষ্য ছিল,—সব দেখে শুনে এসে শিষ্য দুটিকে তিনি অনেক কথা বুঝিয়ে দিলেন,—তার মধ্যে একটি কথা আমার মনে আছে—আজ নিরঞ্জনের পানে চেয়ে সেই কথা হাটাৎ মনে পড়্‌ল—"

পণ্ডিতের মুখে নিজের নাম শুনিয়া, নিরঞ্জন ফিরিয়া চাহিল,—তিনি মদনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন দেখিয়া নীরবে অগ্রসর হইয়া আসিল। পণ্ডিতের কথার উত্তরে মদন সাগ্রহে বলিল "কি কথা ?"

পণ্ডিত মহাশয় নিজের সুপক্ক মস্তকের তুষার-শুভ্র কেশরাশির উপর হাত বুলাইয়া,—ঈষৎ হাস্যের সহিত অন্য মনে উত্তর দিলেন "তিনি এখানকার সবচেয়ে ভাল নক্সাগুলির উল্লেখ করে তাদের সূক্ষ্ম মর্ম্ম ব্যাখ্যার সময় বল্লেন

"মানবীয় হৃদয় মনের আশা আকাঙ্ক্ষার সুর যেন এগুলিকে স্পর্শ করে নি, এদের কাছ থেকে সবাই যেন সসঙ্কোচে পিছু হেঁটে তফাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে, নিতান্ত প্রয়োজনে যেখানেই সে রসের অবতারণা আবশ্যক হয়েছে,—সেইখানেই শিল্পীর অকৃতকার্য্যতা ধরা পড়ে—বেশ বোঝা যায় রসভাব স্ফুটনোন্মুখ হয়ে—অকস্মাৎ ইঙ্গিতের অন্তরালে আড়ষ্ট হয়ে গেছে !—এর মধ্যে চমৎকার ভাবে ফুটেছে শুধু একটি ভাবের মহিমা—"

পণ্ডিত মহাশয় থামিলেন। ঘাড় ফিরাইয়া,—উৎসুক অথচ সকরুণ নয়নে নিরঞ্জনের মুখপানে চাহিয়া. সাগ্রহে কি যেন অন্বেষণ করিলেন।—পণ্ডিত মহাশয়ের কথা শুনিতে শুনিতে নিরঞ্জন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল,—প্রবীন ভাস্করের মতামত তাহার অধরে,—নির্দ্বন্দ্ব কৌতুকের স্মিতহাস্যরেখা অজ্ঞাতে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, তীক্ষ্ণদর্শী ভাস্করের দৃষ্টি শক্তিকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়া—সে নিজের স্পষ্ট প্রকাশিত,—গোপন-মূঢ়তার কথাই ভাবিতেছিল ;

পণ্ডিত মহাশয় তাহার মুখভাব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কি বুঝিলেন, জানি না,—অনেক অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন "তিনি বল্‌লেন, এই ওস্তাদ শিল্পী,—ভাবুকের অগ্রগণ্য,—বেশ বোঝা যায়, ইনি,—তীব্র নিষ্পীড়নে উদ্দাম বাসনার রক্ত শোষণ করে, ভাবের তুলি রাঙিয়ে, পাথরের বুকে,—প্রাণের স্পষ্ট-বেদনাকে, জীবন্ত মূর্ত্তিতে এঁকেছেন ! এ শিল্প, শুধু বিশ্বের, রসগ্রাহী ভাবুকের বন্দ্যনীয়, তোমাদের মত ভোগাসক্ত জীবের চিত্ত বোধহয় এর শিল্পে মুগ্ধ হবে না !"

নিঃশব্দে নিরঞ্জনের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল. সে ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া গেল। অদ্ভুত, আশ্চর্য্য !—পরিচিতের দল তাহার, কৃশ ক্ষীণ বাহ্য আকৃতি ও খিন্ন ম্লান বাহ্য প্রকৃতিকে, কৃপাশ্রিত করুণার দৃষ্টিতে দেখে, তাহাকে নির্ব্বোধ প্রকৃতির শান্ত-নিরীহ ব্যক্তি বলিয়া জানে !—কিন্তু ঐ একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি, তিনি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহার হৃদয়ের গতি অনুসরণ করিয়া,—স্বচ্ছন্দে তাহার অন্তঃ প্রকৃতির আকৃতিটা বুঝিয়া লইয়াছেন ! বড় আশ্চর্য্য—বড় অদ্ভুত ব্যাপার !

কিন্তু হাঁ,—অস্বীকার করিবার শক্তি নাই ! তাহার বাহ্য-আকৃতির শক্তি-চাঞ্চল্য হরণ করিয়া তাহার বাহ্য প্রকৃতির স্ফূর্ত্তি-সজীবতা শোষণ করিয়া, সত্যই তাহার অভ্যন্তরে,—তাহার অন্তঃ প্রকৃতির বুকের উপর জ্বালাময়ী প্রচণ্ডতা খরস্রোতে অবিশ্রাম বহিয়া যাইতেছে !—সে যে কি ভয়ঙ্কর, কত নিদারুণ, তাহা জানেন শুধু অন্তর্য্যামী !—হতভাগ্য, নির্ব্বোধ, দুর্ব্বল সে,—সেও তাহার সঠিক সংবাদ রাখিতে অসমর্থ,—সত্য বলিতে সে ত নিশ্চয় কিছু জানে না !

জগৎ তাহাকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখে, কোন্ বুদ্ধিতে বিচার করিতে চায়, তাহা সে জানে না,—জানিতে চাহেও না, কিন্তু আজ অযাচিত আহ্বানে, একজনের কণ্ঠস্বর তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, অদ্ভূত হৃদয়বান্ সে ব্যক্তি !

নিরঞ্জন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে দেখিয়া মদন বলিল "সকল রস আস্বাদনের শক্তি সকলের অনুভূতিতে নাই, পণ্ডিত মহাশয়—এই চন্দ্রালোকে, এ ত যোগী ভোগী সকলের পক্ষেই স্নিগ্ধ আনন্দময়, কিন্তু এর দ্বারা যোগীর মনে যে রস, যে ভাবের সঞ্চার হয়,—ভোগীর মনে ঠিক্ তার বিপরীত ভাব, রসের উদয় হয়,—ধরুন এই গোপী ভাবে প্রেম সাধনা !—এ সাধনা কারো চক্ষে স্বর্গ—কারো চক্ষে নরক !........"

এ সকল তর্ক শুনিতে নিরঞ্জনের ভাল লাগিল না,—এ সকল আলোচনা অন্যের কাছে যতই আবশ্যকীয় হউক,—কিন্তু তাহার ক্লান্তি-পীড়িত হৃদয়ের কাছে আজ—এখন এ-সকল যে নিতান্তই অনাবশ্যক কোলাহল !

নিরঞ্জন ধীরে ধীরে সেখান হইতে ফিরিয়া চলিল, জ্যোৎস্নালোকে সুদূর-বিস্তৃত উদ্যানের শান্ত নির্জ্জনতা বড় তৃপ্তিময় বোধ হইল, লক্ষ্যহীন ভাবে চলিতে চলিতে নিরঞ্জন উদ্যান-প্রান্তে পুষ্করিণীর নিকট আসিয়া পড়িল।

পুষ্করিণীর পাড়ে উদ্যানের মালীর মৃৎকুটীর। কুটীরের দ্বার রুদ্ধ ছিল, দ্বারের ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে ক্ষীণ আলোক-রশ্মি নির্গত হইতেছিল, বোধহয় ভিতরে মানুষ আছে,—কাছাকাছি হইয়া নিরঞ্জনের বোধ হইল যেন, কুটীরের ভিতর হইতে একটা অস্পষ্ট করুণ কাতরোক্তি শুনিতে পাওয়া যাইতেছে!

বিস্ময় চকিত নিরঞ্জন দাওয়ার সম্মুখে থমকিয়া দাঁড়াইল, ভাল করিয়া কান পাতিয়া শুনিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু শব্দ বড় ক্ষীণ—বড় ক্লান্ত অস্পষ্ট বোধ হইল।—নিরঞ্জন অনুসন্ধিৎসু নয়নে চারিদিক চাহিল—কৈ কোথাও ত একটি প্রাণী নাই! অলক্ষিতে তাহার অধর প্রান্তে আপনা হইতে বিষাদের ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল,—হায় এমন সুন্দর শান্ত নির্জ্জনতার বুকে এমন মনোরম জোৎস্নার সৌন্দর্য্য প্রবাহের হৃদয় ভেদ করিয়া—একি ক্লিষ্ট কাতরতাময়ী বেদনা ধ্বনি! অথচ ইহা শুনিবার জন্য কেহ কোথাও নাই!

বিমূঢের মত নিরঞ্জন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কুটীরে কে আছে কিছুই জানে না—কাহাকে ডাকিয়া কিছু সুধাইতে তাহার সাহস হইল না।……অজ্ঞাতে দীর্ঘশ্বাস পড়িল! ওগো একদিন, সে দিন ছিল, যে দিন অমর নির্ভিকতা তাহার তরুণ বক্ষঃ অক্ষয় কবচে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল,—সেদিন তাহার হৃদয়ের মধ্যে চেতন স্পন্দন সজীব ছিল,—জগতের প্রত্যেক সাড়া প্রত্যেক শব্দকে সেদিন সে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করিত, সকল অভাব সকল আহ্বানের উত্তরে, তাহার সুস্থ সচেতন অনুভূতি সাগ্রহে সাড়া দিবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিত; ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল প্রয়োজনের মধ্যে আপনাকে সঁপিয়া দিয়া, সে আত্ম-সার্থকতার তৃপ্তিলাভে ধন্য হইত!—কিন্তু আজ? আজ তাহার সেদিন গিয়াছে, আজ তাহার হৃদয় রিক্ত নিঃস্ব! আজ অভাব সম্মুখে আসিয়া হাত পাতিলে, সে ভয়ে কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে, হৃদয়ের সুপ্তোত্থিত আগ্রহ—সে ক্ষিপ্র ব্যাকুলতার অলস ঔদাস্যের অন্তরালে ঠেলিয়া দিয়া নির্জ্জীবের মত চক্ষু ঢাকা দিয়া অন্ধকারে লুকাইয়া হাঁপ ছাড়িতে পারিলে স্বস্তি পায়! আজ সে এত দীন এত হীন হইয়াছে! এক মুহূর্ত্তের প্রেমের অপরাধে তাহার হৃদয় নিদারুণ অভিশপ্ত হইয়াছে—হৃদয়ের সকল বৈভব ধ্বংস হইয়া গিয়াছে! সে আজ অযোগ্য! অযোগ্য! অযোগ্য তাহার চতুর্দ্দিকে অযোগ্যতার অবসাদ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে, ইহার মাঝখানে দাঁড়াইয়া সে কোন্ লজ্জায় মুখ তুলিয়া চাহিবে!—কোন্ উন্নত গৌরবের চরণে আত্মনির্ভর স্থাপন করিয়া সে অকপট সাহসে পৃথিবীকে ডাকিয়া বলিবে, "ওগো আমি তোমার কাজের যোগ্য!"—না না, সে সব পারিবে, ওটুকু পারিবে না! সে আপনার সহিত প্রবঞ্চনা করিয় মনস্তাপে জর্জ্জরিত হইয়াছে, আর পৃথিবীর সহিত প্রবঞ্চনা করিতে পারিবে না!

সহসা কুটীরের দ্বার ঈষদুন্মুক্ত হইল। একজন অতি শীর্ণকায় বৃদ্ধ একটা ঘটি হাতে করিয়া হামাগুড়ি দিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে দেখিতে পাওয়া গেল,—সে অত্যন্ত ক্লান্তভাবে ঘন ঘন হাঁপাইতেছে, তাহার দৃষ্টি অস্বাভাবিক বিফলতা পূর্ণ!—তাহার সর্ব্বশরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, শ্লথ কম্পিত হস্তে দুয়ারটা টানিতেছে, কিন্তু সেটাকে খুলিতে পারিতেছে না। নিরঞ্জনকে দেখিয়া স্তিমিত ক্ষীণ দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া বৃদ্ধ ব্যাকুলভাবে বলিল "কে, কেগা ওখানে, মহাবীর,—বাপ্ আমার?"

নিরঞ্জন যেন আঘাতের মাঝে আনন্দ পাইল! —আশ্বাস পাইল! তাড়াতাড়ি দাওয়ায় উঠিয়া বলিল "না বাবা, আমি অন্য ব্যক্তি,—তোমার—তোমার কোন সাহায্য, কিছু সাহায্য করতে পারি কি?—'

কি বিনয়-নম্র অনুমতি প্রার্থনা! বৃদ্ধ বিহ্বল-নয়নে চাহিয়া বলিল "তুমি, তুমি,—কেগা?"

কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া নিরঞ্জন বলিল "আমি বিদেশী অতিথি, সুন্দর-মঠের অতিথি—তুমি পীড়িত বোধ হয়, তোমার কি দরকার আছে, আময় বল্‌বে ?"

কি সকরুণ অনুনয়!—কৃতজ্ঞ বিস্ময়ে বিচলিত বৃদ্ধ তাহাকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য, সজোরে দুয়ারটা টানিয়া খুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু রুগ্ন দেহ সে বেগ সহ্য করিতে পারিল না, বৃদ্ধ টলিয়া পড়িবার উপক্রম হইল—নিরঞ্জন—কুণ্ঠা দ্বিধা ভুলিল, তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া ক্ষিপ্র সতর্কতায় পতনোন্মুখ বৃদ্ধকে জড়াইয়া ধরিয়া, ব্যগ্র সান্ত্বনার স্বরে বলিল, "স্থির হও স্থির হও,—ব্যস্ত হোয়ো না, কি চাই বল আমি দিচ্ছি—"

অৰ্দ্ধ সংজ্ঞাহীন বৃদ্ধ কথা কহিতে পারিল না,—তাহার কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছিল, জিহ্বা ভিতরে টানিতেছিল, অসাড় হাত দুইটা যথাসম্ভব ব্যগ্রতার সহিত সঞ্চালন করিয়া, হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া সে জলের ঘটিটা খুঁজিতে লাগিল। নিরনঞ্জ প্রথমটা তাহার মনোভাব বুঝিতে পারে নাই—পরে ঘটির দিকে দৃষ্টি পড়াতে—ত্রস্তে সেটা তুলিয়া বৃদ্ধের মুখে জল দিতে গেল, কিন্তু হায় জল যে তাহাতে কিছুমাত্রও নাই !—ব্যাকুল হইয়া নিরঞ্জন ঘরের ভিতর দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু দুর্ভাগা, কোথায় জল ? তৈজসপত্র বিছানা মাদুর কাঠ-কুটরা, ভাঙ্গা বাক্স ইত্যাদি দীন গৃহস্থের সামান্য জীবন যাত্রার আয়োজন উপকরণে সমস্ত ঘর ঠাসা রহিয়াছে,—সেখানে বোধহয় সংসারের সকল আসবাবই সাজান আছে, নাই শুধু—একটু জল! আর একটা শূন্য জলপাত্র এক কোণে উপুড় করা রহিয়াছে,—নিরঞ্জন প্রমাদ গণিল !

আর এক মুহূর্ত্তের বিলম্বে হয় ত বৃদ্ধ প্রাণ হরাইবে,—দ্বিধাহীন হইয়া নিরঞ্জন চৌকাঠের কাছে মাটীর উপর বৃদ্ধের দেহ শোয়াইয়া দিয়া, জলের ঘটি লইয়া ঊৰ্দ্ধশ্বাসে পুষ্করিণীর দিকে ছুটিল। অবিলম্বে জল লইয়া ফিরিল, বৃদ্ধের মুখে চোখে জল সিঞ্চন করিতে করিতে, তাহার আড়ষ্ট জিহ্বার জড়তা ঘুচিল ; শ্রান্ত বৃদ্ধ কম্পিত ওষ্ঠে বলিল "ভাগ্যে তুমি এসেছিলে বাবা, ভাগ্যে দয়া করে এসেছিলে,—আজ জলের জন্যে আর একটু হ'লে প্রাণ হারাতুম, তুমি আজ আমায় বাঁচালে !"

কৃতজ্ঞ সন্তোষে নিরঞ্জনের বুক ভরিয়া গেল,—সে বৃদ্ধকে বাঁচাইয়াছে, না বৃদ্ধ তাহাকে বাঁচাইল !

সযত্নে বৃদ্ধকে তুলিয়া ছিন্ন মলিন কন্থা রচিত শয্যার উপর শোয়াইয়া দিয়া নিরঞ্জন তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বাতাস করিতে লাগিল, কোন কথা বলিতে পারিল না,—তাহার মনে পড়িতেছিল আর একটা রজনীর এমনই একটা ঘটনার কথা! সে ঘটনা এই সুন্দর-মঠে ঘটিয়াছিল! যন্ত্রণা-কাতর চিত্তরঞ্জনের পীড়িত কণ্ঠস্বর,—প্রয়োজনের ব্যগ্র আহ্বান সে দিন দৈব দুর্ব্বিপাকে হতভাগ্য নিরঞ্জনের বধির কর্ণে স্থান পায় নাই, সেই ক্ষোভে তাহার সমস্ত প্রাণ উন্মাদ, অধীর হইয়া উঠিয়াছিল—আজ এতদিনের পর সেই গ্লানি বিক্ষোভ মোচন করিবার জন্য করুণাময় কি সদয় হইয়া এই সান্ত্বনাটুকু লাভ করিবার সুযোগ দিলেন !—

লোক হিত ! লোকহিত !—ওরে কোন মূর্খ জগতের উপকারের জন্য,—নিঃস্বার্থ নিষ্কাম সাজিয়া লোকহিত-ব্রত পালনের আইন কানুন গড়িয়া—লক্ষ কথার আড়ম্বরে জাঁকাইয়া বিধিব্যবস্থার উপদেশ দেয় ? মূর্খ নিরঞ্জন মিথ্যাই এত দিন নিজের অযোগ্যতাকে অভিশাপ দিয়া জগতের কাজ হইতে আপনাকে সুদূরে স্বতন্ত্র রাখিয়া সভয়ে সতর্ক হইয়া চলিয়াছে ! ওরে মূর্খ দাম্ভিক, জগতের উপকার তুমি কর, নাই কর, জগতের তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, তুমি শুধু নিজের দুর্ব্বুদ্ধিদোষে নিজের উপকারের শক্তি হারাইয়াছ, নিজের উন্নতি সাধনের পথে জড় নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছ,—ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ, কাহারও তাহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই ! লোকহিত ?—ওরে নির্ব্বোধ, তাহার প্রকৃত অর্থ যে আত্মহিত,—শুধু আত্মহিত !—জড় দৃষ্টি লইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া

আছ, ভিতরের সূক্ষ্ম অনুভব চেতনা, তাই জড়তায় স্তম্ভিত হইয়া পড়িতে বাধা হইয়াছে!—যে ফুল একদিন বৃক্ষের শাখাগ্রে ফুটিয়া উঠে,—শুধু তাহার দিকে চাহিয়া সেইদিনই তোমরা বিস্ময় আনন্দে 'বাহবা' দাও—কিন্তু মনে রাখিতে ভুলিয়া যাও,—কোন গোপন অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া মাটির ভিতর হইতে রস শুষিয়া কে তাহার প্রাণশক্তি সংগ্রহ করিতেছে!—যে সাফল্য একদিন পূর্ণ সৌন্দর্য্যে প্রকটিত হইয়াছে, কত দিনের কত যত্ন কত, চেষ্টা, কত আয়োজন—অবিশ্রাম তাহার পশ্চাতে খাটিয়াছে! জগতের উপকার? হায় ভ্রান্তি! জগত কি কাহারও উপকারের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিয়া আছে, জগদীশ্বর তত নির্ব্বোধ নহেন, তিনি তোমার সাহায্য প্রত্যাশায় তাঁহার সৃষ্টি নির্ম্মাণ করেন নাই,—তিনি দয়া করিয়া তাঁহার জগৎ তোমার সম্মুখে বিকশিত করিয়াছেন, তোমারই উপকারের জন্য, তোমারই সাহায্যের জন্য! তোমার আত্মবৃত্তি সাধনার জন্য তিনি এখানে সহস্র, লক্ষ, কোটী উপকরণ সাজাইয়া রাখিয়াছেন!—হৃদয়কে জাগ্রত করিতে চাও, প্রাণকে বলিষ্ঠ করিতে চাও, আত্মাকে আত্ম-মহিমা উপলব্ধি করাইতে চাও,—নিজের রুগ্ন অবসাদ ঝাড়িয়া স্বাস্থ্যের জন্য, শক্তির জন্য,—একাগ্র চেষ্টায় ব্যায়াম কর,—তৃণের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান খুঁজিয়া পাইবে!—কিন্তু শুধু অলস ঔদাস্যের আশ্রয়ে নির্জ্জীবের মত যদি থাক, স্বয়ং ব্রহ্মা আসিলেও তোমায় ব্রহ্মজ্ঞান দান করিতে সমর্থ হইবেন না!

ক্লান্ত বৃদ্ধ চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল, নিরঞ্জন নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া নিজের কাজ করিতে লাগিল।—ক্ষুদ্র গৃহের মধ্যে একটি মাত্র ক্ষুদ্রতম বাতায়ন, তাহাও রুদ্ধ; সমস্ত গৃহ বিবিধ উপকরণে আবর্জ্জনা পূর্ণ, তাহাতে আলোকের তাপ, রোগীর নিঃশ্বাস, গৃহ মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্যের হাওয়া যেন এতটুকুও ছিল না,—কিন্তু নিরঞ্জনের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই! এতক্ষণ সে বাহিরের মুক্ত চন্দ্রালোকে শান্তি স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে বৃথাই ঘুরিতেছিল! কোথাও বাঞ্ছিত তৃপ্তি খুঁজিয়া পায় নাই,—এতক্ষণে এইখানে আসিয়া এই অসহায় অসুস্থের সেবায় আপনাকে অকপট আগ্রহে নিবেদন করিয়া দিয়া,—এইবার সে স্বস্তি পাইল এই ক্ষুদ্র আনন্দ স্পর্শের মাঝে সে যেন জড়তা হইতে মুক্তি লাভ করিল তাহার সমস্ত হৃদয় মন ছাপাইয়া চঞ্চল উদ্দাম স্রোত জাগিয়া উঠিল—মুগ্ধ বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া নিরঞ্জন ভাবিতে লাগিল এক মুহূর্ত্তের আশীর্ব্বাদে, অভিশাপে, যে জীবন মৃত্যু আবির্ভূত হয়,—ইহা কি আজ নাস্তিকের মত অস্বীকার করিবে?—যে রূপকে আজ অন্তরে প্রত্যক্ষ চেতনায় উপলব্ধি করিতেছে, ইহা কি আজ রূপক কল্পনা বলিয়া অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিবে? ইহা কি সত্যই শুধু অলীক ভাবাতিশয্য মাত্র?

হউক,—পৃথিবী যাহা কিছু ভাল ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, তাহা ত ভাবাতিশয্যেরই ফলে!—অভাবের অত্যাচারে যাহা ঘটিয়াছে তাহা জড়ত্ব, মূঢ়ত্ব, পাশুত্ব মাত্র!—এ ভাবোন্মাদনা যতই অসার হউক, কিন্তু সে চেষ্টা করিয়া দেখিবে, ইহার মধ্যে কিছুও সারকে খুঁজিয়া পায় কি না.........!

যাক, মানুষের রসনা-সৃষ্ট সমস্ত তর্ক দ্বন্দ্বের কোলাহল, স্থূলত্বের বিচার বিশ্লেষণের পশ্চাতে একান্তভাবে পরিসমাপ্ত হউক!—নিরঞ্জন এবার তাহার গণ্ডি কাটিয়া আপনাকে বাহির করিয়া লইবে!—প্রকৃতিকে আপনার পথে স্বচ্ছন্দ স্রোতে মুক্ত হইয়া ছুটিতে দিবে!

জড়ভোগের বিরুদ্ধে তাহার হৃদয় মন চিরদিন বিদ্রোহী হইয়া আছে!—তাই ত পার্থিব বাসনা যখনই তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে আসে, তখনই তাহার অন্তরাত্মা জলাতঙ্ক রোগীর মত আতঙ্কে উন্মাদ হইয়া উঠে!—পৃথিবীর ভোগাসক্ত মানব প্রকৃতির সহিত তাহার প্রকৃতির যোগ নাই—মিথ্যাই জবরদস্তি করিয়া মাথা ঠুকিয়া মরিতেছে! পৃথিবী বিপুল আয়োজন সাজাইয়া তাহার ক্ষুধিত প্রকৃতিকে স্নেহ-কোমল আহ্বানে বারে বারে

ডাকিতেছে, কিন্তু সে মূঢ় অভিমানে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া নিজের তৃষ্ণা পীড়িত হৃদয়কে কেবলই নির্দ্দয় শাস্তি দিতেছে,—তাহার ক্ষুধার যোগ্য খাদ্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু হতভাগা সে শুধু গ্রহণের যোগ্যতা হারাইয়াছে।

মুক্ত দ্বার পথে দুই ব্যক্তি কক্ষে ঢুকিল। নিরঞ্জন চাহিয়া দেখিল, উদ্যানের মালী ও স্থানীয় চিকিৎসক। অনুমানে বুঝিল মালী চিকিৎসককে ডাকিতে গিয়াছিল, এবং ইহাও আপন মনে সিদ্ধান্ত করিয়া লইল,—যে পীড়িত ব্যক্তি মালীর আত্মীয়, সম্ভবতঃ পিতা! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সে কোন প্রশ্ন কাহাকেও সুধাইল না, নির্ব্বাক ঔদাস্যে একবার শুধু আগন্তুকদ্বয়ের দিকে চাহিয়া,—ঠিক পূর্ব্বের মতই অচঞ্চল ভাবে নিজের কাজে নিযুক্ত রহিল।

মালী নিরঞ্জনকে মহারাজের সহিত যাওয়া আসা করিতে অনেকবার দেখিয়াছে, সুতরাং চিনিতে পারিল। কুণ্ঠিত বিস্ময়ের সহিত নমস্কার করিয়া বলিল "আপনি এখানে এ কি কষ্ট কর্‌ছেন মহাশয়, কতক্ষণ এসেছেন?"

নিরঞ্জন কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। বৃদ্ধ চক্ষুরুন্মিলন করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল,—"মহাবীর এসেছ? আজ বড় কষ্ট পেয়েছি বাপ, ঘটিতে জল ছিল না, তৃষ্ণায় কাতর হয়ে নিজেই পুকুরে যাব বলে উঠেছিলাম, কিন্তু দুয়ার পর্য্যন্ত গিয়ে, আর পারি নি,—ভাগ্যে এই ভদ্রলোক এসে পড়েছিলেন,—এঁর কৃপাতেই আজ প্রাণ পেয়েছি বাপ্।"

মালী অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বলিল "বাবা, ইনি যে মোহন্ত মহারাজের পার্শ্বচর—"

ব্যাকুল বিনয়ে বৃদ্ধ সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল "আপনি মহারাজের পার্শ্বচর, আমি ত জানি না, না জেনে আপনাকে কত কষ্ট দিয়েছি, কত অপরাধ করেছি—আমায় ক্ষমা করুন।"

এই কৃতজ্ঞতার অভিবাদন নিরঞ্জনের কাছে কর্কশ অত্যাচারের মত বোধ হইল;—অসহ্য বাড়াবাড়ি মনে হইল! কিন্তু ইহাকে খর্ব্ব করিবার উপায়ও সে খুঁজিয়া পাইল না, তাহার বাক্‌শক্তি যেন রোধ হইয়াছিল। অসহিষ্ণু ভাবে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার ইচ্ছা হইল, রোগীর সেবা শুশ্রূষা ফেলিয়া নির্দ্দয়ের মত পলাইয়া গিয়া কৃতজ্ঞতার উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষা করে, কিন্তু তাহাও পারিল না, নিশ্চল ভাবে রোগীর শিয়রে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বৈদ্য, রোগীকে পরীক্ষা করিয়া প্রসন্ন মুখে বলিলেন, "কোন আশঙ্কা নেই, ব্যাধির এ প্রকোপ বৃদ্ধি আরোগ্য লাভের পূর্ব্ব লক্ষণ,—আজ এখনই জ্বর ত্যাগ হবে, রাত্রে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় ইনি সুস্থ হবেন। তুমি ঔষধ খাওয়াও, আমি মহারাজকে সংবাদ দিয়ে যাচ্ছি।"

বৈদ্য বিদায় লইলেন। পুত্র পিতার শুশ্রূষায় ব্যাপৃত হইল, নিরঞ্জন দেখিল—সেখানে তাহার কাজ আর নাই। সেও নিঃশব্দে বৈদ্যের পশ্চাতে প্রস্থান করিল। গমনের সময় একটা মৌখিক বিদায় সম্ভাষণও জ্ঞাপন করিল না, পাছে কৃতজ্ঞ পিতা পুত্রের নিকট হইতে আবার দুই কথা শুনিতে হয়।

বৈদ্য মোহন্ত মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নির্ম্মল-মঠে গেলেন। প্রত্যেক অধীনস্থ ব্যক্তির পীড়ার সংবাদ প্রত্যহ যথাযথ বিবরণ সহ মহারাজকে জানাইতে হইত, বৈদ্য মহারাজের বেতন ভোগী অনুগত ব্যক্তি।

বাহিরের মুক্ত জ্যোৎস্নালোক আসিয়া, নিরঞ্জন দেহ মনের উপর এবং অপূর্ব্ব স্বাচ্ছন্দ্যের হিল্লোল স্পর্শ অনুভব করিল,—কিন্তু তাহার ক্ষুব্ধ হৃদয় তবুও ঐ বদ্ধ গৃহের রুদ্ধ বাতাসের জন্য বেদনার নিঃশ্বাস ফেলিল— কিন্তু থাক্, শুধু আয়োজনের দিকে তাকাইয়া প্রহর গণিয়া লাভ কি?—তাহার প্রয়োজন কোথায়,—এবং তাহার পরিমাণ কতটুকু তাহাই এখন দ্রষ্টব্য!

নিরঞ্জনের চরণগতি অজ্ঞাতে মৃদুতর হইয়া আসিল, কার্য্যব্যস্ত বৈদ্য স্বাভাবিক দ্রুত গমনে চলিয়াছিলেন সুতরাং শীঘ্রই তিনি দূরে অগ্রসর হইয়া পড়িলেন। নিরঞ্জন একটা শাখাবহুল বটগাছের তলায় অনামনস্ক ভাবে বসিয়া পড়িল,—উর্দ্ধে, জ্যোৎস্নাহসিত নীলাকাশের পানে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া মুগ্ধ প্রাণে একটু হাসিল, মরি মরি কি স্নিগ্ধ মনোরম শোভা! ওগো মুক্ত সুন্দর হৃদয় বিশ্বভাবুকগণ, তোমাদের অনুভূতির চরণে প্রণাম! — ·... মিলন অভিসারের উপযুক্ত শুভলগ্ন ত ইহাই!

হাঁ—এই মুক্ত-সুন্দর আকাশের পানে চাহিয়া, একবার সকল দ্বিধা-সঙ্কোচ মুক্ত হইয়া নিরঞ্জন প্রাণকে বাঞ্ছিত অভিসারের পথে ছুটিতে দিউক! রুদ্ধ হৃদয়ের গোপনদ্বার মুক্ত করিয়া মন ও বুদ্ধিকে বিশ্বস্তভাবে গ্রহণ করিয়া মিলনের উৎসব আরম্ভ করুক,—অকপট সরলতায় প্রকৃতি ও পুরুষাকারের গোপন-দ্বন্দ্বকে মীমাংসার পথে বোঝাপড়া হইতে দিউক,—আজ অকুণ্ঠিত ভাবে জানিয়া লউক, প্রবলা প্রকৃতি কোন নিগূঢ় অভিমানে এমন ক্ষুব্ধ বিদ্রোহী হইয়া আছেন,—কেন তিনি আত্মার পৌরুষ উদ্যমকে—বারে বারে এমন প্রতিহত করিতেছেন? কেন তিনি সখ্যের স্থলে,—নির্ম্মম বিদ্বেষে শুধু শত্রুতাকে জাগাইয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার এ অপ্রীতির মূল কি?

মূল? মূল শুধু একটু ভুল মাত্র! সেই সামান্য ভুলের উপরই এই বিরাট বিপ্লব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে!

হাঁ একটা কথা!—আপনাকে খর্ব্ব করিয়া একটা সত্য মনেপ্রাণে স্বীকার করিয়া লইতে নিরঞ্জন চিরদিন ভয় করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু আজ একবার অকপট সাহসে নির্ভীক হইয়া হৃদ্‌পিণ্ডের কঠিন মূঢ়তার বুকে শেল হানিয়া—উচ্ছ্বসিত রক্ত-কণিকা লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুক, কোন জাতীয় রোগ-বীজাণু তাহাতে অবস্থান করিতেছে? ..... যে দৌর্ব্বল্য বেদনার স্মৃতি ক্রমাগতই তাহার হৃদকে নিষ্পীড়িত করিতেছে। সে বেদনা কি,—শুধু জড় ভোগ তৃষ্ণার ব্যর্থ হাহাকারে সৃষ্ট!

সে ভালবাসিয়াছিল!—হাঁ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছে ভালবাসিয়াছিল, আজিও ভালবাসিতেছে! কিন্তু সে ভালবাসা পার্থিব লালসার ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ পরিবেষ্টনে অবরুদ্ধ নহে!—সে ভালবাসার স্থান তাহার উর্দ্ধে—বহু উর্দ্ধে।

বাহ্য সৌন্দর্য্য তাহার শিল্পীনেত্র মুগ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু সে মুগ্ধতার মাঝে এতটুকুও কামনার বিকার ছিল না! সে সৌন্দর্য্য তাহার সম্মুখে আরাধ্য দেবতার রূপের প্রতিবিম্ব রূপে আবির্ভূত হইয়া তাহার হৃদয়কে স্নিগ্ধ করিয়াছিল, সাধন উৎসাহ উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল! সেখানে সে যাহা লাভ করিয়াছিল, তাহা শুধু অনাবিল আনন্দ!

তারপর—সেই সৌন্দর্য্যের অন্তরালে, যে উন্নত মাধুর্য্যময়ী তরুণ নারীহৃদয়টি বিরাজ করিতেছে, তাহার আশ্চর্য্য প্রাণময় সত্তা যখন সে অনুভব করিল,—তাহার অন্তরতম সত্তাকে যখন সে অংশিতে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিল, তখন বিস্ময়ে, বেদনায়, সম্ভ্রমে, শ্রদ্ধায় তাহার অন্তর অভিভূত হইয়া পড়িল! ভক্তির আবেগে, পূজার আকাঙ্ক্ষায়, নিজের তরুণ হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ সম্ভ্রম প্রীতির অর্ঘ্য—সেই কোমল সুন্দর হৃদয়ের চরণে নীরবে, উৎসর্গ করিল, সে নিবেদনের মাঝে লৌকিক সঙ্কোচ ছিল না, প্রত্যাখ্যানের শঙ্কা ছিল না,—প্রসাদলাভে আকাঙ্ক্ষা ছিল না, সে পূজা শুধু পূজাতেই তৃপ্ত!

কিন্তু তত শুচিতা বুঝি পৃথিবীর বুকে অসহ্য!—অজ্ঞাতে—অশুভ মুহূর্ত্তে, পৃথিবীর মলিন বাসনার নিঃশ্বাস তাহার মাঝে আসিয়া পড়িল!...... · পূজোর হৃদয় বুঝি অজ্ঞাতে চমকিত হইল, পূজক আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল,—নিবেদিত অর্ঘ্য মাটির বুকে ছড়াইয়া পড়িল! পূজার যোগ প্রাণান্তকর বিয়োগে পরিণত হইল!

কিন্তু তাহাতে নিজের দিক হইতে—যতই তুচ্ছ লাভ ও যতই বৃহৎ ক্ষতি থাক্, তাহাতে নিরঞ্জনের বেশী দুঃখ নাই, কিন্তু তাহার দুঃখ সেইখানেই অপরিসীম,—যেখানে তাহার পূজ্যের হৃদয়ের গোপন বেদনা.........উঃ থাক্, সে চিন্তার স্থান তাহার সহিষ্ণুতা-সীমার বহির্ভাগে!

অধীরভাবে উঠিয়া নিরঞ্জন দ্রুত পরিভ্রমণ করিতে লাগিল, অনেকক্ষণ পরে ঈষৎ সংযত হইয়া নিঃশ্বাস ফেলিল,—যাক্ যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার দুঃসংস্মৃতি বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত হউক,—এখন যাহা হওয়া কর্ত্তব্য তাহার চিন্তাই শ্রেয়।

কিন্তু অপরাধীর কর্ত্তব্য ত শুধু প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে আত্মসমর্পণ করা! ভাল, তাহার হৃদয় মনের এ অপরাধ—সে কোন সুদীর্ঘ ব্রতানুষ্ঠানে পরিক্ষালন করিবে? কোন অমর আশীর্ব্বাদে তাহার এ মৃত্যু অভিশাপ মোচন হইবে?

সাধু, গুরু, শাস্ত্রের নিকট সন্ধান লইবে?—কিন্তু সফল হয় কৈ? শাস্ত্র ত ঢের পড়িয়াছে,—লৌকিক অভিধানে সাধুসঙ্গ বলিতে যাহা বুঝায়, ভাগ্যক্রমে তাহার ত বিশেষ অভাব হয় নাই! গুরু উপদেশ?—বিশ্বগুরু ত অসংখ্য বিষয় ও ব্যাপারে নিরন্তর অজস্র উপদেশ দিতেছেন,—কিন্তু সে তাহাতে উপকৃত হইতেছে কৈ? তাহার রুদ্ধ হৃদয়ের দ্বারে আশা, আগ্রহ, উদ্যম, আসিয়া বারে বারে ঘা মারিয়া ফিরিয়া যাইতেছে,—সে অকপট সাহসে দ্বার খুলিয়া সরল বিশ্বাসে কাহাকেও গ্রহণ করিতে পারিতেছে কৈ? সে পিছনের ত্রুটির পানে চাহিয়া ক্ষুব্ধ বেদনায় শুধু যে আড়ষ্ট-নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে!

লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে অন্যমনস্ক নিরঞ্জন কখন যে নিম্মল-মঠের দ্বারের কাছে আসিয়া পৌঁছিল তাহা তাহার স্মরণ ছিল না,—সহসা দেখিল মঠের দ্বার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মহারাজ স্বয়ং তাহাকে ডাকিতেছেন! সচেতন হইয়া নিরঞ্জন উত্তর দিল,—মহারাজ অগ্রসর হইয়া বলিলেন "আমি ভেবেছিলুম, তুমি তর্কের ভিড়ে জমে আছ, তা নয়, একলা বেড়াচ্ছিলে?

কুণ্ঠিত হইয়া নিরঞ্জন বলিল "ওঁরা ওখানে বসে কথা কইছেন।" মহারাজ হাসিয়া বলিলেন "তর্ক চল্‌ছে বুঝি?—এস একটু লঘু আনন্দ উপভোগ করা যাক্—"

অন্যদিন এ আহ্বান নিরঞ্জনের অন্তরের কাছে অপ্রীতিকর না হইলেও বিশেষ প্রীতিকর হইত না, কিন্তু আজ তাহার চিত্ত এ প্রস্তাব সহসা প্রসন্ন আগ্রহে উন্মুখ হইয়া উঠিল, সে ব্যগ্র ভাবে বলিল "চলুন—"

উভয়ে আসিয়া পাষাণ চত্বরের নিকট উপস্থিত হইলেন। মদন তখন সত্য সত্যই প্রবল উত্তেজনার সহিত বক্তৃতা করিতেছিল, মহারাজ নিঃশব্দে আসিয়া পণ্ডিতের পার্শ্বে বসিলেন—মদনের কাছে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া নিরঞ্জনকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

মহারাজকে দেখিয়া মদন চুপ করিল। মহারাজ পরিহাস কোমল-কণ্ঠে বলিলেন "সমালোচনা শ্রবণের অধিকার থেকে আমার মত বৃদ্ধকে বঞ্চিত রাখা, বড় সহৃদয়তার লক্ষণ নয়, মদন আলাপ থামালে কেন? মদন বিনীত ভাবে বলিল "এটা আলাপ নয় মহারাজ, কলহ!" মহারাজ বলিলেন "ব্যক্তিগত নাকি?"

মদন বলিল "না মহারাজ, সাম্প্রদায়িক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিতা!"

মহারাজ বলিলেন "তবেতো ওটায় কান দিতে আমিও বাধ্য! সত্য কথা বলতে কুণ্ঠিত হোয়ো না মদন, এ সব আলোচনাক্ষেত্রে আমাকে তোমার সমশ্রেণীস্থ সুহৃদ বলে মনে কোরো।"

পণ্ডিত বলিলেন "মদনানন্দ যুক্তিযুক্ত প্রশ্নের অবতারণা করেছেন, পূজ্যপাদ বল্লভাচার্য্য দেব প্রবর্ত্তিত শুদ্ধাদ্বৈত মতবাদ যে এখন সাম্প্রাদায়িক বিধি নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান জড়ত্বে পর্য্যবসিত হয়েছে, উন্নত সাধনতত্ত্বকে আচ্ছন্ন করে যে এখন পরিতাপজনক কুৎসিত পঙ্কিলতার স্রোত বেয়ে চলেছে, সেই সকল ব্যাপার উল্লেখে উনি আক্ষেপ করছেন।"

মদন বলিল "মহারাজ বৈষ্ণবধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম অনুধাবন করবার অবকাশ এখনও পাই নি,—তবে আশে-পাশে যতটুকু দৃষ্টিপাত করেছি, তাতে দেখেছি বাংলা দেশে শ্রীচৈতন্যের পার্শ্বচরগণ থেকে আরম্ভ করে, আমাদের গুরুকুলের সকলেই এক বাক্যে আমাদের সতর্ক করে গেছেন, যে বৈষ্ণব নিন্দা মহাপাপ. মহারাজ আমিও এ বাক্যের সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। আমি বৈষ্ণবধর্ম্মকে নিজে ভালবাসি বলে শুধু নয়,—এ ধর্ম্ম আমার পিতা পিতামহের উপাস্য সাধন প্রণালী বলে, একে আমি সমস্ত প্রাণের সঙ্গে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু মহারাজ আপনি বলুন ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে মানুষ যখন আত্মশ্লাঘা দম্ভে স্ফীত হয়ে নির্ব্বিচারে অন্যায় ব্যভিচার স্রোত চালাতে সুরু করে, তখন হৃদয়ে কতখানি আঘাত লাগে? ধর্ম্মের নামে মানুষ নৈতিক অবনতির পথে স্বচ্ছন্দে চলেছে, এর চেয়ে বড় মনস্তাপ আর কি আছে? ... আমি যাকে আরাধ্য বলে শ্রদ্ধাসম্মান করি, তার অপমান,—আমার অপরাধের ভয়ে কুণ্ঠিত হয়ে কোন্ মুখে নীরবে সহ্য করি বলুন?"

মহারাজ গম্ভীর ভাবে বলিলেন "সহ্য করা উচিত নয়, মদন আমিও জোরের সঙ্গে স্বীকার করছি!"

উৎসাহিত হইয়া মদন বলিল "তাই বলুন মহারাজ!—প্রাণহীন আড়ম্বর অনুষ্ঠানে এখন আমাদের যথার্থ সাধন-প্রণালী আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, জানি তত্ত্বজ্ঞ সত্য সাধক যে, সম্প্রদায়ের মধ্যে—একেবারে নাই তা নয়, কিন্তু তাঁদের দ্বারা সাম্প্রদায়িক উন্নতিসাধনের চেষ্টা বৃথা! তাঁরা আত্মোন্নতি সাধনার প্রতিকূল বলে, কর্ম্মবিপ্লবে ভিড়তে রাজী নন! কিন্তু স্থিতি, সত্বগুণ সম্ভব হলেও সৃষ্টি রজোগুণ প্রাধান্য ব্যতীত হওয়া অসম্ভব!... ....মহারাজ আমার স্পর্দ্ধা মার্জ্জনা করুন, আপনার মত যথার্থ শক্তিশালী, উন্নত, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গুরুগণের চরণে কোটী প্রণাম, তাঁদের কথা নিয়ে আলোচনা করবার সাধ্য আমার নেই,—কিন্তু সম্প্রদায়ের অন্যান্য গুরুকুল, যতদূর দেখেছি মহারাজ, সকলেই শাস্ত্র জ্ঞানহীন, বিলাসী, স্বেচ্ছাচারী, স্বার্থপর! স্বার্থের অনুরোধে তাঁরা অজ্ঞান শিষ্য সম্প্রদায়কে, বিশেষতঃ স্ত্রীজাতীয়া শিষ্যাগণের দ্বারা ধর্ম্মের নামে, ইষ্ট সাধনের নামে,—রাসলীলা প্রভৃতি যে সব আপত্তি জনক * অনুষ্ঠান প্রকাশ্যে সমাধা করাচ্ছেন, তা বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়। গুরু—ততক্ষণই গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, যতক্ষণ তিনি পার্থিব লাভ স্বার্থের ঊর্দ্ধে নিজের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখেন!—জানি মহারাজ আমি নির্ব্বোধের মত অপরাধী বাক্য উচ্চারণ করলুম, কিন্তু ক্ষমা করবেন,—এর মধ্যে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ কিছুমাত্র নাই, আমি অকুণ্ঠিত সরলতায় শুধু মনের বেদনা ব্যক্ত করছি!"

মদন চুপ করিল। কেহই কোন কথা কহিতে পারিলেন না। মহারাজ চিন্তা-গাম্ভীর্য্য পূর্ণ বদনে ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে নীরবে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া মদন আবার বলিল "অজ্ঞান কুসংস্কারাচ্ছন্ন সম্প্রদায়ের

---

* "বল্লভাচার্য্য বহুকাল বৃন্দাবন সন্নিহিত গোকুলে বাস করিয়াছিলেন তজ্জন্য এই সম্প্রদায়ের গুরুদিগকে "গোকুলিয়া গোসাই" বলে। তিনি অবশ্য সদুদ্দেশ্যেই সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার তিরোভাবের পর কালের প্রভাবে উহা ভিন্ন আকার হইয়াছে। গোকুলিয়া গোসাঁইরা শিষ্যদিগের নিকট আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া পরিচয় দেন এবং তাহাদিগকে গোপীভাবে সেবা করিতে বলেন অল্পশিক্ষিত শিষ্য ও অশিক্ষিত শিষ্যরা নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় তাহাদের আদেশ পরিপালন করে............ ..।"

"রামানুজ চরিত" ৩০৮ পৃঃ (পরিশিষ্ট) ৺শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত।

মধ্যে—মূল ধর্ম্ম সাধন প্রণালীর যথাযথ মর্ম্ম রহস্য উদ্ঘাটন, সত্যজ্ঞান প্রচার ভিন্ন এই উপধর্ম্ম,—এই অনাদর অনুষ্ঠান স্রোত কিছুতেই রোধ হবে না! আমাদের এই ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উন্নতির চেষ্টা করতে গেলে আগে—গুরু সম্প্রদায়ের সংস্কার!—প্রার্থনীয়! আমি বিদ্বেষ চাই না, বিদ্রোহিতা চাই না, আমি পরিপূর্ণ সহানুভূতির সঙ্গে চাই, গুরু কুলের সংস্কার!—জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাসী এমন একজন ত্যাগী একনিষ্ঠ কর্ম্মসাধক চাই, যিনি সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করতে পারেন! এমন একজন সাধক পেলে, তার জীবনের মহিমায় আর দশজনের মনুষ্যত্ব আপনি উদ্বোধিত হয়ে উঠ্‌বে,—পাষাণের মধ্যে চেতনা আপনি স্পন্দিত হয়ে উঠ্‌বে তখন কারুর জন্যে কাউকে ভাব্‌তে হবে না!

অকস্মাৎ নিরঞ্জন লাফাইয়া উঠিল! জীবনে এত বড় প্রচণ্ড চমক সে আর কখনও বোধ হয় নাই! তাহার সর্ব্ব শরীরে উন্মাদ তড়িৎ ঝঞ্জনা বহিয়া যাইতে লাগিল, বিহ্বল বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সে মদনের মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

নিরঞ্জন হঠাৎ কেন এমন ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল তাহা মহারাজ বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু মঠে ফিরিবার সময় হইয়াছে, তাহা মনে পড়িল।—গম্ভীর ভাবে বলিলেন "আর একটু বোস নিরঞ্জন, কথাটা শেষ পর্য্যন্ত শুনে যেতে হবে—এখনো বেশী রাত হয় নি।"

নিরঞ্জন যন্ত্রচালিতের মত বসিয়া পড়িল।—পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন "মদনানন্দ,—ইতি পূর্ব্বে নাস্তিক, কুতর্কী-গণের মুখে এ সকল বিষয়ে কুৎসা আলোচনা শুনে শুনে বড়ই বিরক্ত হয়েছিলাম,—সম্প্রদায়ের ভাল মন্দ চিন্তায় কখনও মাথা খাটাই নি, তাই তোমার কথায় কোন সদুত্তর দিতে পার্‌ছি না,—কিন্তু এটা নিশ্চয় বুঝ্‌ছি যে, তুমি যে দিক থেকে তর্ক যুক্তি উত্থাপন করছ সেটা সম্পূর্ণই অন্যদিক, আমি আশীর্ব্বাদ করছি তোমার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হোক—"

ক্ষণেক থামিয়া পণ্ডিত পুনশ্চ মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমাদের আশা আছে যে ভগবানের ইচ্ছায় একদিন সমস্ত জঘন্য প্রথা, সম্প্রদায় থেকে নিশ্চয়ই দূরীভূত হবে!

মদন বলিল "আমাদেরও আশা আছে যে একদিন সমস্ত পাপ, সমস্ত কুসংস্কার,—শুধু এ সম্প্রদায় থেকে কেন,—পৃথিবীর সকল জাতি, সকল ধর্ম্ম, সকল সম্প্রদায়, সকল মনুষ্য থেকে দূরীকৃত হবে,—কিন্তু ভগবানের ইচ্ছাটা সকলের ওপর,—সেটাকে আমরা সাফল্যের অঙ্কে মূর্ত্তিমান বলে অনুভব করি—এ দিকে তার জন্যে নীচে থেকে আমাদের চেষ্টা শক্তিকে যে কাজ খাটান দরকার, সেটা আমরা মনে রাখ্‌তে ভুলে যাই! ভগবানের ইচ্ছার ওপর আংশিক ভাবে অন্ধ নির্ভর স্থাপন করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা মানে,—তাঁর সমুদয় শক্তিকে অগ্রাহ্য করা!........ তাঁর কিছু না কিছু শক্তি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে চেতন পুরুষাকার রূপে অবস্থান করছেন, আমরা যদি তার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার না করি—তাহ'লে তার জন্যে আমাদের প্রত্যবায়ের অপরাধী হতে হয় না কি।"

মহারাজ ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন "হয় বৈ কি মদন, নিশ্চয় হতে হয়!"

উৎসাহ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মদন বলিল "আপনার কথা ভুলি নি মহারাজ,—আপনি এই নির্ম্মলমঠ থেকে একটা মহৎ কর্ম্মানুষ্ঠানের সূত্রপাত করেছেন; সেই জন্যই বড় আশায় আপনার মুখ পানে চেয়ে আছি............কিন্তু সত্য জ্ঞানকে শুধু নির্ম্মলমঠ, সুন্দরমঠের সীমায় আবদ্ধ রাখ্‌লে চল্‌বে না, একে চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে! অনাসক্ত কর্ম্মীর কর্ম্ম, জ্ঞান, বিশ্বহিতেই তৃপ্ত, সার্থক, ও সম্পূর্ণ।"

মহারাজ উঠিয়া মদনকে বক্ষের উপর টানিয়া লইয়া তাহার শিরশ্চুম্বন করিলেন, মদন নীরবে তাহার পায়ের ধূলা লইল। স্নিগ্ধকণ্ঠে মহারাজ বলিলেন "আজ বিদায়,—তোমায় বরাবর বলেছি, আজও আশীর্ব্বাদের সঙ্গে অনুরোধ করছি মদন, তোমার এ মস্তিষ্ক, কর্ম্ম ও জ্ঞানের পথ দিয়ে সংসার ধর্ম্মে খাটাতে হবে,—তোমার মত গৃহস্থ-সন্ন্যাসীদের সাহায্য-সমবায় ব্যতীত কোন মঙ্গল প্রতিষ্ঠান সার্থক হবে না। কাল এ সম্বন্ধে তোমায় অন্যান্য পরামর্শ দেব,—আজ আর কোন কথা নয়, যাও মঠে গিয়ে বিশ্রাম কর।"

মহারাজ প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া মদন ও পণ্ডিত মহাশয় অন্য দিনের মত তাঁহাকে উদ্যানবাটিকার দ্বার পর্য্যন্ত পহুঁছাইয়া দিয়া আসিবার জন্য উঠিলেন কিন্তু মহারাজ বাধা দিয়া বলিলেন "না আপনারা মঠে যান।"

অগত্যা তাঁহারা প্রস্থান করিলেন। মহারাজ মুখ ফিরাইয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী নিরঞ্জনকে আহ্বান করিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু নিরঞ্জনের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইলেন, দেখিলেন, নিরঞ্জন বক্ষবদ্ধ হস্তে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া—ঊর্দ্ধমুখে স্থির নিষ্পলক নয়নে সম্মুখস্থ প্রাসাদশীর্ষ অবলোকন করিতেছে!—তাহার সুদীর্ঘ ঋজু সুন্দর অবয়ব, স্থির নিশ্চল,—যেন সম্পূর্ণ নিষ্পন্দ।

মহারাজ নিঃশব্দে তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন, ধীর কণ্ঠে ডাকিলেন "নিরঞ্জন—"

"মহারাজ—" দৃষ্টি নামাইয়া শান্ত বদনে নিরঞ্জন তাঁহার পানে চাহিল।

মহারাজ বলিলেন "কি দেখ্‌ছ নিরঞ্জন?",

কোমলকণ্ঠে নিরঞ্জন উত্তর দিল "দেখ্‌ছি মহারাজ,—একদিন এই প্রাসাদের প্রত্যেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে, সযত্নে এর সমুদয় মূর্ত্তিটা গড়ে তুলেছি, আজ প্রয়োজনের আদেশ পেলে,—একে অকুণ্ঠিত-চিত্তে নিজের হাতে ধ্বংস করতে পারি কি না?"

মহারাজ স্তব্ধ দৃষ্টিতে নিরঞ্জনের মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন, কিছু বলিলেন না।

কয় মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া নিরঞ্জন সহসা ঈষৎ বেগের সহিত বলিয়া উঠিল "না মহারাজ, এ গুরুভার পাষাণ সৃষ্টি যতই সুন্দর হোক্, যতই মনোরম হোক্,—কিন্তু এ বড় কঠিন!—এর নিষ্ঠুরতা চাপে পৃথিবীর বুক অনেকখানি নিষ্পীড়িত হয়ে উঠেছে, আজ তাই চেয়ে দেখছি, এর প্রত্যেক পাথরখানি খুলে, লোহার হাতুড়ীর ঘায়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করে—পৃথিবীর প্রত্যেক অণু পরমাণুর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারি যদি,—এর অস্তিত্বটা নিঃশেষে লোপ করতে পারি যদি,—তা হ'লে বোধ হয় পৃথিবী হাল্কা হয়ে স্বস্তি পায়!"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া মহারাজ বলিলেন "নিরঞ্জন, মঠে ফেরবার সময় হয়েছে,—"

নিরঞ্জন ত্রস্ত হইয়া বলিল "চলুন মহারাজ।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

—:*:

সমস্ত পথ নিরঞ্জন দীর্ঘদ্রুত পাদক্ষেপে, অত্যন্ত ব্যস্ত, উদ্বিগ্ন ভাবে চলিল। মহারাজ চিরদিন দ্রুতগমন অভ্যস্ত,—কিন্তু তবুও তিনি আজ নিরঞ্জনের অস্বাভাবিক গমনের সহিত পারিয়া উঠিতেছিলেন না, কেবলই পিছাইয়া পড়িতেছিলেন। বার বার তিনি সবিস্ময় দৃষ্টিতে নিরঞ্জনের মুখভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাঁহার কেবলই

মনে হইতেছিল—নিরঞ্জনের সেই স্নিগ্ধ-শ্রী মণ্ডিত সুকোমল মুখে,—একটা অনুতাপবিদ্ধ বিবর্ণ উদ্বেগের ছায়া ক্রমশঃ ঘনাইয়া উঠিতেছে!—মহারাজের বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল, তিনি ক্রমাগত ভাবিতেছিলেন, এতদিন ধরিয়া পরীক্ষা করিয়াও কি তিনি এই অদ্ভুত যুবকের প্রকৃতি বুঝিতে ভুল করিয়াছেন!

সমস্ত পথ নিরঞ্জন একটাও কথা কহিল না, মহারাজও ইচ্ছা করিয়া নীরব রহিলেন। মাথার চুলগুলার ভিতর সজোরে অঙ্গুলি ঘর্ষণ করিয়া, যথেচ্ছভাবে সেগুলাকে বিশৃঙ্খল এলোমেলো করিয়া—নিরঞ্জন অধীর চরণে পথাতিবাহন করিয়া চলিল। মহারাজের সহিত পাশাপাশি চলিতে চলিতে, অজ্ঞাতে সে যে বেশী অগ্রসর হইয়া যাইতেছে,—মহারাজ যে ক্লান্তভাবে পিছাইয়া পড়িতেছেন,—তাহাতে সে ভ্রূক্ষেপমাত্র করিল না।

তাঁহারা মঠে ফিরিলেন। বিস্তর অধীবাসীসঙ্কুল মঠে,—একসঙ্গে সকলে আহারে বসিলে পাচকগণের পরিবেশনের সুবিধা হইত না, সেই জন্য ভোজনার্থীগণ তিনদলে বিভক্ত হইয়া আহার স্থানে যাইত। নিরঞ্জন প্রত্যহ শেষদলের সহিত আহার করিতে যাইত।—কিন্তু আজ মঠে প্রবেশ করিবামাত্র, প্রথমদলের আহারের আহ্বান শুনিয়া—চিন্তা-অপ্রকৃতিস্থ নিরঞ্জন বিনা বাক্যে তাহাদের সহিত মিশিয়া আহার স্থানে চলিয়া গেল।

প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে মহারাজ স্বয়ং আহার স্থানে উপস্থিত হইয়া সকলের আহার কার্য্য দেখিতে লাগিলেন। নিরঞ্জন অসময়ে আহার করিতে আসিয়াছে দেখিয়া তিনি অধিকতর বিস্মিত হইলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না—তবে অন্যদিনের মত প্রসন্ন-পরিহাস-কুশল মহারাজ আজ হাস্যকৌতুক বাক্যালাপে ভোজনার্থীগণের মন অনাবিল সন্তোষ আনন্দে উৎসাহ মুখর করিয়া তুলিতে পারিলেন না,—প্রত্যেকের নিকট আসিয়া শান্ত গভীর বদনে শুধু কি চাই-না-চাই জিজ্ঞাসা করিয়া গেলেন। মঠের আহার্য্য ব্যাপারে—বাঙ্গালী ধনী-পরিবার সুলভ বিলাস আড়ম্বরের সম্পর্ক লেশমাত্র ছিল না, তবে ভোক্তার ক্ষুন্নিবারণ ও পরিতোষ বিধানের আয়োজন চেষ্টাতেও কিছুমাত্র ঔদাসীন্য ছিল না। সকলেই তৃপ্তির সহিত পরিমিত আহার গ্রহণ করিয়া উঠিল। মহারাজ লক্ষ্য করিলেন,—নিরঞ্জন যথানির্দ্দিষ্ট মাত্রায় ভোজন ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া গেল বটে,—কিন্তু এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংজ্ঞাও যে তাহার অনুভূতির নিকট পৌছাইয়াছিল—এমন বোধ হইল না।

প্রথম দল উঠিয়া গেল। মহারাজ যথাবিহিত তত্ত্বাবধানের সহিত অন্য দুই দলের আহার কার্য্য সমাধা করাইয়া নিজের নির্দ্দিষ্ট আহার দুগ্ধ ও ফল প্রভৃতি গ্রহণ করিলেন। প্রত্যহ সকলের শয়ন বিশ্রামের ব্যবস্থা দেখিয়া তবে নিজে শয়ন করিতে যাইতেন, আজিও দেখিতে গেলেন। মঠের সকলেই প্রায় তখন শয়ন করিয়াছিল,—দিবানিদ্রাসেবী দুই চারিজন শুধু তখনও জাগিয়া বসিয়া ভজন গান বা শ্লোকাদি আবৃত্তি করিতেছিল। মহারাজ নিরঞ্জনের শয্যা অন্বেষণ করিলেন, দেখিলেন সে নাই,—মহারাজ জানিতেন নিরঞ্জনের নিদ্রা বা শয়নের সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থিরতা নাই, সে কোন দিন যথাসময়ে শয়ন করিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইত, কোন দিন ভৌতিক বিকারগ্রস্তের ন্যায় অকারণ ব্যস্ততায় সারারাত্রি মঠের মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া জাগিয়া কাটাইত, কোন দিন বা শেষ রাত্রে শয্যাশ্রয়ী হইত!

আজ নিরঞ্জনের জন্য মহারাজ সত্য সত্যই কিছু বেশীমাত্রায় উদ্বিগ্ন ছিলেন, তাই শয্যায় তাহাকে না দেখিয়া তাড়াতাড়ি ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, শুনিলেন সে ছাদের উপর আছে,—কিন্তু মহারাজ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, নিজেই ছাদের উপর তাহাকে দেখিতে চলিলেন।

গ্রীষ্মকাল; প্রশস্ত ছাদের উপর মুক্ত চন্দ্রালোকে মঠের অধিবাসীগণের অনেকেই আসিয়া শয়ন করিয়াছিল, সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, মহারাজ নিঃশব্দে সকলের ঘুমন্ত মুখ পরীক্ষা করিলেন,—নিরঞ্জন তাহাদের ভিতর

নাই, নিদ্রিত ব্যক্তিগণকে অতিক্রম করিয়া সংশয়ান্বিত চিত্তে মহারাজ ছাদের শেষপ্রান্ত খুঁজিতে অগ্রসর হইলেন, দেখিলেন ছাদের শেষপ্রান্তে নির্জ্জন স্থানে আলিসার ধারে পা ঝুলাইয়া নিরঞ্জন নিস্তব্ধভাবে বসিয়া আছে, তাহার কাছে কেহ নাই !

পাছে হঠাৎ সে চমকিত বা বিচলিত হয় বলিয়া মহারাজ আর অগ্রসর হইলেন না। দূর হইতে মৃদু কাশিয়া ডাকিলেন "নিরঞ্জন দেব—"

দৃষ্টি ফিরাইয়া নিরঞ্জন ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিল 'আজ্ঞে—"

নিরঞ্জন উঠিতে উদ্যত দেখিয়া মহারাজ হস্তেঙ্গিতে তাহাকে নিষেধ করিয়া নিজে আসিয়া তাহার পাশে বসিলেন, ধীরভাবে বলিলেন, "তোমার সঙ্গে গোটাকতক কথা আছে নিরঞ্জন।"

নিরঞ্জন বলিল "স্বচ্ছন্দে অনুমতি করুন মহারাজ—"

মহারাজ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর মৃদু-কোমল কণ্ঠে বলিলেন "চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু সে জীবিত থাক্‌তে, পরামর্শ, প্রয়োজনে, আমাকেই অভিভাবক বলে মনে করত,—এ কথা বোধহয় তোমার স্মরণ আছে।"

নিরঞ্জন বলিল "যথেষ্ট আছে মহারাজ —"

কণ্ঠস্বর আরও স্নিগ্ধ-কোমল করিয়া মহারাজ বলিলেন "আজ সেই দায়িত্বজ্ঞান স্মরণ করে, তোমার সঙ্গে যদি সাংসারিক বিষয়ের কিছু আলোচনা করি, তা হলে সেটা বোধহয় অসঙ্গত হবে না—"

নিরঞ্জন উত্তর দিল "কিছু মাত্র না মহারাজ—"

মহারাজ ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া বলিলেন, "তোমার বয়স হয়েছে, আর কালক্ষেপ করা উচিত নয়, এবার বিবাহ ক'রে সংসার ধর্ম্মেপ্রবৃত্ত হওয়া তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।"

ব্যথিতভাবে হাসিয়া নিরঞ্জন বলিল "বুঝেছি মহারাজ,—আমার স্বভাবের উদ্ভ্রান্ত বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করে আপনি সন্দিগ্ধ হয়েছেন,—কিন্তু মার্জ্জনা করুন, আপনাদের মত শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদগণকে মনঃক্ষুণ্ণ করতে বাধ্য হওয়াই বোধহয় আমার প্রাক্তন ফল ; জীবনে নির্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হয়ে অনেক কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করেছি, কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হয়ে—এত বড় অকর্ত্তব্যে জ্ঞানতঃ অগ্রসর হ'তে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম।"

নিরঞ্জন এরূপ ভাবে স্পষ্ট বাক্যে অস্বীকার করিবে মহারাজ তাহা প্রত্যাশা করেন নাই! বিস্মিতভাবে বলিলেন "কেন নিরঞ্জন বিবাহের প্রতি তোমার এত বিদ্বেষ কেন? নারীজাতিকে তুমি কি শ্রদ্ধা কর না? —"

রুগ্ন স্নায়ুতন্ত্রীতে অকস্মাৎ প্রচণ্ড আঘাত বাজিলে সমস্ত স্নায়ুকেন্দ্র যেমন তীব্র বেদনায় উগ্র আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে, নিরঞ্জনের অবস্থা ও ঠিক্ তাই হইল। তীর-বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দৃপ্ত স্বরে বলিল "শ্রদ্ধা!—শুধু মৌখিক ভাষায় আমি কেমন করে আপনাকে বুঝাব মহারাজ, পূজ্যের প্রতি পূজকের প্রাণভরা শ্রদ্ধার পরিমাণ কতখানি?—" ...নিরঞ্জনের কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল, আত্মসম্বরণের জন্য তাড়াতাড়ি সে ছাদের এদিকে ও-দিকে পায়চারি করিতে লাগিল, কথা কহিতে পারিল না।

কিয়ৎকাল পরে অপেক্ষাকৃত সংযত হইয়া সে মহারাজের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, শান্তভাবে বলিল "না মহারাজ, বিবাহের প্রতি আমার কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই, আমিও আপনার মত আন্তরিকতার সঙ্গে বল্‌ছি, যোগ্যতা

থাকলে বিবাহ ক'রে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রত্যেক যুবকের অবশ্য কর্ত্তব্য.—কিন্তু আমার মত হতভাগ্যের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব বহন আমার অপ্রকৃতিস্থ প্রকৃতিতে অসম্ভব।"

চমৎকৃত মহারাজ চুপ করিয়া রহিলেন। এ সন্দেহ—বহুপূর্ব্বেই তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল, কিন্তু নিরঞ্জনের মত সচ্চরিত্র সুশীল যুবকের সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ ধারণা তিনি মনে পোষণ করিতে পারেন নাই,—তবে এটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে কি একটা প্রচণ্ড বেদনা তাহার বলিষ্ঠ শ্রমকুশলী প্রকৃতির মধ্যে—অহরহঃ প্রচ্ছন্ন কাতরতায় আর্ত্তনাদ করিতেছে, তাহার উদ্যমশীল, উন্নত সংযমনিষ্ঠ হৃদয়কে কি-একটা দুরন্ত আবেগ-প্রাবল্য,—নিরন্তর তীব্র আলস্য-অবসাদে নিষ্পীড়িত করিতেছে!—মহারাজ ইহার কারণ কিছু খুঁজিয়া পান নাই, তিনি সময় সময় আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেন 'মানুষের প্রকৃতির মধ্যে যে কত অদ্ভুত বৈচিত্র্যের সমাবেশ থাকতে পারে,—তরুণ শিল্পীর ভাবুক প্রকৃতি তাহার জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ! সেই জন্য তিনি সরলভাবে চিরদিন নিরঞ্জনের অসতর্ক কথাবার্ত্তা ও অদ্ভুত বিশেষত্ব পূর্ণ আচার ব্যবহারের ত্রুটি—স্নিগ্ধ স্নেহময় দৃষ্টিতে দেখিয়া হাসিয়া উড়াইতেন, কচিৎ মন সংশয়ান্বিত হইয়া উঠিলে তাহা গ্রাহ্য করিতেন না।—কিন্তু আজ তিনি বিস্ময়ে চমকিত হইয়াছেন।

চিন্তাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া নিরঞ্জন ক্ষণেক নীরব রহিল, তারপর বলিল "না মহারাজ, আমি শঙ্করাচার্য্য নই, কিন্তু আমি তবুও—চিরদিন যথেষ্ট শ্রদ্ধা, সম্ভ্রমের সহিত, দূর হ'তে নারীজাতিকে প্রণাম করে আসছি, এইটুকু জেনে আপনি দয়া করে ক্ষান্ত হোন, এর ওপর কোন তর্ক, কোন প্রশ্ন উত্থাপন করবেন না।"

মহারাজ বলিলেন "নিরঞ্জন, অবিবাহিত জীবনে উদ্দেশ্য হীনতার আশঙ্কা যথেষ্ট—"

পরিতপ্ত বেদনার বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া নিরঞ্জন বলিল "আশঙ্কা, কি বলেন মহারাজ, আমার জীবন সত্যই লক্ষ্যহীন। কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মবন্ধন ক্ষয় করতে সিদ্ধকাম হব বলে,—'দৈবায়ত্ত হি পৌরুষম্' মন্ত্র সম্বল করে শিল্পতত্ত্বের ওপর ঝুঁকেছিলাম,—কিন্তু এখন দিনে দিনে বুঝতে পারছি, বাইরের সাধনায় বাইরের দিকেই সাফল্য লাভ করেছি কিন্তু অন্তরের পক্ষে সে শুধু শাস্তিদায়ক পীড়া হয়ে উঠেছে! শিল্পতত্ত্বের ওপর শ্রদ্ধা থাকলেও আর আগ্রহ নাই মহারাজ, উৎসাহ নাই!—আন্তরিক উদ্যম নিষ্ঠা হীন হৃদয় নিয়ে, শুধু ব্যবসায়ের অনুরোধে,—ঐ উন্নত-সুন্দর শিল্পচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হ'তে আর ইচ্ছা নাই, এই বুঝছি এ-যাত্রা,—আমার ইষ্ট দেবতার চরণে আত্ম-নিবেদনের যাত্রা নয়, এ শুধু উপদেবতার চরণে আত্মবলিদানের অভিযান! না মহারাজ, আত্মোন্নতি সাধনার নামে,—এমন আত্মপ্রতারণার গ্লানি অসহ্য!"—নিরঞ্জন সজোরে অধর দংশন করিয়া থামিল, তাহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

মহারাজ উর্দ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। আত্মসম্বরণ করিয়া নিরঞ্জন আবার বলিতে লাগিল "আমার চারিদিকে মায়ার ইন্দ্রজাল আর আত্মকৃত অভিশাপের বোঝা স্তূপাকার হয়ে উঠেছে, তারই জমাট আবেশে আমার প্রকৃতির মধ্যে দুঃসহ জড় পঙ্গুত্ব এসে পড়েছে! আমি কিছুতেই গণ্ডি কেটে আপনাকে ভিতর থেকে মুক্তি দিতে পারছি না... .....অতৃপ্তির চরণে অনর্থক প্রাণের অর্ঘ্য ঢেলে দিয়ে যাচ্ছি, কাজেই নিষ্ফলতার ক্ষোভে অলক্ষিতে আমার অন্তর ক্ষিপ্ত উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠছে!.........আজ আপনাদের সম্প্রদায় গত সাধন সমস্যার তর্ক আঘাতে আমি নিজের অন্তরের মধ্যে এক জটিল সমস্যার নিগূঢ় সংবাদ উপলব্ধি করেছি, আমি স্তম্ভিত হয়েছি,—মহারাজ আজ বোধ হচ্ছে, আমারও অন্তরের মধ্যে ঐ রকম গুরু শিষ্যের সম্বন্ধে বৈষম্যে—অনর্থ সাধনের ব্যাধি উদ্ভূত হয়েছে!... .....মহারাজ আমি দৃষ্ট স্বাস্থ্য হারিয়েছি, আমার নির্দ্দিষ্ট পথ খুঁজে

পাচ্ছি না, আমার জীবন মন অবসন্ন হয়ে পড়েছে, আজ বুঝ্‌তে পার্‌ছি......বৈষয়িক গৌরব আড়ম্বরে বহিরাংশটা আবৃত করে, আমার লক্ষ্যহীন জীবন—বয়ে চলেছে শুধু এক অন্ধ একক্ত্বাম্বিতার পথে !"

মহারাজ অনেকক্ষণ নীরব রহিলেন, তারপর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "নিরঞ্জন তোমার গুরু-করণ হয়েছি কি ?—"

অনুতপ্তকণ্ঠে নিরঞ্জন উত্তর দিল "হয় নি বল্‌লে প্রত্যবায়ের ভাগী হতে হবে মহারাজ ! জীবনের কোন সময়ে হয় ত অন্তর গুরুর কাছে অজ্ঞাতভাবে দীক্ষা পেয়েছি, তারপর—জানিনে কখন নিজের মূঢ় চপলতায় শিষ্যত্ব গ্রহণের শক্তি হারিয়ে ফেলেছি ! তাই আমার অন্তরতম প্রদেশে—গুরু শিষ্যের নিত্যসত্য সম্বন্ধের মধ্যে এক উৎকট দুঃসহনীয়তা এসে পড়েছে ! মার্জ্জনা করুন মহারাজ, আর আমি আপনাকে নিজের অবস্থা বোঝাতে পারব না !"

মহারাজ চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন, নিরঞ্জন ছাদের চতুর্দ্দিকে চক্র দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া আবার মহারাজের কাছে দাঁড়াইল, বলিল "মহারাজ মঙ্গল কর্ম্মানুষ্ঠানে সত্য সত্য চিত্তশুদ্ধি হয় কি ? আজ আপনার কাছে আমি এ প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর জান্‌তে চাই ।"

ধীর—স্থির স্বরে মহারাজ উত্তর দিলেন "হয়, যদি পূর্ণ সাত্বিক ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান পালন করতে পারা যায় !" নিরঞ্জন মহারাজের পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া কাতর কণ্ঠে বলিল "তবে মহারাজ এবার আপনি কৃপা করুন,—আমায় হাতে ধরে পথ নির্দ্দেশ করে দিন !—আপনার সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য আমায় উৎসর্গ করে দিন, আমি সেইখানে মহৎ কর্ম্মক্ষেত্রে সাধনার হোমানলে প্রাণের বিরাট জঞ্জালস্তূপ পুড়িয়ে ফেলে মুক্ত ।"

মহারাজ শান্ত কণ্ঠে বলিলেন "আত্মোন্নতি সাধনার ক্ষেত্রে কোন কর্ম্ম ক্ষুদ্র নাই কোন কর্ম্ম বৃহৎ নাই নিরঞ্জন,—অনুষ্ঠেয় ব্রতের পক্ষে ক্ষুদ্র তৃণাঙ্কুরটিও মহৎ প্রয়োজনীয় বস্তু ! আত্মোন্নতি সাধনার ক্ষেত্রে যিনি দাঁড়াবেন, তিনি যেমন তৃপ্ত আনন্দে দেবতার চরণে পুষ্পচন্দন অর্পণ করবেন, প্রয়োজনের অনুরোধে তেমনি শ্রদ্ধা-নিষ্ঠ হৃদয়ে, পতিত, ঘৃণিত, হতভাগ্য আর্ত্তজীবের মলমূত্র পরিষ্কারেও প্রফুল্ল আনন্দে আত্মনিয়োগ করবেন তবে তাঁর ব্রত উদ্‌যাপন হবে, সাধন সার্থক হবে !—ভাল, তোমার মানসিক গতিপ্রবণতা আপাততঃ কোন্ দিকে ?—"

"আপাততঃ !" বেদনাহত কণ্ঠে নিরঞ্জন উত্তর দিল,—"চিরাগত স্রোতধারার পাষাণ অবরোধ কাহিনীর মর্ম্ম বিদারক ইতিহাস অন্ধকারেই থাক্ মহারাজ, সদ্য আঘাত-মুক্ত আকৃতির 'আপাততঃ' আবির্ভাব সংবাদই শিরোধার্য্য !—মহারাজ, নারী সমাজের সংস্রব পরিত্যক্ত হলেও,—নারী জাতির মহৎ সম্মান আমার কাছে চিরদিন সশ্রদ্ধ বন্দনীয় ! তাই নারী সমাজের অপমান, অবনতির সংবাদ আমার হৃদয়ের কাছে আজ একটা তীব্র বেদনা বহন করে এনেছে !.........কিন্তু আমার আর সাহস স্পর্দ্ধা নাই মহারাজ, নিজের শক্তিকে বিশ্বাস করতে ভয় হয়, কিন্তু তবুও—তবুও মহারাজ মুক্তকণ্ঠে বলছি, আমার এ আকাঙ্ক্ষা, তীব্র অকপট !........এখন আপনি যদি আশীর্ব্বাদ করেন—আপনি যদি অনুমতি করেন,—"

কথা অসমাপ্ত রাখিয়া নিরঞ্জন উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে মহারাজের মুখপানে তাকাইল। মহারাজ ওষ্ঠের উপর অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া খানিকক্ষণ কি ভাবিলেন, তারপর বলিলেন "দয়াশক্তির অযথা অপব্যবহারের নাম অহমিকার দম্ভ ! আমি তোমায় যথেষ্ট স্নেহ করি নিরঞ্জন,—কিন্তু স্নেহের মুখ চেয়ে পরামর্শ দিলে, অনেক সময় অবিচার করা হয়, অনুমতি, বিবেচনা সাপেক্ষ। আমি সমস্ত অন্তরের সঙ্গে আশীর্ব্বাদ করছি, ভগবান তোমার মঙ্গলেচ্ছা সিদ্ধির সহায় হোন, আমার মতামত যথাসম্ভব বিবেচনার পর কাল তোমায় জানাব ।"

মহারাজ নিরঞ্জনকে সঙ্গে করিয়া ছাদের উপর হইতে নামিয়া আসিয়া, তাহাকে শয়ন কক্ষে পৌছাইয়া দিয়া নিজে বিশ্রাম করিতে গেলেন।

অতি প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গের পর নিরঞ্জন সবেমাত্র শয্যাত্যাগ করিতেছে, এমন সময় মহারাজ আসিয়া কক্ষে ঢুকিলেন; নিরঞ্জন প্রণাম করিল, মহারাজ তাহার মস্তক স্পর্শে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি চিরদিনই সীমাবদ্ধ। জানিনে মঙ্গলময়ের কি ইচ্ছা, কিন্তু আমি যথাসাধ্য বিবেচনা করে দেখলাম, এ ক্ষেত্রে তোমার মত উদ্যমশীল কর্ম্মঠ ব্যক্তির আগ্রহে বাধা দেওয়া সমীচীন নয়, তা ছাড়া আমি যতদূর বুঝেছি, তাতে বোধহয় তোমার দ্বারা সংসার ধর্ম্ম পালন অপেক্ষা অন্য ধর্ম্ম সাধন ব্যাপারে শ্রেয় লাভের আশা অধিক। তুমি আপাততঃ নীলাচলে শ্যামানন্দ আচার্য্যের আশ্রমে গিয়ে বিধি নির্দ্দিষ্ট পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করে শাস্ত্রচর্চ্চা প্রভৃতির দ্বারা চিত্তোন্নতি সাধন কর, তারপর কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হোয়ো, আজ দীক্ষার পক্ষে প্রশস্ত দিন আছে নিরঞ্জন, আমি সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত কর্‌তে বলেছি,—তুমি স্নান করে এস্ আমি আজই তোমায় দীক্ষা দেব।"

প্রণাম করিয়া কৃতজ্ঞ দীন কণ্ঠে নিরঞ্জন বলিল,—"আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, মহারাজ,—আমি যেন দীক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত হতে পারি।"

মহারাজ তাহার মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, যেন তোমার শেষ রক্ষা হয়!"

দীক্ষা শেষে, পরদিন মহারাজকে প্রণাম করিয়া অন্যান্য সাধুপণ্ডিতগণের সস্নেহ আশীর্ব্বাদের মধ্যে বিদায় গ্রহণ করিয়া নিরঞ্জন নীলাচল যাত্রা করিল। সকলে বিস্মিত হইলেন, সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আশ্চর্য্য হইল মদন!—কিন্তু মহারাজ তাহাকেও ছাড়িলেন না,—তাহার দীক্ষালাভ আগ্রহ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, "তুমি আগে কলেজে গিয়ে আইন বিদ্যা অধ্যয়ন করে এস, পরে তোমার দীক্ষার ব্যবস্থা হবে।"—ক্ষুণ্ণ চিত্তে মদন মহারাজের আদেশ পালনে প্রতিশ্রুত হইয়া পরদিন নির্ম্মল-মঠ ত্যাগ করিল।

ক্রমশঃ—

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

অস্তি।

(কাশী—কেদার-ঘাট)

ফাল্গুনের বাসন্তী সন্ধ্যায়!
রম্য দিনান্তের আলো ত্যজি নদীতট-বালুকায়
পরপার শস্যক্ষেত্রে, ক্রমে উঠে তালতরুশিরে;
ঝলকি ত্রিশূল দণ্ড "বনদুর্গা" উন্নত মন্দিরে
দিগন্তে মিলায় ক্রমে। কাশীতলে শীতল বাহিনী
সুনীলা সুনীরা গঙ্গা মৃদু পদে সাগরগামিনী।

সুনীল আকাশসিন্ধু—পূর্ব্বপারে আরক্ত বেলায়
দাঁড়াইয়া মুগ্ধা সন্ধ্যা "বাসন্তিকা"* ললাটিকা প্রায়
দক্ষিণ সীমন্ততলে, অঙ্গে কম্র গোলাপি বসন
বক্ষে দীপ্ত মহামণি ! †
জলক্রীড়া করি সমাপন
পরপার হ'তে ঘাটে ফিরে আসে মরালের দল
নবনীতশুভ্রকান্তি।
হো হো রবে দীপ্ত চিতানল
সহসা গর্জ্জিল যেন বিস্ফুরিয়া স্ফুলিঙ্গের রাশি
পার্শ্বস্থিত শ্মশানেতে ; বিচ্ছুরিয়া মর্ম্মন্তুদ হাসি
শত উৎসমুখে যেন দৈত্যসম তীব্র ব্যঙ্গভরে।
'হা হা হাহা' মহাহাস্য ছুটে চলে দিক্ দিগন্তরে
স্পর্শিতে গগনবক্ষ, প্রকৃতির মায়ার গুণ্ঠন
আতঙ্কে খসিয়া প'ল, চরাচর স্তম্ভিতস্পন্দন।
পশ্চিম আকাশপ্রান্ত শোভে যেন মহাচিতাপ্রায়,
তৃতীয়ার খণ্ড চন্দ্র মাঝে তার আতঙ্কে মিলায়।
চিতাচ্যুত পাংশুজালে ধীরে ছায় শূন্য জল স্থল
মুছে খ'সে ভেঙে যায় প্রকৃতির বিভব কোমল।
নগ্না ধরণীর বক্ষে বিচ্ছুরিয়া স্ফুলিঙ্গের রাশি
হা হা রবে মহাশূন্য হাসে শুধু তীব্র অট্ট হাসি।

সে মহা 'নাস্তি'র মাঝে অকস্মাৎ আর্ত্ত কণ্ঠরব
ধ্বনিল কোথায় ! চাহে চরাচর কৌতুকে নীরব।
ক্রীড়া সারি' একে একে ঘরে গেছে মরালের দল
একটী দাঁড়ায়ে তীরে, সউৎসুক কাতর চঞ্চল
উৎক্ষেপি সঘনে পক্ষ, চাহে দূর নদীবক্ষমাঝে,
হোথায় অপর তীরে প্রিয়ে তার ত্যজি আসিয়াছে
অন্যমনে, মুহুর্ম্মুহু কলকণ্ঠে করি আর্ত্তনাদ
চাহে দিগন্তের পানে, ঝাঁপ দিয়ে ছুটে যেতে সাধ
প্রিয়ের সন্ধানে বুঝি!

* 'ক্যানোপাস্' † 'সিরিয়াস্ নক্ষত্র দ্বয়।

পরপারে সায়াহ্নতিমির
লুপ্ত করি তীর-রেখা অতিক্রমে তটিনীর নীর
'কালপুরুষের' মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া প্রহরীর প্রায়
বহু অতীতের সাক্ষী কেদারের মন্দিরচূড়ায়।
ঈশানে 'মিথুন'যুগ্ম চাহি আছে মৌন-কৌতূহলে
উৎসুকে নীরব যেন অট্টহাস ম্লান চিতানলে।
ঝাঁপ দিয়ে নদী বক্ষে চাহি অন্ধ দিগন্তের পানে
মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হ'ল মরালীটী প্রিয়ের সন্ধানে।
কণ্ঠরঅত্তীব তার বহুক্ষণ বক্ষে নিল দিক্
চকিত অযুত তারা চেয়ে র'ল স্থির নির্নিমিখ্।
তার সেই কলকণ্ঠ ব'লে গেল এই দুটি কথা—
'আছে হেথা আছে প্রেম বিশ্ব যাহে লভে নির্ভরতা।'

শ্রীনিরুপমা দেবী।

দুইখানি প্রাচীন পুঁথি

কোচবিহার রাজ্যের দিনহাটা নগরে প্রাচীন পুঁথির অনুসন্ধান কালে দুইখানি গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। একখানি শ্রীশ্রী৺ সত্যনারায়ণের পাঁচালী। এখানি দিনহাটা রেলওয়ে ষ্টেশনের ষ্টেশনমাষ্টার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সম্পত্তি ও মূল পুঁথির নকল। গ্রন্থখানি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ৺নন্দরাম মিত্র কর্ত্তৃক রচিত। অপরখানি পদ্মপুরাণান্তর্গত ক্রিয়াযোগসারের বঙ্গানুবাদ। ইহা দিনহাটানিবাসী জোতদার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্পত্তি। গ্রন্থখানির রচয়িতা রামলোচন শর্ম্মা। এই দুইখানি পুঁথির পরিচয় প্রদান করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে ৺সত্যনারায়ণের পাঁচালী বহু দেখিতে পাওয়া যায়। আলোচ্য পুঁথিখানির বিশেষত্ব এই যে, এখানি অতি প্রাচীন, প্রায় ১৮৫ বৎসর পূর্ব্বে রচিত। এমন কি ভারতচন্দ্রের সত্যনারায়ণের পাঁচালীও ইহার পাঁচ বৎসর মাত্র পূর্ব্বে রচিত। ভারতচন্দ্রের বয়স আলোচ্য পুঁথি রচনার সময় ২০ বৎসরের অধিক হইবে না। বিদ্যাসুন্দর, অন্নদামঙ্গল তখন সম্পূর্ণ হয় নাই। ভারতচন্দ্রের পরবর্ত্তী অথচ ভারতচন্দ্রের প্রভাব হইতে মুক্ত প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্য অল্পই দেখা যায়। আলোচ্য পুঁথিখানি ভারতচন্দ্রের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, কারণ ভারতচন্দ্রের রচনা খুব সম্ভব লেখক দেখিতে পান নাই। ভারতচন্দ্র ১১৩৪ সনে (১৬৪৯ শকাব্দে)

সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করেন। ইহার প্রমাণ ভারতচন্দ্রের পাঁচালীর নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি হইতে পাওয়া যায় :—

"সবে কৈল অনুমতি, সংক্ষেপে করিতে পুঁথি, তেমতি করিয়া গতি,
না করিও দূষণা।
গোষ্ঠীর সহিত তাঁর, হরি হোন্ বরদার, ব্রতকথা সাঙ্গ পায়
সনে রুদ্র চৌগুণা।"

আলোচ্য নন্দরাম মিত্রের পাঁচালী ১৬৫৪ শকাব্দে রচিত হয়। পাঁচালীর শেষে এই পংক্তিগুলি হইতে তাহা জানিতে পারা যায়।

"অঙ্ক বাণ রুদ্র সেন বাঙ্গলাতে লেখে।
প্রথম শরৎকাল পঞ্চম তারিখে।
বেদ বাণ রস শশী শক পরিমিত।
সেইকালে রচিল সত্য-পীরের চরিত॥"

বাঙ্গলা সনটি শকাব্দের সহিত মিলে বলিয়া আমার বোধ হয় না। 'প্রথম শরৎকাল পঞ্চম তারিখ' অর্থে ৫ই ভাদ্র করা যাইতে পারে।

গ্রন্থকারের কোন বিশেষ পরিচয় পুঁথি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। গ্রন্থকার নিজের নাম নন্দরাম মিত্র এইমাত্র পরিচয় দিয়াছেন ও নিজেকে 'ঘটক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

"দণ্ডবৎ হও সবে পীরের চরণে।
ঘটক মিত্র নন্দরাম এই কথা ভণে॥"
"সত্য পীরের পাদপদ্ম করিয়ে ভাবনা।
নন্দরাম মিত্র কার প্রবন্ধ-রচনা॥"

পুঁথিখানির আরম্ভ এইরূপ :—

"প্রথমে বন্দিলাম সূর্য্য করি যুগ পাণি।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন দেব দিনমণি॥
খর্ব্ব স্থূল লম্বোদর বিঘ্নবিনাশন।
প্রণমহ গণপতি গৌরীর নন্দন॥
ইন্দ্র আদি দিকপাল নবগ্রহ আদি।
সবার চরণ বন্দম্ এ জীবনাবধি॥"

গ্রন্থশেষ :—

"যার যে বাসনা থাকে করহ কামনা।
অতঃপর আমীন আমীন বল সর্ব্বজনা॥
দণ্ডবৎ হও সবে পীরের চরণে।
ঘটক মিত্র নন্দরাম এই কথা ভণে॥
যেবা ভণে যেবা শুনে যে করে সিরিণী।
পীরের প্রসাদে যেই বাড়ে দিনি দিনী॥"

গ্রন্থখানিতে বর্ণিত ঘটনা এই !---এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ফকিরবেশী সত্যপীর কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তাঁহার পূজা করিয়া ধনবান্ হন। ব্রাহ্মণের উপদেশে কয়েকজন কাঠুরিয়া সত্যপীরের পূজা করিয়া ধনী হয়। এক বণিক কাঠুরিয়া-গণের নিকট পীরের ক্ষমতা শুনিয়া সন্তান-কামনায় পীরের পূজা করিয়া "সির্ণী" ভক্ষণ করেন। বণিকের চন্দ্রাবতী নামে কন্যা জন্মে। সাধু তাহার বিবাহ দেন। পরে জামাতাকে লইয়া বণিজ্য করিতে যান। অর্থোপার্জ্জন কালে সত্যপীরের পূজা না করাতে কাঞ্চননগরের রাজা কর্ত্তৃক চোর বলিয়া ধৃত ও কারাগারে প্রেরিত হন। সাধুর স্ত্রী ও কন্যা বহু ক্লেশভোগ করিয়া শেষে সত্যনারায়ণের পূজা করেন। তাহাতে সত্যপীর কাঞ্চননগরের রাজাকে স্বপ্নে সাধুকে জামাতা সহ মুক্ত করিতে আদেশ দেন। সাধু গৃহে ফিরিয়া আসিতেছেন পথে সত্যপীর ফকিরবেশে 'নৌকায় কি আছে' জিজ্ঞাসা করেন। সাধু "লতাপাতা আছে" এই বলিয়া ধনরত্নের কথা গোপন করিলে বাস্তবিকই সমস্ত দ্রব্য লতাপতা রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। শেষে আবার সত্যপীরের অনুগ্রহে দ্রব্য সকল পূর্ব্বরূপ লাভ করে। সাধু গৃহে ফিরিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার পত্নী ও কন্যা দৌড়িয়া ঘাটে যাইতে থকে। কন্যা সত্যপীরের "সির্ণী" ফেলিয়া ছুটিয়া যাওয়ায় নৌকা সহ সাধুর জামাতা জলমগ্ন হয়। সাধু, স্ত্রী ও কন্যা সহ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিবেন এমন সময় সত্যপীর দৈববাণী করেন, ভূমিতে নিক্ষিপ্ত "সির্ণী" উঠাইয়া খাইলে সাধুর জামাতা প্রাণ পাইবে ; ঐ কার্য্য করাতে নৌকা সহ সাধুর জামাতা পুনর্ব্বার জলে ভাসিয়া উঠিল।

এই ধরণের ঘটনা প্রায় সকল সত্যনারায়ণের পুঁথিতেই পাওয়া যায়। এই পুঁথির মধ্যে লেখকের সমকালীন সমাজের আচার ব্যবহার যে অংশগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে, সেগুলি ঐতিহাসিকের চক্ষে আদরণীয় হইতে পারে।

কন্যা জন্মের পর :—

"দৈবজ্ঞ আসিয়া সাধু করিল ঠিকুজি।
শুভাশুভ ভালমন্দ গুণে চাহি আজি ॥"

কন্যা বয়ঃস্থা হইলে :—

"কন্যা বিভা দিতে সাধু ভাবিল অন্তরে।
ঘটক পাঠাইয়া দিল দেশদেশান্তরে ॥
চলিল কুলজ্ঞগণ বরের উদ্দেশে।
পাইল সুন্দর বর চিরটের দেশে।
ভুলায়ে আনিল তারে পথে লাগ পেয়ে।
সাধুর নিকট সব কৈল বিশেষিয়ে ॥
জানিল কুলীন বড় পুরুষ ক্রমে লেখা।
সুবর্ণ যৌতুক দিয়ে করিলেক দেখা ॥
কহিল সকল কথা করিয়ে বিনয়।
আপনার কুলশীল দিল পরিচয় ॥
শুনিয়ে সন্তুষ্ট সাধু উপযুক্ত বটে।
প্রতিপাল্য কর বাপা থাকিয়ে নিকটে ॥
তবে সাধু বলে বাপু এ সব তোমার।
তুষ্ট হ'য়ে দিল বর ধর্ম্মতঃ কন্যার ॥

সঙ্গে কেহ আইসে নাই চিত্তে বড় খেদ।
বিবাহের দিন হ'ল বিচারিয়ে ভেদ ॥
নাহি জানে বাপ মায় জ্ঞাতি কুটুম্ব।
ঘটক চাতুরী আছে ভুলায়ে সম্বন্ধ ॥
পণাপণ দায় ধরা কেবা কথা কয়।
লগ্ন হ'ল শুভক্ষণে গোধূলি সময় ॥"

গ্রন্থকর্ত্তা নিজে ঘটক ছিলেন। গ্রন্থে বর্ণিত ভুলাইয়া বর আনিয়া বিবাহ দেওয়া ব্যাপারটি তৎকালে প্রচলিত থাকিতে পারে। ঘটক গ্রন্থকার চন্দ্রাবতীর বিবাহের বর্ণনাটি যেরূপ সুন্দর ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে উহা তৎকালীন সমাজের বিবাহ উৎসবের একখানি জীবন্ত চিত্র বলিয়া প্রতীতি হয়। কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইলেও প্রাচীন সামাজিক আচারব্যবহারে পরিচায়ক বলিয়া সেই স্থলটি সমগ্র উদ্ধৃত হইল। অন্য সত্যনারায়ণের পুঁথিতে এরূপ বিবাহ বর্ণনা পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয় গ্রন্থকারের নিজব্যবসা বিবাহের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়াই এই বর্ণনাটি বিস্তৃত রূপে করিয়াছেন।

"হেথায় সাধুর নারী ডেকে আনে এয়ে।
সুন্দর সুবেশা হ'য়ে আসে বেণের মেয়ে ॥
কারু হাতে শাঁখা, কোনো জোকা, তাড়ে বাজুবন্দ।
কারু নাকে নথ, ছোলা দাঁত, কথার কত ছন্দ ॥
কারু চিকুর, সিঁথায় সিঁদুর, গলায় গজমতি।
পায়ে নূপুর, কটিতে ঘুঙুর, হংস জিনি গতি ॥
কারু অচিরাতে বানিজ্যেতে স্বামী গেছে দূর।
তিনি বড় অভাগিনী না পরেন সিন্দুর ॥*
কারু পুনঃবিভা করি মাসে স্বামী গেছে বাড়ী।
কথা তার ঠেকার ঠেকার হাতে দেন তুড়ী ॥
কেহ সতীন পীড়িত তাপেতে জড়িত স্বামীতে করে দ্বেষ।
পরের সুখ দেখিতে তার পাঁজরা হয় শেষ ॥
কেহ হেঁটে যায় পান খায় ঠোঁটটি লাল ক'রে।
হেসে হেসে পড়ে খসে স্বামীর সোহাগ ভরে ॥
প্রাচীন যারা বলে তারা নিষেধ বচন বাণী।
কথার পাট হেন ঠাট কভু নাহি শুনি ॥
বাড়ী যেয়ে কব তারে এ সব রসের কথা।
যাবা রাতি খাবা লাথী পাবে মরম ব্যথা ॥
এইরূপে আইল যত সাধুর বাটীর এয়ে।
সুন্দরা সুবেশা হ'য়ে আইল বেণের মেয়ে ॥
হাস কৌতুক কেউ বা যৌতুক দিল টাকা কড়ি।
তোমার কারণ এয়েছি মোরা শীঘ্র যাব বাড়ী ॥

* এ প্রথাটি আর কোথাও বর্ণিত হইয়াছে বলি জানি না। পতি জীবিত থাকিতে সিন্দুর না পরা অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়াই পরিচিত।

সাধুর নারী বলে তবে ভাল বলিছ বটে।
চল তবে যাই সবে জল সহিতে ঘাটে॥
ঘটক মিত্র নন্দরাম ভেবে সত্যপীর।
বাঞ্ছা সিদ্ধি কর জিন্দে তুমি দস্তগীর॥

দীর্ঘ ত্রিপদী।

জল সইতে চলে এয়ে সুমঙ্গল গীত গেয়ে
হাসে রসে লয়ে সাধুর নারী।
ঘটবারি লইল মাথে, নানাবিধ বাদ্য সাথে
চলে জয় জয় শব্দ করি॥
প্রথমে ব্রাহ্মণ বাড়ী, ঘট পূরি লইল বারি
সাধুর রমণী দিল পান।
চন্দ্রাবতীর বিভা হবে, কৃপা করি যেও সবে
আশীর্ব্বাদ করিহ কল্যাণ॥
সামাজিক পাড়াপড়সী, ক্রমে জল সয়ে আসি
উপনীত জাহ্নবীর তটে।
পূজিলেক ভাগীরথী একান্ত ভকতি মতি
পশ্চাতে হুলু দিয়ে উঠে॥
গঙ্গা পূজি আইল বাড়ী, আনিয়ে নূতন পিঁড়ী
চন্দ্রাবতী করাইল স্নান।
সোণার জড়িত গায় নানারত্ন শোভে তায়
দিব্যবস্ত্র দিল পরিধান॥
করিল বিচিত্র বেশ পরিপাটী বান্ধে কেশ
অধিবাস করাইল সকলে।
সময় হইল বেলা পাঠাইল চতুর্দ্দোলা
বর লয়ে গেল ছাদনা তলে॥
চারিদিকে বাদ্য বাজে ভাউয়ে রোমজানী নাচে
বাজিতে রজনী কৈল দিন।
পূর্ব্বমুখে বর বৈসে কোন বা পণ্ডিত দোষে
ব্যক্তিক্রম মত যে প্রাচীন॥
অর্চ্চিয়ে আনিল বর দিল বস্ত্র অলঙ্কার
ঘরে লয়ে গেল ভৃত্যগণে।
আইল সাধুর নারী দিব্য পট্টাম্বর পরি
বয়ে বয়ে কতেক বন্ধনে॥

স্বস্তিক সুপ্রতি সাজি ধুস্তরা কদলী মাজি
বরণের কত কব লেখা।
জুখিলেক সকল অঙ্গ হাতে বান্ধে সুতা রঙ্গ
কনক অঙ্গুলী দিল টাকা॥
বরকন্যা দুইজন থুইল নৈঋত কোণ
ছাউনি করিল ধরাধরি।
প্রদক্ষিণ করিল পতি সপ্তবার ভকতি মতি
মাল্যবদল ফুলের বেহারী॥
ছালনাতলে দুহা আনি, পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী
মধুপর্ক লইতে দিল ঘ্রাণ।
বান্ধিল দুহার হাত হরীতকী তাম্বূল সাত
তিল তুলসী কুশ পরিমাণ॥
তিন তিন পুরুষ ধরি গোত্র নাম উল্লেখ করি
সম্প্রদান করে সদাগর।
হস্তমোচনের কালে আচার্য্য ডাকিয়া বলে
বর দক্ষিণা আন অতঃপর॥
সেইক্ষণে দিল টাকা সুবর্ণে করিয়ে লেখা
কামস্তুতি পড়ে পুরোহিত।
শুভদৃষ্টি করে চেয়ে অন্তরে হরিষ হয়ে
দর্শনে দুহার পুলকিত॥
গ্রন্থী বান্ধিয়ে বাসে থুইল লয়ে বাম পার্শ্বে
অগ্নি নমস্কার কৈল বসি।
ঘরে লয়ে গেল দুহা মাস মঙ্গল খেলে জুয়া
আনন্দে করিল পঞ্চগ্রাসী॥
এয়েগণ বসিল বেড়ি আনিয়ে নূতন হাঁড়ী
ভাত ব্যঞ্জন পোতে কুতূহলে।
দিব্য শয্যা সুশোভন শুইল সাধুর নন্দন
চন্দ্রাবতী তুইল লয়ে কোলে॥
রাত্র শেষ ছিল অতি জ্বালিয়ে ঘৃতের বাতী
লজ্জায় কামিনী শুইল পার্শ্বে।
সুবুদ্ধি সাধুর বালা কেবল মাত্র মন কালা
রজনী বঞ্চিল হাসে রসে।
কুশণ্ডিকা আদি যত করিলেক শাস্ত্র মত
বাসি বিভা দিল তারপর।

নন্দরাম মিত্র কয় সত্যপীর দয়াময়
কৃপা কর করুণাসাগর ॥

আধুনিক বঙ্গে যে সকল বিবাহের আচার প্রচলিত তাহার সহিত উপরে বর্ণিত আচারগুলির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইবে।

লেখক তৎকালীন বিবিধ নৌকার নাম দিয়াছেন। সাধু এই সকল নৌকা লইয়া বাণিজ্যযাত্রা করিলেন। লেখকের ভূগোলজ্ঞানের অভাব বর্ণনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রথমে ভাসায় ভড় না লাগে তাহাতে ঝড়
তার পাছে চলে বাঙ্গলা মুটে।
দাঁড়ীগণ কিনারে যায় বাদাম তুলিয়ে তায়
কাছি ধ'রে লয়ে যায় হেঁটে ॥
তার পাছে চলে ভুটি বহুত জিনিস উঠি
বাঘমুখ পিতলবান্ধা চক।
পাটগাজ পাছে ধায় দুই কূল হেঁসিয়ে যায়
দেখে সাধু পরম কৌতুক ॥
পোয়াগাছ পূকরিডিঙ্গা দুইদিকে রামসিঙ্গা
মধ্যখানে মনমকাষ্ঠ বান্ধা।
পুলকে ডুলকে ধায় জল চিরে আগে যায়
দেখে সাধুচিত্তে বড় ধান্ধা ॥
বজরা কোসা তবে চলে ছোঁয় কি না ছোঁয় জলে
সাধুর বৈঠক তার পর।
হিঙ্গুলে মণ্ডিত কান্ধা দুইদিকে পিত্তল বান্ধা
মালগীরি দিব্য দুই ঘর ॥
খেলানার কত রাগ না পায় তাহার লাগ
পক্ষিরাজ উঠে যেন পাখা।
গঙ্গা বাহি রাত্র দিনি পৈল গিয়ে বাহির পানি
হিজলী বন্দরে দিল দেখা ॥
খাস দোহা বেয়ে যায় বাণেশ্বর ডাইনে রয়
ঠাকুর বাড়ী সমুদ্রের কূলে।
প্রণমিল জগন্নাথ খাইল প্রসাদ ভাত
জয় জয় শব্দ করি চলে ॥
সুরথ বন্দর দেখি পরে হনুমানচৌকি
লক্ষ্মণ লছমন কৈল ডাহিনে।
রামেশ্বর সেতুবন্ধ দেখিয়ে পরমানন্দ
মহাবেগে ধায় রাত্র দিনে ॥

ভাগলপুর বিজয়পুর হজ মক্কা কত দূর
কর্ণাটের কূল গেল বেয়ে।
মিছিরিবন্দ গুজরহাটী দিব্য ছিট পরিপাটী
কিনিল জিনিষ কত দিয়ে॥
শ্রীহট্ট নেংটার দেশ দেখিয়ে বিচিত্র বেশ
সিংহলেতে গেল তার পর।
নদ নদী বাইল যত তার বা নাম লব কত
উত্তরিল কাঞ্চননগর॥

গ্রন্থকার বাণিজ্যে কোন্ কোন্ দ্রব্যের পরিবর্ত্তে সাধু কি কি দ্রব্য কিনিলেন তাহারও একটা তালিকা দিয়াছেন। উহা পাঠকগণের কৌতুককর হইবে বলিয়া এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

নারিকেল বদলে শঙ্খ যব গমে লয় লঙ্গ
চাউল বদলে লয় জীরে।
কলাই মরিচ সুঁটী মেপে লয় পরিপাটী
সুপারীতে রুদ্রাক্ষ ফেরে॥
নালিতায় তেজপাত হরীতকী তাম্বুল সাত
সুঁটী বদলে লয় হিং।
তিল সরিষা গুয়া মৌরি, জায়ফল সমান করি
বদলেতে না লয় কিছু দিং॥
রজত কাঞ্চন চুণি হীরা মতি মাণিক্য মণি
মুকুতা প্রবাল পিতল পলা।
দস্তা কাঁসা তাঁবা সিসে বদলে না পায় দিশে
কিনিল জিনিষ দিয়ে মেলা॥

কারাগারের বন্দীদের পায়ে লৌহশৃঙ্খল প্রদত্ত হওয়া, তাহাদের স্নানার্থ তৈল না দেওয়া ও ক্ষৌরকর্ম্ম না হওয়ার বর্ণনা নিম্নলিখিত পংক্তিগুলিতে পাওয়া যায়। সাধু কারাগার হইতে মুক্ত হইলে :—

"রাজা বলে দেহ ছাড়ি শীঘ্র কাট পা'র বেড়ী
নাপিতে বলিল কামাইতে।
তৈল কুড়ে করে স্নান বস্ত্র দিল পরিধান
ভোজন করাল বিধিমতে॥"

সাধুর জামাতা গৃহে ফিরিবার সময় কি কি দ্রব্য কিনিলেন সেই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করিয়াই এ পুঁথিখানির পরিচয় শেষ করিব।

"একে তার মনে ছিল আরো আজ্ঞা পায়।
সোণারূপার বাট ভাঙ্গি গঠন গড়ায়॥

শাল পামরি কেনে বনাত আট পট্টু।
শ্বশুরের উপরোধ রাখে পাছে হন কটু ॥
ঢুলিচা গালিচা কেনে সতরঞ্চ ভোট।
খেলাত মহরা কেনে স্বর্ণরেখা কোট ॥
ছিট সাহেবানা কেনে কত রঙ্গের ছোপ।
এলাশ আতরদান কেনে আর পালকীর টোপ ॥
সোণারচাকী চাল কেনে পোলাদী সংসের।
আরশী বান্ধা কলমদান গজদানী হাড়ের ॥
নেজাবর্ষি মোমজামা দেখিতে কৌতুক।
ঠুকনী পাথর কেনে চকমকে বন্দুক ॥
কাটারী খুঞ্জরী কেনে তালপত্র খাঁড়া।
মৃতজীব সঞ্চারিণী কেনে বিষমোড়া ॥”

ক্রিয়াযোগসার।

ক্রিয়াযোগসার পদ্মপুরাণের অংশ ও ২৬ অধ্যায় বিশিষ্ট। ক্রিয়াযোগসারের বাঙ্গলা পদ্যে অনুবাদ অতি অল্পই এযাবৎ আবিস্কৃত হইয়াছে। মুনশী আবদুল করিম সঙ্কলিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য হইতে প্রকাশিত “প্রাচীন পুঁথির বিবরণ” নামক গ্রন্থে একখানি ক্রিয়াযোগসারের উল্লেখ আছে। মুনশী সাহেবের লেখা হইতে মনে হয়, ক্রিয়াযোগসার যে কি বিষয়ক ও ইহা যে পদ্মপুরাণের অংশবিশেষ তাহা তিনি জানেন না। যাহাই হউক এই অসম্পূর্ণ ক্রিয়াযোগসারের পুঁথি ব্যতীত আর দুইখানি মাত্র ক্রিয়াযোগসারের পুঁথি আমি দেখিয়াছি। একখানি কোচবিহারের মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ রচিত ও অপরখানি অদ্যকার প্রবন্ধের বিষয়ীভূত। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের ক্রিয়াযোগসার কোচবিহার সাহিত্য-সভা কর্তৃক প্রকাশিত হইতেছে। হরেন্দ্রনারায়ণ নিজে সমগ্র ক্রিয়াযোগসারের অনুবাদ শেষ করিতে পারেন নাই। কতকগুলি সর্গের অনুবাদ নিজে করিয়াছেন। অবশিষ্ট সর্গগুলির অনুবাদ নিজ সভাস্থিত পণ্ডিতগণের দ্বারায় করাইয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য পুঁথিখানিতে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ আছে।

গ্রন্থের আরম্ভ এইরূপ :—

শ্রীশ্রীদুর্গায়ৈ নমঃ।

অথ ভাষা ক্রিয়াযোগসারঃ লিখ্যতে।

গুরুং গণপতিং ব্যাসং শ্রীদুর্গাং সারদাং দ্বিজঃ।
নারায়ণং শিবং নত্বা বক্তি শ্রীরামলোচনঃ ॥

গুরু গণপতি ব্যাস শ্রীদুর্গা সারদা।
নারায়ণ শিব বন্দি কহিছে কবিতা ॥

শ্রীরামলোচন দ্বিজ মূর্খ মূঢ়মতি।
শ্রীনাথের শ্রীচরণে দৃঢ় করি মতি ॥
নারায়ণ ব্রহ্মা আদি যত দেবগণ।
ক্রমাগত সর্ব্বদেবের বন্দিয়া চরণ ॥
পদ্মপুরাণের উক্ত ক্রিয়াযোগসার।
পদবন্ধ করি তাহা করিল প্রচার ॥

* * *

পূর্ব্বে নৈমিষারণ্যে আছে তপোধন।
হেনকালে আইল তথা সুত তপোধন ॥
ব্যাসপুত্র সর্ব্ব শিষ্য করিয়া সংহতি।
শ্রীহরি স্মরণ করি আইল মহামতি ॥
তাহা দেখি গাত্রোত্থান কৈল মুনিগণ।
অন্যে অন্যে সম্ভাষ করিল সর্ব্বজন ॥

গ্রন্থশেষ এই :—

ক্রিয়াযোগসার পাঠ করে যেইজন।
সর্ব্বপাপে মোক্ষ সেহি ব্যাসের বচন ॥
লিখে বা লিখায় পুঁথি ক্রিয়াযোগসার।
বিষ্ণু পূজা ফললাভ হয় তো তাহার ॥
শ্রীরামলোচন দ্বিজ মূর্খ মূঢ়মতি।
শ্রীনাথের শ্রীচরণে দৃঢ় করি মতি ॥
ক্রিয়াযোগ সার কথা ব্যাসের বচন।
যৎ কশ্চিৎ ভাষায় তাহা করিল রচন ॥
সংস্কৃত ভাঙ্গি পদ রচিল ভাষায়।
হরি হরি বল ভাই পালা হৈল সায় ॥
হরি পদ ভাব মন হইয়া একান্ত।
ফাঁকিতে পড়িয়া রবে দুর্জ্জয় কৃতান্ত ॥
শ্রীরামলোচনে কৃপা করহ শ্রীহরি।
ভবসিন্ধু পার হৈতে দেহ পদতরী ॥

ইতি শ্রীবেদব্যাসজৈমিনি সংবাদে পদ্মপুরাণোক্ত ক্রিয়াযোগসারে পঞ্চবিংশতি অধ্যায়।

পুঁথির আকার ১৩×৪½ ইঞ্চি। হরিদ্রাবর্ণের কাগজে লিখিত। মোট ৮৮ পত্র। ১৭৬ পৃষ্ঠা। পৃষ্ঠায় পংক্তি সংখ্যা সর্ব্বত্র সমান নয়, কোন পৃষ্ঠায় ৯, কোন পৃষ্ঠায় ১০, কোন পৃষ্ঠায় বা ১১ পংক্তি অবধি আছে।

গ্রন্থের বিষয়ের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। মূল সংস্কৃত ক্রিয়াযোগসার মুদ্রিত হইয়াছে। বঙ্গবাসী আফিস হইতে বঙ্গানুবাদ সহ মূল গ্রন্থও সুলভমূল্যে বিক্রীত হইতেছে। এখানে কেবল গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয় ও তাঁহার রচনার কিঞ্চিৎ নমুনা উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে।

১৯ পত্রের সম্মুখের পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার এইরূপে নিজ পরিচয় দিয়াছেন :—

"তারাপুর গ্রামে ধাম শ্রীরাধামোহন নাম
দ্বিজবর বক্সী আখ্যা ছিল।
তার সুত মূঢ়মতি শ্রীরামলোচন খ্যাতি
বহুযত্নে পুস্তক ভাঙ্গিল ॥
পদ্মপুরাণের সার নাম ক্রিয়াযোগসার
শ্রবণে পাতক ধ্বংস হয়।
ব্যাসভক্তি নহে বৃথা গঙ্গার মাহাত্ম্য কথা
শ্রবণেতে বৈকুণ্ঠেতে যায় ॥"

পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে গ্রন্থকার নিজ বিশদ পরিচয় দিয়াছেন। সে অংশটি এই :—

"কাশীনাথ নাম বিপ্র শিবের সন্তান।
আমুঠ্যার গাঙ্গুলি তার পুত্র কাণুরাম ॥
কাণুরাম সুত মুক্তারাম বলি খ্যাতি।
ছয়জন ছিল মুক্তারামের সন্ততি ॥
ব্রজনাথ বলি নাম ছিল সর্ব্বজ্যেষ্ঠ।
ব্রজকিশোর নাম তাহার কনিষ্ঠ ॥
ব্রজমোহন বক্সী বল্লি তদনুজ।
রাধামোহন নাম তাহার অনুজ ॥
ব্রজগোবিন্দ বলি কনিষ্ঠ তাহার।
ব্রজসুন্দর নাম তার সহোদর ॥
এহি ছয় ভাই মুক্তারামের সন্তত্তি।
তস্য মধ্যে রাধামোহন বক্সী যার খ্যাতি ॥
তার সুত শ্রীরামলোচন মূঢ়মতি।
তারাপুর বেকাতাড়ি গ্রামেতে বসতি ॥
রঙ্গপুরের পূর্ব্ব বাহারবন্দের পশ্চিম।
সেইস্থানে বাস মূঢ়মতি দীনহীন ॥ .....
পদ্মপুরাণের উক্ত ক্রিয়াযোগসার।
ভাষায় ভাঙ্গিয়া পদ করিল প্রচার ॥
ইহাতে যে ভদ্রাভদ্র পদ অপূরণ।
সে দোষ না লবা মোর শুন বুধজন ॥
এহি আশীর্ব্বাদ মোকে কর সর্ব্বজন।
শ্রীনাথ চরণে মোর দৃঢ় হোক মন ॥

ইহা হইতে গ্রন্থকারের বংশপরম্পরা এইরূপ বুঝিতে পারা যায় :—

কাশীনাথ গাঙ্গুলি (বক্সী)
|
কাণুরাম
|
মুক্তারাম
|
ব্রজনাথ　ব্রজকিশোর　ব্রজমোহন　রাধামোহন　ব্রজগোবিন্দ　ব্রজসুন্দর

রাধামোহন
|
রামলোচন
(গ্রন্থকার)
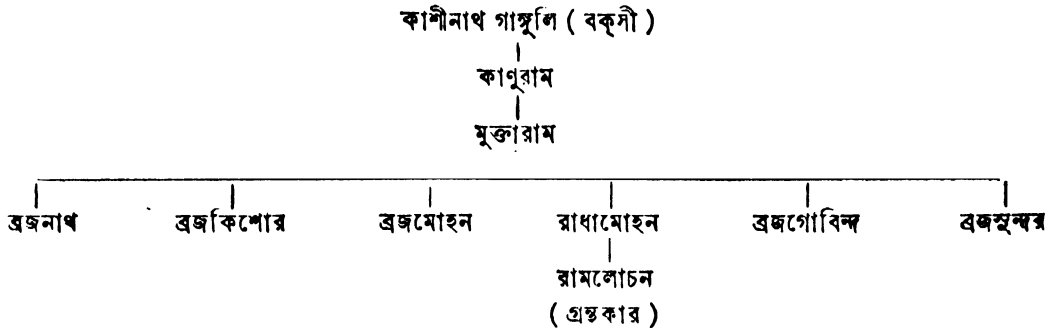
রঙ্গপুরের পূর্ব্ব ও বাহারবন্দের পশ্চিমে তারাপুর বেকাতাড়ি গ্রামে গ্রন্থকারের নিবাস ছিল।

গ্রন্থকার তন্ত্রোক্ত মন্ত্র জপ করিতেন তাহার প্রমাণ গ্রন্থখানি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। গুরু কর্ত্তৃক প্রদত্ত শ্রীনাথের নামই তাঁহার ইষ্টমন্ত্র বলিয়া বোধ হয়। চতুর্থ অধ্যায় শেষে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :—

"জপরে ওরে মন　　সেই গুরুদত্ত ধন
সংস্রারে ধ্যান কর শ্রীনাথচরণ।
বাস যার মূলাধারে　　জাগন করায়ে তারে
লৈয়া যাবে 'সহস্রারে' শ্রীনাথ সদন॥"

পুঁথিখানি গ্রন্থকারের নিজের বলিয়া মনে হয়। ৩ পত্রের শেষে একটু ফাঁকা জায়গা পাইয়া লেখক লিখিয়া রাখিয়াছেন :— "শ্রীরামলোচন শর্ম্মণঃ পুস্তকমিদম্।"

পুঁথিখানি যে লেখকের স্বহস্তে লেখা তাহাও ৩৫ পত্রে ঐরূপ ফাঁকা জায়গায় লিখিত নিম্নলিখিত মন্তব্য হইতে বুঝিতে পারা যায় :—

"শ্রীরামলোচন শর্ম্মণঃ পুস্তকমিদং
স্বকীয়রচিতং স্বাক্ষরে লিখিতম্।"

কিন্তু পুঁথিখানির শেষদিকের পত্রগুলির হস্তলিপি অন্যরূপ। পুরাতন গলিত পত্র অনেক সময় অন্যে নকল করিয়া পুঁথিখানিকে সম্পূর্ণ রাখিত। এ ক্ষেত্রে তাহা হইয়াছে কি না বিবেচ্য।

গ্রন্থকারের অন্য কোন পরিচয় বা গ্রন্থরচনাকাল পুঁথিখানি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

৬০ পত্রের মার্জ্জিনে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালীতে লিখিত আছে "শ্রীদয়ানাথ শর্ম্মণা কামরূপী পাঠকৈয়াসীত্র পুস্তক।" ইহা হইতে অনুমিত হইতে পারে গ্রন্থখানি এক হাত হইতে অপর হাতে যাইতে যাইতে দয়ানাথ শর্ম্মার অধিকারে পৌঁছিয়াছিল। ৬ পত্রের মার্জ্জিনে আছে "শ্রীদয়ানাথ শর্ম্মণঃ সাঃ কামরূপ। কামরূপ পঃ গুয়াহাটী।" ২০ পত্রের কোণে ভিন্ন কালীতে লেখা আছে "শ্রীশ্রীদুর্গা সন ১২৬১ সাল।" ইহা গ্রন্থরচনার কাল মনে করিবার কোন হেতু নাই। পুঁথির কোন অধিকারী ইহা লিখিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়।

গ্রন্থখানির রচনাপ্রণালী ও ভাষার একটি উদাহরণ দিয়া এ প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

"তারপর শুন কথা　　বেশ করে রাজসুতা.
অপরূপ ভুবনমোহন।
বদন শারদশশী　　তাহে মন্দ মৃদু হাসি
কুরঙ্গনিন্দিত বিলোচন॥

কপালে সিন্দুর ফোঁটা দিনমনি জিনি ছটা
চন্দনের বিন্দু চারিপাশে।
অধর সুন্দর শোভা অরুণ জিনিয়া আভা
হাস্য কালে বিজুলী প্রকাশে॥
নাসিকা গরুড় তুল্য নিন্দা করি তিলফুল
তাহে শোভা করে গজমতি।
ভুবন জিনিয়া তায় দাড়িম্বের বীজ প্রায়
শোভা করে দশনের দ্যুতি॥
গৃধিনী জিনিয়া শ্রুতি কনক কুণ্ডল তথি
গণ্ডযুগে দোলে অনুপাম।
কণ্ঠে শোভে মণিমালা ভুবন করিছে আলা
গলে দোলে মুকুতার দাম॥……
মৃণাল জিনিয়া কর শোভে অতি মনোহর
তাহে শোভে অঙ্গদ কঙ্কণ।
আভরণ নানাজাতি শোভা করে কত ভাতি
গতি যেন খঞ্জনগঞ্জন।
মণিময় শোভে তাড় আর নানা অলঙ্কার
রম্ভা ও উর্ব্বশী রূপ জিনি।
চামর জিনিয়া কেশ সিংহ জিনি মধ্যদেশ
তাহে শোভে কনককিঙ্কিণী॥
হৃদয়ে কাঁচুলি শোভে* চলিতে কিঙ্কিনী বাজে
পরিধান পট্ট সাড়ীখানি।
কপালে সিন্দুর ফোঁটা যেন তড়িতের ছটা
শোভা করে যেন দিনমণি॥
জিনি রামরম্ভা ঊরু শোভা করে দুই উরু
পদযুগে শোভে বঙ্করাজে।
পাঁয়জর শোভিছে পায় কনক ঘুঙ্গুর তায়
গমনেতে রুণু রুণু বাজে॥"

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

* 'শোভে' স্থলে 'রাজে' লিখিলে মিল নির্দ্দোষ হইত।

ভারত-রমণী।

—:*:—

দিঙ্মণ্ডলে শশীলেখা সমা অজ্ঞান-তমঃ খণ্ডনী—
মন্ত্রজননী ব্রহ্মবাদিনী ঋগ্মণ্ডলমণ্ডনী।
ইন্দ্রে তুষিয়া ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বাঁধিয়াছ তুমি পুষ্করে
জ্ঞাননেত্রের মোচনের লাগি সাধিয়াছ দেবি দুশ্চরে।
অমৃত ভূমারে যাচিয়াছ তুমি পদে ঠেলি ইহ-ক্ষুদ্রেরে
শাশ্বত-রূপ প্রকাশ মেগেছ বরণ করেছ রুদ্রেরে।
দানবীরে শুধু জঠরে ধর নি বিতরেছ জ্ঞানসম্পদে
ব্রহ্ম বিচারে দিগ্বিজয়ীরে জিনেছ রাজার সংসদে।
জয় গো জননী ভারত-রমণী মুক্ত নিখিল বন্ধনা
গহনমগ্ন ভগ্নদেউলে আজো গাহি তব বন্দনা।

ভৃঙ্গার চৌর দণ্ড ধরালে আপনার প্রিয় সন্তানে,
শতেক যোজন করেছ ভ্রমণ ব্রহ্মজ্ঞানের সন্ধানে।
দেশের শ্রেষ্ঠ তর্ক বিচারে বিচারিকা হলে গৌরবে,
নাস্তিকগণ চরণে জুটিল চিত্ত-সরোজ-সৌরভে।
তব পদ-তট ধৌত করিয়া মহাকাব্যের অম্ভোধি
শুনায় কীর্ত্তি কীর্ত্তন তব নিখিল বিশ্বে সম্বোধি,
স্বামীর সেবায়ে বনে বনে ঘুর' আধ বসনের সঙ্গিনী।
লালসা মোহের লোহ লেলিহানা তুমি পুন রণরঙ্গিণী।
জয় গো জননী ভারত-রমণী মুক্ত নিখিল বন্ধনা
গহনমগ্ন ভগ্নদেউলে আজো গাহি তব বন্দনা।

রূপ রাজপদ মানসম্পদ তেয়াগিয়া, রাজনন্দিনী
তপঃ সংযম শৌর্য্য পরম চরণে হয়েছ বন্দিনী।
শীর্ষে ধরেছ কুটীরাঙ্গনে ধূলিমাখা দীন মঙ্গলে,
অন্ধ হৃদয় বন্ধুর লাগি বেঁধেছ নয়ন অঞ্চলে।
একাধারে সখী, গৃহিণী, সচিব, শিষ্যা ও দেবীবন্দিতা
পতিরো পূজ্যা, তোমার পূজায় সর্ব্বদেবতা নন্দিতা

গৃহে গৃহে তুমি মোক্ষফলদা নারী—শরীরিণী জাহ্নবী।
সতীধর্ম্মের অরাতির বুকে হান' ভীমশূল, ভৈরবী।
জয় গো জননী—ভারত-রমণী মুক্তনিখিল বন্ধনা
গহনমগ্ন ভগ্নদেউলে আজো গাহি তব বন্দনা

পতিসহ তোমা চিতায় বহিয়া ধন্য দেবতা বহ্নি যে
তোমার শুদ্ধি পরখ করিতে আরো বিশুদ্ধ হ'ন নিজে।
নিখিল জগৎ শীর্ষে ধরেছে তোমার গণিত-জল্পনা
কল্প-লতিকা মানস-দেবতা জাগাও কবির কল্পনা।
জিনেছ শমনে মকরকেতনে জয়-গৌরব মণ্ডিতা
প্রকৃতি পালনে শাসনে ব্যসনে রাজ-রণনীতি পণ্ডিতা।
ভবন-কমলা নবীন-কোমলা পু।-বিমলা অন্নদা
ভুবনপালিনী ধৈর্য্যশালিনী বসুধার মত রত্নধা।
জয় গো জননী ভারত-রমণী মুক্তনিখিল বন্ধনা
গহনমগ্ন ভগ্নদেউলে আজো গাহি তব বন্দনা।

শ্রীকালিদাস রায়।

বিদেশী গল্প সল্প।

'পাঁচটো রূপেয়া"

(ইংরাজী গল্পের অনুসরণে)

আজ আমি যাহা বলিতে যাইতেছি তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য—একটা কথাও কাল্পনিক বা মিথ্যা নহে।

বরাত লইয়াই জগতে যাহা কিছু সব; আমার শ্রমের ফলে আজ হাজার হাজার টাকা উপার্জ্জন করিতেছে, কিন্তু হায় রে বরাত! হাবাতের কপালে অন্ন নাই!

তখন আমি বহুদিন হাঁসপাতালে পড়িয়া রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া সবে বাহির হইয়াছি; শরীর দুর্ব্বল। ডাক্তার বাবু বলিয়াছিলেন—"ছিদাম, তোর বুকের ব্যামো হয়েছে বেশী খাটিস-খুটিস নি।" শরীরেও শক্তি নাই, ডাক্তারেরও নিষেধ, কিন্তু তথাপি পোড়া পেটের জন্য নিশ্চিন্ত থাকিবারও উপায় নাই।

সম্মুখেই একটা বড় বাড়ী। লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম বাড়াটায় একটা সাহেব ভাড়া লইয়া বাস করে। মনে করিলাম, একবার সাহেবের কাছে যাই, যদি কোনরূপ কাজ-কর্ম্ম পাওয়া যায়! কুগ্রহ! তাহা না হইলে এমন চিন্তাটা মনেই বা আসিবে কেন?

আমি অগ্রসর হইলাম। বাড়ির চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত; সম্মুখে ফটক। ঠিক ফটকের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়াছি, এরূপ সময়ে কে আমার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিল। ত্বরিতে ফিরিয়া চাহিলাম, একজন সুবেশ-ধারী ভদ্রলোক আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার কোঁকড়া চুলের সিঁথির বাহার, সাহেবী ধরণের চক্‌চকে আলপাকার কোর্ট এবং বার্ণিস করা বিলাতী জুতা দেখিয়া আমি হতভম্ব হইয়া গেলাম। তাঁহার গায়ের খোসবায়ে আমার চেতনা হইল;—পুরুষ মানুষের খোসবায় মাখাটা আমি দু চক্ষে দেখিতে পারিতাম না।

তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কি, কাজের সন্ধানে এসেছে বুঝি? একটা কিছু না হ'লে আর কিছুতেই চ'লছে না, নয়?"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম,—"লোকের মনে কথা জান্‌লেন কেমন ক'রে?"

হাসিয়া লোকটী বলিলেন,—"মাঝে মাঝে জান্‌তে হয় বই কি! তুমি কাজের সন্ধানে সাহেবের কাছে যাবে মনে কচ্ছিলে, কেমন কিনা?"

"আজ্ঞে হাঁ, কিন্তু তাতে কিছু অপরাধ করিনি বোধ হয়?"

"না, না, অপরাধ আবার কি? যিনি এ বাড়ীতে থাকেন তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব আছে। সাহেবের বড় দয়ার শরীর, গরীব এসে দাঁড়ালে দু'চার টাকা দেনই। তাই আমি একটু সাবধান হ'য়েছি। এদেশে ভিখিরীর ত শেষ নেই, টাকার লোভ পেলে বন্ধুটীকে তারা ফতুর ক'রে দেবে সেই জন্যেই, আমার নজরে পড়্‌লে দোর গোড়া থেকেই তাদের ভাগিয়ে দি। কি বল, ঠিক্ করি না?"

"আজ্ঞে আমার মতে এটা ভারি অন্যায় আপনার। বরং এ কাজে সাহেবকে আপনার উৎসাহ দেওয়াই উচিত। গরীব লোককে দান করার চেয়ে কি আর দুনিয়ায় পুণ্যের কাজ আছে মশায়! আপনি যে কথা বল্লেন, তারপর আর আপনার কাছে আমার দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়।"—বলিয়া আমি ফটক ঠেলিয়া বাটীর সীমানায় প্রবেশ করিলাম। লোকটাও আমার সঙ্গ লইল।

লোকটা আসিতে আসিতে বলিতেছিল,—"আমিও তোমার সঙ্গে যাই, বন্ধুকে সাবধান ক'রে দিতে হবে, বেশী কিছু যাতে না নিয়ে যেতে পার।"

আমি তাহাকে গ্রাহ্য মাত্র না করিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম। তাহার তখন মনে হইতেছিল লোকটা যাহা বলিল বাটীর মালিক যদি সত্যই সেইরূপ দয়ালু হন, তাহা হইলে একটা যাহা হউক করুণ দুঃখের কাহিনী বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে কিছু টাকা হাতড়াইয়া লইতে পারিব।

সদরদ্বারে পৌঁছিয়া আমি কড়া ধরিয়া নাড়িলাম। কয়েক মুহূর্ত্ত কেহ দ্বার খুলিল না। এই অবসরে আমি একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলাম; দেখিলাম সম্মুখের খোলা জমিতে লতা দিয়া একটা কুঞ্জ করা আছে এবং তাহারই অনতিদূরে একটা বৃহৎ বৃক্ষ; অপরদিকে নাতিক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান। এইগুলি চকিতের ন্যায় দেখিয়া লইয়াছি মাত্র, এরূপ সময়ে সদরদ্বার খুলিয়া একটা মুসলমান স্ত্রীলোক মুখ বাড়াইল। আমায় দেখিয়া তাহার

বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আমার সঙ্গী ভদ্রলোকটী বলিল,—"এ লোকটা এখানে ভিক্ষে ক'রতে এসেছে; তোমার মনিবকে আমি খুব চিনি, তাই আগে থেকে সাবধান ক'রে দিতে এসেছি। সাহেব কোথায়? ঘরে আছেন কি?"

মেয়েটা বলিল,—"আজ্ঞে না, তিনি বাগানে।"

ঠিক এই সময় সেই লতাকুঞ্জের অভ্যন্তর হইতে একটী সদাহাস্যময় যুবক সাহেব বাহিরে আসিলেন।

সাহেব আমার সঙ্গী ভদ্রলোকটার দিকে রোষকষায়িত দৃষ্টিতে চাহিলেন; মনে হইল যেন একবার ভ্রুকুটিও করিলেন; কিন্তু না, নিশ্চয় সেটা আমার বুঝিবার ভুল।

সাহেব লোকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হ্যালো বোস, বেপাড় কি আছে? এটী আবাড় কে?"

ভদ্রলোক বলিল,—"আর একজন ভিখিরী মিঃ গ্রিস! তোমার দানের সৎপাত্র—কিছু ভোগা দিতে এসেছে!"

"আ—আ—পুয়োর ফেলো! বড়ই গরীব আছে! বহুৎ কষ্ট আছে মনে করি!"—তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিল,—"বাপু, টুমি পাঁচ্‌টো রুপেয়া রোজগার ক'রতে রাজী আছে?"

আমি বিস্মিত হইলাম; ভদ্রলোকটী আমায় রোজকার করিবার কথা ত' কিছুই বলে নাই! পরিশ্রম করিয়া রোজকার করিতে হইবে?—কি বিপদ! কিন্তু কি করি, না বলিবারও উপায় নাই। কাজেই বলিলাম, ডাক্তার আমায় অধিক পরিশ্রম করিতে নিষেধ করিয়াছেন, কাজটা যদি শ্রমসাধ্য না হয় তবে আমার আপত্তি নাই।

সাহেব হাসিয়া বলিলেন,—"কুছু ডর করিও না, এ কামে একটুও পরিশ্রম আছে না।"

ভদ্রলোকটী বলিল,—"এ কিন্তু তোমার ভারি অন্যায় মিঃ গ্রিস,—এরকম ক'রে আস্কারা দেওয়া লোককে!"—বলিয়া সে সাহেবের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া গেল।

সাহেব বলিলেন,—"লোকটা চলিয়া গিয়াছে, ভালই হইয়াছে, বড়ই নির্দ্দয় ও আছে। আখুন শুন, টোমায় এই খোলা জমিনে ঘুরিয়া বেড়াই হইবে—এই মাট্র! আমি একটা চিত্রকর আছে, টোমার ছবিটা আমি আঁকিয়া লবে, বুঝেছে? তুমি মনে কর যেন টোমার বাড়ীতে আছে, এমনি ধারা ক'রে ঘুরে বেড়াও,—আচ্ছা?"

এই বলিয়া তিনি পুনরায় লতাকুঞ্জে প্রবেশ করিলেন আমি দেখিলাম কাজটা একটু বিচিত্র রকম হইলেও মোটেই শ্রমসাধ্য নহে;—কাজেই আমি সাহেবের ইচ্ছামত লতাকুঞ্জের নিকট পদচারণা করিতে লাগিলাম; মধ্যে মধ্যে সন্দিগ্ধ মনে লতাকুঞ্জের দিকে চাহিতেছিলাম। বাহির হইতে আমি সাহেবকে দেখিতে পাইতেছিলাম না, মাত্র একটা অস্পষ্ট, অদ্ভুত রকমের শব্দ শুনিতে পাইতেছিলাম;—সেটা যে কিসের শব্দ তাহা আমি কোন মতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। অকস্মাৎ বাড়ীটার পশ্চাৎ একটা কুকুর চীৎকার করিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে সাহেব লতাকুঞ্জে হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

তিনি সভয়ে বলিয়া উঠিলেন,—"কি সর্ব্বনাশ! লোকটা কুকুরটাকে ছেড়ে দিয়েছে যে দেখেছে!—এ সেই ভদ্দর লোকের কাজ আছে।"

আমি একটা কথাও কহিবার অবসর পাইলাম না, দেখিলাম একটা সুবৃহৎ বুল্‌ডগ্‌ নাচিতে নাচিতে আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে এবং তাহার পিছনে পিছনে ভদ্রলোকটী আসিতেছে। প্রাণ ভয়ে আমি গাছের দিকে

ছুটিলাম ; গাছটার চারি হস্ত উপরে একটা মোটা ডাল ছিল, আমি সবেমাত্র সেই ডালটী ধরিয়াছি এরূপ সময়ে কুকুর আসিয়া লম্ফ দিয়া আমার জামাটা কামড়াইয়া ধরিল। দুইজনে আমরা ঝুলিতে লাগিলাম,—উঃ সে কি শ্রমসাধ্য কার্য্য! হতভাগা কুকুরটা যেন বিশ মণ পাথর! উভয়ে আমরা দুলিতে লাগিলাম;—আমার ইচ্ছা গাছে উঠিয়া এই হতচ্ছাড়া কুকুরটার হস্ত হইতে বাঁচিয়া যাই--আর কুকুরটার ইচ্ছা, গাছ হইতে আমায় মাটিতে টানিয়া ফেলে। নিকটে সেই ভদ্রলোকটা দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল—আর জন-প্রাণীও নাই। সাহেব আবার লতাকুঞ্জে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আমি পরিত্রাহী ডাক ছাড়িতে লাগিলাম ;—কিন্তু কে শুনিবে। প্রায় পাঁচ মিনিট এইরূপ শূন্যে যুদ্ধ চলিবার পর সাহেব বাহিরে আসিলেন।

ভদ্রলোকটার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"মিঃ বোস্ এ টোমার বড়ই অন্যায় আছে—কুকুরটাকে ছাড়িয়াছ কেন?"

আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম,—"কুকুর বাঁধ সাহেব, কুকুর বাঁধ। এখুনি ও আমায় কামড়ে ছিঁড়ে ফেলবে।"

সাহেব ডাকিলেন,—"টমি, ইধার আও!"

কুকুরটা আমায় ছাড়িয়া দিয়া সাহেবের নিকট গেল। তিনি তাহার কলারের মধ্যে রুমাল দিয়া শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিলেন,—"এইবার টুমি নাবিটে পারে—আর কুচ্ছু ডর না আছে।"

টমির দিকে নজর রাখিয়া আমি গাছ হইতে নামিয়া আসিলাম ; সাহেবকে বলিলাম,—"তোমার কুকুর আমার একমাত্র জামাটী ছিঁড়ে দিয়েছে, এর খেঁসারৎ দিতে হবে।"

ভদ্রলোকটা বিদ্রূপের স্বরে বলিল,—"হাঁ! ভারি ত' জামা তার আবার খেঁসারৎ!"

কুকুরটা তখন ছাড়া পাইবার জন্য ক্রমাগত ছট্ ফট্ করিতেছিল। হাসিয়া সাহেব বলিলেন,—"দশটা টাকা হইলেই টোমার সকল দাবী পূর্ণ হইবে ট'?"

আমি বলিলাম,—"দশ টাকা! মোটে দশ টাকা! সে ত' অতি সস্তা; নালিশ ক'রলে জামার দরুণ পাঁচ টাকা আর আমায় এ ভাবে কষ্ট দেওয়ার খেঁসারৎ দেড়শ' টাকা ত' নিশ্চয়ই পাব।"

ভদ্রলোকটা বলিল,—"অত টাকা আমরা দিচ্ছি না, তা তুমি যাই কর।"

আমি যে তাহার নিকট অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া আসি নাই এই কথাটাই তাহাকে বুঝাইতে যাইতেছিলাম এরূপ সময়ে সাহেব বলিয়া উঠিলেন, "সাবধান! টমি আবার ছাড়া পাইয়াছে!"—সঙ্গে সঙ্গে তিনি লতাকুঞ্জে প্রবেশ করিলেন এবং সেই দুর্ব্বোধ্য অদ্ভুত শব্দ আবার আরম্ভ হইল।

আমার তখনও কোন কিছুই শুনিবার অবসর ছিলনা: টমি আমার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, সে আমার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেই আমি ভূমে পড়িয়া গেলাম; তাহার পর পরস্পরকে ধরিয়া আমরা গড়াইতে লাগিলাম। একটা বিষয়ে আমি বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না,—কুকুরটার কামড়াইবার ইচ্ছা মোটেই ছিল না, ইহার অর্থ কি? দেহের নানা স্থান ধরিয়া খেলার ভাবে সে নাড়া চাড়া করিতেছিল, একস্থানেও তাহার সুতীক্ষ্ণ দন্ত বিদ্ধ করে নাই;—কিন্তু কেন? বহুক্ষণ এই ভাবে দ্বন্দ্ব চলিবার পর সাহেব লতাকুঞ্জ হইতে বাহিরে আসিয়া কুকুরটাকে ডাকিয়া লইলেন।

আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"দেখ বাপু, টোমার কাজ শেষ হইয়াছে—এই লও টোমার পাঁচটো রূপেয়া,—ইহা টুমি সট্যাই উপার্জ্জন করিয়াছে।"

আমি বলিলাম,—"এত গেল! আমার পরিশ্রমের পাঁচটাকা. আর খেঁসারতের টাকা কই? অন্ততঃ আর পাঁচ টাকাও যদি না দাও তা হ'লে এখুনি আমি পুলিসে যাব!"

ভদ্রলোক বলিল,—"অনায়াসে, তাতে তোমাকেই চোর ব'লে হাজতে দেবে। যা খুসী কর তোমার, আমরা আর একটা পয়সাও দেব না।"

সাহেব তাহার কথা অনুমোদন করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

ব্যাপার দেখিয়া আমি ফটকের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম;—আমাদের মত দরিদ্রের সুবিচার পাইবার কোন আশাই নাই, হা রে অর্থ!

দেড়মাস পরে আমি আসল ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলাম। সেদিন গ্রামের জমিদার বাড়ী বায়স্কোপ হইতেছিল,—আমাদের গ্রামের অন্যান্য লোকের সহিত আমিও সেখানে গিয়াছিলাম। বায়স্কোপে সেই কুকুরের সহিত স্বস্বর জীবন্ত ছবি দেখিলাম। সাহেবটা বলিল, "ফরাসী দেশ হইতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই ছবিখানি আনা হইয়াছে।" ক্রোধে ক্ষোভে আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম.—"মিথ্যে কথা, এক বেটা জোচ্চোর সাহেব আমায় মোটে পাঁচটাকা দিয়ে এই ছবি, তুলেছে।"—কেহ আমার কথা বিশ্বাস করিল না; উপরন্তু চীৎকার করার অপরাধে জমিদারের দ্বারবান আমায় অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বাটীর বাহির করিয়া দিল। হা রে অদৃষ্ট!

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভবঘুরে।

—:*:—

অন্ধকার রাত্রি, রাস্তায় জলকাদা, চলিতে বারবার পা পিছলাইতে ছিল। অতি কষ্টে এক দোর হইতে অন্য দোরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, আস্তে আস্তে কড়া নাড়িয়া আবেদন জানাইতেছিলাম "বড় বিপন্ন রাত্রিটুকুর জন্য একটু আশ্রয় চাই।" উত্তরে কেহ বা আমায় প্রতিবেশীর দোর দেখাইয়া দিতেছিল, কেহ বা গোল্লায় যাইতে বলিতেছিল,—এক দোরে কুকুর লেলাইয়া দিবে ভয় দেখাইল, অপর দোরে গম্ভীর ভাবে একখানি মোটা লাঠি দেখাইল। হু হু শব্দে এক একটা দমকা বাতাস আসিতেছিল. গাছের ডালে ডালে ইহার করুণ শব্দ ফুটিয়া উঠিতেছিল। চালার ভিজে খড়গুলি উড়াইয়া দিতেছিল। রজনীর এই নিস্তব্ধ বিমর্ষতার মধ্যে ইহার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ও করুণ সঙ্গীত কেমন শুনাইতেছিল। প্রকৃতির এ অবস্থায় ঘরের ভিতরে যাহারা বাস করিতেছিল তাহাদেরও মনের অবস্থা বোধ হয় তেমন স্ফুর্ত্তির ছিল না. তাই আমায় ভিতরে যায়গা দেয় নাই। হতাশ হইয়া আমি গ্রাম ছাড়িয়া মাঠের পথ ধরিলাম—ভাবিলাম সেথায় হয়ত একটা খড়ের গাদা গোছ কিছু পাইব, যার নীচে রাত্রির মত আশ্রয় করিয়া লইতে পারিব, কিন্তু এ অন্ধকারে একমাত্র দৈব সহায়, তা না হইলে আশ্রয় খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

দেখিলাম আমার সম্মুখেই কি যেন প্রকাণ্ড একটা দাঁড়াইয়া আছে, সেটা যেন অন্ধকারের চেয়েও আরো অন্ধকার, অগ্রসর হইয়া দেখিলাম একটা শস্যের গোলা। তোমরা জান, গোলার মেজে আর মাটির মাঝে

এমন ফাঁকা জায়গা থাকে যেখানে একজন মানুষ অনায়াসে থাকিতে পারে, হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়া একটু যেন সমান জায়গা পাইলাম। এমন সময় অন্ধকারে হঠাৎ গম্ভীর আওয়াজে কে বলিল "একটু বাঁয়ে সরে

স্বরে ভয়ের কিছু ছিল না, কিন্তু অপ্রত্যাশিত নিশ্চয়ই ! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম " কে ওখানে ?"

"মানুষ ...সঙ্গে লাঠি ত আছে......?"

"নিশ্চয়ই !"

"ম্যাচ নেই ?"

"হাঁ, ম্যাচও আছে।"

"ভাল কথা।"

আমার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। আমার কিছু খাবার ও একটু তামাক দরকার, শুধু ম্যাচ নয়।

অদৃশ্য স্বর জিজ্ঞাসা করিল —"বোধহয় গ্রামে ওরা তোমায় কেউ একটু রাত্রিবাসের স্থান দেয় নি ?"

আমি বলিলাম—"না।"

"আমায়ও দেয় নি। বাঁদরেরা একটু স্থান দিলে না ? ভাল দিনে থাক্‌তে দেয়—আর এমন বাদলার দিনে খ্যাক্ খ্যাক্ করে তেড়ে আসে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?"

"নিকোলিভে,—আর তুমি ?"

"বেশ তা হ'লে এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে, যাক্ এখন ম্যাচটা জেলে একটু চুরুট টানা যাক্।"

ম্যাচ ঠাণ্ডায় ভিজিয়া উঠিয়াছিল। জ্বলিতে আর চায় না, অবশেষে অনেক চেষ্টায় জ্বলিয়া উঠিল, সেই সঙ্গে ভিতর হইতে কৃষ্ণ শ্মশ্রু সমন্বিত একখানা বিবর্ণ মুখ ফুটিয়া উঠিল।

চোখ দু'টি তার আমার পানে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল, গোঁফ্ জোড়ার নীচে সাদা দাঁতের পাটি এককালে বিকাশ করিয়া লোকটা বলিল—"সিগারেট খেলে হয়।" ম্যাচ নিভিয়া গিয়াছিল, আর একটা জ্বালিলাম, আলোতে পুনরায় আমরা দু'জনা দু'জনার পানে চাহিলাম,—আমার সঙ্গী কহিল "এই যে চুরুট।" আর একটা চুরুট তাহার দাঁতের মধ্যে ছিল, টানের সঙ্গে সঙ্গে জ্বলিয়া তাহার মুখখানিকে বেশ একটু লালআভায় রঞ্জিত করিল। লোকটার চোখের চারিদিকে ও কপালে অনেকগুলি টানা টানা দাগ।

আমি বলিলাম—"তীর্থ যাত্রী না ?"

"হাঁ, পায় হেঁটেই চলেছি—তুমি ?"

"আমিও তাই।"

সে একটু নড়িল। ধাতুদ্রব্যের থন্‌থনে আওয়াজ শোনা গেল—বোধ হইল যেন, তীর্থযাত্রীর অপরিহার্য্য চা-পাত্র ও কেট্‌লির শব্দ! কিন্তু তাহার স্বরে ও ব্যবহারে ভক্তির বিন্দুমাত্র ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষা বুঝিলাম না—তাহার কথায় তীর্থযাত্রীর বিনম্র ব্যবহার বা ধর্ম্মগ্রন্থের শ্লোক পাঠ একটিও ছিল না; যে সকল ব্যবসায়ী পাণ্ডা প্রায়ই তীর্থযাত্রী পাড়াগেঁয়ে ধর্ম্মভীরু লোকদের সুচতুর বচনে ঠকাইয়া খায়, তাহার ব্যবহারে সেরূপ কোন ভাবও ছিল না। বিশেষতঃ নিকোলিভে যাইতেছে। সেথায় মন্দির বা পুরাতন ধর্ম্মস্মৃতিও কিছু নাই ! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কোথা থেকে আসছ তুমি ?"

"এ্যাষ্ট্রাখাঁ থেকে।"

এ্যাষ্ট্রাখাঁও কোন তীর্থস্থান। আমি তাহাকে বলিলাম "তোমার কথায় বোঝা যাচ্ছে তুমি শুধু দেশ দেখে বেড়াচ্ছ—তীর্থকরা কিছু নয়।"

"না,—তবে আমি তীর্থস্থানেও গিয়ে থাকি,—তীর্থে যাব না কেন ? বেশ খুসীর সঙ্গেই যাই ওরা বেশ খাওয়ায় সেথায়, বিশেষতঃ সাধুবাবাদের সঙ্গে যদি একবার আলাপ-পরিচয় করে নেওয়া যায়—আমায় সকলেই একটু খাতির করে, কারণ আমি গেলে তাদের একঘেঁয়ে জীবন একটু সরস হয়ে ওঠে—কি বল। একটা কাঠি জ্বালাও —আর একটু চরুট ধরান যাক্—ধূমপান কর্‌বার সময়টা বেশ একটু গরম বোধ হয়।"

সত্যি বড় ঠাণ্ডা ; শুধু বাতাসের জন্যও নয়, আমাদের ভিজে কাপড়ের জন্যই ঠাণ্ডা বেশী বোধ হইতেছিল।

"কিছু খেতে তোমার আপত্তি নেই বোধ হয় ? আমার সঙ্গে পাঁওরুটি, আলু, আর দুটো দাঁড়কাক-রোষ্টও আছে···কিছু খাও না ?"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "দাঁড়কাক ?"

"কখনো খাও নি বুঝি,—মন্দনয়······"

সে আমায় একখানি বড় রুটির টুকরা দিল, দাঁড়কাক-রোষ্ট লইবার আর আগ্রহ হইলনা।

"দেখ না খেয়ে,—শরৎকালে এগুলো বড়ই মধুর লাগে, বিশেষতঃ নিজের হাতে ধরা দাঁড়কাক, এক টুকরা রুটি আর চর্ব্বি ভিক্ষা করার চেয়ে এ ঢের ভাল, ও-ভিক্ষে নিতে গা জ্বলে যায় যেন!" তার একথা যুক্তিসঙ্গত, বেশ মনেও লাগে। দাঁড়কাক যে খাবার জিনিস হ'তে পারে, এ আমি নূতন জানিলাম, কিন্তু আশ্চর্য্য কিছু বোধ হইল না। আমি জানিতাম শীতের সময় ওডেসাতে ছোটলোকেরা ইঁদুর, শামুক প্রভৃতি খায়। অসম্ভব এতে কিছু নাই। এমন কি প্যারীর অধিবাসীরা পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ অবস্থায় যা-তা খেয়ে জীবন ধারণ করে। কেমন করিয়া সে এই সব সংগ্রহ করে জানিবার ইচ্ছা হইল—তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম —"তারপর কেমন করে দাঁড়-কাক ধরা হয় ?" "মুখ দিয়া নিশ্চয়ই নয়—লাঠি দিয়ে কি ঢিল ছুঁড়েও ওদের মারা যায়, কিন্তু সব চেয়ে মাছ দিয়ে ধরাই ভাল। একটা বর্শীর সঙ্গে এক টুকরো মাছ কি মাংস গেঁথে রেখে দিলে বাছারা একেবারে গিলে ফেলে, বাস্ তারপর ধরে আগুনের উপর সাঁৎলিয়ে নাও।"

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম—"আঃ—এখন একটু আগুনের ধারে বস্‌তে পার্‌লে কি-যে আরাম হোত।"

শীত ক্রমেই যেন বেশী বোধ করিতে লাগিলাম, বোধ হইতেছিল যেন বাতাস পর্য্যন্ত জমিয়া যাইতেছে, গোলার দেয়ালের সঙ্গে বাতাসের শব্দ কেমন করুণভাবে বাজিতেছিল ! মাঝে মাঝে ইহার সঙ্গে কুকুরের চীৎকার, মোরগের ডাক ও গ্রাম্য-গীর্জ্জার বিষাদপূর্ণ ঘণ্টাধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল। গোলার ছাদ হইতে বৃষ্টির ফোঁটা ভিজে মাটির উপর টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতেছিল। আমার রাত্রিবাসের সঙ্গী বলিল—"এঁ ভাবে চুপ্ করে তো বসে থাকা যায় না।"

আমি বলিলাম "বড় ঠাণ্ডা, কথা বল্‌তে,—" "জিভটা পকেটের ভেতর রেখে দাও না, গরম হয়ে উঠবে 'খন।"

"উপদেশের জন্য ধন্যবাদ।"

"আমরা দু' জনাই এক সঙ্গে যাব, কি বল ?

"তা হ'লে পরিচয়টা বেশ তো হয়ে যাক্ কেমন—আমার নাম প্যাভেল ইস্‌নাটেভ প্রোমটভ।" আমিও সেই ভাবে নিজের পরিচয় দিলাম।

"বেশ এখন জানা শোনা তো একরকম হয়ে গেল, এখন জিজ্ঞাস কচ্ছি, এ পথের পথিক হ'লে কেমন করে—নেশা-কেসার দুর্ব্বলতায় এঁ্যা ?"

"জীবনের উপর বিরক্ত হয়েই এ অবস্থা।"

"হাঁ সেও হ'তে পারে, তবে নাম-ধাম পুলিসের খাতায় টোকা নেই তো ?

আমার নাম সেরূপ কোন খাতায় ছিল না, তাহাকে তাই বলিলাম।

"আমার নামও নেই।"

"কিন্তু কিছু করেছ না কি ?"

"সবই ভগবানের হাত।"

"তোমায় দেখে বোধ হচ্ছে বেশ আমুদে লোক।" "থাক্ ও-কথায় আর দরকার কি ? তোমার মত অবস্থায় পড়ে এমন কথা অনেকের মুখ থেকেই বের হোত না।"

তাহার কথার আন্তরিকতায় আমার সন্দেহ হইল।

"আজকের অবস্থা দেখ্‌ছ, ভিজে, ঠাণ্ডা, কিন্তু কাল সকালে দেখ্‌বে সব বদলে গেছে, সূর্য্য উঠলেই আমরা এ থেকে বের হয়ে চা,—খাবার খেয়ে বেশ গরম হয়ে নেব—সে মন্দ হবে এঁ্যা ?"

"খাসা হবে।"

"এই দেখতে পাচ্ছ এখন মন্দেরও ভাল দিক্ আছে একটা।"

"আর সব ভাল-জিনিসেরও মন্দ দিক্ আছে।" প্রোমটভ ধর্ম্মযাজকের স্বরে কহিল "ভগবান তোমার ইচ্ছা!"

বাঃ—এমন মজাদার সঙ্গী, তার মুখখানা দেখিতে পাইতেছিলাম না বলিয়া আমার আক্ষেপ হইল। তার কথার টানে আর বলিবার ভঙ্গী থেকে বোধ হইল, মুখেও বেশ একটু ভঙ্গী খেলিয়া যাইতেছে। দু'জনেই দু'জনার সঙ্গে আরো বেশী পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা গোপন করিয়া আমরা অনেকক্ষণ বসিয়া নানা বাজে কথা কহিলাম।

আমরা আলাপ করিতেছিলাম, বৃষ্টি থামিয়া গেল, অন্ধকার ধীরে ধীরে অপসারিত হইতেছিল, পূর্ব্বদিকে উষার রক্তরাগ দেখা দিল, ভোরের বাতাসে কেমন একটা নূতনত্ব,—এ বাতাস, গরম শুকনো পোষাক গায় দিয়েই উপভোগ করিতে আরাম! প্রোমটভ কহিল "দেখি একটু আগুনের জোগাড় হয় কি না, এই একটু শুকনো খড় কড় পেলেও হোত।" হামাগুড়ি দিয়ে মেজে যতদূর খোঁজা যায় দু'জনে খুঁজিলাম, কিছু মিলিল না। তখন আমরা মৎলব করিলাম, গোলার নীচেরই একখানা কাঠ খুলে নেব। কাঠগুলোও সব খন্‌খনা শুকনো। টানিয়া বাহির করিয়া ভাঙ্গিয়া আগুন জ্বালাইবার উপযোগী করিলাম। তারপর প্রোমটভ প্রস্তাব করিল গোলার নীচে ছিদ্র করিয়া যদি কিছু বের করে নেওয়া যায় তবে আর খাবার ভাবনা করিতে হয় না। আমি আপত্তি করিয়া বলিলাম, "আমাদের দরকার একসের আধসের, তার জন্য ৫০।৬০ মণ জিনিস নষ্ট করবার আবশ্যক কি ?

প্রোমটভ বলিল—"তাতে তোমার কি ?"

"শুনেছি অন্যের সম্পত্তি হলেও একটু সম্মান করে চল্‌তে হয়।"

"হাঁ গো ছোকরা—সে কর্‌বে শুধু তোমার নিজের সম্পত্তির বেলায়, সে শুধু আবশ্যক এই জন্য, যে, সম্পত্তিটা তোমার নিজের, অপরের নয়।"

আমি নীরব রহিলাম, মনে ভাবিলাম ইহার সম্পত্তি-জ্ঞান অতি উদার—এবং এর সঙ্গে পরিচয়ের আনন্দ নিরানন্দেও পরিণত হতে পারে, কোন ফ্যাঁশাদে পড়ে না যাই !

সূর্য্য উঠিল, মেঘগুলো সব ধীরে পরিশ্রান্ত ভাবে উত্তরে ভাসিয়া যাইতেছিল। প্রোমটভ ও আমি গোলার নীচ থেকে বের হয়ে গ্রাম লক্ষ্য করিয়া চলিলাম। সঙ্গী বলিল—"ওখানে একটা নদী আছে।" তাহার পানে তাকাইয়া বুঝিলাম, তাহার বয়স প্রায় চল্লিশে। আর জীবন তার কাছে হাসি-খেলার কিছু নয়। তার গাঢ়-নীল বসা চোখ দুটী স্থির শান্ত;—একটু তুলে বক্র দৃষ্টিতে চাহিলেই কেমন ক্রূর নিষ্ঠুর দৃষ্টি বাহির হয়। তার পিঠে চামড়ার একটা মস্ত ঝুলি। তার দিকে একটু স্থির দৃষ্টিতে চাহিলেই বোঝা যায় এ যেন এই ভবঘুরে জীবন যাপনের জন্যই বদ্ধপরিকর হইয়া বাহির হইয়াছে।

সে বলিল—"তা হ'লে এক সঙ্গেই যাব আমরা কেমন—এই নদী পার হ'য়ে সোজা কিছু দূর গেলেই গ্রাম পাওয়া যাবে। ও-গ্রামবাসীরা খুব ভাল, বেশ খাওয়াবে।—শুধু রকম-বুঝে ওদের একটু আমোদ দিতে হবে কিন্তু সাবধান, কোন ধর্ম্মগ্রন্থ থেকে ওদের কিছু বলা হবে না—ওসব ওদের কণ্ঠস্থ।"

নদীর ধারে গোটাকত পাথরের টুক্‌রো নিয়ে একটা উনুন বানিয়ে, আগুন জ্বালিবার বন্দোবস্ত করিলাম। দূর গ্রামে ঘরগুলি সূর্য্যের আলো পাইয়া ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। প্রোমটভও কহিল—"আমি স্নান করে নি, এমন দুর্দ্দশায় রাত্রি কাটানোর পর স্নান করে নেওয়া অত্যন্ত দরকার,—তোমায়ও আমি সেরে নিতে বল্‌ছি। আমরা স্নান করে নিতে-নিতে চা ততক্ষণ হয়ে যাবে, তুমি জান নিশ্চয়ই যে আমাদের সব সময়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকৃতে হয়।"

এই বলিয়া সে কাপড় খুলিতে লাগিল, তার শরীরখানা বেশ ভদ্রলোকের মত,—গড়ন সুন্দর, মাংসপেশী পুষ্ট। সে কাপড়গুলো খুলিয়া ফেলিল, সেগুলো বড় ময়লা। স্নান করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে লাফাইয়া তীরে উঠিলাম, শীতে নীল হইয়া গিয়াছিলাম, উঠিয়াই তাড়াতড়ি কাপড় পরিলাম, কাপড়গুলো আগুনের তাপে অনেকটা শুকনো হইয়া উঠিয়াছিল, আমরা চা পান করিতে বসিলাম।

প্রোমটভের সঙ্গে একটা চা পেয়ালা ছিল,—সে তাহাতে চা ঢালিয়া আমাকেই প্রথমে দিল, কিন্তু আমার দুর্ম্মতি, আমি উদারতা দেখাইয়া বলিলাম—"ধন্যবাদ, তুমি আগে খেয়ে নেও আমি খাব 'খন।"

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, একথা বলার পর প্রোমটভ ভদ্রতার খাতিরে নিশ্চই চা-পাত্র আমাকেই দিবে,—কিন্তু সে শুধু "বেশ তাই হোক্"—বলিয়া চা পেয়ালা মুখে তুলিল। প্রোমটভের কাল চোখ দুটো আমার পানে চাহিয়া ভীষণ ভাবে হাসিতেছিল,—আমি যেন তা লক্ষ্য করি নাই এই ভাব দেখাইবার জন্য শূন্য মাঠের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম।

সে চা খাইতে খাইতে স্থির চিত্তে রুটি চিবাইতেছিল। আমি শীতে কাঁপিতেছিলাম—কেট্‌লীর টগবগা জল-

সময় নিজের সুবিধা কিছু হয় না। তাই না? বুঝে রাখ, সময়ে আরও শিখবে—যা তোমার নিজের সুবিধা সে জন্য পরের মুখ চাও কেন? এই আমার মত। ওরা বলে যে সব মানুষ তাই—কিন্তু একথা হাতে-কাজে দেখাতে কেউ কখন দেখেছ কি?"

"এই কি সবি তোমারি মত নাকি?"

"বল দেখি যা আমি মনে ভাবি—তা মুখে বলবো না কেন?"

"তুমিত জান মানুষ যে অবস্থায়ই থাকুনা কেন সেই অবস্থায়ই একটু অহঙ্কার করতে চেষ্টা করে।"

"আমি বুঝতে পাচ্ছি না কিসে আমি আমার উপর তোমার এতটা অবিশ্বাস জন্মালেম, বোধ হচ্ছে তোমায় আমি একটু রুটি আর চা দিয়েছি তাই এ বিশ্বাস! কিন্তু এ আমি কোন প্রকার ভ্রাতৃভাব থেকে দি নাই, কৌতূহলের বশেই দিয়েছি—আমি মানুষকে সে যে-অবস্থায় আছে সেই ভাবে বিচার করি না,—আমি জান্তে চাই কি ভাবে কেমন করে সে এ-অবস্থায় এসেছে।"

"আমিও ঠিক্ সেই কথাই জান্তে চাই, আমায় বল তুমি কে?"

সে আমার পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিল—একটু পরে বলিল—"মানুষ কখনো ঠিক্ ভাবে জানে না যে সে কি—সে নিজেকে সব সময়ই জিজ্ঞাসা কচ্ছে যে সে কি?"

"বেশ সেই ভাবেই বল"

"ভাল ··আমার মনে হয় আমি একটা এমন মানুষ,--যার জীবনে কোন স্থান নাই। জীবন সঙ্কীর্ণ, আমি মস্ত। এই বিশ্বে এমন অনেক লোক আছে যারা নিশ্চয়ই ভ্রামামান ইহুদিদের বংশধর হবে, তাদের বিশেষত্ব এই যে তারা নিজেদের জন্য এতটুকু স্থান এই বিশ্বে করে নিয়ে টিঁকে থাকতে পারে না,—তাদের মনে নূতন একটা কিছুর জন্য অদম্য আকাঙ্ক্ষা থাকে! নারী, অর্থ, সম্মান কিছুতেই এদের তৃপ্তি নাই—কি যে একটা আকুল পিয়াসা এদের হৃদয়ে! জীবনে এমন লোক কখনও ভালবাসার পাত্র হয় না—তারা অসহ্য হয়েই থাকে। দেখ এই সাধারণ লোক যত দেখছ, সব রাজার ছাপওয়ালা দু'আনি—সব সমান--শুধু সনের বেশী কম, কেউবা নূতন কেউবা পুরাণ; যাহোক আমি ওদের দলে নই, একটু তফাৎ আছে ওদের সঙ্গে—"

সে এমন হাসির ভঙ্গী করিয়া ঐ কথাগুলি বলিল যেন সে নিজেকেই নিজে বিশ্বাস করিল না। কিন্তু সে আমার মনে এমন একটা ব্যগ্র কৌতূহল জাগাইয়া দিল যে তাহার বিশেষ পরিচয় না জানা পর্যান্ত তাহার সঙ্গ ছাড়িতে ইচ্ছা হইল না। এ বোঝাই যাইতেছে যে সে একজন তথাকথিত 'বুদ্ধিমান লোক।' ভবঘুরে দলের ভিতর এমন অনেক লোক আছে কিন্তু তারা সকলেই মরা,—সব আত্মসম্মান হারাইয়া ফেলিয়াছে—নিজের সম্বন্ধে কোন ধারণা হারাইয়া—নিত্যই আবর্জ্জনা জঞ্জালের ভেতর এক এক ধাবা নামিতেছে—পরিশেষে তাহারা এতেই মিশিয়া পড়ে এবং অন্তর্দ্ধান করে।

কিন্তু প্রোমটভের মধ্যে যেন একটু সার আছে, আর সে সাধারণের মত অসহনীয় জীবন বলিয়া কাঁদুনি গাহিতেছিল না। সে বলিল "চল এইবার ওঠা যাক্।" "হাঁ নিশ্চয়ই।"

চা ও সূর্য্যালোকে গরম হইয়া আমরা উঠিয়া পড়িলাম, আমি প্রোমটভকে জিজ্ঞসা করিলাম "তারপর খাবার জোটাবার জন্য কি করা হয়—কোন কাজ কর নাকি?"

"কাজ—না আমি ওর বড় ভক্ত নই।"

"তা হলে—কেমন করে জোটে?"

"সে দেখো এইবার" এই বলিয়া নীরব হইল। কয় পা আগাইয়াই সে শিষ দিয়া একটা স্ফূর্তির গান আওড়াইতে লাগিল,— সে নিশ্চিত-লক্ষ্য মানুষের মত চলিতেছিল। আমি তাহার পানে চাহিলাম, কার সঙ্গে সঙ্গী হয়ে চলেছি, সেটা জানিবার ইচ্ছা আমার ক্রমেই বেশী হইতে লাগিল, চারিদেকে আমাদের নিস্তব্ধ পরিত্যক্ত প্রান্তর—উপরে আমাদের বন্ধুর মত সূর্য্য—দক্ষিণে বাতাস—নিঃশ্বাস আগ্রহে টানিতেছিলাম।

আমরা যখন গ্রামের পাশে আসলাম, একটা ছোট কুকুর আমাদের কাছে আসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া চীৎকার করিতে লাগিল—আমরা যতবার তাকে তাড়াকরি, ততবার নীরিহ বেচারীর মত ভীত আওয়াজ ছাড়িয়া দূরে সরিয়া দাঁড়ায়, আবার তেড়ে এসে চীৎকার আরম্ভ করে—তার চীৎকার শুনিয়া আরো কয়েকটা কুকুর ছুটে এল, কিন্তু দু' একবার ডাকিয়াই তারা চলিয়াগেল, তাদের এই নির্লিপ্ত ভাব দেখিয়া কুকুরটা আরো মরিয়া হইয়া চীৎকার সুরু করিল। কুকুরটার দিকে মাথা নড়িয়া প্রোমটভ বলিল—

"দেখ্ছ কুকুরটার কি নীচ প্রকৃতি? এত ভরা এর সব মিছে,—ও জানে এখানে ওর চীৎকরের কোন আবশ্যক নেই, কামড়াবে ত না—কিন্তু ও ভীরু—শুধু ওর প্রভুকে দেখানো হচ্ছে এটা। ছোট্ট পশুটা ঠিক্ মানুষের মত,—আর শিক্ষাও পেয়েছে সেই রকম—মানুষই তাদের পশুগুলোকে মাটি করে,—দেখ্বে খুব শীগ্‌গীর পশুগুলোও তোমার আমার মতহ বাঁকা-মন ঘৃণিত হবে।"

আমি বলিলাম "ঠিক্ বলেছ," "থাক্—এইবার আসল জিনিসের সন্ধান চাই।" তার উন্নত দেহ এইবার নুয়ে পড়্ল, উজ্জল চোক দুটো একটা পর্দ্দায় যেন বুদ্ধিহীন বলিয়ে দিলে, দেখে যেন শুধু একা ছেঁড়া নেকড়ার স্তূপ বলে বোধ হ'তে লাগ্‌ল।

"এইবার কিছু চাইতে হবে।" সে এই কথায় যেন তার পরিবর্ত্তনের কারণটা আমায় বুঝাইয়া দিল। সে ঘরগুলির দোর বেশ মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগল। একদোরে একজন নারী একটি ছেলেকে আদর করিতেছিল, প্রোমটভ তাকে সেলাম করিয়া খুব নরম ভাবে কহিল—"তীর্থ যাত্রীকে কিছু খাবার দাও বোন্"—

"মাপ কর বাবা!" নারী, সন্দেহ-দৃষ্টিতে আমাদের পানে চাহিয়া জবাব দিল।

প্রোমটভ রাগিয়া অভিশাপের স্বরে কহিল "বুকের দুধ তোমার শুকিয়ে যাক্, কুকুর-ছানা সব!"—

নারীকে যেন বোল্‌তায় কামড়াইয়াছে,—এই ভাবে চীৎকার করিয়া আমাদের পানে আগাইয়া কহিল "এ্যা"—যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা—এঁ্যা—!'

প্রোমটভ একটুও না নড়িয়া তার পানে তেমনি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল·········নারী বিবর্ণ হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আপন মনে বকিয়া ঘরের ভেতর চলিয়া গেল। আমি প্রোমটভকে কহিলাম "চল এইবার।"

"না—খাবার না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।" এইবার সে নিশ্চয় খাবার নিয়ে আসবে।" তার কথাই ঠিক্, নারী, হাতে একখানা রুটি আর কিছু চর্ব্বি নিয়ে অনুতাপ স্বরে কহিল "রেগো না, এই নাও।"

"ভগবান তোমায় রক্ষা করুন, কুদৃষ্টি যেন না লাগে।"

এই বলিয়া প্রোমটভ বিদায় গ্রহণ করিল, আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম, একটু দূরে আসিয়া আমি বলিলাম—"কি অদ্ভুত তোমার ভিক্ষা চাওয়া!" "এই সব চেয়ে ভাল পথ, দাবী করে যখন নিতে পারি তখন ছোট হ'তে যাব কেন? সব সময় ভেবেছি যে, ভিক্ষার চেয়ে নিতে-পারাই ভাল। কিন্তু যদি নিতে না পার—তবে অবশ্যই ভিক্ষা করতে হবে—"

"এ রকম ঘটে নাই কথনো যে, খাবার বদলে—"

"অর্দ্ধচন্দ্র—এঁ্যা ? না সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ থেক' ভায়া—আমার কাছে এক টুক্‌রো কাগজ আছে, ইন্দ্রজালের মত তার ক্ষমতা, একবার এই সব গ্রামবাসীদের দেখালেই তারা আমায় ঠাকুর ভেবে পূজো করবে··· দেখ্‌বে তুমি ? একখানা কুঞ্চিত ময়লা কাগজ আমি হাতে নিয়া দেখিলাম যে, একখানা ছাড়পত্র। পিটার ইগনাটেড প্রোমটভকে এ্যাষ্ট্রামাঁ হইতে নিকোলিভ পর্য্যন্ত ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। কাগজখানায় এ্যাষ্ট্রামাঁর পুলিস-আপিসের শিল-মোহর রহিয়াছে।

আমি তাহাকে দলীলখানা ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম—"বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, এ দেখ্‌ছি এ্যাষ্ট্রামাঁর ছাড় পত্র, অথচ আস্‌ছ তুমি পিটার্সবার্গ থেকে" সে হাসিল, তার সমস্ত মুখে চোখে এই ভাব ফুটিয়া উঠিল যেন সে আমার চেয়ে কত বুদ্ধিমান।

"এই বুঝ্‌ছ না, অতি সরল ব্যাপার, ওরা আমায় পিটার্সবার্গ থেকে পাঠিয়ে দিলে, পাঠাবার সময় কি কারণে যেন জিজ্ঞাসা করলে আমার বাড়ী কোথায় ? আমিও পছন্দ করে বল্‌লাম 'কুরাস্ক'। সেথায় পৌঁছে যুদ্ধের পুলিস-আপিসে গেলাম, দেখ্‌লাম—সেথাকার কর্ত্তারা নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত,—আমায় দেখে মনে করলেন 'এ কি আপদ !' আমিও তাদের আর ব্যতিব্যস্ত না করে বল্‌লাম "আমি আমার বাসস্থান ঠিক করেই রেখেছি, তবে আপনারা যদি আবার নূতন করে ঠিক করিয়ে দেন।" তারা আমার কথা শুনে আমায় কিছু দিয়ে বিদেয় করলেন—তারা এমনভাবে দিয়ে থাকেন, কারণ সামান্য কিছু দিয়ে একটা মহাহাঙ্গামা থেকে বাঁচা যায়। সত্যি কথা—এর উপরেও তারা আমায় এই কাগজখানা দিলে, দেখ্‌তে ছাড়পত্রের মত মোটেই দেখায় না। ছাড়পত্র নয় অথচ সরকারী ছাপ-মোহর করা চিঠি দেখলেই সব স্তব্ধ হয়ে যায়। আমি এইখানা নিয়ে গ্রামের মোড়লকে দেখাই, তার বুদ্ধি শীতের মতই জমাট, এক বিন্দুও এর বুঝ্‌তে পারে না সে। এই শিলমোহর দেখেই সে ঘাবরে যায়, আমি তাকে বলি "এই কাগজের খাতিরে তুমি আমায় রাত্রিবাস দিতে বাধ্য, সে তখনি তা দেয়—তুমি আমায় খাবার দিতে বাধ্য, সে আমায় খাওয়ায়। এ সব না করেও পারে না সে, কারণ কাগজের উপর লেখা আছে সেন্ট পিটার্সবার্গের শাসন পরিষদ হইতে—এই শাসন পরিষদের মানে কি ! এর অনেক অর্থই হতে পারে ; হতে পারে উপকূল সমূহের ব্যবসায়ের অবস্থা দেখ্‌তে—বা জালটাল হচ্ছে কি না খোঁজ নিতে, কিম্বা গোপনে মদ বা কোন নিষিদ্ধ দ্রব্যের ব্যবহার না চলে। ওরা এও ভেবে নেয় যেন ছদ্মবেশে আমি কোন রাজকর্ম্মচারী, ছলনা করতে এসেছি—সব বোকার দল কি বুঝ্‌বে ওরা !"

আমি বলিলাম "হাঁ বেশী তো আর বুঝ্‌তে পারে না ওরা।" প্রোমটভও বেশ একটু উৎসাহিত হইয়া কহিল—"কিন্তু বড় ভাল লোক ওরা ;—এই রকমই হওয়া উচিত ওদের,—ওরা আমাদের কাছে এই বাতাসের মতই প্রয়োজনীয়। গেঁয়ে লোক গুলো কি, আমাদের পোষণের জন্যই তো ওরা—এই আমায় দিয়ে দেখ—এই লোকগুলো না থাকলে কি আমার সংসারে থাকা ঘটতো ? মানুষের বেঁচে থাকার জন্য চারিটি জিনিষ চাই—সূর্য্য জল, বায়ু আর এই পাড়াগেঁয়ে ভূত !

"আর জমি চাই না।"

"ঐ গেঁয়েদের যা আছে—তোমার আমারও তাই, শুধু দাবী করে নিতে হবে।" এই ফুর্ত্তিবাজ ভবঘুরে খুব কথা কহিতেছিল। অনেকক্ষণ। গ্রাম ছাড়িয়া আসিয়াছি।—আমাদের সম্মুখে আর একখানা গ্রাম দেখা যাইতেছিল। প্রোমটভ আপনমনে বলিয়া যাইতেছিল।—আমি তাহার কথা শুনিতেছিলাম আর ভাবিতেছিলাম—

এই লোকগুলার সম্পদের কথা ও তাহাদের ঠকানোর এই 'অবতারদের' কথা সরল পল্লীবাসী কবে তাহাদের উপর এই অন্যায়ের প্রতিকার করিতে সমর্থ হবে?—এইখানে আমার পাশে নিজের শোষণ ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ মত্কুরে একটি সজাগ ভবঘুরে চলিতেছে।—পরের রক্ত শোষণ করিয়াই ইহার জীবন!

হঠাৎ মনে হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আচ্ছা—ঐ কাগজ সম্বন্ধে যদি কারো মনে সন্দেহ হয় তুমি বুঝাও কেমন করে?" প্রোমটভ হাসিয়া বলিল—"সে রকমও হয়েছে—তবে দু'বার অমন জায়গায় না গেলেই হোল।"

তার সরলতায় আমি আনন্দিত হইলাম—সরলতা জিনিসটা সব সময়ই ভাল,—বড়ই দুঃখের বিষয় ভদ্র সন্ন্যাসী লোকদের ভিতর এটা কচিৎ দেখা যায়। আমি মনোযোগের সহিত আমার সঙ্গীর কথা শুনিতে লাগিলাম। প্রোমটভ কহিল—"এই দেখ আমাদের সম্মুখে একখানা গ্রাম। তুমি ইচ্ছা করলে এইখানে আমার কাগজের টুকরোর ক্ষমতা দেখাতে পার।—কি বল?"

আমি সে দেখিতে গররাজী হওয়া কি উপায়ে সে কাগজখানি পাইয়াছে তাহাই শুনিতে চাহিলাম. সে হাত নাড়িয়া কহিল—"ওঃ—সে মস্ত গল্প, সে বল্‌বো এখন একদিন, এস এখন জিরিয়ে কিছু খেয়ে নি; সঙ্গে ঢের খাবার আছে—এখন আর এজন্য গ্রামবাসীদের বিরক্ত করা উচিত নয়।"

রাস্তা ছাড়িয়া একটু দূরে বসিয়া আমরা খাইতে আরম্ভ করিলাম।—তারপর সূর্য্যের গরমে ও বাতাসের কোমল নিঃশ্বাসে আমরা সেইখানে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। যখন জাগিলাম বেলা প্রায় অবসান—দূরে সন্ধ্যার কুয়াসা আসর জমাইবার আয়োজন করিতেছিল। প্রোমটভ কহিল "দেখ ভাগ্যের লেখা—আজ ঐ ছোট গ্রামখানিতেই বাস করতে হবে।"

আমি বলিলাম—"চল এই বেলা আলো থাক্‌তে থাক্‌তেই যাওয়া যাক্‌।"

"ভয় পেয়ো না, আজ ছাদের নীচে রাত্রি বাস করতে পারবো।"

তার কথাই ঠিক, প্রথম দোরে ঘা দিয়া রাত্রি বাসের স্থান চাহিতেই পাইলাম।

বাড়ীর কর্ত্তা বেশ হাসি খুসি লোক, এই মাত্র মাঠ থেকে বাড়ী আসিয়াছে। তার পত্নী রাত্রির আহারের জোগাড় করিতেছিল। কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ঘরের কোণ হইতে আমাদের পানে তাকাইতেছিল। ঘরের গিন্নি অন্য ঘর হইতে খাবার আনিয়া সাজাইতেছিল, কর্ত্তা পেট হাতাইতেছিলেন, আমাদের দিকে তার দৃষ্টি—প্রশ্ন হইল "কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

"আমরা 'কিভে' যাচ্ছি।" কর্ত্তা গম্ভীর ভাবে কহিল "সেথায় কি আছে দেখ্‌বার?"

"এই তীর্থ স্থান।"

কৃষক প্রোমটভের পানে চাহিয়া মুখ ভরা থুথু ফেলিয়া কহিল "কোত্থেকে আসা হচ্ছে?"

"আমি পিটার্সবার্গ, ইনি মস্কো থেকে।" কৃষক ভ্রূ দুটি টানিয়া তুলিয়া কহিল—এ্যাঁ পিটার্সবার্গ কেমন—লোকের কাছে শুনি সাগরের উপর সহর, প্রায়ই জলে ডোবা থাকে।"—দোর খুলিয়া গেল, দুইজন লোক ঘরে প্রবেশ করিল, একজন বলিল—একটা কথা আছে মাইকেল তোমার সঙ্গে।"

"কি কথা?"—

"এরা কে?" গৃহস্থ আমাদের দেখাইয়া বলিল "এরা?"

গৃহস্থ চিন্তিত মনে নীরব রহিল। শুধু মাথা একটু নাড়িল। একজন আমাদের পানে চাহিয়া বলিল "বোধ হয় তোমরা তীর্থযাত্রী?"

প্রোমটভ কহিল "হাঁ।"

বহুক্ষণ সকলে নীরব রহিল, তিনজনেই আমাদের পানে সন্দেহ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। একজন বলিল "তোমরা নিশ্চয়ই বেশ জ্ঞানী গুণী?"

প্রোমটভ সংক্ষেপে কহিল "হাঁ কিছু আছেই তো।" "তা হ'লে বোধ হয় বল্‌তে পারেন যে, কোমরে যদি এমন ধারা ব্যথা হয় যে রাত্রিতে ঘুমান অসম্ভব হয়ে ওঠে তা হ'লে কি দরকার?"

"হুঁ, জানি।"

"কি?"

প্রোমটভ অনেক্ষণ রুটি চিবাইতে লাগিল, তারপর তোয়ালেতে হাত মুছিয়া ছাদের দিকে চাহিয়া গম্ভীর ভাবে কহিল—"কিছু গাঁজার তেল ওই জায়গায় দিয়ে তোমার স্ত্রীকে আচ্ছা করে মালিশ করে দিতে বল্‌বে।"

"কি হবে তা হ'লে?"

প্রোমটভ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "কিছু না।"

"কিছু না কি রকম।"

"কিছু হবে কেন?"

"মেখে দেখ্‌ব—ধন্যবাদ।"

প্রোমটভ বিজ্ঞের মত কহিল "হাঁ সেরে ওঠে।" সব নিস্তব্ধ, শুধু খাইবার চপ্‌চপ্‌ শব্দ ও ছেলেদের ফিস ফিস্ শোনা যাইতেছিল! গৃহস্থ বলিল—"শোন মস্কোর কথা তো সকলেই জান—আমি সাইবেরিয়ার কথা বল্‌ছি, সেথায় বাস করা যায় কি না—আমাদের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বল্‌ছিলেন, কিন্তু সে বোধ হয় মিথ্যা কথা! অসম্ভব—।"

প্রোমটভ গম্ভীর হইয়া কহিল—"অসম্ভব—কিন্তু সাইবেরিয়ায় যাওয়া কেন এইখানেই তো যথেষ্ট জমি রয়েছে—যত চাও।"

একজন কৃষক বিষাদ স্বরে কহিল, "মরে গেছে যারা তাদের কোন আবশ্যক না হ'তে পারে, কিন্তু বেঁচে আছে যারা তাদের পক্ষে জানার দরকার।"

প্রোমটভ উৎসাহভরে কহিল 'পিটার্সবার্গে এ ঠিক হয়ে গেছে। ভদ্রলোকদের আর কৃষকদের যে সব জমি আছে সব সরকার খাস করে নেবে।"

গৃহস্থ তিন জনেই প্রোমটভের পানে "হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, প্রোমটভ জিজ্ঞাসা করিল 'হাঁ খাস করে নিচ্ছেন সরকার কেন তা জান?" নীরবতা ভীষণ ভাব ধারণ করিল। গৃহস্থ তিনজন ব্যাকুলতায় মরিয়া যাইতেছিল, আমি তাহাদের দিকে চাহিয়া প্রোমটভের এই নিষ্ঠুর পরিহাস দেখিয়া রাগে জ্বলিতেছিলাম। কিন্তু ইহাদের কাছে প্রোমটভের বুজরুকি ভাঙ্গিলে আমাদেরই মরণ, তাই চুপ করিয়া রহিলাম।

একজন গৃহস্থ অতি বিনীত ভাবে কহিল "কেন মশায় বলুন না?"

"এই জন্য থাস কচ্ছেন—এই সব জমী আরো ভাল ভাবে কৃষকদের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন, এই ঠিক্ হয়ে গেছে,—জমীর প্রকৃত অধিকারী হচ্ছে কৃষকরা, তাই এই ঠিক হয়েছে সাইবেরিয়ায় যেতে হবে না কিন্তু সকলকে অপেক্ষা কর্‌তে হবে যে পর্যান্ত না জমি ভাগ করে দেওয়া হয়।"

একজন গৃহস্থের হাতের রুটি বিস্ময়ে মাটিতে পড়িয়া গেল, সকলেই প্রোমটভের পানে চাহিয়া তাহার অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিতেছিল।

আমি বলিলাম "এ শুধু গুজব কথা—"

প্রোমটভ আমার পানে চাহিয়া রুক্ষ স্বরে কহিল "কি গুজব! কি মিথ্যা কি বল্‌ছ তুমি!"

এই মাত্র আমি ছাড়া তার মিথ্যা বক্তৃতা সকলের কানেই সুধা বর্ষণ করিতেছিল। আমরা ঘুমাইয়া পড়িলাম, সূর্য্যোদয়ের সময় প্রোমটভ আমায় জাগাইল।

"ওঠ চল এইবার।"

তার পাশে গৃহস্থ দাঁড়াইয়া, প্রোমটভের ঝুলি পূর্ণ—ভারি স্ফূর্ত্তি, গান গাহিয়া শিশ দিয়া আমার পানে মাঝে মাঝে বিদ্রূপ কটাক্ষ বর্ষণ করিতে করিতে চলিতে লাগিল।

সে হঠাৎ বলিল "ভাল আমায় মেরে ফেলনা কেন?"

আমি শুষ্ক কণ্ঠে কহিলাম "জান কি এর পরিণাম কি হবে?"

"নিশ্চয়ই আমি বুঝেছি তুমি আমার ওপর কি চাপাতে যাচ্ছিলে, বাপু হে চুপ করে চেপে যেতে হয়, ও সব কৃষকদের মাথায় খেয়াল ঢুকাতে দোষ কি! এতে তারা রাতারাতি বেশী জ্ঞানী হয়ে যাবে না। দেখ দেখি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে কিনা। ঝুলি দেখ কেমন ভরে এনেছি। "কিন্তু ওরা এগিয়ে হট্টগোল বাধাতে পারে।"

"থাক্ সে হবে না, আর পরের ভাবনায় আমার কি দরকার, নিজের ভাবনা ভগবানের ইচ্ছায় ভেবে যেতে পারলেই হয়, এ ন্যায়ের অনুমোদিত নয় কিন্তু আমার ন্যায়, অন্যায় দিয়ে কি দরকার?"

"চল—" আমি ভাবিলাম তার কথাই ঠিক্।

ধর তারা আমার দোষেই ভোগ কর্‌লে—বোধ হয় তাতেও আকাশ নীল থাক্‌বে, সাগর জল লোনাই থাক্‌বে।"

"কিন্তু তোমার দুঃখ হয় না?"

"একটুও না......আমি ভবঘুরে যা বাতাসে আমার পা'র নীচে এনে ফেলে তাতেই আমায় ব্যথা দেয়।"

সে গম্ভীর কঠোর—চোখে তার তীব্র জ্বালা! "আমি সব সময় এমন করে থাকি, কখনো এর চেয়ে মন্দ করি,—একবার একটা লোককে পেটের ব্যথার জন্য সব সময় জলপাইয়ের তেল খেতে বলেছিলাম, এই বিশ্বের তীর্থযাত্রী হয়ে কখনো হাসির ধরণের মন্দ আম করিনি, কত সব কুবিশ্বাস ইহাদের মাথায় ঢুকিয়াছে, আমি কখনো ওসব খুঁটিনাটি ধরি না, কেন ধর্‌বো? নীতিধর্ম্মের কয়েকটা বচনের জন্য? আমার নিজের ভেতর কি কোন পদার্থ নেই? এই আমার ধর্ম্মের স্বীকার উক্তি"—

"কিন্তু এ নিয়ে গর্ব্ব কর্‌বার কি আছে?"

"কি অন্যায় নাকি? কিন্তু দেখ ওসব ভদ্রতা আমি বড় পছন্দ করি না, আমার মতে কেউ যদি আমায় লাঠি মার্‌তে ওঠে আমিও লাঠি নিয়েই তাকে উত্তর দেই,—আশীর্ব্বাদ করি না।"

তার কথা শুনিতে শুনিতে আমি মনে করিলাম এই পাপীর সংসর্গ ত্যাগ করাই ভাল, কিন্তু তাহার ইতিহাস আমার জানিবার ইচ্ছা হইতেছিল, তার সঙ্গে আমি আরো তিনদিন কাটাইলাম, এই তিনদিনে যা সন্দেহ করিয়াছিলাম তার চেয়ে ঢের বেশী জানিতে পারিলাম।

জীবনটা তাহার ভবঘুরের নিখুঁৎ চিত্র! হায়, দেশ এরূপে কত লোক,—কত প্রতিভা নষ্ট হইতেছে—সরল বিশ্বাসী ব্যক্তিদের ঠকাইয়া বাহাদুরী লইতেছ—কিন্তু ভাবিয়া দেখিতেছে না তাহাদের জীবন কতদূর হেয়—সাধু সাজিয়াও,—সাধুর কলঙ্ক তাহারা,—চির হাভাতে ভবঘুরে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রেমের যজ্ঞ।

—— ঃ*ঃ ——

প্রেমের যজ্ঞে হবির অনল জ্বলিয়া উঠেছে আজ।
এস যাজ্ঞিক পুণ্য-পূজারী মিছে বহে যায় কাজ!
হবির অনলে আহুতি কে দিবি আয় ত্বরা চলে আয়
সাধনার পিঠে ঘৃত-দীপ ধূপ বৃথা কেন দহে যায়?
ইন্ধন তা'র জোগাবে সাধক বন্ধন-হারা প্রাণ,
দৃপ্ত-যজ্ঞ-অনলে হইবে মূর্চ্ছার অবসান,
দর্ভ তাহার হইবে সর্ব্ব-মঙ্গলময়ী আশা,
শান্তির সনে মিলনানন্দ উজ্জ্বল ভালবাসা।
হৃদয়রক্ত নিঙাড়ি গব্য ঢালিবে বহ্নি মাঝে,
সঙ্কোচ-ভরা সকল কর্ম্ম ম্লান হয়ে যাবে লাজে;
কম-কণ্ঠের সঙ্গীত সুধা ইঙ্গিতে প্রাণ হরি'
ওঙ্কার সনে ঝঙ্কার দিবে সকল বিশ্ব ভরি।
প্রেমের মন্ত্র হৃদয় তন্ত্র নাচাইবে তালে তালে,
চিত্ত-মোহিনী নিত্য-রাগিণী থামিবে না কোনকালে।
শান্তির জল বিরহ-অশ্রু সকল শ্রান্তি-হরা,
প্রেমের যজ্ঞ-তিলক ললাটে সর্ব্ব-বিজয় করা।
এতেই ঋদ্ধি, এই সমৃদ্ধি এতেই সিদ্ধি হ'বে,
পুণ্য বিশ্ব-প্রেমের সাধক অমর হইবে ভবে।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

---

(৩)

আধুনিক সাহিত্যেও,—তা' সে যতই অপরাধী হোক্ না কেন,—সুখদুঃখ যে আছে এবং প্রচুর-পরিমাণেই আছে, এ-সত্য কেউ সজ্ঞানে অস্বীকার করতে পারেন না; কিন্তু এ সুখদুঃখ নাকি ধনীর, দরিদ্রের নয়!—এ আপত্তির উত্তরে আমি বলি যে এ সুখদুঃখও 'মনের', আর আমরা সকলেই মনে মনে জানি যে 'মন' নামক পদার্থটী ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকলেরই আছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে এই অত্যন্ত সহজ কথাটা শক্ত শক্ত বিদ্যেবুদ্ধি নিয়েও আমরা বুঝে উঠ্‌তে পারিনে যে ধনীর সুখদুঃখ ও দরিদ্রের সুখদুঃখ অধিকরণের দিকে একই বস্তু—তফাৎ যা কিছু, সে শুধু উপাদানে। সুখদুঃখের ক্রিয়াটা যেখানে অনুভূত হয় সেই মনটীকেই আমি "অধিকরণ" বল্‌ছি, আর "উপাদান" হচ্ছে সেই সমস্ত বহুবিচিত্র পারিপার্শ্বিক বিষয় যা' থেকে মনের মধ্যে সুখদুঃখ প্রবেশ করে। "বিষয়-বিষে মত্ত বাঙ্গালী তোমরা, বৈষ্ণব-কবিতার কি বুঝ্‌বে"—এ-ধমক বিজ্ঞেরা তো প্রায়ই আমাদের দিয়ে থাকেন; কিন্তু বিষয়ের ছাপ্ না দেখ্‌লে নিজের মনটাকেও যে-সকল বিজ্ঞ চিন্‌তে পারেন না তাঁদের মত্ততা ঘুচ্‌বে কিসে? সকলেই জানেন যে বহির্জগত থেকে মনকে সুখদুঃখের উপাদান পাঁচভূতেই চিরকাল যুগিয়ে আস্‌ছে; এ-অবস্থায়, অধিকরণের চেয়ে উপাদানের ওপরই আমাদের আস্থা যদি বেশী হয় তবে বুঝ্‌তেই হবে যে আমাদের মনের ঘাড়ে ভূত চেপে বসে আছে, আর 'মনের' চেয়ে ও-বস্তুর 'ঘাড়ের ভূতকেই' আমরা অধিক মান্য করে' থাকি।

এই জাতীয় ভূতুড়ে সমালোচকদের প্রতি এ-পরামর্শ দিলে আশা করি অন্যায় হবে না যে তাঁরা ধনীই হোন্ আর দরিদ্রই হোন্, যদি অতঃপর মনের হাতে হাল ছেড়ে না দেন তা' হ'লে মনোজগতের চিত্র দেখ্‌লেই চিন্‌তে পার্‌বেন—তা' সে চিত্রের শিল্পী ধনী বা দরিদ্র যাই হোন্ না কেন। দরিদ্রের দুঃখে কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়া কিছুমাত্র শক্ত কাজ নয়, এবং ও-সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের আঁতের টান মায়ের চেয়েও কিঞ্চিৎ বেশী হ'লে অনায়াসেই তা' করে' উঠ্‌তে পারি,—কিন্তু দরিদ্রের মধ্যে প্রাণৈশ্বর্য্য-সঞ্চার কর্‌বার উপায় একটু অন্যরকম; অন্ততঃ, সেক্ষেত্রে এমনভাবে অগ্রসর হওয়া দরকার হয় যাতে সুখদুঃখকে তারা নিজেই হেসে উড়িয়ে দিতে পারে। বলাবাহুল্য, 'প্রাণ' বল্‌তে যা বোঝায় তা' দরিদ্র নয়—প্রমাণ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ঐশ্বর্য্যকে সে প্রকাশ কর্‌ছে।

অশিক্ষিত ও নিরক্ষরের ভগ্নকুটীর ও জীবনচরিত রচনা করাও প্রাণের অবশ্য-কর্ত্তব্যের মধ্যে পড়ে না; কেন না, যে প্রাণ দুনিয়ার যাবতীয় শিক্ষাকেই উৎসারিত করে আস্‌ছে তা' অশিক্ষিত নয়—আর বিশ্বের যাবতীয় বর্ণমালা ও বর্ণলীলা যার প্রকাশ তা' নিরক্ষরও নয়। এ-সত্যের প্রমাণ হাতে হাতেই পাওয়া যায়—রবীন্দ্র-সাহিত্য-সাগরের কূল কিনারা না পেলেও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বড় বড় তত্ত্ব কথায় বোঝাই-করা জাহাজগুলিও জিনিষের ওপর ভেসে বেড়ান যে বন্ধ কর্‌তে পারে না, এর চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আর কি হ'তে পারে!

(৪)

'জন সাধারণের 'প্রাণ' 'দেশের প্রাণ' প্রভৃতি বাক্যগুলো যখন কথায় কথায় ব্যবহৃত হ'তে দেখি সেই সঙ্গে লোকারণ্য ও দেশের দিকে ফিরে ফিরে তাকাই তখন, সত্যি কথা বল্‌তে কি, ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারিনে। হিন্দু সাধারণের কথাই ধরা যাক্; কুলি বাগ্দী হাড়ি ডোম থেকে আরম্ভ করে' উড়িয়া মেড়ুয়া এবং সর্ব্বশেষ ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকলেই তো আমরা হিন্দু সমাজের লোক, কিন্তু "হিন্দু" এই জাতিত্ব-বাচক নামটীর কোটায় পড়লেও বিশেষ কোনো প্রাণধর্ম্মে আমাদের ঐক্য আছে কি? হিন্দু ধর্ম্মের অর্থ খুঁজ্‌তে চাইলে এই

(খ)

পূর্ব্বে বলা হয়েছে যে কালের বিরুদ্ধে জাতিত্বকে টিঁকিয়ে রাখ্‌তে হ'লে কাল-ধর্ম্মকে শোষণ করতে হয়—কিন্তু মনুষ্যত্বের মান রাখার চেয়ে মানুষের মন রাখায় যখন আমরা লাভ দেখ্‌তে পাই তখন মনোবৃত্তিকে চিত্তরঞ্জিনী করে তোলবার লোভ সামলাতে না পেরে বলি যে 'খোল নল্‌চে হুঁকো রাখার চেয়ে খাঁটীর দিকে ঝুঁকে পড়াই ভাল,' অতএব এজগতে খাঁটী-প্রাণতাটার উদ্ধারসাধন অবশ্য কর্ত্তব্য।

সম্প্রতি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে যে বর্ত্তমান বঙ্গের খাঁটী প্রাণ অতীতের মাটী আঁকড়েই পড়ে আছে—অতএব বাঙ্গালীমাত্রেরই উচিৎ কার্য্য হচ্ছে কোদাল ও খন্তা হাতে করে' পিছু হাঁট্‌তে থাকা। খন্তা-সহযোগে চণ্ডীদাসের বাস্তুভিটায় একটা বড় রকমের কুয়ো কেটে পতিত বাঙালী যদি অতীত-ভক্তির প্রমাণ প্রয়োগ করবার জন্যে সদলবলে তার মধ্যে বাসা বাঁধে, তা' হলে সে কার্য্যটা যে অতি-ভক্তি হয়েই দাঁড়াবে, এমন আশঙ্কার কারণ আছে। জীব-বিশেষের হৃৎপিণ্ড "জাম-গাছের কোঠরে" থাকাটা যে আশ্চর্য্য নয়, এমন ধারণা পঞ্চতন্ত্র কথিত মকরের মনে নিশ্চয়ই জন্মাতো না, যদি প্রেয়সীর মনস্তুষ্টির জন্যে বন্ধুর প্রাণটীকে হস্তগত করবার লোভ তার মনে না থাকৃতো। বাঙালার খাঁটী প্রাণকে প্রয়োজনের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করবার লোভ যাঁদের মধ্যে আছে—খাঁটী প্রণীদের ধাঁচায় মুগ্ধ ও তৎফলে প্রতারিত হবার সম্ভাবনা তাঁদের ভাগ্যে ঘট্‌তে বাধ্য,—কেননা, লোভের ফলে যা' পাওয়া যায় তা' যথাক্রমে 'পাপ' ও 'মৃত্যু', কিন্তু 'প্রাণ' নয়।

তবে ভরসার কথা এই যে বর্ত্তমান বাঙালীকে ভোগা দিয়ে পথ ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়া আর আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না—তা' সে "হে বাঙালী, আমি পেয়েছি—পেয়েছি" বলে' অষ্টপ্রহর চীৎকার করে' আমাদের মুখ দিয়ে রক্ত উঠে গেলেও নয়।

কিন্তু এই যে চারিদিকে আজ নানাপ্রকার ব্যাপারের অভিনয় সুরু হয়েছে ; এর কারণ মূলে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ধারণা-সম্বন্ধে বুদ্ধি-বৈষম্য ছাড়া আর কিছু নেই। কোনো কাগজের সম্পাদক কিছুকাল থেকে ক্রমাগত এই বলে' আক্ষেপ জানিয়ে আস্‌ছেন যে তাঁদের রবীন্দ্রনাথ অকস্মাৎ তাঁদের ছেড়ে গিয়েছেন।

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন—"কোন্ সূত্রে এরকম আন্দাজ করছেন?"

উত্তর—ঘরে বাইরে নামক 'মারাত্মক' কেতাবখানি পড়ে ; কেননা, ও-কেতাবে "রবীন্দ্রনাথ বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান করিতে যাইয়া ঘর নষ্ট করিতে বসিয়াছেন। দেশধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিশ্বধর্ম্মের দিকে ঝোঁক দিয়াছেন। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মহিমা প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধে এমন একটা উচ্ছৃঙ্খলতার আদর্শ আনিয়াছেন যাহাতে কোনো সমাজ, ঘরেই হোক্ বাহিরেই হোক্, টিঁকিতে পারে না।"

তবে সম্পাদক মহাশয়ের বিশ্বাস যে রবীন্দ্রনাথের মাথা আগে এরকম বিগড়ে যাইনি ; প্রমাণ—"একবার তোরা মা বলিয়া ডাক, জগতজনের শ্রবণ জুড়াক্" বলে' যখন তিনি ভাবে বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন তখন তাঁর নিজের হৃদয়ে-দেশের যে মোহন মূর্ত্তিটী ফুটিয়া উঠিয়াছিল" সে-মূর্ত্তি তিনি সম্পাদক মহাশয়ের প্রাণে চিরকালের মতন এঁকে দিয়েছেন ; সে অঙ্কন এমনি গভীর যে কোনোমতেই নাকি মুছে ফেল্‌তে পারা যাচ্ছে না—জল দিয়ে ধুয়েও নয়, ঝামা দিয়ে ঘসেও নও!

বিপদের কথা, তাতে আর সন্দেহ কি! পণ্ডিত মানুষদেরও এরকম মোহ প্রাপ্তি দেখে ক্ষুব্ধ না হয়ে থাকা যায় না,—তবে শ্রীকৃষ্ণের মোহিনীরূপ দেখে মহেশেরও যখন ও-দশা ঘটেছিল, তখন এক্ষেত্রেও অবাক হবার কারণ নেই।

"মা বলিয়া ডাকাডাকি" অবশ্যই খুব উপাদেয় কার্য্য, এবং দূরত্ব যত বেশী হয়, ডাকের শব্দটা তত উচ্চ করারও প্রয়োজন ঘটে। ডি, এল, রায়ের একটী গানকে একটু বদ্‌লে নিলে দেখা যায়—

"আমরা সব, দেশভক্ত দেশভক্ত বলে' চেঁচাই উচ্চরবে
কারণ সেটার যতই অভাব ততই সেটা বল্‌তে হবে।"—

অতএব রবীন্দ্রনাথের ঐ অতীত-'ডাকের' ঢকানিনাদে আমাদের বর্ত্তমান-মন যদি মূর্চ্ছিত হয়েই পড়ে থাকে, তবে সেটা অল্প আশঙ্কার কথা হবে না। ও গানে যা' ছিল, তা' একটী অস্পষ্ট আকুলতা ছাড়া অন্য কিছুই নয়; "মোহন মূর্ত্তি" হয়তো বা ওর আড়ালে ছিল, নইলে পণ্ডিতেরা এতটা বেসামাল হয়ে পড়্‌বেন কেন.—তবু একথা হলফ করে' বলা যায় যে ও-গান লেখবার সময় কবির মনে তাঁর দেশের কোনো স্বচ্ছ সত্যমূর্ত্তি একেবারেই ছিল না।

কিন্তু সে যাই হোক্‌, আমরা ভাবছি—নিজের জালে নিজে জড়িয়ে পড়াটাও যে দেশের ধর্ম্মানুশাসন-বিরুদ্ধ, সেই দেশের ধর্ম্মকে আপন ধর্ম্ম বল্‌তে যাঁরা গৌরব বোধ করেন, তাঁরা পর্য্যন্ত পরের হাতে পাকানো দড়ি গলায় বেঁধে শূন্যে ঝুলে পড়্‌তে লজ্জিত হন না কেন? যে জাল পশ্চাতে ফেলে রবীন্দ্রনাথ বহুকাল এগিয়ে গিয়েছেন সেই জালে আপাদ-মস্তক জড়িয়ে পড়ে' এটা কোনোমতেই পণ্ডিতেরা বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছেন না যে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের 'ছেড়ে' যাননি—'ছাড়িয়ে' গেছেন মাত্র।

রামানন্দ রায়ের সঙ্গে চৈতন্যের যে প্রশ্নোত্তর চলেছিল,—যে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসায় রামানন্দের উত্তরের পর উত্তর reject কর্‌তে কর্‌তে চৈতন্য ক্রমাগত দাবী করেছিলেন "এহ বাহ্য, আগে কহ আর"—আর, যে দাবীর মুখে সমাজ, সংসার দেশ ও ব্রহ্মাণ্ড ভাসিয়ে দিয়েও স্থিতির সন্ধান পাওয়া যায়নি—সেই দেশের ধর্ম্মকে সেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মেরই অজুহাতে আজ দেশাভিমানীরা স্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত কর্‌বার চেষ্টায় আছেন,—আশ্চর্য্য!

রবীন্দ্রনাথের ভূতপূর্ব্ব সঙ্গীত-তাজের মাঝখানে, পণ্ডিত মহাশয়দের 'জীবন্তে সমাধি' হয়ে গেলেও, সঙ্গীত-রচয়িতার যে কি জন্যে হয়নি, তার কৈফিয়ৎ 'তাজ মহল'-শীর্ষক কবিতায় সাজাহানের আত্মাকে সম্বোধন করে' কবি নিজেই দিয়েছেন—

তাজমহল বল্‌তে চাইছে—"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া!"—কিন্তু কবি বজ্রস্বরে তিরস্কার করে' বল্‌ছেন—

"মিথ্যাকথা!—কে বলে যে ভোলো নাই,
কে বলে রে খোলো নাই
স্মৃতির দুয়ার?
অতীতের চির অস্ত অন্ধকার,
আজিও হৃদয় তব রেখেছে বাঁধিয়া?
বিস্মৃতির মুক্তি-পথ দিয়া
আজিও সে হয়নি বাহির?......

বিরাট বিচ্ছিন্নতার দিকে তাকিয়ে কোনো চক্ষুষ্মান্ কি তা, পেতে পারেন? অবশ্য প্রজ্ঞাচক্ষে ঠুলি পর্‌লে আমাদের মধ্যে অনেকেই দেখ্‌তে পান যে আচারে ব্যবহারে বৈষম্য থাক্‌লে কি হয়, ভেতরে ভেতরে দিব্যজ্ঞান সকলেরই চমৎকার টন্‌টনে আছে। কানকে কতকটা লম্বা করে' দিলে এমনও নাকি শুন্‌তে পাওয়া যায় যে আমাদের সমাজের সপ্তস্বরার অন্তরালে একতারার একটা একটানা সুর ও harmony রক্ষা কর্‌ছে! কিন্তু আমি ভাব্‌ছি, ও কথা যদি খাঁটী হয় তবে এ-জাতের এমন দুরবস্থা কেন? ধর্ম্মপ্রাণতা মানুষকে আধমরা করে, না পুরোপুরী বাঁচিয়ে তোলে?

দেখ্‌তে পাই ধর্ম্ম-ভীরুর প্রশংসায় আমাদের অনেকেরই জিহ্বা জলসিক্ত হইয়া ওঠে কিন্তু একথাটা ভেবে দেখা আমরা দরকার মনে করিনে যে অপরিচিত দূরের শক্তিকেই মানুষ ভয় করে—চির পরিচিত বুকের শক্তিকে নয়। বলা বাহুল্য, ধর্ম্ম তেজে তেজস্বী হবার সুযোগ দুর্ভাগ্য ক্রমে না পেয়ে যারা ও-বস্তুর ছায়াও কখন মাড়ায়নি তারাই ধর্ম্ম ভীরু হইয়া থাকে।

'জন সাধারণের প্রাণ' বলে' কোনো প্রাণ শুধু এদেশ কেন, কেনো দেশেই নেই—যেহেতু প্রাণ জিনিষটাই একটু অসাধারণ। সাধারণ জনের মধ্যে ওবস্তুর ছিটে-ফোঁটা যা কিছু থাকে সে শুধু এই জন্যে যে অন্যথায় তাঁদের গায়ের মাংস পচে উঠ্‌বে; ও-ক্ষেত্র থেকে প্রাণ পদার্থটীর কর্জ্জ গ্রহণ চলে না; কেন না, তা' হ'লে তাঁদের দেউলে হয়ে যাবারই সম্ভাবনা বেশী। তা' ছাড়া সাধারণের কাছ থেকে যা' নেওয়া গেল তাই যদি সাধারণকে প্রত্যর্পণ করা যায়, তা' হ'লে প্রেরণাটা তাঁদের মধ্যে আস্‌বে কোথা থেকে? সুদ কিছু না দিলে তো আর তাঁদের আসল বাড়্‌বে না!—কিন্তু অত লোককে সুদ-আসলে দেনা শুধে দেওয়ার মতন "অতিরিক্ত সঞ্চয়" ব্যক্তির মধ্যে কোথা থেকে জমে? আসল কথা—

'প্রাণের দেশ বলে' একটা সুগোল দেশ নিশ্চয়ই আছে, (যদিও ভূগোলে তার সন্ধান মেলে না।)—কিন্তু 'দেশের 'প্রাণ' বলে' কোনো খণ্ড প্রাণ একেবারেই নেই। যদি থাকে, তবে সেই পরিমাণে তা' মিথ্যে, যে পরিমাণে তা' নাকি খণ্ড।

কিন্তু এ সত্যটা আমাদের সমাজ-হিতৈষীদের মনে ধরানো শক্ত—কেননা, এঁরা সকল বিষয়েই রক্ষণশীল, শুধু যেটাকে রক্ষা করলে সমস্তই রক্ষা পায় সেই প্রাণের বিষয়টী ছাড়া। এঁরা বলেন—হিন্দু ধর্ম্ম যে কালজয়ী অমরত্ব লাভ করেছে সে শুধু সমাজ হিতৈষীদের আশ্চর্য্য রক্ষণশীলতার গুণে; কিন্তু আমি যা চোখে দেখি তা, একটু অন্য রকম। আমার বিশ্বাস—কালজয়ী হ'তে গেলে সমাজকে রক্ষণশীল হ'তে হয় না, কিন্তু সমাজ-ধর্ম্মকেই ভক্ষণশীল হ'তে হয়; কাল যে সর্ব্বগ্রাসী একথা আমরা সকলেই জানি—কিন্তু একথাটা সকলে মানিনে যে, কালের ওপর জয়ী হয়ে থাক্‌তে গেলে ঐ কালধর্ম্মটীকে নিজের মধ্যে শুষে নেওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নেই। ঘেঁটু, মনসা, ইতু, সত্যপীর থেকে আরম্ভ করে' কতই না বিচিত্র ব্যাপার গ্রাস করে ফেলার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত এই সমাজ-ধর্ম্মের ইতিহাসে থেকে গিয়েছে—এই অতিভোজন ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে সে-বিচার আজ নিরর্থক, কেননা খাবার সময় ক্ষুধার তরফ থেকে সম্ভবতঃ ও-সমস্তের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যে-স্বাস্থ্য আহার্য্য গ্রহণ কর্‌তে জানে, পরিপাক কর্‌তে পারা এবং অজীর্ণ অংশ নিক্ষেপ করে' নব নব আহার্য্য আদায় কর্‌তে পারাও তার পক্ষে অত্যাবশ্যক। এ-কাল যে নূতন খাদ্য আমাদের সাম্‌নে নিয়ে এসেছে তার দিক্ থেকে মুখ ফিরিয়ে যদি আমরা অতঃপর ভুক্তদ্রব্যের রোমন্থন করাই শ্রেয় মনে করি তা' হলে ভবিষ্যতে মনুষ্যত্ব রক্ষা কর্‌তে পার্‌বো না, কেননা, আর যে বিদ্যেই মানুষের নিজস্ব হোক্ না কেন, রোমন্থনের বিদ্যে নয়।

(৫)

সমাজধর্ম্ম বা দেশধর্ম্মকে সর্ব্বধর্ম্মের সার না মনে করে' বর্ত্তমান সাহিত্যে যে ধর্ম্মকেই সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বসমাজের সার মনে কর্‌বার চেষ্টায় ফির্‌ছে এজন্যে আক্ষেপ কর্‌বার কোনো বৈধ হেতু নেই। ধর্ম্ম জিনিসটা আর যাই হোক্—একদেশদর্শিতা একেবারেই নয়; আর সাহিত্য জিনিসটাও 'জাতীয়' বা 'জাগতীয়' এর একটাও নয়, 'আত্মীয়' মাত্র। অবশ্য 'সমাজ-সাহিত্য' 'জাতীয়-সাহিত্য' প্রভৃতি খণ্ড-সাহিত্য যে নেই তা' নয়—তবে কথা এই যে তা মানব-মাত্রেরই 'আত্মীয়' নয়; অর্থাৎ সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের অখণ্ড নিয়ম তার মধ্যে সঞ্চিত নেই।

বলা বাহুল্য, 'আত্মীয়' সাহিত্য রচনা করবার শক্তি একমাত্র আত্মশক্তিনির্ভরশীলেরই থাকে; তবে যে আমরা ঐ আত্মশক্তির Power house খুঁজ্‌তে মানবাত্মা ছেড়ে সমাজ দেহের ঘাড়ে গিয়ে পড়ি, সে শুধু এইজন্যে যে যূথভ্রষ্ট প্রতিভার চেয়ে দলবদ্ধ অপ্রতিভের ওপরই আমরা বেশী আশা ভরসা রাখি। 'একশ্চন্দ্রঃ তমোহন্তি ন চ তারাগণৈরপি'—একথা পড়েছি আমরা অনেকেই, কিন্তু হ'লে কি হয়, বেশীর ভাগ লোকই আপনাপন বোধ শক্তির মধ্যেও সত্যের অর্থ-সাক্ষাৎকার লাভ কর্‌তে পারেন নি। আসল কথা, যুগে যুগে যে সমস্ত মহাপুরুষ সমাজদেহে বিদ্যুৎ-সঞ্চার করে গিয়েছেন তাঁরা নিজের মধ্যে তলিয়ে গিয়েই প্রাণের আদি অন্তহারা ভূ-মধ্যসাগর দেখ্‌তে পেয়েছিলেন, চারিয়ে-থাকা সমাজ পরিধিতে চরে বেড়িয়ে নয়।

স্কুলমাষ্টারী করার বিরুদ্ধে সাহিত্যের ঘোরতর আপত্তির কথা শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় এতই চমৎকার করে' জানিয়েছেন, যে তারপর আর কিছু না বল্‌লেই ভাল হয়। পড়া-বুলি পড়ানো আর পড়া-বুলি ছড়ানো যে আলাদা আলাদা জিনিস, মানবাত্মার খেলাঘর ও গুরুমহাশয়ের পাঠশালার মধ্যে যে আশ্‌মান্ জমিন্ ফারাক্—এ-সত্য মানুষের মনে কেটে-বসিয়ে দেওয়ার পরিচয় "সাহিত্যে খেলা" শীর্ষক প্রবন্ধটী থেকে কৌতূহলী পাঠক মাত্রেই সংগ্রহ করে' নিতে পার্‌বেন। বস্তুতঃ, সৃষ্টি-সম্বন্ধে শেষ কথা তিনিই বলে দিয়েছেন যাঁর গানের একটী ছত্রে প্রকাশ—"খেলার ছলে হরিঠাকুর গড়েছেন এই জগতখানা।" বিশ্বশিল্পীর যাঁরা মন্ত্রশিষ্য, তাঁদের হাতের কাজও ঐ একমাত্র 'খেলার ছলেই' গড়া—ছলে বলে কার্য্যোদ্ধার কর্‌বার কোনোরকম ফিকির-ফন্দী ওর মধ্যে নেই।

(৬)

ভাষা নিয়ে তর্ক করাটা প্রাণের ধর্ম্ম কিনা, সে-তর্ক আর এখানে তুলবো না। তবে, নিজের জোরে চলার অর্থই যে বাধাবিঘ্নকে বিপর্য্যস্ত করে' চলা, আর মনোরাজ্যে ঐ বাধা-অতিক্রম করার জোরের নামই যে তর্ক, এ-সত্য নবীন উপাসক-দলের পক্ষে জেনে রাখা মন্দ হবে না। উপলখণ্ড যদি বাধা না দেয় তাহ'লে সকল নির্ঝরই নিঃশব্দে বয়ে যেতে পারে—কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম অন্যরূপ। জোর পরীক্ষা কর্‌বার জন্যেই বাধা ঘটে—প্রাণশক্তি অবশ্যই তাতে বাঁধা পড়ে না—সংঘাতে সংঘাতে আনন্দ-ঝঙ্কার তুলে হু হু করে এগিয়ে যায়। ভাষার তর্কাগ্নিতে ঝক্‌মক্ কর্‌তে কর্‌তে যে নব-ভাষার ঝরণা আজ অগ্রসর হয়ে চলেছে, তা' চল্‌বেই—কোনো পাথরের নুড়িই-তা' বন্ধ কর্‌তে পার্‌বে না, মাঝে থেকে স্রোতের তলায় গড়াগড়ি খেতে খেতে শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হয়ে অবশেষে তারা বালুকায় পরিণত হবে।............

সমাধি-মন্দির
একঠাঁই রহে চিরস্থির—
ধরার ধুলায় থাকি
স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি'—
জীবনেরে কে রাখিতে পারে
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে,
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব-নব পূর্ব্বাচলে আলোকে আলোকে।
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধন-বিহীন।
মহারাজ! কোনো মহারাজ্য কোনোদিন
পারে নাই তোমারে ধরিতে,
সমুদ্র-স্তনিত-পৃথ্বী, হে বিরাট, তোমারে ভরিতে
নাহি পারে;
তাই এ ধরারে
জীবন উৎসব শেষে দুই পায়ে ঠেলে
মৃৎপাত্রের মত যাও ফেলে;
তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায়, কীর্ত্তিরে তোমার
বারংবার।"

দেশের সিংহদ্বারে এত বড় সজাগ-কবিকণ্ঠের পাগল-করা আহ্বানের বিরুদ্ধেও যদি আমরা ধরে নিতে পারি যে মানুষ মাত্রেরই মাথার মণি সমাজ বা দেশের গড়বন্দী উঠান-ভূমিতে গোবর-চাপা পড়ে আছে—আর মণিহারা ফণীর মতন ঐ গোবরকে প্রদক্ষিণ কর্‌বার জন্যেই মানুষের জন্ম, তা' হলে কবিকে যেন সে-জন্যে গৃহ-শত্রু মনে না করি।

'ঘরে-বাইরে' বইখানি মারাত্মক কি মৃতসঞ্জীবনী—সে কথা বোঝ্‌বার আগে, শিল্পীর প্রাণের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্কের মোটামুটি একটা ধারণা করে নিলে মন্দ হবে না, কেননা দেখা গিয়েছে যে ঐ বইটীর কবি, খবরের কাগজ-ওয়ালাদের মতে 'বিমলা'-চরিতে সমাধিস্থ আছেন।

এইমাত্র এইখানেই শিল্প-রচনা-নিরত এক শিল্পীকে দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে এবং সেটী হচ্ছে একটা মাকড়সা। নিজের অভ্যন্তর থেকে সূক্ষ্মরকমের একটী সূতো বিস্তার করে দিয়ে জানালার বাইরে মহা উৎসাহে সে টানাপোড়েন লাগিয়েছে—উদ্দেশ্য, একটা জাল তৈরি করে' খোস-মেজাজে তার ওপর উঠে-বসা। সাহিত্য-শিল্পী যিনি, তাঁরও কাজ এই মাকড়সাটীরই অনুরূপ; কেননা, তিনিও চান—যুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতার জটিলতা-জালকে মনের ভেতর

থেকে বাইরে নিক্ষেপ করে' প্রাণ-পদার্থটীকে তার ওপরে ভাসিয়ে তুল্‌তে। জালের কোনো অংশই যেমন মাকড়সা নয়, কাব্যের কোনো অংশও তেমনি কবি নন। জাল-জিনিসটী মাকড়ার অধীন হলেও ছোটখাটো পোকা-মাকড় যেমন ঐ জালেরই অধীন—শিল্প জিনিসটাও সেই রকম; কেননা, শিল্পী তাঁর জালকে অতিক্রম করে' অবস্থিত হলেও, ছোটখাটো পোকমাকড়-সম্বন্ধে ওখানে দুর্ঘটনা অল্প ঘটে না। কিন্তু শিল্পীরা তা' চান না, সুতরাং বলেই দেন—"কবিকে খুঁজিছ যেথায়, সেথা সে নাহিরে।"

কবির ইচ্ছা—সকলকেই তিনি জালের বাইরে হাত ধরে' তুলে নিয়ে আনন্দের ক্ষেত্রে মুক্তি দেন; কিন্তু একদিকে ভক্তেরা তাঁর পা জড়িয়ে থাকাটাই বেশী পছন্দসই ভাবে, আর অন্যদিকে গুরুমহাশয়ের দল (যাঁরা নাকি শিল্পের চেয়ে ব্যাকরণটাই ভাল বোঝেন) ও-ব্যাপারটাকেই দুর্ব্বোধ ঠিক করে' তেলে-বেগুনে জলে ওঠেন। বলাবাহুল্য, প্রাণের বোধ থেকে নিজেদের দুরাবস্থিত মনে করা অহঙ্কারীর পক্ষে সহজ নয়; আর, নিজেকে নির্ব্বোধ ভাবার চেয়ে অপরকে দুর্ব্বোধ ভাবায় আরাম আছে।

(গ)

ইট্‌কাঠের ঘরের মধ্যে থেকে থেকে আমাদের মন জিনিসটাও যে চারিদিকে পাঁচিল তুলে দাঁড়ায় তার প্রমাণ,—এমন কথাও আজ ছাপার অক্ষরে শুন্‌তে পাওয়া যাচ্ছে যে 'ঘরের' মধ্যে 'বাহির'কে জায়গা দিলে ঘর ফেঁসে যাবে!

"ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর"—

এদেশে অপরিচিত উক্তি নয়; বিশেষতঃ, আমরা সকলেই জানি যে মন পদার্থটী এতই elastic যে সমস্ত দুনিয়া ভরে দিলেও তা' ফেঁসে যাওয়া তো দূরের কথা, অতিরিক্ত কিছুর জন্যেও জায়গা রেখে দিতে পারে; তবু মজা এই যে, শিশু কৃষ্ণের সান্ত বদন-বিবরে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড দেখে পদ্যকারকে তারিফ কর্‌বার সময় যাঁদের ঐ কচি-গাল চিরে যাবার সম্ভবনা একেবারেই মনে আসে না, তাঁরাও মনের ঘরে বহির্বৈচিত্র্য দেখ্‌লে শিউরে উঠেন!

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মহিমা-প্রচারের জন্য রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা দোষী সাব্যস্ত কর্‌ছেন, বিবেকানন্দের Maya and Freedom শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে তাঁদের অবগতির জন্যে কয়েকটী কথা তুলে দিচ্ছি; কেননা, দেখা গিয়েছে--রবিবাবুকে যাঁরা বুঝেও বোঝেন না, বিবেকানন্দকে তাঁরা না বুঝেও মানেন:—

বিবেকান্দন বল্‌ছেন—"The idea that the goal is far off, away beyond Nature, attracting us all towards it, has to be brought down nearer and nearer without degrading or degenerating it, until it comes closer and closer and the God of Heaven becomes the god in Nature,—the God in Nuture becomes the God who is Nature—the God who is Nature becomes the God within this temple of the body, becomes the temple itself, becomes the soul and man and there it reaches the last words it can teach."

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁরা একটু স্থির হয়ে ভাবলেই দেখ্‌তে পারেন যে এ কবিটীর হৃদয় কব্যের প্রকাশপথে মনোরাজ্যের সকল মাটী মাড়িয়ে আস্‌ছে এবং এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব। তাঁর কবিদৃষ্টিকে একদিন আমরা Macrocosmic দেখেছি, আজ ব্যক্তিতে এসে ঠেকে Microcosmic হয়ে উঠ্‌তেও দেখ্‌ছি—কিন্তু রবীন্দ্র-সাধনার শেষ আজও দেখিনি। জগতগুরুর আবির্ভাব সম্ভাবনায় সমস্ত পৃথিবী

আজ আকুল হয়ে উঠেছে,—কে বল্‌তে পারে, কোন্ Medium কে আশ্রয় করে' সেই last words প্রকাশ পাবে যা' শুনে মানব-জগতের মনের চেহারা বিলকুল বদল হয়ে যাবে! সাধনা-মন্দিরের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে যে কবি বলে এসেছেন—

"মনে হয় কি একটী শেষ কথা আছে
সেইটী হইলে বলা সব বলা হয়;
কল্পনা ফিরিছে সদা তারি পাছে পাছে
তারি পানে চেয়ে আছে সমস্ত হৃদয়।
সে কথা হইলে বলা নীরব বাঁশরী
আর বাজাবো না বীণা চিরদিন তরে
সে কথা শুনিতে সবে আছে আশা করি
মানুষ এখনো তাই ফিরিছে না ঘরে"—সেই কবির শেষ কথা নিশ্চয়ই

এখনও বলা হয়নি, তাই এখনও তাঁর বীণা থাম্‌তে পারছে না। কিন্তু বর্ত্তমান লেখকের ভবিষ্যদ্বাণী আপাততঃ উহ্য থাক্—ইতিমধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দাবীটিকে আরো একটু পরিষ্কার করে' নিয়ে, 'ঘরে-বাইরে'-সম্বন্ধে বাকী কথাটুকু বলি :—

এ-দাবীর অর্থ আর কিছুই নয়—ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেককে ঐক্যের ক্ষেত্রে দাঁড় করিয়ে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের যোগ উপলব্ধি করাতে চাওয়া। কিন্তু কোথায় সেই ঐক্য যেখানে মানুষ কৃত্রিম উপায়ে দল বাঁধে না, অথচ অকৃত্রিম মিলে মিলিত হয়ে যায়? উত্তর—প্রাণের আনন্দে। কিরূপ?

সৌরজগতবাসী আমরা, সুতরাং সূর্য্যকে প্রাণের রূপক করে নিলে ব্যাপারখানা আশা করি সহজবোধ্যই হয়ে উঠ্‌বে। ওমর-খৈয়াম বলে গিয়েছেন—

For within and without, around, above, below—
'Tis nothing but a Magic-shadow-show,
Played in a box whose candle is the sun—
Round which we phantom figures come and go.

—এটা হচ্ছে সাদা-চোখের কথা। কিন্তু "All things end in the nothing" যেখানে দাঁড়ালে "yes"এ শেষ হবে, সে-জায়গাটার সঙ্গে ঐ Phantom figure গুলির যোগাযোগটা একবার দেখে নেওয়া যাক্।

কল্পনা কর—একটী সূর্য্য কোনো একখানি মেঘের ছিদ্রপথে অজস্র রশ্মিরেখা বিস্তার করে দিয়ে প্রকাণ্ড একটা পরিধি-চক্র রচনা করেছে, যে-পরিধিটা আমরা চোখের সাম্‌নে দেখ্‌ছি আর যে সূর্য্যটাকে মনের পশ্চাতে আড়াল করে' রয়েছি। ঐ রশ্মিরেখাগুলি যেখানে পরিধি-চক্রে বিরাম-লাভ করেছে সেইখানে প্রত্যেকটী রশ্মির মুখে এক একটী বিন্দু কল্পনা করে নিলে যা' দাঁড়ায় তাই হচ্ছে এক একটী বাহ্য-মানব-দেহ (Apparent man)। এখন, ঐক্য খুঁজ্‌তে গিয়ে যদি আমরা জগৎ পরিধিটা সমস্তই পরিভ্রমণ করে' আসি, তা হ'লেও কেন্দ্র থেকে দূরত্ব ঘোচাতে পারবো না। কিন্তু ঐক্য চাই—বিচ্ছিন্ন হয়ে বা আংশিক পরিধিখণ্ডকে দেশ বা সমাজ ধরে নিয়ে মন ভোলাবার ছোট চেষ্টা আর ভাল লাগে না। কোথায় ঐক্য? উত্তরে, চিরজাগ্রত কবির মুক্তকণ্ঠ বলছে—"ওরে হতভাগ্য বিন্দুকণাগুলো! তোদের নিজস্ব রশ্মি-রেখা পথে কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে আয়—এই সূর্য্যের আলোক-মণ্ডলে দাঁড়িয়ে দেখ্,—রশ্মির তুই কেউ নয়, কিন্তু রশ্মিই তোর আলোক; বিশ্বপরিধির সঙ্গে কেউই

তোকে দড়ি] দিয়ে বেঁধে রাখেনি, কিন্তু ঐ পরিধিই তোকে Pivot স্বরূপ আশ্রয় করে ঘুরছে। এইখানে, এই প্রাণের কেন্দ্রে সমস্তই তোর সঙ্গে যুক্ত, অথচ সমস্ত দড়ি-দড়া থেকেই তুই মুক্ত—এই মুক্তির কেন্দ্রেই ঐক্য, অন্য কোনোখানেই নয়।" এই অদ্বিতীয় ও শাশ্বত ঐক্যের উদ্দেশে প্রত্যেকটী রশ্মিরেখাগ্র-বিন্দুকে হৃদয়-মন পেতে দেবার জন্যে যে আহ্বান, তাই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-প্রকারকের আহ্বান। বলাবাহুল্য, ঐ প্রাণের তীর্থে যাত্রা করবার পথ আমাদের মনেরই মধ্যে দিয়ে—মনু-সংহিতার মধ্যে দিয়ে নয়। এইরূপে লব্ধপ্রাণ বা আত্ম-প্রতিষ্ঠ মানুষই হচ্ছে Real man.

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় সম্প্রতি 'স্বরূপ' আর 'রূপের' যে তফাৎ বোঝাবার জন্যে বৈষ্ণব-শাস্ত্র-সমুদ্র তোলপাড় করে' পাঠকদের মনশ্চক্ষে সর্ষেফুল ফোটাবার চেষ্টা করেছেন, সে ব্যাপারটা এই একই মানবদেহে অনুভূতি-মাত্রার মারপ্যাচ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর "একখানি চিঠি"র গলদঘর্ম্ম প্রকাশ-চেষ্টাটা দুটীমাত্র কথায় ঢের সোজা করে বলা যেতে পারে' আর সে কথা হচ্ছে এই—

ব্রহ্মের সঙ্গে যাঁর চিত্তের যোগ ঘটেছে—তিনি দেহবাসী মুক্ত পুরুষ; আর ব্রহ্মে যাঁর চিত্ত নিমজ্জিত হয়েছে স-শরীরে নরদেবতা—যাঁকে নাকি লৌকিক ভাষায় 'অবতার' বলা হয়। পরমে ব্রহ্মনি যোজিত চিত্ত, আর পরমে ব্রহ্মনি নিমজ্জিত-চিত্ত—এই ক্রমাবয়িক stageএর তফাৎ পরিদৃশ্যমান মানব-দেহের আশ্রয়েই বিকাশ প্রাপ্ত হয়—নইলে 'ব্রহ্ম' নামক একটা কোনো অশ্ব-ডিম্বের পেছনে—আরও দূরে, আরও দূরে—সত্যিসত্যিই কোনে একটা আলাদা মানুষ তার জ্যোৎস্না-রচিত চিদ্দেহ নিয়ে অনন্তকাল ধরে' খাড়া নেই। ব্রাহ্ম অজিতকুমারকে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র বাবু পরম বিজ্ঞভাবে যা' বলতে চেষ্টা করেছেন, সে-সম্বন্ধে তাঁর নিজের ধারণা বা বোধশক্তি যে আজ পর্য্যন্ত যথেষ্টই কাঁচা, এ কথা তাঁরই মতন অপর একজন হিন্দুসন্তান তাঁকে জানাতে বাধ্য না হ'লেই খুসী হ'তে পারতো।

(ঘ)

অতঃপর 'ঘরে-বাইরে' সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যটুকু বলে' এ-প্রবন্ধ শেষ করি—

এ-বই সম্বন্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে স্ত্রীপুরুষ-সম্পর্কে এমন একটা উশৃঙ্খলতার আদর্শ ওতে দেখানো হয়েছে যা' ঘরের বা বাইরের কোনোখানেরই আদর্শ নয়।

যে মজ্জাগত জাতীয় ব্যাধি থেকে ও-রকম অভিযোগ আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে, তাও বিবেকানন্দ স্পষ্টাক্ষরে ধরা দিয়ে গিয়েছেন; তাঁর কথা—"Our great defect in life is that we are so much drawn to the ideal; the goal is so much more enchanting, so much more alluring, so much bigger in our mental horizon that we lose sight of the details altogethar. But when the failure comes, if we analyse it critically, in ninety-nine per cent of cases, we shall find that it was because we did not pay attention to the means. Proper attention to the finishing and strengthening of the means is what we need. With the means all right, the end must come. Once the ideal is chosen and the means determined, we may almost let go the ideal; because, we are sure it will be there when the means are perfected.

রবীন্দ্র-সাহিত্য রস-পিপাসুরা বিবেকানন্দের ঐ উক্তি স্বর্ণাক্ষরে মনের মধ্যে এঁকে নিয়ে যদি কাব্যপাঠে প্রবৃত্ত হন, তা' হলে নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন যে বিবেকানন্দের মর্ম্মান্তিক অভিযোগটাকে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রাহ্য করে' তাঁর দুঃখ ঘোচাবার প্রাণপন চেষ্টা অজস্র বাধার বিরুদ্ধে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই করেছেন।

আমরা সকলেই জানি যে বর্ণপরিচয় প্রথমভাগে অক্ষরগুলিকে একদফা সোজা করে' সাজাবার পর শিক্ষার্থীদের বর্ণবোধ পরীক্ষা কর্‌বার জন্যে আবার উল্টো করে' সাজানো হয়ে থাকে। যে-সকল শিশু সোজা-রকমে সাজানো পাতাটা পড়ে' ঠিক করে বসে যে বর্ণপরিচয় তাদের মধ্যে পাকা হয়ে গিয়েছে, পরপৃষ্ঠায় এসে বোকা বনে যাওয়ার দৃষ্টান্ত তাদের ভাগ্যে অল্প ঘটে না। এ জন্যে পুস্তকপ্রণেতাকে শত্রু ঠাওরানো ছেলেদের পক্ষে স্বাভাবিক হলেও সঙ্গত নয়। অতএব, সীতা দেখে যাঁরা ঠিক করে' বসেছিলেন যে আদর্শ তাঁদের আয়ত্তে এসে গিয়েছে—বিমলা দেখে যদি আজ তাঁরা বোকা বনে গিয়ে থাকে তা' হ'লে বুঝ্‌তেই হবে যে আদর্শ-সম্বন্ধে বর্ণপরিচয়টাও এ-যাবৎ তাঁরা দুরস্ত করে উঠ্‌তে পারেন নি।

এখন 'ঘরে বাইরে'তে কাণ্ডখানা কি আছে দেখি :—

বিমল নিখিলেশের স্ত্রী; কিন্তু স্বামীর সহধর্ম্মিণী হবার পথে সন্দীপ এসে তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। এই অন্তরায়টার বিপক্ষে ও স্বপক্ষে তার অন্তরে যে জড়িয়ে-পড়া ও ছাড়িয়ে-চলার ছায়ালোক-তরঙ্গ উঠেছিল, তারি উত্থান-পতনে টলমল কর্‌তে কর্‌তে সর্ব্বশেষে শোণিতার্দ্র-হৃদয়ে লক্ষ্যভেদ—এই তো বিমলার দিকের ইতিহাস। দেশ বা সমাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এর অর্থ পাওয়া গিয়াছে—এখন মানব-সাধনার ক্ষেত্রে এ-চিত্রের রহস্যটা দেখে নেওয়া যাক্।

'বিমল' মাত্রেই নিখিলেশের অধিকারিণী সত্য—কিন্তু তার বিমলত্ব সন্দীপিত হওয়া দরকার; কেননা—"ভগবান আমাদের দিতেই পারেন, কিন্তু নিতে হয় যে নিজেরই গুণে; অনেক দিন ধরে' দাম দিয়ে দিয়ে তবেই সত্ব ধ্রুব হয়ে ওঠে।"

এ কেতাবের একমাত্র লীলাভূমি হচ্ছে মানুষের 'মন'। প্রকৃতি যে ত্রিগুণাত্মিকা আর ঐ মন নামক অন্তঃ-প্রকৃতিটীও যে তিনটী গুণের যৌগিক ফল একথা তো আমাদের কণ্ঠস্থ! এখন, বিমলা, সন্দীপ নিখিলেশ এই তিনটী নামে ঐ গুণত্রয়কে ভাগ করে' আমরা পাচ্ছি -বিমলা-রজঃ, সন্দীপ-তম আর নিখিলেশ-সত্ব। দুটী বিভিন্ন-মুখী শক্তির কেন্দ্রে বিমলা দণ্ডায়মানা; এবং ঐ শক্তিদুটীর একটী আত্মাভিমুখ আর অপরটী স্বার্থাভিমুখ। সন্দীপ উড়্‌ছে আকাশে, কিন্তু তার দৃষ্টি শকুনেরই মতন রক্ত মাংসের দিকে; নিখিলেশ মাটীতেই দাঁড়িয়ে, কিন্তু বেদনার পর বেদনা বুকে করেও আত্মবিশ্বাসী, অচঞ্চল ও উদাসীন।

সকলেই জানেন—যে দুটী চরমপন্থী গুণে অনেকখানি মিল আছে—যেমন মিল নাকি শাদায় ও কলোয়। এর প্রথমটীতে সাতটা বর্ণ বাতিল হয়ে গিয়েছে, আর দ্বিতীয়টীতে একটা বর্ণও আরম্ভ হয়নি। এই অহঙ্কারী ও আত্মজ্ঞানী বন্ধুদ্বয়ের মাঝখানে পার্থক্যের বিদারণ-রেখাটা যে কত বড়, আর যে-রেখাটাকে বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর করে' তুললে অভিমান-সর্ব্বস্ব পণ্ডিতেরা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অর্থ নিয়ে বিপদে পড়্‌বেন না, তার চেষ্টা ও-কেতাবে অল্প নেই।

বিমলা হচ্ছে রজোগুণের জীবন্ত চিত্র। তমোগুণের যুদ্ধে সম্পূর্ণ জয়ী হলেই যে রজোগুণ সত্বগুণে পরিণত হয়, একথা অনেকেই জানেন—অতএব বিমলাকে সাত্বিকতার সম-ধর্ম্মিণী হবার যোগ্যতা অর্জ্জন কর্‌তে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্কট-পথে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে এগিয়ে আসতে হয়েছে। 'মন'কে ফাঁকি দিয়ে মনুষ্যত্ব গড়ে তোল্‌বার সহজ-ফিকির সমাজে থাক্‌লেও সত্যের রাজ্যে নেই। যে-অগ্নিপরীক্ষা সীতা-চরিত্রে রূপকমাত্র ছিল, বিমলা-চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ তাকে রূপ দিয়েছেন—তবু, এ-বই পড়্‌লে সমাজ নাকি মারা পড়্‌বে।

উত্তর—ও-আশঙ্কা যদি সত্য হয়, তবে সমাজ মরেই আছে, কেননা কৃত্রিমতার চেয়ে বড় মৃত্যু ভগবানের সৃষ্টিতে কোনোখানেই নেই। এই কৃত্রিমতার কবরটাকে পুষ্প প্রদীপে সম্মান দেখানোর নামই যদি সমাজ হিতৈষণা

হয়, তবে ঐ সকল হিতৈষীদের হাত থেকে সমাজকে উদ্ধার করাই বর্ত্তমান-সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হোক্।

প্রাণের ঐক্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে হ'লে মনের অনৈক্য নষ্ট করা চাই।—যার মনের মধ্যপথে প্রবলতম প্রলোভনও ব্যর্থ হয়ে না ফিরেছে, তার জীবন অত্যুচ্চ শিখরে উঠেও পতিত হ'তে পারে। চিত্ত-বৈষম্যকে চিত্ত-বৈচিত্র্যে পরিণতি দিতে চাইলে নরনারীর মনে "নব নব ভাবের উন্মেষ" ঘটানো দরকার, কেননা এই মানস-কর্ম্মযোগ ছাড়া কোনো জাতিই একনিষ্ঠ হবে না। আজ এমন কথাও শুন্‌তে পাওয়া যাচ্ছে যে স্ত্রীজাতি-সম্বন্ধে ও-কার্য্যে আমরা রাজী নই। আমরা বলি, তোমাদের রাজী না হওয়ায় কিছুই যায় আসে না—কেননা, এ হচ্ছে মানবমাত্রেরই প্রতি মানবাত্মার এমন আদেশ যা' অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন কর্‌তে প্রত্যেকের পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত বাধ্য।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

বিদ্যারণ্য।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অগ্নি পরিবেষ্টিত রাজশ্রী শ্রেষ্ঠির গৃহ সম্মুখস্থ রাজপথ। পথে বিপুল জনতা ও সশস্ত্র সৈন্যগণ, গৃহ মধ্য হইতে মুহুর্মুহু কাতর আর্ত্তনাদ, একদল নাগরিকের প্রবেশ।

নাগ। আ-হা-হা; বাচ্চা, কাচ্চা সব সমেত পু'ড়ে গেল গা! বংশে বাতি দিতে কেউ রইলো না। হায়! হায়! এমন সর্ব্বনাশও কেউ কারো করে?

অপর না। নিশ্চয় ব্রহ্মশাপে পড়েছিল, তা নৈলে কি আর এমন করে ঝাড়েবংশে অপমৃত্যু হয়?

তৃতীয় না। তা' ভাই, রাজার হুকুম যে ব্রহ্মশাপের বাড়া, খামকা রাজাকে চটাতেই বা গেল কেন?

চতুর্থ। এ কি অত্যাচার রাজার! এত ধন পাবে কোথা তা' রাজা ভেবেও দেখ্‌বে না? একে আবার রাজা বলে? এর চেয়ে অরাজকতা আর কি আছে!

প্রথম। চুপ্‌ চুপ্‌! ও সব কথা আমাদের কেন ভাই! আমরা ক্ষুদ্রপ্রাণী, বড় কথায় আমাদের কাজ কি? চল্‌, সরে পড়ি।

তৃতীয়। চল্‌ ভাই, চল্‌! [একদলের প্রস্থান ও অপর দলের প্রবেশ]

প্রথম। উঃ কি জ্বলাটাই জ্বল্‌ছে! ব্রহ্মা যেন সংহার মূর্ত্তি ধারণ করেছেন।

দ্বিতীয় ও তো আগুন নয়, সাক্ষাৎ রাজার ক্রোধাগ্নি!

তৃতীয়। ওই দানবটা আবার রাজা নাকি? রাজবংশে জন্মায়ও নি, রাজ্যে কেউ অভিষেকও করে নি, রাজা বল্লেই তো আর রাজা হয় না!

প্রথম। (সভয়ে) চুপ্! সৈন্যরা এখনি শুন্‌তে পাবে।

একজন রাজকর্ম্মচারী। (অগ্রসর হইয়া) শুন্‌তে আর বাকী নেই। তোমরা রাজবিদ্রোহ প্রচার কর্‌ছো, রাজার নামে, তোমাদের আমি ধৃত করলেম, সৈন্যগণ! এদের বন্দী কর।

[সৈন্যগণ কর্ত্তৃক নাগরিকগণের বন্দী হওন]

সকলে। দোহাই মহারাজের! দোহাই সিপাহি মহারাজের, আমরা কোন দোষের দোষী নই। আমাদের ছেড়ে দিতে হুকুম হোক্!

কর্ম্মচারী। এই যে ছাড়া হচ্ছে। মুখের সুখে রাজনিন্দা কর্‌বে না? কেন এখনি যে বল্‌ছিলে রাজবংশে না জন্মালে রাজা হয় না, আবার মহারাজ বলে চেঁচাচ্ছো।

[সকলকে লইয়া প্রস্থান]

গৃহবাসীগণ। কে আছ? রক্ষা কর, আমাদের না হয় এই শিশুগুলির প্রাণ বাঁচাও, ভগবান নিশ্চয়ই তাকে পুরস্কৃত কর্ব্বেন।

জনৈক সৈ। ভগবান, তোমাদের কেমন পুরস্কৃত করেছেন দেখ্‌ছো না? তাকেও তেমনি কর্ব্বেন আর কি?

২য় সৈ। হা-হা-হা,—তা ছাড়া ভগাবেটার আর কি কাজ আছে? বসে বসে পাঁচরকম খেলা খেলায়, আর মজা দেখে এই রকম হিহি করে হাসে।

গৃহবাসিনী নারী। কৃপা কর, কৃপা কর ওগো, তোমরা কৃপা কর! কে আছ? আমার এই শিশুটীকে রক্ষা কর। এ যে আমার বহু তপস্যা-লব্ধ ধন; ওরে ননীর পুতলী আমার, এমন করে দগ্ধ হয়ে তোকে মর্‌তে দেখে আমি কেমন করে সহ্য কর্ব্বোরে বাপ!

[বেগে হরিহর ও বিনায়কের প্রবেশ]

জনৈক গৃহবাসী ও বালক। রক্ষা কর! রক্ষা কর!

হরি ও বিনা। ভয় নেই! ভয় নেই! (সমবেত জনগণের প্রতি) তোমরা মানুষ হয়ে, ঐ অমানুষী কাণ্ড দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছো? এসো এ নরমেধ যজ্ঞ ভঙ্গ করে মানব জন্ম সফল কর্‌বে এসো!

[উভয়ের জ্বলন্ত গৃহাভিমুখে অগ্রসর হওন]

সৈনিক। [বাধা দিয়া] রাজবিদ্রোহীদের সহায়তা কর্ব্বার আদেশ নেই। যে অগ্রসর হতে চেষ্টা কর্‌বে, সে আমাদের হাতে বন্দী হবে।

হরি। এই বর্ব্বরতা রাজার নয়! রাক্ষসের! পথ ছাড়, বিলম্ব কর্‌তে গেলে অহেতুক প্রাণী হত্যা হবে!

সৈনিক। আমি তোমাদের বন্দী কর্‌লেম।

বিনা। (অসি মুক্ত করিয়া) তবে মর। [অস্ত্রাঘাত, সৈনিকদ্বয়ের পতন, অপর সৈন্যগণের পলায়ন। হরিহর ও বিনায়কের অগ্নিময় গৃহ মধ্যে প্রবেশ]

জনৈক দর্শক। (সানন্দে) নিশ্চয়ই এরা দেবতা! দেবতা না হলে, এত ভরসা! চল্ আমরাও এদের কথা মত, জল এনে আগুন নিবুতে চেষ্টা করিগে। নৈলে দৈব-কোপে পড়ে মর্‌তে হবে।

সমবেতগণ। যেতে হবে বৈ কি ? যেতে হবে বৈ কি !—ভরসা করে পাঁচজনে হাত লাগালেই, কার্য্যোদ্ধার হবে না কেন ?

(সকলের প্রস্থান)

[দ্বিতলে অগ্নিবেষ্টিত কক্ষমধ্যে হরিহর ও বিনায়কের প্রবেশ, উভয়ের স্কন্ধে অচৈতন্য বালক ও নারী]

হরি। এখনও বেঁচে আছে। এখনও এদের রক্ষা করা যায়। কিন্তু এখান থেকে প্রত্যাবৃত্ত হবার পথ কই ? অধিরোহণ ভস্মসাৎ হয়ে গেছে। নিজেরা এই বাতায়ন-পথে লম্ফ প্রদানে অবতরণ কর্‌তে পার্‌তেম। কিন্তু এদের যদি তাতে আঘাত লাগে !

বিনা। দাদা ! আর বিচার কর্ব্বার সময় নেই, এখান থেকেই এদের নীচে ফেলে দিতে হবে। তারপর ওদের ভাগ্যে যা আছে, ঐ দেখুন ! অগ্নি ভীষণ গর্জ্জন কর্‌তে কর্‌তে এ স্থানকেও গ্রাস করার জন্য লেলিহান হয়ে ছুটে আস্‌ছে।

(বাতায়ন সমীপবর্ত্তী হওন)

হরি। বুঝ্‌! বুঝ্‌তে পেরেছি, এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই, তথাপি এই নবনীত-সুকোমল সুকুমার শিশুকে স্বহস্তে কেমন করে নিক্ষেপ করি ! তবে আর আমরা ওদের কি রক্ষা কর্‌লেম ? আমি বুদ্ধিহারা হয়েছি গুরুদেব ! গুরুদেব ! তুমি বলেদাও !—

বিনা। (অসহিষ্ণু ভাবে) কিন্তু আর বিলম্ব অবিধেয়।—

হরি। ঐ দেখ ! বুক্ক স্মরণ মাত্রেই তিনি এসেছেন।

(নিম্নে বিদ্যারণ্যের প্রবেশ)

বিদ্যা—হে হব্যবাহন ! তোমার ঐ রুদ্রতেজ সম্বরণ করে, প্রকৃত বস্তুতত্ত্বজ্ঞতার পরিচয় প্রদান কর, আমি তোমায় মানসে অর্চ্চনা করে, স্বীয় মানস প্রসূত এই দিব্য হবি দ্বারা আহুতি প্রদান কর্‌লেম্‌ গ্রহণ করে তুমি সুপ্রসন্ন হও !

(অগ্নির উদ্দেশ্যে হস্ত দ্বারা অহুতি প্রদান)

অগ্নি মধ্য হইতে দিব্য মূর্ত্তিধারী অগ্নিদেবতার আবির্ভাব

অগ্নি। তাপসবর ! আপনার ব্রহ্মতেজাগ্নি সমস্ত আধিদৈবিক শক্তিকেই পরাভব কর্‌তে সমর্থ ! তপস্বীর এই তপস্যাগ্নির নিকট, অগ্নির স্থূল প্রত্যক্ষ রূপ সম্পূর্ণই তেজোহীন।

(অন্তর্দ্ধান, অগ্নি নির্ব্বাপিত)

ক্রমশঃ—

শ্রীঅনুরূপা দেবী।
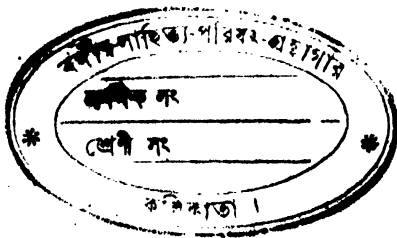
কোচবিহার ষ্টেট্ প্রেসে শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও কোচবিহার সাহিত্য-সভা কর্তৃক প্রকাশিত।
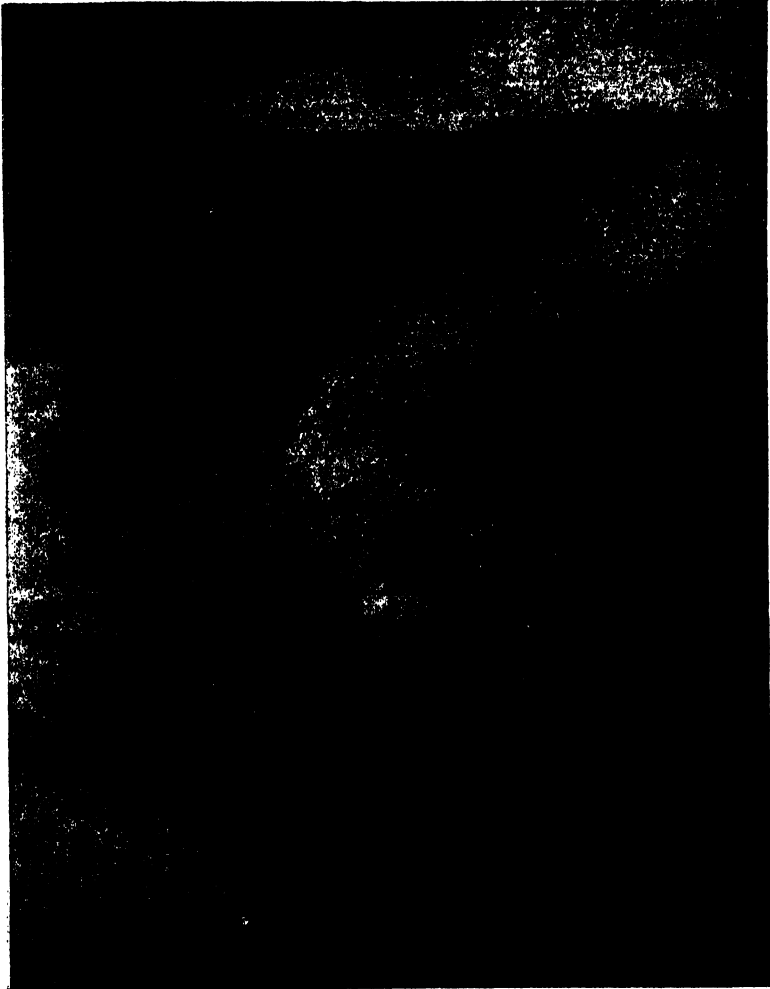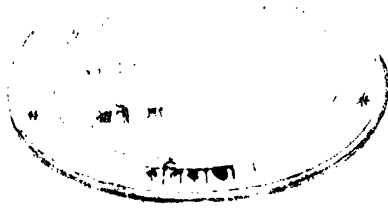
সারাবেলা শুধু নদী তীরে
বালু ল'য়ে খেলা ধীরে ধীরে।

— রবীন্দ্রনাথ

চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয়ের সৌজন্যে।

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

২য় বর্ষ। জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫ সাল। ৭ম সংখ্যা।

অসহ্য।

—:*:—

আমি তোমার ক্ষমা সইব না গো,
সইব না,
তোমার দয়া বইব না।
তোমার হাতের আঘাত মাগি
কর আমায় দণ্ড দাগী,
যা খুসি তা কর আমায়
কোন কথাই কইব না,
শুধু তোমার ক্ষমা সইব না।

নিজেরে যে ঢাকৃতে নারি
নিজের ক্ষমা আড়ালে,
আমার অনুতাপের ব্যথা
ক্ষমা দিয়েই বাড়ালে।
ক্ষমা হতে বাঁচাও মোরে
আগুন দিয়ে দগ্ধ ক'রে
আমার পাপে ভস্ম কর
নইলে কোলে রইব না
প্রভু, তোমার ক্ষমা সইব না।

তাই।

—:*:—

ব্যথা আমি সইতে পারি
তাইত ব্যথা দাও,
দণ্ড তোমার বইতে পারি
তাই মারিতে চাও।
তোমার হাতের পরশ রাগে
প্রাণে আমার রং যে জাগে,
তাইত ব্যথার রং দিয়ে, প্রাণ
রঙ্গীন করে নাও।

ঐখানে যে গরব আমার
ঐখানে যে সুখ
ঐখানে যে তোমার আঘাত
পূর্ণ করে বুক।
তোমার ব্যথায় কোরক টুটে
আমার পূজার কুসুম ফুটে;
তোমার মুঠির আঘত দিয়ে
তাই মোরে কাঁদাও।

আহ্বান।

—:-*-:-

আজ, ফোটা ফুলে ভরেছে মোর
শূন্য জীবন ডালা,
আজ, প্রাণের দানে ঢেকে গেছে
প্রাণের অর্ঘ্য থালা।
আজ, আঘাত খেয়ে নেমেছে মন
তেয়াগিয়া স্বর্ণ-আসন,
আজ, অনেক দুঃখে আরম্ভিল
প্রেমের সুধা ঢালা।

আমার দুখের অন্ধকারে
এস জীবন জ্যোতি,
আজ্‌কে তুমি এস বঁধু
আমার এ মিনতি।
তোমার চরণ দুটি বক্ষে রেখে
আচল দিয়ে রাখব ঢেকে,
আমার অশ্রুমণি ছিঁড়ে তোমার
গাঁথব গলার মালা।

কাগজের অর্থ।

—:*:—

অর্থের প্রয়োজন কি এবং ধাতু মুদ্রা দিয়া অর্থের কাজ কিরূপে চলিতেছে, সে সকল কথা পূর্ব্ব দুই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে; ধাতু মুদ্রার পরিবর্ত্তে কাগজ দিয়া অর্থের কাজ চালান যায় কিনা এখন আমরা তাহাই আলোচনা করিব।

সাধারণতঃ ধনের কাজ কাগজ দিয়া চালান অসম্ভব। এক টুক্‌রা কাগজে যদি আপনাকে লিখিয়া দেই "একবাটি সন্দেশ" অথবা "একখানা কম্বল," তাহা হইলে উহা দ্বারা আপনার রসনার তৃপ্তিও হইবে না, গায়ে গরমও লাগিবে না, কারণ সন্দেশ ও কম্বল সোজাসুজি ভাবে ভোগের জিনিষ। ভোগ্য দ্রব্য না পাইলে ভোগ

করিব কি ? অর্থের প্রধান প্রয়োজন বিনিময়ে মধ্যবর্ত্তী হইয়া কাজ করা, উহা সোজাসুজি ভাবে ভোগের জিনিষ নহে। ধনবিজ্ঞানবিৎ মিল্ (Mill) বলিয়াছেন যে অর্থ আবশ্যকীয় পণ্য লাভের আদেশ পত্র স্বরূপ। এক কথায় বলিতে গেলে অর্থ টিকেট বিশেষ। এই টিকেট যে কোনও দোকানে উপস্থিত করিলে উহার বিনিময়ে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় জিনিষ লাভ করা যাইতে পারে। কাজেই অর্থের, কাজ ধাতু মুদ্রা দিয়া যেমন চলে কাগজ দিয়াও ঠিক্ তেম্নি ভাবেই চলিতে পারে। তবে, আমাদের দেশে অনেক পশ্চামা চাকর যেমন মোহর মালা গাঁথিয়া গলায় পরে কেহ যদি ধাতু মুদ্রাকে ঠিক্ তেম্নি সোজাসুজি ভাবে ব্যবহার করিতে চান, তাহা হইলে অবশ্য ধাতু মুদ্রার পরিবর্ত্তে কাগজ চলিবে না।

বিনিময়ে ধাতুমুদ্রার পরিবর্ত্তে কাগজের-অর্থ ব্যবহার করা যে একেবারে বিংশ শতাব্দীর আবিষ্কার তাহা নহে। নবম খৃষ্টাব্দে চীনদেশে কাগজের-অর্থের প্রচলন ছিল; তাহার আগে উহা সে দেশে ছিল কিনা সে কথা জোর করিয়া বলা কঠিন। প্রাচীন আসিরিয়া (Assyria) ও বেবিলনে (Babylon) ইহার ব্যবহার ছিল।

কাগজের অর্থ তিন প্রকার :—

(১) রিপ্রেজেন্‌টেটিভ্ (Representative paper-money) ইহা গচ্ছিত অর্থের নিদর্শন পত্র ছাড়া আর কিছুই নহে।* মনে করুন কোনো ব্যাঙ্কে আমি ১০৲টী টাকা জমা রাখিলাম। তাহারা তজ্জন্য আমাকে একখানা সার্টিফিকেট্ লিখিয়া দিল যে, এই ব্যক্তি আমাদের নিকট ১০৲টী টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছে, এই সার্টিফিকেট্ উপস্থিত করিয়া দাবী করিলেই সে টাকা পাওয়া যাইবে। তাহা হইলে এই সার্টিফিকেট্খানাকেই রিপ্রেজেন্‌টেটিভ মনি (Representative money) বলিব। বেশী পরিমাণ ধাতুমুদ্রা নাড়াচাড়া করা অসুবিধা বলিয়া বড় বড় ব্যবসাদার তাহাদের মুদ্রা বাণিজ্যজগতে বিশ্বাসযোগ্য কোন ব্যক্তি অথবা সঙ্ঘের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া তাহার পরিবর্ত্তে সার্টিফিকেট্ লইয়া অর্থের কাজ চালায়। ব্যাঙ্ক অথবা গবর্ণমেণ্ট এই প্রকার কাগজের-অর্থ চালাইতে পারেন। যুক্তরাজ্যের ট্রেজারিতে কমপক্ষে ২০ ডলার জমা রাখিলে সেই ট্রেজারির সেক্রেটারী মহাশয় একখানা সার্টিফিকেট্ দেন। আমেরিকার এই "গোল্ড্ সার্টিফিকেট্" (Gold Certificate) এবং "সিল্‌ভার সার্টিফিকেট্ (Silver Certificate) রিপ্রেজেন্‌টেটিভ কাগজের-অর্থের (Representative paper moneyর) প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(২) ফাইডুসিয়ারি (Fiduciary paper money) ইহা প্রতিজ্ঞা সম্বলিত কাগজের-অর্থ। ইহাতে লেখা থাকে যে এই কাগজ উপস্থিত করিয়া দাবী করিলে বাহককে আমি এত টাকা দিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি। কাজেই এই প্রকার কাগজের-অর্থের মূল্য থাতকের ওয়াশিল দিবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে, যদি তাহার টাকা দিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া মনে হয়, এবং তাহার প্রতিজ্ঞা ও নামের সহি বিশ্বাসযোগ্য হয়, তাহা হইলে ইহা কাগজের-অর্থের কাজ চালাইতে পারে। আমরা ভবিষ্যতে ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আলোচনার সময় দেখিতে পাইব যে অধিকাংশ ব্যাঙ্ক নোটই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

কন্‌ভেন্‌সনাল (Conventional paper money) কাগজের-অর্থ। হাতে বেশী ধাতুমুদ্রা না থাকিলে গভর্ণমেণ্ট এক প্রকার কাগজের-অর্থ বাহির করেন। অন্যান্য প্রকার কাগজের অর্থের মতো ইহাও প্রতিজ্ঞা

* বাংলায় চলতি পরিভাষিক শব্দ না পাওয়ায় বাধ্য হইয়া ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করিলাম। ধনবিজ্ঞান আলোচনার বেলা বাংলায় চলতি শব্দ না পাওয়া গেলে, সংস্কৃতের শব্দমালা হইতে পারিভাষিক শব্দ খুঁজিয়া না আনিয়া বাণিজ্যজগতে সুপরিচিত বিদেশী শব্দ ব্যবহার করাই উচিত মনে করি।

সম্বলিত। ইহার উপরেও লেখা থাকে এত টাকা দিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি। কিন্তু সকলেই একথা মনে মনে ঠিক জানে যে ইহা কল্পনা ছাড়া কিছুই না। গভর্ণমেণ্ট কিছুতেই এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিবেন না; কারণ তাঁহার হাতে যথেষ্ট অর্থ নাই।

এই শেষোক্ত প্রকার কাগজের-অর্থের সৃষ্টি দুই ভাবে হইতে পারে। (১) গভর্ণমেণ্ট হয় দেশের সকলকে জানাইয়া জানাইয়া ইহা চালাইতে আরম্ভ করেন; অথবা অন্য প্রকার কাগজের-অর্থ—যাহার পরিবর্ত্তে আগে টাকা পাওয়া যাইত—এখন অধঃপতিত হইয়া এই ভাব ধারণ করিয়াছে। কন্‌ভেন্‌শনাল্ কাগজের-অর্থও ধাতুমুদ্রার পরিবর্ত্তে চলিতে পারে এই কথা সহজ ধারণায় আনিতে ইচ্ছা হয় না। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু এ ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে বহুদেশেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। রুশিয়াতে এবং দক্ষিণ আমেরিকার গণতন্ত্রে (South American Republics) এই রীতি বহুদিন চলিয়াছিল। চলিবেই বা না কেন? দেশের আইনের হুকুমে ও দেশের সম্মতিক্রমে ইহার দ্বারা যদি প্রয়োজনীয় পণ্যের বিনিময় সাধিত হয়, ঋণ শোধ দেওয়া যায়, এবং ট্যাক্সও দিতে পারা যায়, তাহা হইলে ইহা ধাতুমুদ্রার মতো চলিবেনা কেন?

কিন্তু ধাতুমুদ্রার তুলনায়-কাগজের অর্থের কতকগুলি অসুবিধা আছে। যেমন (১) যিনি আইন তৈয়ার করিবেন তাঁহার ইচ্ছার উপর ইহার সৃষ্টি ও ধ্বংশ নির্ভর করে বলিয়া ইহা কতকটা বিপজ্জনক। একবার যদি আইনের হুকুম হয় যে কাগজের অর্থ আর চলিব না, তাহা হইলে যাহারা লোহার সিন্ধুক বোঝাই করিয়া কাগজের অর্থ রাখিয়াছেন তাঁহাদিগকে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িতে হইবে। কারণ তখন স্তূপীকৃত নোটের মূল্য একরাশ্ কাগজের টুকরা ছাড়া আর কি!! আর যদি কোমো একটী ধাতুমুদ্রা চলিবে না বলিয়া হুকুম জারি হয়, তাহা হইলেও উহাকে অর্থরূপে চালান না যায়, গালাইয়া ধাতুহিসাবে ব্যবহার করা তো চলিবে।

(২) ধাতুমুদ্রার চেয়ে কাগজের-অর্থের মূল্য বেশী পরিবর্ত্তনশীল। ধাতুর যোগান প্রকৃতির হাতে, আর দ্বিতীয়টীর সৃষ্টি নির্ভর করে মানুষের বুদ্ধির উপর। কোনো অসাবধান গভর্ণমেণ্ট হয়তো আবশ্যক চেয়েও বেশী কাগজের-অর্থ যোগাইয়া উহার মর্য্যাদা একেবারে নষ্ট করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু কোনো গবর্ণমেণ্ট প্রকৃতদত্ত-ধাতু মুদ্রার এইরূপ ভাবে অপমান করিতে পারিবেন না।

(৩) ভারতগভর্ণমেণ্ট এক টাকার নোট বাহির করিয়াছেন। আমরা ভারতবাসী, ভারত গভর্ণমেণ্টের উপর আমাদের বিশ্বাস অটল, তাই আমরা উহা গ্রহণ করিয়াছি; আমাদের দেশের ভিতর ইহার সাহায্যে বিনিময়, ব্যবসা ও বানিজ্য অবাধে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের বাহিরে, অপর দেশের, ভিন্ন জাতির (মনে করুন জাপানের) একজন এই নোট্ গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিবে। ভারত গভর্ণনেণ্টের উপর হয়তো তাহার তেমন আস্থা নাই; সুতরাং তাহার প্রতিজ্ঞাতেও বিশ্বাস কম। সে তো এই নোট্‌কে একটুকরা কাগজ অপেক্ষা কোনও অংশে বেশী মূল্যবান্ মনে করিবে না। কাজেই সে ওই নোট গ্রহণ করিবে না। কিন্তু ধাতুমুদ্রা সে অর্থরূপে হয়তো গ্রহণ করিবে;—অর্থরূপে গ্রহণ করুক আর নাই করুক ধাতু হিসাবে তো গ্রহণ করিবেই। সুতরাং দেখিতেছি আন্তর্জ্জাতিক বিনিময়ে কাগজের-অর্থ চলে না। কিন্তু ধাতুমুদ্রা চলিতে পারে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

বসন্ত সেনা।

(মৃচ্ছকটিক

কুলটার গৃহে লভেছ জনম
　　সাধ করে' ত্যাগ করনি কুল,
সমাজবদ্ধ পদে দলে তুমি
　　পতিরে তেয়াগি করনি ভুল।
সতীর স্বর্গ তেয়াগিয়া তুমি
　　পঙ্কে নামনি হে স্বৈরিনি!
পঙ্কেরি মাঝে জনমেছ তুমি
　　মধু সৌরভে পঙ্কজিনী।
কামকলাকেলি কুতূহল মাঝে
　　জনমি কামনা-অন্ধা নও
তুমিত কামের কিঙ্করী নহ,
　　তুমি বুঝি তার ভগিনী হও?
অন্নের লাগি ওগো কিন্নরি!
　　অবরেণ্যেরে বর' নি গেহে
বিত্ত তোমার নহেত কাম্য,
　　স্বর্ণের খনি তোমার দেহে।
কুবেরের ধন লুটিয়া এনেছে
　　তোমার কণ্ঠ, তোমার বীণা
রাজারো স্বজনে কিঙ্কর সম
　　ভাবিতেও তুমি কর যে ঘৃণা।
সুপুরুষ বিট রাজ পুরুষেরা
　　বৃথা লুটে পড়ে তোমার পদে,
মণিউষ্ণীষ পাদ-পীঠ তব
　　স্তব নাহি শুন' গর্ব্ব মদে।
হস্তী অশ্ব বাঁধা তব দ্বারে,
　　কুঞ্জে পারাবত রজত থামে,
হর্ম্ম্য তোমার চিত্রসেনের
　　প্রাসাদ যেন গো ধরণী ধামে।

কিসের অভাব? কিসের বেদনা?
　　নতাননে আছ গৌরবিনি!
মণি-কুট্টিমে লুটে লুটে চোখে
　　ঝরাইছ কেন মন্দাকিনী?
কনক হয়েছে পাবকের সম,
　　রজত হয়েছে ফণীর লালা
বৃশ্চিক সম বক্ষে বিঁধিছে
　　হীরাগজমতি-মণির মালা।
রতনের রেণু চোখে দিয়ে তব
　　করিল বিধাতা প্রবঞ্চনা
নারী জীবনের শ্রেষ্ঠকাম্য—
　　পাওনি প্রিয়ের প্রেমের কণা।
রাজার শীর্ষ লুটে পড়ে যত
　　তোমার অরুণ পায়ের কাছে
তোমার শীর্ষ গুরুভার হয়ে
　　লুটে পড়িবার চরণ যাচে।
কল্পলতিকা বিষাদ ধূসর
　　সারারাতি লুটো ধরণীতলে
নির্ব্বাক নব যৌবন তব
　　মণির প্রদীপে নীরবে জ্বলে।
বহনের দুখ সে যে বড় দুখ
　　ত্যাগের সুখ যে সুখের সার;
কতদিন ব'বে ওগো পূজারিনী
　　দাসী জীবনের অর্ঘ্য ভার?
পেতে তব প্রাণে সাধ নাহি জাগে
　　দিতে পেলে তব পরাণ বাঁচে
ঐহিক সুখ ভার হয়ে তব
　　পাষাণের মত চাপিয়া আছে।

দানে দীন হয়ে সন্তানে যেবা
মাটির খেলানা দিয়াছে তুলি'
জীবনের শেষ উত্তরীয়টি
বিতরি' দিয়াছে আপনা ভুলি'
সুমেরু সমান বিত্ত তোমার
দুহাতে বিলাতে পারিবে যেবা
তুমি চাহ দেবী, সেই দেবতার
চরণ যুগল করিতে সেবা।

সঙ্গীত তব বেদনা করুণ
অরুণ করেছে রূপের মায়া
রভস তৃষার কোলাহল মাঝে
ঘনায়ে তুলেছে গহন ছায়া।
চরণ নূপুরে কি ব্যথা বিমরে
সে কথা ভাবিয়া বুঝেনি কেহ;
নৃত্যলহরে বিধুবিম্বের
লীলা হেরি সবে ফিরেছে গেহ;
উদাস স্বপনে তোমার বীণায়
তালমানলয়ে হয়েছে ভুল
বিচার করিতে করেনি সাহস
সাধুবাদ দেছে মূর্খকুল।

ঘৃণা করে' তুমি হাসিয়াছ মৃদু
আপনারে আরো করেছ ঘৃণা;
নিজবৃত্তিরে শতশাপ দিয়ে,
কতবার ছুঁড়ে ফেলেছ বীণা।
ভুল' নাই ধনে, মজ' নাই রূপে,
দেবভাব হেরি' হয়েছ দাসী
কুলটা বলিয়া নিন্দিলে তোমা'
অবিচার হেরি পায়গো হাসি।

সোণার হরিণী কস্তূরী তবু
বহিছ গোপন হৃদয়তলে,
সন্ধ্যামণির শাখা দিয়ে তুমি
ঢাকিয়া রেখেছ তুলসীদলে।

রমণী গরিমা—অশোক শোণিমা—
সীঁথির সিঁদুরে ফুটিতে চাহে,
জননী মহিমা স্তন্যধারায়
কামনা শৈলে ছুটিতে যাহে।
সংসার তুমি চাহ পাতিবারে
কল্যাণীসতী জননী সমা
দীনের কুটীরে শত গৃহকাজে
হতে চাও তুমি গৃহের রমা।

মণির মরীচি মরীচিকা শুধু,
তৃষার সলিল কভু ত নহে;
ধূলি কাদা মাথা পদতট তলে
চাহ যে করুণা-নদীটি বহে।
রমণীর মাঝে রয়েছে জননী
কামিনীর মাঝে রয়েছে দেবী—
হেমলঙ্কার কতদিন তারা
বন্দী রহিবে হীনতা সেবি'!
হেম পালঙ্কে প্রেম রসহীন
অমরতা বর ও তোমার হেয়,
দীন প্রেমিকের চরণের তলে
অন্নাভাবেও মরণ শ্রেয়ঃ।

সংশয় মাঝে প্রত্যয়ময়ী!
ভ্রমের মধ্যে সত্যসমা
দাস রাজগৃহে কল্যানি অয়ি!
শান্তনুরাজ হৃদয় রমা
ফণীসম বেণী বলম্বিত তব
তনুর মাঝারে যে ধন জাগে,
ব্যথার ঘরষে চন্দন সম
দেবের অর্ঘ্যে প্রকাশ মাগে

ধরা জননী স্তন্য যে দেয়,
হেম কমলে ও-গন্ধ-মধু
দেবতার পায় ঠাঁই আছে, শুধু
বিলাসিনী নহে কুসুম-বধু।

গোময়ের মাঝে দূর্ব্বার দল
তোমা' চাহে গৃহ গন্ধ ডালা
তুমি পবিত্র কৌষেয় বাস
নহ তুমি শুধু কীটের লালা।

নমি ভিখারিণী প্রেমকাঙালিনী,
সতীরো বন্দ্যা কলঙ্কিনী
অসতীর রাণী সতী শিরোমণি
পঙ্কের মাঝে পঙ্কজিনী।

শ্রীকালিদাস রায়।

মঙ্গল-মঠ।

—:※:—

দ্বিতীয় খণ্ড।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা উৎরাইয়া গিয়াছে।

দেয়ালের গায়ে প্রজ্জ্বলিত 'সেজের' সুরঞ্জিত কাঁচাবরণের ভিতর হইতে স্নিগ্ধ আলোকচ্ছটা নির্গত হইতেছিল; সমস্ত গৃহের দৃশ্য সেই রঙয়ের আবেশে মধুরোজ্জ্বল মাধুরী-স্নাত দেখাইতেছে। হর্ম্ম্যতলে একটি চারিপাঁচ মাসের ফুল্ল মল্লিকা-শুভ্র সুন্দর শিশু সতরঞ্চির উপর শুইয়া—অব্যক্ত হর্ষোচ্ছ্বাসে অর্থহীন শব্দে, হস্ত পদ আস্ফালন করিয়া আলোর দিকে চাহিয়া চাহিয়া খেলা করিতেছিল। শিশুর পাশে বসিয়া, তাহার পিতা মন্মথনাথ তাহার চিবুকে মৃদু মন্দ তর্জ্জনী আঘাত করিয়া সস্নেহে আদর করিতেছিলেন। ঘরে আর কেহ ছিল না।

মন্মথনাথের আর্থিক অবস্থা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে। ঈশ্বরেচ্ছায় এখন তাঁহাকে সংসার খরচের অসচ্ছলতার জন্য ভাবিতে হয় না, প্রয়োজনীয় আইন পুস্তক ইচ্ছামত না কিনিতে পারায় আপেক্ষ করিতে হয় না। এখন তাঁহার অনেকগুলি আলমারী পুস্তকে ভরিয়া গিয়াছে। যদিচ আড়ম্বরের বাহুল্য ছিল না, তথাপি স্বচ্ছলভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী, গৃহের একান্ত আবশ্যকীয় আসবাব পত্রগুলা হইতে দৈন্যের মলিন চিহ্ন সম্পূর্ণরূপে লোপ হইয়া গিয়াছে। দরিদ্রের মুখ চাহিয়া দয়াদাক্ষিণ্য প্রকাশ জন্য চতুর্দ্দিকে তাঁহার যথোচিত সুনাম বিঘোষিত হইয়াছে, তরুণ ব্যবহারজীবির ভবিষ্যত আশা সম্বন্ধে বারলাইব্রেরীর শামলাধারী সভ্যবৃন্দ এখন নিঃসন্দেহে নিজেদের আনুমানিক ভরসা বিশ্বাস প্রকাশ করিয়া থাকেন।

অল্পদিন হইল, স্বর্গের সৌরভ-প্রীতি বহন করিয়া তাঁহাদের গৃহে ঐ সুন্দর-কোমল শিশুটি আবির্ভূত হইয়াছে। শিশুর মুখপানে চাহিয়া পিতা আনন্দে উৎসাহিত, মাতা স্নেহে আত্মবিস্মৃতা!—দাম্পত্যের দায়িত্ব এখন স্বামী স্ত্রীর নিকট উজ্জ্বল চেতনায় সজীব সুন্দর, সংসার এখন তাঁহাদের চক্ষে আনন্দ লীলা-নিকেতন! বড় সুখে দিন কাটিতেছে।

কিন্তু অন্যত্র দুঃখ দুর্ঘটনার অসদ্ভাব ছিল না। বোম্বায়ের—বৎসরে শোচনীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। অকালে সন্তান প্রসব করিয়া হৃষীকেশের গুণবতী পত্নী শিশুসহ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। শোককাতর হৃষীকেশ যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া একমাত্র কন্যা মমতাকে যোগ্য পাত্রে সমর্পণ করিয়া, কর্ম্মে অবসর লইয়া

কিছুদিনের জন্য দেশে ফিরিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাকে আর বোম্বাই ফিরিতে হইল না,—একদিন হঠাৎ বিসূচিকা রোগে তিনি ইহধাম ত্যাগ করিলেন।

তারপর সম্প্রতি বেদান্তবাগীশ মহাশয় দেহরক্ষা করিয়াছেন। কেবলরাম অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া এখন তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার বিবাহ হইয়াছে।—শান্তিদেবী বোম্বাইয়ে কেবলরামের নিকট রহিয়াছেন। আজ তাঁহার নিকট হইতে পত্র আসিয়াছে, মন্মথনাথ সেই পত্র হাতে লইয়া, আজ অসময়ে মায়ার অপেক্ষায় গৃহে বসিয়াছিলেন,— বৈঠকখানায় যান নাই।

তখন গ্রীষ্মকাল অবসান প্রায়। দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়া—ক্লান্তিহারী মৃদুমন্দ নৈশ সমীরণ কক্ষ মধ্যে ভাসিয়া আসিতেছিল, বাহিরে কৃষ্ণা চতুর্থীর সান্ধ্য জ্যোৎস্না কিরণ বিভাসিত নীলাকাশে অগণ্য নক্ষত্র হাসিতেছিল। নিদাঘ দিবসের খরতাপ-ক্লেশ-পীড়ন-মুক্তা প্রকৃতির শোভা এখন স্নিগ্ধ আনন্দময়ী।

মন্মথনাথ বসিয়া শিশুকে আদর করিতেছেন, অল্পক্ষণ পরে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধপাত্র হাতে করিয়া, মায়া দ্বার দেশে আসিয়া দেখা দিল। গৃহে ঢুকিতে উদ্যত হইয়া মায়া একবার থামিল, স্নিগ্ধ দীপালোক উদ্ভাসিত কক্ষ দৃশ্য—তাহার চক্ষে, অপূর্ব্ব নয়নাভিরাম. চমৎকার প্রীতি সুন্দর বোধ হইল,—মায়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে একবার চাহিল,—প্রস্ফুট যুঁথিকা স্তবক তুল্য ক্ষুদ্র শিশুর পানে—একবার চাহিল প্রসন্ন মহিমা স্নাত মূর্ত্তি স্বামীর পানে!

দ্বার-প্রান্তবর্ত্তিনী মাতার দিকে দৃষ্টি পড়িতে(ই) শিশু পায়ের ভরে উত্তরার্দ্ধ উপর দিকে ঠেলিয়া, সজোরে হাত পা ছুঁড়িয়া, অসহিষ্ণুতা জ্ঞাপক মৃদুমন্দ ক্রন্দন আরম্ভ করিল। ঘাড় ফিরাইয়া মন্মথনাথ পিছনে দ্বারের দিকে চাহিয়া, মায়াকে দেখিয়া হাসিলেন। শিশুকে লক্ষ্য করিয়া কৃত্রিম কোপে বলিলেন "এই-ও ছুঁচো, এতক্ষণের পর এই বুঝি কৃতজ্ঞতা হোল! এই দিকে চা'—ওদিকে নয়"—তিনি শিশুর চিবুক ধরিয়া, মুখখানা টানিয়া নিজের দিকে ফিরাইলেন, তার পর হেঁট হইয়া সস্নেহে তাহার ললাট চুম্বন করিলেন।

শিশু কিন্তু সে উৎকোচে ভুলিল না, সে আবার মাতার পানে দৃষ্টি ফিরাইবার চেষ্টা করিল। মায়া স্নেহ-কোমল হাস্য রঞ্জিত বদনে অগ্রসর হইয়া আসিয়া দুধের বাটি নামাইয়া তাহার কাছে বসিল, শিশুর উদরে হস্তার্পন করিয়া ঈষৎ নাড়া দিয়া বলিল "কান্না কেন? বড় খিদে পেয়েছে বুঝি?"

মন্মথনাথ মায়ার হাত টানিয়া লইয়া বলিলেন "বুঝ্‌তে ভুল কর্‌ছ মায়া, ও কান্নাটা খিদের দৌরাত্ম্যে নয়, ওটা সম্পূর্ণ দুষ্ট বুদ্ধির লক্ষণ;—থাম, আস্কারা দিয়ে কোলে তুলো না, একবার কাঁদ্‌তে দাও,—এখনি দেখবে আপনি ঠাণ্ডা হবে।"

মায়া শিশুর মুখ পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। শিশু-ব্যগ্র ভাবে হস্তপদ সঞ্চালন করিয়া, মাতার কোলে উঠিবার জন্য খানিকক্ষণ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল,—তার পর ভুলিয়া গেল, আলোর দিকে চাহিয়া, আপন মনে খেলা করিতে লাগিল।

ঝিনুকে দুধ লইয়া বাটিতে ঢালিয়া জুড়াইতে জুড়াইতে মায়া বলিল "তুমি যে বড় অসময়ে ঘরে এসে বসে আছ?"

মন্মথনাথ বলিলেন "তোমায় দেখ্‌বো বলে,—"

মুখ নত করিয়া ঈষৎ হাসিয়া মায়া বলিল "ও কথাটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।"

মন্মথনাথ মায়ার হাতে একখানি চিঠি দিয়া বলিলেন "তবে নাও, শান্তি দিদি তোমায় আশীর্ব্বাদের সঙ্গে ঠাট্টা করে চিঠি লিখেছেন, তুমি মনুর বিয়ের সময় ওজর করে যাওয়ার প্রস্তাব কাটিয়েছিলে, বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের

শ্রাদ্ধের সময় হঠাৎ শরীর খারাপ বলে যেতে অক্ষম হয়েছিলে, তাই 'কান্ টানলেই মাথা আসে' প্রবাদের উল্লেখ করে বলেছেন এবার তুমি কি ওজর করে যাওয়া নাকচ কর্‌বে তিনি তাই ভাব্‌ছেন।"

"কেন?"—মায়া বিস্মিত হইয়া স্বামীর পানে চাহিল।

"এবার একটা বড় মামলা পেয়েছি, বম্বে কোর্টে গিয়ে দিন কতক গলা বাজি কর্‌তে হবে—"

"তোমায়! কবে?"

"দিন দশেকের মধ্যে বেরুতে হবে,—মান্দ্রাজ থেকে একজন ব্যরিষ্টার আস্‌বে, আর এলাহাবাদ থেকে উকীল শ্রীশ বাবুর জুনিয়ার হয়ে আমাকে যেতে হবে, দৈনিক ফিস্ ওঁকে আড়াই শো' দেবে, আমায় পঁচাত্তর।"

বোম্বাই যাওয়ার নাম শুনিয়া মায়া ভিতরে যেন একটু দমিয়া গিয়াছিল। মুখে কষ্ট-সৃজিত হাসি টানিয়া লঘু কৌতুকের স্বরে বলিল "ওঃ মোটা পাওনা—"

হাসিয়া মন্মথনাথ বলিলেন "দেখ্‌ছ কি? তোমার বরাত জোর খুব?—মামলা চল্‌বেও অনেক দিন, মঙ্গলমঠের গাদি নিয়ে ঝগড়া বেধেছে।"

অধিকতর বিস্ময়ে মায়া বলিল "মঙ্গলমঠের গাদি নিয়ে! কার সঙ্গে?—

মন্মথনাথ বলিলেন "মঠের অধিকারী দেবকীনন্দন মাসখানেক হোল হঠাৎ মারা গেছেন, কুসংসর্গে মিশে দুশ্চরিত্রতা, আমোদে মেতে তিনি বিস্তর দেনা রেখে গেছেন, সেই সব নিয়েই ত এক গোলমাল বেধেছে, তার ওপর দেবকীনন্দন অপুত্রক অবস্থায় মারা গেছেন, তাঁর একটী ছোট নাবালিকা মেয়ে আছে। সুরাটের সুন্দর-মঠের মোহন্ত মহারাজ, মঙ্গলমঠের অধিকারীদের মন্ত্রগুরু, সুতরাং বর্ত্তমানে তিনিই মঠের অভিভাবক, তিনি বল্‌ছেন,—দেবকীনন্দনে ঐ মেয়েটিকে যোগ্যপাত্রে অর্পণ করে সেই জামাইকে মঠের গদি দেওয়া হোক, এ দিকে মঙ্গলমঠের দেওয়ান দেবল চাঁদ, মৃত অধিকারী মহারাজের দূর সম্পর্কীয় ভাগিনেয়,—তিনি বল্‌ছেন অপুত্রক অধিকারী মহারাজের অবর্ত্তমানেও মঠের গদি আইনানুসারে তাঁরই প্রাপ্য,........ এই নিয়ে মমলা!—দেবল চাঁদ 'মোরিয়া' হয়ে লেগেছে, মঠের তহবীল ভেঙ্গে শুনছি নাকি বোম্বে কোর্টের সমস্ত বড় বড় উকীল ব্যারিষ্টারদের হাত করেছে, সেই জন্য সুরাটের মোহন্ত মহারাজ অন্য জায়গা থেকে উকীল ব্যারিষ্টার নিয়ে যাচ্ছেন।"

মন্মথনাথের সব কথা মায়ার কানে ঢুকিল কি না ঈশ্বর জানেন,—সে কিন্তু কোন উত্তর দিল না, উন্মনা ভাবে শুধু ঝিনুক বাটি লইয়া ব্যতি ব্যস্ত হইয়া রহিল।

মন্মথনাথ বলিলেন "থাক্, আমাদের যথা লাভ; কেবল বাবুর যত্নে আর এখানে আমাদের শ্রীশ বাবুর অনুগ্রহে, এবার আমার আমার ভাগ্যলক্ষ্মী বোধ হয় প্রসন্ন হ'লেন। এত বড় মামলায় হাত লাগাবার সৌভাগ্য এর আগে আর হয় নি, এদ্দিন যত্র আয় তত্র ব্যয় হয়েছে, এবার দেখা যাক, কিছু গুছিয়ে ফেল্‌তে পারি কি না;—হ্যাঁ ভাল কথা,—" সহাস্যে মন্মথনাথ বলিলেন "শান্তি দিদিকে তোমার যাওয়ার কথা কি লিখ্‌ব বল?"

মায়া কোন উত্তর দিল না,—শিশু শুভ্র কোমল কচি হাত দুটিতে নিজের পা টানিয়া ধরিয়া সাগ্রহে পদাঙ্গুলি চুষিতেছিল, মায়া একাগ্র মনোযোগে তাহাই দেখিতে লাগিল।

উত্তর প্রত্যাশায় ক্ষণেক নীরব থাকিয়া মন্মথনাথ সবিদ্রূপে বলিলেন,—ভাল যা হোক, চমৎকার নিশ্চিন্ত হয়ে ছেলের খেলা দেখ্‌ছ, আর আমি ভদ্রলোক যে কাজের কথা নিয়ে হাঁ করে বসে আছি,—তার খোঁজ নাই!

চমকিয়া দৃষ্টি তুলিয়া মায়া অস্বাভাবিক বিষন্ন বিকৃত কণ্ঠে বলিল "কি বল্‌ছ?"

"তোমার যাওয়ার কথা!—" সহসা মন্মথনাথ স্তব্ধ হইলেন। মায়ার গম্ভীর মলিন মুখ পানে চাহিয়া তিনি বিস্ময়ের সহিত বেদনা অনুভব করিলেন,—তাঁহার স্মরণ হইল বোম্বাই যাইতে চির অসম্মতা মায়াকে আজ এরূপ স্থলে বোম্বাই যাওয়ার কথা লইয়া বিদ্রূপ করা-টা সমীচীন হয় নাই, সেখান কার উপর্য্যুপরি সংঘটিত শোক-দুর্ঘটনার স্মৃতি নিশ্চয়ই মায়ার মনকে ক্লিষ্ট নিষ্পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার কোন ভুল নাই।

কণ্ঠস্বর নামাইয়া মন্মথনাথ মৃদু ভাবে বলিলেন "মন খারাপ কোরনা মায়া, ঈশ্বরাধীন কাজ মানুষকে নিঃশব্দে মথা পেতে নিয়ে চল্‌তে হয়,…………যা হয়ে বয়ে গেছে, তার স্মৃতি পীড়ন মনকে ভুলে যেতে দাও।"

মায়ার মুখ পাংশু বিবর্ণ হইয়া গেল, মুহূর্ত্তের জন্য বোধ হইল সে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে,—পরক্ষণে সহসা ব্যগ্র ভাবে মায়া শিশুকে তুলিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিল, তার পর বিস্ময় নির্ব্বাক মন্মথনাথের মুখ পানে চাহিয়া স্থির কণ্ঠে বলিল "আমার মনে করবার ত আর কিছু নাই, দরকার হয়—তোমরা যদি বল আমি নিশ্চয় সেখানে যাব।"

মন্মথনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—এ প্রসঙ্গে এইখানেই নিরস্ত হওয়া উচিত বুঝিয়া,—অন্য কথা পাড়িলেন, বলিলেন "শান্তি দিদিকে পত্র লিখে, আমি এখনই শ্রীশ বাবুর বাসায় যাব, মামলার কথা বার্ত্তা শেষ করে ফির্‌তে বোধহয় রাত হবে,—ঠাকুরকে বোলো আমার খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে যেন তারা হাঁড়ি হেঁসেল তুলে খেয়ে দেয়ে যায়।"

মন্মথনাথ চলিয়া গেলেন। মায়া শিশুর মুখ পানে চাহিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় স্তব্ধ নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিয়া—শিশু স্তন্যপান করিতে করিতে জঠরানল নিবৃত্তির আরাম অনুভব করিয়া, মার কোলে ঘুমাইয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। মায়া পূর্ব্বের মতই জড়-অচেতন ভাবে বসিয়া রহিল, শিশু যে তাহার কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তাহা স্মরণ ছিল না,—সে কেবলই ভাবিতেছিল,—এত দিনের পর সত্যই আবার বোম্বাই যাইতে—হইবে? সেই মহা অমঙ্গলের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের ক্ষেত্র, কিশোর হৃদয়ের সেই মহা শোক সমাধির—জীবন্ত শ্মশান, মঙ্গলমঠে এতদিনের পর আবার ফিরিয়া গিয়া দাঁড়াইতে হইবে?…………একদিন সেই চির পরিচয়ের ক্ষেত্র সীমা ছাড়াইয়া, দুঃসহ বেদনা পীড়িত পরিচিত জীবনকে ভুলিবার জন্য—অপরিচিত পথিকের সঙ্গ ধরিয়া,—বিশাল দূরত্বের ব্যবধানে আত্মবিস্মৃতির মধ্যে হাঁপ ছাড়িবার জন্য পলাইয়া আসিয়াছে, সুদীর্ঘ সাত বৎসরের সুখ দুঃখ অভাব আনন্দের ভিতর দিয়া এই অপরিচিত ঘর কন্নার সহিত আপনাকে এখন ঘনিষ্ট যোগে সুদৃঢ় রূপে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে,—এখন ইহার অপেক্ষা বড় পরিচিত তাহার কাছে আর কেহ নাই! তবে কেন অদৃষ্ট আবার এত দিনের পর,—সেই অতীত মৃত শ্মশানে তাহার কর্ম্ম ক্ষেত্র নির্দ্দেশ করিতেছেন?

ঝি ঘরে ঢুকিয়া বলিল "মা, শিরীশবাবুর বাড়ী থেকে মেয়েরা এসেছেন, নীচে দাঁড়িয়ে আছেন।"

মায়ার স্বপ্ন ঘোর ছুটিয়া গেল, তাড়াতাড়ি শিশুকে দোল্‌নায় শোওয়াইয়া দিয়া সে নীচে নামিয়া আসিল।

এখানকার প্রতিবেশী বাঙ্গালী পরিবারগুলির সহিত ইতিমধ্যে তাহাদের যথাসম্ভব আলাপ পরিচয় হইয়া গিয়াছে, ক্রিয়া কলাপে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণও যথাবিহিত বিধানে প্রচলিত হইত। বিশেষতঃ কার্য্য সম্পর্কে শ্রীশবাবু উকীলের বাড়ীর সহিত তাহাদের পরিচয় কিছু বেশী হইয়াছে। মায়া নীচে আসিয়া দেখিল শ্রীশবাবুর দুই পুত্রবধূ ও বিধবা কন্যা মালতী ঠাকুরাণী আসিয়াছেন সঙ্গে শ্রীশবাবুর দশম বর্ষীয় কনিষ্ঠ পুত্র শান্তিচরণ ও মালতী ঠাকুরাণীর পঞ্চদশ-বর্ষীয় পুত্র নন্দলাল এবং বাড়ীর সরকারী ঠানদিদি,—বয়ষা গৃহিণী বলিয়া-ই হউক, অথবা দলের প্রধান পক্ষে

অভিষিক্ত হইয়া-ই হউক,—আসিয়াছেন। মায়া সসৌজন্যে প্রণাম নমস্কারের পর তাঁহাদের বসিতে আসন দিল, কিন্তু ঠান্‌দিদি হাসিয়া বলিলেন "আসন রাখ নাত্‌বৌ, বস্‌তে আসি নি ভাই, বেড়াতে এসেছি,—নাতি আমাদের ওখানে আটক পড়েছে, ফিরে আস্‌তে অনেক দেরী হবে, খবর পেয়ে তোকে চুপি চুপি বের করে নিয়ে যেতে এসেছি,—ছেলে ঘুমিয়েছে ?"

ঠানদিদির রসিকতায় মায়া হাসিল, বলিল "ছেলে ঘুমিয়েছে ঠানদিদি, আপনারা কোথায় বেড়াতে যাবেন রাত্রে ?—"

ঠানদিদি একটা অনির্দ্দিষ্ট স্থানের নামোল্লেখ করিয়া আবার রহস্য ফাঁদিবার উপক্রম করিলেন, কিন্তু আগ্রহ অধীর বালক নন্দলালের বাজে সময় নষ্ট করিতে ধৈর্য্যে কুলাইল না, সে অগ্রসর হইয়া বলিল "শীগ্‌গীর বেরিয়ে পড়ুন মাসিমা, আমরা মঠের ধারে দাদাবাবুর নূতন বাগানে বেড়াতে—"

ব্যস !—দলকে-দল একযোগে হাঁ হাঁ করিয়া উৎসাহিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—যে জ্যোৎস্না রাত্রে নির্জ্জন মাঠের ধারে বাগানে, অসঙ্কোচ আনন্দে পায়ে হাঁটিয়া বেড়াইবার জন্য সখের সঙ্কল্প আঁটিয়া অল্প বয়স্কা বধূ দুইটি ননন্দার সহিত যোগ সাজস করিয়া স্নেহময়ী ঠান্‌দিদির কাছে আব্‌দার ধরিয়া,—তাঁহার দ্বারা শাশুড়ীর অনুমতি আদায় করিয়া লইয়াছে,—এখন সঙ্কল্প সিদ্ধির পথে ছেলে দুইটিকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়াছে, সঙ্গে গাড়ী পাল্‌কীর হাঙ্গাম নাই,—শুধু সতর্কতার বিনাশ নাই বলিয়া, দুইজন দ্বারবানকে আনা হইয়াছে। তাহারা বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে।

মায়া অবাক হইয়া, তাহাদের উৎসাহ প্রখর আনন্দ চঞ্চল প্রফুল্ল সুন্দর মুখগুলির শোভা দেখিতে লাগিল,—সংসার-জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়াও ঐ বৃদ্ধা ঠান্‌দিদির কি সরল স্নেহ কোমলতা ! তিনিও এই অল্প বয়স্কের দলে মিশিয়া ইহাদের আমোদ-প্রিয়তা চরিতার্থ করিবার জন্য কৌতুক উদ্যমে যোগদান করিতে দ্বিধা করেন নাই ? আশ্চর্য্য ব্যাপার !—ইহাকেই বুঝি বলে, পরার্থে আত্ম নিয়োগ !

মালতীদেবী প্রসন্ন-স্মিত বদনে বলিলেন, "বৌ ঠাকুরুণ, ভেবো না, নন্দকে পাঠিয়ে চুপি চুপি মন্মথবাবুর মত আনিয়েছি,………"

মাতার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে নন্দলাল সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ মামিমা, মন্মথবাবু ব'লে দিয়েছেন, চব্বিশ ঘণ্টা একলাটি বাড়ীতে থেকে মন খারাপ হয়ে যায়, ঠানদিদি অনুগ্রহ করে বেড়াতে নিয়ে যাবেন এ ত খুব আনন্দের কথা,……খোকাকে ঝিয়ের কাছে রেখে তোমার মামিমাকে যেতে বোলো………"

এত লোকের সমক্ষে স্বামীর এই সময় সহানুভূতিপূর্ণ আগ্রহ মায়াকে বাহিরে লজ্জিত করিল,—অন্তরে পীড়া দিল। "চাদর নিয়ে আসি"—বলিয়া মায়া তাড়াতাড়ি ঘরে চলিয়া গেল।

দোল্‌নায় শিশু ঘুমাইতেছিল, সন্তর্পণে তাহাকে চুম্বন করিয়া বিষণ্ণ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মায়া চাদর গায়ে জড়াইয়া বাহিরে আসিল, ঠাকুরকে যথাকর্ত্তব্য উপদেশ দিয়া, ঝিকে খোকার জন্য বারম্বার সতর্ক করিয়া—সঙ্গিনীদের সহিত মিলিত হইয়া, মায়া বেড়াইতে চলিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

সকলে উৎসাহিত পাদক্ষেপে চলিতে আরম্ভ করিল,—অদূরে আর একটি বাটী হইতে একজন প্রতিবেশিনী রমণীকে ডাকিয়া লওয়া হইল,—রমণী তাহার বালিকা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন, যাত্রীদল বেশ পুষ্ট হইল।

বালক বালিকা তিনটি সকলের আগে চলিল তারপর বধূদ্বয়, তারপর মায়া মালতীদেবী ও বর্ষিয়সী প্রতিবেশিনী মহাশয়া এবং ঠানদিদি।—দ্বারবান দুইজন লাঠি কক্ষতলে চাপিয়া, করতলে 'খৈনী' মর্দ্দন করিতে করিতে, দূরে থাকিয়া 'মাইজী লোক্‌কা' চরণগতির সহিত তাল রাখিয়া অলস-মন্থর চরণে চলিল।

সদর রাস্তা দিয়া চলিলে পাছে পরিচিত কাহারও চোখে পড়িতে হয় বলিয়া, সকলে গলিপথ ধরিয়া গন্তব্য স্থানোদ্দেশে চলিল, তারপর গলিপথ অতিক্রম করিয়া তাহারা নির্জ্জন মাঠের পথে পড়িল,—গ্রীষ্মাতিশয্যে ক্লিষ্ট রমণীগণ এবার মুখের ঢাকা খুলিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন,—অনেকগুলি নীরব রসনা এবার মুক্ত-সঙ্কোচে সরবে ঝঙ্কৃত হইতে আরম্ভ করিল।

বধূদ্বয় অস্ফুট স্বরে কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছিল, প্রতিবেশিনী মহাশয়া পাড়ার অন্য কোন ধনীগৃহিনীর অ-প্রীতিকর ব্যবহার উল্লেখে, মহা উদ্যমে চর্চ্চা আলোচনা স্রোতে রসনা খুলিয়া দিয়া বৃদ্ধা ঠানদিদির ও মালতীদেবীর কান ও মন অধিকার করিয়া লইলেন,—মায়া অন্যমনস্ক ভাবে জ্যোৎস্না উজ্জ্বল প্রান্তরের সুদূর বিস্তৃত শোভা, এবং অনন্ত উন্মুক্ত আকাশের আনন্দ মোহনরূপ, বিস্ময় স্তব্ধ নয়নে দেখিতে দেখিতে চলিল, তাহার মনে হইল—অসীম ঔদ্যার্য্যের জীবন্ত মূর্ত্তি যেন আজ এইখানে পরিস্ফুট দেখিতেছে! চারিদিকেই মুক্তির আনন্দ!

মাঠের সঙ্কীর্ণ 'আল' পথে চলিতে চলিতে, বৃদ্ধা ঠানদিদি সামান্য একটা 'হুঁছট্' খাইলেন, অগ্রগামী নন্দলাল সবিদ্রূপে বলিল "দেখো ঠানদি, এমন সখের শোভাযাত্রা যেন খুন জখম বাধিয়ে মাটী কোরো না!—"

সকলে হাসিল। ঠানদিদি নিজের পদস্খলনের ত্রুটি নন্দলালের মাতার স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া বলিলেন "তোর মা, তোর মামীদের নিয়ে যে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত ছুটেছে,—আমি বুড়ো মানুষ হোঁচোট্ খাব না কেন বল?"

নন্দলালের মাতা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "চল্‌তে যখন হবে ঠান্‌দি, তখন ঘোড়দৌড়ের ছুট্‌টাই ভাল,—"

নন্দলাল তাড়াতাড়ি পিছাইয়া আসিয়া বলিল "ভাল ঠান্‌দি মায়েরা এগিয়ে যাক, আমি তোমার ডাইনে যুড়ি হয়ে, মামাবাবুর ঘোড়ার মত দুল্‌কী চালে যাচ্ছি চল,—আর তোমায় হোঁচোট্ খেতে দেব না!"

মামীরা খুব হাসিতে লাগিলেন, মাতাও হাসি চাপিতে পারিলেন না,—কৃত্রিম বিরক্তির সহিত পুত্রের স্কন্ধে মৃদু চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, "যা যা এগিয়ে যা, ঠানদিদির সঙ্গে বাক্‌চাতুরী কর্‌তে লজ্জা হয় না!—"

নন্দলাল অগ্রসর হইল, হাস্য পরিহাসের মাত্রা ক্রমশঃ চড়িয়া উঠিল, স্থান ও কাল মাহাত্ম্যে স্ফূর্ত্তির মুক্ত উচ্ছ্বাসে সকলের মনই যেন কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল,—সঙ্কোচের এত বড় মুক্তির মাঝে, জ্যোৎস্নার এমন মুগ্ধ মহান সৌন্দর্য্য,—অজ্ঞাতে সকলের হৃদয়, চঞ্চল-আনন্দে মাতাইয়া তুলিয়াছিল, অল্প বয়স্কগণের কেহই লঘু চাপল্য প্রকাশে নিরস্ত হইতে পারিল না।

নীরব রহিল শুধু মায়া।—আশ্চর্য্য স্তম্ভিত সুরে তাহার কানে ক্রমাগতই বালক নন্দলালের সেই বিদ্রূপ ধ্বনিত হইতে লাগিল……"সখের শোভাযাত্রা যেন খুন জখমে না মাটী হয়!—"

মায়ার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ আতঙ্কে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল! হায়, বিশ্বজীবনের পথে, এমনই সুন্দর জ্যোৎস্না ভরা শান্তির আলোকে,—তরুণ উৎসাহ ভরা হৃদয়ের বড় আনন্দের শোভাযাত্রার মাঝে, সেও না অমনি অতর্কিতে একটা দৃপ্ত-প্রচণ্ড হুঁচট্ খাইয়া,—উৎসাহ প্রোজ্জ্বল শোভাযাত্রাকে—নীরব ভীষণতায়, তীব্র বেদনার রক্তে অনুরঞ্জিত করিয়া ফেলিয়াছে! মুক্ত-স্বচ্ছল, যাত্রার প্রাণশক্তি, আড়ষ্ট যন্ত্রণাময় করিয়া তুলিয়াছে!……… হাঁ হাঁ, সেত তাহার-ই জীবনের জ্বলন্ত সত্য ব্যাপার!……আজ এই মুক্ত উদারতার বক্ষে দাঁড়াইয়া, দৃষ্টিগ্রাহ্য বিরাট বাস্তবের দিকে তাকাইয়া,—সে কি অকপট প্রাণে বলিতে পারে, 'না গো সে কিছুই নয়, শুধু কাল্পনিক স্বপ্ন মাত্র!'—না অসম্ভব, অত বড় মিথ্যা উচ্চরণ করা অসম্ভব!—ভয়ের তাড়নায় সে যাত্রার পথে প্রাণপণে স্বাচ্ছন্দ্য বেগে ছুটিয়াছে বটে,—কিন্তু সে স্বচ্ছন্দতা সহজ নহে, স্বাভাবিক নহে, তাহার প্রাণশক্তি গোপন আঘাতে খঞ্জ হইয়া আছে!—আজিও সে আঘাতের বেদনা, তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিয়া আছে, মজ্জায় মজ্জায় জাগিয়া আছে,—তাহাকে অস্বীকার করিবার যো' কি?

মায়ার হৃদয়াভ্যন্তরে আকুল বিহ্বলতা হায় হায় করিয়া উঠিল,—ওগো অকপট নির্ভীকতার সকল দিকে চাহিয়া—সত্যকে খুঁজিয়া বুঝিয়া দেখিতে তাহার সাহস হয় না, শক্তি হয় না,—নির্ম্মম বেদনায় তাহার বুক ভাঙ্গিয়া পড়ে! হায় হতভাগ্য অধম!……অমন উদার মহিমাময় স্বামী তাহার মাথার উপর—এমন প্রফুল্ল আনন্দময় শিশু তাহার বুকের মাঝে.—তবুও ধিক্!……কবে কোথায় পায়ের নীচে একটা কাঁটা ফুটিয়াছিল, তাহার বেদনা সে,—এত সুখ সৌভাগ্যের মধ্যেও ভুলিতে পারিতেছে না? ইহাকে কি বলিবে? আত্মপরায়ণতা নহে কি? হাঁ একরূপ তাহা বৈ কি? সকলের মুখ চাহিয়া আপনাকে একেবারে ভুলিয়া যাইবে—ইহাই তাহার একান্ত আকিঞ্চন,—কিন্তু অপরাধ-সন্তপ্ত আত্মা,—নিজের দৈন্য যে কিছুতে ভুলিতে চাহে না, একি নিদারুণ অভিশাপ! ঐ অগ্র পশ্চাতের সহযাত্রিদলের সুস্থ সহজ হৃদয়ানন্দ ধারা,—চিত্তোচ্ছ্বাস সংঘর্ষ, তাই তাহার চিত্তকে কুণ্ঠিত করিয়া তুলিতেছে,—হৃদয়কে স্পর্শ করিতে অক্ষম হইতেছে!

শ্রদ্ধার আধার স্বামীর পায়ের নীচে মাথা লুটাইয়া—হৃদয়ের অমূল্য মাণিক বড় আদরের ধন পুত্রের মুখে, স্নেহোন্মাদ চুমা খাইয়া সে ত প্রত্যেক নিমেষে আপনাক হারাইয়া ফেলে,—প্রত্যেক মুহূর্ত্তে বিভোর আনন্দে স্বর্গলাভ করে!—কিন্তু হায়, সে স্বর্গে তাহার অকুণ্ঠিত গৌরবের শান্তি কৈ?……অতীতের স্মৃতি যে তাহার বুকের মাঝে ক্রুদ্ধ কালসর্পের মত বিষদন্ত ফুটাইয়া জড় নিশ্চল ভাবে বসিয়াছে, প্রতিকূল ঘটনার এতটুকু ইঙ্গিত এতটুকু নিঃশ্বাস স্পর্শ বাজিলেই যে সে আজিও ক্ষিপ্ত-আক্রোশে গর্জ্জিয়া উঠিতে চায়, হায় দুর্ভাগ্য! নিবৃত্তির সাধনতীর্থে বাস করিয়াও, অভিশপ্ত সাধক প্রাণপণ আকিঞ্চনে ও দুষ্কৃতি পীড়ন হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছে না!

মায়া সজোরে নিঃশ্বাস ফেলিল। তাহার নিঃশ্বাস-শব্দ-অগ্রবর্ত্তিনী মালতী দেবীর কানে পৌঁছিল কিনা ঠিক বলা যায় না,—তিনি সেই সময় মুখ ফিরাইয়া মায়ার পানে তাকাইলেন, বলিলেন "বৌঠান্ এবার আমাদের ছেড়ে কিছুদিনের মত তা হ'লে ভাইদের বাড়ী চল্লে?"

বিস্ময় উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি তুলিয়া মায়া বলিল "ভাইদের বাড়ী কোথা?

"বোম্বায়ে মন্মথ বাবুর সঙ্গে যাচ্ছ ত?"

"ওঃ—কিন্তু আমার যাওয়ার ঠিক নাই ....আপনি এর মধ্যে কার কাছে শুন্‌লেন ?

"বাবা সন্ধ্যাবেলা জল খেতে এসে গল্প কর্‌ছিলেন, মঠের গদি নিয়ে বিরোধ মামলা বেধেছে, বল্লেন শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়াবে", বাবার সঙ্গে মন্মথ বাবু যাবেন শুনেছ বোধ হয় তাই বলছিলেন মন্মথ বৌমাকে নিয়ে যাবে,—সেখানে বৌমার আত্মীয়েরা কে সব আছে—"

"অস্ফুট ক্ষীণ ভাবে উত্তর দিয়া মায়া সজোরে দন্তে রসনা চাপিয়া ধরিল, কে জান অসতর্ক উচ্ছ্বাসে কোন্ মুহূর্ত্তে রসনায় কোন্ ভয়াবহ বাণী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিবে, কে বলিতে পারে ? আপনাকে বিশ্বাস করিতে প্রশ্রয় ভরসা হয় না।

সকলে বাগানের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিলেন, দ্বারবানদের ডাঁকাডাকিতে বাগানের খোট্টা মালী আসিয়া বেড়ার ফটক খুলিয়া দিল.—সকলে বাগানে ঢুকিলেন।

ষাট বিঘা জমি জুড়িয়া প্রকাণ্ড উদ্যানক্ষেত্র ; অল্পদিন পূর্ব্বে ইহা একজন কৃষি-ব্যবসায়ীর নিকট কেনা হইয়াছে,—এখনও ইহাকে রীতিমত উদ্যানে পরিণত করা হয় নাই,—পূর্ব্বাধিকারীর ব্যবসায় বুদ্ধির পরিচয়-সাক্ষ্য স্বরূপ এখন বাগানের চতুর্দ্দিকে বেড়ার গায়ে অড়হর শুঁটির শুষ্ক লতা নির্লিপ্ত ভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে, স্থানে স্থানে কয় বিঘা জমিতে এখনও পলতা লতা ও নানা জাতীয় শাকসব্জি বিরাজ করিতেছে, মাঝে মাঝে কলা ঝাড় ও আম জাম আতা পেয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ কতকগুলা আছে,—পশ্চিমে ছোট একটি ফুল বাগান ও একটা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ চাঁপা ফুলের গাছ,—বাকী সমস্ত জমি সদ্যঃ লাঙ্গল কর্ষিত অবস্থায়, বড় বড় ঢেলা ও উচ্চ নীচ গর্ত্ত বিশিষ্ট কর্কশ-অসমতল হইয়া রহিয়াছে।

ছেলেরা বাগানে ঢুকিয়া ফুল বাগানে 'চড়াও' করিল, ঠান্‌দিদি দ্বারবানদের লইয়া সব্জি-বাগানে গ্রহণ যোগ্য সামগ্রীর তত্ত্বাবধানে মনোযোগ দিলেন, বধূদ্বয় বাকী সকলকে লইয়া, কলমের গাছে কাঁচা আমের সন্ধানে ঘুরিতে লাগিল, মায়া তাহদের পিছু পিছু খানিকটা গেল,—তারপর নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিয়া ফুলবাগানের পাশে 'আলের' মাথায় দাঁড়াইয়া, লুব্ধ-চঞ্চল বালক বালিকা তিনটির পুষ্প সংগ্রহের উল্লাস-উৎসব দেখিতে লাগিল।

ফুলবাগানের সম্পদ বেশী ছিল না, সুতরাং লুণ্ঠনকারীগণ অল্পক্ষণেই নিরস্ত হইতে বাধ্য হইল। কিন্তু উদ্যমশীল নন্দলাল সহজে সন্তুষ্ট হইবার পাত্র নহে,—সে সঙ্গীগণের ভয়, বিস্ময়, ও নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া মালকোঁচা মারিয়া চাঁপাফুলের গাছে উঠিয়া, নির্ব্বিচারে কতকগুলা অস্ফুট প্রস্ফুট পুষ্প ছিঁড়িয়া নীচে নামিয়া আসিয়া, সঙ্গীদের সহিত ভাগ করিয়া লইতে বসিল।

ভাগ শেষ হইল, নিজের ভাগ হইতে দুইটি ফুটন্ত ফুল তুলিয়া লইয়া নন্দলাল মায়ার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—বলিল "মামিমা, আপনি এই দুটো নিন্"

ম্লানভাবে হাসিয়া মায়া বলিল "আমি ফুল নিয়ে কি কর্‌ব বাবা ?"

বালক অনুরোধ-মিশ্রিত জেদের সহিত বলিল "নিন্ না,—আমরা ত সবাই নিয়েছি।"

ইহার উপর তর্ক চলিতে পারে না,—তাহারা সকলেই ফুল লইয়াছে, মায়াকেও লইতে হবে! সে গ্রহণের উদ্দেশ্য—হউক খেলা-করা, হউক নষ্ট-করা, হউক আমোদ-করা বা হউক অন্য আর কিছু !........মায়া আর আপত্তি করিল না, নীরবে হাত পাতিয়া ফুল লইল।

ছেলেরা অগ্রসর হইয়া 'পলতা' ক্ষেত্রে ঢুকিল,—মায়া উদ্দেশ্য-হীন গমনে তাহাদের পিছু পিছু গিয়া, 'পলতা-ক্ষেত্রের' পাশে পাশে লাঙ্গল-কর্ষিত উগ্র-বন্ধুর ভূমির উপর অন্যমনস্ক ভাবে বিচরণ করিতে লাগিল।

সহসা একখানা বড় মেঘ আসিয়া চন্দ্রদেবকে ঢাকিয়া ফেলিল, জ্যোৎস্না ডুবিল—ভূমিলগ্ন লতান্তরালবর্ত্তী ফল খুঁজিয়া পাওয়া, এই জ্যোৎস্নাহীন ম্লান আলোকে অসম্ভব দেখিয়া,—নন্দলাল ছুটিয়া গিয়া মালীর ঘর হইতে রেড়ির তৈলের ক্ষুদ্র কাঁচাবরণ যুক্ত একটি ক্ষীণ-আলোক লইয়া আসিল, তারপর মহা উৎসাহে সকলে 'পটল' অন্বেষণে ব্যস্ত হইল।

চলিতে চলিতে মায়া একদিকে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িল,—পিছনের সঙ্গীরা যে কতদূরে রহিয়াছে, তাহা চাহিয়া দেখিল না,—তন্ময় অনামনস্কতার মাঝে হঠাৎ কিসের চমক খাইয়া, সে সচেতন হইল. স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, সম্মুখে কোন স্থান হইতে,—মৃদু-মনোহর অতি সুমিষ্ট সুরে, কুলু-কুলু ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইতেছে!

পরক্ষণে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, তাহার সম্মুখে, ঠিক পায়ের নীচে,—প্রশস্ত সমতল পথ! মায়া স্তম্ভিত হইয়া গেল! এ কোন স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে! চারিদিকে চাহিল, ম্লান-জ্যোৎস্নালোকে দেখিল অতি নিকটেই উদ্যান প্রান্তের বেড়া! বুঝিল, আপন মনে চলিতে চলিতে সে উদ্যানের অন্যতম প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছে!—এ পথ নির্গম পথ!

দুরন্ত—অজ্ঞাত স্রোত-প্রবাহের কলধ্বনিতে আবার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল,—মায়ার মনে হইল, সে যেন কোন অচেনা আনন্দের ব্যগ্র বিনয়-ভরা অধীর-আহ্বান! তাহার বিস্ময়-বেগ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিল,—ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল, দেখিল সম্মুখের নির্গম পথটি বেড়ার অবকাশমুক্ত হইয়া বাহিরে,—কোন অলক্ষ্য স্থানে চলিয়া গিয়াছে!

কৌতূহলী মায়ার ইচ্ছা হইল,—এই পথ ধরিয়া, ঐ আগ্রহান্বিত আহ্বানের উদ্দেশে সে মুক্ত-আনন্দে ছুটিয়া যায়!—কিন্তু ক্ষণপরে মনে পড়িল, সে একাকিনী, স্ত্রীলোক,—তাহাতে রাত্রিকাল, তাহার উপর দারুণ—নির্জ্জনতা!...............

ভয়ের নামই বুঝি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভয়ানক! মুহূর্ত্তে তীক্ষ্ণ ভীতি-শিহরণে মায়ার আপাদ-মস্তক কাঁপিয়া উঠিল! পিছনে সঙ্গীদের দিকে চাহিতে গিয়া,—অসাবধানে টলিয়া একটা গর্ত্তের মধ্যে পা পড়িল, মায়া ঢিল-ভাঙ্গা জমির উপর বসিয়া পড়িল, শঙ্কা ব্যাকুল নয়নে ইতস্ততঃ চাহিল,—দূরে—অনেক দূরে পলতা ক্ষেত্রে বিচরণশীল বালকদের হাতের ক্ষীণ আলোকরশ্মি দৃষ্টিগোচর হইল!—দ্রুত-কম্পিত হৃদ্‌পিণ্ড আশ্বাসের নিঃশ্বাস স্পর্শে কিছু স্বস্তি পাইল।—সামলাইয়া মায়া ফিরিবার জন্য উঠিল,—নিজের অকারণ উদ্বেগভীতির কথা স্মরণ করিয়া নিজেই হাসিল!.........না, গাছপালার অঙ্কে অদৃশ্য ভাবে বিরাজমান অশরীরি উপদেবতাগণের অস্তিত্বে যত বড় বিশ্বস্ত প্রমাণ থাক,—তাঁহাদিগকে বিশ্বাসের সহিত মানিতে হইবে বলিয়া যে ভয় করিয়াও চলিতে হইবে, এমন ত কোন কথা নাই!—কিন্তু মাটীর বুকে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ভাবে সশরীরে যে দেবতাগণ বাস করেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও সংস্রব সতর্ক-সম্মানে, সভয়ে দূরে পরিহার করিয়া চলা অবশ্য কর্ত্তব্য বটে!—মায়া উঠিয়া অগ্রসর হইল।

চিন্তামগ্না মায়া ঢিল-ভাঙ্গা জমির উপর দিয়া প্রথম বারে যখন আসিয়াছিল, তখন ভ্রমণের কষ্ট বুঝিতে পারে নাই, ফিরিবার পথে, মানসিক উদ্বেগ-চাঞ্চল্যের জন্যই হউক, অথবা ব্যস্ত দ্রুত গমনের জন্যই হউক,—পথের অসমতল কর্কশতা তীব্র রূপে হৃদয়ঙ্গম করিল!—তখনও চন্দ্র মেঘাচ্ছন্ন; অস্পষ্ট অন্ধকারে চলিতে চলিতে, সহসা একটা নিম্নাভিমুখী বৃক্ষশাখার দৃঢ় অংশে সজোরে মস্তক আহত হইল,—চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া মায়া নিঃশব্দে বসিয়া পড়িল,—ক্ষণপরে আবার উঠিয়া দাঁড়াইল কিন্তু সম্মুখের ক্ষীণ আলোক আর দেখিতে পাইল না,—ভীত হইয়া;

চারিদিক চাহিল, না কোথাও আলোক নাই,—কোথাও কাহারও কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না! বিস্তৃত বাগানের মধ্যে কে কোথায় কত দূরে কোন গাছপালার আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে, অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না! মায়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল,—বড় ভয় করিতে লাগিল।

অবসন্ন—স্খলিত চরণে অগ্রসর হইল, এক দুই তিন পদ,—হাঁ—আঃ বাঁচা গেল, ঐ যে আলোকরশ্মি! সম্মুখে একঝাড় কলা গাছ আড়াল পড়ায় এতক্ষণ উহা দেখা যাইতেছিল না, যাক্ খুব কাছাকাছি আসিয়া পড়া গিয়াছে।

ক্লান্ত মায়া এবার খুব জোরে একটা তীব্র স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিকটবর্ত্তী 'আলের' মাথায় ভাল করিয়া বসিল, মাথার সদ্যঃ আহত স্থানটা তখন ও ঝন্ ঝন্ করিতেছিল, কিন্তু মায়া সেদিকে লক্ষ্য রাখিল না,—স্তব্ধ বিস্ফারিত নয়নে সে মেঘান্তরাল অন্তর্হিত চন্দ্রদেবের অস্পষ্ট-ম্লান মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল।

অনেক দিন আগের—অতীতের একটা ঘটনা-স্মৃতি মনে পড়িল, তাহার বিবাহের পূর্ব্ব দিনের কথা! অতি ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, অনাড়ম্বরে—একটি অত্যন্ত সহজ সামান্য ব্যাপার,—কিন্তু তাহার অভ্যন্তরে মায়া,—শুধু মায়া দেখিয়াছিল, কি নীরব গাম্ভীর্য্যে, কি মহান্ মহত্ত্ব-সুন্দর গৌরব প্রতিষ্ঠিত আছে !..... মায়ার ভাবী পতির প্রত্যুদ্গমন উৎসবে নিরঞ্জনের সেই প্রশান্ত সুন্দর আচরণ! সে কাজ অন্যের পক্ষে খুব তুচ্ছ; নগণ্য ব্যাপার,—কিন্তু মায়া কি জানে না,—সে কাজ সম্পাদন করিতে কি নির্দ্দয় নিষ্ঠুরতায় নিরঞ্জনকে নিজের বুক বাঁধিতে হইয়াছিল!.........ওগো গোপন মর্ম্মবেদনার অশ্রু গোপনে মুছিয়া, আপনার জন্য আত্মত্যাগ করা সহজ,—কিন্তু নিষ্ঠা-সংযত হৃদয়ে, নির্ভীক অবজ্ঞায় আপনার দুঃখ পায়ের নীচে দলিয়া, শান্ত বিজয়ের হাসি হাসিয়া পরের মঙ্গলের জন্য যে আত্মজয়,—তাহার মূল্য,—না না, তাহার মূল্য জগতে নাই?—কে জানে জগতের মানুষ, কোন্ দৃষ্টিতে কাহাকে দেখে, কোন যুক্তিতে কাহার কার্য্য সমর্থন করে, কোন তর্কে কাহার কার্য্যে প্রতিবাদ করে,—মায়া তাহার হিসাব নিকাশ জানিতে চাহে না, শুনিতে ইচ্ছা করে না,—কিন্তু নিজের জন্য যাহা অনুভব করিবার,—তাহা সে করিয়া লইয়া লইয়াছে, তাহার উপর জগতের কোন যুক্তির কোন তর্কের নাই,—ইহা স্থির-নিশ্চয়!—ওগো কেহ জানে না, কিন্তু মায়া জানে, সেই ধীর তেজস্বীতায় সৌম্য, স্নিগ্ধ নিষ্ঠা-গরিমা,—কতখানি জ্বলন্ত অক্ষরে, মায়ার জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ অঙ্কে, চির অঙ্কিত হইয়া আছে! মায়ার ক্ষোভাকুল—অবসন্ন হৃদয়কে, সেই দৃপ্ত সুন্দর স্মৃতি কি পুণ্যময় শক্তি চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া, কি বলিষ্ঠ প্রেরণায় দৃঢ়-সংহত করিয়া, স্থির অঙ্গুলি নির্দ্দেশে জীবনের কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিয়াছে!—যে ব্যর্থ বেদনা, তীব্র নিষ্পেষণে তাহার বুক ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, তাহাই যে, সার্থক-সান্ত্বনার স্বস্তি-আশীর্ব্বাদ অঞ্জলি ভরিয়া তাহার মাথায় ঢালিয়া দিয়াছে? .....তবে আজিও সে কাতর? সে কাতরতা যে তাহার নিজের দৌর্ব্বল্য সৃষ্ট দৈন্য অক্ষমতা! তাহার জন্য কেহই অপরাধী নহে, অপরাধী, তাহার নিভৃত অন্তরের—সেই নীরব ক্ষোভে নিষ্ফল-আক্রোশে, ক্ষিপ্ত অণু পরমাণুগুলা!—মায়া যে এ গুলার সহিত সারিয়া ও পারিয়া উঠিতেছে না!—

মায়া উঠিয়া অগ্রসর হইল, যাক,—বন্ধুর, কর্কশ, কঠিন, পথ অতিক্রম করিয়া যখন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে গমন করিতে হইবে-ই,—তখন আকাশের ঐ মেঘাবৃত উজ্জ্বল চন্দ্রালোকের জন্য আক্ষেপ করিয়া লাভ কি?—দৈবা-বশে প্রাপ্ত, সম্মুখের ঐ ক্ষীণালোকটির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হওয়া-ই একান্ত কর্ত্তব্য নয় কি? হাঁ,—নিশ্চয় তাই!—

সহসা ব্যাকুলকণ্ঠে মায়া ডাকিয়া বলিল "বাবা নন্দলাল," হেঁট হইয়া ফল সংগ্রহে ব্যস্ত নন্দলাল মুখ তুলিয়া উত্তর দিল "কেন মামি মা—"

নিকটস্থা হইয়া ব্যগ্র মিনতির স্বরে মায়া বলিল "এবার বাড়ী চল, বাবা,—আমার খোকা হয়ত উঠে কাঁদবে—"

"চলুন না,—আমাদের ত সব হয়ে গেছে,"—বলিয়া নন্দলাল পুনশ্চ হেঁট হইয়া আলোক ধরিয়া লতাপাতা উল্টাইয়া শেষ বারের মত ফলান্বেষণে মনোযোগী হইল। মায়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, সময়োপযোগী কোন-কিছু একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার চেষ্টায় বলিল,—"কতগুলো পটল পেলে বাবা?"

নন্দলাল বলিল "বেশী নয় মামি মা, পটলই নেই, তা পাব কোথা, শেষা-আবাদে চারা 'আজান' হয়েছিল, ফসল ত এবার ভাল হবে না, দেখুন না, এতক্ষণে উট্‌কে মোটে 'গোটা আষ্টেক' পেয়েছি!—ধর ত মামা আলোটা, এই ঝাড়টা একবার দেখে নি—"

মাতুলের হাতে আলোক দিয়া নন্দলাল আবার অনুসন্ধানতৎপর হইল। মাতুল আলো দেখাইতে দেখাইতে সাগ্রহে বলিল "ঐ একটা—ঐ একটা—"

নন্দলাল পাতা উল্টাইয়া নির্দ্দিষ্ট বস্তুটা দেখিল, অবজ্ঞার স্বরে বলিল, "ওঃ, নেহাৎ ছোট!—"

মায়া অন্য একটা স্থান দেখাইয়া বলিল "এখানে কি একটা রয়েছে দেখ দেখি,—"

আলোক লইয়া বালকদ্বয় সেই স্থানে ঝুঁকিয়া পড়িল,—নন্দলাল হাসিয়া বলিল, "ওটা ফুল মামিমা—"

মায়া উৎসুক হইয়া বলিল "ফুল, পটলের ফুল!—দেখি দেখি কেমন দেখ্‌তে?—"

সবিস্ময়ে নন্দলাল বলিল "আপনি পটলের ফুল কখনো দেখেন নি নাকি?—দেখুন না,—ঐ যে"

পুষ্পের উপর যথাসম্ভব আলোক-রশ্মি নিপতিত হইল, হঠাৎ মায়া দ্বিধাহীন আগ্রহে বলিয়া উঠিল, "ফুলটা ছিঁড়ে দাও না, বাবা, ভাল করে দেখি, একটা নষ্ট হলে কি এসে যাবে?—"

সজোরে ঘাড় নাড়িয়া নন্দলাল বলিল "কিচ্ছু না"

বালক একটানে ক্ষীণবৃন্ত পুষ্পটিকে জীবনাশ্রয়-স্থানচ্যুত করিয়া মায়ার হাতে তুলিয়া দিল,—মায়া দেখিল, হরিদ্রাবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুণ্ড শোভিত কতকগুলি শীর্ণ-দীর্ঘ শৃঙ্গের চতুষ্পার্শ্বে, গুটি কয়েক ক্ষীণ ক্ষুদ্র,—অনাড়ম্বর শুভ্র পাপ্‌ড়ী!—তাহাই বৃন্ত-সংলগ্ন হইয়া, পল্‌তা গাছের 'ফুল' আখ্যা লাভ করিয়াছে!

মায়া কিছু বলিল না, পূর্ব্ব লব্ধ ফুল দুইটির সহিত মিশাইয়া যত্ন-সংগৃহীত পুষ্পটিকে ভাল করিয়া মুঠার পুরিল।

সকলে ফিরিল, কিছু দূরে তৃণাচ্ছাদিত ভূমির উপর মেয়েরা সকলে বসিয়াছিলেন, মায়াকে দেখিয়া—বধূদ্বয়ের একজন বলিল "আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? আমরা কত মজা করছি, কাঁচা আম টাম খেলুম,—তারপর খুকিকে ধরে এতক্ষণ গান গাওয়াচ্ছি! আপনি শুনলেন না!—" খুকি—অর্থাৎ প্রতিবেশিনী কন্যা।

মৃদু হাস্যে মায়া বলিল, "তাই ত ঠকে গেছি তা হলে!"

নন্দলাল বলিল "মা ওঠো,—এবার বাড়ী ফিরে চল"

মাতা বলিলেন, সে কি শ্মশানের মহাদেব দর্শন করিয়ে নিয়ে যাবি বলেছিস্, এর মধ্যে বাড়ী ফেরা কি?"

মায়ার দিকে চাহিয়া নন্দলাল বলিল "মামিমার খোকা কাঁদবে ব'লে, ব্যস্ত হচ্ছেন যে!—"

কুণ্ঠিত-প্রতিবাদের স্বরে মায়া বলিল "না না,—তা ব'লে ঠাকুর-প্রণাম না করে কি বাড়ী ফেরা হয়?......... চলুন না আপনারা, কত আর দেরী হবে?......মন্দির কত দূরে?"

অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নন্দলাল বলিল "এই বাগানের পাশে যমুনার ওপর শ্মশানের ধারে মন্দির,—বেশী দূর নয়!"

"যমুনা!—" বিস্ময়-চকিত নয়নে মায়া নন্দলালের মুখ পানে তাকাইল! বুঝিল ঐ দিকে গিয়া অনতিকাল পূর্ব্বে সে যে স্রোতধ্বনি শুনিয়াছিল, তাহা যমুনার-ই! কোন কথা কহিতে পারিল না,—দূরে চাহিয়া কি যেন দেখিতে লাগিল।

নন্দলালের মাতা আসিয়া মায়ার পিঠ চাপড়াইয়া সহাস্যে বলিলেন, "ছেলের মায়েদের ছেলে ছেড়ে কোথাও গিয়ে একদণ্ড স্বস্তি নাই, না ভাই?—"

মায়া ক্ষীণভাবে হাসিল; নন্দলাল সকলকে লইয়া দেবদর্শন করাইতে অগ্রসর হইল,—মায়া আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, এ সেই পথ, যে পথে—সে ইচ্ছা সত্বেও অগ্রসর হইতে গিয়া আপনার অবস্থা ভাবিয়া ভীত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল!

সকলে উদ্যান পার হইলেন, মেঘ মুক্ত চন্দ্রদেব উজ্জ্বল শোভায় হাসিয়া উঠিলেন,—পরিষ্কার জ্যোৎস্নালোকে অদূরবর্ত্তী শ্মশান ভূমির দৃশ্য পরিস্ফুট রূপে দেখা গেল, মহিলাগণ সকলেই অন্তর মধ্যে কিছু ভাব বৈলক্ষণ্যে অস্ফুট চাঞ্চল্য অনুভব করিলেন ঠানদিদি সন্ত্রস্ত ভাবে বলিলেন "দেখিস্ বাছা...... সবাই সাবধানে চ'—"

এরূপ স্থলে অসাবধানতা প্রকাশের দুঃসাহস কাহারও ছিল না,—সকলেই সতর্ক ভাবে চলিল, সম্মুখেই সদ্যঃ সংস্কৃত শুভ্র সুন্দর দেবালয়, দেবালয়ের পার্শ্বদেশ ধৌত করিয়া নিদাঘ-শোষণে শীর্ণ কলেবরা যমুনা-প্রবাহিত হইতেছে,—চারিদিকে কোথাও মনুষ্য-বসতির চিহ্ন নাই,—চারিদিকে মৌন-নিস্তব্ধতা উগ্র-গাম্ভীর্য্যে বিরাজ করিতেছে।

মায়া সকলের পিছনে থাকিয়া, নির্ব্বাক বিস্ফারিত নয়নে, জ্যোৎস্না উদ্ভাসিত নীরব নির্জ্জন শ্মশান ক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া চলিল, সঙ্গিনীগণের অস্ফুট ভীতি গুঞ্জন তাহার কানে ভাল লাগিল না,.........আশ্চর্য্য ব্যাপার, এমন চরম নির্ভয়ের অঙ্কে দৃষ্টি ফিরাইয়া তাকাইতেও মানুষের প্রাণ আতঙ্কে শিহরিতে চায়!—মানব জীবনের সকল দ্বন্দ্ব সমস্যার নির্ভুল মীমাংসা সমাপ্তি স্থান ত ইহাই! ভ্রান্ত মানব, তবু ইহাকে ভয়ানক বলিয়া মনে করিতে চায়!—

না না,—মায়াও অবশ্য নির্ব্বিকার নহে, ইহাকে দেখিয়া তাহার মনেও নানা ভাবের উদয় হইয়াছে, কিন্তু তাহা ভয় নহে!—ইহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তাহার হাসিতে ইচ্ছা হইতেছে না বটে, কিন্তু কাঁদিতেও ইচ্ছা হইতেছে না,—তাহার ইচ্ছা হইতেছে, এই নিস্তব্ধ-গম্ভীর মুক্ত সুন্দর জ্যোৎস্না নিশীথে, অকুণ্ঠিত প্রাণে—নিজের জীবনের দিক হইতে ইহার পানে তাকাইয়া,—সশ্রদ্ধ চিত্তে নতশিরে,—এই মহা সমাপ্তির সম্মিলন ক্ষেত্রকে অভিবাদন করিতে!.........

শিবালয়ের মন্দির সম্মুখে সুদৃঢ় স্তম্ভের উপর সুদৃশ্য খিলানযুক্ত ছাদে ঢাকা,—সুদীর্ঘ অলিন্দ; মসৃণ মর্ম্মর প্রস্তরে রচিত অলিন্দে পা দিয়া, এতক্ষণের পর অসমতল কর্কশ বন্ধুর পথে অনভ্যস্ত ভ্রমণশীল চরণ কয়খানি পরম স্বস্তি অনুভব করিল, এক সঙ্গে অনেকগুলি-কণ্ঠে উচ্ছ্বাসিত-আরামে "আঃ" শব্দ নির্গত হইল।

মায়ার মনে হইল, এতক্ষণের পর সে সহযাত্রিগণের সহিত একত্র হইল!—এতক্ষণ ইহাদের সঙ্গ সংস্রবের খুব নিকটস্থ হইয়াও নিজের নিভৃত মনের মাঝে সে নিঃসঙ্গ ভাবে ঘুরিতেছিল,—কিন্তু এইবার—ইহাদের তৃপ্তির আনন্দ ব্যঞ্জনার সহিত তাহার হৃদয়ের ভাষাও এইখানে আসিয়া সমস্বরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে!—"আঃ!"

মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ; শ্মশান-শিবের পূজারী মহাশয় সন্ধ্যার পরই 'শীতল' দিয়া—দেবতার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া যান,—সুতরাং দর্শনাশায় ভগ্ন মনোরথ প্রণামার্থীগণ রুদ্ধ দ্বারের বাহির হইতেই, দেবোদ্দেশে যথা কর্ত্তব্য শেষ করিল, মায়াও প্রণাম করিল, প্রণামান্তে মস্তকোত্তলনউদ্যতা মায়ার—সহসা মনে পড়িল, তাহার হাতের মুঠায় ফুল আছে!—ব্যস্ত হইয়া মায়া মুঠা খুলিল, স্বল্পান্ধকারে স্পষ্ট অনুভব করিল, তিনটি ফুলই বটে!—কিন্তু হায়, এ কি? অনায়াসলভ্য চম্পক পুষ্প দুইটির সতেজ সৌরভ, তাহাদের জীবনী-শক্তির দৃপ্ত প্রাখর্য্য সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করিতেছে বটে, কিন্তু—আ মরি মরি, তাহার ব্যগ্র-আয়াসে বড় সাধের সংগৃহীত অন্যতম পুষ্পটির ক্ষীণ প্রাণ—কখন তাহার অন্যমনস্ক কর-নিষ্পেষণে বিদলিত হইয়া গিয়াছে, তাহা সে জানিতেও পারে নাই! পুষ্পটি সম্পূর্ণ রূপে নির্জ্জীব পর্য্যুসিত হইয়া গিয়াছে!

মায়া নিঃশ্বাস ফেলিল! যাক ভগবান, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক!......অনায়াস লব্ধ, ও যত্নায়াস সংগৃহীত যত কিছু ভাল মন্দ—সব তোমার দ্বারে সমর্পণ করিয়া, রিক্ত হস্তে তাহাকে বিদায় লইতে দাও!............চরম অমঙ্গলের শিয়রে পরম মঙ্গলের শান্ত সুন্দর মূর্ত্তি ধরিয়া কঠিন নিশ্চল ভাবে বিরাজমান,—ওগো রুদ্ধ গৃহের অদৃশ্য দেবতা,—দ্বন্দ্ব পীড়িত দুর্ভাগা মানব হৃদয়ের যত কিছু ভুল-ভ্রান্তি যত কিছু সুখ-সান্ত্বনা, দুঃখ-বেদনা,—সব আজ তোমার উদ্দেশে 'তস্মৈ নমঃ' বলিয়া উৎসর্গ করিয়া দিতেছে, হে দেব, এই দান সার্থক হইবার আশীর্ব্বাদ কর,—শ্রান্তি হত মানবাত্মার নিষ্কৃতি বিধান কর!

সাশ্রু নয়নে অন্ধকার চৌকাঠের পাশে নিঃশব্দে পুষ্পগুলি রাখিয়া মায়া আবার প্রণাম করিল,—ভারমুক্ত হৃদয়ের মাঝে, অনেক দিনের পর ধীর-আবর্ত্তনে নির্ম্মল স্বাচ্ছন্দ্য প্রবাহের জীবন-হিল্লোল অনুভব করিল।

সঙ্গীগণের সহিত অলিন্দ হইতে অবতরণ করিয়া মায়া সকলের সহিত পথের ধূলায় মাথা লুটাইয়া দেবালয়ের উদ্দেশে পুনশ্চ প্রণাম করিল,—মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে(ই) ললাট সংলগ্ন ধূলি কণাগুলি, ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিয়া, মুখ বুক বহিয়া,—নীচে পড়িল!—অলক্ষিতে মায়ার অধর প্রান্তে স্নিগ্ধ-কোমল হাস্য রেখা নীরবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, হায় দেবতা,—এমনি করিয়া একদিন মুক্ত কৃতার্থ প্রণতির পর,—অভিশপ্ত ললাটের সমস্ত দুঃখ-কলঙ্ক রেখা নিঃশেষে ঝরিয়া পড়িয়া,—মানবীয় অদৃষ্ট-টা, সত্যই কখনও প্রসন্ন নির্ম্মল হইবে কি?

মায়ার দুই চক্ষু অশ্রু পূর্ণ হইয়া উঠিল!

ক্রমশঃ—

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

প্রত্যাবর্ত্তন।

·:*:·

বিদায়েরি সময় এলো
নাইক দেরী আর,
মন্দির ওই রুদ্ধ হবে
ওই দিয়েছে বার।

দেখতে যে গো অনেক বাকি
অতৃপ্ত হায় রইল আঁখি,
সাজির কুসুম সব পেলে না
চরণ দেবতার।

(২)

কালকে যখন আসবে হেথা
রিক্তা উষা রে,
কনক দেউল পড়বে ঢাকা
শুভ্র তুষারে।
অঞ্জলির এ কনক চাঁপা
কোন তলেতে পড়বে চাপা,
সে যে পরম আরাধ্যেরি
পূজার উপচার।

(৩)

কেবল নিয়ে যাচ্ছে ফিরে
অবশ দেহখান,
এই দুয়ারে ধন্না দিয়ে
রইবে পড়ে প্রাণ।
বক্ষ আমার পাথর করে
রেখে গেলাম সোপান গড়ে
নিঝর হয়ে বইবে ঘিরে
উষ্ণ আঁখি ধার।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।
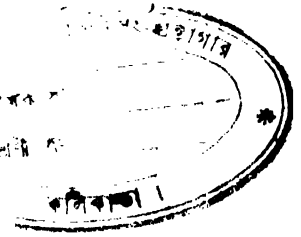
সিমলা ভ্রমণ।

-:*:-

পূজাবকাশে সিমলা ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলাম। গাড়ীতে আদৌ ভিড় ছিল না, আমরা সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ জন, এক এক জন এক একটা গদী অধিকার করিলাম, কিন্তু গাড়ীতে নিদ্রাদেবীর সহিত আমার চির বিবাদ; রাত্রি সাড়ে সাতটায় যখন গাড়ী গয়ায় পেঁাছিল, দেখিলাম বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম, মনে ভয়ের সঞ্চার হইল; শীতের জন্য বুঝি সিমলা যাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে, কিন্তু গাড়ী যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, শীত কমিয়া আসিল; শরৎকাল, গন্তব্য পথের চতুর্দ্দিকে অপূর্ব্ব শোভা। তৃতীয় দিবস প্রত্যুষে ছয়টায় কালকায় গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম।

কালকা সিমলা রেলওয়ে মিটার গেজ, ইহা ১৯০৩ খৃঃ নভেম্বর মাসে খোলা হইয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ৫৯½ মাইল এবং ৪৬৬৫ ফিট উপর উঠিয়াছে, গাড়ীগুলি ছোট ছোট, কিন্তু বড় সুন্দর; ছয়খানি গাড়ী জুড়িয়াছিল, লাইনটা সর্পের মতন বক্রাকারে চলিয়া গিয়াছে। ই. আই. রেলওয়ের চণ্ডীগড় ষ্টেশন হইতে গাড়ীতে দুখানি করিয়া ইঞ্জিন জোড়ে, এবং গাড়ী অতি ধীরে চলিতে থাকে, কিন্তু কালকা সিমলা রেলওয়ের গাড়ী ইহা অপেক্ষা জোরে চলে, কারণ ইহাতে ই. আই. রেলওয়ে অপেক্ষা অনেক কম গাড়ী জোড়ে। কালকা হইতে সিমলা যাইবার পথে ১০৩টী টানেল (সুড়ঙ্গ); কালকা হইতে সিমলায় যাইবার একটী রাস্তা আছে, ইহাকে Cart road (কার্ট রোড) বলে, এই রাস্তা দিয়া পূর্ব্বে টঙ্গা চলিত, রেলওয়ে হওয়া পর্য্যন্ত টঙ্গা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই রাস্তায় চড়াই খুব কম, কেবল কেথলিঘাট ও ধরমপুরের নিকট দু এক জায়গায় চড়াই আছে। কালকা হইতে একায় যাইলে ওখানে নামিতে হয়, কেননা লোক লইয়া যাইতে পারে না। তারাদেবী ষ্টেশনে গাড়ী হইতে দেশী আরোহীগণকে নামান হইল, ডাক্তার সাহেব প্রত্যেকের নাড়ী টিপিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, তার পরে তিনি এক একখানি ছাড়পত্র দিলেন; একজন দেশীয় রেলওয়ে কর্ম্মচারী, যাত্রীদের নাম, ধাম, জাতি, ধর্ম্ম, পেশা, পিতার নাম, কোথায় বাটী, কি উদ্দেশ্যে সিমলায় আগমন লিখিয়া লন। যাহারা ব্যারামী, তাহাদের আর সিমলায় যাইতে দেওয়া হইল না, তারাদেবীর সরকারী হাঁসপাতালে যাত্রা শেষ! দেশীয় স্ত্রীলোকদের গাড়ীর ভিতর যাইয়া মেয়েরা পরীক্ষা করেন।

বরোগ ষ্টেশনে কেলনর ছাড়া হিন্দু ও মুসলমানদের Refreshment room (আহারের স্থান) আছে, এই ষ্টেশনের নিকট একটী প্রকাণ্ড টানেল (সুরঙ্গ),—(দৈর্ঘ্যে ৩৭৫২ ফিট) তাহার মধ্যে ট্রেণের যাইতে অন্ততঃ পাঁচ মিনিট লাগে ও ট্রেণে আলো জালিয়া দেয়, কিন্তু দ্রুতগামী চলন্ত ইঞ্জিনের অতিরিক্ত ধূমে আরোহীগণের বড়ই ক্লেশ উৎপাদন করে। সমস্ত রাস্তায় বৃষ্টি হইতেছিল, চতুর্দ্দিক কুয়াসায় আচ্ছন্ন, শুনিলাম বর্ষাকালে

সূর্য্যোদয় প্রায়ই হয় না। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, শীতাধিক্য বোধ হইতে লাগিল। কালকা হইতে সিমলা প্রায় ৬০ মাইল, পাহাড়ের উপর বলিয়া সিমলা পৌঁছিতে ছয় ঘণ্টা লাগিল, সমতলভূমি হইলে কম সময়ে যাইতে পারিত। কালকা হইতে নয় মাইল দূরে, কশৌলী ষ্টেশন, এখানে Pasteur Institute (প্যাসটার চিকিৎসালয়) আছে, তথায় কুকুর কামড়ান রোগীর চিকিৎসা করা হয়; বৎসরে চারি হাজার হাইড্রোফোবিয়া রোগী চিকিসিত হয়। ইহা সাধারণের চাঁদা দ্বারা চলে।

সিমলার ভৌগোলিক চৌহদ্দী এইরূপ:—পূর্ব্ব ও উত্তর দিকে কোটী নামক দেশীয় রাজ্য, দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকে কোয়েন্‌থলি রাজার এবং পাতিয়ালা রাজার রাজ্য। সিমলার আয়তন ৮৬ বর্গ মাইল। ইহা ৭০০০ ফিট sea lebel হইতে উচ্চ। লোক সংখ্যা আনুমানিক ৫০,০০০ কিন্তু শীতকালে কমিয়া ১০,০০০ দশ হাজারে দাঁড়ায়। সিমলায় রিক্স ছাড়া আর কোন যান নাই, ইহা চারিজন মানুষে টানে, প্রথম শ্রেণী প্রথম ঘণ্টা ১৲ দ্বিতীয় শ্রেণী প্রথম ঘণ্টা ৸০। বড় সিমলায় কার্ট রোডের উপর দেশীয় কেরাণীদের থাকিবার জন্য অনেক সরকারী ব্যারাক আছে, Indian clerks' barracks, Block A, Block B, Block C এবং Block D. এই ব্লকে Sir Harcourt Butter school নামক একটী উচ্চ ইংরাজী স্কুল আছে, ইহাতে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পড়ান হয়। সমস্ত বাঙ্গালী-ছেলেরা এখানে পড়ে। ইহা ভূতপূর্ব্ব শিক্ষাসচিব Sir Harcourt Butterএর নামে প্রতিষ্ঠিত এবং পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট।

এখানে সেপ্টেম্বর মাসে আব হাওয়া খুব ভাল কিন্তু এবারে ক্রমাগত বৃষ্টি হইতেছে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, পাহাড়ে মেঘ ধুঁয়ার ন্যায় জমিয়া রহিয়াছে, তাহাকে এখনকার লোকে "আঁধী" বলে, সেই মেঘ যখন সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তখন বৃষ্টি হয়। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, উপরের পাহাড়ে রৌদ্র রহিয়াছে, নীচের পাহাড়ে মেঘ জমিয়া বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। রাস্তায় বেশী বেড়ানও বড়ই কষ্টকর এবং আয়াসসাধ্য, কারণ পার্ব্বত্য প্রদেশে কেবল "চড়াই" ও "উৎড়াই"। উৎড়াই হইতে নামা সহজ বটে, কিন্তু 'পিছ্‌লে' যাবার বিশেষ সম্ভাবনা। এই আশ্বিন মাসে কলিকাতার পৌষ মাঘ অপেক্ষা শীত, পৌষ মাঘ মাসে বরফ পড়িতে থাকে, রাস্তাঘাট সমস্ত বরফে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, সেই সময় মুন্সীপালের লোকেরা বরফ কাটিয়া রাস্তা পরিষ্কার করিয়া দেয়, রাত্রিতে শোবার ঘরে আগুন জ্বালিতে হয়। অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষে রাস্তা হারাইয়া যাওয়া খুব সম্ভব, কারণ রাস্তায় চলিতে পাশাপাশি রাস্তায় গেলে হয় ত কোন খাদে গিয়া পড়িতে হয়; অথবা একটী পার্ব্বতীয় গ্রামে যাওয়া বিচিত্র নহে। এখানকার আবহাওয়া ইংরাজদের খুব ভাল লাগে, তাই তাঁহারা দলে দলে সিমলা শৈলে ভ্রমণ করিতে আইসেন এবং ইহাকে Ideal Health-resort আদর্শ স্বাস্থ্য-নিবাস বলেন। এখনকার মুটেরা প্রায়ই পার্ব্বতীয় "সিরমুরী" ও "লাজকী" জাতীয়, দেখিতে পাঠানের মতন এবং ধর্ম্মে মুসলমান। এই পার্ব্বতীয় সিরমুরী ও লাজকী কুলিরা কিরূপ মোট পিঠে করিয়া লইয়া যায়, দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়; অনেকে পাঁচ ছয় মন

মোট লইয়া পর্ব্বতে উঠিতেছে। একদিন একজন মুটেকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, যে পাঁচ মন মোট লইয়া যাইতেছে। এখানে (Mall) মাল্ রোডে (দুই দিকে খাদ, মধ্যবর্ত্তী সমতল ভুমিকে মাল্ বলে)

ম্যাল, সিমলা।

বড় বড় দোকানপশারী আছে, দেখিলে Chowringhee চৌরঙ্গী বলিয়া ভ্রম হয়, সমস্ত কারবার পাঞ্জাবী, ইংরাজ, পার্শী ও অন্যান্য জাতিদের কিন্তু বাঙ্গালীদের একটীও বড় দোকান দেখিতে পাইলাম না, শুনিলাম, দুই চারি জন করিয়াছিলেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। হায়! চাকুরীজীবি বাঙ্গালীদের ধাতে ব্যবসা সয় না। তবে এই দোকানপশারী ছয় মাস থাকে, ছয় মাস বরফ পড়িতে থাকে, সেই সময় সাহেব ও অন্যান্য লোকেরা নীচে চলিয়া যান এবং অনেকে অফিসই দিল্লিতে চলিয়া যায়, সুতরাং ছয় মাস বসিয়া বসিয়া ভাড়া গণিতে হয়। এখানে তৈয়ারী চায়ের দোকান একখানিও দেখিলাম না, এই দোকান খুলিলে বেশ চলে, কারণ এখানকার লোকেরা শীতের দরুণ বহুবার চা পান করে। এখানে ষ্টেশনে ও লোকের বাটীতে গারোয়ালী ও কাঁকড়াই চাকর। ইহারা অতি বাধ্য ও পরিশ্রমী। এই গারোয়ালীরা নেপালের গুরখাদের সহজাতী, কারণ নেপালের গুরখাদের আদিম নিবাস গারোয়ালে ছিল, তৎপরে প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে তাহারা নেপালের আদিম নিবাসী নেয়ারদের পরাজিত করে। এখানে কুকুর রাখিলে ট্যাক্স দিতে হয়, একটী কুকুরের দরুণ বাৎসরিক ৩৲ তিন টাকা লাগে।

এখানে কেলু, চিড়, বাণ ও রবাশ এই কয় প্রকার গাছ পর্ব্বতের উপর দেখিতে পাওয়া যায়। বরফের সময় অধিকাংশ গাছে পাতা থাকেনা, খালি কাঁটাসার হইয়া থাকে, দেখিলে বোধ হয় যেন মরিয়া গিয়াছে।

এপ্রিল মাসে আবার কচি কচি পাতায় গজায়। বরফের সময় যখন পাতা থাকেনা তাহার উপর বরফ পড়িয়া যেন রূপার গাছ বলিয়া বোধ হয়। এখানে অধিকাংশ বাটীই কাষ্ঠে নির্ম্মিত, চাল টিনের, কারণ বরফের সময় বরফ সহজেই রাস্তায় পড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু সহরের বাহিরের খাস পাহাড়ীদের ঘরের ছাদ অধিকাংশ শ্লেট নির্ম্মিত। আজ কাল রেলওয়ে হওয়াতে ইটের আমদানী হওয়ার দরুন, দু একখানি ইটের বাটী নির্ম্মিত হইতেছে, কিন্তু চাল টিনের। কেলিটিস হোটের বাড়ীটী আটতালা, অতি সুন্দররূপে নির্ম্মিত। মাল রোডে কিছুদূরে একস্থানে কাষ্ঠের নানারূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়, এই জন্য এই স্থানকে "লকড় বাজার" বলে। এখানকার কারিগর সমস্তই পঞ্জাবী ও শিখজাতীয়।

প্রস্‌পেক্ট হিলের নিম্নেই একটী স্থানকে "বালুগঞ্জ" বলে, Boileau বালু নামক একজন ইংরাজ এখানে বাস করেন এবং একটী বাজার (গঞ্জ) বসান। তাঁহার নামানুসারে এই স্থানের নাম হয়। সিমলার মধ্যে এই স্থানটী পুরাতন। এখনকার সিমলা ইহার অনেক পরে নির্ম্মিত। সিমলা প্রধানতঃ কয়েকটী পাহাড়ের উপর অবস্থিত, Prospect hill প্রস্‌পেক্ট হিল (৭১৪০ ফিট) Observatory hill অবজারভেটরী হিল (৭০০৭ ফিট) Jako জ্যাকো (৮০৪৮) Summer hill সামার হিল এবং Jutogh যুতগ এই কয়েকটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

একদিন প্রস্‌পেক্ট দেখিতে গেলাম। চড়াই ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। দরদর্ করিয়া ঘামিতে লাগিলাম, এইরূপে অতি কষ্টে পর্ব্বত শিখরে আরোহন করিলাম। অতি নির্জ্জনে স্থান, পর্ব্বতের উপর হইতে সিমলা সহরের দৃশ্য অতি মনোহার, চতুর্দ্দিকে কেবল গিরিশৃঙ্গ, অদূরে কালকা-সিমলা রেলওয়ে লাইন, তারাদেবী ষ্টেশনটীও দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। যুতগ (Jutogh) ষ্টেসনের এর উপর যুতগ ক্যান্টনমেণ্ট দেখিতে পাওয়া গেল। পর্ব্বতের চূড়ায় কামনা দেবী নামক ঠাকুর আছেন, একজন সন্ন্যাসী ইঁহার পূজারী, আমাদের প্রসাদ খাইতে দিলেন। সর্ব্বোপরি উত্তরদিকে দূরে পাহাড়ের উপর বরফ পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিয়া নয়ন জুড়াইয়া গেল। নিম্নে Cart road রাস্তাটি একটী রেখার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

পূর্ব্বে যে তারাদেবী ষ্টেশনের কথা বলিয়াছি তাহা তারাদেবী নামক পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত। ঐ পর্ব্বতের উপর "তারাদেবী" নামক দেবী আছেন, তাঁহার নামেই পাহাড়ের নামকরণ হইয়াছে। প্রবাদ এই যে কল্‌কা (কালীকা) মহিষাসুরকে বধ করিয়া ফিরিবার সময় দেবী এই স্থানে বিশ্রাম করেন। সিমলার সন্নিকটস্থ জুনগাঁর রাজা দেবীর সেবাইত। মহাষ্টমীর দিন এখানে খুব ঘটা করিয়া দেবীর পূজা হয় এবং একটী মেলা বসে। জুনগাঁর রাজা নিজে সপরিষদ সে সময়ে উপস্থিত থাকেন, প্রথম যে মহিষ বলি হয় তাহা স্বহস্তে বধ করেন। এখানে বলি আমাদের দেশের মত হয় না, হাড়িকাট ইত্যাদির কোন বন্দোবস্ত নাই। রাজা প্রথমে তরোয়াল দ্বারা একটী আঘাত করেন তাহাতে যতটুকু কাটে, বাকী পাঁচ জনে কুড়ুল ইত্যাদি দ্বারা শেষ করে। শেষে তাহাকে খাদের দিকে ফেলিয়া দেওয়া হয়। সে এক নিষ্ঠুর দৃশ্য! জানিনা মায়ের নামে এরূপ নিষ্ঠুরতা আরও কতকাল চলিবে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া (Summer hillএ) সামার হিলে গেলাম, এই পর্ব্বতের নামে ষ্টেশনের নাম হইয়াছে, এই পর্ব্বতের উপর সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের প্রাসাদ দেখিতে পাওয়া গেল। এই ষ্টেশনে বড়লাট বাহাদুর গাড়ী হইতে নামিয়া তাঁহার প্রাসাদে গমন করেন, তিনি আর সিমলা ষ্টেশনে যান না, কারণ এই স্থান হইতে বড়লাট সাহেবের কুঠি অতি নিকট। ইহা অবজারভেটরী হিলের উপর প্রতিষ্ঠিত, অতি উচ্চ পর্ব্বতের উপর নির্ম্মিত বলিয়া প্রায় সকল স্থান হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, ছাতের উপর নিশান উড়িতেছে। বড়লাটের বাটীর গেটে গুরখা সৈন্যেরা বন্দুক হস্তে পাহারা দিতেছে। সন্ধ্যা কালে

যখন সিমলা নগরী বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত হয়, তখন তাহার কি সুন্দর শোভা হয়, তাহা তিনি দেখিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন।

সিমলা হৃদ্‌রোগের পক্ষে বড়ই উপকারী, ধরমপুরে যক্ষ্মারোগীদের জন্য হাঁসপাতাল নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার নাম "King Edward Sanitorium for Consumptives" সম্রাট এড্‌ওয়াডের যক্ষ্মারোগীর স্বাস্থ্য-নিবাস। ইহা কালকা হইতে ২০½ মাইল, সমুদ্র হইতে ৫০০০ ফিট উচ্চ। ১৯০৯ খৃঃ সুপ্রসিদ্ধ পার্শী সমাজ সংস্কারক সার্ বেলজ্ঞামিন্, মেলাবারী ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ভারতের দেশীয় রাজাদের দানে ইহা চলিতেছে, পাতিয়ালার রাজা স্থানটী দান করিয়াছেন। এখানে ৫০ পঞ্চাশ জন রোগী চিকিৎসিত হইবার বন্দোবস্ত আছে। সিমলার বরাশখুল রক্ত-আমাশয়ের পক্ষে বড়ই উপকারী।
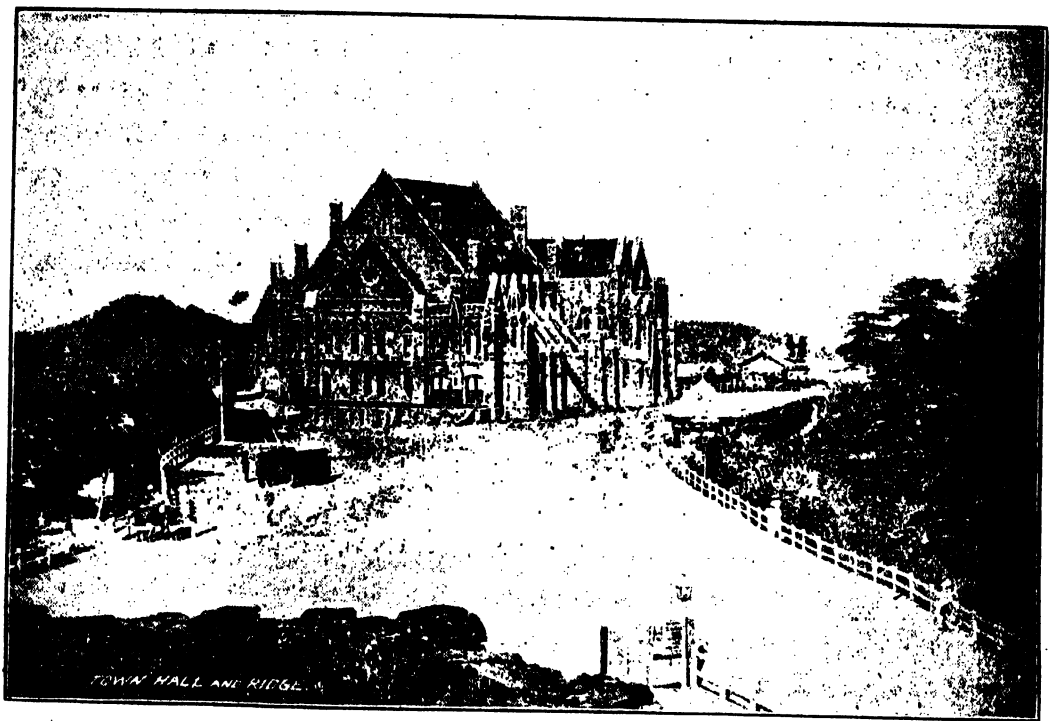
টাউন হল, সিমলা।

সিমলা হইতে তিন মাইল উত্তরে মন্‌জৌলির বাজার; ইহার নীচে খাতে একটী শ্মশান আছে, এখানে হিন্দুদের শবদাহ করা হয়। বাজারের পর একটী টানেল পার হইয়া খানিক দূর যাইলে কোটী (Kati) নামক দেশীর রাজার রাজ্য আরম্ভ। এই রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে একটী (tall tax) ট্যাক্স্ দিতে হয়। এই স্থান হইতে চার মাইল যাইলে পর মাসাবারাতে বড় লাটের আর একটী বাগান-বাটী আছে। তিনি এই স্থানে প্রায় যান এবং বাস করেন। অর্দ্ধ মাইল পরে একটী স্থানে সিপি মেলা হয়, সেখানে পূর্ব্বে পার্ব্বতীয় সুন্দরীরা বিক্রয় হইত, কোটী রাজা খুব কড়াকড়ি করাতে এক্ষণে প্রথাটি লুপ্ত প্রায়, কিন্তু পূর্ব্বকার প্রথামত সুন্দরীরা সাজিয়া গুজিয়া বসিয়া থাকেন। সিপি মেলা হইতে আট মাইল দূরে শতদ্রু তীরে "তাতাপানি" নামক স্থান

আছে, এখানে নদীর ধারে বালী খুঁড়িলে গরম জল বাহির হয়। সে জলে গন্ধকের ভাগ খুব বেশী এজন্য সেই জলে চর্ম্মরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী, অনেকে সেখানে স্নান করিতে যায়।

সহরের উত্তর দিকে মাল্ রোড হইতে কিছু নিম্নে কায়থু (Kaithu)—সেখানে সেক্রেটারিয়েটের অনেক বড় বড় চাকুরে বাস করেন এবং একটী জেল আছে। তাহার নিম্নে Anandale আনানডেল—চতুর্দ্দিকে উচ্চ পাহাড়ে বেষ্টিত আনন্দ-দেল (?) কলিকাতার গড়েরমাঠ বিশেষ, ফুটবল, ক্রিকেট, পোলো, ঘোড়দৌড় প্রভৃতি এই স্থানে হয়, সেই সময় এই স্থানে বহুলোক সমাগম হয়। তখন ম্যালরোড হইতে আনানডেলের দিকে চাহিলে Gulliverএর Lilliputianএর ধারণা বেশ হয়। পশ্চিমের অনেক বড় বড় সহরের ন্যায় এখানেও একটী কালী-বাড়ী আছে, এটী স্থানীয় প্রাবাসী বাঙ্গালীর নিজস্ব; তবে অন্য দেশীয় হিন্দুদের পক্ষে পূজা নিষেধ নহে। এখানে যে কোন নবাগত বাঙ্গালী তিন দিন বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান পাইতে পারেন। মায়ের পুরোহিতও বাঙ্গালী; কালীবাড়ীর সঙ্গে একটী হরিসভাও আছে—কালী কৃষ্ণের এরূপ অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ বঙ্গদেশে খুব বিরল। কালীবাটীতে দুর্গা পূজার তিন দিন খুব ধুমধাম হয়, নবমীর রাত্রিতে প্রায় ২০০০ হাজার কাঙ্গালী ভোজন করেন। বলিতে ভুলিয়াছি, সেণ্টজেলির পথে ছোটসিমলা বলিয়া স্থান আছে, এখানে বহু বাঙ্গালী বাস করেন, এখানেও একটী হরিসভা। সেখানে সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে খুব ধুম হয়। এখানে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের ধর্ম্মমন্দিরও আছে, যেমন শিখেদের গুরুগোবিন্দ সিংহ ও সভা, আর্য্য সমাজ, নববিধান হিমালয় ব্রহ্মমন্দির (স্থাপিত ১৮৮৬) ক্রাইষ্ট চার্চ্চ (ফিট ৭২৩০ ইহা ঠিক জ্যাকোর নিম্নে নির্ম্মিত হইয়াছে)। এখানে অধিকাংশ দেশীয় নৃপতিবৃন্দের প্রাসাদ আছে।

সিমলার পূর্ব্বদিকে Jako (যক্ষ) পাহাড়, (৮০৪৭ ফিট) উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত, সিমলা অপেক্ষা ইহার উচ্চতা সহস্র ফিট অধিক। ইহার দক্ষিণ ভাগে পঞ্জাবের ছোটলাট বাহাদুরের গ্রীষ্মাবাস ও অফিসাদি অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে কুসুমটী বাজার। এই স্থান হইতে চুড়ী নামক পাহাড় দেখা যায়, এই পাহাড় সিমলা হইতে দক্ষিণে, কিন্তু ইহার উচ্চতা সিমলা হইতে অনেক অধিক, সিমলায় বরফ পড়িবার অনেক পূর্ব্বে এখানে বরফ পড়ে এবং এপ্রেল মাস পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। কুসুমটীর বাজার হইতে দক্ষিণে, কিছুদুর যাইলে জুনগাঁর রাজ্যে এখানে প্রবেশ করিতে হইলে কোন রূপ ট্যাক্স দিতে হয় না। পূর্ব্বে নাকি জ্যাকোতে যক্ষগণ বাস করিতেন, এবং তাঁহাদের নামানুসারে ইহার করণ হইয়াছে। পূর্ব্বে কেহই উপরে উঠিতে সাহস করিত না, পথও ছিল না। তখন রাত্রে নাকি শঙ্খ ঘণ্টা ও সুমধুর সঙ্গীত ধ্বনি শোনা যাইত, পরে সিমলায় বহুলোকের সমাগম হওয়াতে যক্ষগণ এই স্থানত্যাগ করেন। প্রবাদ হনুমান গন্ধমাদন লইয়া ফিরিবার সময় এখানে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ স্বরূপ এই পাহাড়ের উপর হনুমানজীর এক মন্দির আছে। একজন হিন্দুস্থানী বাবাজী ইহার সেবায়ত। এখানে সিমলা অপেক্ষা শীত বেশী। মন্দিরটী দেখিবার ইচ্ছা প্রকার করায় এখানকার বন্ধুগণ কিছু ছোলাভাজা সংগ্রহ করিতে বলিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন, যাইলেই বুঝিতে পারিবেন। তাঁহাদের এই অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না। দুই আনার ছোলা ভাজা সঙ্গে লইয়া ধীরে ধীরে জ্যাকো আরোহণ করিলাম, পথ বেশ নিরিবিলি, দুই পার্শ্বে উচ্চ কেলু, চিড় ও নানারূপ লতা-গুল্মের শ্রেণী। মন্দিরের সম্মুখে কতকটা স্থান সমতল করিয়া উঠানের মত করা হইয়াছে। পার্শ্বে ঢোলপুরের মহারাজার শৈলাবাস। মন্দির প্রাঙ্গনে পা দিবা মাত্র কোথা হইতে দলে দলে বাঁদর আসিয়া আমাকে ঘেরিয়া ফেলিল। এক, আধটা নয়, রীতিমত একটী রেজিমেণ্ট। তাহাতে সদ্য প্রসূত শাবক

হইতে লোলচর্ম্ম বৃদ্ধ বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সব ছিল। হঠাৎ এরূপ বাঁদর বেষ্টিত হইয়া আমারও মধুসূদন স্মরণ করিবার ক্ষমতাও লুপ্ত প্রায় হইল। যাহারা আমাকে ছোলা ভাজা লইবার পরামর্শ দিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত করা তাঁহাদের উচিত ছিল। একজন নবাগতের ঘাড়ে এরূপ Practical joke চাপাইয়া আনন্দ ভোগ করা নিষ্ঠুরতার নামান্তর মাত্র। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে লাগিলাম যে তাঁহারা কল্পনায় আমার অবস্থা অনুমান করিয়া হাসিয়া লুটাপটি যাইতেছেন। রাগে সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু উপস্থিত বিপদের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় কি? ছুটীয়া পলাইবারও পথ নাই, এবং পথ থাকিলেও পারিতাম কিনা সন্দেহ। রাগে (ভয়েই) হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে ছিল। এমন সময়ে মন্দিরের বাবাজী বাহির হইয়া আমার অবস্থা দেখিলেন, তারপর কি একটা শব্দ করিলেন, অমনি—আশ্চর্য্য ক্ষমতা এই বাবাজীর--সেই বর্ব্বর-বাহিনী Commanding officerএর (সৈন্যাধ্যক্ষের) আদেশ হইবা মাত্র আমাকে ত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যে এত কাণ্ড হইয়া গেল, কিন্তু ইহার মধ্যেই আমি গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিলাম, গলা শুকাইয়া কাট হইয়া গিয়াছিল; অবসন্ন ভাবে একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িলাম, বাবাজী আমার হাত হইতে ছোলা ভাজার ঠোঙ্গাটি লইয়া বার কতক "রাজা রাণী" "রাজা রাণী" বলিয়া হাঁক দিলেন, প্রায় দুই মিনিট পরে দুই ভীমমূর্ত্তী বাঁদর মন্থর গতিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহারাই রাজা রাণী— এই বাঁদরদের। বাবাজী উঠানে ছোলা ভাজা ছড়াইতে লাগিলেন। রাজা রাণী বাবুলোক, দুই চারিটি খাইয়াই সরিয়া পড়িল। তখন সেই বিপুল বাহিনীর ভোজ আরম্ভ হইল। এক এক বার আমার দিকে মিটির মিটির করিয়া চায়, আর কুড়ুর কুড়ুর করিয়া ছোলা ভাজা খায়, সে বড় মজার দৃশ্য! ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বাবাজীর হাতে কিছু প্রণামী দিয়া উঠিয়া পড়িলাম। বাবাজী সঙ্গে করিয়া মন্দির সীমানা পার করিয়া দিলেন, একবার সীমানা পার হইতে পারিলে আর কোন ভয় থাকে না। কিন্তু আমার ভয় তখনও কাটে নাই, প্রায় অর্দ্ধেক পথ নামিয়া আসিবার পর ভয় দূর হইল।

সিমলা সহরে বিদেশীর ভাগ পনর আনা, এদেশের লোক সহরে বাস করে না, তাহারা নীচে খাদে বাস করে। তাহার প্রধান কারণ, তাহারা কৃষিজীবি। আজ কাল দু' চার জন অফিসের চাপরাসী, দপ্তরী বা ওইরূপ অন্য কাজ করিতেছে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অঙ্গুলীতে গণনা করা যায়। চাষ সকলেরি আছে। যেখানে ঝরনার জল পাওয়া যায় না বা বর্ষার জল বাঁধ দিয়া ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই, সেখানে চাষী লোকের থাকা চলে না, কাজেই তাহাদিগকে সহর হইতে দূরে থাকিতে হয়, সেখান হইতে সহরে আসিয়া তাহারা ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয় করে। উপর হইতে তাহাদের গ্রামগুলি দেখিতে যেন ছবির মত। না, ছবি ত স্বভাবের ব্যর্থ অনুকরণ মাত্র, এ দৃশ্য যে কিসের মত তাহা জানি না, তবে যতই দেখ, সাধ মিটিবে না, ইহা জোর করিয়া বলিতে পারি। এখানকার জমী খুব উর্ব্বরা, অবশ্য সব দেশে সব জিনিস জন্মায় না, কিন্তু এখানে যাহা জন্মায়, তাহা প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। ভুট্টার আটাই এ দেশের লোকের প্রধান আহার, গমের আটা সমস্তই সহরে বিক্রয় হয় এবং বিদেশীরাই ব্যবহার করে। আটা ইত্যাদি পাণিকাক্কী (Water mill) তে তৈয়ারী হয়। চাউল ইহারা ব্যবহার করে না। এখানে চাউলের চাষ খুব অল্প এবং যাহা জন্মায়, তাহাও নিকৃষ্ট। এখানকার পুরুষেরা খুব পরিশ্রমী এবং অল্পে সন্তুষ্ট।—কিন্তু মেয়েরা অপেক্ষাকৃত বিলাসী, যদিও তাহারা সংসারের কাজ কর্ম্ম করে এবং চাষ বাসের কার্য্যে পুরুষের সহায়তা করে।

তাহারা বড় পরিচ্ছদপ্রিয় এবং তাহার জন্য ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয় করিতে কাতর নয়। অনেকে দেখিলাম, স্বামী স্ত্রী একত্রে সহরে আসিয়াছে, স্বামীর হয় ত কৌপিন মাত্র পরিধান, মস্তকে একটা পাগড়ী, গায়ে একটা ছিন্ন কোর্ত্তা, হস্তে একটা লাঠি, কিন্তু স্ত্রীর ভেল্‌ভেটের পাজামা, রেশমী পিরহান, ভেল্‌ভেটের Waist coat, (মক্‌মলের জামা) তদুপরি রঙ্গীন ওড়না, পায়ে ষ্টকিং, রীতিমত উঁচু গোড়ালীওয়ালা বিলাতী বুট বা সু, তাহার উপর

পার্ব্বত্য-জাতী, মাশোবরা পরিবার। সিমলা পাহাড়।

পাঁজোর ; কানে, নাকে, মাথায়, হাতে এক গোছা করিয়া রূপার গহনা, অঙ্গুলীতে প্রকাণ্ড আয়না বসান। (যাঁহারা বলেন সৌখীন স্ত্রীর গহনা পোষাক যোগাইতে বাঙ্গলার স্বামীকুল সর্ব্বস্বান্ত তাঁহারা একবার এই নিরক্ষর পাহাড়ী চাষীর সহিত আপনাদের অবস্থা তুলনা করুন। বাঙ্গলার সৌখীন স্ত্রীর স্বামীকে এখনও কৌপিন পরিতে হয় নাই।) সুন্দরী মুহুর্মুহু পান চিবাইতেছেন ও মধ্যে মধ্যে সেই আয়নাতে আপনার রূপ দেখিয়া আপনি মোহিত হইতেছেন। গৌরীর জন্ম ভূমীতে জন্মিয়া করিয়া তাহারা স্বভাবতই বড় সুন্দরী, এবং সৌন্দর্য্যের প্রভাবও বুঝি কতকটা বুঝে, তাই বোধ হয় যেন তাহারা রূপের তেজে হতভাগ্য পুরুষগুলাকে পুড়াইয়া মারিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত। এমনও দেখিলাম যে, কোন দুষ্ট লোক প্রকাশ্য রাজপথে সহস্র লোকের মধ্যে স্বামীর সাক্ষাতে স্ত্রীকে কুৎসিৎ ঠাট্টা করিল, সুন্দরী তাহার দিকে কটাক্ষ হানিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল। সতীত্বের মূল্য ইহাদের চক্ষে অতি তুচ্ছ—এ জন্য কোন সামাজিক শাসন নাই ! স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু এককালে একাধিক পতি গ্রহণ করে না। বিবাহের সময় স্ত্রীর মূল্য স্বরূপ পুরুষকে কিছু টাকা দিতে হয়। কিছুদিন পরে যদি স্ত্রী সে স্বামীর সহিত "ঘর করিতে" না চায় বা অন্য কোন পুরুষকে পছন্দ করে তাহা

হইলে স্বামীকে তাহার টাকা ফেরত দিলেই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হয়। স্ত্রী তখন পত্যন্তর গ্রহণ করে। এরূপ ঘটনা খুব সাধারণ। অবশ্য নিম্ন-শ্রেণীর মধ্যেই এটা অধিক ঘটে। পূর্ব্বে যে-কোন জাতীয় লোক টাকা দিয়া এখানে পত্নী (?) ক্রয় করিতে পারিত—পূর্ব্বে যে সিপির মেলার কথা বলিয়াছি, সেটা তো রমণী বিক্রয়ের হরিহরছত্র বিশেষ ছিল, এখন সে নিয়মটী তত চলিত নাই। আয়ার কার্য্য ভিন্ন এ-দেশীয় মেয়েদের অন্য চাকরী করিতে দেখি নাই—এবং গোয়ালিনী ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসা করিতেও সহরে আসে না। কিন্তু সামান্য একটু উপলক্ষ ঘটিলে সাজগোজ করিয়া বিশ ক্রোশ দূর হইতে সহরে আসিয়া নানারূপ অসুবিধা ভোগ করিতে এতটুকু কাতর হয় না। শুনিলাম ফুটবল খেলা বা ঘোড়দৌড় দেখিবার জন্য দু দিনের পথ হাঁটিয়া আইসে, ২।৩ দিন পথে পথে বা গাছতলায় কাটাইয়া দেয়, কিন্তু তাহাতেও তাহাদের মুখের হাসি মিলায় না।

এখানে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে প্রায় একমাস কোন ছোট ঝরণার পাশে এমন ভাবে শুয়াইয়া রাখা হয় যেন ঝরণার জল তাহার মস্তকে ধীরে ধীরে পড়িতে পারে। ইহাতে নাকি সন্তান খুব শক্ত হয় এবং ঠাণ্ডা লাগিবার ভয় থাকে না। সেরূপ বরফ-শীতল জল যদি বাঙ্গালীর কোন "ভীমের" মস্তকে ১০।১৫ মিনিট পড়ে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সেণ্টবাইলির শ্মশানে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ইতিহাস। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নেপালের প্রবল গুরখা জাতী সিমলা ও তদসন্নিকটস্থ সমস্ত প্রদেশ জয় করিয়াছিল। এই সকল স্থানের হতভাগ্য পার্ব্বতীয় জাতিরা গুরখা অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইংরাজদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল, ইংরাজেরাও তাহাদিগকে গুরখা কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হন। জেনারাল সার ডেভিড অক্টোরলনী এই যুদ্ধের সেনাপতি হন। ১৮১৫ খৃঃ ১৫ই মে তিনি গুরখাদের শেষ সালোন দুর্গ অধিকার করিয়া লন। এই যুদ্ধের ফলে সিমলা ইংরাজদের করতলগত হয়। সিমলার চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশ ইংরাজেরা পাতিয়ালা ও কায়েনথলের রাজার নিকট লইয়াছিলেন। ইহার বিনিময়ে তাঁহারা অন্যান্য স্থান ঐ রাজাদের সমর্পণ করিয়াছিলেন। ১৮১৯ খৃঃ লেফ্‌টন্যাণ্ট রস, তৎকালীন Political Agent পলিটিক্যাল-এজেণ্ট। প্রথম কাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহ নির্ম্মাণ করেন, এবং ১৮২২ খৃঃ লেফ্‌টন্যাণ্ট কেনেডি প্রথম বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ১৮২৭ খৃঃ লর্ড আমহার্ষ্ট প্রথম এখানে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করেন। ১৮৬৪ খৃঃ হইতে লর্ড লরেন্স সিমলাকে গ্রীষ্মকালীন রাজধানী করিয়া গিয়াছেন, তদবধি সিমলা বড়লাট সাহেবের গ্রীষ্মকালীন শৈলাবাসে পরিণত হইয়াছে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

স্বরলিপি।

মিশ্র বারোয়াঁ—একতালা।

আমার মন মানে না (দিন রজনী)।

আমি কি কথা স্মরিয়া এ তনু ভরিয়া পুলক রাখিতে নারি !

ওগো কি ভাবিয়া মনে এ দুটি নয়নে উথলে নয়ন-বারি।

(ওগো সজনি !)
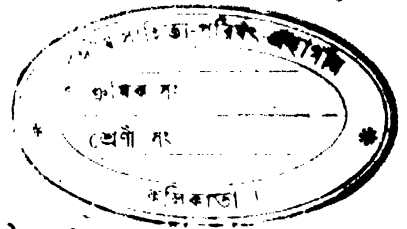
সে সুধা-বচন, সে সুখ-পরশ, অঙ্গে বাজিছে বাঁশি।
(তাই) শুনিয়া শুনিয়া আপনার মনে হৃদয় হয় উদাসী।
কেন না জানি।

(ওগো) বাতাসে কি কথা ভেসে চলে আসে আকাশে কি মুখ জাগে
(ওগো) বন-মর্ম্মরে নদী নির্ঝরে কি মধুর সুর লাগে।
ফুলের গন্ধ বন্ধুর মত জড়ায়ে ধরিছে গলে,
আমি একথা এ ব্যথা সুখ-ব্যাকুলতা কাহার চরণ-তলে
দিব নিছনি।

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা

পা পা -া II {মা -রমা জ্ঞা | রা সা -া | -া -া -া | -া সরা সন্‌া I
আ মা র ম ০ন্ মা নে না ০ ০ ০ ০ ০ দি০ ন০

২´ ৩ ০ ১
I সা -া -া | গা -া -া | গমা -পাঃ -মগঃ | পা পা -া }II
র ০ ০ জ ০ ০ নী০ ০ ০০ "আ মা র"

গঃ মা II মা পা পা | মা পধা পা | মা পা পধপা | মা গা গা I
আ মি কি ক থা স্ম রি০ য়া এ ত ০সু০ ভ রি য়া

২´ ৩ ০ ১
I গা গা গা | গা গা গমা | রগা -রগমা মা | -া -গা -মা I
পু ল ক রা খি তে০ ০না ০০০ রি ০ ০ ০
(ও গো)

২´ ৩ ০ ১
I পা পা পা | পা পা পা | পা ধা ণা | র্সা নর্সর্রা র্সা I
কি ভা বি য়া ম নে এ দু টি ন ০য়০ নে

২´ ৩ ০ ১
I ণর্সা র্ণা ণা | ধণধা ধা পা | মা -গমগা মা | -গা গা গা I
উ০ থ লে ০ন০ য় ন বা রি ০ ও গো

২´ ৩ ০ ১
I রগা -া -া | রগমা -া -া | গমপা -াঃ -মগঃ | গপা পা -া II
স • • •ঙ্গ• • • •নি• • •• "আ মা য়"

২´ ৩ ০ ১
[সা´ নর্দা দা পা মজ্ঞা]
-া -া II {পা পা পা | মজ্ঞা জ্ঞা মা | পা না না | র্সা র্সা র্সা I
• • সে সু ধা •ব চ ন সে সু খ প র শ

২´ ৩ ০ ১
I নর্সা -া সনা´ | র্সা র্সজ্ঞা´ জ্ঞর্রা´ | র্সা -র্রা র্সা | (না নর্সা -নর্সর্রা´)}I
অ • •ঙ্গে বা •জি ছে• বাঁ • শি • •গো •••

১ ২´ ৩ ০ ১
I -না না -া I না র্সা র্সা | না র্সর্ঋা র্সা | নর্সা না না | -দা দা পা I
• তা ই শু নি য়া শু •নি য়া •আ প না র ম নে

২´ ৩ ০ ১
I পা পা পা | পা -া পা | পা -ধা পধণা | -া ণা ণধা I
হৃ দ য় হ য় উ দা • •সী• • কে •ন

২´ ৩ ০ ১
I পধা -া পা | পা -ধপা -মা | মা -পমা -গা | গপা পা -া II
না • • জা • • • নি •• • "আ মা য়"

১ ২´ ৩ ০
সরা -া সন্া I {সা মা জ্ঞা | রা সরা সন্া | সা সমা জ্ঞা |
ও • গো বা তা সে কি ক থা ভে সে চ

১ ২´ ৩ ০
রা সরসা ন্া I সা গা গা | গা গরা গা | (গমা -া -জ্ঞরা |
লে •আ• সে আ কা শে কি সু• খ জা • ••

১ ০ ১
রজ্ঞমা জ্ঞরা সন্া)}I গমা -গা মপমা | -া গা মা I
•গে• (স• খি•) জা • •গে• • ও গো
ও গো

২´ ৩ ০ ১
I পা পা পা | -া পা পা | পা ধা ণা | -ধণসা´ ণা ণধা I
ব ন ম ০ র্ম রে ন দী নি ০০০ ঝ´ ০রে

১ ২´ ৩ ০ ১
I পধা ধা পা | মা গা গমা | রগা -রগমা মা | -া -া -া I
কি০ ম ধু র সু ০র লা০ ০০০ গে ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
[সা নদা দা পা]
I{ পা পা পা | মজ্ঞা -মজ্ঞা মা | পা -ধা না | সা´ সা´ সা´ I
ফু লে র ০গ ০০ ন্ধ ব ০ ন্ধু র ম ত

২´ ৩ ০ ১
I পসা´ সা´ স´না | সা´ স´জ্ঞা´ জ্ঞ´রা´ | সা´ -রা´ স´র´সা´ | (-না নসা´ -নস´রা´)} I
জ ড়া রে০ ধ রি ছে০ গ ০ ০লে০ ০ ০গো ০০০

২: ৩ ০ ১
I -না না না | না সা´ সা´ | না স´ঋা´ সা´ | নসা´ সা´ না
০ আ মি এ ক থা এ ব্য০ থা ০সু খ ব্যা

২´ ৩ ০ ১
I না দা পা | পা পা পা পা পা পা | পা -ধা পধণা I
কু০ ল তা কা লা র চ র ণ ত ০ ০লে০

২´ ৩ ০ ১
I -া ণা ণধা | পধা -া -পা | পা -ধপা -মা | গপা -পা -া II II
০ দি ০ব নি ০ ছ নি ০০ ০ "আ০ মা র"

বিদ্যারণ্য।

—:*:—

দ্বিতীয় অঙ্ক।

সপ্তম দৃশ্য।

রাজ সভা।

দয়ালরায়, মন্ত্রী, সভাসদগণ।

দয়াল। কে কোথাকার দুটো বালক তারা কিসের জন্য আমার সকল কাজে বাধা দিতে আসে? কে তারা? আমি এরাজ্যের রাজা, আমার যেরূপ অভিরুচি হবে, বিনা বাধায় আমি তা সম্পন্ন কর্‌বো। তারা কে?

সভাসদ। তা তো বটেই, নেইই তো। কে বল্‌তে পারে যে আছে! যে প'রে একবার এসে বলুকই না।

দয়াল। দেখ দেখি অত্যাচার! রাজার উপর অত্যাচার! অমন পরীর মত সুন্দরী আমার হাতে এসে পড়্‌লো, একদণ্ড চোখ মেলে আমায় দেখ্‌তেও দিলে না! যেন ভেল্কি-বাজীতে কোথা দিয়ে তাকে উড়িয়ে নিয়ে ফেল্লে এক বেটা সন্ন্যাসীর কাছে! আর সেই সন্ন্যাসীটাই বা কি? বেটা ভণ্ড! তোদের কামিনী-কাঞ্চন দর্শন স্পর্শন না নিষেধ! তুই কি হিসেবে নারী সঙ্গ করিস্? তা'পর আবার দেখ দেখি অত্যাচার, আমি আমার রাজদ্রোহী প্রজাদের দণ্ডবিধান কর্‌লাম, তাদের যেমনি কর্ম্ম তেমনি শাস্তি দিয়েছি, তাতে তোর কি? তুই কিসের জন্য তোর গুণ্ডা দুটো আর কতকগুলা ইতর সাধারণকে লেলিয়ে দিয়ে তাদের বাঁচাতে গেলি! তা'পর এই যে ব'লে পাঠিয়েছি সুভালাভালি আমার ভাবী রাজ্ঞীকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিতে। তাই কি দেবে?

ভিপ্সন। দেবে না? নিশ্চয় দেবে। রাজার হুকুম, না দেবার সাধ্যি আছে?

জনৈক সভাসদ। তা ছাড়া বলে দেওয়া হয়েছে, অমনি না দেয় কেড়ে আন্‌বে। এতক্ষণ সেখানে কাম ফর্‌সা!

দয়াল। (সহর্ষে বেশ্ বেশ্!) এই তো বীরের মত কথা। সন্ন্যাসী বেটাকে কোমরে বেঁধে আন্‌তে বলা হয়েছে?

জ-স। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা করে পিছমোড়া করে বাঁধ্‌বার হুকুম দিয়েছি। এই দেখুন না তারা এলো ব'লে।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজের জয় হোক্। কিন্তু—

দয়াল। কি কি, কি সংবাদ দূত? আমার মহিষী কোথায়?

দূত। আর সংবাদ মহারাজ! (হতাশযুক্ত ইঙ্গিত করণ)

দয়াল। কেন, কেন? কি হয়েছে? তোমরা সৈন্য নিয়ে যাওনি বুঝি?

দূত। মহারাজের আদেশ পালনে আমাদের কোনই ত্রুটী হয়নি, প্রায় শতাধিক সৈন্য আমাদের সঙ্গে ছিল, প্রথমে প্রার্থনা ও অবশেষে বল প্রয়োগ করে, সেই সুন্দরীকে নিজেদের করায়ত্তও করেছিলাম, কিন্তু—অকস্মাৎ কোথা হতে সে দিনের সে দুটো ডাকাত এসে পড়ে আমাদের হাত থেকে আবার তাকে ছিনিয়ে নিলে।

দয়াল। (সক্রোধে) কি! দুজনে তারা তোদের একশোটাকে হারিয়ে দিলে! সব শূলে যাক্।

দূত। (সভয়ে) প্রভু! আদেশ প্রত্যাহার করুন! শূলে কারুকে আর দিতে হবে না। তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই মারা পড়েছে। যে কয়জন অবশিষ্ট ছিল, তারা সেই সন্ন্যাসীর কথায় ভুলে, তাদের দল ভুক্ত হ'য়ে গেল। তারা শুধু দুজন নয়। তাদের দলে দেশের প্রায় সকল লোকেই এসে এসে যোগ দিচ্ছে।

দয়াল। বটে! আচ্ছা আমি এখনই দশহাজার সৈন্য জড় করে পাঠাচ্ছি, দেখি দেশের লোক তাদের সামে, কি করে দাঁড়ায়!

(একজন প্রহরীর প্রবেশ)

দূত। মহারাজের জয় হোক্, দ্বারে একজন গৈরিকধারী সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান। রাজসাক্ষাৎকার প্রার্থনা করছেন।

দয়াল। তোঁদের 'পরে কি আদেশ আছে? অলস ব্যক্তিগণ খেটে খাবার ভয়ে সন্ন্যাসী সেজে বেড়ায়, আমি তাদের কিছু দিয়ে রাজভাণ্ডার শূন্য করতে চাই নে। বিদায় করে দে।

দূত। রাজাধিরাজ! বিদায় কর্ব্বার অনেক চেষ্টা করেছিলাম, সন্ন্যাসী বল্লেন, তাঁকে মহারাজেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাঁর নাম বিদ্যারণ্য, ভুবনেশ্বরী মন্দিরের সেবক তিনি।

দয়াল। হো-হোঃ বিদ্যারণ্য! এইবার অরণ্যে বাস কর্ব্বেন দেখ্ছি।

সকলে মিলিয়া। (আনন্দ ধ্বনি)

দয়াল। কিন্তু দেখ! সে বড় সর্ব্বনেশে সন্নিসী! সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে দেখা-টেকা করলে কি জানি কি মন্ত্র-তন্ত্র করেই বা বসে! শেষে কি হ'তে কি হয়! তার চেয়ে অমনি ঐখান থেকে বন্দী করে ওকে বরং কিছুদিন তেজ মার্ব্বার জন্যে কারাগারে রেখে দেওয়া হোক্,—তারপর—

(বিদ্যারণ্যের প্রবেশ)

একি! তুমি কার হুকুমে রাজসভায় প্রবেশ করলে?

সভাসদগণ। কার? কার হুকুমে রে, অর্ব্বাচীন!

বিদ্যারণ্য। ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ যতী-সন্ন্যাসী তো কারো আজ্ঞাধীন নয় সর্দ্দার! এদের দ্বার সর্ব্বত্রই অবারিত। তা ভিন্ন আমি শুনেছি, তুমি আমায় বন্দী করে আনতে সৈন্যগণকে আদেশ করেছিলে। সৈন্যেরা অশক্ত হয়েছে বলে, আমি নিজেই তোমার আদেশ পালন করতে এসেছি।

দয়াল। হা-হা-হাঃ, আমার প্রতি যে তোমার বড়ই দয়া দেখা যাচ্ছে। সন্নিসী ঠাকুর! তা যখন তোমার এমন সুবুদ্ধিই হয়েছে, তখন খুব সুখেরই কথা। তা ঠাকুর! করেছ রাজদ্রোহ। এখন প্রাণ ভয়ে হাজারই রাজার শরণাগত হও, তবু রাজার ন্যায় বিচারের হাত থেকে তো এড়াতে পারবে না। ব্রাহ্মণ—মৃত্যু দণ্ড দেবার যো নেই, তপ্ত লৌহে কপালে "রাজদ্রোহী" লিখে, যাবজ্জীবন কারাগারে বন্দী রাখ্বার হুকুম দিলুম। যদিও সে লেখাটা কেউ দেখ্তে পাবে না, তা আর কি করা যাবে, তুমি যে বাইরে থাকবার মত ভদ্রলোক নও।

বিদ্যারণ্য। যদি তোমার দেওয়া দণ্ড, যথার্থই রাজদণ্ড হয়, তা গ্রহণ কর্ব্বার বিপক্ষে একটি বর্ণ উচ্চারণ কর্ব্বার শক্তি আমার নেই। কিন্তু সর্দ্দার! তোমায় আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি কে? রাজ্য অরাজক হ'লে তন্ন

হতে সকলেই ব্যাকুল হয়। সৃষ্টিকর্ত্তা সেই সকল ভয় হরণ কর্ব্বার জন্য যাঁকে সৃজন করেছেন, যাঁর এই শাস্ত্রীয় রূপ আমরা দেখ্‌তে পাই—

ইন্দ্রানিল যমার্কানামগ্নেশ্চ বরুণস্যচ
চন্দ্র বিত্তেশায়াশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতী॥

তুমি কি যথার্থই সেই "ধর্ম্মরূপী দণ্ডধর" দেবগণের অংশভূত রাজা?

দয়াল। কেন নয়?

বিদ্যা। কেন নয়? যদি রাজা তুমি, কেন তবে তোমার রাজ্যে প্রজা নিরুপদ্রবে নিজ ধর্ম্ম পালন করতে পায় না? কেন সাধ্বীর সতী-ধর্ম্ম রক্ষিত হয় না? কেন তবে দেশে এত বড় অরাজকতার অভ্যুদয় হয়েছে? এ ত রাজার লক্ষণ নয় সর্দ্দার! আমি তোমার বিরুদ্ধে তোমারই নিকট অভিযোগ কর্‌ছি,—যদি রাজা তুমি তবে নিজের বিচার নিজে করে, এই ন্যায় দণ্ডের মর্য্যাদা রক্ষা এতদিন করনি কেন?

দয়াল। জান তুমি বটু! এই মুহূর্ত্তেই তোমার ঐ নির্ভিক জিহ্বা রাজার আদেশে চির নীরবতা লাভ করতে পারে?

বিদ্যা। যে রাজা মোহ প্রযুক্ত অবিচারে রাজ্য কর্ষণ করেন, তিনি সবান্ধবে রাজ্য ও জীবন হতে ভ্রষ্ট হন। তুমি সম্মানিতগণের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেছ, নিরীহ প্রজার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন কর্ব্বার প্রশ্রয় দিয়েছ, তুমি অহৈতুক বৈর সৃষ্টি করে নিরপরাধীকে অমানুষিক নৃশংসতাচরণে বধ করতে চেয়েছ; সর্দ্দার দয়াল রায়! যে অত্যাচারের বাড়া, আর কোন অত্যাচার জগতে সৃষ্টি হয় নি, যে পাপের অপেক্ষা অপর কোন মহাপাতক, এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আর থাক্‌তে পারে না; যে পাপের অংশানুষ্ঠানে প্রবল পরাক্রান্ত কুরুরাজ সবংশে নিহত হয়েছিল; যে মহাশক্তির অবমাননা পাপে, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী, শক্তিউপাসক, শিবসেবক লঙ্কাধিপতি রাবণ বিধ্বংস হয়ে গিয়েছিল; তুমিও সেই প্রায়শ্চিত্তবিহীন মহাপাপে লিপ্ত হয়েছ। নারীর অবমাননা করেছ। তুমি দেশের, সমাজের, স্বধর্ম্মের শত্রু, সর্দ্দার দয়াল রায়! এ মহাপাপের দণ্ড নিয়ে কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারিবে কি?

দয়াল। (অর্দ্ধাভিভূতবৎ) কি সে প্রায়শ্চিত্ত?

বিদ্যা। যে লোভ-হস্তে প্রজার পীড়াদায়ক—অপহৃত ধন গ্রহণ করেছ সেই হস্তচ্ছেদন, যে কলুষিত নেত্রে সাধ্বীর প্রতি কলুষ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করেছ, সে নেত্রদ্বয় স্বহস্তে উৎপাটিত করে জ্বলন্ত অনলে নিক্ষেপ ক'র্ত্তে হবে; পার্ব্বে কি দয়াল রায়?

দয়াল। (রোষে জ্বলিয়া) রাজার প্রতি দণ্ড বিধানে তোমার কি অধিকার বিপ্র? তুমি রাজকুল-গুরু সায়ন বংশীয় নও!

বিদ্যা। আমিই 'সায়ন-মাধব'। সর্দ্দার দয়াল রায়! কিন্তু শুধু সে অধিকারে নয়, ব্রাহ্মণের অধিকারে, ব্রাহ্মণ আমি—তোমায় আদেশ কচ্ছি, তুমি রাজদণ্ড ধারণ কর্ব্বার যোগ্য নও। যোগ্যতমের হস্তে এই ধর্ম্মরূপী দণ্ডকে ন্যস্ত হ'তে দিয়ে তুমি তোমার নিজের পথে ফিরে যাও।

দয়াল। আমায় রাজ্যচ্যুত কর্ব্বার অধিকার তোমার নেই, (প্রজ্বলিত ক্রোধে) তুই ভণ্ড তপস্বী, জো-চোর! কে তোকে মানে? এক্ষুণি দূর হ, নয় তো ব্রাহ্মণ ব'লে কখ্‌খন ক্ষমা কর্ব্বোনা! তো—তো—তোকে শূলে দেবো!

বিদ্যা। আবার তোমায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, সর্দ্দার দয়াল রায়! এ ন্যায়-দণ্ড ন্যায়ের ও ধর্ম্মের মূল্যে এ-কে ক্রয় কর্‌তে হয়। অন্যায়াচারীর হস্তে এর স্থান হবে না।

(বিদ্যারণ্যের প্রস্থান)

দয়াল। চলে গেল! কেউ বাধা দিলে না? যে ওদের মাথা ক'টা কেটে আন্‌তে পার্‌বে, আমি তাকে আমার প্রধান মন্ত্রী কর্ব্বো।

তিপ্পন্। মহারাজ! ওদের মাথা আর এমন কি বস্তু? কিন্তু ওর মধ্যে একটী মাথা ব্রাহ্মণের! ব্রাহ্মণ হীনকর্ম্মী হলেও অবধ্য!

দয়াল। (সক্রোধে) ব্রাহ্মণ ব'লে কি রাজা নাকি? যারা ব্রহ্মবধকে পাতকের শ্রেণীতে ফে'লেছে, সেই শাস্ত্রকারয়া ব্রাহ্মণ ছিল বলেই নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে এত বড় একটা পক্ষপাতের সৃষ্টি করে রেখেছে! আমি কালই এই সমস্ত পচা পুরণো মান্ধাতাকেলে শাস্ত্রনীতি পরিবর্ত্তন করে নূতন নীতিশাস্ত্রের প্রবর্ত্তন কর্‌বো। কে ওর মাথা আন্‌তে যাবে বল? মন্ত্রী, তিপ্পন্! তুমি তোমার মন্ত্রিত্ব বজায় রাখ্‌তে চাও?

তিপ্পন। চাই বই কি মহারাজ! কিন্তু আমার পরামর্শ শুনুন। শুধু ওই মাথা কয়টি তো সব নয়, এখন ওদের সঙ্গে এ রাজ্যের অনেক লোকেই যোগ দিয়েছে, তার চেয়ে দ্বারের নিকট পাঠান রয়েছে, তারাই তো আপনাকে সিংহাসনে বস্‌তে সাহায্য করেছিল, এই সিংহাসন বজায় রাখ্‌তেও, তারাই আপনার সহায় হয়।

দয়াল। (সহর্ষে) উত্তম প্রস্তাব হয়েছে মন্ত্রি! "মন্ত্রীকুলশেখর" এই উপাধি তোমায় আজ আমি দান কর্‌লেম। তবে আর বিলম্ব কিসের? পাঠান সেনাপতি মহবুব্ খাঁর নিকট, পত্র লিখে দূত প্রেরণ কর। আসুক তারা, পাঠান সৈন্যের পায়ের চাপে, বিজয়নগরের শস্যক্ষেত্রে হোলির আবীর উড়ে যাক! অর্দ্ধেক রাজ্য তাদের দেবো সেও ভাল, তবু ওদের দেবো কেন? ওরা কে যে আমার রাজ্য কেড়ে নেবে? কিন্তু আমার ভাবী মহিষীকে আমি কেমন করে পে'তে পার্ব্বো! তিপ্পন! তিপ্পন! আমার সেই বিদ্যুৎবরণী, অশনি ভরা সজল জলদ তুল্যা অভিনব শ্রী সেই ভুবনমোহিনীকে না পে'লে, আমার রাজ্য ভোগ বৃথা বোধ হচ্ছে। তুমি শীঘ্র দূত প্রেরণ কর মন্ত্রি! আসুক পাঠান, বিজয়নগর চূর্ণ করে ফেলে, তুঙ্গভদ্রার সলিল রাশি আলোড়িত করে যেখান থেকে পাক্ তারা আমার হারানিধি হরণ করে এনে দিক্।

তিপ্পন। এখনি দূত প্রেরণ কর্‌ছি মহারাজ! (মন্ত্রীর প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য।

বিজয়নগর ও হাম্পির মধ্যবর্ত্তী বিশাল প্রান্তর।
যুদ্ধমান সৈনিকের আস্ফালন, অশ্বহ্রেষা, অস্ত্র ঝন্‌ঝনা শুনা যাইতেছিল। পর্ব্বত
পাদদেশে, বৃক্ষতলে বিদ্যারণ্য ও অলোকা।

অলোকা। আমার প্রাণ যেন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সমরাঙ্গণ পানে ছুটে যেতে চাচ্ছে। মনে হচ্ছে, ওখান থেকে কে আমায়, অঙ্গুলী করে বল্‌চে তোর প্ররোচনায় যারা মুগ্ধ হয়ে সমর শিক্ষায় আত্মবিসর্জ্জন দিতে ছুট্‌লো, তাদের সেই দাবানলে ঠেলে দিয়ে, নিজে তুই লুকিয়ে রইলি? যখন নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে উন্মাদনাকারী সঙ্গীতে

প্রসুপ্ত প্রাণগুলোকে জাগিয়ে তোল্‌বার জন্য, ছুটে ছুটে বেড়িয়েছিলি, তখন তোর এ ভীরু নারীত্ব কোথায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিল? আদেশ করুন! আমিও আমার অত্যাচারিত ভাইদের সঙ্গে এ অরাজকতার বিরুদ্ধে অধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে মহাসমর-সাগরে ঝাঁপ দিতে যাই।

বিদ্যারণ্য। যদি প্রয়োজন হয়, শুধু তুমি কেন—এ ন্যায় যুদ্ধে অত্যাচারের বিরুদ্ধে তোমার দেশের সকল নারীকেই আমি তাঁদের নিজ নিজ ধর্ম্ম, সম্মান, পতিব্রতা রক্ষার জন্য, ওই জ্বলন্ত বহ্নি-পর্ব্বতে ঝাঁপ দিতে সবিনয়ে আহ্বান করবো। রাজপুত সতীরা জহর-ব্রতের অনুষ্ঠান করে থাকেন। মদ্র কন্যাগণ সে ব্রত সংশোধন করেই পালন কর্বেন। তাঁরা যে অনলের হোত্রী হবেন, সে যজ্ঞাগ্নি। বাহ্যঅগ্নি নয়, সমরাগ্নি। নারীকে গৃহলক্ষ্মী রূপে, গৃহ মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতেই সাধারণতঃ নর অভ্যস্ত, কিন্তু আমি জানি মা! তাঁরা কেবল মাত্র গৃহিণী অন্নপূর্ণাই নহেন, শিব-গেহিনীর ন্যায় মহাশক্তির প্রধান অংশসম্ভূতা, লক্ষ্মী স্বরূপিণী কল্যাণীগণ, রণক্ষেত্রে মহিষাসুর বিমর্দ্দিনী চণ্ডীরূপ পরিগ্রহ করিতেও সমর্থা। কিন্তু সে এখন নয়। দেবাসুর যুদ্ধে যখন দেবতারা পরাভব প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তখনি তাঁদের নিজ নিজ তেজাংশসম্ভূতা চণ্ডিকাকে প্রয়োজন হয়েছিল? সর্ব্ব শক্তির আধারভূতা তখনই দেবগণকে মহাভয় হ'তে ত্রাণ করেছিলেন? ঐ শোন! কোলাহল ক্রমেই চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ঐ যে—এই দিকেই না সকলে পালিয়ে আসছে! ঠিক্, সেনাপতি বিনায়ক, আদেশের পর আদেশ দিয়েও ওদের নিবৃত্ত করতে পারছেন না। অলোকা! এইবার তোমার রণ-পিপাসা মিটাবার কাল এসেছে! যাও, দেখ কি করতে পারো।

(অলোকার দ্রুত প্রস্থান। একদল সৈন্যের প্রবেশ।)

প্রঃ সৈনিক। হাঃ-তোর দেশ! নিজেই যদি মরে গেলাম, তবে দেশের কি ভাল মন্দ ঘট্‌লো না ঘট্‌লো, তাতে আমারই কি আর তোরই কি? কথায় বলে—আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

২য়-সৈঃ। ঠিক বলেছিস্ ভাই! পাঁচ কথার এক কথা বলেছিস্, বাপের নামই থাক। আর নিজের নামে কাজ নেই। কে ক'দিন আছি রে ভাই! আজ মরিতো কাল দুদিন হবে। কেনই বা এমন মানুষ জন্মটা গোঁয়ারতুমি করে ফুরিয়ে দিই! তুমিও যেমন—

তৃ-সৈ। "ভস্মীভূতেষু দেহেষু পুনরাবর্ত্তনং কুতঃ?" এ অথর্ব্ব বেদের প্রথম বচন হচ্ছে। আমি মহীধরের কাছে শুনেছি। সে আবার কে ছিল জানিস্?—সে ছিল সায়ন ঠাকুরকে চিনিস্ তো? মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ব'লে, রাজ সভায় দেব সভায় যাঁর নামে ধন্যি ধন্যি পড়ে গিছ্‌লো! এই সব ফ্যাসাদ্ উপস্থিত হতেই, কাশীধামে না জগন্নাথধামে কোথায় পালিয়ে গিয়ে বসে আছেন। সেই ছোট সায়ন ঠাকুরের মামার খুড়তুতো শালার নিজের ভগ্নিপতি হচ্ছে কিনা, আমার বন্ধু মহীধরের জাঠ শ্বশুড়ের আপন দীক্ষা গুরু।

(অশ্ব পৃষ্ঠে বিনায়কের প্রবেশ)

বিনা। সৈন্যগণ! আমি তোমাদের সেনাপতি। আমার আদেশ তোমরা সর্ব্বতোভাবে পালন কর্ব্বার শপথ নিয়ে এই সৈনিকব্রতে ব্রতী হয়েছিলে। কিন্তু আজ বীরধর্ম্ম বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত এক সঙ্গেই তোমরা বিসর্জ্জন দিচ্ছ? আদেশ তো দূরের কথা, অনুরোধ অনুনয় পর্য্যন্ত না শুনে, নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায়, সমর ক্ষেত্র ত্যাগ করে পালাচ্ছ? ভেবে দেখেছ কি, যে—এই যে অর্ব্বাচীনতা আজ তোমরা প্রদর্শন করছ, এর ভবিষ্যৎ ফল কি? যে জীবনের মমতা তোমাদের ক্ষাত্রধর্ম্ম বিস্মৃত করিয়েছে; সেই জীবনকেই যে, এই ভীরুতা দ্বারা অধিকতর বিপদাপন্ন করা হচ্ছে, এটাও একবার ভেবে দেখবে কি?

প্রঃ সৈঃ। ভাব্‌বার আগেই যে চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছি, সাক্ষাৎ মরণের সাম্‌নে ঠেলে দিচ্ছেন! করি কি !

বিনা। সদ্দার দয়াল রায় আজ স্বধর্মীর বিরুদ্ধে পাঠান-সাহায্য ভিক্ষা নিতে দণ্ডায়মান। তোমরা আজ এই হীনকর্ম্মী ধর্ম্মবৈরীকে যে প্রশ্রয় দান কর্‌লে, অতঃপর কিরূপ সঙ্কোচহীন সাহসে ওরা ওদের অত্যাচারের আগুণে, তোমাদের পাপে তোমাদের অতি সুকুমার শিশুটী পর্য্যন্ত দগ্ধ করে এ মহাহীনতার প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বে, এ কথা স্মরণ কর্‌তে তোমাদের বুকের মধ্যে বীরের রক্ত উচ্ছসিত হয়ে উঠ্‌ছে না ? ধিক্ ! ধিক্ ! শতধিক্ ! সেই অতি ঘৃনিত জীবনে ! যে জীবন স্ত্রী পুত্রের অনাহার, অবমাননা, তাদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার, হত্যা, লুণ্ঠন প্রভৃতি দেশব্যাপি অরাজকতার প্রতিশোধ নিয়ে, বীরের অক্ষয়স্বর্গ কামনা না করে শৃগালের ন্যায় গহ্বর মধ্যে লুক্কায়িত হয়। আর সহস্র ধিক্ তাদের সেনাপতিকে ! যে তাদের এই মহাকলঙ্ক লাঞ্ছনা হ'তে মুক্ত কর্‌তে অক্ষম !

প্রঃ সৈঃ। দেখুন ! বুঝি সব, কিন্তু এ প্রাণটা যে সত্যিকার, দেশের জন্যে এ প্রাণটা দিয়ে দিলেই, যদি দেশের দুঃখ দূর হয় ; তা হ'লেও না হয় কোনমতে দিই। কিন্তু তা' যদি না হয়, তবে অনর্থক প্রাণটাই তো খোয়া গেল। কারু কোন কাজে ও লাগ্‌লো না। এতে যে প্রাণের উপর বড্ড মায়া আসে। আর স্বর্গ-ফর্গ ওসব ভাল বুঝিওনে, চিনিওনে। চাই যে দেশটা ভাল হয়, ছেলে-পিলেগুলো খেয়ে-দেয়ে বাঁচে। লুটতরাজ-গুলো থেমে যায়। তা নৈলে আর কি ? ম'রে যাবো, ফুরিয়ে যাবে। কে-কার ?

বিনা। মূর্খ কাপুরুষ সব, কর্ম্ম না করেই তোরা ফল পে'তে চাস্।

তৃ সৈঃ। মূর্খ আমরা নই, যারা দেশের লোকের হাত থেকে দেশ রক্ষা কর্‌তে চাইছে, মূর্খ সেই তারা ! দেশে অরাজকতা, অত্যাচার কিন্তু সে অরাজকতা অত্যাচারের মূল কারা ? কোন বিদেশী নয়। সে এ দেশেরই লোক। তবে এর চেয়ে আর মূর্খতা কি আছে মশাই ! যারা নিজের গলায় নিজে ছুরি দিচ্ছে ; তাদের হাত ধরে আর কতক্ষণ বসে থাকা যাবে বলুন দেখি ! সে তো সুযোগ পেলে আবার দেবে।

বিনা। এ যুক্তি নিতান্ত অর্থহীন ! যে উন্মাদ হয়েছে বলে, নিজের গলা নিজে টিপে ধর্‌তে যাচ্ছে ; তার হাত চেপে ধরে, আত্মহত্যা থেকে তাকে রক্ষা কর্‌তেই হবে। পরস্পর আজ পরস্পরের বুকে ছুরি মার্‌ছে বলে কি, সে ছুরি নিরাপদে পড়্‌তে দিতে হবে ? বাধা দেবে না ?

দু-তিনজন। (মৃদু গুঞ্জনে) যদি সে বাধা কেউ না মানে, না বোঝে ?

(দূরে সঙ্গীত ধ্বনি, সকলে উৎকর্ণ, দেব দাসীগণ সহ অলোকার গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গীত।

মিশ্র ইমন।

হও গো ধন্য রাজার জন্য জীবন করিয়া পণ।
ধর্ম্মের তরে সঁপি অকাতরে জীবন যৌবন ধন ॥
তাহে মৃত্যু বরিতে হয় হোক না কি এত ভয়।
অমর কেহ তো নয় ভঙ্গুর এ জীবন ॥
জীবন করহে পণ ॥

যদি স্বজনের হিতে প্রাণ পারো দিতে জন্ম সফল হবে,

যাবৎ এ ক্ষিতি রহিবে কীর্ত্তি অক্ষয় যশ রবে,

দিয়ে নশ্বর প্রাণ লভ অবিনশ্বর মান,

যে জন কীর্ত্তিমান চিরজীবি সেই ভবে।

শুধু বাঁচিয়া কি ফল তবে ?

যদি প্রাণ পে'তে চাও মান পে'তে চাও,

অর্পহ প্রাণ মন।

দেশের জন্য দশের জন্য জীবন করিয়া পণ ॥

প্রঃ সৈঃ। ওরে ভাই! এই যে স্বয়ং মা আবার আমাদের ফিরুতে এসেছেন। তবে তো আর পালাতে পারিনে। চল ভাই! চল সব মায়ের আশীর্ব্বাদ মাথায় ধরে নূতন উদ্যমে ছুটে চল্। মা যখন সহায় রয়েছেন, তখন শত্রুর বাবা শত্রু এলেও আমাদের সঙ্গে পার্‌তে হয় না। হোক্ না তারা জঙ্গী-জোয়ান, হোক্ না তারা পাঠান! আমরাও যে মায়ের সন্তান!

২য় সৈঃ। সত্যিই তো মরণ কোথা নেই রে ভাই? বিছানায় শুয়ে যে লোক আথ্‌সার মারা যাচ্ছে! তবে বিছানায় শুই কেমন করে? যুদ্ধে জয়ীও হ'তে পারি, মরণও হ'তে পারে! হলো হলো-ই! অমর তো আর কেউ জন্ম নেয়নি!

তৃ-সৈঃ। মর্‌তে যদি হয়, তো বীরের মত মরাই ভাল।

চ-সৈঃ। ঠিক্, তবু তো একটা নাম থাক্‌বে। নাতি-পুতিরা বুক ফুলিয়ে একদিন পাঁচজনার কাছে বড়াই করে বল্‌তে পার্ব্বে যে, আমাদের বাপ-ঠাকুরদা রাজার জন্য প্রাণ দিয়েছিল। সেটাই কি কম কথা!

পঃ-সৈঃ। নে-চল্, কিসের ভয়?

সকলে। চল্ চল্,—জয় ভুবনেশ্বরীর জয়! জয় নতুন রাজার জয়!

(অলোকাকে প্রণাম করিয়া বীরদর্পে প্রস্থান)

বিনা। (সহাস্যে) অলোকা! তুমিই এ যুদ্ধের সেনাপতি! আমি খেলার পুতুল মাত্র।

(অশ্বে কশাঘাত করিয়া প্রস্থান)

অলোকা। (স্বাগতঃ) বীরের মত সুন্দর জগতে আর কিছুই নেই। সেনাপতির বেশে ওঁকে আজ কি সুন্দরই মানাচ্ছে। (প্রকাশ্যে) আমি সেনাপতি নয়, তাঁর সহকর্ম্মিণী মাত্র।

উর্ম্মিলা। (হাসিয়া) "সহকর্ম্মিণীর" চাইতে, সহধর্ম্মিণী শব্দটা এবং পদটা, দুইটাই অনেক ভাল।

অলোকা। (কৃত্রিম কোপে) মাথার উপর মৃত্যুর কৃপাণ ঝুলচে, এ হাসি তামাসার সময় বটে!

সুরজা। তা মৃত্যুর তো আর হাসি তামাসায় মানা নেই। মর্‌তে যদি হয় তবে যেন হেসেই মর্‌তে পারি। শত্রুরাই কেঁদে মরুক্। সেই গানটা গাই, আয় না ভাই যমুনা!—মরিতে যদি হয়, সেই টে—

সকলে—

গীত।

সাহানা।

যেন মরার মত মরিতে পারো মরিতে যদি হয়।
মৃত্যু কোথা? মরে না জীব নিত্য সে তো শুদ্ধ শিব,
দেহের নাশ জানিও শুধু বিনাশ তার নয়।
খেদ কি তাহে পুরাণো গিয়ে নূতন যদি হয়?
কাঁদিয়া মিছে মরিস্ কেন? মরণে-ই এত ক্ষতি কি হেন?
বিফল প্রাণ সফল করো মরণ করি জয়।
মরিবে যদি হাসিয়া মর কিসেরই এত ভয়!

নবম দৃশ্য।

—§*§—

গ্রাম্যপথ, দেবদাসীগণ সহ অলোকার প্রবেশ।

গীত।

ভৈরব।

আমায় ডেকে নাও মা, ডাক দিয়ে নাও
তোমার ঐ অভয় পথের যাত্রী করে।
চলে যাবার শক্তি দে মা;
আমার এ ঘোর মোহের সুপ্তি হরে॥
তোমার নামে ডাক পড়েছে,
হাজার হাজার লোক ছুটেছে,
বুকে আমার ঢেউ উঠেছে,
আমি কেমন করে রইবো ঘরে।
ওমা তুমি যখন ডাক দিয়েছ,—
ভাবনা কোথা ভয় বা কারে॥
তোমার নামের জয় ধ্বনি,
মেঘেতে খেলায় অশনি,
বিপদ বাধা তুচ্ছ গণি,
তোমার চরণ বক্ষে ধরে।
হৃদয়েতে বল পেলে মা,
বাহুর কৃপাণ আপনি ফেরে॥

(কুটীরবাসী নর নারীগণের সসম্ভ্রমে বহির্গমন)

প্রথম। কি আদেশ জননি! শুনেছি আপনারই আজ্ঞায় পলায়মান সৈন্যেরা ফিরে গিয়ে তুমুল যুদ্ধে সম্পূর্ণ জয় লাভ করেছে। রাজধানী এখন নূতন রাজারই হস্তগত হয়েছে। পাঠানগণ বিতাড়িত হয়েছে। দয়াল রায় বন্দীকৃত, ও তাঁর সেনাপতি চণ্ডবল জী রাজার নিকট আশ্রয় নিয়েছেন। এতদিনে বোধ হচ্ছে যেন, এ রাজ্যের উপর হতে, অমঙ্গল ধুমকেতুটা নেমে যাচ্ছে। তা' এ সবই তো শুন্‌তে পাই মা, যে তোমারই কৃপায়!

অলোকা। না বাছা! আমার কৃপায় নয়। মা ভুবনেশ্বরীর দয়ায়। আর তাঁরই সেবক, প্রভু বিদ্যারণ্যের চেষ্টায়। আমি তাঁদের অধমা সেবিকা মাত্র। শুধু তাঁদের আদেশ প্রচার করে বেড়াই।

জনৈকা নারী। আজ এ দীন-দুঃখীর কুটীরে, কি জন্য ও-রাঙ্গা চরণের ধুলো পড়েছে মা! জননি! আমি লোক মুখে শুনেছি, তুমি মা ভুবনেশ্বরীর নিজের মেয়ে। মা একদিন দেশের লোকের অত্যাচার সইতে না পেরে এক দুঃখী মেয়ে মানুষের রূপ ধরে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দেশ রক্ষার জন্য হুকুম দিতে এসেছিলেন। তাঁর দু'হাত ধরে দু'জনে কার্ত্তিক আর গণেশ ঠাকুর রাজা আর সেনাপতির রূপ ধরে এসেছিলেন। আর তুমি নাকি ছিলে মা তাঁরই কোলে, কে যে তা জানিনে, মা লক্ষ্মী কি সরস্বতী কেউ হবেন। সেই থেকে এ রাজ্যের ভোল ফিরে গেছে।

অপরা নারী। আমি বলি মা লক্ষ্মীই হবেন। না হলে গেরুয়া পরা সন্ন্যাসী তিনি, অত চাই চাই 'সোনা বৃষ্টি' করালেন কেমন করে? সেই সোনাতে সাতটা রাজ্যি থেকে ধানে গমে নূতন রাজধানী নাকি গোলাবাড়ী হয়ে উঠেছে। আর মা এ পাপ মুখে কি বল্‌বো! তোমার কল্যাণে দেশের উপবাসী দুঃখী প্রজারা পেট ভরে কি খাওয়াটাই যে খেয়ে নিচ্ছে মা! তেমন খাওয়া কেউ কখন খায়নি! দেশ যেন দেখ্‌তে দেখ্‌তে উথলে উঠ্‌ছে।

প্রথমা নারী। তা মা যদি দয়া করেই এসেছ; তবে আমার এ দুয়োরটাতে একবার ঐ চরণ স্পর্শ করিয়ে যাও মা। ঘর কন্না আমার অমনি করে উথলে উঠুক।

অলোকা। (হাসিয়া) না মা, চরণে আমার স্বর্ণ বৃষ্টি হয় না। যিনি এই স্বর্ণ বৃষ্টি করাতে পারেন, আজ তাঁরি জন্য আমি তোমাদের সাহায্য চাইতে এসেছি।

প্রথমা নারী। হাঁ মা, এইবার তা হ'লে দেশ ঠাণ্ডা হলো?

অলোকা। দেশের অরাজকতা এইবারে বিদূরিত হবে। তাতে আর সন্দেহ নেই। মহারাজ হরিহর ও রাজ সেনাপতির অসাধারণ বীরত্ব কৌশলে, দেশ-বৈরী সর্দ্দারের দল ও পাঠানগণ পরাভূত হওয়াতে, দেশে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট শান্তি স্থাপিত হয়েছে। মহাড়ম্বরে নব রাজধানী নির্ম্মাণকার্য্য চল্‌ছে। জন সাধারণ সুবিচার লাভ কর্‌চে। অন্যায় অত্যাচার দেশ ত্যাগী হয়ে গেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে আর এক বিষম সংবাদ এসেছে—এই স্বর্ণবৃষ্টির কাহিনী শ্রবণান্তে পাঠান রাজ ভুবনেশ্বরী মন্দির লুণ্ঠন ও আমাদের অসীম যোগৈশ্বর্য্যশালী প্রভুকে ধৃত করবার জন্য, আবার এক মহাবাহিনী প্রেরণ কর্‌ছেন।

দ্বিতীয়া নারী। হ্যাগা মা, এ কি সত্যি! তবে কি হবে মা?

অলোকা। প্রভুর জন্য আমাদের ভাবনা নেই। তিনি নিজেই নিজের রক্ষক, কিন্তু এ ক্ষেত্রে বড় বিষম ব্যাপার উপস্থিত! শোনা যাচ্ছে সৈন্যদলের প্রতি আদেশ আছে, যতক্ষণ না স্বর্ণ প্রস্তুতকারী সন্ন্যাসীকে বন্দী কর্‌তে সক্ষম হবে, ততক্ষণ নগর গ্রাম বিপর্য্যস্ত করে অনুসন্ধান কর্‌তে বিরত হবে না। এ জন্য যদি বিজয়নগর রাজ্য মরুভূমে পরিণত কর্‌তে হয় তাও কর্‌বে। প্রভু অটল। তিনি স্থির করেছেন দেশের একবিন্দু শান্তি নাশ করে, নিজেকে তিনি রক্ষা কর্‌বেন না। পাঠান এলেই রাজ্য সীমানায় গিয়ে তাদের হস্তে আত্মসমর্পণ কর্‌বেন।

তারপর যোগবলে দেহ ত্যাগ করা, তাঁর পক্ষে তো কঠিন নয়। কিন্তু তোমরা কি তাঁর অমূল্য জীবনের এই পরিণাম দেখ্‌তে চাও? না নিজেদেরই ভবিষ্য-উন্নতির জন্য তাঁকে ধরে রাখ্‌তে চাও?

সকলে। চাই।

অলোকা। যিনি তোমাদের জীবন-সম্মান স্বচ্ছন্দ দান করেছেন, তোমরা তাঁর জন্য কি কিছুই দিতে পারবে না?

সকলে; সর্ব্বস্ব দান কর্‌বো।

অলোকা। তবে প্রস্তুত হয়ে থেকো, শত্রু আগত প্রায়, আমি চল্লেম। এখনও বহু স্থানে ভ্রমণ কর্ত্তে হবে।

(গ্রামিকগণের সোৎসাহে প্রস্থান)

কোথাও হতাশ হতে হচ্ছে না, নিশ্চয়ই আমাদের কার্য্য সফল হবে।

(বিনায়কের প্রবেশ)

বিনা। এ কি! এখানেও যে তুমি! যেখানেই যাই সকলেই বলে, মা ভুবনেশ্বরী আমাদের আদেশ দিয়ে গেছেন। অলোকা! আমি নামেই সেনাপতি। কিন্তু যথার্থ যদি সেনাপতিত্ব কেউ করে থাকে সে তুমি!

অলোকা। (সলাজ হাস্যে) আমি সেনাপতি কিসে বীর! সৈন্য সংগ্রহে কিছুমাত্র বীরত্বের প্রয়োজন হয় না। এ তো সর্ব্বজন বিদিত। সেই অগণ্য শত্রু সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করে সিংহ বিক্রমে কে তাদের পরাক্রম খর্ব্ব করেছিল? অক্ষমা নারীর বাহু কি সেই অমোঘ শক্তি ধারণে সমর্থ? সে দৃশ্যে আমার অনেক অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেছে। নারী-শক্তি পুরুষ-শক্তি যে ঠিক এক নয়, এতদুভয়ের মিশ্রণই যে প্রয়োজন, ভিন্ন ভাবে ইহার কোনটাই যে সার্থক নয়, এ কথা আমি বুঝেছি।

বিনা। (প্রীত চিত্তে) আমার বিশ্বাস, এ যুদ্ধেও আমরা অকৃত কার্য্য হবো না। একবার জয় লাভে দেশ-বাসীর মনে যুদ্ধ-ভীতি বিদূরিত হয়ে, তার স্থলে বরং একটা যুদ্ধ-প্রীতি দেখা দিয়েছে। এবার সকলেই উৎসাহিত।

অলোকা। (স্বগতঃ) জয়ী হতেই হবে. না হলে এ অনাথিনী অলোকা যে সর্ব্বহারা হবে। (প্রকাশ্যে) ধর্ম্মই ধার্ম্মিকের রক্ষক।

বিনা। [ক্ষণ পরে অতি মৃদুস্বরে] এখনকার মত, এই দেখাই শেষ দেখা,—যদি এ যুদ্ধে জয়ী হই,—আবার দেখা হবে। অলোকা! সেই প্রথম দিনের কথা মনে পড়ে? সেই সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাতেই তোমার অন্তর্যামী তোমাকে তোমার চিরন্তন আত্মীয় চিনিয়ে দিয়েছিলেন মনে আছে অলোকা! আবার দেখা হয়, সে দিনের সে কথা যেন স্মরণ থাকে!

অলোকা। সেনাপতি মশাই! যুদ্ধ যাত্রা আত্মীয়তা ছিন্ন করণার্থ, আত্মীয়তা পাতানের এ সময় নয়।

বিনা। তা জানি অলোকা! কিন্তু ধর যদি মৃত্যুই আসে, তবে সে সময়টাকে কেন একটা আবেগ ভরা স্মৃতি সুখে সুমধুর করে না নিই, তবে এখন আসি। [প্রস্থান]

অলোকা। (স্বগতঃ) পুরুষ জাতির এই এক কেমন রোগ! ওদের জয়শার সীমা নেই। জড় চেতন সবার উপরেই ওরা, ওদের অধিকার বিস্তৃত করতে চায়। (আপন মনে হাসিয়া) তা ওদের দোষই বা দিই কেমন করে? মন যা চায়, কেউ না হয় সেটা কোটে যাই—এখন ও অনেক কাজ বাকী এস ভাই! সবাই এসো।

[সকলের প্রস্থান]

দশম দৃশ্য।

—:*:—

রণক্ষেত্রের একপ্রান্ত, যুদ্ধ করিতে২ একদল পাঠান ও একদল হিন্দু সৈনিকের প্রবেশ।

হিন্দু সৈঃ। মনে করেছ বিজয়নগরের লোকগুলো সব মরে গেছে, সেবার হেরে পালিয়েও লজ্জা হয় নি, আবার এদেশে মুখ দেখাতে এসেছ, এবার আর ফিরে দেশে কাউকে কালা মুখ আর দেখাতে যেতে হবে না। সেটা খুব জেনে রেখো।

পাঠান সৈঃ। হিন্দুরা খুব বাক্‌যোদ্ধা সেটা বরাবরই জানা ছিল, আজ এ নূতন শোনা নয়।

হিঃ সৈঃ। কার্য্যবীর! তবে কার্য্যদ্বারাই প্রমাণ করা যাক্ এসো।

(পরস্পর যুদ্ধ করিতে২ প্রস্থান, অপর দিক হইতে যুদ্ধমান হরিহর ও মহবুব খাঁর প্রবেশ)

হরি। এখনও নিবৃত্ত হও পাঠান বীর! অনর্থক কেন প্রাণ হারাবে। তোমার বহু সৈন্য হত হয়েছে, অবশিষ্ট কয়টিকে নিয়ে, এখনও ইচ্ছা করলে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করতে পার। বীর তুমি, তোমার অস্ত্রশিক্ষা ও বাহুবল অনন্য সাধারণ। তোমার বীরত্ব কৌশলে আমায় তুমি মুগ্ধ করেছ, তাই তোমায় আমি বন্ধুভাবে এই সৎপরামর্শ দান করছি জেনো।

মহবুব। হিন্দু বীর! তোমার হস্ত যেমন শিক্ষিত, বুদ্ধিও তেমনই প্রখর। বুঝেছি, তুমি তোমার মনোগত ভাব এই ভাবেই ব্যক্ত করছ, কিন্তু এসব কৌশল কেন? নিজে তুমি যদি যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে থাক; স্পষ্ট করেই বলতে পার। দয়ালরায়ের পরিবর্ত্তে তোমাকেই বিজয়নগরের রাজা স্বীকার করে, তোমাদের সঙ্গে সুলতানের প্রতিনিধিত্বে সন্ধি সংস্থাপন করতে আমি প্রস্তুত আছি, সর্ত্ত কেবল সেই হিন্দু ফকীরকে আমাদের হাতে দিতে হবে। শুধু দেওয়া নয়, আমাদের রাজ্য সীমায় সঙ্গে গিয়ে তার দ্বারা এক পসলা স্বর্ণ বৃষ্টি করিয়ে প্রমাণ করে দিতে হবে যে, সেইই স্বর্ণবৃষ্টিকারী ফকীর, জাল নয়।

(বিনায়কের অপর একজন পাঠান সৈন্যাধ্যক্ষের পশ্চাতে প্রবেশ)

বিনা। কাপুরুষ! এই শক্তি নিয়ে তোরা, এই অহেতুক লোক ক্ষয় করতে এসেছিলি? (অস্ত্রাঘাত ও পাঠান সৈন্যাধ্যক্ষের পতন)

পাঃ সৈঃ। কাফের! সয়তান! (মৃত্যু)

মহবুব। ইয়া আল্লা! (মূর্চ্ছা)

হরি। সেনাপতি! পাঠান বীরকে সত্বরে সযত্নে শিবিরে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হোক্। সেখানে এঁর সেবা যত্নের যেন কোন ত্রুটী হয় না। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে চল্লেম, আমাদের মধ্যে একজনও সেখানে উপস্থিত না থাকলে, হয় ত এ নিশ্চিত জয়ের মুখেও কখন কি বিশৃঙ্খলা ঘটে, বলা যায় না।

(হরিহরের প্রস্থান)

বিনা। (সৈন্যদের প্রতি) এঁকে সাবধানে নিয়ে যাও (মহবুবের মূর্চ্ছিত দেহ সৈন্যগণের উত্তোলন) পথে হয় ত তোমাদের দেখতে পেয়ে নবোৎসাহে এঁকে তোমাদের হাত হতে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে। শোণিতক্ষয়ে আমারও শরীর ক্রমে অবসন্ন হয়ে আসছে। সকলে সাবধানে এসো।

(সকলের সহিত ধীরে ধীরে প্রস্থান)

—

একাদশ দৃশ্য।

—:*:—

বিজয় নগর রাজ সভা।

বিদ্যারণ্য, হরিহর, বিনায়ক, কম্প, মুদপ্প, মারপ্প, মহামন্ত্রি,
অমাত্যবর্গ ও প্রতিহার।

বিদ্যা। রাজ্যে ঘোষণা করা হোক্, অভিষেকোৎসবোপলক্ষে, রাজা কল্পতরু ব্রতাচরণ কর্‍বেন। এই সাম্রাজ্য বাসীদের মধ্যে যার যা অভাব আছে, তা যেন অকুণ্ঠিত চিত্তে, রাজ সকাশে জ্ঞাপন করে। সে দিন যেন রাজ্যের মধ্যে কেহও অসুখী বা অভাবগ্রস্ত না থাকে। মহারাজের এই রূপই অভিলাষ।

অমাত্য। প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য। এখনই ঘোষক নিযুক্ত কর্‍ছি।

[প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ]

শত শত ঘোষযন্ত্রধারী ঘোষকগণ প্রচারার্থ নিয়োজিত হয়ে গেছে।

বিদ্যা। অতি উত্তম হয়েছে। (নিম্নস্বরে) হরিহর! তুমিই এখন রাজা। তোমারই এখন সকল প্রকার আদেশাদি নিজ মুখে প্রদান করা কর্ত্তব্য।

হরি। (বিজড়িতভাবে) প্রভু বিদ্যমানে এ দাসানুদাসের......

বিদ্যা। না হরিহর! এ রাজসভায় আমাদের অন্য কোন সম্বন্ধ প্রকাশ পাওয়া উচিত নয়, তাতে রাজ-কার্য্যের অসুবিধা এবং রাজকর্ত্তব্য পালন সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ায় বাধা পড়্‌তে পারে। এখানে তুমি দেশের রাজা, আমি তোমার মন্ত্রণাদাতা মন্ত্রী স্থানীয়। এই ধর্ম্মাধিকরণের আসনে যে অধিষ্ঠিত, সে বিজয়নগরের মহারাজ, হরিহর রায়। সে বিদ্যারণ্যের শিষ্য নহে, তার রাজ্যভারও নহে, অষ্টদিকপালের অংশ সম্ভূত নরদেহধারী ইন্দ্র!

হরি। (সলজ্জে) ভাই এ সিংহাসনে এ চিত্ত কিছুমাত্র আকৃষ্ট নয়।

বিদ্যা। (কর্ণপাত না করিয়া) রাজ ভ্রাতৃত্রয় উপস্থিত। এঁদের যথাক্রমে যোগ্যতানুসারে এক এক প্রদেশের শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রদান করা অনাবশ্যক! যে যে প্রদেশ আপাততঃ সুশাসিত নয়, সেই সেই স্থানে ইঁহারা নিজ নিজ বাহু বল ও কুটবুদ্ধি সহকারে ধীরতার সহিত পরিচালিত কর্‌লেই প্রজাবর্গ সহজেই বশীভূত ও তত্তৎ দেশের শ্রীবৃদ্ধিও হতে পার্‍বে।

হরি। অসাধারণ রণ-পণ্ডিত প্রিয় ভ্রাতা সেনাপতি বিনায়ক সমর সচিব পদে বৃত হলেন। কড়পা ও নেল্লুর প্রদেশের সমুদয় ভার কম্প প্রাপ্ত হলেন, মারপ্প অত্যাচারী কদম্ব রাজাদের প্রদেশ সকল জয় কর্‍বেন ও তাদের অধিকার লাভ কর্‍বেন। মুদপ্প চন্দ্রগিরি, মহীশূর প্রভৃতি যে সকল স্থান আমাদের সাম্রাজ্য ভুক্ত করা হয়েছে, অথচ এখনও শাসন বিধির নিয়মাধীন হয়নি; সেই সকলের শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হলেন।

(রাজ ভ্রাতৃত্রয়ের অভিবাদন সহ মহামন্ত্রীর নিকট হইতে নিয়োগ পত্র গ্রহণ)

বিদ্যা। দিল্লীর সুলতান মামুদের প্রতিনিধি মহবুবের সহিত যুদ্ধে, সেনাপতি বিনায়ক ও তাঁর সহকারী মল্লিনাথের অতুল পরাক্রমে আমাদের সম্পূর্ণ জয় লাভ হওয়াতে আমাদের প্রতিবেশী হিন্দুরাজাগণ এক্ষণে সকলে সম্মিলিত হয়ে মহারাজ হরিহর রায়কে সকলের ছত্রপতি বলে স্বীকার করেছেন। এই অভিষেক উপলক্ষে

এঁদের সকলকেই যেন নিমন্ত্রণ করে এনে, সমুচিত সম্বর্দ্ধনা করা হয়। এ বিষয়ে রাজ ভ্রাতৃবৃন্দ এবং সচিবমণ্ডলী বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখ্‌বেন। এক্ষণে প্রধান বন্দীদ্বয়ের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হচ্ছে।

হরি। পাঠান সেনাপতিকে আনয়ন কর।

(প্রতিহারীর প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ। পশ্চাতে সশস্ত্র প্রহরী-বেষ্টিত পাঠান সেনাপতির প্রবেশ)

হরি। আপনার কুশল তো খাঁ সাহেব ?

মহবুব। বন্দীর আবার কুশল অকুশল কি কাফের ! তোমাদের হাতে আল্লা যখন এনে ফেলেছেন, তখন যে রকম খুসি কঠোর দণ্ড তোমরা আমায় দিতে পারো, আমি তোমাদের কাছে, কিছুই প্রার্থনা কর্‌তে চাইনে। এই আমার একটি মাত্র কথা বল্‌বার ছিল। বলা শেষ হয়ে গেছে।

জঃ পারি। তোমাদের পাঠান রাজ্যে বুঝি, এর চেয়ে অন্য প্রকার কোন অতিথিসৎকারের ব্যবস্থা তোমরা জান না ?

মহবুব। কাফের ! আল্লার ইচ্ছায় একদিন সেটা চাক্ষুষ প্রমাণ হওয়াও কিছু বিচিত্র নয় !

জঃ পাঃ। আহা ! সে দিনে যে তুমি—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছাগলদাড়ি নেড়ে আমোদ কর্‌তে পার্‌বে না, এ হতেই আমার বড় দুঃখ হচ্ছে, খাঁ সাহেব !

বিদ্যা। দেশের অতিথি আশ্রয়াধীন বীরকে মনঃক্ষোভ প্রদান করা অনুচিত। আপনারা সবাই এই বীর-পুরুষের মর্য্যাদা পূর্ণমাত্রায় রক্ষা কর্ব্বেন। খাঁ সাহেব ! আপনি আমাদের অতিথি। অতিথি হিন্দুর চক্ষে ভগবানের প্রকাশমান রূপ। যদি চাপল্য বশে কেহ আপনার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে থাকে, আপনি তাকে অল্পজ্ঞ জেনে ক্ষমা কর্ব্বেন।

হরি। এই অভিষেকোৎসব উপলক্ষে যেমন সমস্ত বন্দীকেই মুক্তিদান করা হচ্ছে, তেমনি এই পাঠান বীরকেও, উপযুক্ত বসন ভূষণে সজ্জিত করে পাথেয় ও অনুচর সহ সম্মান সহকারে বিদায় দান করা হোক্। সেনাপতি ! তুমি নিজে এঁকে সঙ্গে করে নগর সীমায় পোঁছে দাও।

বিনা। যে আদেশ ! আসুন খাঁ সাহেব।

মহ। (চমকিয়া) ছেড়ে দেবে ! আমাকে ! তোমাদের এত বড় শত্রুকে ?

হরি। না বীরবর ! আপনি পরিহাস মনে করছেন ? পরিহাস করা হরিহরের স্বভাব নয়। যখন আপনি আমাদের শত্রু ছিলেন, তখন আপনাকে আমরা সম্মুখ-যুদ্ধে পরাস্ত করে, বন্দী করে আনতে দ্বিধা করিনি। কিন্তু এখন আপনি আমার অতিথি। আমার প্রজা, আমার অবশ্য সম্মানীয় সযত্নে পালনীয় !

মহ। বুঝেছি কাফের ! আমি ফিরে গেলে, তোমার হয়ে সম্রাটের নিকট এত্তালা করবো, এই তোমার আমাকে ছেড়ে দিবার ফন্দি !

হরি। না খাঁ সাহেব ! আমার কর্ত্তব্য, আমার শাস্ত্রনীতি, আমার ধর্ম্ম, আমায় পালন কর্‌ছে। আপনার যেরূপ অভিরুচি, অনায়াসেই আপনি তো কর্‌তে পার্ব্বেন। আমরা সেজন্য আপনাকে কোন প্রকার অঙ্গীকার বদ্ধ করাতে চাইনে, ইচ্ছা কর্‌লে আবার আপনি এই বিজয়নগরেরই বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা কর্‌তে পারেন। সেজন্য আমাদের কোন অনুরোধ নেই।

মহ। রাজন্ ! আপনি যথার্থই মহৎ ! আমি আপনাকে হৃদয়ের সঙ্গে বিজয়নগরের মহারাজা বলে স্বীকার করেছি, আর যদি ফিরে যাই, সমস্ত প্রকৃত তথ্য জান্‌তে পেরে, সুলতানও যাতে আপনার এই উচিত অধিকার

অস্বীকার না করেন সেজন্য আপনি না বল্লেও, আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই চেষ্টা কর্‌বো, এ কথা না জানিয়ে আজ আপনার নিকট হতে চলে যেতে পার্‌বো না।

হরি। আপনাকে আজ আমাদের বন্ধুরূপে প্রাপ্ত হয়ে, নিজেদেরই আমরা সম্মানিত বোধ কর্‌ছি জান্‌বেন।

মহ। আপনি বন্ধুরূপে বরণীয় সন্দেহ নাই, আপনার ন্যায় শত্রুও শ্লাঘনীয়।

(পরস্পর অভিবাদনান্তর সেনাপতিসহ প্রস্থান)

বিদ্যা। দয়াল রায় ?

(বন্দী দয়ালরায়কে লইয়া প্রহরীর প্রবেশ)

হরি। তোমার প্রতি ন্যায় বিচারে যে দণ্ডাদেশ হয়েছে, তুমি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর্‌তে চেয়েছ শুনলেম্। কি তোমার অভিপ্রায় এখানে প্রকাশ কর্‌তে পার।

দয়াল। আমার এই বল্‌বার আছে যে, আমার প্রাণ ভিক্ষা দেওয়া হোক্।

হরি। প্রাণ ভিক্ষা ! (বিদ্যারণ্যের দিকে নেত্রপাত ও বিদ্যারণ্যের ইঙ্গিত।)

দয়াল। হ্যাঁ প্রাণ ভিক্ষা। মৃত্যুকে আমার বড় ভয় করে, শুনেছি পাপীর পরলোক বড় ভয়াবহ। তার চেয়ে অন্য দণ্ড দিন। মার্‌বেন না, মর্‌তে পার্‌বো না।

হরি। যদি তোমার প্রাণদণ্ড রহিত করা যায়, তুমি আমায় কি দিবে বল ?

দয়াল। আমি আপনাকে (বিমূঢ়ভাবে) কি দেবো ? আমার সমস্তই তো আপনি অধিকার করে নিয়েছেন।

হরি। না সমস্ত নিতে পারিনি সর্দ্দার, এখনও বাকী আছে। সে জিনিস কেড়ে নেওয়া যায় না, দিলে পাওয়া যায়, যা দাওনি, বল তাই বিনিময়ে দেবে ?

দয়াল। (বিস্মিতভাবে) বাকী আছে ? কই কি আছে মনে তো পড়ে না, যদি তাই হয়, কিছু যদি কোথাও থাকে, তাও নেবেন। আমি মর্‌তেই বসেছি আমার আর কিসে প্রয়োজন ?

হরি। তুমি মুক্তি পেলে। (প্রহরীর বন্ধনমোচন) তবে এইবার দাও সর্দ্দার ! তোমার অস্বীকৃত বস্তু, এইবার আমায় অর্পণ করে, নিজ প্রতিশ্রুতি পালন করো। দাও তোমার বিশ্বাস, তোমার বশ্যতা, তোমার ভালবাসা, আজ হতে তুমি চিরদিনের জন্য আমায় দাও। দিয়ে এই সিংহাসনের পাশে, নিজের ভূতপূর্ব্ব সম্মানের আসন গ্রহণ করো। আবার সেই পুরাতন সর্দ্দার দয়ালরায় হও।

দয়াল। (নতজানু) রাজেন্দ্র ! ক্ষমাশীল ! বাস্তবিকই তুমি রাজা, তোমার কাছে আমি কি !

হরি। বন্ধু ! মন্ত্রি ! ভাই ! (আলিঙ্গন)

বিদ্যারণ্য। ধন্য মহারাজ ! তুমিই যথার্থ শত্রুজয়ী ! প্রেমের জয়ই প্রকৃত জয়। হিংসার জয় কতক্ষণের ?

সভ্যগণ। রাজাধিরাজ হরিহর রায়ের জয়।

ক্রমশঃ—

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

তুমি।

—*—

রমণীয় তুমি জগতের মাঝে, কমনীয় তব কান্তি,
ধ্বান্ত আমার শ্রান্ত মানসে ঢালিয়াছ তুমি শান্তি।
বারিধির মত গম্ভীর তুমি, কাকলীর মত মিষ্ট,
প্রভাতের মত স্নিগ্ধ তুমি যে সন্ধ্যার মত শিষ্ট!
জ্যোৎস্নার মত সুন্দর তুমি, প্রকৃতির মত শুদ্ধ,
চিত্তের মাঝে বিচিত্র তুমি, জ্ঞান-গরিমায় বুদ্ধ,
কুসুমের মত কমনীয় তুমি, সুপ্তির মত শান্ত,
তারকার মত উজ্জ্বল তুমি করিয়াছ মোরে ভ্রান্ত।
সংগীত সুধা নিয়ত তোমার মুখরি' উঠিছে কণ্ঠে,
প্রবেশি শ্রবণ কুহরেতে যেন অমিয়া নিয়ত বণ্ঠে!
নির্ম্মল তুমি, উজ্জ্বল তুমি, সন্ধ্যার দীপ-রেখা,
দূর্ব্বার বুকে শীকর-বিন্দু, অন্তরে মম লেখা।

শ্রীসনৎ কুমার সেন গুপ্ত।

ঢাকায়

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের

একাদশ অধিবেশন।

(প্রতিনিধির পত্র)

কালনেমির আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসপ্রশংসিত ঢাকানগরীতে বাঙ্গালীর "প্রাণধর্ম্মের" উদ্বোধক বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের একাদশ অধিবেশন তান্ত্রিকমতে নিরাপদে সমাধা হইয়া গেল। দেশ-প্রসিদ্ধ জননায়ক শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় বাঁকিপুরের অধিবেশনে যখন সম্মিলনকে ঢাকায় আহ্বান করেন, তখন অতীত কালের গৌরবস্মৃতিবাহিনী সুপ্রাচীন রাজধানী দর্শন, যুক্তবঙ্গের অখ্যাত বিখ্যাত সুবিখ্যাত সাহিত্যিকমণ্ডলীর সহিত সাক্ষাৎ আলাপপরিচয় ও প্রীতিসৌহৃদ্যস্থাপন প্রভৃতি কত দীপ্তআশার উজ্জ্বল আলোক নিমন্ত্রিত, অনিমন্ত্রিত ও স্বয়মাহূতদিগের হৃদয়ক্ষেত্র আলোকিত করিয়াছিল, উহা যাঁহারা কোনও সম্মিলনের অন্নসত্রে মিলিত হইয়াছেন তাঁহারা অক্লেশেই বুঝিতে পারিবেন।

তারপর যখন সম্বৎসর অর্থাৎ সারা ১৩২৪ সাল ধরিয়া সম্মিলনের অধিবেশনের দিন পরিবর্ত্তন ও কোনও কোনও সংবাদপত্রে কর্ত্তৃপক্ষের মতবিবর্ত্তনের সংবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল, তখন পণপ্রথার উৎপাতে আসন্নবিবাহের নিবৃত্তিসংবাদে মিষ্টান্নপ্রিয় বরযাত্রীর মূর্চ্ছাভঙ্গের ন্যায় মাদৃশ সাহিত্যরসপিপাসুর চিত্তে বড়ই আঘাত লাগিল। যা হ'ক, আশাই জীবনের মূল গ্রন্থি। সূত্রে মণিহারের ন্যায় আশাসূত্রেই মানবসমাজ গ্রথিত রহিয়াছে। সময় বিশেষে আশা আকাঙ্ক্ষার হাতে আত্মসমর্পণ করিলেও একেবারে মরিয়া যায় না; আলোকের কোলে সুপ্ত তমোরাশির ন্যায় উহার অস্তিত্ব কদাপি বিলুপ্ত হয় না। তাই গত সম্মিলনের প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে উহার সম্পাদক 'ভদ্রমহোদয়ের' ভদ্রতায় 'মৌলিক গবেষণা পূর্ণ' প্রবন্ধপাঠার্থ সশরীরে আহূত হইলাম। বলাবাহুল্য বয়স বা স্বভাবের দোষে কলিকাতার উপকণ্ঠবাসী মার্চেন্ট অফিসের বাবু ডে'লি প্যাসেন্‌জারদের বাষ্পদগ্ধ ক্ষিপ্র হস্তে অপক্ক বা অর্দ্ধপক্ক ভোজ্য গলাধঃকরণের ন্যায় একটা প্রবন্ধ বনাম কবন্ধ মিয়াদের তারিখ মধ্যেই চিঠিরবাক্সে ফেলিয়া দিলাম। এবং সেই মুহূর্ত্ত হইতে উপরিওয়ালার নিকট নগদ একদিন ছুটীর জন্য (শনি, রবি ও সোম— তিন দিন স্থানীয় পর্ব্বোপলক্ষে বন্ধ থাকায়) আর্জ্জি দাখিল করিয়া তদ্বির করিতে বদ্ধপরিকর হইলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমার এ প্রয়াস "মাঠে মারা" গেল না। যথা সময়ে ছুটী মঞ্জুর হওয়ায় মন্দুরামুক্ত তুরঙ্গের ন্যায় বৃহস্পতিবারের শেষ বার-বেলায় "যদি পাই আয়মা দেশ। তবু না যাই বৃহস্পতির শেষ॥" এই প্রাচীন অনুশাসন বর্ণে বর্ণে প্রতিপালনার্থ সম্মিলন মহাতীর্থ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথি মধ্যে উত্তরবঙ্গের সাহিত্যপীঠ রাজসাহী, রংপুর, বগুড়া প্রভৃতি স্থানের বহু না হ'ক অনেক অনামা বিনামা সুনামা সাহিত্যরথীর সহ সাক্ষাৎ ও সহগামিতার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম। কিন্তু বোধহয় আমার মত উত্তম যাত্রিকবার ও সময় না পাওয়ায় তাঁহারা সেদিন যাত্রা করিতে পারেন নাই। পরদিন বেলা আন্দাজ চারিটার সময়ে ঢাকা রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌঁছিলাম।

পথের কথা তুলিয়া পুঁথি বাড়াইলাম না, কারণ কাগজের বাজার আগুন। বলা ভাল ইতিপূর্ব্বে আর কখনও "ঢাকা" দেখি নাই। বিশেষতঃ অনুস্বার বিসর্গ মহলের লোক, মানচিত্রের চিত্রও আমার চিত্তে একেবারেই অস্পষ্ট। সুখের বিষয় গাড়িতে উঠিয়াই একজন গৃহপ্রতিগামী ঢাকাবাসী নব্যশিক্ষিত সভ্যযুবকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় ও তাঁহার সঙ্গে বরাবর একত্র গমন করায় আমার ঢাকায় গিয়া দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, ও লক্ষিতব্য বহু বিষয়ের সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহার মত সজ্জন সহযাত্রীর সঙ্গ না পাইলে পথিমধ্যে আমাকে বোধহয় অনেক দুর্ভোগ ভুগিতে হইত। গাড়ি যখন ভাওয়াল রাজ্যের সীমানা স্পর্শ করিল, তখন দিগন্তব্যাপী অনিবিড় অনুচ্চ এক বনভূমি দর্শনপথে পতিত হইল। জিজ্ঞাসায় জানিলাম এই অদৃষ্টপূর্ব্ব বৃক্ষের নাম "গজারি।" ঐ গুলি ভাওয়ালরাজের অর্থাগমের অন্যতম প্রধান উপায়। উক্ত গজারি শব্দ ষষ্ঠীতৎপুরুষ কি বহুব্রীহি সমাসনিষ্পন্ন অনেকক্ষণ ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। 'ডিথ' ও 'ডবিথের' মত একটা ধ্বনি কর্ণপটহে ধ্বনিত হইল মাত্র। গাড়ি হইতে নামিয়াই স্বেচ্ছাসেবক চিহ্নধারী ছাত্রবৃন্দ ও সম্মিলনের সম্পাদক প্রমুখ (পরে পরিচয়ে জানিলাম) কয়েকজন উদ্যোক্তৃবর্গকে শেষ চৈত্রের প্রথম অপরাহ্নের প্রখর রৌদ্রে সছত্র ও অছত্র মস্তকে দূরাগত প্রতিনিধিদের স্বাগত-সম্ভাষণের নিমিত্ত উৎসুক নেত্রে চঞ্চলভাবে প্লাটফর্ম্মে ইতস্ততঃ ধাবমান দেখিলাম। সুযোগক্রমে এই সময়ে ইঁহাদিগের সহিত প্রতিনিধি রূপে পরিচিত হইলাম।

ছাত্রগণ শশব্যস্তে ও সসম্ভ্রমে গাড়ী হইতে আমার দ্রব্যাদি নামাইতে সচেষ্ট হইলে আমি তাঁহাদের নিবৃত্ত করিলাম। আমি কেবল একটী ক্ষুদ্র ব্যাগসর্ব্বস্ব হইয়া ঢাকা গিয়াছিলাম; তাঁহারা ক্ষিপ্রতার সহিত সেইটী লইলেন ও পথপ্রদর্শক হইয়া ষ্টেশনের বাহিরে অবস্থিত পূর্ব্বে স্থিরীকৃত একখানি অশ্বযানে উঠাইয়া দিয়া দুই তিন

জন আমার সঙ্গী হইলেন। পথিমধ্যে ঢাকার ভাড়াটীয়া ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়া অতি সুলভ, নগদ একসিকা বা চারি আনা মাত্র শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইয়াছিলাম। এক্ষণে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জনে বিস্ময় সত্য ধারণায় পর্য্যবসিত হইল। গাড়ীর অভ্যন্তরে বসিবার স্থান সেরূপ সঙ্কীর্ণ দেখিলাম, তাহাতে স্পষ্টই বুঝিলাম যে কোন দুর্ম্মূল্যতার যুগেও ঢাকায় ঘোড়াগাড়ীর ভাড়া বাড়ে নাই। বলিতে কি, ঐরূপ গাড়ীতে দুইজনের বেশী আরোহীর স্বচ্ছন্দভাবে বসিবার স্থান সঙ্কুলান হয় না। আরোহী যদি হিতোপদেশের স্বেচ্ছাবিহারী হরিণের মত একটু হৃষ্টপুষ্ট হন, তাহা হইলে দুজনায় স্থান হয় কি না সন্দেহ। শকট নগরগামী হইলে আমি সঙ্গীদিগকে সেই গাড়ীতে কোন্ কোন্ স্থানের কতগুলি প্রতিনিধি আসিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরে কেবল ইতিহাস লেখার সভাপতি শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় আমার অগ্রগামী গাড়ীতে যাইতেছেন শুনিলাম। উত্তরটী বড় আশাদায়ক বোধ হইল না। তৎপর ষ্টেশন হইতে আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং হষ্টেলের দ্বার পর্য্যন্ত পৌছিতে দুই ধারে যে সকল উল্লেখযোগ্য সুদৃশ্য সৌধ দৃষ্ট হইতেছিল, একে একে সেগুলির কিছু কিছু পরিচয় লইলাম। গাড়ী যথা-কালে স্বস্থানে পৌছিলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম। তথায় আমার পৌছিবার পূর্ব্বেই স্থানান্তর হইতে আগত দুইজন সাহিত্যিক দুইটী চৌকীতে স্ব স্ব শয্যা পাতিয়া মশারী খাটাইয়া অগ্রদানী ব্রাহ্মণের মারফতে সজ্জিত শ্রাদ্ধীয় ষোড়শের খাটের ন্যায় দুইটী স্থান অধিকার করিয়া স্নানে গিয়াছেন শুনিলাম। ঐ হষ্টেল ভবনটী বিস্তৃত ও বৃহদায়তন। উহার নিম্ন ও উপরিতলে প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে চারিটী করিয়া সিট্ বা থাকিবার স্থান ছাত্রদের জন্য নির্দ্দিষ্ট। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা হইয়া গ্রীষ্মাবকাশ আরব্ধ হওয়ায় অধিকাংশ ছাত্র দেশে গিয়াছেন। অল্প কয়েক জন ছাত্র কেবল সম্মিলনের কার্য্যে স্বেচ্ছা-সেবকতা করিবার মানসে ও দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। দ্বিতলের সমস্ত প্রকোষ্ঠ প্রতিনিধিদের অবস্থিতির জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ঢাকায় সম্মিলনের এটী একটী বৈশিষ্ট্য। আমরা অন্যান্যস্থলে দেখিয়াছি যে ধনের ও জ্ঞানের মাত্রানুসারে সাহিত্যিকদিগের অবস্থা-দির জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হয়। যাহার নাম সম্মিলন, তাহাতে এরূপ মর্য্যাদার জাতিভেদ থাকিলে ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খের মিলনে পরস্পর ভাব বিনিময়ের কতদূর সুবিধা তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ঢাকায় সম্মিলনের কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা এ পক্ষে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল বলিতে হয়। হইতে পারে, ঢাকার ন্যায় বৃহতী নগরীতে ঐরূপ বৃহৎ অট্টালিকা থাকায় একত্র সকল প্রতিনিধিদের বাসস্থান দেওয়া সম্ভব নয়; মফঃস্বলে অন্যত্র ঐরূপ হওয়ার সম্ভাবনা বিরল; ইহাতে আমাদের বক্তব্য যে যতদূর সম্ভব সম্মিলনের সম্মিলিত সারস্বত সভ্যগণের একত্র বা হয় নিকটে নিকটে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। সাহিত্যসম্মিলনে কাঞ্চনকৌলীন্যের বা জ্ঞানপ্রাধান্যের ভেদনীতির অনুসরণ সর্ব্বথা হেয় ও পরিহার্য্য। তৎপরে কয়েকজন পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত সম্মিলনহিতকামী সভ্য আসিয়া আমাদের সহিত সময়োপযোগী কিছু কিছু মিষ্ট মধুর আলাপ করিয়া সত্বর মধ্যাহ্ন বা অপরাহ্নকৃত্য সমাধা করিতে অনুরোধ করিলেন। আমরাও পথশ্রান্তি ও ক্ষুধার প্রেরণায় অতি তৎপরতার সহিত স্নানাদি সমাপন করিয়া ঘোলের সরবত আদি মিষ্টান্নান্ত দৈনিক ভোজন সমাপন করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে সন্ধ্যার প্রাক্কালে রমনার ময়দানে একটু হাওয়া খাইয়া আসিলাম। এইবার আমি কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলাম। আমার সহ গৃহবাসী তিন জন চতুর প্রতিনিধি বেশ শয্যার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আমি কিন্তু "পাণিপাত্র দিগম্বর" হইয়া তথায় গিয়াছি। দিনের বেলাতেই ঢাকার বিখ্যাত মশক বংশধরদের গভীর বংশীনাদ শুনিয়া আরোহীর কোলাহলে পূর্ব্বরাত্রে অনিদ্রিত ক্লান্ত অন্তরাত্মা আতঙ্ক-সঙ্কুচিত হইয়াছে। আমাদের বাসস্থানের সহৃদয় তত্ত্বাবধায়কদের নিকট আমার এই ত্রুটি ও শয্যাদারিদ্র্যের দুর্দ্দশায় জন্য একটা জ'নৃকে-মশারী একটা তিনপোয়া বালিশ ও অন্ততঃ একটা আমার হাতের সাড়ে তিন হাত (অন্যের সাড়ে চারি হাতও

হইতে পারে) সতরঞ্চি জোগারের জন্য আবেদন নিবেদন করিয়াছি। তাঁহারাও অবস্থা মত ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া যথেষ্ট আশ্বস্ত করিয়াছেন। কিন্তু তথনও জোগার হয় নাই দেখিয়া জ্যোৎস্নাধৌত রজনীতেও মশার হুঙ্কারে চক্ষে আঁধার ঠেকিতে লাগিল। আমার তদবস্থ দেখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সদাশয় কৃতীযুবক প্রতিনিধি অগত্যা তাঁহার শয্যায় অর্দ্ধভাগী করিবেন বলিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একটী স্বেচ্ছাসেবক সুশীল ছাত্র আমার ফর্দ্দ অনুযায়ী শয্যা লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়া মশারীবর্ম্মাচ্ছাদিত হইয়া ঢাকার মশকযুদ্ধে বিচার গৌরবে গৌরবিত হইবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। তথন আমার মনের যে কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহা যদি কোন পাঠক কথন ঐরূপ দুরবস্থায় পড়িয়া থাকেন, কেবল তিনিই বুঝিবেন। তৎপরে সন্নিহিত পুষ্করিণীর সোপানে বসিয়া সন্ধ্যাদি করিয়া ক্ষুধাদেবীর অকৃপাবশতঃ সে রাত্রে জল গ্রহণ না করিয়া, জাগরণ পথশ্রান্তি ও উদরপূর্ত্তি সুলভ নিদ্রার বশীভূত হইলাম। পরদিন ৩০শে চৈত্র প্রত্যূষে উঠিয়া স্বনামখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গোস্বামী রায় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তিনি তথনও নিদ্রিত শুনিয়া, রমনার ৺রী কালীদর্শন, ঢাকেশ্বরী দেবালয়দর্শন, নবনির্ম্মিত কলেজ ভবন ও সেক্রেটেরিয়ট ভবন-শ্রেণী দর্শন করিয়া বেলা প্রায় ৮টার সময় বাসায় ফিরিবারমুখে অধ্যাপক রায় সাহেবের সাক্ষাৎ লাভ করিলাম। তাঁহার সহাস্য আস্য, প্রফুল্লতাময় ভাব, ও সদালাপ পূর্ণ শিষ্টাচারে সবিশেষ আপ্যায়িত ও পরিতৃপ্ত হইয়া আসিলাম।

কলিকাতা হইতে প্রধান সভানায়ক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গমণ্ডলী পূর্ব্ব দিন উপস্থিত হইতে না পারায় সেইদিন পূর্ব্বাহ্ণের সভা স্থগিত ছিল। কাজেই আমরা বেলা ১০টা ১১টা পর্য্যন্ত বেশ একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইলাম। তৎপর স্নান আহ্নিক ও মধ্যাহ্নকৃত্য শেষ হইল। এ দিন দক্ষিণহস্তের ব্যবস্থার ক্রমোৎকর্ষ বুঝিলাম। আহারান্তে কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর, কলিকাতা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে ছোট, বড়, মে'জ সকল প্রকারের সভাপতি ও তাঁহাদের অনুচর ও পার্শ্বচরবৃন্দ শুভাগমন করিয়াছেন শুনিলাম। কেবল জলধর বাবু নববর্ষে নব মেঘের সঞ্চারের ন্যায় পূর্ব্ব দিনেই সম্মিলনের সহকারী সম্পাদক যোগেন্দ্রবাবুর গৃহে অতিথি হইয়াছেন জানিলাম। দেশনায়িকা বিদুষী শ্রীমতী সরলা দেবীর শুভাগমন বার্ত্তাও এই সময়ে কর্ণগোচর হইল। আমরা অনেকেই তথন সভাপতি ও তাঁহার সঙ্গীদের সহিত আলাপ পরিচয়ের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের প্রকোষ্ঠে গমন করিলাম। তথায় কিছুকাল পরস্পর কথাবার্ত্তার পর তাঁহারা প্রয়োজনমত আহারাদি সারিয়া লইলেন। অসময় হওয়ায় কলিকাতার প্রতিনিধিদের মধ্যে অনেকেই পথিমধ্যে মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপন করিয়াছিলেন। কেবল স্বনাম-প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ও অন্যান্য দুই একজন অর্ণবযানের সহিত ঈষৎ সাদৃশ্যবশতঃ বোধ হয় পদ্মামাঝে ঐ ব্যাপারটা পুরাপুরি সারিতে পারেন নাই। তাঁহাদের ভোজনান্তে বেলা প্রায় সারে পাঁচটার সময় হিন্দুর পুণ্যবাসর মহাবিষুব সংক্রান্তির শুভ মুহূর্ত্তে কীর্ত্তিকুশল ফুলারী গবর্ণমেণ্টের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ সেক্রেটরীয়ট্ ভবনাবলীর অত্যুত্তম বৃহৎ আলয়ে, যথায় ঢাকা কলেজের মুসলমানছাত্রবর্গ তাঁহাদের দৈনিক আহার্য্য গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেই রম্যহর্ম্মে সম্মিলনের সাধারণ সভার অধিবেশন আরব্ধ হইল। ঢাকার প্রবীণ গায়ক কিন্নরকণ্ঠ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথবাবুর উদ্বোধন সঙ্গীত, সরলা দেবীর ললিতকণ্ঠের "অয়ি ভুবনমনমোহিনী উষে" ইত্যাদি, প্রসিদ্ধ গানটীর কোমল ঝঙ্কার ও কবিতা পাঠরূপ স্বস্তিবাচনের পর, অভ্যর্থনা সমিতির সুযোগ্য সভাপতি দাশ মহাশয় রসভাব মধুর অভিভাষণ পাঠ করিয়া মনস্বী মনীষী হীরেন্দ্রনাথের সভাপতি পদে বরণের প্রস্তাব করিলেন। প্রাচীন সাহিত্য-সেবী শ্রীযুক্ত জলধরবাবু বক্তৃতামুখে ঐ প্রস্তাব সমর্থন করেন। দাশ মহাশয়ের সরল সারগর্ভ নাতিদীর্ঘ

অভিভাষণে ঢাকার প্রাচীন গৌরবের পরিচয় নিদর্শন, কাব্য, সাহিত্য, শিল্প, সৌন্দর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতির প্রধান প্রধান অভিনেতাদিগের যশঃ কীর্ত্তন, ইহার বর্ত্তমান ও অতীত অবস্থায় বৈষম্য বিবরণ দুর্দ্দিনে দূরদূরান্তর ও দেশ দেশান্তর হইতে সমাগত নারায়ণরূপী অভ্যাগত সাহিত্যিক ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট ত্রুটি বিচ্যুতির আশঙ্কায় ক্ষমা ভিক্ষা, ঢাকা নগরের নামের উৎপত্তির ব্যাখ্যা প্রভৃতি বিষয় বেশ স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। আমরা কুতূহলী পাঠকদিগের চিত্তরঞ্জনমানসে চিত্তরঞ্জনের প্রদর্শিত ঢাকা শব্দের ব্যাখ্যা তিনটী এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। প্রথম ব্যাখ্যা, পূর্ব্বোক্ত "গজারি" গাছের মত ঐ প্রদেশে প্রাচীন কালে ঢাক নামে এক প্রকার বৃক্ষ বহু পরিমাণে উৎপন্ন হইত বলিয়া উহার নাম ঢাকা রাখা হইয়াছে। এটা তালগাছহীন পুকুরের নাম তালপুকুর কিম্বা শাকগাছ হইতে শাক্যসিংহের নামের উৎপত্তিসদৃশ। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা, বুড়ী গঙ্গার অপর তীরস্থ অরণ্যানী হইতে আবিষ্কৃতা নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী ঢাকেশ্বরীর নামানুসারে ঢাকা নামকরণ হইয়াছে। এটী কালীঘাটের ৺শ্রীকালীমাতার নাম হইতে কলিকাতা নামকরণের অনুরূপ। তৃতীয় ব্যাখ্যা, "১৬০৮ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিন ইসলাম খাঁ রাজমহল হইতে বুড়ী গঙ্গায় আসিয়া, এই নদীবহুলা ভূমিকে মনোরম দেখিয়া, এইখানে রাজধানী করিবার সংকল্প করেন। আজ যেখানে ঢাকা অধিষ্ঠিত, সেইখান হইতে ঢাক বাজাইলে যতদূর অবধি শুনা যায়, ততদূর পর্য্যন্ত ঢাকা সহরের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া ইহার নাম ঢাকা রাখেন।" শেষোক্ত অর্থটী মনুসংহিতায় কৃষ্ণসার মৃগের বিচরণ ভূমিভাগের যজ্ঞিয় দেশ সজ্ঞার ন্যায় নগরীর সীমা নির্দ্দেশের পদ্ধতি হইতে নামের উৎপত্তির বোধক। তাঁহার অভিভাষণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। প্রাজ্ঞবর হীরেন্দ্রনাথ তাঁহার অনতিদীর্ঘ অভিভাষণের আরম্ভেই পরমাণুগতসাদৃশ্য ধরিয়া মধুর অভাবে গুড় কিন্তু গুড়ের অভাবে নিম যেমন কোনমতেই বিধেয় হইতে পারে না, তদ্রূপ রামেন্দ্রের স্থলে হীরেন্দ্রের সভাধ্যক্ষত্ব একেবারেই অসমীচীন বলিয়া চূড়ান্ত বিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন।

আমরা কিন্তু ঐ দুইনামেই মধু ও গুড়ের পরে মানব সৌসাদৃশ্যের ন্যায় আবয়বিক পূর্ণ সাদৃশ্য "ইন্দ্র" দেখিয়া সভাপতি নির্ব্বাচকগণ যে একটা মহা অপকর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা ঠিক্ ঠাওরাইতে পারিলাম না। তিনি বিগতবর্ষে সাহিত্য-সম্মিলনের ভূতপূর্ব্ব দুইজন প্রাচীন বিশিষ্ট সভাপতির পরলোক লাভের জন্য ব্যথাভারক্লিষ্ট অন্তরে শোক প্রকাশ করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনের অধিনায়কেরা সম্মিলনের সাফল্য কামনায় কি কি উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, এবং বর্ত্তমানে তার কতগুলি কি পরিমাণে ফলদায়ক হইয়াছে ও অন্য কি কি নূতন উপায় অবলম্বন করা উচিত এ সকলের সযৌক্তিক আলোচনা করেন। অনন্তর বঙ্গসাহিত্যের বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্ম্মাণকল্পে বাঁকিপুরে দশম অধিবেশনের সভাপতি সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতীর কম্বুকণ্ঠ ঝঙ্কৃত বেদগম্ভীর মহাবাক্যনিচয় উদ্ধৃত করিয়া তৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মন্তব্য প্রকাশ পূর্ব্বক বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের পঠন, পাঠন, পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তম উত্তম গ্রন্থ রচনা পদ্ধতি সংক্রান্ত স্বদেশী বিদেশী বৃহস্পতিকল্প সুধীবর্গের সারবান্ মতামত তুলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন। বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্যের প্রসার এবং প্রকৃত উন্নতি করিতে হইলে একমাত্র বাঙ্গলা ভাষার সাহায্যে সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতির অধ্যয়ন অধ্যাপনার ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে প্রবর্ত্তিত হওয়া অতীব বাঞ্ছনীয় বলিয়াছেন। তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রের "বিলাতি তলোয়ারের খাপের মধ্যে দেশী খাঁড়া ভরিবার ব্যায়ামের" দৃষ্টান্ত দিয়া ভারতীয় বালকের জন্মসুলভ কোমল মস্তিষ্কের ভিতর কতকগুলি ভাবহীন নীরস গ্রন্থের শুষ্ক বর্ণপুঞ্জ ঢুকাইবার চেষ্টা নিতান্ত পণ্ডশ্রম ও বিফল প্রয়াস বুঝাইয়াছেন। এইরূপে এম, এ, পরীক্ষায় প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্য, বঙ্গভাষা তত্ত্ব, এবং বঙ্গ সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার বিষয়

হওয়া উচিত; আর চতুষ্পাঠীর ছাত্রদিগকে বাঙ্গলার সাহায্যে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি কিছু কিছু পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া উহাদিগকেও গদ্য পদ্যের অমৃত ধারায় অভিষিক্ত করিতে হইবে বলিয়া সুপরামর্শ দিয়াছেন।

এইরূপে বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর বিফলতা, অপকারিতা, পরিবর্ত্তনীয়তা, উপকারিতা প্রভৃতি নানাভাবে নানাদিক্‌ হইতে আলোচনা করিয়াছেন। তৎপরে পরিভাষা সঙ্কলনের নিয়ম, যশোলিপ্সা সংযম আদি কতিপয় অবশ্য জ্ঞেয় বিষয়ের সারকথা বলিয়া, উপসংহারে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম বন্যায় ভাসমান বঙ্গসন্তানের বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা, উপেক্ষা অনাদরের নিদর্শন প্রদর্শন পূর্ব্বক অধুনা "বন্দেমাতরং" এর যুগে যাহাতে নূতন বাঙ্গলায় নূতন বাঙ্গলা সাহিত্যের হীরককিরীটিনী মণিস্তম্ভময়ী রত্নোজ্জ্বলা বিশ্ববিজয়িনী সৌধশ্রেণী রচিত হইতে পারে, তজ্জন্য সাদরে দৃঢ় স্বরে সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। আমরা আশাকরি সর্ব্বব্যাপিনী বঙ্গবাণীর অপার কারুণ্য প্রভাবে তাঁহার সাধক ভক্তের করুণ আবেদন কদাপি অরণ্যরোদনে অবসিত হইবে না। অনন্তর রাত্রি নয় ঘটিকার সময় সাধারণসভার কার্য্য সমাপ্ত হইলে কিয়ৎক্ষণ পরে প্রতিনিধিদের বাস ভবন ইঞ্জিনিয়ারিং হষ্টেলের হারিত তৃণমণ্ডিত বাসন্তীকৌমুদীসম্পাতস্নিগ্ধ বিস্তৃত চত্বরে বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশন হয়। এই সভায় আলোচ্য বিষয়গুলির সামান্য কিঞ্চিৎ বাদানুবাদের পর মূল পরিষদের নিয়মাবলীর আনুগত্য রক্ষা করিয়া কতকগুলি বিষয় পরদিনের সভায় গ্রহীতব্য মন্তব্যরূপে নির্দ্ধারিত হয়। রাত্রি অধিক হওয়ায় এদিন এইখানেই ক্ষান্ত দিয়া প্রতিনিধিগণ নৈশ ভোজনান্তে স্ব স্ব প্রকোষ্ঠে বিশ্রাম করিলেন। এদিন রাত্রিতে মৎস্য, মাংস, পোলাও, লুচি, সন্দেশ প্রভৃতির বিচিত্র সম্মিলনে ভোক্তা সম্মিলনীটি বড়ই উপাদেয় হইয়াছিল। পরদিন চপলা চমকের ন্যায় ১৩২৪ সাল কালের কোলে লীন হইয়াছে। ১৩২৫ সালের ১লা বৈশাখ তারিখে, সূর্য্যদেবের অতিচার গতিতে অষ্টমীর নিশি শেষে সন্ধি, মহানবমী, ও বিজয়াদশমী কৃত্যের ন্যায় একইদিনে প্রত্যুষ ৭টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন ও সাধারণ বা বিদায় সভার অধিবেশনের পালা। সেদিন যদিও শুভ বর্ষারম্ভ তথাপি ভোজনবিলাসী বিপ্রের একদিনে বহু গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষায় বিব্রত হওয়ার ন্যায় সাহিত্য-রসিকদিগের বড়ই দুর্দ্দিন বলিয়া মনে হইয়াছিল। যাহা হউক সকাল সকাল স্নানাদি সারিয়া যথা কালে সভামন্দিরে আসন গ্রহণ করিলাম।

পূর্ব্বদিনের বিজ্ঞাপন অনুসারে এদিন বেলা ৭টার সময় ইতিহাস শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় সসম্মানে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়া স্বীয় অভিভাষণ পাঠ সমাপন করতঃ ঐ শাখায় পাঠের জন্য নির্ব্বাচিত কতিপয় প্রবন্ধ ক্রমে ক্রমে পাঠ করিতে লেখক বা পাঠকদিগকে অনুরোধ করিলেন। দুই তিনটী প্রবন্ধ পঠিত আর কয়েকটী প্রবন্ধ সময় অভাবে পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। এখানে বলা উচিত, এই শেষোক্ত প্রবন্ধ কয়টীর লেখকের নামে সভাপতি মহাশয় স্বীয় মুখে উচ্চারণ করিয়া সমাগত প্রতিনিধিগণকে শুনাইতে বিস্মৃত হন নাই। পঠিত প্রবন্ধ কয়টীর সার বক্তার বিষয় বিবৃত করিতে পারিলাম না, কারণ আমি অনৈতিহাসিক। তবে প্রথম প্রবন্ধটী একখানি তিব্বতীয় ভাষার পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদের বাঙ্গলা তর্জমার সমালোচনা বলিয়া মনে হইল। অনুবাদক ও প্রবন্ধ রচকের মধ্যে সাক্ষাৎ না হউক পরোক্ষে যে একটা লঘু গুরু সম্বন্ধ আছে তাহা অনুবাদকের শুভানুধ্যায়ী লেখকের প্রযুক্ত "শ্রীমান্‌" বিশেষণেই আমরা অনেকটা বুঝিয়াছি। যাহা হউক ঐতিহাসিক প্রবন্ধের সমালোচনাটী যে গ্রন্থখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য রূপে প্রবর্ত্তিত হওয়ার ঔচিত্য উদ্দেশে লিখিত, তাহা বেশ বুঝা যায়। সাহিত্য-সম্মিলনের সুপারিশের সাহায্যে এ কাজটা সহজসাধ্য হইলে এখন হইতে অনেক গ্রন্থকার সম্মিলনের অধিবেশনে যোগদান করিতে সমুৎসুক হইবেন। তৎপরে বিজ্ঞান সভার পালা, বেলা ১টা হইতে

তিনটা পর্য্যন্ত। বিজ্ঞান ভারতীর সহিত ঐ অবৈজ্ঞানিক প্রতিনিধির সম্পর্কটা বড় সুবিধাজনক না থাকায় অধিকন্তু দীপ্রমধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রসন্তাপে বিজ্ঞানের মত গুরুগম্ভীর বিষয়ের রসাস্বাদনের সম্ভাবনা অল্প বুঝিয়া ঐ সময় একটু আরামদায়িনী নিদ্রাদেবীর উপাসনা করিলাম। নিদ্রাভঙ্গে তাড়াতাড়ি সভায় যাইয়া বিজ্ঞানসভার আচার্য্য স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়কে মুণ্ডিত শ্মশ্রু ও সাদাধুতিচাদর পরিহিত পাকাপুরোহিতের ন্যায় পৌরোহিত্য করিতে দেখিয়া যুগপৎ বিস্ময়, হর্ষ, ও আশায় হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

আমি ঐ সভার অন্তিমকালে যাইয়া উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার মুখ হইতে,—"আমরা আগামী বর্ষের সাহিত্য-সম্মিলনে অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল ভাল বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ পাইবার আশা করি। প্রবন্ধ লেখকগণ যাহাতে নানাজাতীয় ভাষার অবোধ্য দুর্ব্বোধ্য শব্দ সাংকর্য্যে দুর্ভোজ্য ও দুষ্পাচ্য খিচুড়ীর সমাবেশ না করেন" এরূপ অনুরোধ-সূচক কথাগুলি শুনিলাম। সভায় তখন যেরূপ গরম তাহাতে "খিচুড়ী"র বয়কট শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। এইরূপে বিজ্ঞানসভার সমাপ্তির পর সাহিত্যসভার উদ্যোগ পর্ব্ব আরম্ভ হইল। যথাকালে সুদর্শন শশাঙ্কমোহন বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে মামুলীপ্রথায় কবিতাপাঠ আদি পূর্ব্বরঙ্গ অভিনীত হওয়ার পর পুষ্পমাল্য মণ্ডিত সভাপতিবর, তাঁহার চিন্তা, ভাষা, ভাব ও বিজ্ঞতা প্রসূত, মনোমত অভিভাষণটী পুনঃ পুনঃ জলপানের সহিত পাঠ করিলেন। এই সময় মধ্যে মধ্যে পরদানসিন সাহিত্যিক মণ্ডলীর সন্তানসন্ততির কলকোলাহলে সভ্যগণ বিরক্তি মধুর সাময়িক বিশ্রাম ভোগ করিতেছিলেন। সভাপতির অভিভাষণে শুনিবার, বুঝিবার, ও ভাবিবার মত অনেক নূতন কথা আছে। অপরদিকে শিশুপালবধ রচয়িতা কবিমাঘের "অপস্পশা সরস্বতী"ও বাদ পড়েন নাই। বঙ্গভাষায় এরূপ "মিঠেকড়া" বিশেষণ বোধহয় নূতন প্রযুক্ত হইল। অবশ্য নূতন সভাপতির কিছু নূতনত্বের দাবী অসঙ্গত নহে। এই সময় সরলাদেবী তাঁহার লিখিত সুচিন্তিত "রামপ্রসাদের পদাবলী" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, উহার মূল প্রতিপাদ্য সাকার নিরাকার উপাসনার তত্ত্ব "তারতম্য।" "তম" প্রত্যয়টী নিরাকার উপাসনার উপরেই বেশ মানাইয়াছে বুঝিলাম। সম্মিলনের নিত্যঅন্তরায় সময়াভাবের অজুহাতে কয়েকটী "অনাদিমধ্যান্ত" (অনাদি, অমধ্য, ও অনন্ত) প্রবন্ধ পঠিত, ও কয়েকটী পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। স্থান ও সময়ের অনাটনে এই সময় "গো ব্রাহ্মণ বিরলে শুচি"র ন্যায় "ল-কলেজে" দর্শন-সভার কার্য্য সুরু হইল। বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরসঞ্চারী লুব্ধ মধুপের ন্যায় অল্পাধিক প্রবণতা বশতঃ, নির্দ্দিষ্ট ঘটিকার শেষ মুহূর্ত্তে দৈনিক হাজিরার ভিখারী পরীক্ষার্থী কলেজের ছাত্রের ন্যায় আমি উর্দ্ধশ্বাসে সে আইন অধ্যাপনা গৃহের, ভিতরে নহে, দ্বারের পার্শ্বে, অর্দ্ধদণ্ডায়মান ও অর্দ্ধউপবিষ্ট ভাবে অতি কষ্টে একটু স্থান সংগ্রহ করিলাম। মনে হইল জীবনে কলার (Arts) কলেজে বসিবার সাধ কথঞ্চিৎ পূর্ণ হইলেও আইনের কলেজে ঢুকিবার কোন আশাই ছিল না। ভূতপূর্ব্ব দীর্ঘদর্শী পূর্ব্ববঙ্গের ছোটলাট ফুলারের বুদ্ধি মহিমায় আর ঢাকা সাহিত্য সম্মিলনের কৃপায় আজ সে দুরাশা পূর্ণ হইল। স্থান সংকীর্ণ অথচ জনসমাগমবহুল তিল পতনের স্থানাভাবে সকলেই গলদ্‌ঘর্ম্ম। যা হৌক পার্শ্বোপবিষ্ট হীরেন্দ্রনাথের দক্ষিণে দণ্ডায়মান শান্ত সৌম্য আকৃতি সভাপতি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় তাঁহার জ্ঞানবিজ্ঞান গম্ভীর অভিভাষণপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। পণ্ডিত মহাশয় সংক্ষেপে ষড়্‌দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ, তত্ত্ব-সমূহের নাম, ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক পদ্ধতি, অপরাপর শাস্ত্র অপেক্ষা দর্শন শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব, পাশ্চাত্য দর্শনের তীব্র আলোকে প্রাচ্যদর্শনের স্বরূপ নির্ণয়ের অযথা চেষ্টা, বিভিন্ন দর্শনের মতে ধর্ম্ম, জ্ঞান, মুক্তি ও ঈশ্বরের তত্ত্বনিরূপণ প্রভৃতি সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন। লিখিত বক্তৃতা পাঠকালে মধ্যে মধ্যে তিনি যে আবেগপূর্ণ সুমধুর মর্ম্মোপদেশ

ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যান বিবৃত করিয়াছিলেন, ঐ গুলিও অতীব মূল্যবান্। এ সভাতেও কতিপয় প্রবন্ধ পঠিত ও কয়েকটী পঠিত রূপে গৃহীত হইয়া সভার কার্য্য শেষ হয়। সর্ব্বশেষে ক্ষুদ্রাকারে সাধারণ সভার আর একটী অধিবেশন হইয়া পূর্ব্ব দিনের বিষয় নির্ব্বাচনী সভায় নির্দ্ধারিত সম্মিলনের আলোচ্য বিষয়গুলি যথাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যের দ্বারা প্রস্তাবিত, সমর্থিত ও অনুমোদিত হইল। অনন্তর ধন্যবাদ দানরূপ "কবির লড়াই" সমাপ্ত হইলে এবারকার মত সম্মিলনের শান্তিবাচন হইল। সম্মিলনের কার্য্যের সাহায্যকারী ঢাকার ছাত্রবৃন্দের উৎসাহদীপ্ত মুখমণ্ডল, কর্ম্মতৎপরতাসম্ভূত প্রফুল্লতা, পরিচর্য্যাসহজাত সহিষ্ণুতা ও শ্রমশীলতা, সর্ব্বোপরি শিক্ষাসুলভ বিনয়নম্রতা দেখিয়া বাঙ্গলার ভবিষ্যতের অদূরবর্ত্তী উন্নতির ছবি আমাদের হৃদয়ে দৃঢ় অঙ্কিত হইয়াছে। সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষের ও প্রতিনিধিবর্গের তত্ত্বাবধায়কদিগের আন্তরিকতা, অমায়িকতা ও নিরহঙ্কারতা চিরস্মরণীয়। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত সম্মিলন দর্শনের সুযোগে ঢাকার শিক্ষিত পদস্থ বিদ্বান্ স্থির ধীর সাহিত্যিকমণ্ডলীর কার্য্যকলাপ দর্শনে বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইতি—

শ্রী—

মতি ও গতি।

—:-*-:—

(বিলাতযাত্রা)

আমাদের এই হতভাগ্য দেশে উপদ্রবের অন্ত নাই। অতিবৃষ্টি আছে, অনাবৃষ্টি আছে, দুর্ভিক্ষ আছে, মহামারী আছে; প্লেগ, বসন্ত, কলেরা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি নিত্য নূতন উৎপাত যে কত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু এগুলা আমাদের সহ্য হইয়া গিয়াছে। ইহাদের সহিত বহুকাল ঘর করিয়াছি, এবং অনন্তকাল ঘর করিতে প্রস্তুত আছি। সম্প্রতি আবার এক নূতন উপদ্রবের সৃষ্টি হইয়াছে। বিলাত নামধেয় এক বিরাট রাক্ষস বহু যোজন দূর হইতে তাহার শোণিতলোলুপ শ্যেনদৃষ্টি সমস্ত দেশের প্রতি নিক্ষেপ করিল, এবং সেই নির্নিমেষ লোচনের সম্মোহবাণে জর্জ্জরিত ভারতবাসীর শিথিল মুষ্টি হইতে বিচ্যুত করিয়া দেশের যুবকগণকে গণ্ডা গণ্ডা গ্রাস করিতে লাগিল। কত সংসার শ্মশানে পরিণত হইল। তথাপি ঐ রাক্ষসের বিশাল খর্পর পূর্ণ হইল না। আজিও যুবকগণ দলে দলে "বিলাতে পালাতে ছটফট করে।"

যাহা হউক চক্রবৎ পরিবর্ত্তমান সুখ দুঃখের কোনটাই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। বিধাতার আশীর্ব্বাদে আমরাও আজ বিপন্মুক্ত। এক্ষণে বিলাতযাত্রার পথ চিরদিনের মত রুদ্ধ। কেহ কেহ হয় ত ভাবিবেন ইউরোপীয় মহাসমর শেষ হইলেই যুবকগণ পূর্ব্বের ন্যায় বিলাতে যাতায়াত করিতে থাকিবেন। ইঁহাদের আশা বৃথা। বিলাতযাত্রাপ্রতিষেধক কারণ ইউরোপীয় যুদ্ধের গুলিবৃষ্টি নহে, এ দেশীয় সভাবিশেষের বুলিবৃষ্টি। কিছুকাল পূর্ব্বে কালীঘাটে ব্রাহ্মণদিগের এক সভা হয়। তাহাতে স্থির হয় যে, বিলাতযাত্রা নিষিদ্ধ কর্ম্ম, মহাপাপ; যে দুর্ভাগা এই পাতকে লিপ্ত হইবে তাহাকে এবং তাহার বংশধরদিগকে আমরণ জাতিচ্যুত করিয়া রাখা হইবে। ব্রাহ্মণগণ এরূপ আইন ইহার পূর্ব্বেও প্রচার করিয়াছেন। অথচ ঘটা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে এবং কেশচ্ছেদনের পরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্য ধরিয়া দিলে অনেকেই জাতিতে উঠিতে পারিতেন। এবার কিন্তু সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ এবার তাঁহাদের সভা বসিয়াছিল কালীঘাটের অন্তঃস্থলে ভগবানের অস্তিত্বহীন কোন স্থানে নয়,

স্বয়ং জগন্মাতার সমক্ষে ব্রাহ্মণগণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহারা বিলাতফের্ত্তাদিগকে সমাজে গ্রহণ করিবেন না। এইবার ধরণীর বুকের ভিতর স্থিরচরণযুগল আজানুপ্রোথিত করিয়া জলদগম্ভীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করি এই সকল দেশনায়কদিগকে অমান্য করিয়া লোহিত সাগরের পরপারে পদার্পণ করিতে দুঃসাহসী হইবে কে?

বিষয়টী স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিতে সকলকে অনুরোধ করি। মনে কর রামসুন্দর India Council এর Member নিযুক্ত হইলেন। আনন্দের বিষয়! কিন্তু P & O Companyর জাহাজে উঠিবামাত্র তাহার জাতির বুদ্বুদ্ ফট্ করিয়া ফাটিয়া যাইবে। এ বিপদ হইতে তাঁহার উদ্ধার নাই। ইংলণ্ড অবস্থানকালে জাতিচ্যুত থাকাতে তত ক্ষতি নাই। কিন্তু একদিন ত তাঁহাকে দেশে ফিরিতে হইবে। একদিন মরিতেও হইবে। তার পর? পতিতের মৃতদেহ কোন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু স্পর্শ করিবে না। কাজেই তাঁহার লাশ অশুচি ডোমের সাহায্যে ভাগাড়ে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং সেখানে হিংস্র শৃগালাদির খর দংষ্ট্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইতে থাকিবে। একে মৃত্যু! তাহার উপর এই উৎপীড়ন!! ওঃ! ইহা স্মরণ করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে।

বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়া ধন মান অর্জ্জন করিতে পার। কিন্তু ধন মান লইয়া কি ধুইয়া খাইবে? ইহারা কি কেহ সঙ্গে যাইবে? কখনই না। যাহা ধুইয়া খাওয়া যায় না বা যাহা সঙ্গে সঙ্গে যায় না তাহা অর্জ্জন করিয়া লাভ? ছিন্নকন্থাবিহারী ছারপোকার ন্যায় সঙ্গে যাইবেন—একমাত্র ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মই যদি গেল তবে ব্যারিষ্টার হইয়াই বা কি, ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াই বা কি?

বিলাত প্রবাসীর ধর্ম্মহানি হয় কেন তাহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইবে না। মনু বলিয়াছেন "আসমুদ্রাৎ তু বৈ পূর্ব্বাৎ আসমুদ্রাৎ তু পশ্চিমাৎ"—ইত্যাদি। অর্থাৎ আরব্য ও বঙ্গোপসাগরের মধ্যবর্ত্তী ভূমিভাগ আর্য্যাবর্ত্ত, এবং এই স্থানেই আর্য্যদিগের বাস। ইহার বাহিরে সমস্ত পৃথিবী অবশ্যই অনার্য্য কর্ত্তৃক অধ্যুষিত। সমুদ্র পার হইলেই অনার্য্যদিগের সংস্রবে আসিতে হইবে। এরূপ নীচ সংসর্গে ধর্ম্মহানি হইবে তাহাতে আর বৈচিত্র কি? জুলু বা হটেণ্টটের সহবাসে কোন্ সভ্যজাতি স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে সক্ষম? অতএব সমুদ্রযাত্রা অধর্ম্ম ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

তবে বর্ম্মা, শ্যাম, জাপান বা যবদ্বীপে যাইতে দোষ নাই। কারণ ঐ সমস্ত দেশ পূর্ব্বদেশীয় এবং উদীয়মান্ সূর্য্যদেবের বিমল রশ্মিজালে প্রত্যহ পবিত্রীকৃত। "সমুদ্রযাত্রা নিন্দনীয়" ইহার অর্থ বুঝিতে হইবে "পশ্চিম সমুদ্রযাত্রা নিন্দনীয়।" কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ব্বাভিমুখ অর্ণবযানে আরোহন করিয়া ইংলণ্ডে যাওয়া সঙ্গত হয় না। কারণ ইংলণ্ডে গমন করিলেই জাতিচ্যুতি ঘটিবে। তা যে পথ দিয়াই যাও। ইহার হেতু, ইংলণ্ডে গমন করিলে শূকরাদির মাংস ভক্ষণ করিতে হয়। হইতে পারে, কেহ কেহ ঐ সকল অখাদ্য গ্রহণ করেন না। কিন্তু তাহারাও সংসর্গ দোষে দুষ্ট হন। আমি জানি বঙ্গদেশে বাস করিয়াও অনেকে Ham & egg এবং beef curry খাইয়া থাকেন এবং তজ্জন্য জাতিচ্যুত হন না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, ইংলণ্ডীয় গোশূকর এদেশীয় গোশূকর হইতে ভিন্নজাতীয়। এ দেশে গোজাতি দেবতাবিশেষ। বিলাতীগরুর দেবত্ব দূরে থাক্, তাহার পৃষ্ঠে মন্দিরাকৃতি ককুদের অস্তিত্বই নাই। বিলাতী শূকর একেবারেই গৃহপালিত, এদেশীয় শূকর তবু আধা বন্য।

আর এটাও ত বিবেচনা করা উচিত যে বিলাতযাত্রা যদি অধর্ম্ম না হয় তবে শাস্ত্রকারগণ ইহাকে গর্হিত কর্ম্ম বলিলেন কেন, আর শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণগণই বা ইহার উচ্ছেদ করিতে কৃতসংকল্প কেন? আমাদের সহিত ইঁহাদের কি এতই শত্রুতা? আমাদের ঠকাইয়া ইঁহাদের এমন কি স্বার্থ সিদ্ধি হয়?

এক্ষণে প্রমাণিত হইল যে বিলাতযাত্রা মহাপাপ, এবং বিলাতযাত্রী জাতিচ্যুত করাই ধর্ম্ম। অতএব, হে হিন্দু সন্তান, আজ হইতে প্রাণপণে এক ঘরে করিতে বদ্ধপরিকর হও। বিবেকানন্দকে একঘরে কর, রবীন্দ্রনাথকে একঘরে কর, জগদীশচন্দ্রকে একঘরে কর, প্রফুল্লচন্দ্রকে একঘরে কর, ঐ সুরেন বাঁড়ুয্যে, এস্ পি সিংহি, চিত্তরঞ্জন, ডি, এল, রায় আর আর যে যেথানে আছে সকলকে একঘরে কর। তুমি বলিবে সকলকে একঘরে করিয়া সমাজে থাকিবে কে? কেন আমরা থাকিব। আমাদের চিন্তা কি? যতদিন স্কন্ধে উপবীতের গোছা ঝুলিতেছে, ততদিন নিরেট পাউরুটি প্রস্তুত করিলেও আমরা জগৎপূজ্য। আর যাহাদের গলায় যজ্ঞোপবীত নাই তাঁহারা?—তাঁহারা ব্রাহ্মণের পদসেবা করিয়াই কৃতার্থ হইবেন।

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়।

(মায়াবাদে—ভট্টাচার্য্যের পাঁতি)

—:*:—

যত দুঃখ, যত কষ্ট, সকল অনর্থের মূলেই বন্ধন,—মায়া-পাশ,—মোহের, অবিদ্যার আকর্ষণ!

"কস্য মাতা কস্য পিতা কস্য ভ্রাতা সহোদরঃ।
কায়াপ্রাণৈর্ন সম্বন্ধঃ কা কস্য পরিবেদনা॥"

কে কাহার? কাহার জন্য এত? এত মায়া কি জন্য? সমস্তই বৃথা! নিজের কায়ার সহিত যেথানে প্রাণের সম্বন্ধ নাই, সেথানে "অন্যে পরে কা কথা!" মায়ার বিরুদ্ধে শাস্ত্রের সহস্র অনুশাসন; শাস্ত্র ও শস্ত্র এক জানিয়া মায়া-বন্ধন ছিন্ন কর, মুক্ত হও। পরের ভাবনায় কাজ কি বাপু? পর কি তোমার পরকালের সঙ্গী হইবে, আত্মরক্ষার্থে যত্নপর হও; শাস্ত্রে আছে,—"আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজৎ" 'জননী জন্মভূমিশ্চ' সে ত তুচ্ছ! সমাজের বন্ধন, প্রেমেরপাশ, বান্ধবতার মাদকতা, রক্তের আকর্ষণ, মোহ বশে তোমার নিকট বড়ই মধুর—কিন্তু চতুর সুজন! তাহাতে আত্মবিস্মৃত হইও না। তাহা হইতে দূরে, অতিদূরে পলায়ন কর; 'দলে দলে বনং যযৌ' নিবিড় বনে গমন করিয়া নিভৃত চিন্তায় পরমার্থ অর্জ্জন কর, আত্মোন্নতি সাধিত হউক! ভীত হইও না—তথায় হিংস্র সিংহ ব্যাঘ্রের বাহুল্যে সংসারী তুমি, মোহগ্রস্ত তুমি, ভীত হইবেই ত কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভীত হইবার কি আছে, বড় জোর তোমার কায়ার প্রতি তাহাদের লোলুপ দৃষ্টি পতিত হইবে; তাহাতে যে তুমি কৃতার্থ, "কায়া প্রাণৈর্ন সম্বন্ধঃ কা" শরীরের সহিত তোমার আর সম্বন্ধ কি, মায়ায় তাহা ছিন্ন করিতে না পারিয়া অশেষ ক্লেশের আয়োজন করিতেছ—বিনা চেষ্টায় কায়ার মায়াবন্ধন ছিন্ন হয় যদি, সে ত সৌভাগ্য! কায়া ত্যাগে বহু সুবিধা—যে আহারীয় বলিয়া তোমার এত চেষ্টা, দিবারাত্রি অমানুষিক পরিশ্রম, সে কাহার জন্য, ঐ সকল অনর্থের মূল কায়ার পোষনার্থে। কায়ার ত্যাগে তাহার ত্যাগ—সুবিধা কি কম! যত গোল বন লইয়া—এত জঙ্গল মিলিবে কোথায়? দলে দলে গেলে বন যে হইবে মানুষের চিড়িয়াখানা (!)। না সে আশঙ্কা নাই—কারণ অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে "যথারণ্যং তথা গৃহম্।" অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে—যেরূপ আছ তদ্রূপই অবস্থান কর,—"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি"। তাহাই মধুর। শাস্ত্রে যে আছে—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥" বিচারশূন্য হইয়া যেন বেদ বাক্যও গ্রহণ করিও না। ওটা নিভ্রান্ত অসার বাক্য। শাস্ত্রের দোহাই দিলে আর কথা নাই—অন্ধের ন্যায় তাহার অনুসরণ করিবে! তাহা না হইলে তুমি আর কিসের বাধ্যছাত্র—নিষ্ঠাবান—সনাতন ধর্ম্মের সেবক!

প্রাণের ধর্ম্ম বাঁধা, বাঁধা পড়া—মনের তৃষ্ণা মিলনে,—

"হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
মানবহৃদয়ে মিশিতে,
নিখিলের সাথে মহা রাজপথে
চলিতে দিবস নিশীথে।"

সাধ যায়—সে দিন আসুক যে দিন—

"ছিঁড়িয়া ফেলিবে জাতিজালপাশ,
মুক্ত হৃদয়ে লাগিবে বাতাস,
ঘুচায়ে ফেলিয়া মিথ্যা তরাস।"
মিলিবে মহা মিলনে!

হৃদয় চায়—

"বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
বাজুক্ বিশ্ববাজনা।
উঠুক্ চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হয়ে আপনা।
টুটুক্ বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সঙ্গীতে নূতন ছন্দ,
হৃদয়সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাক্ নবীন বাসনা।"

নবীন বা প্রবীণ যে বাসনাই জাগুক না কেন, সে যে মায়াবন্ধন—বাসনা মাত্রই ব্যসন, তাহাকে কি কখন প্রশ্রয় দিতে আছে? ওগুলা যে মহা অবিদ্যা—অবিদ্যাকে প্রশ্রয় দিয়া নিরয়গামী কে হইবে! মিলন কে 'মহা'ই বল, আর যাহাই বল—শাস্ত্রের শাসনে ও-মিলন-সাধের গুড়ে বালি!

শ্রীকুলিশধর ভট্টাচার্য্য।

(কর্ম্ম ও মর্ম্মের সম্মিলন ফলে)

—:*:—

দেশের লোকের যেরূপ মতিগতি, তাহাতে রক্ত যেন ক্রমেই "জলুষ" হইয়া যাইতেছে; প্রাণটাকে সজীব রাখিবার ক্ষমতা আমরা যেন দিন দিন হারাইতেছি! রক্তের এমন জোর নাই, যাহার টানে প্রাণ, আত্মীয়ত

নিতান্ত আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে, পরের কথা ত অনেক দূরে। ইহার নিদানে পণ্ডিতেরা বলেন "এ লক্ষণ দেখা দিবেই ত, এটা হইতেছে কর্ম্মের যুগ,—হৃদয়-বৃত্তির নয়,—প্রতি মুহূর্ত্তে পরের মুখ চাহিয়া চলিতে হইলে গতি-শক্তির হ্রাস পদে পদে, কার্য্যের প্রত্যবায় অবশ্যম্ভাবী।" বড়র যুক্তি বড়,—ক্ষুদ্রের তাহা বুঝিবার সাধ্য কি! যে স্থানে স্নেহের আকর্ষণে সকলে মিলিত, সেখানে সংঘর্ষণ কিরূপে সম্ভবে,—ক্ষুদ্রের বাধা দিবার শক্তিই বা কতটুকু, কর্ম্মে বাধা দিবার পূর্ব্বেই যে সে কৃতজ্ঞতা রসে গলিয়া মিলিয়া যায়! নির্ম্মম কর্ম্মবাদের থিওরী আমাদের অসুখ রক্তের ফল! প্রকৃত কর্ম্মী যিনি, তাঁহার চক্ষে কর্ত্তব্যের এটা ছোট, ওটা বড় নাই; রুটিন শোধ কর্ম্ম নহে, কর্ম্ম হৃদয়ের, মানুষের প্রতি মানুষের যে কর্ত্তব্য, যে দায়িত্ব তাহা সুসম্পাদনেই তাঁহার সার্থকতা। কর্ম্মবীর হৃদয়বলে, সহানুভূতিতে, সৌহার্দ্দে, কর্ম্ম ও মর্ম্মকে এক করিয়া প্রাণের ধর্ম্ম পালন করেন। সে যোগের অমৃতময় ফলে জীবনে জীবনে প্রেম, প্রীতি বিকশিত হয়—কর্ম্মীর সৌরভ-গৌরবে মহিমান্বিত হইয়া সকলেই তাঁহার সহায়তা সম্পাদনে বদ্ধপরিকর হয়—তাঁহার বাধা সংসারে নাই, যত বাধার, যত বিপদের নিরাকরণই কর্ম্ম! তিনি সকলের সহায়, সকলে তাঁহার সহায়, স্নেহাজ্ঞানুবর্ত্তি; সে ক্ষেত্রে পরস্পরের মিলনে কার্য্য সুচারুরূপে সাধিত হয়। ইহা অলীক কল্পনার কথা নহে, জীবন্ত সত্য, আমাদের ইহার উপলব্ধি হইয়াছে—সর্ব্বজন প্রিয় আমাদের শ্রীযুক্ত ডাক্তার মোহিতলাল সেন মহাশয়ের কর্ম্ম-জীবনে। মোহিতবাবুর ন্যায় সুচিকিৎসক দুর্লভ নহে, কিন্তু সে জন্যই কি তিনি কোচবিহারবাসীর আত্মীয়ের ন্যায় প্রিয়? কেবল চিকিৎসা নৈপুণ্যে লোকে এরূপ আকৃষ্ট হয় না,—সকলে তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ, তাঁহাতে কর্ত্তব্য ও হৃদয় একসূত্রে গাঁথা বলিয়া। সস্নেহ হাস্যরস ও গাম্ভীর্য্য তাঁহাতে অপূর্ব্ব সমাবেশ, মনটি যেন তাঁহার, সর্ব্বমঙ্গলচিহ্ন নারিকেলটির মত, বাহিরে দৃঢ় খোসা—ভিতরে সরল শাঁশ—অমৃত-তুল্য স্নেহ—লোকে তাঁহার জন্য কেন না আকৃষ্ট হইবে! তাঁহার হাতে রোগী দিয়া আত্মীয়গণ আশ্বস্ত, রোগীও আশান্বিত, শঙ্কিতও বটে! হাসিভরা বাক্যতূণের মধ্যে অন্যায়ের প্রতি বাণটি ত তাঁর কম তীক্ষ্ণ নয়! অনধিকার-চর্চ্চা একেবারে তাঁহার অসহ্য—কর্ত্তব্যের নিকট বিনয় তাঁহার সঙ্কুচিত—সকল সময় স্পষ্ট কথা—অথচ তাহাতে এমন একটা মিষ্টত্বের আমেজ মাখান, যেন তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ-সমালোচনা, তীক্ষ্ণ মধুর; যার বাজে সেই বুঝে, আত্মভ্রম সংশোধন হইয়া যায় তখনি। মিঠেকড়ার এমন অপূর্ব্ব সম্মিলন কেবল সরল সরস মনেই সম্ভবে। তাঁহার আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহারে কোচবিহারবাসী কিরূপ ভাবে আকৃষ্ট, তাঁহার অভাব কিরূপ ভাবে তাহারা অনুভব করিয়াছে তাহা, যে দিন প্রচার হইল, তিনি সিভিলসার্জনের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন—সেই দিন আপামর অধিবাসীবর্গের মধ্যে যে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল, তাহা হইতে সহজেই অনুমেয়। যে প্রাণ এইরূপে নিজের চরিত্রবলে, কর্ত্তব্যপালনে, প্রীতিদান করিয়া নিস্পরকেও আত্মীয়রূপে বরণ করিতে সমর্থ, যাহার বিরহ আত্মীয়বিরহ রূপে সকলের মনে বিরাজিত, সে প্রাণ কত উদার ভালবাসিবার শক্তি তাঁহার কিরূপ! তিনি সকলেরই অনুকরণীয়, তাঁহার পরিচিত মাত্রই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। ভগবান এই কর্ম্ম ও মর্ম্মজ্ঞীকে দীর্ঘজীবি, চিরসুখী করুন, এই আমাদের প্রার্থনা—তাঁহার আদর্শে আমাদের মতি গতি

শ্রী—

পক্ষীপ্রবাদ।

—:*⊕*:—

(বর্দ্ধমান জেলায় প্রচলিত)

ফটিক জল, ফটিক জল—এক ব্রাহ্মণী ছিলেন। তিনি বিধবা হইয়া বৃদ্ধ বয়সে একাদশ্যুপবাস করিয়া জল তৃষ্ণায় অধীরা হন, তথাপি তিনি জল পান করেন না। অবশেষে তৃষ্ণায় প্রাণ ত্যাগ করিয়া চাতক পক্ষীর আকার পরিগ্রহ করিয়া 'জল' 'জল' করিতে থাকে।

তুই নিলি. তুই নিলি—দুই বন্ধু ছিল। তাহারা অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত বিদেশ যায় এবং প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময় উভয়ের সম্মতিক্রমে, সমস্ত অর্থ লইয়া যাওয়া নিরাপদ নহে বিবেচনা করিয়া সমস্ত অর্থ গ্রামের নিকটবর্ত্তী এক বাগানে প্রোথিত করিয়া রাখিল, এবং কিছু সঙ্গে লইয়া বাটী গমন করিল। কিছুদিন পরে আবশ্যকবোধে উভয়ে সেই অর্থ আনয়ন করিবার জন্য গমন করিয়া দেখে এক কপর্দ্দকও নাই, তখন উভয়ে 'তুই নিলি তুই নিলি,' বলিয়া মারামারি করিয়া প্রাণত্যাগ করে। পরে তাহারা 'বরাই' পাখী হইয়া 'তুই নিলি, তুই নিলি' বলিতে থাকে।

হুট্টিটি, হুট্টিটি—এক ধনী ছিল। সে বড় কৃপণ। একদিন চোরে তাহার সমস্ত ধন অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, সে দুঃখে তিতির পাখী হইয়া উড়িয়া যায়। সেই কারণে তিতির পাখী ডাকিলে আমাদের দেশের লোকে বলিয়া থাকে যে, কাহারও বাড়ীতে চুরি হইবে।

শ্রীশেফালিকা কুণ্ডু।

(ফরিদপুর)

কাক—সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পল্লীর শান্ত শীতল ছায়ায় একজন লোক বাস করিত। সে জাতিতে ছিল বাগ্দি। সে একখানি ক্ষুদ্র গৃহে তাহার কন্যা লইয়া বাস করিত। কন্যাটী অত্যন্ত সুন্দরী ছিল। রূপ উপছিয়া পড়িত। রাস্তা দিয়া যখন সে যাইত সকলেই তাকাইয়া দেখিত।

সেই গ্রামে একদল মুচি বাস করিত। তাদের একটী ছেলে তাকে ভালবাসে। কন্যাটীও তাকে ভালবাসে। দুইজনে মেলামেশা করে। মুচির ছেলে গান গায়—মেয়ে কাছে বসিয়া শুনে। এইরূপে দিন যায়। এ কথা কি লোকের অগোচর থাকে? অবশেষে কন্যার পিতা ঘটনা জানিতে পারিয়া দুইজনকেই অভিশাপ দিল।—এমন নীচ তোরা—জাতটাও মানিলি না—ভাবিয়াছিস্ গান গাহিয়া জীবন যাইবে—হক্ তাহাই,—পাখী হইয়া তোরা ডালে ডালে ফের—তোদের গানে তোরাই মুগ্ধ হ',—স্বর যেন তোদের এমন কর্কশ হয় যে স্বরের জন্যই লোকে তোদের তাচ্ছিল্য করে।

বাগ্দিবুড়ার শাপে সেই মুহূর্ত্ত হতেই তাহারা কাক, এবং কা কা করিয়া আজও বেড়াইতেছে।

বিনয়েন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

বৈরাগ্যের পথে—শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম, এ বি, এল প্রণীত। প্রকাশক--গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ডঃ ক্রা ৩২ পেঃ ১০২ পৃষ্ঠা। ছাপা ও কাগজ সুন্দর। মূল্য ॥০ আনা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কথামৃতের, গৃহস্থের কর্ত্তব্যপথ নির্দ্দেশক, অমূল্য ধর্ম্মোপদেশবলী, ইহাতে বিষয়ানুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সংগৃহীত হইয়াছে। অধিকারী ভেদে সাধন পথও ভিন্ন; সংসারী ও সন্ন্যাসীর পথ এক নহে। ঠাকুর বলিতেন, "মানুষ দেখ্‌তে সব একরকমের বটে কিন্তু প্রত্যেকের আলাদা আলাদা প্রকৃতি। কারও সত্ত্বগুণ বেশী, কারও রজোগুণ, আবার কারও তমোগুণ, যেমন পুলিপিঠে দেখ্‌তে একরকম, কিন্তু কোনটির ভিতরে নারিকেলের ছাঁই, কোনটির ভিতরে ক্ষীরের পোর, আবার কোনটির ভিতরে কলায়ের পোর। আবার সকলের সবটি সয়ও না, "যেটি যার ভাল লাগে, যার পেটে যা সয়, মা তাই খেতে দেন। কোন ছেলের জন্য মাছের কালিয়া, কারও মাছ ভাজা, কারও বা মাছের অম্বল।" তেমনি অধিকারী ভেদে উপদেশও বিভিন্ন। ঠাকুর রোগ বুঝিয়া অমোঘ ঔষধের ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার কথামৃত, অমূল্য শান্তি সুধা, শ্রীম—প্রমুখ ভক্তগণ অনেকাংশে সংগ্রহ করিয়া জগতের মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন; কিন্তু অধিকার অনুযায়ী বিষয়গুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিলেন, বোধহয় শরৎবাবু এই প্রথম। মানবমন, কেবল সংসারের দেহজ সুখ লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে না; সংসারের সুখ মোহে আবদ্ধ থাকিয়া কি প্রাণ প্রাণের ধর্ম্ম ভুলিতে পারে? জীবনে এমন সময় আসে,--যখন মনপ্রাণ মহাপ্রাণের জন্য কাঁদিয়া উঠে। তাপিত তৃষিত আত্মা জগন্মাতার স্নেহ-শীতল সর্ব্বসন্তাপহারী ক্রোড়ে শিশুর ন্যায় আশ্রয় লইতে ব্যগ্র হয়। পথভ্রষ্ট অবাধ্য বালকের তখন কেবলি মনে পড়ে, মার কথা, কিন্তু কোথা মাতা? সে যে প্রবৃত্তির ঝোঁকে, বহুদূরে, বিপথে, ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ, বিপদসঙ্কুল স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে! কে বলিয়া দিবে কিসে পরিত্রাণ—কোন্ পথ ফিরিবার! এ অবস্থায় উপায়—কেবল মহাপুরুষের চরণে শরণ—তাঁহাদের নির্দ্দেশিত পথ অবলম্বন। যিনি সেই অনন্ত শান্তির উৎস,—জীবন রক্ষক—মৃত প্রাণের মৃতসঞ্জীবনী সুধা মহাজন-উক্তি তৃষিতের ওষ্ঠপ্রান্তে তুলিয়া ধরেন, তিনি সকলের ভক্তির পাত্র, পরম মিত্র! তৃষিত না হইলে তাপিতের দুঃখ বুঝে না, শরৎবাবু গৃহী, তিনি গৃহীর দুঃখ বুঝেন। তিনিও একদিন তৃষিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "গৃহীদের উপায় কি? সংসারী কি করিবে? সংসারীদের জন্য রামকৃষ্ণ কোন পথ দেখাইয়া দিয়াছেন?" এই অন্বেষণের ফলে, তিনি যাহা লাভ করিয়াছেন, গৃহীর কর্ত্তব্যপথনির্দ্দেশক সেই উপদেশাবলী "বৈরাগ্যের পথে" সংগ্রহ করিয়াছেন। ঠাকুরের আশীর্ব্বাদে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হউক, গৃহী ঠাকুরের উপদেশ গ্রহণ করিয়া সংসারে অবস্থান করিয়াও, মাতৃমন্দিরের পথ বৈরাগ্যের পথে অগ্রসর হউন; সংসার সুখের হউক।

কু—

কোচবিহার ষ্টেট্ প্রেসে শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও কোচবিহার সাহিত্য-সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

২য় বর্ষ। | আষাঢ়, ১৩২৫ সাল। | ৮ম সংখ্যা।

ধ্যান-ভঙ্গ।

মেঘে রৌদ্রে বাঘ-ডোরা তেয়াগি গগন-আসন,
অস্তাচল-তপোবনে রবি-ঋষি ফিরিল যখন ;
পর্ব্বত গুহার মাঝে তেজে দগ্ধ-প্রায়,
ছিল যেই লুকাইয়া কায়,
তিমির-অপ্‌সরা সেই সায়াহ্নের কোমল ছায়ায়
আবরিয়া আপনারে ধীরে ধীরে করে আগমন।
ইন্দ্রপ্রস্থ আছিল যেখানে,
সেই ধ্বংস-স্তূপ মাঝে ধ্যানরত তাপসের কানে
শীতল মধুর বায়ু কহে গেল করুণ কাহিনী ;
ক্রমে ধীরে আসিল রজনী,
তারকার জালে ঘেরা, ছড়াইয়া মেঘ কেশপাশ,
চন্দ্রমাবদনে হাসি তপস্যায় করে উপহাস।

কতদিন কতদিন আগে হেথা আছিল নগরী,
স্মৃতি তার এখনও জাগিয়া,
শৈবাল আচ্ছন্ন শিলা, মাঝে মাঝে উঠিয়াছে ফুঁড়ি
দীর্ঘ তরু গগন ব্যাপিয়া ;

শত বসন্তের শোভা ফুটে উঠি' গিয়াছে মিলায়ে,
ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস বাজিয়াছে প্রকৃতির গায়ে ;
শত বর্ষা কেঁদে গেছে স্মরি' সেই অতীত গৌরব,
ঝরে গেছে কত ফুল, মিশাইয়া গিয়াছে সৌরভ ;
গাছে গাছে লতায় পাতায়
ঘেঁসাঘেঁসি মেশামিশি সকৌতুকে যেখানে সাজায়
প্রকৃতির রম্য কুঞ্জবন,
সেইখানে শিলার আসন ;
বসি' তথা এ তাপস অবিরাম করিছে সাধনা
কি প্রয়াসে কেবা জানে ? সফল কি হইবে কামনা ?

অতি দূর লোকালয়, মহিষের গলঘণ্টাধ্বনি
কভু নাহি পশে' এইখানে ;
মধ্যাহ্নের তপ্ত রৌদ্রে ব্যর্থ করে পাতার গাঁথনি ;
ঝিল্লীরব অবিরাম গানে
ঘুম পাড়াবার ছলে ভুলাইয়া নিখিল সংসার,
স্নেহময়ী মাতা-সম অনুক্ষণ তুলিছে ঝঙ্কার,
ত্যজি পুত্র কন্যা ও বনিতা
ত্যজি কায়া, ধরি ছায়া, তপস্যার একি সার্থকতা ?
একি স্বপ্ন ? কল্পনার খেলা ?
ভুলে গেছে সব কথা ; ভেঙ্গে গেছে সংসারের মেলা।
দীর্ঘ জটা ধূলায় লুটায়
বল্মীকে আবৃত তনু, কেশে পাখী বেঁধেছে কুলায়
গলদেশ বেড়ি' ফণী জীর্ণ ত্বক্ করেছে মোচন
পাষাণ-মূরতি-সম সে তাপস ধ্যানে নিমগন।

অবশেষে একদিন প্রভাতের আলোক তরুণ
তরুশিরে কনক বরষে,
তাপস শুনিল কানে কার বাণী স্নেহ-সকরুণ
মত্ত প্রাণ উদ্বেল হরষে।
"বর লও" ; চাহি দেখে সম্মুখেতে আজি ভগবান
সকল সার্থক তপ ; শ্রম আজ হল অবসান।

কাতরে কহিল বাণী "হে দেবতা তুমি কি জান না
কার তরে এত ক্লেশ সহি' এত করেছি সাধনা ?
পূরাও কামনা এবে।" মৃদু হাসি কহিল দেবতা,
"ভ্রান্ত তুমি হে বাতুল! তপের সে নহে সার্থকতা।
দারিদ্র্য অনলে দহি'
রোগ, শোক, জরা, তাপ অহরহ সংসারেতে সহি'
বৈরাগ্য জনমে যদি মনে,
মুক্তি লভিবার তরে তপ করে তাপস কাননে।
আকাঙ্ক্ষা তোমার,—
ধনজনপূর্ণ গৃহ হোক্ সুখভোগের আধার।
কর্ম্মপথে পূরে সে কামনা
তপস্যায় কেন বৃথা নশ্বর বিভব আরাধনা ?"
"চাহি নাকো মুক্তি দেব! দাও বর, তৃপ্ত হোক্ মন।"
তর্জ্জনি হেলনে দেব দেখাইল দৃশ্য সুমোহন।

দেখিল তাপস চাহি' সেই দূর পল্লীর মাঝারে,
দীঘিকার জলে আর নারিকেল তরুর ছায়ায়
ডুবিয়া শীতল হ'ত যে কুটীর, বিনাশিয়া তারে
অপরের উচ্চ সৌধ উঠিয়াছে গগনের গায়।
পরে আসি অধিকার করিয়াছে তার সেই ঘর,
পুত্র কন্যা এবে সকাতর
পরের আশ্রয়ে করি' কোনক্রমে জীবনধারণ,
নিরুদ্দেশ জনকেরে সধিক্কারে করিছে স্মরণ।
মৃতা তার জায়া,
কাঁদি বলে সে তাপস "একি দেব ? একি তব মায়া ?"
"মায়া নয়, সত্য ইহা। বল বল দিব কোন্ বর ?"
"পুত্র কন্যা দেহ মোরে, ফিরে দাও আমার সে ঘর।"
"এর তরে এত তপে ছিল তব কোন্ প্রয়োজন ?
জগতের কর্ম্মশালে বাঞ্ছা তব হ'ত সম্পূরণ।
কর্ম্ম অনুরূপ ফল এ জগতে ভুঞ্জিবে মানব
এই ত নিয়ম,
যে তপ করেছ তুমি মুক্তি তার ফল যে চরম।"

তাপস কহিল রোষে
"পাব না কি ফিরে যাহা হারায়েছি নিজ কর্ম্মদোষে ?
দেবতার বাণী কি ছলনা ?
ত্যজি তপ, সংসারেতে যাব পুনঃ, পূরাব কামনা।"

দাঁড়াইল সে তাপস, অঙ্গে আর নাহি কোনো বল,
মরণের ছায়া আসি আবরিল নয়ন-যুগল।
বদ্ধমুষ্টি আস্ফালি বৃথায়
বারেক জড়তানাশপ্রয়াসেতে সঞ্চালি কায়ায়
লুটাইয়া পড়িল ধরায়
অন্তিমের শ্বাস ছাড়ি' কেঁদে বলে ধরি দেব-পায়,
"হে দেবতা! করগো করুণা,
জানাও এ পরিণাম, ব্যর্থ এই আমার সাধনা
সুতসুতা জানে যেন, বুঝে যেন ভোগের কামনা
তপে নাহি পূর্ণ হয়, ভোগসুখ যদি মন চায়
সংসারের মত্ত সিন্ধু গর্জ্জি যেথা দিগন্তে ফেণায়,
জীবনের তরণী তথায়
ভাসাইয়া দিতে হ'বে; অনুক্ষণ থাকি অনলস
লক্ষ্যপথে যেতে হ'বে, পুরস্কার—" নীরব তাপস।
ব্যর্থ জীবনের সেই শেষ বাণী না যেতে মিলায়ে
"তথাস্তু" বলিয়া দেব দিল বর, করুণা বিলায়ে।

'সিদ্ধি'—রচয়িতা।

মঙ্গল-মঠ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

নবম পরিচ্ছেদ।

মায়াকে বাটীতে পৌছাইয়া দিয়া, শ্রীশ বাবুর বাটীর সকলে নিজালয়ে প্রস্থান করিলেন। মায়া ঘরের আসিয়া ঢুকিতে-ই ঝি বলিল "মা, তোমার বাপের বাড়ী থেকে কে কুটুম এসেছে,—বাবু সঙ্গে করে নিয়ে উপরে গেলেন, দেখ গে,—"

মায়া আশ্চর্য্য হইল, পিত্রালয় হইতে আসিবার মত কুটুম ত কাহাকেও মনে পড়িল না,—ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিল "কতক্ষণ ?"

ঝি বলিল "এই আসছেন—"

বাক্য ব্যয়ে কালক্ষেপ অনাবশ্যক বুঝিয়া, মায়া দ্রুতপদে উপরে চলিল, কুটুম্ব যিনিই হউন,—মন্মথনাথ যখন অন্তঃপুরে বিশ্রাম-কক্ষে তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই নিঃসম্পর্কীয় বাহিরের লোক হইতে পারেন না,—মায়ার মনে হইল হয় ত কেবল দাদা-ই মামলা-সম্পর্কীয় কার্য্যানুরোধে আসিয়াছেন!—

শয়ন কক্ষ হইতে সদ্যঃ জাগরিত পুত্রের অস্পষ্ট ক্রন্দনধ্বনি কানে আসিয়া পৌঁছিল, মায়া গৃহে ঢুকিতে উদ্যতা হইয়া বিস্মিত-সঙ্কোচে পিছু হাটিয়া দাঁড়াইল,—দেখিল দোল্‌নার কাছে টুলের উপর বসিয়া, জনৈক স্নিগ্ধ-সুন্দর-কান্তি তরুণ যুবক, স্মিত-কৌতূহল বিস্ফারিত নয়নে শিশুর পানে চাহিয়া দোলনায় দোল্ দিতেছে,—তাহার পরিধানের কাল রংয়ের কোট-প্যান্ট ও মাথার প্রকাণ্ড মারাঠি পাগড়ীতে—সেই তরুণ-শ্রী সুন্দর আকৃতিকে গম্ভীর-কোমল গরিমাময় দেখাইতেছে, মায়া দেখিল সে মূর্ত্তি তাহার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত!

মায়ার পদশব্দে মুখ ফিরাইয়া যুবক দ্বারের দিকে চাহিল, পরক্ষণে টুল ছাড়িয়া উঠিয়া শিষ্ট-সৌজন্যের সহিত প্রণাম করিয়া অসঙ্কোচ হাস্য সুন্দর বদনে বলিল "দাঁড়ান মা, আমি আপনাকে প্রণাম করতে এসেছি, আমায় আপনি চেনেন না, কিন্তু মঙ্গল-মঠে শান্তি মাসিমার নিকট হ'তে আমি আপনার পরিচয় পেয়েছি, আমার নাম মদনানন্দ ভট্ট।"

যুবক বাঙ্গলায় কথা কহিল বটে, কিন্তু তাহার কথার স্পষ্ট মারাঠি টান মায়ার কর্ণ অতিক্রম করিল না,—মায়া বুঝিল উদার স্নেহময়ী শান্তি দেবীর যেমন অসংখ্য স্বদেশী-বিদেশী পুত্র কন্যা মাতা পিতা আছে, ইনিও তাহাদের একজন! কিন্তু যুবকের সরল পরিচয়ের উত্তরে সে যে কি বলিয়া স্নেহ-অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না,—কুণ্ঠিত ভাবে মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দ্বারের পাশ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ চাহিল,—মন্মথনাথ কৈ?

দোল্‌নার কার্য্যবন্ধ হওয়ায়, শিশু ততক্ষণে হাত পা ছুড়িয়া রীতিমত ক্রন্দন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, মদন তাড়াতাড়ি তাহার কাছে গিয়া, সহাস্য মুখে মাথা নাড়িয়া, আঙ্গুলে তুড়ি দিয়া 'ছোট ভাই-টি আমার'—'ছোট ভাই-টি আমার' বলিয়া আদর করিয়া তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল,—বিস্ময় নির্ব্বাক মায়া, তাহার অকুণ্ঠিত আনন্দময়-আত্মীয়তা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল,—এ ব্যক্তিকে অপরিচিত বলিবে কে?

পাশের ঘর হইতে মন্মথনাথ কাপড় ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দ্বারের পাশে কুণ্ঠিত বিপন্ন ভাবে দণ্ডায়মানা মায়াকে দেখিয়া প্রসন্ন-স্মিত বদনে বলিলেন "একটি ভদ্রলোক এসেছেন, দেখেছ? সন্ধ্যার ট্রেনে এসে উনি শ্রীশ বাবুর বাসায় উঠেছিলেন, পরিচয় পেয়ে আমি ধরে নিয়ে এলুম!—উনি সুন্দর-মঠের মহারাজের কাজে এসেছেন, শান্তিদিদিকে, উনি মাসিমা বল্লেন।"

খোকাকে বুকের উপর তুলিয়া লইয়া মদন বলিল "অবিচার করবেন না,—আপনি না বল্লেও আমি ছোট মাসিমাকে প্রণাম করতে আস্‌তাম, সেখান থেকে আমি ঠিকানা নিয়ে এসেছি,—মাসিমা ক্ষমা করবেন, সামাজিক শিষ্টাচারের বাঁধাবাঁধি আমার প্রকৃতিতে সব সময় পোষায় না,—আপনাদের মত ভাল-লোক দেখলে আমার ভারী আনন্দ হয়!……… আমার অদ্ভুত ব্যবহারে আপনি হঠাৎ খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন, না? কিন্তু আমার প্রকৃতি-টা এমনি-ই বর্ব্বরতা পূর্ণ! চিরদিন-ই!"

উচ্ছ্বসিত সরলতায় মদন আপনা আপনি অপ্রস্তুত লজ্জায় সকৌতুকে হাসিয়া উঠিল!—মায়া দেখিল, নিতান্ত-ই বালক! সঙ্কোচ ইহার কাছে আপনি সঙ্কুচিত হয়!—কিন্তু তবু মায়ার অনভ্যস্ত প্রকৃতি অপরিচিতের সম্মুখে সলজ্জ-কুণ্ঠায় অবনত হইয়া রহিল,—মায়া মন্মথনাথকে লক্ষ্য করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "রাত্রি অনেকটা হয়ে গেছে,………আমি খাবায়ের বন্দোবস্ত করে আসি—"

মায়া প্রস্থানোদ্যতা হইল, মদন বলিল "আপনার খোকার খিদে পেয়েছে বোধ হয়,—"

খোকার ক্ষুধার কথা—সদ্যঃ পরিচয়ের দায় সামলাইবার তাড়ায়. মায়া ভুলিয়া গিয়াছিল,—মদনের কথায় ব্যস্ত হইয়া পড়িল কুণ্ঠা-চকিত নয়নে মন্মথনাথের পানে চাহিয়া বলিল "ওকে এনে দাও—"

শিশুকে মদনের নিকট হইতে লইয়া মন্মথনাথ মায়াকে দিলেন, মায়া চলিয়া গেল।

বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া মদন জল-যোগান্তে মন্মথনাথের সহিত নানাকথায় প্রবৃত্ত হইল,—মায়া রান্নাঘরের কাজকর্ম্ম লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত রহিল, সে আর এদিকে আসিল না।

আহারের সময় মন্মথনাথ আহারস্থানে মায়াকে অনুপস্থিত দেখিয়া তাহার সন্ধানে রন্ধনাগারে গেলেন, দেখিলেন মায়া দুধ জ্বাল দিতেছে। মন্মথনাথ বলিলেন "ওগো তুমি এস, মদন খেতে বসছে।"

মায়া ফুটন্ত দুগ্ধের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সংক্ষেপে বলিল "তুমি ত রয়েছ—"

মন্মথনাথ বলিলেন "কি মুস্কিল,—খাওয়ার সময় তুমি না থাকলে কি ভাল হয়? সে হবে না, চল—"

অসহিষ্ণু-চঞ্চল ভাবে মায়া সহসা বলিল "আমার লজ্জা করে,—আচ্ছা তুমি চল, আমি গিয়ে পরিবেশন করছি—"

মন্মথনাথ বিস্মিত হইলেন, বলিলেন "না না,—তুমি বসে খাওয়াবে চল, ঠাকুর পরিবেশন করুক,—ছিঃ নিঃসম্পর্কীয়ের মত ব্যবহার করলে ছেলে মানুষ দুঃখিত হবে,—ওকে আর লজ্জা কি? ...... না মায়া, ও সব পাগলাম রাখ. তুমি ওকে এখনো বুঝতে পার নি. ও অত্যন্ত সরল-স্বভাব ছেলে মানুষ, রক্তের সম্পর্ক নেই বলে হতগ্রাহ্য করলে—ওকে অন্যায় আঘাত দেওয়া হবে।"

দুধের কড়া উনানের উপর হইতে নামাইয়া রাখিয়া মায়া বলিল "তবে চল—"

উভয়ে আহার স্থানে উপস্থিত হইলেন। মদন ও মন্মথনাথ আহার করিতে লাগিলেন—মায়া সম্মুখে বসিয়া এবার বেশ অকুণ্ঠিত-সংযত ভাবে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল। শান্তি দেবীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে মদন বলিল "মাসিমার ভারী ইচ্ছে ছিল আমার সঙ্গে এখানে আসেন, কিন্তু ক' মাস থেকে তাঁর শরীরের অবস্থা ভাল নহে, সেই জন্যে সাহস করলেন না!—"

পিতার মৃত্যুর পর হইতে হঠাৎ আচার-অনুষ্ঠানের অত্যন্ত কড়াকড়ি করিয়া, শান্তি দেবী তাঁহার শক্তি সুগঠিত স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহটির প্রতি একরূপ অ-যথা অত্যাচার করিয়া, তাহার স্বাচ্ছন্দ্য ব্যাহত করিয়া কিছুদিন হইতে অসুস্থতা-বোধ করিতেছেন, তাহা মায়া পূর্ব্বে কেবলরামের পত্রে সংবাদ পাইয়াছিল, আজ মদনের মুখেও তাহার কিছু কিছু আভাস পাইল. দুঃখিত ভাবে বলিল "দিদি অবশ্য আমাদের চেয়ে ঢের বেশী বোঝেন কিন্তু তাঁর এ সমস্ত কাজকে আমরা মন্দ বলে নিন্দা করতে না পারলেও—"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া মন্মথনাথ বলিলেন "ভাল বলে সুখ্যাতি করতেও পারিনে, কি বল ভট্‌চা-জী?"

সজোরে মাথা নাড়িয়া মদন বলিল "নিশ্চয়! এই নিয়ে আমি এবার তাঁর সঙ্গে খুব ঝগড়া করে এসেছি—"

স্নিগ্ধ-কৌতূহলপূর্ণ নয়নে চাহিয়া মায়া বলিল "ঝগড়া! কি রকম?"

মদন বলিল "ক্রমশঃ অভ্যাসে শরীরের পক্ষে সকল ক্লেশই সহনীয় হয়, কিন্তু হঠাৎ চাবুক মেরে কার্য্যোদ্ধার অসম্ভব! মাসিমা সারা রাত হিমে বসে—রাত জেগে মালা করতেন,—দিবসান্তে একাসনে হবিষ্য গ্রহণ করতেন............আরও এমনি কত শক্ত শক্ত নিয়ম পালন করতেন, এত কি সহ্য হয়? সীমা সকলের-ই আছে!......আপনি ত এবার সেখানে যাবেন মাসিমা, সবই দেখতে পাবেন, এখন তবু কড়াকড়ি অনেক কমিয়েছেন!—"

মায়ার কৌতূহলী দৃষ্টির উপর চকিতে একটা বিষণ্ণ গাম্ভীর্য্যের ছায়া নামিয়া আসিল, হেঁট হইয়া মায়া সম্মুখের বাতিটা উজ্জ্বল করিয়া দিতে মনোযোগী হইল। কোন কথা কহিল না।

মন্মথনাথ ও মদন অন্যান্য কথা আরম্ভ করিলেন। মঙ্গল-মঠের গদির স্বত্ব-সাব্যস্ত বিষয়ক তর্ক উত্থাপন করিয়া মদন বলিল "দেখুন, সুন্দর-মঠের মোহন্তমহারাজকে আমি খুব ভাল রকম চিনি, তিনি কোন মানুষকে, তার জাতি, ধর্ম্ম, বয়স, এ-সবের দিক থেকে বিচার করেন না,—তিনি গুণগ্রাহী লোক, মানুষের মনুষ্যত্ব-টা সকলের উপর দেখেন। আমি বেশ জানি দেওয়ান দেবলচাঁদ যদি মানুষের মত মানুষ হ'ত, তা হলে তাকে গদি দিতে মহারাজের কোনই আপত্তি ছিল না,—কিন্তু দেওয়ান শিক্ষিত হ'লে হবে কি? সে যে চরিত্রহীন, অপদার্থ! সে সব লোক এমন অসীম প্রতাপে গুরুতর দায়িত্বভার পরিচালনের ক্ষমতা পেলে, অপ্রতিহত স্বেচ্ছাচারে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম, সমাজ সব রসাতলে পাঠাবে! ········তাই ত মোহন্ত মহারাজ এমন ভাবে তার দুষ্প্রবৃত্তি দমনের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন! না হলে তিনি কি এ সব ছেঁড়া-ল্যাঠায় নিজে মাথা গলাতেন, না আমাদের শুদ্ধ জড়িয়ে এত হয়রান্ করতেন!—"

কথা বলিতে বলিতে মদন ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া উঠিল, বলিল "দেখুন মন্মথবাবু,—আপনার কাছে যথার্থ বলছি,—আইন-বিদ্যা ভাল লাগে না বলে এর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে গেছলুম, কিন্তু মহারাজের আজ্ঞায় আবার বাধ্য হয়ে কলেজে ঢুকে আইন পড়ে পাশ করে এলুম—কিন্তু বাস্তবিক বল্‌ছি তবু এ ব্যবসায়ের ওপর আমার শ্রদ্ধা ছিল না, কিন্তু এই মামলার দায়ে ঠেকে, এইবার আইনের মাহাত্ম্য বুঝ্‌ছি, চমৎকার জিনিস!"

মন্মথনাথ হাসিয়া বলিলেন "প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই সকল বস্তুর শক্তি-মাহাত্ম্য পরীক্ষিত হয়। সাধনার প্রণালী ভেদে সকল ধর্ম্ম, সকল কর্ম্ম, মন্দ ভাল হয়ে থাকে, ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থপরতার নিকট যদিও এ ব্যবসায়ের মর্য্যাদা হানি হয় বটে, তবু সমষ্টিভাবে দেখ্‌লে ব্যবহার ক্ষেত্রে এ বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার কর্‌বার যো নাই!"

স্মিত-কোমল দৃষ্টি তুলিয়া মায়া বলিল "আপনি পাশ করেছেন, ওকালতী কর্‌বেন না?—"

অসন্তোষের সহিত মদন বলিল "আমায় আপনি? না মাসিমা, ওটা গাল দেওয়া হয়,—মেসোমশায়, উনি পর মনে কর্‌তে পারেন, কিন্তু আপনি শুদ্ধ ········নাঃ! ভারি অন্যায় কর্‌ছেন।"

মায়া মাথা হেঁট করিয়া সলজ্জভাবে হাসিল! সুন্দর শিশু বটে! ইহার প্রকৃতিকে আদর করিয়া ভাল বাসিতে ইচ্ছা হয়, চমৎকার সরল হৃদয় বালক!

মদন বলিল "ওকালতীর দিকে গেলে আমার মত ঝগড়াটে লোক খুব সুবিধে কর্‌তে পার্‌বে, সকলে এ কথা বল্‌ছেন বটে,—কিন্তু আমার ওতে ইচ্ছে নাই!"

মন্মথনাথ বলিলেন "কোন লাইনে যেতে চাও শুন্‌তে পারি কি?—"

মদন এক নিঃশ্বাসে জলের গ্লাশটা উজাড় করিয়া বলিল "আপত্তি নাই। দেখুন আপনারা আমায় নির্ব্বোধ মনে কর্‌তে পারেন কিন্তু আমি মিথ্যাবাদী নই, কারুর কাছে নিজের সত্য-ধারণা, বিশ্বাস, মতামত, বা ইচ্ছা গোপন করে রাখ্‌তে পারি না, অবশ্য এ জন্যে অনেক সময় লোকের কাছে আমায় খুবই অপদস্থ লজ্জিত হতে হয় বটে, কিন্তু তাই বলে কুণ্ঠিত হয়ে কথা-কওয়া আমার কুষ্ঠিতে লেখে নাই,—কোন লাইনে যেতে চাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন? আমি সরল ভাবে বল্‌ছি শুনুন, যেখানে কাজ আছে, অথচ কাজের লোক নাই, আমি সেইখানে ভিড়্‌তে চাই। আমাদের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের পথে এখন বিস্তর বিঘ্ন উন্নতির প্রতিকূল হয়ে দাঁড়িয়েছে, আমি

সেইদিকে কল্যাণের জন্য আমার অর্থ, বিদ্যা, সময়, চেষ্টা সব উৎসর্গ করে দিতে চাই, অজ্ঞান কুসংস্কারাচ্ছন্ন নরনারীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আমি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যজ্ঞান, শিক্ষা প্রচার কর্‌বার সঙ্কল্পে দীক্ষিত হয়েছি, তবে ভগবানের ইচ্ছায় কতদূর কি হয়ে উঠ্‌বে বল্‌তে পারিনে, কিন্তু চেষ্টা আমার ঐ দিকে!—"

মায়া শ্রদ্ধা স্নেহমণ্ডিত নয়নে মদনের জীবন্ত-উৎসাহ-প্রোজ্জ্বল তরুণ সুন্দর মুখের পানে নির্ব্বাক ভাবে চাহিয়া রহিল। মন্মথনাথ বলিলেন "সুন্দর-মঠের মোহন্ত মহারাজের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক আছে মদন?"

মদন বলিল "আছে বৈ কি,—আদেশ এবং পালনের মধ্যে যে সম্পর্ক, তাঁর সঙ্গে আমারও সেই সম্পর্ক; অন্য শিষ্য, সেবক, অনুগত ব্যক্তির মত তাঁকে আমি সম্মান প্রতিপত্তির জন্য শ্রদ্ধা ভক্তি করি কিনা, বল্‌তে পারি না, কিন্তু তাঁকে আমরা পিতার মত, সুহৃদের মত ভক্তি করি, ভালবাসি। তিনি সকলের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বত্যাগী হয়ে সংসারে বাস কর্‌ছেন, কাজেই সম্মান তাঁর পায়ের কাছে বাধ্য হয়ে মাথা নোয়ায়!—ভাল কথা মাসিমা মঙ্গল-মঠে থাক্‌তে তাঁর কথা বোধহয় সব শুনে থাক্‌বেন?"

মৃদু স্বরে মায়া বলিল "শুনেছি, সামান্য-ই।"

মন্মথনাথ বলিলেন, "আমিও ভাল ভাল লোকের কাছে শুনেছি, মহারাজ চরিত্র-মহত্বে দেবতুল্য মানুষ, সাম্প্রদায়িক মঙ্গলামঙ্গলের দিকেও তাঁর যথেষ্ট দৃষ্টি আছে।"

মদন বলিল "যথেষ্ট; প্রত্যেকের মঙ্গলে-ই যে সম্প্রদায়ের মঙ্গল, প্রত্যেকের উন্নতিতে যে সম্প্রদায়ের উন্নতি, এ কথা, তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলে যান নি!—দেখুন না, আমার মত অকর্ম্মা লোককে সেই জন্যে তিনি কি রকম জব্দ করে কাজে লাগিয়েছেন।………আমার পৈতৃক বিষয় নিয়ে যখন অংশীদারগণের সঙ্গে বিরোধ হয় তখন মামলার ভয়ে,—নিজের লোকসান জেনেও আমি আপোসে মামলা মিটিয়ে ফেলি, কিন্তু মঙ্গল-মঠের গদির সঙ্গে আমার চৌদ্দ পুরুষের কারুর কোন সম্পর্ক না থাক্‌লেও, মহারাজ এমনি জোরে আমার কান ধরে মামলা তদ্বিরে লাগিয়েছেন, যে এখানে 'না' বলে মাথা নাড়্‌বার উপায় নাই! মঙ্গল-মঠের গদি, মৃত অধিকারীর ভাগিনেয়-ই পান, আর জামাতাই পান,—আমার তাতে কোন দুঃখ-দরদ ছিল না, কিন্তু মহারাজ আমায় দেখিয়ে দিলেন সম্প্রদায়ের স্বার্থের জন্য এর মধ্যে আমার মত তৃতীয় পক্ষগণের যথেষ্ট-বাধ্যতা আছে! রাজত্ব পরিচালনের জন্য রাজার হৃদয় যেমন প্রশস্ত-উদার হওয়া দরকার, সুশৃঙ্খলা বিধানের জন্য মন্ত্রির মগজটি যেমনি উর্ব্বর সতেজ হওয়া দরকার,—বিদ্রোহ দমনের জন্য সেনাপতির বাহুবল তেমনি দৃঢ়-নির্ভীক শক্তিশালী হওয়া চাই!—কেউ 'ফেল্‌না' নন। কিছুদিন আগে, পড়াশুনো ছেড়ে ছুড়ে চিরকুমার সন্ন্যাসী সাজবার লোভে আমার ভারী ঝোঁক চেপেছিল, কিন্তু মহারাজ আমার সে আব্দার গ্রাহ্য করেন নি অবশ্য তখন আমি মহারাজের সে ব্যবহারে মোটেই খুসী হতে পারি নি বটে, কিন্তু এখন বুঝে্‌ছি,—সন্ন্যাসী হলে তত্ত্ব উপদেশ আলোচনায় আধ্যাত্মিক বা আধিদৈবিক ব্যাপারে নিজের কিছুমাত্র উপকার করতে পারি আর না পারি,—এই সব খুচ্‌রো আধিভৌতিক ব্যাপারে জন-সাধারণের কারুকে যে আবশ্যক মত, কিছু সাহায্য কর্‌তে পার্‌তুম না সেটা স্থির-নিশ্চয়!"

অকপট সারল্য-উচ্ছ্বাসে নিজের যুক্তিযুক্ত অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া, মদন, মন্মথনাথকে যেমনই প্রীত তেমনই কৌতুকান্বিত করিয়া তুলিল। তিনি হাসিতে লাগিলেন।—মদন, মোহন্ত মহারাজের চিত্ত ও চরিত্রের উচ্চতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রমাণাদি বিষয়ক নানা কথা কহিতে কহিতে, আহার সমাপ্ত করিল। মায়া প্রশংসামুগ্ধ— স্নেহস্মিত বদনে নীরবে তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

আচমনান্তে উভয়ে ঘরে আসিয়া বসিলে মায়া মন্মথনাথের জন্য পান ও মদনের জন্য মসলা আনিয়া দিল। তখনও মদন মোহন্তমহারাজের কীর্ত্তিকলাপ আলোচনা করিতেছিল, মায়া মন্মথনাথের পাশে টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিল।

রাত্রি সাড়ে এগারটা বাজিয়া গেল, মদন বলিল "মাসিমা খেয়ে আসুন—"

"যাব এখন,—" ঈষৎ হাসিয়া মায়া বলিল "আর একটু হোক, মহারাজের কথা শুন্‌তে আমার বড় ভাল লাগ্‌ছে,—"

উৎসাহিত ভাবে চেয়ারের উপর সোজা হইয়া বসিয়া মদন বলিল "এ ত কি শুন্‌ছেন মাসিমা,—মুখে কত বল্‌ব? যদি দেখেন তাঁকে কখনো,—'যদি' কেন, এবার ত নিশ্চয়ই মঙ্গল-মঠে গিয়ে তাঁকে দেখ্‌তে পাবেন,—তখন দেখে আশ্চর্য্য হবেন। কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তির নিষ্কাম-সাধনা যে কাকে বলে সেটা মহারাজকে দেখ্‌লে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ বুঝ্‌তে পার্‌বেন, তাঁর প্রকৃতি—অদ্ভুত শক্তিশালী!—আমার প্রতি তাঁর কৃপাদৃষ্টি আছে বলে যে আমি তাঁকে ভালবাসি, তা নয় মাসিমা—ছোট বড় সকলের উপরই তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা সহানুভূতির দৃষ্টি আছে বলে, আমি তাঁর একান্ত গুণমুগ্ধ।........সাময়িক বৈরাগ্য-উচ্ছ্বাসে আমার মত অনেক চপল-কৌতূহলী প্রকৃতির শিক্ষিত অশিক্ষিত যুবক তাঁর কাছে গিয়ে চিরকুমারব্রতে দীক্ষিত হবার জন্য কত মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করেছে, তার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু মহারাজ কারুর কথা গ্রাহ্য করেন নাই, স্বভাবসিদ্ধ মিষ্ট পরিহাসের সঙ্গে হাসিমুখে আদর করে উপদেশ দিয়ে সকলকে বিদায় দিয়েছেন,—আমরা সকলেই মনে কর্‌তাম মহারাজ চিরকৌমার্য্য ব্রতের একান্ত বিরোধী, কিন্তু মানবপ্রকৃতিগত সূক্ষ্ম বিশেষত্ব নির্ণয়ে তাঁর এমনি আশ্চর্য্য দক্ষতা,—একদিন বিনা অনুরোধে হঠাৎ একটি রাজপুত যুবককে চিরকৌমার্য্য ব্রতে দীক্ষা দিয়ে, কাজে ভিড়িয়ে দিলেন। সে লোকটি ছিলেন পাতুরে কারিকর,—মানুষের প্রাণের ওপর কলম চালাবার শক্তি যে তাঁর মগজের মধ্যে আছে, এ ত আমরা কেউ স্বপ্নেও জান্‌তুম না, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, তিন বৎসরে সে লোকটি যা করেছেন,—ত্রিশ বৎসরের সাধনায় অন্যের পক্ষে তা সম্ভবপর নয়! আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেছি মেসোমশায়, তাঁর চেয়ে সুপণ্ডিত বুদ্ধিমান লোক ঢের দেখেছি,—কিন্তু তাঁর মত একাগ্র-সাধননিষ্ঠ অদ্ভুত সংযমী, হৃদয়বান লোক এ পর্য্যন্ত আমি বোধহয় আর দেখিনি!"

কৌতূহলী নয়নে চাহিয়া মন্মথনাথ বলিলেন "কি কর্‌তেন তিনি?"

মদন বলিল, "প্রস্তর শিল্প ব্যবসায়, মহারাজের প্রতিষ্ঠিত নির্ম্মল-মঠের নাম বোধহয় শুনে থাক্‌বেন, পাঁচ বৎসর আগে সেই নির্ম্মল-মঠ তিনি নিজ হাতে গড়েছিলেন,—শুনেছিলাম তিনি একজন প্রতিভাশালী তরুণ ভাস্কর, ব্যস্ ঐ পর্য্যন্ত!—তিন বৎসর আগে তাঁকে দেখেছিলাম, মৃদু প্রকৃতির নিতান্ত নিরীহ শান্ত সাধারণ ভদ্রলোক।... কার সাধ্য বোঝে ভিতরে কিছু জানাশোনা আছে! এবার গিয়ে তাঁকে দেখে হতভম্ব হলুম, আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! যাঁদের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণের যোগ্যতা পর্য্যন্ত তাঁর ছিল না,—এখন স্বচ্ছন্দে তাঁদের ওপর শিক্ষকতা কর্‌ছেন, বয়সে সকলের ছোট হলেও এখন নির্ম্মল-মঠের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত তিনি!—"

মন্মথনাথ বলিলেন "তিনিই কি নির্ম্মল-মঠের মোহন্ত হয়েছেন?"

মদন বলিল "মহারাজ সেই পদে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে চান, সাধু পণ্ডিতগণ সকলেই তাঁর অনুরাগী, সকলেই একবাক্যে তাঁকে যোগ্যপাত্র বলে স্বীকার কর্‌ছেন,—কিন্তু তিনি এখন অমায়িক নিরভিমানী ব্যক্তি যে তেমন সম্মানের পদও অক্লেশে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তিনি স্পষ্ট বলেন আমার শিক্ষা সাধনা আগে হৃদয়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পরিপাক হোক, তবে আমি পরীক্ষা ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হব,—'অধিকারী' 'মোহন্ত' ইত্যাদি পদের যোগ্যতা মানুষ

তখনই লাভ কর্‌তে পারে, যখন মোহ-অন্তকারী বিশুদ্ধ নির্ম্মলতার উপর সম্পূর্ণ বিজয়াধিকার স্থাপনে মানুষের হৃদয় সিদ্ধকাম হয়!"

প্রশংসা-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মন্মথনাথ বলিলেন "বাঃ, পাণ্ডিত্য ত একেই বলে! তিনি এখন কি কর্‌ছেন?"

"নির্ম্মল-মঠে থেকে সাধু সহবাসে শিক্ষা-সাধনা,—বেশ চালিয়ে যাচ্ছেন, প্রতিভা বলে ভাষ্য ব্যাখ্যার বিকৃত অর্থ—যার জন্যে সম্প্রদায় উৎসন্ন যেতে বসেছে, সেই সকলের সত্য রহস্য উদ্‌ঘাটনেও নিযুক্ত আছেন, কিছুদিন পরে সে সব চারিদিকে প্রচার হবে। তা ছাড়া, শুন্‌লুম একদিকে তাঁর ভয়ানক ঝোঁক,—নারী জাতির উন্নতি! মূর্খ উপদেষ্টাগণের দোষে বর্ত্তমানে আমাদের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম সাধন প্রণালীর অত্যাচারে,—বল্‌তে ঘৃণা হয় মশায়,—মাতৃরূপিণী নারীজাতিকে কুৎসিত বিড়ম্বনায় নিগৃহীত হতে হয়েছে,—সম্প্রদায়ের ভিতর জন্মলাভ করে, রক্তের টানেও—যে অন্যায়াচারের বিরুদ্ধে কেউ সাহস করে দাঁড়াতে পারেনি, নিরঞ্জনদেব বাইরে থেকে এসে,—আন্তরিক সমবেদনায় প্রাণের জোরে তেজস্বী হয়ে সেই মিথ্যাসৃষ্ট অনাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন! সুন্দর-মঠের মোহন্তমহারাজ তাঁর পৃষ্ঠপোষক,—সুতরাং চারিদিকে অনেক স্বার্থপর মঠাধিকারী ইতিমধ্যে যথেষ্ঠ শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন, খুব সম্ভব শীঘ্রই একটা বিপ্লব আরম্ভ হবে!"

মায়া এতক্ষণ স্থির-নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় মদনের কথা শুনিতেছিল—সহসা নিরঞ্জনদেবের নাম শুনিয়া সে তীব্র-চমক খাইল! উদ্বেগ-পীড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "কি? কি নাম তাঁর?"

মদন উত্তর দিল "নিরঞ্জন ভাস্কর, উপাধি 'দেব'।"

"নি-র-ঞ্জ-ন দেব!"—বিস্ফারিত-নয়না মায়ার কণ্ঠ হইতে এমনই ভাবে নামটা প্রতিধ্বনিত হইল,—যেন সে প্রতিধ্বনি তাহার কণ্ঠ শব্দের নহে!—সে যেন তাহার হৃন্মর্ম্ম স্তম্ভনকারী অন্য কোন প্রচণ্ড শক্তি-সংঘাতের—যুগান্ত প্রলয়কারী আকস্মিক বিস্ময় প্রতিধ্বনির মৃদু শব্দ-স্ফুরণ! মায়া শক্ত হাতে টেবিল-টা চাপিয়া ধরিয়া আড়ষ্ট-নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

পাশের ঘরের ঘুমন্ত খোকার, মশক দংশনে নিদ্রা ব্যাঘাতের অস্বস্তিজ্ঞাপক মৃদু ক্রন্দন শব্দ শোনা গেল, মদনের সর্ব্বব্যাপী তীক্ষ্ণ অনুভূতির নিকট সকলের আগে সে সংবাদ আসিয়া পৌছিল, ত্রস্তে সে বলিল "মাসিমা, আপনার খোকা কাঁদ্‌ছে।"

"যা—ই" সংযত-ধীর কণ্ঠে উত্তর দিয়া মায়া অকম্পিত চরণে পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

মদন ও মন্মথনাথ আরও কিছুক্ষণ বসিয়া, অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করিলেন। তারপর উভয়ে বাহিরের বৈঠকখানায় গিয়া মামলা সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি লইয়া দেখাশুনা করিতে লাগিলেন। মামলার আর বেশী দিন বিলম্ব নাই, কাজেই সমস্ত কাজ পূর্ব্বাহ্নে প্রস্তুত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা চলিতে ছিল। মন্মথনাথ রাত্রি দেড়টা পর্য্যন্ত জাগিয়া কাজ করিলেন। তারপর মদনকে বৈঠকখানার শয্যায় শয়ন করাইয়া নিজে বাটীতে আসিলেন।

মন্মথনাথ শয়ন করিতে না-আসা পর্য্যন্ত মায়া প্রত্যহ রাত্রে সেলাই, বোনা,—অভাব পক্ষে একখানা বই লইয়া, জাগিয়া থাকিত, আজিও জাগিয়াছিল, কিন্তু মন্মথনাথ আজ শয়ন কক্ষে আসিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, দেখিলেন মায়া জাগিয়া আছে বটে কিন্তু সেলাই, বোনা, বা বই লইয়া নহে! সে খোকাকে জাগাইয়া নিশ্চিন্ত-কৌতুকে খেলা করিতেছে!—

কাছে আসিয়া মন্মথনাথ বলিলেন "খোকা এখনো ঘুমায়নি কেন?"

শান্ত দৃষ্টি তুলিয়া মায়া খুব সহজ ভাবে উত্তর দিল "আমি ঘুমাতে দিইনি—"

সপরিহাসে মন্মথনাথ বলিলেন "অপরাধ ?"

মায়া স্থির কণ্ঠে উত্তর দিল "বড় একলা বোধ হচ্ছে—"

হাসিয়া মন্মথনাথ বলিলেন "আশ্চর্য্য ব্যাপার ত, তোমায় আমি কথনো একলা থাকার জন্যে আক্ষেপ করতে শুনিনি—সেলাই, বোনার মাঝে মৌন্য গাম্ভীর্য্যে ধ্যানস্থ হতে আজ ভুলে গেলে না কি ?—"

মায়া শিশুর মুখে চুমা খাইয়া বলিল "ধ্যান হয় ত না-ও ভুলে যেতে পারি, তবে ধ্যেয় আজ রূপান্তরিত হয়েছেন সেটা ঠিক,—বুনে বুনে জ্বালাতন হয়েছি, সেলায়ের কাজও আজ কিছু নাই।—"

মন্মথনাথ বলিলেন "বই পড়া ?"

উদাস দৃষ্টিতে আলমারির পানে চাহিয়া মায়া বলিল "সবই যে পুরাণো—"

হাসিয়া মন্মথনাথ বলিলেন "বটে ! ভুলে গেছি, আচ্ছা এবার নূতন বই আনিয়ে দেব,—যাক্ রাত্রি অনেকটা হয়েছে, এখন নিদ্রার ব্যবস্থায় মনোযোগী হ'লে ভাল হয় না ?"

কুণ্ঠিত মিনতির স্বরে মায়া বলিল "তুমি ঘুমাও,—খোকা-টা যতক্ষণ জেগে আছে........"

বাধা দিয়া মন্মথনাথ বলিলেন "না না, রাত জাগিয়ে খেলা নয়, ওর অসুখ করতে পারে,—অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে, শেষে তোমাকেই ভুগ্‌তে হবে !...........খেলা ছাড়, ঘুম পাড়িয়ে ফেল্‌বার চেষ্টা কর, এখনি ঘুমাবে, উঠো তুমি।"

আদেশের উপর জেদের তর্ক চালান' মায়ার প্রকৃতিতে অনভ্যস্ত ব্যাপার, সুতরাং অনিচ্ছা সত্বেও সে বিনা বাক্যে শিশুকে তুলিয়া লইয়া শয্যায় গেল, মন্মথনাথ আলো কমাইয়া দ্বারের বাহিরে রাখিয়া, নিজে শয্যায় গিয়া শুইলেন।

নিস্তব্ধ অন্ধকার কক্ষের মধ্যে মাতৃবক্ষের শান্তি সুধায় পরিতৃপ্ত শিশু, শীঘ্রই নিদ্রার আরামে মগ্ন হইল। শ্রান্ত মন্মথনাথও বোধহয় তন্দ্রাবিষ্ট হইয়াছিলেন, কোন দিকে কাহারও সাড়াশব্দ নাই; মায়ার মন অধীর ব্যাকুল হইয়া উঠিল, এ নির্জ্জনতা তাহার কাছে ভয়াবহ অস্বস্তি-কর বোধ হইল,—হঠাৎ ব্যগ্র-উৎকণ্ঠিত ভাবে সে বলিয়া উঠিল, "ওগো শুনছ ?"

তন্দ্রাকর্ষিত মন্মথনাথ চমকিয়া বলিলেন "এ্যাঁ—"

অপ্রতিভ হইয়া মায়া বলিল "তোমার ঘুম এসেছিল,—তাই ত.........আচ্ছা ঘুমাও—"

মন্মথনাথ বলিলেন "তুমি ভয় পেয়েছিলে বুঝি ? কিসের শব্দ শুনতে বল্‌ছিলে না ?—"

"শব্দ ?"—সবিস্ময়ে মায়া বলিল "শব্দ ? কৈ না ?"

"তবে কি ?"

"কি জানি.........তা হবে, বাতাসের শব্দ বোধ হয়, ও কিছু নয়, তুমি ঘুমাও"—মায়ার কণ্ঠস্বর ব্যস্ততাপূর্ণ হইয়া উঠিল।

পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া নিশ্চিন্ত হাস্যে মন্মথনাথ বলিলেন "ভাল ভীরু যা-হোক্, মাঝখান থেকে আমার তন্দ্রাটি নষ্ট করলে !"

অনুতপ্ত স্বরে মায়া বলিল "আমি বুঝ্‌তে পারি নি"—পাখা-টা তুলিয়া লইয়া সজোরে বাতাস করিতে করিতে মায়া পুনরায় বলিল "তুমি ঘুমাও—"

নিদ্রালস নয়ন বিস্তৃত করিয়া মন্মথনাথ বলিলেন "তোমার ঘুম আসে না কেন ? অসুখ বিসুখ করে নি ত ?"

সজোরে মায়া উত্তর দিল "কিছু না !—

"তবে ঘুমাচ্ছ না কেন ?"

"কি জানি,.........যাক্ গে......দ্যাখ আমি ঐ মদন ভট্টের কথা ভাব্‌ছি, বেশ ছেলে, ওর কথাবার্ত্তা ভারী চমৎকার।"

মন্মথনাথ সংক্ষেপে অনুমোদন করিয়া বলিলেন "প্রাণ খোলা লোক—"

মায়া সাগ্রহে বলিল "আচ্ছা, মদন যে ভাস্করের কথা বল্‌লে, নিরঞ্জন ভাস্কর......তিনি আগে মঙ্গলমঠেও গিয়েছিলেন নয় ?"

পুনশ্চ নিদ্রা চেষ্টিত মন্মথনাথ জড়িত কণ্ঠে বলিলেন "হতে পারে, জানিনে—"

এবার পরিষ্কার কঠিন স্বরে মায়া বলিল "তুমি ত তাঁকে দেখেছ, ...বিয়ের সময়। কেবল-দা'র সঙ্গে তাঁর যে খুব বন্ধুত্ব ছিল, অনাথ দরিদ্রের সেবা.........কত লোকের কত সাহায্য—" মায়ার কণ্ঠস্বর কাঁপিল, মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া মায়া পুনশ্চ বলিল "কতলোকের কত উপকার কর্‌তেন, তার হিসাব নাই তখন তাঁর বয়স অল্প...... মঙ্গল-মঠ সংস্কারের জন্য এসেছিলেন ভাস্করের কাজ কর্‌তেন তখন—"

মন্মথনাথ বলিলেন "তোমরা তা হলে দেখেছ তাঁকে।"

খুব শান্ত—খুব সংযত কণ্ঠে মায়া বলিল "হ্যাঁ দেখেছি, তুমিও দেখেছ ত, বিয়ের আগের দিন কেবল দার সঙ্গে তিনি ষ্টেশনে তোমাদের আন্‌তে গেছলেন।"

"কেবল-দার সঙ্গে ?"—ভ্রূযুগল ঈষদাকুঞ্চিত করিয়া বিস্মৃতি মোচন চেষ্টায় ক্ষণেক থামিয়া মন্মথনাথ বলিলেন "হ্যাঁ মনে আছে, পাৎলা চেহারা সুন্দর রং,—একটি ছোকরা.........হাঁ কেবল তাঁর কি-একটা পরিচয় দিয়েছিল মঠের সম্পর্কেই বটে ! তিনিই নিরঞ্জন ভাস্কর ? হতে পারে.........বিয়ের দিনও তাঁকে দেখেছি, তোমাদের বাড়ীতে,"

নিদারুণ বিস্ময়ে চমকিয়া মায়া বলিল "আমাদের বাড়ীতে !—" পরক্ষণে আত্মদমন করিয়া সজোরে বলিল "না—"

মন্মথনাথ বলিলেন "'না' কি ? আমার বেশ মনে হচ্ছে তাঁকে দেখেছি, তিনি-ই ত কেবলবাবুর সঙ্গে ছাদ্‌নাতলায় পীঁড়ে ঘোরালেন—"

স্তম্ভিত স্বরে মায়া বলিল "পীঁড়ে ! অসম্ভব !"

মন্মথনাথ বলিলেন "অসম্ভব কি ? নিশ্চিত।—জানি না, তিনিই নিরঞ্জন ভাস্কর কি না, কিন্তু ঠিক মনে আছে, যিনি ষ্টেশনে আমাদের আন্‌তে গেছ্‌লেন তিনিই পীঁড়ে ধরেছিলেন, তাঁর মুখের গঠন আমার ভারি ভাল লেগেছিল, ঠিক স্মরণ আছে, বড় বড় ভাসা চোখ, প্রশস্ত সুন্দর কপাল, মুখে অল্প অল্প গোঁফের রেখা—"

ক্ষীণ কণ্ঠে মায়া উত্তর দিল "হবে, তাঁর চেহারা ভাল করে দেখি নি—"

মন্মথনাথ বলিলেন "আমি বেশ দেখেছি. ঘাড় পর্য্যন্ত কোঁকড়া কাল চুল, মাথায় পাগড়ী........."

অন্ধকারে মায়ার মুখভাব কেহ দেখিতে পাইল না, কিছুক্ষণ পরে, তাহার অন্যমনস্ক দশংনরত-অধরান্তরাল-চ্যুত একটি অস্পষ্ট—নিতান্ত ক্ষীণ শব্দ আসিয়া মন্মথনাথের কানে পৌছিল—"হাঁ,"

অনেকক্ষণ মায়ার কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, নিস্তব্ধতার মধ্যে নীরব নিদ্রাকর্ষণ অনুভব করিয়া মন্মথনাথ বলিলেন "মায়া, শোও গে—

মায়া নিঃশব্দে পাখা রাখিয়া উঠিয়া গিয়া শুইল—ক্ষণপরে, তন্দ্রাচ্ছন্ন মন্মথনাথ পা সরাইতে গেলেন মায়ার কপালে পা ঠেকিল, অপ্রসন্ন ভাবে জড়িত স্বরে তিনি বলিলেন "আঃ কোথায় শুলে গিয়ে? ছেলে-টার কাছে নিজের জায়গায় শোও না,—"

মায়া যেন এই আদেশটির প্রতীক্ষায় ছিল, তৎক্ষণাৎ বিনা বাক্যে উঠিয়া গিয়া নিজের শয্যায় শয়ন করিল।

সহসা দূরে—সুপ্তিবিবশ নিশীথের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তীব্র ব্যাকুলতার উচ্ছ্বাসে কে গাহিয়া উঠিল—

'আমায় ভাবের ভেলায় ভুবন স্রোতে ভাসাও এবার ভাই!'

মন্মথনাথের স্তব্ধ তন্দ্রা আকস্মিক শব্দ-সংঘাতে আবার আহত হইল। মায়া উৎকর্ণ হইয়া উঠিল, বিস্ময়-বিহ্বল স্বরে বলিল "এ কি গান!"

সুপ্তি-জড়িত-কণ্ঠে মন্মথনাথ বলিলেন "স্কুলের পাগলা মাষ্টার মশাই গাইছেন বুঝি?"

কে গাহিতেছেন, তাঁহার ব্যক্তিত্বের পরিচয় সংবাদ লইয়া মন ঠাণ্ডা করিবার সাবকাশ তখন মায়ার ছিল না। গানের ছন্দ, সুর, তান, লয় নির্ভুল সঠিক কি না তাহার হিসাব খতাইবার প্রবৃত্তিও তাহার ছিল না, গান যাহাই হউক, কিন্তু তাহার প্রাণের আঘাত আসিয়া মায়ার হৃদয়ে বাজিয়াছিল,—উৎকণ্ঠিত ভাবে মায়া কান পাতিল—আবার সেই উচ্ছ্বসিত সৌহৃদ্যের প্রাণভরা অনুরোধ-বাণী শুনিতে পাওয়া গেল;—

'আমায় ভাবের ভোলায় ভুবন স্রোতে ভাসাও এবার ভাই!'

ব্যগ্র উন্মাদনায় মায়ার সর্ব্বশরীরের রক্ত চঞ্চল উদ্দাম হইয়া উঠিল, শয্যা ছাড়িয়া মায়া আসিয়া জানালার পাশে দাঁড়াইল, গায়ক গানের দ্বিতীয় চরণ গাহিল, এবার উচ্ছ্বাসের মত্ততায় নহে—বেদনা-নম্র হৃদয়ের দৃঢ়-করুণ অনুনয় স্বর—

'এই ভয়ের বাঁধন চাইনে কখন, অকূলে কূল নাই বা পাই,'

তারপর গানের সুর আরও নামিয়া গেল—বিশ্বস্ত প্রিয়তমের নিকট নিভৃত বিজনে, গোপন-হৃদয়ের আবেগ অভিব্যক্তির ন্যায় আবার সুর বাঞ্জনায় সঙ্গীত ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল—

'আমায়,—নিয়ে চল জগত ছেড়ে; সব কলরব শান্ত করে
শূন্য হতে শূন্যান্তরে—দিগন্তে দূরে—
জীবন্মৃতা সজীব যেথা, প্রান্ত সীমার অন্ত নাই!'

ক্ষণ পরে সুর পরিবর্ত্তিত হইয়া যেন সুখাবেশ কল্পনার হর্ষ-বিহ্বলতায় গলিয়া কোমল—কোমলতম হইয়া মধুর আবেগে ধ্বনিত হইল,—

'তোমায় আমায় খেল্‌ব সেথা উড়িয়ে পরাণ-পোড়া ছাই,'

আবার সুরের গতি ফিরিল,—উচ্ছ্বাসে চড়িয়া দৃপ্ত-আজ্ঞার মত আবার সেই একান্ত অনুরোধের প্রথম তরঙ্গ উর্জ্জলিত হইয়া উঠিল।—

'ভাবের ভোলায়, ভুবন স্রোতে ভাসাও এবার ভাই!'

মায়ার স্নায়ুকেন্দ্র মূলে সহসা এক আকুল ব্যগ্রতার প্রচণ্ড শিহরণ বজ্র-ঝঙ্কারে জাগিয়া উঠিল; একি গান, একি গান! একি গান!—ভয়ের বাঁধন ছিঁড়িয়া মুক্ত নির্ভীকতার স্রোতে,—অবাধ গতিতে সপ্ত ভুবনের বুকে ভাসিয়া চলিবার জন্য একি আশর্য্য, তীব্র আকাঙ্ক্ষা! একি উন্মাদ হৃদয়ের ভ্রান্ত প্রলাপ?

মায়ার মনে পড়িল,—সে শুনিয়াছে ঐ পাগলা মাষ্টার মহাশয়—অসময়ে স্ত্রীপুত্রের মৃত্যু হওয়ায়, শোকে অর্দ্ধ উন্মাদ হইয়াছেন। লোকে তাঁহার পাগলামীর ত্রুটি ধরিয়া বিদ্রূপ কৌতুকে আমোদ অনুভব করিয়া থাকে,—পাগল তাহাতে কখনও অত্যন্ত বিরক্তিতে অধৈর্য্য হইয়া উঠেন, কখনও উন্মাদ-অনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়েন। নিয়মের নির্দ্দিষ্ট পরিসীমায় আবদ্ধ হইয়া জীবিকা অর্জ্জন অসহ্য বলিয়া তিনি কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়াছেন, এখন যত্র-তত্র ঘুড়িয়া বেড়ান। গভীর রাত্রে নিদ্রা ভাঙ্গিলে, অজ্ঞাত-ঔৎসুক্যে উত্তেজিত হইয়া, পাগল এমনি ভাবে পথে পথে করতাল বাজাইয়া ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়ান। তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার জ্ঞান বুদ্ধি যথেষ্ট মার্জ্জিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রকৃতির স্থৈর্য্য সব সময় থাকে না। এক এক সময় তিনি সত্যই পাগল হইয়া উঠেন কিন্তু এখন তিনি যে ভাবোদ্বোধনে মত্ত হইয়াছেন, কে বলিলে উহা অ-প্রকৃতিস্থের মুখের বাণী? না—সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হৃদয়ের যথার্থ অকপট আকাঙ্ক্ষার মুক্ত-উচ্ছ্বাস?

সহসা সচেতন হইয়া মায়া অনুভব করিল, ইহার মধ্যে মন্মথনাথ কখন শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া—তাহার পাশে দাঁড়াইয়াছেন, তিনি নিঃশব্দে গান শুনিতেছেন।

গায়ক ভাবের অভিব্যক্তি ব্যঞ্জনার তালে তালে সুর উঠাইয়া নামাইয়া কঠিন কোমল করিয়া—উচ্ছ্বাসের বুক বিদীর্ণ করিয়া, প্রাণ খুলিয়া প্রাণের ভাষা নিবেদন করিতে লাগিলেন,—সুপ্ত রজনীর বুকের উপর যেন বিরাট-চেতনার দৃপ্ত-জাগরণ অপরূপ সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতা দুইটি অবাক হইয়া শুনিতে লাগিল গায়ক গানের শেষাংশ গাহিতেছে!—

"চোখে চোখে মুখে মুখে হৃদয়ে হৃদয়—
মাটীর মানুষ জানে না সে প্রেমের পরিচয়
মহা স্বচ্ছ মুক্ততাতে বিশ্ব ছাড়া বিশ্বাসেতে
মহাপ্রাণে প্রাণ মিশাতে ব্যাকুল মরম আকুল তাই!
দণ্ডী খেটে দম ছুটেছে,—
(এবার) গণ্ডি কেটে মুক্তি চাই!"

গানের শেষ চরণে গায়ক অগাধ অপরিমেয় করুণ কাতরতায় মর্ম্মভরা মর্ম্মদুঃখের চরম ঐকান্তিকতা ঢালিয়া দিয়াছিলেন, মায়া প্রাণপণ চেষ্টাতেও উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ সম্বরণ করিতে পারিল না—নিঃশব্দে তাহার চক্ষু ফাটিয়া টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। ঊর্দ্ধ নয়নে চাহিয়া বুকের উপর দুই হাত স্থাপন করিয়া সারা হৃদয়ব্যাপী আবেগ-কম্পনের মধ্যে—রক্তকেন্দ্রের প্রত্যেক রক্ত কণিকার—আকস্মিক ত্রস্ততায় সচেতন-সাড়া—সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করিতে লাগিল! গায়ক গাহিতে গাহিতে কখন গান থামাইল, তাহার সংবাদ সে আর লইল না।

অনেকক্ষণ মন্মথনাথও কথা কহিলেন না,—তারপর সশব্দে নিশ্বাস ফেলিয়া ক্ষুব্ধ করুণ কণ্ঠে বলিলেন "বাস্তবিক ......*কি অকপট ভক্তি, কি সুন্দর*.........আহা ঐ ভদ্রলোকটীর কথা নিয়ে ছেলে বুড়োয় নিরঙ্কুশ ভাবে বিদ্রূপ করে,.........বেশী কি, কৌতুকের অনুরোধে আমরাও কত সময় হৃদয়হীনের মত তাতে যোগ দিয়ে থাকি!—কিন্তু মুক্তকণ্ঠে বলছি আজ এইখানে দাঁড়িয়ে ঐ অবজ্ঞেয় পাগলের ভক্তি ভাবুকতার চরণে আমার মাথা লুটিয়ে প্রণাম করতে ইচ্ছা হচ্ছে!—"

মায়া চমকিয়া বলিল "কি?"

মন্মথনাথ ভাবিলেন, তাঁহার প্রণামের নামে মায়া চমকিত হইয়াছে বুঝি বর্ণগত-পার্থক্যের প্রচলিত মর্য্যাদার পানে চাহিয়া!—মন্মথনাথ ব্রাহ্মণ সন্তান, আর ঐ পাগল যে বৈদ্য! মৃদু হাসিয়া মন্মথনাথ বলিলেন, "না আমি অন্য ভাবে বলিনি, আমি আমার নিজের হৃদয়ের দিক থেকে বলছি, ঐ শোকাহত দীর্ণ হৃদয়ের মাঝে অকপট সরলতার যে মহৎ সাধনার উচ্ছ্বাস আপনার আনন্দে আপনি স্বচ্ছন্দে বয়ে যাচ্ছে, সে মহত্ব—অন্ততঃ আমার কাছে অবশ্য প্রণম্য বৈ কি?"

সহসা সবলে মন্মথনাথের হাত চাপিয়া ধরিয়া মায়া ত্রস্ত ব্যাকুলতায় বলিয়া উঠিল "অবশ্য প্রণম্য!—সত্য বল্‌ছ তুমি, সত্যই বল্‌ছ? ওগো মানুষের মহত্বকে—মানুষ যত ক্ষুদ্র, যত ক্ষীণই হোক—কিন্তু তার প্রাণের উচ্চতাকে তুমি—না না তুমি নয়, তোমার হৃদয়, ওগো সত্য বল, সত্যই কি তোমার হৃদয় অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধায় সম্মান করে, ক্ষুদ্র মানুষের অবজ্ঞাত হৃদয়ের উদার মহত্বকে,—সে কি সত্যই অকপটে সম্ভ্রম করে?—" মায়ার প্রশ্ন আর অগ্রসর হইল না, তাহার আবেগ-কম্পিত কণ্ঠস্বর উচ্ছ্বাসআধিক্যে রোধ হইয়া গেল।

দুর্ব্বোধ্য বিস্ময়ের তাড়নায় বিপন্ন হইয়া মন্মথনাথ বলিলেন "হাঁ করে, সত্যই করে—মহা পাষণ্ডের চরিত্রেও যখন অতর্কিত ঘটনা সংঘাতে আমি এতটুকু মহত্ব বিকাশ দেখি, তখন সেখানেও আমার হৃদয় আপনি শ্রদ্ধাসম্ভ্রমে নত হয়! ....কিন্তু তাতে কি?............কেন তুমি এমন অধীর হ'য়ে উঠ্‌লে মায়া,—কি হয়েছে তোমার?"

মায়া থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, হায় একথার উত্তর সেকি দিবে? তাহার ভাষা যে আর নাই—তাহার কি হইয়াছে?—হায়, ওগো সংসার-জীবনের দয়াময় উপদেষ্টা-সহৃদয় গুরু,—ক্ষমা কর, এ ভয়ঙ্কর প্রশ্নের উত্তর সে জানে না,—জানেন তাহার অন্তর্য্যামী, কিন্তু থাক্‌—থাক্‌!—আজ মনস্তাপ রাখিবার স্থান তাহার বিশ্বে নাই, আজ অপর্য্যাপ্ত বেদনার সহিত অগাধ সান্ত্বনার সত্য জ্যোতিঃ আসিয়া তাহার প্রাণে পৌঁছিয়াছে! এ আলোক কি তীব্র প্রখর, কি অসহ্য সুন্দর!—ওগো এতদিন পরিতপ্ত চেতনার তীক্ষ্ণ ফলকে অনুবদ্ধ হইয়া, তাহার কাল্পনিক অপরাধ শঙ্কিত মূঢ়তা মরণান্তিক দ্বন্দ্ব-সংশয়ের অন্তরালে তাহাকে ঠাসিয়া ধরিয়া, ঈর্ষিত বিদ্বেষের কঠোর ভ্রুকুটি পীড়নে—নৃশংস শাসনে বৃথাই তাহার হৃদয়কে বিনাপরাধে শাস্তি দিয়াছে, তাহার নির্ব্বোধ দৌর্ব্বল্যের বুকে চাপিয়া বসিয়া নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে তাহার স্বচ্ছন্দ প্রাণশক্তিকে শুষিয়া পলে পলে ধ্বংশ করিয়াছে, তাহার প্রাণের পূজনীয় সত্যকে ক্ষিপ্ত আক্রোশে ক্ষত বিক্ষত করিয়া—তাহাকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করাইয়াছে!—আজ চরম সত্য বিশ্বাসের স্থির তেজস্বী তরঙ্গাঘাতে,—মিথ্যা মূঢ়তার দম্ভ ভূমিসাৎ হইল.—আজ সে বুঝিয়াছে, বুঝিয়াছে—কি ভয়ানক ভুল এতদিন তাহার প্রাণকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছিল! আজ সে সুনিশ্চয় ভাবে শুনিল—জানিল মানুষের—সে মানুষ যেই হউক যিনিই হউন—মানুষের হৃদয়াভ্যন্তরের মহত্ব সৌন্দর্য্য,—তাহা প্রত্যেক হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অনুভূতির নিকট—অসঙ্কোচ শ্রদ্ধায় চির পূজ্যপাদ! মায়া এতদিন জানিয়াও জানে নাই, বুঝিয়াও বুঝে নাই, দেখিয়াও দেখে নাই—ত্রুটি অপরাধের যথার্থ সীমা কোথায়! আজ (তাহার যদি ভুল না হইয়া থাকে—তাহা হইলে নিশ্চয়ই) জীবনের প্রকাণ্ড ভুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; আজ উগ্র অনুতপ্ত চেতনায় সে জ্বলন্ত সত্য অনুভব করিতেছে—কৃত্রিম সংস্কার অনুগত—কাল্পনিক অপরাধ-শঙ্কায় এতদিন বৃথায় সে নির্দ্দয় অত্যাচারে অপনাকে কুণ্ঠা নিষ্পীড়িত করিয়াছে! প্রাণের সত্যকে অস্বীকার করিয়া, ঘৃণিত দৌর্ব্বল্যে দাসত্বের অনুশাসন-ইঙ্গিতে বৃথাই অন্ধভাবে অপনাকে পরিচালিত করিয়াছে! কি নিদারুণ পরিতাপ—হায়, এতদিনে সে বুঝিয়াও বুঝে নাই, বল পূর্ব্বক প্রাণের গতি প্রতিরোধের নামই—স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ,—আত্মহত্যা!

আজ অতীতের স্মৃতি—তোমায় প্রণাম, প্রণাম !—আজ দীনতার ছদ্ম আবরণে মুখ ঢাকিয়া শঙ্কাকুণ্ঠিত নয়নে তোমার পানে চাহিয়া অপরাধী হইবার দুঃখ তাহার নাই, আজ সে দৃঢ় বিশ্বাসের বক্ষে নির্ভীকে হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার অপরাধ নাই ! নিরঞ্জন ভাস্করের মহত্ব ? হাঁ তাহাকে ভয় করিয়া ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইবার কোন হেতু আজ নাই ! সে দেবত্বকে—মায়ার মানবাত্মা স্বতঃ উচ্ছ্বসিত আনন্দে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছে—দিতে বাধ্য হইয়াছে !—কিন্তু তাহাতে সঙ্কোচের জন্য শঙ্কার জন্য কোন হীনতা গ্লানি তাহার নাই ? সে নারী হৃদয়ের প্রাধান্য পরিবেষ্টনে দাঁড়াইয়া—নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ লালসার চরণে প্রাণের অর্ঘ্য উপহার দেয় নাই সে একটি উন্নত আত্মার সৌন্দর্য্য মহত্বের চরণে, মুগ্ধ অন্তরে বিনত হইয়াছে, ইহাতে কি জগত তাহাকে অপরাধী বলিবে ?—বলে বলুক, কিন্তু হে জগদীশ্বর—তোমায় ভালবাসিয়া ভক্ত যে আগ্রহ ব্যকুলতায় তোমার চরণে প্রাণের পূজা নিবেদন করে—তাহাই বা নিরপরাধ হইবে কোন্ হিসাবে ? কোন্ প্রমাণে সে ব্যাপার নিষ্পাপ বিবেচিত হইবে, তাহা বলিয়া দাও দয়াময় !

গায়ক ঠিক্ বলিয়াছেন "মাটীর মানুষ প্রেমের পরিচয় জানে না !"—মহাস্বচ্ছ মুক্তির মাঝে—বিশ্বের সঙ্কীর্ণ সংস্কার বিশ্বাসের বহির্ভাগে, সে প্রেমের পূজার স্থান,—ধ্যানের আসন প্রতিষ্ঠিত !........ মানুষ আত্মার চৈতন্য মহিমা অনুভব করিতে জানে না,—জানে শুধু চর্ম্মচক্ষে মূঢ়-জড়তার বাহ্যাকৃতি দেখিয়া, লঘু কৌতুকে কুৎসা করিতে !.........কিন্তু থাক্, আজ তর্ক দ্বন্দ্বে মিথ্যা মনঃপীড়া সৃষ্টির সময় নাই, আজ স্পষ্ট জাগরণের মধ্যে মায়া প্রাণের আলোকে নিজের জীবনকে উপলব্ধি করিয়া লইতেছে, আজ আর দুঃখ করিবার কিছু নাই !—মর্ত্তের নিরঞ্জনের মধ্যে যে অমরত্ব-চৈতন্যের মহানুভবতা দৃপ্ত-গৌরবে ঝলসিত হইতেছিল,—মায়া দূর হইতে তাহার সৌন্দর্য্য আত্মচেতনায় উপলব্ধি করিয়া এক নিমেষে মুগ্ধ হইয়াছিল !—কিন্তু এত বড় নিষ্কলঙ্ক শুচিতার মাঝে ঈর্ষার বিদ্রোহ তুফান তুলিয়া প্রমাদ ঘটাইল, সেই, তাহার ভিতরের—নীচ দৃষ্টি 'মাটীর মানুষ-টা !'—সে মাটীর মানুষ, সে প্রেম-জ্ঞানহীন ! সে পূজা জানে না, ধ্যান মানে না, সে বুঝে শুধু—নিষ্ঠুর ঔদ্ধত্যে বর্ব্বর-উৎপীড়ন ! আত্মার সৌন্দর্য্য সম্মান তাহার কাছে অগ্রাহ্য, সত্য-নীতি সত্য-বিবেক তাহার কাছে হতাদৃত ! সে বুঝে শুধু বিবেকের দম্ভে,—অবিবেকী মোহ ! জানে শুধু নীতির দোহাই দিয়া দুর্নীতির নিষ্ঠুর শাসন !—

ওরে হতভাগ্য 'মাটীর মানুষ'—আজ তোর সমস্ত মলিনতা লইয়া তুই দূর হইয়া যা ! আজ 'মাটীর মানুষ'কে লইয়া 'মাটীর মনুষ্যত্বের' সহিত সম্পর্ক পাতাইয়া, সে আর সন্তাপ নিষ্পীড়িত হইবে না !........ আজ অবসন্ন আলস্যে সে জড় নির্জ্জীব থাকিতে পারিবে না,—দণ্ডী খাটিয়া তাহার সত্যই দম ছুটিয়াছে;—এবার প্রাণের জোরে গণ্ডি কাটিয়া সে মুক্ত হইবে,.........!

মন্মথনাথ বুঝিলেন,—একটা অস্বাভাবিক আলোড়ন মায়ার ভিতর তীব্র বেগে চলিতেছে ! তিনি কারণ বুঝিলেন না,—বিস্ময়-উদ্বেগে অধীর হইয়া, মায়ার স্কন্ধ ধরিয়া নাড়া দিয়া বলিলেন "মায়া—মায়া অমন কর্‌ছ কেন ?"

থর-কম্পিত দেহে মায়া মন্মথনাথের পাদপ্রান্তে বসিয়া পড়িল, অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "কেন শুনবে ? জীবনে স্বর্গ কোথায় জানি না, কিন্তু তার চেয়ে বড় সত্য-তীর্থের পথ আজ আমি এইখানে খুঁজে পেলুম,—ওগো আজ তোমার পায়ের ওপর মাথা রাখতে দাও,—আশীর্ব্বাদ কর, তোমার এই মুহূর্ত্তের শিক্ষা আমার জীবনে যেন চির সার্থক হয় !—"

মায়া মন্মথনাথের পায়ের উপর মাথা নামাইল, মন্মথনাথ সেইখানে বসিয়া পড়িলেন, মায়ার মাথা বুকের উপর তুলিয়া লইয়া নির্ব্বাক ভাবে বসিয়া রহিলেন। দুইজনে-ই স্থির, নীরব, নিস্পন্দ !—মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত গভীর

নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়া কাটিয়া চলিল, স্বামীস্ত্রীর কেহই কাহাকে কোন ক্ষুদ্র শব্দে সম্ভাষণ করিয়া সে নিস্তব্ধতার শান্তি ভঙ্গ করিতে পারিলেন না।

দশম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

বিধির-বিধান-রহস্য মানুষের দৃষ্টি সীমার বহির্ভাগে। মানুষের জড়-চেতনা জড়ত্বের পরিবেষ্টনে আবদ্ধ,—মানুষ জানিতে পারে না, কোন জড়-উপাদানের মধ্যে—কত সূক্ষ্ম সম্ভাবনা—কত সূক্ষ্মতর ভাবে সঞ্চালিত হইয়া,—কোন সূক্ষ্মতম বিকাশের বক্ষে,—পূর্ণ শক্তিতে বিকশিত হইয়া, বিশ্বকে বিস্ময় চমকিত করে!—মানুষ ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত মর্ম্মে-চর্ম্মে অনুভব করিতে জানে,—তাই ঘটনা সমষ্টির প্রহেলিকা তাহার কাছে সব চেয়ে বড়—অলঙ্ঘনীয় বিধিনির্দ্দেশ! মানুষ ভালমন্দ বুঝিয়া হাসে, কাঁদে তাহারই পানে চাহিয়া!—কিন্তু তাহার পশ্চাতে যে-কোন মঙ্গলের জন্য কত অমঙ্গল—সতর্ক সজাগ হইয়া কিসের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে মানুষ তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না।

প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর মন্মথনাথ সুপ্তি-জড়িত চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, মায়া শয্যা হইতে উঠিয়া গিয়াছে। মন্মথনাথ শয্যা ত্যাগের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না, দেহ অবসন্ন আলস্যে জড়তাময় বোধ হইল, স্মরণ হইল গতরাত্রে—অনেক বিলম্বে শয়ন করা হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলা অস্পষ্ট ঘটনাস্মৃতিও মনে পড়িল, কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও—তাহার সবিশেষ তথ্য স্মরণ করিতে পারিলেন না। মস্তিষ্ক অত্যন্ত বিকলতা পূর্ণ বোধ হইল।—মন্মথনাথ আবার শুইয়া পড়িলেন,—অসহিষ্ণু বিরক্তিতে স্মরণ হইল, অনেক প্রয়োজনীয় কাজ পড়িয়া আছে,—এখন নিশ্চিন্ত বিশ্রাম একান্তই অমার্জ্জনীয়, কিন্তু তখনই অবসাদ-শ্রান্ত-দেহ কঠিন ভাবে উত্তর দিল, আজ আমি নিতান্তই অপারগ। নিরস্ত হইয়া মন্মথনাথ আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন।

অনেক বেলায় মদন অসিয়া ডাকাডাকি করিয়া মন্মথনাথের ঘুম ভাঙ্গাইল। মন্মথনাথ চোখ মেলিলেন, মদন দেখিল তাঁহার দুই চক্ষু জবাফুলের মত ঘোর রক্তবর্ণ। গায়ে হাত দিয়া দেখিল জ্বর তাপে সর্ব্বাঙ্গে অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে—বিস্মিত হইয়া বলিল,—'একি? আপনার জ্বর হোল কখন?'

অলস-ঘুর্ণিত নয়নে মন্মথনাথ বলিলেন, "জ্বর, কি জানি কখন জ্বর হয়েছে--তা হোক্ গে একটু ঘুমাতে দাও—"

মদন আবার বলিল "আজ অফিস যাবেন না!"

কার্য্যালয়ের নামে কর্ম্মপ্রাণ মন্মথনাথের রোগ আলস্য জড়তার ভিতর একটা চাঞ্চল্য উত্তেজনা বহিয়া গেল, ব্যর্থ চেষ্টায় দুইবার উঠিতে গিয়া অধিকতর শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন,--উদ্বিগ্ন ভাবে বলিলেন "তাইত সর্ব্বাঙ্গে বিষম বেদনা বোধ হচ্ছে—না পারব না, ওহে ভট্টজী তুমিও আছ; ভুলে গেছি তাই ত বড় বিপদে পড়লুম যে;—অনুগ্রহ করে একবার শ্রীশ বাবুর কাছে যাও, আজ গরাইদের মামলার দিন, তাঁকে বোলো একটা যেন ব্যবস্থা করেন, আমি আজ উঠ্তে পারছি না!—"

আরও দুই একটা খুচরা মামলা ছিল, মন্মথনাথ সেগুলা সম্বন্ধে যথাকর্ত্তব্য উপদেশ দিয়া মদনকে সত্বর শ্রীশ বাবুর কাছে পাঠাইয়া দিলেন, মায়াকে ডাকিয়া অভ্যাগত অতিথি মদনের যত্ন স্বাচ্ছন্দ্যের যাহাতে ত্রুটি না হয় তৎ সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন।

সমস্ত দিন তেমনই তন্দ্রাঘোরে কাটিয়া গেল। মদন বার বার আসিয়া সংবাদ লইতে লাগিল, মায়া সংসারে অত্যাবশ্যকীয় কাজকর্ম্মগুলো শীঘ্র ও সংক্ষেপে সারিয়া, সমস্ত দিন মন্মথনাথের কাছে বসিয়া রহিল।

রাত্রে নিঃশব্দ তন্দ্রাঘোর আর রহিল না, যন্ত্রণায় মন্মথনাথ খুব ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন, মায়া ভীত হইল, মদন উদ্বিগ্ন হইল, রাত্রেই একজন চিকিৎসককে আনা হইল, রোগীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া তিনি বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিলেন না, সন্দিগ্ধ ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন "কাল্‌কের দিনটা না দেখে কিছু বলা যায় না।"

পরদিনও সেই অবস্থায় কাটিল, যন্ত্রণা ঘোরে মন্মথনাথ প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। শ্রীশবাবুপ্রমুখ হিতৈষী সুহৃদবর্গ আসিয়া রোগীর অবস্থা দেখিয়া বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন, গবর্ণমেণ্ট হাঁসপাতাল হইতে সাহেব-ডাক্তার আনা হইল, সাহেব সহযোগীর সহিত একমত হইয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন "অবস্থা দুর্ব্বোধ্য!"

বুকভরা উৎকণ্ঠা বুকের মধ্যে চাপিয়া, মায়া শ্রান্তিহীন ধৈর্য্য লইয়া রোগীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিল। গোপন শঙ্কাপীড়িত মদন,—বাঙ্গালীর মেয়ের শক্তি, সাহস, ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া বিস্মিত হইল, প্রথম দর্শনের সেই সঙ্কোচ-কুণ্ঠিতা ক্ষীণ-কোমলা নারীমূর্ত্তির মধ্যে যে এতখানি কঠোর সংগ্রাম-শক্তি লুকাইয়া থাকিতে পারে, তাহা—তাহার ধারণা-বহির্ভূত ব্যাপার!—এক এক সময় তাহার সন্দেহ হইতেছিল যে 'স্বামীর সঙ্কটাপন্ন ব্যাধির অবস্থা মাসিমা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, তাই নিশ্চিন্ত ধৈর্য্যে ইনি এতদূর শক্ত হইয়া আছেন বুঝি!'

মদন অভ্যাগতরূপে এ বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু অবস্থাচক্রে বাধ্য হইয়া এই দুঃসময়ে তাহাকে এ বাটীর অভিভাবকপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইল; এই বিপদের সময় মদনের সাহায্য মায়ার নিকট যেন দেবতার আশীর্ব্বাদের মত বোধ হইল। অক্লান্ত পরিচর্য্যার মাঝে, যখন সংজ্ঞাহীন মন্মথনাথের পাংশু বিবর্ণ মুখপানে চাহিয়া, মায়ার অন্তর শিহরিয়া উঠিত, যখন আপনাকে দুঃসহ সঙ্কটের মধ্যে অত্যন্ত অসহায় নিরুপায় বোধ হইত,—সেই সময় মদন যখন—"কি চাই মা" বলিয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইত, তখন অপার্থিব করুণ-কৃতজ্ঞতায় মায়ার সমস্ত বুক যেন ভরিয়া যাইত! তাহার মনে হইত,—চাহিবার আর কিছু নাই, প্রয়োজন সব ফুরাইয়াছে!

একদিন, দুইদিন, তিনদিন, চারদিন কাটিল, মদনের ঐকান্তিক আগ্রহ মায়ার প্রাণান্তিক সেবা কিছুই সফল হইবার লক্ষণ দেখা গেল না। ডাক্তারগণের সন্দিগ্ধ গাম্ভীর্য্য ক্রমশঃ স্থির বিশ্বাসে কঠিন নীরব হইয়া উঠিল।

গতিক ভাল নহে দেখিয়া শ্রীশবাবু মদনকে ইঙ্গিত করিলেন, মদন মঙ্গল-মঠে টেলিগ্রাম করিল,—সেখান হইতে কেবলরাম শান্তিদেবীকে সঙ্গে লইয়া, পরদিন এলাহাবাদে আসিলেন।

গুরুতর প্রয়োজনের সম্মুখে অসহায় অবস্থায় দাঁড়াইলে—শক্তিশালী মানবচিত্তে আত্মনির্ভরতা উদ্বোধিত হয়, কিন্তু সেখানে সাহায্য আসিয়া জুটিলে সে নির্ভরতা অনেক সময় ক্ষীণ হইয়া পড়ে!—মায়ার বোধহয় তাই হইল, পর-নির্ভরতার অবলম্বন পাইয়া তাহার সাহস বাড়িল না,—বাড়িল শুধু ভয়! সাহায্য-সম্পদ দেখিয়া বিপদের গুরুত্ব ভয়াবহরূপে মায়ার উপলব্ধি হইল,—কে জানে কেন হঠাৎ তাহার মনে হইল, তবে আর মন্মথনাথ বাঁচিবেন না!......শুষ্ক ম্লান মুখে আসিয়া শান্তিদেবীকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া হঠাৎ তাহার মুখ হইতে যেন অজ্ঞাত অশুভ লক্ষণের পূর্ব্ব সূচনার মত ক্ষীণ কাতর বাণী নির্গত হইল, "দিদি কি হবে?"

শান্তিদেবী আশ্বাসের স্বরে বলিলেন "কি আর হবে বোন্? ভগবান মঙ্গলময়, তিনি যা কর্‌বেন তাই হবে।"

শান্তিদেবী ও কেবলরাম আসিয়া রোগশয্যার পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন, ডাকাডাকিতে মন্মথনাথ অনেক কষ্টে বিকারঘোরাচ্ছন্ন চক্ষু মেলিলেন, কিন্তু কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না,—কেবলরাম পরিচয় দিল, মন্মথনাথ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "আপনারা এসেছেন, এ সময় বড় উপকার হোল.........ওদের দেখ্‌বেন।"

তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না, পাশ ফিরিয়া শুইলেন, বৈকালের দিকে তাঁহার অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইয়া আসিতে লাগিল, বাড়ীর লোকে প্রমাদ গণিল, চিকিৎসকগণ হতাশ হইলেন, মন্মথনাথের বন্ধুত্ব ও উপকার যাহারা ভুলিয়া যান নাই, তাঁহারা সকলেই আসিয়া বিষণ্ণ বেদনায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন, মায়ার সাহস লোপ হইল, ধৈর্য্য ফুরাইল, সেবার শক্তি ঘুচিল, সে আর সহ্য করিতে পারিল না, সকলের নিষেধ উপদেশ সান্ত্বনা ভুলিয়া সে শয্যাপ্রান্তে বসিয়া মুখে আঁচল চাপা দিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। কেহই তাহাকে থামাইতে পারিল না।

মুমূর্ষু মন্মথনাথের ক্ষণে ক্ষণে সংজ্ঞা সঞ্চার হইতেছিল, সেই সময় একবার তাঁহার জ্ঞান হইল,- মায়াকে রোরুদ্যমানা দেখিয়া তিনি বিস্ময়-জড়িত স্বরে বলিলেন, "কাঁদ্ছ ? কেন কাঁদ্ছ ?-- তুমি ত ঢের কেঁদেছ, আর কেন ?—এবার সবাই কাঁদুক্, তুমি চুপ কর,—তোমার কান্নার আর কিছু ত নাই !"

পরক্ষণে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া স্তিমিত নয়নে, তিনি আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "ভেবো না, ভয় কোর না, যা হবার তা হবেই, ভয় খেয়ে ভুলকে ডেকো না, তা হ'লেই বিপদ ! ওগো প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে মনকে চেতনায় 'শাণ' দাও, দেখ্‌বে চিত্তে বিশ্বজয়ী শক্তি আবির্ভূত হবে, কিছু মন্দ বোলো না, সব ভাল,—সব ভাল, ভালই রূপান্তরিত হয়ে তোমার চৈতন্য উদ্বোধনের জন্য—তোমার সহায়তার জন্য নানা বিচিত্র বেশে তোমার সাম্‌নে উপনীত হচ্ছে,—ভয় কোর না কুণ্ঠিত হোয়ো না, মঙ্গলময়ের ওপর নির্ভর করে অকপট বিশ্বাসে সব মাথায় তুলে নাও,—সব ভাল—সব ভাল মন্দ কিছু নাই !" তিনি আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন—

শান্তিদেবী দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া উঠিলেন, কেবল ও মদন মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দে অশ্রু মুছিতে লাগিল, মায়া রুদ্ধ রোদন বেগ সম্বরণ করিবার জন্য মন্মথনাথের দুই পায়ের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে মন্মথনাথ যন্ত্রণাঘোরে ছটফট করিতে করিতে আবার সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইলেন, মায়ার মাথা নিজের পায়ের উপর দেখিয়া আশ্বস্ত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "প্রণাম কর্‌ছ ? কর, কর,—প্রণামের মত প্রণাম কর যেন প্রত্যেক প্রণামের মধ্যে,—সুপ্ত প্রাণ-শক্তি বিকশিত হয়ে উঠে,—সমস্ত জীবনের পুঞ্জীকৃত ভুল, ভ্রান্তি, পাপ, সন্তাপ, সব যেন এক পলকে ধ্বংস হয়ে যায়, দেখো সাবধান, শুধু বুকে হাঁটু দিয়ে ওখানে নিষ্ফল লৌকিকতা কোর না, সে বড় পরিতাপ !"

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মায়া বলিল "তুমি আশীর্ব্বাদ কর,—সে পরিতাপ যেন আমায় স্পর্শ কর্‌তে না পারে।"

হতাশ-বেদনার ক্ষীণ হাসি, সেই মুমূর্ষু নিষ্প্রভ বদনপ্রান্তে ফুটিয়া উঠিল, মন্মথনাথ বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ!—না, সে শক্তি নাই, তোমায় আশীর্ব্বাদ করবার শক্তি যাঁর আছে, তিনি সকলের ওপর ! তাঁর কাছে প্রার্থনা করি তিনি তোমার মঙ্গল করুন, মায়া—মায়া, তাঁকে প্রণাম কর, মানুষের মুখ চেয়ো না,—মানুষ সকল তেজ সহ্য কর্‌তে পারে না, সকল শক্তি সম্বরণ কর্‌তে পারে না, মানুষ যত বড়ই হোক্ সে সসীম !........ গাছে উঠে মই ফেলে দাও, কৃতজ্ঞতার মোহে তার পানে তাকিয়ে থেকো না, ভুল কর্‌বে, শ্রম পণ্ড হবে.—সাবধান !"

কি দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকা পূর্ণ প্রলাপ ;—গৃহস্থ সকলেই চমকিত হইলেন,—কে জানে জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান মানবের প্রয়াণোন্মুখ আত্মার আধ্যাত্ম-চেতনা সহসা কেন সজাগ হইয়া উঠে, অন্তর্দৃষ্টি কেমন করিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠে !—কে জানে কোন প্রাক্তন সংস্কার বশে,—কোন অলক্ষিত সাধন প্রভাবে,—মানুষ সারা জীবনে যাহা

বুঝিতে পারে না, মরণের সময় তাহা অন্যকে বুঝাইয়া দিতে শক্তিশালী হয়; নিজের পথ যে কখনও খুঁজিতে চাহে নাই,—খুঁজিয়া পায় নাই, সেও অন্যের পথ নির্দ্দোষ করিয়া দেয়!

আসন্ন-শোক-শঙ্কিত সকলের চিত্ত,—রোগীর নিদান-প্রলাপে বিস্ময় উৎকণ্ঠিত হইল বটে,—কিন্তু এইবার যেন লুপ্ত শক্তি ফিরিয়া পাইল, তাহার দ্বিধা কাটিয়া গেল, একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্য জটিলতা যেন ধীরে ধীরে তাহার দৃষ্টির উপর পরিষ্কার হইয়া যাইতে লাগিল, সে নির্ব্বাক ভাবে স্থির হইয়া রহিল।

শেষ রাত্রে মন্মথনাথের নাভিশ্বাস আরম্ভ হইল, প্রাণ যখন কণ্ঠাগত, তখন কেবলরামের দুই হাত ধরিয়া সাশ্রু নয়নে তিনি বলিলেন "সব অপূর্ণ রইল ভাই, চল্লুম। ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য কাকে বলে জানিনে, তবে কর্ত্তব্যকে চিরদিন প্রাণপণ নিষ্ঠায় পালন করেছি, অসহায়া দরিদ্রকন্যাকে জীবনসঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করেছিলাম, মনে বড় আশা ছিল, সুখী করব, কিন্তু সময় পেলুম না, বড় দুঃখ রইল কিছুই সঞ্চয় করতে পারিনি, ওদের পথের ধূলায় বসিয়ে রেখে চল্লুম, তোমারা রইলে, ওদের দেখো—আর তোমার কাছে, মদনের কাছে আমার একটি অনুরোধ, ছেলেটা যদি বাঁচে তা হলে তাকে মূর্খ করে রেখো না, তোমরা নিজের সন্তান বলে—অন্ততঃ ভিক্ষার দানেও ওর পড়াশুনার ব্যবস্থা করো—"

অশ্রুপ্লাবনে অধীর কেবলরাম কথা কহিতে পারিল না, মদন আত্মদমন করিয়া নিকটে আসিয়া বলিল "আপনি নিশ্চিন্ত হোন্ মন্মথ বাবু, আপনার পুত্রকে আজ থেকে আমি ধর্ম্মভ্রাতা বলে গ্রহণ করলুম, তার সকল ভার আমার ওপর,—ভাইয়ের জন্য ভাই যা করতে পারে, আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে তার কিছু মাত্র ত্রুটি হবে না, নিশ্চয় জানবেন।

মন্মথনাথের মৃত্যুছায়া-মলিন বদনে প্রসন্ন আনন্দের জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, ইঙ্গিতে আশীর্ব্বাদ করিয়া শান্তমুখে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। নবীন জীবনের অজস্র আশা আকাঙ্ক্ষা, হৃদয় ভরা উদ্যম, প্রাণভরা কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, সব এক মুহূর্ত্তে ছায়াবাজীর মত শূন্যে মিলাইয়া গেল, ত্রয়োবিংশ বর্ষীয়া পত্নী ও অপোগণ্ড দুগ্ধপোষ্য বালককে অনাথ করিয়া—নিয়তির বিধান মাথায় বহিয়া তিনি লোকান্তরে চলিয়া গেলেন, জগতে রহিল শুধু তাঁহার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ জীবনের শান্ত স্মৃতি,—আর মানুষের বুক ভরা ব্যর্থ ব্যাকুলতার বেদনাময় হাহাকার!

যথা সময়ে কেবলরাম শ্মশানে যথাকর্ত্তব্য শেষ করিয়া বাড়ী আসিল। শোকের প্রথম সংঘাত সহ্য হইলে পর কেবল শান্তি দিদির সহিত পরামর্শ করিয়া মদনের সহিত একমত হইয়া, শ্রীশবাবুপ্রমুখ বিজ্ঞ ভদ্রলোকগণের অনুমতি লইয়া—এখানকার বাসা উঠাইয়া মায়াকে লইয়া মঙ্গল-মঠে নিজালয়ে যাইতে প্রস্তুত হইল, প্রস্তাব শুনিয়া শোকক্লিষ্টা মায়ার শুষ্ক অধরপ্রান্তে শুধু একটু ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্যও দ্বিধা আপত্তি করিল না।

উদ্যোগী কেবলরাম বাসার অনাবশ্যক আসবাবপত্র টেবিল চেয়ার খাট প্রভৃতি এবং মন্মথনাথের বহুলায়াস-সংগৃহীত মূল্যবান আইন পুস্তকগুলি সব সুবিধামত দরে বিক্রয় করিয়া দিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল, কপর্দ্দকহীনা বিধবা মায়ার হাতে, নগদ যাহা কিছু আসে তাহাই ভাল! বিশেষতঃ এ সকল অপ্রয়োজনীয় বস্তুর যত্ন, ব্যবহার, বা সংরক্ষণ করিবে কে? সকলেই তাহার মতানুমোদন করিলেন, এবং সমবেত চেষ্টার ফলে শীঘ্রই নব্য উকীল মহলে, মৃত উকীলের ব্যবহার্য্য সামগ্রীগুলি বিক্রীত হইয়া গেল, বাসাভাড়া ও রোগের খরচ বাবদ কিছু দেনা ছিল, তাহা মিটাইয়া, যে কয়েক শত টাকা বাঁচিল, তাহা সুদে খাটাইয়া পিতৃহীন শিশুর ভবিষ্যত্ সংস্থাপনের ব্যবস্থা করিবার জন্য মায়া কেবলরামের হাতে দিল, টাকা জিনিস ভাল নহে, সময় বিশেষে তাহা সুধীর মতিভ্রম ঘটাইয়া

থাকে বলিয়া কেবলরাম জোর করিয়া মায়ার নিকট প্রতিশ্রুতি-পত্র লিখিয়া দিয়া, সাশ্রুনয়নে অর্থ গ্রহণ করিল।

যেদিন তাঁহারা বোম্বাই ফিরিবেন, সেইদিন সুরাটের মোহন্তমহারাজের নিকট হইতে মদন টেলিগ্রাম পাইল। তিনি মদনকে ফিরিয়া যাইতে লিখিয়াছেন কারণ মঠের মামলা মিটিয়া গিয়াছে, দেশের গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ একত্র হইয়া ধর্ম্ম সম্পর্কীয় মতদ্বন্দ্ব নিষ্পত্তির জন্য রাজদ্বারে আবেদন করা লজ্জা ও অপমানের বিষয় বুঝিয়া, দেবলচাঁদকে মহারাজের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করাইয়া আপোসে মীমাংসা করাইয়াছেন, দেবলচাঁদ গদি লাভের আশা ত্যাগ করিয়াছে, মহারাজ তাহাকে ক্ষমা করিয়া পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন, এবং শীঘ্রই জনৈক সুপাত্রের সহিত মৃত দেবকীনন্দনের কন্যার শুভ বিবাহকার্য্য সমাধা করাইয়া তাহাকে মঠাধিকারী পদে অভিষেক করিবেন জানাইয়াছেন।

মন্মথনাথের আকস্মিক মৃত্যুতে মদন অত্যন্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল, মামলার গোলমাল তাহার আদৌ ভাল লাগিতেছিল না, সুতরাং মহারাজের টেলিগ্রাম পাইয়া সে নিশ্চিন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, এবং কালবিলম্ব না করিয়া সেইদিনই তাহাদের সহিত এলাহাবাদ ত্যাগ করিয়া মঙ্গল-মঠ হইয়া সুরাটে গমন করিল। কেবলরাম শোকখিন্না মায়াকে ও শান্তিদেবীকে সঙ্গে লইয়া, শিশু ভাগিনেয়কে বুকে করিয়া বিষাদমলিন বদনে নিজের বাটীতে প্রবেশ করিল।

কেবলের কিশোরী বধূ অমিয়া দেবী সরল উন্নত চেতা সদাশয় স্বামীর উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী; সে শান্তি দেবীকে পূর্ব্বাপর যত্ন ও সম্মান করিয়া চলিত, এখন মায়াকেও ঠিক তাঁহারই পাশে স্থান দিল, মায়ার শিশুকে সে খুব সহজেই নিজের আয়ত্ত করিয়া ফেলিল, মায়ার সহিত এখন আর শিশুর কোন সম্পর্ক রহিল না, শুধু স্তন্য পানের জন্য সে কয় বার মায়ার কাছে আসিত মাত্র, তাহা ছাড়া সর্ব্বক্ষণ সে কেবলের বধূর তত্ত্বাবধানে থাকিত।

ক্রমশঃ—

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

আম্র।

—§*§—

লভি প্রতি বৎসর তব শুভ দৃষ্টি
নূতন শ্বশুর ঘর চেয়ে তুমি মিষ্টি।
স্বাদু তুমি স্বাদ যদি হয় কভু টক্ গো
শ্যালিকার উপহাস সম উপভোগ্য।
যদি তুমি হও কভু অতি কটু খাট্টা
সেও ঠিক শালাদের বিজন ঠাট্টা।
ঢল ঢল মুখ তব সুন্দর সৌম্য
প্রেয়সীর হাসিটীর চেয়ে তুমি রম্য।

সঙ্গেতে যদি তুমি পাও ক্ষীর দুগ্ধ,
বাসরের গীত চেয়ে কর প্রাণ মুগ্ধ,
যদি তুমি তাহে পুনঃ চিনি পাও অল্প,
সে যে মিঠা ঠিক ফুলশয্যার গল্প।
যদি তুমি আধপাকা হও আমচুর হে
পুরাতন প্রেমলিপি প্রেমে ভরপুর হে।
যবে তুমি একেবারে হও আমসত্ত্ব
খোঁকার মামার সে ত ষষ্টীর তত্ত্ব।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

তুড়ি।

—§*§—

অঙ্গুষ্ঠ, মধ্যমা ও অনামিকার পরস্পর নিষ্পেষণ-বিপ্রকর্ষণ-সঞ্জাত ধ্বনিবিশেষকে তুড়ি কহে। অরণির সংঘর্ষোদ্ভব পাবকের ন্যায় অঙ্গুলির ঘর্ষণজনিত এই ধ্বনিও বিশ্বের বিবিধ কল্যাণ-বিধান করিয়া থাকে। ইহার সাহায্যে অপ্রিয়কে পলক মাত্রেই উড়াইয়া দেওয়া যায়। কাব্য, নাটক, ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি কার্য্য এবং বক্তা, লেখক, কবি, সাধক প্রভৃতি কারণ, কেহই ইহার প্রভাব অমান্য করিতে পারেনা। ইহার দৃষ্টান্ত, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অসহ্য হইল অমনি বঙ্গদেশ এক তুড়িতে তাহা উড়াইয়া দিল।

তুড়ির একটী বিশেষ প্রয়োগ দেখা যায়—জৃম্ভন কালে। এই তুড়ির উদ্দেশ্য কি তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, হাই তুলিবার সময় মুখ অতিমাত্রায় ব্যায়ত হইলে চোয়াল গ্রন্থিচ্যুত (Dislocated) হইবার সম্ভাবনা। তুড়ির Detonating signal দ্বারা জৃম্ভনকারীকে সতর্ক করিয়া দিলে তিনি দেহবিবরের অতি-বিস্তার সংযত করিয়া এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন। কিন্তু ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। হাই তুলিতে চোয়ালের গ্রন্থিচ্যুত কদাচিৎ হইয়া থাকে। হইলেও তাহা মারাত্মক নহে। তবে তুড়ির প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? সকলেই জানেন—বাতাসে অসংখ্য রোগের বীজাণু অহরহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কোনরূপে মানবদেহে প্রবেশ করিয়া জীবনীশক্তিকে পরিক্ষীণ করাই ইহাদের চরমলক্ষ্য। কিন্তু প্রবেশের কোন উপায় নাই, সমস্ত শরীরই দুর্ভেদ্য চর্ম্মে আবৃত। ভিতরে প্রবেশ করিবার একমাত্র উন্মুক্তপথ নাসাবিবর। কিন্তু তদন্তর্গত রোমরাজিতে প্রতিহত হইয়া জীবাণুগুলিকে হতাশ ভাবে ফিরিয়া আসিতে হয়। এরূপ অবস্থায় যদি কেহ হাই তুলেন, তাহা হইলে তাঁহার অবারিত মুখগহ্বরে অবাধ গতি পাইয়া জীবাণুগুলি দলে দলে প্রবেশ করিতে থাকে। এইগুলিকে উড়াইয়া দিবার জন্যই তুড়ির প্রচলন হইয়াছে। তুড়ির সাহায্যে জীবাণু তাড়াইবার দুইটী প্রথা আছে। প্রথম, জৃম্ভনকারী নিজে তুড়ি দিয়া শরীর সংস্পৃষ্ট বায়ুতে তরঙ্গ উত্থাপিত করেন, এই তরঙ্গের আবর্ত্তে নাকাল হইয়া জীবাণুগুলি দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করে। দ্বিতীয়, জৃম্ভনকারীর অনতি

দূরবর্ত্তী কোন ব্যক্তি তুড়ির শব্দে জীবাণুগুলিকে চমকিত করিয়া দেন, কাজেই তাহারা আর একদণ্ডও সে স্থানে অবস্থান করিতে সাহস পায় না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে—জীবাণু হইতে রোগোৎপত্তি আধুনিক পণ্ডিতগণেরই মত; অতি অল্প দিন হইল মাত্র এই সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে; ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ ইহার সন্ধান পাইলেন কিরূপে? ইহার উত্তর, প্রাচীন ঋষিদিগের অবিদিত কিছু ছিল কি? Decimal notation, মাধ্যাকর্ষণ, পৃথিবীর গোলত্ব, প্রভৃতি যাঁহাদের আবিষ্কার, যাঁহারা রাসায়নিকতত্ত্বসমূহে ব্যুৎপন্ন, Intestinnal obstruction প্রভৃতি উৎকট রোগে শস্ত্র চিকিৎসায় পারদর্শী এবং বিমানযান পরিচালনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাঁহারা জীবাণু সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ এ-কথা বিশ্বাস যোগ্য নহে।

শাস্ত্রে যে অসংখ্য দেবতার উল্লেখ আছে তাঁহারা জীবাণু ব্যতীত আর কিছুই নহেন। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে দেবতায় প্রযুজ্য সমস্ত বিশেষণই জীবাণুকে বিশেষিত করে। দেবগণ অমর ও নির্জ্জর। জীবাণু ভিন্ন জগচ্চরাচরে আর কোন প্রাণী অজর ও অমর আছে কি? দেবগণ তৃতীয় দশায় যৌবন বিশিষ্ট। জীবাণুরাও তাই। ইহাদের মধ্যে বাল্য বা বার্দ্ধক্যের কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। ইহাদের প্রত্যেকটী অবয়বে ও ধর্ম্মে অপর সকলের সমান। মাতৃদেহ হইতে সদ্যোবিচ্যুত জীবাণুও মাতার অপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন নহে। জীবাণুতে intelligence বা বুদ্ধির সত্তা পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন না। দেবগণও বিবুধ বা বুদ্ধিহীন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। সুর শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি আমার জানা নাই। তবে সুর হইতেই যে সুরা শব্দের উদ্ভব সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। জীবাণুর সাহায্যে শর্করাদ্রব সুরায় পরিণত হয়, এ কথা ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও স্বীকার করেন। দেবগণ খেচর, জীবাণুগণও খেচর, সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া তাহাদের আধিপত্য। অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, জীবাণুতত্ত্ব ঋষিদিগের অনবগত ছিল না। এবং ইহাও বুঝা যাইতেছে, ওলাবিবি Commabacellus এর নামান্তর।

অণুপরিমিত জীবাণুগণ চর্ম্মচক্ষুর অগোচর, অথচ ইহারা ঋষিদিগের অপ্রত্যক্ষীভূত ছিল না। ইহা হইতেই বুঝা যায় পুরাকালে ভারতে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রচলন ছিল। শাস্ত্রে আছে, "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃপরস্তাৎ।" অর্থাৎ 'আমি অন্ধকারের অপর পারে আদিত্যবর্ণ এই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।' আদিত্যবর্ণ বলিলে কি কি বুঝিব? আদিত্যের বর্ণ কি? সপ্তবর্ণের সংমিশ্রণোদ্ভূত শ্বেত আলোকের বর্ণই আদিত্যের বর্ণ। এবং একমাত্র স্বচ্ছ পদার্থই এইরূপ বর্ণ বিশিষ্ট হইতে পারে। সকলেই জানেন জীবাণুর দেহ স্বচ্ছ। অতএব আদিত্য বর্ণ মহান্ পুরুষ বলিতে, শক্তিতে মহান্ স্বচ্ছ জীবাণুকেই বুঝিতে হইবে। এই সূত্রে 'পুরুষ' শব্দ "স্বায়ম্ভুবো পুরুষো বা" ইত্যাদি স্থলের ন্যায় লিঙ্গ নির্বিশেষে ব্যবহৃত ও জীবসাধারণের বোধক। 'এতং' পদ হইতে বুঝিতে পারা যায়, অদৃষ্টপূর্ব্ব এবং ক্রিয়ামুমেয় সত্তা কোন জীবাণু আবিষ্কার করার উল্লাসে সূত্রকার উক্ত বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন। অণুবীক্ষণের আভ্যন্তরীণ ঘোরান্ধকারের পর দেখিয়াছিলেন বলিয়া সূত্রে "তমসঃপরস্তাৎ" এই পদটী ব্যবহৃত হইয়াছে।

ঋষিগণ অণুবীক্ষণের সাহায্যে জীবাণুর ক্রিয়াকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, এ বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। কিন্তু শুদ্ধমাত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত ছিলেন না। ইহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপায়ও তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। Carbolic acid প্রভৃতি antiseptic দ্বারা জীবাণুবংশ ধ্বংশ করিবার প্রয়াস যে কত ব্যর্থ তাহা তাঁহারা বহু পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন। তাই তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট পন্থা অন্যরূপ। তাঁহারা

জানিতেন যে কয়েকটী খাদ্য জীবাণুদিগের অতি প্রিয় যথা—ঘৃত, দধি, ক্ষীর, রক্ত, সিক্ত আতপতণ্ডুল ইত্যাদি। ইংরাজীতে এইগুলিকে Culture media বলা হয়। দেবোদ্দেশে নানাবিধ যাগযজ্ঞ করিয়া এবং তদুপলক্ষে পশুরক্ত ও তণ্ডুলকদলীঘৃতক্ষীরাদি উপহার দিয়া তাঁহারা জীবাণুদিগকে পরিতৃপ্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। যজ্ঞভূমে প্রজ্বলিত হোমাগ্নি হইতে উপযুক্ত তাপ সংগ্রহ করিয়া ঐ সকল খাদ্যের কণা ধূমের সহিত অজস্র আকাশে উত্থিত হইত এবং বিমানচারী জীবাণুগণ এই খাদ্যকণিকা আকণ্ঠ আহার করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িত। কাজেই জীবদেহের উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইত না। দুর্ভাগ্যক্রমে ইদানীং যাগযজ্ঞাদি লোপ পাইয়াছে। অনাহারক্লিষ্ট জীবাণুগণ হিমপ্রদেশের রক্তলোলুপ নেক্ড়িয়ার ন্যায় দলে দলে মানবের বাসভূমি আক্রমণ করিতেছে এবং মুখনাসিকাচক্ষুশ্রোত্রাদির আশেপাশে আপনাদের স্থায়ী আবাস রচনা করিতেছে। এক্ষণে ইহাদিগকে তাড়াইবার একমাত্র উপায় তুড়ি!

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়।

রথ।

(রূপক)

(১)

ঐ আসে রথ,
পদাঙ্গুষ্ঠে দিয়ে ভর উৎকণ্ঠায় নারীনর
ভরে' আছে সারা রাজপথ।
তরুণ বালক বৃদ্ধ কৃপণ-দরিদ্রঋদ্ধ,
গৃহ ফেলি' দু'ধারে দাঁড়ায়
বিচারক বন্দীসাথে যন্ত্রী তার যন্ত্র হাতে
পশারিণী পশারা মাথায়।
শিশুরা উঠেছে কাঁধে এ উহারে হাতে বাঁধে
শত্রুমিত্র সবে গায়গায়,
ভাণ্ডার-পেটিকা খোলা ছড়ান টাকার ঝোলা
চোর তবু জুটেছে হেথায়।
এক পায়ে লাক্ষা পরি' কটিতে বসন ধরি'
বাতায়নে জুটে নারী যত,
শুনিয়া মেঘের ধ্বনি রথচক্র শব্দ গণি
বার বার ভুল করে কত।

(২)

ঐ এল রথ,
হুড়োহুড়ি জন দলে　　চারি দিকে কোলাহলে
একত্রিত সমগ্র জগৎ,
আগে যেতে সবে চায়　　কে কাহার পড়ে গায়
নাহি খোঁজ ঠেলাঠেলি মাঝে
কেবা ডরে সিপাহীরে　　চামারও সে চলে ভিড়ে
পাশে ঠেলে ফেলে মহারাজে।
হুলুধ্বনি করি নারী　　লাজ বর্ষে দুই ধারই
বাজে শঙ্খ ঢাক ঢোল কাঁশী
বালক হারায়ে যায়　　খুঁজিয়া মিলায় তায়
তার মুখে তালপাতা বাঁশী,
রথের দেবতা হায়　　কোলাহলে ডুবে যায়
উৎসবে যে সবে মেতে যায়,
তর্ক দ্বিধা দ্বন্দ্ব দোলে　　মহানন্দ কলরোলে
প্রত্যয়েরে কোথায় হারায়।

(৩)

চলে গেছে রথ,
নিমেষের কোলাহলে　　কোন্ দিকে গেল চলে
মিলাইল সুখস্বপ্নবৎ।
চক্রচিহ্ন বুকে ধরি　　পথ হাহাকার করি
পড়ে আছে ম্লান শূন্যতায়,
ফিরিতে আপন ঘরে　　মন আর নাহি সরে
ফিরিবারে সংসার-কারায়।
রথ চির গতিশীল　　স্থির নহে এক তিল,
সে যে এসে দিগন্তে মিলায়
তীর্থের মন্দির সম　　নহে ইহা স্থিরতম,
একবার দ্বারে দ্বারে যায়।

দুয়ারে পেয়েও তায় সজ্জা শোভা মাঝে হায়
ভুলিলাম ঠাকুরে হেরিতে,
সে মূরতি ধরি বুকে সংসারের সুখে দুখে
সমাশ্বাস নারিনু লভিতে।

শ্রীকালিদাস রায়।

মহাস্থান বা মস্তানগড়।

বগুড়া টাউন হইতে ৭ মাইল উত্তরে বগুড়া শিবগঞ্জ রোডের বামপার্শ্বে মহাস্থান বা মস্তানের সুবিস্তৃত উচ্চ গড় অবস্থিত।

মস্তান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্পটী প্রচলিত আছে :—

পরশুরাম নামে এক পরম শিবভক্ত হিন্দু নৃপতি মহাস্থানের অধিপতি ছিলেন। কেহ কেহ বলেন পরশুরাম পালবংশীয় রাজা ছিলেন।

এক শিবচতুর্দ্দশীরাত্রে রাজা লক্ষ শিবলিঙ্গার্চ্চনা করিবেন সংকল্প করিয়া পূজার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু লক্ষ সংখ্যা পূর্ণ হইল না। গণনা অশুদ্ধ হইয়াছে মনে করিয়া বারংবার গণনা করিতে করিতেই রাত্রি পোহাইয়া গেল। রাজার সংকল্প অসিদ্ধ হইল, পূজার ফুল বিল্বদল পুষ্পপাত্রেই শুকাইয়া গেল, ঘৃতের পঞ্চপ্রদীপ জ্বলিয়া জ্বলিয়া আপনি নিভিয়া গেল, দেখিয়া রাজদম্পতি ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় আকুল হইয়া উঠিলেন। বাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবান্ ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন না। দেবের চক্রান্ত কে বুঝিতে পারে? কঠোর নিয়তি-লীলা খণ্ডন বোধহয় দেবাদিদেব ভগবান্ ত্রিলোচনেরও সাধ্যাতীত।

এদিকে পারস্যদেশের বল্কসহরের সুলতান সাহ সুলতান সাহেব দরবেশ বেশে ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করিবার নিমিত্ত মহাস্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন।

তথায় এক চণ্ডালের সহিত দৈবক্রমে তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটিল। তাহার নিকট হইতে রাজার দানশীলতার বিষয় অবগত হইয়া স্বীয় সংকল্প সিদ্ধির এক উপায় মনে মনে স্থির করিলেন।

দানশীল পুণ্যাত্মা রাজা প্রতি মধ্যাহ্নে পূজার্চ্চনা সমাপনান্তে পবিত্র তিলক ও নির্ম্মাল্য ধারণ করিয়া দূর দেশাগত অতিথি অভ্যাগতকে অভীষ্ট দান করিয়া পরে অন্তঃপুরে আহার করিতে যাইতেন। এক মধ্যাহ্নে ফকিরবেশী সুলতান রাজ সকাশে উপনীত হইয়া স্বীয় প্রার্থনা নিবেদন করিল—সরলমতি নিষ্পাপ অন্তঃকরণ রাজাও "তথাস্তু" বলিয়া দেবমন্দির সন্নিকটে তাহাকে "ন্যমাজ" করিবার নিমিত্ত ত্রিহস্ত পরিমিত স্থান দান করিলেন। রাজা বুঝিতে পারিলেন না যে এই "তথাস্তু"র সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সৌভাগ্য সূর্য্যও হেলিয়া পড়িল।

ফকির এই ত্রিহস্ত পরিমিত স্থান অধিকার করিয়া নিত্য পবিত্র দেবমন্দির সন্নিকটে গোহত্যা প্রভৃতি কদাচার আরম্ভ করিল। ক্রমে এ সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হইল, রাজা উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

দেখিতে দেখিতে দরবেশবেশী সুলতানের অগণিত মুসলমান সেনা অতর্কিতে আসিয়া "আল্লা হো আকবর" শব্দে দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল; প্রতিদিন উভয় পক্ষেই বহু সংখ্যক সৈন্য হতাহত হইতে লাগিল। কিন্তু প্রতি প্রভাতেই হিন্দু সৈন্য সংখ্যা পূর্ব্ববৎ বোধ হইত, বহুদিন ব্যাপী যুদ্ধেও হিন্দুসৈন্য সংখ্যার কোন হ্রাস হইতেছে না দেখিয়া সুলতান বড়ই চিন্তিত হইলেন। সুলতানের চিন্তার কারণ অবগত হইয়া সেই চণ্ডাল মহারাজ পরশুরামের অন্তঃপুরস্থিত পবিত্র "জীয়ৎকুণ্ডের" অবস্থিতির বিষয় নিবেদন করিল। "জীয়ৎকুণ্ডের" পবিত্র বারি-সিঞ্চনে মৃতের দেহে পুনরায় জীবনী শক্তির সঞ্চার হইত। প্রতি নিশিতে পূত বারি-সিঞ্চনে মৃত হিন্দুসৈন্য নব জীবন লাভ করিয়া প্রভাতে নব বলে বলীয়ান হইয়া অকুতোভয়ে পুনঃ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত। সেই চণ্ডালের সাহায্য কিছু গোমাংস কৌশলে রজনী-যোগে জীয়ৎকুণ্ডের পবিত্র সলিলে নিক্ষিপ্ত হইল। কলুষিত কুণ্ডোদক সিঞ্চনে মৃত হিন্দু সৈন্যদেহে আর পুনরায় প্রাণ সঞ্চার হইল না। মুসলমানগণের আনন্দোল্লাস নৈশ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গগণে উত্থিত হইল। সেই ধ্বনিতে হিন্দুগণের প্রাণ অশুভ শঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল।

অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উভয় পক্ষে পুনরায় ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল—ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু সন্তান প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া রণমদে মত্ত হইয়া শাণিত কৃপাণ হস্তে বহু অরাতি নিধন করিয়া জননীজন্মভূমির চির শান্তিময় ক্রোড়ে চির বিশ্রাম লাভ করিল। দেবের ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়া ভক্তবীর মহারাজ পরশুরাম জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে করিতে বীরের ন্যায় সংগ্রাম স্থলে প্রাণত্যাগ করিলেন।

তখন মুসলমান সৈন্যগণ ভীমবেগে পবিত্র দেবমন্দির ও অন্তঃপুর আক্রমণ করিল, কর্ণধারবিহীন তরণীর ন্যায় হিন্দু সৈন্যগণ চালকবিহীন হইয়া সে আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না; ইতস্ততঃ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। মুসলমান সৈন্যগণ দেবমন্দির ও রাজান্তপুর লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল, সাহ সুলতান সাহেব ভীতিবিহ্বলা অসহায়া পলায়নপরা রাজকন্যা শিলাদেবীর পশ্চাদ্ধাবন করিলেন; দেবীঅংশসমুদ্ভূতা দেবীপ্রতিমা শিলাদেবী উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রাসাদ হইতে পুণ্যতোয়া করতোয়া সলিলে ঝম্প প্রদান করিলেন। দেবী হস্ত নিক্ষিপ্ত কঙ্কণাঘাতে সুলতানের দেহ দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। এইরূপে মহারাজ পরশুরামের জীবন-নাটকের অভিনয় শেষ হইল। এখন মহাস্থানের সুউচ্চ গড়ের উপর শিব মন্দিরের পরিবর্ত্তে সাহ সুলতান সাহেবের ইষ্টক নির্ম্মিত শ্বেতবর্ণ উচ্চ কবর শোভা পাইতেছে। এই গোরে সুলতানের মুণ্ডহীন দেহের সমাধি হইয়াছে। মুণ্ডটীর বিষয় কেহই কিছু অবগত নহেন।

প্রত্যহ এই সমাধি স্থলে বহু মুসলমান "সিন্নি" লইয়া আসিয়া থাকে। প্রতি সন্ধ্যায় কয়েক জন ফকির সেবাইত প্রদীপ জ্বালাইয়া মহাস্থানের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তারস্বরে "নমাজ" পাঠ করেন। (১) সমাধি গাত্রে এখনও শিব-পীঠের চিহ্নটী বর্ত্তমান রহিয়াছে, (২) শিব-লিঙ্গটী ভূমিতলে গড়াগড়ি যাইতেছে। কি উদ্দেশ্যে শিবপীঠটীর ধ্বংসসাধন করা হয় নাই তাহা বলিতে পারা যায় না কিন্তু বোধ হয় এ চিহ্নটীর লোপ হইলেই ভাল হইত কারণ এ দৃশ্য হিন্দু দর্শক মাত্রেরই হৃদয়ে গভীর বেদনার সঞ্চার করে।

(১) এস্থানে নমাজ হয় না। সঃ

(২) সমাধি গাত্রে নহে, সমাধি প্রাচীরের বহির্ভাগে ফটকের পশ্চিমে ইহা অবস্থিত। সঃ

পশ্চিম দক্ষিণ কোণে ইষ্টক নির্ম্মিত সেই ত্রিহস্ত পরিমিত স্থান এবং তৎপার্শ্বেই একটী বহু পুরাতন "খোদার ঘর" মসজিদ্ (৩) ইহার পশ্চাতে একটী জাম, এই জামগাছতলে রাজার পূজাগৃহ নির্ম্মিত ছিল। দালান-গুলি সমস্ত মাটীতে বসিয়া গিয়াছে। সরকারী রাস্তা হইতেই—১০।১২ হাত প্রস্থ ইষ্টক নির্ম্মিত সোপানশ্রেণী আরম্ভ হইয়াছে, এই সোপানের বাহিরে অনেকদূর উর্দ্ধে উঠিলে প্রথমেই দক্ষিণপার্শ্বে সেই বিশ্বাসঘাতক চণ্ডালের কবর ও তৎপার্শ্বে আরও কয়েকটী সমাধি দৃষ্ট হয়।

কয়েক বৎসর হইল বামপার্শ্বে একটী দরবেশ কর্ত্তৃক একটী জুনিয়ার মাদ্রাসা নির্ম্মিত হইয়াছে।

অদূরে গড়ের ভিতরে মহারাজ পরশুরামের অন্তঃপুরের ভগ্নাবশেষ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মহাস্থানের নির্জ্জন গড়ে মহারাজ পরশুরামের পাদুকাচিহ্ন ধারণ করিয়া সেই ইষ্টক নির্ম্মিত সুবৃহৎ কূপ "জীয়ৎকুণ্ড" এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া মহাস্থানের অতীত গৌরবের স্মৃতি দর্শকের মনে জাগাইয়া তুলে।

দীর্ঘকালাবধি শিবলিঙ্গগুলি একত্র স্তূপীকৃত থাকিয়া এক সুবিশাল কঠিন প্রস্তর খণ্ডে পরিণত হইয়াছে। (৪)

পূর্ব্ববঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট মাননীয় শ্রীযুক্ত ফুলার সাহেব মহাস্থানে একটী সেনানিবাস নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু বহুশ্রম ও কৌশলসত্ত্বেও এই সুবিশাল প্রস্তরখণ্ডকে স্থানচ্যুত করিতে অক্ষম হইয়া সে সংকল্প পরিত্যাগ করেন।

মহাস্থানের গড় চতুর্দ্দিকে প্রায় দুই মাইল স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমানে কয়েক ঘর প্রজা গড়ের মধ্যে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া চাষ আবাদ আরম্ভ করিয়াছে। গড়ের মধ্যে অদূরে একটী ছোট মন্দির ও তাহার চতুপার্শ্বেই জল দৃষ্ট হয়। লোকে এই মন্দিরটীকে "পদ্মাদেবীর মন্দির" বা "মনসাদেবীর বাড়ী" কহে। সত্য হউক মিথ্যা হউক এই জলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বহু সর্প লক্ষিত হয়।

গড়ের নিম্নে ক্ষীণদেহা স্বল্পতোয়া করতোয়া মৃদু মন্দ গতিতে বহিয়া যাইতেছে। কূলে একটি বাঁধাঘাট ও তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটী বটবৃক্ষ আছে। লোকে ইহাকে শিলাদেবীর ঘাট কহে। করতোয়া তীরে প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে একটী নাতিবৃহৎ মেলা বসে এবং "করতোয়া স্নান" দিনে দূরদেশাগত বহু যাত্রী করতোয়ার পুণ্য সলিলে অবগাহন করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করে। নারায়ণী-যোগ উপলক্ষে শিলাদেবীর ঘাটে নানা দেশ হইতে বহু যাত্রী সমাগত হয়।

শুনিতে পাওয়া যায় যে মহারাজ মানসিংহ যখন মোগল সাম্রাজ্য বিস্তার উদ্দেশ্যে এ দেশে আগমন করিয়াছিলেন তখন তাঁহার প্রতি রজনীযোগে দৈবাদেশ হয়—এবং তিনি তদনুযায়ী করতোয়া বক্ষ হইতে শিলাদেবীর পাষাণ মূর্ত্তি উদ্ধার করিয়া জয়পুর রাজ্যে লইয়া স্থাপন করিয়াছিলেন।

মহাস্থানের নিকটে গোকুল, শিবগঞ্জ, শঙ্করপুর, কৃষ্ণপুর, বৈকুণ্ঠপুর, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি গ্রাম আছে। গ্রামগুলির নামকরণ হইতেই বুঝা যায় যে কোনও হিন্দুরাজার রাজত্বকালে গ্রামগুলির উৎপত্তি হইয়াছে।

ধার্ম্মিক রাজা পরশুরামের দানশীলতার কথা, হিন্দু মুসলমানের ভীষণ সমর ও শিলাদেবীর প্রাণ বিসর্জ্জন প্রভৃতির বিষয় মহাস্থানবাসী কৃষকগণের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়। ভক্তবীর পরশুরাম জগতে

(৩) ইহাই নমাজের স্থান। সমাধির সেবাইত ও দর্শকগণ এই স্থানে নমাজ পড়িয়া থাকেন। মসজিদটি পুরাতন হইলেও "বহু পুরাতন" বলা যায় না। ইহার দ্বারে উৎকীর্ণ শিলা লিপিতে সাহ করকথের নাম ক্ষোদিত আছে। সঃ

(৪) প্রস্তর দীর্ঘকাল একত্র থাকিলে এক হইয়া যায় এরূপ ধারণা সাধারণের হওয়া বিচিত্র নহে,—শিক্ষিত, ঐতিহাসিক সন্দর্ভ লেখকের তাহা গ্রহণীয় কি? সঃ

দান ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়া ইহজগত হইতে চির-বিদায় লাভ করিয়াছেন।

মঙ্গলময় ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তকে সবংশে নিধন করিয়া তাঁহার কোন্ ইচ্ছার পূরণ করিয়া জগতের কোন্ মঙ্গল বিধান করিয়াছেন তাহা একমাত্র তিনিই জানেন। জগতে তাঁহার লীলা কে বুঝিতে পারে ?*

শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার।

সাজা।

—ঃ*ঃ—

আমি যতই তোমায় আঘাত করি
তত‌ই ব্যথা লাগে,
আমি যতই তোমায় কাঁদাই ততই
আপন কাঁদন জাগে।
আমি যতই ভয়ে যতই লাজে
তোমার মুখে তাকাই না যে,
তোমার দৃষ্টি ততই মনের মাঝে
আমার দিঠি মাগে।

আজ্‌কে আমার এত দিনে
হঠাৎ মনে লয়,
কেমন তারে দেখ্‌তে লাগে
এমন যে নির্দ্দয়!
আমি যেই তুলেছি আমার আঁখি
আর ফেরাতে পার্‌ছি তা কি,
আমি যতই দেখি ততই হৃদয়
ডুব্‌ছে অনুরাগে।

অনুশোচনা।

-ঃ(*)ঃ—

আমার মাঝে তোমার ছায়া
প্রকাশ হ'তে চায়,
আমি ততই জোরে আঘাত করি
ততই মারি তায়।
তুমি যে গো নীরব রহ,
তুমি আমার পীড়ন সহ,
এই ব্যথা যে সহে না আর
আমার প্রাণে হায়।

নিত্য আমি এমন করে
কতই মারি মার,
তুমি যে তা শান্ত মুখে
সহেছ বারবার।
অঞ্চলে মুখ লুকাই লাজে,
মার্‌ব না আর মার্‌ব না যে,
তুমি এবার আমার মারো
কঠিন বেদনায়।

* পরশুরাম ও সাহ সোলবানের পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিক বৃত্তান্তই মহাস্থান গড়ের বিশেষত্ব, তাহা বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আলোচিত হয় নাই। লেখক ঐতিহাসিক তথ্য অপেক্ষা কিম্বদন্তীরই প্রাধান্য দিয়াছেন। কিম্বদন্তী পুরাতত্ত্বের অংশ হইলেও উহা প্রকৃষ্ট ঐতিহাসিক উপকরণ নহে—ইহা স্মরণে রাখিয়া অতি সাবধানে সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা না করিলে এরূপ প্রবন্ধে স্থায়ী ফল লাভের সম্ভাবনা কম। সঃ

বিধির নির্দ্দেশ।

চৈত্রের অপরাহ্ন ; হিমবিমুক্ত সূর্য্যের প্রখর কর ও সমস্ত দিবসের উদ্দাম বাতাসে সে গ্রামখানি ধূলি ধূসর, নিম্ব বৃক্ষে বসিয়া একটা কোকিল তাহার করুণ সুরে দিগ্‌দিগন্ত প্লাবিত করিতেছিল। কোথাও আম্রকুঞ্জে সদ্যমুকুল-মুক্ত আম্রগুটির লোভে লুব্ধ বালকদল মুখে মুখে প্রতিধ্বনি তুলিয়া পিকবধূর অলস কূজনকে ক্ষিপ্র করিয়া তুলিতেছিল, একটী পুরাতন একতালা বাটীর জীর্ণ চণ্ডীমণ্ডপের এক কোণে একটী কুক্কুরী তাহার শাবক চতুষ্টয়কে স্তন্য পান করাইতেছিল। গৃহস্বামী গুরুপ্রসাদ বাবু ঘন ঘন অন্দর বাহির করিতেছিলেন, তাঁহার কন্যা কিরণকে আজ তাহার ভাবী-শ্বশুর দেখিতে আসিবেন। কিরণ তাঁহার এখন একমাত্র সন্তান। তাঁহার অনেক কয়টী সন্তান-সন্ততি জন্মিয়াছিল, তাহার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল মাত্র কিরণ। গুরুপ্রসাদ বাবুর উপার্জ্জন পরিমাণ যাহা, তাহার উপর তাঁহার শরীর যেরূপ রুগ্ন, তাহাতে তাঁহার সঞ্চয়ের ঘরে শূন্য ; তথাপি তিনি যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া কন্যাকে সুখী করিতে দৃঢ়কল্প হইয়াছিলেন, বরপক্ষের সহিত অন্য কথাবার্ত্তা সুস্থির হইয়া গিয়াছিল, বাকী কেবল কন্যা দেখা। বরপক্ষের প্রতীক্ষায় গুরুপ্রসাদ বাবু তাই উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যথাসময়ে ভাবী বৈবাহিক রাধিকা বাবু ও তাঁহার কুটুম্বোত্তম নীলমণি বাবু আসিয়া বৈঠকখানা ঘরে উপবেশন করিলেন, মিষ্টালাপ ও যথোচিত শিষ্টাচারের পর যথারীতি জলযোগান্তে কন্যা দেখানো হইল, কন্যায় অপছন্দের কিছু ছিল না; কিরণের সুকুমার কমনীয় কোমল গঠন, তাহার উপর বুদ্ধি প্রাখর্য্যপ্রভায় বদনমণ্ডল মণ্ডিত, উজ্জ্বল চক্ষু, লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি, সুতরাং কন্যা অপছন্দ হইল না। দেনা-পাওনাও সমস্তই স্থির, বিবাহের দিন জ্যৈষ্ঠ মাসে সুস্থির হইয়া গেল। কিন্তু বিধাতার বিধান বুঝি অন্যরূপ, মেয়ে দেখার কয়েকদিন মাত্র পরেই ভগ্নস্বাস্থ্য গুরুপ্রসাদ বাবু জ্বরাক্রান্ত হইলেন। অল্প অল্প জ্বর হইলেও শরীর ক্ষীণ হইতে লাগিল ; গুরুপ্রসাদ তাহাতে দমিলেন না। তাঁহার সান্ত্বনা—কন্যাদায় হইতে গৃহিণীকে উদ্ধার করিয়া যাইতে পারিবেন! গ্রামে ভাল চিকিৎসক পাওয়া যায় না, সহর হইতে চিকিৎসক আনিতে গেলে অর্থের প্রয়োজন, স্ত্রীর হাত চাপিয়া গুরুপ্রসাদ বলিলেন "এ পুঁজী শেষ করোনা গিন্নি, মেয়েটাকে আগে পার করি, আমার যা হয় হোক"। কিন্তু স্বামীর সে রক্তশূন্য বিবর্ণমুখ দেখিয়া ব্যাকুলা গৃহিণী রাধিকাবাবুর পত্রের উত্তর লিখিবার সময়, স্বামীর নিকট অনেক মিনতি করিয়া কলিকাতা হইতে একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক আনিবার কথা লিখাইলেন। চিকিৎসক লইয়া রাধিকাবাবু সপুত্র আসিলেন, অবশ্য যথেষ্ট ভদ্রতা করিয়া রোগীর গৃহে না উঠিয়া গ্রামস্থ জনৈক আত্মীয়ের গৃহে উঠিলেন। সেখানে তাঁহার কোনও বৈষয়িক কাজ ছিল। পরদিন চিকিৎসক ও রাধিকাবাবু ও তাঁহার পুত্র মণীন্দ্র আসিয়া রুগ্ন গুরুপ্রসাদের গৃহে তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। রাধিকাবাবুকে দেখিয়া গুরুপ্রসাদ আনন্দাতিশয্যে উঠিয়া বসিলেন এবং মণীন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া ভাবী জামাতাকে কিছুক্ষণ আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর চিকিৎসক পরীক্ষা করিয়া গম্ভীর মুখে জানাইলেন যে রোগীর রোগ যক্ষ্মা ; ফুস্‌ফুসের যেরূপ অবস্থা তাহাতে তাহা বহুদিন জাত রোগ মনে হয়, এবং বর্ত্তমান অবস্থা চিকিৎসাতীত ; কথাটা আর অপ্রকাশ রহিল না। অতঃপর রাধিকাবাবু ও মণীন্দ্র কেহই গুরুপ্রসাদের কোন সংবাদ লইলেন না।

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি একদিন অনাথা বিধবাকে ও কন্যাকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া গুরুপ্রসাদের প্রাণপাখী জীর্ণ পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া নূতনের উদ্দেশে চির নূতনে মিশিয়া গেল। শ্রাদ্ধাদি সমাপনান্তে

করিয়া নিসঃহায় কপর্দ্দকহীনা বিধবা বহুদিন পরিত্যক্ত পিত্রালয়ে ভ্রাতা গিরিজানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই জামতলি গ্রামেই রাধিকারঞ্জন চক্রবর্ত্তীর বাস, সুতরাং অনতিবিলম্বে কিরণের মাতা জানিতে পারিলেন— চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন "কিরণের মা তাঁহার কন্যাকে অন্যত্র পাত্রস্থ করুন, কন্যার পিতার যক্ষা রোগ ছিল, তাঁহার কন্যাকে জ্ঞাতসারে আর তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন না।" বিধবা চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। তাঁহার স্বামীর স্থির নিশ্চয় কথাবার্ত্তায় মণীন্দ্রই যে তাঁহার কিরণের স্বামী, তাঁহার জামাতা, ইহা যেন তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা হইয়া গিয়াছিল। যাহা তাঁহার নিতান্ত নিশ্চিত বলিয়া জানা ছিল, তাহার সমস্তই যে অকস্মাৎ আকাশকুসুমে পরিণত হইয়া গেল! এ আঘাতে তিনি দমিয়া গেলেন। কিরণ তখন নিরুদ্বেগ চিত্তে বাগদীঝির মাজা বাসনগুলিতে জল ঢালিতেছিল, মাতার হাহুতাশ ও আক্ষেপ শুনিয়া দৃষ্টি স্থির করিয়া উজ্জল চক্ষে একবার মাতার মুখপানে চাহিয়া আবার তখনি দৃষ্টি নত করিয়া কাজে মন দিল। মাস কতক পরেও কিরণের মাতা যখনি শুনিতেন, মনোমত পাত্রীর অভাবে মণীন্দ্রের বিবাহ হয় নাই তখনও তাঁহার চক্ষু লুব্ধ-আশায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, অন্য পাত্র অন্বেষণের কথা তিনি ভুলিয়া যাইতেন।

(২)

বৎসর প্রায় পরিপূর্ণ হইতে চলিয়াছে, সেই সময়ে, নিদাঘের সন্ধ্যায়, সমস্ত দিনকার দারুণ পরিশ্রমের পর কিরণ সে দিন যেন কেমন অবসন্ন হইয়া, ফাটল-ধরা রোয়াকের এক কোণে বসিয়া-বসিয়াই কখন্ যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। রান্নাঘরের কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া আসিয়া ভবানী কন্যাকে তুলিয়া দিলেন, একটু স্নেহ-সরস তিরস্কার করিয়া বলিলেন "সমস্ত দিন্টা এক দণ্ড বিশ্রাম ক'রতে চাস্‌নে তাই সন্ধ্যেবেলা ঘুম আসে, পরের-বাড়ী তোকে তুলে ভাত খাওয়াবে কে ?" অদূরে মাদুর পাতিয়া একটা বালিশ লইয়া আহারান্তে গিরিজানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অর্দ্ধ শয়নাবস্থায় ধূমপান করিতেছিলেন; ভবানী ভ্রাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "তাই তো দাদা ওঁরা তো অমত ক'র্‌লেন, কিন্তু একটা কিছু ঠিক্ করাও তো চাই, কি জানি কবে আছি কবে নেই।" গভীর মনোযোগ দিয়া হুঁকাতে সজোরে দম দিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন "হুঁ তাই তো।" ভবানী অন্যমনে মৃদু স্বরে বলিলেন "তাই তো, তিনি তো ওই মণীর ভরসায় নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, আমিও ছিলাম কিন্তু শেষটায়—" "শেষটায় ? তা ছাড়া তাঁরা যে পাওনার কথা ব'লেছিলেন তাই বা এখন আমরা দেব কোথা থেকে ? এদিকে আমার লীলাও বড় হয়ে উঠেছে।" ভবানী সস্নেহে কাতর দৃষ্টিতে কিরণের মুখপানে চাহিলেন, একটী দীর্ঘশ্বাস বুক ভেদ করিয়া বাহির হইল, মায়ের সে নিঃশ্বাস কিরণের মনের ভিতর জমিয়া গেল। রাত্রে মায়ের ক্রোড়ে শুইয়া মনে পড়িয়া গেল তাহার সেই অতলস্পর্শী স্নেহসাগর বাবাকে। আরও মনে পড়িল তিনি মৃত্যুশয্যায় তাহাকে কেবলি রাধিকা বাবুর ঘর করনার কাজ কি ভাবে করিতে হইবে তাহাই উপদেশ দিতেন। স্বর্গগত পিতার মুখ মনে করিয়া কিরণ বিগলিত হৃদয়ে বালিশে মুখ গুঁজিল।

কালীঘাট দর্শন ও গঙ্গাস্নানের পুণ্যলাভ আকাঙ্ক্ষায় ভবানী তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র অমৃতলালের কলিকাতার বাসায় আসিয়া উঠিলেন। অতি প্রত্যুষে কন্যা লইয়া সমস্ত দিন হেমন্তের প্রখর রৌদ্রে ঘুরিয়া তিনি সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিলেন. বালিকার মুখখানি শ্রান্তিতে ও রৌদ্রতাপে আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ম্লান জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোকে মুক্ত ছাদে কিরণ ও ভবানী বসিয়াছিলেন, জুতার মস্ মস্ শব্দ করিয়া, পাশ দিয়া, অমৃতলালের পুত্র ললিত ও তাহার বন্ধু চলিয়া যাইতেছিল, সহসা ললিত থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "এখানে কে ? ছোট পিসিমা নাকি ?" "হ্যাঁ বাবা, তা উটি কে ?" "ও এই পাশের বাড়ীর ছেলে ওর নাম মণী।" "মণী ?"

সজোরে শ্বাস গ্রহণ করিয়া ভবানী কি বলিতেছিলেন, কিরণ নিতান্ত সঙ্কোচে মাতার পিঠ ঘেঁসিয়া বসিল, মন হইতে সজোরে কি যেন ঝাড়িয়া ফেলিয়া ভবানী বলিলেন "রাধিকাবাবুর"--অসম্পূর্ণ থাকিতেই ললিত জোর দিয়া বলিল "ওঃ তুমি তো চেন দেখ্‌চি।" সহসা মণীন্দ্রের সবল আকর্ষণে সে চলিয়া গেল। কক্ষান্তরে মণীন্দ্র বলিল "উনি আমায় কি ক'রে চিন্‌লেন? আমি তো চিন্‌লাম না।" ললিত হাসিতে হাসিতে বলিল "তুমি যে সেই দেশেরই লোক!" "উনি কি গ্রামে থাকেন?" "সম্প্রতি স্বামী মারা গিয়ে অবধি"—"স্বামীর নাম জান্‌লে কি ওকে চিন্‌তে পার্‌বো?" "ওঁর স্বামীর নাম ছিল গুরুপ্রসাদ বাবু।"

চকিতে মণীন্দ্রের মুখাকৃতি পরিবর্ত্তন হইলেও প্রসঙ্গান্তরে ব্যাপৃত ছিল বলিয়া ললিত তাহা লক্ষ্য করিল না। সময়ান্তরে ভবানীর নিকট সমস্তই শুনিয়া ললিত বলিল "ও! তাই তুমি ওকে চিন্‌তে পেরেছিলে, আমি ভাব্‌ছিলাম এতকাল বিদেশে থেকে তুমি কেমন ক'রে ওকে চিন্‌লে—" ভবানী ক্ষুন্ন স্বরে বলিলেন "আর চিনেই বা কি হবে!"

পরদিন কলেজ প্রত্যাগত ললিত বসিয়া জলযোগ করিতেছিল, বাহির অন্দরের মাঝামাঝি সুসজ্জিত কক্ষে টেবিলের উপরকার টেবিলক্লথ হইতে ললিতের চঞ্চল হস্তের নিক্ষিপ্ত মসীচিহ্ন, সিক্তবস্ত্রখণ্ড দিয়া ঘুছিয়া মুছিয়া কিরণ সাফ করিতেছিল, পশ্চিম দিক্‌কার মুক্তদ্বার পথে পর্য্যাপ্ত সূর্য্যকিরণ তাহার আনত মুখখানির উপর এক ঝলক আলোক ঢালিয়া দিয়াছিল। পূর্ব্বদ্বারে কণ্ঠস্বর শুনা গেল "ললিত!" সচকিতে কিরণ সোজা হইয়া দাঁড়াইল; গুচ্ছ গুচ্ছ চুলগুলা সামনে পিছনে অবিন্যস্ত ভাবে আসিয়া পড়িল, হাত দুখানি কালীমাখা সে বিব্রত হইয়া পড়িল, যে আসিয়াছিল সেও সসঙ্কোচে নতমুখে পশ্চাতে হটিল, ললিত সহাস্যে উচ্চকণ্ঠে ডাকিল "মণী নাকি?" কিরণ কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল। ললিত গমনোদ্যত মণীকে ফিরাইয়া বলিল "তারপর! চুরি ক'র্‌তে এসেছিলি কি? পালাচ্ছিলি যে?" একটু লজ্জিত হইয়া মণী বলিল "তোকে দেখ্‌তে পেলাম না।" "তাই ফির্‌ছিলি?" "ডাক্‌লাম তোকে, তারপর ঘরে কে ছিলেন, কাজেই ফির্‌ছিলাম"—ললিত একটু থামিয়া বলিল "ঘরে ছিল আমার বোন্—ছোট পিশিমার মেয়ে, আমরা ভাব্‌তাম যে ও এখনও ছোট আছে।" মণী নিস্তব্ধে ছিল, সহসা ললিত বলিল "দ্যাখ্ ভাই পিশেমশায় মারা যাবার আগে ডাক্তার নাকি বলেছিল তাঁর থাইসিস্ হয়েছিল, তা এই জন্যে কি ওই মেয়েটাকে কেউ বিয়ে ক'র্‌বে না? ওর অভিভাবক তো ঐ মা, উনি যদি না থাকেন তখন কি হবে ওর?" মণীন্দ্র অত্যন্ত মৃদু স্বরে বলিল "আর কেউ নেই বুঝি?" "নাঃ কিন্তু এর একটা উপায় করা দরকার, বের উপযুক্ত বয়স হয়ে গেছে"—মণীন্দ্রের মনে তখন ঘুরিয়া ফিরিয়া অস্তালোক দীপ্ত লোহিতাভ কোমল মুখখানি ও তার শোভন সুন্দর আয়ত চক্ষু দুটি ভাসিয়া উঠিয়া তার উপর সহানুভূতি জাগাইতেছিল—"আহা!" ললিত আবার বলিল "আর লোকে চারে তো টাকা, তাই বা কোথায়?" মণীন্দ্র একটু সচেতন হইয়া বলিল "ভাবী বংশের শুভাশুভ ভাবাও তো খুব উচিত।" "ছাই ভাবা! আমাদের ক্লাশের নলিনী না ব'ল্‌তো সে এই রকম বিয়ে ক'র্‌তে পারে? তার অভিভাবক কেউ নেই যে বাধা" যেন একটা কূল পাইয়া মণীন্দ্র বলিল "তা সে নিশ্চয় ক'র্‌তে পারে আর বিনা পয়সায়ও—সে ইচ্ছে বা বল তার আছে।" ললিত মনে করিয়াছিল একটু অনুরোধ করিয়া মণীন্দ্রকেই সম্মত করাইবে কিন্তু নলিনী সম্বন্ধে আশা পাইয়া সে নিশ্চিন্ত হইল।

একাদশীর দিন ভবানী শুইয়া ছিলেন কিরণ তাঁহাকে বাতাস করিতেছিল, অমৃতলাল ও ললিত উভয়ে আসিয়া বসিল। অমৃতলাল বলিলেন "ছোটদি আজ খোকাকে যে ডাক্তার দেখ্‌তে এসেছিল তারে

দেখেছ ?” ভবানী একটু কৌতুহল ব্যঞ্জক কণ্ঠে বলিলেন “হ্যাঁ বেশ্ ছেলেটী।” “সে কিরণকে বিয়ে ক'রতে পারে পয়সা নেবে না, দেবে ?” “আমি আবার দেবো কিনা তাই বোল্‌ছ ? আমি যে কন্যাদায়ে পড়েছি—” “তোমার মত আছে, তাকে জানাবো তবে ?” ভবানী অতি আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন অমৃতলালকে অজস্র আশীর্ব্বাদ করিয়া নিজের মত সানন্দে জ্ঞাপন করিলেন। কিরণ নতমুখে ভাবিতেছিল “কি পরনির্ভর এই নারীজাতি! একজন ঘৃণা সহকারে প্রত্যাখ্যান করিবে, অপরে আবার অসীম অনুগ্রহ দেখাইয়া তাহা গ্রহণ করিবে, ইচ্ছা হয় তো আবার বিমুখ হইবে, কি কাজ এই অনুগ্রহ গ্রহণে! যখন পিতার মৃত্যু শয্যায় তাহাকে বুঝান হইয়াছিল রাধিকাবাবু তোমার শ্বশুর, এবং তাহার পিতা বুঝিয়াছিলেন মণীন্দ্র তাঁহার জামাতা তখন সে তাহাই বুঝিয়াছিল, আজ আবার এ কৃতার্থ করা কেন ? ক্ষণেক চিন্তার পরই সে স্থির অচঞ্চল ভাবে আবার পাখা তুলিয়া লইল। ললিত কিরণকে রহস্য করিয়া বলিল “আমি তোর ঘটকালি ক'রলাম, আমায় ধন্যবাদ দেওয়া উচিত তোর।” নিতান্ত মলিন মুখে কিরণ জড়িত স্বরে বলিল “হ্যাঁ কাজেই—পৃথিবী শুদ্ধ আমার বরই যোগাড় করো তোমরা।” নিতান্ত বিস্ময়ে ললিত বলিল “কি রকম! তোর পছন্দ হ'ল না, তা হ'লে, যাই পিশিমাকে ব'লে আসি।” অত্যধিক চঞ্চল হইয়া কিরণ বলিল “না না দাদা শোন, মাকে আবার কি ব'লতে যাবে, তিনি কেঁদে ফেল্‌বেন।” উদ্যতচরণ থামাইয়া ললিত বলিল “তবে তুই কি বলিস্ ?” “আমি! আমি চাইনে যে আমার জন্যে এ অনুগ্রহ তোমরা গ্রহণ কর, আমাদের আর এতে কোনও দরকার নেই”—“বেশ, আবার পাত্র পাব কোথা ?” “দরকার কি ? সেজ মামাদের বিনুদি তো ওম্‌নি আছেন।” “দূর পাগ্‌লী সে যে বিধবা।” “তা হোক্ আমি এমনিই থাক্‌বো।” “তবে এ বে'তে তোর ইচ্ছে নেই ?” সবেগে মস্তক আন্দোলন করিয়া সে জানাইল—“কিচ্ছু না।”

(৩)

গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া ভবানী মেয়ে লইয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিলেন, কিরণের সৌভাগ্য ক্রমে কুলের অমিলের দোহাই দিয়া ললিত সে বিবাহ স্থগিত রাখিয়াছিল, কিন্তু গ্রামের ইতর ভদ্র সকলেই অতি বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া বলিত “মেয়ে যে ধাড়ী মাগী হ'য়ে উঠেছে বিয়ে দেবে নাকি ?” তাহার নিজের সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের মতবাদ দেখিয়া শুনিয়া কিরণও যেন দিন দিন কেমন অধিকতর গাম্ভীর্য্যের আশ্রয় লইতেছিল; আত্মীয় কুটুম্বের দৃষ্টি হইতে যতটা সম্ভব প্রচ্ছন্ন থাকিয়াই চলিতে সে চেষ্টা করিত।

দুঃখে কষ্টে, কাল চক্রের আর এক আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই মামাতো বোন্ লীলার বিবাহ উপলক্ষে কিরণ ও তাহার মা কলিকাতা আসিলেন, গিরিজানন্দ, ভ্রাতা অমৃতলালের বাসা হইতে কন্যার বিবাহ দিলেন। তথায় শুনিলেন পাশের বাড়ীতে রাধিকা বাবু পীড়িত; এক দ্বিপ্রহরে আহারান্তে ভবানী ও কিরণের মামী কিরণকে লইয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। রাধিকা বাবু বিপত্নীক, গৃহে ভ্রাতুষ্পুত্রী আর মণীন্দ্র। সেবা-পরায়ণ ললিত বন্ধুর পিতার সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। সে কিরণকে দেখিয়া, তাহাকে রোগ-শয্যা পার্শ্বে আহ্বান করিল। ললিত জানিত কিরণ শুশ্রূষায় কিরূপ সিদ্ধহস্ত।

কিরণ উঠিয়া গিয়া দ্বার প্রান্তে দাঁড়াইল। খাটের উপর রাধিকাবাবু মুদ্রিত চক্ষে শায়িত, কক্ষ মধ্যে একটী ভৃত্য ও ললিত ব্যতীত আর কেহ নাই, কিরণ লঘুপদক্ষেপে রোগীর শিয়রে বসিল, পার্শ্ব কক্ষে মণীন্দ্র ও তাহার কনিষ্ঠভ্রাতা সত্য উভয়ে কি একটা কাজ করিতেছিল। কিরণ নীরবে উঠিয়া টেবিলের বিশৃঙ্খল কাগজ পত্র ঔষধ, চামচ, গ্লাস ইত্যাদি গুছাইয়া ললিতের হাত হইতে ছোট পাখাখানি লইয়া রোগীর মাথায় ব্যজন

করিতে লাগিল। কি একটা ঔষধ দিবার সময় মণীন্দ্র আসিয়া সহসা কিরণকে দেখিয়া স্বভাব সঙ্কোচে একটু থমকিয়া দাঁড়াইল, তারপর ঔষধটা ঢালিয়া শয্যার নিকটস্থ হইল। কিরণের বাহ্যিক-চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল না, সে অত্যন্ত নিপুণতার সহিত এক হস্তে অতি সাবধানে প্রৌঢ়ের মস্তক বেষ্টন করিয়া চিবুক ধরিল, একটু নিজকে সামলাইয়া অপর হস্তে মণীন্দ্রের হাত হইতে ঔষধ লইয়া গ্লাসটা তাঁহার ওষ্ঠে স্পর্শ করাইল। ললিত একটু জোরে বলিল "ওষুদটা খেয়ে ফেলুন।" মুদ্রিত নেত্রেরই ঔষধটা গিলিয়া ফেলিয়া রাধিকা বাবু আবার তেমনি ভাবে শুইয়া পাশ ফিরিলেন। কিরণ সযত্নে মাথায় হাত বুলাইতেছিল ললিত সপ্রশংস প্রীতি নেত্রে কিরণের নিয়োজিত-কর্ম্ম-নিপুণতা দেখিতেছিল। মনীন্দ্র ও ললিতের নিকটে একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। কয় দিন হইতেই ললিত রোগীর শুশ্রূষার ভার লইয়াছিল, কিন্তু রোগীর রোগ যন্ত্রণার ভিতর এতটুকু শান্তি পাইতে দেখিলে শুশ্রূষাকারীর যে তৃপ্তি হয় তাহা বর্ণনাতীত, কিরণের সেবাতে হয় তো রাধিকা বাবু একটু স্বস্তি পাইতে পারিবেন তাই ললিত আগ্রহ করিয়া কিরণের উপর শুশ্রূষার ভার অর্পণ করিল, মণীন্দ্র বাধা দিল "কেন আর ওঁকে কষ্ট দাও, বেশ তো চল্‌ছিল, ওঁর মা কি মনে কর্‌বেন?" "কিছুই মনে কর্‌বেন না, দেখ্‌তে পাচ্চো, রোগী কথা না বলেই নিজের দরকার মত সবটুকু পেলেই আরাম বোধ করেন; ও বেশ্ যত্ন কর্‌তে পার্‌ছে তাই তো রাখ্‌লাম।" "তা ব'লে—হ্যাঁ—না ভাই এ আমিই পার্‌বো" "তুমি! তুমি যে ভীতু রোগী জোরে নিঃশ্বাস ফেল্‌তে দেখ্‌লেও ভয় পাও"। "তা হোক"। "আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে বেশী বকিস্‌নে"।

নিশাবসানে কিরণ আবার রোগী শুশ্রূষার জন্য উপস্থিত হইল; ললিত তাহাকে লইয়া আসিয়াছে।

কিরণ ষ্টোভ জ্বালিয়া তাহাতে জল বসাইয়া দিল, সত্য বলিল "জল কি হবে?" মৃদু অথচ অপরিষ্কার কণ্ঠে কিরণ বলিল "মুখ ধোয়াতে লাগ্‌বে"। নিদ্রা ভঙ্গে রাধিকাবাবু কিরণকে দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়ে বলিলেন "তোমায় তো চিন্‌লাম না মা", কিরণ নতমুখে কাজ করিতেছিল। মণীন্দ্র ও সত্য পিতার মশারি তুলিতেছিল পিতার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখিয়া সত্য বলিল "ও ললিতদার বোন্—সেই গুরুপ্রসাদবাবুর মেয়ে।" "ওঃ" রাধিকাবাবুর মুখ মলিন হইয়া গেল। কিরণের অক্লান্ত ক্রটীহীন সেবা ক্রমশঃ রাধিকাবাবুর অসহ্য হইতেছিল,—না এ যে অপরিহার্য্য স্তূপীকৃত ঋণ কিন্তু সামান্য রূপ অসুবিধাও যখন কিরণ ব্যতীত আর কেহ তেমন ভাবে মোচন করিতে পারিত না অন্য কাহারও সেবা তাঁহার পছন্দ হইত না, তখন একরূপ নিচেষ্ট হইয়াও কিরণের সেবা গ্রহণ করিতেন, কিরণ যে অস্থায়ী তাহা মনে করিতেও রাধিকাবাবু ভয় পাইতেন। সে দিন ভবানীর গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তনের দিন, উপায়ন্তর ছিল না! কিন্তু কিরণের ইচ্ছা, তাহার এই সযত্ন সেবার-সার্থক-স্বরূপ রাধিকাবাবুর আরোগ্য দেখিয়া যায়, কিন্তু মা ও মামারা সে ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দিবেন কিনা কে জানে? মণীন্দ্র রাত্রে জাগিয়া ভোরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। "ললিতদা"—সহসা কিরণের আহ্বানে ললিত না জাগিয়া মণীন্দ্র জাগিয়া উঠিল, রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতালোকে ঘরখানি প্লাবিত, অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে, কিরণ নতমুখে বলিল "এখানে একজন থাক্‌তে হবে; আমি যাচ্ছি।" কি একটা উত্তর দিতে গিয়া মণীন্দ্র দেখিল কিরণ চলিয়া গিয়াছে। অকস্মাৎ মাতৃক্রোড়চ্যুত শিশুর মত রাধিকাবাবু জাগিয়াই ডাকিলেন "মা"! মণীন্দ্র মুখ ধুইবার জল দিলে তিনি বলিলেন "সে?" "চ'লে গেছে বাবা"। "কেন?" "তাঁরা সবাই আজ বাড়ী যাচ্ছেন" রাধিকাবাবু অন্যমনস্কভাবে কি ভাবিতেছিলেন ললিতকে দেখিয়া বলিলেন "ওরা আজ বাড়ী গেলেন বুঝি?" "আজ্ঞা হ্যাঁ" "আর দুদিন থেকে গেলেই হ'ত।" কথাটা বলিয়াই রাধিকাবাবু অপ্রস্তুত হইলেন। 'কেন দুদিনে কি হইবে তাঁহার জন্যই কি?' তারপর বলিলেন "খাসা মেয়েটী, কাছে থাক্‌লে স্বস্তি পাওয়া যায়।"

ললিত বলিল "তা তাকে রাখুন না আপনার কাছে, সে কৃতার্থ হবে।" কথাটা বলিয়া ললিত সহাস্যে মণীন্দ্রের দিকে কটাক্ষ করিল, রাধিকাবাবু মুখ ফিরাইয়া নিতান্ত মৃদু স্বরে বলিলেন "হুঁ।" মনে হইতেছিল বুঝি সেই জন্যেই এত! বেলা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে, ললিত কলেজে গিয়াছে, মণীন্দ্র অস্নাত, অভুক্ত হইয়া পিতাকে লইয়া বসিয়াছিল, উঠি উঠি করিয়াও একাকী রোগী রাখিয়া কিংবা ভৃত্যের উপর নির্ভর করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। নিতান্ত বিমনা হইয়া বসিয়াছিল, সহসা মস্তকের নিকট পালঙ্কের পাশে মৃদুশ্বাস-উষ্ণতা অনুভব করিয়া ফিরিয়া দেখিল, কিরণ! অত্যন্ত আনন্দিত ও বিস্মিত হইয়া বলিল "যাওয়া হয়নি? অত্যন্ত সংক্ষেপে কিরণ বলিল "না।" মণীন্দ্র খাট ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইল, তাহার মুখপানে চাহিয়া কিরণ বলিল "খান নি? খেয়ে আসুন, যান্" অত্যন্ত মৃদু হাসিয়া মণীন্দ্র কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল। বৈকালে জ্বরটা বৃদ্ধি হওয়ায় রাধিকাবাবু ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন, কিরণ ব্যাকুলভাবে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যখন যে ভাবে একটু শান্তি দেওয়া যায় তাহাই করিতেছিল। মণীন্দ্র, সত্য, ললিত সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল, রাধিকাবাবু কিরণকে দেখিয়া বলিলেন "তুমি যাও নি মা।" কিরণ বলিল "না আপনি সার্‌লে যাব।" কিরণ ভাবিতেছিল যদি বাক্যালাপে কষ্ট অনুভব কম করেন, তাই সোৎসাহে বলিল "মাও যান্ নি, আপনাকে এ রকম দেখে যেতে ইচ্ছে ক'রল না।" রাধিকাবাবু ললিতের দিকে চাহিয়া বলিলেন "হ্যাঁ ললিত, আমি চিরদিন একে কাছে রাখ্‌তে রাজি—তুমি বলো এর মাকে।" কিরণ কাল ও পাত্র দেখিয়া সব ভুলিয়াছিল, এ কথায় তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্ত হইয়া উঠিল। রাধিকাবাবু আর একটু থামিয়া বলিলেন "তাই, তাই, যা হচ্ছিল, আমার সাধ্য কি যে ভবিতব্য লঙ্ঘন করি।" কিরণ বিবর্ণ হইয়া গেল, প্রভাতে মায়ের সহিত বেশ একটু বচসা হইয়া গিয়াছে, বৃদ্ধ যদি অনুমান করিয়া থাকেন যে ইহাই তাহাদের অভিপ্রেত, ছি ছি আবার অনুগ্রহ! সে চাহে না এ অনুগ্রহ; তাহার পিতা চাহিয়াছিলেন কিন্তু সে তো চুক্তিমত অর্থ বিনিময়ে। দুর্নিবার লজ্জার ক্ষোভে সে ঘরের কোণে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল, সে নিজের স্বভাব বশতঃই রোগের সেবা করিয়াছে, কিছুর লোভে নহে, কি করিয়া সে কথা জানাইবে? সে অনুগ্রহপ্রার্থীনী নহে! রাধিকাবাবু বলিলেন "ব্যস্, কই মা—নাও তোমার এই ছেলেটীকে, এবার সব নিশ্চিন্ত।" ললিত বলিল "পিশিমাকে ব'ল্‌বো?" নিজের অজ্ঞাতে বিহ্বল ভাবে কিরণ দৃঢ়স্বরে বলিল "না।" "না! কি না? মাকে জানাব না?" "না" বলিয়া লজ্জিত অথচ বেশ্ লঘু হৃদয়ে সে আবার রাধিকাবাবুর মস্তকটী ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বলিল "মাথাটা ব্যাথা কর্‌ছে স্থির হ'য়ে থাকুন একটু টিপে দেই"—

(৪)

মাসখানেক কাটিয়া গিয়াছে, ললিত পরীক্ষার ব্যস্ততায় কিরণের মাকে দেশে রাখিয়া আসিতে পারে নাই, তাই তাহারা আজও কলিকাতায় আছে, রাধিকাবাবু অনেকটা আরোগ্য হইয়াছেন। চৈত্রের সন্ধ্যায় মৃদু জ্যোৎস্না-স্নিগ্ধ কক্ষের জানালায় কিরণ চুপ করিয়া বাহির দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল, নিম্নে মাধবীলতায় স্তবকে স্তবকে অগণ্য শ্বেত রক্তকুসুম দুলিতেছিল বাতায়ন সন্নিকটস্থ বাতাবী লেবুর পুষ্পাচ্ছাদিত গাছ হইতে মাদকতাময় সুমিষ্ট সুবাস আসিতেছিল। কক্ষের অপর প্রান্তে ভবানী বসিয়া মালা করিতেছিলেন, কক্ষটী অন্ধকার, কেবল মাত্র মৃদু অস্পষ্ট জ্যোৎস্না, জানালা পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। ললিত ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল "আঃ ঘরটা অন্ধকার, এতে আলো আনিস্ নি কেন?" তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল মণীন্দ্র। কিরণ মুখ না ফিরাইয়া বলিল "মায়ের চোখে লাগে ব'লে সরিয়ে রেখেছি।" "বেশ ক'রেছিস্, তোকে ওবাসার কর্ত্তা যেতে ব'লেছেন" মস্তক আন্দোলন করিয়া কিরণ বলিল "কেন? শুধু শুধু ওখানে কেন যাবো আমি?" ললিত কিরণের কথায় উত্তর না দিয়াই ভবানীকে জানাইল যে রাধিকা বাবু তাহাকে যাহা যাহা বলিতে বলিয়াছেন এবং সে দিন কিরণ যাহা বলিয়াছিল; অৰ্দ্ধ-সমাপ্ত

কথাতেই কিরণ সহসা জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল "ছোট বেলায় যা করে তা বাপ মায়েই ক'রে দিয়ে থাকে, কিন্তু আমি যদি এখন বলি আমি কারু অনুগ্রহ চাইনে তাতে তোমাদের কি ?" ললিত ও ভবানী ব্যস্ত বিব্রত, এবং নিতান্তই বিস্মিত হইয়া বলিলেন "না তিনি তো আর দয়া দেখাতে নিচ্ছেন না তিনি তো চেয়ে নিচ্চেন।" কিরণ বলিল "কেন ? দয়া নয় তো কি বলে একে ? তখন যে কারণে বিয়ে বন্ধ হ'য়েছিল এখনো তো তা আছে; আর বাবার যে অসুখ করেছিল সেই অসুখ যদি আর কারো হয় তার মেয়ে বিয়ে ক'রতে পারো তুমি ?" ললিত উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল "নিশ্চয় ! খুব পারি", কণ্ঠের উগ্রতা কমাইয়া কিরণ বলিল "খুব পারো, একি বাহাদুরী ? এতো দারুণ অনুচিত যে মেয়ে জেনে শুনে একটা বংশে এ বিষ দ্যায় তারও মহাপাপ।" তাহাকে থামাইবার অভিপ্রায়ে ভবানী বলিলেন "বড্ড অন্ধকার কিরণ, আলোটা নিয়ে আয়।" কিরণ যখন লণ্ঠন লইয়া ফিরিল তখন আলোক-রশ্মি পড়িল সর্ব্বপ্রথম মণীন্দ্রের উপর। এতক্ষণ কেহই তথায় তাহার অস্তিত্ব অনুভব করে নাই, কিন্তু কোনও সঙ্কোচ না করিয়া যেন তাহাকে দেখিতেই পায় নাই এম্‌নি ভাবে পাশ কাটাইয়া কিরণ চলিয়া গেল।

দিন দুই পরে কিরণ ও ভবানীর দেশে ফিরিবার দিন। ভবানী উপরে ভ্রাতৃবধূর সহিত কথা বলিতেছিলেন, কিরণ মামাকে বিদায় প্রণাম করিবার জন্য বাহিরে যাইতেছিল, তাহার গতি রোধ করিল মণীন্দ্র, সে কখনোই অনাবশ্যক কোন কথা কিরণকে বলিতনা, কিন্তু সে দিন স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল "তোমরা আজ যাচ্চো বুঝি ?" কিরণ মস্তক হেলাইল। একটু ঢোক গিলিয়া মণীন্দ্র বলিল "তুমি তোমার সম্বন্ধে ভুল করেছ, আমার বাবা তো তোমায় অনুগ্রহ ক'তে চান্‌নি বরং তোমারি অনুগ্রহ চেয়েছিলেন, তুমি তোমার মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখ্‌তে পারো, কিন্তু বাবা তোমায় ভালবেসেছেন তাই"—কিরণ সমস্ত কথা না শুনিয়াই নত মুখে ধীর পদে অমৃতলালের শয়নকক্ষাভিমুখে চলিয়া গেল। কোন কথা যে তাহার কানে গিয়াছে, বলিয়া মনে হইল না।

পল্লীগ্রামে সমাজের সমস্ত খুঁটীনাটীতে উপ প্রয়োগ ব্যবস্থা। বিচার বিবেচনার ধারা সেখানে কেহ ধারে না। কিরণকে ভবানী লইয়া গ্রামে গিয়া বড় বিপদে পড়িলেন। কি করিয়া কন্যার বিবাহ হইবে তাহার কূল কিনারা নাই; কিন্তু কোন ও আত্মীয় প্রতিবেশী দেখিলেই ভয় হয়—এরকমে আর কয় দিন কাটিবে ? কিরণও যেন দিন দিন অধিকতর দৃঢ়তায় এইগুলিই অঙ্গশোভা করিয়া লইতেছিল। ভবানী জানিতেন--কিরণ নিজেই নিজের বিবাহের প্রতিকূলে। কিরণ শুধু মর্ম্মাহত হইত মায়ের জন্য, মা তাহার তাহারি চিন্তায় অকারণ কষ্ট পাইতেছেন এবং এই দেশকালে কন্যাসন্তানের ঐ এক উপায় ভিন্ন যে অনন্যগতি। যাক্ মায়ের এ স্নেহবেষ্টনইবা আর কতদিন ? কিন্তু তারপর? একদিন সে কতকটা আভাস পাইল যে ভবানী কন্যাকে লুকাইয়া গিরিজানন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া আগামী বৈশাখ মাসে তাহার বিবাহ স্থির করিয়াছেন। কিরণ নীরব রাহল আর কোন আপত্তি সে করিবে না, কেন ? মায়ের অগণ্য যন্ত্রণাময় চিন্তাভার-ক্লিষ্ট হৃদয়ে সে একটু তৃপ্তির ছায়াপাত দেখিতে পায়—কি জন্য তাহা মুছিয়া দিবে ? কোন্ প্রাণে মায়ের কর্ত্তৃত্ব কাড়িয়া তাঁহাকে কষ্ট দিবে ? থাক্ যা হয় হউক, কিন্তু বিবাহ এই পর্য্যন্ত ! সে নিজের কর্ত্তব্যকে স্নেহের নিকট, মায়ার নিকট পরাজয় হইতে দিবে না।

" কিন্তু হায় ! কিছুই করিতে হইল না ! চৈত্রের শেষ ভাগে একটা একাদশীর পর পারণ করিয়া বার তিন ভেদ বমিতে ভবানী কন্যাকে বুকে লইয়া মর্ম্মভেদী কাতর দৃষ্টিতে অতলস্পর্শী মমতা ঢালিয়া মৌন আশীর্ব্বাদ করিয়া চক্ষু মুদিলেন। সন্ধ্যার রক্তিমচ্ছটা বিভাসিত অগ্নিময় আকাশের অসীম ক্রোড়ে ভবানীর চিতাগ্নি জ্বলিয়া জ্বলিয়া অস্তমান সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই নিভিয়া গেল। স্নানান্তে গিরিজানন্দের সহিত কিরণ ঘাটে উঠিয়া দাঁড়াইল। বিশ্বজগতে এক দিশাহারা শূন্যতায় তাহার অন্তর বাহির তখন মূহ্যমান।—বন্ধন শেষ !

ভগ্ন শরীরে কাশীবাস আকাঙ্ক্ষা করিয়া রাধিকাবাবু মণীন্দ্রের বিবাহ দিলেন। কিরণ শুনিল; কি জানি কেন পরম আশ্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বাঁচিল। কিন্তু তাহার মাতৃহারা স্নেহহারা হৃদয় সে বাড়ীতে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। গিরিজানন্দের স্ত্রীও বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিতেন "এমন অলুক্ষুণে মেয়ে যে সেবার বিয়ের গন্ধ উঠ্‌তে বাপ্‌কে খেলে এবার ঠিক্ সেই রকম মাকে খেলে।" অবিচল গাম্ভীর্য্যে মাতার অঞ্চল অন্তরালে সে এতদিন সব সহিয়াছিল, তাহার বিক্ষিপ্ত চিত্ত এবার একটু শান্তির জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাই ললিতও অমৃতলালের নিকট পত্র লিখিয়া সে কলিকাতায় আসিল। মণীন্দ্রের নব পরিণীতা বধূ, সত্য ও মণীন্দ্রকে বাড়ী রাখিয়া রাধিকাবাবু কাশী যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন। প্রণতা কিরণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি যে তাহার মাতৃবিয়োগ সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন তাহা জানাইলেন। কাশী যাত্রার সঙ্গী কেবল তাঁহার বৃদ্ধা পাচিকা; সে নিতান্ত অনুরোধ করিয়াছে, কর্ত্তা সঙ্গে লইলে তাহার চাকরি, আশ্রয়, এবং কাশীবাস সবই হইবে তাই সে যাইবে। কিরণ নতমুখে বলিল "আমায় নিয়ে চলুন আমি একাই অনেক কাজ পার্‌বো।" "তোমায়? মা তোমায় তো নিতে চেয়েছিলাম, মা তুমি যে বিমুখ হ'লে!" "না আমায় নিয়ে চলুন, আমি বেঁচে যাই তা হ'লে।" "না মা তা কি হয়? তোমার বড়মামা রাগ কর্‌বেন, কুমারী মেয়ে তুমি শুধু শুধু নিঃসম্পর্কীয় লোকের সঙ্গে কাশীবাস ক'র্‌তে তিনি দেবেন কেন? আর তুমিই বা কাশীবাস ক'র্‌বে কেন?" কিরণ বড় মিনতি করিয়া ধরিল, তাহার অশ্রুভরা বড় বড় চক্ষু দুটি রাধিকাবাবুও অমৃতলালকে টলাইল। গিরিজানন্দ অমৃতলালকে লিখিয়াছিলেন "যদি পাত্র পাও তো মেয়েটার গতি ক'রে দিও।" কিন্তু গতির পূর্ব্বেই কিরণ বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। রাধিকাবাবু একদিন অকস্মাৎ মণীন্দ্রকে নিভৃতে আহ্বান করিয়া আনিলেন। সমস্ত ঠিক্ হইয়াগেল। সম্প্রদাতা অমৃতলাল বিনা আড়ম্বরে কিরণকে মণীন্দ্রের হস্তে যথারীতি উৎসর্গ করিয়া দিলেন। শিক্ষিতের এক স্ত্রী বর্ত্তমানে দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ! মণীন্দ্র নিতান্ত ক্ষুব্ধ বিরক্ত হইয়া শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানগুলি শেষ করিল। কুশণ্ডিকা সমাপ্তে, গম্ভীর নিশ্চেষ্ট মণীন্দ্রের পদতলে মস্তক স্থাপন করিয়া যুগ্মকরে কিরণ বলিল "ক্ষমা করো, আজই শেষ – মনে কোন ক্ষোভ রেখো না, আজ বিদায় নিচ্চি, কেবল মাত্র সামাজিক বিধির জন্য তোমার হাতের একটী দাগ আমি নিয়ে যাচ্ছি, এ ছিল আমার বিধির নির্দ্দেশ; আমার সংকল্প স্থিরই আছে আমা হ'তে কোনও সংসারে কোনও অকল্যাণ প্রবেশ না করে, এই জন্যে সে দিন বাবার যে অনুগ্রহ আজ মাথায় তুলে নিলাম—তা গ্রহণ করি নি; কি? কথা ক'চ্চো না যে? মণীন্দ্র নিশ্চল নির্ব্বাক হইয়াছিল পিতার গমনকালের অনুরোধ, বিশেষতঃ অকস্মাৎ ভাবনা চিন্তার অবসর না দিয়াই তাহার অনিচ্ছায় তাহার চিরদিনকার ঘৃণিত একাধিক বিবাহ তাহার দ্বারা হইয়া গেল! তাহার নব বধূর মুখখানি মনে করিয়া মনে মনে বলিতেছিল 'আহা সে কিছুই জানে না!' কিরণের প্রশ্নে সে কেবল নিদারুণ উত্তেজনায় বলিল "অন্যায়—এ দারুণ অন্যায়" বেদনাহত চিত্তে কিরণ বলিল "হ্যাঁ কিন্তু শুধু বাবা আর মামা তোমায় এ কষ্ট দিলেন, কিন্তু বল তুমি রাগ কর নি? ক্ষমা করেছ—বিশ্বাস কর, অন্যায় হলেও পিতৃআজ্ঞা,—আর এ অন্যায়ের প্রশ্রয় আমি কখনো দেবো না—না না তা নয়—তা নয়—প্রশ্রয় দিতে হবে আমায়, কেবল তা আমারি মধ্যে।" রুদ্ধ আবেগে কম্পোচ্ছ্বাসে কিরণ স্বামীর আপাদমস্তক বিস্ফারিত নেত্রে জন্মের মত দেখিয়া লইয়া বলিল "বল আমায় ক্ষমা করেছ?" মণীন্দ্র যন্ত্রের মত বলিল "হাঁ।" বহির্দ্বারে তাহাদের যাত্রার জন্য গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল আর একবার প্রণাম করিয়া কিরণ গিয়া গাড়ীতে বসিল!

শ্রীনীহারবালা দেবী।

শিশুর প্রভাব।

-:*:

(১)

বিরাট পুরী স্তব্ধ ছিল মাটির বুকে মাটির মত,
শপ্তা অহল্যারি সমান পাষাণ হয়ে মৃত্যুহত।
নবীন প্রাণের দখিন হাওয়ায়,
মুঞ্জরে সব তরুণতায়;
কোন্ ভগীরথ আন্‌লো ডেকে করে মধুর শঙ্খধ্বনি,
মনমাতালের সগরসুতের শাপবিমোচন সঞ্জীবনী!

(২)

নিত্য দিনের হিসাব করা নিক্তি-ওজন কাযের তুলায়
এই বেহিসাব ঘটায় কে রে অকায দিয়ে কাযটি ভুলায়!
আমার জীবন একতারাতে
হাজার তারের সুরধারাতে
ডুবিয়ে দিল, তলিয়ে দিল, উঠ্‌লো বেজে নতুন সুর
যার গমকে মুর্চ্ছনাতে সারা বাড়ীই পরিপূর।

(৩)

বসন্ত আজ মূর্ত্ত যেন গৃহের প্রতি ঘরে ঘরে
আগুন্ ভরা ছোট্টো পায়ের পাঁজে পাঁজে থরে থরে,
মধুর কলকণ্ঠ স্বনে
বেণুর আভাস মনের বনে
আস্‌চে ভেসে আকুল করা পাগল করা মোহন স্বরে
স্বপ্নপরী পুরীর মায়া ছেয়েছে আজ ভবন ভরে

(৪)

যে সব ঘরে বহু দিবস হয়নি কারো চরণপাত
সেথাও আজি ঘন ঘন হচ্ছে সবার যাতায়াত
চটুল কপোত যে আঙ্গিনে
দিত সাড়া রাত্রি দিনে
আজ্‌কে সেথা মানবকের কান্নাহাসির কণ্ঠস্বর
কান্ত কোমল কলরবে গড়্‌চে বিপুল স্বর্গপুর।

(৫)

শিশুর চলচরণ তলে ছন্দনৃত্য নোয়ায় শির
ঝরে হাসির ফুলঝুরিতে ফাগুন দিনের ফাগ আবির
আঁধার গৃহের সজীব দীপ
গৃহের সিঁথির সিঁদুর টিপ
সজীব শোভা, বেণুবীণা, জীবনকাব্যে শ্রেষ্ঠ শ্লোক
মর্ত্তে সে যে মূর্ত্ত স্বর্গ আনন্দেরি মহল্লোক।

(৬)

কিন্তু সে ত নিত্যভরা সিন্ধুকেরি অন্ধকারে
জ্ঞানের গতি মাথার কোঠায় অন্ধকরা গ্রন্থভারে
বনের পশু, মানুষ মেলা
তাদের লীলা তাদের খেলা
বন্ধবিধির চলা পথে, অপথে ও নির্ব্বিচারে
শিশুর প্রভাব জগজ্জয়ী, দেহের মনের মাটির পরে।

(৭)

আল্‌নাতে আজ নাইক ঠাঁই ছোট্টো কাপড় জামার ভিড়ে
আধ ময়লা আধা ভিজে কাঁথার মেলা রেলিং ঘিড়ে
নতুন লোকের হুকুম নিয়ে
নতুন কাযে চাকর ঝিয়ে
ব্যস্ত তারা বদ্‌মেজাজে রকমারি ফরমাসে
অনর্গল সে প্রশ্নভারে পণ্ডিতেরো জ্বর আসে।

(৮)

কাপড় চাদর এলোমেলো জুতার পাটি হারিয়ে যায়
এই ঝাঁট দেওয়া এই ময়লা সাজিয়ে রাখাই মস্ত দায়
পথের পাথর নির্ব্বিচারে,
বিছানার পর বারে বারে
ধোয়া কাপড় মসীরঙ', বইয়ের পাতা বই ছাড়া
এই লোকসান শঙ্কামাঝে কি আনন্দ বন্ধহারা।

(৯)

খরগোসটা খাচ্ছে কপি, রামা কোথায় গেল চলে
সদাই নালিস বিনা দোষে নির্ব্বোধের কি আদর ছলে।
অসম্বন্ধ শেখা কথায়
শ্রান্তি তার আর আছে কোথায় ?
পরিচয়ের রসান্ পেলে, দূরে পলায় লজ্জা ভয়
সোহাগ চুমো সোহাগেতে সব সঙ্কোচ সোনা হয়।

(১০)

ধুলায় ধূসর উলঙ্গেরে বক্ষে নিতে চিত্ত মাগে
এই উৎপাত এই কলরব মিষ্টি তবু বড়ই লাগে
বাচাল সে যে বাচাল করা
তার বিরহ শান্তিহরা*
দেখ্‌লে তাহার মলিন বদন কঠোর বক্ষ পড়ে ভেঙে
তখন কেবল বাজে কথাই কহি তারে মেঙে মেঙে।

(১১)

উঁচু কথার ভর সহেনা যাহার অভিমানী বুকে
রাঙা চোখের আঁচ লাগে যার রাঙা অধর ওষ্ঠ মুখে
অনাদরের আশঙ্কাতে
সরে যে যায় দূর তফাতে
কথা যাহার সৃষ্টি ছাড়া, খেলাই যাহার প্রধান কায
তাহার প্রভাব তীব্র হেন, বল্‌তে কবির নাইক লাজ।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

---

*কে জানিত কবির এই বিরহ-আশঙ্কা চিরবিরহে পরিণত হইবে! আজ তিনি পুত্রহারা! মর্ম্মাহত আমরা প্রার্থনা করি—যাঁহার ইচ্ছায় পিতার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় দুলাল, তাঁহারই শান্তিময় ক্রোড়ে স্থানলাভ করিয়াছে, তিনিই শোক-সন্তপ্ত পিতৃহৃদয়ে শান্তি দান করুন। সঃ

দুই দিক।

—:*:—

বৈজ্ঞানিক যেমন দেখিয়াছেন যে প্রত্যেক পরমাণুতে বিশ্বের সকল শক্তি ক্রিয়া করে, তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমাজের সকল শক্তি নিহিত রহিয়াছে। মানুষ একদিকে ব্যষ্টি, অপর দিকে সে সমষ্টির অংশ। ব্যষ্টি ও সমষ্টি একসূত্রে বদ্ধ। মানুষ কতখানি আপনার ব্যক্তিত্ব লইয়া আপনি চলিতে পারে, এবং কি পরিমাণে সে সমাজের নিকটে আবদ্ধ ইহা চিন্তার বিষয়।

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দেশে ইহার বিভিন্ন মীমাংসা হইয়াছে। ইয়োরোপেও এক সময়ে ব্যক্তিত্ব দুই একজন ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহাজনেই আরোপিত হইত অর্থাৎ Hero-worship এর ভাব প্রবল ছিল। আপামর সাধারণ ব্যক্তিত্বের দাবী করিতে পারিত না। কিন্তু কালক্রমে সমস্ত মানবের দাবী humanity নামে ধ্বনিত হইতে লাগিল। ফরাসীবিপ্লব উহার বীভৎসতার অন্তরালে প্রত্যেক মানবের ব্যক্তিগত অধিকার (rights of man) রাখিয়া গিয়াছে। মহাকবি সেক্সপীয়রের কালেও ইংলণ্ডে জনসাধারণের ব্যক্তিত্ব তুচ্ছ ছিল। তাঁহার নাটকাবলীতে তিনি জনমণ্ডলীকে অজ্ঞ সাজাইয়াছেন। জুলিয়াস সীজারের জন-সঙ্ঘও এই অজ্ঞতার পরিচায়ক।

ইয়োরোপে মানব সমষ্টির (humanityর) অধিকার ও অস্তিত্ব ম্যাটসিনি যেমন তেজে ও পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন তৎপূর্ব্বে আর কেহ তেমন করিতে পারে নাই। ম্যাটসিনির দাঁড়াইবার ভূমি যীশুখ্রীষ্টের মানবের-ভ্রাতৃত্ব-ভাব। ম্যাটসিনি ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন, তাই বিশ্বপ্রাণীকে মানবমণ্ডলী মধ্যে দেখিয়াছিলেন। তিনি মনুষ্যমাত্রকে ও জাতি সকলকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার দানের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ম্যাটসিনির সকল কার্যের সমর্থন না করিয়াও তাঁহার মানব প্রীতিকে প্রশংসা করা অন্যায় হইবে না।

ঋষিতুল্য এমার্সনও এই সাধারণ মানবকেই বরণ করিয়াছেন। সামান্য জীবনের সামান্য ঘটনাকেই তিনি অধিক মূল্য দান করিয়াছেন। তিনি কেবল মহান, বিরাট, বা অদ্ভুত ব্যাপার লইয়াই ব্যস্ত ও বিস্মিত থাকিতে চাহেন নাই। ক্ষুদ্রের মধ্যেই বৃহৎকে দেখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "I ask not for the great, the remote, the romantic. I embrace the common, I explore and sit at the feet of the familiar, the low" অর্থাৎ আমি মহান্ কিছু চাহি না, সুদূরের বা কল্পনার জিনিস চাহি না। আমি যাহা সাধারণ তাহাই চাই, আমি পরিচিত ও ক্ষুদ্র যাহা তাহার অন্বেষণ করি এবং তাহা হইতেই শিক্ষা লাভ করিতে চাহি। সামান্যের নিকটেই মহতের শিক্ষার সামগ্রী রহিয়াছে! এমার্সন আরও বলিয়াছেন যে, সাধারণ মানবকে ভাল না বাসিলে উচ্চনীতিরও প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না, কারণ নীতি সকল সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল অন্বেষণ করে—"Morals is the direction of the will on universal ends." সামান্য মানুষের ব্যক্তিত্ব নৈতিক জগতের হিসাবে সামান্য নহে। প্রত্যেক মানবের প্রাণ ও মনের মূল্য কে বলিতে পারে? ইংলণ্ডে রাস্কিন এই ব্যক্তিগত প্রাণ ও মনের অশেষ মূল্য প্রদান করিয়া শ্রমজীবিশ্রেণীর কল্যাণের নিমিত্ত স্বহস্তে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কর্ম্মকে উচ্চস্থান দিলেন এবং সকলের আত্মা ও মনের বিকাশের নিমিত্ত বহু উপায় নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সে শিক্ষা ফলবতী হইয়াছে। শ্রমজীবি আজ অধিকার লাভ করিয়াছে, তাঁহার কার্য্যের মূল্য জনসমাজ বুঝিয়াছে। আজ মানবসমাজ ব্যক্তি বিশেষের প্রাধান্য (One-man-theory) তাঁর স্থান লাভ করিতে পারিতেছে না। একজন খ্যাতিমান্ ব্যক্তির খ্যাতিতে অন্য সকলের কৃতিত্ব এখন আর বিলীন হইয়া যায় না! যুদ্ধের সামান্য

সৈনিকের বীরত্বও এখন পুরস্কৃত হইতেছে, যুদ্ধ জয়ে এখন কেবল সেনাপতির জয়ই ঘোষিত হয় না; কিন্তু বিজয়ীদলের সৈনিকমাত্রই চিহ্নিত ও সম্মানিত হয়। প্রাচ্য ও ব্যক্তিত্বকে অন্বেষণ করিয়াছে, কিন্তু তাহা কেবল অন্তর জগতে। বহির্জগতে সামান্য মানবের প্রকৃত স্থান প্রাচ্য দেশ দিতে পারে নাই। এখানে মানব নিয়তির বশবর্ত্তী হইয়া আপনার ভাগ্যে সন্তুষ্ট রহিয়াছে। কর্ম্মকে বন্ধন মনে করাতে কর্ম্মের মর্য্যাদা হ্রাস হইয়াছে। এ দেশে কার্লাইলের কর্ম্মই ধর্ম্ম (Work is worship)এ মত গৃহীত হয় নাই।

সামান্য মানুষের মূল্য দানে কুণ্ঠিত হইলেও প্রাচ্য মহান্ মানবের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছে। এই মহান্ মানব বা অতিমানুষ নিট্‌সের (Superman) "অতি-মানুষ" হইতে স্বতন্ত্র। এ মহত্ত্ব ও বিশালত্বের বৃদ্ধি অন্তরে। নিট্‌সের অতিমানুষ বাহিরের শক্তি, শারীরিক ও জাগতিক বলে বলীয়ান্। এ দেশের মহত্ত্ব অধ্যাত্ম ও নৈতিক। মানুষ কতটা বাহিরের ও কতখানি আধ্যাত্মিক বলের উপরে উন্নত হইয়াছে ইহা মীমাংসার বিষয়। প্রাচ্যভূমি আধ্যাত্মিক বলে বিশাল দেহ, শক্তিশালী মন ও হৃদয় গঠন করিতে চাহিয়াছে। শারীরিক ব্যায়ামের স্থান হইয়াছে প্রাণায়াম, সংযম ইত্যাদি, মানসিক তেজ ও নৈতিক বলের উপরে প্রতিষ্ঠিত! গুরু শিষ্যকে এ সকল গূঢ় রহস্য শিক্ষা দান করিতে পারেন। গুরু শিষ্য হইতে অধিকার ভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। সকলে সমভাবে উন্নতি লাভের অধিকার এ দেশে প্রাপ্ত হয় নাই। পাশ্চাত্য এ অধিকার ভেদ রক্ষা করে নাই। মানব প্রকৃতিকে বিভিন্ন গুণ বিশিষ্ট খণ্ড অংশে দেখিতে চাহে নাই।

বাস্তবিক প্রত্যেক মানুষকে সকল প্রকার অধিকার দান সহজ কার্য্য নহে। জগতে তারতম্য, বিভিন্নতা ত রহিয়াছে। অধ্যাত্ম জ্ঞানের দ্বারও এ নিমিত্ত ভারতে সকলের জন্য উন্মুক্ত হয় নাই। অধ্যাত্মজ্ঞানের আশ্রমও লোকালয় হইতে দূরে অরণ্যের মধ্যে স্থাপিত। প্রকৃতির নিত্য নিকেতন বনভূমি যে উচ্চ জ্ঞানের প্রকৃষ্ট বিদ্যালয় তাহা এ দেশের জ্ঞানীসমাজ উপলব্ধি করিয়াছেন। তপোবন সমূহে সেই শিক্ষালয়ই স্থাপিত হইয়াছিল সেখানে দেবমানুষ গঠিত হইতে পারিত। আশ্রম সকলের শান্ত তরুচ্ছায়া, নিশ্চিন্ত বিচরণশীল শ্বাপদকুল, স্বচ্ছন্দ বনজাত ফলমূলের সাত্ত্বিক-আহার, আর অরণ্যানীর অবয়বে বিশ্বেশ্বরের প্রকাশের গভীর আভাস—সে বনরাজি ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাটাছাঁটা বনের দুই একটী তরুলতা বিন্যস্ত বনশোভা নহে—তাহা বিচ্ছিন্নতার মধ্যেও বিশাল প্রকৃতির নিগূঢ় শোভায় গম্ভীর ও সুন্দর,—সেখানে মহামহীরুহ সকল সায়াহ্নের ছায়ার সহিত ঋষি তপস্বী-গণের সহিত নিশীথ-ধ্যানে নিমগ্ন হয়, এমনি শান্তির আলয়ে জ্ঞান ও ধর্ম্মের বিকাশ লাভ হয়। আবার গ্রীসেও তেমনি "একডেমির" (academy) তরুচ্ছায়া তলে মহাঋষি সক্রেটীস্ ও প্লেটো জ্ঞানের শিখা জ্বালিয়া শিষ্যদিগের মনকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন। জ্ঞান ও ধর্ম্ম ইহা দ্বারা লোকালয় হইতে দূরে, শিষ্য মণ্ডলীর গণ্ডী মধ্যে স্ফূর্ত্তি লাভ করিল. সাধারণ মানব তাহার অংশী হইতে পারিল না। সে জ্ঞানের সহিত ধর্ম্ম জড়িত ছিল। তাহা লাভের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম্ম লাভ। আজিকার দিনে জ্ঞানের দ্বার ইয়োরোপে এবং অন্যান্য দেশে সকলের জন্য উন্মুক্ত। এ জ্ঞান প্রধানতঃ অর্থকরী, ইহার সহিত জীবনের সম্পর্ক কমই রহিয়াছে।

ইয়োরোপ সকলের অধিকারের সহিত জ্ঞানলাভের অধিকারকেও তুল্য স্থান দিয়াছে। কাহাকেও জ্ঞানের আলোক হইতে বঞ্চিত রাখিবার অধিকার অন্য মানবের নাই। এ শিক্ষা এ দেশে রাজা রামমোহন রায়প্রমুখ ব্যক্তিগণের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। ইহাকে "ফেরঙ্গ শিক্ষা ও সভ্যতা" বলিয়া নিন্দিত করিবার প্রয়াস বৃথা।

আজ জগতে প্রত্যেক মানবকে অতিমানুষ গঠনের (Superman) ভাব জাগ্রত। তাহাতেও কি তারতম্য ঘুচিবে? শক্তির সাধনাকে প্রবল করিলে কি সকল দ্বন্দ্ব মিটিবে, জগত উন্নত হইবে! এ অতিমানুষ কি

বহুকাল আপনার শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে? নিট্‌সে (Nietzche) খ্রীষ্টের নীতিকে উড়াইয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে যে জাগতিক শক্তি সাধনের নীতি প্রচার করিতেছেন তাহা লইয়া মানুষ কতদূর অগ্রসর হইবে? বরং গ্রীসে যে উচ্চাঙ্গের, পূর্ণ, সুন্দর, সুঠাম, সাহসী, স্বদেশপ্রাণ মানব গঠনের চেষ্টা হইয়াছিল তাহার মূল্য অধিক, কিন্তু জগতের ধন ও ঐশ্বর্য্যের মোহে তাহারাও বদ্ধ হইয়া মনুষ্যত্ব হারাইল, আর নিট্‌সের অতিমানুষ ত দুদিনের! গ্রীসে যে মনস্বীতা ছিল, নিট্‌সের মানুষেও তাহা নাই।

মানব তবে কিসে শ্রেষ্ঠ হইবে? আজ কর্ম্মে নিস্পৃহ, জ্ঞানে বিশাল, প্রেমে অসীম, ধর্ম্মে জীবন্ত নরশ্রেষ্ঠ নরের শিক্ষা ও সাধনা গণ্ডী সকল মানবের জন্য রেখা শূন্য হইয়া এ দেশকেই আবার জাগ্রত করিতে হইবে। কবির কথায় ভারতবর্ষকেই বলিতে হইবে—সকল মানবের এখানে অধিকার সমক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত;—মহান-মানব গঠন আবার মানবের ভ্রাতৃত্ব বোধে হইবে :—

এস হে হিন্দু, এস মুসলমান
এস বৌদ্ধ, এস খ্রীষ্টান,
এস হে আর্য্য, এস অনার্য্য,
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে॥”

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ রায়।

বন-ফুল।

—ঃ-*-ঃ—

(Daffodils হইতে)

পাহাড়ের গায়ে মাঠের উপর দিয়া
নীলাকাশে যথা মেঘ ভেসে ভেসে চলে,
চলিতেছিলাম ; হেরিনু স্তব্ধ হিয়া
লক্ষ ফুলের উৎসব দলে দলে!
জলের কিনারে শ্যামল গাছের ছায়ে
হাসিছে, নাচিছে, দুলিছে মন্দ বায়ে।

ছায়াপথ হ’তে পুলক-উজলে-আঁখি
তারারা যেমন মিটি মিটি হেসে চায়,
তেমনি ফুলেরা আকুল সুষমা মাখি’
হেসে কুটিকুটি তীরে তীরে বনছায়!
দেখিলাম, যেই মেলিলাম আঁখিপাতা
হাজার কুসুম তুলিয়া হাজার মাথা!

কিরণে উজল ঢেউগুলি নাচে জলে ;
তারো চেয়ে সুখে নাচিছে এদের হিয়া,
হেন সুন্দর আনন্দময় দলে
কবির চিত্ত উঠিছে উল্লসিয়া !
দেখিলাম শুধু, ভরিল তাহাতে প্রাণ,
ভাবিনু না এরা করিল কি মোরে দান।

নির্জ্জনে যবে শয়নে বসিলে আসি'
শূন্য হৃদয়ে আকুল বেদনা বাজে,
তখনি তাহারা অন্তরে উঠে ভাসি',
হৃদি-মন্দিরে আকুল শান্তি রাজে !
তখনি পরাণ পুলকে উছলি' উঠে,
নাচে সুখে বন ফুলের সঙ্গে জুটে !

শ্রীগনেশচন্দ্র রায়।

বিদ্যারণ্য।

—:*:—

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নূতন রাজধানীর প্রশস্ত রাজপথ, উভয় পার্শ্বে নানাদিক্ দেশীয় পণ্যসম্ভারে সুসজ্জিত, বিপণীশ্রেণী ও হর্ম্ম্যমালা, কর্ম্মব্যস্ত নরনারীগণ গমনাগমন করিতেছিল।

নর নারী ও বালকবালিকাগণের প্রবেশ।

গীত।

অরাজকতার এ মহাশ্মশানে এনেছেন যিনি নূতন প্রাণ।
অত্যাচারের বহ্নি নিভা'তে করেছেন যিনি হৃদয় দান॥
জননী পেয়েছে সন্তান তাঁর ফিরাইয়া পুনঃ কৃপায় যাঁহার।
যাঁহার অসীম দরিদ্র-প্রেম অন্নহীনেরে দিয়াছে অন্ন,
তর বিতাড়িত পুরবাসী আজ গৃহবাসী পুনঃ যাঁহার জন্য॥

নমঃ বরেণ্য বিদ্যারণ্য ! প্রণাম চরণে হে যতিরাজ !
পুণ্যতীর্থ বিদ্যানগর যাঁর পদরজঃ ধরিয়া আজ।
যাঁহার করুণা বারিধির তটে রক্ষিত শত নারীর মান ॥
মানবধর্ম্মঘাতীরে দলিয়া, রেখেছেন যিনি জাতির মান,
লুণ্ঠিত হত শস্য কণিকা প্রাসাদে কুটিরে বহ্নির শিখা,
দশদিক ভরা হাহারবে যেন মহাপ্রলয়ের মহাবিষাণ।
যাঁহার স্থিতির রাগিণীর মাঝে হয়েছে আজিকে লুপ্ততান ॥
নমঃ বরেণ্য বিদ্যারণ্য ! প্রণাম চরণে হে যতিরাজ।
নিবাইয়া যিনি দেছেন এ দেশে আত্মবিরোধ অগ্নিশিখা।
মানবাত্মার অমর তত্ত্ব পঞ্চদশীতে যাঁহার লিখা ॥
ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ হৃদয়, বিশ্ব যাঁহার মরীচিকাময়,
"সর্ব্ব-দর্শন-সংগ্রহ"-আদি ঘুচায় যাঁহার মনের ভ্রান্তি,
স্বদেশের প্রেমে মানবের স্নেহে ত্যাজিলেন যিনি আপন শান্তি
নমঃ বরেণ্য বিদ্যারণ্য ! প্রণাম চরণে হে যতিরাজ।
মোক্ষ ধর্ম্মে জ্ঞানে ও কর্ম্মে সর্ব্ব উদ্যম চিত্তে যাঁর।
সনাতন উপনিষদ-বাণীতে পূর্ণ হৃদয় রত্নাগার ॥
ইচ্ছাতে যাঁর স্বর্ণবৃষ্টি ইঙ্গিতে সাম্রাজ্য সৃষ্টি,
স্বদেশের হিত স্বধর্ম্মীর সুখ লক্ষ্য যাঁহার মোক্ষ (ও) পর।
নমো নমস্তে ভারতী তীর্থ বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর ॥
নমো বরেণ্য বিদ্যারণ্য প্রণাম চরণে হে ঋষিরাজ !
পুণ্যতীর্থ বিদ্যানগর তব পদরজঃ ধরিয়া আজ ॥
[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান বিদ্যানগরের প্রান্তভাগে তপোবন
তরুতলে বেদিপীঠে আসীনা অলোকা ও মাধবী।

গীত।

অলোকা—

বনের ফুল বনেই ফোটে বনেই ঝরে যায়।
কে তারে বুকে ধরে আদর করে হায় ॥
গাছের পাখী গাছের ডালে, জনম নিয়ে পাতার তলে,
দুদিন বেড়ায় হেসেখেলে নীল আকাশের গায়,
আবার ফিরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে পাতার বিছানায় ॥

জগত জুড়েই যাওয়া আসা, দুদিন শুধু বাঁধা বাসা,
পাখীর মত ফুলের মত ঢেউএর মতই প্রায়।
মানুষগুলোও এম্‌নি ক্ষণিক খেলা খেলে যায়।

বড় মজারই এ পৃথিবী, এই আছে এই নেই, কাল যে ছিল; আজ আর সহস্র আহ্বানেও তার এতটুকু সাড়া পাওয়া যায় না, এই জন্যই তো প্রভু বলেন, এ বিশ্বকার্য্যের বাস্তব কোন সত্তা নেই, সমস্তটাই একটা বিরাট অসত্য স্বপ্নমাত্র, রজ্জুকে সর্পভ্রম, শুক্তিকে রজতবৎ প্রতীয়মান হওয়া।

মাণ্ডবী। হ্যাঁ তা এক রকম মনে তাই-ই হয় বৈ কি? এই আজ যার প্রতাপে সসাগরা ধরা কম্পমান, মনে কর্‌তেও পারা যায় না যে, কস্মিন্‌কালে কখন এর পতন হ'তে পারে, কাল হয় ত তার সেই অখণ্ড প্রতাপের স্মৃতিটুকুই পড়ে আছে, আর কিছু নেই, এর চেয়ে আর জগতের অলীকত্ব কিসে প্রতিপাদিত হ'তে পারে? আনগুণ্ডি বংশের স্মৃতি আজ উপকথায় পরিণত, পাঠানআক্রমণ একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন, তারপর সেই ভীষণ অরাজকতা! এখন সেও প্রায় গল্পকথার সামিলেই এসে পড়েছে! আজ আবার দীর্ঘকালব্যাপী অশেষ রোগযন্ত্রণার পরিসমাপ্তিতে দেশলক্ষ্মী নূতন স্বাস্থ্যসম্পদ্‌লাভে যেন নব-যৌবন-বিভূষিতা-তরুণীর ন্যায় ঝল্‌মল্‌ কর্‌ছেন, রামচন্দ্রসম মহারাজ হরিহরের সুবিচার, সেনাপতি বিনায়কের অর্জ্জুনতুল্য বাহুবল, আর সবার উপর বশিষ্টসম জ্ঞানী প্রভুর সুপরিচালন, এখন আর পূর্ব্বের দারিদ্র্য, অত্যাচার, মহামারি, দুর্ভিক্ষ, অজ্ঞতা প্রভৃতি বিপদসকলকে স্বপ্নবৎ মিথ্যাই প্রতিপন্ন করে দিচ্ছে, বিদ্যানগর আজ শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যাপুরীর সঙ্গে সমতুল্য!

অলোকা। তা ঠিকই বলেছ, কে বল্‌তে পারে, এই সেই অরাজকতার কেন্দ্রস্থল, যেখানে দিনের আলোয় মায়ের বুক থেকে পিশাচেরা সন্তান কেড়ে নিয়ে যেতে দ্বিধা কর্‌তো না, যেখানে মানুষের ধন-মান-প্রাণ সমস্তই প্রতি মুহূর্ত্তে পদ্মপত্রস্থিত বারির মতই টলমল কর্‌তো; একি! মহারাজ যে!

মাণ্ডবী। তাই তো! আমি তা হ'লে এখন চল্লেম। (প্রস্থান)

(হরিহর ও বিনায়কের প্রবেশ।)

অলোকা। মা ভুবনেশ্বরী, মহারাজকে চিরবিজয়ী করুন এই প্রার্থনা। প্রণাম করি।

হরি। (হাসিয়া) রমাসমা হও! যখন বিজয়লক্ষ্মী স্বয়ংই জয়কামনা কর্‌ছেন, তখন আর পরাজয়ের সম্ভাবনা কোথায়? তোমার সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ তো অলোকা?

অলোকা। মহারাজের কৃপায় এদেশে অকল্যাণের প্রবেশ এখন যে একবারে অসম্ভব!

হরি। শোন বিনায়ক! অলোকার বিনয় প্রকাশের সীমা নেই! অলোকা! এ রাজ্য সংস্থাপনে আমার হস্ত কতটুকুই বা সাহায্য করতে সক্ষম হয়েছে, প্রভুর অসীম কৃপা, বিনায়কের বাহু, এবং তোমার চিত্ত, তোমার ওজস্বিনী ভাষার উন্মাদনাকারী সঙ্গীত, তোমার রণাঙ্গনে দানবদলনী চণ্ডীমূর্ত্তিই এ রাজ্যের ভিত্তিভূমি, তুমিই এ রাজ্যের জয়শ্রী, (অলোকাকে লজ্জাবিপন্না দেখিয়া) প্রভু কোথায়?

অলোকা। তিনি বাহিরে গিয়েছেন, কিন্তু বোধ করি আপনাদের আগমনের বিষয় জান্‌তে পেয়েই বলে গেছেন, "যদি কেহ তাঁর সাক্ষাতইচ্ছুক হয়ে আসেন, অল্পক্ষণমাত্র প্রতীক্ষা কর্‌লেই সাক্ষাৎ হতে পারবে," কুটীরে আসন গ্রহণ কর্‌বেন—আসুন্‌!

রাজা। এইখানেই আমি প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করতে চাই, বিনায়ক! তুমি কাননপথের শেষ সীমানায় গিয়ে তাঁর প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষা কর, প্রভুর আগমনমাত্রে তাঁকে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাবে।

বিনায়ক। যে আজ্ঞে! (প্রস্থান)

রাজা। (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) অলোকা!

অলোকা। মহারাজ!

রাজা। (বিজড়িতভাবে) আমায় এরূপ রাজকীয় সম্মানে অভিভাষিত কেন কর অলোকা? তোমার নিকটে এই সুদূর সম্বন্ধ তো প্রাণ চায় না।

অলোকা। দূর! কে বলে এ কে সুদূর সম্বন্ধ মহারাজ! রাজার মত নিকটতম, আত্মীয়তম, প্রজার আর কি আছে রাজন্? পিতা সন্তানের সকল অভাব মিটাতে অক্ষম, কিন্তু রাজার সে শক্তি আছে; তাই রাজা পিতাপেক্ষাও অধিক ভরসাস্থল। পিতা নিজ সন্তানেরই পালক, আর সারারাজ্যের পিতা পালনকর্ত্তা—রাজা!

রাজা। (মৃদু হাসিয়া) অলোকা, বাক্‌যুদ্ধে তোমার নিকট সমুদয় বিজয়নগর সাম্রাজ্য পরাভূত হয়েছিল, আমিও জয়ের আশা রাখিনে, সে কথা যাক্, এখন বল দেখি! তোমার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এ রাজ্যের সমুদয় দুঃখ সুখের ভার গ্রহণ করতে, কবে তুমি রাজগৃহে প্রবেশ করে, কবে সেই অন্ধকার রাজপুরী উজ্জ্বল করে তুলবে? আর সেখানের শূন্যতা তো মানাচ্ছে না। সে পুরী তোমারই চরণস্পর্শকামনায় যে উন্মুখ অধীর হয়ে, তোমার পথ চেয়ে আছে, কবে তাকে পবিত্র, আর তার...............

অলোকা। (বাধা দিয়া) মহারাজ! অধিনীর ধৃষ্টতা মার্জ্জিত হোক্। আপনার এ অতুলনীয় স্নেহরাশির যৎসামান্য প্রতিদান করণেরও সামর্থ্য আমাতে নেই, তাই এতখানি অনুগ্রহে সর্ব্বথা ভীতা হচ্ছি, তবে এইটুকু সাহস করে বলতে পারি যে, যেদিন আমার জননী মহারাণীমাতা রাজপুরী উজ্জ্বল করবেন, সেদিন তাঁর শত সেবিকার মধ্যে এই নগণ্যা অলোকাই সর্ব্বপ্রবর্ত্তিনী এবং সর্ব্বপ্রধানা হ'তে পার্ব্বে। সে শুভদিন কবে আসবে রাজাধিরাজ! যেদিন পিতামাতার যুগল চরণ দর্শন করে, এ তৃষিত নেত্র সার্থক করতে পার্ব্বো?

রাজা। (ক্ষণ পরে, বিষাদপূর্ণ হাস্যের সহিত) 'সেদিন' বোধ হয় কোন দিনই আসবেন না অলোকা! তুমি আমার আবেদন অগ্রাহ্য করলে, কিন্তু জেনো বৎসে! হরিহর নিজের সংকল্প ত্যাগ করতে কোনদিন শিক্ষা করেনি। এরাজ্য স্থাপনের সহায়তা সম্বন্ধে, তোমার অবশ্য প্রাপ্য অংশার্দ্ধ আমি কোনমতেই ভোগ করতে পারেনি। ইহা গ্রহণ করতে তুমি ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃই বাধ্য। যদি বল—তুমি তোমার স্বত্ব আমাকে দান করেছ, তা' আমিই বা তোমার দান গ্রহণ কর্ব্বো কিসের জন্য।' ব্রাহ্মণ বৃত্তি হিসাবে এবং অভাবগ্রস্তগণ জীবিকা-নির্ব্বাহার্থই দান গ্রহণের অধিকারী, আমি এতদুভয়ের একতমও নই, রাজা একমাত্র ব্রহ্মবিৎগণের নিকট ভিক্ষা গ্রহণে সমর্থ। তুমি তা নও, কি হিসাবে তোমার সম্পত্তিতে আমি দখল নেবো আমায় বল দেখি?

অলোকা। মহারাজ! পুণ্যশ্লোক! আপনার এ অতুলনীয় মহত্ত্ব............

রাজা। (হাসিয়া) কিছু না, মহত্ত্ব এর মধ্যে তুমি কোথা পেলে? কর্ত্তব্যপালনে পুণ্য নেই, অপিচ ত্যাগে পাপ, এ কথা বোধ করি মহর্ষি পরম তত্ত্বজ্ঞ বিদ্যারণ্য স্বামীর প্রিয়শিষ্যাকে আমার শেখান নিষ্প্রয়োজন? আমি পুণ্যশ্লোকও নহি। ঐ দেখ গুরুদেবের আগমন ঘোষণাস্বরূপ আমার কার্ত্তিকেয় সদৃশ ভাই ত্রস্তগতি এই দিকেই আসছে, কি সংবাদ বিনায়ক?

বিনা। (দূর হইতে) প্রভু আগমন করছেন। (প্রস্থান)

রাজা। তবে আসি অলোকা! সুখে থেকো। (প্রস্থান)

অলোকা। (বৃক্ষান্তরাল ব্যবধান পথে উভয়ের গতিপথ পানে চাহিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ) রাজপুরী আমার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছে? ভগবন্! কেন এ দুরাশার স্বপ্ন প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দিতে এলো! এ আমার কি অগ্নি পরীক্ষা, বিজয়নগর রাজপুরী? প্রার্থিত! প্রিয়তম! জানি না কোন্ জন্ম-জন্মান্তরীণ অচ্ছেদ্য কর্ম্মসূত্রের অজ্ঞাত আকর্ষণ পাশে বেঁধে, এ ভিখারিণীকে তীব্র আকর্ষণে তুমি সতত আকৃষ্ট করছো। সেই আকর্ষণের বেগই আমার জীবন হ'তে রোধ করতে পারছিনে। আজ আবার এ কি প্রলোভনের জাল, এ মায়া-মুগ্ধার সাক্ষাতে বিস্তৃত করতে এলে?

মহারাজ! তোমায় আমি আর কি বল্‌বো? বল্‌বার যে কিছুই ভাষা যোগায় না। মা ভুবনেশ্বরী তোমার বংশে চিরপ্রসন্না থাকুন। উপযুক্তা রাজলক্ষ্মীকে বরণ ক'রো। তুমি এ যে নিতান্তই তৃণাবলম্বন করতে চেয়েছিলে! হ্যাঁ প্রভু ফিরে এসেছেন, যাই তাঁর পরিচর্য্যার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

বিরূপাক্ষ মন্দিরের একাংশ। অদূরে গোপুর, শিবালয় ও তৎসম্মুখস্থ সুবৃহৎ মণ্ডপ দেখা যাইতেছে।
মৃগচর্ম্মাসনে বিদ্যারণ্য আসীন, সম্মুখে হরিহর ও বিনায়ক।

হরি। এ যে অভাবনীয় সংবাদ প্রভো! আপনি যদি বিদ্যানগরকে ত্যাগ করে যাবেন, তবে তার আর অবশিষ্ট কি রইল? সর্ব্বালঙ্কার বিভূষিতা অতুল শ্রীসম্পন্না কোন নবজাতা বালিকার প্রাণ হরণ করে নিলে, তার সমুদয় ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য যেমন, তার পক্ষে একান্তই ব্যর্থ হয়, আপনার অভাবও যে, এই নব স্থাপিত সাম্রাজ্যের পক্ষে সেই রূপই ক্ষতিকারক হবে।

বিদ্যা। (স্নেহের হাস্যে) তুমি প্রেমের আতিশয্যে অত বড় উপমাটী দিয়ে বস্‌লে হরিহর! বাস্তবিক আমার অভাব বিদ্যানগরের পক্ষে মৃত্যু তুল্য নয়। এর পঞ্চপ্রাণ তোমাদের উভয় ভ্রাতার বাহু এবং অলোকার চিত্ত, ইহার শরীরাশ্রয়ীই তো রইলো। আমার অবস্থিতি এক্ষণে অনাবশ্যক বলেই মনে হচ্ছে।

হরি। প্রভো! পিতঃ! এত বড় মহাভার, আপনার সাহায্য ব্যতিরেকে বহন করতে আমরা সম্পূর্ণ সাহসহীন। এ দীন আশ্রিতের প্রতি কৃপা পরবশ হোন্। আপনার তপস্যা বিঘ্নাপনোদনে আজ হ'তে আমাদের উভয় ভ্রাতার মনপ্রাণ ও বাহুবল সর্ব্বদাই নিয়োজিত রইল। এ রাজ্যের মধ্যে এমন একটী কীটাণুও নেই যে, তাদের জীবন মান ও অন্নদাতা পরমেশ্বর সমতুল্য প্রভুর তপোবিঘ্নাপনোদনে সদা সচেষ্ট না থাকবে। শৃঙ্গেরি যাত্রা স্থগিত হোক্।

বিদ্যা। বৎস! তুমি মহারাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী হয়ে এ বালকোচিত অনুরোধ করছ কেন? তুমি কি জান না যে বর্ণী-ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীর রাজধানী এবং রাজপরিবারবর্গের সহিত সর্ব্বপ্রকার সংস্রবই সর্ব্বথা পরিবর্জনীয়? অধিককাল জনসঙ্গ করলে সন্ন্যাসীকে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সকল তত্ত্ব জেনেশুনে

কেন এ অন্যায় মোহে নিজেকে আবদ্ধ করে এমন ব্যাকুল হচ্ছ ? দেশের জন্য দেশবাসী মাত্রেরই যেটুকু কর্ত্তব্য, শুদ্ধ মাত্র সেই কর্ত্তব্যটুকু প্রতিপালনার্থই এতদিন আমার এই সন্ন্যাসাশ্রম বিরুদ্ধ ক্ষাত্রজনোচিত কার্য্যে লিপ্ত হ'তে হয়েছিল। দেশের অন্ন গ্রহণ করে ; যে অকৃতজ্ঞ দেশের দুরবস্থা নিরপেক্ষ ভাবে দাঁড়িয়ে দেখে, নিজের ধনমান প্রাণ এবং এমন কি স্বর্গ মোক্ষাদি মহোচ্চ ফল সকল পর্য্যন্ত দেশের উন্নতিকল্পে উৎসর্গ না করে কোটি কুম্ভীপাকই তার প্রকৃত আশ্রয়স্থল। দেশ-ঋণ শোধ না করে, মহাতপস্বীও মুক্তি লাভে সমর্থ হন না। তাই দেশের দুঃসময়ে মা দেশ-জননী তাঁর এই দীন সন্ন্যাসী সন্তানকে আহ্বান করে এনেছিলেন। কিন্তু আজ তো আর সে বিপদের কালো মেঘে মায়ের ললাট অন্ধকার নেই ! দেশ আজ ধন-ধান্যে উথ্‌লে উঠেছে। জননীর প্রিয় সুসন্তান আজ তাঁর রক্ষাভার গ্রহণ করে ; সকলকেই নিরুপদ্রবে ধর্ম্ম ও কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়ার অবকাশ প্রদান করেছেন। ন্যায় ও ধর্ম্ম আজ ধর্ম্মাধিকরণকে পুনরলঙ্কৃত করছে। সেনাপতির অতুলনীয় বীরত্বে শত্রুকুল আতপবিশুষ্ক ছিন্নতরুবৎ বিমলিন। আজও যদি আমি স্বীয় ব্রতভঙ্গ করে, এই রাজধানীতে বসে থাকি, তবে সে কি সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য পালন করা হবে ?

(রাজার অধোমুখে নিরুত্তরে অবস্থিতি)

বিদ্যা। (সস্নেহে) হরিহর ! বুঝেছি, এ ত্যাগ তোমার পক্ষে বড় কঠিন ত্যাগ ! শুধু রাজকার্য্যের মন্ত্রিত্ব নয়, গুরুশিষ্য সম্বন্ধের অতি প্রিয়তর, আত্মীয়তর সম্বন্ধে, তুমি আমাকে নিজের সঙ্গে বদ্ধ করে ফেলেছ। তাই সে বন্ধন কাটাতে এত কাতরতা তোমার মধ্যে এসে পড়েছে। কিন্তু বৎস ! গুরুশিষ্য সম্বন্ধের গুরুত্ব তো তোমার অবিদিত নাই ! বলেছি তো এ সম্বন্ধ জাগতিক সকল সম্বন্ধের অপেক্ষা কঠিন, এবং সর্ব্বাপেক্ষাই মধুরতম। গুরু, ভগবানের কৃপা মূর্ত্তি। তাই এ গুরুর মধ্যে তাঁর স্রষ্টাত্বে পিতৃরূপ, পালনে মাতৃরূপত্ব প্রভৃতি সমুদয় ভাবই, এই ভাব-বহুল কৃপা মূর্ত্তিতে প্রকটিত আছে। আর তদ্ভিন্ন মোক্ষ-প্রদ ঈশ্বরত্বও একমাত্র তাঁতেই বর্ত্তমান। যদি যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ গুরুকে প্রকৃত সাত্ত্বিক ভক্তিমান শিষ্য একান্ত ভাবে আশ্রয় করেন, তবে আর অপর কোন কর্ম্মানুষ্ঠানই অনাবশ্যক। কারণ শিষ্যের সমুদয় পাপাদি কলুষ মোচন পূর্ব্বক তাকে সংসার হতে মুক্ত করাই গুরুর ধর্ম্ম। গুরু যদি নিজে মুক্তপুরুষ হয়েন, তবে বিনা বাধায় তাঁর শিষ্যেরাও মুক্তি লাভের অধিকারী। যে গুরু তা পারেন না, স্বীয় পুণ্যাংশ প্রদান করেও তাঁর শিষ্যের মুক্তি বিধান করতে বাধ্য হতে হয়। শিষ্য নিজের পুণ্যাংশ না দিয়ে, গুরুর পাপের অংশ গ্রহণ না করে কেবল মাত্র তাঁর পুণ্যের অংশ লাভ করে। তাই গুরুশিষ্য সম্বন্ধের মত শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ জগতে আর কিছুই নেই। তাই শাস্ত্রকারগণ শিষ্য এবং গুরু উভয়ের অধিকারিত্ব সম্বন্ধে এতদূর অবধানতাবলম্বন করতে বলে গেছেন। আমরা সর্ব্বদা যে সকল গুরুশিষ্য সম্বন্ধ দেখ্‌তে পাই। তাহা শাস্ত্রানুমোদিত যথার্থ গুরুশিষ্য সম্বন্ধ নয়,—তবে ভাল বিষয়ের চর্চ্চাতে, এমন কি ভানেও অল্প-বিস্তর ফল লাভ অনিবার্য্য ! হরিহর ! আমি জীবন্মুক্ত মোক্ষ পুরুষ নই, কিন্তু তুমি যথার্থই ভক্তিমান শিষ্য। তোমার প্রকৃত গুরুভক্তিতে শীলামধ্যে গূঢ় চৈতন্য যেমন বিশিষ্ট চেতন ভাবে ভক্তের আরাধনামন্ত্রে আবির্ভূত হন, তেমনি আমার মধ্যেও গুরুরূপ প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হবে না। তাই নিজে আমি অতি অকিঞ্চন হ'লেও হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বাদ করছি তোমার কোন অমঙ্গল হবে না। যেখানেই থাকি, এ রাজ্য সমেত তোমাদের মঙ্গলচিন্তা ভুলে থাকা আমার পক্ষে একান্ত অসম্ভব ইহাও তো বুঝেছ ; তবে আর বিষণ্ণতা কিসের ? যখনি প্রয়োজন বুঝ্‌ব, আমায় এখানে আস্‌তেই হবে। কেমন সন্তুষ্ট হ'লে তো !

রাজা। (পদপ্রান্তে পতিত হইয়া) প্রভো ! পিতা !

বিদ্যা। (রাজাকে উঠাইয়া) বৎস! প্রিয়তম! তোমার পক্ষে কোন ত্যাগই তো কঠিন নয়! দ্বিতীয় দেবব্রত........!

রাজা। আশীর্ব্বাদ করুন সবই যেন সহিতে পারি। কি আর বল্‌বো দেব! যে প্রার্থনা কর্‌তে সাধ হয়, তা মুখ ফুটে জানাতেও সাহসী নই!! আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আপনারই। আমায় যে আদেশ কর্‌বেন, নির্ব্বিচারে তা পালনে যেন সামর্থ্য থাকে শুধু এই ভিক্ষা চাই।

বিদ্যা। মা বিশ্বজননী তোমায় নিজে আশীর্ব্বাদ করুন, রাজধর্ম্ম চির অবিস্মৃত থেকো। রাজার ব্যক্তিত্ব নাই। শৃঙ্গেরির শান্ত উপত্যকা সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জন্য, সেখানে রাজার স্থান নেই, বৎস! কর্ত্তব্যে ও ত্যাগে সর্ব্বাবস্থায়ই তোমার আনন্দ অটুট থাক্, আনন্দময়কে তুমি চিরসখারূপে স্বীয় হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করো; এই তোমার প্রতি তোমার গুরুর আশীর্ব্বাদ। আর তোমার রাজ্যের জন্য— জগৎলক্ষ্মী চির অচঞ্চলা হয়ে এ রাজ্য রামরাজ্যে ও রাজাকে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিরূপে পরিণত করুন। এই আমার শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ ও কামনা।

(উত্থান)

(উভয় ভ্রাতার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্ব্বক প্রস্থান)

বিদ্যা। হরিহর! তোমার জীবনই ধন্য! তুমি হতাশার তীব্র জ্বালাকে অপরিসীম ত্যাগের আনন্দে ডুবিয়ে দিয়ে, বিশ্বজিৎব্রত ধারণ করেছ! আত্মজয়ীই এ জগতে সর্ব্বজয়ী বীর। শৃঙ্গেরি! শৃঙ্গেরি! আঃ—কি পবিত্র। কি প্রশান্ত সেই নিরালা কাননভূমি! সেখানে হৃদয়, মর্ত্ত্যে ব্রহ্মলোকের শান্তি লাভে অনির্ব্বচনীয় আনন্দপীযুষধারা পানে ধন্য হয়। আমার মনপ্রাণ সেইখানে চলে গেছে। আর ক'দিন পরে এ দেহখানা শুদ্ধ সেই পবিত্র ভূমির অঙ্কাশ্রয়ী হয়ে জীবন সফল কর্‌বে।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

—:*:—

স্থান তপোবন, কুটীরাভ্যন্তরে গৃহকর্ম্মনিরতা অলোকা।

অলোকা। (আত্মগত) গরীবের মেয়ে—গরীবের মত থাক্‌বো, খাট্‌বোখুট্‌বো খাবো, ঘুমোবো বাস্—! কিন্তু আমার একি রোগ? কিছুতেই মনকে এ সমস্ত ভাললাগাতে পারিনে। ঝাঁট্‌পাট্, রান্নাবান্না এ সব যেন, এক একটা দার্শনিকসূত্রের চেয়েও জটিল! মন লাগে না ব'লে কিছুই সুচারু সম্পন্ন হয় না। কিন্তু রাজ্যের সে দুর্দ্দিনে, সেই অজস্র রণবিমুখ ভীত নাগরিককে উত্তেজিত করে তুল্‌তে, উঃ—সে কি এক অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দই অনুভব করেছি। যুদ্ধের সময় কখন কখনও নিজের হাতে কৃপাণ ধরতেও কই মন তো দ্বিধা বোধ করেনি। সেই সব সময়গুলিই যেন, আমার জীবনের এক মহৎ স্বপ্ন। অনির্ব্বচনীয় আনন্দের স্মৃতি! আর ওদিকেও কিছু নেই। আর এদিকে! হ্যাঁ—তা' এদিকেও ঘট্‌তে কিছু অবশ্য পার্‌তো; কিন্তু সে আমারি জন্য ঘট্‌বে না। মহারাজ বল্লেন "রাজপুরী আমার পথ চেয়ে আছে! তা' এ এমন কিছু অসম্ভব কথা নাও হ'তে; পারে! আমার নিজের মনেও যেন আমি এমনিধারা একটা ব্যাকুল আহ্বান থেকে থেকে শুন্‌তে পাই, সেই হয় ত এ রাজ্যের রাজলক্ষ্মীরই ডাকে! সেই আহ্বানের অতি তীব্র আকর্ষণই তো আমায় আমায় নিজের

স্বাভাবিক অবস্থায় এমন অসহিষ্ণু অতিষ্ঠ করে তুলেছে। কিন্তু এ হ'তে আমার কর্ণ বধির রাখ্‌তে হবে। মনকে কশাঘাতে ফিরাতে হবে। আমি গরীব চাষার মেয়ে, আমার মনে এ সিংহাসনের স্বপ্ন কেন? একেই বলে গরীবের ঘোড়া রোগ!' যাই দেখিগে উনুনটা ধর্‌লো কি না?......(প্রস্থানোদ্যত।)

(বিনায়কের প্রবেশ)

বিনা। অলোকা! এখানে তুমি? আমি তোমায় সারা উদ্যানটী খুঁজে এলাম, কি কর্‌ছো?

অলো। (সহাস্যে) যুবরাজ! উদ্যানে বায়ু সেবনই কি আমার একমাত্র কর্ম্ম? গৃহ কার্য্য নেই?

(ব্যস্তভাবে পুঁথিপত্র গুছাইতে লাগিল)

বিনা। (তাহার কার্য্যনিরত মূর্ত্তি এক দৃষ্টে দেখিতে দেখিতে) অলোকা!......

অলো। (কার্য্যারতা থাকিয়া) যুবরাজ!

বিনা। (লজ্জিতভাবে) এ কি সম্বোধন আজ অলোকা? আমি যুবরাজ নই, এ রাজ্যের সেনাপতি মাত্র, তা' ভিন্ন আমার ডাকবার জন্য একটা নামও রাখা হয়েছিল। সে নাম তোমারও খুব অপরিচিত তা বোধ হয় না। যখন যুদ্ধের সময় আমরা প্রায়ই একসঙ্গে থাক্‌তাম, তুমি সেই নামেই আমায় সম্বোধন করতে বলেই, যেন আমার মনে পড়ে, তবু যদি স্মরণ না থাকে, তাই মনে করে দিচ্ছি, সেটা 'বিনায়ক।'—এমন কিছু শ্রুতিকটু বা দুরুক্ষরও নয়।

অলো। সম্মানীগণের নাম ধরা কি আধুনীক সভ্যতার অঙ্গ হয়েছে? আমি বনবাসিনী, রাজধানীর নূতন নিয়ম তো জানিনে, তাই সেই পুরাণ চালেই চলেছি।

বিনা। (হাসিয়া) পুরাণ চালে চল্‌ছো আর কই? সেই চালই তো আমি চাইচি। পূর্ব্বে তুমি তো আমায় 'বিনায়কই' বল্‌তে, এখন সেটা হঠাৎ পরিবর্ত্তন কর্‌চো কেন? আমি কিন্তু দেখ বরাবর সেই চালই বজায় রেখেছি।

অলো। (হাসিয়া) আপনার তখন ওই বই আর কোন সংজ্ঞা ছিল না। কাজেই নিরুপায়ে নাম ধর্‌তে হইয়াছিল। এখন সেটা কর্‌তে গেলে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা হয় যে।

বিনা। তোমার কল্যাণে, গুরুর আশীর্ব্বাদে আমার সম্মান প্রদর্শনের লোকের এ রাজ্যে অভাব নাই। তুমি একজন তা' থেকে বাদ পড়্‌লে, আমার সম্ভ্রমের কিছু মাত্র হানী হবে না। এ সম্বন্ধে তুমি অনায়াসে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারো, আর এও যদি তোমার মনঃপুত না হয় আমিও এবার হতে, তোমারই পন্থা গ্রহণ কর্‌তে বাধ্য হবো। আমিও তোমায় এইরূপ সম্মান প্রদর্শন কর্‌বো, কি বল?

অলো। (উচ্চকণ্ঠে হাস্য করিয়া) আমায় সম্মান প্রদর্শন কর্ব্বেন? কি বলে সেটা কর্‌বেন? দু একটা মনঃকল্পিত মিথ্যা অলঙ্কারে বিশেষিত কর্‌বেন বোধ হয়! তা না হলে, এই দুনিয়ায় তো আমার সম্মানের কোন পাঠই নাই যে তা ......

বিনা। (বাধা দিয়া) মিথ্যা! মিথ্যার সাহায্য বিনায়ককে গ্রহণ কর্ত্তে কেউ কখন দেখেনি। তুমি যেমন আমার 'যুবরাজ' বলে সম্বোধন কর্‌লে, এও যেমন মিথ্যা নয়, আমিও তো তেমনই যথার্থরূপেই তোমায় 'যুবরাজ্ঞী' বলে সম্বোধন কর্‌তে পারি।"

অলো। ছি, ছি, যুবরাজ!

বিনা। 'ছি ছি' কেন যুবরাজ্ঞি!

অলো। (সরোষে) এই কি বিজয়নগরের ভবিষ্যত রাজা, ভীষ্মতুল্য মহারাজ হরিহরের সহোদরের উপযুক্ত? এত বড় অপমান আমায় আপনি কর্‌তে পার্‌লেন?

বিনা। (ক্ষুব্ধকণ্ঠে) বিজয়নগরের যুবরাজ্ঞীর পদ, তোমার পক্ষে এমন অপমানের তা তো আমার জানা ছিল না, সত্যই কি আমার এ আগ্রহ আবেদন তোমায় অপমানিত করেছে অলোকা?

অলো। (উদ্দীপ্তভাবে) যে যেখানের যোগ্য নয়, তাকে সেই স্থান দিতে চাওয়া, তাকে অপমান করা ব্যতীত আর কি?

বিনা। (অলোকার হাত ধরিয়া) যোগ্য অযোগ্য বিচার ভার নিয়োগকর্ত্তার উপরই থাকে, পরের অধিকার নিজের মস্তকে বহন নিষ্প্রয়োজন! কেন অলোকা! আমার তো মনে হয়, আমরা বহু পূর্ব্ব হতেই, দুজনে দুজনার মনের ভাব ভালরূপেই জানি, মুখে না হোক্‌, কতদিন কতভাবে আমার প্রতি তোমার এ অতুলনীয় ভালবাসা প্রকাশ পেতেও তো ইতিপূর্ব্বে বাধা পায় নি, আর আমি? আমার কথা যে আবার নূতন করে কোন দিন তোমায় বুঝাতে হবে, এ আমার পক্ষে স্বপ্নেরও অগোচর! তুমি মনের মধ্যে ভালই জান যে, তুমিই বিনায়কের 'সর্ব্বস্ব'!

অলো। (বিষাদ প্রচ্ছন্ন হাস্যে) যুবরাজ! সর্ব্বস্বের বাড়া, রাজার ঘরে যে আরো কিছু আছে; যা হোক ও সব বাজে কথার উপন্যাস রচনার সময় আমার এখন নেই। রান্না বান্নার সময় হয়েছে। প্রভুর আহার কাল উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। আমি এখন যাই। রাজঅতিথি আপনি, আপনার সমুচিত সম্বর্দ্ধনা করা হলো না। ক্ষমা কর্‌বেন।

(প্রস্থান)

বিনা। (স্বগতঃ) কি ওর মনোভাব কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লেম না! অলোকা যেন চিরদিনই এক প্রহেলিকা! সে পরকে ধর্‌তে জানে, কিন্তু নিজেকে ধরা দিতে রাজী নয়। বোধহয় দারিদ্র্যের তীব্র অভিমান! পাছে কেউ মনে করে তার মনে ঐশ্বর্য্য লোভ আছে। তাই সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য ভোগ তুচ্ছ করে গুরুদেবের সঙ্গে তপোবনে এসেছিল। আজও সেই আত্মমর্য্যাদার তেজে, নিজের হৃদয়েরও বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ প্রচার করে গেল। তা হোক্‌ এ ভাব স্থায়ী হতে পারে না। প্রকৃত প্রেম সর্ব্বজয়ী! অলোকা! অলোকা! যে দিন আমি তোমায় লাভ কর্‌বো, সে দিনই এ জীবন যৌবন ধন্য হবে। এই দক্ষিণ বাহু আর তুমি ভিন্ন, এ জগতে বিনায়কের আর কিছুই ঈপ্সিত নেই। রাজ্য! রাজ্য জয় ও বিস্তারেই আনন্দ। ভোগে কি সুখ? রাজা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি যোগসিদ্ধ হবেন। জীবনে কখন নারীমুখ সন্দর্শন কর্‌বেন না। অগত্যা আমাকেই এ রাজ্যের ভবিষ্য রাজা বলে কল্পনা কর্‌তেই হবে। আমার কিন্তু রাজ্য পালনে আনন্দ নেই। সেনাপতি মাত্র থেকে, প্রয়োজন কালে যুদ্ধ; আর শান্তির সময় রাজধানীর বাইরে একটী ক্ষুদ্র গৃহস্থালী মধ্যে অলোকার সঙ্গসুখ এই আমার কাঙ্খিত। যা হোক্‌ অলোকাকে পেলে, রাজ প্রাসাদ বা কুঞ্জকানন কোন স্থানই আনন্দহীন হবে না।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

—§*§—

স্থান তিপ্পকুল পুষ্করিণী, পাষাণ সোপানোপরি অলোকা।

অলোকা—

আমি কেমনে জানাবো বল কারে,
যে যাতনা ফিরে যে'তে ফিরাইতে তারে।
যাহার লাগিয়া এত সহি শত মর্ম্মাঘাত,
বেদনা ঢাকিতে তত ব্যথা দিই তারে,
অশ্রুবারি মুছাইতে অশ্রু বহে শতধারে॥

কাঁদালেই কাঁদ্‌তে হয়। প্রতিদিনই কি আশাভরা হৃদয় নিয়ে দেখা দেন; আর যখন ফিরে যান, তখন সেই পুর্ণিমার চাঁদ যেন রাহুগ্রস্ত হয়ে যায়! আমায় এ কি মহা পরীক্ষায় ফেল্লে প্রভু! আমিই বা কি করি? কি করি আমি? প্রাণ আমার যেন বা'র হবার যোগাড় হয়েছে। সারা চিত্ত যাদের জন্য হাহাকার কচ্ছে, সেই ইহপরলোকের মধ্যে প্রার্থিততম দুটী বস্তুই আমার নিজের হাতে বিসর্জ্জন করতে হবে। এ কি কম শাস্তি আমার? এক নিলে দুই-ই পাওয়া যায়। একের প্রত্যাখ্যানে ইহজন্মের সার সুখ দুয়েরি বিদায় অভিবাদন। বিনায়ক! বিনায়ক! স্বামি! প্রভু, সখা আমার! তুমি কি জান্‌বে তোমার রাজ-সম্মান,—তোমার ভবিষ্য সন্তানের মাতৃগৌরব অক্ষুন্ন রাখ্‌বার জন্যই, শুধু অভাগিনী অলোকা কি বজ্রানলে দগ্ধ হয়ে, তোমায় এ তীক্ষ্ণধার ছুরিকাঘাতে আহত কর্‌তে বাধ্য হচ্ছে! কেন তুমি শুধুই সেনাপতি রইলে না? কেন বিজয়নগরের ভবিষ্য সম্রাটপত্নীর মহোচ্চপদ প্রদানে ত্যাগশীল মহারাজ আমায় সম্মানিত করণের প্রতিজ্ঞা করলেন? তাই আজ তোমরা উভয়ভ্রাতাই অসুখী! রাজার হৃদয় অপার্থিব ধনের রত্নাগার, তাঁর এ'তে ক্ষতি হবে না, কিন্তু তুমি যে কত বড় আঘাত পাচ্ছ, আর সে আঘাত যে আমার বুকেই শেলের মত বাজ্‌চে। কিন্তু উপায় নেই,—কোন উপায় নেই! এরাজ্যের সাম্রাজ্ঞী অজ্ঞাত কুলশীলা চাষার মেয়ে? এ অপমানে তুমি রাজন্যবর্গের মধ্যে মাথা তুল্‌বে কেমন করে? এর ফলে হয় ত তোমার সন্তানগণ, প্রজাবৃন্দের পূর্ণ শ্রদ্ধা লাভ কর্‌তে সমর্থ হবে না। লোকে হয় ত তাদের দাসীপুত্র বলে বিদ্রূপ কর্‌বে! তোমাদের বিন্দু ক্ষতি যেখানে, সেখানে আমার পূর্ণ সুখও কিছু নয়। তবে আর তোমার প্রতি আমার ভালবাসার গভীরতা কোথায়? কিন্তু উঃ—কেমন করে আমি এত বড় প্রলোভন থেকে নিজেকে মুক্ত রাখি? বিজয়নগরের সিংহাসন! সে যে আমার সাধনার স্বপ্ন! আর তার চেয়েও বড় তোমার অমর প্রেম! কেমন করে আমি অত বড় সুখে নিজেকে চিরবঞ্চিত কর্ব্বো? ওগো! এত বড় শত্রুতা যে অতি বড় শত্রুতেও কর্‌তে পারে না। এ কি সওয়া যায়? (নীরবে রোদন)

(ধীর পদবিক্ষেপে বিনায়কের প্রবেশ)

বিনা। কোথাও সুখ নেই, রাজধানী যেন অরণ্য তুল্য মনে হয়, মনে করি আর আস্‌বো না। যে আমার এতখানি কাতরতায় বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না; কেন তার করুণা ভিক্ষায় আমি এমন উন্মাদের মত ছুটে বেড়াই? এ রাজ্যের সেনাপতি আমি, ভবিষ্যত রাজা আমি, আমার কিসের অভাব? নাই বা আমার অলোকা হইলো! বন পর্ব্বতাকীর্ণ অসভ্য প্রদেশ সকল জয় করে, রাজ্যবিস্তার কল্পনা এবার কার্য্যে পরিণত করি না

কেন? নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র রাজ্য সকল আমরা অনায়াসেই আমাদের সাম্রাজ্য ভুক্ত কর্‌তে পারি। কিন্তু সেরূপ পররাষ্ট্রলোলুপতা আমাদের মধ্যে নেই। এ সকল রাজ্যাধিবাসীগণ হিংসালেশহীন নিরীহ, ওদের উচ্ছেদে ফল কি? তবে আরণ্যক হিংস্র জাতিদের স্ববশে আনয়ন অধর্ম্মজনক মনে হয় না। কেন না ওরা মানবধর্ম্মের এখনও সম্পূর্ণ অধিকারী নয়। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান, শিল্প ওরা কিছুই জানে না। বহু প্রদেশ ওদের দ্বারা অধিকৃত থাকায়, অনেক শস্যপ্রসবিনী ভূমি অকর্ষিত আছে। ওদের অত্যাচারে অনেক হীনবল প্রজা, অত্যাচারিত হওয়ায় অনেক সময় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তও হতে হয়। কিন্তু দূর হোক ও সকল ভাবনা। অলোকার এ অন্যায় পণ আমি যে কোন মতেই সহ্য কর্‌তে পার্‌ছিনে। অন্য কোন বিষয়ে মন দেবো কি, মন আমার সে যেন চূর্ণ করে দিয়েছে। যা হোক্ আজ আবার একবার ভাল করে বুঝিয়ে দেখি, কি হয়! আচ্ছা, এর ভিতর আর কোন কথা নাই তো? অপর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী? যদিও কখন এ অসম্ভবকে সম্ভব মনে হয়নি, কিন্তু এ ভিন্ন এত বড় অনিচ্ছা, আর কিসের হ'তে পারে, তাও তো কিছু বোঝা যায় না? (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) না, আমি এ কি মনে কর্‌ছি? যতই হোক্ বিজয়নগরের যুবরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী একটা নগণ্য ক্ষুদ্রজীবি বনবাসী বা নাগারক কখনই হ'তে পারে না। ঐ যে অলোকা এখানে! (নিকটবর্ত্তী হইয়া) অলোকা!

অলো। (চমকিয়া) কে যুবরাজ।

(সসব্যস্তে অঞ্চলে অশ্রুমোচন)

বিনা। (অলোকার মুখের দিকে সন্দেহকঠোর নেত্রে চাহিয়া স্বগতঃ) অলোকা, কাঁদ্‌তে জানে? অলোকা লুকিয়ে কাঁদে? কিসের এ রোদন? (প্রকাশ্যে) তুমি কাঁদছিলে অলোকা? কেন?

অলো। (অশ্রু সংবৃত্ত হইয়া) এ রাজ্যে কারু ইচ্ছামত হাসবার কাঁদবার অধিকারও নেই না কি যুবরাজ? সকল কাজের সকল সময়ই কি রাজদরবারে জবাবদিহি কর্‌তে হবে?

বিনা। (নিঃশ্বাস ফেলিয়া) এই প্রশ্নের কি এই উত্তর অলোকা?

অলো। এ ভিন্ন আর কি সদুত্তর হ'তে পারে তো শিখিয়ে দিন দেখি।

বিনা। (পুনশ্চ সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আমার ভাগ্য!......

অলো। (সকৌতুক হাস্যের সহিত) আপনার সহিত ভাগ্য পরিবর্ত্তন কর্‌তে পেলে, এ রাজ্যের সাড়ে তিন কোটী লোকের মধ্যে দু একটা হতভাগ্য ব্যতীত, বোধ করি আর সকলেই বেঁচে যায়!

বিনা। বোধ হয় সে দু একজন ভাগ্যবানের মধ্যে তুমিও একজন?

অলো। তা হ'তে পারে। আপনার কি আজকাল হাতে কোনই কাজ নেই না কি?

বিনা। (অদূরে বসিয়া) আমার শত কাজের মধ্যে এ ও যে এক প্রধান কাজ অলোকা। তাই তুমি ঘৃণা করে তাড়িয়ে দিলেও বিদায় নিতে পারিনে। এই পদাহত ঘৃণ্য জীবন নিয়ে কেবলি ফিরে ফিরে তোমায় জ্বালাতে আসি। আমার মনে হয় এর বাড়া কাজ আমার আর কিছুই নেই।

অলো। (নদীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া সচেষ্ট হাস্যে) কি স্ত্রীলোকের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধ করা?

বিনা। না, শেখা, (ব্যথিত ও ভৎসনার সহিত) অলোকা পাষাণে যদি প্রাণ থাক্‌তো, তবে সেও কবে গলে জল হয়ে বয়ে যেতো, তোমার রক্তমাংসের শরীরে এতটুকু দয়ামায়াও নেই কি? না হয় আমায় নাই ভালবাস, না হয় আমার কাছে তুমি সুখী নাই বা হ'লে, তবু এত বড় সুখস্বপ্ন আমার তুমি ভেঙ্গে দিও না। আমি মনে কর্‌বো তুমি আমায় ভালবাস। আমি সেই স্বপ্নেই বিভোর হয়ে প্রাণ দিয়ে তোমায় ভালবাসবো।

শুধু তুমি আমার হয়ে আমার ঘরে চল। আর আমি তোমার কাছে কিছু চাইবো না, দেবীমূর্ত্তির যেমন প্রতিষ্ঠা করে সাধক তায় পূজা করে, আমি তোমায় তেমনি আমার রাজপুরলক্ষ্মীরূপে প্রতিষ্ঠা কর্‌বো। আমার প্রতি এইটুকু দয়া কর, তোমায় না দেখেও যে আমি বাঁচবো না।

অলো। (সবলে অধর দংশন করিয়া স্বগতঃ) আর ত পারিনে, যা হয় হোক্, পাপ হয় পাপী হবো, একি শোনা যায়? (প্রকাশ্যে) যুবরাজ! আমি নিতান্ত নিরুপায়েই শুধু আপনাকে······

বিনা। (অতিশয় কাতরভাবে) আবার সেই নিরুপায়ের কথা শুনাবে? না যথেষ্ট হয়েছে, আরও স্তোক-বাক্যে ভোলাবার চেষ্টায় কাজ নেই, নিরুপায়? কিসের নিরুপায় তুমি? আমি যেমন মূঢ়, তাই তোমার কাছে দয়ার প্রত্যাশায়, বৃথায়ই কাঁদতে আসি। (সক্রোধে) তোমার মত নিষ্ঠুর পাষাণীর কাছে যে কৃপা ভিক্ষা করে, সে রাজ্যের একটা দীনহীন ভিক্ষুকের চেয়েও অধম! পথের কুক্কুরের চেয়েও নীচ! আর না!

(বেগে প্রস্থান)

অলো। (বজ্রাহতবৎ থাকিয়া) বুঝি এই ভাল হলো! এখুনি কি বল্‌তে হয় ত কি ব'লে ফেল্‌তাম! কিন্তু এ রাগ কতক্ষণের? আবার হয় ত কালই ফিরে আসবেন। কি উপায় করি? না হয় প্রভুকেই সকল কথা খু'লে বলিগে। কিন্তু কি করে বল্‌বো! বল্‌তে বড় লজ্জা করে যে, আচ্ছা, এই আবার এক আপদ কোথা হতে জুটলো বল দেখি? লজ্জা সরম তো কখন কর্‌তে শিখিনি। কিন্তু ওঁর নাম লোকের সাক্ষাতে এমন করে মুখে বাধে; মনে হয় কে হয়তঃ কোন্ ছলে সব জে'নে ফেল্‌বে। আর সমুদয় তাঁর কর্ণগোচর হ'য়ে যাবে। মনে করি এ মোহ কেটে গেলে, কোন রাজকন্যা পত্নী ঘরে এনে, তিনি এ দুদিনের স্বপ্ন ভুলে গিয়ে সুখী হবেন। তাঁর বংশগৌরবও অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে, কিন্তু যে রকম কর্‌ছেন মনে হয় না যে, আমি সরে থাক্‌লেই তাঁর প্রভাব দূর হবে। মহারাজ নীরবে যে পণ রক্ষা কর্‌লেন উনি তাঁর ভাই, বোধ করি সরবে সেই টুকুই পালন কর্‌বেন। বংশটা হয় ত এই সর্ব্বনাশীর জন্যই লোপ হবে! দেখি আজ যদি মিটে থাকে ভালই, না হয় তো প্রভুকে জানাতেই হবে। তা ভিন্ন আর উপায় কই?

পঞ্চম অঙ্ক।

—§*§—

প্রথম দৃশ্য।

স্থান তপোবন, তরুতলে শিলাসনে আসীন বিদ্যারণ্য।

বিদ্যা। এ রাজ্যের প্রতি সকল কর্ত্তব্য আমার প্রায় শেষ হয়েছে। কেবল এখনও একটী কার্য্য বাকী, সেটুকু সমাধা হলেই এর সঙ্গে সকল সম্বন্ধ পার্থিবভাবে দূরীভূত হয়। অলোকাকে যথাযোগ্য স্থানে স্থাপন করাই, শুধু এ পর্য্যন্ত ঘটে' উঠেনি। এইবার তাকে বিবাহিতা এবং পতিগেহে প্রেরণ পূর্ব্বক কণ্ব মুনির শকুন্তলা পালনের ন্যায়, আমারও এই অনাথা কন্যা প্রতিপালন সমাপ্তি হবে। আজই তাকে সকল বিষয় জ্ঞাত করাবো স্থির করেছি। অলোকা!

(অলোকার প্রবেশ ও প্রণাম)

বিদ্যা। বৎসে! তোমায় এত ম্লান দেখ্‌ছি কেন?

অলো। (রোদনরুদ্ধ কণ্ঠে) পিতা! কেমন করে আপনাকে সে সব কথা নিবেদন করবো।

(অধোমুখে স্থিতি)

বিদ্যা। (স্নেহ স্বরে) আমায় জানা'তে লজ্জা কি মা? পিতা, গুরু, সন্ন্যাসী এঁদের নিকট অতি গোপনীয় বিষয়ও অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রকাশ করা যায়।

অলো। (লজ্জা কাতরতার সহিত) পিতা! যুবরাজ আমায়, তাঁর ভবিষ্যৎ মহিষীর পদ প্রদান করতে চান, কিছুতেই আমি তাঁর এ মতি পরিবর্ত্তন করতে সক্ষম হচ্ছিনে। আপনি এর কোন উপায় করুন।

বিদ্যা। যুবরাজের এ উচিৎ প্রস্তাবে অনাস্থা প্রদর্শনের তোমার কারণ কি? তুমি কি তাঁর সহধর্ম্মিণী হতে অনিচ্ছুক?

অলো। (ব্রীড়ানত মুখে) আপনি তো জানেন, আমার পক্ষে সে আশা দুঃস্বপ্ন মাত্র।

বিদ্যা। এ কথা কেন বল্‌ছ?

অলো। আমি অজ্ঞাত কুলশীলা দরিদ্রা, অনাথা। প্রজা সাধারণ কি তাদের এমন রমণীকে শ্রদ্ধা করতে সমর্থ হবে? না আমার ভবিষ্য সন্তান, রাজন্য সমাজে বরেণ্য হতে পারবে? লোকে তাদের দাসীপুত্র ব্যতীত আর কোন্ আখ্যা দিতে পারে? আপনি তো জানেন প্রভো! আমি মদ্র-মণ্ডলের রাজচক্রবর্ত্তীর মহিষীর পদ প্রাপ্তির যোগ্যা নই।

বিদ্যা। (হাসিয়া) মদ্রভূমির সম্রাট দুহিতা, আজ সে রাজ্যের অধিশ্বরী হবার অযোগ্যা, কে এমন কথা বল্‌বে, অলোকা?

অলো। (তড়িৎ বেগে উঠিয়া উচ্চ কণ্ঠে) এ কি সত্য, না স্বপ্ন! পিতা! পিতা! প্রভু! বলুন,—বলে দিন এ স্বপ্ন নয়, সত্য! আমার প্রাণে যে, সদাসর্ব্বদা ঐ কথাই বলে! মন আমার অহর্নিশি কি অচ্ছেদ্য আকর্ষণ পাশে আকৃষ্ট হয়ে, ঐ রাজধানী মধ্যে, রাজসিংহাসনের চারিপাশে অহরহঃ যে আবদ্ধ হয়ে ফিরেছে। সে পাশ কি কখন মিথ্যার পাশ হ'তে পারে? পিতঃ! পিতঃ! আমার অভাগিনী জননী! মা, মা, মা আমার! মহারাণী অম্বিকা! আজ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, কেন সে শোকের উত্তাল তরঙ্গে অমন বিভীষিকাময়ী ফেন বুদ্‌বুদের ক্রীড়ায় তাঁর সারাপ্রাণ দিবারাত্রি উদ্বেলিত হ'তে থাক্‌তো। প্রভো! কোথায় স্নেহময় রাজ্যেশ্বর পিতা আমার! (রোদন)

বিদ্যা। অলোকা! তোমার জীবনাকাশে দুঃখের ভয়াল কালো মেঘ কেটে গেছে, তোমার স্বর্গগত পিতার ত্যক্ত সিংহাসন তোমারই সাহায্যে আজ নিষ্কণ্টক। যাও বৎস! অকুণ্ঠিত চিত্তে নিজের পূর্ণাধিকার গ্রহণ কর্‌তে যাও।

অলো। তবে এ সব কথা এতদিন গোপন ছিল কেন প্রভু?

বিদ্যা। কেন? হরিহর কি তোমার পৈতৃক সিংহাসন স্পর্শ কর্‌তো, যদি সে ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে পার্‌তো যে পূর্ব্ব রাজবংশের কেহ এখনও এ পৃথিবীতে বর্ত্তমান, আছে? অথচ দেশের এ অবস্থায়, তাঁর মত বিচক্ষণ রাজা ব্যতীত দেশের প্রকৃত উন্নতি হওয়াও সম্ভব ছিল না। বিনায়ক যোদ্ধা, অত বড় যোদ্ধা সেও নয়।

অলো। বুঝেছি প্রভো! তবে এ কাহিনী চির তিমিরাচ্ছন্নই থেকে যাক্। মহারাজ হরিহরের প্রয়োজন এখনও এ দেশে ফুরায়নি। দেশের লাভ ক্ষতির কাছে, ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ, সমুদ্রের কাছে গোস্পদ তুল্য।

বিদ্যা। মা সত্যবতী! তোমার ত্যাগেচ্ছাই মহাপ্রাণতার পরিচায়ক। না, বৎসে! চির অজ্ঞাত রাখ্‌বার প্রয়োজন নেই। যে দিন বিনায়ক রায়, বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহন কর্‌বেন, সেইদিন মহারাণীর প্রকৃত পরিচয় সাধারণ্যে প্রচারিত হবে। ততদিন পর্য্যন্ত এ সংবাদ উহ্যই থাক্।

অলো। দেব! আপনার কৃপায় এ জীবন আজ সকল সন্দেহমুক্ত ক্ষোভ মাত্র হীন! আমার মত সুখী বোধ করি আজ বিজয়নগরে নাই।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—ঃ*ঃ—

তপোবন লতাকুঞ্জ, ফুলসাজে সজ্জিতা অলোকা।

অলোকা। (পুষ্প চয়ন করিতে করিতে) আজ আমার মনটা যেন শরৎকালের অতি স্বচ্ছ সুনীল আকাশের মতই নির্ম্মল। এবং ঐ মৃদুমন্দ মলয়ার মতই লঘু মনে হচ্ছে! পৃথিবীটা আজ কি সুন্দর শোভাই না ধারণ করেছে! অপরাহ্ণের সোনালি আলোয় জল স্থল সমস্তই সোনামাখা। পাখীর গানে সারাপ্রকৃতি যেন মে'তে উঠেছে। ফুলগুলোর গন্ধও কি আজ বদ্‌লে গেছে? বিশ্বসংসারটা যেন আগাগোড়া নূতন করে কে ভেঙ্গেচুরে গড়েছে। (হাসিয়া) তা নয়, মনটাই আমার এই নূতনের সৃষ্টিকর্ত্তা। বন্ধ-মোক্ষ সবই যে মনঃকল্পিত বলে গুরুদেব তাঁর 'পঞ্চদশীতে' প্রমাণ দিচ্ছেন; তা আজ আমি নিজের মন থেকে সেটা খুবই প্রত্যক্ষ কর্‌ছি। মনেই সব, এর বাহিরে কোথাও কিছু নেই। এতেই নরকযন্ত্রণা স্বর্গসুখ. ব্রহ্মালোকের শান্তি; হেন বস্তু নেই যা ভোগ করা যায় না। ক'দিন কি অন্ধকারেই আমার কাছে এ পৃথিবী কালীমাখা হয়ে উঠেছিল। আর আজ তাতেই এত আলো—এত শোভা! এই ফুলের রাশি দিয়ে আরও মালা গাঁথি। (উপবেশন ও মাল্য গ্রন্থন) গায়ে তো আর ধরে না। এ মালাটা নিয়ে তবে কর্‌বে কি? (হাসিয়া) তাঁর গলায় পরিয়ে দেবো নাকি? সলজ্জ ভাবে) মন আমার এমনি উতলা হয়েছেই বটে! তা' মনেরই বা দোষ কি? ওকে তো আর কোন পীড়ন করা হয়নি। বিশেষ সেই যে রাগ করে চলে গেছেন, এ দু'দিন আর তো দেখা নেই! আজ সেই রুদ্ধ জলের স্রোত বাঁধ ভেঙ্গে ফেলেছে। আর তাকে কে ফিরায়?

গীত।

খাম্বাজ।

কেমনে পরাণ মম স্থির হয়ে রবে হায়।
ছুটেছে আজ মনের নদী বাঁধন ভাঙ্গা জলের প্রায়॥
বন্যা এলো পাহাড় হ'তে ভাসাল কূল অকূল স্রোতে,
প্রাণের টানে সাগর পানে ভেঙ্গে দুকূল ছুটে যায়॥
পাগলপারা আকুলধারা অসীমে মিশাতে চায়।
হৃদ্‌সাগরে ঢেউ উঠেছে কেমনে ফিরাব তায়॥

তা' ফিরাবই বা কেন? আজ তো আর এই হৃদয়ধারা পঙ্কিল সরোবরমাত্র নয়, স্বচ্ছ স্রোতস্বতীরই এ জল যে, সাগর ব্যতীত এর গতি আর কোথায়ই বা হবে? মহারাজ জম্বুকেশ্বরের কন্যা, মহারাজ হরিহরের ভ্রাতৃবধূ কেন না হ'তে পার্ব্বে? কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য সংঘটন! আমার প্রাণের টানই যেন, আমার এর মধ্যে এমন করে টেনে নিয়ে এলো! আর সেই সর্ব্বশক্তিমতি মহামায়া, যিনি সকল কার্য্যের নিয়ন্ত্রী, তিনিই মুখ্যতঃ এই অপূর্ব্ব

নাটকের নাট্যকার।—কিন্তু কই ? এখনও কেন এলেন না ? তবে কি আর আস্‌বেন না ? (অদূরে বিনায়কের প্রবেশ) ঐ যে, ঐ না তিনি আসছেন ; উঃ কি আনন্দ আজ আমার হচ্ছে ! ইচ্ছা হচ্ছে এখনি ছুটে গিয়ে ওঁর পায়ের তলায় নিজের সর্ব্বস্ব—আর নিজেকে শুদ্ধ সমর্পণ করে দিই গে। এতদিনকার সমুদয় ছদ্মবেশের খোলস্‌টা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে, নিজের যথার্থ হৃদয়টাকে ওঁর চোখের সাম্নে মুক্ত করে দিয়ে যুক্তকরে বলি, তোমারই জন্য হে আমার হৃদয়মন্দিরের আরাধ্য দেবতা!—শুধু তোমারি সুনাম রক্ষার জন্য তোমাকে এই কষ্ট দিয়েছি!—দিয়েছি বটে, কিন্তু কতখানি যে নিজে নিয়েছি, তা তো তুমি জান্‌তে পারনি। গোপনে নীরবে জ্বলায় কি যে অরুন্তুদ যন্ত্রণা, সে আর কে জানবে ? কিন্তু আজ আমায় গ্রহণে, তোমাদের সম্মানের এতটুকু হানি হবে না। তাই আজ নিজে তোমার পায়ে ধরে ভিক্ষা চাইছি, আজ আমায় তুমি গ্রহণ কর, এখন এ কথা বল্‌তে আর আমার একটুও বাধবে না। কেননা আজ আমি তাঁর মহিষীপদের অযোগ্যা নই। (অগ্রসর হইয়া) আমি তোমারি জন্যে প্রতীক্ষা করছিলেম, এ দুদিন আসনি কেন ?

বিনা। (অলোকার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া স্বগতঃ) উঃ—এত বড় নির্লজ্জা নারী বোধ করি, ভূভারতে আর কখনো জন্মগ্রহণ করেনি, দুদিন আমি না আসায় পাপিষ্ঠা নিশ্চিন্ত মনে নিজের প্রণয়ীর সঙ্গসুখ আনন্দে বিভোর হয়ে আছে ! দুটি দিনে একি পরিবর্ত্তন ! যেন একটা নবযুগ ওর উপর দিয়ে চলে গেছে ! চোখ মুখের সে ক্লান্ত বিষণ্ণতা আর নেই। সে রোদনারক্ত নেত্রে আজ উজ্জ্বল আনন্দের পূর্ণ দীপ্তি, বেশ-ভূষারই বা কি পারিপাট্য ! নিশ্চয়ই এই পুষ্পভূষণে সেজে নাগরীক প্রণয়ীর আশাপথ চেয়েছিল ! অথচ এমনি লজ্জাহীনা অনায়াসে ব'লে বস্‌লো "তোমার প্রতীক্ষা কর্‌ছিলাম !". এত বড় ছলনাময়ী রাক্ষসীকে নরদেহ ধরে কেউ ভালবাস্‌তে গেলে, তার অদৃষ্টে আর এর চেয়ে অন্য কি লাভ হবে ? (প্রকাশ্যে) আমার এত বড় সৌভাগ্য কবে হ'তে হ'লো ? আমি তো জান্‌তেম, আমার প্রতীক্ষার কালে অশ্রুজলের বন্যাই প্রবাহিত হ'তো !

অলো। না না, বিনায়ক ! আজ আমার এ আনন্দের সময়ে সে পুরাতন প্রসঙ্গ উত্থাপিত করে আমায় লজ্জা দিও না। সে কথার বিচার এর পরে অন্য সময় করো। আজ শুধু আমার এই অসীম সুখের একটুখানি অংশ নিয়ে নিজেও সুখী হও। আমার মনে হয়েছিল বুঝি তুমি আজও আস্‌বে না। যদি—

বিনা। (পশ্চাতে হটিয়া) তাই মনে করেই নিশ্চিন্ত মনে ফুলের সাজে সেজে, "অসীম আনন্দ পূর্ণ চিত্তে" তোমার অন্তরঙ্গ প্রণয়ীর প্রতীক্ষার পথ চেয়ে ছিলে ? ধিক্ আমায়, তাই আমি জন্মের শোধ বিদায় নিতে আবার তোমার কাছে এসেছিলেম। আর শতধিক তোমায় লজ্জাহীনা নারি ! নিজের এ নীচ আনন্দের কথা, আমার কাছে ব্যক্ত কর্‌তে তোমার ও-পাপজিহ্বায় এতটুকু বাধিল না ?

অলো। যুবরাজ ! এ সব কথার অর্থ কি ?

বিনা। (পরুষ কণ্ঠে) পাপিষ্ঠা ! মায়াবিনি ! এর অর্থ কি তুমি কিছুই জান না ? আমায় প্রত্যাখ্যান করে, তোমার কোন প্রণয়ীর বক্ষে লুণ্ঠিত কর্‌তে ওই ফুলের মালা নিয়ে, এই মোহনসাজে সেজে এ কাননভূমে একাকিনী বসে আছ ? বিশ্বাসঘাতিনি ! রাক্ষসি ! আমার সন্দেহ আজ সম্পূর্ণ সত্যে পরিণত হয়ে গেল ! এই জন্য তোমার—রাজ্য ধন আমার এই অতুল অসীম প্রেম, কিছুতেই প্রবৃত্তি হ'লো না ? ধিক্ ও-ক্ষুদ্র লালসায় ! নীচ গৃহে জন্ম নিলে, মানুষের প্রবৃত্তিও নীচ ভিন্ন কখনই উচ্চ হ'তে পারে না।

অলো। বিনায়ক! বিনায়ক! জান তুমি কা'র সঙ্গে এমন করে কথা কইচো? কা'কে অত বড় অপমান কর্‌তে তুমি সাহসী হচ্ছো তা কি তোমার ধারণা আছে? এই মুহূর্ত্তে যে নারকীয় মিথ্যা, ঈর্ষাবিষদিগ্ধ চিত্ত তোমার ঐ পাপজিহ্বায় এনে দিয়েছে, জান সেই ভয়ঙ্কর অসত্যকলঙ্ক, কার নামে প্রচার কর্‌তে যাচ্ছ! যার সাম্‌নে জানু নত করে, যার প্রত্যেক আদেশ পালন কর্ত্তে তুমি বাধ্য,—এতদূর স্পর্দ্ধা যে তুমি তাকেই ক্ষুদ্র একটা বারনারীর ন্যায়, অকথ্য তিরস্কার কর্‌তে কুণ্ঠিত হচ্ছো না!

বিনা। (রুষ্ট হাস্যে) তা বই কি! নারীপ্রেম ভিক্ষা, চিরদিন নতজানু হয়েই কর্‌তে হয়। শুনেছি বটে। তবে এ সকল বিষেয় আমি নিতান্ত বড় আনাড়ি। কিন্তু আপনার দেখ্‌ছি এ সব শাস্ত্রে যথেষ্টই দখল হয়েছে! বিশেষতঃ আমি যুদ্ধ ব্যবসায়ী, আমার কঠোরবক্ষে ও ফুলের মালা সাজ্‌বে কেন?

অলো। বিনায়ক রায়! যথার্থই কি তুমি মহারাজ হরিহর রায়ের সঙ্গে এক মাতৃগর্ভে স্থান লাভ করেছিলে? আর এই অবিশ্বাসভরা হৃদয় তুমি মহারাজ জম্বু—(বাক্য সম্বরণ করিয়া) এই ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ, অতি পঙ্কিল, ভালবাসারই এতদিন এত গর্ব্ব করে বাড়িয়েছ? এরি নাম, তোমার "অতুল প্রেম?" (সক্ষোভ হাস্যের সহিত) তোমার 'অতুল প্রেম' তোমারই থাক্‌। আমার কাছে ওর কোন মূল্যই নেই জেনো। আমার এতক্ষণের আনন্দস্বপ্ন মহাশূন্যে চিরনির্ব্বাণ লাভ করেছে!

বিনা। অলোকা! তোমার মুখে এ ধিক্কার শোভা পায় না! আমার ভালবাসা সঙ্কীর্ণ কিনা।—সে প্রমাণ তুমি পেয়েছ। কোন্ মুখে আজ তার অপলাপ কর্‌তে চাও? কোন্ দেশের কোন্ রাজবংশীয় পুরুষ—রাজ সহোদর ভবিষ্য রাজদণ্ডধর অজ্ঞাত-কুল-শীলা নারীকে তার ভবিষ্য রাজমহিষী পদ গ্রহণের জন্য এমন করে মিনতি করে? তবু তুমি বল্লে আমার "পঙ্কিল প্রেম!" 'ক্ষুদ্র ভালবাসা!' উঃ—ধন্য তুমি!

অলো। "অজ্ঞাত-কুল-শীলা!" ওঃ মহত্ত্বের সীমা হয় না বটে! মনের মধ্যে ঐ পরিচয়টুকু কৃপার সঙ্গে জাগ্রত রেখো। 'নীচ বংশের' লাঞ্ছনা—জিহ্বামূলে ঢাকা দিয়ে, এ অতুল প্রেমের লীলা, খুব উদারতারই পরিচায়ক! যে ভালবাসায় প্রেমাস্পদের প্রকৃত পরিচয় চিনিয়ে দিতে সক্ষম হয় না,—সে প্রেম নয়, মোহ! এই স্বহস্তগ্রথিত পুষ্পমাল্যে আজ আমি যে অমরপ্রেমের পূজা প্রতীক্ষা কর্‌ছিলেম, এই মমত্বে পরিপূর্ণ দাম্ভিকতা, সে পূজার বস্তু নয়। আমার সকল স্বপ্ন টুটে গেছে, তবে এও তার অনুগামী হোক্‌।

(হস্তস্থিত পুষ্পমাল্য দলিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ)

বিনা। (অতি বিস্ময়ে) অলোকা! অলোকা! তবে কি আমারই ভ্রম? এতদিনে যথার্থই কি তোমার হৃদয় গলেছিল?

অলো। যদি গ'লে থাকে, আবার তা জমাট বেধে গেছে।

(প্রস্থানোদ্যতা)

বিনা। (নিকটে আসিয়া) তুমি আমায় দোষ দিচ্ছ, কিন্তু ভেবে দেখ, আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়া এতই কি বিচিত্র? কয়দিনের হতাশায় তুমি আমায় উন্মাদ করে দিয়েছিলে। সহসা তোমার এ মতি পরিবর্ত্তনে তাই আমার বিপরীত ধারণাই জন্মেছিল। আমার চিত্ত স্থির থাক্‌লে, কখনই এমন লঘু সন্দেহ জন্মাতে পার্‌তো না। আজ আমি রাজ্য পরিজন সমস্তই পরিত্যাগ করে, যথেচ্ছ চলে যাবো স্থির করেই, তোমার কাছে চিরবিদায় নিতে এসেছিলাম, এতেই বুঝে দেখ আমার মনের কি অবস্থা!

অলো। (স্থিরস্বরে) চিরবিদায় নিতে এসেছিলে! বেশ তাই নাও।

(প্রস্থানোদ্যতা)

বিনা। (হাত ধরিয়া) অলোকা! অলোকা! ক্ষমা কর, হাত ধরে ক্ষমা চাইছি, নিজের দুর্ব্বলতা স্বীকার করছি, তবু এ মুহূর্ত্তের অপরাধ ভুল্‌তে পার্‌বো না? ক্ষমা নারীর স্বভাবজ ধর্ম্ম। জননী ধরিত্রী নিজে চির-ক্ষমাময়ী কখন তেমন অন্ধআবেগে ভালবাস নাই, তাই জান না যে, এ কি? এতে মানুষকে উন্মাদ করে!

অলো। ধরণীর মত ক্ষমাময়ীও মধ্যে মধ্যে ভূমিকম্পে নিজের অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে ফেলেন, আমি কোন্ ছার। আপনি আমায় দয়া করে মুক্তি দিন যুবরাজ! আমার আজ আর কাকেও ক্ষমা করবার সাধ্য নেই (হস্তাকর্ষণ)।

বিনা। (সবলে হাত চাপিয়া) কোথায় যেতে চাও পাষাণি! যদি আসন টলেছে, তবে আর ছেড়ে দিব না, ক্ষমা কর না কর, আমায় ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বে না।

অলো। (হস্ত মুক্ত করিয়া) আজিকার এ ঘটনার পর, আর আমাদের মধ্যে সে পবিত্র সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে না যুবরাজ! আপনার মনের ভিতর একবার যখন অবিশ্বাসের বজ্র গর্জ্জন করে উঠেছিল, তখন ওর মধ্যের সূক্ষ্ম বিদ্যুৎ ওখানে চির বর্ত্তমান থাক্‌বেই, আর আমিও আমার এ বিশ্বাসঘাতক মনকে, এ জীবনে কোন মতেই, আর ক্ষমা কর্‌তে পার্ব্বো না। মা ভুবনেশ্বরী আপনার মঙ্গল করুন; জন্মের মত বিদায়!

(প্রস্থান)

বিনা। (স্তম্ভিত থাকিয়া) একি হ'লো! একি কর্‌লেম! ও যে বজ্রের মতই কঠিন, এ ক্রোধ কখনই যে, যাবে এমন আশা কর্‌বারও আমার কিছু নেই! নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর! এই তোমার বিচার হলো? এক মুহূর্ত্তের ভ্রমে আমার প্রতি এ কি জীবনব্যাপী ভীষণ দণ্ডাদেশ!

(মুহ্যমানভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

ভুবনেশ্বরী মন্দিরের সম্মুখ।

এক দল বৈরাগীর গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

গীত।

দেখ সংসারী, চেয়ে দেখ আজি।
(এই) সংসার-সুখ যত ছায়াবাজি ॥
সুখসাধ জেন শুধু দুঃখেরি কারণ।
আশা সতত করে অন্তর শোষণ ॥
মর্ত্তে পড়িবে টুটে কে জানে কখন।
বিমান বিনির্ম্মিত হর্ম্ম্যরাজি ॥

মেঘহীন নির্ম্মল নীলাকাশে,
হাসে রবি হাসে শশি তারকা হাসে,
কখন সে হাসিরাশি গ্রাসি নিমেষে
　　ভয়াল করাল মেঘ উঠিবে সাজি ॥
সুখসাধ যত সব পরিহর,
বিষম বিষয় বিষ ত্যাগ কর,
আশা-পিয়াসা কর দূরতর,
　　হৃদয় নিহিত কর কামনারাজি ॥

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

—:*:—

বিদ্যারণ্যের কুটির।

বিদ্যারণ্য ও অলোকা।

অলোকা। আমার সকল কথাই আপনাকে নিবেদন করেছি,-- আমায় এখন আপনার পাদপদ্মে একটু স্থান দান না কর্‌লে, আমি আর দাঁড়াই কোথা? শৃঙ্গেরি যাচ্ছেন, আমায়ও সঙ্গে নিয়ে চলুন।

বিদ্যা। অলোকা! বেশ করে ভেবে দেখেই কি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছ? অথবা ক্ষণিকের চিত্ত বিকলতায় উদ্ভ্রান্ত হয়ে মন তোমার একথা বল্‌ছে? এক দণ্ডের একটা ক্ষুদ্র মনোমালিন্যের উপলক্ষে চির জীবনের সমুদয় আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দেওয়া তো সহজ নয়। হয় তো ভবিষ্যতে এই বুদ্ধিবিপর্য্যয়ের জন্য তোমায় অনুতাপিত হ'তে হবে। বৎসে! ক্রোধ বা অভিমানের বশীভূত হয়ে যথেচ্ছাচরণ নিতান্ত অন্যায়—স্বেচ্ছাচার অধর্ম্ম।

অলোকা। আমার মন এখন আর ক্রোধ বা অভিমানের বশে বিন্দুমাত্র অভিভূত নয়। অনেক দিন ভেবে দেখেই, আমি আমার জন্য এই পথ স্থির করেছি। তাঁর মনে আমার সম্বন্ধে অত বড় একটা সন্দেহ তো জাগ্‌তে পেরেছিল! যা ভেঙ্গে যায়, তা' আর ঠিক তেমনভাবে জোড়া লাগে না। কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা এই যে, আমি নিজেই নিজের কাছে ঘোর বিশ্বাসঘাতিনী! কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও আমি মনে করেছিলেম; আমার প্রকৃত পরিচয় আমি তাঁকেও জানাবো না. তিনি জানেন; তিনি কৃপা করে এ ভিখারিণীকে রাজেন্দ্রাণী করছেন। এই আত্মপ্রসাদটুকু হ'তে, কেন আমি তাঁর করুণাভরা হৃদয়কে বঞ্চিত কর্‌বো! কিন্তু তার পরমুহূর্ত্তেই, তাঁর কাছে আকস্মিক আঘাত পেয়ে আমার সমস্ত সংকল্প এক নিমিষে কোথায় ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে গেল! তাঁর সেনাপতির সম্মান, যুবরাজের সম্মান, পুরুষের সম্মান, এমন কি আমার স্বামীর সম্মান শুদ্ধ ভস্ম ক'রে দিয়ে, মুহূর্ত্তে আমার সুপ্ত অহং অশনির ন্যায় গর্জ্জে উঠ্‌লো!

বিদ্যা। বৎসে অলোকা! তোমায় স্মরণ হয় কি, রাঘবকুললক্ষ্মীও একদিন তাঁর পূর্ণব্রহ্মরূপী মহৎপ্রাণ স্বামীর মুখে পুনঃ অগ্নিপরীক্ষা প্রস্তাব শ্রবণ করে, অমনি স্বরেই তাঁকে তিরস্কার কর্‌ছিলেন!

অলোকা। সেই আহত নারীত্বের অপমানে, আমার সতীতেজ তো পুনঃপরীক্ষাপ্রস্তাবকারী শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি সাধ্বীপ্রধানা সীতাদেবীর ন্যায়, সমুচিত তিরস্কার কর্‌তে যায়নি, প্রভু! সে যে তাঁর নিজের অভিমানে জ্বলে উঠে দলিতফণা ফণিনীর ন্যায়, গরলোদ্গীরণ করে, তাঁকেই দংশন কর্‌তে ছুটে গেল! সে ভীষণ মুহূর্ত্তে সে বিস্মৃত হয়ে গেল,—তিনি স্বামী সে স্ত্রী, তিনি প্রভু সে দাসী। সেই অপমানের জ্বালা তাদের সকল সম্বন্ধ মুছে দিয়ে, একমাত্র এই প্রচণ্ড অহঙ্কারকে জাগিয়ে তুল্লে যে, তিনি তার ক্ষুদ্র প্রজা মাত্র। আর সেই এ দেশের সর্ব্বময়ী সম্রাজ্ঞী! এ অবস্থায় আমাদের মধ্যে অত বড় পবিত্র সম্বন্ধ সংঘটিত হওয়া, কেবল পরস্পরকে ছলনা করা মাত্র। মনের মধ্যে এই পাপের গ্লানি সূক্ষ্ম রেখায় রেখে কি, সেই সুপবিত্র বেদমন্ত্রের উচ্চারণ করা সাজে? তাঁর মনের কালী, আর আমার মনের কালানল এই দুই-ই দু'দিকের চির ব্যবধান! আমারই বুঝিবার ভুল প্রভো! যদি যথার্থই আমি সেই অজ্ঞাত কুলশীলা অলোকা হ'তেম; তা হ'লেই বুঝি ভাল হতো। স্বামীর চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে কর্ব্বার, তা হ'লে এ পাপ মন কোন অবলম্বনই তো পেতো না! এখন আমার এই ভয়, আমার এই সংকল্প ত্যাগী মন, কেনই বা ভবিষ্যতে আবার এ অপরাধে অপরাধী হতে না পার্ব্বে?

বিদ্যা। বৎসে! চিত্ত তোমার অসংযত হয়ে, গুরু অপরাধে অপরাধী হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর প্রায়শ্চিত্তে, তুমি যে নিজের জন্য তুষানল ব্যবস্থা কর্‌লে, এ কি সইতে পার্ব্বে?

অলো। (কৃতাঞ্জলি হইয়া) প্রভুর কৃপা থাক্‌লে, নিশ্চয়ই পার্‌বো। বিজয়নগরবাসী চিরানন্দ লাভ করুক। আমাকে আর এদের কি প্রয়োজন? আমায় আপনি নিয়ে চলুন।

বিদ্যা। বালিকা তুমি; সন্ন্যাস ব্রত, তোমার মত রাজ দুহিতার জন্য নয়। এতে অত্যন্ত কঠোর তপস্যা-পরায়ণ চিত্তের প্রয়োজন।

অলো। বুদ্ধদেব তো দরিদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন নি! প্রভু! রাজার কন্যা আমি, কিন্তু রাজকন্যা তো নই!

বিদ্যা। (স্নেহস্বরে) তার চেয়ে আমি বলি—এক কাজ করা যাক্‌,—তোমার জীবন কাহিনী আমি কালই সাধারণ্যে প্রচার করে দিই। তোমার নিজ অধিকার তুমি ত্যাগ কর্‌তে চাইলেও আমরা তো তোমায় ত্যাগ কর্‌তে দিতে পারিনে।

অলো। (ম্লান মুখে) আপনি আদেশ কর্‌লে, সে আদেশ লঙ্ঘন কর্ব্বার শক্তি আমার নেই। কিন্তু এখন এ পরিচয়ও আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। আমার পরিচয়, মহারাজের রাজ্যভোগনিস্পৃহ চিত্তে আরও একটু ত্যাগের সুযোগ আনয়ন কর্ব্বে মাত্র। বিশেষতঃ আমি যখন লোকতঃ তাঁর পত্নী হতে পার্ব্বো না, তখন তিনিই কি জেনে শুনে আমায়, এই পৈত্রিক সাম্রাজ্যের ভার নিজে গ্রহণ কর্‌তে যাইবেন? আমায় দয়া করুন প্রভু! যে জীবন তিমিরাবৃত আছে, তা' চির অন্ধকারেই ঢাকা থাক্‌। আমি নিজে তাঁকে ত্যাগ কর্‌ছি, এই হৃদয়হীনতাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। একসঙ্গে তাঁর এ পৃথিবীর সমস্তই কি কেড়ে নেবো? এতখানি নিষ্ঠুরতা, আমার এ পাষাণ প্রাণেও যে সইবে না।

বিদ্যা। তোমার এ আত্মত্যাগ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

অলো। (বিদ্যারণ্যের পদধূলি লইয়া) যে আত্মদানে এতবড় অক্ষম; তার ভাগ্যে এমনি ত্যাগ ব্যতীত আর কি লাভ হ'তে পারে প্রভু! (নেপথ্যে পদশব্দ) ও কে আসে? (দেখিয়া) আমি চল্লেম আর সাক্ষাৎ নিষ্প্রয়োজন। (ব্যস্তে প্রস্থান)

(অপর দিক হইতে বিনায়কের প্রবেশ)

বিনা। প্রভুর দর্শন লাভে চরিতার্থ হ'লেম!

বিদ্যা। আয়ুষ্মান্ হও সৌম্য!

বিনা। (অধোবদনে) আমার কিছু ভিক্ষা আছে।

বিদ্যা। কি বল্‌বে বলো!

বিনা। (কাতর-কণ্ঠে) আমি আপনার নিকট বিচার প্রার্থনা কর্‌তে এসেছি। শুন্‌লেম অলোকা আমার রূঢ় ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে আমায় জন্মের মত ত্যাগ কর্‌তে উদ্যতা হয়েছে, আপনার সঙ্গে আজ সেও নাকি চিরদিনের মত শৃঙ্গেরি যাত্রা কর্‌বে, দেশে এইরূপই জনরব।

বিদ্যা। এইরূপই তার মনন।

বিনা। আপনি অবশ্য তাকে এই অবৈধ কার্য্যে নিষেধ কর্‌বেন! সেও নিশ্চয়ই আপনার আদেশ লঙ্ঘন কর্‌বে না।

বিদ্যা। যদি আমি নিষেধ করি, তবে খুব সম্ভব সে, সে নিষেধ পালনও কর্‌বে। কিন্তু আমি তাকে বুঝিয়ে এ পণ হ'তে নিবৃত্ত কর্‌বার জন্য চেষ্টা করেছিলেম, নিষেধ করিনি।

বিনা। কেন?

বিদ্যা। তার যুক্তি অকাট্য!

বিনা। (বেদনাদিগ্ধ যন্ত্রণায়) আমার সেই ক্ষণিকের বাতুলতা কি চির অমার্জ্জনীয়?

বিদ্যা। বৎস! স্থির হয়ে বসো! শান্ত হও, শোন! যদিও অলোকা তোমার এই বিশ্বাসচ্যুতিকে বড় প্রবল-ভাবেই নিয়েছে, কিন্তু ইহাই প্রধান নয়, সে তোমার প্রতি তার নিজের অন্যায় ব্যবহারকে, ক্ষমা কর্‌তে পারেনি বলেই, এত বড় কঠিন দণ্ড নিজের জন্য স্থির করেছে।

বিনা। (সাগ্রহে) সে কিছুই নয়। আমি তা মনেও ধরিনি। সে যদি সেই জন্য কুণ্ঠিতা হয়ে থাকে, তবে তার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। সে তো উচিৎ তিরস্কারই করেছিল! সে টুকু বুঝ্‌বার, বু'ঝে তা' সইবার ক্ষমতা বিনায়কের আছে। বাস্তবিকই আমি তার সঙ্গে নিতান্তই বর্ব্বরের ন্যায় ব্যবহার করেছি! আপনি তাকে বুঝিয়ে দিন। আমায় ক্ষমা কর্‌তে বলুন।—সে যদি আমায় ত্যাগ করে,—তবে আমিও এ রাজ্য সম্পদ সমস্তই ত্যাগ কর্ব্বো! কেন আমি অনর্থক এ বৃথা ভার বহন কর্‌তে যাবো। কার জন্য?

বিদ্যা। 'ক্লৈব্য মাস্মসমঃ' বীর তুমি! নারী প্রত্যাখ্যাত হয়ে, এ কাপুরুষোচিত বিলাপ, তোমার মুখে সাজে না!

বিনা। (লজ্জিত বিষাদে) বুঝি প্রভু! তবু তার এ হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতায়, আমার বুক একবারে ভেঙ্গে যাচ্ছে। কোন্ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে আমি তাকে এমন সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে ভাল বাস্‌লেম,—যে সে আমার এতখানি ভালবাসার কিছুমাত্র প্রতিদান দিলে না।

বিদ্যা। (স্মিত মুখে) কে বল্লে সে তোমায় ভালবাসে নাই?

বিনা। (ঘোর অবিশ্বাসে) তার নিজের ব্যবহারের চেয়ে আর অধিকতর প্রামাণিক কি আছে প্রভু? তা হ'লে কি এই তুচ্ছ কারণে, সে এমন হৃদয়হীন ভাবে, আমার ত্যাগ কর্‌তে পার্‌তো?

বিদ্যা। বিনায়ক! জান না তুমি, তাই এমন একটা, আমূল ভ্রান্ত ধারণা হৃদয়ে পোষণ করে ক্লেশ ভোগ কর্‌ছ? যদিও সে আমায় এ কথা প্রকাশ কর্ত্তে পুনঃ পুনঃ নিষেধই করেছে, তথাপি তার চরিত্রের এ কলঙ্ক না ধৌত কর্‌লে, যে অবমাননার যোগ্যা নয়, তাকেই অবমানিতা করা হয়। শোন! কিন্তু তোমার জ্যেষ্ঠের জন্য, ইহা এখন গোপনই রেখো। তিনি ধর্ম্মশীল। পাছে প্রকৃত বিষয় জ্ঞাত হ'লে, অন্যের অধিকার হতে অপস্থত হন সেই ভয়ে আমি এবং তারপর সেও সযত্নে এ গোপন বিষয় গোপনেই রেখেছিলাম। তুমিও তাই করো—যাকে তুমি দীনা—অজ্ঞাত-কুল-শীলা বলে জানো, সে যথার্থ তা নয়। মহারাজ জম্বুকেশ্বরের একমাত্র জীবিত সন্তান, রাজকুমারী সত্যবতী সে! তার ভালবাসা এতই প্রগাঢ়, এতই নিঃস্বার্থ যে, পাছে তাকে বিবাহ কর্‌লে, তুমি রাজন্যবর্গ মধ্যে নিন্দিত হও, তাই নিজেকে বলি দিয়েও, তোমার প্রেম, আর স্বাভাবিক কারণে বিজয়নগর সিংহাসনের প্রবল আকর্ষণ হতে, আপনাকে সে অপস্থত করে রেখেছিল! তার ভালবাসা এমনই স্বার্থগন্ধহীন যে, তোমাকর্ত্তৃক অপমানের আঘাতে নিজের অজ্ঞাতসারেও তোমাকৃত অপমানের প্রত্যর্পণ করে ফেলেছে, তারই প্রায়শ্চিত্তে নিজেকে নিজের ইহজগতের সর্ব্বস্ব হ'তে, স্বেচ্ছা বঞ্চিতা করে, এই কঠিনতম দণ্ডে দণ্ডিতা কর্‌তেও কুণ্ঠিত হয়নি। তার এ প্রেম অপার্থিব। সাধারণের তা' বোধগম্য নয়।

বিনা। (স্বপ্নাভিভূতবৎ থাকিয়া) অলোকা রাজকন্যা সত্যবতী! অলোকা, এ রাজ্যের ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারিণী! সে নিজে এ কথা কবে জান্‌তে পেরেছে প্রভু?

বিদ্যা। মাত্র তিন দিন।

বিনা। বুঝেছি। তাই সে দিন সে যথার্থই 'গভীর আনন্দ পূর্ণ হৃদয়ে' আমার প্রতীক্ষা কর্‌ছিল! অনেক আশা, আমিই তার দলিত করে দিয়েছিলেম, তাই সে আত্মসম্বরণ করতে পারেনি! কিন্তু প্রভু! আমি তাকে যতই ভালই বাসি, আমিও যাদববংশীয় বিনায়ক রায়। সে যখন সত্যসত্যই 'আমি তার কাছে নত জানু হয়ে আদেশ পালনে বাধ্য', জেনে শুনেও সে কথা উল্লেখ করতে পেরেছে, তখন যথার্থই আমাদের মধ্যে আর এই ঈপ্সিত সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে না। আমি তার স্মৃতিকে আজীবন পূজা কর্‌বো। কিন্তু পার্থিব ভাবে এ পৃথিবীতে তার সঙ্গে আর আমার কোনই সম্বন্ধ নেই। প্রণাম প্রভু! রাজা বিদ্যমানে নিশ্চয়ই এ রহস্য আমা দ্বারা উদ্‌ঘাটিত হবে না। কিন্তু যদি তাঁর মৃত্যুর পরেও, আমি জীবিত থাকি, তবে জান্‌বেন অলোকার এ অবিচারের দান নিজে আমি কোন মতেই গ্রহণ কর্‌বো না। আমি রাজপুত্র, ভিখারী নই।

(দ্রুত পদে প্রস্থান)

বিদ্যা। "নিয়তি কেন বাধ্যতে।" যা বিধিলিপি, তাই হবে। তোমার ভাগ্য যদি, তোমার এই বিজয়নগর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা লিখে থাকে, তোমার সাধ্য কি যে, তুমি তাকে লঙ্ঘন করো। মহামায়ার মহামায়ায় আবদ্ধ আমরা, না বুঝে নিজের অহংকেই কর্ত্তা ভোক্তা রূপে প্রতিষ্ঠিত দেখি, তাঁর কর্ত্তৃত্ব বুঝ্‌তে পারিনে। ভাবিনে যে, তিনি যা করান, আমি তাই করি। নতুবা আমি কে? এই বাহিরের স্থূল প্রত্যক্ষরূপধারী আমিও কর্ত্তা নই। আর এই পঞ্চকোষিক স্থূল সূক্ষ্ম দেহের অধীশ্বর প্রকৃত যে আমি, তিনিও কর্ত্তা নন। সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা প্রত্যগাত্মা রূপেও সেই নির্ম্মল, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়। তিনি কর্ত্তাও নন, ভোক্তাও নন। শুদ্ধ জ্ঞাতা মাত্র!

এই সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যুর চির আবর্ত্তন, এই মিলন-বিচ্ছেদাত্মক মানব জন্ম, এ সবই যে, সেই এক অবিদ্যার অত্যাচারের ফল, মায়া প্রপঞ্চের লীলা, এ বোধ কবে জীবশ্রেষ্ঠ মানবের, আনন্দপ্রতিবিম্বচুম্বিত মানসদর্পণে

সুপরিস্ফুট হবে ? আহা, কবে অন্তরের অন্তরে, বিশ্বব্যাপকভাবে, ভগবান্ শঙ্করের এই মহাস্তোত্র প্রতিধ্বনিত হয়ে, এই অশান্ত সৃষ্টি লীলার মধ্যে. স্থির শান্তির অচলায়তন প্রতিষ্ঠা কর্‌বে ! কবে মানব নিজের প্রকৃত পরিচয় নিজে পেয়ে যথার্থ প্রাণ খুলে বল্‌তে পার্‌বে—

নারায়ণোঽহং নরকান্তকোঽহং পুরান্তকোঽহং পুরুষোঽহমীশঃ।
অখণ্ডবোধোঽহমশেষসাক্ষী নিরীশ্বরোঽহম্ নিরহং চ নির্ম্মমঃ॥

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

—:*:—

শৃঙ্গেরি মঠ।

বিদ্যাতীর্থ, বিদ্যারণ্য, অলোকা ও সন্ন্যাসিনীগণ, যতি ব্রহ্মচারীবর্গ।

পরিপূর্ণমনাদ্যন্তমপ্রমেয়মবিক্রিয়ম্—একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
সদ্‌ঘনং চিদ্‌ঘনং নিত্যমানন্দঘনমক্রিয়ম্—একমেবাদ্বয়ং... ... ...
প্রত্যনেকরসং পূর্ণমনন্তং সর্ব্বতোমুখম্—একমেবাদ্বয়ং... ... ...
অহেয়মনুপাদেয়মনাদেয়মনাশ্রয়ম্——একমেবাদ্বয়ং... ... ...
নির্গুণং নিষ্কলং সূক্ষ্মং নির্ব্বিকল্পং নিরঞ্জনম্—একমেবাদ্বয়ং ... ...
অনিরূপ্য স্বরূপং যন্মনোবাচামগোচরম্—একমেবাদ্বয়ং... ... ...
সৎসমৃদ্ধং স্বতঃসিদ্ধং শুদ্ধং বুদ্ধমনীদৃশম্—একমেবাদ্বয়ং... ... ...

অসৎকল্পো বিকল্পোঽয়ং বিশ্বমিত্যেকবস্তুনি—নির্ব্বিকারে নিরাকারে নির্ব্বিশেষে ভিদা কুতঃ।
দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যাদি ভাবশূন্যৈক বস্তুনি—নির্ব্বিকারে নিরাকারে নির্ব্বিশেষে ভিদা কুতঃ॥
কল্পার্ণব ইবাত্যন্তপরিপূর্ণৈকবস্তুনি—নির্ব্বিকারে নিরাকারে নির্ব্বিশেষে ভিদা কুতঃ।
তেজসীব তমো যত্র প্রলীনং ভ্রান্তিকারণং—অদ্বিতীয়ে পরে তত্ত্বে নির্ব্বিশেষে ভিদা কুতঃ॥

শ্রীঅনুরূপা দেবী

যবনিকা।

মৃত্যু-সম্বর্দ্ধনা।

আজ হ'তে তোরে ভালবাসিব মরণ,
তুই আর খোকা মোর অভিন্ন এখন!
অশ্রুবান্ রোগ-শুষ্ক পাণ্ডুর বদনে
সে কাতর আর্ত্তনাদ শুধু মোর তরে
স্নেহ-গর্ব্বী পিতা হ'য়ে শুনিনি শ্রবণে
পারিনি ত নিতে তার ব্যথা-বিন্দু হরে'!—
তুমি বন্ধু, আর্ত্তত্রাণ, পরম দয়াল
অযাচিত দিলে আসি কোল সুশীতল
সোহাগে চুম্বিয়া তার রোগতপ্ত ভাল
দিয়েছ অনন্তপ্রাণ পবিত্র নির্ম্মল!
শিশু সে রহিল শিশু! জরা-বয়োহীন,
সেই কান্ত সুকুমার অম্লান অদীন
ব্যকুলতা দিয়া মিছে আগুলাতে গিয়া
কেবলি করেছি ছিন্ন আপনারি হিয়া।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

দিল্লীর লাড্ডু।

·:*:——

সপ্তদশ বৎসর পূর্ব্বে যখন মহানগরী কলিকাতা হইতে স্থায়ীভাবে কার্য্য করিবার জন্য এই দিল্লীনগরে সরকারী কর্ম্মোপলক্ষে প্রেরিত হই, তখন বন্ধুবান্ধবেরা পরিহাসচ্ছলে তাঁহাদের জন্য "দিল্লীর লাড্ডু" পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। উক্ত মিষ্টান্নের প্রকৃত কোন সত্তা আছে কি না বা প্রকৃতই কেহ কখনও উহা রসনায় আস্বাদন করিয়াছেন কি না তাহার কোন প্রত্যক্ষ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু উক্ত মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া অনেকেই যে পস্তাইয়া থাকেন ইহা বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারো অবিদিত নাই। জনৈক দিল্লীবাসীর নিকট শোনা গিয়াছিল যে করাতের মুখনিসৃত কাঠের গুঁড়া চিনির আবরণে আবৃত ও উপরিভাগ রং দ্বারা সুরঞ্জিত করিয়া উক্ত প্রলোভনীয় লাড্ডু প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু বহু অনুসন্ধানে উক্ত লাড্ডুর পার্থিব অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়া পস্তাইবার সাধ মিটাইতে না পারিলেও জীবনের বহু

কার্য্যই লাড্ডুর আস্বাদনে কৃতার্থ হইতে বাধ্য হইয়াছি। দিল্লী আসিবার পূর্ব্বে পশ্চিমের স্বাস্থ্যপ্রদ ও সুলভদ্রব্য-সঙ্কুল স্থানে স্বল্প বেতনে সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিবার উৎকট আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগরিত হইয়া যে সুখ-স্বপ্নের সৃষ্টি করিয়াছিল কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া তাহা কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। বিগত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতায় দিল্লীর স্বাস্থ্য পশ্চিমের অন্যান্য স্থানের ন্যায় কলিকাতা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে নাই। বরং শীত গ্রীষ্মের আতিশয্যে দিল্লী সহরে বাস করা সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষ আরামদায়ক মনে হয় নাই। মৎস্যমাংস ও দুগ্ধ কলিকাতা হইতে অপেক্ষাকৃত সুলভ হইলেও বঙ্গদেশীয় অন্যান্য শাকশব্জী ও ফল প্রভৃতির অভাব নিবন্ধন দিল্লীর সুলভতা সম্যক অনুভূত হইতেছে না। আবার দিল্লীতে দরবারের অনুষ্ঠান ও রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ায় পূর্ব্বে যাহা কিছু সুবিধা ছিল তাহা চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে। তথাপি আমাদের কেহ কেহ দিল্লী আসিবার জন্য লালায়িত এবং কেহবা কলিকাতায় বদলি হইয়াও পুনরায় দিল্লী আগমনের সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, দিল্লীর লাড্ডুর এমনি মধুর আস্বাদ বটে!

যাহা হউক দিল্লীতে আমদের ন্যায় লাড্ডুখোরের সংখ্যা নিতান্ত অল্প না হইলেও দিল্লীতে এই সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন নহে, কিন্তু দরবার উপলক্ষে যাঁহারা স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এই দিল্লীধামে আগমন পূর্ব্বক সেই সুবিখ্যাত "দিল্লীর লাড্ডু" ভক্ষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাঁহাদের সংখ্যা নির্ণয় করা নিতান্তই দুঃসাধ্য। আমরা জানি দরবারের সময় অত্যাধিক ব্যয় ও স্থানাভাব বশতঃ বহুলোকের দরবার দেখিবার সাধ পূর্ণ হয় নাই; আবার যে অসংখ্য জনমণ্ডলী যে সময় দিল্লীতে সবাগত হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করতঃ তথাকথিত দরবার দর্শন-সাধ পূর্ণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই স্বীয় পদমর্য্যাদানুযায়ী ব্যাবস্থার জন্য অনিচ্ছাকৃত ব্যায় বাহুল্যে ও নানা অসুবিধা ভোবে বাধ্য হইয়া, যে কিরূপ প্রসন্নচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়।

কেহ কেহ নারী জাতির সহিত উক্ত লাড্ডুর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে প্রয়াসী। আমাদের বঙ্গীয় সমাজের অনেকেই আজকাল বিবাহকে বিশেষতঃ স্ত্রী জাতিকে যেরূপ হীন সাংসারিক ভাবে সংকীর্ণ ও লঘু দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন তাহাতে রমণীগণ তাঁহাদের নিকট যে দিল্লীর লাড্ডুরূপে বিবেচিত হইবেন ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ফলতঃ বিবাহকে আধ্যাত্মিক চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া পবিত্র প্রেমের উচ্চ ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পারিলে ও নারী জাতিকে লঘু ভাবে না দেখিয়া সম্মানার্হ স্থানে শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিলে, আমাদের গৃহে শান্তি-স্বরুপিণী গৃহলক্ষ্মীগণের আগমন কখনই পরিতাপের কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইত না।

বিধাতার মঙ্গল বিধানে বিবাহ ও নারী জাতির প্রতি আকর্ষণ পুরুষ হৃদয়ে বড়ই প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। ইহার ফল স্বরূপ অনেকে বিবাহের জন্য লালায়িত হইয়া যতক্ষণ কোন রমণীর পাণিপীড়ন করিতে না পারেন ততক্ষণ স্থির থাকিতে পারেন না। আবার সংসারে প্রবৃষ্ট হইয়া তিনি যে কেবল সুখেরি মুখ দেখিবেন ইহা কখনও আশা করিতে পারা যায় না। মানুষ কোন অবস্থাতেই নিরবচ্ছিন্ন সুখের অধিকারী হইতে পারে না। সুতরাং বিবাহিত জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভে অকৃতকার্য্য হইয়া এবং সুখের আনুসঙ্গিক দুঃখ সকলের সহ্য করিতে না পারিয়া যাঁহারা বিবাহিত জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া পড়েন, তাঁহারাই দিল্লীর-লাড্ডু ভক্ষণ করেন তাহাও কি বলিবার! কিন্তু সে ক্ষেত্রে তাঁহাদের অর্দ্ধাঙ্গিনীরা দিল্লীর লাড্ডুর সহিত কি প্রকারে উপমিত হইতে পারেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। পক্ষান্তরে যে সকল সতী সাধ্বী স্ত্রীলোক, দুর্ব্বৃত্ত স্খলিত-চরিত্র স্বামীর হস্তে পড়িয়া অশেষ লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও স্বামী সেবায় বিরত হ'ন না, তাঁহারাও দিল্লীর

লাড্ডু সেবন করিয়া থাকেন বা তাঁহাদের স্বামীরা যে দিল্লীর লাড্ডু আখ্যায় অভিহিত হইবেন ইহাই বা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে। আমার বিবেচনায় স্ত্রী বা স্বামী কেহই লাড্ডু পদবাচ্য নহেন—তাঁহাদের সেবিত "বিষয়" যাহার তৃষ্ণা বাসনা কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার নহে—তাহাই দিল্লীর লাড্ডু নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। এ সংসারে সুখ দুঃখ, শান্তি অশান্তি, সংগ্রাম বিরাম, নিয়তই আমাদের সহচররূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ" ইহা ত আমাদের নিয়ত প্রত্যক্ষ ঘটনা। অবিবাহিত থাকিয়াও দুঃখ অশান্তি সংগ্রাম পরীক্ষা প্রভৃতি মাথায় করিয়া বহন করিতেছেন এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা সংসারে বিরল নহে। আবার বিবাহিত হইয়াও সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট, আপদ বিপদ, অম্লানবদনে সহ্য করিয়া পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি হেতু মনের সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন এরূপ দম্পতি সংসারেই বিরল নহে। এ যদি "দিল্লীর লাড্ডু" সংজ্ঞায় অভিহিত করিতে হয় তাহা হইলে দিল্লীর লাড্ডু ভক্ষণে অরুচি কাহার?

চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে কতকত সাধুসজ্জন ব্যতীত আমরা প্রায় সকলেই বিষয়ের পশ্চাতে নিরন্তর ছুটাছুটি করিতেছি এবং বিষয় ভোগে কখনও পরিতৃপ্তি হয় না বলিয়া আমাদের বিষয় বাসনা চরিতার্থ হইবারও কোন সম্ভাবনা নাই। তবেই "বিষয়" বাসনাই প্রকৃত পক্ষে "দিল্লীর লাড্ডু!" আমরা উহার স্বাদগ্রহণ করিয়া প্রতিনিয়ত পস্তাইলেও উহার অপ্রতিহত প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইতেছি না! লাড্ডুর মিষ্টত্ব এমনি,—বিধাতার দয়া না হইলে উহার প্রলোভন হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই।

বিধাতা আশীর্ব্বাদ করুন আমরা যেন তাঁর অপার করুণায় এই সুবিখ্যাত "দিল্লীর লাড্ডুর" বিষম প্রলোভন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারি।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মল্লিক।

প্রার্থনা।

—*—

অনর্থময়ী চিন্তায় গত
ব্যর্থ সারাটি দিন,
নিদ্রার সেবা করিয়া কেবলি
বিভাবরী হ'ল ক্ষীণ;
কবে পরমেশ! তোমার রাতুল
চরণ-কমল মোর
সংসার-ঘোর-শ্রান্তির মাঝে
আনিবে শান্তি-লোর।

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ

গ্রন্থ-সমালোচনা।

গল্পমাল্য—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী কোং। মূল্য ॥০ আনা।

এই গ্রন্থখানি কয়েকটি ক্ষুদ্র গল্পের সমষ্টি। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি বাঙ্গলা মাসিকপত্রে পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম গল্প "শাপমুক্তি" টল্‌ষ্টয়ের একটি গল্প অবলম্বনে রচিত। বাকিগুলি লেখকের স্বকপোল-কল্পিত।

বসন্তবাবু কয়েকখানি কবিতাগ্রন্থ পূর্ব্বে প্রকাশিত করিয়াছেন, এই তাঁহার প্রথম গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হইল। কবিতায় তিনি অনেকস্থলে পল্লীসমাজ ও পল্লীচিত্র অঙ্কনের প্রয়াস পাইয়াছেন, এই গল্পগুলির মধ্যে কয়েকটির স্থলে স্থলেও সে প্রয়াস দেখা যায়। হাস্য ও করুণ এই উভয় প্রকার রস-সৃষ্টির প্রয়াসই বসন্তবাবু করিয়াছেন। আমাদের মতে তাঁহার হাস্যরসসৃষ্টির প্রয়াসই অধিক পরিমাণে সফল হইয়াছে। "আমার জীবন" ও "কবির সুবুদ্ধি" নামক গল্প দুইটি আমরা বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। প্রকাশ না থাকিলেও আমরা জানি যে বাঙ্গলা মাসিকের কয়েকটি বেনামী বাঙ্গময় রচনার লেখক কে? সেই লেখকের লেখনীপ্রসূত বলিয়াই আমরা ঐ গল্পদুটি অত আগ্রহের সহিত পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। সুখের বিষয় যে আমাদের আশা বিফল হয় নাই।

"শাপমুক্তি" গল্পটি কতকটা দেশী ছাঁচে ঢালিয়া আনা হইয়াছে, আবার কতকটা বিলাতী ধরণই রহিয়াছে। এইজন্য মাঝে মাঝে রসগ্রহণে ব্যাঘাত ঘটে। সাইমন মুচি পত্নীর পরিত্যক্ত জ্যাকেট কোটের নীচে আঁটিতেছে, আবার রুবল্ কোপেকের বদলে টাকা পয়সা ব্যবহার করিতেছে। এক পূরা বিলাতী ধরণে অথবা পূরা দেশী ছাঁচে গল্পটির খুঁটিনাটিগুলি পর্য্যন্ত লিখিলেই আমাদের মতে ভাল হইত। ৩৯ পৃষ্ঠায় স্বর্গদূত বলিতেছে "তুমি বল্‌চ কি করে আমি আমার স্ত্রীপুত্রকে খাওয়াই?" কিন্তু এরূপ কোন কথা পূর্ব্বে উল্লেখিত না হওয়াতে অসঙ্গতি দোষ হইয়াছে।

"গৌরী" গল্পটির শেষ দিকের কতক অংশ পরিত্যক্ত হইলে আমাদের মতে গল্পটি উৎকৃষ্ট হইত। শেষের দিকটায় রবিবাবুর একটি গল্পের উপসংহারের মত করিতে গিয়া লেখক আসল গল্পটির যে পরিণাম সঙ্ঘটন করিয়াছেন তাহাতে আমরা সুখী হইতে পারি নাই। "গৌরী"র উপর সহানুভূতি আকর্ষণের প্রয়াস যে লেখকের কতদূর সফল হইয়াছে তাহা ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। "অপরাধীকে সাজা দিন্ ভগবান আপনার মঙ্গল কর্‌বেন।"

এই পংক্তির পর গল্পটি শেষ হইলে ইহার সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকিত।

"পুনর্ম্মিলন" গল্পটির গোড়ার দিকটা হাস্য-রস সিঞ্চিত। শেষে অবাধ্য পুত্রের সহিত স্নেহকাতর জননীর মিলন প্রদর্শিত হইয়াছে।

"ভাই" গল্পটিতে অত্যাচারী ভ্রাতার প্রতি জ্যেষ্ঠের অপরিসীম দয়ার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। "ভিক্ষুক" গল্পটিতে এক অন্ধ ভিক্ষুকের কোমল সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ের আলেখ্য আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। 'দ্বীপান্তর' একজন অনুতপ্ত অপরাধীর প্রায়শ্চিত্তের কাহিনী।

গ্রন্থখানির ভাষা সহজ ও সরল। কেবলমাত্র 'ভিক্ষুক' গল্পটির স্থলে স্থলে বর্ণনায় আড়ম্বর দেখা যায়।

"আমার জীবন" ও "কবির সুবুদ্ধি" এই দুইটি গল্পই গ্রন্থখানির সকল গল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমরা বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের এই দুইটি হাস্য-রসোজ্জ্বল গল্প পড়িতে অনুরোধ করি।

বইখানিতে মুদ্রাকর প্রমাদ বহু পরিদৃষ্ট হইল। এ কাহার ত্রুটিতে ঘটিয়াছে জানি না। প্রকাশকদের ইহা গৌরবের কথা নহে। মোটের উপর এই বইখানি পাঠে আমরা বসন্তবাবুর গল্প সাহিত্যে অবতরণে আশান্বিত হইয়াছি।

প্রেমের ডালি—শ্রীরসিকলাল দে প্রণীত। হুগলী, এলাটী "শ্রীবৈষ্ণব-সঙ্গিনী" কার্য্যালয় হইতে শ্রীসুরেন্দ্র মোহন অধিকারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ছাপা ও কাগজ ভাল। কাগজের মলাট, ১১৬ পৃষ্ঠা মূল্য ॥০ ডাক মাশুল ৵০।

গ্রন্থকারের কথায়—"শ্রীভগবান, গৌরহরির চরণাশ্রয় করিয়া প্রাণের আবেগে" তিনি যে "কয়েকটি গদ্যপদ্য গীতিকাময় প্রবন্ধ" লিখিয়াছেন "তাহার সমাবেশে প্রেমেরডালি রচিত।" উদ্দেশ্য—"গৌরগুণগাথা কীর্ত্তন" ও সেই সঙ্গে পুস্তিকার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা সোনোমুখী (বাঁকুড়া) গরিব ভাণ্ডারের সাহায্য করা। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সাধু, তাঁহার ভরসা—'জীবে দয়াবান, নামে রুচিপরায়ণ বৈষ্ণব-সেবানুরক্ত ভক্তগণ প্রেমেরডালি গ্রহণ করিয়া তাঁহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটী সংসাধনে সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন।" বৈষ্ণবগণ তাঁহার সহায় হউন। নতুবা কেবল সাহিত্যরসে আকৃষ্ট হইয়া গ্রন্থক্রয় করিবার প্রবৃত্তি বঙ্গীয় পাঠকপাঠিকার যেরূপ উগ্র, তাহাতে দানের দিক্ হইতে না হইলে, গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য তাঁহার আশামাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে। রসিক বাবু প্রেম-রসিক—তাঁহার প্রেমের-ডালিতে প্রেম আছে, ভক্তি আছে, রস আছে। তিনি "তৃণাদপি ভাব লয়ে, অপরাধ শূন্য হয়ে." আবেগময়ী সুমিষ্ট ভাষায় যে নামসুধা বিতরণপ্রয়াসী হইয়াছেন, তাহাতে, আমাদের আশা, তিনি বৈষ্ণবমণ্ডলীর মনোরঞ্জনে সমর্থ হইবেন।

নকল পাঞ্জাবী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের আট আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার অষ্টাদশ গ্রন্থ। কাগজ, ছাপা, বাঁধাই উত্তম।

নকল পাঞ্জাবী গল্প পুস্তক, তিনটি 'প্রস্তাবে' সমাপ্ত। গল্প তিনটিকে টানিয়াবুনিয়া একসূত্রে গাঁথিতে চেষ্টা করা হইলেও, ভাব, ভাষা ও বলিবার ভঙ্গীতে তাহারা স্বতন্ত্রই রহিয়া গিয়াছে। প্রথম প্রস্তাব দুইটি ডা'লে চা'লে খিচুড়ী,—ডা'লে চা'লে ভাল না মিশিলেও উৎকৃষ্ট ঘি মশলার গুণে ঠাণ্ডার দিনে বেশ উপভোগ্য, কিন্তু লঘুপাচ্য কিছুতেই নহে। বাঙ্গলার গৃহে গৃহে এরূপ ভাবের-খিঁচুড়ী পাচিত হইলেই সর্ব্বনাশ! শেষের প্রস্তাবটি "মধুরেণ সমাপয়েৎ"—সত্যই মধুর, আঙুরের মত রসে ভরপূর,—বিধির কৃপায় বিলাতী কোর্টসিপের অভিনব মোলায়েম বাঙ্গলা সংস্করণ,—খাঁটী রোমান্স্ অথচ প্রতীচ্য ভাবাপন্ন নব্যতন্ত্রী শিক্ষিত বাঙ্গালী বা নকল-পাঞ্জাবীর জীবনে তাহা অসম্ভাব্য নহে। আমাদের মধ্যে অনুকরণ প্রবৃত্তি,—নকল সাজিবার উগ্র আকাঙ্ক্ষা-স্রোত যেরূপ প্রবল বেগে প্রবাহিত তাহাতে বাঙ্গলায় আর বেখাপ্পা কিছুই নাই, কোন অস্বাভাবিকত্বই বাঙ্গালী জীবনে অসম্ভাব্য নহে। বাঙ্গালী নিজের বিশেষত্ব জাতীয়ত্ব বিসর্জ্জন দিতে পারিলেই যেন রক্ষা পান, পাকা বিদেশী বলিয়া অবিহিত হইতে পারিলে, বিদেশী চালচলন হাসিতে কাসিতে, আহারে বিহারে নিখুঁত ভাবে নকল করিতে পারিলেই যেন চরিতার্থ, কৃতার্থ হন। সভ্যভব্য অর্থেই এখন দেশীয় জঙ্গলীভাব পরিবর্জ্জিত—সার্টকোট পরিহিত, সাবান পাউডারে ফ্যাকাসে ন দেব ন পিশাচ, ইঙ্গও নয়, বঙ্গও নয়—সে এক অপূর্ব্ব অদ্ভুত অবতার। এ হেন সভ্যতার যুগে, নকলের দিনে নকল পাঞ্জাবী আমাদের পর নহে—তাহার বর্ণিত অমন উদ্ভট চিত্রও আমাদের সামাজিক চিত্র—অন্য বিদেশী জাতীর চক্ষে তাহা হাস্য-রসের উৎস,—সং-সজ্জ আমাদের ন্যায় সংয়েরও উপভোগ্য,—লেখক মহাশয়ের শ্রম সার্থক!

প্রথম প্রস্তাবের নায়িকা দিদিমণি (লেখকের কথায়) "সখের পড়া আদুরে মেয়ে, বিবিয়ানা ঢং—খেয়ালি মেজাজ"—বিলাত ফেরত মিঃ রায়ের নাত্নী,—"স্বভাব পুরুষ মানুষের মতো তেজী," বাল্যে অজ্ঞ মেয়ে যখন

পুতুল খেলে সে তখন খেলিত—মার্কেল, ব্যাট্‌বল,—ঘুরাইত লাঠিম আর ঠাকুরদাদাটিকে ; উড়াইত ঘুড়ি,—নিজেও উড়িয়াছে বেলুনে,—চড়িয়াছে ঘোড়ায়, শেষে চরাইতে বসিয়াছে তাহার ফিলসফার অধ্যাপক—"মোহিত মাষ্টার মশাইটি"কে। মোহিত—একেবারে মোহিত, পৌরুষ-প্রধান হইলেও যে দিদিমণি—দিদিমণিই,—বয়স্থা, শিক্ষিতা ছাত্রী—যুবক শিক্ষক—বিশেষতঃ বাঙ্গালীবিরল পাঞ্জাবে, সে সম্বন্ধের পরিণাম যে স্বামীত্ব লাভ তাহা মিঃ রায়েরও অজ্ঞাত বা বোধের অতীত ছিলনা সে দিক্ হইতে তাহাদের মিলনেরও কোন বাধা ছিল না কিন্তু গোল বাধাইল স্বয়ং মোহিত,—তাহার মার্জ্জিত বুদ্ধির দোষে, বক্তৃতা প্রভৃতির ফলে সে অবশেষে 'দিদিমণি'কে হারাইতে বসিল। একদিন কথায় কথা উঠিল,—Natural selection সম্বন্ধে। তাই থেকে inter-marriage (আন্তর্জ্জাতিক বিবাহের) প্রশ্ন উঠিল। মোহিত বক্তৃতার স্রোতে গা ঢালিয়া, ছাত্রীকে বেশ করিয়া বুঝাইল,—আন্তর্জ্জাতিক বিবাহই জাতীয় উন্নতি—নৈতিক মানসিক সর্ব্বসম্বন্ধে উৎকর্ষতার একমাত্র উপায়!—আর যাইবে কোথায়, সেই মুহূর্ত্তে মেধাবী ছাত্রী জাতীয় উন্নতির মূলমন্ত্র inter-marriage-এর জন্য ক্ষেপিয়া উঠিল, ভাসিয়া গেল মোহিতের প্রেম-আকর্ষণ। ফ্রি-লভ্, স্বাধীন ভালবাসার দিনে স্বামী ও প্রেমাস্পদ এক নহে। দিদিমণি মোহিতকে পত্র লিখিল "প্রিয়তম, তুমি আমায় ভালবাস, আমি তোমায় ভালবাসি, কিন্তু ভালবাসা এক, বিবাহ স্বতন্ত্র। জাতীয় উন্নতির একমাত্র উপায় ইণ্টার-ম্যারেজ,—উপায় শুধু বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না, তুমি একটি পাঞ্জাবী মেয়েকে বিবাহ কর, আমি একজন পাঞ্জাবীকে বিবাহ করি, তা হ'লে আমরা অধঃপতিত এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন দেশকে জাগাইতে পারিব না কি? এস, আমরা দু'জনে স্বদেশের কল্যাণ-মন্দিরে আপনাদের বলি দি। আমি স্থির, এখন তুমিও আমায় টলাতে পারবে না।" মোহিতের মস্তকে বিনামেঘে বজ্রাঘাত! সে শরণাপন্ন হইল তাহার বন্ধু শ্রীমান নকল পাঞ্জাবী মুখরাজ তারিণীশঙ্কর মুখুজ্যের; মুখুজ্যে আবার মিঃ রায়ের বন্ধুর নাতি,—প্রবাসী-বাঙ্গালীর পুত্র, পাঞ্জাবেই তারও জন্ম, বাল্য ক্রীড়াভূমি শিক্ষাদীক্ষার মন্দির তাহার লাহোরে। বাঙ্গালী না বলিয়া তাহাকে 'পাঞ্জাবী ভাইয়া' বলিলে সে খুসী—তার মটো—"In Rome one must do as the Romans do", নটবর রসিক, মায়ের আদুরে গোপাল কিন্তু ঘটকালীতে পাকা—প্রেমিক দেখিলেই তার মনটা মিলন ঘটাইবার জন্য নাচিয়া উঠে, সে দিকে মাথাও খেলে বেশ।

ঠাকুর দা নাত্‌নীতেত আর ঢাকঢাক সারসার নাই; ঠাকুর দা নাত্‌নীকে বলিলেন "কিরে তোর হ'ল কি?" নাত্‌নী বলিল "ইণ্টার ম্যারেজ।" ঠাকুর দা—"কার সঙ্গে?" নাত্‌নী—"যে কোন, একটা পাঞ্জাবীর সঙ্গে।" ঠাকুর দা বলিলেন "যা করবি,—কাল সকালে যা হয় হবে, এখন তো ঘুমুবি চল" "না দাদা, যতক্ষণ পাঞ্জাবী বিয়ে না কর্‌ছি, ততক্ষণ ঘুম হবেনা!"

'কি সর্ব্বনাশ!" বৃদ্ধ প্রমাদ গণিলেন। তখন বড় কষ্টে তিনি অতীত জীবনের দিকে,—পশ্চাতে ফিরিয়া না চাহিয়া পারিলেন না,—একটা খাঁটী সত্য তাঁহার সমক্ষে ভাসিয়া উঠিল—তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ভাবিতে হইল; মানুষ না বুঝে চায়, পেয়ে কিন্তু পরে হায় হায় করে!: যখন চেয়েছিলুম তখন বুঝ্‌তে পারিনি যে চেয়েছি কতকগুলি জঞ্জাল! যাকে শিক্ষা বলে মনে হ'ত সেটা যে কুশিক্ষার নামান্তর।

নকল পাঞ্জাবী মুখরাজ শর্ম্মা ঠাকুরদাদার উপযুক্ত নাতী—মিঃ রায় তাহার দাদামহাশয়ের বন্ধু—সে ঠাকুরদাদাকে বলিল—"মাভৈ ঠাকুর দা, হয়েছে! মা বলেছেন যে পাঞ্জাবীদের সঙ্গে বাঙ্গালী মেয়ের মিল হতে পারে না,—এইটে যদি আপনার নাত্‌নী বুঝ্‌তে পারে তা হলে আর এ বাই থাকবে না।" এক খাস পাঞ্জাবী, একবারে আহেলা বিলাত, পাড়াগেঁয়ে ভূতকে নাত্‌নীর বরের ভূমিকা লইবার জন্য ঠিক করা হইল,—পাঞ্জাবী তাহার মহা আনন্দ—রমণী ও অর্থ লাভ এক সঙ্গে!

ঠাকুরদা, পাঞ্জাবী বরকে নাত্নীর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন, বলিলেন "ইনিই পঞ্জাবী পাত্র অনেক সাধ্যসাধনায় বাঙ্গালা মেয়ে বিবাহ করিতে রাজি করিয়াছি। দিদি, তুমি এর সঙ্গে পরিচয় কর।" দিদি স্মিত নেত্রে, ইংরেজি কেতা অনুসারে তাহার হাতখানি বাড়াইয়া দিল কিন্তু পাঞ্জাবীর সে দিকে হুঁস নাই সে মুগ্ধ হইয়া দিদিকে দেখিতে দেখিতে বলিল "ইয়ে আস্‌লি রং কি নক্‌লি ?" ঠাকুরদা তাড়াতাড়ি বলিলেন "নেহি বাবু নেহি, আস্‌লি রং, হাম পানিমে ধোকে দেখ্‌লানে সক্‌তা।" পাঞ্জাবী বলিল "হক ! মেরা পছন্দ। রূপিয়া দেও।" পাঞ্জাবী সেক্‌হ্যাণ্ড না করায় দিদিমণি অপ্রতিভ,—তার রং আসল কি ফলানো সন্দেহ করায় অপমানে আগুন,—টাকার কথা শুনিয়া ঘৃণায় অর্দ্ধমৃত। সে জিজ্ঞাসা করিল "কিসের টাকা দাদামণি ?" "এঁকে দশ হাজার টাকা দিতে হবে, তবে বাঙ্গালী বিয়ে করবেন।"

অধৈর্য্য পাঞ্জাবী বলিল "রূপেয়া ?" ঠাকুরদা বলিলেন "হাঁ—ওতো জরুর দেগা, সাদিকা পিছে।" "নেহি, আধা আভি চাহি।" নাত্‌নীর আর সহ্য হইল না, বলিল "দাদা, দশ হাজার টাকা দিয়ে একটা অসভ্য জঙ্গলী" "দিদি, টাকার কথা ছেড়ে দাও। যার সঙ্গে চিরকাল ঘরকন্না করতে হবে তার পরিচয় আগে নাও—নাম কি জিজ্ঞেস কর না।" নাত্‌নী জিজ্ঞাসা করিল "আপ্‌কা নাম ?" পাঞ্জাবী হাসিয়া বলিল "হামারা নাম পিয়ারী শঙ্কর। তোমারা নাম ক্যা ?" কি অসম্মানসূচক সম্ভাষণ! নাত্‌নী ঘৃণায় মুখ ফিরাইল। ঠাকুরদা উত্তর দিল "ইস্‌কা নাম মিস্ বেলা রায়।" পাঞ্জাবী মহাখুসী "হা—হা—হা বহু মজাদার নাম হক্ হক্। বিল্লী রায় বিল্লী রায় ! কেঁউ ? কুল্ মছ্‌লি খাঁতে হো !" "তোমারা মুণ্ডো খাতে হো।" মিসের কি এত অপমান সহ্য হয়।

ঠাকুরদা বলিলেন "রেগো না দিদি ! এ হাত ছাড়া হলে আর সুপাত্র পাওয়া যাবে না। একে যেমন ক'রে হোক পোষ মানাতে হবে !"

"দাদামণি, আমায় ছেড়ে দাও। মোহিতবাবু তোমার সঙ্গে কথা আছে।" দাদা যেন একটু রাগ করিয়াই বলিলেন "তুই তো বড় মজার লোক দেখ্‌ছি। আমি সাধ্যসাধনা করে আন্‌লুম, এখন তুমি চল্‌লে ? তা হবে না—তা হবে না।" মোহিতও ঠাকুরদার কথায় সায় দিল, সেও মিস্ বেলাকে জানাইয়া দিল পাঞ্জাবী মেয়ে না হলে সে বিবাহ করিবে না। অসহ্য দিদিমণি অধৈর্য্য হইয়া বলিল "মোহিতবাবু, তুমি কি ক্ষেপেছ, দাদামণি তুমিও কি ক্ষেপেছ ! আমি অন্যায় বায়না নিয়েছি বলে তোমাদের তাই কর্ত্তে হবে ? আমি যদি এখন বলি আমায় বিষ এনে দাও—আমি খাব—" "নেহি বিল্লি বিবি,—নেহি বিশ নেই ওহি ছয় হাজারমে হো যাগা।—হক।" "ওই শোন, থেকে থেকে ক্যা ক্যা করছে, আর হক্ হক্ করছে" "কি করবে দিদি তোমার খেয়াল !" বেলা অতি কাতর হইয়া বলিল "আমায় ক্ষমা কর,—রক্ষা কর,—দাদামণি, তোমার পায় ধরছি আর তোমার কথার অবাধ্য হব না, তুমি ও-মিন্‌সেকে তাড়াও—" তাহাই হইল। অধ্যাপক মোহিত ও শিক্ষিতা বেলা বিবাহসূত্রে মিলিত হইল—মণিকাঞ্চন সংযোগ !

ইহার উপর আর টীকা টিপ্পনী অনাবশ্যক। দ্বিতীয় প্রস্তাবটীও তুল্য, তাহার বিস্তারিত পরিচয়ের আমাদের স্থানাভাব, সেটীও নব্য শিক্ষিতের প্রেমের পাগলামী ! তৃতীয় প্রস্তাবটি মনোরম—নকল-পাঞ্জাবীর প্রধান পাঠ—তাহার নিজের নায়িকাসম্ভাষণের অতি মধুর কাহিনী। বাঙ্গালীবিদ্বেষী (পাঞ্জাবীর প্রতিও তাহার তুল্য টান তাহা পূর্ব্ব-প্রস্তাবে পাঞ্জাবী বরটির চিত্রেই প্রকাশ) নকল পাঞ্জাবী জাতীয়তার স্বাভাবিক টানে বঙ্গবালাকে বরমাল্যে বরণ করিতে বাঙ্গালায় ছুটিয়াছিল;—তখনো বেশটা ছিল পাঞ্জাবীর। ঘটনাক্রমে তাহার নায়িকা ঠিক্ অভিসারিকা না হইলেও সেই ট্রেণেই তাহাকে দেখা দিতে কলিকাতা আসিতেছিল (বা আনা হইতেছিল) পথে ছদ্মবেশী বরের সঙ্গে দেখা; মেয়ে না চিনিলেও না বুঝিলেও পাঞ্জাবী তার পরিচয়ে পরিতৃপ্ত—মুগ্ধ—আশান্বিত বাঙ্গালীর মাধুর্য্যে দ্রবীভূত। অবশেষে পরিচয় হইল—হাওড়ার ষ্টেসনে; সঙ্গে সঙ্গে বরে-কনেয় প্রেমের পরিচয়—অনুমান করা অন্যায় হইবে না সে পরিচয়ের পরিণাম পরিণয়। নকল-পাঞ্জাবী বঙ্গের কমনীয় নমনীয় স্পর্শমণি স্পর্শে খাঁটী সোনা, সে-চিত্র আমরা কল্পনা করিয়াই সুখী !

কোচবিহার ষ্টেট্ প্রেসে শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও কোচবিহার সাহিত্য-সভা কর্তৃক প্রকাশিত।
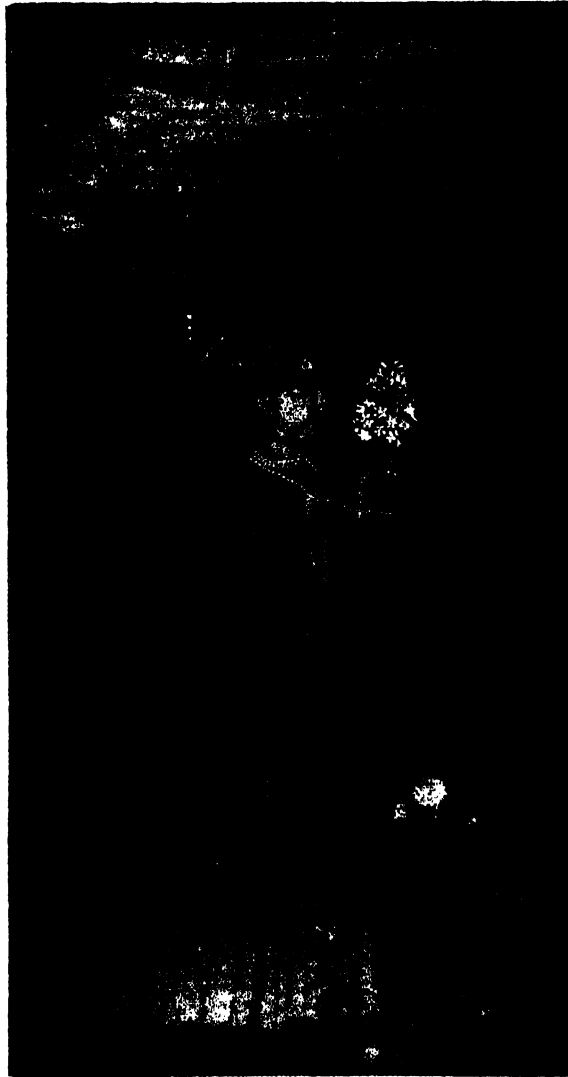
ফুলবিলাস
(প্রাচীন চিত্র হইতে)

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)
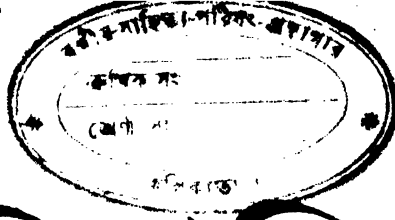
"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

২য় বর্ষ। | শ্রাবণ, ১৩২৫ সাল। | ৯ম সংখ্যা।

গান।

কবে পথ চাওয়া মম ফুরাবে?
কবে তোমার সরস পরশ লভিয়া
পরাণ আমার জুড়াবে?
কবে ঝরঝর বারিধারা সম
তব প্রেমধারা অন্তরে মম
চিরপিপাসিত চাতকের তৃষা
নববরষায় পূরাবে?

তাই আছি পথ চাহি গো,
শুধু তোমারি লাগিয়া বিরহ এ প্রাণে
আর অভিলাষ নাহি গো।
হে আমার প্রিয়! ওগো ব্যথাহারি!
মুছাও মুছাও নয়নের বারি,
অবগাহি' তব প্রেম-সায়রে
হৃদয় মুকুতা কুড়াবে।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

ভাস্কর্য্যের কথা।

আমাদের দেশে ভাস্কর্য্যের প্রাচীন ইতিহাস যে সব পাওয়া যায় সেগুলির দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌লে আমরা দেখ্‌তে পাই যে তখনকার কালের ভাস্কর্য্য দেশের প্রায় সমস্ত কীর্ত্তিগুলিকে চিরন্তন করে রেখে গেছে। এ পর্য্যন্ত বাঙলাদেশেও আমরা প্রায় দু'হাজার বৎসরের পুরাতন ভাস্কর্য্যের নমুনা প্রাচীন মন্দিরের দেয়ালের দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তিগুলিতে দেখি। তখন আমাদের দেশের ভাস্কর্য্য প্রধানত স্থাপত্যের সঙ্গেই শোভা পেতো এবং মন্দিরের জন্যে শাস্ত্রানুশাসন মতে প্রতিমা গঠন করা ভাস্করের প্রধান কাজ ছিল। প্রাচীন গ্রীসে যেমন ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ভাস্কর্য্য-কলা দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তিতে প্রকাশ পেয়েছিল আমাদের দেশেও এককালে দেবদেবী প্রভৃতির মূর্ত্তিই ছিল ভাস্করের জীবিকা অর্জ্জনের উপায় স্বরূপ এবং একান্ত আরাধ্য বস্তু। তখন শাস্ত্রের ধ্যানই ছিল শিল্পীর ধ্যান। এর ফলে বাইরের দিক থেকে দেখ্‌লে যে কোন দেবদেবীর একই প্রতিমূর্ত্তি অনেক শিল্পীতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শাস্ত্রীয় মাপ ও প্রমাণাদি অনুসারে এক প্রকারেই গড়েচেন দেখা যায় তাতে আকারগত কোন বৈচিত্র্যই নেই। কিন্তু ভাল করে কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর কাজ লক্ষ্য কর্‌লে দেখি যে তিনি নিজের বিশেষত্বের ছাপ দিয়ে সেই শাস্ত্রানুশাসনের মাপ ও মাত্রাকে ছাড়িয়ে উঠে বাইরের এই রূপের মধ্যে একটি অনির্ব্বচনীয় রসধারায় সেটিকে সঞ্জীবিত করে রেখে গেছেন। শিল্পীর সেখানে মনের সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাব এই বিধিবদ্ধ আকারের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে।

প্রাচীন গ্রীসের মূর্ত্তিগুলিকে প্রায় উদ্যানের মধ্যে রাখা হোতো। আর আমাদের দেশে প্রধানত মন্দিরের মধ্যেই তার স্থান ছিল। গ্রীসের এই বাগানে মূর্ত্তি রাখার মুখ্য উদ্দেশ্য বাগানের শ্রীবৃদ্ধির জন্যে মোটেই নয় তার উদ্দেশ্য বাগানটির শ্যামলতা ভাস্কর্য্যের পটযবনিকা রূপে ব্যবহার করা। তাঁদের ভাস্কর্য্য প্রকৃতির কোলের দুলালের মত শোভা পেতো আর আমাদের দেশে ভক্তের পূজামন্দিরই ছিল ভাস্কর্য্যের প্রশস্ত স্থান।

এই সকল মূর্ত্তি যে কেবল পাথরের তৈরী হোতো তা নয়! কাঠের, হাতির দাঁতের, মাটীর এবং বিভিন্ন ধাতুতেও এই সকল মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করা হোতো। এই সকল শিল্পের প্রয়োজনীয়তা কমে গেলেও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের হাতির দাঁতের কাজ, কৃষ্ণনগরের মাটীর মূর্ত্তি এবং অন্যান্য অনেক স্থলে ধাতুমূর্ত্তি গড়া অল্প বিস্তর এখনও প্রচলিত আছে। বাঙলাদেশের ভাস্কর্য্যের নিদর্শনগুলিতে প্রধানত মাটীর গড়া মূর্ত্তিই বেশী দেখা যায়। ভারতবর্ষীয় অপরাপর সঙ্গীতের মধ্যে বাঙলাদেশের বাউল কীর্ত্তন প্রভৃতিতে যেমন একটি স্বাতন্ত্র্য দেখা যায় তেমনি বাঙলাদেশের যশোহর মেদিনীপুর প্রভৃতি নানা স্থানে যে সব পুরোনো মন্দিরের গায়ে মাটীর মূর্ত্তিগুলি আছে সেগুলিতে বাঙলার একটা বিশেষ ছাপ আছে বলে মনে হয়। বাঙলায় ভারতবর্ষের প্রাচীন অন্যান্য স্থানের মূর্ত্তিগুলির সঙ্গে এগুলিকে একেবারে মিশিয়ে দেওয়া যায় না। বাঙলাদেশের মত উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য, গান্ধার প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন ভাস্কর্য্যকেও সহজেই এইরূপে ভাগ ক'রে দেখান যেতে পারে। বলাবাহুল্য কৃষ্ণনগরের যে সব কারিগরেরা মাটীতে আজকাল মূর্ত্তি গড়েন তাঁদের মধ্যে এই বাঙলার বিশেষত্বের ছাপটুকু আর আমরা দেখ্‌তে পাই না বা তাঁরা শাস্ত্রানুশাসন মতেও মূর্ত্তি গড়েন না। ফলে, বীরশ্রেষ্ঠ কার্ত্তিকের আধুনিক "সোনার কার্ত্তিক" রূপে কোঁচান ধুতি পরে গলায় চাদর ঝুলিয়ে (যেন গলবস্ত্র হয়ে) গোঁপে চাড়া দিয়ে অলস ভাবে অতি কষ্টে ময়ূরের পিঠে বিরাজ করে থাকেন এবং নটেশ মহাপ্রলয়ের বিষান না বাজিয়ে "শিবঠাকুরটি" সেজে "শিবনেত্র" হয়েই আছেন, কেবল কপালে একটা বেশী করে চোখ আঁকা থাকে মাত্র—দুর্ভাগ্যের বিষয়

তাঁর এই তন্দ্রা যে শিল্পীরা কবে ঘোচোবেন তা বলা যায় না। কৃষ্ণনগরের কারিগরেরা আজকাল ইউরোপীয় ভাস্কর্য্যের অনুসরণ করলেও ইউরোপীয় আদর্শের বিশেষত্বও তাতে স্পর্শ মাত্রও করেনি এখন তাদের কাজগুলিকে বাঙলাদেশের কাজ বলে পরিচয় দিতেও লজ্জা বোধহয় ইউরোপীয় শিল্পের সঙ্গে তুলনা করলে ইউরোপীয় শিল্পকেও অপমান করা হয়। শিল্পের মধ্যেই আসলে আমাদের জাত বাঁচানর আবশ্যকতা আছে। কেননা শিল্পই আমাদের জাতীয়তার প্রধান পরিচয়। বাঙলাদেশ থেকে চিত্র-শিল্পে যে জাতীয়তা রক্ষার দিকে আমাদের উদ্যম আজকাল প্রকাশ পাচ্চে দুঃখের বিষয় দেশের ভাস্কর্য্যের দিকে আমরা কেউ সেরূপ সুনজর এখনও দিইনি।

ভাস্কর্য্যের সঙ্গে চিত্রশিল্পের একটা বিশেষ পার্থক্য এই যে ভাস্কর্য্য তার নিজের স্বরূপটিকে নিয়েই সম্পূর্ণ; তার আশেপাশের সব জিনিষকে সে ছাড়িয়ে উঠেচে। আর ছবি আশেপাশের অনেক জিনিষের সঙ্গে জড়িয়ে আত্ম-প্রকাশ করতে সমর্থ হয়। আমরা আমাদের দেশের প্রাচীন ভাস্কর্য্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ অজন্তা, ইলোরা, কোনারক বরবোদর প্রভৃতি স্থানে যা দেখতে পাই তাতে লক্ষ্য করি যে এই সব মূর্ত্তিগুলি স্বাভাবিক মানুষ এবং আশেপাশের অন্যান্য পার্থিব জিনিষের চেয়ে এত বড় আকারে গঠিত যে তার সামনে দাঁড়ালে সেই সব আশপাশের জিনিষগুলিকে ভুলে যেতে হয়। মানুষের কাজ সেখানে মানুষকে ছাড়িয়ে উঠে তার মনকে একেবারে অধিকার করে বসে তাই সেই সব মূর্ত্তির পাশে দাঁড়ালে নিজকে নিজের সৃষ্টবস্তুর চেয়ে ক্ষুদ্র বলেই মনে হয়। এখানে শিল্পীর মনের উদার মহত্ত্ব কতখানি—কত উঁচু সেই কথাই ভাববার বিষয় হয়ে পড়ে।

শিল্পীর শিল্পরচনা কবির বাণীর মতই তার মনের কথাটিকে প্রকাশ করে। কাব্য-কলায় কবি বাণীর সাহায্যে সংখ্যাতীত ছবি এবং রঙে মন জাগিয়ে দিয়ে তাঁর ভাব-কল্পনার একটি অনির্ব্বচনীয় রস ও রূপ একটি মাত্র কবিতার মধ্যে প্রকাশ করে থাকেন। কবির বাণী রূপ পেতে হলে বেশী সাজ সরঞ্জামের অপেক্ষা রাখেনা সে অবাধে প্রকাশ পায়। অবশ্য এই বাণী স্বর্গীয় সামগ্রী এবং দুর্লভ। চিত্র-শিল্পীর চিত্র বাহিরের দিক থেকে দেখলে কবির ভাষা ও সুরের চেয়ে সীমাবদ্ধ তাই তাতে যেটি প্রকাশ করতে হয় তাতে রঙের ও নানান বস্তুর সন্নিবেশে শিল্পীরা ভাব ফুটিয়ে তোলবার সুযোগ পান। ভাস্কার্য্যে—কবির বা চিত্রকরের মত অবাধগতি তো নাইই, সে একেবারে স্থির জমাট বস্তু। ভাস্কর্য্যে জমাট বলে জড়পদার্থ মোটেই নয়। ভাস্কর্য্যের গম্ভীরত্ব তার সমস্ত চঞ্চলতাকে ছাড়িয়ে অনেক উপরে উটেচে তাই সে স্থির। ভাস্কর্য্যের বাইরের আকার বা মাপ তার রূপ দেয় না, তার মোট ভাবটিকেই প্রকাশ করে। তাই জগতে অন্যান্য শিল্পকলার মধ্যে ভাস্কর্য্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বড়ই কম। বেশী সূক্ষ্ম কাজ বা রক্তমাংসের গঠন দেখান শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্যের লক্ষণ নয়। তাই কখন কখন অতি অসভ্য ও অশিক্ষিত লোকের তৈরী পুতুলের মধ্যেও আমরা আশ্চর্য্য শক্তির পরিচয় পেয়ে থাকি। শিল্পীর সৃষ্ট বস্তু মানুষের ব্যবহার্য্য, অব্যবহার্য্য, সূক্ষ্ম, স্থূল, উপকারী, অপকারী এসব ধরণের জিনিষের মত জিনিষ নয়; সেটা বাইরে একটা আকার নিয়ে প্রকাশ পায় বটে কিন্তু সেটা আসলে মানুষের হৃদয়ের জিনিষ এবং তাই সে বাইরের আকার বা রেখাকে ছাড়িয়ে মনকে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ রসে ভরে দেয়। প্রকৃত আর্ট তাই বাহ্য গঠন-নৈপুণ্যে প্রকাশ পায় না, তার মোট রসটিই হ'ল আসল রূপ।

শিল্প-জগতের ইতিহাসে দেখা যায় প্রাচীন কালে কাঠের মূর্ত্তি গড়াই সব দেশে প্রচলিত ছিল। পাথরের তৈরী কুঠারের সাহায্যে কাঠের মূর্ত্তি গড়া হ'ত। তারপর মাটীর এবং ক্রমশ লোহার যন্ত্রের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে পাথরের ও ধাতুমূর্ত্তি প্রচলিত হয়। ভাস্কর্য্যকলা সমস্ত শিল্পকলার মধ্যে প্রাচীনতম; এটাকে আদিশিল্প বলা যেতে পারে, সর্ব্ব প্রথমে মানুষ এই ভাস্কর্য্যের সাহায্যেই মনের ভাবকে মূর্ত্তি দিয়েছিল, তারপর চিত্রকলার

ভাব প্রকাশের সুবিধাও স্বাধীনতা লাভ করার পর চিত্রের সাহায্যে বাণীর প্রচার করাবার ক্ষমতা লাভ করে। এই ভাবে দেখা যায় ভাস্কর্য্যের সর্ব্বপ্রাচীন মূর্ত্তিগুলি সূক্ষ্ম বিচারে অত্যন্ত নিকৃষ্ট বলে মনে হলেও তাতে যে ভাবের অভিব্যক্তি আমরা দেখ্‌তে পাই তা' আধুনিক শিল্পরচনায় একেবারেই বিরল। আধুনিক যুগে শিল্প রচনায় কারুকার্য্যের পারিপাট্যের প্রতি যতটা নজর দেওয়া হয়, ভাব প্রকাশের দিকে ততটা নজর দেওয়া হয় কিনা সন্দেহ। পুরাকালে ইজিপ্ট প্রভৃতির শিল্পীরা মোট-ভাব প্রকাশের জন্যেই ছবি গড়ে তুলতেন। Technique এর প্রতি ততটা লক্ষ্য রাখ্‌তে জান্‌তেন না। আর পরবর্ত্তী শিল্পীরা ক্রমশ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বিচার করে চলতে শিখে মোট-ভাবটিকে প্রায় হারিয়ে ফেলেচেন। তাই ইজিপ্টের মূর্ত্তিতে আমরা একটা সরল সহজ প্রাণস্পর্শী ভাব যা দেখতে পাই সেটি পরবর্ত্তী উন্নত শিল্পের মধ্যে নেই বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।

অনেকে মনে করেন যে পুরাকালের মূর্ত্তি ও চিত্রের সাহায্যে তৎকালের ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু আমাদের মনে হয় সেটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা; কেননা শিল্পীরা তৎকালে যা কিছু গড়েছিলেন সেগুলির নিদর্শন বাইরের কোন সামগ্রী থেকে আধুনিক বাস্তব-প্রধান ইউরোপীয় শিল্পীদের মত প্রত্যক্ষ ভাবে গ্রহণ করেন নি।—কেবল তাঁদের কল্পনার রূপটি সেই সব প্রাচীন কলায় তাঁরা অমর করে রেখে গেছেন মাত্র। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় (?) তৎকালের বেশভূষা বা আচারবিচারের তথ্য বা নিদর্শনরূপে এমন কোন শিল্প রচনা করেন নি যা থেকে পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকেরা তাঁদের গবেষণার খোরাক পেতে পারেন। গ্রীকের নগ্নমূর্ত্তিগুলি দেখে এবং তার অতি-মানুষিক মাপ ও পরিমাণ দেখে আমরা যদি ভাবি যে পুরাকালের সব গ্রীকেরা এই ভাবে নগ্ন ও অতি-মানুষিক অবয়ব নিয়ে বেড়িয়ে বেড়াতেন তা হলে সেটা হাস্যকর কল্পনা ছাড়া আর কিছুই হয় না। তাই আমাদের দেশের নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার মত স্থির অতিবৃহৎ পাথরের বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি দেখে বুদ্ধের জড়দেহের মাপটিও আসলে ঐরূপ ছিল যদি কল্পনা করি তা হলে বুদ্ধদেবকে বিশেষ কিছু গৌরবান্বিত করা হয় বলে মনে হয় না। এটা ঠিক যে প্রাচীনকালের মানুষও মানুষই ছিল তারা অতিকায় হস্তী বা হিমালয় পাহাড়ের মত একটা কিছু ছিল না।

ভাস্কর্য্য সবদেশেই প্রধানত Personaltiyকেই প্রকাশ করে। ভাস্কর্য্য একটি কোন মূর্ত্তির ভিতরই তার ভাবকে ফোটায় তবে সেই ভাবটিকে বিশেষভাবে বোঝাতে গিয়ে অনেক সময় গৌণ মূর্ত্তিও আশেপাশে দেখা যায়। আমাদের দেশের বুদ্ধ, ও অন্যান্য দেবদেবীর প্রতিমা, গ্রীসের দেবতাদের মূর্ত্তি, ইজিপ্টের রাজনগণের মূর্ত্তিগুলি তার সাক্ষীস্বরূপ বর্ত্তমান। আধুনিক যুগে কলকব্জার সঙ্গে সঙ্গে যেমন ধর্ম্মবুদ্ধি লোপ পেতে বসেছে তেমনি শিল্পকলার techniqueএর শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের রসবোধের মাত্রা কমে চলেচে। আজকাল তাই মূর্ত্তিটির চেয়ে মূর্ত্তির কাপড়ের teexture ও দেহের অস্থি-মজ্জার সংস্থান ঠিক হয়েচে কিনা সেইদিকেই শিল্পীদের নজর বেশী থাকে। আসলে রসের চেয়ে রূপেরই এখন আদর বেশী দেখা যায়। এখনকার শিল্পীরা বিশেষভাবে ভাস্কর্য্যে দেহগঠনের কমনীয়তা ও বাহ্য-রূপেরই ধ্যান করেন সেটা ছাড়া আধ্যাত্মিক রসবোধের তাঁরা ধারই ধারেন না। এ বিষয় কোন কোন ইউরোপীয় শিল্পরসিকেরা এখন খুবই বুঝ্‌তে পেরেচেন তাই তাঁদের দেশের প্রকৃত শিল্পী রোঁদার মত শিল্পীকে বুঝ্‌তে তাঁদের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দির উপর লেগেছিল। পাশ্চাত্যের শিল্পীদের মনে বহুকাল থেকে যে পেশীবহুল স্থূল শিল্পলক্ষ্মীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে সেটির পরিবর্ত্তে ভারতের বরাভায়া কমলাসীনা মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা আমরা তাঁদের দেশে করাতে চাই না কিন্তু আমাদের দেশের শিল্পীদের হৃদয়-কমলে সেই মূর্ত্তিটীর প্রতিষ্ঠা দেখ্‌তে চাইলে কিছু অন্যায় আব্দার করা হবে না।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

জোয়ার এল বনের বুকে।

জোয়ার এল বনের বুকে
　　　　কাঁপিছে হিয়া থর থর,
শ্যামল স্রোতে ঢেউএর মত
　　　　উঠিছে মহা মর মর !

শাখারা সব পাগল পারা,
শিকড় চাহে ভাঙিতে কারা
উপাড়ি প্রাণ দেখাতে চায়
　　　　কোথায় সুধা নিরঝর ॥

ফুলের দল ঝরিয়া পড়ে
পাতার পাতি উধাও ওড়ে
বাতাস ছোটে আকাশ গাহে
　　　　এদেরে সব ধর ধর ॥
উতল রোলে জাগর গান
ঘুমের বুকে হানিল বাণ,
চেতন তরু বরণে ফুলে
　　　　বরিয়া নিল চরাচর ॥

২।৯।১৭

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

মঙ্গল-মঠ।

—:✻:—

দ্বিতীয় খণ্ড।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অতি অল্প বয়সে, জ্ঞানোন্মেষের পূর্ব্বেই শান্তিদেবীর বিবাহ ও বৈধব্য ঘটনা সমাধা হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং সে ঘটনাগুলা তাঁহার প্রাণকে তেমন কিছু স্পর্শ করিতে পারে নাই, তাঁহার যাহা কিছু দুঃখ অনুভব হইয়াছিল তাহা শুধু পিতার কষ্ট দেখিয়া !—তারপর জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মহদাশয় জ্ঞানী পিতার সাহচর্য্য ও দৃষ্টান্তপ্রভাবে তিনি স্বচ্ছন্দে জীবনের গতি প্রশস্ত উদারতার পথে মুক্ত করিয়া দিয়া প্রাণে নির্ম্মল শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু

অধিক বয়সে পিতৃবিয়োগ শোকটা তাঁহার মনের উপর বেশ একটা তীব্র আঘাত হানিয়া গিয়াছিল, ইহাকে তিনি এড়াইতে পারেনও নাই, এড়াইতে চাহেনও নাই ; কিন্তু এই শোককে তিনি শুধু পরম দুঃখের দিক হইতে গ্রহণ করেন নাই,—পরম শিক্ষার দিক হইতে ইহাকে তিনি সসম্মানে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, এই শোকাহত দৃপ্ত-চেতনার মধ্যে তিনি সমস্ত হৃদয়কে সংহত করিয়া, ব্যাকুল-আগ্রহে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে শ্রেষ্ঠ সাধনার পথে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন।

মাঝখান হইতে মায়ার এই সাংঘাতিক ভাগ্যপরিবর্ত্তন, তাঁহাকে অন্য দিক হইতে নূতন রকমের একটা শক্ত আঘাত দিয়া, বড় বিচলিত করিয়া তুলিল। নিজের যাহা হইবার তাহা হইয়া বহিয়া গিয়াছে, চারিপাশে যে কয়জন স্নেহপাত্র আছে, তাহারা যদি সুখেস্বচ্ছন্দে দিন কাটায়—তাহা হইলে যথেষ্ট তৃপ্তি পাওয়া যায়, কিন্তু ভাগ্যদেবতা তাহাতেও বিমুখ হইলেন, সুপ্ত শোক-বহ্নি নূতন আঘাতে উদ্দীপ্ত হইয়া শান্তিদেবীর স্নেহ-কোমল হৃদয়কে বড় বিকল করিয়া তুলিল, অসহ্য মনের আবেগে তাঁহার অসুস্থ শরীর অধিকতর অসুস্থ হইয়া উঠিল,—তিনি মঙ্গল-মঠে আসিয়া শয্যা গ্রহণে বাধ্য হইলেন।

মায়ার নম্র-কোমল প্রকৃতির শান্ত-সহিষ্ণুতা সকলেই চিরদিন ভাল রূপে জানিত,—এত বড় পরিবর্ত্তনেও তাহার সে ভাবের বিশেষ কিছু ব্যত্যয় দেখা গেল না, সে প্রথমটা অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা খুব অল্প সময়ের জন্যই। তারপর তাহার প্রকৃতিতে সেই চির অভ্যস্ত ধৈর্য্য-দৃঢ় গাম্ভীর্য্য-প্রশান্তি আবার দ্বিগুণ শক্তিতে প্রকটিত হইতে দেখা গেল। সকলেই বেদনার সহিত বিস্ময় বোধ করিলেন কিন্তু মায়া কিছুতেই দৃক্‌পাত করিল না, নিজের মধ্যে স্পষ্ট-চেতনায় সে উপলব্ধি করিল যে এই সর্ব্বস্ব-খোয়ান শোকের আঘাত যত বড় বিষম কঠিন হৌক,—কিন্তু এই শোক, একটা সুদৃঢ় সান্ত্বনা পরিবেষ্টনে আবরিত করিয়া তাহাকে সর্ব্বজয়ী নিশ্চিন্ত নির্ভয়ের অঙ্কে স্থান দিয়াছে, এই দুঃসহ যন্ত্রণাময়ী বিয়োগ বেদনা,—তাহাকে সকল মোহের যোগ হইতে, সকল দৌর্ব্বল্য কাতরতার যোগ হইতে চিরদিনের জন্য নির্ম্মম টানে ছিঁড়িয়া,—একেবারে পরম নির্ভরতার বুকে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে !—এখানে দাঁড়াইয়া অতীতের সুখ দুঃখের স্মৃতি আন্দোলন করা দুঃসাধ্য,—বড় অসহ্য ব্যাপার ! বর্ত্তমানের জন্য আক্ষেপ করিতেও ইচ্ছা নাই, এখন এখানে দাঁড়াইয়া, তাহার ইচ্ছা হইতেছে শুধু,—ভবিষ্যতের পরপারে যাহা আছে, তাহারই দিকে নিঃশঙ্ক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে !

দিনের পর দিন, কাটিতে লাগিল, মায়া চিত্তকে নিত্য নূতন পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া দ্রুততর বেগে টানিয়া লইয়া চলিল, বাহ্যজগতের সংস্রব সে একেবারেই ছাড়িয়া দিল, স্তব, স্তোত্র,—শাস্ত্রচর্চ্চা ও জপের মালা লইয়া সে গৃহ কোণে মৌন-নির্জ্জনতার মধ্যে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করিল, অবস্থাভিজ্ঞা শান্তিদেবী গভীর বিষাদের সহিত তীব্র নিশ্চিন্ত তৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিলেন, কেবলরাম দূর হইতে সমস্ত চাহিয়া দেখিয়া, নিঃশব্দ মনস্তাপে মৌন গম্ভীর হইয়া রহিল। মায়াকে দেখিলে এখন সংসারের মানুষ বলিয়া হঠাৎ বুঝিতে পারা যায় না, সে যেন অন্যলোকের অধিবাসী ;—তাহাকে কতক পরিমাণে মর্ত্ত্যের মানুষ বলিয়া তখনই বুঝিতে পারা যাইত,--যখন পুত্রকে বুকে তুলিয়া লইয়া, সে আন্তরিক আগ্রহে তাহাকে স্নেহচুম্বনে অভিষিক্ত করিত,—তখন,—শুধু তখনই তাহার মুখে চোখে স্বর্গ মর্ত্ত্যের শ্রী—সৌন্দর্য্য সম্মিলিত হইয়া, প্রসন্ন ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। তখনই সংসারের মানুষ বুঝিতে পারিত—হাঁ, এ নারী তাহাদেরই একজন বটে !—

সে দিন সন্ধ্যাবেলা কেবলরাম মঠের কাজ সারিয়া বাটী ফিরিয়া জলযোগে বসিয়াছিল,—অদূরে শান্তিদেবী মালা হাতে করিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহার নিকটে বধূ আসিয়া মাথার কাপড় টানিয়া মায়ার শিশুকে কোলে লইয়া

বসিয়াছিল, কেবল. শান্তিদেবীকে তাঁহার পাঁজরের ব্যথার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন. সহসা অপ্রত্যাশিত ভাবে মায়া সেখানে আসিয়া কেবলরামের সম্মুখে বসিয়া পড়িয়া বিনা ভূমিকায় বলিল, "দাদা, আমার একটি অনুরোধ আছে, বল তোমরা রাগ করবে না ?"

কেবল ম্লান ভাবে হাসিয়া বলিল "রাগ করবার মত অনুরোধ তুমি ত কখনো করনি দিদি, কেন আমি রাগ করব ?"

মায়া খুব সহজ ভাবে সংক্ষেপে বলিল "মঙ্গল-মঠে দেবালয়ের পরিচারিকা ক'দিন হোল কর্ম্মত্যাগ করেছে, আমাকে তুমি সেইখানে নিযুক্ত করে দাও।"

বিস্ময়ে চমকিয়া কেবল বলিল "তোমাকে ? অসম্ভব ! না মায়া, আমার আয় যত অল্পই হোক, কিন্তু সংসারে অভাব অসচ্ছলতা আমার কিছুই নাই—"

বাধা দিয়া দৃঢ় স্বরে মায়া বলিল "তোমার অভাব না থাক, কিন্তু আমার আছে ! আমার শক্তি সবল দেহ, জপের মালা নিয়ে অষ্টপ্রহর অলস নিশ্চেষ্ট ভাবে বসে থাকায় শক্তির অপব্যবহার হচ্ছে,—এই অপব্যবহারই যে মহাপাপ কেবল-দা, না, এর প্রতীকার চাই, তুমি আপত্তি কোর না—"

হতবুদ্ধি হইয়া কেবল বলিল "তোমার ছেলে যে ছোট মায়া—"

"তাতে আমার কি ? যে ক'দিন একান্ত অসহায় ভাবে আমার মুখাপেক্ষী হয়েছিল, সে ক'দিন প্রাণপণে যত্ন তত্ত্বাবধান করেছি, এখন ভগবানের ইচ্ছায় ও দিনে দিনে আমার সংস্রব এড়িয়ে যাচ্ছে, এ ত আমার পক্ষে খুব ভাল হয়েছে,........ আমি এখন নিজের কাজ খুঁজে নিতে কেন আলস্য করি বল দেখি ?"

কেবল ক্ষণেক হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিল "বুঝেছি মায়া দিদিমা যে ঐ কাজ করে গেছেন, সে কথাটা তুমি ভুলতে পারনি, কিন্তু তাঁর অবস্থার সঙ্গে তোমার অবস্থার পার্থক্য কতটা তা কি ভেবে দেখেছ ?"—

মায়া বলিল "দেখেছি কেবলদা, কিন্তু তাই বলে সেই ভয়টাকে বড় করে এখান থেকে পেছিয়ে দাঁড়াতে পারিনে, আমার কাজ চাই, কেবল-দা, সৎ কাজ, যাতে দেহ মন দুই সুস্থ থাকে, এমন কাজের ব্যবস্থা চাই,—না কেবল-দা, বুঝতে পারছি, তুমি তোমার মান-অপমানের কথা তুলে আপত্তি করতে চাইছ, কিন্তু ও বাজে তর্ক, ভাই যেখানে দাসত্ব করতে পারে, ভগিনীর সেখানে দাসীত্ব স্বীকারে হানি কি ? বিশেষ সে দাসীত্বে যদি চিত্তের আনন্দ স্ফূর্ত্তি থাকে........"

মায়া যে এমন ভাবে তর্ক যুক্তির অবতারণা করিতে পারে তাহা কেবলের স্বপ্নের অগোচর ! কি উত্তর দিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া সে হতভম্ব হইয়া রহিল। শান্তি দেবী ম্লান মুখে অশ্রু ছল ছল নয়নে বলিলেন "কেন পাগলামী করিস মায়া, এমন ভাবে আমাদের কষ্ট দেওয়াটা কি তোর উচিত ?—তোর এত দুঃখ সহ্য করবার কি দায় পড়েছে ?"

মায়ার অধরপ্রান্তে যেন ক্ষুব্ধ বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিল, বলিল "দুঃখ ? তোমরা একে 'এত দুঃখ' মনে করলে দিদি ? সত্যই এবার আমার বড় দুঃখ বোধ হোল, তোমাদের স্নেহ অনুগ্রহ যত্ন আদরের ওপর খুশীর জোরে তর্ক চালাতে পারি না দিদি, চুপ করে যেতে বাধ্য হচ্ছি, কিন্তু মুক্তকণ্ঠে বলছি বিশ্বাস কর—দুঃখের সম্পূর্ণ মূর্ত্তিটা যে কত বিরাট, কত ভয়ানক,—তা আমি জীবনের চরম সুখের মুহূর্ত্তে সব চেয়ে ভাল করে দেখে নিয়েছি—বুঝে নিয়েছি ! তার কাছে এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষীণ ছায়া ভয় করবার জিনিস নয়,—ভাল বাসবার সামগ্রী !"

একটু থামিয়া, সহসা অসহিষ্ণু বিরক্তির সহিত মায়া বলিয়া উঠিল, "এই সামান্য ব্যাপারটার জন্যে তোমরা যে অনর্থক মত-দ্বন্দ্ব বাধিয়ে আমায় বাধা দেবে,—এটা বড়ই অবিচার হয়! আমি বাক্‌চাতুরী করে তোমায় জ্বালাতন করতে আসি নি দাদা, আমি এক কথা বলে দিতে এসেছি আমার 'কাজ চাই!'.........এর ওপর সত্য সত্যই যদি আপত্তি করবার মত কিছু থাকে, বুঝে দেখে কাল আমায় বোলো, কিন্তু যতদূর বুঝ্‌ছি, তুমি এখন দেবালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ, প্রধান পুরোহিত। তুমি যদি একটু চেষ্টা কর, তা হলে এ কাজ আমার পক্ষে খুবই সহজসাধ্য হয়।"

মায়ার অসঙ্গত অনুরোধটা সদ্যঃ প্রত্যাখ্যান করিয়া নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কেবলরাম মনে মনে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল, কিন্তু জোর করিয়া 'না' বলিতেও তাহার ভয় হইল, অথচ কোন তর্কে মায়াকে নিরস্ত করিবে তাহাও ভাল বুঝিতে পারিল না, খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা বলিল "মনের শান্তির জন্য যে গোলমেলে দাসত্ব-বাধ্যতার মধ্যে ঢুক্‌তে চাইছ, তাতে কি শেষ পর্য্যন্ত মনের শান্তি সন্তোষ অব্যাহত থাক্‌বে?"

মায়া ইহার উত্তর যেন পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, হাসিয়া তৎক্ষণাৎ বলিল "তা কি থাকে কেবল দা? শেষ পর্য্যন্ত শান্তি সন্তোষ অব্যাহত থাক্‌লে যে সব দিকই মাটী হয়ে যাবে! আমি এ কাজে এগোতে চাইছি, বাইরের দিক থেকে শান্তি সন্তোষ লাভের জন্য নয়,—বাইরের দিক থেকে নানা অবস্থার সংঘাতের ভেতর দিয়ে আমি এমন জিনিস নিতে চাই,—যাতে করে আমার ভিতরের শান্তিসন্তোষ চরম তৃপ্তিতে চিরদিনের জন্য জমাট বেঁধে যায়!"

মায়ার কথাটা সকলের নিকটই অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য বোধ হইল, কেবলরাম নির্ব্বাক হইয়া রহিল, শান্তিদেবী বলিলেন "মায়া, তুই বুদ্ধিহীনা নস্, সেটা খুব ভাল জানি, দেবালয়ের পরিচর্য্যা খুব সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই, যদি প্রাণের নিষ্ঠায় কর্ত্তব্যপালন করা যায়, তাহলে সেও যে এক মস্ত সাধন তা'কে অস্বীকার করবে? আমি তোকে বাধা দিতে চাইনে, কিন্তু একটা কথা,—নিশ্চিন্ত নির্জ্জনে মুখ্য-সাধন ছেড়ে, অত কোলাহলের মধ্যে গিয়ে গৌণ-সাধনের প্রয়োজন কি?"

মায়া শান্তি দেবীকে প্রণাম করিয়া বলিল "সন্দেহ-টাকে নিঃসংশয়ে মিটিয়ে নিতে চাই! মুখ্য-সাধন ছেড়ে গৌণ চাইছি কেন জিজ্ঞাসা করছ?—মুখ্য সত্য স্পষ্ট পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধি করবার জন্যই গৌণ সাধনের আবশ্যকতা বুঝ্‌ছি বলে! অস্ত্রের ব্যবহার ক্ষেত্র যেখানেই হোক্, কিন্তু তাকে 'শাণ' দেবার জন্য কঠিন পাথরের দরকার, সেটা বিধাতা আমায় খুব ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন,............না,—আমার কথা হয়ত গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে, তোমরা বুঝ্‌তে পারছ না, কিন্তু ক্ষমা কর দিদি, আমি মনে যা বুঝ্‌ছি, তা নিয়ে মুখোমুখী বকাবকি করতে পারিনে, কেবলদা তোমার পায়ে পড়ি ভাই আপত্তি কোর না,—আমি জীবনে অনেক ভুল করেছি, ভুল করে করে ভুলের চেহারাটা খুব ভাল করে চিনে নিয়েছি, কিন্তু এবার ভগবান আমায় যে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সে পথের ত্রিসীমানায় ভুল তিষ্ঠাতে পারে না,—এটা খাঁটি সত্য।"

মায়া উঠিয়া দাঁড়াইল, আত্মসম্বরণ করিয়া খুব সহজ ভাবে একটু হাসিয়া তরল কণ্ঠে বলিল,—"অত কথায় কাজ নাই, মোটামুটি এইটুকু বলতে চাই, আমার দিদিমা ও পিতৃমাতৃহীনা দৌহিত্রীর জীবনের সদ্গতির জন্য ঐ দেবালয়ে ঐ কাজ করে গেছেন, তবে আমি কেন আমার অপোগণ্ড শিশুর ভবিষ্যত কল্যাণের জন্য ঐ দেবালয়ে কাজ [illegible]তে পারব না? বিশেষ, সুযোগ যখন রয়েছে, তখন একাজে অগ্রসর হওয়া আমার পক্ষে একান্ত [illegible]?"

মায়া চলিয়া গেল। কেবলরাম ও শান্তিদেবী অনেকক্ষণ ধরিয়া মায়ার প্রস্তাবের অনুকূলে ও প্রতিকূলে অনেক ভাল মন্দের সম্ভাবনা লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া অলোচনা করিলেন, তারপর উভয়ে একমত হইয়া, মায়ার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। পরদিন কেবল মায়াকে মঠের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিল।

দেওয়ান দেবকচাঁদের হস্তে মঠের বৈষয়িক ব্যাপারের সমস্ত ক্ষমতা থাকিলেও দেবালয় সংক্রান্ত কোন বিষয়ের সহিত তাহার সংশ্রব ছিল না, পুরাতন পুরোহিত শ্যামসুন্দর পণ্ডিত এখন পরলোকে, কেবলরাম তাহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সুতরাং দেবালয়ের সম্বন্ধীয় সকল ব্যাপারে কেবলরামই এখন সর্ব্বেসর্ব্বা। তাহার কঠোর শাসন ও সতর্ক দৃষ্টিতে এখন দেবালয়ের সকল কাজই খুব সুশৃঙ্খলে চলে, সেবকগণ সকলেই শিষ্ট-সংযত ভাবে কর্ত্তব্য পালন করে, কেবল পূর্ব্ব হইতে সকলকে ভালরূপে চিনিয়া রাখিয়াছিল, সুতরাং এখন প্রভু হইয়া সে সকলের সম্বন্ধেই যথোচিত সতর্ক হইয়া, কাজ আদায় করে; সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতা শাসিত হইয়া দেবালয় এখন যথার্থই দেবালয়ে পরিণত হইয়াছে।

শ্যামসুন্দর পণ্ডিতের পুত্র দয়ানন্দ ও তাহার সমশ্রেণীস্থ যে কয়জন কুৎসিত প্রকৃতির অপদার্থ ব্যক্তি দেবালয়ে ছিল,—তাহারা কেবলের অনুগ্রহে সকলেই মানে মানে বিদায় হইয়াছে,—দেবালয়ের অনেক পুরাতন লোক চলিয়া গেলেও, মায়া দেখিল এখনও বৃদ্ধ ভাণ্ডারী-জী দেবালয়ে আছেন; মায়ার জীবনের বিসদৃশ অবস্থা পরিবর্ত্তনের সংবাদ, বৃদ্ধের সরল স্নেহশীল হৃদয়ে বড় বেদনার সহিত গভীর সম্ভ্রমের ভাব জাগাইয়া দিল, বৃদ্ধ নিজের ব্যবহারে ত ত্রুটি রাখিল না, উপরন্তু তীক্ষ্ণ সতর্কতায়—মায়ার উচ্চ সম্মানের দ্বারে সে যেন প্রহরী হইয়া বসিল, তাহার ইঙ্গিতে দেবালয়ের ক্ষুদ্রতম প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া, সকলেই এই ভাগ্যপীড়িতা ভদ্র-গৃহস্থ যুবতীকে যথোচিত শিষ্ট-মর্য্যাদাপূর্ণ ব্যবহারে সম্ভ্রম দেখাইয়া চলিত, মায়া যতক্ষণ দেবালয়ের কাজে নিযুক্ত থাকিত, ততক্ষণ সকলেই পূর্ণমাত্রায় শান্ত সংযত ও নম্র হইয়া থাকিত। মায়া অবাধ শান্তিতে প্রসন্ন হৃদয়ে নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইত।

কেবলরামের বধূর যত্ন ও চেষ্টায় এবং মায়ার ইচ্ছানুকূল্যে মায়ার পুত্র, মাতার সহিত একে একে সকল সংশ্রব ত্যাগ করিল, বধূ অমিয়া স্বভাবতঃই শিশুবৎসল, তাহার পিত্রালয়ে,—জননীর সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তানটিকে, সে এমনি ভাবে সকলের সম্পর্ক ছাড়াইয়া নিজের আয়ত্ত বশীভূত করিয়া, জননীর নাম পর্য্যন্ত ভুলাইয়া দিয়াছিল! শিশু-হৃদয় জয় করিবার বিদ্যা কৌশলটা তাহার স্বভাবে খুব অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, মায়ার শিশুকে পাইয়া সে অব্যর্থ সন্ধানে সম্মোহিনী বিদ্যার প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহার উপর সম্পূর্ণ দখলীস্বত্ব সগর্ব্ব-কৌতুকে ঘোষণা করিয়া বসিল!—শিশু দিনে দিনে যতই চঞ্চল 'দামাল' হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই অমিয়াকে ঘনিষ্ঠ ক্রীড়াসঙ্গী রূপে খুব ভাল করিয়া চিনিয়া লইল, এখন অমিয়াকে পাইলে, সে ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া যায়, স্তন্যপানের জন্য মাতার কাছে শয়ন করিতে যাইতেও তাহার ইচ্ছা করে না!—রাত্রে অমিয়াকে ছাড়িয়া মাতার কাছে শয়ন করিতে যাইতেও তাহার ঘোর-আপত্তি, এক এক দিন তাহার আপত্তির মাত্রা এতদূর চড়িয়া উঠে যে, অমিয়াও নিজের গোপন-আগ্রহ লুকাইতে পারে না, ব্যগ্র মিনতিতে বলিয়া উঠে. "ছোড়-দি' মণি, আপনি যান, খোকা আজকের মত আমার কাছে থাক!"

শান্তি দেবী অবাক হইয়া যান, কেবলরাম আমোদ অনুভব করিয়া উচ্ছ্বসিত কৌতুকে খুব হাসে, মায়া সস্নেহে সরলা কিশোরীর লজ্জা-রক্তিম মুখখানি বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া এক এক সময় কৃতজ্ঞ-করুণ কণ্ঠে বলিয়া উঠে,—"অমিয়া তুই তবে ওর মা হ' ভাই, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ছুটী নিই।"

বাস্তবিক যতই দিন যাইতে লাগিল, অমিয়া ততই নিজের সুদক্ষতার পরিচয় দিয়া, মায়াকে নিশ্চিন্ত হইতে নিশ্চিন্ততর করিয়া তুলিল। খোকা খুব শীঘ্র বসিতে শিখিয়াছে, এইবার সে হামা দিতে আরম্ভ করিবে,—সুতরাং এখন খোকা বলিয়া ডাকা আর ভাল লাগিবে না বলিয়া অমিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল,—শান্তিদেবী আদর করিয়া খোকার নাম রাখিলেন, 'বাল গোপাল' কিন্তু অমিয়ার তাহা পছন্দ হইল না, সে কেবলরামকে গিয়া ধরিল, কেবল বাছিয়া খুঁজিয়া ইন্দ্র চন্দ্র বিশেষণ যোগে সৌখিন ধরণের একটি নামকরণ করিল, কিন্তু অমিয়া তাহাও না মঞ্জুর সাব্যস্ত করিয়া, মায়ার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল,—মায়া প্রথমত হাসিয়া উড়াইল, কিন্তু শেষে উপর্য্যুপরি অনুরোধে অতিষ্ঠ হইয়া, গোপনে বেদনাশ্রু মুছিয়া উত্তর দিতে বাধ্য হইল, অমিয়া খুশী হইয়া শান্তিদেবীর কাছে আসিয়া হাসি মুখে জানাইল, 'ছোড়-দি মণি খোকার নাম রাখিয়াছেন,—'মুক্তি সাধন !'

দিনের পর দিন কাটিতে চলিল। সুদীর্ঘ ব্যাধি ভোগের পর, সহসা স্বাস্থ্যস্পর্শে, ব্যাধিগ্রস্তের ক্লিষ্ট অবসন্ন দেহ মন যেমন স্ফূর্ত্তি প্রফুল্লতার মধ্যে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতনতর ভাবে স্পষ্ট সচেতন হইয়া উঠে, মায়ার আভ্যন্তরিক স্বাচ্ছন্দ্যের অবস্থাও ঠিক তেমনি দ্রুতবেগে উজ্জ্বল শান্তিতে ভরিয়া উঠিতে লাগিল!—মায়ার দিন রাত্রিগুলা দিনে দিনে নব নবীনতর তৃপ্তি-আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল পিছনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তটা—সে যেন স্বপ্ন বিস্মৃতির অন্ধকারে সজোরে নিক্ষেপ করিয়া তীব্র আকাঙ্খায় ব্যাকুল আগ্রহে,—তৃষিত উৎসুক হৃদয় লইয়া বাঞ্ছিত পথে ছুটিয়া চলিল, চতুষ্পার্শ্বের ঘটনা-তরঙ্গ বলিষ্ঠ বাহুর ক্ষিপ্র কৌশল সঞ্চালনে সজোরে ঠেলিয়া মুক্ত বাতাসের উপর মাথা উঁচাইয়া নির্ভীক নিঃশ্বাসে প্রাণশক্তি-সংগ্রহ করিয়া, সে যেন স্রোতের মুখে উজানে ভাসিয়া চলিল!—এক এক সময় গভীরতম শান্তি আনন্দের মধ্যে হর্ষবিহ্বল হইয়া সে ভাবিত, তাহার এত শক্তি এতদিন কেবল দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকারে, কোন মহাসুপ্তির মধ্যে মগ্ন হইয়াছিল? সে যে ইহার অস্তিত্ব এক মুহূর্ত্তের জন্যও জানিতে পারে নাই!........বুঝি মঙ্গলময় দয়া করিয়া তাহাকে এই নির্ভুল সন্তরণ কৌশল শিখাইবার জন্যই,—নির্দ্দয়ের মত তত বড় ভুলের মধ্যে ডুবাইয়াছিলেন!.........না ডুবিলে বুঝি এই সাঁতার শিক্ষা হইত না!

মায়ার কৃতজ্ঞ ভক্তিভার-নম্র হৃদয় একান্ত আত্মনিবেদনের মধ্যে আত্মহারা হইয়া উঠিত!—হায় নারায়ণ, তোমার বিরাট রহস্য কৌতুকলীলা মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য! মানুষ কি বুঝিবে, তুমি কাহাকে গড়িবার জন্য কাহাকে ভাঙ্গিতেছ! কোন বোধ-উদ্বোধনের জন্য কত বড় ভ্রান্তি-রহস্য রচনা করিতেছ!....... দুর্ভাগিনী মায়া, জীবনের সব চেয়ে বড় সৌভাগ্য, সার্থকতার মুহূর্ত্তে—অন্তরের সব চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য, ব্যর্থতা অনুভব করিয়া, ক্ষুব্ধ বেদনায় আত্মগ্লানিতে জর্জ্জর হইয়াছিল!—আর আজ,—জীবনের চরম ব্যর্থতার অঙ্কে উপস্থিত হইয়া,—অন্তরের পরম সার্থকতা খুঁজিয়া পাইল!—এ কি আশ্চর্য্য তোমার করুণা, দীনবন্ধু!—তোমার মহিমার জয় হোক, মানব-অদৃষ্টের মহত্তর দুর্ভাগ্য-যোগেই পরম-সুযোগের সন্ধানে কৃতার্থ,—ধন্য হইয়াছে! সে আজ বুঝিতে পারিতেছে, মানব জীবনের সব চেয়ে বড় ব্যর্থতাই সব চেয়ে বড় সার্থকতার সংবাদ বহন করিয়া আনে!—হে কৌতুক-কুশল দেবতা, তোমার কৌতুক লীলা তোমার কৌতুকের জন্যই,—জগতে চিরদিন সমস্রোতে প্রবাহিত হোক, তোমার তৃপ্তিতে মর্ত্ত্য-জীবের জীবনমরণ গৌরবে ধন্য হোক. কিন্তু ক্ষমা কর দয়াময়, একান্ত পরিশ্রান্তকে এবার চির বিশ্রামের আশীর্ব্বাদে, অ-মর করিয়া দাও! এ যাত্রা, আর নয়!

দিনের পর দিন অপ্রতিহত বেগে কাটিয়া চলিল, বর্ষার পর শরত, হেমন্ত, শীত, চলিয়া গেল, আবার নূতন করিয়া বসন্ত আসিয়া দেখা দিল, অবিশ্রান্ত পরিবর্ত্তন স্রোতের—প্রত্যেক বিন্দুতে বিন্দুতে নব-নবতর পরিবর্ত্তন-ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গেল, কাল শুধু নিঃশব্দ কৌতুকে করতালি দিয়া বলিতে লাগিল "দেখ মানব, জগতে

জগদীশ্বরের কৌতুকলীলা দেখিয়া যাও ! জগতের প্রাণ বৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, জগতের শোভা বৈচিত্র্যে অনুরঞ্জিত, জগতের গতি পরিবর্ত্তনের ইঙ্গিতে পরিচালিত, তাই জগত এমন চমৎকার প্রহেলিকাময়,—এমন আশ্চর্য্য সুন্দর !—"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বৈকালের বেলা পড়িয়া গিয়াছে, মায়া সন্ধ্যারতির দ্রব্যসম্ভার যথাযথভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া, নামের মালা লইয়া সেইমাত্র মন্দিরের ভিতর বিগ্রহের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া মালা ফিরাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় বাহির হইতে ব্যগ্র উচ্চ কণ্ঠে পরিচিত স্বরে কে ডাকিল "মা আছেন, এখানে মা আছেন ? মা"—

এই অপ্রত্যাশিত আহ্বানে মায়া সহসা গভীর প্রীতি আনন্দের সহিত কিছু বিস্ময় বোধ করিল,—এ যে মদনের কণ্ঠস্বর ! মায়া দ্বার-সম্মুখে আসিয়া স্নেহ-স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "এস এস বাবা এস,—অনেক দিনের পর ! কেমন আছ বাবা ?—"

"ভাল"—মায়ার পানে চাহিয়া মদনের কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া গেল !—কাশিয়া জড়িত স্বর পরিষ্কার করিয়া মদন বলিল "নেমে আসুন,—মা, প্রণাম কর্‌ব।"

মৃদু আপত্তি ব্যঞ্জক স্বরে মায়া বলিল "দেবালয়ে ?"

মদন বলিল "হানি কি ? আমি যে ধূলো পায়েই আপনাকে খুঁজ্‌তে গেছ্‌লুম, তারপর বাড়ী থেকে এখানে ফিরে আস্‌ছি—"

এত বড় আগ্রহ প্রত্যাখ্যাত-খর্ব্ব করা মায়ার শক্তিতে অসাধ্য, দ্বিরুক্তি না করিয়া সে মন্দির সোপান বাহিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল, মদন প্রণাম করিয়া অশ্রু ছল্ ছল্ নয়নে ম্লান ভাবে বলিল "দেহটা কি করে ফেলেছেন মা, এত কৃশ !—আপনার দিকে যে চাইতে পাচ্ছিনে, মাথার চুলগুলা শুদ্ধ ছেঁটে ফেলেছেন, আপনার মুখ দেখে যে আমার সেই মা বলে মোটেই চিন্‌তে পাচ্ছিনে !—এ কি করেছেন ?"

শান্ত মৃদু হাস্যের সহিত মায়া উত্তর দিল "বাইরের বেশের দৈন্যই শুধু 'বড়' করে দেখ্‌বো বাবা ?—"

মদন বলিল "সন্তানের দৃষ্টিতে সেই দৃশ্যই বড় ক্লেশদায়ক মা,—"

বাধা দিয়া মায়া বলিল "ও কথা যেতে দাও, তুমি সুন্দর-মঠে কেমন ছিলে এতদিন, তাই বল—সেখানে মহারাজ ভাল আছেন ত ? দেবকীনন্দন ঠাকুরের কন্যা 'কিশোরী' মহারাজের কাছে কেমন আছে বল ?"

মদন মৃদু স্বরে বলিল "ভালই আছেন, তাঁরা সকলে আজ এখানে এলেন যে !"

"তোমার সঙ্গেই ? মহারাজ শুদ্ধ ?"

"হাঁ—"

"কোথায় রয়েছেন তাঁরা ?"

"বাইরে থেকে মন্দির প্রণাম করে মহারাজ কাছারী মহলে গেছেন, সমাগত সম্ভ্রান্ত লোকজনদের সঙ্গে দেখা শুনা কর্‌ছেন, আমি মাঝখান থেকে পালিয়ে এসেছি।—"

মায়া হাসিল, মদন অশ্রু-হাস্য বিকশিত বদনে বলিল "শান্তি মাসিমাকে প্রণাম করে খোকার—অর্থাৎ মুক্তির সঙ্গে দেখা করে এলুম, কি দুরন্তই হয়েছে মা! আমাকে ঝক্ মানিয়ে দিলে,—আর দিন কতক পরে, লোকে তাকে দেখ্‌লেই মদনের ভাই বলে বুঝ্‌তে পার্‌বে!"—মদন আবার হাসিল।

মায়া স্মিত বদনে বলিল, "তা পারুক, কিন্তু আর কত দিন এমন বম্ বম্ করে বেড়াবে বল দেখি, এইবার সংসারের কাজে এগুলে ভাল হয় না?"

মদন নম্র হাস্যে বলিল "আপনারা পেছুতে দিলেন কৈ? মহারাজ ত সেই জনাই কান ধরে টেনে আন্‌লেন—"

মায়া সবিস্ময়ে বলিল "তুমি বিয়ে কর্‌তে এসেছ?—কোথায় বিয়ে কর্‌বে?—"

"আপনাদের এই মঠে।"

"মঠে? কার সঙ্গে?—"

"দুঃখের কথা আর কেন বলেন মা,—মহারাজের ঘটকালী বুদ্ধিটা বড় সুবিধে নয়, তিনি দেবকীনন্দন ঠাকুরের জামাই হবার উপযুক্ত লোক ব্রহ্মাণ্ডে খুঁজে পেলেন না,—আমি নিরীহ প্রাণী একপাশে পড়ে আছি দেখে আমাকেই গিয়ে পাক্‌ড়াও কর্‌লেন।"

সানন্দে মায়া বলিল "মহারাজের জয় জয়াকার হৌক,—আমি তাঁর বুদ্ধি বিবেচনাকে লক্ষ প্রণাম করি, আর তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, বড় সুসংবাদ শুনিয়েছ বাবা! আমি নিশ্চিন্ত হলুম, তুমি এবার মঠের অধিকারী হবে,—"

মদন বলিল, "না মা, অত বড় যোগ্যতা আমার নাই, সে আমি মহারাজের সঙ্গে চুক্তি করে এসেছি, মহারাজের এক সু-পণ্ডিত ব্রহ্মচারী শিষ্য মঠের অধিকারী পদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সম্প্রদায়ের কল্যাণ সাধন কর্‌বেন,—আমি তাঁর অধীনস্থ উপদেশার্থী হয়ে থাক্‌ব, আমি শুধু বৈষয়িক ব্যাপারের শৃঙ্খলার জন্য দায়ী রইলুম—শুধু ওকালতী বুদ্ধি খরচ করা ছাড়া মঙ্গল-মঠের কাজে আমার কোন কর্ত্তৃত্ব থাক্‌বে না, যা কর্‌বার সব তিনি কর্‌বেন।"

মায়া বলিল "কর্ম্ম কর্ত্তা যিনিই হোন, কিন্তু সত্বাধিকারী ত তুমি-ই?"

মদন হাসিয়া বলিল "আপনাদের আশীর্ব্বাদে, অগত্যা,—"

ক্ষণ পরে মদন সহসা বলিল "ভাল কথা,—খবরটা শুনে অবধি, আমার মন ক্ষুন্ন হয়ে গেছে,—আপনার সঙ্গে ঝগড়া কর্‌ব বলে, দুষ্ট বুদ্ধিকে শাণিয়ে ছুটে আসছিলুম, কিন্তু আপনাকে প্রণাম করেই সব ভুলে গেছি—"

মায়া বলিল "কি কথা বাবা?"

মদন ক্ষুণ্ণ-করুণ কণ্ঠে বলিল "মঠের এই কাজটা নেওয়া কি ভাল হয়েছে মা?—"

মায়া সহসা কোন উত্তর দিতে পারিল না, একটু থামিয়া, খুব শান্ত ধীর কণ্ঠে বলিল "তোমরা যেদিক থেকে এর ভালমন্দ বিচার কর্‌ছ, আমি সে দিকে চোখ রেখে এ কাজে আসিনি বাবা,—গৌণ আয়োজন, মুখ্য সাধনের সহায়ক বলে-ই আমি জোর করে দেবালয়ের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয়েছি, এখন এই কাজেই আত্মনিয়োগ করে, আমি সমস্ত তৃপ্তি, সমস্ত শান্তিকে খুঁজে পাচ্ছি,—এখন দিনে দিনে বুঝ্‌তে পার্‌ছি,—খুব ভাল করেই বুঝ্‌তে পার্‌ছি বাবা,—কাজের পথে উঁচু নীচু বল্‌তে কিছু জের নাই, ঊর্দ্ধে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে যাওয়াই শুধু আমাদের কর্ত্তব্য, তা হলে পথই পথের সন্ধান দেখিয়ে দেয়!"

চমৎকৃত মদন নির্ব্বাক হইয়া গেল! তাহার চোখে অশ্রু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল. শ্রদ্ধানত শিরে মায়ার পদপ্রান্তে মাথা নোয়াইয়া দুইহাতে সে পায়ের ধুলো তুলিয়া মাথায় দিল,—রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "কলেজে পড়েছি, পাশ করেছি, অনেক ভাব, অনেক ভাষা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, সমাজে বিদ্বান বলে পরিচিত হয়েছি,—কিন্তু ········ কিছুই শিখিনি মা, কিছুই শিখিনি! সে শিক্ষা শুধু মনকে বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করেছে মাত্র, কিন্তু যে সাধনা হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করে, প্রাণকে উজ্জ্বল করে, তার আগুন শুধু আপনাদের মধ্যেই প্রদীপ্ত দেখি!·········থাক, এর ওপর একটি কথাও উচ্চারণ কর্‌বার ক্ষমতা আমার নাই,—তবে যোড় হাত করে একটি ভিক্ষা চাইছি মা, এ অনুরোধটা রাখ্‌তেই হবে।"

মায়া মন্দিরে বিগ্রহের পানে দৃষ্টি স্থির বদ্ধ রাখিয়া বলিল "মদন তুমি শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত. আজ বাদে কাল রাজ রাজেশ্বরের পদে প্রতিষ্ঠিত হবে, তোমার সামাজিক মর্য্যাদা ভুলে যেও না, সংসারের কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় দগ্ধ ভস্মীভূত,—সন্তান পালনের জন্য পরানুগ্রহ প্রত্যাশী দীন ভিখারিণীর সঙ্গে কথা কইছ, সেটা স্মরণ রেখো বাবা;"

মনস্তাপ পীড়িত স্বরে মদন বলিল, "মুমূর্ষুর অন্তিম শয্যায় সত্য সাক্ষ্য করে, যাঁদের ধর্ম্ম-মাতা বলে, ধর্ম্ম-ভ্রাতা বলে স্বীকার করেছি, আজ অবস্থা পরিবর্ত্তনে সামাজিক মর্য্যাদার দোহাই দিয়ে সে সত্য সম্পর্ক অস্বীকার কর্‌তে বলেন?"

মায়া ধীর কণ্ঠে বলিল "সম্পর্ক আমি অস্বীকার করতে বলছিনে।"

"তবে, সম্পর্কের দায়িত্ব মর্য্যাদা অস্বীকার কর্‌তে বলেন? তা হলে আমি যে ধর্ম্মে পতিত হব মা, আমার শিশু ভ্রাতার ওপর বিধবা মাতার ওপর আমার যা কর্ত্তব্য আছে, আমি তা অবশ্য প্রতিপালন কর্‌তে বাধ্য বৈ কি!··· ··না, আমি আপনার স্বচ্ছন্দ সাধনার ব্যাঘাত কর্‌তে চাইনে, যেমন আছেন তেমনি থাকুন, তবে এইবার থেকে আমার মুখ চেয়ে একটু প্রকার ভেদের কষ্ট সহ্য কর্‌তে হবে, এইটুকু নিবেদন।"

প্রশান্ত দৃষ্টি তুলিয়া মায়া বলিল, "তুমি কি বল্‌তে চাও বুঝেছি, অক্ষম শিশুর দরিদ্রা জননীকে তুমি সক্ষম সন্তানের,—রাজরাজেশ্বরের মাতৃত্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে চাও, কিন্তু না বাবা তা হতে পারে না, আমার অন্তরের গৌরবকে আন্তরিক তৃপ্তিতে ধন্য হতে দাও, বাইরের গর্ব্ব আস্ফালন প্রকাশ চেষ্টায় তাকে হতশ্রী কোর না, আমার স্বাচ্ছন্দ্য হানি কোর না, ভগবান দয়া করে আমায় যে অবস্থায় রেখেছেন এই অবস্থাই আমার পক্ষে সহজ, সরল, ও সত্য, এই অবস্থা আমি সন্তুষ্ট চিত্তে শিরোধার্য্য করে নিয়েছি, আমায় প্রলোভনে বিচলিত করো না, আমি মদনের মা, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট,—লক্ষেশ্বরের মা হওয়া আমার পক্ষে বিড়ম্বনা! তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি বাবা, আমার মনকে দ্বিধায় কুণ্ঠায় অশান্ত করে তুলো না, আমি বেশ আছি, খুব ভাল আছি—এইটুকু নিশ্চিন্ত হও—"

মদন অধোবদনে নিরুত্তর হইয়া রহিল। মানুষের মুখের কথা মৌখিক তর্কে উড়াইয়া দেওয়া সহজ, কিন্তু হৃদয়ের দৃঢ়তা যেখানে মূর্ত্তিমান হইয়া দাঁড়ায়, সেখানে মুখের কথা সম্পূর্ণই অচল!

মদন ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বুঝিয়া মায়াও মনে কিছু দুঃখিত হইল, কিন্তু স্নেহের মুখ চাহিয়া অন্যায়ের সমর্থন করা যায় না, খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া মায়া সান্ত্বনা-কোমল কণ্ঠে বলিল, "কিছু মনে করো না মদন, তোমার আত্মীয়তা, আমার জীবনের, মূল্যবান সম্পদ, কিন্তু তাই বলে অনর্থক গলগ্রহ হয়ে নিজে অস্বস্তিভোগ করতে চাইনে, যখন শক্তি যাবে, তখন সকলের আগে তোমারই সাহায্যপ্রার্থী হব, এটা নিশ্চয় জেনো, কিন্তু—এখন অপাত্রে দয়া দান কোর না, এই আমার অনুরোধ!"

বৃদ্ধ ভাণ্ডারী-জী কার্য্যব্যপদেশে সেইদিকে আসিতেছিলেন, মায়াকে একজন অপরিচিত যুবার সহিত কথা কহিতে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া দূরে দাঁড়াইলেন, মায়া হাস্যোজ্জ্বল বদনে তাঁহাকে ডাকিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আসুন ভাণ্ডারী জী, সুসংবাদ শুনে যান, সুন্দর-মঠের মোহন্ত মহারাজ বরকন্যা নিয়ে শুভ বিবাহ সম্পাদন করাতে এসেছেন, ইনিই আমাদের মঠের ভাবী জামাতা,—এঁর নাম মদনানন্দ ভট্ট।"

ভাণ্ডারী অধিকতর বিস্মিত হইয়া একবার মায়ার মুখ পানে একবার মদনের মুখ পানে তাকাইলেন, মায়ার কথার অর্থ তিনি যেন ভাল বুঝিলেন না,—মোহন্ত মহারাজের অপ্রত্যাশিত আগমনে বাহির-মহলে খুব হুলস্থুল পড়িয়া গেলেও ভিতর মহলের কর্ম্মব্যস্ত কর্ম্মচারী কয়জন এখনো সে সংবাদ জানিতে পারে নাই, ভাণ্ডারীকে ইতস্ততঃ-পরায়ণ দেখিয়া মায়া প্রসন্ন-স্মিত বদনে বলিল,—ইনি আপনাদের মঠের জামাই হলেও আমার সঙ্গে এঁর আলাদা সম্পর্ক আছে, ইতিপূর্ব্বে ইনি আমায় 'মা' বলে ধন্য করেছেন তাই তাড়াতাড়ি আগে আমায় দেখা দিতে এসেছেন,—"

ভাণ্ডারী অগ্রসর হইয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন। দেখিতে দেখিতে একে একে অনেক লোক জুটিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাহির মহল হইতে সংবাদ লইয়া দূত আসিল, সকলে ব্যস্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, চারিদিকে হাঁক-ডাক সোর-গোল জমিয়া গেল,—সন্ধ্যারতির সময় হইয়া আসিতেছে দেখিয়া মদন অন্যান্য কথার পর মায়ার নিকট বিদায় লইয়া মহারাজের সন্ধানে চলিয়া গেল। মায়া মন্দিরের দীপ জ্বালিয়া, সন্ধ্যারতির প্রতীক্ষায় একপাশে বসিয়া মালা জপ করিতে লাগিল। উজ্জ্বল দীপালোক সম্মুখে স্বর্ণ সিংহাসনে, কৃষ্ণমর্ম্মর নির্ম্মিত সুচিক্কন সুন্দর, সসজ্জ গোপাল-বিগ্রহ, নির্ব্বিকার হাস্য প্রসন্ন বদনে বিরাজ করিতে লাগিলেন। মায়া শান্ত নিশ্চিন্ত দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, আরতি দর্শনার্থীগণ নগ্নপদে একে একে আসিয়া, সংযত গম্ভীর ভাবে মন্দিরপ্রাঙ্গনে সমবেত হইতে লাগিল, কিছু পরে কয়েক জন অনুচরের সহিত মহারাজা আসিয়া প্রাঙ্গনে দাঁড়াইলেন, সকলে অভিবাদন করিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল, কেবলরাম তাঁহাদের সহিত আসিয়াছিল, সে মন্দির প্রাঙ্গনে সকলকে পৌঁছাইয়া দিয়া, তাড়াতাড়ি বস্ত্র পরিবর্ত্তনের জন্য প্রস্থানোন্মুখ হইল, কারণ আরতির সময় পট্টবস্ত্র ও উত্তরীয় ব্যবহার-ই প্রচলিত বিধি।

মাহারাজের অনুচরবর্গের মধ্যে একজন অগ্রসর হইয়া কেবলকে নমস্কার করিয়া বলিল "আমি সদ্যঃস্নাত, যদি অনুমতি করেন, আমিই তাহলে, সন্ধ্যারতি করি—"

কেবলরাম সসৌজন্যে বলিল, "স্বচ্ছন্দে, আহ্লাদের সহিত এ প্রস্তাব অভিনন্দন করছি—"

তাহাদের কথা মহারাজের কানে পৌঁছিল তিনি বলিলেন "কে নিরঞ্জন আরতি করতে চাও?—যাও, কিন্তু তোমার উত্তরীয়?"

নিরঞ্জন মন্দির সোপানে উঠিতে উদ্যত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল "মহারাজ আমি স্নানের পর কৌপীন, বহির্ব্বাস, গ্রহণ করে, আরতি দর্শনের উদ্দেশ্যে এসেছি, উত্তরীয় আনি নাই—"

"আমার উত্তরীয় নিয়ে যাও—" মহারাজ স্কন্ধ-বিলম্বী রেশমী উত্তরীয় খুলিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া নিরঞ্জনের দিকে ছুড়িয়া দিলেন। নিরঞ্জন ক্ষিপ্রহস্তে ধরিয়া ফেলিয়া, মাথায় ঠেকাইয়া নতজানু হইয়া সেইখান হইতে অভিবাদন করিল, তারপর বক্ষঃ পৃষ্ঠ আচ্ছাদন করিয়া বাহির দিয়ে দিয়া উত্তরীয়ের উভয় প্রান্ত একত্র করিয়া

বুকের উপর টানিয়া ফাঁশ দিয়া বাঁধিল। মন্দিরের দ্বারে মাথা নোয়াইয়া ভিতরে ঢুকিয়া আরতি কার্য্য আরম্ভ করিল, সমস্ত উপকরণ নির্ভুল ভাবে পাশাপাশি সজ্জিত ছিল,—কিছু খুঁজিতে হইল না।

মন্দিরের কোণে স্তম্ভগাত্রে ঠেস দিয়া মালাজপনিরতা মায়া বাহিরের কথাবার্ত্তা শব্দ কিছু কিছু শুনিয়াছিল, সকলের শেষে মহারাজের কথাটা খুব স্পষ্ট, খুব তীব্র ভাবে শুনিল,—"কেও নিরঞ্জন।"

অকস্মাৎ বহুদিনের পর দৃপ্ত-উৎকণ্ঠা সংঘাতে মায়ার শক্তিকীর্ণ হৃদ্‌পিণ্ড রূঢ় চমক খাইয়া, শান্ত স্নায়বিক শক্তির বুকে আছাড় খাইয়া, তাহাকে ভয়ে কাঁপাইয়া তুলিল!—মায়া বিচলিত হইল, বাহিরের কোন কথা আর তাহার কানে ঢুকিল না, জপের মালা বুকের কাছে তুলিয়া জপনামের প্রত্যেক অক্ষরটা সে অন্তরের মধ্যে সংহত হইবার চেষ্টা করিল,—ত্রাস-কম্পিত অন্তর মর্ম্মভেদী ব্যাকুলতায় আর্ত্তনাদ করিয়া করিয়া উঠিল, নারায়ণ রক্ষা কর!—

আর্ত্তের আর্ত্তনাদ বুঝি সত্যই নারায়ণের কর্ণে পৌঁছায়!—মায়া সত্য সত্যই আত্মসম্বরণের শক্তি পাইল, ক্ষণ মধ্যে তাহার মুখে সেই স্বাভাবিক স্থৈর্য্য প্রশান্তি আবার ফিরিয়া আসিল, কিন্তু সংঘাতের বেগটা সে ভুলিতে পারিল না, গোপন হৃদয়ের মধ্যে একটা টল্‌মলে অস্বস্তি সে বেশ বুঝিতে লাগিল, মায়া ভীত হইয়া দৃষ্টি নামাইল, এই অপ্রকৃতিস্থ দুর্য্যোগের মুহূর্ত্তে কি দুঃসাহসে নির্ভর করিয়া দৃষ্টি-মেলিয়া কোন দিকে চাহিতে আছে? কে জানে ঝঞ্ঝাবেগে কোন কঙ্কর অকস্মাৎ ছিট্‌কাইয়া আসিয়া দৃষ্টির উপর নিষ্ঠুর আঘাত হানিবে কিনা, কে বলিতে পারে?............পৃথিবীতে 'নিশ্চয়' বলিতে কি আছে, তাহার সংবাদ সে আজিও যখন সুনিশ্চিত রূপে বুঝিতে পারে নাই,—তখন অসম্ভব বলিতেও যে পৃথিবীতে কিছু নাই, তাহা স্মরণ রাখিয়া সতর্ক হইয়া চলাই ভাল!

নূতন পুরোহিত মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সংহত গাম্ভীর্য্যে ধীর ভাবে আপন কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন, সকল আয়োজনই সজ্জিত ছিল, সুতরাং অভাবের জন্য তাঁহাকে কোন কিছু অন্বেষণ করিতে হইল না, তিনি কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না, নিস্পন্দ জড় ভাবে,—আর একজন মনুষ্যও যে সেই মন্দিরে রহিয়াছে, তাহার অস্তিত্বও তিনি জানিলেন না।

আরতি শেষ হইল, বাদ্যধ্বনি থামিয়া গেল, পূজারী শঙ্খঘণ্টা নামাইয়া, গভীর উদাত্ত স্বরে—যেন আভ্যন্তরিক স্বর-যন্ত্রের প্রাণ-মূলকে পর্য্যন্ত পবিত্রত্বের ভাব-সৌরভে পূত সংস্কৃত করিয়া গম্ভীর মধুর ধ্বনিতে 'হরিবোল, হরিবোল' বলিতে বলিতে মন্দিরের বাহিরে প্রণাম করিতে গেলেন, মন্দির নিস্তব্ধ হইল,—মন্দিরে রহিলেন শুধু, প্রসন্ন শোভা সৌন্দর্য্যে পরিস্নাত,—অপরূপ কান্তি পাষাণ বিগ্রহ,—আর ততোধিক রূঢ় কঠিনতার মধ্যে আত্ম-সমাহিত করিয়া এক স্থির নিস্পন্দ নারীমূর্ত্তি!—

বাহিরে বিচিত্র কণ্ঠের বহুবিধ স্তব স্তোত্র প্রণাম মন্ত্রের মধ্যে নিত্য নৈমিত্তিক ভজন গান আরম্ভ হইল, মায়া আজ ভজন শুনিতে বাহিরে আসিল না, অন্যতম পূজক দেবানন্দ ঠাকুর প্রত্যাহিক প্রথানুসারে স্নান-জল-চরণ-তুলসী লইয়া দর্শনার্থী ভক্তবৃন্দের মধ্যে পরিবেশন করিলেন, মায়া সেখানেও গেল না, যেখানে বসিয়াছিল, সেইখানেই বসিয়া রহিল,—এক চুল নড়িল না।

আজ সে আরতি দেখিতে পায় নাই! নিগূঢ় অধৈর্য্যতার সহিত দুঃসহ অভিমান বেদনার বোঝা তাহার বুকের উপর জমাট বাঁধিয়া বসিয়াছিল, এ কি করিলে দেবতা, এ কি করিলে? এখনও এই হৃদয় বিদারক—কৌতুক প্রহসনের যবনিকা পড়িল না! এখনও তুমি ছলনা করিতে চাও! অসহ্য!—আজ জগতে কাহাকেও দোষ দিবার নাই, নিজের তীব্র দৌর্ব্বল্যকেও নয়! সে না তোমার পায়ে অকপট বিশ্বাসে সব সঁপিয়া নিশ্চিন্ত

হইয়াছে? তবে এ কি নির্ম্মমতা করিতেছ দয়াময়! আজ দোষী তুমি! দোষ তোমার!—সে মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছে যত অনর্থের মূল, তোমার ঐ নিষ্ঠুরতা! তুমি নির্দ্দয়, নির্দ্দয়, নির্দ্দয়!! বড় নির্ম্মম—নির্দ্দয়!—

মায়ার দুই চক্ষু ফাটিয়া তপ্ত অগ্নিস্রোত ছুটিল,—আজ—সমস্ত জীবনের মধ্যে এই প্রথম দিন, সে মৃত্যু নির্ভীক তেজস্বিতায় উদ্ধত বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া, প্রাণের মধ্যে প্রাণারাধ্যের সহিত মহাদ্বন্দ্ব করিয়া হইল! ....আত্মহারা বেদনায় বিগলিত অশ্রু জলে, কঠিন শীতল হর্ম্ম্য তলে শির লুণ্ঠিত হইল! প্রেমের বিরোধ প্রেমের সন্ধিতে মিটিয়া গেল, শান্ত হইয়া উর্দ্ধে দৃষ্টি তুলিয়া সকরুণ কণ্ঠে মায়া বলিল "মানুষের বুক ভীতি-কম্পনে কাঁপাইয়া কৌতুক দেখিতে চাও, দেখ, কোন দুঃখ নাই,—কিন্তু এ ভীতি-কম্পন তোমারই চরণে উৎসর্গ করিয়া চলিলাম, ইহার বেগ তুমিই সহ্য করিও, আমি আর পারিয়া উঠিতেছি না, আমার পথ নিষ্কণ্টক করিয়া দাও!"

বাহিরে আসিয়া মায়া দেবানন্দ পূজারীকে ডাকিয়া বলিল "বাবা, আমায় চরণ-তুলসী দাও—"

পূজারী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন মা? দেখ্‌তে পাইনি—"

"মন্দিরেই—" বলিয়া মায়া সহসা থামিল, একটু কাশিয়া ধীর স্বরে বলিল "কাজে ব্যস্ত ছিলুম—"

পূজারী তখনই চরণ-তুলসী আনিয়া দিলেন, যথারীতি গ্রহণ করিয়া প্রণামান্তে মায়া উঠানে নামিয়া আসিল, তখন ভজন গান থামিয়া গিয়াছে, দর্শনার্থী দল সকলে বিদায় লইয়াছে, উঠানে কেহ কোথাও নাই, শুধু নাট-মন্দিরের সম্মুখে খিলানের গাত্র অবলম্বী 'সেজে'র আলোকে বসিয়া তিন ব্যক্তি সংযত গম্ভীর ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, মায়া দূর হইতে দেখিয়া চিনিল, মদন ও কেবল; তৃতীয় ব্যক্তিকে চিনিতে পারিল না, তিনি সেজের ঠিক সম্মুখে বসিয়াছিলেন, তাঁহার পেশীপুষ্ট বলিষ্ঠ বিশাল সুন্দর মহিমোজ্জ্বল আকৃতি খুব স্পষ্ট পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল, তিনি তর্জ্জনী উঁচাইয়া পার্শ্বোপবিষ্ট মদনের উদ্দেশ্যে কি বলিতেছিলেন, মদন বিনীতভাবে নীরব মনোযোগে শুনিতেছিল কেবলরাম অন্য পাশে চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

মায়া মোহন্ত মহারাজকে কখনো দেখে নাই, তাহার সন্দেহ হইল বুঝি, ইনিই তিনি!—প্রণাম করিবার জন্য অগ্রসর হইল, নিঃশব্দে নিকটস্থ হইয়া, কণ্ঠস্বর ভাল করিয়া শুনিয়া, সহসা চমকিয়া সে স্তম্ভের ছায়া অন্ধকারে স্থির হইয়া দাঁড়াইল!—ওহো হো! এই তেজস্বী গম্ভীর কণ্ঠধ্বনির সহিত—সুদূর অতীতের সেই স্বল্প পরিচয়ে তীব্র পরিচিত—তরুণ কণ্ঠের নম্র-কোমল-ধ্বনির কোন অসামঞ্জস্য নাই যে! সেই কণ্ঠ,—স্বরে শুধু—উচ্চারণে শুধু, দৃপ্ত দৃঢ়তা মাহাত্ম্য বিস্ফুরিত হইতেছে মাত্র! কি কথার উত্তরে ঠিক বলা যায় না, বুঝি সদ্যঃবিবাহার্থী,—সংসার প্রবেশোদ্যত অনভিজ্ঞ সরল যুবা মদনের প্রতি তিনি উপদেশ দিতেছেন—নারী দেবীর জাতি! কল্পনা নয়, কাহিনী নয়, বাস্তব সত্য! আমি নিজের অভিজ্ঞতায় জোরের ওপর বল্‌ছি, নারীত্বের মধ্যে আত্মবোধ যেখানে জাগ্রত হয়েছে, দেবীত্বের বিকাশ সেখানে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখ্‌বে! শুধু—লঘুভাবে কৌতুহল পরিতৃপ্তির জন্য এই মহত্বকে দু' চক্ষু মেলে যথেচ্ছাচারের ওপর দেখ্‌তে চেওনা, বুঝ্‌তে যেওনা, তাহলে নিরাশ হবে, ভুল করবে—আমি স্পষ্টভাবে এখানে মনের ভাষা ব্যক্ত করবার শক্তি সাহস পাইনি অকপটে স্বীকার করছি, তবুও আন্তরিক শ্রদ্ধা সম্ভ্রমে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হব না, আমি দেখেছি, জেনেছি, এঁদের মধ্যেই দেবীর সৌন্দর্য্য আছে! সতর্ক হও এঁদের দেবীত্ব উদ্বোধনে সহায়তা কর, দেখ্‌বে এঁরাই বিষ্ণু-গৃহিণী লক্ষ্মীর মূর্ত্তি ধরে পূর্ণশক্তি-গৌরবে সংসার পালয়িত্রী-পদে প্রতিষ্ঠিত হবেন! নির্দ্দয় লালসা চড়ুই'এর মত ক্ষুদ্র প্রাণ নিয়ে ততোধিক সঙ্কীর্ণতর ঘৃণিত ভোগ তৃষ্ণায় পশুত্ব আশ্রয় ক'রে—এই মহামহিমার দিকে হীনদৃষ্টিতে তাকিও না, এ মর্য্যাদার অপমান কোর না, নিজেদের প্রাণ-শক্তিকে ধ্বংস কোর না!—সংহত-তেজস্বী-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হও, সিংহের পৃষ্ঠে ভগবতীর আসন, এটা মূর্খের

পরিকল্পনা নয়—এর ভিতর জলন্ত সত্য নিহিত আছে; খোঁজ, আবিষ্কার কর, সিদ্ধি সাফল্য সবই করায়ত্ত হবে!

নিঃশব্দে মায়ার অধরে সকরুণ বেদনার হাসি ফুটিয়া উঠিল—অজ্ঞাতে—সম্পূর্ণ নীরবে একটা অতি ক্ষীণ, দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িল, হায়! এত দিন পরে, এতদূরে আসিয়া আজ এ সংবাদ শুনিতে হইল! কিন্তু থাক্,...... বুকের ভিতর যত বড় তীব্র উন্মাদনায় কম্পন-স্রোতে চসুক, কিন্তু তাহার পথ আজ ভিন্নমুখে!—তাহার দুর্জ্জয় উন্মাদ স্রোত, সে আজ মহাসাগরের দিকে সুনিশ্চিত রূপে ফিরাইয়া দিয়াছে! আজ নারীত্বের গণ্ডিতে নিজেকে পুরিয়া এই সুউচ্চ জাতীয় সম্মানকে,—গ্রহণ করিয়া, ব্যক্তিগত সত্যনিষ্ঠার চরণে কৃতজ্ঞতা-ভারে, মোহ-গৌরবের মূল্য আপনাকে বিকাইয়া দিতে পারিবে না! আজ তাহার মধ্যে জাতীয়ত্ব নাই, নারীত্ব নাই,—পৃথিবীর মানুষের জন্য কিছুই অবশিষ্ট নাই! আছে—সুধু আছে, একটু বেদনাময় অভিমানভরা,—অতি ক্ষুদ্র নিজস্ব-ব্যক্তিত্ব! কিন্তু তাহা মানুষের মুখ চাহিয়া নহে,— আত্মেতর প্রেমময়ের মুখ চাহিয়া,—অবজ্ঞাত, অবহেলার জন্য মাত্র! পৃথিবীর সহিত, পৃথিবীর মানুষের সহিত আজ তাহার কোন সম্পর্ক নাই!

থাক্......নীচাশয় জগতের অতৃপ্ত স্বার্থবাসনা! তুমি তোমার স্বভাবসিদ্ধ ঈর্ষাদ্বেষের ভ্রূকুটি পীড়ন লইয়া তুনিরীক্ষ্য অন্ধকারে আপনার মনে আপনি মাথা খুঁড়িয়া মর, আজ তোমাকে চাহিয়া দেখিবার অবসর তাহার নাই! চিরদিন ভয়ের মূর্ত্তিটা-ই সে বড় করিয়া দেখিয়াছে! আজ সদ্যঃলব্ধ শক্তি বলে সে নিঃশঙ্ক সতেজ হইয়া,—পূর্ণ সাহসের মূর্ত্তিটা কত বিরাট, কত সুন্দর, তাহা দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া লইবে, আজ নিজের ক্ষুদ্রতার পানে চাহিয়া সে কুণ্ঠিত হইয়া পিছাইবে না!

মায়া অগ্রসর হইল, কেবলরাম তাহাকে দেখিতে পাইয়া প্রশ্ন করিল, "কে মায়া?—"

"হাঁ—" খুব সহজ উত্তর! মুক্ত দীপালোকের মধ্যে নিরাভরণা, শুভ্রবসনা, ক্ষীণাঙ্গী বিধবা যুবতী, অসঙ্কোচে সকলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল! তাহার কোনখানে এতটুকু শঙ্কা নাই, কুণ্ঠা নাই, দ্বিধা নাই, দৈন্য মলিনতা নাই,—সে যেন দৃপ্ত মহিমার মধ্যে সম্পূর্ণ নির্ম্মল ভাস্বর! অপূর্ব্ব শক্তি-শ্রীমণ্ডিতা গরীমাময়ী দেবী!

সম্মুখেই নিরঞ্জন উপবিষ্ট। তাহার পরিধানে কৌপীন বহির্ব্বাস, দেহ অনাবৃত, মহারাজের সেই উত্তরীয় এখন তাহার বক্ষঃবন্ধন মুক্ত হইয়া স্কন্ধের উপর শ্লথ-বিলম্বমান; তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত। মায়া ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, হাঁ ইনি নিরঞ্জনই বটে! কিন্তু—ইনি সেই আট বৎসর পূর্ব্বের প্রবল-হৃদয়াবেগে আত্মহারা সৌন্দর্য্য-সাধক, তরুণ কোমল কান্তি নিরঞ্জন ভাস্কর নহেন,—ইনি এখন সুদৃঢ় সাধন-শক্তি-প্রভাবে পূর্ণ পরিণত আকৃতি বলিষ্ঠ ব্রহ্মচারী নিরঞ্জন! ইহাঁর সংযম-শক্তি স্ফীত সুবিশাল বক্ষে শৌর্য্যমহিমা, নয়নে প্রশান্ত করুণা, ললাটে মহত্ত্ব-গরিমা, অধরে তেজস্বী দৃঢ়তা নির্ভীক স্থৈর্য্যে বিরাজমান, সর্ব্বাঙ্গে পূর্ণ গরীমায় ব্রহ্মচর্য্য জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত! মায়া সসম্ভ্রমে প্রণত হইল, মহত্তর শ্রদ্ধার চরণে, মহত্তর সম্মান-অর্ঘ্য নিবেদন করিল!

প্রণতার প্রণাম গ্রহণের জন্য প্রণম্য সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মদন ও কেবলরাম সঙ্গে সঙ্গে উঠিল, পরিচয় জ্ঞাপন উদ্দেশ্যে—সরলচিত্ত মদন সসৌজন্যে বলিল, "ইনি দেবালয়ের পরিচর্য্যাকারিণী।"

পরিচয় জ্ঞাপনের মধ্যে পূর্ব্বকথা কেবলরামের স্মরণ হইল, ব্যথিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া কেবল বলিল, "আমার দুর্ভাগিনী ভগিনী মায়া! আট বৎসর পূর্ব্বে এর বিবাহের সময় আপনি উপস্থিত ছিলেন, স্মরণ আছে বোধহয়...... এ সেই মায়া, আমাদের ভাগ্যদোষে এখন বিধবা।"

"বি—ধ—বা!"—ব্রহ্মচারীর স্বভাব শান্ত কণ্ঠস্বরে অকস্মাৎ অস্বাভাবিক বিস্ময় বিমূঢ় বেদনাতঙ্কের কম্পন-প্রবাহ বহিয়া গেল! তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না। দৃষ্টি তুলিতে পারিলেন না!

প্রণামান্তে কয়েক হস্ত ব্যবধানে মায়া ঠিক সম্মুখে সোজা হইয়া দাঁড়াইল, বিস্ময় স্তম্ভিত ব্রহ্মচারী মুহ্যমান, নির্ব্বাক !—মুহূর্ত্ত কাল পরে, তাঁহার স্তব্ধ রুদ্ধ কণ্ঠ, দ্বিধাভিন্ন করিয়া, একটা ক্ষীণ শব্দ নির্গত হইল, অতি অস্ফুট অতি জড়িত ভাবে,—"জয়স্তু !"

মায়া নতশিরে বদ্ধাঞ্জালি হইয়া,—সমস্ত জীবনের মধ্যে এই প্রথম, সবচেয়ে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ভাবে, চিত্ত ভরিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিল ! এমন ভাবে, সে আর কখনও কোন আশীর্ব্বাদ লইতে পারে নাই, আজ প্রথম পারিল, জয় হউক ! জয় হউক ! এই ত, অবিশিষ্ট দ্বন্দ্ব বিরোধের ক্ষীণ চিহ্ন এইখানে, এতদিনের নিঃশেষে লুপ্ত হইল, আর ভয় নাই, ভয় নাই !

পরক্ষণে মায়া সচেতন হইয়া অন্যদিকে চাহিয়া ঈষৎ বিচলিত হইল, বিস্ময়-ব্যথিত-দৃষ্টি তুলিয়া ব্রহ্মচারীর মুখ পানে তাকাইল,—একি ? কণ্ঠস্বর জড়ায় কেন ? আট বৎসরেও কি সে অকল্যাণ-স্মৃতির—অলক্ষিত বহ্নিশিখা নির্ব্বাপিত হয় নাই ?............বেদনাক্লিষ্ট নিঃশ্বাস নিঃশব্দে ত্যাগ করিয়া,—মায়া ধীরে ধীরে ফিরিয়া চলিল। আর দাঁড়াইল না।

কেবলরাম মদনের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া অগ্রসর হইল, নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে বিদায়-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া বলিল "আপনি এখন বাড়ীতে শান্তি দিদির সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারবেন না ?—"

নিরঞ্জন নিস্তেজ স্বরে উত্তর দিল "সময় নাই, ক্ষমা করবেন।"

তাহারা চলিয়া গেল, নিরঞ্জন বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল ! মায়া বিধবা !.........নিরঞ্জনের বক্ষের মধ্যে উদ্ভ্রান্ত বিপ্লব, প্রলয়ঙ্করী উত্তেজনায় গর্জ্জিয়া উঠিল, উজ্জ্বল দীপালোক রশ্মির নীচে মঙ্গলময় দেবতা প্রতিষ্ঠিত মঙ্গল-মঠের বক্ষে,—অকস্মাৎ এ কি ভয়াবহ অমঙ্গলের বাড়বানল উচ্ছ্বাস ! সমীরণ রুদ্ধ হও, অন্তরীক্ষ-চারী গ্রহগণ স্তব্ধ হও, শোন—কান পাতিয়া শোন, বিশ্বের নেপথ্য মর্ম্ম-কেন্দ্রে ও কি ভয়ঙ্করী কোলাহলে প্রচণ্ড বিদ্রোহ রোল জাগিয়া উঠিয়াছে ! নিরঞ্জন হতবুদ্ধির মত বসিয়া পড়িল ! তাহার চিত্ত-ক্ষেত্র জুড়িয়া, বিশ্বধ্বংসী হুঙ্কারে যে উদ্দাম ঝঞ্ঝা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহার উগ্র-নিদারুণ শব্দাভিঘাতে বাহিরের সমস্ত শব্দ-তরঙ্গ ডুবিয়া গেল !

ক্রমশঃ—

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

মা।

—:*:—

ও মা দিনটা গেল হেলায় খেলায়
দলাদলির কোলাহলে,
অনেক দাহে, অনেক তাপে,
অনেক ব্যথায় নয়ন-জলে।

অনেক আলোর আঘাত লাগি
হ'ল এ প্রাণ ব্যথায় দাগী,
অনেক মিছে কান্নাহাসি—
অনেক প্রতারণার ফলে।
পসরা মোর ফুরিয়েছে মা,
ফুরিয়েছে এই বেচাকেনা,
মিথ্যা এ ভার আর সহেনা
আর চলেনা পাওনা দেনা।
ও মা এবার ডাক কাঙ্গাল জনে
মৃত্যু-গভীর আলিঙ্গনে
আঁচল দিয়ে জড়িয়ে রাখ'
স্নিগ্ধ-ঘন স্নেহের তলে।

রেলপথে।

—ঃ-*-ঃ—

বৰ্দ্ধমান সাহিত্যসম্মিলনের পর ভাগলপুরে ফিরিতেছিলাম। সঙ্গে আমার অগ্রজ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত ও বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরলাল দাশগুপ্ত ছিলেন। আহারাদি করিয়া সকলে দশটার গাড়ীতে রওনা হইয়াছিলাম। ট্রেণে উঠিয়া শরীরটা অত্যন্ত অসুস্থ বোধ হইতে লাগিল। স্থানাভাব ছিলনা; একটি বেঞ্চ অধিকার করিয়া শুইয়া পড়িলাম। কখন নিদ্রাবেশ হইয়াছিল জানিনা। যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন গাড়ী সাঁইতিয়া ষ্টেসনে পৌছিয়াছে।

কয়েকজন ভদ্রলোক আমাদের কামরায় প্রবেশ করিলেন। সকলেরই পায় চটি এবং গায়ে শুধু চাদর। শুভ্র যজ্ঞোপবীত তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় দিতেছিল। শীঘ্রই জানিতে পারিলাম যে তাঁহারা সিউড়ীতে অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। আমার অগ্রজ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনাদের সভাপতি ছিলেন ত শশধর তর্কচূড়ামণি ?'

'হাঁ, ইনিই শশধর তর্কচূড়ামণি' বলিয়া উত্তরকারী যাঁহাকে দেখাইয়া দিল তাঁহার গৌরবর্ণ তেজঃপুঞ্জ সৌম্য-মূর্ত্তি পূর্ব্বেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার এই পরিচয় পাইয়া আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার শুভ্রশ্মশ্রুমণ্ডিত বদনমণ্ডলের উপর শ্রদ্ধাভরে দৃষ্টিপাত করিলাম। যিনি একসময়ে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের ধ্বজা ধরিয়া পাশ্চাত্য প্রভাবের গতিরোধ করিবার জন্য স্বীয় পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা নিয়োগ করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র যাঁহার বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন এবং মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁহার Neo-Hindu Revival of Bengali Literature শীর্ষক প্রবন্ধে নব্য-সমাজের উপর যাঁহার প্রভাব স্বীকার করিয়াছেন তাঁহাকে যে তখন সেখানে দেখিতে পাইব তাহা মনে করি নাই।

গোঁড়ামির শত্রু দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গোক্তি মনে পড়িল—A queer amalgam of শশধর, Huxley and Goose, আর মনে পড়িল রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কয়েক ছত্র—

পণ্ডিত ধীর মুণ্ডিত শির প্রাচীন শাস্ত্রে শিক্ষা,
নবীন সভায় নব্য উপায়ে দিবেন ধর্ম্মদীক্ষা।
কহেন বোঝায়ে, কথাটি সোজা এ, হিন্দুধর্ম্ম সত্য,
মূলে আছে তার কেমিষ্ট্রি আর শুধু পদার্থতত্ত্ব।
টিকিটা যে রাখা, ওতে আছে ঢাকা ম্যাগ্নেটিজ্ম্ শক্তি,
তিলক রেখায় বৈদ্যুত ধায় তাই জেগে ওঠে ভক্তি।
সন্ধ্যাটি হলে প্রাণপণ বলে বাজালে শঙ্খঘণ্টা
মথিত বাতাসে তাড়িত প্রকাশে সচেতন হয় মনটা।
এম্-এ ঝাঁকে ঝাঁক শুনিছে অবাক অপরূপ বৃত্তান্ত—
বিদ্যাভূষণ এমন ভীষণ বিজ্ঞানে দুর্দ্দান্ত।

এই কয়ছত্রে যে শশধর তর্কচূড়ামণিকেই ব্যঙ্গ করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি যে হিন্দুধর্ম্ম ব্যাখ্যা কালে অনেক সময়ে বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রয়োগ করিতেন তাহা অনেকেই জানেন। রবীন্দ্রনাথ একবার বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলেন।

আমি এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময়ে দেখিলাম আমার অগ্রজ তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিলেন 'আপনি ত এখন আর কোন আন্দোলনে বড় যোগদান করেন না।'

তর্কচূড়ামণি মহাশয় মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন,—'না আর কেন! বয়স হইয়াছে। এখন জীবনের শেষ কয়টা দিন গঙ্গাতীরে নির্লিপ্তভাবে কাটাইয়া দিব ইহাই আমার বাসনা।'

আমার অগ্রজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনে বিলাত-ফেরৎদিগকে সমাজে লওয়া সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিলেন?"

তর্কচূড়ামণি মহাশয়। আমরা সমাজে তাঁহাদের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিতে অক্ষম। যাঁহারা আমাদের এই ব্যবস্থায় আমাদের উপর খড়্গহস্ত তাঁহারা যেন মনে রাখেন ইহাতে আমাদের কোন স্বার্থই নাই। আমাদেরই আত্মীয়স্বজন কি বিলাতে যান না? তাঁহাদের সঙ্গেও ত আমাদের সমাজিক সংস্রব ছিন্ন করিতে হয়। আমরা মনে করি ইহাতেই সমাজের মঙ্গল হইবে। প্রথমতঃ এটা যখন ধ্রুব-সত্য যে যাঁহারা বিলাত যান তাঁহারা পাশ্চাত্য ভাব ও পাশ্চাত্য বিলাসিতার দাস হইয়া পড়েন তখন তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের মেলামেশা সম্ভব কোথায়? আমরা যে তাঁহাদের ঘৃণা করিতেছি তাহা নয়। তাঁহাদের সংখ্যা এখন এত বেশী যে স্বচ্ছন্দে তাঁহারা একটা স্বতন্ত্র সমাজ তৈরী করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে আমাদের স্ত্রীকন্যাদের মিশিতে দিতে পারি না; কারণ বিলাসিতা একটা সংক্রামক ব্যাধি, এবং আমাদের বিশ্বাস এইরূপ সংসর্গের ফলে পাশ্চাত্য বিলাসিতা আমাদের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া পড়িবে।

এইখানে প্রশ্ন হইল—'কিন্তু ইহাই কি বিলেত-ফেরৎদের সমাজে না লওয়ার একমাত্র কারণ?'

চূড়ামণি। 'না, আরও একটা কারণ আছে। তাহা সংস্কারমূলক। আবহমান কাল হইতে যে সংস্কার সমাজের সকলের মনে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে তাহার উচ্ছেদ কি সহজ ব্যাপার! অশনে বসনে আচারে ব্যবহারে

আমাদের দেশের চিরাচরিত পদ্ধতির মস্তকে যাঁহারা পদাঘাত করিতেছেন তাঁহাদের সঙ্গে এই সংস্কারবশেই যদি সামাজিক সম্পর্ক রাখিতে আমরা অক্ষম হই তাহা হইলে কি আপনারা আমাদের দোষ দিতে পারেন?'

'কিন্তু সংস্কার যদি যুক্তির মস্তকে পদাঘাত করে তাহা হইলেও কি তাহা দোষের নহে?'

'যুক্তির কথা যে বলিতেছেন তাহা কি আমরা বুঝি না? সেটুকু বুদ্ধিও কি আমাদের নাই? আমরা না হয় ইংরাজি পড়িয়া বিএ, এম এ, পাসই করি নাই। কিন্তু ইচ্ছা করিলে কি পারিতাম না! আমাদের ত ষড়-দর্শন অধ্যয়ন করিতে হইয়াছে, তাহা কি ইংরাজি কোন শাস্ত্র অপেক্ষা সহজ? তাহাতে কি যুক্তিতর্ক নাই? সুতরাং যুক্তি দিতে আমরাও জানি। এখন, কোন্ যুক্ত যে ঠিক—আপনাদের না আমাদের তাহার কে মীমাংসা করিবে?'

এ সম্বন্ধে আর বেশী আলোচনা হইল না। অল্পক্ষণ পরেই গাড়ী—বারহাবরা ষ্টেসনে আসিয়া দাঁড়াইল। তর্কচূড়ামণি মহাশয় দলবলসহ নামিলেন। তিনি বহরমপুরে থাকেন। নামিবার সময় আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া স্মিতমুখে বিদায় লইলেন।

গাড়ী আবার চলিল। আমি তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কথাগুলি মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলাম। তিনি হিন্দুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াও একবারও শাস্ত্রের দোহাই দেন নাই। সমাজের কল্যাণের দিক দিয়াই তিনি বিষয়টার আলোচনা করিতেছিলেন। আমরা অবশ্য তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই। বিলাত গেলেই যে লোকে বিলাসী এবং বিলাতী ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে এ কথা সত্য নহে। যাঁহারা পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও পদ-গৌরব বশতঃ সমাজের অশেষ উপকার করিতে সমর্থ তাঁহাদিগকে যদি বিলাত যাওয়ার অপরাধে সমাজে স্থান দেওয়া না হয় তাহা হইলে দেশের সমূহ অনিষ্ট সাধন করা হয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত মহাশয় চিরাগত সংস্কার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। মানুষ যে সাধারণতঃ সংস্কারের দ্বারাই অন্ধভাবে পরিচালিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা কি সর্ব্বত্রই কুফলপ্রদ? এই সংস্কার নানা প্রকারে—নৈতিক, পারমার্থিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি। পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্মের ধারণা যে দেশকাল ভেদে বিভিন্ন তাহার কারণ এ সকল ধারণার মূলে প্রধানতঃ মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আবেষ্টন-সঞ্জাত মানসিক সংস্কার বা সেন্টিমেন্ট্। মানুষ আদিম অসভ্যাবস্থায় যে পশুবৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞানহীন ছিল, এবং ক্রমে সমাজবদ্ধ হইয়া স্বীয় জীবন-যাত্রার সুবিধার জন্যই নানাবিধ নিয়ম ও ব্যবস্থা প্রণয়ন করে এবং এইরূপে কালক্রমে সে কতক-গুলি সংস্কারের অধীন হইয়া পড়ে তাহা ইতিহাসের আলোচনা দ্বারা এবং অকাট্য যুক্তি বলে প্রমাণ করা যাইতে পারে। সেই সঙ্গে ইহাও দেখাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে যে ইহাদের অধিকাংশই কুসংস্কার মাত্র, এবং বর্ত্তমান যুগে এগুলি বর্জ্জন না করিলে জাতির মঙ্গল নাই। এইরূপ মত প্রচারই ত অধিকাংশ আধুনিক পাশ্চাত্য লেখকগণ জীবনের ব্রত করিয়াছেন। ইঁহারা প্রধানতঃ নৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের মূলোচ্ছেদ করিতে উঠিয়াপড়িয়া লাগিয়াছেন এবং মানবজাতির জন্য নূতন আদর্শ, সমাজের জন্য নূতন বিধিব্যবস্থা উদ্ভাবন করিতেছেন। ইহার ফল কি সর্ব্বত্র শুভ হইতেছে? জার্ম্মান দার্শনিক নীচে (Nietzsche) খ্রীষ্ট ধর্ম্মের নৈতিক অনুশাসনগুলিকে ঘৃণা পূর্ব্বক Slave morality বলিয়া অভিহিত করিলেন, কারণ এই নীতিতে বলে, 'পরের দ্রব্যে লোভ করিবে না, শত্রুকে ক্ষমা করিবে, তোমার একগণ্ডে কেহ প্রহার করিলে অপর গণ্ড ফিরাইয়া দিবে।' নীচের শিক্ষা জর্ম্মানি গ্রহণ করিয়া নীতি ও ধর্ম্মকে বিদায় দিল, এবং শক্তির উপাসনা করিয়া 'অতিমানুষ' (Superman) হইতে অগ্রসর

হইল। ফলে হইল কিন্তু বর্ত্তমান মহাসমরের সূচনা। স্ত্রীপুরুষের যৌন সম্পর্কের সহিত চিরকাল ধর্ম্মাধর্ম্মের ভাব ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত আছে, এবং ইহাতে সমাজের অশেষ কল্যাণ হইয়াছে কিন্তু আধুনিক যুক্তিসর্ব্বস্ব লেখকগণ যে ইহাকে কুসংস্কার বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহা আমরা দেখিতেছি। ধর্ম্ম-জগতেও পুরাতন সংস্কারগুলি আর বড় টিকিতেছে না। ফরাসী বিপ্লবের সময় হইতে য়ুরোপে যে সুপ্রাচীন মত ও সংস্কারাবলীর উচ্ছেদ সাধন আরম্ভ হইয়াছে তাহার পরিণাম কোথায়, কে বলিতে পারে? যাঁহারা যুক্তিমাত্র আশ্রয় করিয়া এই ধ্বংস কার্য্যে অবতীর্ণ হন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে—Not Reason alone, but Reason and Tradition in harmonious action guide our steps to the discovery of truth*—কেবল যুক্তি নহে, পরন্তু যুক্তি ও সুচিরাগত সংস্কার একত্র মিলিত হইয়া আমাদিগকে সত্যাবিষ্কারের পথে লইয়া যায়।

সাধারণ অশিক্ষিত লোকের উপর এই নবভাবনা অতি ভয়ঙ্কর ফল প্রসব করে। যাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস কতকগুলি অন্ধসংস্কারের সমষ্টি মাত্র, যাহাদের নৈতিক বৃত্তিসমূহ এই ধর্ম্মবিশ্বাসকেই অবলম্বন করিয়া—স্ফূর্ত্তিলাভ করে, যাহারা যুক্তি ও বিচারের ধার ধারে না, যাহারা পিতৃপিতামহাদি হইতে প্রাপ্ত সংস্কারাবলী দ্বারাই জীবন-প্রণালী নিয়ন্ত্রিত করে, তাহারা যদি এই সকল সংস্কার হারাইতে থাকে, অতীতের সহিত তাহাদের সম্পর্ক যদি ক্ষীণ হইয়া যায়, সামাজিক বিধিব্যবস্থাসমূহ যদি আর তাহারা শ্রদ্ধার চক্ষে না দেখিতে পারে, তাহা হইলে শুধু যে তাহাদেরই সর্ব্বনাশ সাধিত হয় তাহা নয় দেশের পক্ষেও তাহা এক ঘোর দুর্দ্দিন বলিয়া মনে করিতে হইবে। অধ্যাপক ডাউডেনের কথায় বলি, 'If the past is not to bind us, where can duty lie? We should have no law but the inclination of the moment,'—যদি অতীতের বন্ধন আমরা না স্বীকার করি তাহা হইলে আমাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান কোথায় থাকে? তাহা হইলে আমাদের যখন যাহা ইচ্ছা হইবে তাহা করাই নীতিসম্মত হইয়া দাঁড়াইবে। একথা অশিক্ষিত সাধারণের পক্ষে যে অতি-সত্য তাহাতে কি সন্দেহ আছে? আমাদের দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে যে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে তাহা ভাবিয়াই ত দ্বিজেন্দ্রলাল সরল-প্রাণ কৃষাণকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছিলেন—

ওরে চাষী হারাস্ নে তোর সরল দেহ, সরল জীবন,
সভ্যতার এই সংঘর্ষণে এসে,
হারাস্‌নে তোর শুদ্ধ হৃদয় বেশীবুদ্ধির জোরে পড়ে,—
ধনে মানে ফতুর হোস্‌নে শেষে।
হারাস্‌নে তোর সরল ধর্ম্ম—গঙ্গাস্নানে পুণ্য ভাব',
পরদারে মাতা বলে' জানা,
বৃক্ষের কাছেও কৃতজ্ঞতা, সর্ব্বভূতে দয়ামায়া,
গাইকে ভগবতী বলে' মানা।

কিন্তু তাই বলিয়া কি সংস্কার মাত্রকেই শ্রদ্ধা করিতে হইবে? কুসংস্কার বলিয়া কি কিছু নাই? আছে বৈকি এবং বোধ হয় এত বেশী যে দেশহিতৈষীকে অক্লান্ত ভাবে সেগুলির সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। যাহা শুধু অযৌক্তিক তাহা সকল সময়ে হয়ত তত মারাত্মক নয়। 'গঙ্গাস্নানে পুণ্য ভাব' কিংবা 'গাইকে ভগবতী বলে মানা'-সম্প্রদায়

* Dowden,—Studies in Literature. P. 266.

বিশেষের অন্ধবিশ্বাস মাত্র হইতে পারে, তাহাতে সমাজের বিশেষ কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; কিন্তু যে সকল সংস্কার ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে তাহা মানবসমাজের যত অনিষ্ট করে তত বুঝি আর কিছুতে করে না। এক কালে আমাদের দেশে গঙ্গাসাগরে সন্তানবিসর্জন একটা ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। এখন আমরা সকলেই স্বীকার করি ইহার ন্যায় নির্ম্মম কুসংস্কার কোন জাতির ইতিহাস কলঙ্কিত করিয়াছে কিনা সন্দেহ। বিলাতে পূর্ব্বে যে সকল স্ত্রীলোককে লোকে ডাইনী বলিয়া সন্দেহ করিত তাহাদিগকে তাহারা জলে ডুবাইয়া বা পুড়াইয়া নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিত। ইহাও যে একটা ঘোর কুসংস্কার ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেবতার কাছে মানত করিয়া জনকজননী কে আর কোথায় আপন শিশুসন্তানকে সাগরগর্ভে বিসর্জ্জন দিতে পারিয়াছে? বালবিধবা যদি দারুণ গ্রীষ্মে একাদশীর দিনে তৃষ্ণায় মরিয়াও যায় তাহা হইলেও যে তাহাকে একবিন্দু জল দেওয়া হইবে না এই প্রথাও উক্ত সন্তানবিসর্জ্জন অপেক্ষা কম অন্যায় ও নিষ্ঠুর নহে, এবং ইহারও মূলে একটা অন্ধ-সংস্কার ব্যতীত আর কিছু নাই। কারণ শাস্ত্রে যে এরূপ বিধি নাই তাহা সেদিন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন 'একাদশীতত্ত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন। আবার যখন দেখি হিন্দুসমাজে জাতিভেদের অত্যাচার এত বেশী যে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণও আহারাদিতে বন্ধুত্বের খাতিরের চেয়ে জাতিভেদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যত্নবান, যখন দেখি বিংশশতাব্দীর ব্রাহ্মণগর্ব্বিত হিন্দু সদাচারী ধার্ম্মিক ভিন্নজাতি বন্ধুর স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করা ত দূরের কথা তাহার সহিত বসিয়া পানভোজন পর্য্যন্ত করিতে অক্ষম, অথচ একজন ঘোর কদাচারী অপরিচ্ছন্ন পাচক-ব্রাহ্মণের প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজনে তাহার কোন আপত্তি নাই, তখন এই সংস্কারের অপার মহিমা প্রত্যক্ষ করি, আর যে সংস্কার সমাজে বন্ধুর সহিত মিলনের পথে অন্তরায় যাহা সমাজের স্তরে স্তরে ঘৃণাদ্বেষের বিষ সঞ্চারিত করিতেছে তাহাও যখন যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হয় তখন কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম! আর এই যে বিলাত-প্রত্যাগত-দিগকে জাতিচ্যুত করা, যে সম্বন্ধে পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে এতক্ষণ আলোচনা হইতেছিল, তাহারও মূলে যে এইরূপ একটা ভ্রান্তসংস্কার বর্ত্তমান তাহা ত স্পষ্টই প্রতীয়মান। যাঁহারা শাস্ত্র বা সমাজের দোহাই দিয়া এই সব কুসংস্কার সমর্থন করেন তাঁহারা যুক্তি তর্কের বাহিরে।

সংস্কারের প্রসঙ্গ উঠিলেই এইরূপ অনেক কথা মনে আসে। যাহাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার, বিচার করিবার শক্তি নাই সেই অশিক্ষিত জনসাধারণের পক্ষে এই সংস্কারের অধীনতা স্বীকার ব্যতীত গত্যন্তর নাই, এবং তাহাতে যে সমাজের বিশেষ অনিষ্ট হয় তাহা মনে করিবার কারণ নাই। কিন্তু যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহারাও যদি সংস্কারবশে ন্যায়ধর্ম্ম বিস্মৃত হন তাহা হইলে সমাজের কল্যাণ কোথায়? যদি 'তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি' বিচারের স্রোতঃ পথ গ্রাস করিয়া ফেলে তাহা হইলে কে আমাদিগকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করিবে?

এই সময়ে আবার চিন্তাসূত্র ছিন্ন করিয়া বন্ধুবর বলিলেন, 'এইবার আমাদিগকে নামিতে হইবে।'

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

সমাজে।

—:*:—

(১)

যদিও হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসি মাংস,
জলচর ভূচরের খাই অধিকাংশ,
সহরে যাইয়া ঢুকি এখানে ও ওখানে
খাই বটে তরকারী যার তার দোকানে।
ষ্টীমারে যদিও খাই খালাসীর হাঁড়িতে ;
যদিও মোরগ খাই লুকাইয়া বাড়ীতে।
তাই বলে মূর্খেরা মনে মনে ভাব কি
যার তার সাথে আমি সমাজেতে খাব কি ?

(২)

শুঁড়িদের হেঁসেলের চাট সহ আঁধারে,
ধেনো মদ খাহ বটে বসে তার পাঁদাড়ে,
আকাচা কাপড়ে খাই অস্নানে সকালে,
সাহা-বাড়ী খাই বটে লোভ কিছু দেখালে,
খাই বটে একপাতে ধনীদের সঙ্গে
সে কেবল সখা-ভাবে আর রসরঙ্গে।
কেহ যদি জিজ্ঞাসে এই সব খাও কি ?
সমাজে স্বীকার করি,—ভাবিয়াছ তাও কি ?

(৩)

কোথাও পোলাও খেতে দোষ আমি দেখিনা,
পাইলে পাঁটার ঝোল জাত খোঁজ রাখিনা।
মুচি যদি লুচি দেয় খাই তাও আড়ালে।
শিবু সার দোকানেতে বেশী দেনা দাঁড়ালে
নূতন খাতার দিনে, দিনে খাই কচুরী
রাত্রিতে খাই বটে কোর্ম্মা ও খিঁচুরী
তাই বলে মূর্খেরা মনে মনে ভাব কি
সাদা জাত শাক ডাল যেথা সেথা খাব কি ?

(৪)

যদিও অশৌচ আদি ঠিক মত মানিনা
সংস্কৃত খিটিমিটি একটুও জানিনা।
গোত্রটা ঠিকমত পারিনা ক বলিতে
আহ্নিক প্রয়োজন নাহি হেরি কলিতে।
যদিও মারিলে গরু, দেই মোরা উড়ায়ে
বুড়া জ্ঞাতি খুড়াটির দেই মাথা মুড়ায়ে
তাই বলে যাবো কি গো মস্‌জিদে নমাজে
তাই বলে জাতে কি গো ছোট হবো সমাজে ?

(৫)

তাই বলে সাদা-ভাত যেথাসেথা খাব কি ?
দেবলের সাথে চলে, তার বাড়ী যাব কি ?
গণকের জল খায়—আরে রাধামাধব'।
কি ভীষণ! তার বাড়ী আমি গিয়ে পা ধোবো ?
যার বাপ নাপিতের যাজকতা চালাত
তার বাড়ী খেতে হবে ? কম নয় জ্বালা ত ?
অমুকের শালা গেল বিলাতে যে পালায়ে
নিব তার ভাগনীর জামায়েরে চালায়ে ?

(৬)

করণ করিল যেবা গঙ্গার ওপারে—
অথবা মন্ত্র দিল যেইজন ধোপারে—
পনের বছুরে মেয়ে যার বাড়ী অনূঢ়া,
যার বাড়ী খায় নাক ও-পাড়ার মনুরা
তার বাড়ী খাব আমি ? কুলে যেবা নীচুতে
খাওয়া থাক্ তার বাড়ী পা ধোবনা কিছুতে।
গোপনে অনেক খাই—নূতন তা জান কি ?
স্বীকার করিব তাও সমাজের মাঝে কি ?

বেতাল-ভট্ট।

ডেপুটি-শিক্ষা।*

প্রথম পাঠ।

পূজার ছুটি হইয়াছে। কলিকাতায় কলেজের ছাত্রদের একটি মেসে আজ হুলুস্থুল ব্যাপার। কয়দিন হইতে ইহারা ফর্দ্দ-হাতে চাঁদনী, বড়বাজার, চীনাবাজার, মুর্গীহাটা তোলপাড় করিয়া ফেলিয়াছে। ষ্টীলট্রাঙ্কগুলি এত বোঝাই হইয়াছে যে দুই তিনবার নানারকমে জিনিষ সাজাইয়াও সেগুলি বন্ধ করিতে পারা যাইতেছে না। শেষে দুই তিন জনে ডালার উপর দাঁড়াইয়া চাপ দিয়া সেগুলিতে চাবি লাগান হইতেছে। নববিবাহিত কেহ বইয়ের দোকানে দোকানে ঘুরিয়া চক্‌চকে বাঁধান নূতন গল্পের বই কিনিয়া তাহার উপহারপৃষ্ঠায় রাত্রিতে সকলে ঘুমাইলে ধরিয়া ধরিয়া একটি নাম লিখিয়া বাক্সের মধ্যে কাপড়ের তলে লুকাইয়া রাখিয়াছে। চিঠির তাড়াটিও সেইখানেই থাকে।

আজই যে যার বাড়ী রওয়ানা হইবে। সকালবেলা কেহ আঁকা বাঁকা মেয়েলী হাতে লেখা একখানি পত্র একটু আড়ালে খুলিয়া দেখিতেছে কোনও ফরমাস ভুল হইল কি না। ফর্দ্দটি যদিও মুখস্থ, তবু বলা যায় না, যদি পড়িতে ভুলই হইয়া থাকে। কাহারও পায়ের জুতা দোকানদার 'স্কু-হরণ' দিয়া ঠিক্ পরাইয়া দিয়াছিল, এখন তাহার মধ্যে পা ঢোকান অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ঠাকুর ও চাকর কিছু মোটা রকম বক্‌সিসের আশায় একেবারে সহস্রবাহু অর্জ্জুন হইয়া উঠিয়াছে। অত্যন্ত গম্ভীর দার্শনিক ছাত্রেরও মুখে আজ পরিহাসের বাণী ফুটিয়াছে। আর বেশী দেরী নাই।

কেবল দ্বিতলের একটি কক্ষে একজন ছাত্র সাংখ্যের পুরুষের মত উদাসীনভাবে এই সব ব্যাপার দেখিতেছে। তাহার নাম ব্রজনাথ দাস। সে বাড়ী যাইবার কোন উদ্যোগই করে নাই। মেস্ বন্ধ হইয়া যাইবে। তাহার থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা কি হইবে তজ্জন্য অন্যান্য ছাত্রেরা চিন্তিত হইলেও, তাহার কোন চিন্তার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। বেশ নিশ্চিন্তভাবে আয়না সম্মুখে রাখিয়া গালে উত্তমরূপে সাবান মাখাইয়া সে ক্ষৌরকার্য্যে নিযুক্ত ছিল, এমন সময় সেই কক্ষবাসী সুধীন্দ্র একটা বড় কাগজের বাক্সের মধ্যে কি কি জিনিষ লইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল।

কাগজের বাক্সটা বিছানার উপর রাখিয়া, জুতা খুলিতে খুলিতে সুধীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল "তারপর ব্রজদা', দুখানা টিকিটই কিনে আনি ?"

ক্ষুর নামাইয়া ব্রজনাথ বলিল "কেন ?"

"তুমি কি সত্যি যাবে না নাকি ?"

"সত্যি না ত কি ?"

"যাও, কি তামাসা কর। একলা এখানে থাক্‌বে কোথা ?"

"সে ভাবনা তোমার কেন ?" এই বলিয়া ব্রজনাথ একমনে দাড়ীতে ক্ষুর চালাইতে লাগিল।

সুধীন্দ্র কিছু বুঝিতে পারিল না। বলিল "তোমার [illegible] কি শুনি ?"

* Service Text-Book Committee কর্ত্তৃক পঠিত [illegible] প্রাদেশিক পাঠ্যরূপে অনুমোদিত।

"মৎলব আবার কি ?"

"আমায় কি কচিখোকা পেলে নাকি ? কল্‌কেতায় তোমার কেউ নেই। পুজোর ছুটির সময় মেস্ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এখানে থাকাও চল্‌বে না। বাড়ী যাবারও নামটি নেই। ব্যাপারখানা কি ?"

"এই এক কথা ত মেস্-শুদ্ধ সবাই একমাস ধ'রে শোনাচ্ছ। এতদিন যা উত্তর দিয়েছি, আজও তাই দিচ্ছি।" এই বলিয়া ব্রজনাথ নীরবে ক্ষৌরকার্য্য সমাপন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

সুধীন্দ্র আর বেশী কিছু বলিল না। তাহার দাদার বিবাহ হইয়াছে। বৌদিদিকে পূজার তত্ত্বে দিবার জন্য কাপড় জামা কিনিবার ভার তাহার উপর ছিল। সে তাহা কিনিতে গিয়াছিল, ব্রজনাথের ঐ প্রকার ভাব দেখিয়া সে চটিজুতা পায়ে দিয়া কাগজের বাক্সটা লইয়া অন্য ছাত্রদের দেখাইতে গেল, সে ঠকিয়া আসিয়াছে কি না। সেই আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজনাথের এই রহস্যপূর্ণ আচরণের নানাপ্রকার কারণ উদ্‌ভাবন করিবার চেষ্টাও হইতে লাগিল। কিন্তু সকলেই বাড়ী যাইবার জন্য ব্যগ্র ; অদম্য কৌতূহল সত্ত্বেও কলিকাতায় থাকিয়া এ রহস্য-ভেদের প্রবৃত্তি কাহারও হইল না।

সকাল সকাল আহারাদি করিয়া, ভাড়াটিয়া গাড়ী ডাকাইয়া বিছানা ট্রাঙ্ক প্রভৃতি তাহার উপর তুলিয়া, হাঁক ডাক করিতে করিতে, হাস্য-পরিহাসের ঝড় বহাইয়া এক এক দল করিয়া সকল ছাত্রেরা যখন চলিয়া গেল, তখন ব্রজনাথ চাকরকে সদর দরজা বন্ধ করিতে বলিয়া নিজ কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিল। চাকরটি সে রাত্রি সেইখানে থাকিবে। পরদিন প্রত্যূষে সে চলিয়া যাইবে। ব্রজনাথকেও বাড়ী ছাড়িতে হইবে।

দ্বাররুদ্ধ করিয়া বিছানা ছাড়া অন্য সমস্ত দ্রব্যাদি ব্রজনাথ গুছাইতে আরম্ভ করিল। রাত্রি যখন এক-টা তখন সমস্ত গুছান শেষ হইল। তখন বিছানার উপর শুইয়া ব্রজনাথ ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সকালবেলা স্নান করিয়া চাকরের দ্বারা কিছু খাবার আনাইয়া খাইয়া, ব্রজনাথ বাড়ী ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত হইল। চাকর বিছানা গুটাইয়া বাঁধিয়া দিল। একখানি ঠিকাগাড়ী ডাকিয়া দিল। ব্রজনাথ চাকরকে বক্‌সিস্ দিয়া জিনিষপত্র গাড়ীর ছাদে চাপাইয়া বলিল "কালীতলা চলো।"

গাড়ী যখন কালীতলার নিকট আসিল, তখন ব্রজনাথ গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া একটী দেশী হোটেল দেখাইয়া দিয়া বলিল "ঐখানে গাড়ী রাখ।"

গাড়ী আসিয়া হোটেলের সামনে দাঁড়াইল। ব্রজনাথ গাড়ী হইতে নামিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিল। উপরের একটী ঘরে হোটেলের এক কর্ম্মচারীর সহিত একটী ঘর বন্দোবস্ত করিয়া, কোচম্যান দ্বারা জিনিষগুলি সেই ঘরে তুলিল। পরে ভাড়া দিয়া গাড়ী বিদায় করিয়া দিল।

মধ্যাহ্নে পূর্ব্বরাত্রির ভুক্তাবশিষ্ট বাসি মাংস গরম করিয়া অন্যান্য তরকারির সহিত ব্রজনাথের ভাত দিয়া গেল। ব্রজনাথ মাংস খাইতে পারিল না। তরকারি দিয়া অল্প ভাত খাইয়া একটু বিশ্রাম করিল। পরে ঘর বন্ধ করিয়া হোটেলের চাকরকে তাহার ঘরটির প্রতি নজর রাখিতে বলিয়া ট্রামে উঠিয়া চাঁদনী চলিয়া গেল।

বেলা চারিটার সময় ব্রজনাথ ফিরিল। তাহাকে দেখিয়া প্রথমে হোটেলের বেহারা চিনিতেই পারে নাই। পাঞ্জাবী গায়ে চাদর উড়াইয়া কোঁচা দুলাইয়া যে বাবু বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, এখন তিনি পুরাদস্তর সাহেব সাজিয়া [illegible] চক্‌চকে কলার ও [illegible] বোতাম স্বর্ণবর্ণে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। নূতন বুট, নূতন সুট, নূতন হ্যাট।

হাতে ছড়ি হইতে মুখে চুরুট পর্য্যন্ত সমস্তই নিখুঁত। বেহারা বুঝিল, বাবুর কাছ হইতে ভাল রকমই কিছু মিলিবে। খুব ঝুঁকিয়া সেলাম করিয়া ঘর খুলিয়া দিল।

দ্বিতীয় পাঠ।

—§*§—

পরদিন বেলা বারটার সময় সাহেবীবেশে সজ্জিত হইয়া ব্রজনাথ লালদীঘির ট্রাম ধরিল। "রাইটার্স বিল্ডিংস্" এর সম্মুখে নামিয়া সেই সুবৃহৎ বাড়ীতে প্রবেশ করিল। তাহার স্থিরপদবিক্ষেপ ও নিশ্চিত গতি দেখিয়া বোধ হইল এ বাড়ী তাহার অপরিচিত নহে। তাহার গম্যস্থান সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ নাই।

একটি কক্ষের সম্মুখের বারাণ্ডায় পৌঁছিয়া ব্রজনাথ দেখিল, খুব জমকাল পোষাক পরা কোমরে তরবারি ঝুলান আরদালী দ্বার রক্ষা করিতেছে। দর্শনপ্রার্থী সে একা নয়, আরও দুইজন চোগাচাপকান-পরা ভদ্রলোক আগে হইতেই দাঁড়াইয়া নিম্নস্বরে পরস্পর কথোপকথন করিতেছিলেন। একজন বৃদ্ধ; তাঁহার মাথার চুল সব পাকিয়া গিয়াছে। খুব কৃশকায়, চোখে চস্‌মা। একটি লাঠির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। অপরটি আধাবয়সী, স্থূলকায়। তাঁহার চাপকান ফাটিবার উপক্রম করিয়াছে। বৃদ্ধটি বলিতেছিলেন "আমার আর কতক্ষণ লাগ্‌বে? কালকেই বলে গেছি। চিঠিখানা নিয়েই চলে যাব। তোমরা এখন তোয়াজ টোয়াজ কর। আমাদের সঙ্গে তোমাদের এখন তুলনা হয় না।"

স্থূলকায় ভদ্রলোকটি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন "আর তোয়াজ বলে তোয়াজ? গোপেন আরবারে ছুটিতে দেখা করে আমার ষ্টেশনটি দখল করে নিয়েছে। আমায় দিয়েছে ঠেলে একেবারে হাড়ভাঙ্গা ম্যালেরিয়ার দেশে। ছেলেমেয়েগুলোর ত পিলেতে পেট ভরে গেছে। পরিবার ছ' মাস থেকে আজ উঠ্‌ছে ত কাল পড়্‌ছে। যদি বদলি না করে ত ছুটির দরখাস্ত কর্‌তে হবে। আপনার ছেলের জন্যে কোথায় চেষ্টা কর্‌ছেন?"

"আর বল কেন? লেখাপড়া ত তেমন কিছু হ'ল না। তাই পুলিশ লাইনেই ঢোকাবার চেষ্টা কচ্ছি।"

"যে দিনকাল পড়েছে, এখন পুলিশ লাইনে চাকরী কি সুবিধার হবে?"

"আর অন্য কোথায়ই বা দিই? এও হচ্ছে অনেক যোগাড়ে। আমাদের যারা চিন্‌ত জান্‌ত, সে সব সাহেবেরা প্রায়ই 'রিটায়ার' করেছে। একে ধরে যদি কিছু কর্‌তে পারি তবেই হ'ল, না হ'লে আর কোন আশাই নেই।"

এই সময় ভিতর হইতে একজন চাপরাসী আসিয়া বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে সাহেবের সেলাম জানাইলে, তিনি কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে আরও তিন চারজন ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও অঙ্গুলি সঞ্চালনে একে একে আরদালীকে ডাকিয়া নিজ নিজ কার্ড দিলেন। আরদালী তাঁহাদের চেয়ে বলিয়া মনে হইল। 'পূজার বক্‌সিস্' বলিতেই রৌপ্যমুদ্রার ঝনৎকার শ্রুতিগোচর হইল।

ক্ষণকাল পরেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বাহির হইয়া আসিলেন। স্থূলকায় ভদ্রলোকটির ডাক পড়িল। তিনি যাইবার সময় বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হ'ল?"

"বড় ব্যস্ত। চার পাঁচদিন পরে আস্‌তে বল্লে।"

স্থূলকায় ভদ্রলোকটি উত্তরে মুখ বিকৃত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

কিছু পরেই ভিতর হইতে সাহেবের উচ্চ কণ্ঠস্বর শ্রুতিগোচর হইল। স্থূলকায় ভদ্রলোকটি কি বলিতেছিলেন তাহা শোনা গেল না। কিন্তু সাহেবের কণ্ঠ ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে লাগিল। দুই এক মিনিটের মধ্যেই স্থূলকায় ভদ্রলোকটি মুখ লাল করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন ও কাহারও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন।

এই সময়ে বাহিরের আরদালী একত্রে বাবুদের কার্ডগুলি লইয়া ভিতরে গেল। সাহেবের কণ্ঠস্বর ভিতর হইতেই শুনা গেল—"হাম্ জান্তা হ্যায়্ '—' লোগকো সব ছুটি হুয়া। বোল্ দেও—আভি ফুরসৎ নেহি হ্যায়।" ভদ্রলোকগুলি বাহির হইতেই ইহা শুনিতে পাইলেন ও বুদ্ধিমানের মত চাপরাসী ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন।

ব্রজনাথ একাকী দাঁড়াইয়া রহিল।

আরদালী ফিরিয়া আসিয়া দরজার নিকট দাঁড়াইল। ব্রজনাথ বারান্দায় পায়চারি করিতেছিল। একবার দাঁড়াইয়া হস্তসঙ্কেতে আরদালীকে ডাকিল। আরদালী তাহা যেন দেখিতে পায় নাই, এইভাবে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন ব্রজনাথই অগ্রসর হইয়া তাহার নিকটে গেল এবং যেন এইমাত্র আসিতেছে এইরূপ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল "সাব্ হ্যায়?"

আরদালী সংক্ষেপে 'হাঁ' বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ব্রজনাথ পকেট হইতে একটি কার্ডকেস্ বাহির করিল। পূর্ব্বদিন অনেক মুসাবিদা করিয়া একখানি কার্ডে সে বহুযত্নে নিজ নাম লিখিয়া রাখিয়াছিল। সেই কার্ডখানি বাহির করিয়া আরদালীকে দিতে গেল। বলিল "সাব্‌কো দেও।"

আরদালী হাত বাড়াইল না। বলিল "আভি সাব্‌কো ফুরসৎ নেহি হ্যায়।"

ব্রজনাথ মৃদু হাসিল। বাঙ্গলায় বলিল "ওহে বাপু, আমি সবই বুঝি। ফুরসৎ যাতে হয়, তাই করিয়ে দাও দেখি।" এই বলিয়া পাঁচটি টাকা আরদালীর হাতে দিল।

একটা সেলাম করিয়া আরদালী তখনই হস্ত প্রসারণ করিল ও কার্ডসহ মুদ্রাগুলি গ্রহণ করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

সাহেব কার্ড দেখিয়াই জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন "ইয়ে ক্যা হ্যায়? তুম্‌কো বোল্ দিয়া না এ্যায়সা মৎ দিক্ করো।"

সাহেবের গর্জ্জনে ব্রজনাথের উপকার হইল। আরদালী যখন বুঝিল যে সাহেব তাহার উপরই চটিয়াছেন তখন সে নিজ দোষক্ষালন জন্য এক লম্বা বক্তৃতা ঝাড়িয়া দিল। তাহার মর্ম্ম এই—যে কার্ড আনিয়াছে সে মস্ত খেতাবধারীর পুত্র, রাজরাজড়ার আত্মীয়। ব্রজনাথ আরদালীর মুখে "রায়বাহাদুর", "রাজাবাহাদুর" প্রভৃতি উপাধিবৃষ্টি শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল।

বক্তৃতার ফল ফলিল। কলম ফেলিয়া দিয়া সাহেব বলিলেন "সেলাম দেও।"

দশ মিনিট পরে ব্রজনাথ সাহেবের কক্ষ হইতে বাহির হইল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া আরদালী আর কিছু চাহিবার প্রয়াস করিল না। ব্রজনাথ বারান্দা পার হইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতেছে, এমন সময় দেখিতে পাইল

পান চিবাইতে চিবাইতে একজন কেরাণীবাবু উপরে উঠিতেছেন। কেরাণীবাবু ব্রজনাথকে দেখিয়াই বলিলেন "কি হে? আজ দেখা করলে নাকি?"

ইচ্ছা না থাকিলেও ব্রজনাথকে দাঁড়াইতে হইল। কারণ ইঁহার অনুগ্রহেই সে সন্ধান পাইয়া সাহেবের সহিত দেখা করিতে পারিয়াছিল।

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তারপর? কিছু আশাটাশা পেলে?"

"কিছু না। আরদালী 'বাবু' বল্‌তেই বেটা বলে কি 'বাবু কোন্ হ্যায়? উ-ও তো সাব্ হ্যায়?' কে জানে বেটা হ্যাট্‌কোটের উপর চটা। তা হ'লে না হয় চোগাচাপকানই পরে আসা যেত। আপনিও ত কিছু বল্‌লেন না।"

"আমি তা কি ক'রে জান্‌ব ব'ল? তারপর? শুধু এতেই চটে গেল? তোমাকে যে রকম বলেছিলুম, তা বল্‌তে পারলে না? ও গরীবের ছেলে। গরীব টরীব বল্লে, Recommendation নেই বল্লে, নিশ্চয়ই কার্য্য উদ্ধার হ'ত।"

"আরে তা আর বল্‌তে পারলুম কই? আরদালী বেটা আগে থাক্‌তেই এক লম্বা বক্তৃতা ঝেড়ে দিয়েছিল যে আমার বাপ পিতামহ রাজাবাহাদুর, রায়বাহাদুর। কাজেই চুপ্ করে থাক্‌তে হল।"

কেরাণীবাবু হো—হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন "ঠিক্ পরিচয়ই দিয়েছে বটে। তা হ'লে ত চটে যাবেই। ও নিজে গরীবের ছেলে ব'লে বড়-বংশটংশ শুনলেই চটে যায়। তা হ'লে আর কোন আশা নেই বল?"

"সেই রকমই ত মনে হচ্ছে। আর ডেপুটিদের আজ যা দুর্দ্দশা দেখ্‌লুম, তার চেয়ে বি-এলটা দিয়ে ওকালতী করাই ভাল।"

"The grapes are sour এঁ্যা?" ব্রজনাথের কাঁধ টিপিয়া এই কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে কেরাণীবাবু উপরে উঠিয়া গেলেন।

তৃতীয় পাঠ।

ব্রজনাথ বাড়ী আসিয়াছে। তাহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সকালবেলা কথোপকথন করিতেছিল। জেলেপাড়ায় ব্রজনাথের বাড়ী। ব্রজনাথের পিতা মৎস্য বিক্রয় করিয়া বেশ স্বচ্ছন্দ ভাবেই সংসার চালাইত। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাধানাথও ঐ ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছিল।

ব্রজনাথের পিতা বলিতেছিল "হাঁারে, আজ একটা বড় মাছ আমাদের জন্যে রাখ্‌তে হবে। বেয়ান্রা ত ভাল মাছ না হ'লে খেতেই পারে না।"

"আচ্ছা।" রাধানাথ ব্রজনাথের উপর বড় প্রসন্ন ছিল না। কারণ ব্রজনাথ কলেজে পড়িয়া বি-এ পাশ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দাদা বলিয়া পরিচয় দিতেও লজ্জা বোধ করিত। শ্রদ্ধাভক্তির কথা ত বলিবার দরকারই নাই।

ব্রজনাথের পিতা রাধানাথের অপ্রসন্নভাব লক্ষ্য করিলেন। একটু অনুযোগের সুরে বলিলেন "তা তুই কিছু মনে করিস্‌নে রাধু, বেরজা এখন সাহেব-সুবোর সঙ্গে বেড়ায়, তাই অমন হয়েছে। তুই-ই ত ওকে স্কুলে পাঠাবার জন্যে জিদ্‌ ধরেছিলি। নইলে এতদিন ত আমাদের জাতব্যবসাই ধর্‌ত।"

রাধানাথের উচ্চ আশা ছিল, ভাই মানুষ হইবে। কিন্তু সেই 'মানুষ' হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভাই যে তাহার উপর শ্রদ্ধা হারাইবে, এ কথা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। বলিল "সাহেব সুবোর সঙ্গে ত' বেড়ায়। কিন্তু নূরুমিঞা কাল কি বলে গেল শুনেছ? বল্‌লে, পাদরী সাহেবের বাড়ী ত্ব'বেলা গিয়ে গিয়ে বেরজা 'খিষ্টান' হবে।"

ব্রজনাথের পিতা মাথা নাড়িয়া বলিল "দেৎ। 'খিষ্টান' হবে কি রে?"

"আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তুমি নূরু মিঞাকে জিজ্ঞাসা করো। নিজে ত 'খিষ্টান' হবেই. মুসলমান পাড়ায় গিয়ে সকলকে ভজাচ্ছে—'খিষ্টান' হবার জন্যে।"

"বটে! আসুক আজ বেরজা। তার হাড় একজায়গায় মাস একজায়গায় কর্‌ব।"

"না, না। মারধোর ক'রো না। তুটো ধমক্‌ দিলেই হ'বে।" রাধানাথ ভাইয়ের ভক্তির পাত্র না হইলেও, ভাইটিকে ভালবাসিত। ছেলেবেলায় কত উঁচু গাছে উঠিয়া ডগার গাছের ফল পাড়িয়া দিয়াছে. ফুল তুলিয়া দিয়াছে। কোথাও নিমন্ত্রণ হইলে নিজে না খাইয়া ভাইয়ের জন্য রসকরা বাঁধিয়া আনিয়াছে। সে নিজে ভাইয়ের উপর আজকাল অপ্রসন্ন হইলেও, আর কেহ ভাইকে কিছু বলে তাহা সহ্য করিতে পারিত না।

বৃদ্ধ বুঝিল। হাসিয়া বলিল "আচ্ছা, আচ্ছা। চল্‌।" বলিয়া তামাকের কলিকা রাখিয়া পিতাপুত্রে জাল ঘাড়ে করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

ম্যাক্‌গিলান সাহেব সেই সহরের মিশনারি। লম্বা চওড়া চেহারা। ব্রজনাথ বাড়ী আসিয়াই তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া ফেলিয়াছিল। সে শুনিয়াছিল, মিশনারি সাহেবের মেমের সহিত নাকি উঁচুদরের সাহেব সুবার ঘনিষ্ঠতা আছে। এমন কি লাটসাহেবের কাছে পর্য্যন্ত নাকি দরবার চলিতে পারে। মেমের প্রথম স্বামীর মৃত্যু হইলে তিন চারিটি সন্তান সহ তিনি ম্যাক্‌গিলান সাহেবকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলেই সাহেবের চাকরী প্রাপ্তি। সুতরাং চাকরী পাইবার সম্বন্ধে নজীরেরও অভাব ছিল না।

ব্রজনাথ একখানি বাইবেল জোগাড় করিল। মাঝে মাঝে কোন কোন পংক্তির গূঢ় মর্ম্ম বুঝিবার জন্য পাদরী সাহেবের নিকট যায়। মেমসাহেব তাহাতে বিশেষ খুশী। অদূর ভবিষ্যতে এই শিক্ষিত যুবকটিকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারা যাইবে, এই আশা পোষণ করিতেছিলেন। মিশনারি সাহেব এযাবৎ কাহাকেও খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারেন নাই। সেইজন্য মেমসাহেব স্বামীকে অপর মিশনারিদের সমকক্ষ করিবার জন্য এত ব্যগ্র। কাজেই মেমসাহেবের নিমন্ত্রণে ক্রমশঃ ব্রজনাথের চা বিস্কুটও চলিতে লাগিল।

চতুর ব্রজনাথের অবস্থা বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না। মেমসাহেবের প্রতিষ্ঠার কথা সে আগেই শুনিয়াছিল। দ্রাক্ষাফলের লোভে আবার শৃগালের রসনা রসসিক্ত হইয়া উঠিল। ব্রজনাথ একটা বড় রকমের চাল চালিল।

সে বৎসর অজন্মা। কৃষকদের বড়ই কষ্ট। ঋণে সর্ব্বস্ব গিয়াছে—আর ধারও কোথাও পায় না। ব্রজনাথ সুবিধা বুঝিয়া মুসলমানপাড়ায় ঘুরিতে আরম্ভ করিল। আহার নিদ্রারও তাহার অবসর রহিল না। নূরুমিঞা এই খবরটা রাধানাথকে দিয়াছিল।

নূরুমিঞা পাকা লোক। সাহেবের চাপরাসীগিরি করিয়া দাড়ী পাকাইয়া ফেলিয়াছে। কয়েকমাসের ছুটি লইয়া সে বাড়ী আসিয়াছিল। মুসলমানপাড়ায় তাহার বাক্য 'হাদিসে'র মতই অভ্রান্ত বলিয়া সকলের বিশ্বাস।

ব্রজনাথ প্রথম যে দিন মুসলমানদের কাছে খ্রীষ্টান হইবার প্রস্তাব করিয়াছিল, সে দিন জালাল সেখের লাঠির আঘাতেই সে ধরাশায়ী হইত। তাহার সৌভাগ্যক্রমে নুরুমিঞা সেখানে উপস্থিত ছিল। সেই বাবুর গায়ে হাত তুলিতে মুসলমানদের নিষেধ করিয়া দিল।

তারপর হইতে ব্রজনাথ ও নুরু মিঞার খুব ভাব দেখা গেল। ইহার ফলে মুসলমান পল্লীতে অল্পদিনের মধ্যেই মিশনারি সাহেব ও তাঁহার মেমের ঘন ঘন শুভাগমন হইতে লাগিল। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা "সাহেব ছবি, মেম সাহেব ছবি" বলিয়া তাঁহাদের ঘিরিয়া ধরিতে লাগিল। বৃদ্ধেরা, যুবকেরা নিরক্ষর হইলেও ছাপান কাগজে লেখা "সদাপ্রভু কি বলেন?" পাইতে লাগিল। অবশেষে সকলে যেদিন বলিতে লাগিল "কেরেস্তান হ'ব" সেদিন সাহেব আর মেমের আনন্দ দেখে কে?

ব্রজনাথ বলিল "সাহেব, এদের কিছু করে টাকা না দিলে ত চল্‌বে না। গরীব লোক। গির্জ্জায় যাবার সময় ত একটু ভাল জামা কাপড় পরে যেতে হবে।"

মেম বলিলেন "Certainly. একটু respectable পোষাক না হ'লে লোকে বল্‌বে কি? প্রত্যেককে ১৫৲ টাকা করে দেওয়া যাবে।"

ম্যাকগিলান সাহেব মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিলেন "মিশন ফণ্ড্ থেকে বোধ হয় টাকাটা পাওয়া যেতে পারে।"

মেম বলিলেন "নিশ্চয়। নইলে আর ফণ্ডের উদ্দেশ্য কি? না মেয়. আমি নিজের পকেট থেকে দোব।"

একেবারে এতগুলি লোককে ম্যাকগিলান সাহেব খ্রীষ্টান করিতে পারিবেন, এই আনন্দে মেমসাহেবের হাত দরাজ হইয়া গিয়াছিল।

ফর্দ্দে নাম লিখিয়া আনিয়া ব্রজনাথ লোক পিছু ১৫৲ ধরিয়া মোট টাকা লইয়া চলিয়া গেল।

নুরুমিঞা মুসলমানদের প্রতিনিধিস্বরূপ টাকা গণিয়া লইল। কয়েকটি টাকা ব্রজনাথের দিকে বাড়াইয়া বলিল "আপনার দস্তুরি।"

ব্রজনাথ শিহরিয়া উঠিয়া বলিল "রাম রাম। সেকি? আমি ও-সব চাই না। এজন্য আমি তোমাদের কাছে আসি না।"

নুরুমিঞা তাহার বয়সে অনেক বাবু দেখিয়াছে। সে এই স্বার্থত্যাগটা প্রকৃত বলিয়া বিশ্বাস করিল না। কিন্তু মুখে কিছু না বলিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে চলিয়া গেল।

নুরুমিঞা যখন চলিয়া যায়, তখন ব্রজনাথ তাহাকে ডাকিল। বলিল "ওহে টাকা ত নিলে, কিন্তু ভাল পোষাক পরে না গেলে ত চল্‌বে না।"

নুরুমিঞা হাসিয়া বলিল "সে জন্য ভাবনা নেই বাবু। সব ঠিক করে দোব।"

সংবাদপত্রে ম্যাকগিলান সাহেব কর্ত্তৃক একশত মুসলমানের ব্যাপ্‌টাইজ হওয়ার সুদীর্ঘ বর্ণনা প্রকাশিত হইল। মেমসাহেব নবদীক্ষিত মুসলমানগণের ফটো বাঁধাইয়া ঘরে টাঙ্গাইলেন। সকলেই পেন্ট্‌লন, কোট, চোগা, চাপকান পরা। উকীল মোক্তার ও মাষ্টারদের পোষাক সেইদিনের জন্য ভাড়া দিয়া ধোপারা দুইপয়সা করিয়া লইয়াছিল। মেমসাহেব ব্রজনাথের পিঠ চাপড়াইয়া উৎফুল্লচিত্তে বলিলেন "বাবু, তোমার কিছু করিতে পারিলে আমি বিশেষ আনন্দিত হইব।"

চতুর্থ পাঠ।

—:*:—

রবিবার বেলা প্রায় তিনটা। রাধানাথ সকালবেলা বাজারে বেশ চড়াদামে মাছ বিক্রয় করিয়া আসিয়াছিল। বন্ধের দিন, অনেক বাবুরা নিজেই বাজার করিতে আসিয়াছিলেন। চাকরেরা চুরি করে, তাই সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ একদিন চুরি নিবারণ করিতে আসিয়া ভাল জিনিসটার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কাজেই রাধানাথ যাহা হাঁকিল তাহাই পাইয়াছিল।

বেশী রোজগার হইয়াছিল বলিয়া আসিবার সময় স্ফূর্ত্তিতে রাধানাথ এক মদের দোকানে গিয়া কয়েক গ্লাস মদ্যপান করিয়া আসিয়াছিল। সুরার প্রভাবে তাহার মনটা বেশ প্রফুল্লই ছিল। গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে সে একটা জাল বুনিতেছিল। এমন সময় ব্রজনাথ আসিয়া ডাকিল "দাদা।"

রাধানাথ মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার শিক্ষিত ভ্রাতাটি তাহাকে বহুদিন 'দাদা' বলিয়া ডাকে নাই। কলিকাতা গিয়া অবধি সে তাহার কাছেই ঘেঁসিত না। একে মেজাজটা প্রফুল্ল ছিল, তাহাতে এই দাদা ডাকে রাধানাথ প্রসন্ন হইয়া বলিল "কিরে?"

"দাদা, বড় বিপদে প'ড়ে তোমার কাছে এসেছি। তুমি রক্ষা না কর্‌লে আর উপায় নাই।"

রাধানাথ আশ্চর্য্য হইয়া গেল। যে তাহাকে এতদিন অবজ্ঞা করিয়া আসিতেছে, সেই তাহার শরণাপন্ন। ব্যাপারখানা কি? সুরাগন্ধে আকৃষ্ট কয়েকটা মাছিকে মুখের কাছ হইতে হস্তসঞ্চালনে তাড়াইয়া দিয়া বলিল "কি? হয়েছে কি?"

"দাদা, আমি একটা বড় চাকরীর যোগাড় করেছি।"

"কি চাকরী?"

"ডেপুটিগিরি।"

"এ্যাঁ! বলিস্ কিরে? তুই কি তত লেখাপড়া শিখেছিস্ না কি? 'ডিপ্‌টি' কি সোজা কথারে! বাঘে গরুতে যার নামে একঘাটে জল খায়। একবার মাছ ধর্‌তে চন্দনার বিলে গিয়ে এক 'ডিপ্‌টি'র সামনে পড়েছিলুম। এই মারে ত এই মারে।"

ব্রজনাথ মনে মনে হাসিয়া বলিল "সত্যি দাদা, আমি সব জোগাড় করেছি। কিন্তু একটা বড় মুস্কিল হয়েছে। তুমি তার না উপায় কর্‌লে আর হয় না।"

"'ডিপ্‌টি' হবি, তার আর মুস্কিল কিরে? আর আমিই বা তার কি উপায় কর্‌ব? আচ্ছা মুরুব্বি ধরেছিস্ ত? আমি কি তোকে লাটসাহেবের কাছে নিয়ে যাব নাকি?"

"না দাদা, তা নয়। মিশনারি সাহেবকে দিয়ে একটা 'বাইবেল ক্লাস্' খুলিয়েছি! তাতে সব লোকদের রবিবার ডেকে ডেকে নিয়ে যাই। ঘণ্টাখানেক বাইবেল পড়া হয়।"

শুনিয়াই রাধানাথের পিত্ত জ্বলিয়া গেল। মদ্যপান করিলেই তাহার ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনা হইত। ঐ অবস্থায় সে একেবারে পরম বৈষ্ণব হইয়া পড়িত এবং সঙ্কীর্ত্তন হইলে তাহার ঘন ঘন দশা-প্রাপ্তি হইত। সে ক্রুদ্ধকণ্ঠে হুঙ্কার দিয়া বলিল "বটে? তুই 'খিষ্টান' হ'য়ে ডিপ্‌টি হবি মৎলব করেছিস্? পাজী কোথাকার।"

"শোনই না। আগে থাক্‌তেই চট কেন ? আমি কি সত্যি খ্রীষ্টান হব ? কোন রকমে সাহেবটাকে ভোগা দিয়ে একটা চাকরী যোগাড় করে নিতে পারলেই—বাস্‌। তারপর সাহেব কি আর আমার টিকি দেখ্‌তে পাবে ?"

"ওরে, ওসব বুদ্ধি করিস্‌নি। তোকে মেম বিয়ে দেবে ব'লে ভুলিয়েছে বুঝি ?"

"তুমি কি আমায় তেমন বোকা মনে কর দাদা ? তবে যদি বল, 'বাইবেল ক্লাস্‌' খুলিয়ে আমার লাভ কি ? আমি সাহেবকে বুঝিয়েছি, খ্রীষ্টান হ'লে আমায় ত' বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে। তাই একটা চাকরীর জোগাড় না করে দিলে খাব কি ? প্রথমটা ত সাহেব রাজীই হয় নি। বলে৷ খ্রীষ্টান হয়ে মিশন হাউসে থাক্‌বে। পরে একটা ব্যবস্থা করে দেব। তাতে আমি মেমকে ধরেছি। মেম রাজী হয়েছে। দু'চারজন বড় বড় সাহেবকে চিঠিও লিখেছে। আশাও পেয়েছি। আর মেরেকেটে একটা হপ্তা চালাতে পার্‌লেই কাজ হাসিল করে নোব।"

"তা আমায় তুই কি কর্‌তে বলিস্‌ ? আমাকে দিয়ে তোর কি কাজ হবে ?"

"বাইবেল্‌ ক্লাসের আর লোক পাচ্ছি নি। লোক যোগাড়ের ভার আমার ওপর। প্রথম প্রথম ত ঘরে লোক ধর্‌ত না, এখন আর কেউ আস্‌তে চায় না। কেউ বলে, বাড়ীতে বক্‌বে। কেউ অসুখের ওজর করে। কেউ বা স্পষ্টই গালাগাল দেয়। আজ একজনকেও বাগাতে পারলুম না। অথচ এই চাকরীর যোগাড় হব হব হয়েছে, এ সময়টা কাউকে না নিয়ে গেলে ত সব ফস্কে যাবে। তাই দাদা, তোমায় ধরেছি।"

"তা আমি কি করব ?"

"তুমি যদি দাদা যেতে রাজী হও। কিছু কর্‌তে হবে না। খালি চুপটি করে বসে থাক্‌বে। বেশীক্ষণ নয়, বড়জোর একটি ঘণ্টা। আজকের দিনটা কেটে গেলেই এখন আবার আর রবিবার পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত। এর মধ্যেই আমি কাজ বাগিয়ে নোব।"

রাধানাথ স্পষ্ট জবাব দিল, "আমার দ্বারা ওসব হবে-টবে না।"

"তাহ'লে দাদা আমি ত' মারা যাই। আমি জেলের ছেলে, আমায় কি অমনি ডেপুটি করে দেবে ? কত সবজজ, মুন্সেফ্‌ তাদের ছেলেদের চাকরীর জন্যে হাঁটাহাঁটি ক'রে পায়ের দড়ি ছিঁড়ে ফেল্‌ছে। আর তুমি দাদা হয়ে যদি এটুকুও না কর তাহ'লে আর আমার কোন আশাই নেই।"

রাধানাথ দুঃখিত হইল। তাইত'—তাহার এত সাধ, ভাইটা মানুষ হয়। এমন একটা সুবিধা আসিয়াছে, একবার গেলেই বা কি ক্ষতি ? একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "আমি মুখ্যু সুখ্যু মানুষ। কি বল্‌তে কি বলে ফেল্‌ব, সাহেব কিছু মনে কর্‌বে না ত ?"

"তোমায় কি আর কথা কইতে হ'বে ? তাহ'লে আমি নিয়েই যেতুম না। চুপটি করে বসে থাক্‌বে। সাহেব বাইবেল পড়্‌বে, আর বাঙ্গলা করে বুঝিয়ে দেবে। মাঝে মাঝে ঘাড় নাড়্‌লেই চল্‌বে।"

"আচ্ছা—তোর যদি একটা উপকার হয়, তা না হয় যাবই এখন একবার।"

ব্রজনাথ মহা খুসী হইল। কিন্তু তখনও এক বৃহৎ ব্যাপার বাকি। রাধানাথ কি পরিয়া যাইবে ? ব্রজনাথ বলিল "দাদা, তোমায় কিছু একটু ভাল কাপড়-চোপড় পরে যেতে হবে।"

"আমার কোরা কাপড়খানা পরব এখন। আর চৌধুরীবাবুরা মেজবাবুর বিয়েতে যে গামছা দিয়েছে, সেইখানা কাঁধে নেব এখন।"

"না দাদা। খালিগায়ে যাওয়া হবে না। জামা গায়ে দিতে হবে।"

"এঁ্যা? জামা? লোকে যে গায়ে ধুলো দেবে রে। ঐরকম সং সেজে আমি রাস্তায় বেরুতে পারব না।"

"দোহাই দাদা, তোমার পায়ে পড়ি। এই একটিবার। আর কখনও তোমায় কিছু অনুরোধ করব না।"

অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত তখন রাধানাথ 'নবকলেবর' ধারণে প্রবৃত্ত হইল। ব্রজনাথের একখানা কোঁচান ধুতি পরিল। একটা সার্টও গায়ে দিল। কিন্তু ব্রজনাথ ক্ষীণকায়, তাহার জামা অসুরের মত রাধানাথের গায়ে হইবে কেন? বহুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর কোনরকমে হাত দুটা ও মাথা গলান হইল কিন্তু বোতাম আর আঁটিতে পারা গেল না। কাঁধ ও পিঠ্ চড়্‌চড়্ করিতে লাগিল। ব্রজনাথ একখানা কোঁচান চাদর ভাঁজ খুলিয়া গায়ে জড়াইয়া দিয়া জামার মধ্য দিয়া পরিদৃশ্যমান রাধানাথের বিশাল বক্ষ ঢাকিয়া দিল। ব্রজনাথের কোন জুতাই রাধানাথের পায়ে ঢুকিল না। তখন একজোড়া চটিতে অর্দ্ধেক পা দিয়া অর্দ্ধেক পা বাহির করিয়া রাধানাথ ভ্রাতার মঙ্গলের জন্য আত্মবলি দিতে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। মুখে মদের গন্ধ ঢাকিবার জন্য ব্রজনাথ একখানা রুমালে একটু এসেন্স মাখাইয়া দাদার হাতে দিল। বলিল "এইখানা মুখের কাছে ধ'রে থেক।"

পঞ্চম পাঠ।

—:-*-:—

সেদিন সকালবেলা কিন্তু একটা কাণ্ড ঘটিয়াছিল। ব্রজনাথ তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিত না।

ম্যাক্‌গিলান সাহেব সকালবেলা গির্জ্জায় উপাসনা সমাপ্ত করিয়া বাড়ী ফিরিয়া দেখেন, মেম অগ্নিমূর্ত্তি। সাহেবকে দেখিয়াই আরও যেন জ্বলিয়া উঠিলেন। একখানা চিঠি ও কয়েক টুকরা কাগজ সাহেবের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন "তোমায় আচ্ছা ঠকিয়েছে ত।"

চিঠি ও কাগজগুলি পড়িয়াই সাহেবের মাথা ঘুরিয়া গেল। মেমের পরিচিত একজন পদস্থ কর্ম্মচারী এই পত্র পাঠাইয়াছেন। পত্রের সহিত একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র হইতে একটি "কাটিং" আসিয়াছে। সংবাদপত্রে লেখাটির মর্ম্ম এই—পাদরী সাহেব যে মুসলমানদের খ্রীষ্টান করিয়াছিলেন, তাহারা সদলে আবার মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। গত সপ্তাহের শুক্রবারে তাহাদিগকে ঘটা করিয়া জুম্মার নমাজ প'ড়িতে দেখা গিয়াছে। এই সংবাদটি দিয়া সম্পাদক তীব্র এক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, মিশনারিগণ নাম কিনিবার জন্য অগ্রপশ্চাৎ না বুঝিয়া যাহাকে তাহাকে খ্রীষ্টান করেন। অর্থ বা অন্য কোন প্রলোভন দেখাইয়া খ্রীষ্টান করিতে গেলে পরিণাম এইরূপই হইয়া থাকে।

পত্রখানি মেমের নামে। তাহাতে লেখা ছিল "পাদরীসাহেব নিশ্চয়ই কোন ধূর্ত্তের চক্রান্তে প্রতারিত হইয়াছেন। আপনি যে বাঙ্গালী যুবককে Recommend করিয়াছেন, সম্ভবতঃ এ তাহারই কাজ। একখানা বাঙ্গলা সংবাদপত্রের "কাটিং" পাঠাইলাম, তাহা হইতে ইহা বুঝিতে পারিবেন।"

বাঙ্গলা সংবাদপত্রখানি মুসলমান—সম্প্রদায়ের। তাহাতে বেনামী একখানি চিঠি প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে নানা ব্যঙ্গের সহিত ঘটনাটি বর্ণিত ছিল ও শেষে লেখা ছিল, "আমাদের বিশেষ দুঃখ এই যে যিনি এই উপলক্ষে ডেপুটিগিরি বাগাইবার চেষ্টায় ছিলেন, তাঁহাকে এবার নিরাশ হইতে হইবে। তবে আমরা তাঁহাকে এবার কাহারও ঘোড়া ধরিতে পরামর্শ দিই।"

মিশনারি সাহেব বাঙ্গলা জানিতেন। অর্থ বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তখন বেলা অনেক হইলেও টুপি মাথায় দিয়া মুসলমানপাড়ার দিকে ছুটিলেন।

তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া দুই চারিজন ছোট ছোট ছেলে পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ "সাহেব ছবি" বলিয়া দাঁড়াইয়া গেল। মুসলমানেরা কয়েকজন অগ্রসর হইয়া আসিল। দুই একজন ব্যঙ্গের সহিত সেলাম করিল। সাহেব রাগে আগুন হইয়া গেলেন।

অতি ক্লেশে ধৈর্য্য ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপার কি? যা শুনছি তা সত্যি নাকি?"

তখন পিছন হইতে নুরুমিঞা মৃদুমন্দ গতিতে অগ্রসর হইল। খুব ঝুঁকিয়া একটা সেলাম করিয়া বলিল "সাহেব, এ সব গোঁয়ার লোক। এরা কি বোঝে? ঐ যে একজন মৌলবী এসেছিল, সেই খেপিয়ে দিয়ে গেছে।"

"শালালোক সব্ বদ্মাস্।" সাহেব এই কথা বলিয়া ক্ষিপ্তভাবে তাহাদের দিকে ছুটিয়া গেলেন।

দুই একজন মুসলমান একটু পিছাইয়া গেল, কিন্তু জালাল সেখের উত্তেজনায় আবার সকলে দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। নুরুমিঞা ঈষদ্বিকসিত হাস্যের রেখাটুকুকে সম্পূর্ণভাবে গুম্ফ-শ্মশ্রুরাজির মধ্যে বিলীন করিয়া দিয়া সাহেবকে বুঝাইল "হুজুর, এ সব গোঁয়ার-লোগ্‌দের খেপাইলে একটা দাঙ্গা ফ্যাসাদ বাধিয়া যাইবে। আপনি যান, আমি এদের ঠাণ্ডা কর্‌ছি। বাঙ্গালী বাবুটিকে যে দেখ্‌ছি না। তিনি ডেপুটি হয়েছেন নাকি?"

সাহেব কোন উত্তর দিলেন না। "ভগবান ইহাদের ক্ষমা কর, ইহারা কি করিতেছে তাহা ইহারা জানে না।" অস্ফুট স্বরে এই কথা বলিয়া দ্রুতপদক্ষেপে ফিরিয়া গেলেন।

নুরুমিঞা তখন দীর্ঘনলযুক্ত ফর্‌সিটি বাহির করিয়া গাছের গোড়ায় ঠেস্ দিয়া বসিল। বলিল "দেখ্‌লি? বেম্‌হ্মা জেলে এসেছিল আমার সঙ্গে চালাকি কর্‌তে। একেবারে ছাপার কাগজে বার করে দিয়েছি জানিস্। খাস্ কল্‌কেতার ছাপার কাগজ।"

সমবেত সকলে নুরুমিঞার 'এলেমে'র অজস্র 'তারিফ্' করিতে লাগিল। নুরুমিঞা হাসিতে হাসিতে বলিল "শুধু 'তারিফ্' কর্‌লে ত হয় না। এইবার দস্তুরি বার কর্। বেম্‌হ্মা জেলের চেয়ে আমি তোদের ঢের বেশী উপকার করে দিয়েছি।"

ম্যাক্‌গিলান সাহেব বাড়ী ফিরিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্ত স্থির করিতে পারিলেন না। খানাও স্পর্শ করিলেন মাত্র। তা ছাড়া মেমসাহেব সমস্ত দোষ তাঁহার উপর চাপাইয়া হাবে ভাবে, আকারে ইঙ্গিতে তাঁহাকে একটি আস্ত গর্দ্দভ প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য মেমসাহেবের পর্য্যন্ত অপমান হইল, এইরূপ বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইয়া সমস্ত দুপুরবেলাটা কাটিল।

বিকালবেলা সাহেবের আর বাড়ীতে থাকিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু হঠাৎ মনে হইল, 'বাইবেল ক্লাস্' আছে। ব্রজনাথ আসুক, তাহার সঙ্গে এ বিষয় আলোচনা করিয়া একটা কেস্তনেস্ত করিতে হইবে, এই স্থির করিয়া সাহেব শেষে বাড়ীতেই বসিয়া রহিলেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে ব্রজনাথ রাধানাথকে লইয়া উপস্থিত হইল। রাধানাথের অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখিয়াই সাহেব জ্বলিয়া উঠিলেন। মনে মনে বলিলেন "রোজই নূতন নূতন লোক। একজন লোককেও ত দু'বার আস্‌তে দেখি না। এ সব Vagabondকে কোত্থেকে রোজ রোজ জুটিয়ে আনে? আমাকে একেবারে অপদস্থ কর্‌তে বসেছে। আমি নেহাৎ গাধা তাই কিছু বুঝ্‌তে পারি নি।" কিন্তু প্রকাশ্যে কোন কথা বলিলেন না। কেবল বলিলেন "আজ এই একজনই নাকি?"

ব্রজনাথ একটু যেন কৈফিয়ৎ দেওয়ার সুরে আস্তে আস্তে বলিল "আজ্ঞে হাঁ, আজ এই একজনই।"

সাহেব আর কোন কথা না বলিয়া বাইবেল খুলিয়া পাঠ ও তাহার বাঙ্গলা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। রাধানাথ কখনও জামা পরে নাই, সে আড়ষ্টভাবে মুখে রুমাল দিয়া চুপ্‌ করিয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু সাহেবের মুখে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রশংসা শুনিতে শুনিতে ক্রমশঃ তাহার ক্রোধ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষে সাহেব যখন প্রসঙ্গক্রমে হিন্দুধর্ম্মের উপর কটাক্ষপাত করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন রাধানাথকে সামলাইয়া রাখা মুস্কিল হইল। ব্রজনাথের মুখ শুকাইয়া গেল। সে দাদার গা টিপিয়া চুপ করিয়া থাকিবার জন্য ইসারা করিতে লাগিল। ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল আর বেশীক্ষণ নয়, পাঁচমিনিট কাটিলেই সাহেবের গির্জ্জায় যাইবার সময় হইবে। এই পাঁচমিনিট যাহাতে নির্বিঘ্নে কাটে তজ্জন্য ভাবী খ্রীষ্টান ব্রজনাথ বহু হিন্দু দেবদেবী এমন কি মাকাল ঠাকুরকে পর্য্যন্ত মানসিক করিয়া ফেলিল।

সাহেবের সেদিন মনটা খারাপ ছিল বলিয়া, হঠাৎ পাঠ শেষ করিয়া বলিলেন "এস, একটু প্রার্থনা করি।" এই বলিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন। ব্রজনাথও তদবস্থ হইয়া দাদাকে সেইরূপ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিতে লাগিল। কিন্তু রাধানাথের মেজাজ বিগড়াইয়া গিয়াছিল। সে একেবারে কবুল জবাব দিল, হাঁটু গাড়িয়া বসিবে না। একি তাহাকে খ্রীষ্টান করিবার ফিকির নাকি?

সাহেব রোষকষায়িত নেত্রে চাহিতেছেন, ব্রজনাথ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, রাধানাথ উদ্ধতভাবে ঘাড় তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় সাহেব রাধানাথকে সম্বোধন করিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিলেন "টুমি কি বলিটেছ?"

রাধানাথকে আর সামলাইয়া রাখা গেল না। সে চটিয়া গিয়া বলিল "বল্‌ছি তোমার মাথা। মুসলমানদের পয়সার লোভ দেখিয়ে খ্রীষ্টান করেছ। আর আমার ভাইকে চাকরীর লোভ দেখিয়ে বুঝি আমায় খ্রীষ্টান কর্‌বার মৎলব করেছ? ও সব চালাকী আমি ঢের বুঝি। জেলে বলে আমরা এত বোকা নই। বড় বড় হাকিমদের সঙ্গে আমাদেরও বাজারে দেখা সাক্ষাৎ হয়। হামেশা কথাবার্ত্তা চলে।"

সাহেব বিস্মিত হইয়া বলিলেন "টোমার ভাই কে?"

"এই যে গো। যেন কিছুই জানেন না। বেজা, তুই যদি লাটসাহেবও হস্‌, তবু আমি 'খিষ্টান' হ'তে পার্‌ব না। এই আমি পষ্ট কথা বলে দিলুম।" এই বলিয়া রাধানাথ বেগে বাহির হইয়া গেল।

সাহেব বাঙ্গলা বেশ ভালই বুঝিতেন। ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া ব্রজনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন "বাবু।"

ব্রজনাথ "Sir, Sir" করিয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে স্কন্ধে সাহেবের কঠিন করস্পর্শ অনুভব করিল। ঘাড় ফিরাইতে না ফিরাইতে গলাধাক্কা খাইয়া সে একেবারে কক্ষের বাহিরে আসিয়া পড়িল। ঘরের ভিতর হইতে ক্রুদ্ধ স্বর শোনা গেল "ফের যদি এসে চৌকাটে পা দাও, তাহ'লে লাথি মেরে দূর করে দোব।"

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

তিনরূপ।

—:*:—

স্বপ্নময়ী।

এসেছিলে তুমি জীবন-প্রভাতে
আমার কিশোরী প্রিয়া,
মোহ-অঞ্জনে রঞ্জিত আঁখি
কুসুম-পেলব হিয়া।
কল্পনা তুমি, সঙ্গীত তুমি,
স্বপন-কুহেলি-মালা,
উজাড় করিয়া মানস-কুঞ্জ
দিয়েছি অর্ঘ্য-ডালা।
ভবসাগরের এপার ওপারে
ভাসিল দুখানি তরি—
সহসা একটী কনক প্রভাতে
পরাণ উঠিল ভরি'।

প্রেমময়ী।

হে তরুণি, তব তরণী বহিয়া
আমার হৃদয়-কূলে,
এসেছিলে যবে কল্যাণময়ি,
বক্ষে নিয়েছি তুলে'।
শঙ্খ-কাঁকণে উঠিল বাজিয়া
লক্ষ্মীর জয়-গান,
গৃহবেদীমূলে জ্বলিল প্রদীপ,
জীবন করিলে দান।
তোমার নয়নে হেরিনু জগৎ,
বিশ্বে তোমারি হাসি,
প্রেম-ধ্রুবজ্যোতিঃ উঠিল ফুটিয়া,
মোহের কালিমা নাশি'।

প্রাণময়ী

জীবন-সন্ধ্যা আসিছে ঘনায়ে
সমুখে মিলন-রাতি,
কাল-পারাবারে জাগে বিধাতার
করুণ আশীষ-ভাতি।
মরণে মরিছে দেহের গরব;
প্রেমের উজল আলো
মরণ-কালিমা মুছিয়া ফেলিছে
কে বলে মরণ কালো?
দূরে দূরে কার মোহন বাঁশরী
যাচিছে জীবন-দান!
মিলনে সফল জনম মরণ
সফল এদেহ প্রাণ।

শ্রীসুকুমার দাসগুপ্ত।

টিকি।

—:-:—

কেঁচো, কৃমি প্রভৃতি প্রাণী কেশহীন ও অতি ক্ষীণশক্তি। শুঁয়াপোকাও ক্ষুদ্রজীব। কিন্তু তাহার অঙ্গ তীক্ষ্ণ রোমে আবৃত, এই কারণেই সে দুর্ব্বল হইয়াও দুর্দ্ধর্ষ। অতি নীচ বিছুটিও কতকগুলি শুঁয়ার সাহায্যে জীব জগতের ভীতিপ্রদ। ইহা হইতেই বুঝা যায় জীবের সমস্ত শক্তি এবং সমস্ত তেজ তাহার কেশে। সকলেই জানেন ব্রহ্মার চরণ হইতে শূদ্র, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় ও মুখ হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হয়, কিন্তু রূপে গুণে, বিদ্যা বুদ্ধি ও বীর্য্য পরাক্রমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহার কেশ হইতে। কারণ কেশই শক্তির আধার। তেজঃপুঞ্জশরীর মহর্ষিগণ দীর্ঘ জটা ধারণ করিতেন, স্বয়ং আদ্যাশক্তি মহামায়া আগুল্ফ বিলম্বিত কেশা, এবং শক্তিস্বরূপিণী নারী স্নিগ্ধ-বেণী-সাহচর্য্যে ত্রিভুবন-বিজয়িনী। স্যাম্‌সনের সমস্ত সামর্থ্যছিল তাঁহার চুলে, কেশ-চ্ছেদন না করিয়া চীনাগণ আজ আন্তর্জাতিক বিদ্রোহ-বাত্যায় বিধ্বস্ত।

তবে কি লম্বা চুল রাখিতে হইবে? রাখিলে ভাল হয়। কিন্তু আরো ভাল শিখা ধারণ করিলে। দেহজ তেজোরাশি প্রত্যেক কেশে সঞ্চরিত হইতেছে। এই বহুধা বিক্ষিপ্ত তেজঃ-কণিকাগুলিকে একটী মাত্র গুচ্ছে সংহত করিতে পারিলে তাহারা যে অধিক কার্য্যকরী হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। মাঠে তৃণ ত অনেক রহিয়াছে। তাহাদের শক্তি কি? কিন্তু একবার সবগুলিকে একত্র মিলিত কর, দেখিবে তাহারা মত্তহস্তীকেও সংযত করিতে পারে। সকলেই জানেন, একই জলধারা ৪ ইঞ্চি নল হইতে যে বেগে নির্গত হয়! দু'ইঞ্চি নল হইতে-- তদপেক্ষা অধিক বেগে এবং ১ ইঞ্চি নল হইতে তাহা অপেক্ষাও অধিকতর বেগে নির্গত হয়, এইরূপে তাহাকে যত অল্প পরিসরের মধ্যে পরিচালিত করা যায় তাহার শক্তিও তত অধিক হয়। সেইরূপ মানব-শরীরে সমস্ত তেজ শিখা মাত্রে সঞ্চিত হইলে অতিশয় শক্তিশালী হইয়া উঠে।

অন্যত্র কেশের যত অভাব শিখায় তেজের তত প্রাবল্য এবং শিখানিবদ্ধ তেজের প্রাবল্য যত বেশী শিখাধারীর তেজস্বিতা তত সুস্পষ্ট। অতএব বুঝা যাইতেছে, শ্মশ্রুল অপেক্ষা গুম্ফ শ্মশ্রুহীন কর্ত্তিত কেশ এবং তদপেক্ষা মুণ্ডিত মুণ্ড শিখাধারী অধিক তেজস্বী।

দেহজ তেজের কথা বলিয়াছি। এই তেজ আর কিছুই নহে, Electricity. শরীরস্থ তাড়িত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া স্বধর্ম্মানুসারে মস্তক ও পদ এই দুই প্রান্তে সঞ্চিত হয়। পদসংলগ্ন তাড়িত পৃথিবীগর্ভে লুপ্ত হইয়া যায় কাজেই এক কথায় বলা যাইতে পারে যে শরীরের সমস্ত তাড়িত শিরোদেশে ছড়াইয়া পড়ে এবং সুবিধা পাইলে টিকির ডগায় গিয়া উপস্থিত হয়। কারণ Electricity exceeds at points শিখা মস্তকের পশ্চাৎভাগে ঝুলিতে থাকে, এই নিমিত্ত তদগ্রভাগবর্ত্তী তাড়িতের অধিকাংশই মস্তিষ্কের নিম্নভাগ ও কশেরুকা মজ্জায় সংক্রামিত হয়। তবে কিয়দংশ যে আকাশে বিকীর্ণ না হয় এমন কথা বলা যায় না। এই ক্ষতি নিবারণের একমাত্র উপায় টিকিতে ফাঁস দিয়া তাহার ডগা মস্তকের দিকে ফিরাইয়া দেওয়া। এইরূপ করিলে, শিখাস্থিত তাড়িত, প্রাণশক্তিমূলক Medulla oblongata, spinal cardএর উপরিভাগ, চক্ষুশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়পরিচালক স্নায়ুগ্রন্থিসমূহ এবং মস্তিষ্ক তলদেশস্থ অন্যান্য প্রদেশে নিঃশেষে ব্যয়িত হয়। Medulla প্রভৃতি স্থলেই Electric brush discharge বাঞ্ছনীয় বলিয়া অনতিদীর্ঘ শিখা রাখিবার বিধি।

পুরাকালে ঋষিগণ ব্যাঘ্র বা মৃগচর্ম্মে উপবেশন করিতেন। এগুলি Non-conductor. কাজেই তাঁহাদের শরীর তাড়িতের কণামাত্রও বাহিরে যাইতে পারিত না, সমস্তটাই শিখা বা জটাপথে ফিরিয়া আসিত এবং এদিকে

আসনস্থ রোমরাজি হইতে অসংখ্য তাড়িত-প্রবাহ দেহমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইত। এই দুই প্রবাহের মধ্যে থাকিয়া তাঁহাদের তেজ এত অধিকমাত্রায় বাড়িয়া যাইত যে তাঁহারা দৃষ্টিমাত্র কাক, চিল প্রভৃতিকে ভস্মে পরিণত করিতে পারিতেন। কখনো কখনো তাড়িতবাহী তাম্রতন্ত্রান্তর্গত কার্বণ তন্তুর ন্যায় নিজেরাই দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেন এবং বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া নিমেষে ভস্মসাৎ হইতেন। ইহারই নাম সমাধি।

টিকি কেবলমাত্র শারীরিক তাড়িত সঞ্চয় করিবার Leydenjar বিশেষ নহে। উহা একপ্রকার হাতল। আমরা জানি, স্বর্গ উপর দিকে, নরক নিম্নে ও মর্ত্ত্য এই দুয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত। কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে দেবদূতগণ উপর হইতে নামিয়া আসিয়া প্রথমেই হাত দিবেন তাঁহার মাথায়। সেখানে বাগাইয়া ধরিবার মত একটি টিকি থাকিলে তাঁহারা অনায়াসে ঐ ব্যক্তিকে স্বর্গে লইয়া যাইতে পারেন। টিকির অভাবে তাঁহাদিগকে বড় বিব্রত হইতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে হয় তাঁহারা মৃত ব্যক্তিকে ফেলিয়া চলিয়া যান, না হয় ত তাঁহাকে উঠাইবার চেষ্টা করিয়া শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়েন এবং অর্দ্ধেক পথে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। বিপুলগুম্ফ ব্যক্তির পক্ষে স্বর্গের আশা বিড়ম্বনা। তাহাকে লক্ষকোটী জন্ম পরিভ্রমণ করিয়া মর্ত্ত্যলোকেই ঘুরিতে হইবে। আর যে দুর্ভাগা লম্বা দাড়ি রাখেন ও মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটেন তাহার দুর্গতির অন্ত নাই, কারণ তাহার Handle নীচের দিকে।

অতএব হে বন্ধুগণ, তোমরা আজ হইতে টিকি রাখ। যদি ঐহিক সুখ চাও তো টিকি রাখ, যদি পারত্রিক সুখ চাও তো টিকি রাখ। যদি বাঁচিতে চাও তো টিকি রাখ, যদি মরিতে চাও তো টিকি রাখ। টিকি ছাড়া উপায় নাই। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভের একমাত্র উপায় ওই গাছ কত চুল!

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়।

ফুলের বাজার।

—:*⊕*:—

চাঁপা ত নবীন ধনীর তনয়া
সুরভি দেমাকে ভরা,
'গাঁদা' রূপবান ধনীর তনয়
জানে না ক লেখাপড়া।
'জবা' আহা মরি পরা রাঙা শাড়ী
বরণ কালের বধূ,
'বুনো যুঁই বেলা' গরীবের বালা
শুধু বুক ভরা মধু।

'টগর' সরল পাড়াগেঁয়ে যুবা,
প্রৌঢ় 'গন্ধরাজ',
'আউচ' চাষার কিশোর তনয়
সভাতে বসিতে লাজ।

কৃষক-গৃহিণী 'নয়ন-তারা'টী,
বধূটী 'সন্ধ্যামণি',
'সেফালি' তাহার কন্যা দুলালী
রূপের গুণের খনি।

'পদ্ম,-করবী' নয় ত গরবি
আলো করে দুখী ঘর,
'নাগেশ্বরের' বড়ই বাহার
ভাল দোজবরে বর।

পরশিতে কারো হয় না সাহস
ফণি 'মনসার' ফুল,
ধনীর ঘরের পাস-করা-ছেলে
দরের নাহিক ভুল।

'গোলাপ' রূপসী সহরের মেয়ে
পাড়া গাঁয়ে হ'ল বিয়ে
ঘর যে মোটেই করিতে পারে না
মিলে দশজনে নিয়ে।

'অপরাজিতা'র মাঝে 'তরুলতা'
সহে উপহাস কত,
শাক্ত গৃহেতে বৈষ্ণবী বধূ
সদা খায় থতমত।

'মাধবী' 'মালতী' সতীন দু' বোন
কুলীন স্বামীর বাসে,
নাহি কোলাহল নাহি রাগারাগি
এক যায় এক আসে।

বিমল 'কমল' বড় বধূ ও যে
পূজা আয়োজন করে
শ্রোত্রিয়সুতা শত গুণযুতা
নিকষ 'ফুলের' ঘরে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

ভূত।

(১)

লাখিয়া ল্যাপ্চা বালিকা; চতুর্থ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মাতৃহীনা; তাহাকে দেখিয়া-শুনিয়া আদর-যত্নে পালন করিবার বড় কেহ ছিল না। পিতা বর্ত্তমান ছিল বটে, কিন্তু সে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিল। নব-পরিণীতা পত্নীর নবোজ্জল রূপরাশি, তদুপরি একটি এক বৎসরের শিশুর আধউচ্চারিত বাক্যাকাকলি, নধর অধরোদিত অস্ফুট হাস্য-লালিমা নীরবে বাদ সাধিয়া শনৈঃ শনৈঃ লাখিয়াকে স্নেহপ্রবণ পিতৃহৃদয় হইতে নির্ব্বিবাদে নিষ্কাসিত করিয়াছিল। মাতৃবিয়োগের পর প্রথম কয়েকটি বৎসর বালিকার যেরূপ সুখ স্বচ্ছন্দে কাটিয়াছিল, তাহা যদি তাহার ভাগ্যে একটানা থাকিয়া যাইত, তাহা হইলে ত কোন কথাই ছিল না। পত্নীবিয়োগবিধুর সামুলিয়ার (লাখিয়ার পিতার) শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে লাখিয়া তখন একমাত্র শান্তি, একমাত্র বন্ধন! সামুলিয়া কি তখন তাহাকে অযত্ন, অনাদর করিতে পারে! সামুলিয়া সংসারের সব বিসর্জ্জন দিয়া প্রাণের আবেগে তাহাকে প্রাণে প্রাণে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল; তাহার চক্ষে তখন আলোক আঁধার ছিল না, কাজকর্ম্ম সে ভুলিয়া গিয়াছিল। তাহার যাহা কিছু সকলি কন্যার ন্যস্ত করিয়াছিল। কন্যার চিন্তায়, কন্যার সেবাশুশ্রূষায়, তাহার দিবারাত্র কোথায় দিয়া কেমন করিয়া কাটিয়া যাইত। মুহূর্ত্তের তরেও সে কন্যাকে ক্রোড়চ্যুত করিতে সাহসী হইত না— পাছে সেও ছাড়িয়া যায়! কিন্তু হায়! এমন করিয়া মানুষের কয়দিন চলে! বহির্জ্জগতকে পায়ে ঠেলিয়া, এককে লক্ষ্য করিয়া, তুমি জীবনের দিনকটা কাটাইয়া দিবে, স্বার্থপর সংসারের চক্ষে তাহা নিতান্ত অসহ্য। উপেক্ষিতা জীব-প্রকৃতি রোষে ঘৃণায় ফুলিয়া-ফুঁসিয়া তোমার হঠকারিতার প্রতিশোধ লইতে প্রাণপণ করিবে। তাহার তুলনায় তোমার বল আর কতটুকু! সামুলিয়া আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না। বৈচিত্র্যহীন দুর্ব্বহ জীবন-ভার, অভাবঅভিযোগ একত্র যোগসাজস করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহার দৃঢ়তা ভাঙ্গিতে বসিল। কন্যাকে দিবারাত্র চোখে চোখে করিয়া বসিয়া থাকিলে তার ত আর চলে না। হয় ত অপরিমিত অপত্যস্নেহ সম্বল করিয়া তাহার শূন্যহৃদয় পূর্ণীকৃত হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু নিরন্নের শূন্যোদর পূর্ণ হইবার অন্যোপায় ছিল না। অভাবের তাড়নে, সামুলিয়াকে আবার শিকারে বাহির হইতে হইয়াছিল। সেদিনে তার কত কাতরতা, কত আশঙ্কা, কত চিন্তা, তাহার পরিশ্রম-পরিপুষ্ট বক্ষঃপঞ্জর বুঝি সেক্ষণে চূর্ণবিচূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, ক্রোড়চ্যুত বালিকার বিষাদ-কোমল মুখ-কমল কতবার তাহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়াছিল। পশুহননকারী শিকারী, গৃহপ্রত্যাবৃত্ত হইয়া, না জানি কতবার কন্যার মুখ চুম্বন করিয়াছিল।

কিন্তু তাহাতে কি? সে আবেগ-উচ্ছ্বাসের আয়ু আর কতক্ষণ? নিরবলম্ব লোষ্ট্রখণ্ডের ন্যায় সামুলিয়ার সে উচ্ছ্বাস অচিরাৎ ভূচুম্বন করিয়াছিল। নিত্য নব নব কার্য্যকলাপে তাহার স্থৈর্য্যবলকে বলি দিয়া, সে একদিন সহিষ্ণুতার শেষ সীমায় উপনীত হইয়া প্রকৃতই অনুভব করিয়াছিল,—'একা আর এ অসম্ভব সম্ভবে না, কন্যার যত্নের জন্যই অন্ততঃ আর একটি প্রাণীর আবশ্যক।' হৃদয়ের অন্তঃপুরে যে আর একটি গোপন-বাসনা কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহাকে আকুল করিয়া তুলিতেছিল সে তাহা বুঝিয়াও বুঝিল না। হায়! আত্মপ্রতারণা!

সামুলিয়া আবার বিবাহ করিল। তাহার ফলে সচরাচর যাহা ঘটে এক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। পিতার স্নেহশৈথিল্যের সহিত, বিমাতার ব্যবহার চরম উৎকর্ষতা লাভ করিয়া হতভাগিনী লাখিয়াকে গৃহ হইতে

পর্ব্বতের অধিকতর পক্ষপাতিনী করিয়া তুলিয়াছিল। বিমাতার হস্তে বারংবার উৎপীড়িতা হইয়া বালিকা তাহাকে তথাকথিত পার্ব্বতীয় প্রকাণ্ড ভূতটি অপেক্ষাও অধিকতর ভয় করিত। সৌভাগ্যক্রমে পিতার মেষ কয়েকটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাহার উপর অর্পিত হইয়াছিল। বালিকা দিনমান বনে বনে, উপত্যকায় উপত্যকায় মেষ চরাইয়া ফিরিত। জঠরজ্বালায় নিরতিশয় কাতর না হইলে গৃহে ফিরিত না। কখন বা পার্ব্বত্যতরুর আশীর্ব্বাদ সম্বল করিয়া দুই একদিন পর্ব্বতগুহায় কাটাইয়া দিত। ক্রমে গৃহ হইতে পর্ব্বত তাহার আপনার হইয়া পড়িল। প্রকৃতি-মাতা-লাঞ্ছিতা বালিকার সরল-সুন্দর শিশু-হৃদয়খানি তাঁহার উদার বক্ষে টানিয়া লইলেন; স্বভাবদুহিতা স্বভাবশোভায় সংসারের সব ভুলিতে শিখিল। বনানীর বিচিত্র শোভা, রাগরঞ্জিত কুসুমরাজির অপূর্ব্ব সাজ, নির্ঝরিণীর সুমধুর কুলু কুলু ধ্বনি, বিহঙ্গিনীর উন্মুক্ত আনন্দকাকলি, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি অধিকার করিয়া বসিল। ধূমল ধূসর মেঘদল যখন নীল ললাম গিরিশির বেষ্টন করিয়া দুলিয়া দুলিয়া ঘুরিয়া নাচিত, বালরবির কনক-কিরণ যখন রজত-ধবল, তুষার-কোমল শৈলবক্ষে স্বর্ণস্নেহ ঢালিয়া দিত, সুখে 'সুখিনী শিখিনী' যখন নৃত্য করিতে থাকিত, আয়তলোচনা কুরঙ্গবালা যখন বিস্ফারিত নেত্রে সে শোভা নিরীক্ষণ করিয়া সদ্যোজাত শ্যামল সুমিষ্ট শষ্পাস্বাদন তুচ্ছ করিত, লাখিয়াও তখন আত্মহারা হইত—প্রকৃতিপ্রাণা বালিকা তখন সে শোভা হইতে নয়ন ফিরাইতে পারিত না। সে ধীরে ধীরে নির্ঝরিণী কূলে শিলাখণ্ডে বসিয়া পড়িত। অযত্ন বর্দ্ধিত কেশদাম লইয়া সমীরণ ক্রীড়া করিত; কুসুমপ্রিয় অসভ্য বালিকার সাধের কুসুমভূষণ কেশচ্যুত হইয়া ভূমিতে লুটাইত। সে কিছুই লক্ষ্য করিত না।

এম্‌নি করিয়া আরও কয়েকটি বৎসর কাটিয়া গেল; সেই সঙ্গে লোকলোচনের অন্তরালে বালিকার বাল্য অবয়ব কেমন করিয়া কোথায় লুকাইল কে জানে। তৎ পরিবর্ত্তে তাহার পরিপুষ্ট অঙ্গে অঙ্গে কে যৌবনতরঙ্গ ঢালিয়া দিল। লাবণ্যমাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়া কে তাহাকে বরেণ্য সুন্দরীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিল,—তাহার পারি-পার্শ্বিক জড়জগতকে এমন সুন্দর মধুর করিয়া তুলিল। সহসা এক বাসন্তী প্রভাতে শাল-শাখে কোকিল কুহরিয়া উঠিল; ভ্রমরদল গুঞ্জরিতে গুঞ্জরিতে কুসুম বনে উড়িয়া গেল; বন্যকুক্কুট মুখরিত হইয়া তাহার প্রনয়িণীর পাশে নাচিতে লাগিল। জগৎ এক অভিনব রসে মাতিয়া উঠিল। লাখিয়া মর্ম্মেমর্ম্মে সে যুক্ত-সৌন্দর্য্যপ্রভাব অনুভব করিল, কিন্তু কেন এমন হইল তাহা কিছুই বুঝিল না। সে আনমনে একটি প্রস্ফুটিত কুসুমকে চুম্বন করিল; কতকগুলি ফুল তুলিয়া ফুল সাজে সাজিল। সেই পথ দিয়া একটি দুষ্ট বালক যাইতেছিল; লাখিয়ার বেশবিন্যাস দেখিয়া সে বলিল "পাগলী, বে কর্‌বি?" লাখিয়া ঘার বাঁকাইয়া বলিল "ছি!"

(২)

"বাবা গো মলুম গো প্রাণ গেল।"

প্রভঞ্জনের গর্ব্বিত প্রবল কণ্ঠে, ক্ষীণকণ্ঠ যোজনা করিয়া কে যেন গোঙ্গরাইয়া গোঙ্গরাইয়া আর্ত্তস্বরে কহিল, "বাবা গো মলুম গো প্রাণ গেল।" প্রাণ যাইবারই কথা। সে বড় দুর্দ্দিন; ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি! দিকে দিকে কেবল সূচীভেদ্য অন্ধকার, প্রবল বাত্যায় শোণিতশোষণকারী সন্‌ সন্‌ শব্দ, বৃক্ষ পতনের মড়মড় ধ্বনি, জীমূত-মন্দ্রের কড়কড় গর্জ্জন। প্রলয় কালে বাসুকী যেন সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া রোষে ফুলিয়া ফুলিয়া ফোঁপাইতেছে! তাহার প্রতিশ্বাসে বিশাল শালতরু ক্ষুদ্র এরণ্ডের ন্যায় দুলিতেছে। মড়মড় মরাৎ শব্দে একটি শাল বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গেই সেই কাতর আর্ত্তনাদ! হতভাগ্য বৃক্ষ সংঘাতে নিষ্পেষিত হয় নাই ত!

দুই প্রহর অতীত হইতে না হইতেই, আজ একখণ্ড কৃষ্ণমেঘ গগনের ঈশান কোণে দেখা দিয়াছিল। ক্রমে দিগম্বরী অম্বরে তাহার সুচিক্কন কেশদাম এলাইয়া দিয়া ঘোর তাণ্ডবে মত্ত হইল; ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ বিকট হাস্যে হাসিতে লাগিল। সুদূর গগনচারী শ্যেন শকুনি ত্রাস পাইয়া সশব্দে নক্ষত্রবেগে ধরাপৃষ্ঠে নামিয়া আসিল; পাখী গান ছাড়িয়া আশ্রয় অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। শ্বাপদকুল ঘোর বনে গিয়া লুকাইল। অসভ্যগণ গতিক ভাল নয় বুঝিয়া মেষপাল সহ কুটিরে ফিরিয়া আসিল। কেবল লাথিয়ার সে চিন্তা ছিলনা। অন্যের যাহাতে ত্রাস তাহাতে তাহার আনন্দ। সে নির্ঝরিণী কূলে শিলাখণ্ডে বসিয়া কাদম্বিনীর উদ্দামনৃত্য দেখিতেছিল। কাদম্বিনী কেমন জলোকার ন্যায় কুঞ্চিত দেহ প্রসারিত করিয়া, লম্ফে লম্ফে গগনতল ছাইয়া ফেলিতেছিল। মায়াবিনী কেমন পলে পলে করি কুরঙ্গের রূপ ধরিয়া রঙ্গভঙ্গে বিভ্রমবিলাসে মাতিতেছিল; সুনীল পর্ব্বতগাত্রে আপন কৃষ্ণদেহ মিশাইয়া-দিয়া কেমনে 'লুকোচুরী' খেলিতেছিল, লাথিয়া তাহা অনিমেষ নয়নে নয়নপ্রাণ ভরিয়া দেখিতেছিল। ভাবে বিভোর হইয়া ভ্রমেও সে ভাবিতে পারে নাই যে এই চঞ্চলা প্রখরা, মধুরা কাদম্বিনী হইতে কখন কোন বিপদ হইতে পারে। কিন্তু অপ্রতিহত বারি পতনে যখন লাথিয়ার সে মোহ ভাঙ্গিয়া গেল, তখন সে সহজেই বুঝিতে পারিল কাজটা অতি গর্হিত হইয়া গিয়াছে। মানস-রাজ্যে নৈসর্গিক শক্তির প্রভাব যেরূপই হউক, এই পঞ্চভৌতিক দেহযষ্টির উপর তাহার প্রভাব যে অসীম তাহা স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর নাই!

লাথিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বন্যহরিণীর ন্যায় দ্রুতপদে সে পিতৃগৃহ পানে ছুটিল কিন্তু প্রবল প্রতিকূল বায়ু তাহাকে প্রতিপদে বাধা দিতেছিল। তবু সে সাহস হারায় নাই; প্রাণপণে সে নামিতেছিল, সহসা সে থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পদতলে কি যেন একটা শীতল কোমল পদার্থের স্পর্শ অনুভব করিয়া স্ফুরিত বিদ্যুতালোকে সে দেখিল,—মনুষ্যের একটি মৃত দেহ! দুরদৃষ্টপীড়িতা লাথিয়া পথিকের শোচনীয় পরিণামে বিচলিতা হইল; দেহটী একবার ভাল করিয়া পরীক্ষা না করিয়া, তাহার সে স্থান পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি হইল না—'বস্তিতে' সে, বৈদ্যকে মূর্চ্ছিতের পরীক্ষা করিতে দেখিয়াছে। অতি সাবধানে সে তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া দেখিল। প্রখর শীতবাতে তাহার হস্তপদও হিমানী-শীতল হইয়া গিয়াছিল; সে কিছুই অনুভব করিতে পারিল না; নাসিকা স্পর্শে বুঝিল নিশ্বাস নাই, হতাশহৃদয়ে লাথিয়া তাহার মুখগহ্বরে অঙ্গুলী প্রবিষ্ট করাইয়া দিল, দন্তে দন্ত কঠিন ভাবে লাগিয়াছে, দন্তোদ্ঘাটনের সহিত একটি বিলম্বিত দীর্ঘশ্বাস পতিত হইল। লাথিয়া তথায় আর দণ্ডমাত্র অপেক্ষা না করিয়া মুমূর্ষুকে অবলীলাক্রমে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া শিকার পৃষ্ঠে তেজস্বিনী শার্দ্দূলীর ন্যায় গিরি অবতরণ করিল।

অসভ্যেরা আর যাহাই হউক তাহারা নিরতিশয় অতিথিসৎকারপরায়ণ। লাথিয়ার পিতা পথিকের আকস্মিক বিপদে ক্ষুণ্ণ হইল, পরিবারস্থ সকলে মিলিয়া প্রাণপণে পথিকের সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিল। বস্তির ভূতপ্রেত-মন্ত্রবিশারদ বৈদ্যরাজকে আহ্বান করিতে তাহারা বিস্মৃত হইল না। বৈদ্যের গুণে না হউক, তাহাদের শুশ্রূষার গুণে পর দিন প্রভাতে পথিকের জ্ঞানসঞ্চার হইল। পথিক ক্রমে উঠিয়া বসিলেন। তাহা দেখিয়া একখানি উদ্বেগ-উদ্বেলিত বদন-কমল উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। রোগীশয্যাপার্শ্বে একটী সুন্দরী যুবতী রোগী-শুশ্রূষায় নিযুক্তা ছিল; সে রোগী উঠিয়া বসিয়াছে দেখিয়া স্মিত মুখে জিজ্ঞাসা করিল, 'সাহেব শরীর এখন কেমন বোধ হইতেছে?' সাহেব কোন উত্তর দিলেন না বা দিতে পারিলেন না। বুঝি তাঁহার দুর্ব্বল হৃদয়ে পলকে একটা নবব্যাধি অস্তিত্ব লাভ করিয়া তাঁহার দুর্ব্বল মস্তিষ্ককে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল! কি জানি কেন যেন তিনি আবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়া পড়িলেন! কেন?—যুবতীর রূপ ধ্যান করিতে? ছি! তিনি যে কৃতজ্ঞ! তাহাতে আবার তিনি খৃষ্টধর্ম-প্রচারক সুসভ্য মিশনারী!

মিশনারী সাহেব আরও ক'টা দিন অসভ্য কুটীরে কাটাইয়া দিলেন। অচিরাৎ তাঁহার সে পর্ণকুটির পরিত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি ছিলনা। রোগমুক্তির সহিত তাঁহাকে নিজ কুঠীতে ফিরিতে হইল কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে যে গুরুব্যাধি বাসা বাঁধিয়াছিল, তাহা বুঝি সারিবার নয়।

(৩)

মিশনারীপ্রবরকে সাহেব বলিলে একটা সত্যের অপলাপ করা হয়। তাঁহাকে খাঁটি ইংরেজ বলিয়া অভিহিত করিতে পারিলে এ পক্ষের বিশেষ আপ্যায়িত হইবার আশা থাকিলেও, তাঁহার পরলোকগত পূর্ব্বপুরুষগণকে সে আখ্যা প্রদান করিয়া অভিসম্পাতগ্রস্ত হইবার ভয়ে সাহেবকে বিচিত্র বঙ্গভূমির অভিনব ফল স্বরূপ বর্ণনা করিতে হইতেছে। দ্বিদশ বৎসর পূর্ব্বে যে বালক একদিন গুরুমহাশয়ের শুভ শাসন-দণ্ডের প্রভাবে গ্রাম্য উদ্যানের বৃক্ষে বৃক্ষে বিচরণ করিয়া একটা কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সঞ্জীবিত করিয়া তুলিত, কয়েক বৎসর পরে, বিলাতি বাক্‌দেবীর কণামাত্র কৃপা লাভ করিয়া কিরূপে সে ইংরাজাধিক ইংরেজ বনিয়া গেল তাহা আলোচ্য হইলেও অসম্ভব নহে, কারণ প্রাণী-তত্ত্ববিদ্‌গণ স্পষ্টই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে সামান্য কীট হইতেই সুন্দর প্রজাপতির উৎপত্তি। শত্রুগণও প্রকারান্তরে তাহাই স্বীকার করিয়া বলিয়া থাকে তিনি নাকি মধুব্রতের ন্যায় পুষ্পবিশেষে আকৃষ্ট হইয়া পুরুষপরম্পরা পাপ-দূষিত শোণিত সুপবিত্র ক্রুস্ বহনে পবিত্রীকৃত করিয়াছেন। যে যাহাই বলুক কৃষকরচিত হিন্দুধর্ম্মের অসারত্বই যে তাঁহার ধর্ম্মান্তর গ্রহণের মূল কারণ তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ করিবার কিছু নাই, কারণ অসভ্যোচিত পূর্ব্ব নামটী পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হওয়াই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁহার নাম ছিল শ্রীরাধারমণ রায়। রায়, ধুতি ছাড়িয়া প্যাণ্ট ধরিবার সঙ্গেসঙ্গেই শ্রীহীন হইয়া মিষ্টর চড়াইয়া সভ্যোচিত অন্নপ্রাশনের সহিত স্বয়ং নামকরণ করিলেন,—মিষ্টর আর, রোম্যান রে। কিন্তু সুসভ্য রে সাহেবকে কুল ত্যজিয়া অকূলে ভাসিতে হইল। যাহার চাকচিক্যে অপরিণামদর্শী উশৃঙ্খল যুবক এ দুষ্কার্য্য করিয়াছিলেন, দুদিনেই তাহা নিষ্প্রভ হইয়া গেল। কয় দিন মাত্র আদর করিয়াই তাঁহার দীক্ষাদাতা পাদরী সাহেবটী পর্য্যন্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। অনেক কষ্টে অনেক অনাহার উপবাসের পর তাহার এই প্রচারকের পদ সংগৃহীত হইয়াছিল। পরিচিত মুখহীন অসভ্য পার্ব্বতীয়জাতীর মধ্যে একা অবস্থান করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্ম বিলাইয়া ফিরিতে হইত। ইহাতে তাঁহার আপত্তির কারণ ছিল না, কারণ দৈন্য হইতে দুঃখ ভাল; আত্মীয়ের উপেক্ষা হইতে অসভ্যের আদরও মধুর!

দিন ত এম্‌নি কাটিতেছিল, সহসা সেই প্রবল প্রভঞ্জন তাহাকে এমন করিয়া গেল কেন! তাহার ত আর কিছুই ভাল লাগে না। প্রচারকার্য্য কালকুট বিষে পরিণত হইয়াছে, গৃহ শ্মশান হইয়াছে। প্রচারক হৃদয়ের ব্যথা প্রচার করিতে নীরবে তাঁহার দুঃখনিদান পর্ব্বতে ঘুরিয়া বেড়ান; লাথিয়া যে তাঁর পর্ব্বতবাসিনী। লাথিয়া—অপ্সরাবিনিন্দিতা সুন্দরী লাথিয়া, কবে তাঁহার আপনার হইবে!

(৪)

একগাছি পদ্মের মালা, একটি পুষ্পস্তবক, একখানি সুরঞ্জিত প্রাকৃতিক চিত্রাবলী, আরও কত কি সুদৃশ্য চটুল বিলাস দ্রব্য-সম্ভার পার্শ্বোপবিষ্টা যুবতীকে উপহার দিয়া, যুবক হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "এ ত অতি তুচ্ছ, তাহার অন্যান্য ঐশ্বর্য্যের তুলনায় এ ত ছার—কিছুই না। লাথিয়া! লোকে স্বর্গকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বলে, সুখের বলিয়া বর্ণনা করে, সে স্থান বুঝি স্বর্গ অপেক্ষাও আরও সুন্দর [illegible] বল, ফল বল, গৃহ অট্টালিকা যাহাই বল, সেখানে যাহা আছে, তাহাই আশ্চর্য্য, তাহাই মনে [illegible] নাই সংসারে জোড়া নাই। [illegible] তোমার কি দেখিতে ইচ্ছা হয় না লাথিয়া?"

স্তম্ভিতা লাথিয়া মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল 'হাঁ।'

এমন সুন্দর সুগন্ধি সুষম সুদৃশ্য উপহার-উপকরণ তথাকার অন্যান্য বস্তুর তুলনায় তুচ্ছ! বনবাসিনী তাহা কল্পনায় আনিতে পারিল না। তাহার সৌন্দর্য্যলুব্ধ ক্ষুদ্র হৃদয় তথাকার কল্পিত সৌন্দর্য্য প্রভাবে ভাসিয়া গেল— সে মাথা নাড়িয়া যুবকের বাক্যের উত্তর দিল, 'হাঁ।'

যুবক বলিলেন. "তবে আর বিলম্ব করিয়া ফল কি? সম্মুখে বড়দিন। সে স্থানের প্রধান উৎসব। সেদিন সেখানে কি মহাসমারোহ। পত্রপুষ্পপতাকায় সজ্জিত হইয়া সে দেশ সেদিন কি অপূর্ব্ব শোভায় সাজিবে, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বুঝিবার নয় লাথিয়া! বড়দিনের পূর্ব্বেই তথায় যাইতে হইবে। কল্য প্রত্যূষেই রওয়ানা হইব। কি বল?"

রেশমকীট আত্মসূত্রে বদ্ধ হয়, পর্ব্বতচারিণী স্বাধীনা হরিণী বংশী রবে আপনি মজে; প্রকৃতিদুহিতা লাথিয়ারও বুঝি তাহাই হইল। তাহার অদম্য সৌন্দর্য্যপিপাসা তাহার কাল হইয়াছে। বাকপটু যুবকের বাক্যজালে সে ধরা পড়িয়াছে। রাধিকারমণ আজ একবৎসর ধরিয়া, স্বরে মধুর মরেম দিয়া নানাভাবে বিনাইয়া বিনাইয়া লাথিয়াকে তাঁহার দেশের কথা শুনাইতেছেন। একটা পার্থিব স্বর্গরাজ্যের ছবি তাহার মানসনয়ন সমক্ষে প্রতিভাত করিয়া তুলিয়াছেন। যুবক বর্ণিত সুরঞ্জিত সুষম পুষ্পরাজি, সুসজ্জিত বিপণীশ্রেণী, গগনভেদী সৌধমালা, অধিবাসীগণের শান্তিময় (!) জীবনী একত্র মিলিত হইয়া লাথিয়ার হৃদয়রাজ্যে যে এক অভিনব রাজ্য সৃজন করিয়াছে, সৌন্দর্য্যপিপাসু সরলা তাহা বাস্তবে পাইতে অধীরা হইয়া পড়িয়াছে। এমনি হয়। মানুষের জীবনে বুঝি শয়তানের অভিসম্পাত আছে; নতুবা মানুষ বর্ত্তমান অবস্থায় এত অসুখী হয় কেন; বাস্তব অপেক্ষা কাল্পনিক জগতকে এত মধুর বলিয়া কেন মনে করে!

(৫)

লাথিয়া সবে কয়েক দিবস হইল রাধারমণের সহিত কলিকাতা আসিয়াছে। এই তাহার কল্পনার রাজ্য; যুবক বর্ণিত পার্থিব-স্বর্গ। স্বর্গে আসিয়া লাথিয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে কেন? এমন সহর, এমন যাদুঘর, এমন পশু-বাটিকা, ইডেনউদ্যান, সৌধঅট্টালিকা দেখিয়া সে কেন চক্ষু মুদ্রিত করে! অসভ্যা লাথিয়া এ সকলের মহিমা কি বুঝিবে! তাহার অশিক্ষিত হৃদয় সেই উদার-উন্মুক্ত হিমালয়ের জন্য কাঁদিয়া উঠিয়াছে! কৈ! যাহা তাহার নিতান্ত আপনার, যাহাতে তাহার অসীম আনন্দ, তাহার তাহারা কৈ এখানে! মস্তকোপরি অনন্ত আকাশ, পর্ব্বত অঙ্গে মেঘমেখলা, শাখে শাখে সুখিনী শিখিনী, দলে দলে পতঙ্গবালা, সচকিতা কুরঙ্গকামিনী, কুলু কুলু-নাদিনী নির্ঝরিণী, কোথায় তাহারা? প্রাচীর বেষ্টিত কয়েদির মত বদ্ধরুদ্ধ হইয়া সে আর কয়দিন বাঁচিবে! লাথিয়ার কেবলি কান্না পায়। এক একবার তাহার মনে হয় এদেশ হইতে উড়িয়া পলাই; আবার ভয় হয়, কোথায় যাইবে! কেমন করিয়া যাইবে! পলায়ন করিলে সাহেবই বা কি ভাবিবে। লাথিয়া কেবল ভাবে, আর লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদে।

কবি বলেন,—'দুঃখ বালুকাবাঁধ অবরোধিত অনন্ত সাগর।' একবার যদি সে বাঁধে একটু ছিদ্র হয়, তবে আর পরিত্রাণ নাই, শতছিদ্র সৃজিত হইয়া [illegible] বারি প্লাবনে পরপার ভাসিয়া যায়!

লাথিয়ার হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়া [illegible] ?—যুবতী [illegible] বার নব নব ছিদ্র অস্তিত্ব লাভ করিয়া তাহাকে অকূল পাথারে ভাসাইল। মধুব্রত-ব্রতী উন্মুখ [illegible] মী! [illegible] হ বাড়িয়া সুদৃশ্য খেলনা সদৃশ্য সুন্দরী লাথিয়াকে

দুইদিনের জন্য সাদরে হৃদয়ে তুলিয়া লইয়াছিলেন। নূতন আর একটি খেলনা লাভ করিয়া ক্রন্দনরতা অসভ্যাকে গৃহকোণে নিক্ষেপ করিলেন। রাধারমণ প্রকাশ্যে লাথিয়াকে কিছু বলিতে সাহস করিলেন না; গোপনে এক সভ্যা মিসের সহিত তাঁহার 'কোর্টসিপ' চলিল।

লাথিয়ার তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না; সে অসভ্যা হউক,—নারী। তাহার সাংসারিক জ্ঞান তেমন ছিল না সত্য কিন্তু পিতৃভবনে প্রায় তুল্য দৃশ্যে তাহার অদৃষ্টে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিল! পুরুষের নারীপ্রীতির কি পরিণাম, তাহা সে জানিত। যে তৃণগাছটী সম্বল করিয়া সে সকলি সহ্য করিতেছিল, তাহাও ছিন্ন হইতে চলিল। ব্যভিচার!—লাথিয়া শিহরিল। এক মুহূর্ত্তও আর সে পাপপুরীতে তাহার প্রাণ থাকিতে চাহিল না। লাথিয়া অনন্ত দুঃখের বোঝা মাথায় করিয়া, অজস্র লোকপ্রবাহে মিশিয়া গেল। গমনকালে একবার তাহার মনে হইয়াছিল, যে সে সাহেবকে বলিয়া যায়, "খৃষ্টান! এই কি তোমার ধর্ম্ম! এই কি তোমার সভ্যতা, আমার অসভ্য প্রতিবাসী তোমা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ!"

দুঃখিনী লাথিয়ার কি হইল? সে কোথায় গেল? তাহা আমরা বলিয়া আপনাকে কাঁদাইব না। অদৃষ্ট নিপীড়িতা প্রাস্কোভিয়ার যাত্রা হইতেও যেন লাঞ্ছিতা লাথিয়ার যাত্রা আরও দুঃখের, আরও ক্লেশকর!

(৬)

মিষ্টর রোম্যান রের মিসের সহিত বনিল না। তিনি আবার হতাশ হৃদয়ে, প্রচার কার্য্যে শৈলবাসে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এবারে পশার তেমন জমিল না। অসভ্যেরা এবারে আদৌ তাহার বক্তৃতায় মন দেয় নাই। তাহারা একটা দুর্দ্দান্ত, অজেয় ভূত লইয়া ভারি ব্যস্ত। পাহাড়ে পাহাড়ে, দেবতাশ্রিত বৃক্ষে বৃক্ষে তাহারা কেবল বন্য কুক্কুট বলি দিয়া ফিরিতেছে, মন্ত্র তন্ত্রের আদ্যশ্রাদ্ধ করিতেছে!

নিরুপায় রায়কে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রেত নির্য্যাতনের ভার লইতে বাধ্য হইতে হইল; নতুবা যে মিশন হইতেও বহিষ্কৃত হইতে হয়! রায় অসভ্যদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন, "প্রভু ঈশের আদেশ; তিনিই ভূত তাড়াইবেন।"

পৌর্ণমাসী রজনী; বিগলিত রজতকিরণ পত্র, পুষ্প, নির্ঝর, পাহাড়ে পতিত হইয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। এ হেন সময়ে শ্বাপদশ্রেষ্ঠ হিংস্রক মানব কাহার প্রাণ লইতে অপেক্ষা করিতেছে। রাধারমণ কয়েকটি পাহাড়ীরায় সহিত ভূতের প্রতীক্ষায় রিভলভার হস্তে বসিয়া আছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল, তবুও ভূতের দেখা নাই। বুঝি বা ভূতও ভয় পাইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রহরের শেষে ভূত দেখা দিল; ধীরে ধীরে আসিয়া নির্ঝরিণী কূলে শিলাখণ্ডে আসিয়া বসিল। এই উত্তম সুযোগ! রায় গুলি করিলেন। ভূত, নির্ঝরিণীর বক্ষে ঢলিয়া পড়িল। রায় সোৎসাহে শিকার সন্নিধানে দৌড়িয়া গেলেন কিন্তু শিকার দেখিয়া অমন বিবর্ণ হইয়া গেলেন কেন? হা! নৃশংস নিষ্ঠুর! যাহার সর্ব্বস্ব লইয়াও তৃপ্ত হও নাই, তাহার প্রাণ লইয়া সে পিপাসা মিটিল কি?

বলাবাহুল্য ভূত হতভাগিনী লাথিয়া ব্যতীত আর কেহই নহে।

৺

বঙ্কিম-প্রশস্তি।*

—:*:—

(১)

আজিকে তোমার জনমবাসরে প্রণমি তোমারে হে গুরু আর্য্য,
আজি বঙ্গের সফল যজ্ঞে তোমার অর্ঘ্য অপরিহার্য্য।
মন্ত্রদ্রষ্টা হে নবস্রষ্টা এ জাতি তোমার প্রধান সৃষ্টি,
ধ্যানের আকাশে চিন্ময়ধনে হেরেছে তোমার গরুড়দৃষ্টি।

(কোরাস্)

বঙ্গহৃদয়পঙ্কজরবি ঐ বাজে তব বিজয়ডঙ্কা,
বঙ্কিম তব অমৃত আলোকে ঘুচেছে অনৃতাতামিরশঙ্কা।

(২)

কলাজগতের তুমি প্রজাপতি কল্পনা তব গৃহিনী ধন্যা,
প্রতাপ কুন্দ রমা প্রফুল্ল মৃণ্ময়ী তব পুত্র কন্যা।
সত্য হইতে পরমসত্য তোমার সৃষ্টি এ মায়াবিশ্ব,
নিত্য হইতে পরমনিত্য দিয়াছ দীক্ষা যতেক শিষ্যে।

(কোরস্)

বঙ্গহৃদয়পঙ্কজরবি ঐ বাজে তব বিজয়ডঙ্কা
বঙ্কিম তব অমৃত আলোকে ঘুচেছে দেশের অনৃতশঙ্কা।

* কোচবিহার সাহিত্য-সভার বিশেষ অধিবেশনের সাহিত্যগুরু স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের একাশীতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে পঠিত।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সাহিত্যগুরু স্মৃতিরক্ষার্থ একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠায় কৃতকল্প হইয়া বঙ্গবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের অনুরোধ পত্র নিম্নে মুদ্রিত করিলাম—আশা করি সকলেই যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিয়া—এই মহৎ কার্য্যের সহায়তা করিবেন। সঃ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পত্র—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে। আনুমানিক কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র টাকা ব্যয় করিলে উক্ত মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইতে পারিবে। ভাস্করকে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে বলা হইয়াছে। প্রোক্ত উদ্দেশ্যের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি পরিষদের সদস্যগণের নিকট এবং সহৃদয় বঙ্গবাসী মাত্রেরই নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যিনি যাহা দিবেন, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং যথারীতি সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে। সাহায্যের টাকা নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে। ইতি—

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

(৩)

গৃহকোণে তুমি গোপনছদ্মে সেজেছ পাগল কমলাকান্ত,
বনমঠে তব হে ভীমকান্ত হেরেছি স্বরূপ রুদ্র শান্ত;
আমাদেরি মাঝে বাঁধিয়াছে ঘর তোমার যতেক মানসপুত্র,
ত্যজেছ ভূলোক বুকে বাঁধা তবু আছে পদাব্জমৃণালসূত্র।

(কোরাস্)

বঙ্গহৃদয়পঙ্কজরবি ঐ বাজে তব বিজয়ডঙ্কা,
বঙ্কিম তব অমৃত আলোকে ঘুচেছে দেশের অনৃতশঙ্কা।

(৪)

বঙ্গসমাজমরমবেদনা নিয়ত তোমার পীড়িল বক্ষ,
শত "বারুণী"তে করে ছল ছল ঢালিল যা তব নয়নপক্ষ্ম।
বাণীর মরালী করে তাহে কেলি তীরে তীরে নীতিবেতসকুঞ্জ,
গীতামন্ত্রের সান্ত্বনা তাহে ফুটে আছে হয়ে সরোজপুঞ্জ।

(কোরাস্)

বঙ্গহৃদয়পঙ্কজরবি ঐ বাজে তব বিজয়ডঙ্কা,
বঙ্কিম তব অমৃত আলোকে ঘুচেছে দেশের অনৃতশঙ্কা।

(৫)

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা মার পায়ে দেছ বুকের রক্ত,
দশভুজা বাণী রমারূপে তাঁর দেউলে দেউলে হেরেছ, ভক্ত।
পুরোহিত তুমি শিখায়ে দিয়াছ দেশজননীর পূজার মন্ত্র,
বাঙালীরে তুমি দেছ ঋষিবর নব শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র।

(কোরাস্)

বঙ্গহৃদয়পঙ্কজরবি ঐ বাজে তব বিজয়ডঙ্কা
বঙ্কিম তব অমৃত আলোকে ঘুচেছে দেশের অনৃতশঙ্কা।

(৬)

গতানুগতিক জনদলে তুমি তুলি বিদ্রোহবৈজয়ন্তী,
আত্মাগুহার আহিত পুরুষে জাগায়ে তুলেছ স্বকৃতপন্থী।
চিনিতে শিখেছে অন্ধ প্রমাদে দেশবাসী তব সাধনা যত্নে
খনি খাত খুঁড়ে গিরিদরী চুঁড়ে আহরি' এনেছ সত্যরত্নে।

(কোরাস্)

বঙ্গহৃদয়পঙ্কজরবি ঐ বাজে তব বিজয়ডঙ্কা
বঙ্কিম তব অমৃত আলোকে ঘুচেছে দেশের অনৃতশঙ্কা॥

শ্রীকালিদাস রায়।

স্বরলিপি।

কথা—শ্রীকালিদাস রায়। স্বরলিপি ও সুর—শ্রীসতীশচন্দ্র মুস্তফী।

ইমনকল্যাণ তাল—একতাল্‌।

(এককণ্ঠ)

০ ১ ২ ৩ ০

ক্ষা-পা পা | -রা গা গা | গা-মা মা | সা সা সা | ন্‌সা-সা রা | ধ্‌সা-না গা | ক্ষপা-সা রা

আ জি যে তো মা র জ ন ম বা স রে প্র॰ ণ মি তো॰ মা রে হে॰ গু রু

স ব ণ স মা জ ম র ম বে দ না নি॰ স্ব তো॰ মা য় পী॰ ড়ি ল

৩ ০ ১ ২ ৩ ০

গা-া পা ‖ সা ধ্‌ না | রা পা গা | সা-রা রা | সা-রা গা | ক্ষা পা ধা | পা গা পা | গা সা রা |

আ॰ র্য্য আ জি ব ন্‌ গে র স ক ল য॰ জ্ঞে তো মা রি অ র্‌ ঘ্য অ প রি

ব॰ ক্ষ প ত "বা রু ণী"তে ক রে ছ ল ছ ল চা লি ল হা ত ব ন য় ন

৩ ০ ১ ২ ৩ ০ ১

গা-া গা ‖ গা-ক্ষা পা | ক্ষা-পা পা | ধা পা গা | -ক্ষা পা পা | গা পা সা | রা গা গা |

আ॰ র্য্য ম ন্‌ ত্র দ্র॰ ষ্টা হে ন ব স্র॰ ষ্টা এ জা তি তো মা র্‌

প॰ ক্ষ বা ণী র ম রা লী ক রে তা হে কে লি তী রে তী রে নী তি

২ ৩ ০ ১ ২ ৩ ০ ১

না-সা সা | রা-া রা | ন্‌-সা রা | সা-রা গা | রা গা ক্ষা | -ক্ষা পা পা | গা-মা রা | ন্‌ সা সা |

প্র ধা ন্‌ সৃ॰ ষ্টি ধা নে র আ কা শে চি ণ্‌ ম য় ধ্যা নে হে রে ছে তো মা র্‌

বে ত স কু॰ ঞ্জ গী॰ তা ম ন্ত্রে র সা॰ স্ব না তা হে ফু টে আ ছে হ য়ে

(বহুকণ্ঠ)

২ ৩ ০ ১ ২ ৩ ০

ন্‌ সা রা | গা-া গা ‖ র্গা-র্রা না | র্সা-া র্সা | না-া পা | ধা পা-া | ক্ষা পা ধা |

গ রু ড় দৃ॰ ষ্টি ব ন্‌ গ হৃ দ য় পং॰ ক জ র বি ঐ॰ দা |

স রো জ পু॰ ঞ্জ

১ ২ ৩ ০ ১ ২ ৩

না ক্ষা পা | ধা না র্সা | র্সা-া র্সা | ধা-া পা | ক্ষা পা -া | র্সা না পা | ক্ষা-পা পা |

জ্ঞে ত ব বি জ য় ডং॰ কা বং॰ কি ম ত ব অ মৃ ত আ লো কে

(এককণ্ঠ)

০ ১ ২ ৩ ০ ১ ২ ৩ ০

পা-া রা | গা-া সা | ন্‌ সা রা | গা-া গা ‖ ক্ষা ক্ষা পা | পা পা-া | মা ক্ষা পা | ধা ধা ধা | র্সা না ধা |

ঘু চে ছে অ নৃ ত তি মি র শং॰ কা ক লা জ গ তে র তু মি প্র জা প তি ক ল্‌ প

দে শে র অ নৃ ত শং॰ কা সু জ লা সু ফ লা শ॰ স্য শ্যা ম লা মা রূ পা

১ ২ ৩ ০ ১ ২ ৩ ০
পা হ্মা পা । গা হ্মা পা । হ্মা -া পা । র্সর্রা -র্গা র্গা । র্সা র্রা র্রা । না -র্সা র্সা । হ্মা পা পা । গা গা রা ।
না ত ব গৃ হি নী ধ ০ না প্র ০ তা প কু ন্ দ র ০ মা প্র ফু ল্ল মৃ ণ্ ম
য়ে দে ছ ধু কে র য ০ ক্ত দ ০ শ ভূ জা বা ণী র মা রু পে তাঁ য় দে উ লে

১ ২ ৩ ০ ১ ২ ৩
গা হ্মা -পা । গা রা -পা । পা -া পা । নর্সা নর্সা ধা । ধা ধা ধা । হ্মা -পা পা । পা -পা পা ।
স্নী ত ব পু ০ ত্র ক ০ ন্যা স ০ ০ ০ তা হ ই তে প র ম স ০ ত্যা
দে উ লে হে রে ছ ভ ০ ক্ত পু ০ রো ০ হি ত তু মি শি খা য়ে দি য়া ছ

০ ১ ২ ৩ ০ ১ ২
সা -না ধা । পা -হ্মা পা । গমা গমা পা । হ্মা -পা পা । সা -সা রা । রা গা গা । গা -া না ।
তো মা র স্থ ০ ষ্টি এ ০ মা ০ য়া বি ০ শ্বে নি ০ ত্য হ ই তে প র ম
দে শ ভ ম মী র পূ ০ জা ০ র ম ন্ ত্র যা ঙা লী রে তু মি দে ছ প্র

৩ ০ ১ ২ ৩ (বহুকণ্ঠ পূর্ববৎ)
না -া ধা । হ্মা -পা গা । রা -গা গা । ন্ সা রা । গা -া গা ॥
নি ০ ত্য দি য়া ছ দী ০ ক্ষা ঘ তে ক শি ০ ষ্যে
বি ব র ন ব শ্রু তি স্মৃ তি পু রা ণ ত ন্ ত্র

০ ১ ২ ৩ ০ ১ ২ ৩
ন্সা সা সা । ন্সা সা সা । ন্সা সা রা । রা রা রা । ন্সা সা রা । গা গা গা । গমা ন্ সা । গা -া গা ।
গৃ ০ হ কো ণে ০ তু মি গো ০ প ন ছ ০ দ্মে সে ০ জে ছ পা গ ল ক ০ ম লা কা ০ ন্ত
গ ০ তা নু গ ০ তি ক জ ০ ন দ লে তু মি তু ০ লি বি ০ দ্রো হ বৈ ০ ০ জ য় ০ ন্তা

০ ১ ২ ৩ ০ ১
ধা্ ধা্ সা । সা ন্ সা । ন্সা ন্সা ধা্ । ধা্ ধা্ ধা্ । হ্মপা্ পা্ পা্ । হ্মপা্ পা্ পা্ ।
ব ন ম ঠে ত ব হে ০ ভা ০ ন কা ন্ ত হে ০ রে ছি স্ব ০ রূ প
আ ০ ত্মা গু হা র আ ০ হি ০ ত পু রু ষে জা ০ গা য়ে তু ০ লে ছ

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
হ্মপা্ ধন্ সা । সা -া সা । গা্ গা্ পা্ । হ্মা্ পা্ -া । হ্মপা্ পা্ পা্ । হ্মপা্ পা -া ।
রু ০ ০ ০ দ্র শা ন্ ত আ মা দে রি মা ঝে বাঁ ০ ধি য়া ছে ০ ঘ র
স্ব ০ কৃ ০ ত প ন্ থী চি নি তে শি খে ছে অ ০ ন্ ধ প্র ০ মা দে

০ ১ ২ ৩ ০ ১
হ্মপা্ ধনা্ সা । সা সা -া । ধ্ন্সা রগা গা । গা -া গা । গহ্মা পধনা ধা । পা হ্মা -পা ।
তো ০ ০ ০ মার য তে ক মা ০ ০ ০ ০ নস্ পু ০ ত্র তা ০ ০ ০ ০ যেহ ভূ লো ক
দে ০ শ ০ বা সী ত ব সা ০ ০ ০ ০ ধনা য ০ ত্নে খ ০ ০ ০ ০ নিধা তে খুঁ ড়ে

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
হ্মপা হ্মপা গা । রা গা -া । হ্মপা হ্মপা গা । রা রা -া । ন্ সা রা । গা -া গা ॥
বু ০ কে ০ বাঁ ধা ত বু আ ০ ছে ০ প ণ্ ক জ মৃ ণা ল সূ ০ ত্র
গি ০ রি ০ দ রী ঢুঁ ড়ে আ ০ হ ০ রি এ নে ছ স ত্য য ০ ত্নে

(বহুকণ্ঠ পূর্ববৎ)

অষ্ট্রেলিয়ার নারী-সমাজ

ও

ফিজিদ্বীপে ভারতীয় নারী।

সৎকর্ম্মের ফল অবশ্যই হইবে, ইহাই বিধাতার বিধান। ফিজিদ্বীপের প্রবল প্রতাপান্বিত চিনিকরগণ ভারতীয় নরনারীকে কুলিরূপে লইয়া তাহাদের উপর বিশেষতঃ নারীদের উপর কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। মানবহিতৈষী মহাপ্রাণ রেভারেণ্ড এণ্ড্রুজ ও মিঃ পিয়ার্সন ভারতবাসীর শোচনীয় অবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া তাহার সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য ফিজিদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বচক্ষে কুলিদের হৃদয়-বিদারক অবস্থা দর্শন করিয়া তাহার যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, সে বিবরণ পাঠ করিয়া ফিজিদ্বীপের ও ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট দীনহীন কুলিদের বিষয় ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ার নারীসমাজ ফিজিদ্বীপে ভারতীয় কুলিনারীদের দুর্গতির সংবাদ শুনিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছেন ও তাহাদের ক্লেশমোচনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তাহারা ভারতের নারীদিগকে সম্বোধন করিয়া যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার তিন খানির অনুবাদ প্রকাশ করিলাম। পত্রত্রয় সহৃদয়তাতে পরিপূর্ণ। ভারতীয় শিক্ষিতা নারীগণের অষ্ট্রেলিয়ার নারীসমাজের সহিত ঘনিষ্টতা স্থাপনের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের আশা এই বাঙ্গালাদেশের নারীগণ আলস্য ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের সহিত অষ্ট্রেলিয়ার সখ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অষ্ট্রেলিয়ার নারীদের সহিত পত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিবেন। কে জানে, ইহার ফলে ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়া প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইয়া এক মহা জাতিসঙ্ঘে পরিণত হইবে না ?

(১)

From

The Women's Christian Temperance Union, West Australia.

ভারতীয় নারীজাতির প্রতি—

পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার সমস্ত নারীসমাজের পক্ষ হইতে আমরা আপনাদের অভিবাদন জানাইতেছি। ফিজিদ্বীপের (Fiji Islands.) চিনিব্যবসায়ীগণের মধ্যে কুলিদের চুক্তি-প্রথার (Indentured system.) যে অনিষ্টকর প্রচলন ছিল, তাহার উচ্ছেদকল্পে আপনাদের অশেষ চেষ্টার কথা সমস্তই শুনিয়াছি। ভারত মহিলাগণের এই আশ্চর্য্য সেবাপরায়ণতার কথা আমাদের অবিদিত নাই।

ফিজিদ্বীপের নিঃসহায় রমণীগণের দারুণ কষ্ট ও তাহাদের উপর ভীতিপ্রদ দুর্ব্যবহারের বিবরণ পাঠ করিয়া আমরা একান্ত ব্যথিত হইয়াছি। এই অমানুষিক অত্যাচারের প্রতি আমাদের তীব্র ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছে। সমগ্র অষ্ট্রেলিয়ার নারীসমাজ ইহাতে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে এবং এই ভীষণ কষ্ট লাঘবের জন্য তাঁহারা সাধ্যমত সাহায্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এই সম্বন্ধে আমাদের পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার (West Australia) দুইজন মহিলা অল্পদিন হইল ফিজিদ্বীপে যাত্রা করিয়াছেন। মহিলাদ্বয়ের একজন শিক্ষয়িত্রী ও অন্যজন সেবিকার কার্য্য করিতেছেন। ইহা অবশ্যই আনন্দের বিষয়।

মিসেস্ সরোজিনী নাইডু আপনাদের স্বদেশের জন্য, সেবা ও হিতানুষ্ঠান-ক্ষেত্রে জ্বলন্ত ভাষায় যে আহ্বান করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা গৌরব অনুভব করিয়াছি। ঈশ্বরেচ্ছায় আপনারা স্বদেশীয় ব্যাপারে এতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন দেখিয়া আমরা আপনাদের প্রতি আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, সমগ্র পৃথিবীর নারীজাতির একটি অখণ্ড একতাসূত্রে দাঁড়াইবার শুভক্ষণ আসিয়াছে। কি জন্য?—আমাদের এই সকল নিঃসহায় ভগ্নীগণের জন্য যাহারা আমাদের ন্যায় সহজপ্রাপ্য সামান্য অধিকার হইতেও চিরবঞ্চিত, যাহাদের নৈতিক ও ধর্ম্মবিষয়ক উন্নতিকে দিনে দিনে ব্যাহিত করা হইতেছে। পৃথিবীব্যাপী এই মহাসমরের অহ্বানে অষ্ট্রেলিয়ার সেনাগণ ছুটিয়া গিয়া এক সমরক্ষেত্রে একই মহা উদ্দেশ্যে ভারতীয় সেনাগণের সহিত পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেছে দেখিয়া, আমরা উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছি। হে ভারতীয় মহিলাগণ! এই অষ্ট্রেলিয়ার নারীজাতি আপনাদের সহিত একই ইচ্ছায় প্রার্থনা করিতেছে যে, শীঘ্রই যেন এই মহাসমরের অবসান হয় এবং সত্য ও ন্যায়ের উপর যেন এই যুদ্ধের শান্তি সংস্থাপিত হয়।

এই ইচ্ছা বিশ্বব্যাপী ইচ্ছা এবং এই শান্তির ধারা যেন প্রত্যেক দেশের মাথার উপর বর্ষিত হয়। কারণ আমরা জানি, "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।" (Righteousness alone exalteth a nation.)

স্বদেশ সেবা, মানবহিত ও ঈশ্বরের কর্ম্মে ব্রতধারিণী—

আপনাদের বন্ধু,—

লিলিয়ান্ মেটকাফ্।

অবৈঃ সভাপতি—

(২)

From

The Women's Service Guild,

Western Australia.

ভারতের প্রিয় ভগ্নীগণের প্রতি—

পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার পার্থনগরীর নারী-সেবা-সঙ্ঘ আপনাদিগকে অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছে। আমরা ইহা জানাইতেছি যে ফিজিদ্বীপে ভারতের নর নারীগণের সম্মানরক্ষার্থে যেরূপ আশ্চর্য্য চেষ্টা হইতেছে, আমরা তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। এ বিষয়টি অষ্ট্রেলিয়ার নানাবিধ নারীসমিতির নিকট উপস্থিত করা হইয়াছিল। এইবারেই আমরা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে সমর্থ হইলাম যে, ফিজিতে আমাদের ভারতীয় মহিলাভগ্নীগণ কি দুরবস্থায় পড়িয়াছেন। আমরা সিড্‌নি হইতে দুই হাজার মাইল দূরে। অষ্ট্রেলিয়ার যত নারীসঙ্ঘ আছে তাহাদের প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়া ঔপনিবেশিক সর্করা কোম্পানির (Sugar refining Company) নিকট এই বিষয়ের অভিযোগ জ্ঞাপন করিবেন। ফিজিদ্বীপে চাষের কাজে নিযুক্ত ভারতবাসিগণ যে দুরবস্থায় বাস করিতেছে তাহার সংস্কার সাধনের জন্য তাঁহারা প্রার্থনা করিবেন। তজ্জন্য 'ডেপুটেশন' গঠিত হইয়াছে। সেই 'ডেপুটেশনে' আমাদেরও প্রতিনিধি রহিয়াছেন। আমরা আশা করিতেছি এই যে 'ডেপুটেশন' সুফল প্রসব করিবে। অন্ততঃ আমরা এই বিষয়টি সহজে পরিত্যাগ করিব না বলিয়া স্থির করিয়াছি।

আমাদের এই নারীসঙ্ঘের দুইটি সভ্য ভারতীয় নারীগণের সেবার জন্য ফিজিদ্বীপে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। আমরা আশা করিতেছি তথায় কি ঘটিতেছে ইহারা তাহা সর্ব্বদা আমাদিগকে জানাইবেন।

আপনারা যে উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া ফিজিপ্রবাসী ভারতীয় নারীগণের কল্যাণার্থে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমরা এ দেশীয় নারীবৃন্দ তাহার শক্তি অন্তরে অনুভব করিতেছি।

জগতের সর্ব্বত্র ক্রমবিকাশের যে কার্য্যস্ফূর্ত্তি চলিয়াছে তাহারি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া প্রত্যেক দেশের নারীগণ পরস্পরের হস্তধারণ করিয়া মানবজাতীর উন্নতির জন্য মঙ্গলকর্ম্মে নিয়োজিত হইতেছে। আপনাদের এই মঙ্গল প্রয়াসও সেই শক্তিরই অঙ্গীভূত বলিয়া আমরা মনে করি।

আপনারা এই বিষয়ে যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং নারীজাতীর উন্নতির জন্য আপনারা যাহা করিতেছেন তৎসম্বন্ধে আপনাদের নিকট হইতে জানিতে পারিলে আমরা আনন্দিত হইব। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে শুভকামনা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনাদের নিকট হইতে শীঘ্রই উত্তরের আশা করি। ইতি—

বিনীতা—নেলী ষ্টিড্ওয়ার্থী।
অবৈতনিক সম্পাদক

(৩)

From

The West Australian National Council of women

To

The Women of India.

প্রিয় ভগ্নীগণ!

পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার নারীগণের জাতীয় পরিষদ্ আপনাদের ভারতবর্ষীয় নারীসমাজকে জানাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন যে ফিজিদ্বীপের শ্রমজীবীগণের চুক্তিপ্রথার সম্বন্ধে যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া বিশেষতঃ তথায় যে সকল রমণী নিযুক্ত রহিয়াছে তাহাদের শোচনীয় অধঃপতনের কথা অবগত হইয়া আমাদের এই নারীসঙ্ঘের সর্ব্বত্র গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা অনুভূত হইয়াছে।

এরূপ জঘন্য ব্যাপার সভ্যতার বর্ত্তমান যুগে অল্পই শ্রুত হয়। ইহা আমাদের পরিষদের মধ্যে গভীর দুঃখ ও ঘৃণা উৎপাদন করিয়াছে। আমাদের ভারতীয় ভগ্নীগণ ইহা যেন অনুভব করেন যে পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার নারীগণ এরূপ শোচনীয় ব্যাপারের প্রতিবাদে সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাদের সহিত একমত। ইহা সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হইলে জগতের নারীসমাজের সর্ব্বত্র নিশ্চয়ই গভীর বেদনাপূর্ণ সহানুভূতির উদ্রেক হইবে। আমাদের দৃঢ়প্রত্যয় যে আপনারা বিশ্বাস করিবেন যে এ বিষয়ে আমাদের শক্তি অল্প হইলেও এই বেদনাদায়ক পাপকে বিদূরিত করিবার জন্য আমাদের একান্ত ইচ্ছা রহিয়াছে। সুযোগ পাইলে আমরা আমাদের সাধ্য ও শক্তিতে যতটুকু সম্ভব হয় চেষ্টা করিব। ইতি—

বিনীতা—এথেল পিথিঙ্গটন,
সেক্রেটারী।

এডিথ ডি কাওয়েল্,
সভাপতি।

(সঞ্জীবনী হইতে)

কেবল বাক্যে নহে, কার্য্যেও অষ্ট্রেলিয়ার নারী-সমাজ তাঁহাদের আন্তরিকতা, মহাপ্রাণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা কেবল তাঁহাদের ভারতীয় ভগিনীগণের অনুষ্ঠানে যোগদানের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াই নিশ্চিন্ত বা ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা ফিজির গভর্ণর মাননীয় মিঃ রড্ ওয়েলের সমাপে ভারতীয় রমণীগণ তথায় কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তাহাদের নারীধর্ম্ম, সতীত্ব, স্বাস্থ্য কিরূপ অবজ্ঞাত তাহা বিশেষ ভাবে প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন। নারী বিশেষের সতীত্বের অবমাননা, নৈতিক অবনতি, নির্য্যাতন, মাত্র তাহারই অপমান বা নিদারুণ মর্ম্মপীড়ার কারণ নহে, তাহা নিখিল নারীর মর্ম্মান্তিক নিপীড়ন। সিড্নি নগরীতে এই মর্ম্মে এক মহতি সভা আহুত হয়; তাহাতে অষ্ট্রেলিয়ার প্রত্যেক প্রদেশের গণ্যমান্যা নারীগণ উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় স্থিরীকৃত হইয়াছে, ফিজির চিনিকরগণ ও ঔপনিবেশিক সর্করা-সংস্কারক কোম্পানি যাহাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে সম্মত হয়, তাহার বিধিমত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১) বর্ত্তমান সময়ে ফিজির হাঁসপাতালগুলিতে মহিলা চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারিণী নাই; যে সকল প্রধান প্রধান হাঁসপাতালে রমণীগণ সাধারণতঃ চিকিৎসিত হইতে উপস্থিত হয়, তথায় শুশ্রূষাকারিণীর নিযুক্ত করিতে হইবে।

(২) ফিজিতে ভারতীয় কুলি পুরুষবহুল; তথায় 'কুলি লাইনে' বিবাহিত স্ত্রীপুরুষ ও অবিবাহিত পুরুষের বাসস্থান একস্থানে নির্দ্দিষ্ট থাকায় অশেষ অকল্যাণের কারণ হইয়াছে। অবিবাহিত এবং বিবাহিত কুলি দম্পতির জন্য স্বতন্ত্র আবাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিবার সময় নারীগণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কেবল বয়স্ক, সম্ভব হইলে বিবাহিত, ব্যক্তিগণকে কার্য্যপরিদর্শকরূপে নিযুক্ত করিতে হইবে।

সভার প্রত্যেক সভ্য, সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিবেন। ফিজিপ্রবাসী ভারতীয় নারীর মধ্যে অবস্থান করিয়া তাহাদের অভাব অভিযোগ নিরাকরণ চেষ্টায়, কুমারী ডিক্সন্ ও কুমারী প্রিষ্ট্ ফিজি যাত্রা করিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ার নারী-সঙ্ঘের এই অবিচলিত সতেজ আন্দোলনে ফিজির সরকারী কর্ম্মচারীবর্গকে বিচলিত হইতে হইয়াছে। ফিজির গবর্ণর, সেক্রেটরীর যোগে মিঃ এণ্ড্রুজের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন:—

মহাশয়, আমি মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের অনুজ্ঞাক্রমে আপনাকে জ্ঞাপন করিতেছি যে নাদিরের কমিশনর জানাইয়াছেন যে আপনি, ফিজি প্রবাসী ভারতীয় নারীগণের মধ্যে কার্য্য করিবার জন্য মিস্ ডিক্সন ও মিস্ প্রিষ্ট্ নাম্নী দুইজন মহিলার ফিজি আগমনের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। মিঃ পিলিংএর পত্রে প্রকাশ, জিলার ভারতীয় অধিবাসীবর্গ উক্ত মহিলাদ্বয়ের অবস্থানাদির সুবন্দোবস্ত করিবে, এই আপনার আশা। তাহারা এ বিষয়ে কোন চেষ্টাই করে নাই। অতএব মহামান্য গবর্ণর বাহাদুরের নির্দ্দেশক্রমে আপনাকে জানান যাইতেছে, যে পর্য্যন্ত, ভারতীয় অধিবাসীদিগের বিনা সাহায্যে, এই মহিলাদ্বয়ের অভ্যর্থনার, বাসভবনের, এবং ভরণপোষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের ফিজিতে আগমন কর্ত্তব্য নহে।

এই পত্রের অনুলিপি কুমারীদ্বয়ের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। তাঁহারা তখন ফিজিগামী জাহাজের প্রতীক্ষায় সিড্নীতে অবস্থান করিতেছিলেন। এ বিষয় একটা কিছু স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত যাহাতে তাঁহাদিগকে 'ছাড়পত্র' না দেওয়া হয়, তাহার চেষ্টাও করা হইয়াছিল। মিস প্রিষ্ট্ এই সংশ্রবে লিখিয়াছেন—"এরূপ আচরণে আমাদের পক্ষে কিছু আসে যায় না। আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া জানাইয়াছি, যাহাই হউক না কেন আমরা রওনা

হইবই। আমরা আমাদের 'ছাড়পত্র' পাইয়াছি.........হয় ত আমাদের সম্মুখে শত বিপদ অপেক্ষা করিতেছে; বলাবাহুল্য ওরূপ বিপদে আমরা বিন্দুমাত্রও শঙ্কিত নই, আমরা তথায় বেশ সুখ-স্বচ্ছন্দে ভারতীয় অধিবাসীবর্গের মধ্যে বাস করিব—নাই বা হইল ইউরোপীয়দের সঙ্গ—তাহাতে কি? বিপদ বা বিঘ্ন যদি কিছু থাকে তাহা ইউরোপীয়দের কুক্ষিতলগত, তাহাদের বাধ্য যে সকল ভারতবাসী তথায় আছে তাহাদের দ্বারাই হইবে—তাহারা যদি ফিজিপ্রবাসী ভারতীয় নরনারীকে আমাদের উদ্দেশ্যকে অন্য প্রকারে বুঝায় ও সরলপ্রাণ কুলিরা তাহাই বিশ্বাস করে, তাহা হইলেই গোল। তাহাই বা কি? কার্য্যের অগ্রসর পক্ষে কিছু বিলম্ব ঘটিবে এই যা—কর্ম্মহানী কিছুতেই হইবে না। সৎ যাহার উদ্দেশ্য, পরিণামে সুফল তাহার সুনিশ্চিত। আমরা প্রাণপণে কার্য্য করিয়া যাই—ফলাফল তাঁহার হাতে। প্রিয় ভারতীয় অধিবাসীবর্গের মুখ স্মরণ করিয়া, বিচলিত বা শঙ্কিত আমরা কিছুতেই হইব না—

কি জোরের কথা,—পর দুঃখে প্রাণ না কাঁদিলে এরূপ উক্তি বাহির হইবার নহে। নারীর প্রাণ নারীর জন্য কাঁদিয়া উঠিয়াছে,—তাঁহাদের সমবেদনা কখনই নিরর্থক হইবে না,—শুভদিন আসিবেই।

জা—

পুত্র বিসর্জ্জনে।

আজ্‌কে খোকা গেল চলে অনেক দূরের নূতন দেশে,
গঙ্গা মায়ের প্রথম বানের ঘোলা জলে ভেসে ভেসে।
হাতের বালা, পায়ের মল
খুলে নিতে নেইক ছল
নেই কোনও ভয় লাগ্‌বে কিম্বা কাঁদ্‌বে বলে' অবশেষে
নিচ্ছি খুলে পড়্‌ পড়িয়ে—দেখ্‌চে বাছা নির্নিমেষে!

জল ঘাঁটা তার প্রিয় বলে, জলটা ভালবাস্‌তো সে যে,
অগাধ জলে ছেড়ে দিলাম ঐযে ঢেউএ খেল্‌চে নেচে!
স্নান করাতে কাঁদ্‌তো বটে
আজ আর সে ভাব নেইক মোটে!
ঐ দেখ' সে ডুব সাঁতারে চল্‌লো কেমন ক্ষীরোদ পুরে
কোঁকড়া কালো চুলের গোছা গৌর আভা উঠ্‌চে ফুঁড়ে।

নতুন নতুন খেল্‌না কত জমেছিল এ কয় দিনে
কোন'টি তার প্রিয় ছিল, কোনওটি সার আনাই কিনে !
দাদা পাছে দিবে হাত
এই ভয়ে সে দিবস রাত
রুগ্ন সরু আঙুল ঘেরা ছোট্ট মুঠায় রাখ্‌তো ভরে'
ছড়িয়ে তারা গড়িয়ে বেড়ায় এখন সে সব মেঝের 'পরে !

দাদা যে তোর ডাক্‌চে তোরে সব বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে
চড়িয়ে তোরে মায়ের কোলে র'বে বলে' দাঁড়াইয়ে !
মামার বাড়ী গেলি যখন
হয়নি মোদের এ দুখ তখন
রেখে ছিলাম গুছিয়ে সবি, আবার এসে নেবে বলে'
এখন তারাই কাট্‌তে আসে গোখ্‌রো সাপের ফণা তুলে !

কাঁথা বালিশ সঙ্গে দিলাম, নৈলে কিসে শো'বে ছেলে
অষুধগুলো নর্দ্দামাতে দিওনাক' যেন ফেলে
এ মায়া নয় দামের তরে !—
এতেই সে যে জীবন ধরে'
লড়েছিল যমের সাথে, খেয়েছিল রাঙামুখে,
এরই ভরসায় ছিলাম বলে' এ দুঃখেও এ বাজ্‌চে বুকে !

কাযের অন্ত ছিল নাক' একটুখানিক আগে, ওরে,
মানুষ ও কায চল্‌ছিল সব ঘড়ির কাঁটা ধরে' ধরে' !
ওলট্‌ পালট্‌ অকস্মাৎ
হাহাকার ও আর্ত্তনাদ
বাজের মত উঠ্‌লো বেজে, গুমোট কেটে প্রলয় ঝড়ে,
হরিধ্বনি ?—বন্ধ কর' !! এত আগুন এর ভিতরে ?

মরণ এতো হয় নিক' তোর—সত্য মরণ আমাদেরি!
বসন্ত-দূত এসেই গেলি, সইল' না তোর একটু দেরি!
সূর্য্যকরের মতন আসি
একটুখানি আঁধার নাশি
দিয়ে গেলি দারুণ চিরনিবিড় অমা নিরন্তর—
তোর শুধু রোগ পিতা মাতার হৃদে থুয়ে অনন্তর।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

পোর্সিয়া।

—:*:—

'জুলিয়াস্ সিজর' মহাকবি সেক্স্পীয়রের একখানি শ্রেষ্ঠ ও অমূল্য দৃশ্যকাব্য। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে দেশপ্রাণ স্বজনবৎসল, আত্মসুখনিস্পৃহ রোমের অদ্বিতীয় ভাবুকবীর পুরুষসিংহ ব্রুটাস্ শীর্ষস্থানীয় হইলেও তদীয় সহধর্ম্মিণী রমণীকুলরাজ্ঞী পোর্সিয়ার চরিত্রই অধিকতর মহনীয় ও চিত্তাকর্ষক। পোর্সিয়া ব্রুটাসের উপযুক্ত নারীসুলভ আত্মত্যাগ, কষ্টসহিষ্ণুতা, স্বামিপ্রাণতা এবং অসাধারণ মহত্ত্ব ও তেজস্বিতার গৌরবে সমুজ্জ্বল।

তখন প্রভাত সমাগত প্রায়। রোমের রাজনীতিক গগন ঘনঘটাচ্ছন্ন। সিজর-রূপ ধূমকেতুকে অপসারিত করিবার জন্য ষড়যন্ত্রকারী নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের অধিনায়ক ব্রুটাসের সহিত ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিয়া সবেমাত্র প্রস্থান করিয়াছেন। দেশের চিন্তায়, স্বাধীনতার একনিষ্ঠসাধক, মাতৃভূমির গরিষ্ঠসন্তান ব্রুটাস সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় অতিবাহিত করিয়া প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান বাটিকায় অবস্থান করিতেছিলেন—এমন সময়ে 'ব্রুটাস্ স্বামিন্!' বলিয়া পোর্সিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ব্রুটাস্ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পোর্সিয়া, এত সকালে তুমি কি মনে করিয়া? তোমার শরীর ত' ভাল নয়!"

পোর্সিয়া স্বামিগতপ্রাণা, সাধ্বী নারী। স্বামী পূর্ব্বদিন হইতেই বিশেষ চিন্তিত, বেশী অন্যমনস্ক, আহারে তাঁহার রুচি নাই, শয়নে নিদ্রা নাই; সুহৃত্তম, মহোপকারী সিজরকে হত্যা করিয়া রোম-জননীকে উদ্ধার করিতে হইবে—এই মহাভাবনায় তিনি আকুল হইয়া উঠিয়াছেন, স্বামীর চিত্তে যে একটা বিরাট অশান্তি ক্রীড়া করিতেছে, পোর্সিয়া কতটা তাহা অনুমাণ করিতে পারিয়াছিলেন। তাই নিদ্রা হইতে উঠিয়া পোর্সিয়া যখন দেখিলেন, স্বামী শয্যায় নাই, তখন তাঁহার সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল; তিনি ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন স্বামীর দুঃখের বোঝা কমাইবার জন্য, স্বামীর বিমর্ষতার কারণ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য। পোর্সিয়া বলিলেন, 'প্রিয়তম, তোমার মনোবিকারের কারণটি আমায় জানিতে দাও।' 'আমার শরীর ভাল নহে, পোর্সিয়া তুমি শয়ন করগে' ইত্যাকার বাজে কথায় ব্রুটাস পত্নীকে বিদায় করিয়া দিতে চাহিলেন। কিন্তু স্বামীপ্রাণা পোর্সিয়া—তাহার স্নেহের

চক্ষু সহজে প্রতারিত হইবার নহে। বিশেতঃ এই মাত্রই কতিপয় ছদ্মবেশীকে ব্রুটাসের নিকট হইতে চলিয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহার ধারণা আরও বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তিনি সগর্ব্বে বলিয়া উঠিলেন,

"Is Brutus sick ? and is it physical
To walk unbraced and suck up the humours
Of the dark morning ? What, is Brutus sick ;
And will he steal out of his wholesome bed,
To dare the vile contagion of the night ?
No, my Brutus ;
You have some sick offence within your mind,
Which, by the right and virtue of my place,
I ought to know of :"

সত্যই ত' স্বামীর মনকষ্টের কারণ জানিবার অধিকার ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ স্ত্রীর আছে। পোর্সিয়া জানু পাতিয়া উপবেশন করিলেন। ব্রুটাস নিষেধ করিলেন। পোর্সিয়া শুনিলেন না—দৃপ্তকণ্ঠে বিজয়িনীর ন্যায় বলিয়া উঠিলেন—

Within the bond of marriage, tell me, Brutus,
Is it expected I should know no secrets
That appertain to you ? Am I yourself ?
But as it were, in sort or limitation ;
To keep with you at meals, comfort your bed,
And talk to you sometimes ? Dwell I but in the suburbs
Of your good pleasures ? If it be no more ?
Portia is Brutus' harlot, not his wife !

কি স্পষ্ট খাঁটিকথা! 'আমাদের পরিণয়-বন্ধনের পরিণাম কি এই যে তোমার সম্বন্ধীয় গুপ্তকথা কিছুই জানিতে পারিব না? আমি কি আংশিকভাবে তোমার সহিত সংবদ্ধ? মধ্যে মধ্যে তোমার সহিত কথাবার্ত্তা বলা, তোমাকে শয্যাসুখ দেওয়া এবং তোমার সহিত একত্র আহার করাই কি আমার একমাত্র কর্ম্ম? আমি কি তোমার শুভেচ্ছাগুলির বাহিরেই রহিয়া যাইব? যদি এর বেশী কিছু না হয়, পোর্সিয়া ব্রুটাসের পত্নী নহে—রক্ষিতা মাত্র!'

ব্রুটাস কহিলেন, 'না, না, তা' নয়; তুমি আমার প্রকৃত স্ত্রী, আমি তোমাকে সম্মান করিয়া থাকি, বক্ষ-শোণিতের মত তোমাকে আমি ভালবাসি।'

স্বামীর স্নেহময় সুমিষ্ট সম্ভাষণে রমণীহৃদয় অভিমান ও গৌরবে ভরিয়া উঠিল। পোর্সিয়া অপূর্ব্ব ভাষায় বলিয়া উঠিলেন—

If this were true, then should I know this secret.
I grant, I am a woman ; but, withal,
A woman well-reputed; Cato's daughter
Think you, I am no stronger than my sex
Being so fathered and so husbanded ?
Tell me your counsels, I will not disclose them ;
I have made a strong proof of my constancy,
Giving myself a voluntary wound
Here in my thigh ; can I bear that with patence,
And not my husband's secrets ?

'যদি তাই ঠিক হয়, তবে আমার এই গুপ্তকথাটি জানা উচিত। আমি নারী বটে, কিন্তু যেমন তেমন নারী নহি—প্রভু ব্রুটাস আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তারপর আমি কেটোর দুহিতা। তুমি কি মনে কর, এমন স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইয়া, এমন পিতার কন্যা হইয়াও আমি সাধারণ স্ত্রীলোকদের চেয়ে শক্তিশালিনী নহি? তোমার গুপ্তকথাগুলি বল, আমি তাহা কাহাকেও বলিব না। তারপর দেখ, আমার এই দৃঢ়তাকে প্রমাণীকৃত করিবার জন্য স্বেচ্ছায় উরুদেশে এক গভীর ক্ষত উৎপাদন করিয়াছি। এই ক্ষতের যন্ত্রণা ধৈর্য্যসহকারে সহিতে পারিব, আর আমার স্বামীর যুক্তিগুলি মনের গোপন কক্ষে লুক্কায়িত রাখিতে পারিব না?'

গরীয়সী সাধ্বীর এই মহনীয় উক্তিগুলি সুবর্ণাক্ষরে খোদিত করিয়া রাখিবার উপযুক্ত। এমন বড় কথা কয়জনের মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে? কয়জন নারী এতবড় অসাধারণ মনবলসম্পন্না? কয়জন নারীতে এমন উদার গর্ব্ব, যোগ্য অভিমান দেখিতে পাওয়া যায়? কয়জন নারী স্বামী ও পিতার গৌরবে এমন অসীম গৌরব অনুভব করিতে পারেন? আর একজন বোধহয় এই হিন্দুরদেশে জন্মিয়া পারিয়াছিলেন—তিনি অমর মাইকেলের অপূর্ব্ব সৃষ্ট রাজবধূ প্রমীলা।

Think you I am no stronger than my sex,
Being so fathered, and so husbanded?

এই দুই লাইন পড়িলেই বঙ্গকবির সেই স্পর্দ্ধিত ছত্র দুইটী মনে পড়িয়া যায়—

রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী
আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে?

তারপর নারীর চিত্ত চঞ্চল. সাধারণতঃ গুপ্তকথাগুলি প্রকাশ করিয়া ফেলিতে পারিলেই তাহারা যেন সুস্থির হয়। ব্রুটাস পত্নীর নিকট আবশ্যকীয় কথাগুলি বলিতে ইতস্ততঃ বোধ করিতে পারেন, তাই পোর্সিয়া উরুদেশে এক ক্ষত উৎপাদন করিয়া স্বকীয় সহিষ্ণুতা-বল পরীক্ষা করিবার জন্য স্বামিসকাশে উপনীতা হইয়াছেন!

কেহ কেহ বলিতে পারেন, নারীস্বভাব সুলভ দৌর্ব্বল্যটী পোর্সিয়ার ন্যায় বীর রমণীতেও যথেষ্ট আছে—কারণ তিনিও আজ স্বামীর গুপ্ত রাজনীতিক চাতুরীগুলি জানিবার জন্য বদ্ধ পরিকর!

কিন্তু এটা বুঝা উচিত, পোর্সিয়া নারী, তথাপি আপনার উৎকট কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি এরূপ বাড়াবাড়ি করিতেছেন না। স্বামী দুশ্চিন্তার ভারে নিপীড়িত,—তাঁহার চেহারায় ও কার্য্যকলাপে তাহা সুপরিস্ফুট। এ অবস্থায় কি করিয়া পোর্সিয়ার ন্যায় রমণী উদাসীন থাকিতে পারেন? মনের দুঃখ চাপিয়া রাখিলেই জ্বালা বাড়ে, সুহৃদ্‌ব্যক্তির নিকট বলিয়া ফেলিলে ভার অনেকটা হাল্কা হইয়া যায়—পোর্সিয়া তাহা বুঝিতেন; আরও বুঝিতেন, তিনি নারী হইলেও সাধারণ নারী হইতে উচ্চস্তরের—স্বামীর গোপন কথা লুকাইয়া রাখিবার সামর্থ্য তাঁহার আছে। তবুও স্বামীকে সর্ব্ব সন্দেহ মুক্ত করিবার জন্য উরুদেশে ক্ষত উৎপাদন করিয়া ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরাকাষ্টা দেখাইলেন!

পোর্সিয়া চরিত্র কি মহৎ, কি মধুর! 'জুলিয়াস সিজরের' খুনোখুনি, রক্তারক্তি, প্রকৃতিবিপ্লব, ষড়যন্ত্র ও রাজনৈতিক চাল চাতুরীর ভিতর পোর্সিয়ার চরিত্র অতি স্নিগ্ধকর, অতীব হৃদয়মনমুগ্ধকরী!

তারপর মনোমোহিনী পোর্সিয়াকে আমরা আর একবার একটুখানির জন্য দেখিতে পাইয়াছি—সে দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ বা শেষ দৃশ্যে।

তখন সিনেট গৃহে ষড়যন্ত্রকারীগণের সহিত সিজরের পরম স্নেহভাজন ও অনুগৃহীত ব্রুটাস গিয়াও মিলিত হইয়াছেন,—রাজোপাধিগ্রহণোদ্যত, স্বেচ্ছাচারী, দাম্ভিক জুলিয়াসের শোণিত তর্পণে রোমের স্বাধীনতা-লক্ষ্মীর গরিমময় বেদীকে সুপবিত্র করিবার জন্য। পোর্সিয়া বাড়ীর সম্মুখে উন্মত্তার ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া বালক ভৃত্য লুকাসকে ব্রুটাসের খবর আনিবার জন্য যা' তা' বলিয়া উত্যক্ত করিতেছেন। কারণ যাইবার সময় স্বামীর মুখে তিনি স্পষ্ট পীড়ার লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছিলেন। পোর্সিয়া বীরনারী হইলেও স্বামীর চিন্তায় অতিমাত্র কাতর ও শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। সিজার অদ্য হত হইবেন,—নারী-হৃদয় এ ভাবনায় বিচলিত হইবে না কেন? জ্যোতির্ব্বিদ আসিল—পোর্সিয়া তাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন—সিজরের কথা!

মহা উদ্বিগ্ন পোর্সিয়া নিজের নারীসুলভ দুর্ব্বলতাকে অনুভব করিতে পারিলেন—

Ah me! how week a thing
The heart of a woman is?

তবুও তিনি ভগবানের নিকট স্বামীর কর্ম্মসাফল্য প্রার্থনা করিতে ত্রুটী করিতেছেন না। তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—'লুকাস, তোমার প্রভুকে গিয়া বল যে আমি বেশ স্ফূর্ত্তিতেই আছি, এবং উত্তরে তিনি কি বলেন আমাকে শুনাইয়া যাইবে।'

স্বামীকে উৎফুল্ল ও উৎসাহিত করিবার জন্য বীর নারীর কি অসীম আগ্রহ!

কিন্তু এমন যে সোণার পোর্সিয়া তার পরিণাম কি ভীষণ শোকাবহ! সার্দ্দিসের সমরপ্রাঙ্গনে বসিয়া ব্রুটাস সংবাদ পাইলেন—স্বামীর বিরহে, ও শত্রুপক্ষ প্রবলতর হইয়াছে শুনিতে পাইয়া অভাগিনী পোর্সিয়া জ্ঞানহারা অবস্থায় জ্বলন্ত অগ্নি গলাধঃকরণপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছেন!

হায়! এই দারুণ দুঃসংবাদে শুধু মহাবীর ব্রুটাসের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায় নাই, ঐ সঙ্গে পাঠক পাঠিকার প্রাণেও কি বজ্রের আঘাত লাগে নাই?

কতটুকু সময়ের জন্যই না আমরা পোর্সিয়াকে দেখিতে পাইলাম! তবুও যাহা পাইয়াছি তাহাতে দেখিয়াছি—পোর্সিয়া সংসারমরুর অনবদ্য অনাঘ্রাত পুষ্প—তিনি রমণীকুলশিরোমণি, চিন্তাবীর মহাপ্রাণ ব্রুটাসের উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী।

শ্রীমুরারিমোহন বসু।

লক্ষ্য-হারা।*

—:*:—

(১)

প্রায় প্রত্যেক শনিবারেই সদাগর পুটেনকফের জীর্ণ ভাড়াটে বাড়ী হইতে রাত্রে খাবার সময়ের একটু পূর্ব্বে ভয়ানক প্রহারের শব্দ শোনা যাইত। দোতলার সিঁড়ির পাশ দিয়ে সামান্য একটু ফাঁকা জায়গা—সে জায়গায় রাজ্যের যত সব নোংরা জিনিস জড়ো হইয়া আছে, তার পাশে একটা ছোট কুঠুরী—সেই কুঠুরী হইতে নারীকণ্ঠের চীৎকার আসিত।

*রুস সাহিত্যিক Maxim Gorky-র "The Orloff Couple"-র অনুবাদ।

নারী উচ্চস্বরে কাঁদিয়া বলিত—"ছেড়ে দাও আমায় ! ছেড়ে দাও !"

কর্কশ পুরুষকণ্ঠের উত্তর শোনা যাইত—"তা হ'লে ছেড়ে যা আমায় !"

"তোমায় ছেড়ে যাব আমি ? মানুষের শরীর কি নয়—দয়ামায়া একটুও নেই—রাক্ষস কোথাকার ?"

"চুপ, বেরিয়ে যা—চলে যা সমুখ থেকে !"

"না, মেরে ফেল্লেও না—কিছুতেই না !"

"কি যাবি না—তবে বোঝ মজা !"

"ওগো মেরে ফেল্লে আমায়, মেরে ফেল্লে !"

"বল্, এখন যাবি কি না ?"

"মার আমায় তুমি মার—নিঠুর, যত খুসী মার—একেবারে মেরে ফেল !"

"হবে হবে ব্যস্ত কেন—ভুগে ভুগে মর !"

দু'জনার মধ্যে এইরূপ কথান্তর আরম্ভ হইতেই চিত্রকর লোকফের ছাত্র সেন্‌কা সিচিক তার রং তুলি ফেলিয়া তাড়াতাড়ি বারান্দায় আসিয়া সকলে শুনিতে পারে এই ভাবে চীৎকার করিয়া বলিত—"এই আবার ওরলফদের ঘরে কাণ্ড সুরু হোল।" বালক সেন্‌কা এই ধরণের হাঙ্গাম গোলমালের গন্ধ পাইলে নাচিয়া উঠিত। ওরলফদের ঘরে এই ধরণের কাণ্ড আরম্ভ হইতেই সে ফাঁকা জায়গায় উঁচু হইয়া জানালায় পেট ভর দিয়া দাঁড়াইয়া সেই অন্ধকার নোংরা দুর্গন্ধেভরা ঘর হইতে যতটা রহস্য সংগ্রহ করা যায় তার চেষ্টা করিত। ঘরের মেজেয় ততক্ষণ দু'জনে জড়াজড়ি গালাগালি সমান ভাবে চলিতে থাকিত। নারীর নিঃশ্বাস-রুদ্ধ কণ্ঠ শেষবার সতর্ক করার স্বরে কহিত "তা হলে তুমি আমায় মেরেই ফেল্‌তে চাও ?"

পুরুষটা রাগে ফোঁপাইয়া ব্যঙ্গ কণ্ঠে কহিত "ভয় নেই !"

তারপর বেশ ভারি কিল ঘুসির শব্দ কিছু নরম জিনিসের উপর পড়িতেছে শোনা যাইত, তারপর কান্না আর দীর্ঘশ্বাস,—তারপর একটা লোক যেন কোন ভারি জিনিস সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে এমন বোধ হইত। সেন্‌কা চীৎকার করিয়া বলিত—"এইবার মেরে ফেল্লে—ওঃ—বুট দিয়ে কি গুতোই দিয়েছে যে !" ততক্ষণ অন্যান্য ভাড়াটেরা সব চারিদিকে জড়ো হয়ে কেউ সেন্‌কার ঘাড় ধরে কেউ বা তার হাত ধরে টানিয়া বলিত—"কি হচ্ছে এবার,—মেরে ফেল্লে নাকি মেয়েটাকে !" সেন্‌কা এই নাট্যের প্রত্যেক দৃশ্য বেশ আনন্দের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল—সে বলিল "এইবার পাশে বসে ওর নাক মাটিতে ঘসে দিচ্ছে।"

আর আর দর্শকেরা সব জানালার পাশে ঠেলে দাঁড়াইয়া ঘরে কি হইতেছে দেখিবার চেষ্টা করিত। যদিও তাহারা গ্রিসকা ওরলফের স্ত্রীর বিরুদ্ধে তাহার অভিযানের প্রত্যেক বৃত্তান্তই বিশেষ রূপে অবগত ছিল তবুও রোজই তাহাদের নিজ চক্ষে সমস্ত ব্যাপার দেখিবার স্পৃহা কিছুতেই মিটিত না। তাহাদের উৎসাহ ও আগ্রহ প্রতিবারেই সমান দেখা যাইত, একজন দর্শক বলিত "ওঃ—কি যাচ্ছেতাই লোকটা—এই আবার মার্‌লে, ও—এখনো রক্ত ঝর্‌ছে !" সেনকা বলিত—"নাক রক্তে ভেসে গেছে,—রক্ত সব গড়িয়ে মাটিতে পচ্ছে।" কোন নারী সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিত "কি পাজি, নিঠুর মিন্‌সেগো !" পুরুষগুলো দার্শনিকের ন্যায় আরো একটু গম্ভীরভাবে মত প্রকাশ করিত—"এ নিশ্চয়ই ওকে একেবারে মেরে তবে ছাড়্‌বে।" বেশ্রোবাদক ভবিষ্যদ্বক্তার মত কহিত—"বলে রাখ্‌ছি আমি দেখো—একদিন দেবে ও ছুরি বসিয়ে, রোজ মার্‌তে মার্‌তে ক্লান্ত হয়ে গেছে—একদিন দেবে সব নিকেশ করে।" সেন্‌কা ফস্ করে তার জায়গা থেকে নেমে ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল "এইবার

ছেড়ে দিয়েছে।" এই বলিয়াই সেন্‌কা আর এক জায়গায় দাঁড়াইল—কারণ সে জানিত এইবার ওরলফ বাহির হইবে। অধিকাংশ দর্শকই তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল, কারণ রাগান্বিত ওরলফ মুচির মুখোমুখি হওয়ার ইচ্ছা কাহারও ছিল না। ঝগড়া মিটিয়া গেছে, ওরলফ্‌কে দেখিবার এখন আর তাদের কোন উৎসাহ নাই—তা ছাড়া এ অবস্থায় তার সঙ্গে সাক্ষাৎ বিপদজ্জনকও হইতে পারে। তাই প্রায়ই ওরলফ বাহির হইয়া এক সেন্‌কা ছাড়া আর কোন প্রাণীকে উঠানে দেখিতে পাইত না। ঘন ঘন সে নিঃশ্বাস ফেলিত।—তার ছিন্ন সার্ট, উস্কখুস্ক চুল, ঘর্ম্মাক্ত দেহ ও উত্তেজিত নখের আঁচড়ওয়ালা মুখ, সে পাগলের মত চেহারা নিয়ে উঠানে দেখা দিত। হাত দু'খানা পেছনে নিয়ে দু'একবার দেয়ালের শেষ সীমা পর্য্যন্ত ঘুরিত, কখনো বা শিষ দিতে দিতে চারিদিকে খুব কড়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত, যেন সে পুটেনককের বাড়ীর সমস্ত ভাড়াটেকেই দ্বন্দ্বে আহ্বান করিতেছে। তারপর হয়তো বসিয়া সার্টের হাতা দিয়া তার মুখের রক্ত মুছিত। অনেকক্ষণ অসাড় অবস্থায় পাশের বাড়ীর দেয়ালের অন্ধকারের পানে চাহিয়া বসিয়া থাকিত।

ওরলফ মুচির বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর—তার সুন্দর মুখখানায় বেশ কালো এক জোড়া গোঁফ ছিল, তার নীচে তার লাল ঠোঁট দু'খানি বেশ মানাইত; সূক্ষ্ম নাসার উপর যুগ্ম টানা ভ্রূ, তার নীচে চঞ্চল কালো চোখ দুটি। কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ তার মাথাটিকে ঘিরিয়াছিল। ওরলফের দোহারা চেহারা,—সে বেশ জোয়ান গোছের লোক ছিল।—

সূর্য্যের আলো উঠান হইতে চলিয়া গিয়াছে, গোধূলির আলো তখনো ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। অরেলপেন্ট, নানারকম পচা তরিতরকারী ও অন্যান্য জিনিসের সমবেত গন্ধ সন্ধ্যার বাতাসকে দুর্গন্ধি করিয়া গৃহবাসীর নাক জ্বালাইতেছিল। তেতালার বাসগৃহ হইতে গান ও নানা চীৎকারের শব্দ আসিতে লাগিল, একজন মাতাল সেখানকার জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া ওরলফের পানে বক্রকটাক্ষ হানিয়া বিদ্রূপ-হাসি হাসিয়া সরিয়া পড়িল।

চিত্রকরদের কাজ হইতে অবসরের সময় আসিয়াছে, তাহারা ওরলফের পাশ দিয়া যাইবার সময় এ উহার পানে ইসারা করিয়া বিদ্রূপ-হাসি হাসিয়া নানা কথা কহিতে কহিতে উঠানে নামিয়া পড়িল। তারপর তাহারা সকলে ছাড়াছাড়ি হইল, কেহবা হাত মুখ ধুইতে গেল, কেহবা মদের দোকান পানে চলিল। তাদের পেছনে দর্জ্জির দল উঠান হইতে নামিতে লাগিল, তাহারা কেহ কেহ চিত্রকরদের কথা লইয়া ঠাট্টা করিতেছিল, উঠান আবার হাসি ঠাট্টার স্বরে পূর্ণ হইয়া উঠিল, ওরলফ কাহারও পানে লক্ষ্য না করিয়া এককোণে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কেহ তাহার নিকটে গেল না, কেহ তাহাকে লইয়া একটু কৌতুক করিতেও সাহসী হইল না,—কারণ সকলেই জানিত—এ সময় সে বন্যপশুর মতই ভয়ঙ্কর। এই ব্যথিত নির্য্যাতিত মন লইয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার মনে হইতে লাগিল যেন তাহার বুকের উপর পাষাণভার চাপিয়া আসিতেছে—তাহার দম যেন ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিতেছে। তাহাকে কেহ যেন ওই স্থানে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছে………সেই ভাবে সে বসিয়া রহিল।

সময় সময় তাহার নাকটা ফুলিয়া উঠিয়া—ঠোঁট দু'খানি একটু খুলিয়া তাহার হলুদবর্ণের দন্তপাটি বিকশিত হইয়া যেন বলিয়া দিত—কি অশান্তি তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে; তাহার চোখ দুটা ক্রমেই বেশী রাঙ্গা হইয়া উঠিত। বিষাদে যেন সে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে—সেই সঙ্গে তার মদের জ্বালাময় তৃষ্ণা আরও যেন বাড়িয়া। সে জানিত একটু পান করিলেই তাহার মনটা অনেক হাল্‌কা হইয়া যাইবে। কিন্তু এখনও যে রাস্তায়

আলো আছে,—সে এই ছেঁড়া নেকড়া আর জামা পরিয়া কেমন করিয়া রাস্তায় বাহির হইবে,—অনেকেই যে তাহাকে ওরলফ মুচি বলিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে চেনে। তাহার আত্মসম্মান বোধ ছিল, সে এ ভাবে সকলের হাসির পাত্র হইতে রাজী ছিল না। সে যে ঘরে গিয়া মুখ হাত ধুইয়া কাপড় বদলাইয়া আসিবে তাহাও পারিতেছিল না,—সেখানে তাহার স্ত্রী রক্তাক্ত দেহে মাটিতে পড়িয়া আছে—এই তো এই মাত্র সে তাহার উপর শত অত্যাচার করিয়া আসিল—এখনই সে তাহার সাহত কোন মতেই দেখা করিতে পারিবে না!

সে নিশ্চয়ই এখনও সেখানে পড়িয়া গোঙাইতেছে—তাহার মনে হইতেছিল তাহার পত্নী যেন মৃতা—সহস্র ভাবে তাহার নিকট সে অপরাধী। সে এ সমস্তই বেশ পরিষ্কার বুঝে। সে বেশ জানে পত্নীর প্রতি এ ব্যবহারে সেই দোষী—এ চিন্তা মনে উঠিতেই পত্নীর উপর তার ঘৃণা আরও বৃদ্ধি পায়। সমস্ত চিন্তা অনুভূতির উপর একটা অস্পষ্ট দুর্ব্বোধ অথচ দুজ্জর্য় ক্রোধের অগ্নি জ্বালাইয়া তাহার চিত্তকে অভিভূত করিয়া ফেলে—আবার কেমন যেন একটা বিষাদভার তাহার অন্তরাত্মাকে মথিত করিয়া তাহাকে আরও নির্য্যাতিত করে.—এ অবস্থা হইতে পরিত্রাণের উপায় কি—মদের আশ্রয় লওয়া ছাড়া আর যে কিছু সে জানে না।—

বেঞ্জোবাদক এই সময় উঠান দিয়া যাইতেছিল, লাল সিল্ক সার্টের উপর ভেলভেট টিউনিক তার গায়, পায় একজোরা বেশ ভাল পালিস জুতো, এক হাতে তার নীলখাপে পোরা বাদ্যযন্ত্র,—গোঁফ জোরা বেশ ভাল করে মোচড়ান—মাথার টুপিটা একপাশে বেঁকা করে মাথায় বসান—তাহাকে দেখিয়া বেশ একটি সজীব আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইতেছিল। ওরলফের কাছে তাহার সহজ সরল ব্যবহার, তাহার সজীবতা ও গানবাজনা ভাল লাগিত, এবং সে তাহার বন্ধনহীন উজ্জ্বল সুখসৌভাগ্যপূর্ণ জীবনকে হিংসা করিত। বেঞ্জোবাদক ঠাট্টা করিয়া কহিল "রক্তাক্তদেহ বিজয়ীবীর আমার অভিবাদন গ্রহণ কর।" ওরলফ্ যদিও এই ঠাট্টা পঞ্চাশবার শুনিয়াছে তবু সে ইহাতে রাগিল না। সে জানিত বেঞ্জোবাদকের কথায় বিদ্বেষ-বিদ্রূপ ভাব কিছু নাই, এ শুধু প্রাণখোলা একটু আনন্দ। বেঞ্জোবাদক সম্মুখে দাঁড়াইলে ওরলফ্ কহিল "কি ভাই কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

"ওরলফ্ বড়ই বিমর্ষ দেখাচ্ছে তোমায়......একমাত্র জায়গা আছে জগতে যেথায় তোমার আমার মত লোকে শান্তি পেতে পারে—চল যাওয়া যাক্, এক সঙ্গে কিছু হবে' খন।" ওরলফ্ মাথা না উঠাইয়াই উত্তর করিল "এত সকালে!"

বোঞ্জোবাদক কাইজাক চলিতে চলিতে বলিল "বেশ এস—আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।" কিছুকাল পরেই ওরলফ তাহার অনুসরণ করিল। সে বাহির হইতেই কুঠুরী হইতে একটী বেঁটে নারী বাহির হইল। একখানা রুমাল দিয়ে তার মাথা শক্ত করিয়া জড়ান—তার একটা চোখ ও গালের একাংশ মাত্র বাইরে দেখা যাইতেছে, সে কাঁপিতে কাঁপিতে দেয়াল ভর দিয়া যাইয়া তাহার স্বামী যে জায়গায় বসিয়াছিল সেইখানে বসিল। কেহ তাহাকে এরূপভাবে দেখিয়া বিস্মিত হইল না, কারণ সকলেই পূর্ব্বাপর ইহা দেখিয়া আসিতেছে। সকলেই জানিত যে পর্য্যন্ত না ওরলফ্ মত্ত অনুতপ্ত হইয়া সুঁড়ির দোকান হইতে ফিরিয়া আসিবে সে পর্য্যন্ত সে ওই ভাবেই বসিয়া থাকিয়া মত্ত চঞ্চল স্বামীকে শয়নকক্ষে লইয়া যাইবে,—সিঁড়িগুলি বড় অপ্রশস্ত, ভাঙ্গা; একবার ওরলফ্ সুঁড়ির দোকান হইতে ফিরিবার সময় পড়িয়া গিয়া তাহার হাত ভাঙ্গিয়া প্রায় একপক্ষ কাল কোন কাজ করিতে পারে নাই—সে তখন জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ঘরে যা কিছু ছিল সব বাঁধা দিতে বাধ্য হইয়াছিল,—সেই হইতে ম্যাট্রোসা এ বিষয়ে খুব সতর্ক।

এক এক সময় কোন ভাড়াটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিত—তার মধ্যে লিউসেঙ্কোই বেশী—সে হাঁই তুলিয়া বেশ একটু জমাইয়া জিজ্ঞাসা করিত "কি গো আজও আবার কিছু হবে না কি ?" ম্যাট্রোসা বেশ একটু শক্তভাবেই উত্তর দিত "তা দিয়ে তোমার কি দরকার ?" "না না কিছু না"—তারপর দু'জনেই অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিত লোকটা আবার বলিত "বড়ই দুঃখের বিষয় তোমাদের দু'জনার দা কুড়োল সম্বন্ধ—একটু বনিয়ে নাও না।" ওরলফ্ পত্নী সংক্ষেপে উত্তর করিত "সে আমাদের কাজ।" লিউসেঙ্কো যেন তাহার মত পূর্ণসমর্থন করিল—এই ভাবে কহিল "নিশ্চয়, নিশ্চয়,—এ তোমাদেরই কাজ !"......ম্যাট্রোসা রাগতস্বরে কহিল "কি বল্‌তে চাচ্ছ তুমি ?"

"এঁ্যা—এঁ্যা—কি বিশ্রী মেজাজ তোমার গা—আর কাউকে একটা কথা বল্‌তে দেবে না তোমাদের সম্বন্ধে! যখনই তোমায় আর ওরলফ্‌কে আমি দেখি তখনি আমার মনে হয় 'বাঃ কি যুগল মিলেছে রে! দুটোতে কুকুরের মত সমস্ত দিন খাঁ্যা খাঁ্যা চলছে,—তোমাদের দুজনারই সকালে বিকেলে আচ্ছা পিটুনির দরকার, তা হলে বোধহয় তোমাদের ঝগড়ার সাধ মিটতে পারে।' এই বলিয়া সে রাগে গম্ গম্ করিয়া চলিয়া যাইত। ম্যাট্রোসা খুসীই হইত ইহাতে, লিউসেঙ্কোর এই বন্ধুভাব জানাতে গিয়ে শত্রুভাবে ফিরে আসা নিয়ে উঠানে অনেক ফিস্‌ফিস্ গিস্‌গিস্ শোনা যাইত। ম্যাট্রোসা মোটেই পছন্দ করিত না যে কেউ তাদের দু'জনার কথা নিয়ে কোন মন্তব্য প্রকাশ করে।

লিউসেঙ্কোর বয়স যদিও চল্লিশ পার হইয়া গিয়াছিল তবু সে সৈনিকের মত পা ফেলিয়া উঠানের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ঘুরিতে আরম্ভ করিত। এই সময় সেন্‌কা দৌড়াইয়া আসিয়া লিউসেঙ্কোর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ম্যাট্রোসার ঘরের দিকে ইসারা করিয়া বলিত "এঁ্যা খুড়ো জমাতে পারলে না !"

"একদিন আচ্ছা মার দোব বুঝ্‌লে ছোকরা।" লিউসেঙ্কো এই বলিয়া সেনকাকে ভয় দেখাইত—কিন্তু তাহার গোঁফের নীচের হাসি বলিয়া দিত, সে এই বাড়ীর সকল গোপনকথাঅভিজ্ঞ বালকটিকে ভালবাসে, এবং তাহার সহিত কথা কহিয়া আনন্দ পায়। সেনকা লিউসেঙ্কোর ভয় দেখানো গ্রাহ্য না করিয়া আপন মনে কহিত "ও জায়গায় জুত হবে না খুড়ো, চিত্রকর ম্যাকাসিনকাও চেষ্টা করেছিল—কিন্তু তার পরিশ্রমের ফল সে কি পেয়েছিল ?...কানে এক ঘুঁসি...! আমি নিজ চক্ষে দেখেছি......"

এই সদাপ্রফুল্ল দ্বাদশ বর্ষীয় বালকটি এই সমস্ত আবর্জ্জনার মধ্যে থাকিয়া স্পঞ্জ যেমন ভাবে জল শুষিয়া লয় সেই ভাবে সব শোষণ করিত ; তার কপালের কুঞ্চন রেখা দেখিয়া বোঝা যাইত সে ইহার মধ্যে চিন্তাও করিতে শিখিয়াছে।

অঙ্গন অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল। মাথার উপরে নীল আকাশ যেন একখানা পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া সব আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তারার আলো মাঝে মাঝে ফুটিয়া উঠিতেছিল। চারিদিকে দেয়াল-ঘেরা উঠানটাকে মনে হইতেছিল যেন একটা অন্ধকূপ। ইহার এক কোণে জড়সড় হইয়া ম্যাট্রোসা মার খাইয়াও তাহার মত্ত স্বামীর প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষায় বসিয়াছিল।

(২)

তিন বৎসর হইল ওরলফ্ দম্পতির বিবাহ হইয়াছে। তাহাদের একটী ছেলেও হইয়াছিল, কিন্তু সে দেড় বৎসরের হইয়া মারা যায়। তাদের কেউ ইহাতে বড় বেশী দুঃখিত হয় নাই, কারণ তারা মনকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিত যে, শীগ্‌গীরই তারা আর একটী পাইবে। যে কুঠুরীতে তাহারা বাস করিত, সেটি বেশ লম্বা, অপরিষ্কার, ছাদ

মাকড়সার জালে ছাওয়া, দোরের সম্মুখেই দেয়ালের পাশ দিয়া একটা সরু রাস্তা, সেই রাস্তা একটা চতুষ্কোণ কুঠুরীর মাঝে গিয়ে পড়িয়াছে—এ ঘরে দুইটা জানালা আছে সেই জানালা দিয়া উঠানের আলো ঘরে আসে। এই জানালার আলোই সামান্য সেই নোংড়া স্যাঁৎসেঁতে খোপের মধ্যে যায়। জীবনের স্রোত এর চেয়ে অনেক দূরে প্রবাহিত হইতেছে, এখানে শুধু তারই একটা অস্পষ্ট ক্ষীণধারা বাইরের ধূলি জঞ্জালের সঙ্গে আসিয়া ওরলফের চিত্ত ও চিন্তাকে নানাভাবের বর্ণহীন জালে আচ্ছন্ন করিয়া যাইত। ষ্টোভের পাশে ধূসর পর্দ্দার পেছনে তাদের উভয়ের শোবার বিছানা, অপর পাশে দেয়ালের সঙ্গে একটা টেবিল, সেইখানে ওরলফ দম্পতি চা পান করিত ও খাবার খাইত এবং বিছানা ও মাঝখানের জায়গায় বসিয়া তাহারা কাজকর্ম্ম করিত। কক্ষের চারিদিকে মাছিগুলো সব ভন্ ভন্ করিয়া উড়িয়া বেড়াইত। ওরলফ্ দম্পতির দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অতি সাধারণ একঘেয়ে রকমেরই ছিল, ম্যাট্রোসা ভোর ছ'টায় উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া চার জল ষ্টোবে চড়িয়ে ঘর দোর ঝাঁট দিত, প্রাতর্ভোজনের সব ঠিক করিয়া তারপর স্বামীকে ডাকিত, ওরলফ্ উঠিলে উভয়ে চা পান করিত। ওরলফ্ একজন বেশ ভাল কারিগর ছিল, সেই জন্য কখনও তার হাত কাজছাড়া থাকিত না। চা খেতে খেতে তারা দিনের কাজ উভয়ের মধ্যে ভাগ করিয়া লইত,—যে সব কঠিন সরু কাজ তা ওরলফ্ নিজের হাতে রাখিত, মোটা কাজ, সুতো বুনিয়ে নেওয়া ও মোমে ঘসা এই সব কাজের ভার ম্যাট্রোসার উপর পড়িত। প্রাতর্ভোজন করিবার সময় দুপুরের আহারের আলোচনাও চলিত, ভোজন হইয়া গেলেই তারা কাজে বসিয়া যাইত, দু'জনে পাশাপাশি বসিয়া কাজ আরম্ভ করিত। প্রথমে তারা চুপ করিয়া বসিয়াই কাজ করিয়া যাইত—কি কথাইবা বলিবার আছে? একবারবা কাজকর্ম্মসম্বন্ধে একটা কথা হইল—আবার সেই নীরবতা! ওরলফ্ মাঝে মাঝেই হাঁই তুলিত এবং প্রতি হাঁইয়ের পর মুখ বুঁজিবার সময় বেশ একটু শব্দ হইত—ম্যাট্রোসা নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলিত।

কোন কোন সময় ওরলফ্ গান আরম্ভ করিয়া দিত, তার স্বর বেশ উচ্চগ্রামে উঠিত—মিষ্টও মন্দ ছিল না। তাহার সমস্ত হৃদয় মথিত করিয়া যেন সেই বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস উঠিত। ম্যাট্রোসাও ক্ষীণ কোমলকণ্ঠে স্বামীর গানে যোগ দিত। এই সময় দুইখানা মুখের চেহারাই চিন্তাক্লিষ্ট ব্যথিত বোধ হইত, এবং ওরলফের কালো চোখ দুইটি যেন জলে ভিজিয়া আসিতেছে। তাহার পত্নী যেন স্বর লহরীতে ডুবিয়া গিয়াছে, মনে হইত যেন সে শুধু সঙ্গীত-জগতেই বিরাজ করিতেছে—সময় সময় সে একেবারেই জ্ঞানহারা হইয়া যাইত আবার স্বামীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইত। এই সময় তাহারা ছাড়া যে দুনিয়ায় লোক আছে এ কথা তাহাদের মনে থাকিত না, তাহাদের আনন্দহীন জীবনের সকল শূন্যতা তাহারা যেন গানে ছড়াইয়া দিতেছে। হঠাৎ ওরলফ্ বলিতে আরম্ভ করিত—"আঃ—আমার জীবন!—আমার অভিশপ্ত জীবন! কি বেদনার জীবন আমার—জ্বলে যাচ্ছে। কি অভিশপ্ত ব্যথা! ওঃ কি ভীষণ জ্বালা! এই সন্তাপ আর দুঃখ......!"

ম্যাট্রোসা কিন্তু এই হঠাৎ দার্শনিকতা পছন্দ করিত না—সে বলিত, "মরণ যখন দেখ্‌তে পাচ্ছ—তখন কুকুরের মত চেঁচিয়ে মর কেন?" সে তৎক্ষণাৎ রোষভরে তাহার উত্তর দিত—"করি না, শুধু যখনই ওই ব্যথা আমায় চেপে ধরে তখন আর নিজেকে সামলাতে পারি না যে......"

"তুই এর কি বুঝ্‌বি! বোঝ্‌বার ক্ষমতাই আছে তোর ভারি!"

"হাঁ জানাও যত পার...... না পার চীৎকার করে ওঠ!"

"চুপ কর—আমি কিছু বুঝিনা—তাই তুই আমায় শিক্ষা দিতে চাস্.........না? নিজের চরকায় তেল দে গে!"

ম্যাট্রোসা দেখিত তাহার চোখে ক্রোধের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, গলার শিরাগুলি সব ফুলিয়া উঠিয়াছে,—সে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া স্বামীর কথার উত্তর দিতে অস্বীকার করিত—কিন্তু তার রাগ যেমন হঠাৎ হইত তেমনি হঠাৎ চলিয়া যাইত। সে তার চোখ দুইটি স্বামীর দৃষ্টি হইতে ফিরাইয়া নিত; যাতে আর ওদিকে দৃষ্টি না পড়ে। ওরলফের রাগ ক্রমে পড়িয়া আসিত,—স্ত্রীর প্রতি তার দুর্বাক্য, দুর্ব্যবহারের কথা মনে পড়িয়া তার চোখ দুইটি আত্মতিরস্কারে ও ভালবাসায় পূর্ণ হইয়া উঠিত।

সে তার স্বামীর এই পুনর্মিলন চেষ্টায় কোন সাড়া দিত না,—যদিও সে স্বামীর মুখে হাসি দেখিবার জন্য অধৈর্য্য ভাবে প্রতীক্ষা করিত—মন কিন্তু ভয়ে কাঁপিতে থাকিত, কি জানি আবার তাহার স্বামীর মেজাজ পাছে তাহার এই খেলায় বিগড়াইয়া যায়—কিন্তু তাহার এও অত্যন্ত তৃপ্তির কারণ যে সে স্বামীর সম্মুখে বসিয়া তাহার ভালবাসার অভিনয় দেখিতেছে,—এ যেন জীবন্ত, এতে অনুভূতি, ভাব রসকে জাগাইয়া তোলে—এতে যেন তার চিন্তার একটা খোরাক জোগাড় হইত। তাহারা উভয়েই তরুণ, সুস্থ, দুজনা দুজনকে ভালবাসে ও এ উহার গর্ব্বের বস্তু। ওরলফ্ দেখিতে সুন্দর বলবান, ম্যাট্রোসাও বেশ বেঁটে খাট ছোট্ট মানুষটি, রং তার পরিষ্কার, উজ্জ্বল,—চোখে তার সরলতামাখা, প্রতিবেশীরা যেই দেখিত সেই বলিত "বাঃ—সুন্দর মেয়েটি" তাদের মধ্যে ভালবাসাও যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তাদের জীবন এমন একঘেঁয়ে বৈচিত্র্যহীন:ও মানুষের জীবনে যাহা একান্ত প্রয়োজনীয় ও প্রত্যেক প্রাণীরই হৃদয় যাহা চায়—সেই উদ্যম-উৎসাহ অভাব ও বহির্জগতের কোন প্রভাব হইতে তাহারা একান্ত বঞ্চিত ছিল,—যাহাতে মাঝে মাঝে এই এক চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তাও মন অধিকার করিতে পারে এমন কোন চিন্তা তাহাদের ছিল না।

এ বস্তুতন্ত্রেরই মনস্তত্ত্ব ঘটিত কথা—যদিও স্বামী স্ত্রী খুব উচ্চ শিক্ষিত হয়—কিন্তু তাহাদের জীবনে অন্য কোন বিষয়ে উৎসাহ না থাকে কিম্বা বহির্জগত সম্বন্ধে একেবারে নিঃসম্পর্ক হইয়া থাকিতে চায় তবে নিশ্চয়ই তাহারা এরূপ দাম্পত্য-জীবনে ক্লান্ত হইয়া পড়িবেই ও উভয়ে উভয়ের নিকট ভার মনে হইবেই। যদি ওরলফ্ দম্পতির জীবনের কোন উদ্দেশ্য থাকিত এমন কি আধ পয়সা করিয়া জমাইয়া কিছু সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তিও যদি থাকিত তবু তাহাদের জীবন অনেক সহজ হইয়া আসিত, কিন্তু সে প্রবৃত্তিও তাহাদের ছিল না—যাহাতে উভয়ের মধ্যে একটা বন্ধন থাকিয়া যায়। দু'জন দু'জনকে সব সময় চোখের সাম্‌নে দেখিতে পাইত, তাই উভয়ে উভয়ের মেজাজ চলন ভঙ্গীর সহিত অতি পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিল।

দিনের পর দিন কাটিত কিন্তু তাদের জীবনে পরিবর্ত্তন বা উৎসাহের কিছুই আসিত না। ছুটির দিন কখনো তাহারা তাহাদের মতই দরিদ্র শূন্য-মনা বন্ধুদের সহিত দেখা করিতে যাইত; কখনও বা বন্ধুরা তাহাদের সহিত দেখা করিত, আসিয়া মদ খাইয়া ঝগড়া ঝাঁটি করিয়া বাহির হইয়া যাইত।

আবার সেই অনন্ত একঘেঁয়ে দিন একটা অদৃশ্য সূত্রের মত তাহাদের সম্মুখে ভাসিয়া আসিয়া জীবনকে নির্য্যাতন করিয়া পরস্পরের প্রতি শুধু একটা বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিত। ওরলফ্ বলিত "কি যে শয়তানের খেলা এ জীবন —যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আছি। আমাদের জন্ম হয়েছিল কি জন্য? কাজ আর ক্লান্তি—ক্লান্তি আর কাজ ...... ভাল, এ ভগবানের ইচ্ছা,—আমার মা আমায় গর্ভে ধারণ করবেন ...... তাই ওনিয়ে বক্-বক্ করে লাভ নেই। তারপর আমি আমার ব্যবসায় শিখলাম, কেন কিসের জন্য?...... আমি ছাড়া কি আর জগতে মুচি ছিল না? বেশ, তাই তারপর আমি মুচি হলাম......তারপর......আমার জন্য কি সৌভাগ্য সঞ্চিত রয়েছে এতে...... আঁধার ঘরে বসে বুট সেলাই করতে করতে ক্রমে আমি মরে যাব—ওরা বল্‌ছে সহরে কলেরা এসেছে......

সম্ভব ও কোন দিন আমাদের খুঁজে বের কর্‌বে.........তারপর ওরা শুধু বল্‌বে “এইখানে একজন ওরলফ্‌ নামে ছিল, জুতা তৈয়ারী কর্‌ত·····! মরে গেছে......কি হোল এতে! কি আবশ্যক এতে যে আমি বেঁচে থেকে জুতো তৈরী করব তারপর মরে যাব এঁ্যা!” ম্যাট্রোসা চুপ করিয়া থাকিত, তাহার স্বামী এই ভাবে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেই সে বড় বিচলিত হইয়া পড়িত—স্বামীকে বারবার ওভাবে কথা বলিতে নিষেধ করিত, কারণ প্রাণ যিনি দিয়াছেন সেই ভগবানই জীবের ব্যবস্থাও করিয়াছেন,—এ যেন ভগবানের বিরুদ্ধে কথা কওয়া। কখনও বা যখন সে খুব ব্যথিত না হইত, অতি সাধারণ ভাবের একটা মন্তব্য প্রকাশ করিত “তুমি আর ও ছাইমদ খেওনা তা হলেই জীবন বেশ সুখে কাটাতে পারবে। ওসব চিন্তা মনে এনে কেন অশান্তি ভোগ কর। আরো তো সকলে বেঁচে আছে, তারা তো কেউ এমন ভাবে না, তারা টাকা জমায়—নিজেদের দোকান খোলে—পরে বেশ সুখে দিন কাটায়।” ওরলফ্‌ রাগিয়া উত্তর দিত “চুপ বোকা, যা তা বল্‌ছে বোকার মত; একটু ভেবে দেখ্‌না মদ ছেড়ে আমি কি করে বাঁচ্‌বো, ওই যে আমার জীবনের একমাত্র আনন্দ! তুই আর সকলের কথা বল্‌ছিস, কজনের কথা জানিস্‌ শুনি, যারা স্বাধীনভাবে দোকান পসার করে সৌভাগবান, সুখী হয়েছে? আমি কি আমার বিয়ের আগে সম্পূর্ণ একজন ভিন্ন ধরণের লোক ছিলাম না? এই আমি তোকে সত্যি কথা বল্‌ছি—তুইতো আমার জীবন এমন হেতো করে তুলেছিস্‌—হতভাগি কোথাকার।......

ম্যাট্রোসা স্বামীর কথাগুলি শুনিয়া ভাবিত তাহারই ভুল হইয়াছে; স্বামী বলে মদ খেলে আনন্দ পায় ভাল থাকে সে ঠিক কথা। আর সকলের কথা সে যা বলেছে সে শুধু তার মনগড়া কথা। এবং তাদের বিবাহের পুর্ব্বে সে যে বেশ হাসিখুসি মনখোলা ভাল মানুষ ছিল সেও সত্যি কথা······যাই হোক এখন সে একটা বন্য পশুর মত হইয়া উঠেছে—······‘সত্যি কি তবে আমি তার পক্ষে এত ভার?’ চিন্তায় ম্যাট্রোসার অন্তর ব্যথিত হইয়াছিল, সে উঠিয়া গিয়া স্বামীর চোখের পানে হাসিয়া চাহিয়া তাহার মাথা নিজের বক্ষে লইত।

“দেখ মজা দেখ, ও আমায় সান্ত্বনা দেবার ভারি সুযোগ পেয়েছে।” স্বামী এই বলিয়া তাহাকে নিজের কাছ হইতে সরাইয়া দিবার ভান করিত কিন্তু ম্যাট্রোসা বেশ জানিত এ তার মনের ইচ্ছা নয় তাই আরো তাহাকে জড়াইয়া ধরিত। হঠাং ওরলফের চোখ দুটি আনন্দ মুদিয়া আসিত, সে তার হাতিয়ার এক দিকে সরাইয়া পত্নীকে ব্যাকুল আগ্রহে চুম্বন করিতে থাকিত, আবেশে সে তাহার গভীর দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া পত্নীর কানে কানে বলিত “ম্যাট্রজা এ জায়গায় আমরা যেন কুকুর বেড়ালের মত বাস কচ্ছি······আমরা যেন পশুর মত একজন অপরকে ছিঁড়ে খাই········কেন এমন হয়? এ বোধহয় আমার ভাগ্য······সব মানুষই বোধ হয় এক একটা নক্ষত্রে জন্মে, সেই নক্ষত্রই তার ভাগ্য নির্দ্ধারণ করে।” কিন্তু এ বুঝিয়াও যেন তাহার মনের শান্তি আসিত না; সে পত্নীকে আরো নিকটে টানিয়া লইত, কেমন যেন একটা অদ্ভুত আনন্দে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিত। ম্যাট্রোসা শুধু নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলিত। কখনো কখনো এই ভরা সুখের সময় তাহার অযথা নির্য্যাতন ও যাতনা ভোগের কথা মনে পড়িয়া সে কাঁদিয়া ফেলিত। পত্নীর মৃদু তিরস্কার ওরলফের হৃদয়ে বাজিত এবং তাহার আলিঙ্গন ক্রমেই নিবিড় হইতে থাকিত। ক্রমে সুখ-মিলন-মুহূর্ত্তে ম্যাট্রোসার হৃদয় বাঁধ মানিত না—সে কাঁদিত আর কাঁদিত। ওরলফের ধৈর্য্য ভাঙ্গিয়া যাইত। সে কর্কশস্বরে বলিত রেখে দে তোর প্যাঙ্গ্যানি, তোকে যখন মারি তখন তোর চেয়ে সহস্রগুণ যাতনা ভোগ করি আমি...চুপ

এখন···চুপ করবি কি না বল, একটু যদি নাই দেওয়া গেল এই নারী জাতটা তবেই পেয়ে বসবে, আর কিছু বলতে হবে না আমায়...মানুষের জীবনই যখন ভার বোধ হয় তখন কি করবে সে ?" আবার যেন তাহার হৃদয় পত্নীর কান্নায় ও অনুযোগে দ্রবীভূত হইয়া আসিত। তখন সে চিন্তিত ভাবে কোমলস্বরে কহিত—"বলতো এ মেজাজ নিয়ে আমি যাই কোথা ? তোকে আমি প্রায়ই ব্যাথা দি। সে সত্যি কথা···এ আমি বেশ জানি একমাত্র তুই জগতে আমার কথা ভাবিস্—যদিও একথা প্রায়ই আমার ভুল হয়ে যায়, কিন্তু সময় সময় আমার মন কেমন হয়ে যায় যেন আর আমি তোর ছায়া সহ্য করতে পারিনা—যেন তোর সঙ্গে সকল সম্বন্ধ জন্মের মত চুকে যাচ্ছে। তারপর এমন একটা রাগ আসে মনে হয় তোকে আর আমাকে দুজনাকেই ছিঁড়ে ফেলি। তখন তুই যতই ঠিক কথা বলিস্ ততই আমার তোকে বেশী মারবার ইচ্ছা হয়।" স্বামী কি বলিতে চাহিতেছে সে ঠিক বুঝিতে পারিত না, কিন্তু তাহার ভালবাসায় স্বরে সে মুগ্ধ হইত।

"ভগবান করুন যেন আমাদের দু'জনারই ভাল হয়; একটা ছেলে যদি হোত আমাদের তবে বোধহয় বড় ভাল হোত—তাহলে একজনের কথা ভাবতে হোত আমাদের, জীবনও একটু ভিন্ন ভাবের স্বাদ পেত।"

ম্যাট্রোসা উপরের দিকে চাহিয়া মৃদু স্বরে বলিত "হায়—ভগবান।" ওরলফ্ আবার নিজের ভুল কাটানের অভিপ্রায় বলিতে আরম্ভ করিত "যা হোক দেখ্ সত্যিইতো আর আমি পশু নই ! এ ত আর আমি বড় সুখে করি না। শুধু যখন ঐ ব্যথা আমায় চেপে ধরে তখন যে আর নিজকে সামলাতে পারি না।

ম্যাট্রোসা বিমর্ষভাবে কহিত "কেমন ভাবে ও ব্যথা আসে তোমার শুনি।" ওরলফ্ দার্শনিকের মত বুঝাইল "দেখ এ আমার কপালের লেখা, আমার ভাগ্য আর এই প্রকৃতি। আমি কি আর সকলের চেয়ে খারাপ—এ্যাঃ ? ধর না ওই লিউসেস্কোর চেয়েও কি খারাপ ? নিশ্চয়ই তার জীবন আমার চেয়ে ঢের সুখে কেটে যাচ্ছে—সে তো আর জানে না এ ব্যথা কি ! সে সংসারে একা—স্ত্রী নেই। আত্মীয়স্বজন নেই,—কিন্তু তোকে ছাড়া আমি নিশ্চয়ই মরে যাব যে। হাঁ সত্যি ও শয়তানটা খুব সুখী. দিব্যি পাইপ টানছে, হেসে খেলে বেড়াচ্ছে······কিন্তু আমি তো ও ভাবে জীবন চালাতে পারি না......নিশ্চয়ই জন্মের সময় আত্মার ভেতরে কি অশান্তি নিয়ে জন্মেছিলাম, তাই এমন প্রকৃতি পেয়েছি। লিউসেস্কোর প্রকৃতি হচ্ছে সোজা একখানা ছড়ির মত আমার হচ্ছে বেঁকা পেচান; একটু চাপ পেলেই এ কেমন নেচে ওঠে। ধর রাস্তা দিয়া সোজা চলেছি, চারিদিকে অসংখ্য সুন্দর জিনিস সাজান রয়েছে। কিন্তু কিছুই আমার নয়,—এতে যেন আমার মনে কেমন আঘাত লাগে,—ও শয়তানের তো এ সব কিছুই দরকার নেই। কিন্তু ওই গোঁফওয়ালা বাঁদরের কোন অভাব নেই এই ভাবতেই আমার মেজাজ যেন কেমন হয়ে ওঠে, আমার যখন ···· আমি বুঝতে পারি না কি যে চাই......আমার সবই পেতে ইচ্ছা যায়—হাঁ সবই। কিন্তু আমি এই ঘরে বসে সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত কাজ করে যাই—পরিণাম—কিছুই না ! তুই আর আমি দু'জনে একসঙ্গে বসি; তুই আমার পত্নী······কিন্তু এ সবে কি ফল ? কি আছে তোর ভেতরে যে তুই আমায় খুসী করতে পারিস্ ? আর সব নারী যেমন তুইও তেমনি। তুই তো আর আমায় নূতন কিছু দিতে পারবি না......আমি তো তোকে খুব ভাল ভাবেই চিনি। এমন কি এও আমি জানি, কাল তুই কি ভাবে হাঁচবি,—এ আমি ভাল জানি কারণ, তোর ঐ একই রকমের হাঁচি আমি সহস্রবার শুনেছি......এ জীবনে কোথায় আমি নূতনত্ব পাব ? নূতন কিছু চাই, জীবনের উপর অনুরাগ বাড়াতে—নূতন কিছু চাই—এই আমার অভাব জীবনে। হাঁ ····আর এই জন্যেই আমি মদের দোকানে যাই—কারণ সেথায় একটু আনন্দ পাই···। ম্যাট্রোসা বলিল—"এই যদি মনে ছিল তো বিয়ে করেছিলে কেন ?" ওরলফ্ ব্যঙ্গভরে কহিল "কেন ? শয়তান জানে শুধু কেন ! সব সময় মনে মনে

বলি এ না করাই উচিত ছিল, এর চেয়ে একটা ভবঘুরের দলে মিশে পড়াই ছিল ভাল। সেথায় ক্ষুধায় কষ্ট পেলেও স্বাধীন থাকা যেত।" ম্যাট্রোসা বলিল "সেই ভাল, আমার ত্যাগ করে স্বাধীন হতে এখনো স্বচ্ছন্দে পার— যাও না তোমার যেথা ইচ্ছা – মস্ত বিশ্ব তোমার চোখের সামনে পড়ে রয়েছে।" ম্যাট্রোসা কষ্টে অশ্রু দমন করিয়া কহিত "যাও তা হলে...... ছেড়ে দাও আমায়!" ওরলফ্ রাগিয়া জিজ্ঞাসা করিত—"কোথায় তুই যাবি তা হলে ?"

"যেথা চোখ যায়।"

একটা বিজাতীয় ঘৃণার জ্বালা সে চোখে বাহির করিয়া চীৎকার করিয়া কহিত—"কোথায় ?"

"চেঁচিও না অত,—আমি তোমায় দেখে ভয় পাই না!"

"কি!...... যা যা দূর! নতুন ঘর সংসার পাত্‌তে মন বুঝি ?"

"দাও আমায় যেতে দাও।"

ওরলফ্ তেমনি চীৎকার করিয়া কহিত "কোথায় যেতে দেব তোকে আমি ?" সে পত্নীর মাথার রুমাল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া রাগে তাহার চুল ধরিয়া টানিল। তার ঘুসি খাইয়া মনে তার যতই বাধা দিবার প্রবৃত্তি জাগিতে লাগিল ততই সে বেশী মার খাইতে লাগিল, এবং স্বামীর এই ক্রোধ ভাব তাহার অন্তরের সমস্ত তন্ত্রী কাঁপাইয়া একটা পরম সুখের বাতাস বহাইয়া দিল। সে তাহার স্বামীর ঈর্ষাভাব কোনরূপে কথায় কমাইবার চেষ্টা না করিয়া পরম সুখে মার খাইতে লাগিল। বরঞ্চ স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া একটু একটু মুচকি হাসিতে লাগিল। ইহাতে ওরলফের রাগ আরো বাড়িয়া চলিল এবং প্রহারের মাত্রা ক্রমেই বেশি হইতে লাগিল।

কিন্তু রাত্রিতে ম্যাট্রোসা যখন তাহার ভগ্ন ও যথেচ্ছাচার পীড়িত শরীর লইয়া স্বামীর পাশে শুইল তখন ওরলফ্ তাহাকে আড় চোখে দেখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। তাহার বিবেকবুদ্ধি তাহাকে যাতনা দিতে লাগিল,— তাহার এ সন্দেহের কোন ভিত্তি নাই তবু সে তাহাকে অন্যায় ভাবে প্রহার করিয়াছে এই কথা মনে হইয়া সে একটা দুর্ব্বহ বেদনা, লজ্জা অনুভব করিতে লাগিল।

ওরলফ্ দুঃখিত স্বরে কহিত "নে আর কাঁদিস্ না। এ রকম প্রকৃতি পেয়েছি সে কি আমার দোষ ? আর অমন তো তোর দোষেই আরো বেশী হই; আমার কাছে সব খুলে না বলে তুই কেবল আমায় রাগাবারই চেষ্টা করিস্। বল দেখি কেন তুই এমন করিস্ ?"

কেন যে অমন করে সে ভাল জানিলেও কোন উত্তর দিত না। সে আগ্রহভরে স্বামীর সান্ত্বনা ও ব্যাকুল আলিঙ্গন প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে এই মিলনানন্দ এই আলিঙ্গন লাভের জন্য সহস্র লাঞ্ছনা নিত্য হাসি মুখে সে সহ্য করিত।

"মোটকা এখন কেমন বোধ কচ্ছিস্—এ দিক আয়, চুপ কর, লক্ষ্মী আমার ক্ষমা কর আমায়...... ......ক্ষমা করেছিস্ বল!"

সে তাহার কেশ নাড়িয়া তাহাকে চুমো দিত—সেই সময়ই তাহার অন্তরের তিক্ততায় তাহার দাঁতে দাঁত কড় কড় করিয়া উঠিত। ওরলফ্ হৃদয় যে যাতনায় মথিত করিতেছিল তাহা অন্তরে চাপিয়া রাখিতে অসমর্থ হইয়া বলিল—"আঃ—এই জীবন একটা যা-তা কয়েদখানা। বুঝ্‌লি মোটকা এই পায়রার খোপে বাস করার জন্যই মনের এমন অবস্থা বুঝ্‌লি ? কি জন্য আমরা এখানে থাকি বল্ তো ?......এখানে আমরা জীবন্ত প্রোথিত আছি বলে মনে হয়। ম্যাট্রোসা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার কথা সাধারণ ভাবে ধরিয়াই বলিল—"চল না অন্য বাড়ীতে

"তা নয় গো......এ আমি বল্‌তে চাইনি......কারণ যেথাই যাই এই জীবন নিয়েই থাক্‌তে হবে তো ?—শুধু এ ঘর নয়...... আমাদের জীবনটাই একটা কেমন হয়ে গেছে......"

ম্যাট্রোসা একটু চিন্তা করিয়া কহিত—"ভগবান করুন আমাদের মতিগতি ফিরুক,—আমরা দু'জনে ভাল ভাবে থাক্‌তে পারি।"

"হাঁ সবই ভাল হবে, ও ত কতবার বলেছিস্‌ তুই। কিন্তু ভাবে তো তেমন কিছু দেখি না মোটজা—যে কেলেঙ্কারীটা আমরা করি।"

ম্যাট্রোসা এ কথা অস্বীকার করিতে পারিত না--তাহার মার খাওয়া ব্যাপারটা ক্রমেই ঘন ঘন হইতেছিল,--ওরলফ্‌ প্রায় শনিবারে সকালে উঠিয়াই বলিত—"আজ সন্ধ্যায় যেই কাজ কর্ম্ম হয়ে যাবে, অমনি মদের দোকানে যাব—আজ যা কাণ্ডটা কোরব।" ম্যাট্রোসা চোখ বুঁজিয়া চুপ করিয়া থাকিত। "তোর কিছু বল্‌বার নেই এতে ? ভাল, ভাল,—চুপ করে থাকাই ভাল......এই তোর পক্ষে ভাল।" সে ভয় দেখানোর ভাবে এই কথাগুলি বলিত, সন্ধ্যা যতই ঘনাইয়া আসিত সে ততই উত্তেজিত হইত। সে বার বার পত্নীর কাছে মদ খাওয়ার ইচ্ছার কথা কহিত। সে জানিত এ কথা তার পত্নীর প্রাণে কত বাজে এবং সে ইহাও লক্ষ্য করিত কেমন নীরব থাকিয়া ও ইহা সহ্য করিতেছে, নীরবে একটু শুষ্ক চাহনী হানিয়া কাজ কর্ম্ম করিয়া যাইতেছে, ইহাতে সে আরও অশান্ত হইয়া উঠিত।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলাই বাড়ীর ভাড়াটেদের সমস্ত দুর্ভাগ্যের দর্শক-সেনকা সিচিক, ওরলফ দম্পতির আর একটা হাঙ্গামের সংবাদ সকলকে দিতে পারিত, ওরলফ্‌ স্ত্রীকে আচ্ছা মত প্রহার করিয়া সময় সময় রাত্রির মতও অদৃশ্য হইত। এমন কি রবিবারেও আসিত না—অবশেষে সে রক্ত চক্ষু লইয়া গৃহে ফিরিত, ম্যাট্রোসা মুখে বেশ একটু কঠোর ভাব আনিয়া হৃদয়ের সমস্ত গোপন ভালবাসা ঢালিয়া নীরবে তাহাকে আগাইয়া আনিত। সে জানিত এ অবস্থায় ওরলফ এক বোতল মদ ছাড়া আর কিছু পাইলেই খুসী হইবে না। তাই পূর্ব্ব হইতেই সে তার জোগাড় রাখিত। "এই এক গ্লাস ঢেলে দেতো।" সে কর্কশ কণ্ঠে এই বলিয়া গ্লাস দু'এক পান করিয়া কাজে বসিত। সে দিন সমস্তক্ষণ সে বিবেকের দংশনে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিত। মাঝে মাঝে তাহার অসহ্য বোধ হইত। সে হাতের কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া যা তা বলিয়া আত্মতিরস্কার করিয়া কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইত। কিম্বা বিছানায় শুইয়া পড়িত। ম্যাট্রোসা কিছুকাল তাহাকে অনুশোচনা করিতে দিয়া আবার কাছে ঘেঁসিয়া বসিত। প্রথমে এই পুনর্ম্মিলন বড় মধুর বোধ হইত কিন্তু কিছুকাল পরেই এই আনন্দ একটুও থাকিত না।

ম্যাট্রোসা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিত "তুমি কি এই মদ খেয়ে নিজকে মেরে ফেলতে চাচ্ছ ?"

"সম্ভব !" ওরলফ্‌ তার পানে এ ভাবে চাহিয়া কহিত যেন মেরে ফেলা না-ফেলা সে আমলেই আনে না। "আর তুই বুঝি আমার কাছ থেকে পালিয়ে নিষ্কৃতি পাবি !" সে পত্নীর পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ভবিষৎ সম্বন্ধে নানা কথা ফেনাইয়া বলিত।

কিছুদিন হইতে স্বামী এ ভাবের কথা আরম্ভ করিতেই সে মাথা নিচু করিয়া থাকিত—পূর্ব্বে কখনও এমন করে নাই। ওরলফ্‌ এই ভাব দেখিলেই তাহাকে ভয় দেখাইত। আসল কথা ম্যাট্রোসা তখন প্রাণপণে স্বামীর হৃদয় জয় করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সে গণক ও তাকতুক-জানা মেয়েদের কাছ থেকে নানা মোহিনী-বিদ্যা শিখিয়া স্বামীকে বশ করিবার চেষ্টা করিত। এ সবে যখন কিছু হইল না তখন সে ভগবানের নিকট স্বামী যাহাতে আর মাতাল না হয় সেই জন্য আপন মনে গীর্জ্জার এক আঁধার কোণে বসিয়া প্রার্থনা করিত। কিন্তু তাহার এই

অসংখ্য চিন্তারাশির মধ্যে স্বামীর প্রতি একটা ঘৃণা ভাব ক্রমেই যেন ফুটিয়া উঠিতেছিল। তিন বছর আগে যে তার খোলা হাসি আর প্রাণের বলে তাহার সমস্ত হৃদয়ে আনন্দের স্রোতে ভাসাইয়া দিত সে যেন এখন তাহার উপরে ক্রমেই মায়া হারাইতে বসিয়াছে।

তাহাদের দু'জনার এক জনারও মন খারাপ ছিল না; দু'জনেই সরল মনে ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়া ছিল; আশা—এমন কি একটা কিছু ঘটিবে না যাহাতে তাহাদের এই অসহনীয় দুর্ব্বহ জীবন-ভার কাটিয়া যাইবে। হায় আশা!

ক্রমশঃ--

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

কেন?

কেন তুমি নীরব থাক, এমন সুদিনে—
গন্ধ-ভরা ফুল মালঞ্চ, মর ভুবনে,
পূর্ব্বাকাশে নব অরুণ;
জরাজীর্ণ প্রাণটি তরুণ,
তুমি কেন ঘুরিয়ে দিলে, শুভ লগনে?
বুক যে আমার উঠ্‌ল তেতে, বিষের বেদনে।

প্রবাসে কোন আশার আশে, রইলে বল তাই
স্মৃতির ঘরে প্রদীপ জ্বালা, তা'কি মনে নাই
হাজার যুগের হিসেবটুকে,
রাখ্‌তে পারো বুকটি ঠুকে,
আমি যে গো মলিন মুখে তোমার পানে চাই।

কেন তুমি কওনা কথা দাওনা পরিচয়
অতীত কালের দেখা শুনা মনেই পাবে লয়?

শ্রীমতী [illegible] মৈত্র।

[illegible] ধরণনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও কোচবিহার সাহিত্য-সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
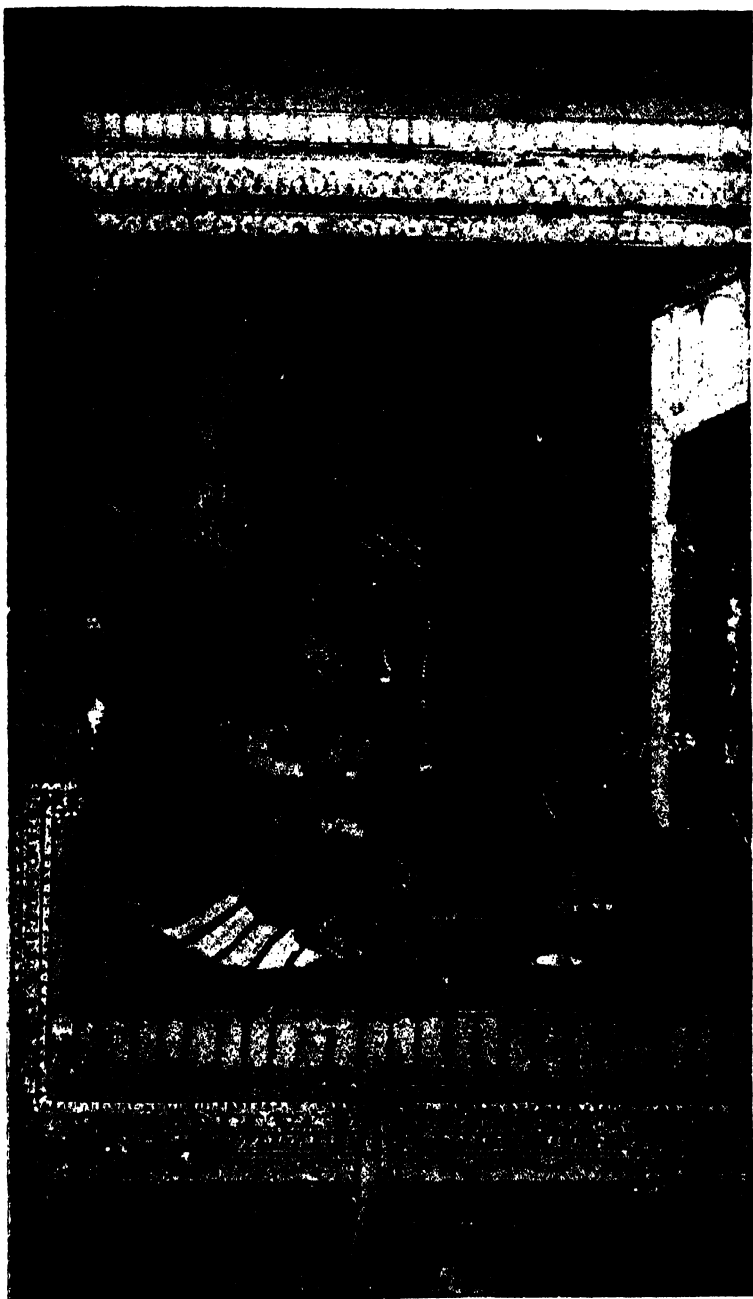
"বাসক সজ্জা"

কুচবিহারের রাজকীয় পুস্তকাগারের প্রাচীন চিত্র হইতে।

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

২য় বর্ষ। ভাদ্র, ১৩২৫ সাল। ১০ম সংখ্যা।

চাঞ্চল্য।

অচলা পৃথ্বীর বুকে যাহা জন্ম লয়
তারি প্রাণ কেন চির চঞ্চলতাময়?
স্থাবর, জঙ্গম হ'তে চাহিছে নিয়ত,
তরু আন্দোলিয়া শাখা কহে অবিরত
উড়িবার কথা, পত্র শুধু কলস্বরে
শাখার বাঁধন ছিঁড়ে অনন্ত অম্বরে
ছুটিয়া চলিতে চায়, পাষাণের বুকে
উৎস আছাড়িয়া বাহু ধায় ঊর্দ্ধ মুখে
গলায়ে তুষার বাধা, ভাঙিয়া শিখর
তরঙ্গে স্ফুরিত মুখ কল্লোল মুখর
নিভৃত শ্যামল শান্ত জন্ম গৃহ হ'তে
নদী ধেয়ে চলে যায় অচেনার পথে!
যে দিন প্রথম শিশু শিখিল চলিতে
মায়ের অঞ্চল ছাড়ি, টলিতে টলিতে
হাসির লহরী তুলি, সোপানে সোপানে
ঘর ছেড়ে ছুটে যায় আঙিনার পানে।

জন্ম-পরিচিত গৃহ কিছুকাল পরে,
সে চঞ্চলে পারে নাক' রাখিবারে ধরে !
পথে, ঘাটে, দেশে, দূরে অজ্ঞাতপ্রবাসে,
মেরুপ্রান্তে, মরুবক্ষে, দুরাশাপ্রয়াসে
কেবলি ঘুরায়ে মারে, এ উধাও প্রাণ
নিরন্তর এ অধীর ব্যাকুল প্রয়াণ,
এই কি ক্ষিতির সেই বাষ্পের আবেগ
নীহারিকা যুগান্তের স্মৃতি এ উদ্বেগ
সেই দীপ্ত অনলের চির ব্যাকুলতা ?
এত দিনে বাষ্পের গিয়াছে তপ্ত ব্যথা
নিজেরে করেছে জল, বহ্নি সমাহিত
মৃত্তিকার জড়তায়, চিত্তে প্রবাহিত
তবু সেই গতি-বেগ, সে ছড়ায়ে পড়া
রয়েছে তেমনি, যারে জন্ম দেয় ধরা,
যাহারে করান পান স্তন্য আপনার
তারি বক্ষে ভরি ওঠে দাহ অনিবার !
অন্তরের নিরন্তর এ বিপুল ত্বরা,
নিশি দিন ভবঘোরে শুধু ঘুরে মরা !
জলের মাঝারে তাই বাষ্পের প্রয়াস
দীর্ণ করে পাষাণের রুদ্ধ কারাবাস,
আজো মেদিনীর সেই তপ্ত ব্যাকুলতা
কেবলি করিয়া পান দ্রুম গুল্ম লতা
মর্ম্ম মাঝে বহিতেছে বহ্নি অনির্ব্বাণ ;
তারি সঞ্চালিত শিখা করিয়াছে দান
উদ্ভিদের পত্র পুষ্পে শাখায় শাখায়
অনন্ত এ আন্দোলন দিবসে নিশায় !

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী ।

বেদনার সুখ।

ভাই বিমলা,

তোমার চিঠি পেলুম। এবারের চিঠিতে তুমি কেবল গল্পের তাগাদা করেছ তাই আজ কলম হাতে করে ভাব্‌তে বসেছি, এমন কি লিখ্‌তে পারব যা তোমাদের মাসিক পত্রিকায় দাখিল কর্‌তে পারি। গল্প লিখ্‌তে গিয়ে কেবলি নিজের জীবনটা চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ছে, তাতে গল্প কিছু নেই, আগা গোড়া বাস্তবে ভরা, সুর কিছু নেই--কেবল বেদনা। আমাদের এই পাঁচিলে ঘেরা জীবন, এর ভিতরের পৃথিবী কত সংকীর্ণ; এর ভিতরের শাসনের বাঁধন কত কড়া; এর ভিতরের নিয়ম কত অলঙ্ঘ্য, এই আমাদের কলতলা থেকে যেটুকু আকাশের ফাঁক চোখে পড়ে তাও এই কল্‌কাতায় কলকারখানার ধোঁয়ায় ধূসর; ঐ অনন্তের নীল রংটুকুও সে আমাদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রেখেছে। শুধু এই দক্ষিণের ঘরটার জানালার গরাদের ভিতর থেকে যে আমগাছের একটুখানি অংশ দেখা যায় তার লাল কচিপাতা আর মুকুলের ঘটা দেখে পৃথিবীর উপরে বসন্তের আবির্ভাব টের পাই; হয় ত কোন দিন কোন পথ-ভোলা কোকিল দু'এক বার কুহু বলে মনটাকে উদাস করে দিয়ে ঐ রান্নাঘরের ছাদের পাশ দিয়ে উড়ে যায়! তা নইলে এই একটানা জীবনের কোন বৈচিত্র্য নেই। আমাদের মত বিধবার জীবনগুল যেন বিধাতার হাতেগড়া কলকব্জার মত, দম আর ফুরায় না—চলে ত চলেইছে। তোমার সঙ্গে এতবার চোখের দেখা হয়েছে কিন্তু মনের দেখা একদিনও হয় নি। আজ কেন মনে হ'ল নিজের জীবনের দুচারটি কথা বলে প্রাণের বোঝাকে হাল্কা করব। তুমি সুখী, তুমি ভাগ্যমানী--কিছু মনে করো না ভাই, ভগবান চিরদিন তোমায় তাই রাখুন—তুমি কি ধৈর্য্য ধরে এই হতভাগিনীর জীবনকথা শুন্‌বে? তুমি বোন্ শোন আর না শোন বলেই আমার তৃপ্তি! মনে পড়ে আমি মা বাপের একমাত্র মেয়ে, কি আদরে পালিত হয়েছিলুম; কচি গা ভরা সোনার গয়না, পরনে রঙ্গীন সাড়ী, কপালে কাঁচপোকার টিপ, মাথায় কত রকম বেরকমের খোঁপা! বাবা মা বড় আদর করে নাম দিয়েছিলেন দুলালী, পাড়াপড়সী সকলেরই দুলালী ছিলুম, প্রতিদিন বাড়ী বাড়ী আমার নিমন্ত্রণ থাক্‌ত রামায়ণ মহাভারত পড়ে শোনাবার; বাড়ী ফির্‌তে দেরী হ'লে বাবা আমায় খুঁজ্‌তে বাহির হয়ে পড়্‌তেন, মা উদ্বিগ্ন হয়ে ভিতরবাহির কর্‌তেন। পূজার সময়ে আমি একখানি সাড়ী চাইলে বাবা দশখানি সাড়ী এনে হাজির কর্‌তেন, মা আমার আদর দেখে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে হাস্‌তেন। শুধু আমার এক পিসিমা ছিলেন তিনি বল্‌তেন "এত বাড়াবাড়ি কি ভাল বাছা? হাজার হ'ক্ মেয়ে মানুষের জাত, কেমন ঘরে পড়ে বলা যায় না ত!" আমি মনে মনে পিসিমাকে শত অভিশাপ দিতুম, সাধ্যপক্ষে তাঁর ছায়া মাড়াতুম না। এমনি করে আমি বড় হয়ে উঠ্‌লুম, বিয়ের যুগ্যি হলুম, কত বর জুট্‌ল কিন্তু বাবা মার মনে ধর্‌ল না, যদি টাকা আছে ত রূপ নেই, বিদ্যে আছে ত ধন নেই, নয় ত সব আছে কিন্তু বয়সে বড় দোজবরে। এমনি করে একে একে সকলেই যখন ফিরে গেল, পাড়া-প্রতিবাসীর যখন আমায় বিয়ের ভাবনায় একরূপ আহার নিদ্রা ত্যাগ হয়েছে তখন একদিন হঠাৎ বাবা একটি ছেলের সন্ধান পেলেন, এ যে একেবারেই মনেরমতনটি! শোনা গেল ছেলেটি কলিকাতানিবাসী, পাশকরা, রূপেগুণে কার্ত্তিক! বাবা মার মুখে আনন্দ ধরে না, বাড়ীতে বিয়ের ধূম পড়ে গেল, তখনি স্যাকরা, জহুরী, কাপড়ওয়ালার জন্য লোক ছুটল! তখনি খাবার ফর্দ্দ তৈয়ার আরম্ভ হ'ল। এমনি করে যখন বিয়ের

সোরগোল পড়ে গেছে তখন আমার আনন্দ দেখে কে ? কি হবে ভাল করে হৃদয়ঙ্গম না করেও আমার তরুণ প্রাণখানি আনন্দে রাঙ্গা হয়ে উঠ্‌ল।

তারপর সেই বিয়ের রাত, পুরোহিত বিয়ের মন্ত্র পাঠ কর্‌ছেন, বাইরে থেকে সানাইয়ের মিঠে আওয়াজ এক একবার হাওয়ার সাথে ভেসে আস্‌ছে, আমি লাল চেলির ভিতরে লজ্জায় আনন্দে সারা হয়ে যাচ্ছি, এমন সময়ে শুভদৃষ্টির লগ্ন পড়্‌ল! আমি আমার বরকে দেখ্‌বার জন্য চোখ তুল্‌লুম—হা ভগবান একি ভয়ানক রূপ, তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে রূপ ঠিক্‌রে পড়্‌ছে, সে রূপ এক মুহূর্ত্তে আমার অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত পুড়িয়ে ঝল্‌সে দিয়ে গেল, আমি ভয়ে চৈতন্যহীন হয়ে চোখ বন্ধ করে নিলুম, মনে হ'ল সে রূপের মাঝে কোনখানে এতটুকু হৃদয় বলে পদার্থ নেই; প্রচণ্ড রূপবান আমার স্বামী! তারপর আর কিছুই মনে পড়ে না, কেমন করে বাসর কাট্‌ল, কেমন করে রাত কাট্‌ল; শুধু বিয়ের রাতে আমার স্বামীর ব্যবহার আমার সারাজীবনের একমাত্র স্মরণীয় স্মৃতি হয়ে আমার দগ্ধ প্রাণে সান্ত্বনা দিচ্ছে। কিন্তু তিনি যেদিন কোমল ব্যবহার দিয়েছিলেন সেদিন আমি পাষাণের মত কঠিন হয়েছিলুম! হারে হতভাগিনী নারি, ঐ একটি মাহেন্দ্রক্ষণ তুই হেলায় ঠেলে দিলি, জীবনের ঐ কয়টি ঘণ্টা সেও ব্যর্থ করে দিলি! যাক্‌ পরদিন যখন কনে বিদায়ের সময় উপস্থিত হ'ল, আমি কেঁদে মার বুকে লুটিয়ে পড়্‌লুম, আমার এ কান্নার অর্থ কেহই বুঝ্‌ল না, শুধু মায়ের মন আমার কান্নায় ভিজে গেল, তিনি আমায় আবার আন্‌বার আশ্বাস দিয়ে কত উপদেশ বাক্য শোনালেন, পিতা ছল ছল চোখে আমার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে কপালে একটি চুমা দিয়ে গাড়ীতে তুলে দিয়ে এলেন। আবার আমি আমার স্বামীর পাশে একা!—দু একজন বরযাত্রী যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা কে কোথায় সরে পড়েছিলেন। আমার স্বামীর জিদে, অন্য লোক সঙ্গে দেওয়া অনাবশ্যক বলে বুঝিয়ে দেওয়ায় বাবা আমার সঙ্গে ঝিটি পর্য্যন্ত দেন নাই।

তারপর ট্রেণের কয় ঘণ্টার পথ কাটিয়ে যখন কলকাতায় আমার শ্বশুরবাড়ীর দরজায় আমাদের গাড়ী থাম্‌ল তখন দেখি সেখানে নতুন বধূ বরণের কোন উদ্যোগই নেই; ছোট্ট একটি একতলা বাড়ী, জনমানবহীন, শুধু দরজার কাছে এক যুবতী দাঁড়িয়ে আছে। তার সাজসজ্জা, তার চটুল কথাবার্ত্তার ভঙ্গী দেখে আমার মন ঘৃণায় ভরে গেল,—স্বামী পরিচয় করিয়ে দিলেন ইনি তোমার বড় জা। আমি প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই তিনি আমায় পথ দেখিয়ে ভিতরে নিয়ে গেলেন। প্রথম দেখলুম শয়ন কক্ষ, এক পাশে একটি পুরাণ পালঙ্কের উপরে মলিন শয্যা পাতা, একটি ছোট টেবিল, দু একটি পায়াভাঙ্গা টুল, এক পাশে কাপড় টাঙ্গাবার জন্য একটি দড়ি বাঁধা, তাই সহজেই বুঝ্‌লুম এই ঘরটিই আমার সর্ব্বস্ব। এমনি করে একটি একটি করে সকল ঘর দেখালেন, তারপর বড় জা নিজের ঘরের বাহির থেকে বল্‌লেন 'এটি আমার ঘর'। দরজায় রেশমের জালের পর্দ্দা, তারই ফাঁক থেকে ঘরের দেয়ালের লাল আভা বাহির হচ্ছে, এ ঘরটি বাহিরের দিকে। বড় জা "মালতী" বলে ডাক দিতেই একটি আধবয়সী নারী এসে হাজির হ'ল। দিদি বল্‌লেন "যা ত বাছা নতুন বৌকে হেঁসেলটা দেখিয়ে দিয়ে আয়।" সেই দিন থেকেই বাড়ীর রান্নার ভার আমার ওপর পড়্‌ল! এমনি করে ২।১ দিনের মাঝে যখন আমি আমার কাজকর্ম্মের ভার বুঝে নিচ্ছিলুম তখন আমার স্বামীর ব্যবহার আমায় ভিতরে ভিতরে বড়ই পীড়ন করছিল! একি বিচিত্র তাঁর ব্যবহার! সারাদিন আমি গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাক্‌তুম, তারপর কত রাত্রি হয়ে যেত, আমার অল্প বয়সের ঘুম দুই চোখে চেপে আস্‌ত শেষে জড়সড় হয়ে খাটের নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঘুমিয়ে পড়্‌তুম, স্বামী কত রাত্রে শয্যা গ্রহণ কর্‌তেন আমি টের পেতুম না। মনে পড়ে যেদিন দিদিকে প্রথম জানিয়েছিলুম অত রাত্রি পর্য্যন্ত একা ঘরে শুতে আমার ভয় করে, সেদিন দিদি তাঁর চোখের কোণ দিয়ে বিদ্রূপের হাসি হেসে

বলেছিলেন "ওমা নতুন বৌ তুমি অবাক্ করলে বাছা। তা মালতী না হয় তোমার পাহারায় বাহাল রৈল!" এমনি করে মালতীকে একদিন আমি আমার অত্যন্ত নিকটে লাভ করেছিলুম। মনে মনে কৌতূহল হ'ত এই দিদির স্বামী—আমার ভাশুর কোথায়, আমার শ্বশুরবাড়ীর আর সকলে কোথায়, কিন্তু মালতী কেবলমাত্র ঐ কথায় নিরুত্তর থাকৃত, বেশী পীড়াপীড়ি করলে বল্ত "আমি ত এবাড়ীর ঝি দিদিমণি, আমি অতশত কি জানি বাছা?" তাই মালতী অত্যন্ত নিকটে এসেও এক জায়গায় দূরে রয়ে গেল। তবু আমার উপরে তার সহানুভূতি—আমার প্রতি তার প্রাণের টান ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠ্ছিল বেশ বল্তে পারছিলুম, আমি তাতে বাধা দিই নি, কারণ এই নিঃসঙ্গ জীবনে ঐটুকুই ছিল আমার আশ্রয়স্থল। দিনের বেলা কাজেকর্ম্মে কেটে যেত, আমি স্বামির থালা সাজিয়ে, ঠাঁই করে দিয়ে চলে আস্তুম, দরজার আড়াল থেকে দেখ্তুম বড়জা স্বামীকে পাখার বাতাস ক'রে নানারকম গল্পগুজব করে খাওয়াতেন, মালতী আমায় বার বার অনুরোধ করত সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে, আমি হেসে তাকে কিল দেখিয়ে বল্তুম "দূর, দিদিই ত দেখ্ছেন।" এমনি করে অবুঝের মত নিজের হাতে নিজের অধিকার ছেড়ে দিচ্ছিলুম। মনে মনে মা বাবার উপর অভিমান হ'ত, মনে মনে তাঁদের সঙ্গে আড়ি পাত্তুম, আবার যেদিন এই নিঃসঙ্গ জীবন বড় ভারবহ বোধ হ'ত, সেদিন মনে মনে মার গলা ধরে কেঁদে তাঁদের কাছে যাবার জন্য অধীর হয়ে উঠ্তুম। স্বামীর দুর্ব্যবহারে পীড়িত হয়ে কত দিন মাকে চিঠি লিখ্তে বসেছি কিন্তু কি লজ্জা আমার হাত চেপে ধরত জানি না, আমার কিছুই লেখা হ'ত না,—শুধু কুশল লিখে আর কুশল জিজ্ঞাসা করেই কথা ফুরিয়ে যেত। মা বাবার দু'একখানি চিঠি কদাচ হাতে এসে পড়্ত, তাও খোলা—আগাগোড়া তার মধুর উপদেশে ভরা। তারপর মনে আছে, বাবা যে দিন লিখেছিলেন আমায় দেখ্তে আস্বেন—সে দিন আমি আনন্দে আটখানা হয়ে গিয়েছিলুম। আমাদের বাড়ীর কিছু দূরেই আমার স্বামীর বাগানবাড়ী, স্বামী বল্লেন "সেইখানে আমার সঙ্গে বাবার দেখা হবে।" জা এসে সে দিন আমায় গা ভরে গয়না পরিয়ে সাজিয়ে স্বামীর সঙ্গে বাগানবাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন। বাবা এসে দুজনের মাথায় হাত রেখে কত আশীর্ব্বাদ করলেন; কতবার করে জানালেন,—ঈশ্বর তাঁর মনের কামনা পূর্ণ করেছেন, আমায় রাজরাণীর মত সুখী করে স্বামীসোহাগিনী করেছেন, এতে তাঁর কৃতজ্ঞতার শেষ নাই। ইচ্ছা হ'ল ছুটে বাবার কোলে লুটিয়ে পড়ে কেঁদে বুকের ভার হাল্কা করি কিন্তু চোখের কোণে এক ফোটা জলও এল না, স্বামীর সাম্নে বুকের তপ্ত-বেদনা কৃত্রিম হাসির ছদ্ম বেশ পরে আমার মুখের উপর জেগে রইল। বাবা আবার সংবাদ নেবার আশ্বাস দিয়ে চলে গেলেন, আমার বুকের দীর্ঘনিশ্বাস শুধু কেঁপে কেঁপে হাওয়ার সাথে মিলিয়ে গেল।

মনে আছে সে দিন সন্ধ্যার প্রদীপ দেওয়ার পর আমি দরজারদিকে পিঠ করে নিজের ঘরে বসে ঝুঁকে-পড়ে কি একটা বই পড়্ছিলুম। মালতী রান্নাঘরে জোগাড় করছিল এমন সময়ে সহসা আমার স্বামী টল্তে টল্তে ঘরে প্রবেশ করলেন, আমার মনে ভয় ও আনন্দ একসঙ্গে জেগে উঠ্ল! স্বামী রক্তচোখে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন "তোমার চাবির গোছাটা একবার দাও!" আমি বল্লুম "এই যে দিই তুমি একটু বস!" "না না আমায় চাবি আগে দাও।" আমি আবার মিনতির স্বরে বল্লুম "এখনি দিচ্ছি তুমি দুদণ্ড বস"। বলে এক-খানি চৌকী তাঁর দিকে এগিয়ে দিলুম। "আমার বস্বার সময় নাই" বলে তিনি আমার আঁচল টেনে এক ঝটকায় চাবিরগোছা খুলে নিয়ে আবার টল্তে টল্তে বাহির হয়ে গেলেন। সেই বালিকাবুদ্ধিতেও যেন আমার কাছে এক মুহূর্ত্তে সব স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠ্ল। আমার চোখে সেই প্রদীপের আলো একেবারে নিভে গেল, আমার মাথা ঘুরে উঠ্ল, দেয়াল ধরে সাম্লে নিলুম। সে রাত্রে আর খাওয়া হল না, মালতী জিজ্ঞাসা করলে বল্লুম "অম্বল হয়েছে।" রাত্রে ভাল ঘুম এল না বিছানায় ছট্ফট্ করে অর্দ্ধ রাত্রি কাটালুম, বুঝ্লুম মালতীর চোখেও ঘুম

নেই, তারও এক একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস আমার কানে আস্‌ছিল, তবু পাছে সব কথা সে জানতে পারে তাই একটা কথা কইতেও সাহস হ'ল না। সেরাত্রে স্বামী আর ঘরে এলেন না, মালতী অন্ধকার থাকতে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

এমনি করে যতই দিন যেতে লাগ্‌ল, দিদির সঙ্গে আমার সম্পর্ক ক্রমেই কমে আসতে লাগ্‌ল। তিনি আর বড় একটা ভিতর বাড়ীতে আস্‌তেন না, থেকে থেকে তাঁর বাহিরের ঘর থেকে উচ্চ হাসির শব্দ আমাদের রান্না ঘরেও ভেসে আসত। সে দিন মালতী, দিদির ঘরে পানের বাটা দিয়ে ফিরে এসে আমার হাত থেকে হাতা নিয়ে অনুযোগের স্বরে বল্‌লে "বাবু ত ঐ বাইরের ঘরেই বসে রয়েছেন, তুমিও যাও না দিদিমণি, আমি একাই আজ সব সাম্‌লে নিতে পারব, অমন করে কি স্বামীকে ছাড়তে আছে?" বলে তাড়াতাড়ি সে আমার মাথার আঁচল টেনে খুলে চুল গুছিয়ে দিতে বস্‌ল। কি জানি এ কথা করাতে আমার মনের ভিতর সেদিন কি বিপ্লব বেধে গিয়েছিল, আমি বাধা না দিয়ে চুপ্‌ করে তার কথা ও কাজ মেনে নিলুম, শেষে কি-ভেবে জানি না ধীরে ধীরে বাহিরের ঘরের দিকে চলে গেলুম, বুঝ্‌লুম পিছন থেকে দুটি উৎসুক চোখ আমার দিকে উৎফুল্ল হয়ে চেয়ে আছে। বাহিরের ঘরে গিয়ে দেখি—হায়রে অভাগিনী এত তোর সহ্য হ'ল—স্বামী, দিদির পায়ের কাছে বসে দুই হাতে হাঁটু জড়িয়ে মান ভিক্ষা কর্‌ছেন। ওরে নারি, তখনি কেন তোর পায়ের তলায় ধরণী দ্বিধা হ'ল না, তখনি কেন আকাশ থেকে তোর উপরে বজ্রাঘাত হ'ল না। আমি দুই হাতে মুখ ঢেকে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনবেগ রোধ করে, ছুটে পালিয়ে এলুম, আর রান্না ঘরে ফিরে যাওয়া হ'ল না: চোরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে, দোরে শিকল দিয়ে, মাটিতে লুটিয়ে পড়্‌লুম! এর পরে স্বামীর ব্যবহার আমার কাছে যেমন অসহ্য তেমনি স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। প্রতিরাত্রে বাইরের ঘর থেকে নারীকণ্ঠের গান, পুরুষদের কোলাহল শোনা যেমন আমার অভ্যাস হয়ে এল তেমনি ভিতর থেকে আমি আমার স্বামীর উপর শ্রদ্ধা হারাতে লাগ্‌লুম! তার উপর স্বামীর অত্যাচার ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌ছিল, প্রতি সপ্তাহে এক একটি গয়না নিয়ে আমার উপর জুলুম চল্‌তে লাগ্‌ল। বেশ বুঝ্‌লুম এ বিয়ে শুধু টাকা জোগাড়ের উপায় মাত্র! কোথায় গেল সেই আমার বালিকাপ্রাণের স্বামী-প্রেমের কল্পনা,—কোথায় গেল সেই সুখের স্বর্গ! আমার বড় দুঃখের—ভগবান, তুমি এমনি করেই ভেঙ্গে চুরে তাকে নিঃশেষ করে দিলে! হায় রে আমার অন্তরবাসিনী সতি, তোর স্বামী দেবতা কি এই জড়দেহের আড়ালে লুকিয়ে আছেন, তবে সেবা কর্‌ নারি, সুখ দুঃখ ভুলে তাঁর সেবায় তোর জীবন বিসর্জ্জন কর্‌। তাই আমার সেবার স্রোত এত বাধা পেয়েও বন্ধ হ'ল না।

কিন্তু এতেও আমার ভাগ্যদেবতা তুষ্ট হলেন না, আমার কপালে যে চরম দুঃখ লেখা ছিল। কিছু দিন স্বামীর মনে কেমন বৈরাগ্যের ভাব দেখা গেল, সময়ে নাওয়া খাওয়া নেই, আর বড় একটা তিনি বাইরের ঘরেও থাকেন না, ভিতরেও থাকেন না, আমাদের সেই বাগানবাড়ীতে সারাদিন কি চিন্তা করেন। এ সময়ে দিদিরও কিছু ভাবান্তর দেখা গেল। আমার স্বামীর যে সব বন্ধু দিদির ঘরে আতিথ্য নিত তাদেরই একজন, অল্প বয়েস, ফর্সা ছিপ্‌ছিপে চেহারা, সে দিদির কিছু বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, এবার ভিতরের একটি ঘরেই দিদির মজ্‌লিস্‌ বস্‌তে লাগ্‌ল, স্বামী কোন কোন দিন হঠাৎ সেই মজ্‌লিসে এসে যোগ দিতেন; দিদির হাসি সেদিন আর শোনা যেত না।—স্বামীর চেহারা কিন্তু দিন দিনই ভয়ানক হয়ে উঠ্‌ছিল, আর এর পরিণাম চিন্তা করে ভিতরে ভিতরে আমার অন্তরাত্মা শঙ্কিত হয়ে উঠ্‌ছিল! সাধ্যপক্ষে স্বামী আমার সেবা এড়িয়ে চল্‌তেন, আমার কথা বল্‌বারও অবকাশ দিতেন না! আমি নিষ্ফল উদ্বেগে সারাদিন ছটফট করে বেড়াতুম, সময়ে অসময়ে মালতীর কাছে মনের দুঃখ জানাতুম কিন্তু উপায় কিছুই ছিল না। যখন দেখ্‌লুম দুশ্চিন্তায় স্বামী একরূপ আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন, তখন আর থাকতে না পেরে একদিন দিদির পায়ের উপর

কেঁদে লুটিয়ে পড়্লুম,--"দিদি গো, তুমি ওঁকে বাঁচাও! তুমি চেষ্টা কর্‌লেই হবে, তোমার পায়ে পড়ি ওঁকে বাঁচাও।" ছিছি. এক মুহূর্ত্তের জন্যে দিদির দুই চোখে কুটিল হাসি খেলে গেল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে তিনি বল্‌লেন "ঠাকুরপোর শরীর যে কি হয়েছে তা কি আমিই দেখ্‌ছি নে বোন্, তোমার স্বামী—তোমার ত প্রাণ কাঁদ্‌বেই! আহার ত্যাগ কর্‌লে মানুষের শরীর আর কদিন টেঁকে? বলে ক্ষিধে নেই. তা না হয় দুদিন ওকে নিয়ে হাওয়া বদ্‌লে এস তুমি। আহা তোমার হাতের লোহা অক্ষয় হক্ বাছা! তা' এক কাজ কর্‌লে হয়, ও মোহনপুরী খেতে বড় ভালবাসে, চারটি ময়দা মাখ ত বৌ, হয় ত দু'খানা মুখে দেবে!" আমি এই কথাটুকুতে সে সময়ে কি যে স্বস্তি বোধ করেছিলুম, তা বোঝাবার শক্তি আমার নেই! এর পর মহা উৎসাহে ময়দা মাখা সুরু হ'ল, দিদি সেদিন নিজের হাতে পুরী তৈরী করে গড়ে দিতে লাগ্‌লেন, আমি ভাজ্‌তে লাগ্‌লুম। দিদি একখানি রেকাবিতে সাজিয়ে দিয়ে আমায় বল্‌লেন "যাও বোন্ দিয়ে এস. ঐ বাহিরের বারাণ্ডায় বসে আছেন।" আমি ত্রস্ত পদে গিয়ে স্বামীর কাছে রেকাবি ধর্‌লুম, স্বামী কি মনে করে রেকাবি নিলেন. আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করে ফিরে এসে দেখ্‌লুম—দিদি যেন কিসের প্রতীক্ষায় ভিতরবাড়ী-বাহিরবাড়ীতে ছট্‌ফট্ করে বেড়াচ্ছেন। তারপর যা হ'ল সে কথা ভাব্‌তে এখনও আমার মাথা ঘুরে ওঠে—এখনও গায়ে কাঁটা দেয়! বাহিরে থেকে মনুবেহারা এসে খবর দিলে দিদিমণি, বাবুর বড় ব্যারাম, শীগ্‌গির চলেন!" আমি ছুট্‌তে ছুট্‌তে বাহিরে গিয়ে দেখি, স্বামীর মুখ দিয়ে ফেণা গড়িয়ে পড়্‌ছে, দিদি একহাতে তাঁর মাথা ধরে আর একহাতে পাখা কর্‌ছেন আর থেকে থেকে চীৎকার করে কেঁদে উঠে বল্‌ছেন "ও অভাগী এ কি খাওয়ালি স্বামীকে? নিজের হাতে বিষ দিলি রাক্ষসি?" আমি হতবুদ্ধির মত গিয়ে স্বামীর পায়ের কাছে বসে পড়্‌লুম, হাতযুড়ে বল্‌তে লাগ্‌লুম "ও—দিদি আমি ত কিছু দিই নি—এ কি হ'ল? ওঁকে বাঁচাও তোমরা!" দিদি ততই চীৎকার করে বল্‌তে লাগ্‌লেন "নিজে দিলেন কি? আমরা বাঁচাই কেমন করে বল ত? আ মর ন্যাকা মাগি!" স্বামীর অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হতে লাগ্‌ল, শুধু প্রদীপ নিভে যাবার আগে যেমন একবার দপ্ করে জ্বলে ওঠে তেমনি করে এক মুহূর্ত্তের জন্য আমার স্বামী সজীব হয়ে উঠে একবার দিদির অশ্রুপ্লুত মুখের দিকে চাইলেন, তারপর আমার বুকে পদাঘাত করে জড়িত স্বরে বল্‌লেন "এই তোর মনে ছিল" আর কথা বাহির হ'ল না, সেই পদাঘাতের উত্তেজনায় তাঁর প্রাণ বাহির হয়ে গেল,—আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্‌লুম,—তার পর যখন জ্ঞান হ'ল, তখন দেখ্‌লুম মালতী আমার বাপের বাড়ীতে এনে আমায় উপস্থিত করেছে। সেই অবধি আমি এখানে। কেমন করে মালতী আমার বাপের বাড়ীতে সংবাদ দিয়েছিল, কেমন করে আমার জায়ের কবল থেকে আমায় উদ্ধার করে এনেছিল সে অনেক কথা। এখানে এসে দেখ্‌লুম আমার মা আমার দুঃখ দেখ্‌বার ভয়ে বড়দুঃখের পৃথিবী থেকে চলে গেছেন. বাবা আবার বিয়ে করেছেন, আমার সৎমা সমস্ত সংসারটাকে ওলটপালট করে দিয়েছেন. আমি যতখানি আদরে এ বাড়ী থেকে বিদায় নিয়েছিলুম ততখানি অনাদরে আজ মাথার সিঁদুর মুছে. সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কার ঘুচিয়ে ফিরে এসেছি! আমার মায়ের সেই আল্‌তাপরা পা দুটি আর সেই প্রসন্ন অভয় চোখ দুটির কালো দৃষ্টি আমার চোখের উপর এখনও জ্বল্ জ্বল্ কর্‌ছে কিন্তু এ মাতৃশোকও আজ তুচ্ছ হয়ে গেছে! ভাইরে. স্বামীর সমস্ত দুর্ব্যবহারের স্মৃতি, আর সর্ব্বোপরি মৃত্যুকালে সেই পদাঘাতের স্মৃতিও আজ আমায় কাতর করতে পারে না! যে নির্দ্দোষী হয়েও স্বামীঘাতিনী বিধবা—তার কি কিছুতেই চরম সাজা হয় ভগবান?

আর পার্‌লুম না ভাই আজ গল্প লিখ্‌তে. হাত আর চলে না, মনও আর সরে না। ইতি—

হতভাগিনী—

তোমার বন্ধু—দুলালী।

———

অভিমান।

—:*:—

আপন মনে কাঁদ্‌বি শুধুই
দিবস যামিনী
কিসের এত দুঃখ, আমার
অভিমানিনি !

চরণ ধরে আপনি সেধে
কইতে কথা উঠ্‌বি কেঁদে,
বক্ষে সদাই রাখ্‌বি বেঁধে
কোন্‌ সে কাহিনী ?
কিসের এত দুঃখ, আমার
অভিমানিনি !

পাস্‌নি যে দান দু'হাত ভরি'
ভিক্ষা মাগিয়া,
তাই কি বৃথা দিবস রাতি
কাঁদ্‌বি জাগিয়া ?
কাঙাল—ও তুই কাঙাল বলি'
মুখ বাঁকায়ে যায় যে চলি',
হায় অভাগী আকুল হলি
তাহার লাগিয়া !
তাই কি বৃথা আপন মনে
কাঁদিস্‌ জাগিয়া ?

কথায় কথায় মুক্তা ঝরে
যুগল নয়নে,
কে মুছাবে অশ্রু এত
সিক্ত বয়ানে ?

আঁক্‌ড়ে ধরি চরণ কত
অমন করে রইবি নত
হাওয়ায় ঝরে লতার মত
　　　　শষ্পশয়নে ?
কে মুছাবে অশ্রু এত
　　　　সিক্ত বয়ানে ?

ওরে আমার উপেক্ষিতা
　　　　মন্দভাগিনি !
গাইবি কত হিয়ায় আমার
　　　　বেহাগ রাগিণী ?
যা'ছিল সব অর্ঘ্য দিয়া
ফির্‌লি শুধুই অশ্রু নিয়া,
রত্নভূষণ বিসর্জ্জিয়া
　　　　সাজ্‌লি যোগিনী !
ওরে আমার উপেক্ষিতা
　　　　মন্দভাগিনি !

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

বঙ্গ সাহিত্যের ধারা।

—:*⊕*:—

কাব্যের উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি ও আনন্দদান। সাহিত্যেরও মুখ্য উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি ও আনন্দদান এবং গৌণ উদ্দেশ্য শিক্ষাদান। ইংরাজীতে লিটারেচার (Literature) বা সাহিত্যের একটা ব্যাপক অর্থ আছে। আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ ও বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনে "সাহিত্য" কথাটার সেই ব্যাপক অর্থই গ্রহণ করা হইয়াছে। আমি এই ব্যাপক অর্থে সাহিত্য কথাটা ব্যবহার করিব না।

আমাদের বঙ্গভাষা সংস্কৃতের দুহিতা বা দৌহিত্রী যাহাই হউক, সংস্কৃতসাহিত্যের প্রভাব যে বিশেষভাবেই বঙ্গভাষার উপর পড়িয়াছে সে সম্বন্ধে বোধ হয় দুই মত নাই। সংস্কৃতসাহিত্য ধর্ম্মের সহিত এমনই জড়িত যে, ধর্ম্মের সংস্রব শূন্য নিছক সাহিত্য ২।৪ খানি খুঁজিয়া মিলিবে। ইতিহাস ও পুরাণে এমনই সম্বন্ধ যে, কোন কাহিনী ঐতিহাসিক ঘটনা কি পৌরাণিক উপাখ্যান মাত্র তাহা সর্ব্বত্র নিসংশয়ে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। শুধু সংস্কৃত

সাহিত্য বলিয়া নহে। মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব্বে জগতের সর্ব্বত্রই গদ্য অপেক্ষা পদ্য কাব্যেরই প্রাধান্য ছিল কারণ গদ্য অপেক্ষা পদ্য স্মরণ করিয়া রাখা সহজ। কেবল নাটকে কোথাও কোথাও গদ্যের ব্যবহার আছে।

আমাদের বঙ্গসাহিত্যের ধারা ধর্ম্মের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া পূতসলিলা ভাগীরথীর ন্যায় একদিন বহুপূর্ব্বে বাঙ্গলার পশ্চিমদিক ঘেঁষিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল এবং বহু শাখা-প্রশাখা সমন্বিতা জাহ্নবীরই ন্যায় পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোভাব, হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান এবং বঙ্গে পাঠানদিগের আবির্ভাবের সময় এবং বঙ্গভাষার শিশুকাল প্রায় এক। বাঙ্গলার সর্ব্ব প্রাচীন গ্রন্থ রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ চিহ্ন ধর্ম্মপূজার ব্যাপার কিন্তু ইহার পরে ধর্ম্মমঙ্গলগুলিতে ধর্ম্মঠাকুরকে কতকটা হিন্দু হইতে হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানকালে যেমন বৌদ্ধমন্দির হিন্দুমন্দিরে পরিণত হইল তেমনই অনেক বৌদ্ধ দেবদেবী রূপান্তরিত হইয়া হিন্দুর দেবদেবী হইলেন এবং বৌদ্ধজাতকের গল্প সংস্কৃত পুরাণের মধ্য দিয়া হিন্দুর নিজস্ব হইয়া উঠিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের ধারা এই সকল দেবদেবীকে আশ্রয় করিয়া অবিরলভাবে রহিয়াছে। শিব, দুর্গা, কালী, সূর্য্য, গণেশ, কমলা, সারদা, শীতলা, মনসা, গঙ্গা, ষষ্ঠী, সত্যনারায়ণ প্রভৃতি দেবদেবীরা মঙ্গলগানে এইরূপে পূজা পাইয়া আসিতেছিলেন। সংস্কৃতের মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদরূপেই হউক বা কথকের গল্প হইতে গ্রথিত হইয়াই হউক এই সকল এড়ণ্ডপাদপের মধ্যে বৃহৎ কল্পবৃক্ষরূপে দৃষ্ট হইত। এমন সময় খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তি ও প্রেমের স্রোতে সমস্ত বঙ্গদেশ ভাসাইয়া লইয়া চলিলেন, তাহাতে সমাজ ও সাহিত্য একসঙ্গেই ভাসিয়া চলিল। শ্রীচৈতন্যপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে জয়দেবের গীতগোবিন্দ, চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী এবং গুণরাজখান মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যপ্রভু এই মৃত্তিকালিপ্ত হীরকগুলিকে পরিষ্কৃত না করিলে কেহ আজ ইহাদের আদর করিত না। নবরসের মধ্যে শৃঙ্গাররস শ্রেষ্ঠ বলিয়া আদিরস নামে অভিহিত হইলেও, বহু সমালোচক আদিরসাশ্রিত কাব্যের প্রতিকূল ছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যপ্রভু আদিরসকে ভক্তিরসের সহিত মিলাইয়া রাসায়নিক সংযোগের ন্যায় এক অপূর্ব্ব মধুররসে পরিণত করিলেন। এই মধুর রস আস্বাদন করিবার জন্য বঙ্গে অসংখ্য মধুপের ন্যায় যে ভক্তবৃন্দের আবির্ভাব হইল তাঁহাদের গুঞ্জনে বঙ্গদেশ আজও মুখরিত হইয়া আছে।

এ সময় লোক এমনই ধর্ম্মপ্রাণ ছিল যে, মুসলমান বাদসাহ হোসেন শাহ ও নসরৎ শাহ এবং সেনাপতি পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার ধর্ম্মগ্রন্থ রচনার উৎসাহ দিয়াছিলেন। পাঠানশাসনকালে বা মোগলশাসনকালে বাঙ্গলার বহু হিন্দু একদিকে যেমন মুসলধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিল, রাজা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও হিন্দুগণ অপরদিকে নানারূপ ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিয়া গানে তাহা প্রচার করিতেছিলেন। এখনও বিহার ও যুক্তপ্রদেশে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা অল্প হইলেও সেখানে হিন্দুর আহার বিহারে যেরূপ মুসলমান সংস্রব দেখিতে পাওয়া যায়, বাঙ্গলাদেশে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক হইলেও হিন্দুর ধর্ম্মনাশ হইবার ভয়ে তাহা অপেক্ষা এক বৃহৎ গণ্ডী করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহা সঙ্কীর্ণতা হইতে পারে, কিন্তু বোধ হয় সেকালে এরূপ সঙ্কীর্ণতার প্রয়োজন ছিল। প্রবাদ আছে এইরূপ সঙ্কীর্ণ সামাজিক নিয়মের ফলে কোন পরিবার ঘ্রাণে অর্দ্ধভোজন হইয়াছে বলিয়া সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। যাহা হউক সেকালের হিন্দুর সর্ব্বকার্য্যেই ধর্ম্মপ্রাণতা দৃষ্ট হইত। বাঙ্গালী হিন্দু-ছেলের নামকরণ হইত দেবদেবতার নামে। তাঁহারা দেবমন্দির পুষ্করিণী ছায়াসমন্বিত বৃক্ষ ও সদাব্রত প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার করিতেন। দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর করিয়া সম্পত্তির সদগতি করিতেন। পূজাপার্ব্বণে দেবদেবতার যাত্রাগান

কীর্ত্তন হইত। মোগলশাসনের শেষভাগে বাঙ্গলাদেশে বেশভূষায় বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম-প্রাণতার মধ্যে আবার আদিরস দেখা দেয়, বিদ্যাসুন্দর গান ইহারই ফল। তথাপি বলিতে গেলে বঙ্গ সাহিত্যের ধারা ধর্ম্মের খাতেই প্রবাহিত হইয়াছিল। এই যুগের শেষে গানের মধ্যে যেমন শ্রীচৈতন্যপ্রভু প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব লক্ষিত হয়, তেমন শ্যামাবিষয়ক গানে ও বাউলের গানেও দেশ মাতিতেছিল। তবে হরিনাম ও শ্যামাবিষয়ক গানই প্রধান স্থান অধিকার করিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে সুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হইলে, বাঙ্গলাদেশে লোকে ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিল ও ক্রমে রাজা রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে একদিকে ব্রাহ্ম হিন্দু ও খ্রীষ্টানধর্ম্মের বাদাবিতণ্ডা হইতে লাগিল অন্য দিকে ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশে পাশ্চাত্যভাবের আমদানী হইতে লাগিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ বাঙ্গলা গদ্যের জন্ম ও শিক্ষার যুগ বলা যাইতে পারে। সুতরাং বঙ্গ-সাহিত্যের ধারা ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রুদ্ধ হইয়াছিল বলিতে হইবে। ১৮০৯ খ্রীঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও ১৮৫১ খ্রীঃ বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। উনবিংশতি শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে সমাজসংস্কার, রাজনীতি, স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইল। বুঝি এই সময়ে বাঙ্গালীর জীবন-সংগ্রামও আরম্ভ হইল। বাঙ্গলার বাণিজ্যও খরস্রোতে বহিল। লোকের হাতে নগদ টাকা অধিক হওয়ায় লোক ক্রমে বিলাসী হইতে লাগিল। এতদিন কেবল জল-পথেই বাণিজ্য অধিক চলিত এখন হইতে রেল নির্ম্মিত হইয়া অন্তর্বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল।

বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল ও প্যারীচাঁদ বাঙ্গলাগদ্যের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইঁহারা সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া শিক্ষার্থীর জ্ঞানলাভের পথ নিষ্কণ্টক করিতে লাগিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সহিত বাঙ্গলাভাষার একটা আশ্চর্য্য রকমের সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ১৮৩৭ খ্রীঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন আর সেই বৎসরই বঙ্গদেশের আদালতে পারশীস্থলে বাঙ্গালাভাষা প্রবেশলাভ করে আবার সিপাহীবিদ্রোহ ১৮৫৮ খ্রীঃ প্রশমিত হইলে মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে ভারতসাম্রাজ্য গ্রহণ করেন আর সেই বৎসরই রঙ্গলালের পদ্মিনী ও মাইকেলের শর্ম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী প্রভৃতি প্রকাশিত হয় এবং প্রায় এই সময়ে বাঙ্গালার শেষ খাটিকবি ঈশ্বর গুপ্ত ও দাশরথি রায় ইহলোক হইতে অপসৃত হন। ইহার ৩ বৎসর পরে মাইকেল অপূর্ব্ব অমিত্রাক্ষর ছন্দে মেঘনাদবধে দেখাইয়া দিলেন কিরূপে পাশ্চাত্যভাবের আমদানী হইলে বাঙ্গালা সাহিত্য উন্নতির পথে ধাবিত হইবে। মেঘনাদবধ প্রকাশিত হইবার ৪ বৎসর পরে বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয়। সুতরাং বলিতে গেলে এই সময় হইতে বঙ্গসাহিত্যের ধারা উপন্যাস, নাটক ও কাব্য এই ৩ প্রধান ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল।

পূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না বলিয়া সমস্ত গ্রন্থই পালাক্রমে গীত হইত কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পরে গ্রন্থ গান করিয়া প্রচার করিবার আর আবশ্যকতা থাকিল না কেবল সুর লয়ের জন্যই গান করিত ও গীত হইত। কিন্তু যে দেশে রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় বৃহৎ কাব্য গানরূপে লোকে শুনিয়া অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহারা ২।১টি খণ্ডগান শুনিয়া তৃপ্ত হইবে কেন? তাই পাঁচালী, যাত্রা, কবির গান, কালিদমন যাত্রা, কীর্ত্তন গান, চণ্ডীর গান বহুদিন পর্য্যন্ত জনসাধারণের আদর ছাড়ে নাই।

পূর্ব্বোক্ত ৩ প্রধান ধারার সহিত ধর্ম্মের বড় একটা সংস্রব থাকিল না। গানের ধারা পূর্ব্বের খাতেই শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল কিন্তু অশিক্ষিত জনসাধারণের নিকট ইহা পূর্ব্বের ন্যায়ই প্রবল বলিয়া অনুভূত হইতেছিল।

উপন্যাস প্রথমে পৌরাণিক আখ্যার স্থান অধিকার করিয়াছিল কিন্তু ধর্ম্মের সহিত কোন সংশ্রব ছিল না বলিয়া কল্পনার রাজ্য হইতে যেন ঘটনাগুলি সংগৃহীত হইত। আমাদের সংসারের সুখ দুঃখের কথা বড় তাহাতে থাকিত না। ইহারই পরম পরিণতি—বিলাতের আমদানী ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে প্রথম পারিবারিক উপন্যাস স্বর্ণলতা প্রকাশিত হয়। লোকে পূর্ব্বে যখন ধর্ম্মপ্রাণ ছিল, তখন তাঁহাদের একমাত্র বুলি ছিল "দারাসুত পরিজন, কেহ নহে রে আপন।" লোকে চাকরী করিতে গেলে একাকাই যাইতেন। পুত্র পরিবার স্বগৃহেই থাকিত, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া সকলেই বিদেশে নিশ্চিন্ত হইয়া জীবন যাপন করিতেন। এখন সে প্রথা উঠিতে লাগিল, গৃহের দিকে দৃষ্টি পড়িল। পূর্ব্বে পরিবার বলিলে বহুলোক বুঝাইত, এখন হইতে স্ত্রী সমস্ত পরিবারের স্থান অধিকার করিতে আরম্ভ করিল। জীবন সংগ্রাম কঠোরতর হইয়া পড়িয়াছে। উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি অলস সহোদরকে আর অন্নদান করিতে চাহেন না। এই সময় হইতেই ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই আরম্ভ হইল। ঔপন্যাসিকের এই গৃহকলহের দিকে দৃষ্টি পড়িল। সেইদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত গার্হস্থ্য উপন্যাসের বিরাম নাই। ইহার মধ্যে দুইটি প্রধান দল হইয়াছে। প্রয়োজনবাদীর দল বলিতেছেন,—উপন্যাস এমন হওয়া চাই যাহাতে গল্প পড়িতে পড়িতে মানুষের নানারূপ শিক্ষা হয়। আর্টবাদীরা বলিতেছেন,—শিক্ষার ভার শিক্ষকের উপরে। যাহা সুন্দর আমরা তাহাই সৃষ্টি করিব। শিক্ষার দিকে লক্ষ্য থাকিলে খাঁটি আর্ট হয় না। অনেক উপন্যাসের লেখক একমাত্র শিক্ষা দেন—ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয়। এরূপ শিক্ষাটা এতই একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে যে এরূপ জয় পরাজয়ের কথা শুনিলেই অনেক পাঠক বিরক্ত হন। শুধু ঘটনা নিচয়ের সম্বন্ধ যেন নিতান্তই জড়পদার্থের মত বা বায়োস্কোপের ছবির মত দেখায় তাই এমন উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। ইহা ঠিক্ যেন রোমান্সের বিপরীত। রোমান্সের সহিত আমাদের পরিচয় অত্যন্ত কম। আর মন জিনিষটা সর্ব্বদাই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। ইহার যতপ্রকার লীলাখেলাই লোকে বর্ণনা করুক না কেন আমাদের বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু এই লীলাখেলার দোহাই দিয়া অশ্লীলতার সমর্থন কিছুতেই করা যায় না। যাহা প্রকৃত ঘটিয়াছে তাহাই বর্ণনা করিতে নীতিবিদের হুকুম আছে বটে, সাধারণতঃ মনে হয় প্রকৃতির নিয়ম পালন করাই মানবের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে ইতর প্রাণী ও অসভ্য মানবই অধিক পরিমাণে প্রকৃতির নিয়ম পালন করিয়া থাকে আর সভ্য মানব কৃত্রিমতার দাসানুদাস। তাহার মনে যাহা উদয় হয় তাহাই বলিলে, হয় অপরে উন্মাদ বলিবে, নয় ত কথায় কথায় কুরুক্ষেত্র বাধিবে। আহারের সহিত তাহাকে বাক্য ও ব্যবহারের সংযম শিক্ষা করিতে হয়। সমাজের উপযুক্ত হইবার জন্য তাহাকে বহুপ্রকারের স্বাধীনতা হারাইতে হয়। সুতরাং ঔপন্যাসিককেও একটু ভালমন্দ বাছিয়া চালাইতে হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি সাধারণ সাহিত্যে অর্থাৎ উপন্যাস, নাটক ও কাব্যে ধর্ম্মের সংশ্রব ছিল না। কিন্তু একদিকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতৃবর্গের ধর্ম্মপ্রচার যেমন ব্রাহ্মধর্ম্ম সাহিত্য গঠিত হইতেছিল তেমনই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাবে বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যেও ধর্ম্মভাব প্রবল হইতেছিল। ইহা ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সেই সময় হইতে গীতার অনুশীলন চলিতে লাগিল, বঙ্কিমচন্দ্র "প্রচার" এবং ধর্ম্মতত্ত্ব, সীতারাম ও দেবী চৌধুরাণীতে গীতার নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। দেশে দেশে হরিসভা স্থাপিত হইতে লাগিল। পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, শশধরতর্কচূড়ামণি প্রভৃতি মহাত্মারা হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। ইহারই ফলে থিয়েটার ও মতিরায়ের যাত্রায় পর্য্যন্ত কীর্ত্তন প্রবেশলাভ করিয়াছিল। বিবেকানন্দের কল্যাণে এই ধর্ম্মভাব কর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া এখন এক নূতন সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়েছে।

নাটকও প্রথমে পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বন করিয়া বাঙ্গলা দেশে দেখা দিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গলার ঠিক প্রথম নাটক কুলীনকুলসর্ব্বস্ব ইহার ব্যতিক্রম স্থল। দীনবন্ধুর নাটক বাস্তবতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু পেশাদার থিয়েটারে জাঁকজমক নহিলে দর্শক জুটে না কাজেই তাঁহাদিগকেও প্রথমে পৌরাণিক নাটক লিখিতে হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা হইতে সমাজের কোন কোন সম্প্রদায়বিশেষের উপর প্রহসনরূপ চাবুক পড়িত। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংশ্রবে আসিয়া গীতার যুগে গিরিশঘোষ মহাশয় কয়েকখানি ধর্ম্মমূলক নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন। সামাজিক বা গার্হস্থ্য নাটকের অভিনয় মধ্যে মধ্যে চলিত বটে কিন্তু কিছুকাল ব্যাপিয়া ইহার প্রাধান্য কখনই হয় নাই। কোন শুভক্ষণে কি অশুভক্ষণে জানি না পার্সী থিয়েটারের অনুকরণে যেদিন স্থানে-অস্থানে দলে দলে নাচের ব্যবস্থা হইল, সেইদিন হইতে নাটকের অবনতির সূত্রপাত হইয়াছিল বলিতে হইবে। স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাতে কয়েকখানি সুন্দর নাটক লিখিত হইয়াছিল। মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক কয়েকখানি তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট। তিনি চিরাচরিতপন্থা অবলম্বন না করিয়া সব দিকেই নূতন পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ঐতিহাসিক নাটক বহু পূর্ব্বে লিখিলেও এই স্বদেশী আন্দোলনের যুগেই প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক নাটকের আদর হইয়াছে। পৌরাণিক যুগের কাল্পনিক চরিত্র অপেক্ষা ঐতিহাসিক যুগের চরিত্রের সহিত দর্শকের সহানুভূতি অধিক হইবার কথা।

আমাদের দেশে উচ্চাঙ্গের নাটক অতি অল্পই বাহির হইয়াছে কারণ যাঁহারা প্রতিভাশালী লেখক তাঁহারা দুর্নামের জন্য রঙ্গমঞ্চের সংশ্রবে আসিতে চাহেন না আর যাঁহারা রঙ্গমঞ্চের সংশ্রবে থাকেন তাঁহাদের মধ্যে প্রতিভাশালী ব্যক্তি অতি অল্প।

বঙ্গ-সাহিত্যের ৩য় ধারা কবিতা বা কাব্য—পূর্ব্বে কবিতা বা গান সাহিত্যের আসর একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল। আমরা দিনরাত যে ভাষায় কথা বলি বা যাহা আটপৌরে ভাষা, তাহা কাব্যের ভাষা হইতে পারে না। আমরা যখন কল্পনাদেবীর রাজসভায় প্রবেশ করি তখন কি আটপৌরে ভাষা লইয়া যাওয়া চলে? সে রাজসভার সহিত আমাদের কর্ম্মময় জীবনের সম্বন্ধ খুব কম। সেটা যেন একটা স্বপ্নরাজ্য। সে রাজ্যে সকলের যাইবার অধিকার নাই। শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমে ডগমগ হইতেন আবার কেহ বা জগন্নাথদেবের মূর্ত্তির স্থলে লাউমাচা দেখে। কাব্যের সমঝদার এই কারণে সব দেশে সব সময়ে অল্প। পূর্ব্বে সাহিত্য যখন পদ্যেই কেবল লেখা হইত তখন সকল পদ্যেই কবিত্ব থাকিত না কিন্তু ধর্ম্মের নানারূপ মূর্ত্তির সহিত লেখকের পরিচয় হইত। বৈরাগ্য, ভক্তি ও প্রেম তাহার মধ্যে প্রধান। তখন মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে এত পুস্তক প্রচারের ধুম ছিল না, দেশের অতি অল্প লোকেই লেখাপড়া জানিত। কিন্তু তবুও জনসাধারণের সহিত সাহিত্যের এই একমাত্র ধারার যোগ ছিল। এখন শিক্ষিত লোকে থিয়েটারের গান শিখে কিন্তু জনসাধারণ নীলকণ্ঠ, মতিরায়, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, রামপ্রসাদ, দেওয়ান মহাশয় ও দাশুরায়ের গান জানে। এমনকি আধুনিক কাব্যের একচ্ছত্র-সম্রাট সার রবীন্দ্রনাথের গানগুলিও তাহাদের নিকট দুর্ব্বোধ্য। অপর কবিদিগের কথা না বলিলেও চলে। এ যেন বিভিন্ন তলে অবস্থিত একমুখী রেখার মিলন। কবি ভাবিতেছেন "আমি লিখি বুঝি বেশ, আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ" কিন্তু জনসাধারণকে জিজ্ঞাসা করিলে বর্ত্তমান যুগের কবির কথা দূরে থাক্, মাইকেল, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র পর্য্যন্ত তাহাদের অজ্ঞাত। তাই কোন কবি কল্পনাদেবীর স্বপ্নরাজ্য ছাড়িয়া পল্লীগ্রামের আনাচে-কানাচে ঘুরিতেছেন আবার কেহবা সাধুভাষা ছাড়িয়া দেশভাষায় কবিতা লিখিতেছেন কিন্তু তাহাতে যায় আসে কি? আধুনিক কবি ইংরাজী শিক্ষিত—আর জনসাধারণ অশিক্ষিত অথচ ধর্ম্মপ্রাণ। দুয়ের মধ্যে সহানুভূতি

নাই। কেহ কাহারও হৃদয়ের কথা বুঝিতে পারে না। শিক্ষিতের মধ্যেই অনেকের "প্রীতি উপহারের" দিন হইতে কবিতার সহিত আদা-কাঁচকলার সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া যায়। ইহার প্রধান কারণ ইহাই অনুমিত হয় যে, একদিকে যেমন আমাদের জীবনযাত্রা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, শিক্ষিত ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্য অর্থোপার্জ্জন ও ভোগ। আমরা শিক্ষিত লোক, পরলোক মানি না, মুখে আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা বলি, কাজেই এক অচিন্ত্য অব্যয় অসীম নিরাকার ঈশ্বরের চরণতলে আমাদের সঙ্গীত উপহৃত হয়। ইহার সহিত বিশ্বসঙ্গীতের যোগ থাকিতে পারে কিন্তু জনসাধারণের হৃদয়ের সহিত ইহার যোগ নাই কারণ জনসাধারণের হৃদয়ের বহু উৰ্দ্ধে আধুনিক সঙ্গীত অবস্থিত।

আধুনিক সাহিত্যের এই ধারায় পদ্মিনী কর্ম্মদেবীরূপে পাশ্চাত্যদেশের নূতন আমদানী "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে" এই এক নূতন ভাব আধুনিক যুগের প্রারম্ভে দেখা দিয়াছিল। হেমচন্দ্রের 'ভারতভিক্ষা' 'ভারত-বিলাপ' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' মনমোহন বসুর 'হরিশ্চন্দ্র' এই সুরে বাঁধা। মোহনমেলা ও জাতীয় সঙ্গীত ইহারই ফল। বঙ্গভঙ্গের সময় ইংরেজবিদ্বেষে এই ভাব কলুষিত হইয়া যখন রাজদ্রোহীদের হত্যাকাণ্ডে পর্য্যবসিত হইল, সেইদিন হইতে এ ভাব সাহিত্য হইতে তিরোহিত হইল। বৈষ্ণব মহাজনগণ আদিরসকে হরিনামের রসের সহিত মিশাইয়া মধুররসে পরিণত করিয়াছিলেন। ইহলোক-সর্ব্বস্ব ইংরাজী শিক্ষিত কবিরা য়ুরোপ হইতে নায়ক নায়িকার সহিত পূর্ব্বরাগের আমদানী করিলে হেমচন্দ্রের "হতাশের আক্ষেপ" রবীন্দ্রনাথের প্রেমসঙ্গীত ও অন্যান্য কবির প্রেমসঙ্গীত দেশ ছাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল। এখন সে সব আর বড় দেখা যায় না, কচিৎ বন্ধুর "প্রীতি উপহারে" ইহার নিদর্শন পাই। বৈষ্ণবমহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণে একদিন ভানুসিংহের পদাবলী বাহির হইয়াছিল আর অধুনা ভুজঙ্গধর ও কালিদাসের কতকগুলি কবিতা এই মধুর ভাবে প্রণোদিত। কিন্তু হইলে কি হয়? যে জনসাধারণ ইহার আদর করিবে তাহাদের নিকট ইহার প্রচার হয় না, আর যাঁহাদের নিকট প্রচার হয়—তাঁহারা ইহার আদর জানে না। মধুররসের ক্ষীণ ধারা এখনও জনসাধারণের নিকট শীর্ণকায়া ভাগীরথীর ন্যায় পবিত্র, আর উপন্যাসের ধারা—বিপুলকায়া পদ্মার ন্যায় সর্ব্বগ্রাসিনী হইলেও তাহা জনসাধারণকে মুক্তি দিতে পারিবে না।

শ্রীরাখালরাজ রায়।

আগন্তুক।

—ঃ*ঃ—

মোদের দোঁহের মধ্যখানে কে এলি তুই বল্,
একূল ওকূল পূর্ণ করি স্নেহের টলমল।
শক্ত করি শিথিলেরে পূর্ণ করি প্রীতি,
মাঝখানে তুই উঠ্‌লি বাজি দুইটী তারের গীতি।
দিবারাতির মধ্যে যেন জ্যোতির্ম্ময়ী উষা,
দুইটী বুকের মধ্যে যেন লক্ষ মণির ভূষা।
দুইটী হিয়ার নবীনবাঁধন পারিজাতের মালা
নূতন করে' পরিণয়ের তুই রে বরণ ডালা।

নিবিড় আলিঙ্গনেও বাঁধন ছিলই নাক যেন,
একটুখানি পৃথক করি বাঁধলি দোঁহে হেন
একটু পৃথক কর্‌লি বটে বাঁধলি অটুট ডোরে!
উঠ্‌লি জ্বলে' পুণ্যশিখা মোহের ধোঁয়া ঘোরে'
মোদের প্রণয় কর্‌লিরে তুই কষিত কাঞ্চন,
যৌবনেরি উদ্দীপনায় মঙ্গল শাসন।
শরৎ-কমল হরলি হৃদয়-বাপীনীরের মল,
মোদের দোঁহের মধ্যখানে কে এলি তুই বল্‌।

আকাশপথের প্রণয় মোদের ছিলই নাক স্থির
সংসারেরি কুঞ্জবনে বাঁধালি তার নীড়।
স্মরধনুর শরে ছিলাম অন্ধ মোহ-মদে
মোদের মাথা নোয়ালি তুই স্মররিপুর পদে।
আবেশমূঢ়ে জীবন পথের লক্ষ্য দিলি এনে,
ভীরুদের আজ জীবনরণে নিয়ে গেলি টেনে।
লাবণ্যেরি পরিণতি অমৃত মঙ্গল
মোদের দোঁহের মধ্যখানে কে এলি তুই বল্‌।

দুইটী কচি হাতে আজি দুইটী জনা বাঁধা
তোকে নিয়ে মোদের সকল হাসা এবং কাঁদা।
একটী কুসুমপাত্রে মোরা আজ্‌কে মধু খাই
একটী সুধার উৎসে ক্ষুধা পিপাসা জুড়াই।
একই ব্রত ভয় ভাবনা একই স্বপন দিয়ে
কর্‌লি শাসন দুইটী মনে একটী করে' নিয়ে।
কুশণ্ডিকার কুশের বনে তুইরে কুসুম-ফল
মোদের দোঁহের মধ্যখানে কে এলি তুই বল।

শ্রীকালিদাস রায়

মঙ্গল-মঠ।

—:*:—

দ্বিতীয় খণ্ড।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

উষার আলোক তখনও ভাল করিয়া ফুটে নাই। মঙ্গল-মঠের সকলে অল্পক্ষণ পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিয়া, দেবালয়ে মঙ্গলারতি দেখিবার জন্য প্রাঙ্গনে সমবেত হইয়াছিলেন, মহারাজও আসিয়াছিলেন, তাঁহার অনুচরবর্গের মধ্যে নিরঞ্জন ব্যতীত সকলে উপস্থিত।

আরতি শেষ হইল, মঙ্গলারতি গান আরম্ভ হইল, তাহাও শেষ হইল, তখনও নিরঞ্জন আসিল না। মহারাজ অনুচরবর্গ সঙ্গে লইয়া প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইবার উদ্যোগ করিলেন, মদনকে বলিলেন "একবার নিরঞ্জনের খবরটা নিয়ে এস, সে অনেকরাত্রি পর্য্যন্ত জেগে কাগজপত্র নাড়াচাড়া করেছে, এতক্ষণে জেগে থাকে যদি, তা হলে ডেকো, না হলে চলে এস।"

কাছারীমহলের দ্বিতলে নিরঞ্জনের শয়নকক্ষ; মদন গিয়া দ্বার ঠেলিতে-ই দ্বার খুলিয়া গেল, মদন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিস্মিত হইল, নিরঞ্জনের পুঁথি, পত্র, শাস্ত্রগ্রন্থ ও নিজ রচনাপূর্ণ কাগজপত্রে বোঝাই বাক্স চারিটা গৃহের একপাশে মুক্তবক্ষে শূন্যগর্ভে বিরাজ করিতেছে; তাহাদের অভ্যন্তর-সম্পদ সমস্ত উজাড় করিয়া মেঝেয় নামান হইয়াছে, দুষ্প্রাপ্য পুঁথি, কীটদষ্ট হস্তলিপি, এবং পূর্ব্বাচার্য্যগণের লুপ্ত প্রায় মতামতের টীকা ভাষ্য ব্যাখ্যা ইত্যাদি বহুলায়াস সংগৃহীত গ্রন্থগুলি চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খল ভাবে ছড়ান রহিয়াছে, এতদিন অখণ্ড মনোযোগে তাহাদের মধ্যে ডুবিয়া, নিরঞ্জন সতর্ক যত্নে প্রমাণ প্রমেয় নিষ্কাষণ করিয়া, মূল ধর্ম্ম মত ও সাধনপ্রণালীর সত্য উদ্ধারে একাগ্র-সাধনায় নিযুক্ত আছে,—আজ সেগুলা বিক্ষিপ্ত, অবিনাস্ত ভাবে উপর্য্যুপরি স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে, সম্মুখে সামাদানে বাতিটা সারারাত্রি জ্বলিয়া এখন উষার আলোকে ক্ষীণ ম্লান অস্তিত্বটার অবশিষ্ট সাক্ষ্য দান করিতেছে, আর নিরঞ্জন অত্যন্ত উন্মনা চিন্তাকুল বদনে কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতেছে!

নিরঞ্জনের শ্রমশীলতা সর্ব্বজন বিদিত, অধ্যয়নচর্চ্চায় অক্লান্ত উৎসাহে সে কত নিদ্রাহীন নিশীথ স্বচ্ছন্দে উপর্য্যুপরি অতিক্রম করিয়া যায় তাহা মদন জানিত, সুতরাং ঘরে ঢুকিয়া ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত বলিল "আপনি জেগেছিলেন? মঙ্গলারতি দেখ্‌তে যান নি কেন?"

নিরঞ্জন চমকিয়া বলিল "মঙ্গলারতি হয়ে গেছে! কখন হোল?"

মদন বলিল "কিছুক্ষণ আগে হয়ে গেছে, আপনি অন্যমনস্ক ছিলেন শুন্‌তে পান নি বোধ হয়।"

নিরঞ্জন নীরবে অধর দংশন করিল কোন উত্তর দিল না, মদন বলিল "আপনি বুঝি সারারাতই জেগে কাজ করেছেন?"

বাতায়নের নিকট আসিয়া উষার ম্লান আলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিরঞ্জন বলিল "সারারাত জেগেছি বটে, কিন্তু কাজ কিছুই করি নাই,"

বিস্মিত মদনকে পুনশ্চ প্রশ্ন করিতে উদ্যত দেখিয়া নিরঞ্জন সহসা ব্যস্তভাবে বলিল "বাজে কথা থাক্, মহারাজ কোথা?—"

মদন বলিল "মহারাজ দেবালয়প্রাঙ্গনে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন, ভ্রমণে যাবার জন্য তিনি প্রস্তুত হয়ে আছেন, কাল যে পণ্ডিতরা সময়ের অল্পতার জন্য আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসে ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে গেছেন, আজ ভ্রমণের সময় তাঁরা এসে সে ক্ষতি মিটিয়ে নেবেন, কথা আছে—আপনি চলুন।"

নিরঞ্জন বলিল "মস্তিষ্ক বড় ক্লান্ত বোধ হচ্ছে,—তাঁদের কৌতূহল চরিতার্থতায় সহায়তা করতে পারলুম না, আমার নমস্কার জানিয়ে তাঁদের ক্ষমা করতে বোলো, মহারাজকে বোলো আজ অসুস্থ বোধ করছি, আজ ভ্রমণে যাব না, এখন একটু নিদ্রা চেষ্টায়………"

মদন অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল "অসময়ে নিদ্রা চেষ্টা ?"

ম্লান হাসি হাসিয়া নিরঞ্জন বলিল "সময়ের মূল্য-মর্য্যাদা জ্ঞান যার নাই, তার কাছে সুসময় অসময় নাই,—যাও মদন তোমায় অকারণ কষ্ট দিলুম, কিছু মনে কোরনা, আজ আমি ভ্রমণে যেতে একান্তই অক্ষম ! মহারাজকে বোলো………"

মদন চলিয়া গেল, নিরঞ্জন মাথায় হাত দিয়া বাতায়নের নিকট বসিয়া পড়িল ! হায় হায় এ কি হইল,—যেখান হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল, আবার এক ধাকায় সহসা ছিট্‌কাইয়া আসিয়া এতদিনের পর ঠিক্ সেইখানে পৌঁছিল !………তিন বৎসরে সে একাগ্র সাধনায় নিমগ্ন হইয়াছিল, সহজ স্বচ্ছন্দতার সহিত আপনার প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য পালন করিয়া, বেশ শান্তিতে দিন কাটাইতেছিল, একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিয়া একটা নিশ্চেষ্ট আলস্যের নিঃশ্বাস গ্রহণ করে নাই, শুধু মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ খুঁজিয়াছে, দৃষ্টির সম্মুখে যে পড়িয়াছে, তাহারই সেবা করিবার--সহায়তা করিবার সুযোগ খুঁজিয়াছে ! মোহের দিক হইতে—অতৃপ্ত বেদনার দিক হইতে আপনাকে গুটাইয়া লইয়া, প্রেমের দিক হইতে—পরিতৃপ্ত সান্ত্বনার দিক হইতে আপনার সমস্ত অনুভূতিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর ছড়াইয়া দিতে চাহিয়াছে !………আকুল হৃদয়াবেগের প্রচণ্ড প্রাধান্য ধ্বংস করিবার জন্য বিশাল কর্ম্ম-ক্ষেত্রের মাঝে আত্মহারা-ব্যগ্রতায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, দেহ ও মনের শক্তি, যতদূর সম্ভব উন্নত বিস্তার করিয়া দিয়াছিল, ভাবিয়াছিল—এইবার দেহের শক্তিতে মনের তেজে সব ধ্বংস করিয়া মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব হইলাম ! কিন্তু হায়, এ কি হইল ! একদিন অচেতন ভাবে যে ক্রিয়া তাহার হৃদয়ের ভিতর আরম্ভ হইয়াছিল, আজ নূতন সংঘর্ষে সচেতন ভাবে তাহা পুনরায় আরম্ভ হইতেও ত্রুটি রহিল না।

নিরঞ্জন কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিল, চতুর্দ্দিকে ছড়ান বইগুলা ক্রমাগত পায়ে ঠেকিতে লাগিল, অসতর্ক পদাগ্রঘাতে একখানা ছিট্‌কাইয়া সশব্দে চৌকাঠের গায়ে গিয়া পড়িল, নিরঞ্জন বিরক্ত হইল, বইখানা তুলিয়া দেখিল রামানুজাচার্য্য প্রণীত "আচার্য্য রাজমার্গ।"—মাথায় ঠেকাইয়া বইখানা বাক্সের মধ্যে রাখিল, রাজ-মার্গের সন্ধান, পুস্তকের পৃষ্ঠাতেই খোদিত থাক, মানুষের হৃদয়ের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই !

নিরঞ্জন আপনার মধ্যে আপনি কশাহত হইল ! এই তাহার সন্ন্যাস !—ইহাই তাহার সাধনা ! ধিক্, ভিতরে এতই যদি ক্লান্তি-দৌর্ব্বল্য ছিল তাহা হইলে মিথ্যা চাতুরীর আশ্রয়ে আত্মগোপন করিয়া, কেন মূঢ়ের মত এত বড় সত্য পথে পদার্পণ করিয়াছিল ? সম্প্রদায়ের উপকার করিবার জনাই না, সে বড় দর্পে ব্রত বরণ করিয়াছে ?—আজ কোথায় উপকার ? শুধু নিজের দৌর্ব্বল্য-কলঙ্কে, ইহার অকল্যাণ বাড়াইয়া তুলিতেছে মাত্র, নয় কি ?—

নাঃ, এত বড় দৌর্ব্বল্য ঢাকিয়া প্রবঞ্চনার মুখস পরিয়া শুদ্ধাদ্বৈতমতবাদের মূল সত্য অন্বেষণ বা প্রচার অসম্ভব !—সে সব অন্যায় করিতে পারিবে, কিন্তু কপটতা করিতে পারিবে না !……… নিরঞ্জনের ইচ্ছা হইল নিষ্ঠুর হিংস্রের মত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া শুদ্ধাদ্বৈতমতবাদের সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দিয়া নিজের

হৃদয়ের সত্য মূর্ত্তিটা জগতকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেয়! তিন বৎসর পূর্ব্বে ভাস্করজীবনের শেষ প্রান্তে একদিন যেমন সেই অতুলনীয় সম্মান-সম্পদের নিদর্শন, দুষ্প্রাপ্য প্রশংসাপত্রগুলো এক নিমেষে ছিঁড়িয়া স্বচ্ছন্দে পথের ধুলায় উড়াইয়া দিয়াছিল, এবারও তেমনি ব্যবস্থা করে!—কিন্তু তখনই মনে পড়িল, সেই প্রশংসাপত্রগুলা নষ্ট হওয়ার জন্য সংসারে অন্য কাহারও কোন ক্ষতি হয় নাই, ক্ষতি যাহা হইয়াছিল, তাহা শুধু তাহার নিজের ভবিষ্যত জীবিকা সংগ্রহের পথে; কিন্তু এইগুলা অপচয় করায় তাহার নিজের মধ্যে উন্মাদ দানবীয়-আনন্দ যতই তীব্র উপভোগ্য হউক, কিন্তু ইহার দ্বারা আরও অনেকের অনেক উপকারের যে সম্ভাবনা আছে,—তাহা চিরদিনের জন্য বিনষ্ট হইবে! না তাহা হইবে না, নিজের অপকার করিতে বাধ্য হইয়াছে বলিয়া, পরের অপকার কেন করিতে যাইবে।

নিরঞ্জন থমকিয়া দাঁড়াইল, বিশৃঙ্খল পুস্তকরাশি গৃহের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা জনক ও নিজের পক্ষে নিতান্ত চক্ষুপীড়াকর বোধ হইল,—ইচ্ছা হইল সব যথাস্থানে গুছাইয়া ফেলে, কিন্তু তখনই মন ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল, অন্তরে যখন শৃঙ্খলা-সামঞ্জস্য নাই, তখন বাহিরের শৃঙ্খলা-সৌন্দর্য্য থাকুক চাই উৎসন্ন যাউক, কি ক্ষতি?... ..বরং ইহার এই শৃঙ্খলা বেশ সজ্জা, এখন নিরঞ্জনের পক্ষে বেশী সহজ, বেশী স্বাভাবিক!

যুক্তি তর্ক রসাতলে যাউক, এখন উপায় একটা চাই— অবলম্বন একটা চাই!

আবার উপায় খুঁজিবার কথা মনে পড়িতে-ই নিজের উপর নিরঞ্জনের ঘৃণা বোধ হইল, রাক্ষসী মোহের দংশন-জ্বালা ভুলিবার জন্য চিরজীবনই ত উপায়ের পর উপায়কে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, নিষ্কৃতি পায় কৈ........ সুকৃতি বলে তবু অনেকটা গুছাইয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ কোথা হইতে এই বুকভাঙ্গা বেদনায় মনস্তাপের প্রতিমূর্ত্তির মত সেই চিরপুরাতন চিরপরিচিত আবার নূতন করিয়া আসিয়া, তাহার সব শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া গোলমাল করিয়া দিল?—

মায়া, সেই মায়া,—সে আজ বিধবা! নিরঞ্জনের হৃদয় ভেদ করিয়া উন্মাদ সমুদ্র তরঙ্গ, আকুল হুঙ্কারে দিগ্বিদিকে আছাড় খাইয়া ভাসিয়া পড়িতে লাগিল! মায়া আজ বিধবা! তাহার হৃদয় আজ নিরাশ্রয়, জীবন আজ সঙ্গীহীন!........

লোকাচার সম্মত অপরাধ শঙ্কা মাথায় থাকুক, নিরঞ্জন আজ ব্যাকুলআবেগে উচ্ছ্বসিত চিন্তাগতি কিছুতেই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না!......কে জানিতে চাহে, আট বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া এতদিন পর্য্যন্ত মায়াদেবীর দাম্পত্যজীবনের ইতিহাসে কত শোভা, কত সৌন্দর্য্য, কত রহস্য, কত বৈচিত্র্য ছিল!......কে জানিতে চাহে তাহাতে মায়াদেবীর শান্তি-স্বস্তির পরিমাণ কতখানি অগাধ অপরিমেয় ছিল! নিরঞ্জন তাহা জানিতে চাহে না, সুখের দিনে—সুখের তরঙ্গে ভাসিয়া সে হয় ত আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল, সে দিনের সংবাদ সে কেমন করিয়া স্মরণ রাখিবে? নিরঞ্জনের তাহা শুনিতে আগ্রহ নাই.........কিন্তু আজ? ওঃ! বিশ্বব্যাপী মনঃপীড়া নিরঞ্জনের মাথার উপর বিরাট বোঝার মত চাপিয়া বসিয়াছে, মাথা নাড়া দিয়া ইহাকে ঝাড়িয়া ফেলিবার যো' নাই!...... মায়া!—সেই মায়া! উন্নতসম্ভ্রমে, অটলনিষ্ঠায়, দুর্জ্জয় প্রতিকূলতার সহিত যুঝিয়া যুঝিয়া মরণান্তিক ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়াও,—যাহার স্মৃতি সে নিভৃত অন্তরে চিরদিন পূজা করিয়াছে, প্রণাম করিয়াছে, সেই বাস্তব মায়ার,—জাগ্রত দেবীত্বের' আহা মরি, আজ এমন অবস্থা! আজ নিষ্ঠুর আঘাতে,—বিশ্বের চারিদিক হইতে সমস্ত শান্তি-শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া পড়িতেছে!..... আকুল ঝঞ্ঝা হাহাকারে, পৃথিবীর মর্ম্মভেদী সহানুভূতির তীব্র হায়-হায় রোল জাগিয়া উঠিতেছে! নিরঞ্জনের ইচ্ছা হইতেছে, এই উন্মাদ ঝঞ্ঝা আলোড়নের মধ্যে, সমস্ত নীতি, সমস্ত

বিবেকের বন্ধন লঙ্ঘন করিয়া, সে দুর্দ্দম্য বেগে ছুটিয়া, অভীপ্সিত হৃদয়ের সান্নিধ্যে গিয়া, সেখানকার সমস্ত অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসে!

সঙ্কল্প মাত্রেই নিরঞ্জনের আপাদমস্তক তীব্র শিহরণে কণ্টকিত হইয়া উঠিল, আপনাকে শত ধিক্কার দিল! পাষণ্ড, নরাধম!—অবাধ স্বেচ্ছাচারের পথ উন্মুক্ত দেখিয়া, আজ সহানুভূতির ছলনায় নিজের উন্মাদ প্রবৃত্তিকে লইয়া কৌতুক ক্রীড়া চেষ্টা! .....

নিরঞ্জন আর ভাবিতে পারিল না, সেই চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত পুস্তকরাশির মধ্যে ধূলির উপর অবসন্ন নির্জ্জীবের মত শুইয়া পড়িল, ছি ছি, মনের এমন দৈন্য কলঙ্কিত অবস্থা লইয়া সে কাহারও সম্মুখে গিয়া আজ দাঁড়াইতে পারিবে না! নিত্য-নৈমিত্তিক পূজা, পাঠ, জপ, আহ্নিক যখন হয় হইবে, কিন্তু এখন, আপাততঃ নয়!

ক্লান্তমস্তিষ্ক, অবসাদগ্রস্ত দেহ শীঘ্রই নিদ্রার মধ্যে আরাম মগ্ন হইল। অনেক বেলায় মোহন্তমহারাজের আহ্বানে ঘুম ভাঙ্গিল, অভ্যস্ত সংস্কারবশে একলম্ফে উঠিয়া দাঁড়াইল, দেখিল সম্মুখে মহারাজ!---নিরঞ্জন প্রণাম করিল। তাহার বুকের ভিতর ভীষণ বেগে ধড়্ ধড়্ শব্দাঘাত বাজিতে লাগিল।

মহারাজ নিরঞ্জনের শয়নের অবস্থা ও শয্যার ব্যবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, ঈষৎ ভর্ৎসনা ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন "রাম, রাম,--ব্রহ্মচারী, সকল সাধনার মধ্যেই সংহত ধৈর্য্য, সহজ স্বাভাবিক ব্যবস্থা রাখা চাই, উচ্ছৃঙ্খলতা কোন পথেই শ্রেয়স্কর নয়! কাল পথশ্রমে সকলেই ক্লান্ত হয়েছিলুম, তার ওপর তুমি সারারাত জেগে দেহ মনকে খাটিয়েছ? ব্রহ্মচারীর স্বাস্থ্য যতই সুদৃঢ় হোক, কিন্তু শ্রমাধিক্যে, অতিচারে সেও ত ব্রহ্মচারীত্ব লাভ করতে পারে, সেটা ভুলো না।"

নিরঞ্জন শুষ্ক রসনা সজোরে দন্তে চাপিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল. তাহার ভয় হইল পাছে সে এখনই চীৎকার করিয়া উত্তর দিয়া ফেলে "মহারাজ, হৃদয়াবেগ প্রাধান্য সময়-বিশেষে,—ইচ্ছাশক্তিকে অতিক্রম করিয়া দেহমনকে অ-যথা অত্যাচার পীড়ন ভোগে বাধ্য করে!—আমি স্বেচ্ছায় অন্যায় করি নাই!"

মহারাজ বলিলেন "যাও স্নান করে এস. আমি ভৃত্যকে ডেকে গৃহের এ সমস্ত বিশৃঙ্খলা, দূরীভূত করিয়ে নিচ্ছি—

নিরঞ্জন সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল "না মহারাজ, এতে কাউকে হাত দিতে হবে না, আমার বিশৃঙ্খলা আমিই শৃঙ্খলিত করব, অন্যের সাহায্য শুধু তার জটিলতা বাড়াবে মাত্র, ও সব যেমন আছে তেমনি থাক্‌তে অনুমতি দিন,—"

মহারাজ বলিলেন "থাকুক, কিন্তু আগে মন স্থির করে প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য শেষ করে এস, পরে এ সকলে হস্তক্ষেপ করো—"

নিরঞ্জন নিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল "যে আজ্ঞা"

নিরঞ্জন গৃহ হইতে বাহির হইল, মনে পড়িল, শয্যাত্যাগের পর আজি এখনও প্রাতঃস্মরণীয় শ্লোকাষ্টক আবৃত্তি করা হয় নাই!—তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ আঘাতে আপনাকে সচেতন করিয়া,—দ্রুত নিঃশ্বাসে, দেবতা, গ্রহদেবতা, গুরু প্রণামের মন্ত্র স্মরণান্তে দ্বিতলের নির্জ্জন সিঁড়ি বহিয়া নীচে নামিতে নামিতে, নিরঞ্জন সচ্চিদানন্দ রূপী নিত্য মুক্ত স্বভাববানের উদ্দেশে সজোরে আবৃত্তি করিল!—

. . . . "লোকেশ চৈতন্য ময়াধিদেব, শ্রীকান্তবিষ্ণোর্ভবদাজ্ঞয়ৈব

প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং"... ... ...

নিরঞ্জন আহত চিত্তে সহসা নীরব হইল! হইল না! হইল না!——কাহার প্রীত্যর্থে সে সংসার যাত্রায় চলিয়াছে? তাঁহার কি? অসম্ভব! সে যে বড় কপট নির্দ্দয়তা! —অপরাধ করিতেছে, ত্রুটি ঘটাইতেছে তাহাই ভাল! কিন্তু মিথ্যাবাদী হইতে পারিবে না, কখনই না!

নিরঞ্জন নিঃশব্দে মাথা হেঁট করিয়া চলিল! যথারীতি স্নান প্রভৃতি সমাপ্ত করিল, নিত্যপাঠ্য স্তব-স্তোত্র সমস্তই নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করিল, কিন্তু ভাল তৃপ্তি বোধ হইল না!......মন—সংশয়াচ্ছন্ন, প্রাণ—আরাম হীন; আজ আর প্রাণায়াম করিয়া কি হইবে? আজ ফুল তুলসী সংগ্রহ করিয়া জপের আসনে বসিয়া কেন বৃথা প্রাণহীন আড়ম্বরে, পূজ্য ও পূজার শুচিতা সম্ভ্রমকে অপমানাহত করিবে? নিরঞ্জন স্নানান্তে জলে দাঁড়াইয়া আবক্ষ-নিমজ্জিত হইয়া সংক্ষেপে জপাহ্নিক শেষ করিল, মুদ্রিত চোখের পাতা ভেদ করিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পরিয়া, জলরাশির মধ্যে মিশিয়া গেল।

পুষ্করিণীর ঘাটে উঠিয়া, দেখিল একজন ভৃত্য তাহার বস্ত্র, ছত্র ও খড়ম লইয়া অপেক্ষা করিতেছে; অসহিষ্ণুভাবে নিরঞ্জন বলিল "তোমার এত কষ্ট কর্‌বার কি প্রয়োজন ছিল বাপু? আমি স্বচ্ছন্দে বাড়ী গিয়ে কাপড় ছাড়্‌তে পার্‌তুম।"

ভৃত্য থতমত খাইয়া বলিল "দাওয়ানজীর হুকুম মহারাজ"

নিরঞ্জন ভৃত্যের হাত হইতে কাপড় লইয়া বলিল "দাওয়ানজীর অতিথিসৎকারব্যবস্থা প্রশংসনীয়, কিন্তু আমাকে এসব উৎপীড়ন থেকে বাদ দিয়ে চলো বাপু,—ছাতা খড়ম নিয়ে যাও, আমি দেবালয়ে যাচ্ছি—"

কুণ্ঠিত ভাবে ভৃত্য বলিল "দুপুরের রোদ, পাথরের শাণ তেতে আগুণ হয়েছে,—অন্ততঃ ছাতিটা—"

হঠাৎ উগ্র ভাবে নিরঞ্জন বলিল "ব্রহ্মচারীর মাথা সামান্য রোদে ফাট্‌বে না,—তুমি চলে যাও—"

ভৃত্য অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইল। দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্থানোন্মুখ হইল, সহসা বিচলিত ভাবে নিরঞ্জন তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "দেখো বাপু, বিবেচনাস্থলে, প্রশ্নস্থলে তর্ক কোরো, কিন্তু আদেশের স্থলে তর্ক কোরনা, ব্যবহারিক বুদ্ধি পরিচালনে আমি অনভ্যস্ত, হয়ত সামান্য কারণে তোমাদের উপর রূঢ়তা প্রকাশ কর্‌তে বাধ্য হব, আমার নিজ সম্বন্ধীয় কাজে, তোমরা কেউ প্রতিবাদের তর্ক তুলো না—"

ভৃত্য ঈষৎ আশ্চর্য্যভাবে মাথা নোয়াইয়া ভিজা কাপড় লইয়া চলিয়া গেল; নিরঞ্জনের নিজের ব্যবহারে নিজের মনের মধ্যেই নূতন অপ্রসন্নতার স্বর বাজিয়া উঠিল,——বিক্ষিপ্ত মনটা কোনমতে সংযত করিয়া, তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া দেবালয়ে চলিল।

দেবালয়ে পৌঁছিতেই সহকারী পুরোহিত দেবানন্দ আসিয়া সাজিভরা ফুল সম্মুখে ধরিয়া সসম্ভ্রমে বলিল "মহারাজ আপনার পূজার ফুল।"

নিরঞ্জনের মন আবার বিরক্ত হইয়া উঠিল; এখানে চারিদিকেই যে বিষম রাজত্ব-আড়ম্বর! আত্মদমন করিয়া ক্লিষ্ট হাস্যে বলিল "পূজার ফুল স্বহস্তে সংগ্রহ করাই প্রশস্ত বিধি,—বিশেষতঃ ব্রহ্মচারীর পক্ষে, কিন্তু তা ছাড়া আজ আমার ফুলের দরকার নাই, জপাহ্নিক পূজা শেষ করে এসেছি,—"

দেবানন্দ ফিরিয়া গিয়া পাশের ঘরে ঢুকিল, শুনিতে পাওয়া গেল, এক ব্যক্তির উদ্দেশে বলিতেছে, "এ ফুলের দরকার নাই মোহন্তমহারাজের পূজা হয়ে গেছে—"

"মোহন্তমহারাজ!"—নিরঞ্জন হাসিল, অধৈর্য্য মনের মধ্যে একটা কর্কশ চীৎকারের প্রতিবাদ উঠিল! নিরঞ্জন সেখানে আর দাঁড়াইল না, দ্রুতপদে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইল।

চলিতে চলিতে নাটমন্দিরের পাশে একটা জায়গায় আসিয়া অকস্মাৎ দাঁড়াইল,—মনে পড়িল কাল এইখানে মায়া দেবীকে দেখিয়াছিল, অজ্ঞাতে মনের মধ্যে একটা অভিনব আগ্রহ,—সন্তর্পণ চকিত ভাবে দৃপ্ত বিদ্যুল্লতার মত চমকিয়া গেল !.........নিরঞ্জনের নিঃশ্বাস যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে রোধ হইয়া আসিল, তাহার বোধ হইল পায়ের নীচে পৃথিবী যেন টলমল করিয়া ঘুরিবার উপক্রম করিতেছে ! নিরঞ্জন চকিতের জন্য স্থির হইয়া সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হৃদয়ের অবস্থাটা পর্য্যবেক্ষণ করিতে চাহিল, কিন্তু বড় ভয় হইল,—কি জানি, সেখানে আজ কোন বস্তুকে কি মূর্ত্তিতে দেখিতে হইবে, কে বলিতে পারে। এতদিন দূরে দাঁড়াইয়া,—নিজের যে বিষাদ বেদনাকে নিজের মনে নিভৃত সন্তর্পণে অলস ভাবে উপভোগ করিতেছিল, যে বেদনাকে মহত্তর ভাব গাম্ভীর্য্যে সাদরে বিমণ্ডিত করিয়া,—সুউচ্চ সম্মান কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, জীবনে মহাসাধনার পথ মুক্ত করিয়া, মহৎকার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিল,—আজ বুঝি সেখানে দস্তাপহারী,—বিশ্বাসঘাতক হইয়া বসে ! আজ রুক্ষ রূঢ় বাস্তব, সম্মুখে জলন্ত বজ্রের মত উদ্যত হইয়াছে, হয়ত এখনই সাঙ্ঘাতিক বেগে মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে, তাহার সাধনার প্রাণ জ্বালাইয়া পুড়াইয়া এখনই হয়ত ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে ! তাহার ভাবের স্বর্গ বুঝি জঘন্য নরকে পরিণত করিয়া দিবে !

নিরঞ্জনের দুই পা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, মন্দিরের দিকে আর অগ্রসর হইতে সাহস হইল না !.........মায়া মন্দিরের পরিচারিকা !......কে জানে সে, সেখানে আছে কি না, কি জানি দেব প্রণাম করিতে গিয়া, অদৃশ্য দানবীর চক্রান্তে জড়াইয়া আবার কোন নূতন বিভ্রাট ঘটিবে কি না ! না না, এমন দুর্দ্দশার মুহূর্ত্তে দুঃসাহসকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না, প্রণাম আজ এইখান হইতে—দূর হইতেহ ভাল !

নিরঞ্জন সেইখানে, নতজানু হইয়া মন্দিরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রতাপে তীব্র তপ্ত প্রস্তর-প্রাঙ্গন যেন জানু মূলে ও দুই হাতে জলন্ত লৌহস্পর্শের মত বোধ হইল, ললাট যেন পুড়াইয়া দিল ! দেহের এই ক্লেশপীড়ন নিরঞ্জনের নিকট আজ মূর্ত্তিমান হাস্যরসের, সরস বিদ্রুপ মনে হইল !——জগত হিতকারী গোবিন্দকে সযত্ন অভ্যস্ত মন্ত্রোচ্চারণে প্রণাম করিয়া, প্রাণে আজ তৃপ্তি পাইবে না, তাহাত সুনিশ্চিত জানা আছে, তবু লৌকিক-কর্ত্তব্য বাধ্যতায় প্রাণহীন অনুষ্ঠান পালন করিতেছে, কিন্তু মাঝখান হইতে এই যে উপরি পাওনা'টা ইহাই সার্থক লাভ !——কারণ ইহার মধ্যে মিথ্যার লেশ নাই !

প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিরঞ্জন দেখিল মহারাজের অন্যতম শিষ্য ও সহচর প্রেমচাঁদ পণ্ডিত মহাশয় পাশে নাটমন্দিরে ইতিমধ্যে কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, প্রেমচাঁদ বয়সে ঠিক প্রৌঢ় না হইলেও যুবক নহেন। মঙ্গল-মঠে থাকিয়া, অভিপ্সিত প্রচার কার্য্যে নিরঞ্জনকে সহায়তা করিবার জন্য, ইনি নির্ম্মল-মঠ হইতে এখানে আসিয়াছেন, শাস্ত্রদর্শিতা ও বিচক্ষণতার জন্য পণ্ডিতসমাজে ইহাঁর যথেষ্ট খ্যাতি আছে, সেইজন্য মহারাজ ইহাঁকে যত্ন করিয়া সঙ্গে আনিয়াছেন।

নিরঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইতেই, পণ্ডিত সহাস্যে বলিলেন "ব্রহ্মচারীর ধৈর্য্য অপরিসীম ! উঃ, উঠানের 'শাণ'টুকু পার হয়ে আসতে আমার পায়ের তলা পুড়ে গেছে, আর তুমি এরই ওপর স্বচ্ছন্দে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করছ, অদ্ভুত শক্তি বটে।"

নিরঞ্জনের মুখে মলিন হাসি ক্ষীণভাবে ফুটিল,—অদ্ভুত শক্তি ত নিশ্চয়ই।—প্রত্যেক মুহূর্ত্তের দাহ যন্ত্রণা সুস্পষ্ট চেতনায় উপলব্ধি করিয়া, এমন প্রাণাকুল আগ্রহে নিজের কপাল নিজে পুড়াইবার শক্তিটা অদ্ভুত বৈ কি ! —নিরঞ্জন সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "আপনি এমন সময় এখানে ?"

পণ্ডিত বলিলেন তোমাকে মহারাজের আদেশ জানাতে এসেছি,—জপাহ্নিকের পর জলযোগ করে, তুমি আমাদের সভায় গিয়ে উপস্থিত হোয়ো,—সেখানে তোমার রচিত,—শুদ্ধাদ্বৈতমতবাদ ভাষ্যের প্রথমাংশের পাণ্ডুলিপি কয়অধ্যায় পাঠ হচ্ছে, আমি এতক্ষণ পড়্‌ছিলুম এবার মদনানন্দ পাঠ করছে, তুমি যথাসম্ভব সত্বর এসো—"

বিস্মিত হইয়া নিরঞ্জন বলিল "আপনাদের সভা, অর্থাৎ ?—"

পণ্ডিত বলিলেন "এখানকার গণ্যমান্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কয়জনকে মহারাজ কাল নিমন্ত্রণ করে রেখেছিলেন, তাঁরা এসেছেন,—গ্রন্থের দোষগুণ বিচার ও প্রয়োজনমত টীকা সংযোজনের জন্য মহারাজ তাঁদের যথোচিত পারিশ্রমিক দিয়ে নিযুক্ত করতে ইচ্ছুক হয়েছেন.—খুব তর্কবিচার চল্‌ছে, সকলেই এক বাক্যে ধন্য ধন্য প্রশংসায় বল্‌ছেন—এর ওপর টীকা সংযোজনের শক্তি তাঁদের নাই, এমন অদ্ভুত প্রতিভাশালী পণ্ডিতের রচনার নিকট তাদের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা নিতান্তই অনাবশ্যক এবং অযোগ্য—

ক্ষুণ্ণভাবে নিরঞ্জন বলিল "তাঁরা টীকা সংযোজনে পুস্তকখানির উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূলে সহায়তা করতে চান না ?

গম্ভীরভাবে পণ্ডিত বলিলেন "তাঁরা অক্ষম, বাস্তবিক নিরঞ্জন, সেটা কিছুমাত্র মিথ্যা নয়,—তোমার প্রতিভা-গৌরবে আমরা সকলেই আজ নিজেকে ধন্য মনে করি, আমরা আশ্চর্য্য হয়ে গেছি, অল্পকালের মধ্যে এ কি অদ্ভুত কাণ্ড করে ফেলেছ ? তোমায় প্রণামের অধিকার নেই, বড় দুঃখের বিষয়,——আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি দীর্ঘজীবি হও, আমাদের দৃঢ় ধারণা, কেউ কিছু না পার্‌লেও, তোমার একার চেষ্টাতেই সম্প্রদায়ের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হবে !—"

নিরঞ্জন ম্লানমুখে ঘাড় হেঁট করিল ! তাঁহাদের এই ধারণার দৃঢ়ত্ব গতকল্য এমনই সময়,—ঠিক এই দ্বিপ্রহরের সূর্য্যালোকের মতই, তাঁহারও নিকট উজ্জ্বল সত্য ছিল, কিন্তু আজ আর নাই--আজ তাহাদের ধারণা দৃঢ়ত্ব; নিরঞ্জনের নিকট মর্ম্মান্তিক আক্ষেপের বিসদৃশ পরিহাস !...............ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া, নিরঞ্জন মুখ তুলিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিল "আপনাদের ভাল লেগেছে শুনে সুখী হলুম, যদি ওর দ্বারা কারুর কিছু উপকারের আশা আছে বোঝেন তাহলে আপনাকে আমি অনুরোধ করছি, ভাষ্যের শেষাংশ প্রণয়নের ভারটি আপনি গ্রহণ করুন !

পণ্ডিত বিস্ময়ে চমকিত হইয়া বলিলেন "আমি কেন।"

উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিঃশ্বাস বুকের মধ্যে চাপিয়া লইয়া নিরঞ্জন ঊর্দ্ধমুখে, মন্দির-চূড়ায় উড্ডীয়মান পতাকার দিকে চাহিয়া বলিল "সকল সাধনাই শক্তি সাপেক্ষ, যে শক্তি নিয়ে এতদিন চোখ কান বুজে প্রাণান্ত চেষ্টায় খেটেছিলুম, সে শক্তি আজ হারিয়ে ফেলেছি, পঙ্কস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে লোহার মুগুর ভাঁজা হয় না,—আত্মশক্তি নির্ভরতা না থাক্‌লে কি পরের শক্তি উদ্বোধনে সহায়তা করতে পারা যায় ? আমার মত হতভাগ্যের পক্ষে অশুদ্ধ মন নিয়া শুদ্ধাদ্বৈতমতবাদের মর্ম্মরহস্য..........." নিরঞ্জন হঠাৎ থামিল, ব্যাকুল নয়নে চারিদিকে চাহিয়া বলিল "না পণ্ডিতবর, ক্ষমা করুন,—আমার দ্বারা আর কাজ হবে না, আমি অক্ষম।"

পণ্ডিত বলিলেন "তুমি নির্ম্মলমঠে থেকেই-না ভাষ্য প্রণয়ন করেছিলে ?—"

নিরঞ্জন বলিল "হাঁ সুন্দর-মঠে দীক্ষা নিয়ে নীলাচলে শ্যামানন্দ আচার্য্যের নিভৃত আশ্রমে শিক্ষার জন্য গিয়েছিলুম পরে নির্ম্মল-মঠে এসে সাধনায় প্রবৃত্ত হয়ে, যৎকিঞ্চিৎ সিদ্ধি-শান্তিলাভ করেছিলুম, কিন্তু এই নিরেট পাথরে গড়া মঙ্গল-মঠটা প্রকাণ্ড অমঙ্গলের নিকেতন, এখানে এসে আমার সুন্দর-মঠের দীক্ষা, নির্ম্মল-মঠের সাধন সব ধ্বংশ হতে বসেছে।—

পণ্ডিত নিরঞ্জনের মুখপানে চাহিয়া হতবুদ্ধি হইলেন, এমন অবিশ্বাস্য অসঙ্গত উক্তিকে কৌতুক বলিবেন কেমন করিয়া। নিরঞ্জনের চক্ষে যে সত্য সত্যই কঠোর মনস্তাপের অগ্নি দেদীপ্যমান! বিস্ময় মথিত স্বরে বলিলেন "ধ্বংশ হতে বসেছে? একদিনেই।-"

গভীর বেদনায় নিরঞ্জন বলিল "এক মুহূর্ত্তে।—বড় কোলাহল পণ্ডিত জী, এখানকার চারিদিকেই বড় কোলাহল,—এখানকার বাতাসে বিষাক্ত বাষ্প ঘ্রাণে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছে, আমার যেন ক্রমশই উন্মত্ততা ঘনিয়ে আস্‌ছে আমি নিঃশ্বাস ফেল্‌তে পাচ্ছিনে,—এখানে মুক্তি সাধনার স্থান নাই, আছে শুধু শৃঙ্খলের বন্ধন!"

পণ্ডিত এমন অদ্ভুত উক্তি জীবনে কখনও কাহারও মুখে শুনিয়াছেন কি না স্মরণ করিতে পারিলেন না, আশ্চর্য্য ভাবে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন "এখানকার মোহন্তপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রাজৈশ্বর্য্য ভোগ তোমার কাছে শৃঙ্খলের বন্ধন বোধ হচ্ছে? আশ্চর্য্য তোমার মনোবৃত্তি। তুমি এতবড় ছেলেমানুষী কথা কইতে জান তা আমার ধারণা ছিল না .... বুঝে দেখো, আমাদের সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী জিতেন্দ্রিয়-স্বভাব মহারাজ কি করছেন?"

সকাতরে নিরঞ্জন বলিল "অনেক পার্থক্য,—অনেক পার্থক্য! পুরুষকারের স্বেচ্ছাধীন আনন্দে গড়া সোনার শিকলকে কণ্ঠের ভূষণ করা——আর রাক্ষসী ছলনাময়ী প্রকৃতির ছলনায় গড়া কঠিন লোহার শিকলে পা বেঁধে আটক পড়ে থাকায় ঢের পার্থক্য,—স্বর্গ নরকের চেয়েও বেশী ব্যবধান, ... না মহাশয় মার্জ্জনা করুন, মহারাজের আহ্বান আমি প্রণাম পূর্ব্বক প্রত্যাখ্যান করছি, আমি আত্মসম্ভ্রমবোধ ভুলে যাচ্ছি, গুরুর মর্য্যাদা রক্ষা করতে পার্‌ছি না, আমি হতভাগা—তাঁর শিষ্য নামের অযোগ্য! আপনাদের সভাকে দূর থেকে নমস্কার কর্‌ছি, শুদ্ধাদ্বৈতমতবাদের সম্বন্ধে উপদেশ শোন্‌বার মত মনের শক্তি স্থৈর্য্য এখন আমার নাই,—নির্লজ্জের মত শুধু প্রশংসালুব্ধ হয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়ানো, আমার পক্ষে মরণান্তিক যন্ত্রণার বিষয়, আপনি যান, মহারাজকে বল্‌বেন, এখন আমি অসুস্থ,—বড়ই অসুস্থ,—একান্তই অসুস্থ!"

নিরঞ্জন অধীরভাবে উঠান পার হইয়া দ্রুতপদে কাছারীমহলে নিজের বিশ্রামকক্ষেরদিকে চলিয়া গেল, পণ্ডিত অবাক হইয়া ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিলেন,--কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলার কোনই সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইলেন না, দুর্ব্বোধ্য বিস্ময়ে সংশয়পূর্ণচিত্তে ধীরে ধীরে মহারাজের উদ্দেশ্যে স্থানত্যাগ করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গৃহের নির্জ্জন শান্তির মধ্যে আসিয়া নিরঞ্জন—মাথাটা ঠিক করিয়া লইতে চাহিল, মুহূর্ত্ত কাল পূর্ব্বের ঘটনাগুলা চেষ্টা সত্ত্বেও আর সে ভালরূপ স্মরণ করিতে পারিল না, তবে মনে পড়িল, আকস্মিক উত্তেজনা বশে,—স্বাভাবিক নম্র সংযম হারাইয়া, সে উদ্ধত বর্ব্বরতায় মাননীয় প্রেমচাঁদ পণ্ডিতের সমক্ষে কতকগুলা বিশ্রী অসংযত প্রলাপ—যাহা তাহার চক্ষে সম্পূর্ণই অশোভনীয়, তাহাই বকিয়া আসিয়াছে!—নিরঞ্জন হতভম্ব হইয়া গেল!

কিন্তু এই প্রলাপটার হেতু কি? আভ্যন্তরিক বিকার-বৈকল্য বেগেই না ইহা উদ্গত হইয়া পড়িয়াছে? নিরঞ্জন ভীত হইল, মানুষ আজন্ম যাহা করে নাই, করিতে পারে নাই,—জীবনের কোন মুহূর্ত্তে তাহা যে ঘটনচক্রে

বাধ্য হইয়া করিতে পারিবে না,—হৃদয়ের এই সুদৃঢ় সত্য ধারণা আজ তাহার কাছে, প্রকাণ্ড মিথ্যা বলিয়া ধরা পড়িল !......আজ সে গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছে, নিজের উশৃঙ্খল একজ্ঞায়িতায় অন্ধ হইয়া, স্বচ্ছন্দে গুরু আজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে ! যে গুরু পরম স্নেহ যত্নে তাহাকে হৃদয়ের কাছে টানিয়া লইয়া, গভীর নিষ্ঠায় সুমহান্ সাধনায় দীক্ষা দিয়াছেন, বড় আশা করিয়া অকপট বিশ্বাসে মহত্বর কর্ত্তব্য পালনে তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, আজ সেই গুরুর মর্য্যাদা সে অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিল ! কি ভয়ঙ্কর পশুত্ব প্রাপ্তি ! আর অধঃপতনের বাকী কি ? তাহার অসাধ্য কাজ পৃথিবীতে আজ আর কিছু আছে বলিয়া ত মনে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না ! নিরঞ্জন ক্ষিপ্ত ঘৃণায়, সক্রোধে আপনাকে ধিক্কার দিল, "অকৃতজ্ঞ, পাষণ্ড !"

একজন ভৃত্য গৃহে ঢুকিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল "মহারাজ আপনার জলযোগের আয়োজন প্রস্তুত হয়েছে, আসুন।"

নিরঞ্জন ব্যাকুল ভাবে বলিল "জলযোগ ? না, না, বন্ধু এখন আমি জল গ্রহণ কর্‌তে পার্‌ব না, আমার গুরু, আমার মহারাজ আমায় ডেকেছেন, আমি তাঁর কাছে চল্লুম,—"

মহারাজের দেওয়া গতকল্যকার উত্তরীয়খানা মেঝের উপর পুস্তকরাশির মধ্যে অনাদরে পড়িয়াছিল ;—ফিরাইয়া দিতে মনে পড়ে নাই ; নিরঞ্জন সেখানা তুলিয়া লইয়া নিজের স্কন্ধের উপর ফেলিয়া ব্যগ্র প্রশ্নে সুধাইল "মহারাজ, পণ্ডিতগণকে নিয়ে কোথায় বিশ্রাম কর্‌ছেন জান ?"

ভৃত্য বলিল "তোষাখানায়।"

নিরঞ্জন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল, তোষাখানার দ্বার উন্মুক্ত, প্রশস্ত মর্ম্মর হর্ম্ম্যতলে সুবিস্তৃত ফরাশের উপর, একপাশে ছয়জন অপরিচিত ব্যক্তি বসিয়া আছেন, অন্যপাশে মহারাজ ; মদন মাঝখানে বসিয়া সেই 'ভাষ্য' পাঠ করিতেছে, নিরঞ্জন চাহিয়া দেখিল প্রেমচাঁদ পণ্ডিত মহারাজের তাকিয়ার পাশ ঘেঁষিয়া বসিয়া, অস্ফুট স্বরে মহারাজকে কি বলিতেছে,—মহারাজ নীরবে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছেন, তাঁহার মুখে একটা সংশয়ান্বিত উদ্বেগের ছায়া ঘনাইয়া উঠিয়াছে !

নিরঞ্জন বুঝিল কথাটা কি ? গৃহে ঢুকিয়া, অভ্যাগত পণ্ডিতগণের উদ্দেশে শিষ্ট সম্মান জ্ঞাপন করিতে ভুলিয়া গেল, একেবারে আসিয়া মহারাজের পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িল, নিঃশব্দে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল। মহারাজ কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, সুগভীর স্নেহে তাহার মাথার উপর হাত বুলাইয়া নীরব আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিলেন একটি শব্দ উচ্চারণ করিলেন না, তাঁহার মুখে বিশ্বস্ত প্রসন্নতার জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল, তাহার অর্থ যেন, 'তুমি আসিবে তাহা নিশ্চয়ই জানিতাম, তবে কত বিলম্বে আসিবে তাহা ঠিক বুঝিতে পারি নাই বৎস !'

প্রেমচাঁদ পণ্ডিত বিস্ময় নির্ব্বাক দৃষ্টিতে নিরঞ্জনের পানে চাহিয়া রহিলেন। মদন পড়া থামাইয়া উৎসুক দৃষ্টিতে পণ্ডিতগণের প্রতি বলিল "ইনিই ভাষ্যকার, শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মচারী মহাশয় !"

যথোচিত সৌজন্যের সহিত উভয়পক্ষে অভিবাদন বিনিময় হইল। পণ্ডিতগণ শ্রদ্ধা বিস্ময় পূর্ণ কৌতূহল বিস্ফারিত নয়নে, তরুণ তপনের ন্যায় উজ্জ্বল সুন্দর কান্তি, আনত দৃষ্টি ব্রহ্মচারী যুবার পানে চাহিয়া রহিলেন, দুই চারিটা সময়োচিত কথা সংক্ষেপে হইল মদন হাতের বইখানি নিরঞ্জনের দিকে সরাইয়া দিয়া, সদ্যঃ অধীত অংশের শেষ প্রান্তে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "এইখান পর্য্যন্ত পড়া হয়েছে, এইবার আপনি নিজে পড়ে শোনান।"

নিরঞ্জন আপত্তি করিতে উদ্যত হইয়া মহারাজের দৃষ্টিপানে তাকাইয়া সহসা থামিল, দেখিল সে দৃষ্টিতে সম্মতি-অসম্মতি কিছুই নাই, আছে শুধু সুনিপুণ পরীক্ষকের তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ ঔৎসুক্যের নীরব প্রতিক্ষা!—নিরঞ্জন অন্তরে কুণ্ঠিত হইল, বুঝিল তিনি আজ কোথায় দাঁড়াইয়া, তাহাকে বিচার করিতে চাহেন, এতদিন শিক্ষার্থী বেশে তাঁহার পদতলে বসিয়া যে ক্ষমা-স্নেহ লাভ করিয়াছিল, আজ পরীক্ষার্থী বেশে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া,—তাহারই ন্যায্য মূল্য হাতে-হাতে পরিশোধ করিতে হইবে।

নিরঞ্জনের অন্তরে অন্তরে হৃদ্‌কম্পন আরম্ভ হইল, হায়, ন্যায্য মূল্য দূরের কথা, সে যে নিজেই আজ সম্বলহীন! ওগো দয়াময় দীননাথ, কোথায় আছ, আজ একবার দয়া কর,—গুরুর সম্মান রক্ষার জন্য, তাহার বিলুপ্ত-আত্ম-সম্মান শক্তিকে আজ একটি দণ্ডের জন্য ফিরাইয়া দাও, শুধু একটিবার!.........

নিরঞ্জন বিনা ভূমিকায় পুস্তক টানিয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল, পড়া—শুধু পড়াই মাত্র! কোন দুরূহ ভাবের নিগূঢ় অর্থ বিশ্লেষণ,—যাহা এতদিন সে প্রত্যেক শ্রোতাকে প্রাণের আনন্দে প্রাণ খুলিয়া প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়াছে, তাহার এক বর্ণ আজ উচ্চারণ করিতে পারিল না, ক্ষোভে অনুতাপে তাহার চোখ ফাটিয়া জল পড়িতে চাহিল, কণ্ঠ শুকাইয়া আসিতে লাগিল, জিহ্বা জড়াইয়া যাইতে লাগিল, শব্দ উচ্চারণ দুর্ব্বোধ্য অস্পষ্ট অশুদ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল, কি পরিতাপ!.........পাঠের কি লাঞ্ছনা! পাঠকের কি নিগ্রহ! নিজের শক্তি গৌরবকেই নিজের দৈন্য লাঞ্ছনায়,—অপমানের কশাঘাতে ক্ষত বিক্ষত রক্তাঙ্কিত করিয়া তুলিল, নিরঞ্জনের নিঃশ্বাস যেন বুকের ভিতর আটকাইয়া যাইতে লাগিল! কপাল বহিয়া টস্ টস্ করিয়া ঘাম ঝরিয়া পুস্তকের পাতা ভিজিয়া যাইতে লাগিল।

প্রণাম করিবার সময় নিরঞ্জন, মহারাজের পায়ের কাছে উত্তরীয়খানি রাখিয়া দিয়াছিল, মহারাজ হাতের কাছে অন্য কিছু না পাইয়া সেইটা তুলিয়া নিরঞ্জনের মাথার উপর দ্রুত সঞ্চালনে বাতাস দিতে লাগিলেন, নিরঞ্জন জানিতে পারিল না, সুতরাং বাধা দিল না। মদন, মহারাজের কাজ দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু মহারাজের নীরব ঈঙ্গিতে নিরস্ত হইল,—অব্যাহত গতিতে পাঠকার্য্য চলিতে লাগিল।

সহসা প্রেমচাঁদ পণ্ডিত বলিলেন "ব্রহ্মচারী, নির্ম্মল-মঠে আমাদের কাছে পাঠ কর্‌বার সময় যেমন সরল, প্রাঞ্জল ভাষায়, চমৎকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে আমাদের বুঝিয়েছিলে, এঁদের কাছেও তেমনই ভাবে বল,—আমরা আরো পরিতৃপ্ত হব।"

মুমূর্ষুর অন্তিম নিঃশ্বাসের মত, বেদনা মথিত দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, নিরঞ্জন বড় ভয়ানক বিষাদকাতর দৃষ্টি তুলিয়া একবার মহারাজের পানে একবার প্রেমচাঁদের পানে চাহিল,—হায় তৃপ্তি-অন্বেষী মানবাত্মা! তৃপ্তিহারা হতভাগ্য আজ কেমন করিয়া বুভুক্ষিত হৃদয়ে তোমাদের প্রাণের তৃপ্তি যোগাইবে? অভিশপ্ত বৃহস্পতিপুত্রের মত, নিজের শক্তিতে প্রয়োগ-অক্ষম মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রের মত—মাত্র নিজের জন্য নিষ্ফলা বিদ্যার বোঝা ঘাড়ে লইয়া সে আজ এই স্বর্গে—এই সভায় লাঞ্ছনাহত অভিশপ্তের বেশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! আজ এখানে...............হায় ভগবান.............! সকাতরে নিরঞ্জন বলিল "আপনারা আজ দয়া করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার করুন,—আমি অক্ষম—।

মহারাজ অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া পণ্ডিতগণের উদ্দেশ্যে বলিলেন, "আপনারা অনুমতি করুন, আজ এই পর্য্যন্ত স্থগিত থাক, বেলা তৃতীয় প্রহর আগত প্রায়, আপনারা ভোজনান্তে এবার বিশ্রাম করুন,—"

"তথাস্তু—" পণ্ডিতগণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, নিষ্কৃতির নিঃশ্বাস ফেলিয়া, কৃতজ্ঞ নমস্কারের সহিত নিরঞ্জন পুঁথি বন্ধ করিল, মহারাজ সকলকে লইয়া ভোজনস্থানের দিকে চলিলেন, নিরঞ্জন পুঁথি রাখিয়া আসিবার জন্য নিজের ঘরে চলিল।

বিচিত্র ভাবোত্তেজনা সংঘাতে দেহ-মন অত্যন্তই অবসন্ন বোধ হইতেছিল, বহি রাখিয়া নিরঞ্জন ক্লান্তভাবে, অনাবৃত দেহ মেঝের ধুলার উপরই এলাইয়া দিল, শৃঙ্খলিত বাহুদ্বয় মাথার উপর তুলিয়া ঊর্দ্ধমুখে আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল।

সংস্কার! কর্ম্মফল! অসহ্য শাস্তি পীড়ন! কর্ম্মের ভিতর দিয়া সাধনা-স্রোত চালাইয়া, ব্রহ্মসত্ত্বা উপলব্ধি?... হায়রে হতভাগ্য, সমস্ত আয়োজন অনুষ্ঠান, জড়ের ভিতর দিয়া জড়ত্বেই পর্য্যবসিত হইল! শুধু আড়ম্বর বহনের দাসখতেই সহি দিয়া মরিল, দাসত্বচুক্তি, ফুরাইল না!......অন্তরের উন্নত নিষ্ঠায় স্থাপিত প্রেমের সৌধ ভাঙ্গিয়া সাধনার মন্দির চূর্ণ করিয়া, শেষে মোহে মজিয়া,—দয়ার নামে নির্দ্দয়তা করিবার জন্য, সর্ব্বনাশের শোভায় প্রবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য সাধের উপবন সাজাইতে বসিল! এ কি সন্ন্যাস? না একজায়ী আত্মম্ভরিতার স্ফুরিত অগ্নি-উচ্ছ্বাস।

অতর্কিতে—একটা হিংস্র বুভুক্ষার দৃপ্ত তড়িতাহত হইয়া নিরঞ্জনের হৃদয়ের অভ্যন্তরে আমূলপ্রোথিত অবসাদ খিন্নতার প্রাণমূলে যেন তীক্ষ্ণ কঠোর কুঠারাঘাত বাজিল! তড়িতাকর্ষিতের ন্যায় নিরঞ্জন সহসা তীব্র সচেতন ভাবে উঠিয়া বসিল! ঠিক ঠিক!—ইহাই ঠিক! ওগো বিশ্বনিন্দিতা অকল্যাণময়ী হিংসা,—তোমার ভিতরও বিশ্ববন্দিতা কল্যাণের শক্তি নিহিত আছে, আছে! আজ সে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছে, অহিংসা পরম ধর্ম্ম হইলেও,—এই মুহূর্ত্তে এখানে, জীবনের জটিল দ্বন্দ্ব সমস্যার স্থলে, নিজের খিন্ন অবসাদ দৌর্ব্বল্যকে হিংসার কঠোর আঘাতে হত্যা করাই পরম ধর্ম্ম!

নিরঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইল। না, পিছনের সমাধি শ্মশানের পানে আর মমতার দৃষ্টিতে চাহিয়া দৌর্ব্বল্য করা নয়! হৃদয়ের ভ্রান্ত কুহকময় সৌন্দর্য্য স্বপ্নের জীবন শুষিয়া, যখন নিজের জীবিকা নির্ব্বাহের পথ উন্মুক্ত করিয়াছে, তখন এই সাধনাই শ্রেয়ঃ! সন্ন্যাসকে ক্ষোভের বিলাস বেশে পরিণত করিবে না! অন্ধ একজায়িতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য,—জীবনের বাঞ্ছিত সার্থকতা সম্ভাবক, পাষাণ শিল্পের নিকট হইতে,—হৃদয়ের বড় সাধের সাধনা হইতে—আপনাকে জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া, নূতন বৈচিত্র্যের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছে—কিন্তু এতদূরে আসিয়া ইহার স্রোত প্রতিকূলতার বক্ষে আহত—অবরুদ্ধ করিলে চলিবে না, কিছুতেই না!—মুক্তি চাই—ই! আত্ম-গৌরব স্থাপন প্রয়াসে, আর আত্ম-প্রবঞ্চনা করিবে না!

নিরঞ্জনের স্মরণ হইল, আজ তাহার দেব প্রণাম অসম্পূর্ণ হইয়া আছে!.........দায়িত্ব জ্ঞান যখন স্মরণ হইয়াছে, তখন জ্ঞানতঃ কোথাও কর্ত্তব্য ত্রুটি রাখা উচিত নয়! অন্ততঃ প্রণামটা সকলের আগে সুসম্পন্ন করা চাই!

নিরঞ্জন তখনই বাহির হইয়া পড়িল, সরাসর আসিয়া দেবালয়ের উঠান পার হইয়া মন্দিরের নিম্নে আসিয়া পৌঁছিল, সোপান বহিয়া উঠিতে উঠিতে সহসা বহুদিনের বিস্মৃত—সুদূর অতীতের পুরাতন পরিচিত একটি সুমিষ্ট-মধুর আত্ম-নিবেদন স্তোত্র মনে পড়িল,—তাহার আদ্যারম্ভে "নমো নমস্তে" শব্দে পরম প্রণতির মন্ত্র সংযোজিত! অকস্মাৎ মনে হইল, দীর্ঘ আলস্য বিস্মৃতির পর, এ যেন তাহারই নিজের অতর্কিতে সুপ্তি ভঙ্গ!—ইহাকে উপেক্ষা করা চলিবে না, ইহাকে এই মুহূর্ত্তে নব উদ্যমে উদ্বোধন করিয়া পূর্ণ চেতনায় বরণ করিয়া লইতে হইবে।

মন্দিরের ভিতর ঢুকিয়া, বিগ্রহ সম্মুখে যুক্ত করে দাঁড়াইয়া প্রীতিনম্র আবেগ-উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে, নিরঞ্জন ভক্তি-তরল কণ্ঠে আবৃত্তি করিল :—

"নমো নমস্তে ভগবন্ দীনানাং শরণং প্রভো !
নমস্তে করুণাসিন্ধো নমস্তে মোক্ষ দায়ক—।
পিতা পাতা পরিত্রাতা ত্বমেকং শরণং সুহৃৎ,—
গতির্মুক্তিঃ পরাসম্পৎ ত্বমেব জগতাং পতিঃ।"

সহসা কণ্ঠস্বর উচ্চে চড়িয়া গম্ভীর ভাবাবেগে অধৈর্য্য ব্যাকুল স্বরে—মন্দিরের সুউচ্চ পাষাণপ্রাকারে প্রবল আহত হইয়া প্রচণ্ড নিনাদে ঝঙ্কৃত হইল :—

"পাপগ্রাহ-সমাকীর্ণে মোহনীহার-সংবৃতে—
ভবাব্ধৌ দুস্তরে নাথ নৌরেকা ভবতঃ কৃপা।
তৎকৃপা তরণীং দেহি,—দেহি নাথ........."

নিরঞ্জন ভুলিয়া গেল ! অসহিষ্ণু ভাবে মনের সমস্ত স্মৃতি আলোড়িত করিয়া, ছিন্ন সূত্র খুঁজিয়া লইতে চেষ্টা করিল, ব্রহ্মরন্ধ্রে করাঘাত করিয়া আকর্ণ ভ্রূ, সুদৃঢ় কুঞ্চনে আকর্ষিত করিয়া, সমস্ত ধৃতি-ধারণা মস্তিষ্কের মধ্যে টানিয়া সংহত করিয়া,—মুষ্টিবদ্ধ হস্তদ্বয়ের উপর ঈষন্নমিত শিরে ললাট স্থাপন করিয়া, প্রাণপণ যত্নে বিস্মৃত পদাংশ ধারণার আয়ত্তীভূত করিতে চাহিল,—কিন্তু কিছুতেই স্মরণ হইল না ! নিরঞ্জন পুনশ্চ আবৃত্তি করিল :—"তৎ কৃপা তরণীং দেহি,—দেহি নাথ........." হইল না, হইল না !—তবুও স্মরণ হইল না, আবার, আবার—আবার আবৃত্তি—আবার আবৃত্তি "তৎ কৃপা তরণীং দেহি দেহি নাথ........."

অকস্মাৎ পশ্চাতে ললিত কোমল কণ্ঠে, স্নিগ্ধ ভক্তি-করুণ প্রার্থনার স্বরে উচ্চারিত হইল :—

"..................দেহি নাথ বরাভয়ম্—
মৃত্যু-মায়াময়ে ঘোরে সংসারে দেহিমেঽমৃতম্ !
ক্ষিপ্রং ভবতু শান্তাত্মা ভক্তস্তে ভক্তবৎসল
নির্ব্বাণং যাতু পাপাগ্নিস্ত্বৎ প্রসাদাৎ পরেশ্বর ॥"

স্তম্ভিত, পুলকাবহ বিস্ময়োচ্ছ্বাসে,—নিরঞ্জনের হৃদয়মন যুগপৎ আর্দ্র বিহ্বল হইয়া উঠিল। কে গো সুহৃদ্, এমন ব্যাকুল প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে বিনা আহ্বানে আসিয়া—এমন ভাবে অগাধ-গভীর অন্তরঙ্গ সহায়তায় তৃপ্তির অমৃত আনিয়া দিলে !

দেবোদ্দেশে নমস্কার করিয়া,—নিরঞ্জন পিছনে ফিরিয়া চাহিল,—নিরাপদ শয্যায়, নিশ্চিন্ত শয়নে শায়িত, বিশ্বস্তচেতা সুষুপ্ত ব্যক্তি সহসা সুপ্তিজড়িত চক্ষু মেলিয়া,—শিয়রে উদ্যতচক্র কালভুজঙ্গম দেখিলে যেমন ভাবে চমকিয়া উঠে, নিরঞ্জন ঠিক তেমনই ভাবে উগ্র চমক খাইয়া, শঙ্কা-বিকল চিত্তে পিছু হটিল !—এ কি মায়াদেবী !

মায়ার সদ্যঃস্নাতা, শুচিবেশা, পূজারিণী মূর্ত্তি ; হাতে সদ্যঃ সংগৃহীতা প্রস্ফুটিত কুসুম সম্ভারে পরিপূর্ণ, ফুলসাজি ; তাহার অবস্থানভঙ্গির কোনখানে এতটুকু কুণ্ঠা নাই,—সে সরল সুগঠিত দেহটি সম্পূর্ণ ঋজু-সুন্দর ভঙ্গিতে স্থির অচঞ্চল করিয়া, উন্নত শিরে, দ্বার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে, তাহার নয়নে স্বর্গীয় প্রশান্তি ;—অধরে হর্ষোজ্জ্বল সুষমা !

সে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সারিয়া বেলা তৃতীয় প্রহরে দেব পূজায় আসিয়াছে, প্রতিদিন সে এমনই সময়ে আসিয়া থাকে।

নিরঞ্জন পিছু হটিয়া সরিয়া দাঁড়াইতে-ই, মায়া মন্দিরাভ্যন্তরে ফুলের সাজি নামাইয়া, দ্বারের বাহির হইতে চৌকাঠের উপর মস্তক লগ্ন করিয়া দেবতাকে প্রণাম করিল, তাহার পর দ্বার ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল, নিরঞ্জন সন্ত্রস্ত ভীত চরণে বাহির হইয়া আসিল।

মায়া মুখ তুলিয়া, স্নিগ্ধ ধীরকণ্ঠে বলিল "দাঁড়ান. আপনাকে প্রণাম করবার জন্যে খুঁজছি,—অধিকারী মহারাজের কন্যা, কিশোরীকে সংস্কৃত পড়াবার জন্যে আজ থেকে নিযুক্ত হয়েছি, তোষাখানার পাশের ঘরে পড়াতে গেছলুম, আপনার রচিত শুদ্ধাদ্বৈতমতবাদ ভাষ্যের পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনেছি, বড় আনন্দিত, বড় গভীর পরিতৃপ্ত হয়েছি,.........আপনাকে প্রণাম করে ধন্য হতে চাই।"

মায়া গলবস্ত্রে নতজানু হইল, অকস্মাৎ ব্যাকুল ভাবে আনত দৃষ্টি তুলিয়া ত্রাস-কম্পিত কণ্ঠে নিরঞ্জন সকাতরে বলিল "না না প্রণাম করবেন না, করবেন না,—আমি প্রণামের অযোগ্য, দুর্ভাগা!"

প্রশস্ত আয়ত দৃষ্টিতে চাহিয়া শান্ত সংযত স্বরে মায়া বলিল "যতক্ষণ দ্বিধা ছিল, ততক্ষণ এ দুঃসাহসে অগ্রসর হই নি, এখন সকল দ্বিধা কাটিয়েছি, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রণতঃ হবার যোগ্যতায় গড়ে তুলেছি. আর ভয় করি না,—আমার প্রণাম, এখন—শুধু আপনি কেন, স্বয়ং ভগবানও প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না! আপনার সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের সংবাদ জানতে চাইনে, শুধু জানি,—শুধু নিশ্চয় বুঝেছি, আপনার হৃদয়ের শক্তি-মহত্ত্ব, দৈন্য-দৌর্ব্বল্য সমস্তই আমার পক্ষে সমান শ্রদ্ধায় অবশ্য প্রণম্য!—"

নিরঞ্জন স্তম্ভিত, নির্ব্বাক! মায়া তাহার অবস্থা-দর্শনে দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া. নতশিরে প্রণাম করিয়া, ঠিক পূর্ব্বের মতই শান্ত অবিচল ভাবে মন্দিরে প্রবেশ করিল।

নিরঞ্জনের সংজ্ঞা ফিরিল; পরস্পর অঙ্গুলি সংলগ্নে বদ্ধ অবস্থায় শ্লথ বিলম্বিত হস্তদ্বয়ে সুদৃঢ় শক্তি ঢালিয়া, স্থির ধৈর্য্যে উর্দ্ধে তুলিয়া ললাট স্পর্শ করিল, তারপর সাশ্রুনয়নে সাষ্টাঙ্গে নত হইল, বুঝি পূজারিণীর উৎসর্গিত ভক্তি প্রণাম, সশ্রদ্ধ সম্মানে মাথায় তুলিয়া লইয়া—পরম প্রীতিভরে ইষ্টদেবতার চরণে নিবেদন করিয়া দিল। মুক্ত হইল! নিরঞ্জন উঠানে নামিল, মাথার উপর মুক্ত শান্ত স্ফটিক-স্বচ্ছ নীলাকাশে উজ্জ্বল তপনদেব দৃপ্ত গৌরবে হাসিতেছিলেন, নিরঞ্জন নিঃশব্দে ভিতরমহল বাহিরমহল পার হইয়া দেবালয়ের দ্বারদেশে পৌঁছিল. সেই সময় কাছারীমহল হইতে হইতে একজন ভৃত্য ছুটিয়া আসিয়া সসম্ভ্রমে বলিল "মহারাজ পণ্ডিতগণের সঙ্গে আহারে বসেছেন, আপনারও আহার প্রস্তুত শীঘ্র আসুন—"

শান্ত-কোমল কণ্ঠে নিরঞ্জন বলিল "ফিরে যাও বন্ধু. আজ আমি আহার করব না—"

এই ভৃত্যই অল্পক্ষণ পূর্ব্বে পুষ্করিণীর ঘাটে নিরঞ্জনের নিকট ধমক খাইয়াছিল, সুতরাং পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া সে বিস্ময় চাপিয়া যুক্ত করে সভয়ে বলিল "মহারাজকে কি উত্তর দেব?"

নিরঞ্জন পরম সৌহৃদ্যে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া প্রসন্ন স্নেহময় কণ্ঠে বলিল "আজ কর্ম্মফলের অবশেষটা, একগ্রাসে মুখে তুলে চিবিয়ে গলাধঃকরণ করেছি. আজ তৃপ্তিতে হৃদয় পূর্ণ, আহারের প্রয়োজন নাই ভাই, তোমরা কেউ ক্ষুণ্ণ হোয়ো না, মহারাজকে বোলো, আজ রবিবার গ্রহরাজের শান্তিব্রত উদযাপন করে আজ আমি সংযম উপবাসী;"

আদর পাইয়া, কৃতজ্ঞ সন্তোষে ভৃত্যের হৃদয় বিগলিত হইল, এবার সে দ্বিধাহীন হইয়া সাগ্রহে প্রশ্ন করিল "কিছুই খাবেন না মহারাজ ? একেবারে নিরম্বু উপবাস ? অন্ততঃ একপাত্র সিদ্ধির সরবৎ—"

সহসা বহুদিনের পর, বালকের মত সরল আনন্দ উচ্ছ্বাসে উচ্চ হাস্য করিয়া নিরঞ্জন বলিল "ভাল কথা মনে পড়িয়েছ বন্ধু, সিদ্ধি !—প্রশস্ত ব্যবস্থা,—যাও সিদ্ধিই নিয়ে এস, আজ আর কিছু প্রয়োজন নাই,—হাঁ মদনের নিকট হতে ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য'খানা নিয়ে এস,—আজ পরিপূর্ণ বিশ্রামের অবসর পেয়েছি—শীঘ্র যাও বন্ধু—"

ভৃত্য পুনশ্চ বলিল "সিদ্ধি কোথায় নিয়ে আসব ? আপনি মঠেই বিশ্রাম করবেন ?"

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিল "না বন্ধু এই কঠিন প্রস্তর-প্রাকার বেষ্টনে শুধু জড় আলস্য জমাট বেঁধে আছে, এখানে বিশ্রামের সুবিধা আমার পক্ষে নাও হতে পারে ! আমি মুক্ত আকাশের নীচে নির্জ্জন উদ্যানে গাছের ছায়ায় নিশ্চিন্ত আরামে বিশ্রাম করব, সিদ্ধি যেন সেইখানে পাই- সামান্য, এতটুকু—সিদ্ধি দিয়ে শুধু সরবৎ !"

ভৃত্য অভিবাদন করিয়া বলিল "যে আজ্ঞা।"

নিরঞ্জন মঠের পাশে পুষ্পোদ্যানে চলিয়া গেল, ভৃত্য সরবৎ ও সিদ্ধির সন্ধানে অন্য পথে চলিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বসন্ত সায়াহ্ন, সেই চিত্তরঞ্জনের চির পরিচিত, অভিনব নবীনত্ব মণ্ডিত, স্নিগ্ধ সুন্দর বসন্ত সায়াহ্ন। সমস্ত দিনের পর বসন্ত প্রকৃতির বুকভরা শোভা সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের বুকে নিষ্ঠুর অগ্নিবৃষ্টির শেষে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত সূর্য্যদেব এখন অস্তগমনোন্মুখ। সারা আকাশ ব্যাপিয়া,—নব বিকশিত কুসুমরাশির গন্ধ বুকে ভরিয়া মৃদু সমীরণ মৃদুল-পুলকে ভাসিয়া চলিয়াছিল, সায়াহ্নের স্নিগ্ধ শান্ত ছায়া সুষমা, ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর মাধুরী আবেশে তৃপ্ত মনোরম হইয়া উঠিয়াছে।

আহারান্তে মহারাজ মদনকে লইয়া দেওয়ান দেবলচাঁদের সহিত বৈষয়িক আলোচনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন; সমস্ত সময়টা সেই কাজে কাটিয়াছে, ব্যস্ততার জন্যই হউক, অথবা যে কারণেই হউক—মহারাজ নিরঞ্জনের সংবাদ গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই, সম্ভবতঃ ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে নিশ্চিন্ত আরামের অবসর দিয়াছিলেন।

বৈকালে মদন ও প্রেমচাঁদকে সঙ্গে লইয়া তিনি উদ্যান ভ্রমণে বাহির হইলেন, নিরঞ্জন উদ্যানে বিশ্রাম করিতেছে,—তাহা তাঁহারা জানিতেন, সকলে আসিয়া দেখিলেন, নিরঞ্জন পুষ্করিণীর তীরে বসিয়া নিষ্পলক দৃষ্টিতে জলের ধারে চাহিয়া একাগ্র মনোযোগে কি ভাবিতেছে। নিকটস্থ হইয়া প্রেমচাঁদ পণ্ডিত পরিহাসকোমল কণ্ঠে বলিলেন "কি ব্রহ্মচারি, সিদ্ধির ঝোঁকে বিশ্বগুরুমূর্ত্তি ধরেছ যে! ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য বন্ধ করে উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছে ?"

নিরঞ্জন মুখ তুলিয়া চাহিয়া স্বাভাবিক নম্র স্মিত হাস্যে বলিল "ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের তুলনায় বিশ্বপ্রকৃতি কিছু মাত্র অবহেলার বস্তু নন,—কোন শাস্ত্রে এতদিন যা বুঝে উঠ্‌তে পারিনি,—আজ এইখানে খুব সহজেই তা শিক্ষা করে নিলুম,—প্রমাণ দেখুন।"

নিরঞ্জন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল, তাঁহারা দেখিলেন জলের প্রান্তে বুক নোয়াইয়া একটি ছোট আম-গাছের শাখা নবোদ্গত পত্র পল্লবে ভূষিত হইয়া বায়ুভরে মৃদু মন্দ উল্লাসে দুলিতেছে ! তাহার মূল নিকটস্থ

মাটীতে মিশাইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, তবুও বুঝা যাইতেছে সে শাখাটা—গাছ নহে, সেটা আশ্রয়স্থান বিচ্ছিন্ন একটা হতভাগ্য ভগ্ন শাখা মাত্র!

নিরঞ্জন বলিল "সন্ধান নিয়ে জানলুম, বাগানের মালী সামনের ঐ—গাছের অপকার বোধে এই ডালটা দিনকতক আগে কেটে জলের ধারে ফেলে দিয়েছিল, কিন্তু বসন্ত কালটা এমনি আশ্চর্য্য তেজস্বী প্রাণবন্ত সময় যে কাটা ডালটা থেকে ইতি মধ্যে শিকড় বেরিয়ে মাটীর ভিতর আশ্রয় নিয়েছে, আর শাখার গায়েও নূতন পত্র উদ্গত হতে ত্রুটি করে নি!—আমি হাঁ-করে এখানে বসে অবাক হয়ে ভাবছি, প্রকৃতির প্রভাব কি ভয়ানক অদ্ভুত!"

মহারাজ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "অত্যন্ত ভয়ঙ্কর!—"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে, তীরের উপর হইতে অকস্মাৎ একলম্ফে নিরঞ্জন জলপ্রান্তে অবতীর্ণ হইয়া চক্ষের নিমিষে ব্যগ্র অসহিষ্ণু ভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, ডালটা ধরিয়া একটানে ভূমি হইতে উৎপাটিত করিয়া সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিল, চকিতের জন্য তাহার মুখভাবে একটা হিংস্র-কঠোরতার চিহ্ন ফুটিয়া, তখনই নীরবে অন্তর্হিত হইল।—স্বাভাবিক স্নিগ্ধ-সুন্দর হাস্যে, যেন ঠিক্ কৌতুকের ভঙ্গিতে নিরঞ্জন বলিল "সৃষ্টির মূলটা-ই স্রষ্টার ভুল মহারাজ! কিন্তু সে রহস্য বুঝে নেবার জন্য মানুষও শক্তি লাভ কর্‌তে পারে—যদি মূল্যের বেলা কুণ্ঠা কার্পণ্য না করে। প্রকৃতির প্রভাব-মাহাত্ম্যে এই ছিন্ন শাখার স্পর্দ্ধিত-বিক্রম বড়ই অসহ্য বোধ হ'ল, ওকে সরস-কোমল মৃত্তিকার সংসর্গ থেকে ছিঁড়ে, ডাঙ্গার ঐ কঠিন পাথর কুচার বুকে ইহজন্মের মত নির্ব্বাসন দিলুম—কাল এবং ক্ষেত্রের অনুকূল সহযোগিতায় স্বভাবের যে বৃত্তি, মঙ্গলের বিরুদ্ধে এমন প্রতিকূল ভাবে বেড়ে উঠ্‌তে চায়, তার উপর এই রকম রূঢ়তা প্রকাশই সমুচিত ব্যবস্থা!"

প্রেমচাঁদপণ্ডিত ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "কিন্তু প্রকৃতির উপর এত কঠোর পৌরুষাধিপত্য স্থাপনও যে বড় বেশী নিষ্ঠুরতা, ব্রহ্মচারি!"

নিরঞ্জন একবার প্রেমচাঁদের মুখপানে চাহিল, তারপর মহারাজের মুখপানে চাহিল। স্থিরকণ্ঠে বলিল "পাত্র বিশেষে এই ব্যবস্থাই,—প্রযুজ্য।"

মদন করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে ভূলুণ্ঠিত শাখাটির পানে চাহিয়া বলিল "আহা, ডালটায় অনেক কচিপাতা ধরেছিল—"

বাধা দিয়া অসহিষ্ণু ভাবে নিরঞ্জন বলিল "তা ধরুক মদন, ও-টুকু ক্ষতিতে পৃথিবীর সামান্যই সৌন্দর্য্যহানি হবে, কিন্তু তার মমতা কর্‌লে,—পৃথিবীর অনেকটা স্বাস্থ্যহানি যে সুনিশ্চিত ঘট্‌বে, তার কোন ভুল নেই, মঙ্গল-মঠের মঙ্গলালয় দেবতার পুষ্পোদ্যানে এমন অপকারী অমঙ্গল-সম্ভাবনাকে প্রশ্রয় দিয়ে রাখ্‌তে নাই, ওর নিষ্ঠুর ধ্বংসই, প্রার্থনীয়।"

নিরঞ্জন লম্ফ দিয়া তীরে উঠিয়া মহারাজের চরণে প্রণত হইয়া পদাঙ্গুলি চুম্বন করিয়া বলিল "মহারাজ আমি আপনাদের কাছে বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এখানে অপেক্ষা কর্‌ছি, আট বৎসর আগে,—নিজের বুদ্ধির ভুলে,—মূঢ়ের মত হঠাৎ বিশ্বের শোভা-সৌন্দর্য্যের পূজা উপাসনায় ভ্রান্তি-প্রমাদ ঘটিয়ে,—পূজক-হৃদয়কে ধিক্কারে ঘৃণিত করে, বুকভাঙ্গা বেদনার আক্ষেপে ক্ষিপ্ত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে, চোখের জলে মঙ্গল-মঠ ত্যাগ করেছিলুম, সেই ভুল সংশোধনের জন্যেই বোধহয় আবার কর্ম্মচক্রে বাধ্য হয়ে ফিরে আস্‌তে হোল, এবার সমস্ত অতৃপ্তি এড়িয়ে তৃপ্তি

পেলুম !—বৃহত্তর শিক্ষা নিয়ে, মহত্তর সাধনার পথে—মুক্তির হাওয়ায় ভেসে পড়্তে চাই, সুনিশ্চত সিদ্ধির আনন্দে, স্বচ্ছন্দ শান্তিতে এবার মঙ্গল-মঠ ত্যাগ করে যাই, বিদায় অনুমতি দিন মহারাজ !—"

সকলে নির্ব্বাকভাবে চাহিয়া রহিল। মহারাজ সবিস্ময়ে বলিলেন "তুমি মঙ্গল-মঠ ত্যাগ করে যাবে ! কোথায় যাবে ? নির্ম্মল-মঠে ? কেন ?"

নিরঞ্জন অকুণ্ঠিত স্থির স্বরে বলিল "মঙ্গল-মঠে, মহা অমঙ্গলের সংঘাতেই, দৃপ্ত বিদ্যুদ্বিকাশের মধ্যে সত্যের মূর্ত্তি দেখেছি, সাধনার প্রাণ-শক্তিকে খুঁজে পেয়েছি,—এবার নিভৃত নিরালায়,—সেই নিজের হাতে গড়া নির্ম্মল-মঠ, যার ভিত্তিমূলের প্রত্যেক পাথরখানি সতর্ক মনোযোগে নিজের হাতে একটির পর একটি করে সাজিয়ে গেঁথেছিলুম, সেইখানে শান্ত বিশ্রামের আসন পেতে সাধনা করতে চাই !—এতদিনের পর আয়োজনের মমতা পীড়ন থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি, এবার শুধু প্রয়োজনের যোগ্যতা লাভে সাধনা চাই !—এবার নিঃসংশয়ে নিজের শক্তিকে,—শুদ্ধাদ্বৈত-মতবাদ প্রচারের জন্য—মঙ্গল-মঠের সেবার জন্য,—আবশ্যকের উপযুক্ত যোগ্যতায় পূর্ণ করে তুলব।"

মদন সবিনয়ে বলিল "মঙ্গল-মঠের সেবার জন্য ?"

শান্ত মুখে নিরঞ্জন বলিল, "হাঁ বন্ধু, মঙ্গল-মঠের মঙ্গলময়ের সেবার জন্যই,—আত্মজয়ে সিদ্ধ হয়ে আত্মদানে সার্থকতা লাভের জন্য প্রাণকে পূজার ফুলে পরিণত করাই, মানবের চিরন্তন সাধনা !—এই পাথরের সঙ্কীর্ণ পরি-বেষ্টনে অবস্থিত মঙ্গল-মঠ-ই, আমার নিকট সেই প্রেমময়ের লীলানিকেতন, শান্তি-প্রেম রচিত মহামহিমাময় মঙ্গল-মঠের পথ বিশ্বব্যাপী কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে নির্দ্দেশ করেছে, এখন সেবায় আত্মোৎসর্গ করাই শুধু সাধনা !—মদন, মানুষের ভুল যত বড়ই বৃহৎ হোক—সে অসীম, কিন্তু সত্য অনন্ত অসীম, তার আঘাতে সকল ভুল একদিন নিঃসংশয়ে ভেঙ্গে পড়্বেই, পড়্বে ! তুচ্ছ ঘটনা-সংঘাতের মধ্যে কত সুমহান সুবৃহৎ পরিবর্ত্তন,—কত অনন্ত অসীম সম্ভাবনা সংগুপ্ত থাকে,—তার সংবাদ-কোলাহল-পীড়িত মানব-চিত্তের ধারণা বহির্ভূত ! আজ নিঃসন্দেহে বুঝেছি ক্ষুদ্র পরমাণুর মধ্যে যে অনন্তের অংশ বিদ্যমান আছে এ তথ্য একবিন্দু মিথ্যা নয় ! পরম অসহায়ের মধ্যেও যে কত বড় সহায়তার ;—কি অসীম শক্তি থাকতে পারে, তা আমি আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখেছি, আমার মূঢ় চেতনা এতদিনে প্রবুদ্ধ হয়েছে ? এতদিন যা বোঝ্বার জন্য অবিশ্রান্ত ধৈর্য্যে কান পেতে,—নিঃশব্দে উপদেশ শুনে আস্ছি, সহস্র চেষ্টাতেও যে উপদেশের মর্ম্ম, বুঝেও বুঝি নি, আজ সেই উপদেশের শান্ত-উদাত্ত সুর আমার নিজের মধ্যে বেজে উঠেছে, আর আমি ভয় করিনে,—তর্ক, দ্বন্দ্ব, সংশয়, সব চলে গেছে,—এবার পূর্ণ নিষ্ঠায় শুধু সাধনা, সঙ্কল্পের মুহূর্ত্তেই, সিদ্ধির পথে বেরিয়েছি,—মহারাজ প্রসন্ন আশীর্ব্বাদে বিদায় দিন,—"

মহারাজ নিরঞ্জনের মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন "সর্ব্বান্তঃকরণে, কিন্তু এবার আদেশ নয় নিরঞ্জন, প্রয়োজনের অনুরোধে,—তুমি চলে গেলে, মঠের কাজে শৃঙ্খলা ব্যবস্থার জন্য নবীন অধিকারী মহারাজের সহায়তা করতে আমি এখন কিছুদিন মঙ্গল-মঠে থাকতে বাধ্য হব, সুতরাং সুরাটের মঠ দুটির—অন্ততঃ নির্ম্মল-মঠের জন্য তুমি অধ্যক্ষতা পদ গ্রহণে স্বীকৃত হও—"

হাসিয়া নিরঞ্জন বলিল "আর আত্মশ্লাঘার অভিমান ভয় নাই মহারাজ, এবার যে-পদে খুশী নিযুক্ত করুন,—আত্ম-প্রতিষ্ঠায় নির্ভয় রেখে এবার সমস্ত 'পদ'ই পদাতিবাহনের যন্ত্র বলে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি।"

প্রীত বদনে নিরঞ্জনের শিরশ্চুম্বন করিয়া মহারাজ বলিলেন "এই ত তোমার যোগ্য কথা নিরঞ্জন, আত্ম-প্রতিষ্ঠায় নির্ভর রেখে আত্ম-বিসর্জ্জন করে যাওয়াই শ্রেষ্ঠ সাধন !—একদিন পরিহাস করে বলেছিলাম, আজ প্রাণের আনন্দে মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি,—নিজের পৌরুষ প্রভাবে, জীবনে নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনত্ব লাভে কৃতার্থম্মন্য হও,—ধন্য হও—সার্থক হও। মঠে এস, তোমার যাত্রার আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত করিয়ে দিচ্ছি, তুমি সন্ধ্যার প্রথম প্রহরেই যাত্রা কর।"

নিরঞ্জন বলিল "আপনি মঠে চলুন মহারাজ, আমি বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কন্যাকে প্রণাম করে আসি,—মদন আমার সঙ্গে যাবে ত চল ;"

"চলুন—" মদন ও নিরঞ্জন অগ্রসর হইল। মহারাজ প্রেমচাঁদ পণ্ডিতকে লইয়া মঙ্গল-মঠে চলিলেন।

নিরঞ্জনের আকস্মিক প্রস্থানের সংবাদটা মদনকে বিস্ময়ের অপেক্ষা বেশী বিষণ্ণ করিয়া তুলিয়াছিল, সমস্ত পথ সে একটি কথা কহিল না। নিরঞ্জনও শান্ত নীরব হইয়া চলিল, উভয়ে আসিয়া বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বাটীতে পৌঁছিল।

বাটীর ভিতর রোয়াকে বসিয়া রুগ্না শান্তিদেবী মালাজপ করিতেছিলেন ; নিকটে বসিয়া বধূ আমিয়া খোকাকে "হাত ঘুরি ঘুরি" খেলার কৌশলে অভ্যস্ত করাইতেছিল, খোকা উচ্ছ্বসিত কৌতুকের হাসি ঠোঁটে চাপিয়া—বিপুল গাম্ভীর্য্য আড়ম্বরে প্রাণপণে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গ্রীবা বাঁকাইয়া বলিয়া প্রসারিত হস্তদ্বয়ের ক্ষুদ্র মুষ্টি দ্রুত ঘূর্ণনে ঘুরাইয়া, পরম ব্যগ্রতার সহিত "হাত ঘুরি ঘুরি" খেলায় অভিনয় নৈপুণ্য দেখাইতেছিল,—"মা" বলিয়া নিরঞ্জন মদনের সহিত বাড়ী ঢুকিতেই, বধূ ঘোমটা টানিয়া ঘরে উঠিয়া গেল। দর্শকের আকস্মিক অন্তর্ধানে, ক্ষুব্ধ বিচলিত অভিনেতা, রসভঙ্গকারী কাণ্ডজ্ঞানহীন আগন্তুকদ্বয়ের পানে বিস্ময় স্তব্ধ নয়নে তাকাইয়া রহিল।

নিরঞ্জনের সুবহুল আকৃতি পরিবর্ত্তনের জন্য শান্তিদেবী সহসা তাহাকে চিনিতে পারিলেন না, নিরঞ্জন হাসিয়া বলিল "ভয়ানক বেড়ে উঠেছি,—চিন্‌তে পার্‌লেন না !—আমি আপনাদের নিরঞ্জন ভাস্কর,—এখন ব্রহ্মচারী ! আপনার কাছে আশীর্ব্বাদ নিতে এলুম মা,—প্রণাম, ভাল আছেন ?"

উদ্গত অশ্রু সম্বরণ করিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে শান্তিদেবী বলিলেন "দীর্ঘায়ু হও, অনেক দিনের পর তোমায় দেখ্‌লুম নিরঞ্জন,—কিন্তু বড় আঘাত পেলুম, এ বেশে তোমায়, কখনও আশা করি নি !

নিরঞ্জন হাসিল, কোন উত্তর দিল না, তাহার চিরব্রহ্মচর্য্যাব্রত মাতৃস্বরূপিণী স্নেহময়ী শান্তিদেবীর হৃদয়ে বেদনার অভিঘাতে বাজিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি ? নিরঞ্জন অন্য কথা তুলিয়া, সে প্রসঙ্গ চাপা দিল, তাঁহার শারীরিক স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন সুধাইল, অন্যান্য সম্বন্ধেও কিছু কিছু কথাবার্ত্তা হইল, শান্তিদেবী বলিলেন "গেলবারে মঙ্গল মঠ থেকে যাবার সময় তুমি আমার সঙ্গে না দেখা করেই চলে গিয়েছিলে সেজন্যে ভারি দুঃখ হয়েছিল, কাল তুমি এসেছ শুনে অবধি আমি ধড়ফড় করছি, শরীর অসুস্থ আর উঠা হাঁটা বেশী করতে পারি না, ভাবছিলাম তুমি ত বুড়ি মাকে ভুলেই গেছ, আজ সন্ধ্যাবেলায় যেমন করেই হোক্ মরে-বেঁচে মঠে গিয়ে তোমায় দেখে আস্‌ব—আমার ভাগ্য ভাল, তুমি নিজেই পথ ভুলে এসে পড়্‌লে !"

হাসি মুখে নিরঞ্জন বলিল "অস্বীকার কর্‌তে পারিনা, কিন্তু এবার যাত্রার পথে আপনাকে প্রণাম করে যাওয়ার কথা ভুলি নি, সেটাও স্বীকার কর্‌ছি !"

বিস্মিত হইয়া শান্তিদেবী বলিলেন "আবার যাত্রা ? কবে ? কোথায় ?—

ম্লানমুখে মদন বলিল "এখনই চল্লেন, সুরাটে নির্ম্মলমঠে,—এখানে থাক্‌বেন না।"

ক্ষুণ্ণ করুণ কণ্ঠে শান্তিদেবী বলিলেন "কেন নিরঞ্জন ?"

স্মিতমুখে নিরঞ্জন বলিল "প্রয়োজনের আদেশ মা।"

খোকা হামা টানিয়া আসিয়া মদনের হাঁটু ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, নিরঞ্জন তাহার পানে চাহিয়া বলিল "এটি কোথা পেলেন ? কেবল ঠাকুর........."

শান্তিদেবীর বলিলেন "না, মায়ার খোকা।"

"মায়াদেবীর পুত্র!"—নিরঞ্জন অভিভূত হইয়া পড়িল! আশ্চর্য্য বিধির-বিধান! এত বড় সান্ত্বনাময় সত্য সংবাদটাও গ্রহবৈগুণ্যে সে এতক্ষণ অনবগত ছিল! উচ্ছ্বসিত হর্ষ বিস্ময়ের জাগ্রত জীবনানন্দে তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল, ঝুঁকিয়া পড়িয়া শিশুর ললাটে চুমা খাইয়া নিরঞ্জন বলিয়া উঠিল "চমৎকার! অতিসুন্দর!"

মদন খোকাকে বুকে তুলিয়া লইয়া বলিল, "এ আমার ধর্ম্মভ্রাতা,—এর নাম মুক্তি—„

"মুক্তি!—" নিরঞ্জনের দৃষ্টিতে আবার নূতন আনন্দ-ঔজ্জ্বল্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! মায়ার বক্ষে মুক্তির বিকাশ! মুক্তি মদনের ধর্ম্মভ্রাতা! আশ্চর্য্য সত্য সান্ত্বনা! স্তব্ধ হইয়া একবার মদনের পানে একবার মুক্তির পানে চাহিল, তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিরঞ্জন শান্তিদেবীকে প্রণাম করিয়া বলিল "তবে বিদায় হই মা—"

ক্ষুণ্ণ শান্তিদেবী বলিলেন "এত শীঘ্র—"

নিরঞ্জন বলিল "দেখা ত হয়েছে মা, আর কেন?—নিরর্থক বিলম্ব নিষ্প্রয়োজন,—"

মদন, মুক্তিকে নামাইয়া দিয়া নিরঞ্জনের সহিত বাহির হইল। পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নিরঞ্জন বলিল, "দাঁড়াও মদন,—পাশের এই সরু পথ ধরে অনেকদিন আগে, একদিন সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলুম বহুদিনের পুরাণ পরিচিত পথ,—এস আজ একবার নূতন চোখে একে দেখে নেওয়া যাক—"

উভয়ে মোড় ফিরিয়া পাশের পথে নামিল। এ সেই বাগানের পথ,—যে পথে একদিন সান্ধ্য জ্যোৎস্নালোকে চলিতে চলিতে—সহসা অজ্ঞাত কণ্ঠের সঙ্গীত সুরাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া—আকুল সংশয়ঘেরা হতাশা-উৎকণ্ঠিত অনভিজ্ঞ হৃদয়ের মূঢ়-বেদনা-করুণ ব্যাকুলতায় 'কোন পাষাণে স্পন্দন চেতনা' অন্বেষণ প্রয়াস অবগত হইয়া, তাহার তরুণ কোমল চিত্ত, মুগ্ধ বিহ্বলতায় আত্মহারা হইয়া,—জীবনের মধ্যে এক প্রকাণ্ড বিভ্রান্তি ঘটাইয়া বসিয়াছিল,—এ সেই,—সেই বিচিত্র জীবন নাট্যের অভিনয়-অন্তর্গত—বিশ্ব রঙ্গমঞ্চের অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ,—এতটুকু নিভৃত অংশ! এইখানে দাঁড়াইয়া একদিন যে নৈরাশ্য-কাতর কিশোর হৃদয়ের আর্ত্তব্যাকুল প্রশ্ন শুনিয়াছিল 'কোন মরু মাঝে অমৃত বিরাজে'—আজ সেই হৃদয়ই—তাহার পাষাণ-অচেতন হৃদয়ের মূঢ়তা,—দৃপ্ত আঘাতে স্তম্ভিত করিয়া, মুক্ত গৌরবে চিরন্তন সত্য উপদেশে চির উপকৃত করিয়া দিয়াছে,—"মৃত্যু মায়াময়ে ঘোরে সংসারে দেহি মেহমৃতম্!"—আজ সেই বেদনালাঞ্ছিত হৃদয়ই, তাহার হৃদয়ের দৈন্য বেদনা দূর করিয়া, তাহার বিস্মৃতি সংশোধন করিয়া আরাধ্যের চরণে, শুদ্ধ বুদ্ধ হইয়া আত্মনিবেদন করিতে,—শক্তি সংগ্রহের জন্য স্বয়ং শক্তি সংযোজন করিয়া—গুরুতর প্রয়োজনীয় প্রার্থনা শিখাইয়া দিয়াছে—"দেহি নাথ বরাভয়ম্!"

চলিতে চলিতে সহসা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নিরঞ্জন বলিল, "মদন পৃথিবীর হিসাব-নিকাশ না খতিয়ে, পৃথিবীর 'ভাল'কে ভালবাসায়, পার্থিক ক্ষতির পরিমাণ যত বৃহৎ-ই হোক,—কিন্তু তাতে লাভ যেটুকু আছে,—সেটুকু অপার্থিব আনন্দ! জীবনে 'ভাল'কে ভাল করেই ভালবেসো; শুধু কুৎসিত ভোগলালসার চরণে আত্মসমর্পণ কোর না,—

তাহলে ভালবাসার সাক্ষাত পাবে না,—সে অভিমানে আত্মহত্যা করবে! মনে রেখো 'পাওয়া' শুধু দৈনিক সম্পর্কের আয়ত্তে নাই—'পাওয়া'কে মহৎ করে, সুন্দর করে, সত্য করে পেতে হয়, শুধু প্রাণে!—

মদন চুপ করিয়া রহিল। উভয়ে উদ্যান পার হইয়া সমুদ্রের তটভূমিতে আসিয়া পৌছিল; সন্ধ্যার স্নিগ্ধ গম্ভীর শান্তি মাধুর্য্য পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসিতেছিল,—সুদূর বিস্তৃত সমুদ্রতটের নীরব নির্জ্জনতার মাঝে, সেই তরঙ্গ আস্ফালনে বীরত্ব গর্ব্বস্ফীত বিশাল বিপুল দিগন্তহারা সমুদ্রের বুকে, সেই অনন্ত অসীম ঔদার্য্যে দিগ্বিদিক-হারা মহত্ত্ব-সুন্দর আকাশের নীচে সেই মৌন-গম্ভীর সন্ধ্যা আবির্ভাব এক সুমহান মাধুর্য্যে অভিব্যক্ত হইতেছে! সেই দৃশ্য অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয়।

উভয়ের কেহই কোন কথা কহিল না। বিষণ্ণ গম্ভীর মদন অন্যমনস্কভাবে যাইতেছিল, নিরঞ্জন অদ্য চলিয়া যাইবে—এ চিন্তাটা তাহার পক্ষে উত্তরোত্তর ক্লেশকর হইয়া দাঁড়াইতেছিল। আর নিরঞ্জন নিজে,—প্রশান্ত-নির্ম্মল-প্রফুল্ল হাস্য-প্রসন্নতায় তাহার মুখ চোখ আনন্দে ঝল্‌মল্ করিতেছিল! মদন মাঝে মাঝে বিস্মিত হইয়া নিরঞ্জনের পানে তাকাইতেছিল, তাহার চিরনির্লিপ্ত গম্ভীর চিন্তাশীল প্রকৃতির মধ্যে এমন মুক্ত সরলতায় তরল উচ্ছ্বাস স্রোত বহিতে সে আর কখনও দেখে নাই।

শান্ত তন্ময়চিত্তে নীরবে চলিতে চলিতে—অনেকক্ষণ পরে নিরঞ্জন আপন মনে মুগ্ধ কোমলকণ্ঠে বলিল "আট বৎসর আগে, এই সমুদ্র এই আকাশের মহান্ মহত্ত্ব-গম্ভীর বিশালতা শুধু শোভার হিসাবে দেখেছি, শুধু সৌন্দর্য্যের হিসাবে দেখেছি—কিন্তু আজ দেখছি, সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যে কতখানি মঙ্গল, কি বিরাট সত্যে আত্মপ্রকাশ করছে!—"

মদন একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "কিছু যদি না মনে করেন, তা হলে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি,—আট বৎসর আগে, বুকভাঙ্গা বেদনার আক্ষেপে, চোখের জলে মঙ্গল-মঠ ত্যাগ করে গিয়েছিলেন কেন, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

শান্ত-কোমল হাস্যে নিরঞ্জন বলিল "তুমি এর মধ্যে একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্য অনুমান করে কৌতূহলী হয়েছে?...... হাঁ, সে রহস্যই বটে! বিচিত্র রসের রসায়নাগার জগতে,—মানুষের মনোবিকার যে কতদূর আশ্চর্য্য রহস্যময়, কি ভয়ঙ্কর কৌতুকস্রষ্টা,—সেটা শিক্ষা দেবার জন্য প্রকৃতি আমার নিকট হতে মনস্তাপ বিগলিত অশ্রু, আর বুকভাঙ্গা বিরাট বেদনা-আক্ষেপ মূল্য গ্রহণ করেছেন! সত্যকে বুকের মধ্যে জাগ্রত রেখে,—বিশ্বাসকে প্রাণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে,—সেই শক্তিকেন্দ্র অবলম্বন করেই আমি নিজের চতুর্দ্দিকে মোহ-সংশয়ের জাল রচনা করে জড়িয়ে পড়েছিলুম; কিন্তু মদন,—আমি ভুলের অঙ্কে দাঁড়িয়ে, কখনো ভুলকে ক্ষুদ্র বলে—নগণ্য বলে, নিজের অক্ষম দৈন্যকে কৃত্রিম আত্মস্তরিতায় আচ্ছন্ন করে,—উপেক্ষা করি নি, ভুলের সামনে দাঁড়িয়ে,—নির্ভীক সাহসে, ভুলকে ভুলের মত করে, যথার্থ বড় করে, স্পষ্ট করেই দেখে নিয়েছি! মরণান্তিক ঔদ্ধত্যে উন্মত্ত হয়ে, নিজের নিগূঢ় অসন্তোষের দ্বারা, প্রাণপণে নিষ্ঠুর ভাবে নিজেকে আঘাত করেছি, এক মুহূর্ত্তের জন্য আপনাকে দয়া করে, ক্ষান্ত হইনি! মদন, চিরযৌবন বেগ-স্ফীত অতলস্পর্শ মহাসমুদ্রের বুকের উপর, প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে ঘূর্ণঝঞ্ঝা সংঘাতের আলোড়ন-উচ্ছ্বাস কখনো দেখেছ?—নিজের বুকের উপর নিশ্চিন্ত আনন্দ বিচরণ করবার জন্য সে আদর করে যাদের নিজের বুকে ঠাঁই দিয়েছিল, প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে ক্ষুব্ধ উন্মাদ হয়ে সে নিষ্ঠুর ভাবে সেই বুকের ধন—পৃথিবীর মূল্যবান্ সম্পদগুলি ধ্বংস করতেও এখন কুণ্ঠিত হয় না, জান,—উন্মত্ত হুঙ্কারে স্ফীত হয়ে নির্দ্দয় রাক্ষসের মত দুরন্ত প্লাবনে পৃথিবীর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার শোভা, সৌন্দর্য্য, আনন্দ, প্রাণ, গ্রাস করে ফেলতে চায়, এমনি ভয়ঙ্করী তার প্রচণ্ড

উত্তেজনা !—কিন্তু চেয়ে দেখ মদন, যে সংযমের সুদৃঢ় তট-বন্ধনের উপর দাঁড়িয়ে আজ শান্ত তরঙ্গ লীলায়, গভীর বীরত্ব-সম্ভ্রম-সংযত দিগন্ত-বিস্তৃত বিশাল সমুদ্রশোভা দেখছি,—সে শোভা কত চমৎকার, নির্ভয় নিশ্চিন্ত আনন্দ পূর্ণ! আর চেয়ে দেখ, মাথার উপর ঐ মহত্ব-সম্ভ্রমে মুক্ত মহীয়ান্, শান্ত-প্রসন্ন নির্বিকার নির্ম্মল আকাশ! ওই আকাশ,—পৃথিবীর সকল স্পর্শের উর্দ্ধে থেকে, অসঙ্কোচ মুক্তির মাঝে আপনাকে অসীম বিস্তৃত করে, জল স্থল সকলের ওপর—অজস্র করুণায় পরম সহানুভূতির স্নেহময় বুক পেতে আনন্দ-তন্ময়! সমুদ্রের দিগ্বিদিকহারা বীরত্বপরাক্রম যতই বিপুল—যতই বিশাল হোক, পার্থিব পুরুষাকার শক্তিতেজে আপনার মধ্যে মত্ত উচ্ছ্বাসে যতই অক্লান্ত আবেগে সে চিরদিন যুদ্ধ করুক,—কিন্তু তারও সীমা আছে!—আর ঐ আকাশও পার্থিব শক্তি গৌরবের প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব অভিঘাত জয় করে,—উর্দ্ধে, সকলের উর্দ্ধে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহতারা ওর বুকের ওপর স্বচ্ছন্দে বিরাজ করে, পৃথিবীর আলো অন্ধকারের কর্তৃত্ব করে, প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের মেঘ বজ্র ওর পায়ের নীচে খেলা করে!—কিন্তু আকাশ তৃপ্ত-মহিমায় স্থির নিশ্চল।

মদন খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "মহারাজ,—অনুগ্রহ করে একটি সংশয়-বিরোধ খণ্ডন করুন, সমাজের স্থিতি উন্নতির জন্য, বংশরক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য, একথা আপনি শুদ্ধাদ্বৈতমতবাদ-ভাষ্যে সুন্দর যুক্তি-তর্কের সাহায্যে প্রকটন করেছেন,—কিন্তু আপনার জীবনের সঙ্গে সে মতের সামঞ্জস্য রইল না কেন?"

ঈষৎ হাসিয়া নিরঞ্জন বলিল "তার কারণ তুমি!"

"আমি!—" এত বড় সাজ্ঘাতিক মিথ্যা পরিহাস মদন জীবনে আর কখনো শুনে নাই! বিস্ময়ে চমকিয়া বলিল, "আমি!—আমি কেমন করে?"

সস্নেহে মদনকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া নিরঞ্জন বলিল "তিন বৎসর পূর্ব্বের কথা স্মরণ কর ভাই, নির্ম্মল-মঠে, তোমারই মুখে—সম্প্রদানের কল্যাণের জন্য একজন সর্ব্বত্যাগী,—আত্মোৎসর্গী কর্ম্মী সাধকের প্রয়োজন প্রথম শুনি। আমার হৃদয়ের অবস্থা তখন শান্তিহীন সংশয়াচ্ছন্ন, তোমার কথায়—মনে দুর্দ্দম্য আকাঙ্ক্ষা উদ্বোধিত হ'ল, ক্ষুদ্র আকর্ষণ জয় করবার জন্য মহত্তর প্রলোভনকে বরণ করে নিলুম, হৃদয়াবেগ সংযত করে, মস্তিষ্ক সচেতন করে, মনকে একান্ত সাধনায় শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলুম, কিন্তু প্রাণের শেষ সংশয় তবুও গেল না, আজ হঠাৎ এক মস্ত সংঘাতের প্রচণ্ড-তরঙ্গ সজোরে আছাড়খেয়ে বুকের ওপর পড়ে, প্রাণের সংশয় ছিঁড়ে নিয়ে গেল, আমি মুক্তি পেলুম! বিরাট সত্যের মাঝে নিজেকে পূর্ণ চেতনায় ফিরে পেলুম, আজ কৃতজ্ঞ আনন্দে তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি মদন, তোমার জয় হোক,......সমাজে, সন্তানের পিতা হবার সাধ আর নাই, কিন্তু সে ক্ষতি আমি লাভের অঙ্কে জমা করে নেব, তোমাদের ভাবী সন্তানকে জীবনের অভিজ্ঞতায় শিক্ষা দেবার শক্তি সংগ্রহ করেছি, সেটা ভুলব না।"

নমস্কার করিয়া মদন বলিল, "পিতা হওয়া সহজ, কিন্তু শিক্ষক হওয়া সহজ নয়। ভাবী পিতাও আজ আপনার কাছে—জীবনের জন্য শিক্ষাগ্রহণে শ্লাঘার সহিত প্রস্তুত।"

হাসিয়া নিরঞ্জন বলিল, "কিন্তু এই মুহূর্ত্তে তোমাকে দেওয়ার মত কোন দান ত প্রস্তুত করে রাখিনি ভাই,—তবে অসীম আকাশের নীচে, বিশাল সমুদ্রের শিয়রে দাঁড়িয়ে জীবনের জন্য একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাই,—যৌবনের ফেনিল উচ্ছ্বাস মত্ত হৃদয়-সমুদ্রে, প্রকৃতির অপ্রতিহত প্রভাবে, কত ভুলভ্রান্তির কুয়াশা—কত কামনার কলতান,—কত উদ্দাম আবেগের উন্মত্ত তুফান উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে, তার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু, সাবধান বন্ধু,—সম্মুখের এই সুদৃঢ় তটবন্ধনের মত কঠিন সংযম শৃঙ্খলে, তার উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদনা,—বিশাল গভীর বীরত্ব সম্ভ্রমে

সুরক্ষিত রাখতে ভুলোনা, মনে রেখো এ সমুদ্রের সুমহান্ বীরত্ব-মর্য্যাদা তখনই নিষ্ঠুর হিংস্র রাক্ষসীর মত্ততায় পরিণত হবে যখনই সে সংযমের বন্ধন লঙ্ঘন করে, ক্ষুধিত লালসায় হুঙ্কার করে মাটীর বুকে লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করবে,—সেই মুহূর্ত্তে বিশ্বের সৌন্দর্য্য মঙ্গল গ্রাস করে, এ সমুদ্র আত্মগৌরব হারাবে!—এই সমুদ্রের মাথার উপর ঐ প্রশান্ত, প্রাণাবন্ত পরমপুরুষকারের জাগ্রত মূর্ত্তি,—ওই অনন্ত আকাশ স্থির হয়ে অপেক্ষা করছে, ওরই পানে লক্ষ্য রেখে,—একটানা স্রোতে ঐ দিগন্তের কোলে মহামিলনের পথে একে বয়ে যেতে দিও। আর সকল কোলাহল—সকল সংশয়ের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, আত্মানুশীলন করো, দেখ্‌বে সকল অমঙ্গলের মূলেই মহামঙ্গল বিদ্যমান! রাশিকৃত ব্যর্থতা স্তূপের উপরই সার্থকতার স্বর্ণসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত! ঐ শোন দেবালয়ে আরতির শঙ্খঘণ্টা বেজে উঠেছে! এস আমরা প্রণাম করিগে।"

মদনের হাত ধরিয়া নিরঞ্জন সমুদ্রতীর ত্যাগ করিল। সমস্ত পথ দুজনের কেহই কোন কথা কহিল না। তাহারা যখন মঙ্গলমঠের বহির্দ্বারে আসিয়া পৌছিল—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মন্দিরে আরতি শেষ হইল, বাদ্যধ্বনি থামিয়া গেল, ভিতর হইতে ভক্ত ও দর্শকবৃন্দের আবেগমুক্ত হৃদয়ের উচ্চ জয় জয় ধ্বনির সহিত প্রণাম মন্ত্র উচ্চারিত হইল,— "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

নিরঞ্জন দ্বারপ্রান্তে নতজানু হইয়া বসিয়া প্রীতি পুলকোজ্জ্বল বদনে শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলিল "আজ এইখান থেকে, মঙ্গলময়ের নামে আমি মঙ্গল-মঠকে প্রণাম করি! এই মঙ্গল-মঠই আমায়—অমঙ্গলের সংঘাতে চিত্ত-বিকার জাগিয়ে, চিত্তশুদ্ধির পথে,—মঙ্গলের মধ্যে মুক্তিলাভের সন্ধান দিয়েছে, এইখানেই আমি মহান অসন্তোষ অতৃপ্তির মধ্যে ত্যাগের তৃপ্তিতে আত্মজয়ে সিদ্ধ হয়েছি! এই মঙ্গল-মঠই আমায় প্রেমের ধ্যান-সাধনায় দীক্ষা দিয়েছে, জ্ঞানের যোগ-সাধনায় শিক্ষা দিয়েছে! আমার,—সৌন্দর্য্য, মঙ্গল, ও সত্যের প্রকৃত চেতনা উদ্বোধন করেছে, এই মঙ্গলময় দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত মঙ্গলালয়—মঙ্গল-মঠ, আমার জীবনের—প্রত্যক্ষ—

"মঙ্গল-মঠ।"

সহস্র ভক্ত, দর্শক, সেবকের চরণধূলির উপর মাথা লুটাইয়া,—গভীর আগ্রহে প্রাণ ঢালিয়া সমস্ত হৃদয়ের সহিত প্রণাম করিয়া, নিরঞ্জন ব্রহ্মচারী মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল, অপার্থিব তৃপ্ত জ্যোতিঃ ঔজ্জ্বল্যে তাহার প্রশান্ত সুন্দর বদন মণ্ডলে স্বর্গ-শ্রী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! হৃদয়াভ্যন্তর উচ্ছ্বসিত ভক্তি আবেগ, তরলস্রোতে নয়নপথে অবতীর্ণ হইল,—সে অপূর্ব্ব শোভা!

ভিতর হইতে একজন ভৃত্য আসিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল "মহারাজ, আপনার যাত্রার আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত হয়ে গেছে,—"

নিরঞ্জন অগ্রসর হইয়া বলিল "আমিও সম্পূর্ণ প্রস্তুত।"

মঠের ভিতর প্রেমানন্দ পণ্ডিত তখন সংস্কৃত ছন্দে ভজন গাহিতে আরম্ভ করিয়াছেন:—

"নমঃ পরেশায় পরস্বরূপিণে, পরাৎ পরস্তাৎ পরমাৎ পরায়।
অপর পরায় পারাত্মলন্ত্রে, নমঃ পরেভ্যঃ পর পাবনায়॥
যোনামজাত্যাদিবিকল্পহীনঃ শব্দাদিদোষ ব্যতিরেকরূপঃ
বহুস্বরূপোঽপি নিরঞ্জনশ্চ তমীশমাদ্যং পরমং ভজামি॥......"

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

সমাপ্ত।

কাশী।

অয়ি কাশী বারাণসী ভূতলের ইন্দু,
মহাকাল ত্রিশূলেতে সিঁদুরের বিন্দু।
যুগে যুগে জমি' যেন পুণ্যের সজ্ঘ
নিরমিল সুবিমল কমনীয় অঙ্গ।
তীর্থের পারিজাত, মোক্ষের সত্র,
বিশ্বের জননীর স্নেহ আতপত্র।
ধর্ম্মের ধাম তুমি, দুর্গার দুর্গ,
ভারতের হৃদি প্রাণ, কণ্ঠের স্বর গো।
অগৃহীর গৃহ তুমি, অকামীর কাম্য,
উদাসীর বন্ধন, বিরোধীর সাম্য।
স্বরগের মরতের তুমি শুভ সন্ধি,
তব বায়ু ভকতির পরিমলগন্ধি।
পরশনে শিব কর পুণ্যের সদ্ম
তুমি যেন শ্যামা মার রাঙা পাদপদ্ম।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

স্বাস্থ্যরক্ষা।

—:-*-:—

পথ্যগ্রহণ ও অপথ্যবর্জ্জন স্বাস্থ্যরক্ষার মূলমন্ত্র। পথ্যগ্রহণ ত প্রয়োজনীয় বটেই। অপথ্যবর্জ্জন তদপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। আদৌ অন্নাহার না করিয়াও কয়েকদিন জীবনধারণ সম্ভব, কিন্তু অহিফেন প্রভৃতি বিষ যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করিলে আশু মৃত্যু অনিবার্য্য। কিন্তু অপথ্য নির্দ্ধারণ করিব কিরূপে? আমরা সকলেই কিছু দেহতত্ত্বে ব্যুৎপন্ন নহি। চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়াও বৃথা, কারণ চিকিৎসকদিগের মধ্যে মতভেদ চির-প্রসিদ্ধ। চিকিৎসাশাস্ত্রও অভ্রান্ত নয়। তবে উপায়? উপায় পাঁজি। কোন্ তিথিতে কোন্ দ্রব্য অপথ্য পাঁজির পাতা হইতে তাহা নিরূপণ করিয়া সকলে আত্মরক্ষায় যত্নপর হউন শাস্ত্রকারগণের এইরূপই অভিপ্রায়।

দুঃখের বিষয় শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনেকে বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। আমার স্মরণ আছে গ্রামের হিতকরী সভায় বক্তৃতায় আমার এক মাননীয় বন্ধু বলেন "দেশটা অধঃপাতে যাইতেছে কেবল উদ্যোগের অভাবে।

একটা দৃষ্টান্ত দিই ;—সকলেই জানেন দুর্ব্বল রোগীর পোষণার্থ চিকিৎসকগণ নানাবিধ বিলাতী খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এই সকল খাদ্য নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশের জলবায়ুতে পুষ্ট উপাদানে প্রস্তুত, প্যাকিং বাক্‌স ও জাহাজের খোলের গুমটে বিকৃত, এবং বহুদিন ডাক্তারখানার আলমারীতে ধূলিসঞ্চয় করিয়া দুষ্ট। অথচ এইগুলা আমরা নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করি। একবার ভাবিয়া দেখি না আমরা কত সহজে ও সস্তায় এইরূপ পুষ্টিকর ও ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারি। আমরা জানি নবমীর অলাবু গোমাংসস্বরূপ। আমাদের মধ্যে যদি কোন উদ্যোগী পুরুষ ভরা নবমীতে কয়েকটা অলাবু সংগ্রহ করিয়া কাথ প্রস্তুত করেন এবং তাহা সুদৃশ্য শিশিতে পুরিয়া লেভেল আঁটিয়া দেন তবে তাহা Panopeptonএর পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিতে কেহই আপত্তি করিবেন না। পচন নিবারণের জন্য প্রতি শিশিতে কয়েক ফোঁটা স্পিরিট দিলেই চলিবে। কিন্তু—" ইত্যাদি।

দেখা যাইতেছে বক্তার মতে নবমীর অলাবু অবস্থা বিশেষে পথ্য। কিন্তু এ মত যে ভ্রান্ত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। "নবমীর অলাবু গোমাংস স্বরূপ" ইহার অর্থ বুঝিতে হইবে ঐ তিথির অলাবু গোমাংসের ন্যায় অস্পৃশ্য— চিরকালই অস্পৃশ্য। আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণ কেবলমাত্র বিধি-নিষেধ প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন। কোন প্রকার যুক্তি প্রয়োগ করা সঙ্গত মনে করিতেন না। যুক্তি সকলে বুঝিতে পারে না, শুনিতেও চায় না। অথচ একটা কারণ না দেখাইলে জনসাধারণকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করা যায় না। এই নিমিত্ত তাঁহারা মিথ্যা যুক্তির অবতারণা করিতেন। এ স্থলেও তাই। "নবমীতে অলাবু আহার করিবে না" ইহাই তাঁহাদের বক্তব্য। ঐ তিথিতে অলাবু গোমাংসে পরিণত হয় এ যুক্তি অজ্ঞলোকের মন ভুলাইবার জন্য। প্রকৃত যুক্তি কি তাহা অব্যক্তই রহিয়াছে।

অথচ যুক্তি একটা আছেই। নবমীর অলাবু উদরস্থ হইলে একটা ঘোর সর্ব্বনাশের কারণ হয় এই ভয়ে আজ অযুতশতাব্দী ধরিয়া আমরা কেহ তাহা স্পর্শ করিতেও সাহস পাই নাই। আমাদের এ আতঙ্ক কি নিতান্ত অমূলক? কখনই না। তবে অনুসন্ধান করিতে হইবে নবমীতে অলাবু খাই না কেন? কেহ কেহ বলেন আমরা খাই না আমাদের ঘরে খাওয়ার রীতি নাই বলিয়া, বা আমরা যাঁহাদের কথা মানিব বলিয়া স্থির করিয়াছি তাঁহারা ইহাকে শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়াছেন বলিয়া এ অভিযোগ মিথ্যা। "কারণাৎ কার্য্যমন্বিচ্ছেৎ ন লোক চরিতং চরেৎ।" ইহা যাঁহাদের শাস্ত্র সেই হিন্দুগণ লোকাচারের আজ অনুবৃত্তি করেন একথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা নিন্দুক। তবে খাইনা কেন? উত্তর:—খাইলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় বলিয়া। কিরূপে তাহা বিশদ করিয়া বলা আবশ্যক। পৃথিবীর উপর গ্রহাদির ক্রিয়া কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। সূর্য্যের উত্তাপে নদীর জল মেঘে পরিণত হয়, চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রে জোয়ারভাঁটার সৃষ্টি হয় ইহা কাহারও অবিদিত নহে। যদি এগুলাই সম্ভব হয় তবে নবমীতে অলাবুর আভ্যন্তরীণ অণুপরমাণুগুলির মধ্যে রাসায়নিক যোগাবিয়োগের একটু বিশেষত্ব এবং ফলে, তাহার গুণান্তর প্রাপ্ত হওয়াও কিছু বিচিত্র নহে। কেহ হয় ত বলিবেন "মনে করা যাক্ ১০টা ২৯মিঃ ১৭ সেকেণ্ডে নবমী পড়িবে। ১০টা ২৯ মিঃ ১৬ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত অলাবু সুখাদ্য। আর এক সেকেণ্ড পরে খাইলেই সর্ব্বনাশ! এক সেকেণ্ডের মধ্যে এত সাংঘাতিক রকমের physical and physiological পরিবর্ত্তন কিরূপে সম্ভব হয়।" অসম্ভব হইবার ত কোন কারণ দেখি না। গণিতজ্ঞ মাত্রই জানেন কোন ত্রিভুজের দুইটী কোণের সমষ্টিকে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিয়া ১৭৯.৫৯ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে। আর এক সেকেণ্ড বাড়াইলেই তাহার ত্রিভুজত্ব নষ্ট হয়। তখন ঐ দুই কোণের সম্মুখীন বাহুদ্বয় অনন্ত দেশকালেও আর মিলিত

হয় না। এক সেকেণ্ড উত্তাপের ন্যূনাধিক্যে বরফ ও জল এই দুই ভিন্ন গুণাকৃতি পদার্থের উদ্ভব হয়। অতএব দেখা যাইতেছে জগৎসংসারে এক সেকেণ্ড নিতান্ত তুচ্ছ নহে।

আমি জানি কয়েকজন উদ্ধত যুবক নবমীতে অলাবু ভক্ষণ করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন এবং কোন কুফল পান নাই বলিয়াও ঘোষণা করিয়াছেন। ইঁহাদের অসমসাহসিকতায় স্তম্ভিত হইলাম। তত্ত্বজিজ্ঞাসা শ্লাঘনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহারও একটা সীমা আছে। সর্পাঘাতে প্রাণহানি হয় এই বাক্যের যাথার্থ্য নিরূপণার্থ কি গোখুরার দংশন ঘাড় পাতিয়া লইতে হইবে? আরও কুফল পান নাই কিরূপে স্থির হইল? হয়ত পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাকে কারণান্তর সঞ্জাত মনে করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। আর যদি সত্যই না পাইয়া থাকেন তাহাতেই বা কি? ক্ষেপা কুকুর কর্ত্তৃক দষ্ট হইবা মাত্রই কেহ জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয় না। ইহাতে কি প্রমাণ হয় যে ক্ষেপা কুকুর নির্ব্বিষ? নবমীর অলাবুর বিষক্রিয়াও আপাতগোচর না হইতে পারে। হয়ত এক বৎসর দুই বৎসর দশ বৎসর বা শতবর্ষ পরে তাহা প্রকাশ পাইবে। কিন্তু প্রকাশ পাইবেই। উদ্ধতযুবক বলেন "অলাবুর বিষক্রিয়া কখনও লক্ষ্য করি নাই। আর কেহ লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়াও শুনি নাই। তবে উহা যে বিষ হইতেই পারে না এমন কথা জোর করিয়া বলি না। হইলেও উক্ত বিষ যে অতি মৃদু তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহাকে বিষ বলিয়া জানি এমন কত পদার্থ আমরা পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা প্রতিনিয়ত গ্রহণ করিতেছি। অলাবুর অতীন্দ্রিয় অনিশ্চিত বিষও না হয় সেইরূপ গ্রহণ করিলাম, না হয় ইহার ফলে আমাদের মাথায় টাক পড়িবে, দু এক সেকেণ্ড পূর্ব্বে। কিন্তু এ ক্ষতি স্বীকার করিতে আমরা প্রস্তুত আছি। বিষমাত্রকে সামলাইয়া প্রাণ রাখিতেই যে প্রাণান্ত হয়। শুনিয়াছি মেঘ নির্ম্মুক্ত একটী বারিবিন্দুর আকর্ষণেও পৃথিবী কক্ষচ্যুত হয়। কিন্তু এই কক্ষচ্যুতির অমেয়ত্ব নিবন্ধন আমরা তাহাকে হিসাবের মধ্যে ধরি না। এই চিরকণ্টকময় সংসারপথযাত্রী মানবের বিবিধ বিপত্তিসংঘাতসঙ্কুল কর্ম্মজীবনে নিষিদ্ধালাবু সেবনজনিত দুর্ব্বিপাকও সেইরূপ অগ্রাহ্য, "সৌক্ষ্ম্যাত্তদনুপলব্ধেঃ"।"

উক্ত যুক্তি যে অতি অপরিণত বুদ্ধির পরিচায়ক ইহা বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। যাহা বিষ তাহা অতি মৃদু হইলেও পরিহর্ত্তব্য। যখন দেখিতেছি দাড়িতে অদৃষ্টপূর্ব্ব একগাছি পক্ককেশও বরের বাজারদর নিমেষে নামাইয়া দিতে পারে, তখন শরীরের হানিকর অতি সামান্য বস্তুকেও উপেক্ষা করিতে পারি না।

অনেকে প্রশ্ন করেন "একদিন নবমী বিচার না করিয়া অলাবু আস্বাদ করিলে সুদূর ভবিষ্যতে দেহের কিছু না কিছু ক্ষতি হইতেও পারে এই ভয়ে কি আমরা নবমীর অলাবু বর্জ্জন করিয়াছি? শরীরের প্রতি আমাদের যত্ন কি এতই অধিক?" নিশ্চয়। আমরা হিন্দুজাতি—ধর্ম্মপ্রাণ, ধর্ম্মের বাড়া আমরা আর কিছুই চাই না। সেই ধর্ম্মের গোড়ার কথা শরীর—"শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং।" তাই পদে পদে স্বাস্থ্যের নিয়ম মানিয়া চলিতেছি। উত্তর মুখে আহার না করিয়া দেশের শিশু মৃত্যুর উচ্ছেদ করিতেছি। জন্মমুহূর্ত্ত হইতে তৈল, রৌদ্র, আগুন, ও ধোঁয়ায় শীততাপসহিষ্ণু হইয়া, পাঁজি ও পদীপিসীর নিদেশ নির্ব্বিচারে পালন করিয়া, পৃথিবীর চুম্বক শক্তির দ্বারা অভিভূত হইবার ভয়ে, ভ্রমেও উত্তর শিয়রে শয়ন না করিয়া,—বিষমলাগা নিবারণার্থ উপনয়ের পর এক বৎসর কাল আহারকালে সুস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ না করিয়া, আপনাদিগকে সবল, সক্ষম ও দীর্ঘায়ু করিতেছি। বস্তুতঃ বিবিধ উপায়ে স্বাস্থ্য অটুট রাখিবার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর।

এক্ষণে স্থির হইল, আমরা বন্ধু গৃহে অনায়াসলব্ধ লুচিপলান্নাদি পেট পূরিয়া খাইয়া বিপন্ন হই **না**, ভাদ্রের রৌদ্রে একটা ছিপ হাতে করিয়া সমস্তদিন খালের ধারে কাটাই **না**, কংকগুলা তামাকের গুঁড়ায় দুই নাসাবিবর নীরন্ধ্র

রূপে আঁটিয়া রাখি না, থিয়েটার দেখিতে গিয়া নিয়মিত শয়ন ও ভোজন করিয়া থাকি, এবং আমাদের দেশের পথে ঘাটে, অলিতে গলিতে, অসংখ্য শুঁড়ির দোকানে বড় বড় বোতল ভরিয়া খাঁটি সরিষার তৈল বিক্রয় হয়।

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়।

ধর্ম্মজ্ঞান।

সম্রাট আক্‌বর
মাতৃআজ্ঞা কোরাণের চেয়ে
ভাবিত উচ্চতর।
বিরাট রাজ্য ইঙ্গিতে যার
হইত শাসিত; চিত্ত প্রজার
জিনিয়াছিল যে বিনা তরবার
এমনি ভাগ্যবান্
কূট রাজনীতি নখদর্পণে
আছিল বিদ্যমান্।

শতনৃপতির পতি—
পদে যার নত উষ্ণীষ শত
মার কাছে শিশু অতি।
প্রণমিয়া মা'য় নিত্য প্রভাতে
বাহিরিত পথে অথবা সভাতে
ছিলনা তর্ক মায়েরে কথাতে;
জননীর অভিলাষ
পুরাতে বাদ্‌শা করিতে পারিত
আপন সর্ব্বনাশ।

মোস্‌লেম্‌ দ্বেষী দেশে
কোরাণে করেছে ঘোর অপমান
অন্ধ হইয়া দ্বেষে !
রাসভের পিঠে চড়ায়ে গ্রন্থ
ফিরায়েছে সব নগর পন্থ
মত্ত জনতা আমোদে অন্ধ
টিট্‌কারি ইস্‌লামে—
সংবাদ এল,— ক্ষুব্ধ বাদ্‌শা
প্রাসাদে দিল্লী ধামে।

কোরাণের গঞ্জনা
সহিবেনা বলি পড়িল নগরে
অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা।
মাগে রাজাদেশ করিবে যুদ্ধ
অরি লোহে হবে কোরাণ শুদ্ধ
বাদ্‌শা জননী ভীষণ ক্রুদ্ধ
পুত্রে কহিলা তাই—
"তাদের ধর্ম্ম লাঞ্ছি এমনি
প্রতিশোধ নেওয়া চাই।"

সম্রাট ধীরে কহে
"ক্ষম' মা' আমারে এমন আদেশ
তোমার যোগ্য নহে।
আমারে হিংসি আমার ধর্ম্ম
অবমানি যদি লভে সে শর্ম্ম
কৃপার পাত্র !—মানব মর্ম্ম
ভক্তিতে পদাঘাত—
আমি তা' নারিব ! তাদের ধর্ম্মে
এস করি প্রণিপাত।"

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

লক্ষ্য-হারা।

—:*:—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৩)

একদিন সোমবার সকাল বেলায় সবেমাত্র তাহাদের প্রাতর্ভোজন শেষ হইয়াছে এমন সময় তাহাদের দোরের সম্মুখে একজন পুলিসকর্ম্মচারীর আবির্ভাব হইল। গ্রিসকা ওরলফ্ ভীত হইয়া তাহার বসিবার আসন হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া—পত্নীর বিষণ্ণ হতবুদ্ধি দৃষ্টির পানে একবার চকিতে চাহিল। গত কয় দিনের মধ্যে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা স্মরণ করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল। ব্যাকুল তিরস্কার ভরা দৃষ্টিতে ম্যাট্রোসা স্বামীর পানে চাহিতেছিল; একটা কিছু ঘটিবে এই আশঙ্কায় সেই ভীষণ নীরবতার মধ্যে ওরলফ্ তাহার অভাবনীয় আগন্তুকদের পানে দৃষ্টি ফিরাইল। পুলিসকর্ম্মচারীর পেছনে যে আসিতেছিল সে সহসা বলিয়া উঠিল! "ওঃ কি ভীষণ অন্ধকার!.........পুটিনকফের বাড়ীটা যে দেখ্‌ছি একটা নরক বিশেষ!" পুলিসকর্ম্মচারী একদিকে পাশ কাটিয়া দাঁড়াইতেই একজন মেডিকেল কলেজের ছাত্র তাড়াতাড়ি আসিয়া টুপিটা হাতে লইয়া ওরলফের কক্ষে ঢুকিয়া পড়িল। তার চুলগুলি বেশ ছোট করিয়া ছাঁটা, কপাল উঁচু, সুন্দর চোখ দুটি চসমার ভিতর হইতে হাসিতেছিল। সে বলিল—"নমস্কার,—আমি তোমাদের কাছে পরিচিত হতে এসেছি, আমি স্বাস্থ্য কমিশনের একজন সভ্য,—তোমরা কেমন অবস্থায় বাস কচ্ছ এখানে,—এই সব জানাতে হবে আমায়.........ওঃ কি বিশ্রী বাতাস এখানকার।"

এতক্ষণে ওরলফের ধরে প্রাণ আসিল, তাহার মুখে স্বস্তির আভা দেখা গেল। প্রথম হইতেই ছাত্রটির বন্ধু ব্যবহার ও খোলামন তাহাকে আকৃষ্ট করিল। এই যুবকের উজ্জ্বল ও উচ্ছ্বসিত হাসি ওরলফের কোঠায় একটা আলো ও আনন্দের জ্যোতিঃ আনিয়া দিল। ছাত্রটি একটু থামিয়া বলিল—"বুঝ্‌লে ভাই ঘরটা বেশ পরিস্কার ফিট্‌ফাট্ রাখ এই আমার ইচ্ছা,—ঘরের কোণে ক্লোরাইড অব্ লাইম কিছু রেখে দেবে। ওতে বাতাসের দোষ অনেকটা কেটে যাবে, আর এ ঠাণ্ডার পক্ষেও ভাল।—কি গো তোমার চেহারা অমন দেখাচ্ছে কেন?"

সে ঘুরে হঠাৎ ওরলফের হাত ধরিয়া তার নাড়ী পরীক্ষা করিল, ওরলফ্ দম্পতি এই মেডিকেল ছাত্রের এতটা আত্মীয়তার ভাব দেখিয়া একেবারে গলিয়া গিয়াছিল। ম্যাট্রোসা প্রসন্ন বদনে তাহাকে দেখিতেছিল, ওরলফেরও যেন এই যুবকের সুন্দর মুখখানা দেখিয়া অবসাদভার অনেকটা কাটিয়া গেল। মেডিকেল ছাত্র বলিল—"তোমার পেট কেমন আছে বল তো? খুলে বল, লজ্জা বা গোপন কর্‌বার কিছু নেই এতে...... ..এ সব জীবন-মরণের কথা বুঝ্‌লে, যদি কোন সামান্য অসুখও হয়ে থাকে সেও বল—আমরা তোমায় বিনা পয়সায় ঔষধ দেব,—দেখ্‌বে দু'দিনেই সব ঠিক্ হয়ে যাবে।"

ওরলফ্ হাসিয়া বলিল—"কি বল্‌বো, শরীর তো ভালই আছে, আর আমায় যদি একটু খারাপও দেখায় এতে ভাব্‌বার কিছু নেই, আমি কাল রাত্রে একটু বেশী খেয়েছিলাম।" "সে আমি গন্ধ পেয়েই বুঝেছি......তা যা হোক, সে সামান্য কিছু বেশী হবে? এই আধ গ্লাসটা নয়?"

ওরলফ্ তাহার বলিবার ব্যঙ্গ ভাব দেখিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিল না, সে খিট্ খিট্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। ম্যাট্রোসাও রুমালে মুখ ঢাকিয়া হাসিতে লাগিল, মেডিকেল ছাত্রটিও তাহাদের সঙ্গে একটু হাসিয়া পরে গম্ভীর মূর্ত্তি

ধারণ করিল ; কিন্তু এই মুখভাব পরিবর্ত্তনে তাহাকে আরো সরল মন খোলা দেখাইতে লাগিল। সে বলিল—"যে কাজের লোক, তার সময় সময় এক আধ গ্লাস খেতে দোষ নেই—কিন্তু মাত্রা ঠিক রাখা চাই—মাতাল হওয়া ভারি দোষ—বড় লজ্জার! আর যে রকম সময় পড়েছে এখন বরঞ্চ একেবারে না খাওয়াই ভাল, সহরে যে রকম মড়ক লেগেছে সে শুনেছ বোধ হয়!" সে মুখখানা বেশ গম্ভীর করিয়া ওরলফের কলেরার কথা ও কিভাবে মড়কের গতিরোধ করা যায় সেই কথা যত সহজে হয় বুঝাইতে লাগিল। কথা বলিতে বলিতে সে ঘরের দেয়াল তা'ক হইতে সমস্ত জিনিস হাতাইয়া শুঁকিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। তার সরল ব্যবহারে কোন কুমতলবের কথা মনে জাগিতেছিল না বরং সে যেকাজের জন্য স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া একাগ্রভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে তাহার প্রভাবে তাহার চোখে একটা উৎসাহের জ্যোতিঃ ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। ওরলফ্ তাহার কথাবার্ত্তা অদ্ভুত উৎসাহের সহিত মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিতেছিল, ম্যাট্রোসা সব না বুঝিলেও শুনিতেছিল। পুলিস কর্ম্মচারী পূর্ব্বেই সরিয়া গিয়াছিল।

"আমি যা বলেছি, ক্লোরাইড অব লাইম অবশ্য ব্যবহার করবে—আর এই পান ব্যাপারটা বুঝলে ভাই কিছুদিনের জন্য একেবারে ছেড়ে দাও, আচ্ছা তবে আমি আসি—আবার এসে একদিন দেখে যাব………।"

সে যেমন তাড়াতাড়ি আসিয়াছিল দেখিতে দেখিতে তেমনি নামিয়া গেল, তাহার শুভাগমনের আনন্দ স্মৃতি দম্পতির মুখে বিরাজ করিতে লাগিল। এই আগন্তুকের হঠাৎ আগমন তাহাদের একঘেঁয়ে বৈচিত্র্যহীন জীবনে কত উৎসাহ কত আনন্দ সঞ্চারিত করিয়াছে তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া কিছুক্ষণ তাহারা দু'জনের মুখের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ওরলফ্ অবশেষে মাথা নাড়িয়া কহিল "দেখ্ দেখি কি বিচিত্র যাদুকরের মত ক্ষমতা লোকটার! …… আর ওরা বলে কিনা এরাই সকলকে মেরে ফেল্লে—এমন মুখখানা যার—সে কি কখনো লোক্‌কে মার্‌বার মত কাজ কর্‌তে পারে? এমন সুন্দর উজ্জ্বল আনন্দভরা কণ্ঠ, এমনি মধুর ব্যবহার!—না-না ওসব বাজে কথা………সে সোজা বন্ধুর মত ভেতরে ঢুকে বল্লে "আমি এসেছি ভাই—আমার যা বল্‌বার আছে শোন! ক্লোরাইড অব লাইম, সে কিন্তু মন্দ জিনিস নয়, আর সাইট্রিক এসিড. সে একটা এসিড মাত্র আর কিছু নয়!…… যা হোক আসল কথা হচ্ছে এই যে পরিষ্কার থাকা,—সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। এই সব কর্‌লে কি আর কখনো মানুষের কিছু খারাপ হয়? এ সব যারা বলে তারা বোকা! ওরা বলে এরা মানুষের অনিষ্ট করে! হাঁ তাই তো………এমনি বন্ধু লোককে অনিষ্টকারী ভাব্‌বে না তো কি? ধৎ—" বল্‌লে "যারা, কাজকর্ম্ম করে তারা এক আধ গ্লাস খেতে পারে—অবশ্য রয়ে সয়ে—ম্যাট্রোসা সে শুনেছিস্ তো? তা হলে আমায় একগ্লাস ঢেলে দে,—আছে না একটু?"

ম্যাট্রোসা তখনই উঠিয়া একটা লুকান জায়গা হইতে তাহাকে একগ্লাস ঢালিয়া দিল। ম্যাট্রোসা তখনও ছাত্রটির কথা ভাবিয়া হাসিতেছিল. "সত্যি বড় সুন্দর লোক কেমন আপনা আপনি ভাব……কিন্তু আর সকলে কেমন কে জানে? সম্ভবতঃ এরা ভাড়া করা—"

"কি বল্‌ছিস্………কি কর্‌তে ভাড়া করা?"

ম্যাট্রোসা কহিল "এই সব লোকদের মুখ বন্ধ কর্‌বার জন্য……বোধ হচ্ছে এইরকম একটা নুটিস জারী হয়েছে যে দরিদ্র যখন খুব বেশী হয়ে পড়েছে তখন তাদের বিষ দিয়ে মার্‌তে হবে।"

"কে বল্‌লে তোকে এ কথা?"

"কেন সকলেই তো বল্‌ছিল……ওই ছবিওয়ালার রাঁধুনী বলেছে……আরও অনেকেই বলেছে।"

"সব মূর্খের দল, সরকারের কি লাভ হবে এতে ? ভেবে দেখ্, প্রথম তাদের আমাদের ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে, তারপর শবযাত্রার, শবাধারের, কবরের সব রকম খরচ দিতে হবে। এতে তো কিছু খরচ আছে সে সব সরকারেরই দিতে হয়—ওরা তো কিছু বোঝে না, লোক কমাবার, সরকারের ইচ্ছা হলে কতক সাইবেরিয়ার পাঠালেই পারেন, সেথায় তো ঢের জাগয়া রয়েছে, তা ছাড়া আরো অমন ঢের পতিত জায়গা আছে যেথায় এদের দিয়ে ভরতি করিয়ে সরকার বেশ টেক্স পেতে পারেন। বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্ না ? এখন বুঝেছিস্ তো এই ভাবে লোক কমালে—লোকও কমান যায় সরকারের সুবিধাও হয়। কারণ একটা অবসতি জায়গা থেকে তো আর কিছু লাভ হয় না ; কিন্তু যারা কাজ করে খায় আর টেক্স দেয় সরকারের তারা কত দরকারী সে বুঝিস্ তো ? কিন্তু এভাবে বিষ দিয়ে তাদের কবর দিয়ে কি লাভ ? এর কোন মানে নেই—দেখছিস্ না ? তারপর এই মেডিকেল ছাত্রদের কথা--এদের ঢের ভুগ্‌তে হয়, লোককে বিষ দিতে গিয়ে নয়,--তাদের উপকার করতে গিয়েছে, অমন কাজ ওরা জগতের সমস্ত অর্থ পেলেও করবে না, এ দেখ্‌লেই বোঝা যায় যে ওরা অমন নয়—খাঁটি লোক !"

সমস্ত দিন তাহারা দুজনে মেডিকেল ছাত্র ও তাহার উপদেশ লইয়া আলোচনা করিল, তাহার হাসি তাহার সদানন্দ ব্যবহার এমন কি তাহার কোটের যে একটি বোতাম ছিল না সে বিষয় পর্য্যন্ত আলোচনা করিল। বোতাম যে ছিল না এ সত্যি কিন্তু ডানধারের কি বাঁধারের বোতাম নেই এ নিয়ে তাদের মধ্যে চুল ছেঁড়াছেড়ি গোছ তর্ক বেধে গেল। দু'দুবার ওরলফ্ পত্নীর সহিত তর্ক করিয়া নিজেই শেষকালে হার মানিল, কারণ তাহার পত্নীর কাছে যে তখনও কিছু মদ অবশিষ্ট ছিল ! তারা ঠিক করিল কালই ঘর দোর সব পরিষ্কার করিবে,—এবং পুনরায় সেই ছাত্রের কথা বলিতে আরম্ভ করিল সে যেন তাহাদের এই একঘেয়ে বদ্ধ জীবনে একটা মুক্ততার প্রবাহ আনিয়া ফেলিয়াছে। ওরলফ্ বলিল—"সত্যি বল্‌ছি—ছোক্‌রা বড় দেলখোলসা। সে ভেতরে এল যেন আমাদের কত বছরের পরিচিত, দরকারী কথাগুলো বলে চলে গেল, কোন গোলমাল নেই, কোন কথা কাটাকাটি নেই—যদিও তার হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল।.........এমন মানুষই আমার পছন্দ ! দেখ্‌লেই বোঝা যায় যে, আমাদের মত লোকের জন্য এদের দয়ামায়া আছে......কি বলিস্ মোটজা ? এই আসল কথা যে, আমরা মরে যাই এটা ওদের ইচ্ছা নয়, আর এই যে নারীগুলো সব বক্ বক্ করে......বিষ দেবে এ করবে ও করবে সব বাজে কথা। বল্লে 'তোমার পেটের অবস্থা কেমন ?' যদি বিষই দেবার ইচ্ছা, তো আমার পেটের অবস্থা জান্‌বার কি দরকার ছিল তার ? কেমন পরিষ্কার করে সব বুঝিয়ে দিলে—কি বল্লে ওর নাম—মনেও পড়্‌ছে না ছাই, ওই যে পোকাগুলো—"

মোটজা একটু ঠাট্টা ভাবে উত্তর করিল "ব্যাকেটেরি—কি ওই রকম হবে কিছু, কিন্তু ও শুধু আমাদের ভয় দেখাবার জন্যই বলেছে যাতে আমরা সতর্ক থাকি।" "কে জানে, সম্ভব এ সত্যি কথা। বোধ হয় তেমন কিছু আছে, অমনি স্যাঁৎসেঁতে জায়গাই অমন প্রাণী থাকে ! মরুক গে—কি নাম যেন পোকাগুলোর ? ব্যাক্—ব্যাকটেরি—ঠিক হোল না........ যদি ঠিক উচ্চারণটা করতে পারতাম !......এ যেন জিভের উপর এসে রয়েছে, শুধু বের করে দিতে পাচ্ছি না।"

বালকেরা যেমন একটা আশ্চার্য্য জিনিস দেখিলে তাদের মনে বসিয়া যায় ও সে সম্বন্ধে তাদের ভেতর আলোচনা চলে রাত্রে শুইয়াও আবার তাহাদের ভিতর তেমনি মুগ্ধ উৎসাহের সহিত ছাত্রের সম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল। কথা বলিতে বলিতে তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন তাহারা খুব ভোরে উঠিল। তাহাদের দোরের পাশে চিত্রকরের পাচিকা দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যমণ্ডিত রক্তাভ গাল দু'খানি সাদা ফ্যাকাসে মত দেখাইতেছিল। সে উত্তেজিত স্বরে কম্পিত ঠোঁটে কহিতে লাগিল—"কলেরা আমাদের বাড়ীর উপরেই হয়েছে, দেবীর অনুগ্রহ হয়েছে এখানে........।" এই বলিয়া সে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ওরলফ্ হঠাৎ ভীতির স্বরে কহিল "কি বল্‌ছ—এ হতেই পারে না।"

ম্যাট্রোসা অনুতপ্ত স্বরে কহিল "আঃ আমি আবারও ময়লা জলের হাঁড়িটা ঘর থেকে বের করে রাখ্‌তে ভুলে গেছি।"

পাচিকা কহিল "ভাই আমি তোমাদের কাছে বিদায় নিতে এসেছি, আমি দেশে ফিরে যাব ঠিক করেছি।" ওরলফ্ শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল "কবে হয়েছে বল তো ?"

"বেঙ্গোবাদকের, সে কাল রাত্রে কি খেয়েছিল, রাত্রি থেকেই টাঁস ধরেছে।" ওরলফ্ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল "বেঙ্গোবাদক !"—এমন একটা জোয়ান মানুষকে যে পীড়ায় আক্রমণ করিতে পারে এ যেন তাহার নিকট সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। এই কালই না সে কত আলাপ করিয়া গেল। ওরলফ্ তখনও অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কহিল "আমি এখনই যাচ্ছি—দেখি গিয়া কেমন ?"

ম্যাট্রোসা শঙ্কিত হইয়া চীৎকার করিয়া কহিল—"কিন্তু ওগো ও যে ছোঁয়াচে !" পাচিকা কহিল—"ওখানে গিয়ে কি করবে বল তো—যেওনা থাক এইখানে।" ওরলফ্ হাত মুখ না ধুইয়াই কাপড় পরিয়া বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। ম্যাট্রোসা পেছন হইতে তাহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, ওরফল বুঝিল তাহার হাত কেমন কাঁপিতেছে কিন্তু পত্নীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে তাহার বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইল, "ছেড়ে দে নইলে আবার কিছু ঘট্‌বে।" সে জোরে এই বলিয়া পত্নীকে ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

উঠান শূন্য, নিস্তব্ধ.........ওরলফ্ বেঙ্গোবাদকের ঘরের পাশে আগাইতে কেমন একটা ভীতির ভাব তাহাকে অধিকার করিয়া বসিল। কিন্তু তখনই আবার মনে হইল সেই বোধহয় সর্ব্বপ্রথম রোগীর ঘরে যাইতেছে ! আহা ! বেচারী, এ চিন্তায় ভীতির ভাব কাটিয়া তাহার মনে বেশ তৃপ্তি আসিল। সে যখন দেখিল তেতালা হইতে শিক্ষানবীশর দরজীরা তাহাকে দেখিতেছে তখন তাহার উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল। তার মোটেই ভয় হয় নাই এই ভাব দেখানোর জন্য সে শিষ্ দিতে দিতে চলিল। যা হোক সে বেঙ্গোবাদকের কক্ষের দোরে উপস্থিত হইয়া কিন্তু সেন্‌কা সিচিককে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল;......তবে সেই সবার আগে আসে নাই—তাহার পূর্ব্বেই ছোক্‌রা আসিয়াছে। সেন্‌কা দোরের ফাঁকা জায়গায় তার নাক রাখিয়া গভীর উৎসাহে ভিতরে কি হইতেছিল দেখিতেছিল। ওরলফ্ পৌঁছিয়া যতক্ষণ না তার কান ধরিয়া ঝাঁকুনি দিল ততক্ষণ সে ওরলফকে লক্ষ্যই করে নাই। সেন্‌কা তার মুখখানা তুলিয়া বলিল—"দেখ গ্রিসকা খুড়ো কেমন টাঁস ধচ্ছে ওর...... কেমন শুক্‌নো হয়ে গেছে চেহারা ওর ! সে নীরবে দাঁড়াইয়া সেন্‌কার কথা শুনিতে শুনিতে এক চক্ষু দিয়া দোরের ফাঁকে চাহিতেছিল—সিচিক বলিল "খুড়ো ওকে বোধ হয় একটু জল দেওয়া দরকার নয় !"

ওরলফ্ বালকের মর্ম্মাহত, ব্যথিত, কম্পিত মুখের পানে চাহিল; ব্যাথায় তাহার হৃদয়ও তখন পূর্ণ এবং এই রোগীকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা ক্রমেই তাহার বেশী হইতে লাগিল। সে সেনকাকে কহিল "যাও দেখি দৌড়ে—একটু জল নিয়ে এস।" তারপর সে রোগীর ঘরের দোর দু'টি একেবারে খুলিয়া অবিচলিত পদক্ষেপে ঘরে ঢুকিল।

তাহার চোখের সামনের কুয়াসার ঘোর কাটিয়া গেল, সে হতভাগা বেঙ্গোবাদককে দেখিল, বেঙ্গোবাদক তাহার সব চেয়ে ভাল পোষাকে সজ্জিত হইয়া শুইয়া ছিল, বুট জোরা তখনও তার পায় ছিল, ভিজে মেজেয় সে একবার

পা ছড়াইতেছিল ও গুটাইতেছিল। রোগী সম্পূর্ণ পরিচিত স্বরে কহিল—"কে এসেছ?" ওরলফ্ একটু আগাইয়া বেশ একটু স্ফূর্ত্তির স্বরেই বলিবার চেষ্টা করিল—"আমি ভাই—কি হয়েছে তোমার? তোমার এমন গান যে আমার কাছে অদ্ভুত ধরণের লাগ্‌ছে—কাল কি একটু বেশী পেটে গিয়েছিল নাকি?

সে ভীত বিস্ময়ে বেঙ্গোবাদকের পানে চাহিল, কারণ সে বোধ হয় তাহাকে আদৌ চিনিতেই পারে নাই। বেঙ্গোবাদকের মুখের হাড়গুলো সব বাহির হইয়া পড়িয়াছে, চোখ বসিয়া গিয়াছে,—নীচে সব কালো দাগ, চাহনী যেন অস্বাভাবিক রকম স্থির। ওরলফের বোধ হইল সে যেন মৃতের নিষ্প্রভ মুখের পানে চাহিয়া আছে। শুধু চোয়ালের নাড়াচাড়া হইতে বোঝা যায় তাহার সমুখে যে রহিয়াছে সে এখনো বাঁচিয়া আছে। কিছুক্ষণ বেঙ্গোবাদক তাহার কাচের মত স্থির, নিষ্পলক চোখ নিয়ে চাহিয়া রহিল। এই মরণ চাহনী ওরলফ্‌কে ভীত করিয়া তুলিল, তাহার বোধ হইল যেন একখানা বরফের মত ঠাণ্ডা হাত তার গলা আকর্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে টানিয়া লইতেছে। এই কক্ষ পূর্ব্বে কিরূপ আনন্দপূর্ণ সুখের স্থান ছিল, কিন্তু কি বিভীষিকা এখন বিরাজ করিতেছে, তাহার মনে হইল যত শীঘ্র সম্ভব এ কক্ষ ছাড়িয়া গেলেই যেন সে বাঁচে। সে কক্ষ ছাড়িতে প্রস্তুত হইয়া আপনা আপনিই যেন কহিল—"আসি এখন।"

হঠাৎ বেঙ্গোবাদকের ধূসর মুখের উপর একটা পরিবর্ত্তনের আভা দেখা দিল, ঠোঁট দু'খানা খুলে গেল সে মৃদু স্বরে বলিল—"আমি আর বাঁ—বাঁচবো না।" এ কথা কয়টা এমন ছাড়া ছাড়া ভাবে উচ্চারিত হইল ওরলফের মাথায় ও হৃদয়ে যেন কয়টা হাতুড়ির আঘাত পড়িল। সে ঘুরিয়া আহতের ন্যায় দোরের দিকে চাহিল—এমন সময় সেনকা জলপাত্র লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। "এই একটু জল এনেছি মিডলফ্‌দের কূয়ো থেকে...... বাঁদরেরা আমায় জল নিতেই দিচ্ছিল না!" সে মাটিতে জল পাত্রটি রাখিয়া ঘরের এককোণে দৌড়াইয়া গিয়া একটা গ্লাস আনিয়া ওরলফের নিকট ধরিল, তারপর আপন মনে বকিতে লাগিল "ওরা বলে আমাদের এখানে কলেরা হয়েছে, "আমি বল্লুম" ভাল তায় হয়েছে কি?.........এ তোমাদেরও হতে পারে, সহরের সর্ব্বত্রই হচ্ছে, এই বল্‌তেই মেরেছে এক ঘুসি আমার গালে......"

ওরলফ্ গ্লাস লইয়া একগ্লাস ঢালিয়া এক চুমুকে পান করিল, তার কানে তখনও রোগীর কথা বাজিতেছিল "আমি বাঁচবো না।"

সিচিক ঘরের ভেতর বেশ স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, বেঙ্গোবাদক তাহার কম্পিত দেহে টেবিলের পায়া ধরিয়া কাঁৎরাইয়া উঠিল "জল দাও আমায়।" সিচিক দৌড়াইয়া গিয়া একগ্লাস জল তাহার কালো ঠোঁটের কাছে ধরিল। ওরলফ্ মন্ত্রমুগ্ধ বা কুস্বপ্ন দৃষ্টির মত দোরের পার্শ্বে দেয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেমন শব্দ করিয়া মরণাহত জল পান করিল—সিচিক তাহার পোষাক খুলিয়া শয্যায় শোয়াইবার অনুরোধ করিল এবং চিত্রকরের পাচিকার আওয়াজ সে সবই শুনিতেছিল,—সে তাহার গোল পুরু মুখের ভীতি এবং ব্যথার ভাব পর্য্যন্ত দেখিতেছিল। পাচিকার পাশেই একজন দাঁড়াইয়া রোগীর কি ঔষধের ব্যবস্থার কথা বলিতেছিল সে তাহার মুখ না দেখিলেও কথা শুনিতে পাইতেছিল।

ওরলফের হঠাৎ বোধ হইল যেন তাহার হৃদয়ের নীরব স্বরে কি কহিতেছে। সে তাহার কপোল ঘসিতে লাগিল, তারপর হঠাৎ ঘাড় নাড়িয়া দৌড়াইয়া উঠান পার হইয়া রাস্তায় অদৃশ্য হইল। পাচিকা চীৎকার করিয়া উঠিল "হা ভগবান, ওরলফ্‌কেও বোধ হয় রোগে ধরেছে—দৌড়ে হাঁসপাতালে গেল।"

ম্যাট্রোসা তাহার সমুখেই বিস্ফারিত নয়নে দাঁড়াইয়া ছিল, তার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কাঁপিতেছিল। সে রাগিয়া কহিল—যদিও তার ফ্যাকাশে ঠোঁট দু'খানি হইতে কথা বাহির হইতেছিল না—"আমার গ্রিসকার ও সব বিশ্রী রোগ হতেই পারে না, মিথ্যাবাদী তুমি—কখ্‌নো না।" কিন্তু পাচিকা তার কথা শুনিল না, সে আপন মনে বকিতে বকিতে কোন দিকে চলিয়া গেল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই পুটিনকফের গৃহ প্রতিবেশী ও পথ চলা লোকের আগমনে সরগরম হইয়া উঠিল। সেথায় তাহারা দাঁড়াইয়া ফিস্ ফিস করিয়া চাপা গলায় কথা কহিতেছিল তাহাদের প্রত্যেকের মুখেই ভীতি, উত্তেজনা, ও নিরাশার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কেহবা একেবারে দমিয়া গিয়াছিল, কেহবা সাহসিকতার ভান করিতেছিল। সিচিক এক একবার রোগীর ঘর ও উঠান দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইয়া রোগীর সম্বন্ধে এক একটা নূতন খবর আনিয়া সকলকে দিতেছিল। জনতা সব পাশাপাশি জমিয়ে দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছিল। কে একজন তাহাদের মধ্য হইতে বলিল "ওই দেখ ওরলফ্ আস্‌ছে।"

ওরলফ্ শুশ্রূষাকারীদের একখানা গাড়িতে আসিয়া বাড়ীর দোরে গাড়ি থামাইল, সে শাদা পোষাক পরা চালকের পাশে বসিয়াছিল—চালক গম্ভীর ভাবে খন্‌খনে আওয়াজে জনতা লক্ষ্য করিয়া কহিল "রাস্তা দাও—রাস্তা ছেড়ে দাঁড়াও।" সে ঠিক জনতার ভেতর দিয়া গাড়ি চালাইয়া গেল, তাই জনতা ডান বাঁয় দ্বিধা হইয়া পড়িল। চালকের পেছনেই পূর্ব্বদিন যে মেডিকেল ছাত্র আসিয়াছিল সে বসিয়া আছে, তাহার পোষাকও শাদা, কোটের মাঝে এসিডের একটা ফুটো। ঘর্ম্মের বিন্দুতে তার কপাল উজ্জ্বল। জনতার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছাত্র কহিল, "তারপর ওরলফ্, রোগী কোথায়?"

জনতার ভেতর হইতে একজন পরিপূর্ণ ঘৃণার স্বরে কহিল "ওরা ছোঁয়াচে লাগ্‌বার ভয় করে না......এই যে বুঝ্‌তে পারি।" একজন বলিল "ওই দেখ মরা নিয়ে আস্‌ছে—ওরলফ্ নিয়ে আস্‌ছে, দেখ কি সাহস ওর।"

"সত্যি বেজায় সাহস ওর।" "ওর মত গোঁয়ারের আবার ভয় কি?"

"সাবধান—দেখো ওরলফ্ পা দু'টো উঁচু করে ধর, হাঁ হয়েছে—উঠিয়েছ! চালাও পিটার—ডাক্তার-সাহেবকে বলো আমি এলুম বলে·····"

ওরলফ্ জায়গাটা কর্‌তে আমার সাহায্য করবে না?—চল......শিখে রাখ্‌লে অন্য সময়ও এ তোমার কাজে লাগ্‌বে—বেশ চল।"

ওরলফ্ গর্ব্বিত ভাবে জনতার পানে চাহিয়া বলিল "বেশ চলুন না।" সিচিক বলিল 'আমিও সঙ্গে থাক্‌বো' ছাত্রটি চশমার ভিতর হইতে তার পানে চাহিয়া কহিল "কে তুমি বালক?"

"চিত্রকরের কাজ শিখ্‌ছি।"

"তুমিকলেরা দেখে ভয় পাও না?"

সেনকা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"আমি ....ভয়!—আমি জগতে কিছু দেখে ভয় পাই না।"

"তাই নাকি, বেশ ভাল। ভাই সব শোন এখন তোমরা"—ছাত্রটি উঠানে একটা গাদার উপর বসিয়া দুলিতে দুলিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা সম্বন্ধে নানা কথা কহিতে লাগিল। এমন সময় ম্যাট্রোসাও ধীরে ধীরে আসিয়া জনতায় যোগ দিল, পাচিকাও তাহার পিছনে ভিজে গামোছায় তাহার অশ্রু-সিক্ত চোখ মুছিয়া আসিল। ক্রমে একে একে সকলে বিড়াল যেমন ধীর চরণে চড়ুই ধরিতে যায় তেমনি ভাবে ডাক্তারকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। লোক সমাগম দেখিয়া ছাত্রও তাহার কথা শুনিবার আগ্রহে সকলে আসিয়াছে বুঝিয়া উৎসাহিত হইয়া ব্যাপার

বুঝাইতে লাগিল। "ভাই সব—সব ব্যাপারেই আগে নিজেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আর পরিষ্কার বায়ু এই দরকার।" একজন বলিল "কিন্তু যারা পরিষ্কার থাকে তারাও তো মরে।" পাচিকা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "হা ভগবান তোমার দয়া।"

ওরলফ্ তাহার পত্নীর পাশে দাঁড়াইয়া যদিও নিজ চিন্তায় মগ্ন ছিল তবুও ছাত্রের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। হঠাৎ কে যেন তাহার হাত ধরিয়া টানিল। সিচিক উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া তাহার কানে কানে বলিল—"খুড়ো বেহ্লোবাদক তো মারা যাচ্ছে, বেচারার তো আর কেউ আত্মীয়-স্বজন নেই তার বেহ্লোর কি হবে?"

ওরলফ্ তাকে ধমকে বলিল "চুপ কর এখনকার কি ওই কথা! সেনকা তাহার মুখের দিকে কঠোর দৃষ্টি হানিয়া বলিল "মরেছে কে?"

(৪)

এই বিপদের দিন সন্ধ্যাবেলায় ওরলফ্ দম্পতি যখন চা খাইতেছিল তখন ম্যাট্রোসা আগ্রহকণ্ঠে কহিল "তুমি এই মাত্র ছাত্রটির সঙ্গে গিয়েছিলে কোথায়?"

ওরলফ্ ঝাপ্সা ভাবে পত্নীর পানে চাহিয়া কথা না কহিয়া পেয়ালা হইতে চা ঢালিল! ঘরগুলি বিশোধিত করিয়া ওরলফ্ ও স্বাস্থ্য পরিদর্শক উভয়েই বাহির হইয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া ওরলফ্ প্রায় তিন ঘণ্টা চিন্তিত ভাবে নীরবে ছিল। বিছানায় শুইয়া ছাদের পানে চাহিয়া একটি কথা না কহিয়া সে চার সময় পর্য্যন্ত পড়িয়া রহিল। ম্যাট্রোসা তার সঙ্গে কথা কহিবার বার বার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিল। ম্যাট্রোসা খুব বেশী বিরক্ত করিলেও সে একবারও রাগিয়া উঠিল না, এ ব্যাপার তাহার জীবনে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক, তাই ম্যাট্রোসার চিন্তার অবধি রহিল না।

স্বামীর সঙ্গে যে নারীর জীবন মিশিয়া গেছে তাহারই অনুভূতি লইয়া সে তখনই ধরিয়া ফেলিল নিশ্চয়ই নূতন ধরণের একটা কিছু তাহাদের জীবনে আসিয়া পড়িয়াছে। সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল এবং কি ব্যাপার জানিবার জন্য ক্রমেই বেশী উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিল। সে আবার বলিতে আরম্ভ করিল "গ্রিসকা তোমার কি ভাল লাগ্ছে না?"

ওরলফ্ চা টুকুতে শেষ চুমুক দিয়া জামার হাতায় গোঁফ মুছিয়া পত্নীর দিকে পেয়ালাটা সরাইয়া মুখখানি কালো করিয়া কহিল "আমি মেডিকেল ছাত্রটির সঙ্গে হাঁসপাতাল পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম।" ম্যাট্রোসা হতাশস্বরে কহিল—"কি! কলেরা-হাঁসপাতালে গিয়েছিলে?" তারপর ভীত ভাবে কহিল—"অনেক লোক আছে নাকি সেথায়?" "এখানকার একজন নিয়ে তেপান্ন জন হয়েছে।" "কি বল্ছ......আর—" "জন বার প্রায় সেরে গেছে তারা হাঁট্তে পর্য্যন্ত পারে তবে বড় রোগাটে, পান্সে হয়ে গেছে।" "ওরা কি সত্যি কলেরার রোগী না কি আর কোন রোগকে কলেরা নামে চালাচ্ছে—তবেই ডাক্তারেরা বল্তে পারবে যে, তারা এদের আরাম করে দিলে এঁ্যা?" ওরলফ্ তাহার দিকে ক্রোধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পরুষ কণ্ঠে কহিল "যেমন গাধার মত বুদ্ধি তোদের! কি বোকাই যে তোরা—এ সব অজ্ঞতা আর বোকামো ছাড়া কিছু নয়, এই সব অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে বেশ বসে থাক্বি তবু কিছু বোঝ্বার চেষ্টা করবি না।" এই মাত্র ম্যাট্রোসা তাহার নিজের জন্য যে চা পেয়ালায় ঢালিয়াছে ওরলফ্ সেইটি নিজের দিকে টানিয়া লইয়া চুপ করিয়া রহিল। ম্যাট্রোসা ঠাট্টা করিয়া কহিল—"আমার জান্তে ইচ্ছা হচ্ছে এত জ্ঞান তুমি কোথায় পেলে!" ওরলফ্ তাহার কথায় একটুও কর্ণপাত করিল না। সে

পূর্ব্বের মত গম্ভীর গট্ হইয়া বসিয়া রহিল। উঠানের দিক হইতে জানালা দিয়া অয়েলপেন্ট, কার্ব্বলিক প্রভৃতি নানা মিশ্র দুর্গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। গোধূলির ম্লান আলো, এই গন্ধ, ষ্টোভের ঝিঁ ঝিঁ সঙ্গীত এই ক্ষুদ্র বাস-কক্ষের অধিবাসীগণের মনে নিশার স্বপনের ভাব আনিতেছিল। ষ্টোভের কালো বিশ্রী মুখটা যেন তাহাদের পানে চাহিয়া হাসিতেছিল, যেন তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিতে চায়। অনেকক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল। ম্যাট্রোসা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল এবং ওরলফ্ আঙ্গুল দিয়া চার টেবিলে বাজাইতে লাগিল। অবশেষে সে হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহিল—"অমন পরিষ্কার জায়গা আমি আর দেখি নি! সব পরিষ্কার, ফিট্‌ফাট্। শুশ্রূষাকারীদের সকলেরই সাদা লিশেনের পোষাক; রোগীদেরও যতবার দরকার পোষাক বদলান হয়। ৫½ রুবল করে যে মদের দাম সেই মদ তাদের জন্য রাখা হয়,—খাবার জল এত সুন্দর যে গন্ধেই প্রাণ জুড়িয়ে যায়! এত যত্ন এত শুশ্রূষা সেথায়—কোন মাও বোধ হয় ছেলের এত যত্ন নিতে পারেন না,—সত্যি বল্‌ছি। এখানে আমরা এতদিন আছি কৈ একটা প্রাণীও তো ফিরে একবার জিজ্ঞাসা করে না, কেমন আছি, কেমন চল্‌ছে, সুখ কি দুঃখ, খেলাম কি না খেলাম। কিন্তু এই সব মরণ ব্যাপারে তারা কি খরচটাই করেছে, কি যত্নটাই লচ্ছে—ধর ৫½ রুবল দামের মদ,—এ সবে খরচা কত সে কি ওরা একবার ভেবেও দেখে না। ওরা চায় মানুষের জীবন দিতে—মরণের হাত হতে রক্ষা করতে—একটা রোগী যেই ভাল হয়ে গেল পুরস্কার ওদের সেই—হাতে যেন স্বর্গ পেলে! কিন্তু এই সঙ্গে নীরোগ যাহারা—খাদ্য অভাবে মরতে বসেছে তাদের সাহায্য করলে বোধ হয় ওদের অর্থ ব্যয় আরও সার্থক হতো!"

সে কি বলিতেছে তাহা বুঝিবার জন্য ম্যাট্রোসা বিশেষ চেষ্টা করিয়া মাথা ঘামাইল না। এই ম্যাট্রোসার পক্ষে যথেষ্ট যে ওরলফের চিন্তা-জীবন একটা নূতন পথে চলিতেছে এবং এখন স্বামীর সহিত তাহার সম্বন্ধও একটা নূতন ভাবে চলিবে। আশা ও আকাঙ্ক্ষায় হৃদয় তাহার উদ্বেলিত হইতে লাগিল, স্বামীর উপর কেমন একটা শক্রতার ভাবও জাগিয়া উঠিল। ম্যাট্রোসা একটু মুখভঙ্গী করিয়া ব্যঙ্গ স্বরে কহিল "তুমি না বলে দিলেও তারা নিজেরাই ঠিক্ করে নিতে পার্‌বে।"

ওরলফ্ ঘাড় নাড়িয়া তাহার পানে আড় চোখে চাহিয়া দৃঢ় স্বরে বলিল—"তারা জানে কিনা সে হচ্ছে তাদের কাজ......কিন্তু জীবনের একটু কিছু স্বাদ না পেয়েই আমি যদি মরে যাই—তো সেরূপ দুর্ভাগা এই প্রথম আমি।..... বুঝে দেখ তা হ'লে এই বিপদের শেষও নিশ্চয় আছে, যেমন ভাবে এই বোজ্ঞোবাদককে কলেরায় ধর্‌লে তেমনি ভাবে আর আমি এখানে বসে কলেরার আক্রমণের জন্য অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌বো না। না,—কখনো না—আমি তা পার্‌বো না, —বরঞ্চ সাহস করে এগিয়ে যাব তার সমুখে......ছাত্র পিটার আমায় বল্‌ছিল "যদি ভাগ্য তোমার বিরুদ্ধে থাকে, তুমিও দেখাও যে তুমিও তার বিরুদ্ধাচরণ কর্‌তে পার। কে জিতে এও অন্ততঃ চেষ্টা করে দেখা যায়—এ একটা যুদ্ধ বৈ আর কিছু নয়। তুই জিজ্ঞাসা কচ্ছিস্ আমার হয়েছে কি? আমিও একজন শুশ্রূষাকারী হয়ে হাঁসপাতালে যেতে চাই,—বুঝেছিস্ এখন?........ যারা ভয় দেখাচ্ছে তাদেরই চোয়ালের ভিতর গিয়ে আমি পড়বো, তারা আমায় গিলে ফেল্‌তে পারে, কিন্তু আমিও আর কিছু না পারি হাত পা দিয়ে অন্ততঃ তাদের বাধা দিতে পার্‌বো।...........আর সেথায় কিছু মন্দও নয়—খোরপোষ বাদে মাসে ২০রুবল করে পাব। এক ভয়—হাঁসপাতালে কত রকমের রোগী, ছোঁয়াচে ব্যারাম—আমি সেথায় মরে যেতে পারি—কিন্তু তাতে কি, জন্মিলেই মরণ আছে—ভয় করে আর ফল? যাই হোক তবু জীবনের একটা পরিবর্ত্তন তো?

সে অতি উত্তেজনায় চা টেবিল চাপড়াইল, চা-পাত্রগুলি নড়িয়া শব্দ করিয়া উঠিল। ম্যাট্রোসা তার কথার প্রথম ভাগ উৎকণ্ঠা অশান্তির সহিত শুনিতেছিল কিন্তু শেষকালে রাগিয়া বাধা দিয়া কহিল—"ওই মেডিকেল ছাত্রটা বুঝি তোমায় এই বুঝিয়েছে তাই না ?" ওরলফ্ সোজা উত্তর দিতে ইচ্ছা না করিয়া একটু ঘুরাইয়া বলিল "আমার নিজের কি কিছু বুদ্ধি নেই—নিজের মতলব কি নিজে ঠিক্ করে নিতে পারি না ?"

"বেশ, আর আমার উপায় কি হবে ? তুমি ত নিজের আনন্দে ভরপুর !"

ওরলফ্ বিস্মিত হইয়া কহিল "কেন ? তোর উপায় !" সে এ দিকটা একবারও ভাবে নাই, অবশ্য এ সাধারণ কথা যে তার স্ত্রী তাদের এই বাসাতেই থাকিবে। কিন্তু স্ত্রীর প্রশ্নে সে চিন্তিত হইয়া ভাবিল "তাই তো !"

সে বিমর্ষ-স্বরে কহিল "তোর পক্ষে এইখানে থাকাই বেশ সোজা হোত, আমার মাইনে থেকেই তোর চলে যেত।" ম্যাট্রোসা এ কথায় কি উত্তর দেয় শুনিবার জন্য সে ব্যগ্র হইয়া রহিল—সে এক কথায় উত্তর দিল "আমার পক্ষে সবই সমান।" ওরলফ্ যেন পত্নীর মুখে কেমন হাসি লক্ষ্য করিল, এ হাসির সে দুই অর্থ ধরিত এবং যখনই তাহার পত্নীর প্রেমে ঈর্ষা জাগিত তখনই সে এই হাসি ম্যাট্রোসার মুখে দেখিত। এ হাসি দেখিয়া তাহার পূর্ব্বের মতই রাগ হইল, কিন্তু সে চাপিয়া গিয়া বলিল—"বোকা আর বলে কাকে—যা তা সব কথা।" পত্নী কি বলে শুনিবার জন্য সে চাহিয়া রহিল, কিন্তু ম্যাট্রোসা কিছুই না বলিয়া শুধু সেই হাসি হাসিয়া তাহাকে বিরক্ত করিতে লাগিল। ওরলফ্ অবশেষে জোর গলায় কহিল "ভাল—কি করতে হবে ?" ম্যাট্রোসা চা পেয়ালা পুঁছিতে পুঁছিতে নির্লিপ্ত ভাবে কহিল "হাঁ কি করতে হবে ?" ওরলফ্ রাগিয়া কহিল "বুঝ্‌লি তুই সাপের মত আমায় নিয়ে না খেল্‌লেই ভাল হয় !—না খেল্‌লেই ভাল, নইলে মাথা ভাঙ্গা যাবে ! হতে পারে আমি মরতেই যাচ্ছি !"

ম্যাট্রোসা ধীর স্বরে কহিল "যেও না তা হলে, আমি তো আর তোমায় পাঠাচ্ছি না।"

ওরলফ্ ব্যঙ্গ ভাবে কহিল "যা হোক আমি জানি,—আমি যাচ্ছি এতে তুই খুসী।"

ম্যাট্রোসা চুপ করিয়া রহিল, এই নীরবতা তাহার ক্রোধের বৃদ্ধি করিল—কিন্তু তাহার সঙ্কল্প বা আবার সেই পত্নী-প্রহার অভিনয়ে ব্যর্থ হইয়া যায় তাই সে চাপিয়া গেল। "আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, তুই আমায় জব্দ করতে চাচ্ছিস্ ভাল দেখা যাক্ কে কাকে জব্দ করে—এমন একটা কাজ করব যাতে তোর দুঃখ ঘুচে যাবে।" সে উঠিয়া টুপি নিয়ে বাহির হইয়া পড়িল, ম্যাট্রোসা একাকী বসিয়া রহিল। সে তার চেষ্টার ফল দেখিয়া বিরক্ত ও স্বামীর ভীতি প্রদর্শনে কেমন হইয়া পড়িয়াছিল, একটা ভীতির ভাব ক্রমেই তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিতেছিল, সে ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে লাগিল। চা পাত্রগুলির উপর একদৃষ্টে চাহিয়া লক্ষ্য-হীন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তারপর উঠিয়া চা পেয়ালাগুলো সরাইয়া রাখিল,—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া একেবারে সটান বিছানায় শুইয়া পড়িল—কেমন যেন উৎকণ্ঠ-বিচলিত ভাব বোধ হইতেছিল তাহার !

ওরলফ্ যখন ফিরিয়া আসিল, তখন বেশ অন্ধকার হইয়াছে। তাহার চলন-ভঙ্গী দেখিয়াই ম্যাট্রোসা বুঝিতে পারিল সে ভাল ভাবে আসিয়াছে। মদ না খাইয়া এ ভাবে তার এই প্রথম আগমন ! ঘর অন্ধকার বলিয়া কোন ডাক হাঁক না করিয়া ম্যাট্রোসাকে ডাকিয়া, বিছানায় তাহার পাশে বসিল। ম্যাট্রোসাও সরিয়া তাহাকে ঘেঁষিয়া বসিল। ওরলফ্ হাসিয়া কহিল "বল্ দেখি এবার কি খবর ?" "কি বল্ না ?" "তোরও ওখানে কাজ হয়ে গেল।" ম্যাট্রোসা কম্পিত ওষ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় ?" সে ভালবাসার স্বরে কহিল "আমি

যে হাঁসপাতালে থাক্‌বো সেইখানে আর কোথায়!" ম্যাট্রোসা স্বামীর কাঁধে পড়িয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া তাহার ওষ্ঠ চুম্বন করিল। ওরলফ্ এ আশা করিয়াছিল না, তাই তাহাকে সরাইয়া দিল, ওর্লফ্ ভাবিতে লাগিল "এ শুধু ভান হচ্ছে—দুষ্টু, ওর সত্যি ইচ্ছা কিন্তু আমার সঙ্গে থাক্‌বার নয়। আমায় বোকা ঠাউরিয়েছে—আচ্ছা মায়াবিনী!" সে পূর্ণ অবিশ্বাসে কঠোর স্বরে কহিল "আচ্ছা তুই এতে খুসী কেন?" ম্যাট্রোসা শুধু সুখের হাসি হাসিয়া কহিল "আমি খুব খুসী হয়েছি।" "আমায় আর আড়ম্বর করে বুঝাতে হবে না, আমি তো তোকে চিনি!" "চিন্‌বে না—কোন্ স্বামী স্ত্রীকে না চেনে—যে চেনে না সে স্বামী না সঙ্গী!" "চুপ নইলে আবার কিছু খাবি।" "আমার প্রিয় ভালবাসার গ্রিস্‌কা!" "সাজাসোজি বল্ কি চাস্ আমার কাছে?"

শেষে যখন তাহার ব্যবহারে সে একটু শান্তি পাইল তখন ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"তা হলে ভয় হচ্ছে না মোটে তোর?" সে এক কথায় উত্তর দিল—"কিন্তু দু'জনে একসঙ্গে থাক্‌বো তো!" এই কথা তাহার কাছে বড় মধুর লাগিল, সমস্ত মেঘ এক নিঃশ্বাসে উড়িয়া গেল—হাঁ স্ত্রীর মত কথা বটে! সে উত্তর করিল ' সত্যি তোর মত স্ত্রী পেয়ে আমি ভাগ্যবান।" তারপর গ্রিস্‌কা মনের সাধে গান ধরিল শিস্ দিতে লাগিল—ম্যাট্রোসা যতক্ষণ না কাঁদিল ততক্ষণ তাহাকে চিম্‌টি কাটিতে লাগিল!

ক্রমশঃ—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

রাঁচির চিঠি।

—:*:—

বন্ধু,

এসেছি অনেক দূরে, হৃদয়ের অন্তঃপুরে
কেবল মরিছে ঘুরে হৃদয়ের কথা,
তোমারে পাইনা কাছে ভরা গান রুদ্ধ আছে
তাই বুঝি প্রকাশের এত ব্যাকুলতা!
কথা আছে লিখিবার ভাষা নাহি পাই তার
দুটি চোখে অশ্রুধার করে ছল্‌ছল্,
ভাব সে ব্যথিয়া ওঠে ফুটিতে পারিলে ফোটে
কুঁড়ির বাঁধন টোটে ভাষার কমল!
জান ত মোদের বাস ঘেরাটোপে বার মাস
একটু ফেলিতে শ্বাস নাহি পাই ছুটি,
এত শোভা অফুরাণ সুধায় ভরিছে প্রাণ
অমৃত করিছে পান মোর আঁখি দুটি!

যে দিকে ফিরাই আঁখি অনিমেষে চেয়ে থাকি
একটু অভাব ফাঁকি নাই প্রকৃতির,
চারিদিক আছে ভরা হৃদয়-পাগল-করা
মাধুরী দিয়েছে ধরা ভরি দুই তীর।

প্রাণ মন ছুটে যায় দিগন্তের সীমানায়
যেথায় আকাশ চায় ধরণীর যোগ, —
সবুজে ধূসরে মিলি প'ড়ে আছে নিরিবিলি
অবাধে সেথায় তারে করিতে সম্ভোগ।

যত দূর দৃষ্টি চলে পর্ব্বতের তলে তলে
নব বরষার জলে ভরেছে পল্বল,
কোথা ঘন শালবন মর্ম্মরিছে অগণন
বিস্ময় ব্যাকুল মন কিশলয় দল।

পথ যেন সরু সিঁথি দুধারে তরুর বীথি
ভরে ওঠে নিতি নিতি শ্যামতর ছায়া,
নবীন ধানের ক্ষেতে কে যেন রেখেছে পেতে
গভীর এ বিজনেতে সবুজের মায়া!

সুবর্ণরেখার তল কল্‌কল্ ছল্‌ছল্
উপলব্যথিত জল আবিলিয়া উঠে;
রাখাল তাহার তীরে গরু চরাইয়া ফিরে
গাহে গান ধীরে ধীরে দলেবলে জুটে।

রামগড় কোথা দূরে পথ গেছে ঘুরে ঘুরে
সেথা মধু কলস্বরে বহে দামোদর,
ছোট গ্রামে ছোট হাট আমগাছে ঘেরা বাট
সুদূরে ধানের মাঠ শ্যামল সুন্দর।

দিন রাত আসে যায় দুইটি সুরের প্রায়
ছয় ঋতু এর গায় আঁকে নব ছবি,
বিভাবরী অবসানে যেমন জীবন আনে
তেমনি মহিমা দানে ডুবে যায় রবি!

যত দেখি তত চাই যত চাই তত পাই
হৃদয় স্বরগ তাই ভরেছে সুধায়,
সুর ভাঙ্গা মোর গানে স্বপনের ছবি আনে
যদি কভু তোর প্রাণে এই দুরাশায়।

মৎস্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ।

মৎস্যলোলুপ বাঙ্গালী আমরা; আমাদিগের রসনা যেরূপ মৎস্যের সহিত পরিচিত, আমরা স্বয়ং তদ্রূপ নহি। কোন্ মৎস্যের কিরূপ স্বাদ, কিরূপে কিসের সহিত রন্ধন করিলে কোন্‌টী কেমন সুতার সুরস রসনাগ্রাহী হয়, ইহা আমাদিগের নিত্য-আলোচ্য। গঙ্গার ইলিশ পদ্মার ইলিশ অপেক্ষা কেমন সুমিষ্ট, লাউ বা পুঁইয়ের সহিত চিংড়ির কি প্রগাঢ় বন্ধুত্ব, তপ্সির টক কি অপার্থিব বস্তু ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহে আমরা যেমন উৎসুক, মৎস্যজাতির জীবন-ইতিহাস সংগ্রহে আমরা তাহার শতাংশের একাংশও উদ্‌গ্রীব নহি। কোন্ জাতীয় মৎস্য কখন কোথায় পাওয়া যায়, কিরূপে তাহাদিগকে শীকার করিতে হয় ইত্যাদি যৎকিঞ্চিৎ--যাহা না জানিলে রসনা পরিচর্য্যায় ব্যাঘাত ঘটে আমরা তাহারই দুই চারি কথা অবগত আছি মাত্র। সত্য বলিতে গেলে, যাহার সহিত রসনার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ নাই, আমাদিগের নিকটও তাহাদিগের বড় আদর নাই।

সত্য বটে, আয়ুর্ব্বেদ বস্তুবিচার করিতে গিয়া পুঁটিতে পিত্ত, টাঁইয়ে শ্লেষ্মা ও রাঘব বোয়ালে বাত দোষ আরোপ করিয়া—রসনা নির্য্যাতনে প্রয়াস পাইলেও বাঙ্গালীর উপর সে উপদেশ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। উহা কবিরাজ মহাশয়ের ব্যবস্থা-গ্রন্থে যে তিমিরে—সে তিমিরে অবস্থান করিতেছে। প্রবৃত্তিও রসনা-নির্য্যাতনে কম করে নাই কিন্তু তাহাকেও তুল্য ফল লাভ করিয়া নিরস্ত হইতে হইয়াছে। চিংড়িটা জলকীট, বাইন প্যাঁকাল—সর্পের সোদর, এ সকল অখাদ্য কি করিয়া গ্রহণ করা যায়! রসনা হাজার মাথা কুটিয়া মরুক্—মন প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে ঘৃণ্য বস্তু গ্রহণ করিতে নিতান্ত নারাজ! রসনাও সহজে পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র নহে! সত্যই হউক আর অসত্যই হউক রসনাশাস্ত্রের এক নীতি—এক সূত্র। এই সূত্র-বলে সুসভ্য ইংরেজের নিকট শুক্তি-মাতা Shell-fish; মণ্ডুকভোজী অসভ্য সাঁওতাল সম্প্রদায়বিশেষের নিকট ভেকপ্রবর—ঝাঁপকই!

রসনার শাস্ত্রে 'ঝাঁপকই' মৎস্য বা যাহাই হউক, প্রাণীতত্ত্ববিদের বিচারে মৎস্য সমাজে উহার স্থান নাই। বয়ঃপ্রারম্ভে মৎস্যজাতির সহিত ভেকপর্য্যায়স্থ প্রাণীর (Batrachians) কতক সাদৃশ্য থাকিলেও বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত উহারা এরূপ ভাবে রূপান্তরিত হইয়া যায় যে, তখন ভ্রমেও উহাদিগকে আর মৎস্য বলিয়া মনে হয় না। বেঙাচি ত জল ডিঙ্গাইয়া ডাঙ্গায় উঠিলেই 'চারি পেয়ের' দলে মিশিয়া সভ্য-ভব্য হইয়া যায়; তিমি, শিল, শুশুক, কুম্ভীরাদি জল-জন্তু, যাহারা আজীবন জলে জীবন কাটায় তাহারাও মৎস্য নামের অধিকারী নহে। ইহাদিগের

আকৃতি-প্রকৃতি প্রকৃত মৎস্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বায়ুস্তরবাসী প্রাণীর মধ্যে আমাদিগের ও পক্ষী জাতির সঙ্গে যেরূপ সম্বন্ধ ইহাদিগের মধ্যেও তদনুরূপ। কুম্ভীরাদি জলজন্তুগণ আমাদিগের ন্যায় বায়ুস্তর হইতে, উহাদিগের মস্তকস্থিত ছিদ্র (spiracles) দ্বারা ফুস্‌ফুস্ সাহায্যে শ্বাস গ্রহণ করে। এই জন্য উহাদিগকে প্রায়ই জলোপরিভাগে মস্তক উত্তোলন করিতে দেখা যায়, কিন্তু মৎস্যগণ বায়ুস্তরের কোন ধার ধারে না। মৎস্য জাতির শ্বাসযন্ত্র ফুস্‌ফুস্ নহে,—ফুলকা (gills)। ইহারা মুখগহ্বর বারিপূর্ণ করিয়া ফুল্‌কার সাহায্যে বারি হইতে বায়ু শুষিয়া শ্বাস গ্রহণ করে ও ফুল্‌কা-সন্নিহিত ছিদ্রপথে ব্যবহৃত বারি বহির্গত করিয়া দেয়। অনেকেই পুষ্করিণী প্রভৃতি স্রোতহীন জলাশয়ের জল বিকৃত বিবর্ণ হইলে, তৎস্থিত মৎস্যগণকে গা ভাসাইয়া এইরূপে মুখগহ্বর দ্বারা জল গ্রহণ করিতে দেখিয়াছেন। আমরা ইহাকে মৎস্যের জল-চিবান বলি, বস্তুতঃ ইহারা জল চিবায় না। বিকৃত বারি-নিহিত বায়ু, মৎস্যের শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুপযোগী হইয়া পড়ে বলিয়া ইহাদিগকে বায়ু-সন্নিহিত জলোপরিভাগে উঠিয়া আসিতে বাধ্য হইতে হয়। আমরা সাধারণে, ইহাদিগের শ্বাসগ্রহণ প্রণালী অবগত না থাকায় শ্বাস-চেষ্টাকে জল-চিবান বলিয়া ভ্রম করি। বেচারীরা এত চেষ্টা করিয়াও প্রাণরক্ষা করিতে পারে না কারণ আমরা যেরূপ ফুস্‌ফুস্ সাহায্যে জলরাশি হইতে তন্মধ্যস্থ বায়ু গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ, তেমি ইহাদের ফুল্‌কা ও সিক্ত না থাকিলে একবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। এইজন্য অধিকাংশ মৎস্য জল হইতে উঠাইলে শ্বাস রুদ্ধ হইয়া প্রাণ হারায়। ইলিশ প্রভৃতির ফুল্‌কা এত শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায় যে উহারা উপরে উঠালেত অনতি-বিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পক্ষান্তরে শিঙি, মাগুর প্রভৃতি মৎস্য স্থলেও বহুক্ষণ জীবিত থাকে। এই জাতীয় মৎস্যের ফুল্‌কা সহজে শুষ্ক হয় না। ইহাদিগের ফুল্‌কার সহিত ইযাড়িং জবার পাপড়ির আকারের আর একটি ভিন্ন অংশ আছে। উহা স্পঞ্জের ন্যায় বহুছিদ্র বিশিষ্ট ও জলশোষণক্ষম। মাগুরাদি মৎস্য এই জলকোষের সাহায্যে ফুল্‌কা সিক্ত রাখিয়া স্থলে বহুক্ষণ জীবিত থাকিতে পারে। আনাবস (anabus) প্রভৃতি আর এক জাতি সামুদ্রিক মৎস্যের ফুল্‌কা আর্দ্র রাখিবার ব্যবস্থা অতি চমৎকার। ইহাদিগের চুয়ালের নিম্নে কতকগুলি কোষ দৃষ্ট হয়। এই কোষগুলি যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিস্তি; ভিস্তিমুখ ফুল্‌কায় গিয়া যুক্ত হইয়াছে। ইহারা স্থলে উঠিবার পূর্ব্বে কোষগুলি জলপূর্ণ করিয়া লয় ও অনায়াসে স্থলপথে বিচরণ করে। এই জাতীয় পার্চ (climbing perch) মৎস্য নাকি স্থলে উঠিয়া বৃক্ষারোহণ পর্য্যন্ত করে।* আমাদিগের দেশের কইয়ের বৃক্ষারোহণ সত্য না হউক, কাদম্বিনীর আহ্বান-উল্লাসে আত্মহারা হইয়া স্থলাভিযানের সাধটী ইহাদিগের পূর্ণ-মাত্রায় বর্ত্তমান। বর্ষণের সহিত যেই মেঘ গুরু গুরু গর্জ্জিলেন, অমি কইকুল কানে হাঁটিয়া কাতারে কাতারে স্থলে উঠিতে লাগিল। ভ্রমণে কইয়ের বিরক্তি নাই। বৃষ্টির পর দেখ সরিৎ সরোবরহীন প্রকাণ্ড প্রান্তরের মধ্য-দেশে কই কানে কাতরাইয়া কাতরাইয়া মহানন্দে চলিয়াছে; কই মাছের শ্বাসবন্ধ হইবার ভয় নাই। ইহাদিগের ফুল্‌কার উপরিভাগ একখণ্ড পাতলা চর্ম্মে আচ্ছাদিত, উহাই ইহাদিগের জলকোষ। ইল জাতীয় মৎস্য আরও সৌখীন। ইহারা ভালমন্দ ফলমূলটা আস্বাদন করিতে স্থলে উঠিয়া আসে; কন্‌কনে শীত পড়িলে শুষ্ক ঘাসের মধ্যে শয়ন করিয়া গরমে আরামে প্রাণের সুখে নিদ্রা যায়।† ইহাদিগের ফুলকাসন্নিহিত ছিদ্র অতি অপ্রশস্ত ও এত দীর্ঘকাল আর্দ্র থাকে যে ইহারা স্থলপথে সহস্রাধিক মাইল অতিক্রম করিয়া জলাশয়ান্তরে

* They have, connected with the gill chamber, a special cavity in which a labyrinthiform memberance is arranged so as to retain water to supply the gills while the fish leaves the water and travels about on land or even climbs trees. Webster's—I. Di.

† Abertus Magnus.

গমনাগমন করে।* মৎস্যের স্বভাব ভেদে ফুল্কার আকার ও অবস্থান ভিন্ন। কোন জাতীয়ের বা মস্তক পার্শ্বে কাহারও বা মস্তক নিম্নে উহা অবস্থিত ও কণ্ঠ পার্শ্ব দিয়া বরাবর মুখ গহ্বরের উপরিভাগ পর্য্যন্ত লম্বমান। সাধারণতঃ যাহাকে আমরা মৎস্যের কান (operculum) বলি তাহা উচ্চ করিয়া ধরিলে, অতি কোমল উপাস্থিনির্ম্মিত যে রক্তবর্ণ ঝালরের ন্যায় পদার্থ দৃষ্ট হয়, উহা মৎস্যের শ্বাসযন্ত্র ফুলকার একাংশ।

ফুল্কার সাহায্যে শ্বাস গৃহীত হইলে আমাদিগের ন্যায় মৎস্যেরও হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। হৃদপিণ্ডের শোণিত শোধিত হইয়া শিরা উপশিরা দ্বারা দেহাভ্যন্তরে সঞ্চারিত হয়; তবে ইহাদিগের শোণিত বায়ুবাসী জীবের শোণিতের ন্যায় উষ্ণ নহে, শীতল এবং হৃদপিণ্ডও এক কক্ষ বিশিষ্ট।† আদিযুগে জীব যেরূপ হৃদযন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহাদিগের হৃদপিণ্ডের আকার অদ্যাপিও প্রায় তদ্রূপই রহিয়াছে, উন্নত জীবের হৃদপিণ্ডের ন্যায় উহা দ্বিভাগে বিভক্ত হইবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। পণ্ডিতগণের মতে, এই হিসাবে মৎস্য জন্তুগণের আদি অবস্থার অনুকৃতি।‡ আমাদের ন্যায় সাধারণের এ কথা সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। মৎস্যের অবস্থান জন্তুর প্রাণোপহারক জলে, ইহারা পদহীন, পাখনাসর্ব্বস্ব নাসিকা, স্কন্ধহীন, উভয় জাতির মধ্যে সাদৃশ্য অতি অল্প। অল্প ঠিক, তথাপি বিভিন্ন জাতীয় মৎস্যের আকৃতি-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে ইঁহাদিগের সুযৌক্তিক বাক্যের প্রতিবাদ করিবার উপায় থাকে না। মনস্বীগণের কল্পনাবান্ জ্ঞান চক্ষে যাহা সহজে পতিত হয় আমরা শত চেষ্টা করিয়াও তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই না। নিত্য জীবনে কত পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া শিশুকে বৃদ্ধ করিতেছে, ডিম্ব—জীবে, বীজ - মহামহীরূহে পরিণত হইতেছে; সকলি চক্ষের সম্মুখে কোথায় দিয়া কিরূপে ঘটিতেছে, আমরা তাহার কোনটী বা লক্ষ্য করিতে পারিয়াছি। আর এই জীবজগতের পরিবর্ত্তন যুগ-যুগান্তের। জ্ঞান চক্ষু ব্যতীত চর্ম্মচক্ষে উহা পতিত হইবার নহে। জীব সেই আদি কাল হইতে জীবনসংগ্রামে জীবন রক্ষা করিবার জন্য বংশানুক্রমে যুঝিতেছে। শক্তিবৎসল বিশ্বরাজও জীবকুলকে জীবনসংগ্রামে নিক্ষিপ্ত করিয়া নিশ্চিন্ত নহেন। যে জীব সে সংগ্রামে যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইতেছে, তিনিও তাহাদিগের গতিমতি অভ্যাস অবস্থা অধিকার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া উহাদিগকে উপযুক্ত পুরস্কারে পুরস্কৃত করিতেছেন, অনুপযুক্তের অধিকার কাড়িয়া লইতেছেন। ফলতঃ ক্রমোন্নতি বলে জীবের যন্ত্র, অস্ত্র, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিমার্জ্জিত, বর্দ্ধিত ও উন্নত হইতেছে, এক উৎস হইতে শত সরিৎ সৃষ্ট হইতেছে, এক জীবপর্য্যায় হইতে শত জীব অস্তিত্ব লাভ করিতেছে। তাহার কেহ বা উন্নত, কেহ কেহ বা অসংস্কৃত অবস্থায় নিষ্প্রভ, মলিন। এই নিয়মে মৎস্য জাতির মধ্যেও এত বিভিন্নতা। এক জাতির মৎস্য যেরূপ উন্নত, অন্য জাতি তদ্রূপ নহে। যে, যে অঙ্গের যে বৃত্তির যত অনুশীলন করিয়াছে, যে যেটীর জন্য সংগ্রাম করিয়াছে, সে অন্যের অপেক্ষা সেটীতে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বে কয়েক জাতীয় উভয়চর মৎস্যের বিষয় উক্ত হইয়াছে। ইহাদিগের শ্বাসযন্ত্র

---

* Some fishes provided with gill opening so narrow that the water moistening the gills cannot readily evaporate, and endowed, besides, with an extraordinary vitality, like many Siluroid eels &c. are enable to wonder for some distance overland and thus may reach a water course leading them 1000 of miles from their original home. Encyclopaedia Bri. Vol. XII.—page 670.

† Fish breathes by means of gills, and not by true lungs, has a single, instead of a double, heart circulating cold instead of warm blood.

‡ With respect to the double heart of the quadruped, there was a time during its developement, when its heart equalled in simplicity that the fish, the division of it into two cavities not taking place until its progress to maturity is considerably advanced. The fish then, in these respects, may be said to constitute the primary model on which the quadruped is formed.—J. S. Bushman's Ichthyology.

অন্যান্য মৎস্য হইতে কত উন্নত। ইহারা ফুল্‌কার সাহায্যে শ্বাস গ্রহণ করিলেও, ফুস্‌ফুস্‌ বিশিষ্ট জীবের অধিকারে অধিকারী। ইহাদিগের পাখনাও স্থল ভ্রমণের উপযোগী। আরবসাগরবাসী গবি মৎস্যের কর্ণপার্শ্বস্থ পাখনা এরূপ অনুশীলিত যে উহা প্রায় খুরুপদে পরিণত। গড়ই, চ্যাঙ্গ, ন্যাটা (টাকি) প্রভৃতি মৎস্যগণের পুচ্ছ ও কর্ণসন্নিহিত পাখনা খুব পুষ্ট, ইহারা উহার সাহায্যে লম্ফ প্রদান করিয়া স্থল ভ্রমণে সমর্থ। কই মাছের কর্ণপার্শ্বস্থ তীক্ষ্ণ কণ্টক পদের অভাব পূরণ করিয়াছে। এইরূপ যুগযুগান্তের অনুশীলন ফলে, ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া মৎস্যের ক্ষুদ্র নগণ্য পাখনা ক্রমে সরিসৃপগণের পদে পরিণত হইয়াছে, কালে উহা আবার পরিপুষ্টি লাভ করিয়া পক্ষীদিগের পক্ষে ও পরিশেষে হস্তী গণ্ডারাদি বৃহৎ জন্তুর চলৎশক্তি বিষয়ক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পরিণত হইয়াছে।* কি পরিবর্ত্তন! পরিবর্ত্তন শুধু পাখনায় পর্য্যবসিত নহে, সমগ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গে--সুতরাং সমগ্র জীব জগতে। জগতের পরিবর্ত্তন-প্রসঙ্গ বর্ত্তমান প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক, আমরা কেবল মৎস্য জাতি হইতে উন্নত কতিপয় সরিসৃপের কথা উল্লেখ করিব। সালামান্ডারিয়া ব্যাঙফেবিয়া জাতীয় সরিসৃপগণ এখনও একবারে মৎস্যকে ছাড়াইতে পারে নাই, কোন কোন বিষয়ে উভয় জাতির মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়া গিয়াছে। মৎস্যের ন্যায় ইহাদিগেরও প্রধানতঃ জলে বাস; শ্বাসযন্ত্র ফুস্‌ফুস্‌ নহে—ফুল্‌কা ও ফুস্‌ফুস উভয়ই! কুম্ভীরাদি ইহাদিগের অপেক্ষা উন্নত হইলেও উহাদিগের শ্বাসযন্ত্র ঠিক ফুস্‌ফুস নহে—ফুল্‌কা ও ফুস্‌ফুসের মাঝামাঝি! বেঙাচী বাল্যে মৎস্যের ন্যায় পাখনাসর্ব্বস্ব কিন্তু জলে বাস,—শ্বাস ফুল্‌কার সাহায্যে; মধ্য অবস্থায় শ্বাস—ফুল্‌কা ও ফুস্‌ফুস্‌ উভয়েই; পরিশেষে ইহারা বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত একেবারে স্থলবাসী। পাখনা তখন পদ ও শ্বাসযন্ত্র ফুস্‌ফুস! শিল, শুশুক প্রভৃতির পশ্চাৎ পদে অদ্যাপিও পাখনার সাদৃশ্য বর্ত্তমান। কতিপয় সামুদ্রিক মৎস্যের শল্কের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে, কূর্ম্মের কঠিন পৃষ্ঠাবরণ শল্কের পূর্ণ পরিণতি বলিয়া মনে হয়। গো ও অষ্ট্রেসিয়ন (ostracion) মৎস্যের পৃষ্ঠাবরণ প্রায় কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় দৃঢ় ও সংযুক্ত। মৎস্য ও জীবকঙ্কালের মধ্যেও যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে; উভয়বিধ প্রাণীরই প্রধান কঙ্কালাশ্রয় মেরুদণ্ড! জন্তুর মেরুদণ্ডের ন্যায় মৎস্যের মেরুদণ্ডও কসরুকার সমষ্টি! কি আভ্যন্তরিক যন্ত্রে অস্ত্রে—কি বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে জীবজগতে পরস্পরের সহিত সর্ব্বত্রই এইরূপ একটা প্রাকৃতিক সাদৃশ্য অনুধাবন করিয়া কি মনে হয় না,--ভগবানের পরিবার কি বিশাল, কিরূপ বিস্তৃত! এক মহাপ্রাণই আধারে আধারে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া, একই নিয়মে, একই নীতিতে সমগ্র জগৎ সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন। অবতার রহস্যে আদিদেব যেমন মৎস্য হইতে কূর্ম্মে, কূর্ম্ম হইতে বরাহে উপনীত হইয়া বিশ্বলীলা সমাপন করিয়াছেন; জীবাধারেও তিনি তদ্রূপ করিতেছেন। (অবতার রহস্যকে কবির কল্পনা বলিতে হয় হউক্, কিন্তু সে কল্পনা কি মহান্; ঋষির অন্তর্দৃষ্টির কি বিরাট উদাহরণ!) কি সমদৃষ্টি! প্রাণারাম যেন ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ জীবে অধিষ্ঠান থাকিয়া তাহাদিগকে পালন করিয়া আত্মরক্ষায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহার জগতে যেখানেই অভাব, সেইখানেই অনুশীলন-প্রবৃত্তি,—অমি অভাব পূরণের ব্যবস্থা! মৎস্য জাতিতে ইহার উদাহরণ আমরা লক্ষ্য করিতেছি। জল ত মৎস্যের প্রাণ! অথচ অধিকাংশ মৎস্যই কেবল দেহের গুরুত্বে জলে বাস করিতে অসমর্থ। ইহাদিগের কঙ্কালের ভার জল হইতে অনেক বেশী; চর্ম্ম ও মাংসেরও

* And it is in the highest degree interesting to notice, in how very slow and progressive a manner these small and simple fins of the fish rise through the insignificant legs of some reptiles, to the more perfect and available wings or legs of birds, and thence, ultimately, to the sturdy members of the rhinoceros and Elephant.

Sir william Jardines Naturalist's, History—Vol. XXXV.

Introduction—Page—56.

তাহাই। সুতরাং মৎস্যের দেহাভ্যন্তরে গুরুত্বনাশী কোন বস্তুর ব্যবস্থা না থাকিলে, ইহাদিগের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অস্থি তাহার ব্যবস্থা! এই জন্য মৎস্য-কঙ্কালাদির গুরুত্ব অনুযায়ী মৎস্যদেহে বারি অপেক্ষা লঘুতর তৈলাক্ত পদার্থের (fat) এত আধিক্য। মৎস্যদেহের আপেক্ষিক গুরুত্ব ইহাদিগের বাসোপযোগী জলের আপেক্ষিক গুরুত্বের তুল্য। বাচা, ইলিশ, চিতল প্রভৃতি গভীর জলবাসী মৎস্যের তৈলাধিক্য সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। সমুদ্রের তিমি জলজন্তু (Cetaceous animal) হইলেও এই নিয়মের বশবর্ত্তী; তিমির লবণাক্ত গুরু জলে বাস, দেহও বিশাল, অস্থির গুরুত্বও তদ্রূপ; তাহার দেহে চর্ব্বির অংশও তদনুযায়ী। একটি তিমির তৈলে একটি ছোটখাট চর্ব্বি বাতির কারখানায় একাধিক দিবসের খোরাক! একটি হাঙ্গরের চর্ব্বিতে সাত আটটি পিঁপে পূর্ণ হইয়া যায়! কিন্তু মৎস্যাদির দৈহিক গুরুত্ব তৎ বাসোপযোগী জলের আপেক্ষিক গুরুত্বের তুলনায় তুল্য হইলেও ইহারা নিরাপদ হইতে পারে না। আপেক্ষিক গুরুত্বের সমতায় বস্তু সমগুরু-জলে অবস্থিত হয়। মৎস্যকে একই স্থানে থাকিতে হইলে, তাহার বড় বিপদ। আত্মরক্ষা ও আহার-প্রচেষ্টায় ইহাদিগকে সর্ব্বদাই উত্থান নিমজ্জন করিতে হয়। এক দৈহিক বলের সাহায্যে ইহাদিগের উত্থান নিমজ্জন সম্ভব কিন্তু জীব কতক্ষণ অঙ্গচালনা করিতে পারে! অধিকক্ষণ অঙ্গসঞ্চালনে প্রাণীকে অবসন্ন হইতে হয়; সুতরাং সর্ব্বকাল-ব্যাপী শক্তির বিরুদ্ধে জীবদেহে এমন একটি ব্যবস্থা থাকে, যে বিনা চেষ্টায় উহার কার্য্য হয়। মৎস্য দেহে আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ন্ত্রক এইরূপ একটি যন্ত্র ব্যবস্থিত হইয়াছে। মৎস্যের ফোঁপড়া বা বায়ুস্থলী (Air or swim bladder) এই যন্ত্র। বায়ুস্থলী ঝিল্লি নির্ম্মিত ও মেরুদণ্ডের নিম্নে অবস্থিত। মৎস্যগণ যদৃচ্ছা বায়ুস্থলীর সঙ্কোচন প্রসারণ দ্বারা দেহায়তনের হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারে।* আয়তনের সহিত উত্থান নিমজ্জনের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। তরল পদার্থ নিহিত বস্তুর আয়তন দ্বারা যে পরিমাণে তরল পদার্থ (Displace) প্রস্থিত করিতে পারে তরল পদার্থের উর্দ্ধগামী শক্তিও (Upward pressure) তদনুযায়ী উহাকে মাধ্যাকর্ষণ মুক্ত করে। মৎস্যগণ বায়ুস্থলী সাহায্যে আবশ্যকমত দেহায়তন কম বেশী করিয়া অনায়াসে যদৃচ্ছা উচ্চে নিম্নে বিচরণ করে। সকল প্রকার মৎস্যের বায়ুস্থলী আবার এক প্রকারের নহে; যাহার যেরূপ আবশ্যক, তাহার তদ্রূপ। পুঁটি, চাঁদা, পিউলী প্রভৃতি ক্ষুদ্র মৎস্যের বায়ুস্থলী এক কক্ষ বিশিষ্ট ও সাধারণ ধরণের; উহা অতি অল্প শক্তিতে সঙ্কুচিত প্রসারিত হয় কিন্তু বোয়াল, আইর, ভেটুস গাগর (কাউনিয়া) প্রভৃতি বৃহৎ মৎস্যের বায়ুস্থলী দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট এবং আহারনালী (Gullet) কিম্বা পাকস্থলীর সহিত সংযুক্ত। কতকগুলি সামুদ্রিক মৎস্যের বায়ুস্থলী বহু শাখা বিশিষ্ট; কাহারও বা একটি বৃহৎ কোষের মধ্যে আর একটি ক্ষুদ্র কোষ সমন্বিত। মৎস্যের অবস্থান ও অভ্যাসানুসারে বায়ুস্থলী মধ্যস্থ বাষ্পেরও বিভিন্নতা। লবণাক্ত গুরুজলবাসী সামুদ্রিক মৎস্যের বায়ুস্থলী গুরু অঙ্গারক বাষ্পে পূর্ণ, স্বচ্ছসলিলা নদী সরিৎবিহারী মৎস্যগণের বায়ুস্থলী লঘু যবক্ষারযান বাষ্পে স্ফীত। ইহারা (স্নায়ু মণ্ডল বা) মাংসপেশী সাহায্যে বায়ুস্থলীর বাষ্প সঙ্কোচন ও নিষ্কাষণ করিয়া দেহায়তনের হ্রাস বৃদ্ধি করে কিন্তু এ সত্যে উপনীত হইতে হইলে একটি সমস্যায় ঠেকিতে হয়। মৎস্য মৃত্যুর পর ভাসমান না হইয়া নিমজ্জিত হয়। ইহাদিগের বায়ুস্থলীর বায়ু সকল সময় সমভাবে তুল্য পরিমাণে বর্ত্তমান থাকিলে ইহারা নিমজ্জিত না হইয়া উর্দ্ধগামী শক্তি (Buoyancy) প্রভাবে মৃত্যুর পর ভাসমান হইবার কথা, কিন্তু মৃত মৎস্য অন্যান্য জীবের ন্যায় স্ফীত বিকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত ভাসমান হয় না!

* Most fishes have an air-bladder below the spine which is called the swimming bladder. The fish can compress or dilate this at pleasure by means of a muscular effort and produce the same effects *i. e.* it can rise and sink in water Ganot's Natural Philosophy.

মৃত মৎস্যদেহ স্ফীত হইয়া উহা পূর্ব্বকথিত প্রাকৃতিক নিয়ম বলে ভাসিয়া উঠে, ইহা কখনই বায়ুস্থলীর কার্য্য নহে। যথার্থই এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে হইলে বলিতে হয়;—মৎস্য, বায়ুকোষস্থ বাষ্প মাংসপেশী সাহায্যে সঙ্কোচ মাত্র করে না, উহারা বায়ুস্থলী সঙ্কোচন করিয়া মুখগহ্বর দ্বারা বায়ু বহির্গত করিয়া দেয়। ইহাতেও আর এক সমস্যা, ইহারা নিমজ্জন কালে যেন বায়ু ত্যাগ করিয়া নিম্নগামী হইল, কিন্তু উথিত হইবার সময়ে কিরূপে পুনঃ বাষ্প সংগ্রহ করিতে পারে। জল বিভাগের নিম্নস্তরে লঘু বাষ্পের নিতান্ত অসদ্ভাব। জলাংশে অঙ্গারক বা যবক্ষারযান বাষ্প নাই। অন্যভাবে উহা থাকিলেও উহা পরিমাণে এত অল্প যে তদ্দ্বারা মৎস্যের উত্থান ক্রিয়ার সাহায্য হইবার নহে। এমতাবস্থায় মৎস্যগণ বহির্দেশ হইতে বাষ্প সংগ্রহ করে বলিয়া মনে হয় না। ইহাদিগের দেহাভ্যন্তরে কোন যান্ত্রিক-ব্যবস্থা আছে যৎ সাহায্যে ব্যয়িত বাষ্পে ইহাদিগের পরিপূরিত হয়। জীব দেহে রস-পিত্তাদি যেমন রক্ত হইতে স্বাভাবিক দৈহিক নিয়মে (Secretion) উৎপন্ন হয়, (মৎস্যের বায়ুস্থলীস্থ) বায়ুও তদ্রূপ প্রকরণে হইয়া থাকে। এ যুক্তির বিরুদ্ধে বলিবার আছে। বাষ্প, রস, পিত্তাদির মত দেহজ পদার্থ নহে। দৈহিক নিয়মে বায়ু উৎপন্ন হইতে পারিলে জীবকে শ্বাস প্রশ্বাস জন্য বহির্দেশ হইতে বায়ু সংগ্রহ করিতে হইত না। এই তর্কের বিরুদ্ধে প্রসিদ্ধ প্রাণীতত্ত্ববিদ চাণ্টার বলেন "বায়ুমণ্ডলস্থ বায়ুর সহিত মৎস্যের বায়ুকোষের বাষ্প তুলনীয় নহে। উহা বিশুদ্ধ অম্লযান বা অঙ্গারক নহে। জীবদেহে ধাতু ও মৌলিক পদার্থগত উপাদান বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে; উহা হইতে জীবের জীবন ধারণোপযোগী যৌগিক পদার্থের নিয়ত সৃষ্ট হইতেছে, সে স্থলে এই নিয়মে বাষ্প উৎপন্ন হইবার বাধা কি।" ডাঃ মনরো (Monro) বলেন, ' মনের গতির পরিবর্ত্তনে জীবদেহে স্বাভাবিক দৈহিক নিয়মে যেরূপ অশ্রু ও ঘর্ম্ম উৎপাদিত হয়, এই বাষ্পও তদ্রূপ হইয়া থাকে। তাঁহার মতে মৎস্যের বায়ুকোষে এক প্রকার মাংসল রক্তবর্ণ পদার্থ আছে, উহার সাহায্যে রক্ত হইতে এই বাষ্প উৎপন্ন হয়।*, বহু তর্কবিতর্কের পর ডাঃ মনরোর মত পণ্ডিতসমাজে গৃহীত হইয়াছে। মিঃ রেও (Ray) মৎস্যের বায়ুকোষ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি মৎস্যের বায়ুস্থলী ছিদ্র করিয়া দিয়া দেখিয়াছেন, উহারা একবারে উত্থান নিমজ্জনে অসমর্থ হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান সময়ে কড্ মৎস্য শীকারে এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, ইহাতে মৎস্যের জীবন নাশ হয় না অথচ পলায়নাক্ষম হইয়া ধৃত হয় ও যে স্থানে ইচ্ছা উহাদিগকে রাখা যায়। কর্দ্দমবাসী মৎস্যগণ ইহার অন্যতম প্রমাণ, উহাদিগের বায়ুস্থলী নাই, উহাদিগের উত্থান অতি আয়াসসাধ্য। নিতান্ত আবশ্যক হইলে উহারা মেরুদণ্ডের ও পাখনার সাহায্যে সন্তরণ করে। কর্দ্দম মধ্যে সর্পের ন্যায় মেরুদণ্ড কসরুকার সঙ্কোচন প্রসারণ দ্বারা বুকে হাঁটে।

পাখনা মৎস্যের সন্তরণ ক্রিয়ার প্রধান সহায়। বায়ুস্থলী বলে ইহারা ঊর্দ্ধে বা নিম্নগা হইয়া পাখনার সাহায্যে যে দিকে ইচ্ছা গমনাগমন করে। মৎস্যপুচ্ছ তরণীর কর্ণের সহিত তুলনীয়। উদর ও পূর্ব্ব পাখনা দ্বারা ইহারা দেহ সমভাবে সমসূত্রে রাখিতে সমর্থ হয়। কর্ণ ও কণ্ঠপার্শ্বস্থ পাখনা দ্বারা ক্ষেপণীর ন্যায় জল ঠেলিয়া ইহারা সম্মুখ দিকে অগ্রসর হয়। এতদ্ব্যতীত গতি পরিবর্ত্তন, আত্মরক্ষার পক্ষে পাখনা মৎস্যের অদ্বিতীয় সুহৃদ। আমরা প্রবন্ধের বিস্তৃতি ভয়ে প্রত্যেক পাখনার বিবরণ না দিয়া মৎস্য বিশেষে উহা কিরূপ বর্দ্ধিত ও পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহার কতিপয় উদাহরণের উল্লেখ করিব মাত্র। সমুদ্রের উড়ুক্কু মৎস্যের নামের সহিত সকলেই পরিচিত। ইহারা জল স্থলে নানা প্রকার শত্রু কর্ত্তৃক উৎপীড়িত, হইয়া ভগবানের দরবারে যুগযুগান্তর ধরিয়া (উড্ডীয়ণ শক্তি লাভ করে) আবেদন পত্র পেশ করিয়া আসিতেছে। উহাদিগের আবেদন নিবেদন বৃথা

*"—That a certain red, fleshy looking substance, which is often found within it (air-bladder) acts in the manner of a gland, and secretes from the blood the air which it contains.—Dr. Monro.

গিয়াছে বলা যায় না। উড়ুক্কু পক্ষ প্রাপ্ত না হইলেও উহাদিগের পাখনা এরূপ ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে যে উহারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শূন্যে অবস্থান করিতে পারে। উহারা উদর-নিম্নস্থ পাখনা বলে উল্লম্ফন প্রদান করিয়া শূন্যে উত্থিত হয় ও পৃষ্ঠ পার্শ্বের পাখনা পক্ষীর ন্যায় প্রসারিত ও সঞ্চালিত করিয়া সেই শক্তিকে সঞ্জীবিত রাখে। উড়ুক্কুর পাখনা পক্ষীর পলকের ন্যায় বায়ুকোষ সমন্বিত না হওয়ায় উহারা বায়ু বিতাড়নে নবশক্তি লাভ করিতে পারে না; সুতরাং উহারা পক্ষীর উর্দ্ধে উঠিতে অক্ষম। নিম্নে আরও একটী মৎস্যের পরিচয় প্রদত্ত হইল। ইহাদিগের কর্ণপার্শ্বস্থ পাখনা অদ্ভুত ভাবে বর্দ্ধিত। ইহারা নিউজিল্যাণ্ড সন্নিহিত সাগরে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। নদ নদীর সমুদ্র-সঙ্গম স্থলে খুব খরস্রোতে ইহাদিগের বাস। ইহারা প্রায়ই উজানে চলে। ক্রমাগত উজাইতে উজাইতে ইহাদিগের পাখনা অনুশীলিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহাদিগের দৃষ্টিশক্তি অতি তীক্ষ্ণ ও অক্ষিগোলক প্রায় মস্তকের উপরে অবস্থিত। আমাদিগের দেশের উড়ল (খরসোল্লা) মৎস্য সম্বন্ধেও এ কথা প্রযুয্য। উড়লের উন্নত চক্ষু ও উজাইবার ক্ষমতা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন! ইহারা যেমন অনুশীলন ফলে উন্নতচক্ষু,—অনুশীলন অভাবে আবার কোন কোন মৎস্যকে চক্ষুরত্ন হারাইতে হইয়াছে। কয়েক প্রকার সামুদ্রিক মৎস্য একবারে অন্ধ। সমুদ্রের অতি নিম্নে আলোকরশ্মি হীন স্তরে উহাদিগের বাস। অনবরত অন্ধকারে বাস করিয়া উহারা ঠিক অন্ধ হইয়া গিয়াছে। আর এক প্রকার মৎস্যের উভয় চক্ষুই মস্তকের এক পার্শ্বে। ইহাদিগের দেহ নিতান্ত অপরিসর, সুতরাং ইহারা সোজা হইয়া সাঁতার না দিয়া কাত্‌ হইয়া চলে। ইহাদিগের এক পার্শ্ব অনবরত আলোকাভিমুখে ও অপর পার্শ্ব নিয়ত অন্ধকারে থাকায় চক্ষুর এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।* ইহাদিগের গাত্রের উভয় পার্শ্বের বর্ণও বিভিন্ন; আলোক-উন্মুক্ত পৃষ্ঠ উজ্জ্বল,—অপরটী ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ। মৎস্য-সমাজে বাহ্যেন্দ্রিয়ের বিপর্য্যয়ে এরূপ পরিণতি (ও) বিকৃতির উদাহরণ অসংখ্য। ইহা ব্যতীত অবস্থা-ভেদে মৎস্যদেহে কত নব নব যন্ত্র অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে। আইর, বোয়াল প্রভৃতির দাড়া অদ্বিতীয় স্পর্শ যন্ত্র। উহার সাহায্যে ইহারা দশ বার হস্ত দূরের বস্তুর অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে। সামুদ্রিক শীকারি মৎস্যের (Angler) দাড়াকে বিদ্যুৎ বলে। ইহারা যে কোন ক্ষুদ্র জীবের দিকে দাড়া সঞ্চরণ করে, তাহাকেই আকর্ষিত হইয়া ইহাদিগের উদরে প্রবিষ্ট হইতে হয়। আর এক জাতি মৎস্যের (Sword fish) ঠোঁট তরবারির আকার ও তদ্রূপ তীক্ষ্ণ। অপর জাতির ঠোঁট করাতের ন্যায়। ইহারা অনায়াসে লৌহপাত আচ্ছাদিত জাহাজের তলা বিদীর্ণ করিয়া ফেলে। রিমরা জাতীয় (Remora or Sucking fish) মৎস্যের শোষণশক্তি অতি অদ্ভুত। শোষক মৎস্য পর্ব্বত-গাত্রে ইহাদিগের দেহস্থ শোষণযন্ত্র সংলগ্ন করিয়া এরূপ ভাবে বায়ু শোষণ করে যে কোন-ক্রমেই ইহাদিগকে স্থানচ্যুত করা যায় না। সুপ্রসিদ্ধ রোমক গ্রন্থকার ও নৌ সেনাপতি Pliny Augustus Caesar এর সহিত Marc Anthonyর নৌ সমরে পরাজিত হইবার প্রধান কারণ, এই মৎস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহারা য়্যাণ্টনীর সময় তরণীর গতি রোধ করিয়া তাহাকে বিপদগ্রস্ত করিয়াছেন। Cain's Caliguta কেও নাকি ইহাদিগের দৌরাত্ম্যে বিজয় শ্রী হারাইতে হইয়াছিল।†

* In the flat fishes both eyes are on the same side of the head, either the right or the left, always on that which is directed towards the light, * * "E B."

† Caius Plinius Secundus' Historia Naturalis. Translated by HOLLAND.

কবি এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন :—

> " The Sucking-fish beneath, with secret chains,
> Clung to the keel, the swiftest ship detains.
> The seamen run confused, no labour spared,
> Let fly the sheets, and hoist the top-mast yard.
> The master bids them give her all the Sails
> To court the winds and catch the coming gales.
> But though the convass bellies with the blast,
> And boisterous winds bear down the cracking mast,
> The bark stands firmly rooted on the sea,
> And. will, unmoved, nor winds nor waves obey ;
> Still, as when calms have flatted all the plain,
> And infant wanes scarce wrinkle on the main.

কবির বর্ণনা অতিরঞ্জিত হইলেও একেবারে মিথ্যা নহে। Mr. Pennet লিখিয়াছেন, এইরূপ একটি মৎস্য একটা অর্দ্ধ মণ ভারী পিঁপে চুষিয়া ধরিয়াছিল, তিনি মৎস্যের পুচ্ছ ধরিয়া ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলেও উহা পিঁপে পরিত্যাগ করে নাই।

মৎস্যের বাক্‌শক্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ সন্দিহান। কোন মৎস্যকেই সুস্পষ্ট রব করিতে শুনা যায় না। আমাদিগের দেশের টেঁপা (Globe fish) জাতীয় ভুল, ভেদা, গাগর প্রভৃতিকে এক প্রকার অস্পষ্ট শব্দ করিতে শুনা যায়। অপিচ জীবজগতের বীজগত প্রকৃতি আলোচনা করিলে মৎস্যজাতিকে একবারে শব্দযন্ত্র হীন বলিতে ইচ্ছা হয় না। জীব আদিকাল হইতে আদিরসে অভিভূত হইয়া শব্দ ও অঙ্গভঙ্গী দ্বারা সঙ্গিনীকে আকৃষ্ট করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। এখনও যৌবন সমাগমে কতকগুলি কীট পতঙ্গ সহসা মুখরিত হইয়া উঠে। মৎস্য জাতিকে একবারে এ প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত বলিতে সন্দেহ হয়। তাহাদিগের অস্ফুট শব্দ বাক্যযন্ত্রোচ্চারিত না হইলেও হইতে পারে কিন্তু ইহারা যে অন্য যন্ত্র সাহায্যে ইচ্ছামত শব্দ করিতে সমর্থ, তাহা নিঃসন্দেহ। শিঙি স্থলে উঠিয়াও এক প্রকার 'কট্ কট্' শব্দ করে। বর্ষাসমাগমে মৎস্যেরা যখন 'পীর' লাগে অর্থাৎ সন্তান ধারণ কাল উপস্থিত হয়; তৎকালে ইহারা অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠে ও দলে দলে পরস্পর আক্রমণ অনুগমন করে। পূর্ব্ব-বঙ্গে পীরের মাছ মারিবার বড় ধুম। ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিয়াছি, ইহারা মৎস্যের শব্দ শুনিতে কিন্তু এ শব্দ শব্দযন্ত্রোচ্চারিত কি পাখনার শব্দ, তাহা বলা কঠিন। আমাদের দেশে প্রবাদ, 'মাছের নাই মেছে, গাছের নাই গেছে।' বলা বাহুল্য শিক্ষিত মহাশয়গণ কেহই ইহা স্বীকার করেন না।—'মাছের মার পুত্র শোক নাই।' আমাদিগের দেশের আর একটি প্রবাদ। এ প্রবাদে পণ্ডিতগণও সায় দেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মাত্র দুই জাতির মৎস্য সন্তান পালন করে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদিগের দেশের মৎস্যের মধ্যে আরও কয়েকটা উদাহরণের দৃষ্ট হয়। শৌল, গজার (শাল) টাকী প্রভৃতি মৎস্যগণ সন্তান স্বাবলম্বী হইবার পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত পালন করে। ইহারা 'পোনা'র সহিত ঘুড়িয়া বেড়ায় ও শত্রু সম্মুখীন হইলে আক্রমণ করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। শৌলের অপত্যস্নেহ অবলম্বনে—"শৌল গজারের পোনা, যার যার মতো সোনা।" মেয়েলী ছড়ার সৃষ্টি! মাতার নিকট সুরূপ কুরূপ পুত্র উভয়ই তুল্য। আইর, ভেটস প্রভৃতি শল্কহীন কয়েক জাতির মৎস্যকে সন্তান পালন করিতে দেখা যায়। এই সময়ে ইহাদিগের গাত্রে এক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ জন্মে। সন্তানগণ মাতার চিক্কণ দেহ লেহন করিয়া জীবন ধারণ করে। এই প্রকার মৎস্যজননীকে 'পোনাচাটা' মাছ বলে; পোনাচাটা মাছ স্বাদ হীন! চিতল মৎস্য ডিম্ব সংরক্ষণে প্রাণপণ করে। কয়েক প্রকার সামুদ্রিক মৎস্য ডিম্ব প্রসব না করিয়া একবারে সন্তান প্রসব করে। এই সন্তান প্রসবকারীগণের (Vivipara) উদরনিম্নে একটি থলিয়া দৃষ্ট হয়। ইহারা, সন্তান-

গণ সম্পূর্ণ চলনক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত থলিয়ায় রাখিয়া পালন করে। এই প্রকার আরও দুই চারিটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। বিশাল মৎস্যজাতির তুলনায় ইহাদিগের মধ্যে অপত্যরক্ষীর সংখ্যা এত অল্প যে উহাতেই উক্ত প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। মৎস্য জননী নির্ব্বিকার নির্লিপ্তভাবে ডিম্ব প্রসব করিয়া খালাস, সন্তানগণও জন্ম মাত্র মরিয়া পড়ে অধিকাংশেরই মাতার সহিত সাক্ষাৎ লাভ ঘটে না। এইরূপে অকালে অর্দ্ধাংশের বেশী মৎস্য-শিশু কালকবলে পতিত হয়। অসংখ্য যদুবংশ বলিয়া আমরা তাহা অনুভব করিতে পারি না। দূরদর্শী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মৎস্যশিশুর অকালমৃত্যু লক্ষ্য করিয়া ইহাদিগের বংশলোপের ভয়ে ভীত হইয়াছেন ও উহাদিগের সংরক্ষণকল্পে বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। আমরা মৎস্যলোলুপ বাঙ্গালী, আমাদিগকে মৎস্য শোকে অধীর করিতে পারে নাই!

শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

স্বরলিপি।

মিশ্রমল্লার—রূপক।

ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।
ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন, বিরহ দারুণ,
সঘন খরশর হন্তিয়া।
কুলিশ শত শত, পাত মোদিত,
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী, ডাকে ডাহুকী
ফাটী যাওত ছাতিয়া।
তিমির দিগ ভরি, ঘোর যামিনী,
অথির বিজুরীক পাঁতিয়া!
বিদ্যাপতি কহে কৈছে গোঁয়ায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া।

কথা—কবি বিদ্যাপতি। সুর—কবি ভানুসিংহ।

স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

১´ ২ ৩ । ১´
II রা রা –া I রা –া | রা রা | রগা –রগমা মা |
ভ রা • বা • দ র মা• ••• হ

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
মা –গা | রগরা সা | রা –মা মা I পা –ধা | র্সা র্ণধা | পা –ধা পা I
ভা • •দ• র শূ • ন্য ম • ন্দি র• মো • •

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
–মা –গা | –রগরা –সা | মা –পা পা I না না | নধা না | র্সা –না র্রা I
• • ••• র ঝ • ম্পা ঘ ন •গ র জ ন্ তি

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
র্সর্সা –না | র্সা র্সা | না র্সা রা I র্রা র্জ্ঞা | র্রা র্সা | নর্সা নর্সর্রা র্সা I
স•• ন্ ত তি ভু ব ন ভ রি ব রি •খ ••• তি

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
[মা -পা]
ণর্সণা –া | –ধা –া | { মপা –া ধা I ধণর্সা ণধা | পা ধা | ণা ণা রা I
রা•• • • • কা ন্ ত •পা• •• হ ন বি র হ

২ ৩ [পা] ১´ ২ ৩ ১´
র্সর্সা –ণা | ধা পমগা } | ধা পা মা I মজ্ঞা জ্ঞা | রা সা | রা –পা মা I
•দা• • রু •ণ• স ঘ ন খ র শ র হ ন্ তি

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
পা –া | –া –া | মা পা র্সা | র্সা না | না না | সা –মা মা I
রা • • • কু লি শ শ ত শ ত পা • ত

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১
গমা –পা | পা পা | পা ধা পা I ধা –া | ধা ণা | ধণা –র্সা না I
মো• • দি ত ম য়ূ র না • চ ত মা• • ত্তি

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
না –র্সা | –ধা –ণা | ণা র্সা না I র্সা –া | র্সা মা | মা পা মা I
রা • • • ম য়ূ র না • চ ত ম য়ূ র

২ ৩ ১ ২ ৩ ১
পা –া । পা পা । পা ধা পা I ধা –া । ধা ণা । ধণা –র্সা না I
না ০ চ ত ম য়ূ র না ০ চ ত মা০ ০ তি

২ ৩ ১ ২ ৩ ১
র্সা –া । –ণধা –পমা । মা –ধা ধা I ধর্সা –ণধা । পা ধা । ণা –া র্রা I
য়া ০ ০০ ০০ ম ০ ত্ত ০দা০ ০০ দু রী ডা ০ কে

২ ৩ ১ ২ ৩ ১
র্সর্রর্সা –ণা । ধা পা । পধা –পা মা I জ্ঞমা –জ্ঞা । রা সা । রা –পা মা I
০ডা০ ০ ডু কী ফা ০ টী যা০ ০ ও ত ছা ০ তি

২ ৩ ১ ২ ৩ ১
পা –া । –া –া । মা পা পা I ধা পা । মা পা । ধা –র্সা র্সা I
য়া ০ ০ ০ তি মি র দি গ ভ রি ঘো ০ র

২ ৩ ১ ২ ৩ ১
–ধা –পধপা । মপা মজ্ঞা । জ্ঞা জ্ঞা রজ্ঞমা I রা রা । সন্ সা । রা –পা মা I
যা ০০০ মি০ নী০ অ থি ০০র বি জু ০রি ক পাঁ ০ তি

২ ৩ ১ ২ ৩ ১
পা –া । –া –া । মা –পা না I না না । নধা না । র্সা –না র্রা I
য়া ০ বি দ্যা প তি ০ক হে কৈ ০ ছে

২ ৩ ১ ২ ৩ ১
র্সা না র্সা র্সা । না নর্রা র্সা I ণর্সণা –ধা । পা মগা । মা –গা গধা I
গোঁ য়া য় বি হ রি০ বি ০০নে ০ দি ন০ রা ০ তি০

২
পধপা –মগা । –রগরা সা II
০য়া০

তালের বোল

২ ৩ ১
I র্সর্রা র্সণা । ধপা মগা । সা গা মা I
খাজা গজা পাঁপড় ভাজা তিন্ তিন্ থাক্
ধুম্ কেটে গদি ঘেনে তা ধুন্ না

প্রাণের প্রেরণায়।

—:-*-:—

ফিজিদ্বীপ-প্রবাসী ভারতীয় নারীর দুর্গতি মোচনা প্রচেষ্টায়, আমরা অষ্ট্রেলিয়ার নারীহৃদয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হইতেছি।—অষ্ট্রেলিয়ার নারীগণ নারীর সম্মান, সতীত্ব-গৌরব অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য যে রূপ 'উঠিয়া পড়িয়া' লাগিয়াছেন, তাহা কেবল উদার অকৃত্রিম, সজীব প্রাণের পক্ষেই সম্ভব। কি বেদনায়, অনুভূতির কি তীব্র আলোড়নে তাঁহাদের হৃদয়প্রাণ মথিত হইতেছে.—তাহা মারার বাড়া আমরা, কল্পনায় আনিতেও অক্ষম! সত্য বলিতে গেলে, আমরা এতদিন বিদেশীয় নারীগণকে ভিন্ন চক্ষে দেখিতেই অভ্যস্ত হইয়াছি। মুখে যাহাই বলি না কেন, শিক্ষাকে আমরা নারীজীবনে কলঙ্কের সহিত তুলনা করিয়া আসিতেছি। যে দেশের বাণী চিরশুভ্র, সর্ব্বকলঙ্কমুক্ত—বীণা-রঞ্জিত পুস্তক হস্তে—সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার জননী, জ্ঞান-পীযূষে প্রাণ দায়িনী, আমরা সে দেশের সন্তান হইয়াও, বিশ্বাস করিতে পারি নাই—শিক্ষাই প্রাণ,—বিশ্বকে এক তন্ত্রীতে বাঁধিবার একমাত্র উপায়। সমপ্রাণতার কেন্দ্রই ঐ শিক্ষা—একমাত্র জ্ঞানদার বরই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা দানে সমর্থ! নানা প্রতিকূল অবস্থা আমাদিগকে এতদিন জড়, স্বাস্থ্যহীন করিয়া রাখিয়াছে, আলস্য তন্দ্রায় আমরা কেবল অতীত আত্ম-গৌরবের স্বপ্নে বিভোর হইয়া প্রকৃত বস্তু তুলনায় আনিতে পারি নাই, অবিরত নিষ্পেষিত হইয়া আমরা বেদনা-বোধহীন—নিবোধা,—আমরা নিজের দুঃখ, বেদনার স্থান নিরূপণ করিতে অসমর্থ,—আমাদের নিজেদের অভ্যন্তর ভাগই আমাদের নিকট আত্ম-জ্ঞান অভাবে অপরিচিত,—আমরা বুঝিব পরের ব্যথা!

সময় সুযোগ সমুপস্থিত, এই মহাজাগরণের দিনে আমাদের রুদ্ধ দ্বারও বিশ্বজননীর সস্নেহ করস্পর্শে ধন্য হইয়াছে,—এই দুর্দ্দশার দিনে তাঁহার আশীর্ব্বাদ আমাদের মরণোন্মুখ প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করিয়া অমরত্ব দানের জন্য উৎসারিত হৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছেন! এই সুযোগ, আদান-প্রদানের,—বুঝিবার ও বুঝাইবার এই মাহেন্দ্রক্ষণ! স্বদেশ-বিদেশ ভুলিয়া, মহামানবকে উপলব্ধি করিবার এই উপযুক্ত অবসর, নিজের দেশের—জগতের উপকারে আসিয়া, মনুষ্যজন্ম ধন্য করিবার দিন আসিয়াছে! অন্ধের মত অন্যের প্রদর্শিত পথ ধরিয়া চলিবার কথা নহে,—পরের মুখে এ-বড়, ও-ছোট ভাবিবার সময় আর নাই, ইংলণ্ড বলিতেছে—অতএব ওটা বেদ বাক্য। অষ্ট্রেলিয়া প্রাণের আবেগে আমাদিগকে কোল দিতে চাহিতেছে তাহাকে মুগ্ধ হইয়া আলিঙ্গন কর—সে হৃদয় প্রবৃত্তির খেলাও নহে,—গোঁড়া বলিতেছে 'ছি ছি বিদেশীর মন্ত্রণায় মুগ্ধ হইবে'—সে গোঁড়ামীর ভাড়ামীও নহে। বাহিরের কোলাহল, আড়ম্বর—ছিঃ—ডুবিয়া যাক্—নিজের প্রাণ খুঁজিয়া লও—সমাহিত হইয়া ভাবিয়া দেখ, তোমার প্রাণ কোথায়,—শুভ সাধনা সফল হইবে! হৃদয়ের তারে, অতি সাবধানে—খুব সংযত ভাবে ঝঙ্কার দিয়া কান পাতিয়া শুন—তাহাতে তোমার প্রাণের তান ঝঙ্কৃত হয় কিনা। পরের সঙ্গীতে মুগ্ধ হইও না,—কেবল পরের নিকট শিখিয়া লও প্রণালী কি। তাহাদের প্রাণশক্তি তাহাদের কণ্ঠে অনুভব করিয়া—অনুভূতিকে জাগ্রত কর, আপনার অনুভূতিকে প্রসারিত করিয়া ধারণায় আন—আত্ম-প্রাণকে, বিশ্বপ্রাণকে, আত্মাকে!

আজ যে অষ্ট্রেলিয়া, ভারতীয় কুলীনারীর দুঃখ দুর্গতিতে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন—তাহা কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে নহে—প্রাণের প্ররোচনায়,—তাঁহাদের তৃষিত আত্মাকে তৃপ্ত করিতে। সে ঐকান্তিক-আগ্রহ, একাগ্র, অবিচলিত, ফলপ্রসূ নিশ্চিত! অষ্ট্রেলিয়ার নারী শক্তি তাই, ফিজির স্বার্থান্ধ ব্যবসায়ীদিগের প্রবল শক্তিকে বিচলিত, বিক্ষুব্ধ, ভীত করিতে সমর্থ হইয়াছে। ব্যবসায়ীরা 'শাক দিয় মাছ ঢাকিতে' চাহিতেছে।

ভারতীয় কুলির প্রতি তাহাদের অত্যাচার-অবিচার-কাহিনী অতি তীব্র ভাষায় অষ্ট্রেলিয়ান সংবাদপত্রে আলোচিত হইতেছে;—ব্যবসায়ীগণ বুঝাইতে চাহিতেছে 'সংবাদপত্রের ও-আক্রমণ কেবল তাহাদিগকে নহে,—ফিজিগভর্ণমেণ্টকে! এই উপায়ে ব্রিটিশ-শক্তিকে দুর্ব্বল করিবার জন্য ভারতীয় এক সম্প্রদায়ের কারসাজি মাত্র।' ফিজির চিনিকরগণ অষ্ট্রেলিয়ান বাসী ও ভারতবাসীকে অতি হীন ভাবে চিত্রিত করিয়া, বিপথগামী বালকের মত নিজে যে অপরাধে অপরাধী তাহা অন্যের স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া সাফাই গাহিতেছে। রাজশক্তি যে কেবল আব্দারে ছেলের মাতৃশক্তি নহে, সে যে সমগ্র প্রজার পালয়িত্রী - রক্ষয়িত্রী,— মূঢ় বণিকগণ স্বার্থান্ধ হইয়া তাহা ভুলিয়া গেলেও রাজা-প্রজার নিত্য সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইবার নহে। যে সম্বন্ধে—যে দাবীর মর্যাদা রক্ষা করিতে এত দিন ভারতগভর্ণমেণ্ট তাহাদের কার্য্যের প্রতিবাদ না করিয়া বরং সহায়তাই করিয়াছেন, অন্ততঃ বাহ্যতঃ দেখিয়া তাহাই মনে হইয়াছে, গভর্ণমেণ্টের উপর ভারতবাসীরও সে দাবী সম্পূর্ণ বর্ত্তমান—এবং তাহাদেরও সে দাবী গভর্ণমেণ্ট কোন দিন অগ্রাহ্য করেন নাই। 'প্রজার মঙ্গল' রাজার ধর্ম্ম—এই ধর্ম্মে লক্ষ্য রাখিয়াই ভারতীয় দরিদ্র প্রজার দুইটী অন্ন সংস্থানের জন্য সরকার বিদেশে কুলি চালানের সহায়তা করিয়াছিলেন, এই আমাদের বিশ্বাস। মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের যে সম্বন্ধ, স্বার্থান্ধ হইয়া মানুষ যে তাহার অবমাননা করিতে পারে, এ সমস্যা হয় ত তখন গভর্ণমেণ্টের মনে উঁকি দেয় নাই! এখন প্রত্যক্ষ প্রমাণে তাহা গভর্ণমেণ্টকে বুঝিতে হইয়াছে, সরকার চুক্তিবদ্ধ কুলির চালান সম্প্রতি বন্ধ করিয়াছেন।

তথাপি নির্লজ্জ চিনিকরগণ আন্দোলনে বিরত হয় নাই। তাহারা ফিজির প্রত্যেক কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিকে কার্য্য করাইতে বাধ্য করিবার জন্য, ফিজিগভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছে। যুক্তি তাহাদের অতি অদ্ভুত—"এই দুঃসময়ে কাহারও অলসভাবে বসিয়া থাকিবার অধিকার নাই।" সত্যই ত বণিকদের ধনবৃদ্ধির জন্য অন্যে খাটিতে বাধ্য—সবল সুস্থ দেশী বসিয়া থাকিবে—আর কুলি অভাবে তাহাদের কারখানা বন্ধ হইবে—এও কি হইতে পারে! 'খাটা' অর্থে তাহাদের ক্ষেত্রে কাজ করা, অন্য স্থানে অন্য কাজ বোধ হয় অকাজ! এমন সুযুক্তির সারবত্তা কিন্তু কলোনিয়ান সেক্রেটরী উপলব্ধি করিতে পারেন নাই! তিনি বলিয়াছেন "যে-ব্যক্তি কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক, তাহাকে রাজশক্তি প্রয়োগে কার্য্যে বাধ্য করিতে তিনি অক্ষম। মূঢ় বণিকগণ স্বার্থের খাতিরে মানবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে পদদলিত করিতে চাহিলেও, রাজশক্তি, এ যুগে, তাহা পারেন নাই। প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিমাত্রই অবশ্য লক্ষ্য করিতেছেন জনসঙ্ঘের মধ্যে এমন একটা মহাপ্রণতা—পরস্পরের মধ্যে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে এমন একটা সহানুভূতি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে, যাহাকে সকলে মান্য করিতে বাধ্য—তাহাকে উপেক্ষা করিবার শক্তি কাহারও নাই। তাহা অবজ্ঞাত হইলে মনুষ্যসমাজের মঙ্গল অবজ্ঞাত হইবে। স্বার্থান্ধ চিনিকরগণ এই নিত্য সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও দূরদর্শী গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টিতে তাহা এড়ায় নাই। স্বাধীনতায়, সমতায়, শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, মানবাত্মার এই স্বাভাবিক দাবী অতি স্পষ্টভাবেই গভর্ণমেণ্টের চক্ষে প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে—তাহার অবমাননা সরকার করেন নাই,—করিতে পারেনও না! মহামানবের মঙ্গল সাধনের এই ঐকান্তিক ইচ্ছা—মানবের জন্য মানবের এই নিঃস্বার্থ নিরাবিল প্রাণের আবেদন--'শরীর পতন কিম্বা মন্ত্র সাধন' যাহার মন্ত্র,—'স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়' যাহার ধর্ম্ম, তাহার অদ্ভুত প্রভাব, প্রবল পরাক্রান্ত শাসন-শক্তির কি অবিদিত! ইতিহাসে এ প্রাণ-শক্তির প্রভাব জ্বলন্তভাবে চিত্রিত! যুগে-যুগে দেশে-দেশে যখনই এই অকৃত্রিম প্রাণের বেদনা, পরদুঃখে কাতরতা, চেতনা, প্রাণকে আকুল করিয়াছে, তখনই দেশীকে কর্ম্মস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। শাক্যের অন্তরাত্মা যখন, অমৃত

করিলেন—জগতের দুঃখকষ্ট যখন তাঁহার মানস-নয়নে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়া ধন ঐশ্বর্য্য বিষয় বিভবাদির অনিত্যতা সুস্পষ্টরূপে তাঁহার উপলব্ধিতে আসিল—তখন কোথায় রহিল অর্থাদির মাদকতা, মহাপ্রাণে সমবেদনার সুর ঝঙ্কৃত হইতেই সংসারের সম্পদ-মোহ, ভোগেচ্ছা অতল তলে ডুবিয়া গেল—রাজপুত্র সন্ন্যাসী, মানবের কল্যাণের জন্য আত্ম-সুখ-ত্যাগী যোগী! পরমহংসদেব যখন আত্মায়-আত্মায় কামিনীকাঞ্চনের অসারত্ব অনুভব করিলেন তখনি মনের তেজে ঐকান্তিক সত্যানুরাগের প্রবল প্রভাবে দেহ পর্য্যন্ত ভীত হইয়া গেল, সেই হইতেই রজতস্পর্শ-মাত্র তাঁহার দেহ পর্য্যন্ত আড়ষ্ট হইত!

এই প্রকার অকৃত্রিম প্রাণশক্তির সাক্ষাৎ লাভ ঘটিয়াছে আমাদের মহাত্মা গান্ধি ও তাহার সহধর্ম্মিণীতে,—তিলকাদি কতিপয় জননায়কে,—অষ্ট্রেলিয়-নারীসঙ্ঘের নেত্রী ষ্টিড্ওয়ার্থী, ডিক্সন, প্রিষ্ট্ প্রভৃতি নারীতে। প্রাচ্য প্রতীচ্য আজ কত কাল কার্য্যকারণে ওতপ্রোতভাবে মিলিতে-মিশিতে বাধ্য হইয়াছে কিন্তু একের হৃদয় অন্যের জন্য স্পন্দিত হইয়াছে কমই; সত্যতার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে বলিতে হয়,—শ্বেত ও কৃষ্ণাঙ্গের সহিত মনেরও একটা কিম্ভুত-কিমাকার সম্বন্ধের রাজ্য। জাতিগত (racial) অহঙ্কার এতদিন মহামানবসঙ্ঘকে উপেক্ষা করিয়াই আসিয়াছে, হেয় স্বার্থের অন্ধকার-বিঘোরে যাহারা দৃষ্টিহীন, তাহারা এখনও আলোক অভাবে নিত্য বস্তুর সত্বা উপলব্ধি করিতে অপারগ হইয়া ছার বর্ণমোহে 'হামবড়' ভাবিয়া পূজা পাইবার জন্য আজও বৃথা চীৎকার করিতেছে! অগ্রসর অসমর্থ পঙ্গুগণ আজও জানিতে পারে নাই—জগতে এই নবযুগ কি মহাপরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে। শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ সমস্তই এক সহানুভূতির স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে; সার্ব্বভৌম প্রেম-পুষ্ট একটি প্রাণ জগতের গৌরব—এ যুগে সেই সাত্বিক প্রাণ-ধর্ম্মের প্রেরণায় শত মহাত্মা বিশ্বমানবের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হইতে অপেক্ষা করিতেছেন। মানবের দ্বারা মানবের অবমাননা, তাঁহারা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছেন না। এক দিন ভারত-প্রাণের যে শুদ্ধ-সত্ত্ব প্রেমশক্তির অনন্যমনা আরাধনায়, নর-নারায়ণ ও জীবের,—এমন কি স্থাবরজঙ্গমের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিয়া মনুষ্যত্বকে দেবত্বে পরিণত করিয়া-ছিলেন, যে শক্তির অভাবে ভারতের আজ এ পতন, সেই বিশ্বপ্রেমের উন্মেষ প্রাচ্যের অষ্ট্রেলিয়ায় দেখা দিয়াছে। তথাতেও বিরোধী নাই, এমন নহে, কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ায় যে বিশ্বপ্রেমাঙ্কুর উদ্গত হইয়াছে তাহাতে একদিন অমৃত ফল লাভ হইবে তাহা নিশ্চিত। পাঠক পাঠিকা, শান্তিনিকেতনের মহাত্মা মিঃ এণ্ড্রুজের নামের সহিত অপরিচিত নহেন। তিনি ইংরাজ হইলেও সহানুভূতির আকর্ষণে ভারতের। তিনি, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ফিজি প্রভৃতি বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া বিদেশ-প্রবাসী ভারতীয় কুলীর অবস্থা পরিদর্শন করিয়াছেন। এই সকল দেশের অনেক-গুলিতেই তথাকার প্রবাসী কর্ত্তৃক ভারতবাসীকে অতি হীন চক্ষে দেখা হয় ও তাহাদের প্রতি বণিকদের আচরণ অমানুষিক কিন্তু এই বিষে-বিষে অমৃত উত্থিত হইবার, অতি ঘৃণ্য অসহ্য ব্যবহার দেখিয়া মানুষের মনে মানুষের জন্য সহানুভূতি উদ্রেক হইবার দিন উপস্থিত হইয়াছে, আজ অষ্ট্রেলিয়ানগণ যে ফিজির বণিকগণের ব্যবহারের তীব্র প্রতি-বাদ করিতেছেন সেও এই বিষের অমৃতে! হৃদয়বৃত্তি তাঁহাদের একবারে বদলাইয়া গিয়াছে। মিঃ এণ্ড্রুজ "মর্ডাণ রিভিউ" পত্রে লিখিয়াছেন, সে দিন তিনি যে জাহাজে ভারতবর্ষে ফিরিতেছিলেন, তাহাতে ছয়টি অষ্ট্রেলিয়ান যুবক তাঁহার সহযাত্রী ছিল, ইহারা যন্ত্রশিল্পী (mechanics) ও শিঙ্গাপুরের যাত্রী। পথি মধ্যে ডাচ অধিকৃত সেলি-বিস দ্বীপের ম্যাকাসার নগরীতে জাহাজ ভিড়িল। প্রায় সকলেই সহরভ্রমণে তীরাবতরণ করিলেন। রাত্রে মিঃ এণ্ড্রুজের সহিত, সেই যুবকগণের একটির সাক্ষাৎ হইবামাত্র, বলিল "মিঃ এণ্ড্রুজ, আজ এখানে আমরা এমন একটি দৃশ্য দেখিলাম, যাহা জীবনে কখন দেখি নাই। সেটা এমনি অদ্ভুত, যদি চিঠিতে আমার নাকে সেটার বিষয় লিখি, তিনি কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করিতে পারিবেন না।

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মিঃ এণ্ড্রুজ জিজ্ঞাসা করিলেন "কি সেটা" যুবক বলিল "কি আশ্চর্য্য! দেখিলাম এই দ্বীপবাসীরা শ্বেত মনুষ্যপুঙ্গবগণকে রিক্স না কি একটা গাড়ীতে চড়াইয়া সহরময় টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছে, সাহেববাও তাদের প্রতি ঘোড়া বা ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করিতে একটুও লজ্জা বোধ করিতেছে না। ভাবিয়া দেখুন ত গাড়ী হাকানের কি উৎকট দৃশ্য? না না অমন গাড়ীতে চড়া আমাদের কর্ম্ম নয়, কথনই হইতে পারে না—আমি যে অষ্ট্রেলিয়ান!"

খাঁটি প্রাণের খাঁটি কথা! ইহা ব্যতীত এ-প্রাণে অন্যভাব প্রতিধ্বনিত হওয়া অসম্ভব। তিন সপ্তাহ পরে মিঃ এণ্ড্রুজের যখন আবার সিঙ্গাপুরে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "কি? আপনি কি একবার রিক্সতে চড়িয়াছেন।" যুবক তীব্রভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিল "সে কি! আমি রিক্সাতে চড়িব!—আমি যে অষ্ট্রেলিয়ান!"

এমন প্রাণের জন্য ভূমিত্ব লাভ করিয়া অষ্ট্রেলিয়া স্বর্গ।

অষ্ট্রেলিয়ানদের শুভ ইচ্ছায় শুভ ফল প্রসব করিতেছে। তথাকার সাধারণতন্ত্রেও সাদা-কালোর ভেদ রক্ষণ নাই। তাঁহারা ভারতবাসীকে অনেক বিষয়ে তাঁহাদের তুল্য অধিকার দানে প্রস্তুত। তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতীয় ছাত্র গ্রহণে দ্বিধাহীন ও তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দান করিতে ইচ্ছুক। অষ্ট্রেলিয়া প্রাণের প্রেরণায় ভারতকে আপনারভাবে গ্রহণ করিতে উদগ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। জননায়কগণ সেগুলি আলোচনা করুন। এ মাহেন্দ্রক্ষণ যেন উপেক্ষিত না হয়—একবার গেলে সহজে ফিরে কি আর।

জা।—

দূর্ব্বা।

—:*:—

দীনতার দুহিতা গো বিনয়ের বনিতা,
নমি' তব চরণে—অয়ি পদদলিতা!
চরণে দলিয়া যায় অবহেলে ধরণী
আশীষ বরিষ তবু অয়ি শ্যামবরণি!
পদ তলে যায় দলে কতশত কু-জাতে
তবু তুমি লাগ' দেবি দেবতারই পূজাতে!
স্বরগ হইতে নামে ধীরে ধীরে নিশিতে,
শিশির-দেবতা-বালা তব সনে মিশিতে!
তোমারই কোলেতে তারা যাপে নিশি পুলকে!
তোমারই কোলেতে মরে প্রভাতের আলোকে!
সবার নীচুতে থাকি' কে পেরেছে আর গো
—কে বসেছে গৌরবে শিরে দেবতার গো!
তোমার মহিমা হেরি ভাষাহারা কবিতা
দীনতার দুহিতা গো বিনয়ের বনিতা!

"বনফুল"

গ্রেস্‌হামের নিয়ম।

—:✱:—

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, প্রচলিত অর্থের (currency) মধ্যে কাগজের অর্থও চলে আবার ধাতুমুদ্রাও ব্যবহৃত হয়।* একথা এখন সকলেই জানেন যে প্রত্যেক দেশেই একটী বা একাধিক প্রধান ধাতু মুদ্রার (coins) সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি অপ্রধান ধাতুমুদ্রাও (subsidiary coins) চলিয়া থাকে। যেমন আমাদের দেশে প্রধান ধাতু-মুদ্রা টাকা ও গিনি, এবং অপ্রধান ধাতু মুদ্রা আধুলি, সিকি, একআনি, পয়সা ইত্যাদি। প্রধান ধাতুমুদ্রাগুলি অধিকমূল্যের হয় বলিয়া অল্পমূল্যের বিনিময়, দুই চার পয়সার কাজ সুবিধামতো চালাইবার জন্য কতকগুলি অল্প মূল্যের অপ্রধানধাতুমুদ্রার (subsidiary coins) প্রয়োজন।

সাধারণতঃ এই প্রধান ধাতুমুদ্রার মধ্যে হইতেই একটী বা একাধিক ধাতুমুদ্রা legal tender money বলিয়া চলে। কাগজের অর্থ (Paper money) যে legal tender money হয় না তাহা নহে। কিন্তু সকল প্রকার কাগজের অর্থ সব দেশে সকল সময়ে legal tender money বলিয়া চলে নাই, চলেও না। যাহা হউক, সে সব বিস্তৃত আলোচনা সুবিধা পাইলে অন্য সময় করা যাইবে। এখন legal tender moneyর প্রকৃতি কি তাহাই বুঝা যাউক। যে অর্থ legal tender money তাহাদ্বারা যদি ঋণ পরিশোধ করা যায়—সে ঋণ যত বেশী পরিমাণেরই হউক না কেন—তাহা হইলে ওই ঋণ পরিশোধ আইন্ অনুযায়ী চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। মনে করুন, আপনার নিকট হইতে আমি একলক্ষ টাকা ধার করিয়াছি। এখন শুধু একআনি দিয়া যদি আমি এই একলক্ষ টাকার ঋণ শোধ করিতে যাই, তাহা হইলে আপনি উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারেন, এবং দেশের আইন্‌ও তজ্জন্য আপনাকে দণ্ড দিতে পারে না। কারণ একআনি unlimited legal tender money নহে। কাজেই বাধ্য হইয়া আমাকে টাকা অথবা গিনি অথবা গভর্ণমেণ্টনোট্ দ্বারা ওই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। অল্প দেনা পাওনা যদি হয়, তাহা হইলে একআনি অথবা তদ্রূপ অপ্রধান ধাতুমুদ্রা দ্বারা কাজ চলিতে পারে। তাহাতে উত্তমর্ণ বা অধমর্ণ কেহই আপত্তি করেও না এবং করিলেও সে আপত্তি টিকিবে না। Legal tender আইন অনুযায়ী প্রধান মূল অর্থ (standard money) দ্বারা যে কোন পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করা যায়; কিন্তু অপ্রধান অর্থ দ্বারা (subsidiary coins) কেবল নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দেনা পাওনাই মিটান যায়। যেমন যুক্ত রাজ্যে (United States) স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যডলার দ্বারা অনির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করা যায়; কিন্তু অর্দ্ধ-ডলার প্রভৃতি অপ্রধান ধাতু দ্বারা (Subsidiary coins) কেবল ১০ ডলার পর্য্যন্ত দেনা পাওনা আইন্ অনুযায়ী মিটান যাইতে পারে। উহাদ্বারা তদপেক্ষা বেশী ঋণ পরিশোধ করিতে গেলে উত্তমর্ণ আইন্ অনুযায়ী তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য নহে। আবার ওই দেশেই পাঁচসেণ্ট মুদ্রা (Five cent piece) এবং তাম্রসেণ্ট্ দ্বারা (Copper cent) কেবল ২৫ সেণ্ট্ পর্য্যন্ত ঋণ আইন্ অনুযায়ী পরিশোধ করা চলে।

এখন আমরা legal tender moneyর ব্যবহার হইতে যে একটী নিয়ম (Law) আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহারই বিষয় আলোচনা করিব। ইহাকে গ্রেস্‌হামের নিয়ম (Gresham's law) বলে। রাণী এলিজাবেথের বাণিজ্য-বিষয়ক পরামর্শদাতা স্যার্ টমাস্ গ্রেস্‌হাম্ (Sir Thomas Gresham) ১৬শ খৃষ্টাব্দে এই নিয়মটী সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া যান্ বলিয়া ইহা তাঁহারই আবিষ্কৃত নিয়ম মনে করিয়া তাঁহার নামের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া চলিতেছে।

---

* পরিচারিকা ২য় বর্ষ ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই নিয়ম (Law) আবিষ্কারের প্রশংসা তাঁহার প্রাপ্য নহে। তাঁহার বহু পূর্ব্বে পণ্ডিতগণ এই নিয়মের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন; তিনি কেবল সুস্পষ্ট করিয়া বৈজ্ঞানিকভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া যান এইমাত্র।*

গ্রেসহামের নিয়মটী এই :—

যে দেশেই দুই প্রকার legal money (অর্থাৎ যে অর্থদ্বারা ঋণ পরিশোধ আইন্ অনুযায়ী চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই অর্থ) প্রচলিত (in circulation), সেই দেশেই মানুষ খারাপ অর্থদ্বারা বিনিময়ের কাজ চালায়, আর ভাল অর্থ ক্রমশঃ অপ্রচলিত (out of circulation) হইয়া অদৃশ্য হইয়া পড়ে।

হঠাৎ শুনিতে এই নিয়মটি একটী ধাঁধা বলিয়া মনে হয়। অনেকেই হয়তো বলিবেন "মহাশয় চিরকালই তো শুনিয়া আসিতেছি এবং দেখিতেছিও যে, লোকে খারাপ জিনিষটী ত্যাগ করিয়া ভালটী দ্বারা কাজ চালায়, উৎকৃষ্ট যেটী সেইটীই আদর করিয়া রাখে। আপনি আবার একি শুনিয়া ছাড়া নিয়মের কথা আরম্ভ করিলেন! বর্ত্তমানকালে সমাজে শ্রমের স্বাধীনতা ও অবাধ প্রতিযোগিতা আছে। এখন সমাজের ভিত্তি এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যে মানুষ সকল অবস্থাতেই তাহার অভাব সুন্দররূপে পূরণ করিতে পারে এইরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট জিনিষ পছন্দ করিয়া থাকে। তবে অর্থের বেলা কেন মানুষ উল্টা ব্যবহার করিবে?"

অর্থ ও ভোগ্যধনের মধ্যে পার্থক্যটা মনে রাখিলে এই ধাঁধা পরিষ্কার হইবে। দুইটী কমলালেবুর মধ্যে যেটী অপেক্ষাকৃত মিষ্টি তাহাই লোকে ব্যবহার করিতে চাহে, এবং টক লেবুটা পরিত্যাগ করে, ইহা সত্য। কিন্তু অর্থ আমার সোজাসুজিভাবে ভোগের জন্য নহে। তবে উহা ব্যবহার করি কেন? হয়তো বিনিময়ের জন্য দোকানদারকে অথবা বণিককে দিব বলিয়া, নচেৎ ঋণ পরিশোধের জন্য মহাজনকে দিব মনে করিয়া। কাজেই ভাল ও খারাপ এই দুই প্রকার অর্থের মধ্যে যেটা দ্বারাই কাজ সম্পন্ন করি না কেন তাহাতে আমার কিছু আসে যায় না। তবে ভাল অর্থদ্বারা যে কাজটী চলে সেটী যদি খারাপ অর্থদ্বারাও ঠিক একইভাবে চলিয়া যায়, তাহা হইলে খারাপ অর্থ ব্যবহার না করিয়া ভাল অর্থ ব্যবহার করাটা মূর্খতা ছাড়া আর কি? সুতরাং এরূপস্থলে মানুষ ভাল অর্থ হাতে রাখিয়া খারাপ অর্থ দ্বারাই কাজ চালাইয়া থাকে। এখানে একটী কথা মনে রাখা দরকার যে, ভাল ও খারাপ এই দুই প্রকার অর্থেরই সমভাবে কাজ সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। বণিক অথবা মহাজন ভাল ও খারাপ এই দুই প্রকার অর্থই গ্রহণে অস্বীকার করিতে না পারে এরূপ হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ এই দুই প্রকারের অর্থই আইন-সম্মত-চলতি-অর্থ (Legal tender money) হইবে।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে, আইন-সম্মত-চলতি-অর্থের মধ্যে ভাল ও খারাপ দুইরকম থাকিলে ভাল অর্থের পরিবর্ত্তে খারাপটা দিয়া কাজ চলে ইহা না হয় বুঝিলাম। কিন্তু ভাল অর্থ যে অর্থরূপে ব্যবহৃত না হইয়া ক্রমশঃ সরিয়া পড়ে, তাহা যায় কোথায়? ইহা তিন উপায়ে অপ্রচলিত (Out of circulatian) হইয়া পড়ে :—

১। সঞ্চয় (Hoarding)। ২। বিদেশে প্রেরণ (Payments abroad)। ৩। ওজন করিয়া বিক্রয়।

১। সঞ্চয়—মানুষ যখন ভবিষ্যত বিপদের সময়ে ব্যবহারের জন্য, অথবা অনাগত প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখে, তখন বাছিয়া ভাল অর্থ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে, আর খারাপ অর্থ দিয়া বর্ত্তমানের কাজ চালায়, ফরাসী-বিপ্লবের সময় ফরাসী দেশে যাহারা সম্মুখে বিপদ দেখিয়া অর্থ সঞ্চয়ে মনোনিবেশ করিয়াছিল

*এরিষ্টোফেনিসের (Aristophanes) সময়ে যে লোকে এই নিয়মের সহিত পরিচিত ছিল তাহা নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পংক্তি হইতে জানা যায় :—

"Often times we have reflected on a similar abuse
In the choice of men for Office and of coins for common use;
For your old and standard pieces, valued and approved and tried,
Recognized in every realm for trusty stamp and pure assay,
Are rejected and abandoned for the trash of yesterday;
For the vile, adulterate issue, drossy, counterfeit and base,
Which the traffic of the city passes current in their place."
—Aristophanes, "Frogs" lines 717ff.

তাহারা স্বর্ণমুদ্রাই সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখনকার সে দেশের হতাদর কাগজের অর্থ—এ্যাসিগ্ন্যাট্ (assignat) সঞ্চয় করে নাই। এই য়ুরোপীয় মহাসমর আরম্ভ হইবার পর আমাদের দেশেও লোকে টাকা বা গিনি হাতছাড়া করিতে চাহে নাই, গভর্ণমেন্ট-নোট দিয়াই কাজ চালাইয়াছে। আর যাঁহারা বেশী হিসাবী তাঁহারা প্রথম হইতেই টাকার বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা বা গিনি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু ভাল অর্থের অর্থরূপে ব্যবহৃত না হইবার এই কারণটী ক্ষণস্থায়ী।

২। বিদেশে প্রেরণ—দেশের অভ্যন্তরে ঋণ পরিশোধ খারাপ অর্থদ্বারাও যেমন চলিত পারে, ভাল অর্থদ্বারাও ঠিক্ তেমনি ভাবেই চলে। কিন্তু বিদেশের বণিক বা মহাজনকে যদি ধাতুমুদ্রা দিতে হয় তাহা হইলে সে তো আমার জাতীয় মুদ্রা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে না। সে তখন মুদ্রাতে যতটা ধাতু আছে, বাজারদর অনুসারে তাহার যাহা মূল্য হয় সেই হিসাবে উহা গ্রহণ করিবে। কাজেই, যে সকল মুদ্রা ব্যবহার করিতে করিতে অত্যন্ত হাল্কা হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে দেশের অভ্যন্তরে কাজ চালাইবার জন্য রাখিয়া নূতন ভারিমুদ্রারদ্বারা বিদেশের বণিকের বা মহাজনের ঋণ পরিশোধ করাই লাভজনক। এইরূপে ভালমুদ্রাগুলি দেশের 'টাকার বাজার' হইতে সরিয়া পড়ে।

৩। ওজন করিয়া বিক্রয়—যুদ্ধের পূর্ব্বে যখন পুরাণো বড় কাগজের দর ছিল—সের প্রতি দুই আনা, তখন কলিকাতা প্রভৃতি সহরে দৈনিক সংবাদপত্রের কোনো কোনো হিসাবী গ্রাহক তাড়াতাড়ি কাগজখানা পড়িয়া সেই দিনই অর্দ্ধমূল্যে কোনো সংবাদপত্রের ফেরিওয়ালার নিকট বিক্রয় করিয়া দিতেন. ওজন করিয়া পুরাণো কাগজ হিসাবে বিক্রয় করিতেন না। কারণ তখন 'সংবাদপত্র' হিসাবে কাগজখানা বিক্রয় করাই লাভজনক ছিল, কাগজ হিসাবে নহে। এখন পুরাণো বড় কাগজের দর চড়িয়া প্রায় সের প্রতি পাঁচ আনা হইয়াছে। কাজেই এখন আবার সংবাদপত্রখানা প্রতিদিন সংবাদপত্র হিসাবে বিক্রয় করা অপেক্ষা পুরাণো কাগজ হিসাবে বিক্রয় করাই লাভজনক। কলিকাতার উপরে অনেকে এখন এইরূপই করিয়া থাকেন। অর্থের বেলাও ঠিক তাহাই। আমাদের দেশে রূপার টাকার ভিতরে রূপা থাকে প্রায় দশ আনি, কিন্তু প্রত্যেকটী টাকা দেশে কাজ চালায় ষোল আনার। মনে করুন কোনো কারণ বশতঃ যদি রূপার দর এতটা চড়িয়া যায় যে, টাকার ভিতর যতটা রূপা থাকে তাহার মূল্য ষোল আনার চেয়েও বেশী হয় তাহা হইলে লোকে তখন টাকা—টাকা হিসাবে ব্যবহার না করিয়া গলাইয়া ওজনদরে রূপা হিসাবে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিবে। গলাইয়া ওজনদরে টাকা বিক্রয় করিবার বেলা, লোকে সাধারণতঃই ব্যবহার করিতে করিতে যে সকল টাকা অত্যন্ত হাল্কা হইয়া গিয়াছে তাহা না গলাইয়া, নূতন ভারি টাকাই গলাইয়া থাকে। এইরূপে অনেক ভাল টাকা অদৃশ্য হইয়া পড়ে।

নিম্নলিখিত তিন অবস্থাতে গ্রেস্‌হামের নিয়ম পরিলক্ষিত হয় :—

(ক) যখন দেশে ব্যবহার করিতে করিতে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে এরূপ মুদ্রার (coins) সহিত নূতন মুদ্রা (coins) চলিতে আরম্ভ করে, তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, নূতন মুদ্রা ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া পড়িতেছে।

(খ) যখন হতাদর কাগজের অর্থের (depreciated paper money) সহিত ধাতুমুদ্রা চলে, তখন দেশের ভিতরে অর্থের কাজ চালাইবার জন্য কাগজের অর্থই খুঁজিয়া পাওয়া যায় ; ধাতুমুদ্রা ধীরে ধীরে সরিয়া পড়ে।

(গ) যখন হাল্কা মুদ্রার সঙ্গে ঠিক ওজনের মুদ্রা, অথবা শেষোক্ত মুদ্রার সহিত তদপেক্ষা ভারি মুদ্রা চলিতে আরম্ভ করে, তখন হাল্কা মুদ্রা ভারি মুদ্রাকে তাড়াইয়া দেয়। যে দেশে দ্বি-ধাতু পরিমাণ (Bi-metallism) আছে সেই দেশে আমরা এই অবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখিতে পাই।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

কোচবিহার ষ্টেট্ প্রেসে শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও কোচবিহার-সাহিত্য-সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিরহিনী

কুচবিহার রাজ-পুস্তকাগারের প্রাচীন চিত্র হইতে।

(নব পর্য্যায়)
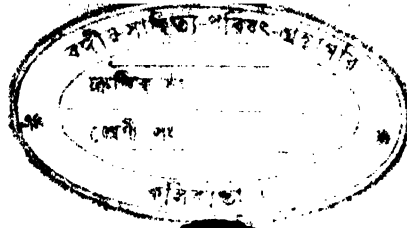
"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।'

২য় বর্ষ। আশ্বিন, ১৩২৫ সাল। ১১শ সংখ্যা।

দিশারী

—:*:—

জনম দিতেছ নবরূপে নবসাজে
জীবন হইতে নবজীবনের মাঝে।
আজিকার ব্যথা আজিকার দুখহাসি,
গভীর প্রাণের গোপন ভাবনা রাশি,
বিনাশ করিছ আপনার হাতে তুমি
আমার আঘাত, আমার সরম-লাজে।

যত চলি তত কেবলি চলার বেগে
সম্মুখে ওঠে নবনব পথ জেগে।
পথ আছে, শুধু পথ আছে, পথ আছে,
তোমার ভুবনে আমার হিয়ার কাছে,
দেখায়ে দিতেছ বারে বারে এ জীবনে
নব নব কালে নব নব ধন রাজে,—
জনম দিতেছ নবজনমের মাঝে॥

শিল্প ও সহজ সাধক।

প্রবাসীর গত বৈশাখ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন—সাধক ভক্ত 'দাদূ'র বাণী অবলম্বন করিয়া যে শিল্প ও সৌন্দর্য্যের রহস্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন এ প্রবন্ধ তাহারি পুনরালোচনা। সত্য শিব সুন্দরের যে সুন্দর ও রসময় রূপটী অনেক জাত্যভিমানী নীরস-অনুষ্ঠান-সর্ব্বস্ব পণ্ডিতে লাভ করিতে পারেন নাই—অনেক শুষ্ক যোগাচারী জ্ঞানকুটীল পন্থানুসারী উগ্রচিত্ত সন্ন্যাসীগণ যে মধুর রূপটীর সন্ধান পান নাই—মুচিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া গৃহী সন্ন্যাসী অশাস্ত্রজ্ঞ ভক্ত কবি 'দাদূ' শুধু হৃদয়ের সাধনাবলে তাহা পাইয়াছিলেন।

জাত্যভিমান আভিজাত্যের গর্ব্ব, জ্ঞানাভিমান ও তপ যোগের অহঙ্কার চির-সুন্দরের সহিত মিলনের অন্তরায়।

সাধক কবি বলিয়াছেন :—

"যেথা অহঙ্কার
ঘৃণাভরে ক্ষুদ্রজনে রুদ্ধ করে দ্বার
সেথা হতে ফির' তুমি।"

ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও তপ ও জ্ঞানে গরীয়ান্ হইয়াও অবশ্য অনেক মহাপুরুষ রসময়ের সন্ধান পাইয়াছেন। তাহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য উক্ত মহাপুরুষগণের জীবনচরিত আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে তাঁহাদের ঐ জ্ঞান ও জাতির অভিমান প্রথমতঃ তাঁহাদের রসসাধনার পরিপন্থী হইয়াছে; পরে তাঁহারা ঐ সকল বাধাকে চরণে বিদলিত করিয়া তৃণাদপি সুনীচ হইয়াছেন এবং চিরসুন্দরের সিংহাসনের ধূলির তলে অপনাদিগকে লুটোপুটি করিয়া তবে তাহার অনুগ্রহপাত্র হইয়াছেন।

এই শ্রেণীর মহাপুরুষদের মধ্যে যাঁহারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাঁহারা চিরসুন্দরের প্রেরণায় চামার-চণ্ডালের সহিত আলিঙ্গন করিয়া ধন্য হইয়াছেন—ধর্ম্মজ্ঞানে যাঁহারা গরীয়ান্ তাঁহারা পাপী ও অধমকে বক্ষে ধরিয়া উদ্ধার করিয়াছেন—যাঁহারা বিদ্যায় দিগ্বিজয়ী ও জ্ঞানে বৃদ্ধ তাঁহারা ফিরিয়া শিশুর মত সারল্য ও অজ্ঞতার বিনয় অবলম্বন করিয়াছেন। যাঁহাদিগকে সকল অহঙ্কারকে নয়নজলে ডুবাইতে হইয়াছে, যাঁহাদিগের উন্নত ও উদ্ধত শীর্ষগুলিকে চিরসুন্দরের চরণধূলির তলে নত করিতে হইয়াছে—তাঁহাদিগকে অতি কঠিন সাধনাই করিতে হইয়াছে—তাঁহাদিগের তুলনায় যে-সকল মহাপুরুষের জাতি ও জ্ঞানের অভিমানের বালাই কোনো দিনই ভাগ্যে জুটে নাই—তাঁহাদের সাধনা অপেক্ষাকৃত সোজা হইয়াছে।

চিরসুন্দরের রসসাধনা শিল্পে আত্মপ্রকাশ করে—এই জন্যই কি জ্ঞানে ও জাত্যংশে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টতর ব্যক্তিগণই শ্রেষ্ঠ শিল্পীর পদ পাইয়াছেন? আমাদের দেশে ত শিল্পসাধনা নিকৃষ্ট জাতিগণেরই একচেটিয়া।

ভক্তপ্রধান দাদূর জাত্যভিমান ও জ্ঞানাভিমানের বালাই ছিল না, রসসাধক শিল্পীদের যাহা প্রধান ধর্ম্ম অর্থাৎ গৃহে রহিয়াও বৈরাগ্য,—তাহাই গৃহসন্ন্যাসী দাদূরও সাধনা ছিল।

ভক্ত দাদূও প্রথমে অসীমসুন্দরকে ভাবের মধ্যে ও ধ্যানের মধ্যে খুঁজিয়াছিলেন কিন্তু তিনি সহজেই নিজের ভুল ধরিতে পারিয়াছিলেন--"কবীরের মত তিনি চক্ষুও বুজিলেন না কানও রুদ্ধ করিলেন না--সৌন্দর্য্যে ও সঙ্গীতে ভরপুর হইয়া পরম আনন্দে চারিদিকে চাহিয়া সুন্দরের রূপ দেখিতে লাগিলেন"—

"আঁখ না মূদূঁ কাণ না রূধূ
কায়া কষ্ট ন ধারূ।

অগল বগল মেঁ হঁস হঁস দেখুঁ
সুন্দর রূপ নেহার।"

ঠিক রবীন্দ্রনাথের :—

"যার খুসি রুদ্ধচক্ষে কর বসি ধ্যান
বিশ্ব সত্য কিংবা ফাঁকি লভ সেই জ্ঞান,
আমি ততক্ষণ বসি নির্ণিমেষ চোখে
বিশ্বেরে দেখিয়া লই দিনের আলোকে।"

ইন্দ্রিয়ের দ্বারগুলি দিয়ে প্রভু অসংখ্যবার বিশ্বের সঙ্গে চিত্তে আসা-যাওয়া করিয়া থাকেন—কবিগুরু তাই বলেছেন :—

"দ্বার রুধি জপিতিস্ যদি মোর নাম
কোন্ পথ দিয়ে তোর চিত্তে পশিতাম।"

দাদু রূপের সাধক হইলেন ও দাদু 'সানী' বা শিল্পরসিক হইলেন।

দাদু ধর্ম্মের বার্থ-আচার পালন করিয়া দেখিয়াছেন তাহাতে অন্তর পূর্ণ হয় নাই—শেষে তিনি ধ্যান জ্ঞান অনুষ্ঠান সব ত্যাগ করিয়া জপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই বিশ্বের রূপে-রূপে আকারে-আকারে যে অনন্তকাল ধরিয়া নাম জপ চলিতেছে—দাদুও সেই জপে যোগ দিয়াছেন :—

"মালা সব আকারকী সাধু সুমিরই রাম
করণী করতে ক্যা কিয়া ঐসা তেরা নাম।"

বর্ষে-বর্ষে, ঋতুতে-ঋতুতে, দিনে-দিনে, নিখিলবিশ্বের দৃশ্যপরিবর্ত্তনের মধ্যে—মেঘে-মেঘে আকাশে-বাতাসে বিশ্ব-শক্তির নিত্যবিনিময়ে—রবিশশী গ্রহতারকার নিঃশব্দ আবর্ত্তনে উদয়-বিলয়ে অসীমসুন্দরের জপমালায় তাঁহার নাম কীর্ত্তন হইতেছে। ভক্ত দাদু এই বিশ্বব্যাপী নাম জপে যোগ দিয়াছেন। শুষ্ক কাঠের বা পদ্ম ও রুদ্রাক্ষবীজের জপমালার মত নীরস নহে। ইক্ষুপেষণচক্রের ঘূর্ণনে যেমন নিয়ত রসস্রাব হয়—এই বিশ্বচক্রের ঘূর্ণনে তেমনি অমৃতরস ঝরিয়া পড়িতেছে—উহা বিশ্বের বর্ণে গন্ধে গানে গুঞ্জরণে নিয়ত আত্মপ্রকাশ করিতেছে :—

"আনন্দের অব্যক্ত সঙ্গীত
ঝরিয়া পড়িছে নামি,—অদৃশ্য অগম
হিমাদ্রিশিখর হতে জাহ্নবীর সম।"

Pythagoras এর music of the spheres এর ন্যায় উহা In Reason's ears they all rejoice আমরা ইহা শুনিতে পাই না—অনুভব করিতে পারি না।

সর্ব্বত্র তোমার গান বিচিত্র গৌরবে
আপনি ধ্বনিতে থাকে সরবে নীরবে।"

তাঁহার ইঙ্গিতময় আনন্দলিপি পড়িতে পারি না। বিমুখ হইয়া বিপরীত মুখে পড়িলে তাঁহার বিশ্বজোড়া আহ্বান-লিপির অর্থ বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু সাধক ভক্তরা ইহা অনুভব করেন এবং ইহাতে মশগুল হইয়া থাকেন।

সেই শিল্পী—যে এই আনন্দে যোগ দিতে পারে,—ভক্তশিল্পীর নিকট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অসীমসুন্দরের নিত্যোৎসব লীলা। ভক্তসাধক এই অসীম মোহন লীলায় নিয়ত মুগ্ধ হইয়া থাকেন—এই মুগ্ধতাই শিল্পের জন্মদান করে।

সায়র সপ্ত মোহে ধরণীধরা
অষ্টকুলা পরবত মেরু মোহে
তিন লোক মোহে জগজীবন
সকল ভবন তেরীসেব মোহে।

ভক্ত বিশ্বভুবনে এই মহানের রূপকে দেখিবার ক্ষমতা কোথা হইতে পাইল ? তাহাকে না জানিলে সে তাহার সন্ধানে যাইতেছে কেন ? সে অসীমসুন্দর ত তাহার অপরিচিত নহে। মোহনের উপাসক সাধক-শিল্পী সেই অমৃতধাম হইতেই আসিয়াছে এবং সেই অমৃতধামেই ফিরিতেছে। সে অমৃতধামের সহিত তাহার পরিচয় আছে এবং সেই ধামের আনন্দামৃতের স্বাদ সে জানে বলিয়াই সে এ সংসারে জড় হইয়া থাকিতে পারে না—নিয়ত সেই ধামের জন্যই আকুল। সে সেই অমৃতধাম হইতে—Trailing clouds of gloryর ন্যায় ভাসিয়া আসিয়াছে সেইখানে, ফিরিবার জন্য তাহার প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতেছে—সে অসীম পথের যাত্রী—সে এ সংসারের অতিথিশালায় রাত্রিবাস করিতেছে মাত্র—তাহার এই ক্ষণিক বিরহ সেই অসীমসুন্দরের রূপবৈচিত্র্য দেখিবার জন্য। ভক্ত দাদূ ভক্তশিল্পীর এই মিলন-ব্যাকুলতা অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"রোম রোম রস প্যাস হৈ
দাদূ করই পুকার
রাখ ঘটা দিল উমগি করি
বরসহু সিরজন হার।
প্রীতিজো মেরে পীরকি
পইঠি পংজর মাহি
রোম রোম পিয় পিয় করই
দাদূ দুসর নাহি।
সব ঘট রসনা সুরতি সোঁ
সব ঘট রসনা বৈন
সব ঘট নৈনা হোই রহই
দাদূ বিরহ ঐন।"

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নানা কবিতায় এই অসীমের জন্য আকুলতা ও বিরহ-বেদনা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার "অচলায়তন" "ডাকঘরে"র বর্ণে বর্ণে এই বেদনা। "আমি চঞ্চল হে—আমি সুদূরের পিয়াসী" ইত্যাদি সঙ্গীতেও এই বিরহের সুর।

ভগবানকে পাইবার জন্য শুধু ভক্তেরই এই আকুল বেদনা নহে—ভক্তকে পাইবার জন্য ভগবানেরও তেমনি আকুলতা। ভক্ত ভগবানকে চাহেন—কিন্তু ভগবান ভক্ত-সম্বন্ধে উদাসীন, তাহা হইলে যে শুধু প্রেম হইত না তাহা নহে, এই বিশ্বের সৃষ্টিই হইত না। ভক্ত ও ভগবানের পরস্পরের সহিত পরস্পরের মিলনাকাঙ্ক্ষাই এই বিশ্বলীলায়

প্রকটিত হইয়াছে। পাওয়ায় যেমন তৃপ্তি আছে দেওয়াতেও তেমনি তৃপ্তি—উৎসর্জ্জনে শুধু গ্রহীতাই আনন্দ পান না—উৎস্রষ্টারও তাহাতে আনন্দ—সর্জ্জনেও স্রষ্টই আনন্দ পান না—স্রষ্টারও আনন্দ। "এই সৃষ্টি যদি একেলা তাঁহার সৃষ্টি হইত তবে কি ইহাতে আমার কোনো আনন্দ হইত? এ সৃষ্টি যে আমারও সৃষ্টি। আমাকে নহিলে তিনি এই সৃষ্টি পাইলেন কোথায়? দুগ্ধ যে বৎসের তৃপ্তি-সুধা তাহার কারণ দুগ্ধ-বৎসেরও সৃষ্টি। বৎস বিনা গাভীর দুগ্ধ হউক দেখি। তাই দুগ্ধ যেমন গাভীর—তেমনি বৎসের, দুগ্ধ দিয়া গাভী যেমন সুখী—দুগ্ধ পাইয়া বৎসও তেমনি তৃপ্ত। বৎসের প্রতি প্রেমেই গাভীর অন্তর রসে ভরিয়া উঠে। আমার প্রতি প্রেম ছাড়াও বিধাতার সৃষ্টি তেমনি অসম্ভব হইত।"

ভক্ত ছাড়া ভগবান—ভগবান ছাড়া ভক্ত অপূর্ণ। সৃষ্টিও অসম্ভব—লীলাও অসম্ভব। Hegel প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা এই আপাতদ্বৈত ভাবটীকেই সকল সৃষ্টি ও সকল জ্ঞানের মূলীভূত কারণ রূপে নির্ণয় করিয়াছেন। অসীম আপনাকে পূর্ণ করিবার জন্য সৃষ্টিচ্ছলে সীমায় আত্মাবচ্ছিন্ন করিয়াছেন—সসীম আপনাকে পূর্ণ করিবার জন্য অসীমের দিকে অনন্তকাল ধরিয়া ছুটিয়াছে।

"আপন স্রোতের বেগে কি গভীর টানে
তোমারে সে খুঁজে পায় সেই তাহা জানে।"

এক-কে ছাড়িয়া যে আরের অস্তিত্ব নাই—বাধ্যবাধক প্রেমের আনন্দই বিশ্বলীলাকে নিয়ত সঞ্জীবিত করিয়াছে। ভক্ত দাদূ বলিয়াছেন :—

শ্রবনা রাতে নাদ সোঁ
নৈনা রাতে রূপ
জিবড়া রাতী স্বাদ সোঁ
দাদূ এক অনুপ।

শ্রবণ ব্যতীত যেমন নাদের, নয়ন ব্যতীত যেমন রূপের, রসনা ব্যতীত যেমন স্বাদের অস্তিত্ব নাই, তেমনি ভক্ত ব্যতাত ভগবান—ভগবান ব্যতীত ভক্তেরও অস্তিত্ব নাই। এক আর-কে পাইয়া পূর্ণ হইবার জন্য অনন্তকাল ব্যাকুল হইয়া আছে—ভক্ত দাদূ বলেন :—

বাস কহে হম ফুলকে পাঁউ
ফুল কহে হাম বাস।
ভাস করে হাম সৎকে পাঁউ
সত কহে হম বাস।
রূপ কহে হম ভাবকো পাঁউ
ভাব কহে হম রূপ
আপস্ মেঁ দউ পূজন চাহে
পূজা অগাধ অনুপ।

ঠিক এই কথাই রবীন্দ্রনাথের :—

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে

সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে
ছন্দ সে পুন ফিরে পেতে চায় সুরে
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ
রূপ পেতে চায় রূপের মাঝারে ছাড়া
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা

অসীমের পথ আর সীমার পথ এক নহে—অসীম সীমার দিকে আসিতেছে—সীমা অসীমের দিকে যাইতেছে—মধ্য পথে মিলনের কথা। অসীমের পিছু পিছু গেলে সীমা কখনো অসীমকে ধরিতে পারিবে না। শিল্পীর সৃষ্টি তাই—বিশ্বসৃষ্টির নকল নহে—এইখানেই art ও nature এর প্রভেদ শিল্প প্রকৃতির অনুকরণ করিবে না। art নূতন সৃষ্টি। কবি যদও বলিয়াছেন :—

যাচ্ছ তুমি আদ্‌রা এঁকে
ভরছি মোরা রঙ দিয়ে

কিন্তু শিল্পীর প্রকৃত সাধনা তাহা নহে, বিশ্বশিল্পীর আদ্‌রায় রঙবুলান নহে—নূতন নূতন চিত্রাঙ্কন-যাহা বিশ্বজগতে নাই—তাহারই সৃষ্টি করা প্রকৃত শিল্পীর সাধনা। যে আলোক স্বর্গে-মর্ত্যে আকাশে-বাতাসে কোনেখানে নাই সেই আলোকে শিল্পী অভিনবসৃষ্টি সম্পাদন করিবে।

He sings of what the world will be
When the fears died away.

এই জন্যই photography শিল্প সৃষ্টি নহ।

"এই জন্যই ভারতের শিল্পী কখনো ব্রহ্মসৃষ্টিকে অনুকরণ করে নাই।" ভারতীয় শিল্পকলা সৃষ্টজগতের অনুকরণ নহে, উহা মানসলোক হইতে সৃজন। এই জন্যই কি ভারতীয় শিল্পকলার অস্বাভাবিকতা এত বেশী চোখে পড়ে?—স্বভাবের অনুকরণ নহে বলিয়াই কি বিসদৃশ ঠেকে?

"এই পূজার লীলা প্রত্যক্ষ করিতে চায় যে সাধক—এই রসের সরসী যে হইতে চাহে, তাহার সহজ হওয়া চাই" কৃচ্ছ্র সাধন মাত্র করিলেই এই রহস্য বুঝা যাইবে না। দাদূ বলিয়াছেন—

"না ঘর ত্যাজ ন বন গয়া
ন কুচ কিয়া কলেশ
দাদূ পোঁহি তোঁ মিলা
সহজ সুরত উপদেশ।

আমি ঘরও ছাড়ি নাই বনেও যাই নাই কোনো ক্লেশও করি নাই। সহজ-প্রেমে এই পৃথিবী ঠিক্ যেমনটী আছে তেমনিটীই দেখিলাম।"

এই সহজের সাধনা মহাকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অতি সুন্দর ভাবে দেখা যায়—

অমল কমল সহজে জলের কোলে
আনন্দে রহে ফুটিয়া
ফিরিতে না হয় আলয় কোথায় বলে'
ধুলায় ধুলায় লুটিয়া।

তেমনি সহজে আনন্দে হরষিত
তোমার মাঝারে রব নিমগ্ন চিত
পূজা শতদল আপনি যে বিকশিত
সব সংশয় টুটিয়া
কোথা আছ তুমি পথ না খুঁজিব কভু
শুধাব না কোনো পথিকে
তোমারি মাঝারে ভ্রমিব ফিরিব প্রভু
যখন ফিরিব যে দিকে
চলিব যখন তোমার আকাশ গেহে
তব আনন্দ প্রবাহ লাগিবে দেহে
তোমার পবন সখার মতন স্নেহে
বক্ষে আসিবে ছুটিয়া।

আবার—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দ ময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারংবার
তোমায় অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণ গন্ধময়। প্রদীপের মত
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়
জ্বালাবে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তি রূপে উঠিবে ফলিয়া।

এই সহজ সাধনার বাণী রবীন্দ্রনাথের নানা কবিতা হইতে দেখান যাইতে পারে—

সে সরল শান্ত প্রেম গভীর উদার
সে নিশ্চিত নিঃসংশয় সেই সুনিবিড়
সহজ মিলনাবেগ, সেই চির স্থির
আত্মার একাগ্র লক্ষ্য, সেই সর্ব্ব কাজে
সহজেই সঞ্চরণ সদা তোমা মাঝে

গম্ভীর প্রশান্ত চিত্তে, হে অন্তরযামী
কেমনে করিব লাভ? পদে পদে আমি
প্রেমের প্রবাহ তব সহজ বিশ্বাসে
অন্তরে টানিয়া লব নিশ্বাসে নিশ্বাসে
ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সহজ সাধক শিল্পীর সাধনা নিষ্কাম—সে ঋদ্ধি সিদ্ধি বা মুক্তি চাহে না, সে চাহে শুধু অসীম সুন্দরের অসীম প্রেম, চায়—তাহার সহিত অক্ষয় মিলন।—

প্রেম পেয়ালা রাম রস হমকো ভাবই এই
রিধি সিধি মাগই মুক্তিফল
চাহ তিনহী কো দোহাই।

কৃচ্ছ্র-সাধনার সঙ্গে এই সকল কামনা জড়িত—সহজ-সাধনা অন্তরের নিষ্কাম সহজ প্রেরণা হিমাদ্রিশৃঙ্গের তুষার পুঞ্জ প্রভাতের রৌদ্র-করে বন্ধ টুটিয়া নদী হইয়া যেমন সিন্ধুর পানে ছুটে—

"আপন স্রোতের বেগে কি গভীর টানে
তোমারে সে খুঁজে পায় সেই তাহা জানে

সহজ সাধনা ও ঠিক সেইরূপ।

তপ ও আত্মনির্য্যাতনের মূল্য দিয়া ভগবানের করুণা ক্রয় ইহা নহে। তাঁহারি অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করুণাকে ভোগ করিয়া (ত্যাগ করিয়া নহে) প্রেমের চির বিধান অনুসারে তাঁহারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করুণার অধিকারী হওয়া—

মোহেরই মুক্তি রূপে প্রজ্বলন
প্রেমেরই ভক্তি রূপে ফলত্ব প্রাপ্তি।

ভগবানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করুণার মাধুর্য্যের মধ্যে মুহ্যমান হইয়া তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করুণাকে (যাহা তাঁহার সহিত মিলনেই শুধু লাভ করা যায়) ভুলিয়া যাওয়াও সহজসাধনা বা শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সাধনা নহে। তাঁহার করুণার তৃপ্তি-সাগরে ডুবিয়া তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিলে চলিবেনা—ভোগের মধ্যেও চির অসন্তোষ যেন সাধককে স্থির থাকিতে দেয় না—যেন তাহা তাহাকে চির অক্ষয় সেই মিলনানন্দের পারাবার পানে টানিতে থাকে। ভক্তদাদু বলিয়াছেন—

রোক্ না রাখই ঝুঠন ভাখই
দাদূ খরচই খায়
নদী পুর পুরবাহ জোঁ্য
মায়া আবই জাই।

ভক্ত-সাধক বিশ্বের সৌন্দর্য্যপ্রবাহকে দাঁড় করাইয়া বা বাধা দিয়া ভোগ করিবে না—কামনার বশবর্ত্তী হইয়া সৌন্দর্য্য ভোগের সংকীর্ণ মোহে অসীমপথের যাত্রা ভুলিবে না। কাছে আত্মাতটিনীর কর্ম্মতটের সৌন্দর্য্যে ও সুখে আত্মহারা ও ব্যাহত-প্রবাহ হইয়া ভুলিয়া যাইবে না।

"দূরে তুমি শান্তি সিন্ধু অনন্ত গভীর"

কাববর বলিয়াছেন—

তব প্রেমে ধন্য তুমি করেছ আমারে
প্রিয়তম। তবু শুধু মাধুর্য্য মাঝারে
চাহি না নিমগ্ন করি রাখিতে হৃদয়,
আপনি যেথায় ধরা দিলে প্রেমময়
বিচিত্র সৌন্দর্য্য ডোরে, কত স্নেহে প্রেমে
কত রূপে—সেথা আমি বহিব না থেমে
তোমায় প্রণয় অভিমানে। চিত্তে মোর
জড়ায়ে বাঁধিব নাক সন্তোষের ডোর
আমার অতীত তুমি যেথা, সেইখানে
অন্তরাত্মা ধায় নিত্য অনন্তের টানে
সকল বন্ধন মাঝে, যেথায় উদার
অন্তহীন শান্তি আর মুক্তির বিস্তার।
তোমার মাধুর্য্য যেন বেঁধে নাহি রাখে
তব ঐশ্বর্য্যের পানে টানে সে আমাকে।

নদীর যেমন দুই তটের প্রতি কর্ত্তব্য শেষ করিয়াও সিন্ধুর চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণে কোনো ক্ষতিই হয় না—সাধকেরও তেমনি সংসারের প্রতি নিত্যকর্ত্তব্য পালন,—অসীমের পানে প্রধাবনে কোনো বাধা দেয় না।

তার সর্ব্বশেষ
আপনি খুঁজিয়া ফিরে তোমারি উদ্দেশ।
নদী ধায় নিত্য কাজে, সর্ব্ব কর্ম্ম সারি'
অন্তহীন ধারা তার চরণে তোমারি
নিত্য জলাঞ্জলি রূপে ঝরে অনিবার।

সহজপ্রেমিক দাদু বলেন—এই প্রবাহে যাহা পথে থাকিয়া যাইতে চাহে—তাহা পথেই থাকুক, তাহাকে প্রবাহে টানিয়া সিন্ধুপানে লইয়া যাওয়ায় প্রয়োজন নাই; যাহা সিন্ধুপানে বহিয়া চলিল তাহাকে আবার পথে তটের জন্য ধরিয়া রাখিতে ব্যগ্র হইও না।

দাদূ—রহতা রাখিয়ে
বহতা দেই বহাই
বহতে সংগে ম যাইয়ে
বহতে সোঁ লব লাই।

একাধারে সংসারী ও সন্ন্যাসী সহজপ্রেমিক শিল্পীসাধক, মর্ত্ত্যবাসীদিগকে দুই হাতে আপনার হৃদয়ের অমৃত বিলাইয়া থাকেন—প্রেমের এই অকুণ্ঠিত বদান্যতাতেও একেবারে রিক্ততা আসে না।

"মর্ত্ত্যের সকল আশা মিটাইয়া তবু
রিক্ত তাহা নাহি হয়।"

সংসারের মাঝে শিল্পীসাধক নব নব সৃষ্টির আনন্দেও বদান্যতার উৎসবে মশগুল হইয়া পড়েন কিন্তু এই—উল্লাসের মধ্যে ভরসা এই যে তিনি নিমেষের জন্য তাঁহার শেষকর্ত্তব্য ও যাত্রা-পথ ভুলেন না।

এই সাধকশিল্পীকে উদ্দেশ করিয়া তাই নবীন কবি বলিয়াছেন—

ওগো, অসীম পথের যাত্রী—
এই—বিশ্বভুবন অতিথিশালায়
কাটাও জীবনরাত্রি।
পথের শুষ্ক ধূলায় ধূলায়
তোমার চটুল চরণ তলায়
ফুটে উঠে কত প্রসূন পংক্তি
মধু পরিমল দাত্রী।
ঐ—কুহরিছে মূক, শিহরে জীবন
জড়ের অঙ্গে অঙ্গে
ক্ষণেকের দেখা, প্রাণ আনচান
সাধ তবু যাই সঙ্গে—
হাসিছ খেলিছ ঢেলে দেছ প্রাণ
তবু কেন তব উদাসী নয়নে
তোমার সাধনা তোমার বেদনা
কাহার প্রণয়পাত্রী?
ধূলি মাটী লয়ে প্রাণের যতনে
বরিছ কাহার মূর্ত্তি
প্রাচী পথ পানে চেয়ে চেয়ে তব
বয়ানে অরুণ স্ফূর্ত্তি।
যার লাগি তুমি চল অভিসারে
সে বুঝি আসিছে বরিতে তোমারে
মিলাইবে তোমা জীবনের পারে
উষা মাঙ্গল ধাত্রী॥

Sympathy বা প্রাণপরশ বিনা সহজসাধক শিল্পীর সাধনা ব্যর্থ। যে বিশ্বের সহিত সম্বন্ধ লোপ করিয়া আপনার মধ্যে আপনি অবরুদ্ধ হইয়া পরমার্থ সাধনায় ব্যগ্র সে বদ্ধ, যে বিশ্বকে ভালবাসে--বিশ্বের যাতায়াতের জন্য যে নিয়ত অন্তরের দ্বার-বাতায়নগুলি সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিয়াছে এবং বিশ্ব যাহার অন্তরে অবারিত দ্বার পাইয়া নিত্য প্রাণের পরশ লাভ করিতেছে—সেই মুক্ত। এই রূপ মুক্তই রসসম্ভোগের অধিকারী। তাই কবি বলিয়াছেন—"ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি, যোগাসন সে নহে আমার।"

আবার :--

ওরে মত্ত ওরে মুগ্ধ ওরে আত্মভোলা
রেখেছিলি আপনার সব দ্বার খোলা
চঞ্চল এ সংসারের যত ছায়ালোক
যত ভুল, যত ধূলি যত দুঃখ শোক
যত ভাল মন্দ যত গীত গন্ধ লয়ে
বিশ্ব পশেছিল তোর অবাধ আলয়ে
সেই সাথে তোর মুক্ত-বাতায়নে আমি
অজ্ঞাতে অসংখ্য বার এসেছিনু নামি
দ্বার রুধি জপিতিস্ যদি মোর নাম
কোন্ পথ দিয়ে তোর চিত্তে পশিতাম।

বিশ্বের সহিত সহানুভূতির গুণেই তাঁহার সহিত অন্তরে বার বার সাক্ষাৎ।

"বিশ্বের সবার সাথে অগণ্য জনশ্রেণীর মধ্যে অজ্ঞাতে অন্তরে যিনি আসা যাওয়া করেন" তাঁহাকে অন্তরে পাইতে হইলে কাহারও জন্য দ্বার রুদ্ধ করিলে চলিবে না—বিশ্বের জনস্রোতকে সর্ব্বদাই অন্তরে প্রবেশ করিতে দিতে হইবে। তিনি ত একা আসেন না—তাঁহার ত জাতবিচার নাই—স্পর্শ দোষের ভয় নাই—জনসাধারণের মধ্যে একজন হইয়া ঘুরিলে তাঁহার সম্মান হানি হয় না—'গৃহহীনে গৃহ দিলে তবে তিনি ঘরে থাকেন।' কখন যে তিনি কি ছদ্মে ঘুরিতেছেন তাহার ঠিক ঠিকানা নাই। রাজরাজেশ্বর তিনি, কিন্তু পথে পথে নানা বেশে তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলকে পরীক্ষা করিয়া বেড়ান। এই বিশ্বে কাহাকেও ঘৃণা করিবার উপায় নাই—কাহাকেও অন্তর হইতে তাড়াইবার উপায় নাই। চিনিতে না পারিয়া—ছদ্মবেশ ধরিতে না পারিয়া শেষে তাঁকেই কি দূর করিয়া বসিব ?

জাতি বিদ্যা জ্ঞান ধর্ম্ম ধন ইত্যাদির অহঙ্কার এই প্রাণস্পর্শের বিরোধী—কাজেই ইহা সহজসাধনার প্রধান অন্তরায়। শিল্পসাধকের ঐ ভীষণ পাপটীকে সর্ব্বাগ্রে পরিহার করিতে হইবে। মহাকবি বলিয়াছেন :—

কারে দূর নাহি কর। যত করে দান
তোমারে হৃদয় মন তত হয় স্থান
সবারে লইতে প্রাণে। বিদ্বেষ যেখানে
দ্বার হতে কারেও তাড়ায় অপমানে
তুমি সেই সাথে যাও।

"ব্রহ্মের সুরে সুর বাঁধিয়া লইতে পারিলে সহজসাধনা অতি কঠিন হইলেও সহজ হইয়া পড়ে। বিশ্বের বিরাট—সঙ্গীতে অতি সহজ ভাবেই যোগ দিলেই চলিবে।

তাঁহার সুরে সুর বাঁধিলে তিনিই ভক্তের বীণায় সুর দিবেন:—

সে তাঁহারি দান
সাধ্য নাই নষ্ট করি সে বিচিত্র গান।

ঐ গানই তখন ভক্তকে বিশ্বের ঐ নগরসংকীর্ত্তন যে পথে যাইতেছে সেই পথেই টানিয়া লইয়া যাইবে।

"কেমনে যে কিছু হয় কেহ হয় কেহ
কিছু থাকে কোনো রূপে কারে বলে দেহ
কারে বলে আত্মা মন

বুঝিতে না পারিয়াও—

কিছুই না জানিয়া অজ্ঞাতে
নিখিলের চিত্তস্রোত ধাইছে তোমাতে

যে পথে নিখিলের চিত্তস্রোত ধাবিত হইতেছে সেই পথেই সহজসাধকের যাত্রা।

ব্রহ্মের সুরের সহিত সুর মিলাইতে না পারিয়া কবি আক্ষেপ করিতেছেন :—

তোমার বীণার সাথে আমি
সুর দিয়ে যে যাবো
তারে তারে খুঁজে বেড়াই
সে সুর কোথায় পাবো।
তেমন সহজ ভোরের জাগা
স্রোতের আনাগেনা
তেমন সহজ পাতার শিশির
মেঘের মুখে সোনা।
তেমন সহজ জ্যোৎস্নাখানি—
নদীর বালু পাড়ে
গভীর রাতে বৃষ্টিধারা
আষাঢ় অন্ধকারে
খুঁজে মরি তেমনি সহজ
তেমনি ভরপুর
তেমনিতর অর্থ ছোটা
আপনি ফোটা সুর
তেমনিতর নিত্য নবীন
অফুরন্ত প্রাণ
বহুকালের পুরাণো সেই
সবার জানা গান
আমার যে এই নূতন গড়া
নূতন বাঁধা তার
নূতন সুরে করতে সে চায়
সৃষ্টি আপনার।
মেশেনা তাই চারিদিকের
সহজ সমীরণে

মেলে না তাই আকাশ ডোবা
শুভ্র আলোর সনে।
জীবন আমার কাঁদে যে তাই
দণ্ডে পলে পলে
যত চেষ্টা করি কেবল
চেষ্টা বেড়ে চলে
ঘটিয়ে তুলি কত কি যে
বুঝি না এক তিল
তোমার সঙ্গে অনায়াসে
হয় না সুরের মিল।

অসীমের সুরে সুর মিলাইবার জন্য কবির এই যে বেদনা—দণ্ডে পলে পলে এই যে জীবনের কাঁদন নানা সঙ্গীতে বাজিয়ে উঠে। ঐ মিলনচেষ্টাতেই কবি তারে তারে খুঁজিয়া বেড়াইয়া অসংখ্য সঙ্গীতের সৃষ্টি করিতেছেন। বেদনাই সৃষ্টির মূল নিদান। কবি বা শিল্পীর বেদনা শিল্পে প্রকটিত হইতেছে। আবার পক্ষান্তরে সীমায় নিবিড় সঙ্গের আকাঙ্ক্ষা অসীমের মধ্যেও বেদনা জাগরিত করিতেছে—ঐ বেদনাই বিশ্ব-প্রকৃতিতে প্রকট হইতেছে। ঐ বেদনাই সুরের আগুনে জ্বলিয়া প্রাণে-প্রাণে সবখানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

বেদনার প্রেরণাই শিল্পীর করে নব-নব সৃষ্টিতে ধ্বনিত হইতেছে—কত বিনিদ্র বিভাবরীর দগ্ধ-হৃদয় কত প্রাণ-পণ, কত ব্যথা ভেদ করিয়া যে ঐ সঙ্গীত উঠে তাহার কি কেহ খোঁজ রাখেন ?

"রাঙাফুল হয়ে উঠিছে ফুটিয়া হৃদয়শোনিতপাত
অশ্রু ঝরিছে শিশিরের মত পোহায়ে দুঃখরাত।"

কবিগুরু তাই বলিয়াছেন :—

"শান্তি কোথা মোর তরে হায় বিশ্বভুবনমাঝে ?
অশান্তি যে আঘাত করে তাই ত বীণা বাজে।
নিত্য রবে প্রাণ পোড়ান গানের আগুন জ্বালা
এই কি তোমার খুসী আমায় তাই পরালে মালা
সুরের আগুন ঢালা"

তাই কবির চিরব্যথার বনে ক্ষ্যাপা হাওয়ায় ঢেউ উঠিয়াই আছে।

শিষ্যকবির কথায় :—

"কুটমূলে নিবদ্ধ ব্যথা লতা বিটপীর
ফলের জনম দেয় কুসুমে ফুটায়
অন্তর্গূঢ়া গূঢ় ব্যথা নীরব গিরির
কল কল গীতিময় নির্ঝরে ছুটায়
বারিদের ঘন ব্যথা অশনি তাড়না
বসুন্ধরা সঞ্জীবন ঢালে শান্তি জল

জীব জরায়ুর ব্যথা প্রসববেদনা
আনন্দনন্দনে অঙ্ক করে গো উজ্জল।

তোমার অসীম ব্যথা বিশ্বশিল্পীরাজ
জ্বলিছে অনন্তজ্বালা তোমার অন্তরে
অনাদি অনন্তকাল তব সৃষ্টিকাজ
চলিতেছে নিশিদিন এই বিশ্বপরে
নিত্য নব জ্বালা তব নিত্য নব ব্যথা
হইতেছে নিত্য নব সৃষ্টিতে প্রকট
অপূর্ণে করিতে পূর্ণ তব ব্যাকুলতা
মুছে মুছে আঁকিতেছ বিশ্বদৃশ্যপট

ওগো স্রষ্টা শিল্পীরাজ বিশ্বের নিদান
শিক্ষা দাও পুত্রে, তার পিতৃব্যবসায়
এই বিশ্ব শিল্পাগারে দাও তারে স্থান
দীক্ষা দাও বেদনার শোণিতটীকায়।
দাও ব্যথা অফুরন্ত নিত্য নব নব
প্রকট করিব আমি শিল্পের লীলায়
সুন্দরে গড়িয়া তার উপাসক হবো
সৃজিতে সৃজিতে স্রষ্টা লভিব তোমায়।"

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির মূলনিদানটী সাধকের মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়া বেদনাকে বর্জ্জন করেন নাই—বেদনার ভয়ে পশ্চাৎপদ বা পরাঙ্মুখ হ'ন নাই—বেদনা হইতে অব্যাহতি চাহেন নাই—বেদনাকেই নিত্য নব-নব রূপে বরণ করিয়াছেন—বেদনার মধ্য দিয়াই চিরবেদনাময়ের সন্ধান করিয়াছেন। শিল্পসাধক হইতে হইলে সৃষ্টির মূল কারণ বেদনাকেই 'স্বয়মাগত তপঃ' স্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত সৃষ্টির সঙ্গীতে প্রকট না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত শিল্পীর অন্তরে বেদনার গুপ্তগুঞ্জনের শেষ নাই। ভক্ত দাদূর কথায় :—

"পার দেবই আপনা গুপ্ত গুঁজমন মাহি"

বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টির বিরাম নাই—কাজেই তাহার বেদনারও বিরাম নাই। স্রষ্টার অন্তরে সসীমের বিরহ ব্যথা নিত্য তাঁহাকে নব-নব সৃষ্টির জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে। সাধকের যে জ্বালা—ব্রহ্মেরও সেই জ্বালা। অসীমকে পাইবার জন্য সসীমের যে জ্বালা সসীমকে পাইতে অসীমেরও সেই জ্বালা। এই জ্বালারও বিরাম নাই—মানব-শিল্পে ও বিশ্বপ্রকৃতিতে সৃষ্টিরও বিরাম নাই। ভক্ত দাদূ বলিয়াছেন :—

"জয়ই সো নাথ নিরংজন বাবা
জয়ই সো অলখ অভেব
জয়ই সো যোগী সবকা জীবনি
জয়ই সো জগমেঁ দেব

জরই সো অল্লাপ উপজাবন হারা
　　জরই সো জগপতি সাঁঈ
জরই সো অলঘ অনুপ হৈ
　　জরই সো মরণা নাঁহী।"　　ইত্যাদি—ইত্যাদি

জলিতেছেন তিনি নিরঞ্জন বাবা, জলিতেছেন তিনি অলক্ষ্য অভেদ এক, জলিতেছেন তিনি জগতের দেবতা। জলিতেছেন যিনি আপনাকেই নব নব রূপে উৎপন্ন করিতেছেন, জলিতেছেন সেই জগৎপতি স্বামী,—জলিতেছেন সেই অলক্ষ্য অনুপম, জলিতেছেন তিনি যাঁর মরণ নাই। ইত্যাদি—

কবির কথায়:—

"সৃজন কামনা তাঁর বেদনায় উছসি
সঙ্গীতে ভরে' তুলে ক্রন্দসী রোদসী
ব্যথায় বিরাম কই? সৃজন চলিছে ঐ—
ভাঙ্গিছে গড়িছে নিতি অঙ্গুলে পরশি॥

সৃজন কামনা তাই সিরজিল মরণে,
বিশ্বতন্ত্রী বুকে তারে তারে তাড়নে।
বেদনা উষার মাঝে দিল গো জনম সাঁঝে
সাঁঝের বেদনা পুনঃ মাগিতেছে উষসী॥

ফুল হলো লতিকার ব্যথাময় সাধনা
ফলের জনম দিল কুসুমের বেদনা।
ফলের বেদনা গতি বীজে লভি পরিণতি
লতার জীবনে পুনঃ উঠিতেছে বিলসী॥

বেদনা সৃজন দোঁহে একে আর মাগিছে
এ মিলন সঙ্গীতে চিরকাল জাগিছে।
বেদনা রবেনা যবে সৃজন কোথায় রবে?
বেদনা যে সৃজনের সুরময়ী প্রেয়সী॥"

বিশ্বস্রষ্টার সসীমের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষার বেদনা বিশ্বপ্রকৃতির চারিদিকেই প্রকট:—

"ওগো—অসীম ব্যথার পারাবার
জনমে মরণে　　দুখ নেয়ে সনে
তোমাতে মোদের পারাপার।
তুমি দুখময় সৃজন তোমার
দুখেরই বিকাশ দুখেরি বিকার
আকাশে বাতাসে　　হাসে শ্বাসে ভাবে
চারিদিকে তাই হাহাকার।

অরুণ হইয়া উষার গগনে,
কাননে কাননে পরকাশে,
করুণ হইয়া নয়নে নয়নে
ছলছল আঁখি জলে ভাসে।
গরল হইয়া বুকে মুখে জ্বলে,
তরল হইয়া মেঘে মেঘে গলে
কঠিন সে যে গো পাষাণে পাষাণে
মশানে শাণিত তরবার॥
কণ্ঠে কণ্ঠে কূজনে গুঞ্জে
প্রেমের স্বপনে মধুময়
বিয়োগে বিরহে বিষজ্বালারূপে
দেয় তার নিতি পরিচয়।
রতনে হিরণে রূঢ় হয়ে জাগে;
কাঙাল হইয়া পথে পথে মাগে
বাহুর নিগড়ে রচে সংসার
লোহার নিগড়ে কারাগার।
জ্যোতি হয়ে জাগে গ্রহ তারকায়
প্রীতি হয়ে মনে মনে রাজে
শ্যাম হয়ে জাগে তরু লতিকায়
ধূসর হইয়া মরুমাঝে।
রস হয়ে জাগে জীবনে জীবনে
রাখে জীবধারা ভুবনে ভুবনে
সম্বেদনায় আহিত চেতনা
ব্যথা বিনা সব জড়তায়।"

যে ব্রহ্মের এই জ্বালা হইতে আপন জ্বালা গ্রহণ করিয়াছে—যে তাঁহার প্রদীপ হইতে আপন প্রদীপ জ্বালিয়া লইয়াছে তাহার বেদনার অন্ত নাই। কিন্তু এই বেদনা তাহার নিষ্ফল ও নিরর্থক নহে—এই বেদনার মূল্য দান করিয়া সে সৃষ্টির আনন্দ লাভ করিতেছে, তাহার রচিত শিল্পে তাহার অভিব্যক্তি তৃষ্ণার সঙ্গে সঙ্গে তৃপ্তিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। শিল্পের মধ্য দিয়া তাহার সৃষ্টির আনন্দ নিখিলেরই আনন্দময় সম্পৎ হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে—নশ্বর সবই লুপ্ত হইতেছে কিন্তু শিল্পীর সৃষ্টি রহিয়া যাইতেছে—যুগে যুগে বিশ্ববাসীর আনন্দ-নিকেতন রূপে অমর হইয়া রহিয়াছে—"অনিত্য সংসারের এই নিত্যধন"ই শিল্পীর সকল জ্বালার সান্ত্বনা। শিল্পী এই বিশ্ববেদনার পথে শুধু আনন্দ পাইতেছে ও নিখিলকে আনন্দ দান করিতেছে তাহা নহে—ঐ পথ তাহাকে এমন ঠাঁইয়ে লইয়া যাইতেছে সেখানে কোনো বেদনা নাই—সেখানে "মরণা ভাগা মরণতেঁ ছুকৃহি ভাগা ছুকৃখ" অসীমের মিলনাকাঙ্ক্ষার তৃষ্ণাও অনন্ত—তজ্জনিত বেদনাও অনন্ত—কিন্তু মিলনে যে আনন্দ তাহাও অনন্ত। যাত্রাশেষের ফল অসীম আনন্দ-

সাগর বলিয়া পথের ক্লেশ—ক্লেশ বলিয়াই মনে হয় না; তাই অসীম-পথের যাত্রী সাধকের সকল ক্লেশ সঙ্গীতে অভিব্যক্ত; সকল কাঁটা কুসুম হইয়া ফুটিয়া উঠে, অসীমকে বিস্মৃত হইলেই সকল দুঃখ-ক্লেশ তাহাদের বিকট মূর্ত্তিতে পীড়ন আরম্ভ করিয়া দেয়। কবিগুরু বলিয়াছেন :—

"তোমারি অসীমে প্রাণ মন লয়ে
যতদূরে আমি যাই
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু
কোথা বিচ্ছেদ নাই
মৃত্যু যে ধরে মৃত্যুর রূপ
দুঃখ সে হয় দুঃখের কূপ
তোমা হতে যবে স্বতন্ত্র হয়ে
আপনার পানে চাই॥"

শিল্পী আপন সৃষ্টির আনন্দ লাভ করিলেও তাহার তৃষ্ণা নিবারণ হয় না, তৃষ্ণা নিবারিত হয় না বলিয়াই তাহার অসীম পথের যাত্রা ভঙ্গ হয় না। আপন সৃষ্টির আনন্দে মুহ্যমান হইয়া পড়িলে শিল্পীর সেই অমৃত পরমানন্দ লাভের আশা থাকে না। সাধক শিল্পীর সৃষ্টির আনন্দ তৃষ্ণাকে নিবারণ না করিয়া তৃষ্ণাকে আরো বাড়াইয়া দেয় -

"যত চেষ্টা করি আরো চেষ্টা বেড়ে চলে।"

শিল্পীর সৃষ্টিগুলি গ্রথিত হইয়া অসীমকে লাভ করিবার শৃঙ্খলের কাজ করে। এই যে শৃঙ্খল—ইহার সহিত অসীমসুন্দরের সিংহাসনের যোগ আছে বলিয়া ইহা অমর ও অক্ষয়। তাই ইহার সাহায্যে শুধু শিল্পী নয়, বহু রসপিপাসু জন অসীমের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকে।

অসীম আমাদিগকে নিয়ত টানিতেছেন, এই টানই এই বিশ্বজগতের বেদনা—এই বেদনাকে সম্ভোগ করাই তাঁহার আকর্ষণের অনুভূতি। এই বেদনা হইতে যদি নিষ্কৃতি চাও—তবে তাঁহাকে পাইবে না। সাধককে বীণা করিয়া তাহার হৃদয়ে নিয়ত ব্যথাময় অঙ্গুলি তাড়নে তিনি নিয়ত আপনার সুর গাহিতেছেন। তাঁহার এই অঙ্গুলি তাড়নার বেদনাই শিল্পীর কণ্ঠে সঙ্গীতে জাগিতেছে।

ভক্ত দাদূ বলিয়াছেন—

"বাঁধে সুরবা বাঁয়ে বাজই
ইহ বা সো ধর নীজহু
রাম সনে হি সাধু বাজে
বেগ মোহি কলি দীজহু।"

"তিনি আমাকে আপন বীণা করিয়া আপন কোলে বামে রাখিয়া বাজাইতেছেন—আর আমি বাজিতেছি। এখান হইতেই সেই অসীম সুর ধরিয়া লও—জগতের সকল সাধুরাই বাজিতেছেন আমাকে শীঘ্র আমার সুরটী দাও।"

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই কথা বহু কবিতা ও গানে ব্যক্ত করিয়াছেন—যথা—

"সেই মোর মুগ্ধমন
বীণাসম তব অঙ্কে করিনু অর্পণ

তার শত মোহতন্ত্রে করিয়া আঘাত
বিচিত্র সঙ্গীত তব জাগাও হে নাথ।"

পুনশ্চ—

"আমারে কর তোমার বীণা লহ গো লহ তুলে
উঠিবে বাজি' তন্ত্রীরাজি মোহন অঙ্গুলে
কোমল তব কমলকরে পরশকর পরাণ পরে
উঠিবে হিয়া গুঞ্জরিয়া তব শ্রবণমূলে।
কখনো সুখে কখনো দুখে কাঁদিবে চাহি তোমার মুখে
চরণে পড়ি রবে নীরবে রহিবে যবে ভুলে।
কেহ না জানে কি নব তানে উঠিবে গীত শূন্যপানে
আনন্দের বারতা যাবে অনন্তের কূলে॥"

পুনশ্চ—

"আমার বীণায় বাজে তাঁহারি আদেশ
যে আনন্দে যে অনন্ত চিত্ত বেদনায়
ধ্বনিত মানব প্রাণ—আমার বীণায়
দিয়েছেন তাঁরি সুর—সে তাঁহারি দান
সাধ্য নাই নষ্ট করি সে বিচিত্র গান।"

অসীম তাঁহাকেই বীণা করিয়া মানব-হৃদয়ের চিরন্তন গান গাহিতেছেন—কবির সাধ্য কি সে গান বন্ধ করেন—তাঁর দেহে মনে যাহা এক সুরে বাজিয়া উঠিতেছে তাহা কেমনেই বা গোপন করিবেন?

মোদক মিষ্টান্ন তৈয়ার করে কিন্তু নিজে উপভোগ করে না, শিল্পীর সহিত মোদকের তুলনা হইতে পারেনা—মধুমক্ষী মধুচক্র নির্ম্মাণ করে' আপনি উপভোগ করে—বিশ্বজন ও সে মধু উপভোগ করে। শিল্পীর সহিত মধুমক্ষীর তুলনা হইতে পারে। কিন্তু যে মোদক নিজে মিষ্টান্ন তৈয়ার করে' উপভোগ করে এবং বিশ্বজনকে উপভোগ করায়, তাহার সহিতই শিল্পীর উপমা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। শিল্পী আপনার বেদনাকে আনন্দের সৃষ্টিতে প্রকট করিয়া উপভোগ করে; সে রসজ্ঞ—সে উপভোগ করিতে জানে, সে জন্য বিশ্বসৃষ্টিকে প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করে—বিশ্বসৃষ্টি তাহার নিকট পরম সুন্দর। যে শিল্পী নহে অথচ রসজ্ঞ, তাহারও সৌন্দর্য্যানুভূতি ও পরম তৃপ্তির অধিকার আছে—তবে তাহাকে মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হইবে। অসীমের পরম-বেদনার ফল এই বিশ্বসৃষ্টি—সাধকের পরম-বেদনার ফল শিল্প। এই বিশ্বপ্রকৃতি ও শিল্পের সৌন্দর্য্যানুভূতির আনন্দ লাভ করিতে হইলে যিনি স্রষ্টা নহেন তাঁহাকে ও সাধনা করিতে হইবে, বেদনার মূল্য দিয়া আনন্দানুভূতির অধিকার অর্জ্জন করিতে হইবে। শিল্পী যে বেদনা অনুভব করিয়াছে সেই বেদনার অনুরূপ বেদনাই তাহাকেও গ্রহণ করিতে হইবে। এখন স্রষ্টার সৃষ্টিকে বেদনার সাহায্যে মনে মনে পুনঃসৃজন। সৃষ্টির সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া আনন্দ পাইতে হইলে বিশ্বস্রষ্টার নিখিল বেদনা, যাহা বিশ্বপ্রকৃতিতে ও মহামানবের হৃদয়ে বৈচিত্র্য লাভ করিতেছে তাহার সমস্তটুকুকেই আপনার করিয়া লইতে হইবে। শিল্পের সৌন্দর্য্যে আনন্দলাভ করিতে হইলে শিল্পীর সহিত প্রাণস্পর্শ (Sympathy) চাই। শিল্পীর সকল বেদনাকে আপনার করিয়া লইতে হইবে।

শিল্পীকে আপনার প্রাণের সখা মনে করিয়া মনে মনে তাহার সৃষ্টিকে নিজেরই সৃষ্টি মনে করিয়া লইতে হইবে তাহা হইলে—

"রাজেন্দ্র সঙ্গমে—
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে"

সেই পরমানন্দ তীর্থে রসজ্ঞেরও যাত্রা সম্ভব হইবে।

বিশ্বস্রষ্টার বিরাটসৃষ্টির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে গিয়া যদি ভাবো ইহা সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টি, তাহা হইলে সৌন্দর্য্যানুভূতি ভাগ্যে ঘটিবে না। চিরসুন্দরে ঐশ্বর্য্য আরোপ করিলেই সৌন্দর্য্যানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে সহজসাধনও নষ্ট হইয়া যাইবে। উদ্দেশ্যমূলক কার্য্য মনে না করিয়া যদি বিশ্বসৃষ্টিকে অহেতুকী-লীলা মনে কর তবেই তোমার সৌন্দর্য্যসাধন সার্থক হইবে। বৈষ্ণবসাধনাতেও শ্যামসুন্দরে ঐশ্বর্য্য আরোপ করিয়া তাঁহাকে ভগবান কল্পনা করিলেও বৈষ্ণবসাধনা নষ্ট হইয়া যায়। সুন্দরে ঐশ্বর্য্য আরোপ করিলে ত আর তাহার সহিত প্রেমের সম্বন্ধ থাকিল না—তাহা হইলে সহজসাধন শক্ত হইয়া উঠিল। শিল্পীর সৃষ্টিকেও উদ্দেশ্যমূলক বস্তুতান্ত্রিক রচনা মনে করিলে শিল্পের সৌন্দর্য্য অনুভূতির কোনো উপায় থাকিবে না। শিল্পীতে সামাজিক গুরু বা রাষ্ট্রিক নায়কের গরিমা আরোপ করিলেই সৌন্দর্য্যসাধন নষ্ট হইয়া যাইবে—সখাভাবে তাহার সহিত হাত ধরাধরি করিয়া যাওয়াও সম্ভব হইবে না।

শিল্পীর সাধনার আর এক বিপদ কামনা। শিল্পী যেন পথের মোহে পথের আনন্দে মুগ্ধ হইয়া যাত্রার শেষ-লক্ষ্য না ভুলে। অসীমসুন্দরের দিকে ধাবমান হইয়া শিল্পী যেন অনিত্য সৌন্দর্য্যকে আপনার উপাস্য বলিয়া ভ্রম না করে—প্রকৃত সত্তা ভুলিয়া যেন ছায়ায় মজিয়া না রহে। চারিদিকেই অসীমসুন্দরের প্রতিবিম্ব—এই সকল প্রতিবিম্বকে অসীমসুন্দরের স্বরূপ মনে করিয়া শিল্পী যদি ভোগতৃষ্ণায় আত্মহারা হইয়া পড়ে তবে চিরসুন্দরকে পাইতে বিলম্ব হইয়া যাইবে—হয় ত আবার গোড়া হইতেই যাত্রা সুরু করিতে হইবে। এই বিপদকে আশঙ্কা করিয়াই কবি বলিয়াছেন :—

"নরের মুকুটে
যে হীরক জ্বলে তারি আলোক ঝলকে
অন্য আলো নাহি হেরি দ্যুলোকে ভূলোকে
মানুষ সম্মুখে এলে কেন সেইক্ষণে
তোমার সম্মুখে আছি নাহি পড়ে মনে ?"

মানুষের অনিত্য সৌন্দর্য্যে মজিয়া অসীমসুন্দরকে হারাইলেই সর্ব্বনাশ। আপনাকে বহু বঞ্চনা করিয়া ধৈর্য্য সহকারে ধ্রুবলক্ষ্যের পানে যাত্রা না করিলে সর্ব্বসাধনাই পণ্ড হইবে। স্থূলদেহের প্রভু হইতে হইবে।—দেহের দাস হইয়া দেহের ক্ষণিক উপভোগের জন্য আত্মা যদি তাহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকে তবে শুভক্ষণ চলিয়া যাইবে। কমলবাসে লুব্ধ মধুকর আসিয়া কমলপাশে বদ্ধ হয়—দিন দশেকের মধ্যে দুই-ই বিলয় পায়। দাদূ বলিয়াছেন :—

ভবঁরা লুবধী বাসকা কমল বঁধানা আই
দিন দশ মাহেঁ দেখতা দোনোঁ গয়ে বিলাই

চিরসুন্দরের আহ্বান পাইয়া শিল্পী যদি আনন্দে প্রমত্ত হইয়া অধীরতা প্রকাশ করে তবে তাহার এ মুগ্ধতাও তাহার সাধনার অন্তরায়। বেদনার সৃষ্টি যাহা শিল্পীর পরম সাধনা তাহাও বদ্ধ হইয়া যায়—তাই কবি বলিয়াছেন :—

"যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য্য নাহি মানে
মুহূর্ত্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
ভাবোন্মাদমত্ততায় সেই জ্ঞানহারা
উদ্ভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তিমদধারা
নাহি চাহি নাথ।"

বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বসৃষ্টিকে সরল ও সুন্দর করিবার জন্য আপনাকে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন :—

হে বিশ্বভুবনরাজ, এ বিশ্বভুবনে
আপনারে সব চেয়ে রেখেছ গোপনে
আপন মহিমা মাঝে।

এই ধরিত্রী আত্মজ্ঞানশূন্যা। আপনাকে সে জানে না বলিয়াই আপনাকে এই চিরসরস চিরনবীন সৌন্দর্য্যে বিকশিত করিতে পারিয়াছে। পুরুষের সংসর্গে প্রকৃতি যে ভাবে সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিতেছে তাহা সে জানে না।

যে শিল্পী আপনার সৃষ্টিতে সচেতন হইয়া সর্ব্বদা জাগ্রত না থাকেন—যিনি আত্মবিস্মৃত—আপনাকে প্রকাশের যাঁর চেষ্টা নাই—যিনি অহংকে আনন্দরসে ডুবাইতে পারিয়াছেন—তিনিই পরম সাধক। যে নাট্যকার আপনার নিজস্ব ভাবাবেগ প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠ শিল্পী—যে অভিনেতা অভিনয়কালে আপনাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হন তিনিই একজন প্রধান শিল্পী।

কবি তাই বলিয়াছেন :—

তোমরা কিসের ভিত পাতগো ইট গাঁথগো একটানা
শেষ কোথা তোর লেশ জান না গেঁথেই চলো আনমনা
রচবে কোথা বারোয়ারীর তালের টাটের আটচালা
হয় যে তাহা মস্জিদ ভবন ধর্ম্মশালা পাঁচতালা।
কি হতে যে কি হয় তোমার কর্ণিকেরি কর্ত্তনে
তোমার দেউল উঠ্‌বে কোথা বুঝ্‌তে নার পত্তনে
ভাবছ তুমি রচবে কুটীর হয় যে তাহা রাজবাড়ী
ছেলে খেলার গড়খাইএতে সৈন্য এসে দেয় সারি।
খেলার খাতে গঙ্গা আসে লোকে তোমার যশ গাহে
নিজেই দেখ অবাক হয়ে ফক্কা তোমার নক্সা হে
পাথর কেটে পুতুল গড় দেবতা এসে বাস করে
তোমরা নিজেই চিন্‌তে নার ভাস্করেরি ভাস্করে।

স্রষ্টার অহঙ্কার সৌন্দর্য্যসৃষ্টির অন্তরায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অসীমের মধ্যে আত্মবিলয় না করিলে—অসীমের সুরে সুর বাঁধিয়া না লইলে শিল্পীর সাধনা পণ্ড। শিল্পীকে গুরু বা নায়কের পদ লইলে চলিবে না—শিল্পী মহামানবের মধ্যে আপনার নামে গণ্ডী রচনা করিয়া দিবে না। সে দিবে অসীম মুক্তির মন্ত্র।

শ্রেষ্ঠ গায়ক কি যে গাহেন তাহা তিনিই জানেন না—শ্রেষ্ঠ কবির লেখনী ধরিয়া কে যেন কি লিখিয়া দিয়া যায়—শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীর তুলিকা ধরিয়া যেন স্বয়ং চিরসুন্দর আঁকিয়া দিয়া যায়। শ্রেষ্ঠ শিল্প শিল্পীর আত্মবিস্মৃত অবস্থাতেই জন্মগ্রহণ করে। শিল্পী নিজেই তাহার সর্ব্বাঙ্গীন সার্থকতা বুঝাইয়া দিতে পারেন না। ঐ যে অৰ্দ্ধচৈতন্য আত্মবিস্মৃত অবস্থা উহাই শিল্পীর প্রকৃত সাধনা। শিল্পী সচেষ্ট হইয়া সচেতন উদ্দেশ্য লইয়া যখনই কিছু সৃজন করিয়াছেন—তখনই তাহা অসুন্দর ও অপকৃষ্ট হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর রচনার ভাবাভিব্যক্তি সম্বন্ধে আমরা নানা জনে অর্থ টানিয়া লই—শিল্পী সচেষ্ট হইয়া কোনো অর্থই দেন না, যদি কোনো অর্থ থাকে তবে তাহা ঐ শেষ অর্থ, তাহা অহেতুক আনন্দ ছাড়া অন্য কিছুই নহে।

শ্রেষ্ঠ শিল্পী আপনাকে অসীমের হস্তের বীণার মত মনে করেন—তিনি যাহা গাওয়ান শিল্পীকে তাই গাহিতে হয়। শিল্পী আপনার প্রভু নহেন। তাই শিল্পী বলেন :—

তব আহ্বান আসিবে যখন
সে কথা কেমনে করিব গোপন
সকল বাক্য সকল কর্ম্ম
প্রকাশিবে তব আরাধনা

অথবা :—

আমার বীণায়
দিয়াছেন তাঁরি সুর সে তাহারি দান
সাধ্য নাই নষ্ট করি সে বিচিত্র গান।

কেমন করিয়া তাঁহার হৃদয়পদ্ম শতদলে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে—তাহা তিনি কি জানেন? জানেন সেই পূর্ব্ব গগনের সহস্রকিরণ সবিতা।

শ্রীকালিদাস রায়।

হয়েছিল কবে পরিণয়!

হয়েছিল কবে পরিণয়,
কবে কোন্ শিশুকালে মনে নাহি হয়,
আলো সনে কালো আঁখি করেছিল মালা বিনিময়!

মিটিলনা দেখার দুরাশা,
চাহনি দ্বিগুণ করে দেখার পিপাসা,
পারেনা'ক দুটি আঁখি দিতে নিতে সব ভালবাসা!

চরণ সেবার অবসর
হয়না'ক, চোখের কোমল দুটি কর
পায়ে রেখে যায় শুধু পরাণের নীরব আখর!

চরণ ধোয়াতে নাহি পারে,
আলো যে নিবিয়া যায় নয়ন আসারে,
চপলার মত হাসি, চাপা পড়ে সহসা আঁধারে !

বাঁধিয়া রাখিতে নারে বুকে,
মিনতি বেদনা-ভরা বহে মনোদুখে,
স্বপ্নে শুধু আসে যায় মিলনের তীর্থ অভিমুখে !

তবুও তো ভরিল জীবন,
আঁখির আরতি দীপে আলো করা মন,
স্বপনে খুলিল ধীরে অনিমেষ তৃতীয় নয়ন !

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

লক্ষ্য-হারা।

—:*:—

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

(৫)

প্রথম কাজে ঢুকিয়া ওরলফ্-দম্পতি দেখিল তাহাদের অনেক কাজ। রোজ অনেক রোগী হাঁসপাতালে আনা হয়, পূর্ব্বের কলহজীবনে অভ্যস্ত সেই দুই প্রাণী, বর্ত্তমান দ্রুত-ব্যস্ততা, নিয়ম-কানুন, এবং বাঁধাধরা কাজের মধ্যে পড়িয়া প্রথমটা দস্তুরমত অসুবিধা বোধ করিতে লাগিল। তাহাদের মাথা ঘুরিয়া গেল, তাহাদের যা করিবার আদেশ দেওয়া হইত সহজে তাহা বুঝিতে পারিত না, চারিদিকের ব্যাপার দেখিয়া তাহাদের ধাঁধা লাগিয়া গেল। যদিও তাহাদের কাজের প্রগাঢ় ইচ্ছা ছিল এবং সেই ইচ্ছা লইয়াই ইতস্ততঃ দৌড়া দৌড়ি করিত কিন্তু তাহারা প্রকৃত কাজ অল্পই করিতে পারিত, বরঞ্চ অন্যের কাজের বিঘ্ন হইত।

এক দিন কাল মত লম্বা একজন ডাক্তার, একটি রোগীকে বাথরুমে লওয়ার জন্য ওরলফ্‌কে সাহায্য করিতে বলিল। নূতন শুশ্রূষাকারী নিজেকে কাজে লাগাইবার উৎসাহে রোগীকে এমন ভাবে চাপিয়া ধরিল যে সে গোঙ্গাইয়া উঠিল, ডাক্তার গম্ভীর স্বরে কহিলেন "দেখো লোকটাকে এইখানেই গুঁড়ো করে ফেলো না—ওকে যে আস্তই বাথরুমে নিয়ে যাওয়া চাই।" এই কথায় ওরলফ্ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। রোগী একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া কহিল এখনও ঠিক বুঝতে পারে নাই, নূতন লোক কিনা।

প্রধান ডাক্তার সাদা ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা একজন বুড়ো ভদ্রলোক। ওরলফ্-দম্পতি প্রথম আসিবার দিনই তাহাদের রোগী-পরিচর্য্যা ও অন্যান্য সম্বন্ধে যথাবিধি উপদেশ দিয়াছিলেন। এই বুড়ো ভদ্রলোকের সহানুভূতি এবং

সদয় ব্যবহারে ওরলফ্ তাহার একান্ত বশীভূত হইয়া পড়িল। কিন্তু আধঘণ্টা পরেই হাঁসপাতালের গোলমাল ও ব্যস্ততার মধ্যে তাহার সব উপদেশ বিস্মৃত হইয়া গেল। শুশ্রূষাকারীরা তাহার সমুখ দিয়া আদেশ পালন জন্য বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া যাইতেছে—রোগীর গোঙ্গানা ক্রন্দনে ও দীর্ঘশ্বাস, ডাক্তারের কথা সকলের প্রতিটী শব্দ যেন এক সুরে ভরিয়া—তাহার কানে আসিতেছিল। প্রথমটা এ সবই তাহার নিকট একটা বিভ্রম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, এর মধ্যে কিছুতেই যেন তাহার মন মানিতেছিলনা। কিছু কাল সে মনমরা হইয়া রহিল। কিন্তু কিছু কাল পরেই যে উৎসাহস্রোতে এখানে সব জিনিসেই প্রবাহিত হইতেছিল—তাহাকেও লইয়া বসিল। এই স্রোতে সাঁতার দিয়া কেমনে সকলে ভাসিতেছে তাহার তাহা জানিবার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা হইল। এই আশায় সে এই ঘুর্ণিপাকে যোগ দিল যে ইহাতে তাহার মনের ভাব কাটিয়া যাইবে, সে সুখী হইতে পারিবে।

একজন ডাক্তার কহিল 'করোসিড্ সাব্লিমেট।' একটা লাল চোখ সরু ছোকরা বলিল ও বাথটায় আরো খানিকটা গরম জল চাই। "দেখ হে তোমার নাম কি?" "ওরলফ্" "বেশ এই রোগীর হাত পা হাতিয়ে দাও... হাঁ বেশ এই রকম করে,...তুমি বেশ কথা বুঝতে পার, ঠিক অত জোরে না, তাহলে যে ওর চামড়াই উঠে যাবে।" একজন ছাত্র ওরলফ্কে উপদেশ দিতে দিতে কহিল "ওঃ, কি পরিশ্রমটাই যে হয়েছে। একজন ডাকিয়া কহিল "ওই আর একজন রোগী নিয়ে এলো—ওরলফ্ দেখতো গিয়ে, ভেতরে নিয়ে আস্‌তে ওদের সাহায্য কর। ওরলফ্ উৎসাহিত হৃদয়ে সব আদেশই পালন করিতে লাগিল। তার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে যাইত। কান ভোঁ ভোঁ করিতে থাকিত, চোখের সম্মুখে সে কুয়াসা দেখিত। এক এক সময়ে চারিদিকের গোলমালে ও উপর্য্যুপরি চাপে সে নিজের সত্বাই ভুলিয়া যাইত। রোগীর কাল চক্ষুর চারিধারের নীল আবরণ, তাহাদের মুখে শিশার মত রং; তাদের হাড় কখানা যেন শরীর থেকে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে, চামড়ার বদ্‌গন্ধ, অৰ্দ্ধমৃত দেহের অঙ্গভঙ্গী এই সমস্ত তাহার হৃদয়ে বড় কঠোরভাবে বাজিত, এবং কেমন একটা ভাব তাহার মনে জাগিত, এ ভাব তাহার মনে পূর্ব্বে কখনও আসে নাই।

একবার কি দুইবার সে চকিতে তাহার স্ত্রীকে দেখিয়াছিল। সে যেন এই ক'ঘণ্টায়ই অনেকটা সরু হইয়া পড়িয়াছে, তার ধব্‌ধবে মুখখানিতে পরিশ্রান্ত চাহনি। সে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল "কেমন আছিস্," মাট্রোসা উত্তরে শুধু একটু হাসিয়া অদৃশ্য হইল। একটা চিন্তা ওরলফের মনে আসিল—তাহার স্ত্রীকে এই নরকে আনিতে এত কি তার আবশ্যক ছিল? হয় তো এরোগ তার হইতে পারে, সে মরে যেতে পারে......। দ্বিতীয়বার তাহাকে দেখিয়া সে বড় করিয়া কহিল "খুব পরিষ্কার থাক্‌বি বুঝ্‌লি। হাত বার বার ধোয়া চাই—খুব সাবধান।" সে তার ছোট শুভ্র দন্ত বিকাশ করিয়া যেন তাহাকে অবহেলা করিবার জন্যই বলিল "এসব তুমি বল কেন? যদি আমি সাবধান না হই!" পত্নীর উত্তরে সে রাগিয়া উঠিল, সে ভাবিল 'দেখ এমন জায়গাও ঠাট্টা কচ্ছে—কি বোকা এই নারী জাতটা!' পত্নীকে আর কিছু বলিবার সে অবকাশ পাইল না, মাট্রোসা স্বামীর রাগ ভাব দেখিয়া তাড়াতাড়ি নারীমহলে সরিয়া পড়িল।

একটু পরেই ওরলফ্ তাহার চেনা একটা পুলিসের জীবনহীন দেহকে লইয়া যাইবার সাহায্য করিতেছিল। দু'দিন আগেই এই পুলিসটাকে সে রাস্তার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছে, এবং হাজার-বার ইহার মুণ্ডপাত করিয়াছে, ইহার সঙ্গে ওরলফের কখনও সদ্ভাব ছিল না। দু'দিন আগে যার স্বাস্থ্য এত ভাল ছিল এখন সে মৃত, অতি বিশ্রী চেহারা হইয়া গেছে রোগে। মৃতদেহ বাহকদের স্কন্ধে এদিক ওদিকে দুলিতেছিল, সে যেন খোলা চোখে তাকাইয়া আছে। ওরলফ্ ভাবিতে লাগিল। "যদি চব্বিশঘণ্টার মধ্যেই একটা আঘাতে মানুষকে ভেঙ্গে

এমনি চুড়মার করে দেয় তো মানুষ কেন জগতে আসে ?" সে পুলিসটার জন্য মনে দুঃখ করিতে লাগিল, এখন এর তিনটি ছেলের দশা কি হইবে ! গত বৎসর ইহার স্ত্রী মারা গেছে, আর একটা বিয়ে করিবারও সময় পায় নাই এ—এখন এই হতভাগা সন্তানগুলির বাপ মা কেউ নাই, এই চিন্তায় তাহার মনে বড়ই দুঃখ হইল। হঠাৎ শবের বাঁ হাত সোজা হইতে লাগিল, সেই সময়ই তাহার মুখ যা এতক্ষণ খোলা ছিল বন্ধ হইয়া গেল। ওরলফ্ অন্যান্য বাহকদের আসিতে বলিয়া, খাট নামাইয়া শঙ্কিত ভাবে ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল "থাম একটু এখনো বেঁচে আছে" বাহকেরা ফিরিয়া সব ভাল করিয়া দেখিয়া ওরলফ্‌কে রাগিয়া বলিল "কি বাজে বক্‌ছ—বুঝ্‌তে পাচ্ছ না ও শবাধারে যাবার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছে, দেখ্‌ছ না কলেরায় কেমন মুসরে গেছে।...ও-ভাবে তো আর শুতে পারবে না।... এস—চলে এস। ওরলফ্ ভীত কাকুতিভাবে কহিল "কিন্তু দেখ এখনো নড়্‌ছে।" "বোকা কোথাকার আমার কথা কি তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না! উঠিয়ে নাও, তাড়াতাড়ি চল—ও হাত পা একটু আয়েস করে নেবার জন্য নড়্‌ছে। তুমি এত মুর্খ যে বল্‌ছ কিনা বেঁচে আছে? যে মরে গেছে, তার সম্বন্ধে এ কথা কে বলে—বল দেখি ভাই, এ মজার জায়গা এখানে সব শবই নড়ে, কিন্তু আমি ভাই এ-সব কথায় তোমায় চুপ্ করে থাক্‌তে বলি।

"খবরদার কাকো বলো না যেন ও নড়েছিল। তা হলে একথা মুখে মুখে রাষ্ট্র হয়ে হাঁসপাতাল সম্বন্ধে ভারী একটা কেলেঙ্কারি হবে, তাহলে সকলে বল্‌বে আমরা ওদের জীয়ন্ত-কবর দি। তাহলে সব লোক ক্ষেপে এসে এখানে একটা হাঙ্গাম সুরু কর্‌বে, তুমি ও ঘুঁষি চড় থেকে বাদ যাবে না;—বুঝ্‌লে, উঠাও এখন।" অপর বাহক প্রমিনের শান্তকণ্ঠ ও বলিবার নরম সুরে ওরলফ্ আশ্বস্ত হইল।

"মাথা সোজা করে চল ভাই—এক গ্লাস সরাব চাই নাকি?" ওরলফ্ বলিল "কে না চায়? এই সব সময় কাজে আস্‌বে বলে ওই কোণে একটু রেখে দিয়েছি, কি বল—চল যাওয়া যাক্।" তাঁহারা হাঁসপাতালে একটা নির্জ্জন কোণে গিয়া একটা বোতল লইয়া বসিল। প্রমিন একটু এসেন্স অব্ পিপারমেণ্ট মিলাইয়া ওরলফের হাতে দিল "নাও এ না কর্‌লে ওরা গন্ধ পেয়ে ভাব্‌বে আমরা মদ খেয়েছি। ওরা মদ সম্বন্ধে এখানে বড় সাবধান—বলে যে এ বড় খারাপ।" ওরলফ্ বলিল "আর তুমি—এ জায়গায় থাকা তোমার সয়ে গেছে বোধ হয়" "তাই তো মনে হয়, আমি সব প্রথম এখানে এসেছি। শএ শ' আমার সমুখে মরেছে। এ জায়গায় জীবন অনিশ্চিত বটে কিন্তু একপক্ষে সত্যি বল্‌তে কি—একেবারে মন্দ না—ভগবানের কাজ, এ যুদ্ধ রেডক্রসের মত। তুমি শুশ্রূষা-কারিণীদের রেডক্রস অ্যাম্বুলেন্স ওয়ার্কের কথা শুনেছ তো? আমি তাদের তুর্কি যুদ্ধে দেখেছি........ ....। সত্যি অ্যাম্বুলেন্সের লোকগুলো ভারী সাহসী! হৃদয় তাহাদের দয়া সাহসে ভরা, সৈনিক আমরা আমাদের বন্দুক কামান আছে, কিন্তু তারা ঐ সব গোলাগুলির মধ্যে চল্‌তো যেন ফুলের বাগানে বেড়াচ্ছে, আমাদের বা তুর্কিদের কাউকো দেখলেই তারা ঐ মরণের খেলা থেকে আমাদের উঠিয়ে এনে ডাক্তারের কাছে নিয়ে আস্‌ত। ওঃ, সে কি ভীষণ, একজনের হয় তো কাঁধে একটা গুলি লেগে পড়ে গেল...।"

নেশার প্রভাব ও এই কথাবার্ত্তায় ওরলফের মন বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, সে একজন রোগীর পা ঘষিয়া দিতে লাগিল। তার পেছনেই একজন করুণস্বরে বলিতেছিল "একটু জল দাও আমায় ..একটু খাবার কিছু...ভগবানের দোহাই।" আর একজনের শীতে দাঁত লাগিতেছিল "ওঃ, বড় ঠাণ্ডা... একটু গরম...ডাক্তারবাবু ভগবান আপনার ভাল করবেন...একটু গরম জল।" ডাক্তার ওয়াসেস্কো ডাকিয়া কহিল "দেখি মদটা এদিকে এগিয়ে দাও তো।" ওরলফ্ নিজের কাজ করিতে করিতে মনযোগের সহিত চারিদিকের সব ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিত। প্রথমটা তার নিকট এই সব ব্যাপার যতটা অর্থহীন গোলমেলে বোধ হইত, এখন আর তেমন বোধ হইত না। এ নিয়ম হীন একটা কিছুর

রাজত্ব নয় এখানে, কিন্তু শক্তি, জ্ঞান এবং কার্য্যকরী ক্ষমতা এথাতে বিরাজ করিতেছে। কিন্তু পুলিসটার কথা মনে হইতেই তাহার কেমন ভয় হইতেছিল এবং সে বার বার জানালা দিয়া মরা-ঘরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। তাহার মনে সত্যি বিশ্বাস হইয়াছিল যে পুলিস মারা গেছে কিন্তু তবু থাকিয়া থাকিয়া কেমন একটা সন্দেহ আসিতেছিল—ধর যদি মরা মানুষটা হঠাৎ চীৎকার করিয়া লাফাইয়া ওঠে। তাহার মনেপড়িতে লাগিল কবে কে বলিয়াছিল "কলেরায় মরা মানুষ শবাধার হইতে উঠিয়া যাকে-তাকে তাড়া করে।" সে প্রতি কাজে ঘুরিতে ফিরিতে রোগীর গা টিপিতে, বাথরুমে নিতে, সব সময়ই যেন তার মাথায় এক চিন্তা। সে ম্যাট্রোসার কথা ভাবিতে লাগিল—সে এখন কি করিতেছে। একবার তাহার পত্নীকে তখনই দেখিবার ইচ্ছা হইতে লাগিল, যদি সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও হয়। কিন্তু একটু পরেই আর এক চিন্তা আসিল "যা হোক সে বেশ আছে এখানে—একটু বেশী মোটা-সোটা হয়েছে—এখানে একটু নড়্‌লে চড়্‌লে একটু নানানসই হয়ে আস্‌বে। তাহার শুধুই বিশ্বাস হইতে লাগিল ম্যাট্রোসা গোপনে এমন মতলব করিতেছে যাহা তাহার পক্ষে মোটেই স্ফূর্ত্তির নহে। সে এও পর্য্যন্ত মনে স্বীকার করিতে পারে এবং এও সম্ভব সে জীবনে একটা পরিবর্ত্তনের প্রয়াসিনী।

তাহার এপর্য্যন্ত স্বীকার করিবার কারণ সে তাহার ভক্তিতে সন্দেহ করিয়াছিল এবং এই ঈর্ষার ফলে সে নিজেকে প্রশ্ন করিল—"কেন আমি আমার খন্দ ছেড়ে এই উত্তপ্ত জীবন-প্রবাহে এসে পড়্‌লাম? এই সব এবং আরো সহস্র চিন্তা তাহার অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে পাক খাইতে লাগিল, কিন্তু ইহা তাহার কর্য্যের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না বরঞ্চ অনবরত কর্ম্ম-প্রবাহে চিন্তারাশি অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। সে এই ডাক্তার ও ছাত্রদের মত এত কাজ কখনো মানুষকে করিতে দেখে নাই, তাহাদের মুখের দিকে চাহিলেই বোঝা যাইত অর্থের উপরও এমন একটা জিনিস আছে যাহার ছাপ তাহাদের মুখের উপর রহিয়াছে।

ওরলফের কাজের ছুটি হইয়া গেলে যদিও তাহার পা চলিতেছিল না তবু সে হাঁসপাতালের উঠানে গিয়া ডিস্‌পেন্‌সারীর জানালার পাশে দেয়ালে ঠেস দিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার চিন্তারাশি যেন কেমন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল! হৃদয়ের কাছে কেমন যেন বেদনা বোধ করিতে লাগিল, পা দুখানি ক্লান্তিতে ভার হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার চিন্তার বা আকাঙ্ক্ষা করিবার আর ক্ষমতা ছিলনা, সে আকাশের দিকে চাহিয়া অস্তগামী সূর্য্যের বর্ণ-বৈচিত্র দেখিতে দেখিতে নিজের দেহ ঘাসের উপর বিছাইয়া দিল। সে ক্লান্তিতে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় তখনই ঘুমাইয়া পড়িল।

সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল;—যেন একটা বৃহৎ কক্ষে সে ও তার পত্নী, ডাক্তার ওয়াসেঙ্কোর অতিথি, চারিদিকে সব চেয়ার সাজান, এই চেয়ারগুলিতে হাঁসপাতালের সব রোগী বসিয়া আছে, সে দেখিল; যেন তাহার পত্নী ডাক্তারের সহিত রুসজাতীয় নৃত্য নাচিতেছে, সে নিজে বেঞ্জো বাজাইতেছে। তাহার হৃদয় হাল্‌কা হাস্যোচ্ছ্বাসিত, ঘরে রোগী যাহারা বসিয়াছিল তাহারাও হাসিতেছিল, ও চেয়ারে অস্থির ভাবে দুলিতেছিল। হঠাৎ দোরে পুলিশটা আসিয়া উপস্থিত হইল, সে ভয়-দেখানো কণ্ঠে কহিল "ওরলফ্‌ তুমি ভেবেছিলে আমি মরে গেছি। তুমি বেশ বেঞ্জো বাজাচ্ছ কিন্তু আমায় মরা-ঘরে পাঠিয়েছিলে—চল এখন তল্পা তুলে আমার সঙ্গে চল।"

কম্পিত দেহে ঘামে ভিজিয়া ওরলফ্‌ জাগিয়া মাটি হইতে উঠিয়া বসিল। সমুখে দেখে ডাক্তার ওয়াসেঙ্কো বিরক্তি দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া আছে। "দেখছে দুটো কথা বলি, ঘুমোতে হয় হাঁসপাতালে তোমার বাক্সই আছে, তোমার কি সে ওয়া দেখায় নি? তুমি নিজে শুশ্রূষাকারী হয়েই যদি এ ভাবে কিছু গায় না দিয়ে খালি-মাটিতে ঘুমোও সে কেমন হয়? ভগবান না করুন হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যদি কিছু হয় ত' কি হবে? এমন ভাবে চলতে হয় না ভাই, এখন কাঁপ্‌ছ কেন—এস আমার সঙ্গে?" ওরলফ্‌ ক্রটি স্বীকার করিয়া মৃদুস্বরে কহিল "বড় পরিশ্রান্ত

হয়ে পড়েছিলাম ?” “ওইতো খারাপ, খুব সাবধান থাক্‌তে হবে, তোমায় দিয়ে ভারী দরকার !” ওরলফ্‌ ডাক্তারের সঙ্গে গিয়া ছুটো ওষুধ খাইয়া থুথু ফেলিল। “বাস্‌ এখন ঘুমোও গে, নমস্কার ?” ডাক্তার তাহার লম্বা পা ফেলিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন, ওরলফ্‌ তাহার পানে চাহিয়া রহিল, হঠাৎ তাহার মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল, এবং সে ডাক্তারের পেছনে দৌড়াইয়া গেল। “ধন্যবাদ ডাক্তার বাবু!” ডাক্তার দাঁড়াইয়া বলিলেন “কেন ?” “আমি এখানে কাজ পেয়েছি বলে ! আমি যথাসাধ্য আপনাকে সন্তুষ্ট কর্‌ব, আমি এখানে এই কর্ম্মপ্রবাহে থাক্‌তে চাই, আপনি এখনি বলেছেন, আপনি আমায় চান, তাই আমি অন্তরের সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।” ডাক্তার বিস্মিত হইয়া শুশ্রূষাকারীর আনন্দভরা উত্তেজিত মুখের পানে চাহিলেন, এবং বন্ধু ভাবে হাসিলেন, “তুমি দেখ্‌ছি অদ্ভুত লোক, যাক্‌ তুমি সোজা কথা বল, এতে আমি খুসী—বেশ এস তা হলে, ভাল কাজকর্ম্ম কর।—আমার জন্যে কিছু না, এই রোগীদের জন্যে কর, এ যুদ্ধক্ষেত্রের মত—রোগীদের আমাদের মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচাতে হবে বুঝেছ ? বেশ সব শক্তি নিয়ে আমাদের কাজে সাহায্য কর, যাও ঘুমোও গে।”

ওরলফ্‌ ডাক্তারের মত লোকের সহিত এইরূপ বন্ধুভাবে কথা কহিয়া গর্ব্ব অনুভব করিল, সে আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল তাহার শুধু দুঃখ হইল, যে ম্যাট্রোসা এই কথাগুলি শুনিতে পাইল না, একথা কাল সে তাহাকে বলিবে কিন্তু সে বোধহয় একথা বিশ্বাস করিবেনা…এই সব আনন্দ-চিন্তায় বিব্রত হইয়া ওরলফ্‌ ঘুমাইয়া পড়িল।

(৬)

“চা খাবে এস।” এই বলিয়া ম্যাট্রোসা পরদিন ভোরে তাহার স্বামীকে জাগাইল। সে মাথা উঠাইয়া পত্নীর পানে চাহিয়া রহিল, ম্যাট্রোসা তাহার পানে চাহিয়া মৃদু হাসিতেছিল, চুলরাশি তার বেশ ব্রাস করা উজ্জ্বল ও পরিষ্কার দেখাইতেছিল, সেই সঙ্গে তাহার সাদা পোষাক তাহাকে বেশ সুশ্রী শ্রী-মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল। পত্নীকে এইরূপ দেখিয়া তার বেশ আনন্দ হইল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার তাহার মনে হইতে লাগিল যে হাঁসপাতালের অপর সব লোকেও ম্যাট্রোসার পানে চাহিয়া এমনি আনন্দ পাইতে পারে! সে হাঁই তুলিয়া কহিল “কি খাব ?” “চা তৈরী।” “আমি এখানেই আমার চা খাব। তুই কোথায় গিয়ে খেতে বল্‌ছিস ?” ম্যাট্রোসা তাহার হাসিভরা চোখ দুটী তুলিয়া তার পানে চাহিয়া বলিল “এস আমরা দু'জনে এক সঙ্গেই চা খাব।” ওরলফ্‌ মুখ ফিরাইয়া সংক্ষেপে উত্তর করিল সে যাইতেছে। পত্নী কক্ষ ত্যাগ করিলেই সে আবার ভাবিতে লাগিল। “হাঁ ও আমায় চা খেতে ডাক্‌ছে,………বেশ স্ফূর্ত্তিতে আছে দেখ্‌ছি—এক দিনে ও একটু রোগা হয়ে গেছে দেখছি।” পত্নীর জন্য তার মায়া হইতে লাগিল, এবং পত্নীকে আশ্চর্য্য করিবার অভিপ্রায়ে তাদের চার সময়ে খানকত কেক লইয়া যাইবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু মুখ ধোয়ার সময় সে চিন্তা দূর করিয়া দিল—“কেন সে স্ত্রীকে নষ্ট করিবে—এছাড়াও তার বেশ চল্‌ছে।” তারা একটা ছোট কুঠুরীতে বসিয়া চা পান করিল, মাঠের দিকের দু'টো জানালা খোলা। প্রভাতসূর্য্যের কিরণধারা মেজেয় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। জানালার নীচে ঘাসের উপর শিশির তখনও ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছিল। দূরে রাস্তার উপরকার গাছগুলি যেন আকাশের শেষ সীমায় মিশিয়া গেছে। মেঘ হীন আকাশ, তাজা ঘাস ও ভিজে পৃথিবীর একটা গন্ধ, জানালা দিয়া ঘর ভাসাইতেছিল। দুটো জানালার মাঝখানে টেবিলটা ছিল, এবং ওরলফ্‌ ম্যাট্রোসা এবং তাহার একজন সঙ্গিনী এই তিন জনে চা পান করিতে বসিয়াছিল। সঙ্গিনীর নাম ফেলিজা জোগোরোভনা—

সে একজন কলেজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মেয়ে। সে ওরলফ্‌কে জানালার ধারে বসিয়া চা পান করিয়া সুন্দর বাতাসে তাহাকে জুড়াইয়া নিতে বলিল। ওরলফ্‌কে বসাইয়া সে বাহিরে গেল। ওরলফ্‌ পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিল "কাল কি খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলি না কি ?" ম্যাট্রোসা কহিল "তাই তো বোধ হয়েছিল, পা যেন আর আমায় বইতে চাইছিল না, মাথা ভোঁ ভোঁ কচ্ছিল ; তারপর যা নড়া-চরা কচ্ছিলাম সে আমার মনে হয়েছিল মরার মত, জ্ঞান হারা হয়ে, ভগবানের কাছে সব সময় প্রার্থনা করেছি যেন তিনি আমাদের উপর সদয় হন।" "কি রকম কথা হোল, তুই ভয় পাসনি এখানে ?" "কেন রোগীদের দেখে-?" "রোগী অথবা আর কিছু ?" সে স্বামীর দিকে ঝুঁকিয়া আস্তেআস্তে বলিল "আমার শুধু মরা মানুষ দেখে ভয় করে, তুমি জান কি – মরেও ওরা নড়ে, সত্যি বল্‌ছি!"

"আমি জানি—সে আমি নিজেই দেখেছি।" ওরলফ্‌ তখনই হাসিয়া কহিল "পুলিশ ন্যাজারফ খাটিয়ায় শুয়েই আমায় ঘুঁষি মেরেছিল! আমি তাকে মরা-ঘরে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ সে তার বাঁ হাত বের করে বস্‌লে আর কি...মরতে মরতে বেঁচে গেছি, সত্যি কথা!" ওরলফের মন বেশ প্রফুল্ল ছিল, এই উজ্জ্বল পরিষ্কার কক্ষে বসিয়া সীমাহীন সবুজ মাঠ এবং অনন্ত আকাশ পরিষ্কার দেখাইতেছিল, এইখানে বসিয়া চা খাইতে তাহার অত্যন্ত আনন্দ হইতে লাগিল। আরও কিছু ছিল তার ভেতরে—যাতে তার আনন্দ আরো বেশী বোধ হইতে লাগিল,—যেন তাহার ব্যক্তিত্ব, বিশেষত্ব হইতেই তাহাকে উজ্জ্বল করিতে লাগিল। তাহার নিজের চরিত্রের ভাল দিকটা ম্যাট্রোসাকে দেখাইবার তাহার প্রবল ইচ্ছা হইতে লাগিল, এবং সেই সময়ই ম্যাট্রোসার চোখে বীর বলিয়া প্রতিভাত হইবার ইচ্ছাও তাহার হইতেছিল। "এই আমি আমার জীবনের ব্রত ধরে নেব, স্বর্গ হতে আশীষ আনন্দধারা বর্ষিত হবে এতে; এ কাজ গ্রহণ করবার আমার কারণও আছে ··আমি বল্‌ছি, এ জায়গায় যেমন লোক দেখ্‌বে এমন লোক পৃথিবীতে মেলা দুষ্কর···" সে তখন ডাক্তারের সহিত তাহার যে কথা হইয়াছিল তাহা ম্যাট্রোসাকে বলিল, তাহার অজ্ঞাতসারে মনের উৎসাহে বিবরণটা একটু বর্দ্ধিতাকারেই দেওয়া হইল। সে বলিতে লাগিল "তার পর ধর এই কাজ,—এও একটা পুণ্যের কাজ—একটা যুদ্ধের মত। একদিকে কলেরা দাঁড়িয়েছে একদিকে আমরা···কে বলবান সেই পরীক্ষা হচ্ছে! সবদিকে চোখ সমানে রাখ্‌তে হবে, এই আমাদের কাজ—তবেই কলেরা কি করে দেখা যাবে। ডাক্তার ওয়াসেঙ্কো আমায় বল্‌ছিলেন, "ওরলফ্‌ একাজে তোমায় আমাদের দরকার, ভয় পেলে চল্‌বে না তোমার, রোগীদের পা আর পেট হাতিয়ে দাও, আমি ওষুধ দিয়ে ওদের ভেতর পরিষ্কার করে দেব···তবেই রোগীর জীবনের ভয় থাক্‌বে না—সেরে উঠে ওদের জীবনের জন্য আমাদের কত ধন্যবাদ দেবে। ভেবে দেখ ম্যাট্রোসা আমি আর তুই একসঙ্গে, ম্যাট্রোসা আমি আর তুই!" সগর্ব্বে তাহার বক্ষ বিস্তৃত হইল, ম্যাট্রোসার পানে জ্বল্‌-জ্বল্‌ চোখে চাহিয়া রহিল। ম্যাট্রোসা শুধু হাসিল—কোন উত্তর করিল না, কথা কহিবার সময় ওরলফ্‌কে কত সুন্দর দেখাইল,—বিবাহের প্রথম দিন ম্যাট্রোসা, ওরলফ্‌কে যেমন দেখিয়াছিল তাহার সেই কথা মনে পড়িল। ম্যাট্রোসা বলিল—"নারীদের দিগেও সকলেই এ বিষয়ে খুব উৎসাহী, ভাল চশমা চোখে মেয়ে ডাক্তারটি, নার্সেরা সকলেই বেশ লোক।" ওরলফের উৎসাহ একটু মন্দা হইলে সে কহিল "তাহলে তুইও সন্তুষ্ট হয়েছিস্‌?" "হাঁ ভারি আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।—হাঁ ধর দেখি—আমি পাই ১২ রুবল, তুমি পাও ২০ রুবল তা হলে হোল ৩২ রুবল। এ আমাদের খোর-পোষ বাদে—যদি কলেরা শীত পর্য্যন্ত টিকে যায়, তবে তো আমরা ঢের জমিয়ে নিতে পার্‌ব। তা হলে হয়তো আমরা ভগবানের অনুগ্রহে ও-খন্দ ছেড়ে শীঘ্রই অন্যত্র যেতে পার্‌বো। ওরলফ্‌ চিন্তিত হৃদয়ে কহিল "হাঁ, সে হবে তখন।" তার

পর ম্যাট্রোসার কাঁধ চাপড়াইয়া আশার স্বরে কহিল "ম্যাট্রোস—সুখ আবার হবে ;—হতাশ হয়োনা—কি বল?" ম্যাট্রোসারও হৃদয় আশা উৎসাহে ভরিয়া গিয়াছিল। ম্যাট্রোসা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সংশয়-দোলিত স্বরে কহিল "হাঁ তুমি যদি শুধু একটু শান্ত হয়ে থাক।"

"যাক্ ও কথা এখন বলিস্ না,—সে সম্পূর্ণ অবস্থার উপর নির্ভর করে, জীবনটা ভিন্ন পথে চললেই আমার অভ্যাস বদলে যাবে।" ম্যাট্রোসা হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে দীর্ঘশ্বাস উঠাইয়া বলিল "ভগবান করুন তাই হোক্।"

"যাক্ ও-নিয়ে আর বেশী কথা বলিস্ না।"

"আমার প্রিয়তম!"

তারা দু'জনেই দু'জনার উপর একটা অপূর্ব্ব ভাব লইয়া যার যার কাজে চলিয়া গেল। উভয়ের হৃদয়ে আনন্দ সাহসে ভরা, উভয়েই তাহাদের নূতন কার্য্যে কৃতকার্য্য হইবার আশায় বদ্ধপরিকর। তিন চারিদিন মধ্যেই ওরলফ্ তাহার ক্ষিপ্রতা ও কার্য্যে উৎসাহ জন্য সকলের যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিল। এই সময় সে লক্ষ্য করিল যেন অন্যান্য শুশ্রূষাকারীরা তাহার উপর একটু হিংসুক হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে জব্দ করিতে চাহে, তাই সে সকল সময় সতর্ক হইয়া চলিত! এই ব্যাপারে প্রমিনের সঙ্গে যে তার এত বন্ধুত্ব ছিল তার সঙ্গেও একটু শত্রুতা দাঁড়াইয়া গেল। সহকর্ম্মীদের ভেতর এই গুপ্ত ও প্রকাশ্য শত্রুতা তাহার প্রাণে যেন কেমন লাগিত। তাহার অজ্ঞাতসারে এই নানা চিন্তার মধ্যে ম্যাট্রোসার কথা আসিয়া পড়িত, কারণ সে তাহার সহিত তো সব বিষয়েই আলোচনা করিতে পারে—সে তো তাহার কৃতকার্য্যতায় ঈর্ষা প্রকাশ করিবে না, এই প্রমিনের মত কার্ব্বলিক এসিড দিয়া তাহার বুটও পোড়াইয়া দিবে না। ওরলফ্ প্রথম দিন যেমন দেখিয়াছিল, রোজ তেমনই রোগীর আমদানী হইতে লাগিল, কিন্তু ইহাতে সে এখন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আর তাহার তেমন ক্লান্তি বোধ হইত না। সে নানা ঔষধের গন্ধ ঘ্রাণ লইয়া ঠিক করিতে পারিত। ডাক্তারেরা আদেশ করিবামাত্রই সে ধরিতে পারিত, ইসারায়-ইঙ্গিতে বলিলেও তাহার বুঝিবার দেরী হইত না। গল্প-গুজব করিয়া কেমন ভাবে রোগীর মন ভাল রাখিতে হয় সে তাহা জানিত, তাই ডাক্তারেরা ও ছাত্রেরা তাহাকে খুব ভালবাসিতে লাগিল। তার এই নূতন কার্য্যে যে সব অভিজ্ঞতা ও ধারণা সে লাভ করিতে লাগিল তাহাতে তাহার মনের ভাব ও আত্মসম্মান বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তাহার মনে একটা প্রবল অকাঙ্ক্ষা জাগিতে লাগিল.--সে নূতন ধরণের মহৎ কার্য্য এমন একটা কিছু করিবে যাহাতে সকলের দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হয়—সে যে একটা মানুষ, এ ধারণা যেন তাহার এই মাত্র জন্মিয়াছে তাই সে কোন একটা মহৎ কাজ করিয়া লোককে ও নিজেকে সেই কথা জানাইতে চায়। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া সাধারণের চোখে বড় হইবার আশায় ওরলফ্ অনেক সাহসিকতার কাজ নিজের উপর লইত। সে একাই অন্য কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা না করিয়া একটা ভারী রোগীকে বাথরুমে নিয়া যাইত। অতি অপরিষ্কার বীভৎস রোগীকেও নিজে পরিষ্কার করিয়া দিত, ঘৃণা-অবজ্ঞা তার যেন একটুও নাই, সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভাবে সে রোগীর সহিত ব্যবহার করিত।

কিন্তু এসব কাজ করিয়াও সে নিজে সুখী হইতে পারিল না। এর চেয়ে বড় কাজ—সাধারণে যা পারে না, তাই করিবার জন্য হৃদয় তাহার চাহিতেছিল, এই অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা তাহাকে জ্বালাইতে লাগিল, আবার তাহার সেই পূর্ব্বের মানসিক অবস্থা আসিল, এবং আর কাহারও সহিত মনের কথা কহিতে না পারিয়া ম্যাট্রোসার কাছেই মন খুলিয়া দিত।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় তাহাদের কাজ শেষ হইয়া গেলে তাহারা দুইজনে মাঠের দিকে বেড়াইতে বাহির হইল। হাঁসপাতাল—সহর হইতে একটু দূরে, মাঝখানে একটা মস্ত মাঠ,—উত্তর দিকে মাঠ বহুদূর বিস্তৃত, দক্ষিণে নদী-তীর—তার পাশ দিয়েই গাছে ঢাকা সহরের রাস্তা চলিয়াছে।

সূর্য্য সবে অস্ত যাইতে আরম্ভ হইয়াছে, স্বর্ণ কিরণে সমস্ত বিশ্ব উদ্ভাসিত। ওরলফ্-দম্পতি নীরবে মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ করিতে লাগিল; হাঁসপাতালের বাতাসের তুলনায় এ যেন স্বর্গের বাতাস। ম্যাট্রোসা দেখিল তাহার স্বামী চিন্তায় ডুবিয়া গেছে—সে মৃদুস্বরে কহিল—"শোন! ঐ ব্যাণ্ড বাজ্‌ছে না·· সহরে না ঐ ব্যারাকে?" তাহার স্বামীর আপন মনে অত চিন্তা সে আদৌ পছন্দ করিত না, এই সময়ে স্বামী যেন তার কত দূরের লোক—কত অপরিচিত বলিয়া বোধ হইত। এ কয় দিন দেখাসাক্ষাৎ তাহাদের মধ্যে কচিৎ হইয়াছে। তাই যতটুকু সময় দু'জনে একসঙ্গে থাকা যায় সেইটুকুই ম্যাট্রোসার কাছে বহুমূল্য বোধ হইতেছিল। ওরলফ্ যেন স্বপ্ন হইতে উঠিল, এইভাবে জিজ্ঞাসা করিল "ব্যাণ্ড,— অতি যাচ্ছে তাই! দেখ-দেখি—গান তো আমার হৃদয়ে কি সঙ্গীত হচ্ছে ·· এই হচ্ছে আসল গান!···"

ম্যাট্রোসা ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া কহিল "কি রকম গানের কথা বল্‌ছ তুমি?" "কি রকম সে আমি নিজেই জানি না, সে আমি তোকে বুঝিয়ে দিতে পারবো না, আর পারলেও তুই সে বুঝ্‌তে পারবি না। আমার হৃদয়ে কি যেন একটা জ্যোতি এসেছে···সমুখে ছুটে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে, দূরে—অনেক দূরে...সব শক্তি দিয়ে চল্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে! এমন অসীম শক্তি দেখ্‌তে পাচ্ছি···আমার ভেতরে। ধর, যদি ঐ কলেরা মানুষ হয়ে আসে—এমন কি দৈত্য হয়েও আসে, তা হলে আমি এবার তার সঙ্গে লড়ে দেখি—কে জেতে! তুমিও জোয়ান, আমি গ্রিস্‌কা-ওরলফ্, আমিও জোয়ান···দেখা যেতো পরখ করে--কে বেশী শক্তি ধরে! আমি নিশ্চয়ই তাকে হারাবো; যদি আমার প্রাণও যায়...তা হ'লে এই সবুজ মাঠে ওরা আমার একটা স্মৃতিস্তম্ভ তুলবে—"গ্রিগরি এণ্ড্রেফ্ ওরলফ্ যে রাসিয়াকে কলেরার হাত হইতে মুক্ত করিয়াছে তাহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ"···এই আমি চাই!" তাহার চোখ মুখ কথা বলিবার সময় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। "আমার প্রিয়তম বীর" এই বলিয়া ম্যাট্রোসা তাহার কণ্ঠলগ্ন হইল। "যদি একটু কিছু উপকারও করতে পারি তো আমি হাজার বিপদের মধ্যে যেতেও রাজী আছি বুঝ্‌লি?......আমার নিজের জন্য কিছু না—কিন্তু মানুষের জীবনকে সুখী করবার জন্যই...এখানে ডাক্তার ওয়াসেঙ্কো ছাত্র সোজেফের মত লোকও দেখি—ওরা যা করে একেবারে আশ্চার্য্য। কেউ দেখে বল্‌বে এত ক্লান্তি সয়েও এরা বেঁচে আছে কেমন করে! তুই কি ভাবিস ওরা অর্থের মোহেই এত কচ্ছে? প্রধান ডাক্তার তো নিজে মস্তো ধনী, তার তো আর অর্থের দরকার নেই—এর ভেতর অর্থের কোন কথা নেই—শুধু দয়ায় এ করে। লোকের দুঃখ সইতে না পেরে ওরা এ কাজ করে,···কার জন্য? সবার জন্যই—মিস্কা ওসফের জন্যও যা করবে, সকলের জন্যই তাই করবে—আর সকলের জন্যও যা করেছিল, ওর জন্যও তাই করেছে। কিন্তু এই মিস্কা একজন দাগী চোর, তবু এরা তার সেরে ওঠাতে কত সুখী হয়েছিল। আমিও অমন-ধারা খুসী চাই—ওদের খুসী দেখলে আমার হিংসা হয়···আর অমনি কাজ করতে আমারও ভয়ানক ইচ্ছা হয়। কিন্তু কিভাবে আরম্ভ করি? আঃ কি যে মুস্কিল।" সে পুনরায় চিন্তামগ্ন হইল। ম্যাট্রোসা নীরব রহিল, কিন্তু তাহার বুক ধরফর করিতে লাগিল। তাহার স্বামীর চিত্তের অস্থির ভাব তাহাকে উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিল, সে তাহার কথা হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিল—কি চিন্তার আগুনে তাহার বুক জ্বলিয়া যাইতেছে। সে তাহার স্বামীকে ভালবাসিত, এবং স্বামীই সে চায়—বীর সে চায় না···।

তাহারা নদীর তীরে আসিয়া ঘাসের উপর উভয়ে পাশাপাশি বসিল, তাহাদের মাথার উপরে গাছের পালকের মত শিশগুলি দুলিতেছিল, সমস্ত গাছে-গাছে কি-যেন একটা কান-কথা হইয়া যাইতেছিল, যেন এই গাছের ছায়ায় কোন প্রিয়জন নিদ্রিত রহিয়াছে—জাগিবে এই ভয়! হঠাৎ ম্যাট্রোসা স্বামীকে দু'হাতে জড়াইয়া, তার মাথা বুকে রাখিয়া বলিল "স্বামি, প্রিয় আমার! কত স্নেহ ভালবাসা দিচ্ছ আমায়...যেমন ধারা আমরা বিবাহের প্রথম অবস্থায় ছিলাম, এখন তেমনি বাস কচ্ছি, একটা কটু কথা তুমি আমায় বল না, হৃদয়ের সব কথা খুলে বল, একটি বার তিরস্কার কর না··।" "সেই রকম কিছুর জন্য তোর প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে নাকি? হয়ে থাকে বল্ আচ্ছা করে ঘা-কত বসিয়ে দি।" সে ঠাট্টা করিয়া এই কথা বলিল, তাহার হৃদয়ে তখন পত্নীর প্রতি শুধু স্নেহ আর সহমর্ম্মিতা উছলিয়া উঠিতে ছিল। সে কোমলভাবে তাহার চুলগুলি নাড়িতে লাগিল এবং এই ভাবে আলিঙ্গন করিয়া সে প্রকৃত সুখ পাইল। ম্যাট্রোসা তাহার হাঁটুর উপর বসিয়া তাহার বক্ষ উত্তপ্ত করিয়া তুলিল। "প্রিয়, প্রিয়তম আমার।" সে টানিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া এমন কথা বলিল যাহা তাহার নিকট ও তাহার পত্নীর নিকট সম্পূর্ণ নূতন। "আমার আদরিণী রাণি!··· কত আদরের ধন আমার, তুমি দেখছ এখন--স্বামীর চেয়ে আপনার জন তোমার কেউ বিশ্বে নেই। আর তুমি সব সময় এমন ভীত ভাবে আড়-চোখে আমার পানে চাও! যদিও তোমায় সময় সময় মেরেছি, ব্যথা দিয়েছি,—মোটজা, সে শুধু আমার হৃদয়ের এই বিপুল ব্যথার জন্য। আমরা সেই খন্দে বাস করতাম, সূর্য্যের আলো কখনো দেখ্‌তাম না, কাকো জান্‌তাম না। এখন খন্দ থেকে বেরিয়ে পড়েছি, মানুষের মধ্যে এসেছি! এখন বুঝেছি—পত্নীই সব চেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু হবে,- এক কথায় হৃদয়ের বন্ধু। কারণ পুরুষ ক্রূর, পাপী; তারা সব সময়ই এর-ওর অনিষ্ট কচ্ছে,--দেখ না এই প্রমিনকে, যাক্ সে কথা. ওদিয়ে দরকার নাই—মোটজা সময়ে, সব ঠিক্ হবে, আমরা আশা ছাড়্‌বো না। মানুষের মত জীবন কাটাবো আমরা, পার্‌বো না? কি বল এতে তুমি, ও রাণি?" ম্যাট্রোসা কাঁদিতে ছিল, সে তাহার আকস্মিক সুখ পাইয়াছে। সে শুধু চুম্বনে উত্তর দিল। স্বামী আলিঙ্গনে তাহার প্রত্যুত্তর দিয়া কহিল "আমার প্রিয়ে।" সেইখানে জড়াইয়া বসিয়া অশ্রুজলে তাহারা বক্ষ ভাসাইতে লাগিল। ওরলফ্ মাঝে মাঝে সেই নূতন স্বরে কথা কহিতে লাগিল। বেশ অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল, সন্ধ্যার আকাশ অসংখ্য তারকায় শোভা পাইতেছিল। চারিদিকের প্রান্তর, উপরে আকাশের মতই শান্তিতে ভরা।

(৭)

ক্রমে সকালের চা তাহারা দু'জনে একত্রে খাইতে আরম্ভ করিল। মাঠে ঐরকম কথা বার্ত্তা হওয়ার পরদিন ওরলফ্ তাহার পত্নীর কক্ষে বিষণ্ণ অস্থির চিত্তে প্রবেশ করিল। ফেলিজার শরীর অসুস্থ হইয়াছিল, ম্যাট্রোসা কক্ষে একা ছিল, সে হাসিয়া স্বামীকে অভ্যর্থনা করিল। কিন্তু সে তাহার ভাব দেখিয়া ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে বল তো, অসুখ হয়নি তো?" সে চেয়ারে বসিয়া চা'র পেয়ালা সমুখে টানিয়া শুষ্ক স্বরে উত্তর করিল "কিছু তো হয়নি আমার।" "তবে অমন হয়েছ কেন?" "মোটে ঘুম হয় নি, সমস্ত রাত চিন্তায় কেটে গেছে। কাল বোকার মত কি সব যে বলেছি দু'জনে। এখন আমার লজ্জা হচ্ছে, কত যে বাজে বকেছি...এই সব দুর্ব্বল-মুহূর্ত্তেই পত্নী স্বামীকে পেয়ে বসে; কিন্তু তুই মনেও ভাবিস্ না এই ভাবে আমায় পেয়ে বস্‌বি ..সে কখনো হবে না, এই কথাই আমার বল্‌বার ছিল।"

পত্নীর পানে একবারও না চাহিয়া কথাগুলি সে বেশ জোর দিয়া বলিল—ম্যাট্রোসা কিন্তু ততক্ষণ তার দিক হইতে একবারও দৃষ্টি ফেরায় নাই। দুঃখে তাহার ঠোঁট কাঁপিতেছিল, সে বলিল "তা হ'লে কাল তুমি আমার উপর অত সদয় হয়েছিলে, ভালবেসেছিলে তাই তোমার দুঃখ হচ্ছে ? আমায় চুমো খেয়েছিলে, আলিঙ্গন দিয়েছিলে, তাতেও তোমার দুঃখ হচ্ছে ? এ কথা শোনা আমার পক্ষে কষ্টকর—বড় ভীষণ...প্রাণে আমার ছুরির মত বিঁধছে ;—কি করতে চাও তা হ'লে বল ? আমি কি তোমার বড় বিঘ্ন হয়ে পড়েছি—আমায় আর তুমি চাওনা তা হ'লে ?" সে তিক্ত স্বরে এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীর পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ওরলফ্ হতবুদ্ধি হইয়া কহিল "আমি ওভাবে বলিনি, এ শুধু সাধারণ কথা...আমরা দুজনে একটা খন্দে বাস করতাম···তুই তো জানিস্, কি জীবন গেছে সে। সে কথা মনে হলেই যেন আমার কেমন হয়···এখন আমরা আলোতে বেরিয়ে এসেছি ; আর আমার যেন ভয় হয়, বড় তাড়াতাড়ি পরিবর্ত্তনটা এসে পড়েছে...নিজেকেই যেন নিজে চিন্‌তে পাচ্ছিনা,···তুইও দেখছি অনেকটা বদলে গেছিস্..এসব হোল কি ? কি হবে এর পরে ?" ম্যাট্রোসা দৃঢ়স্বরে কহিল "কি হবে এর পরে ? ভগবান যেমন ইচ্ছা করেন সেই হবে তখন ; আমি শুধু তোমায় মিনতি করে বল্‌ছি, কাল আমার উপর অত সদয় হয়েছিলে বলে মনে দুঃখ কোরো না।" ওরলফ্ পূর্ব্বের মত বিমর্ষ স্বরে কহিল "যাক্ ওকথা আর তুলিস্ নে। দেখ্ এই ভেবে সমস্ত রাত জেগে কাটিয়েছি, আমার নিশ্চয় ধারণা হয়েছে ওসব কিছুতে কোন লাভ নেই। আমাদের পূর্ব্বজীবন যা-তা কণ্টকাকীর্ণ ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু বর্ত্তমান জীবনও বড় সুখের কুসুমাবৃত নয়।···যদিও আমি মদ খাই না, ঝগড়া করি না, তোরে মারিও না,—তবু আমার..." ম্যাট্রোসা বিদ্রূপ হাসি হাসিয়া কহিল "ও সব করবার সময় যে নেই এখানে।" ওরলফ্ হাসিয়া কহিল "ও সব করতে ইচ্ছা হলে এর মধ্যেই সময় করে নিতে পারতেম। কিন্তু বুঝি না কেন ওসব যেন আর করতে ইচ্ছা হয় না, জানি না—কেমন যে লাগে আমার..." ম্যাট্রোসা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"ভগবান জানেন শুধু কি হয়েছে তোমার, যদিও অনেক কাজ করতে হয় তোমার, কিন্তু এখানে এসে তুমি বেশ আছ, ডাক্তারেরাও সকলে তোমায় ভালবাসেন। অমন সুন্দর ব্যাবহার তোমার.........তবে বলতো কি হয়েছে তোমার ? বল আমায়, তোমায় যেন কেমন অস্থির বোধ হচ্ছে আজ !"

"ঠিক কথা...বড়ই অস্থির আমার মন ! কারণ ছাত্র পিটার আইভানোভিচ যা বলেছে, কাল সমস্ত রাত আমি তাই ভেবেছি। সে বলে যে সব মানুষ সমান···বেশ তা হ'লে কি আর আমি মানুষের মত নই ? দেখ এই ডাক্তার ওয়াসেঙ্কো আমার চেয়ে ভাল, পিটার আইভানোভিচ ও ভাল ,—আরো অনেকে ভাল মানুষ আছে। নিজেই দেখছি আমি তাদের সমান নই,...বুঝি তাদের হাতে তুলে একগ্লাস জল দেবারও উপযুক্ত নই। ওরা মিস্কাকে ভাল করলে, ভাল করে ওদের আনন্দ কত...আমি কিছু বুঝ্‌তে পারলেম না। আমি বুঝতে পারিনা, একটা মানুষের অসুখ থেকে সেরে ওঠাতে এত আনন্দ কিসের জন্য ? জীবনটা সত্যি ভাবে পরখ করে দেখ্‌লে কলেরার যন্ত্রণার চেয়েও ভীষণ ! আমার মত ওরাও এ জানে, তবু ওরা আনন্দ করে···আমিও ওদের মত আনন্দ চাই... কিন্তু আমি পারিনা...কারণ আমি আগেই বলেছি আমি আনন্দ করবার কোন কারণ পাই না..." ম্যাট্রোসা বাধা দিয়া কহিল "কারণ মানুষের উপর ওদের দয়া আছে. এমনি দয়া হাঁসপাতালের নারীদের মধ্যেও দেখা যায়,... একজন রোগী ভাল হয়ে উঠ্‌লে কত আনন্দ তাদের ! যখন তারা হাঁসপাতাল ছেড়ে চলে যাবার সময় হয় কত উপদেশ তাঁরা দেয় তাকে ; ওষুধ, টাকা দিয়ে সাহায্য করে...এদেখে প্রায়ই আমি না কেঁদে থাকৃতে পারিনা সত্যি বড় ভাল লোক এরা, দয়ায় এদের হৃদয় ভরা !" "তুই চোখের জল ফেলার কথা বলছিস, কিন্তু এতে আমায় আশ্চর্য্য করে—একটা বিস্ময় আসে শুধু !"

ম্যাট্রোসা তখন ব্যগ্র ভাবে স্বামীকে বুঝাইতে লাগিল যে, মানুষের উপর দয়া দেখানো অত্যন্ত দরকার; একটু ঝুঁকিয়া স্বামীর মুখের পানে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া সে অনেকক্ষণ হৃদয় খুলিয়া কথা কহিল—সে শুধু তার পানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল। "দেখ ইচ্ছা হলেই নারীগুলো কেমন বকে যেতে পারে—এ সব কথা এ পেলে কোথায়?" ম্যাট্রোসা কহিল "তোমার নিজেরও তেমনি দয়ার হৃদয়, আমি তোমায় বল্‌তে শুনেছি, তেমনি শক্তি থাকলে তুমি কলেরাকে ধ্বংস কর্‌তে! তবে তুমি এ ধ্বংস করতে চেয়েছিলে কেন? তুমি এই মাত্র যা বল্‌ছ তাতে তো এ মন্দের চেয়ে ভালই বেশী করে। তোমার যতদূর পায়—তাতে তো এ তোমার কোন অপকার করেনি, বরঞ্চ সহরে কলেরা হওয়ার পর থেকেই কি আমরা ভাল ভাবে নেই?" ওরলফ্‌ উচ্চহাস্যে কহিল "সত্যি কথা, সত্যি কথা,—কলেরা এসে নিশ্চয়ই আমার পক্ষে ভাল হয়েছে, গোল্লায় যাক্‌! লোকগুলো চারিদিকে সব পতঙ্গের মত মচ্ছে। আর আমি এরি জন্য বেশ আছি! হাঃ হাঃ হাঃ—এই জগতের নিয়ম, এইটুকু ভাব্‌লেই পাগল হতে হয়। সে চেয়ার হইতে উঠিয়া কাজে গেল, বারান্দা দিয়া যাইবার সময় তাহার মনে হইল সত্যি বড় দুঃখের বিষয় ম্যাট্রোসার এই জ্ঞানের বক্তৃতাগুলো কেউ কান দিয়া শুনিল না। নারী হলেও কেমন বুদ্ধিকরে সব কথাগুলো বলিল—এই আনন্দ চিন্তার মধ্যেই সে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল।

রোজেই তাহার ভাবরাশি বাড়িতে লাগিল, এবং সে যাহা ভাবিত ও অনুভব করিত তাহা প্রকাশের ইচ্ছাও তাহার খুব হইতে লাগিল। সত্যি কথা যে, তার নিজের ভেতরে যে বিপ্লবের বন্যা বহিয়া যাইত সে গোছাইয়া বলিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। কারণ অধিকাংশ ভাব ও চিন্তা সে নিজেই বুঝিতে পারিত না। বিশেষ করিয়া এই জ্ঞানই তাহাকে পীড়া দিত যে, পরের সৌভাগ্যে ও ভালতে অপর সকলের মত আনন্দ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। রোজই তাহার মনে এই আশঙ্কা হইত, কিছু একটা বড় কাজ করিয়া—অসাধারণ কিছু একটা করিয়া, জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। হাঁসপাতালে তাহার অবস্থা সে যেন কেমন-কেমন বোধ করিতে লাগিল, সে যেন দুটোর মাঝখানে রহিয়াছে, ডাক্তার ও ছাত্রেরা তাহার উপরে, শুশ্রূষাকারীরা তাহার নীচে—সে কাহারও সমান নহে। কেমন একটা একাকী ভাব তাহার আসিতে লাগিল, তাহার মনে হইল এও ভাগ্য, তাহাকে তাহার কাজ হইতে টানিয়া আনিয়া একটা পালকের মত উড়াইয়া কৌতুক করিতেছে। তাহার কেমন লাগিতে লাগিল, সে তখন একটু সান্ত্বনা পাইবার আশায় পত্নীকে খুঁজিয়া বাহির করিত। এ প্রায়ই সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে করিত, কারণ সে ভাবিত ও সময় তাহার খোলা হৃদয় দেখাইয়া ম্যাট্রোসার চোখে সে খাটো হইয়া যাইবে। কিন্তু ম্যাট্রোসার কাছে হৃদয় উন্মুক্ত করিবার প্রলোভনও দমন করিতে পারিতনা তাই তাহাকে মনের সব কথাই বলিয়া যাইতে লাগিল। সে প্রায়ই রাগান্ধ পাগলের অবস্থায়, আঁধার মন লইয়া তাহার কাছে যাইত, এবং ফিরিবার সময় শান্ত সংযত হইয়া ফিরিত।

ম্যাট্রোসা তাহার ভাব বুঝিয়া ঠিক কথাই কহিত। সে সাধু ভাষা বড় জানিত না, তার কথাও দুর্ব্বল বোধ হইত—কিন্তু সে হৃদয়ের খাঁটিকথা! ওরলফ্‌ বিস্ময়ের সহিত দেখিল, ম্যাট্রোসা ক্রমেই তাহার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল, তার চিন্তা যেন ক্রমেই পত্নীর নিকট বেশী যায়, এবং সব সময়ই পত্নীর নিকট হৃদয় মুক্ত করিতে ইচ্ছা হয়, ম্যাট্রোসাও ঠিক করিয়া ধরিয়া ফেলিল,—স্বামীর উপর তাহার কিরূপ প্রভাব হইতেছে। এবং সেও সতত এই প্রভাব বাড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার এই কর্ম্ম-জীবনের মধ্যে তাহার নিজের আত্মসম্মান জ্ঞানটুকুও বেশ বাড়িতে লাগিল। তাহার মন এমন ছিল না যে, অতীত ভাবিয়া সে মার মার করিবে কিন্তু সে যখন সেই অন্ধকার জীবন, স্বামী,

তাহাদের ব্যবসায় এই সব কথা ভাবিত তখন পূর্ব্বজীবন ও বর্ত্তমানজীবনের তুলনা না করিয়া থাকিতে পারিতনা, এবং তাহার পূর্ব্বের অস্তিত্বের অন্ধকার ছবিগুলো ক্রমেই অতীতে মিশিয়া যাইত। হাঁসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহার ক্ষিপ্রতা কার্য্যের ইচ্ছা এই সব দেখিয়া সকলেই তাহাকে আদর করিত, এবং সকলেই তাহার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিত। এই যে মানুষের মত ব্যবহার পাওয়া এও তার পক্ষে নূতন অভিজ্ঞতা, তাহার স্ফূর্ত্তি বাড়িয়া গেল, জীবনের আনন্দ-জ্ঞানও বেশী হইতে লাগিল। এক দিন যখন সে রাত্রের কাজে ছিল, লেডী-ডাক্তার তখন তাহার পূর্ব্বজীবন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, ম্যাট্রোসা কিন্তু গোপন নাকরিয়া তাহাকে সব কথা খুলিয়া বলিল, এবং হঠাৎ থামিয়া একটা অদ্ভুতগোছের হাসি হাসিল, লেডী-ডাক্তার বলিলেন "হাস্‌লে যে?" "কি বিশ্রী জীবন ছিল আমার, সেই ভেবে না হেসে থাকৃতে পার্‌লেম না···বল্‌লে বিশ্বাস কর্‌বেন না, কিন্তু তখন জীবন কত তিক্ত দুঃখের ছিল সে বিষয়ে কোন জ্ঞান ছিল না—এখন বুঝ্‌তে পাচ্ছি।" এই পূর্ব্ব জীবন ভাবিয়া ভাবিয়া ম্যাট্রোসার স্বামীর উপর কেমন বিদ্বেষ আসিল।

সে ওরলফের কথা পূর্ব্বের মতই ভাবিত এবং প্রিয়তমা পত্নীর মতই তাহাকে ভালবাসিত, কিন্তু তখনই আবার তাহার মনে হইত ওরলফ্ তাহার উপর অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে। তাহার সহিত কথা বলিবার সময় তাহার অস্থির ভাব দেখিয়া সে বড় বেদনা বোধ করিত। সময় সময় তাহার মনে হইত,—এই স্বামীর সহিত কি সুখ-শান্তিতে জীবন কাটানো যাইবে?—যদিও তাহার মনে বিশ্বাস ছিল শেষকালে নিশ্চয়ই ওরলফ্ ঠিক হইবে।

ঘটনার সহজ সাধারণ প্রবাহে তাহাদের উভয়ের জীবন বেশ মিলে-মিশে সুখে কাটানোই উচিত। তারা উভয়েই তরুণ, বলবান, কার্য্যক্ষম, এমন অবস্থায় অনেকেই নিজেদের পেটটা ভাল মত চলিলেই খুসি। কিন্তু ওরলফের হৃদয়ের এই অস্থিরতা তাহার অন্তরাত্মাকে দৈনন্দিন একঘেঁয়ে কর্ম্মজীবনের সহিত মিশ খাওয়াইয়া চলা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল।

(৮)

সেপ্টেম্বরের সকালবেলায় একদিন এ্যাম্বুল্যান্সভ্যাস হাঁসপাতালের উঠানে পৌঁছিলে প্রমিন তাহার ভেতর হইতে মড়কাক্রান্ত হলুদভাঙ্গা মুখ অর্দ্ধমৃত একটি বালককে উঠাইল। কোন্ পাড়া হইতে এই রোগী আসিল এই প্রশ্ন হইলে মোটরচালক উত্তর করিল "পুটিনকফের বাড়ীরই আর একজন।" ওরলফ্ ব্যথিতস্বরে বলিয়া উঠিল "সেকি! হা ভগবান·· এ যে সেনকা! সেনকা আমায় চিন্তে পাচ্ছনা?" সেনকা একটু চেষ্টা করিয়া বলিল "হাঁ পাচ্ছি।" ওরলফ্ বলিল "আহা এমন আনন্দময় বালক—কি করে হোল এ তোমার? ছেলেটার যাতনা দেখিয়া ওরলফ্ বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। এই নির্দ্দোষ বালকটাকেও কি ছাড়তে পারে নি।" সেনকা চুপ করিয়া পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কাঁপাইতেছিল। তাহার ছিন্ন দাগওয়ালা কাপড়গুলো গা হইতে খুলিয়া নিতে সে বলিল "উঃ বড় শীত!" ওরলফ্ বলিল "দেখ্‌বে কেমন সুন্দর গরমজলে স্নান করিয়ে নিচ্ছি। খুব শীগ্‌গীর তুমি ভাল হয়ে যাবে।" সেনকা ঘাড় নাড়িয়া কহিল "না ওরলফ্ খুড়ো...আর আমি ভাল হব না, সে আরও ছোট করিয়া কহিল "এই দিকে শোন···আমি বেঞ্জো চুরি করেছিলাম, ওই কাঠের ছাটনির ভেতর লুকোন রয়েছে পরশুদিনের আগের দিন শুধু ওটা আমি প্রথম বাজিয়েছিলাম...উঃ ভারী সুন্দর! তার পরেই আমার পেটে এই ব্যথা হয়···পাপের শাস্তি আছে তো···ওটা ফিরিয়ে দিও। ওরলফ্ খুড়ো···বেঞ্জোবাদকের এক বোন আছে

...উঃ-উঃ-উঃ।" টাঁসে তাহার শরীর মোচড়াইতে লাগিল, এই বালকের জন্য যতদূর যা করা যায়, সে চেষ্টার ত্রুটি হইল না, কিন্তু তাহার দুর্ব্বল শরীর কণিকা-মাত্র জীবনীশক্তি ধারণেও অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিল। সেই দিন সন্ধ্যা-বেলাই ওরলফ্ সেনকার দেহ মরা-ঘরে লইয়া গেল। তাহার মনে হইল, তাহার যেন মস্ত ক্ষতি হইল, কত বড় যেন আঘাত পাইয়াছে। সে সেই ছোট দেহটাকে সোজা করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। সে বিষন্ন মূর্ত্তিতে সে স্থান ত্যাগ করিল, তাহার সম্মুখে সেই আনন্দের প্রতিমূর্ত্তির ঝলক ও তাহার এখনকার ভয়াবহ শরীর ভাসিতে লাগিল।

মরণের সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া সে কতদূর অসহায় তাহাই তাহার মনে হইতে লাগিল। কত কষ্ট কত যত্ন সে হতভাগা বালক সেনকার জন্য লইয়াছে, ডাক্তারেরাই বা বালককে বাঁচাইবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এত করিয়াও তাহাকে মরণের গ্রাস হইতে রক্ষা করা গেল না।...এ সবই তার কাছে বড় অবিচার বোধ হইতে লাগিল। তার নিজেরও একদিন এই ভাবে মরিয়া পড়িতে হইবে। তার পর সব শেষ হইয়া যাইবে। কেমন যেন একটা চকিত স্পন্দন হইয়া গেল তাহার ভেতরে. সে যেন সম্পূর্ণ একাকী নির্ব্বাসিত বোধ করিতে লাগিল একজন বিজ্ঞলোকের সহিত তাহার এ বিষয় লইয়া আলোচনা করিবার ইচ্ছা হইল, কোন একজন ছাত্রের সহিত আলাপ করিবার আশায় সে অনেকক্ষণ ফিরিয়াছে। কিন্তু এ সব দার্শনিক-আলোচনায় সময় কাটায় এমন সময় কোন ছাত্রের ছিল না। সেই জন্য এক পত্নী ছাড়া কথা কহিবার দ্বিতীয় লোক তাহার ছিল না, অবসন্ন অবসাদ-গ্রস্থ হৃদয়ে সে ম্যাট্রোসার সন্ধানে বাহির হইল।

ম্যাট্রোসা এই মাত্র কাজের ছুটি পাইয়া কক্ষের এক কোণে দাঁড়াইয়া হাত পা ধুইতেছিল। চার জল তৈরী, কেটলির উপর ফুটিতেছিল। ওরলফ্ নীরবে বসিয়া ম্যাট্রোসার উন্মুক্ত সুগোল স্কন্ধের পানে চাহিয়াছিল। জল সিদ্ধ হইয়া ফুস ফুস করিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছিল। বাহিরের বারান্দায় লোক-চলাচলের শব্দ হইতেছিল, ওরলফ্ পায়ের শব্দ শুনিয়া কে যাইতেছে অনুমান করিতেছিল; হঠাৎ তাহার বোধ হইল যেন ম্যাট্রোসার ঘাড় ঘামে ভিজিয়া সেনকার মতই ঠাণ্ডা হইয়া গেছে;—ওরলফ্ চমকিয়া বলিল—"সেনকা মরে গেছে..!" "মরে গেছে! ভগবান তার আত্মার শান্তি বিধান করুন।" ম্যাট্রোসা নাক-মুখের সাবান পুঁছিতে পুঁছিতে এই কথা কহিল। ওরলফ্ বিষাদস্বরে কহিল "ছেলেটার জন্য বড় দুঃখ হচ্ছে।" "কিন্তু বড় দুষ্টু ছিল ছেলেটা যদিও...।" "থাক্ সে মরে গেছে এখন সে শান্তি পাক্। সে বেঁচে থাক্‌তে যাই থাক্ সে দিয়ে আমাদের দরকার নেই...সত্যি তার মৃত্যুতে আমার বড় দুঃখ হচ্ছে। ভারী সুন্দর তুখোর ছেলে ছিল! বেজ্ঞোটা...আঃ...বেশ তুখোর ছেলে. আমার ইচ্ছা ছিল আমিই তাকে শিখিয়ে গড়ে তুলি,—তার বাপ মা ছিল না, সে আমাদের ভালবাস্‌তো বেশ ছেলের মত থাক্‌তো, আমার ভয় হয় আমাদের আর ছেলে-পুলে হবে না, আমি বুঝি না কেন? এমন সুন্দর স্বাস্থ্য, তোর মত যুবতী নারীর কেন যে ছেলে হয় না বুঝি না...একটা হয়েছিল বাস্ মিটে গেছে...আঃ আমার বোধ হয় যদি ছেলে-পুলে থাকতো তো এমন বোধ হোত না, এই দেখছ শুধু খাটুনি, খেটেই যাচ্ছি কিন্তু এর ফল কি হবে? শুধু আমার আর তোর দিনের আহার চালানোর জন্য! কেন আমাদের আহারের কি দরকার! যাতে আমরা কাজ করতে সক্ষম হই...তাই জীবনটা চাকার মত ঘুরে চলেছে, কোন অর্থ নেই, সঙ্গত নেই...শুধু ছেলে থাক্‌লেই আমাদের জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়ে যেত...হাঁ সম্পূর্ণ।"

এ সব কথাই সে মাথা বুকের সঙ্গে ঠেকাইয়া অসন্তোষ অতৃপ্তির স্বরে কহিল। ম্যাট্রোসা দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল, এবং ক্রমেই বিবর্ণ হইয়া যাইতেছিল ওরলফ্ বলিতে আরম্ভ করিল—"আমারো স্বাস্থ্য ভাল,

তোমারও তাই—তবু আমাদের ছেলে-পুলে নেই, এর কারণ কি ?...যে পর্য্যন্ত না মন বিষাদে ভরে আসে ততক্ষণ আমি এই কথা ভাবি, তার পর না পেরে মদ খাওয়া আরম্ভ করি।

ম্যাট্রোসা বেশ দৃঢ় উচ্চস্বরে কহিল "তুমি যা বল্‌ছ এ সত্যি নয়,—তুমি সত্যি বল্‌ছ না। তুমি এই মাত্র যা বল্‌লে, অমন কথা আর আমার মুখের উপর বলতে সাহস কোরো না। তুমি যে মদ খাও এ শুধু তোমারই কুঅভ্যাস যা তুমি ছেড়ে থাক্‌তে পার না,—আমার ছেলে হয় না, এর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। এ ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা।" ওরলফ্‌ তাহার কথায় হতভম্ব হইল। সে যেন তাহার পত্নীকে চিনিতেই পারিতেছে না—এই ভাবে একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। কখনও সে ম্যাট্রোসার এমন উগ্রমূর্ত্তি দেখে নাই, এমন নির্দ্দয় ক্রোধ-দৃষ্টি লইয়া সে কোন দিন তাহার পানে চাহে নাই—এমন উত্তেজিত কথাও সে কখনও তার মুখে শোনে নাই। ওরলফ্‌ তেমনি স্বরেই কহিল "বলে যাও, বলে যাও, তোমার আর যা যা বল্‌বার আছে আমি সবই শুন্‌তে ইচ্ছা করি।"

"সবই শুন্‌বে !...তুমি যদি এমনি ভাবে শুধু আমায় তিরস্কার না কর্‌তে তো আমি এই মাত্র যা বল্‌লেম, এ কথনো বল্‌তেম না। তুমি বল্‌ছ আমি তোমার ছেলে ধরতে পারি না! বেশ কথা...কখনো আর তোমার ছেলে আমি ধরবো না...যে ব্যবহার তুমি করেছ আমার সঙ্গে, তাতে আর ছেলে হবার ইচ্ছা আমার নেই।" কান্নায় তাহার স্বর বন্ধ হইয়া আসিল, এবং শেষ কথাটা সে কাঁদিয়াই বলিল। তাহার স্বামী কঠোর স্বরে কহিল—"থাম ও-ভাবে গোল কোরো না।" "কি জন্য আমার ছেলে হয় না—সেই কথা তুমি শুনতে চাও।... ভেবে দেখ কি দুর্ব্ব্যবহার তুমি করেছ সব সময় আমার সঙ্গে—সব সময় কি ভাবে আমার শরীরের সব জায়গায় লাথি মেরেছ! কতবার তুমি আমায় লাথি ঘুঁষি মেরেছ, কতবার অত্যাচার করেছ গোন দেখি! কত সময় রক্তস্রোত বইয়েছ ভাব দেখি? প্রায়ই তো আমার কাপড় রক্তে ভিজে থাকৃত;—আমার প্রিয় স্বামী তুমি, তোমারই নিষ্ঠুরতায় আমার ছেলে হওয়ায় বাধা পড়েছে। আর তুমি এখন তাই নিয়ে আমায় তিরস্কার কচ্ছ?...আমার চোখের পানে চাইতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না?—হত্যাকারি-কোথাকার! হাঁ, হত্যাকারী তুমি, কারণ তুমি নিজে নিজের ছেলেদের বধ করেছ। এখন তুমি সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপাতে চাচ্ছ! আমারই উপরে যে তোমার সব সহ্য করেছে—সব ক্ষমা করেছে! কিন্তু এই কথাগুলো আমি কখনো ভুলবো না, ক্ষমাও কোরব না,—মরণ সময়েও একথা আমার মনে থাকবে! তুমি বোধ হয় ভাব আর আর নারীর মত ছেলের জন্য আমার কখনো আকাঙ্ক্ষা হয় নি? তোমার কি মনে হয় একটি ছেলে পাই এ আশা আমি কখনো করি নি? কত রাত্রি আমার জেগে কেটে গেছে, ভগবানের কাছে এক মনে প্রার্থনা করেছি, তোমার ঔরসে আমার গর্ভে একটি ছেলে হোক্‌! আর আর নারীদের ছেলে দেখলে হিংসায় দুঃখে আমার বুক ফেটে কান্না আসে—আহা এমন সুখে আমি বঞ্চিত রয়েছি! সেনকা আমার ছেলে একথা কতবার মনে করেছি... আর আজ তুমিই আমার ছেলে না হওয়ার জন্য তিরস্কার কচ্ছ?" তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল—শেষ কথা-গুলো ছাড়া-ছাড়া ভাবে তাহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইল। মুখখানা তার এতটুকু হইয়া গিয়াছিল, স্থানে স্থানে জমাট রক্ত দেখা যাইতেছিল,—তাহার কণ্ঠ অশ্রুর উচ্ছ্বাসে কাঁপিতেছিল।

ওরলফ্‌ চেয়ারের হাতল জোরে ধরিয়া তাহার পত্নী—এই নারীকে দেখিতে লাগিল; কিন্তু এ যেন এখন তাহার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিতা বোধ হইতে লাগিল। তাহার পত্নীকে দেখিয়া ভয় হইতে লাগিল,—সে যেন তাহার গলা টিপিয়া ধরিবে। সে যেন তাহার উচ্ছ্বসিত রাগ-ভরা চোখ লইয়া তাহাকে ভয় দেখাইতে লাগিল। এই মুহূর্ত্তে

সে যেন তার চেয়ে সহস্র গুণে ক্ষমতাশালী, সে এ বেশ অনুভব করিল এবং ভয় করিতে লাগিল। সে পূর্ব্বে যেমন করিয়াছে তেমন লাফাইয়া উঠিয়া তাহাকে মারিতে পারিল না। তাহার নীতি এবং মনের জোরে তাহাকে যেন একটা নূতন মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল—সে যেন তাহার কাছে অনেক নীচু হইয়া পড়িয়াছিল।

তুমি আমার অন্তরাত্মাকে বড় ব্যথা দিয়েছ!… …আমার উপর তোমার পাপ আর দোষ বড় বেশী……… আমি সব সয়ে চুপ করেছিলেম কেন জান? কারণ আমি তোমায় ভালবাস্তেম,…এখনও ভালবাসি··কিন্তু এ রকম তিরস্কার, তোমার কাছ থেকে আমি সহ্য কর্‌তে পারবো না, সে সহ্য করা আমার ক্ষমতার অতীত…যদিও ভগবানের বিধানে তুকি আমার স্বামী—তোমার ঐ কথার জন্য আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি!

ওরলফ্ দাঁত বাহির করিয়া গর্জ্জন করিয়া কহিল "চুপ কর!"

"বাঃ—এসব চীৎকার হচ্ছে কিসের? কোথায় আছ তোমরা সে কি ভুলে গেছ—এসব গোলমাল তো এখানে হতে পারে না।"

ওরলফের চোখের সমুখে সব ধোঁয়ার মত লাগিতে লাগিল। সে লক্ষ্য করে নাই, দোরে কে দাঁড়াইয়াছিল; সে দোর ঠেলিয়া বাহিরে মুক্ত বাতাসে বাহির হইয়া পড়িল। ম্যাট্রোসা অন্ধ বোবার মত কিছুকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল, চাঁদের রৌপ্য-কিরণ মেঘের আবরণ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে মেজের উপর পড়িতেছিল, একটু একটু বৃষ্টি আরম্ভ হইল, বৃষ্টির ফোঁটাগুলি জানালার গায় লাগিয়া দেয়ালে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যাইতে লাগিল, বৃষ্টি বাড়িতেই লাগিল। ম্যাট্রোসা বিছানার উপর অনড় হইয়া পড়িয়া ছাদের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখে মুখে একটা বিষণ্নতা যন্ত্রণা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বৃষ্টির ফোঁটা তখনও জানালার গায় ও দেয়ালে লাগিতে ছিল, এ যেন একঘেঁয়ে স্বরে তাকে ভজাইবার চেষ্টা করিতেছিল। যেন ইহার যুক্তি দেখাইয়া মতে আনিবার ক্ষমতা নাই—তাই যেন এই করুণ একঘেঁয়ে ভজানোর সুর।

ম্যাট্রোসার তখনও ঘুম নাই, বৃষ্টির এই একঘেঁয়ে টিপ্ টিপ্ শব্দের মধ্যে সে শুধু একই প্রশ্ন শুনিতেছিল "কি ঘট্‌বে এর পরে? কি ঘট্‌বে পরে?" এই প্রশ্ন যেন তার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল, এবং তাহারই শব্দ যেন মাথায় আসিয়া মাথা ব্যথা করিতে লাগিল "কি হবে এর পরে?" সে এ প্রশ্নের উত্তর করিতে ভয় পাইতেছিল, যদিও তাহার অনিচ্ছায় তাহার স্বামীর মত হিংস্র মূর্ত্তির মধ্যে উত্তর অনেকবার ফুটিয়া উঠিতেছিল। প্রেমে ভরা একটা পূর্ণ শান্তির জীবন, যাহার কথা এই ক'সপ্তাহ হইল সে ক্রমাগত ভাবিতেছে, সে জীবন কল্পনায় আনিয়া তাহার সমস্ত বিষাদভাব সে দূর করিয়া দিতে চেষ্টা করিল, সেই সময় এ কথাও মনে পড়িল,—যদি ওরলফ্ তাহার পূর্ব্বের মত উচ্ছৃঙ্খল ভাবে চলিতে আরম্ভ করে, তবে তাহাদের একত্র বাস অসম্ভব হইয়া উঠিবে। সে স্বামীকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দেখিল, নিজেও যে ভিন্ন-লোক হইয়া পড়িয়াছে, এবং অতীত জীবনের উপর সে শুধু ঘৃণা ও ভয় লইয়াই চাহিতে পারিত। নূতন ভাব-প্রবাহ যাহা পূর্ব্বে তাহার অজ্ঞাত ছিল তাই তাহার ভেতরে জাগিয়াছে। কিন্তু সব ব্যাপারের পরেও সে শুধু নারী—তাই সে এ ভাবে ঝগড়া করিয়াছে বলিয়া নিজেকেই তিরস্কার করিতে লাগিল,—

"কেমন করে এসব হোল?—ওঃ, আমি যেন আমার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।" এইরূপ নানা বিপরীত চিন্তায় আরও কত ঘণ্টা কাটিয়া গেল। দিনের আলো দেখা দিল, কুয়াসায় মাঠ ঢাকা—আকাশ ধূসর মেঘে আচ্ছন্ন।

"ম্যাট্রোসা তোমার কাজে যাবার সময় হয়েছে।"

ম্যাট্রোসা মন্ত্রচালিতের মত উঠিয়া হাত-মুখ ধুইয়া কাজে গেল, তাহার শুষ্ক মুখ, বসা চোখ দেখিয়া সকলের দৃষ্টিই তাহার উপরে পড়িল। লেডী-ডাক্তার কহিলেন "কি হয়েছে ম্যাট্রোসা তোমার—অসুখ হয়েছে কি ?" "না বেশ আছি।" "সব খুলে বল না, কোন ভয় নেই তোমার—অসুখ হয়ে থাকলে কাজ করে দরকার নেই, আর একজনকে তোমার পরিবর্ত্তে দিচ্ছি।" এই কোমল হৃদয়া নারী কেমন করিয়া তাহার হৃদয়ের ব্যথা ধরিয়া ফেলিয়াছে—তাই সে তাহার শেষসাহসটুকু সঞ্চয় করিয়া ব্যথিত হৃদয়ে হাসিয়া কহিল—"ব্যাপার সত্যি এমন কিছু নয়, স্বামীর সঙ্গে একটু কলহ হয়েছিল, এখন সব মিটে গেছে—আর এতে নূতন কিছু নেই।"

ম্যাট্রোসার পূর্ব্বজীবনঅভিজ্ঞা ডাক্তার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন, ম্যাট্রোসার ইচ্ছা হইল এই নারীর পদতলে পড়িয়া সে চীৎকার করিয়া কাঁদে, কিন্তু সে ঠোঁটে ঠোঁটে চাপিয়া তাহার এই ইচ্ছা নিরোধ করিল, উচ্ছ্বসিত অশ্রু ফিরাইয়া নিতে তাহার সমস্ত আত্মসংযম-ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হইল।

কাজ হইয়া গেলেই সে নিজের কক্ষে ফিরিয়া আসিল। জানালার বাহিরে চাহিয়া দেখিল এ্যাম্বুল্যান্সভ্যাস মাঠের ভেতর দিয়া আসিতেছে—নিশ্চয়ই আর একজন নূতন রোগী লইয়া আসিতেছে, তখনও বৃষ্টি পড়িতেছিল, মাঠ জনশূন্য,—পরিত্যক্ত। ম্যাট্রোসা জানালা হইতে সরিয়া আসিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া টেবিলের ধারে বসিল। "কি ঘটবে এর পরে ?" এই কথা তখন তাহার মাথায় ঘুরিতেছিল, এবং এই চিন্তায় তাহার হৃদয় ধুক্ ধুক্ করিতেছিল। অনেকক্ষণ সে সেখানে তেমনি ভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া বসিয়া রহিল—বারান্দার প্রতি-পদশব্দেই সে চমকিয়া দোরের পানে চাহিতেছিল—অবশেষে যখন দোর খুলিয়া গেল, এবং ওরলফ্ নিজেই প্রবেশ করিল, সে একটুও চমকিল না বা নড়িল না—সে মুহূর্ত্তে তাহার মনে হইল যেন বাহিরে বৃষ্টিধারা ভীষণ বেগে তাহারই উপর পড়িতেছে—তাহার ভার যেন তাহাকে পিষিতেছে।

ওরলফ্ দোরের নিকট দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরে তাহার ভিজে টুপিটা মেজেয় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, ম্যাট্রোসার পানে ধীরপদে অগ্রসর হইতে লাগিল। সে বৃষ্টিতে ভিজিয়া গিয়াছিল, তাহার মুখ ফোলা, চক্ষু নিষ্প্রভ, ঠোঁটে কেমন একটা হাসি! সে কাছে আসিলে ম্যাট্রোসা দেখিল তাহার বুট হইতে জল বাহির হইতেছে, ম্যাট্রোসা ধীরস্বরে কহিল "কেমন হয়ে গেছ তুমি ?" ওরলফ্ নিদ্রাজড়িতের মত দুর্ব্বল কণ্ঠে কহিল "তোমার পায় ধরে ক্ষমা চাইব কি না বল ?" ম্যাট্রোসা নীরব রহিল। "না ?...বেশ যা তোমার খুসী .. আমি তোমার কাছে দোষী কি না এই কথা ভেবে কাল সমস্ত রাত ঘুরে বেড়িয়েছি। অবশেষে মনে হোল, হাঁ, আমি দোষী...তাই আমি তোমার ক্ষমা চাইতে এসেছি.. বল দেবে কি না ?" তবু সে নীরব রহিল, পূর্ব্বস্মৃতি তাহার হৃদয় ছিন্ন-ভিন্ন করিতেছিল, কারণ স্বামী তাহার সমুখে দাঁড়াইলে সে মদের গন্ধ পাইল। ওরলফ্ একটু উচ্চ ভয় দেখানো স্বরে কহিল "দেখ, শোন—অত মুখ বিকৃতি করতে হবে না—আমার ভাল ভাব আর বন্ধুতা হতে...ক্ষমা করবে তুমি আমায় ?" ম্যাট্রোসা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল "তুমি মদ খেয়েছ—যাও ঘুমোও গে।" "মিথ্যা কথা ! আমি মদ খাই নি—শুধু পরিশ্রান্ত হয়েছি—শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছি আর ভাবছি—অনেক কথা ভেবেছি প্রিয়ে, তাই ভেবে কথা বোলো—কথা বলছ না কেন ?"

"এখন কথা তোমার সঙ্গে বলতে পাচ্ছি না।"

"কেন পাচ্ছনা বল।" তাহার মুখভাব হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, সে উচ্চৈঃস্বরে বলিল "তুমি কাল হাঁক-ডাক করেছিলে, তুমিই জোর-গলায় বকেছিলে...আর আমি এখন এসে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি, একথা বুঝতে পাচ্ছ তো ?"

এইবার কথা বলিবার সময় তাহাকে উত্তেজিত দেখাইতে লাগিল, তাহার ঠোঁট কাঁপিতেছিল, নাসা বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছিল। ম্যাট্রোসা বেশ জানিত যে, এ লক্ষণ তাহার সেই শনিবার রাত্রের দ্বন্দ্বের অভিনয়েরই সূচনা করিতেছে। ম্যাট্রোসা দৃঢ়সংকল্পের স্বরে কহিল "হাঁ বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি তুমি আবার সেই বুনো পশু হয়েছ—তা হবেই জানি।"

"আমি বুনো পশু কিনা সে কথার সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। ..আমি জিজ্ঞাসা কচ্ছি;—তুমি আমায় ক্ষমা করবে কি না? কি ভাবছ তুমি? তুমি কি মনে ভাব আমি তোমার ক্ষমা ছাড়া বাঁচ্‌তে পার্‌বো না? তা ছাড়াও বেশ থাক্‌তে পারি--কিন্তু এক কথা--আম তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছিলেম বুঝ্‌লে?" ম্যাট্রোসা পরিশ্রান্ত ভাবে দৃষ্টি সরাইয়া কহিল "একা থাক্‌তে দেও আমায় তুমি।" ওরলফ্‌ বিদ্রূপ কণ্ঠে হাসিয়া কহিল "একা থাক্‌তে দেব তোমায়! তাই ত তুমি চাও—আমি চলে যাব, তুমি এখানে থাক্‌বে--একা, স্বাধীন। কারো তোয়াক্কা নেই না? সে কখনো হবে না! দেখ দেখি এ কেমন পছন্দ হয়?" সে তাহার ঘাড় চাপিয়া তাহার মুখের উপর একখানা ছুরি ধরিল। ছুরিখানা ছোট, পুরু, মর্‌চে ধরা।

"বেশ, কেমন—পছন্দ হচ্ছে তো?"

ম্যাট্রোসা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল "আমার ইচ্ছা হয় তাই, তুমি আমায় ঘা দিয়ে মেরে ফেলে সব শেষ করে দাও।" সে স্বামীর হস্ত মুক্ত হইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। তাহার স্বর শুনিয়া ওরলফ্‌ আশ্চর্য্য হইয়া গেল, এক পা পেছনে সরিল। এ কথা সে আরও তার মুখে শুনিয়াছে বটে কিন্তু এমন মরিয়া স্বরে এ-কথা পূর্ব্বে কখনও উচ্চারিত হইতে শোনে নাই। ছুরি দেখিয়া ভয় না পাওয়াতে তাহার তাক্‌ লাগিয়া গেল। দু'এক মিনিট পূর্ব্বেও সে তাহাকে আঘাত করিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু এখন আর সে পারে না, পারিবেও না। তাহার ভীতি প্রদর্শনে ভ্রূক্ষেপ না করায় সে ছুরি টেবিলের উপর রাখিয়া দিল এবং দমিত ক্রোধে জিজ্ঞাসা করিল—"তবে শয়তানী কি চাস্‌ তুই।"

ম্যাট্রোসা ফোঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "কিচ্ছু চাই না আমি,—কিচ্ছু না—কিন্তু তুমি—তুমি কি চাও?……তুমি এসেছিলে এখানে আমায় হত্যা কর্‌বার মতলব নিয়ে—ভাল মার আমায়, সব শেষ করে দাও।"

ওরলফ্‌ তাহার পানে নীরবে চাহিয়া রহিল। তাহার প্রকৃতি এবং ভাব এমন ভাবে ওলট-পালট হইয়া গিয়াছিল যে পরে কি বলিবে সে তাহার ঠিক ছিল না। সে এখানে আসিয়াছিল তাহার পত্নীর উপর জয়ী হইবে পরিষ্কার এই ইচ্ছা লইয়া, কাল রাতে যখন তাহাদের দু'জনার ঝগড়া হয় তখন তাহার পত্নী স্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছে যে, দু'জনার মধ্যে সেই বলবান, সে ইহা স্পষ্ট বুঝিয়াছে এবং এই চিন্তায় নিজের কাছেই তাহাকে নীচু বোধ হইতে লাগিল। এ খুব দরকারী যে পত্নী এখন তাহার কাছে বশ্যতা স্বীকার করিবে—কি জন্য যে তাহার কোন যুক্তি সে নিজেও পাইল না, কিন্তু তাহার মনে হইল এ অতি দরকারী।

অদ্ভুত ভাবপ্রবণতা ও মিশ্রিত ধাতুতে গঠিত লোক বলিয়া তাহার মনে সবই বেশী বাঝিত। গত ক'ঘণ্টার মধ্যে সে কত বিষয় যে চিন্তা করিল কিন্তু তাহার পত্নীর ন্যায্য কথা ও দোষারোপ তাহার মনে যে ভাব জাগাইয়াছিল তাহার অজ্ঞতা বশতঃ এ ভাবের অর্থ সে কিছুই করিতে পারিল না—এবং বুঝিল না। সে বুঝিয়াছিল যে, তাহার পত্নী তাহার উপর বিদ্রোহ করিয়াছে; সেই জন্য সে ছুরি লইয়া তাহাকে ভয় দেখাইতে ও বশ্যতা স্বীকার করাইতে

আসিয়াছিল, যদি ম্যাট্রোসা এমন চুপ করিয়া বশ্যতা স্বীকার না করিত তবে সে হয়তো তাহাকে হত্যা করিত। কিন্তু তার পত্নী নিঃসহায় দুঃখ নত হইয়া তাহার সমুখে দাঁড়াইয়া আছে, তবু সে তার চেয়ে বলবান,—এই ব্যবহারে ওরলফ্ কেমন একটা ধাক্কা পাইয়া বোকা বনিয়া গেল।—

"শোন এই সব পাগলামো ছেড়ে দাও—তুমি জান যে এই দিয়ে আমি এখনই তোমায় শেষ করে দিতে পারি.. গ্রীবায় একটা আঘাত—তা হলেই সব শেষ—সব দুঃখ বিষাদের অবসান…এ খুব সোজা!"

এই কথাগুলি বলিবার সময় তাহার মনে হইল তাহার অন্তরের কথা যেন সে ঠিক প্রকাশ করিতে পারিতেছে না তাই সে আবার চুপ করিল। ম্যাট্রোসা তখনও অনড় হইয়া তাহার পানে পেছন ফিরিয়া চাহিয়াছিল। সে তাহাদের দাম্পত্যজীবনের আলোচনা করিতেছিল,—সেই সময়ই তাহার মনে প্রশ্ন জাগিল "এর পর কি ঘটবে?"

ওরলফ্ হঠাৎ টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া কহিল—"মোটজা, সবই আমার দোষ--আমার দোষেই এমন হয়েছে—আমাদের দু'জনার ভেতর যেমন থাকা দরকার ছিল—সে নেই।……আমি জানি দুর্ভাগ্য প্রকৃতি আমার।" সে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বিরক্তভাবে তাহার মাথা নাড়িল, "আমার অন্তরে যে কি ব্যথা সে যদি শুধু তুমি জানতে? আমার জীবন এত সঙ্কীর্ণ বোধ হয়……কিন্তু কি জীবন এ? এই রোগীরা আসে এদের নিয়ে কি আমি কোন শান্তি পাই! তাদের ভেতর কতক মরে যায়—কতক সেরে উঠে বেঁচে থাকে।…আমার জীবনকে তেমনি ভাবেই চালিয়ে নিতে হয়…কিন্তু কি ভাবে? অবিরত এই জ্বালা কত ভীষণ! ..কি যে আমার হৃদয়ে সে আমি প্রকাশ করতে পাচ্ছিনা...কিন্তু আমি বুঝি এ ভাবে আর বেঁচে থাকতে পারবো না. কিন্তু কি ভাবে যে পরিবর্ত্তন হবে সে বুঝি না...ধর এই হাঁসপাতালে যারা ভোগ কচ্ছে—তারা কাতর বলে কত যত্ন নেওয়া হচ্ছে তাদের; আমিও তো কাতর. আমারও তো অন্তর ব্যথায় ভরা—কিন্তু কেউ আমার যত্ন লয় না, তাই আমার অবস্থা ওদের চেয়েও খারাপ, আর তুমি আমায় বলছ 'আমি পশুর চেয়ে কোন অংশেই ভাল নয়। কিছু না শুধু একটা মাতাল।' আঃ, তুমি আমায় বুঝতে পাচ্ছনা……হৃদয়হীনা তুমি……"ওরলফ্ শান্ত সংযত স্বরে কথাগুলি কহিল কিন্তু ম্যাট্রোসা তাহাতে সামান্যও কর্ণপাত করিল না—কারণ সে তাহার নিজের চিন্তা লইয়াই বিব্রত ছিল। একটা নূতন কিছু বলিবার জন্য ওরলফের অন্তর কাঁপিয়া উঠিতেছিল--সে বলিল—"উত্তর দিচ্ছনা কেন তুমি কথা বলছনা? কি চাই তোমার বল?" ম্যাট্রোসা বলিল "তোমার কাছ থেকে কিছু চাই না আমি, কেন তুমি আমায় এ-ভাবে বিরক্ত কর; কি করতে বল আমায় তুমি?"

"কি করতে বলি আমি তোমায় ..বেশ, তোমায় আমি...চাই...।"

ওরলফ্ বুঝিল যে সে ঠিক যেমনটি চায় তাহা প্রকাশ করিয়া বলার শক্তি তাহার নাই। তাহার যা বলিবার আছে কথায় সে ভাব ব্যক্ত করিয়া ম্যাট্রোসাকে বুঝাইতে সে অক্ষম। কিন্তু সে বুঝিল এমন একটা বিঘ্ন তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে যাহা সহস্র কথায়ও ভাঙ্গিবার শক্তি নাই। এই চিন্তায় তাহার ভয়ানক ক্রোধের সঞ্চার হইল, ম্যাট্রোসার মাথার পেছনে সে কব্জির আঘাত করিয়া গর্জ্জন করিয়া কহিল—"মায়াবিনি, আমায় হতমান করবার চেষ্টা, আমি খুন কোরব তোকে! আঘাত এত জোরে লাগিয়াছিল যে সে মুখ থুবড়াইয়া টেবিলে পড়িয়া গেল কিন্তু সে ধাক্কা সামলাইয়া স্বামীর মুখেরপানে সদর্প ঘৃণায় চাহিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। "মার ছাড়লে. কেন—"

"চুপ—চুপ কর্!"

"আমি বলছি—মার ছাড়লে কেন ?"

"শয়তানী কোথাকার !"

"না তোমার এ ব্যাপার আর আমি সহ্য কোরব না।"

"চুপ কর,—বলছি !"

"তোমার কাছে এ অত্যাচার আর আমি সহ্য কোরব না !"

ওরলফ দাঁত কড়মড় করিয়া এক পদ পিছাইল, বোধ হয় আরো জোরে আঘাত করিবে এই মতলব করিয়া—কিন্তু এই সময় দোর হঠাৎ খুলিয়া গেল, এবং ডাক্তার ওয়াসেস্কো ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন।

"কি হচ্ছে এখানে,—কোথায় আছ তোমরা সে কি বিস্মৃত হয়েছ ? কি রকম ব্যাপার এ সব !" তাহার মুখভাব কঠোর এবং বিস্ময় ভরা। ওরলফ্ কিন্তু একটুও লজ্জা না পাইয়া ডাক্তারের দিকে মাথা নত করিয়া কহিল "কিছু না, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আবর্জ্জনা একটু দূর করে দেওয়া।" সে ডাক্তারের মুখের উপর মুখ বাঁকাইয়া একটু হাসিল। ওরলফের এইরূপ শ্লেষ ব্যঞ্জক অবিনীত ভাব দেখিয়া ডাক্তার রাগিয়া বলিলেন—"আজ কাজে যাও নি যে ?" ওরলফ্ ঘাড় নাড়িয়া গম্ভীরভাবে উত্তর করিল "আমি অন্য কোন কাজে ব্যাপৃত ছিলেম··· আমার নিজের কিছু কাজেই আটকে ছিলেম···" "ওঃ-তাই না কি ? আচ্ছা কাল রাত্রে অমন হল্লা করেছিল কে" ওরলফ্ বলিল "আমরাই।" "ও, সে তবে তুমি···তাই না কি ! ভাল, ভাল !...বেশ নিজের বাড়ীর মত বন্দোবস্ত করে নিয়েছ এখানে, বোধ হচ্ছে...ইচ্ছামত বাইরেও যাওয়া হয়..." "আমরা ক্রীতদাস নয়···" "চুপ্ এ জায়গায় মদের দোকান বানিয়ে নিতে চাও !···টের পাইয়ে দিচ্ছি কোথা আছ ?" একটা স্পষ্ট বিদ্রোহের ভাব—এই বিপর্য্যস্ত মনের অবস্থা যাহা তাহাকে সর্ব্বদা পীড়া দিতেছিল, এই অবস্থা হইতে বাহির হইবার ইচ্ছা তাহার মনে জাগিল—তখনই আবার তাহার মনে হইল সাধারণে যাহা পারে না তেমনই অসাধারণ একটা কিছু করিয়া যে বাঁধন তাহার আত্মাকে মুষড়াইয়া দিতেছে তাহা হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারে। সে কাঁপিয়া উঠিল, যেন একটা নির্ম্মল আনন্দ তাহার অন্তর বহিয়া উঠিতেছে—ডাক্তারের নিকট আগাইয়া গিয়া সে ধীর স্বরে কহিল "ও-ভাবে চীৎকার করে গলা ফাটাবেন না ! কোথায় আছি সে আমি বেশ ভাল জানি···এমন জায়গায় আছি যেথায় তোমরা মানুষ বধ কর।" ডাক্তার বিস্ময় স্বরে কহিলেন "কি বলছ তুমি—কি বললে তুমি ?" ওরলফ্ বুঝিল যে, সে একটা অর্থহীন অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, কিন্তু সে তাহার কথা ঘুরাইয়া লইল না,—আরো উত্তেজিত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিল—"যাক্ কিছু যায় আসে না ওতে, কি বলছি সে শীগ্‌গীরই বুঝবেন। ম্যাট্রোসা তল্পী বেঁধে নাও, চল।"

"অত তাগিদ কি,—কি বললে এই মাত্র, বল আবার—বল শীগ্‌গীর, এর মজা দেখাচ্ছি, বাঁদর কোথাকার" ওরলফ্ মুখ তুলিয়া নির্ভীকভাবে তাহার পানে তাকাইল, তাহার বোধ হইল যেন সে একটু করে বাতাসের উপর উড়িতেছে, এবং প্রতি নিশ্বাসে সে বেশী হাল্কা বোধ করিতে লাগিল।

"ন্যাড্রিষ্টেপানোভিচ চীৎকার বা গালাগালি করবেন না। আপনি মনে করেছেন বোধ হয় কলেরার সময় বলে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন...কিন্তু সে আপনার ভুল···এই যে সব সারাচ্ছেন এর আধ পয়সা উপকারও আমি দেখি না, কেউ—এই সায়ান, এই বিজ্ঞান বা আপনাদের চায় না; ভাল আমি যদি এ-কে মরণের দ্বারই বলতুম ! .. আমি বলছি হয় তো বোকার মত, সে আমি স্বীকারই কচ্ছি, কারণ এটা রাগের সময়। কিন্তু এই যে আপনি আমার উপর গর্জ্জন কচ্ছেন—এমন ব্যবহার করবার আপনার ক্ষমতা নেই।"

ডাক্তার শান্ত স্বরে কহিলেন "সহজে তোমায় ছাড়্ছি না, বেশ শিক্ষা দিয়ে দেব—কে ওখানে, বাইরে কারা এস দেখি!" অনেকগুলি লোক বাহিরের বারান্দায় একত্র হইয়াছিল, ওরলফের চোখ জ্বলিয়া উঠিল। "আমি হল্লা করি নি—ভয়ও পাচ্ছি না...কিন্তু আপনি যদি আমায় শিক্ষা দেবার জন্য অত ব্যস্ত হয়ে থাকেন ..তা হ'লে আমার কিছু বল্‌বার আছে।"

"বল যা আছে বল্‌বার।"

"আমি সহরে গিয়ে সকলকে বল্‌বো, শোন গো সকলে ওরা কেমন করে কলেরার রোগী ভাল করে।" ডাক্তার চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন "কি?"

"হাঁ সব মিলে এসে প্রতিহিংসা দিয়ে আপনাদের disinfect করবার সাহায্য করব।" এই কথা শুনিতে শুনিতে ডাক্তারের রাগ একটা জমাট বিস্ময়ে পরিণত হইল; এই লোকটিকেই না তিনি কঠোর পরিশ্রমী বিনীত লোক বলিয়া জানিতেন, আর সে এখন এই রকম বিদ্রোহীর ধারণা লইয়াছে!

"কি বল্‌ছ বোকা,...এত বোকা তুমি হতে পার?"

এই 'বোকা' কথাটা ওরলফের ভাবরাশির মধ্যে সারা দিতে লাগিল, সে বুঝিল এ-কথার সে সম্পূর্ণ যোগ্য—কিন্তু এই জ্ঞানেই তাহার রাগ আরও বাড়িতে লাগিল। সে বলিল—"কি বল্‌ছি আমি বেশ জানি। আমার কাছে সবই সমান, আমার মত লোকের সবই সমান,—সব সময় আমাদের মত লোকের মনের ভাব চাপ্‌তে যাওয়া বৃথা। ম্যাট্রোসা তল্পী বাঁধ।" ম্যাট্রোসা ধীর স্বরে চাপা গলায় কহিল "আমি এ যায়গা ছেড়ে যাচ্ছিনা।"

ডাক্তার কি করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া তাহাদের দু'জনের পানেই বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন, পরে ওরলফকে বলিলেন "তুমি হয় মাতাল, নয় পাগল হয়েছ, এখনও বুঝ্ছ না তুমি কি কচ্ছ!" ওরলফ্‌ও বুঝিল সে অনেকটা আগাইয়া গেছে, আর উপায় নাই—তাই সে ব্যস্ত ভাবে উত্তর করিল—"আপনি বল্‌ছেন, কি কচ্ছি আমি! কিন্তু আপনি কি কচ্ছেন সে আপনি জানেন কি? সব disinfect কচ্ছেন, হাঃ হাঃ! আর যে সব লোক জীবনের যাতনা সইতে না পেরে মরে যাচ্ছে তাদের সারাচ্ছেন!......... ম্যাট্রোসা আমার সঙ্গে না আস তো মাথা ভেঙ্গে দেব!"

"আমি তোমার সঙ্গে যাব না।" সে সেইখানে নিষ্প্রভ হইয়া অসাড় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু তাহার চোখের ভাব স্থির দৃঢ়—সে স্বামীর মুখের পানে তাকাইয়া ছিল। এই চাহনি ওরলফের বীরত্ব ঠাণ্ডা করিয়া দিল, তাহার মাথা নত হইয়া আসিল, সে নীরবে সরিয়া গেল।

ডাক্তার বলিলেন "অধঃপাতে যাক্—কি বল্‌লো মাথামুণ্ড কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লেম না। যাও সরে পড়—বেঁচে গেলে ভালয় ভালয়—কপাল ভাল তোমার, এখুনি তোমায় পুলিসে দিতে পার্‌তেম, যাও—চলে যাও।" ওরলফ্ ঘৃণাভরে ডাক্তারের মুখের পানে চাহিল, ডাক্তার তাহাকে মারিতেও পারিতেন, জেলেও দিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় দয়ায় ভরা এবং তিনি বুঝিয়াছিলেন ওরলফ্ এখন যা করিতেছে সে জন্য সে দোষী নয়।

ওরলফ্ শেষ বার তাহার পত্নীকে কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "এই শেষবার—যাবে কি না বল?"

সে পেছন ফিরিয়া যেন একটা ঘুঁষি খাইতে প্রস্তুত হইয়াই বলিল—"না, আমি যাচ্ছি না।" সে অসহায়ের মত চীৎকার করিয়া কহিল "সব যা অধঃপাতে! কি কর্‌বো তোদের দিয়ে?" ডাক্তার দয়ার্দ্র স্বরে কহিলেন "কি হতভাগ্য!" ওরলফ্ উচ্চকণ্ঠে পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল "বোকোনা, দেখ্‌ছ আমি যাচ্ছি। আর বোধ হয় এ

জীবনে আমাদের দেখা হবে না ..হতেও পারে...সে আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। কিন্তু কখনো যদি দেখা হয়...তা হলে সে তোর পক্ষে ভাল হবে না—বলে রাখ্‌ছি...চল্‌লেম।" ডাক্তার, ওরলফ্‌ যাবার সময় ব্যঙ্গ-কণ্ঠে কহিলেন "বিদায়—করুণ-নাট্যের অভিনেতা।" ওরলফ্‌ ফিরিয়া তাহার বিষাদমাখা চোখ তুলিয়া বলিল "ছেড়ে দাও আমায় একা—আর জ্বালিও না।" সে তাহার ভিজে টুপি মেজে হইতে তুলিয়া মাথায় দিয়া একবারও ম্যাট্রোসার পানে না চাহিয়া বহির হইল। ডাক্তারের সমুখে ওরলফ্‌-পত্নী মৃত্যুবিবর্ণ মুখ লইয়া দাঁড়াইয়াছিল—ডাক্তার তাহার পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন ওরলফের দিকে অঙ্গুল নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন "কি হয়েছে ওর?"

"আমি জানি না..."

"হুঁ..... কোথায় যাচ্ছে এখন?" ম্যাট্রোসা স্থির-বিশ্বাসে কহিল "গিয়ে মদ খাবে।" ডাক্তার হাঁই তুলিয়া বিদায় হইলেন। ম্যাট্রোসা খোলা জানালায় চাহিল। অন্ধকার ও জল বাতাসের মধ্যেও সে বুঝিল একজন লোক হাঁসপাতালের গেট হইতে বাহির হইয়া সহরের দিকে যাইতেছে। একা মাত্র তাহাকে এই দুর্যোগে মাঠের মধ্যে দেখা যাইতেছিল, ম্যাট্রোসার মুখ আরো সাদা হইল—সে কক্ষের এক কোণে গিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল, দীর্ঘ নিশ্বাসে ভক্তের তন্ময় কথা তাহার মুখ হইতে বাহির হইতেছিল এবং উত্তেজনা ও জ্বালায় সে কণ্ঠ ও বুক বার বার চাপিয়া ধরিতেছিল।

(৯)

সে দিন আমি ন--সহরের টেক্‌নিক্যাল স্কুল পরিদর্শন করিতেছিলাম, স্কুলের একজন প্রতিষ্ঠাতা আমার বিশেষ বন্ধু সঙ্গে করিয়া তিনি সব দেখাইতে ছিলেন, সব নূতন-ধরণের আদর্শ বন্দোবস্তগুলি আমায় দেখাইয়া তিনি; বলিলেন—"দেখ আমাদের কাজ নিয়ে এখন আমরা গৌরব করতে পারি—সামান্যভাবে আরম্ভ করেছিলেম এই স্কুল, এখন দেখ কেমন সুন্দর হয়ে উঠেছে। শিক্ষকগুলোও মিলে গেছে আমাদের ভাগ্য-ক্রমে ভাল; এই জুতো তৈরী বিভাগে ধর আমাদের একজন মহিলা শিক্ষক আছেন, পূর্ব্বে একজন কারিগরের স্ত্রী ছিলেন, স্বভাব-চরিত্র সুন্দর। কাজ-কর্ম্ম যা করেন আশ্চর্য্য সে!...তার ব্যবসায় শিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা অদ্ভুত—ছেলেদের যে কত ভালবেসে শেখান। খোরপোষ বাদে মাত্র পোনের রুবল করে দেওয়া হয়—এই সামান্য মাহিয়ানায় সে একটা রত্ন পাওয়া গেছে...এই সামান্য আয় থেকেই তিনি দু'টি পিতৃমাতৃহীন বালককে পালন করেন...ভারী সুন্দর লোক!

বন্ধুর মুখে মুচির স্ত্রীর এত প্রশংসা শুনিয়া তাহাকে আমার দেখিবার অত্যন্ত ইচ্ছা হইল। কয়েক দিন পরেই ম্যাট্রোসা আইভানোভনা ওরলফের সহিত আমার পরিচয় হইল এবং সে তাহার জীবনের বিপদকাহিনী আমায় শুনাইল। প্রথম প্রথম স্বামীর সঙ্গে তাহার পৃথক হওয়ার পর সে তাহাকে মোটেই শান্তি দেয় নাই; সে প্রায়ই মাতাল হইয়া আসিয়া ভয়ানক হল্লা করিত, সে বাইরে বাহির হইলেই তাহার পেছন লইত এবং তাহাকে ধরিতে পারিলে নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিত। ম্যাট্রোসা সবই সহ্য করিত, হাঁসপাতাল বন্ধ হইয়া গেলে লেডী-ডাক্তার তাহাকে একটা কাজ জোগাইয়া দিয়া তাহাকে স্বামীর কবল হইতে রক্ষা করিবেন স্বীকার করিলেন। ইহার পর হইতেই ম্যাট্রোসার শান্তিপূর্ণ কর্ম্ম-জীবনের আরম্ভ। হাঁসপাতালে তাহার দুইজন সহকর্ম্মীর নিকট লেখা পড়

শিখিয়া পরে দুইজন বালকবালিকাকে নিজের সন্তানের মত রাখিয়া বেশ সুখের সংসার পাতাইয়া বাস করিতেছিল—শুধু এক একবার তাহার সেই অতীত জীবনের কথা ভীতি-ব্যথিত প্রাণে উঁকি দিয়া যাইত। সে তাহার ছাত্রদের ভালবাসে, যে কর্ম্মের ভার তাহার উপর ন্যস্ত হইয়াছে তাহার দায়ীত্ববোধ তাহার বেশ আছে এবং তাহাই সে জীবনের সার জ্ঞান করিয়া লইয়াছে। স্কুলের অধ্যক্ষগণের ভালবাসা ও সম্মান সে লাভ করিয়াছে; কিন্তু একটা শুষ্ক যন্ত্রণাদায়ক কাশিতে সে ভুগিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং তাহাই তাহার জীবনী-শক্তি হরণ করিতেছিল। তাহার চোখ দু'টিতে সর্ব্বদাই একটা অবর্ণনীয় দুঃখ ফুটিয়া থাকিত; অস্থির চিত্ত ওরলফের সহিত বিবাহিত জীবনের এই প্রভাব এখনও তাহার উপর ছিল।

গত তিন বৎসর হইতে ওরলফ্ তাহার পত্নীকে একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। সে কখনও কখনও ন—সহরে আসে কিন্তু তাহার পত্নীকে কখনও মুখ দেখায় নাই—তাহার স্বামী কি-ভাবে জীবন যাপন করিতেছে সে কথা উঠিলে ম্যাট্রোসা বলিত "ভবঘুরে—ভবঘুরের মতই জীবন যাপন করিতেছে।"

কিছুদিন পরে ওরলফের সহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগ আমারও হইল। সহরের একটা বিশ্রী পল্লীতে তাহার সঙ্গে আমার দেখা। দু' তিনবার দেখা হইতেই আমরা বন্ধু বনিয়া গেলাম, সে আমাকে তাহার বিবাহিত জীবনের কথা বলিল—একই কথা ম্যাট্রোসা যাহা আমাকে বলিয়াছিল। বলিয়া সে যেন খেই হারাইয়া ফেলিল—আবার একটু পরে বলিল "হাঁ ম্যাক্সিম স্যাভাটিস এই ভাবেই সব ঘটছে—এই ভাবে আমি উঠেছিলেম, আবার পড়ে গেলেম। কিন্তু অসাধারণ কিছু করতে পারি নি—এখনও মনের ভয়ানক ইচ্ছা কিছু একটা অসাধারণ করি। বিশ্বের সব আমার ধূলো করে দিতে ইচ্ছা হয়—একটা কিছু যাতে সব মানুষের উপরে উঠতে পারি আমি—যেন সেথায় উঠে সকলের মুখে থুথু দিতে পারি। এমন কিছু যাতে সকলকে বল্‌তে পারি—'পশুর দল কি জন্য জীবন তোদের—কেমন ভাবে বেঁচে রয়েছ—যত সব বদমাস, নীচের দল।' তারপর সেথা থেকে পড়ে চূড়মার হয়ে গেলেও আমার দুঃখ নেই! কি বিশ্রী জীবন এ? বড় সঙ্কীর্ণ—বড় বিশ্রী বোধ হয় আমার। একবার ম্যাট্রোসার বোঝা ঘাড় থেকে নামিয়ে দিয়ে ভেবেছিলেম—এইবার 'ওরলফ্' বোঝা নামিয়ে দিলে—স্বাধীনভাবে চল এইবার। কিন্তু সব যেন উল্টে গেল—নৌকা আমার সেওলায় আট্‌কে গেছে—এইখানে বাঁধা পড়ে গেছি! কিন্তু ভয় করি না—একদিন উঠবোই, নাম করবোই! আমার পত্নী! সে এখন আমার কিছু না, গোল্লায় যাক্ সে! আমার মত লোক পত্নী দিয়ে কি করবে? বিশ্বের বাঁধন যখন আমায় টান্‌ছে তখন এক পত্নীর বাঁধনে কি করে বাঁধা থাকবো?...হৃদয়ভরা অস্থিরতা নিয়ে আমার জন্ম...ভাগ্যের লেখা;—এই অশান্ত জীবন যাপন বিশ্বের মুখের উপর লক্ষ্য-হারা হয়ে ভ্রমণ...এই জীবনই বেশ কিন্তু...এ স্বাধীন, যদিও এতে অসুবিধার অন্ত নেই—সব জায়গা ঘুরছি—কিন্তু আত্মার শান্তি কোথাও পাই না—তুমি বল আমি মদ খাই—বোধ হয় ঠিক—কিন্তু আর কি কোর্‌ব বল তো? মদ একমাত্র জিনিস যাতে অন্তরের শান্তি দেয়—একটা জ্বলন্ত শিখা সদাই আমার পোড়াচ্ছে—সব আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে—সহর, গ্রাম, সব অবস্থার লোক—সব আমার বিপক্ষে।—অস্থির হয়ে পড়েছি! এর চেয়ে ভাল একটা কিছু কি আবিষ্কার করা যায় না? অর্দ্ধেক জগত আর অর্দ্ধেকের উপর ক্ষেপে রয়েছে—সব ধ্বংশ ছাড়া আর এর সংশোধনের উপায় নেই!

জীবন! জীবন! শয়তানের কি আশ্চর্য্য আবিষ্কার! মদের দোকানের দোর খোলা ও বন্ধ করার শব্দ কানে বাজ্‌ছে; ভেতরের অন্ধকার দিকটায় তাকাইলে বোধ হয় যেন দৈত্য হাঁ করে রয়েছে। ধীরে নিশ্চিতপ্রাণে যেন একটির পর একটি দরিদ্র ক্ষুদ্র-আত্মা গ্রাস করছে—অস্থির ও শান্ত কেউ ইহা হতে বাদ যাচ্ছে না...........।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

সম্পূর্ণ।

মা।

মা নামের এ কি মহিমা! কেমনতর টান,
গোলক ছেড়ে বালক হতে চায় যে ভগবান।
বসুন্ধরা অধীর সে ত মায়ের স্নেহ থির,
ক্ষীরোদ-সাগর কোথায় পাবে এমন মধু নীর।
সাতটী জনম সাত সাগরে যত্নে ঢেলে গা,
স্বর্গ হতে মূর্ত্তি ধরে মর্ত্ত্যে আসে মা।
সাত সাগরের রত্ন আসে যত্নে হৃদিতল,
সাত সাগরের পীযূষ আসে স্নিগ্ধ ঢলঢল।
চক্ষে আসে সূর্য্য শশী, বক্ষে বরুণা,
ইন্দিরা বয় স্বর্ণঘটে শুভ্র করুণা।
গাভীর বাঁটে দুগ্ধ আসে, নদীর বুকে জল,
লতার বুকে পুষ্প আসে, তরুর বুকে ফল।
মায়ের নামে গঙ্গা পূতা, লক্ষ্মী পূজা পান,
মা করে দেন মহামায়ার স্নেহের পরিমাণ।
তীর্থে ঘোরে নিত্য লোকে কলুষ হরণে,
স্বর্গ আসে দেখ্‌তে মরত মায়ের চরণে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

শূদ্রের শৌর্য্য।

—:*⊕*:—

ঘরে-ঘরে সেইমাত্র সন্ধ্যার দীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। একজন অশ্বারোহী রাজপুত যুবা, নগরপ্রান্ত হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে অশ্ব ছুটাইয়া আসিয়া অম্বরেশ্বরের প্রধান মন্ত্রী মহামান্য আচরোল-সর্দ্দার মহাশয়ের প্রাসাদ দ্বারে পৌঁছিয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে সংবাদ দিল "মন্ত্রী-জামাতা যুবনসিংহকে সঙ্গে লইয়া মন্ত্রী-কুমার অজিতসিংহ এখনই এখানে আসিতেছেন, তাঁহার আহার বিশ্রামের সুব্যবস্থা করা যাউক।"

দাস-দাসী মহলে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল! অন্তঃপুর আনন্দ-উৎসাহের কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল! নূতন জামাতা যুবনসিংহ তিন বৎসর পূর্ব্বে, একদিন বিবাহ করিতে এই আচরোল প্রাসাদে আসিয়াছিলেন, আর আজ এই দ্বিতীয়বার আসিতেছেন!—তাহাও একান্ত অপ্রত্যাশিত—অকস্মাৎ আগমন! কাজেই বিস্ময়-পুলকে সকলেই চমৎকৃত!

গৃহকর্ত্তা আচরোল-সর্দ্দার তখন বাড়ীতে ছিলেন না, 'বিশেষ প্রয়োজনীয় আহ্বান' পাইয়া কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তিনি রাজপ্রাসাদে চলিয়া গিয়াছিলেন। জামাতার আগমনসংবাদ লইয়া তখনই তাঁহার কাছে একজন লোক ছুটিল!

নাগোরের রাজনৈতিক-গগণে তখন প্রচণ্ড বিপ্লবের ঝড় বহিতেছে! বিচক্ষণ রাণা ভক্তসিংহের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার পুত্র নবীন রাণা বিজয়সিংহ তখন তরুণবয়স্ক বালক মাত্র;—কূট রাজনৈতিক কৌশলে অনভিজ্ঞ বিজয়কে পাইয়া, ভক্তসিংহের জ্যেষ্ঠ সহোদর, রাজ্যভ্রষ্ট অভয়সিংহের পুত্র রামসিংহ মহোৎসাহে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন! পৈত্রিক সম্পদ কেহই ছাড়িবে না!—ঘোর সংগ্রাম চলিতেছে! রামসিংহ গৃহশত্রুকে ধ্বংস করিবার জন্য, বাহিরের শত্রুর শরণাগত হইয়াছেন, দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপ আপ্পাজী সিন্ধিয়ার সহিত মিশিয়া, প্রবল বিক্রমে বিজয়সিংহের সৈনাবল ধ্বংস করিতেছেন। তাহার উপর দৈববিড়ম্বনায় বিজয়সিংহকে নানারূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে; সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, বিজয়সিংহ নাগোর দুর্গে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। শত্রুগণ চারিদিক হইতে আসিয়া নাগোর অবরোধ করিয়াছে। বিজয়সিংহের সৈন্যবল অল্প, শত্রুগণ সংখ্যায় অধিক; কাজেই সহস্র চেষ্টায়ও বিজয়সিংহ পারিয়া উঠিতেছেন না। এদিকে শত্রুগণ ছলে, বলে, কৌশলে, নানরূপে আক্রমণ করিয়াও নাগোরবাসীর ভীষণ শক্তির সাম্নে তিষ্ঠিতে পারিতেছে না, হটিয়া আসিতেছে,—তবু অবরোধ যুদ্ধ ছাড়িতেছে না। প্রভুভক্ত রাঠোরগণ প্রাণপণে বিজয়সিংহকে রক্ষা করিতেছেন। মৈরতা সর্দ্দার যুবনসিংহ, বিজয়সিংহের অন্যতম সামন্ত সর্দ্দার।

সম্প্রতি একহাজার সশস্ত্র রাঠোর-যোদ্ধার সহিত, ছদ্মবেশে গোপনে নাগোর দুর্গ হইতে বাহির হইয়া রাণা বিজয়সিংহ, পূর্ব্ববন্ধু বিকানীর রাজের নিকট সাহায্য আশায় গিয়াছিলেন। কিন্তু বিকানীর পতি, নানা ছলে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। হতাশ হইয়া রাণা, অম্বরপতি ঈশ্বরসিংহের নিকট শেষ চেষ্টা দেখিবার জন্য, বড় আশায় বুক বাঁধিয়া আসিতেছেন,—যদি তিনি অনুরোধ রাখেন! যদি তিনি সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন, তবে মহারাষ্ট্র সৈন্য ধ্বংস করিতে কতক্ষণ?—

কিন্তু ইহাতে একটু—কিন্তু, একটু সংশয়ের কথা আছে!—অম্বররাজ ঈশ্বরসিংহ, বিজয়ের মহাশক্র সেই রামসিংহ মহোদয়ের শ্বশুর!—বর্ত্তমান সম্পর্কে, বিজয়সিংহ আজ তাঁহার জামাতার শক্র।

এখন সমস্যা এই, বিজয়সিংহের প্রার্থনা মতে,—রাজপুত হইয়া রাজপুত ধর্ম্মের মর্য্যাদা রাখিবার জন্য বিজয়সিংহের সাহায্য করিতে তিনি সম্মত হইবেন,—না কুটুম্বিতার দাবীটা সকলের উপর বড় করিয়া, বিজয়সিংহের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন? কে জানে তাঁহার বিবেচনায় কি ভাল বোধ হইবে? বিজয়সিংহের সমভিব্যহারী প্রবীণ বিজ্ঞ রাঠোরগণ সকলেই বিষম সংশয়ান্বিত!—কিন্তু বীরত্ব-খ্যাতি-অর্জ্জন উৎসুক,—রাঠোর যুবাগণের ধারণা অন্যরূপ!—তাহাদের মতের সহিত এক মত হইয়া সংসার-অনভিজ্ঞ সরল-চেতা যুবা বিজয়সিংহও আশা করিয়াছেন, বিশ্বাস করিয়াছেন,—উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অম্বরপতির মত মহামান্য ব্যক্তি কখনই পবিত্র ধর্ম্ম আতিথেয়তার অবমাননা করিবেন না! কুটুম্বিতার স্বার্থ-মমতা অপেক্ষা রাজপুতজাতি বীরত্বের মহত্ব-মর্য্যাদা বেশী জানে। শরণাগত রাঠোররাজকে কি অম্বরেশ্বর আত্ম-গৌরব দেখাইতে কার্পণ্য করিবেন! অসম্ভব!—উচ্চ আশায় উৎসাহিত নবীন রাণা, একান্ত বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া শক্রর শ্বশুরের নিকট আশ্রয়ার্থী অতিথির বেশে আজ আসিয়াছেন, এখন কে জানে কি হয়!

রাজপ্রাসাদ হইতে পদস্থ সামন্ত রাজগণ, তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে গিয়াছেন। অজিতসিংহও তাঁহাদের সহিত ছিলেন,—তিনিই কোনগতিকে গোপনে রাণার সম্মতি আদায় করাইয়া মধ্য পথ হইতে তাঁহার বিশ্বাসী সুহৃদটিকে দলছাড়া করিয়া, নিজেদের বাড়ীতে লইয়া আসিতেছেন। সলজ্জ যুবনসিংহ, শ্যালকের প্রস্তাবে বিস্তর আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু রাণা পরিহাস করিয়া তাহা উড়াইয়া দিয়াছেন, সমবয়স্ক সঙ্গীগণও কিছু কিছু ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে ছাড়ে নাই,—ব্যাপারটা ঘোরাল হইয়া ক্রমশঃ বয়স্ক গুরুজনদের কানে উঠিবার যো' হইয়াছে দেখিয়া, অগত্যা যুবন চুপ করিয়া গিয়াছেন!

যথাসময়ে অজিতসিংহ তাহাকে আপনাদের প্রাসাদে লইয়া আসিলেন।

(২)

অতিথি-সৎকারে রাজপুতের বিশ্ব-বিশ্রুত খ্যাতি; পর্য্যটন শ্রান্ত, ক্ষুৎপিপাসাতুর যুবনকে অন্তঃপুরে আনিয়া যথাযোগ্য আদর-আপ্যায়ন সহকারে, জলযোগ প্রভৃতি করাইয়া, অজিতের স্ত্রী তাঁহাকে এক সুসজ্জ আলোকোজ্জ্বল নিভৃত কক্ষে আনিয়া বসাইলেন। বলিলেন "বীরসজ্জা ছেড়ে এইখানে শান্ত হয়ে একটু বিশ্রাম করুন,—আপনার রাণা আজ আপনাকে ছুটি দিয়েছেন, আজ রাত্রের মত আপনি ত নিশ্চিন্ত। আমি এর পর এসে গল্প করব, আপাততঃ সংসারের কাজ দেখি গে যাই—"

যুবন ব্যস্ত হইয়া কি বলিতে যাইতেছে দেখিয়া তিনি সহাস্যে বলিলেন, একলা থাক্‌বেন না ঐ কোণে মুখ গুঁজে একটি কৌতুকাবহ জীব স্তব্ধ হয়ে আছে, সে একটি বিরাট রহস্য স্তূপ!—তার বেশী পরিচয় আমি জানি না · অতিথি পূজার ক্রটি গ্রহণ করবেন না। আশা করি এই নির্জ্জন বিশ্রামের অবকাশটুকু আপনার অপছন্দ হবে না—"চট্ করিয়া দ্বারের বাহিরে গিয়া তিনি সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। সলজ্জ যুবন, হাসিমুখে নিরুত্তর রহিল।

সর্ব্বাঙ্গে ফুলাভরণ সজ্জিতা ষোড়শী শিপ্রা, ঘরের কোণে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ওড়নার আঁচলে মাথা ঢাকা দিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। যুবন লৌহবর্ম্মের সন্ধিগ্রন্থি খুলিতে খুলিতে কাছে আসিয়া ওড়নার আঁচল ধরিয়া একটু টানিলেন "মৃদুস্বরে বলিলেন, শারীরিক মানসিক সব মঙ্গল ত?—"

মুখ তুলিয়া, লজ্জা-চকিত দৃষ্টি হানিয়া শিপ্রা বলিল "ছিঃ, দেখো ত, আমায় কেমন করে ফুল দিয়ে সাজালে, তোমার সামনে বেরুতে আমার লজ্জা করছে,—ছিঃ, তুমি কি মনে করবে বল দেখি ?—"

"কি যে মনে করা উচিত, সেটা পূর্ব্বাহ্নে ভেবে ঠিক করে রাখতে পারিনি,—কাজেই বলতে পারলুম না শিপ্রা." বলিয়া যুবন নিঃশব্দ কৌতুকে হাসিতে লাগিলেন। শিপ্রা, সজোরে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল "হাঁা যাও!—সংযমী সৈনিকের মুখে ও-সব পরিহাস ভাল শোনায় না,—মোটেই ভাল শোনায় না! এখন আসল খবর বল, পারিবারিক সব কুশল? শক্রপক্ষ নাগোর অবরোধ করেছেন, নগরবাসীর অবস্থা কেমন?—" শিপ্রা কথা কহিতে কহিতে যুবনের বর্ম্ম খোলার সাহায্য করিতে লাগিল, কটিবন্ধ হইতে ছুরিকা খুলিয়া লইয়া হাসি মুখে বলিল "এটা আজকের মত আমার জিম্মায় থাক, কেমন?"

যুবন হাসিলেন। শিপ্রার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন "আমি যুদ্ধের গোলযোগে ব্যস্ত আছি, আর তুমি আমার চোখে ধূলা দিয়ে এত বড় পরিবর্ত্তনের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছ? অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতক তুমি! সেই ক্ষুদ্রা বালিকা শিপ্রা, এর মধ্যে......"

ব্যাকুল হইয়া শিপ্রা বলিল "তোমার পায়ে পড়ি, পায়ে পড়ি, চুপ কর!—আমি ত জানি, আমাকে দেখলেই তুমি ঠাট্টা সুরু করবে! ভারি অন্যায়, আমি বুঝি সত্যিকার এমনই একটা অচেতন পদার্থ! যাও, অগ্নি ধারা করবে যদি,—কর, তোমার যা খুসি তাই কর, আমি কিছু বলব না, এই পাথরের চৌকীতে চুপ করে বসে থাকি—তোমার যা ইচ্ছা তাই কর।"

মৃদু হাসিয়া যুবন বলিলেন "তাই ত, ঘোর বৈরাগ্য যে!"

অত্যন্ত চটিয়া শিপ্রা বলিল "আমি শপথ করে বলছি, তোমাদের মত ঠাট্টাবাজ সৈনিকের দ্বারা কোন কাজ হবে না—এই সব লোকের হাতে রাণা বাহাদুর কেমন করে বিশ্বাসী কাজের ভার দেন, বাস্তবিক আমি তাই ভাবছি! উঃ কি ভয়ানক,......ঠাট্টা নয়, আমি সত্য বলছি, এই সব চপলতা রঙ্গপ্রিয়তা—এ গুলো শিখতে নেহাৎ অল্প সময় যায় না ত।"

"মোটেই না!—" বর্ম্ম খুলিয়া, ঘর্ম্মাক্ত পরিচ্ছদ ছাড়িয়া, যুবন পাশের ঘরে স্নানাগারে গা হাত পরিষ্কার করিতে চলিয়া গেলেন; শিপ্রা, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

একটু পরে যুবন ফিরিলেন। এবার তাঁহার মুখে সেই চপল হাস্যলহরী নাই!—দৃষ্টি উদ্বিগ্ন, ললাটে চিন্তা গাম্ভীর্য্য প্রকটিত হইয়াছে। এতটুকু নিস্তব্ধতার অবকাশ পাইয়া, তাঁহার সমস্ত মন দুর্ভাবনায় ভরিয়া উঠিয়াছে, তাই ত রাণা বিজয়সিংহের প্রার্থনার ফল শেষ পর্য্যন্ত কি হইবে? ঈশ্বরপ্রসাদও কি তাঁহাকে সত্যই প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন? অসম্ভব, তাহা কখনই হইতে পারে না! কিন্তু সত্যই যদি তিনি একবাক্যে রাণার প্রস্তাবে স্বীকৃত হন, সত্যই যদি শরণাগতপালনধর্ম্মের মর্য্যাদা রাখিয়া জামাতার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন,—তবে হাঁ,—জগতে অতুল বীরত্ব-গৌরবের খ্যাতি রাখিয়া যাইবেন। যেদিন হউক একদিন ঈশ্বরপ্রসাদ মরিবেন, কিন্তু তাঁহার মহত্ত্ব-কীর্ত্তি চির অমর হইয়া থাকিবে! সারা জগত, শ্রদ্ধার সহিত—সম্ভ্রমের সহিত, তাঁহার পুণ্যস্মৃতিকে প্রণাম করিবে!

অন্যমনস্ক যুবন উদ্দেশ্যহীন ভাবে বর্ম্মটা তুলিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। শিপ্রা যে ঘরের মধ্যেই বসিয়া আছে তাহা ভুলিয়া গেলেন। শিপ্রা, নীরবে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর সহসা

মৌন ভঙ্গ করিয়া কোমলকণ্ঠে বলিল "যুদ্ধের উৎপাতে তোমাদের বড় মুস্কিল হয়েছে, নয়? অনাহার, অনিদ্রা, উদ্বেগ, মনস্তাপ;—কোথাও শান্তি নাই!"

যুবনের চমক ভাঙ্গিল, বিহ্বলের মত মুহূর্ত্তকাল শিপ্রার পানে চাহিয়া থাকিয়া, নিঃশব্দে চিন্তাস্রোতের গতি ফিরাইলেন। শিপ্রার কাছে আসিয়া, পাশে বসিলেন, সস্নেহে তাহার হাত টানিয়া লইয়া বলিলেন "সত্য শিপ্রা, তিন বৎসরে তুমি এত বড় হয়ে পড়েছ, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি—"

ব্যঙ্গ স্বরে শিপ্রা বলিল "অন্যায়, ভয়ানয় অন্যায়, এ সব জরুরি বিষয়ে স্বপ্ন দেখবার জন্যে, অখণ্ড ফুরসুৎ নিয়ে চুপচাপ লেপচাপা দিয়ে পড়ে থাকা উচিত!—" পরক্ষণে কপটতা ছাড়িয়া, মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে বলিল "আলাপের আর কিছু সূত্র খুঁজে পেলে না? এই সব মাথা-খারাপ-করা কথা আরম্ভ করলে! মিথ্যেই তরোয়াল ভেঁজে দিন কাটাচ্ছ,—মনটাকে বিলাসের আলস্য নিয়ে ঘুরপাক খেতে দিয়েছ! ছিঃ, সৈনিকের জীবন, সে যে ব্রতীর জীবন!—"

শিপ্রার মুখপানে চাহিয়া যুবন নীরবে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, কোন কথা বলিলেন না। যুবনের হাসি দেখিয়া শিপ্রার একটু সন্দেহ হইল,—বুঝি বা সে যতগুলা উপদেশ বিতরণ করিয়া বসিয়াছে,—যুবনের ভাণ্ডারে তাহার কিছুমাত্র অপ্রাচুর্য্য নাই! মনে একটু লজ্জা বোধ হইল, দ্বিধাপূর্ণ কটাক্ষে যুবনের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল "হুঁ আমি বুঝেছি, তুমি জান সব,—শুধু আমাকে রাগাবার জন্যেই······হুঁ নিশ্চয় তাই! নইলে এধারে এমন ভাল মানুষের মত থাক, আর আমার কাছে এসে দাঁড়ালে—কি ঐ সব দুষ্টুমী ধরলে! ছি, ওরকমটি কোরো না,—" হঠাৎ যুবনের স্কন্ধের শুষ্ক ক্ষতচিহ্নের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই বিস্ময়ে চমকিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিল "উঃ কি ভয়ানক চোট্—এত গভীর ক্ষত! কতদিন আগের? আর কত জায়গায় চোট্ লেগেছে?"

যুবন বলিল "ঠিক মনে নাই, তবে পাঁজরে একটা আর হাঁটুতে দুটো চোট লেগে সাড়ে পাঁচমাস বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে পারিনি,—সেইটেই মনে আছে!"

"দেখি—দেখি—" বলিয়া তৎক্ষণাৎ চৌকীর উপর হইতে নামিয়া পড়িয়া শিপ্রা, যুবনের হাঁটুর কাছে জানু পাতিয়া বসিল, হাঁটুর কাপড় সরাইয়া, সন্তর্পণে ক্ষত পরীক্ষা করিতে লাগিল,—করুণ ব্যথায় তাহার সুন্দর মুখ, উজ্জ্বল স্নেহ-মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিল,—খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া, দুঃখিত ভাবে বলিল "বেশ লোক তুমি! কই আমায় ত এ সব কথা কিছুই বলনি?-- এত ক্ষত, এত আঘাত, এত যন্ত্রণা সয়েছ—"

যুবন মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই কিশোর মুখের গভীর ব্যথা-নম্র, একান্ত স্নেহের ছবিটুকু দেখিতে লাগিলেন, কোন কথা কহিলেন না।—শিপ্রা কি যেন ভাবিতে ভাবিতে অন্য দিকে চাহিয়া বলিল "আচ্ছা যখন চুপটি করে বিছানায় পড়ে থাক্‌তে তখনকার কথা মনে হত?--"

সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া যুবন বলিলেন "সত্যি কথা বল্লেই ত তুমি এখনই গালাগালি সুরু করবে। তার চেয়ে ওটা চেপে যাওয়াই ভাল। বোস,—আঃ বোস না একটু, মাথায় একবার হাত বুলিয়ে দাও, সারাদিন উটের পিঠে আস্‌ছি, ভারি ক্লান্ত হয়েছি, এই চৌকীর ওপর একটু শুই,—"

যুবন, সটান লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন, শিপ্রা তাড়াতাড়ি মাথাটি কোলের উপর তুলিয়া লইয়া বলিল "আহা ঐ শক্ত পাথরে বুঝি অমি করেই মাথা রাখে,—এইখানে, হাঁ থাক। তা'পর যুদ্ধের খবর সব বল ত—"

শিপ্রা, মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। যুবন চোখ বুঁজিয়া মৃদু স্বরে উত্তর দিল "বল্‌বার মত খবর কিছু নাই শিপ্রা—"

"রাণা আজ রাত্রে অম্বরে থাক্‌বেন—?"

"সেই রকমই স্থির হয়েছে,............উঃ! তোমার দাদা রাজবাড়ী গিয়ে কত দেরী কর্‌ছেন? রাণার সংবাদের জন্য আমার যে কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না—নিশ্চিন্ত থাকি কেমন করে?" যুবন উদ্বিগ্ন ভাবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কি একটা ক্লেশাবহ চিন্তায় মন দিলেন।

শিপ্রা যুবনের মুখপানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল "আচ্ছা তুমি রাণাকে বড় ভালবাস, না?"

যুবন ধীরভাবে উত্তর দিলেন, "হাঁ বড় ভালবাসি শিপ্রা।"

একটু থামিয়া, আরও ধীরে—আরো গম্ভীর স্বরে যুবন বলিলেন "তাঁকে ভালবেসে, তারই মঙ্গলের জন্য যেন হাসিমুখে, আত্মোৎসর্গ করে যেতে পারি শিপ্রা,—তাহলে বুঝ্‌ব, এই রাঠোর জন্মটা ধন্য হয়েছে!—"

শিপ্রার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। হাতের উল্টাপিঠে তাড়াতাড়ি চোক মুছিয়া, অশ্রুহাস্য উজ্জ্বল বদনে বলিল "তোমরাই রাণার জন্য সব করবে,—আর আমরা কিছুই করতে পার্‌ব না।"

যুবন সপরিহাসে বলিলেন "কেন পার্‌বে না? রাণার ভক্ত অনুগত যোদ্ধাদের সংযত, পবিত্র রাখবার মহৎ দায়িত্ব যে তোমাদেরই উপর! এইমাত্র না আলস্যপ্রিয়তা রঙ্গপ্রিয়তার জন্য আমায় তিরস্কার করে সাবধান করে দিলে, তোমরা না থাকলে মহারাণার এই জরুরি কাজগুলা কর্‌বার লোক পাওয়া যেত কোথা?"

শিপ্রা রাগ করিয়া বলিল "আচ্ছা, যাও—"

যুবন দুই হাত বাড়াইয়া শিপ্রার কটিবেষ্টন করিয়া ধরিলেন। স্নেহ কোমল কণ্ঠে বলিলেন "রাগ করলে শিপ্রা;—না, ক্ষমা কর, শোন কথা, আমি তোমাদের অসম্মান করছি না, সত্য কথাটাই শুধু ঠাট্টার সুরে বলছি মাত্র, ক্ষমা কর, লক্ষ্মীটি—"

শিপ্রা কোন উত্তর দিল না।

যুবন মৃদু হাস্যে বলিলেন "রাগ কর্‌তে চাও কর, আপত্তি করবার অধিকার নাই। তবে একটা কথা শোন, তোমায় বিরক্ত কর্‌তে আসায়—"

অসহিষ্ণু হইয়া শিপ্রা বলিল "বিরক্ত কর্‌তে আসা? আমি তাই বলেছি নাকি?—"

যুবন কষ্টে হাসি চাপিয়া বলিলেন, "তোমায় বিরক্ত করতে আসায় আমার এতটুকুও আগ্রহ ছিল না শুধু মহরাণা জোর করে আমায় পাঠালেন।"

শিপ্রা উদাসীন ভাবে উত্তর দিল "বেশ উত্তম,—"

যুবন বলিলেন "মহারাণা দেখা কর্‌তে পাঠাইয়াছিলেন তাই এসেছিলাম,—এবার অনুমতি কর তো বিদায় হই।—"

সগর্ব্বে গ্রীবা উঁচাইয়া তেজস্বী কণ্ঠে শিপ্রা বলিল "স্বচ্ছন্দে যাও, রমণীর অঞ্চল ধরে অন্তঃপুরে বিশ্রাম করবার জন্য যে রাজপুত বীরগণ জন্মগ্রহণ করে নি—সেটা রাজপুত কন্যা কখনো ভুলে যায় না।—"

যুবন লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্ত্রীর মুখখানি বুকে চাপিয়া ধরিলেন, আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন "রাজপুত কন্যার এই গৌরবের আগুণেই রাজপুত সন্তানের সমস্ত অগৌরবের গ্লানি পুড়ে-ঝুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়, রাজপুত হৃদয়ে

নিস্তেজ হীনতা বলে কোন জিনিস তিষ্ঠাবার স্থান পায় না! তোমাদের জন্যই রাজপুত মরেও সম্মানের মধ্যে চির অমর হয়ে থাকে। শিপ্রা,—আমার শিপ্রা, এতদিন শুধুই পত্নী হয়েছিলে আজ থেকে তুমি আমার—"

যুবনের মুখ চাপিয়া শিপ্রা বলিল "হয়েছে, হয়েছে, আর নয়—"

যুবন বলিলেন "রহস্য নয়, সত্যই,—রাজপুত বীর সমাজের পক্ষ হতে আমি তোমায় সম্মান জানাচ্ছি—"

লজ্জিত ভাবে নত হইয়া শিপ্রা বলিল "আমিও শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রত্যভিবাদন জানাচ্ছি।...সত্য কথা শোন, তোমরা নারী জাতিকে সম্মান কর বলেই নারীজাতি তোমাদের অপমান সহ্য করতে পারে না,—মৃত্যুশোকের চেয়েও তোমাদের অগৌরবের ব্যথা তাদের বুকে বেশী বাজে!"

বীরত্বের গৌরবে, বীরের বুক ভরিয়া উঠিল, যুবন কথা কহিতে পারিলেন না। প্রসারিত বাহু বেষ্ঠনে স্ত্রীকে কাছে টানিয়া লইয়া, সেই চৌকির উপর বসিলেন। দুই জনেই নীরব। একটা শান্ত গম্ভীর আবেগে যুবনের হৃদয় কানায় কানায় ভরিয়া টল্ মল্ করিতে লাগিল।

পুষ্প সৌরভ-ভারাক্রান্ত শান্ত-নিস্তব্ধ কক্ষের মাঝে, উজ্জ্বল আলোক জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত স্ফটিকাধার সম্মুখে, সেই নিবিড় আনন্দের আতিশয্যে একাত্মময় ভাবে ভরা, দুইটি তরুণ মূর্ত্তি পরস্পরের কণ্ঠ অবলম্বনে চিত্রার্পিতের মত শোভা পাইতে লাগিল, অনেক ক্ষণ কাটিয়া গেল, দুই জনেই নিস্তব্ধ।—

(৩)

সহসা বাহিরের বারেণ্ডায় দ্রুত পদধ্বনি হইল। মুহূর্ত্তে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া উচ্চ গম্ভীর কণ্ঠে আচরোল সর্দ্দার ডাকিলেন "বৎস যুবন—"

পিতার কণ্ঠ স্বরে শিপ্রা, ক্ষিপ্র হস্তে যুবনের বাহুবন্ধন মুক্ত হইয়া, লঘু লম্ফে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। যুবন উঠিয়া দাঁড়াইয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন "আজ্ঞে—"

আচরোল সর্দ্দার গৃহে ঢুকিয়া, শান্ত স্নিগ্ধ কটাক্ষে একবার কন্যার দিকে, একবার জামাতার দিকে চাহিলেন, যুবন প্রণাম করিল, আচরোল সর্দ্দার আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ করিয়া কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। শিপ্রা মুখের উপর অবগুণ্ঠন টানিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া নিঃশব্দে পিছন দিয়া পলাইতেছে দেখিয়া, বিচক্ষণ পিতা যুবনের সহিত কথা কহিতে-কহিতেই হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন, সস্নেহে বলিলেন "যেও না মা, আমার এখনি বেরুতে হবে, তুমি বস।"

ডান হাতে কন্যাকে টানিয়া আনিয়া সেই পাথরের চৌকীর একপাশে বসাইলেন, বাঁ হাতে অন্য একখানি কাষ্ঠাসন টানিয়া লইয়া নিজে নিকটে বসিলেন। যুবন দাঁড়াইয়াছিল, তাহার দিকে চাহিয়া, কন্যার পাশে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "বসো বৎস—"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া যুবন কুণ্ঠিত ভাবে আসন গ্রহণ করিলেন। গভীর স্নেহভরা দৃষ্টিতে উভয়ের পানে আর একবার চাহিয়া আচরোল সর্দ্দার বলিলেন, "আমার বেশী সময় নাই যুবন, ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে এখনি রাজপ্রসাদে যাব। তোমায় একটা প্রয়োজনীয় সংবাদ জানিয়ে যাবার জন্য এসেছি—" যুবন বলিল "অনুমতি করুন,—"

একটু থামিয়া মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিয়া আচরোল সর্দ্দার বলিলেন, "প্রভুর আদেশ,—সে ন্যায় হোক, অন্যায় হোক, নির্ব্বিচারে আমায় পালন করতে হবে। তোমায় গোপনে জানাচ্ছি, তোমরা সাবধান হও—অম্বর রাণা, তোমার প্রভুকে বন্দী করবার ব্যবস্থা করেছেন, আর অল্প সময় বাকি—"

বিদ্যুদাহতের মত যুবন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মুহূর্ত্তে তাঁহার দুই চক্ষে অগ্নি ঝল্‌সিয়া উঠিল!—কিন্তু সে মাত্র মুহূর্ত্তের জন্য!—পরক্ষণেই নম্রভাবে শ্বশুরকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন "উত্তম, তবে আমি এখনই বিদায় হই,—আমার প্রভু নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে অরক্ষিত অবস্থায় আছেন—"

আচরোল সর্দ্দার উঠিয়া দাঁড়াইয়া, দুই হাতে যুবনের দুই হাত ধরিয়া বলিলেন, "বৎস, জগতে ঘৃণিত যা-কিছু, তা চিরদিনই সকলের কাছে ঘৃণিত হয়ে থাক্‌বে, অম্বরপতি সহস্র সৎকার্য্যে কীর্ত্তিমান হলেও, এই একটি মাত্র অসৎকার্য্যের জন্য, জগৎ চিরদিন তাঁর নামে ঘৃণা ভরে ধিক্কার দেবে!—শরণাগত অতিথির প্রতি এই বীভৎস্য বিশ্বাসঘাতকতা.—আমরা আজ্ঞাবহ দাস, প্রভু আজ্ঞাপালন কর্‌ব মাত্র, কিন্তু………"

যুবন ধীর স্বরে বলিলেন "বুঝেছি আর্য্য, আমি নির্ব্বোধ নই! পুত্রস্নেহে আপনি আমার জন্য যা করেছেন, তাই যথেষ্ট.—আর ত কিছুই কর্‌বার নাই! এবার অনুমতি করুন, আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করি—"

আচরোল সর্দ্দার বলিলেন "যাও,—আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক্‌, ভগবান করুন, রাঠোর রাজের অনুচরের শৌর্য্যের নিকট, অম্বর রাণার ষড়যন্ত্র-কৌশল পরাস্ত হোক্‌।"

যুবন হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইলেন। আচরোল সর্দ্দার দৃঢ় হস্তে জামাতাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "স্বামীধর্ম্ম পালনের জন্য যদি তোমার কার্য্যে প্রতিকূলাচরণ করি.—তা হলে তোমার প্রভুর রক্ষার জন্য, আজ আমার বুকে তরবারি-বিদ্ধ কর্‌তে কুণ্ঠিত হয়ো না বৎস,………আর সময় নাই, আমি চল্লুম, তোমার অশ্ব প্রস্তুত আছে. সত্বর বর্ম্ম পরিধান করে এস।"

আচরোল সর্দ্দার প্রস্থান করিলেন। যুবন ক্ষিপ্র হস্তে বর্ম্ম পরিতে লাগিলেন। শিপ্রা কোন কথা না বলিয়া নিঃশব্দে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিল। দুই জনের কাহারও মুখে কথা নাই।—দুই জনের কেহই কাহারও মুখ পানে চাহিয়া দেখিল না,—সেখানকার অবস্থা কি?

বর্ম্ম পরিধান শেষ হইল। শিপ্রা সেই ছুরিকাখানি লইয়া নিজ হাতে যুবনের কটিবন্ধে আঁটিয়া দিতে লাগিল,—হঠাৎ তাহার বুকের ভিতরটা যেন-কেমন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, মুখ তুলিয়া ঘন-শ্বাস-কম্পিত কণ্ঠে বলিল "আবার—আবার তোমায় দেখ্‌তে পাব ত?—"

যুবন, ক্ষণিকের জন্য এতটুকুমাত্র, বিচলিত হইলেন!—নত নয়নে ক্ষণিকের জনাই স্তব্ধ রহিলেন! তারপর রুদ্ধ স্বরে বলিলেন "তা তো বল্‌তে পারি না! হয় তো এই শেষ,—নয় তো আবার……! না শিপ্রা এখন আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোর না,—আমার তো আর কথা কহিবার সময় নাই! ঐ শোন, তোমার পিতার অশ্বপদ-ধ্বনি,—আর দাঁড়াব না—"

এক পা অগ্রসর হইয়া যুবনসিংহ আবার দাঁড়াইলেন, দুই হাতে শিপ্রার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া স্নেহময় স্বরে বলিলেন "তুমি ক্ষুণ্ণ হোয়ো না—"

দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া ধীর কণ্ঠে শিপ্রা বলিল "না—"

শান্ত মুখে যুবন বলিলেন "আবার দেখা হবে—এখানে না হোক—সেখানে!"

যুবন আর দাঁড়াইলেন না. দ্রুতপদে কক্ষত্যাগ করিলেন।

(৪)

সুপ্রকাশ সভাগৃহ। মাথার উপর মূল্যবান প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝাড় লণ্ঠন ঝুলিতেছে। মেঝের উৎকৃষ্ট গালিচা বিছান,—একদিকে সাচ্চা সল্মা জড়ির কাজ করা, মখমলের আসনে রাজ-পরিচ্ছদ, অম্বরেশ্বর প্রবীণ রাণা ঈশ্বর-প্রসাদ বসিয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে, স্বতন্ত্র মখমল আসনে তরুণ রাণা বিজয়সিংহ বসিয়াছেন। রাজকীয় প্রথা মতে দক্ষিণ-আসন অতিথির প্রাপ্য; বয়স, বংশ-গৌরব বা পদ-গৌরবে হীন হইলেও দক্ষিণ আসন অতিথির জন্যই নির্দ্দিষ্ট থাকে।

হাসি-হাসি মুখে অম্বরেশ্বর তরুণ অতিথির সহিত সাদর সম্ভাষণে নিযুক্ত; চারিদিকে অম্বরের সামন্ত সর্দ্দার ও পদস্থ সভাসদগণ চক্রাকারে বসিয়াছেন,—এখনই রাজনৈতিক প্রসঙ্গে, জটিল-সমস্যা উত্থাপিত হইবে, অম্বরের যোদ্ধাগণ সকলেই তাহা শুনিতে উৎসুক। বিজয়সিংহের সমভিব্যাহারী রাঠোর সর্দ্দারগণ এখনও সভায় সমবেত হইতে পারেন নাই। এখনই তাঁহারা বিশ্রামাগার হইতে আসিবেন,—তাঁহারা আসিলেই কাজের কথা আলোচনা হইবে। এখন শুধু পারিবারিক প্রসঙ্গ, ও আজে বাজে খোস গল্প চলিতেছে!

ধীর পাদক্ষেপে মৈরতা সর্দ্দার যুবনসিংহ সভাগৃহে ঢুকিয়া, দূর হইতে সসম্ভ্রমে উভয় রাজাকে যথাবিধানে অভিবাদন করিলেন। সাদরে প্রত্যভিবাদন করিয়া অম্বরেশ্বর বলিলেন "আসুন সর্দ্দার জি, সর্ব্বাঙ্গীন কুশল—?"

সবিনয়ে উত্তর দিল "আজ্ঞে হাঁ, সমস্ত মঙ্গল।"

অম্বরেশ্বর বিজয়সিংহের সহিত আবার কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। যুবনসিংহ সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকের সমস্ত মুখগুলা দেখিয়া লইলেন,—দেখিলেন অম্বরের সর্দ্দারগণ সকলেই রাজাদ্বয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতে মনোযোগী,—কাহারও অন্যদিকে লক্ষ্য নাই। যুবন ধীরপদে অগ্রসর হইলেন। কথা কহিতে কহিতে বিজয়সিংহ চির প্রচলিত অভ্যাস বশে নিজের ডানদিকের আসনে যুবনকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন,—মৈরতা সর্দ্দারগণ চিরদিন রাজার ডানদিকের আসনেই বসিয়া থাকেন।—কিন্তু আজ যুবনসিংহ কে জানে কেন, তাহা ভুলিয়া গেলেন।—ডাহিনের সারি সারি খালি আসনগুলি অতিক্রম করিয়া, একান্ত অনামনা ভাবে, এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে, নিঃশব্দে বিজয়সিংহের পিছন দিয়া ঘুরিয়া ঈশ্বরসিংহের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলেন, ঈশ্বরসিংহের আগুল্ফ-লম্বিত মখ্‌মল আঙ্‌রাখার পিছনের অংশটা, তাকিয়া ঝাঁপাইয়া, খানিকটা জায়গা জুড়িয়া পিছন দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যুবনসিংহ চারিদিকে চাহিয়া—সকলের অগোচরে মাথা নোয়াইয়া, একবার নমস্কার করিলেন, তারপর হঠাৎ সেই আঙ্গরাখার উপর চাপিয়া বসিলেন।

মুখ ফিরাইয়া যুবনের দিকে চাহিয়া অম্বরেশ্বর বলিলেন "কি ঠাকুর, আজ রাজার বাঁ দিকে বসলেন কেন?"

চতুর যুবন বুঝিলেন, ধূর্ত্ত অম্বরেশ্বর সকল দিকে আজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন,—যুবন মনে মনে হাসিলেন। শান্ত ভাবে উত্তর দিলেন, "একটু প্রয়োজন আছে মহারাজ—"

বিজয় সিংহ বিস্মিত ভাবে যুবনের দিকে চাহিলেন, যুবন তাঁহার দিকে দৃষ্টি তুলিয়া, পূর্ব্বের মতই শান্ত নম্র ভাবে বলিলেন "উঠুন মহারাজ, আর এক মুহূর্ত্ত এখানে অবস্থান করা নিরাপদ নয়,—হয়ত এখনি আপনার স্বাধীনতা ধ্বংস হবে,—যান মহারাজ, এই মুহূর্ত্তে অম্বর ত্যাগ করুন;—"

বিন্দুমাত্র দ্বিধা-ইতস্ততঃ না করিয়া, বিজয় সিংহ চক্ষের নিমেষে আসন ছাড়িয়া, লাফাইয়া উঠিলেন; বিশ্বস্ত অনুচরের সেই একটি মাত্র অনুরোধ,—তাহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট!—রাঠোর রাজ তাহার উপর একটিও প্রশ্ন

করিলেন না! তীরবেগে সভাগৃহ ছাড়িয়া দ্বারের দিকে ছুটিলেন, যুবন উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "অতিথিশালার সামনে অশ্ব প্রস্তুত আছে, আপনি ঘোড়ায় উঠে,—তারপর আমায় সংবাদ দেবেন!

রাজা বিজয়সিংহ দ্বার ছাড়িয়া অন্তর্হিত হইলেন!

সমস্ত সভাগৃহ মন্ত্রমুগ্ধ নির্ব্বাক!—স্বয়ং ঈশ্বর প্রসাদও যেন হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন! আঁখির পলক ফেলিতে-না-ফেলিতে, অদ্ভুত-কর্ম্মা যুবন সিংহ যে কি কাণ্ডটা ঘটাইয়া বসিল, তাহা যেন হঠাৎ তাঁহার বোধগম্য হইল না! পরক্ষণে তিনি গর্জ্জিয়া উঠিলেন, তরবারীতে হাত দিয়া তিনি বিজয়সিংহকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিলেন,—কিন্তু হায় রে হায়! ব্যর্থ প্রয়াস!—পিছনের অঙ্গরাখা প্রান্ত খট্ করিয়া আটক পড়িল!—ভীষণ উত্তেজিত অম্বরেশ্বর শরীরের ঝোঁক সামলাইনে না পারিয়া, বাঁ কাতে হেলিয়া, ধুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন,—যুবন সযত্নে ধরিয়া ফেলিল! শান্ত ভাবে বলিল "স্থির হন মহারাজ,—বৃথা চেষ্টায় বিড়ম্বিত হবেন না!—"

অম্বরেশ্বর উন্মাদ-ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, অন্যনোপায় হইয়া কটিবন্ধ হইতে ছুরি টানিয়া বাহির করিতে গেলেন, সতর্ক যুবন সিংহ ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিলেন!—মুহূর্ত্ত মধ্যে নিজের কটিবন্ধ হইতে শিপ্রার হাতে-বাঁধা সেই তীক্ষ্ণ শাণিত ছুরি খুলিয়া লইয়া, অম্বরপতির হৃদ্‌পিণ্ডের উপর রাখিলেন,—উগ্র কঠোর স্বরে বলিলেন "খবরদার মহারাণা;—আমার প্রভুর গমনে যদি বাধা দিতে চেষ্টা করেন তা হলে এই দণ্ডে, এই ছুরি আপনার হৃদপিণ্ডের শোণিত পান করবে, সাবধান!"

সভাশুদ্ধ সকলে স্তম্ভিত নির্ব্বাক! কি সূত্র হইতে যে এইসব জটিল-রহস্যের উৎপত্তি,—কোন চাতুরীর উপর চাল চালিয়া যে এই দৃষ্টি স্তম্ভকারী অদ্ভুত চাতুর্য্য অভিনয় চোখের উপর একমুহূর্ত্তে সংঘটিত হইয়া গেল, কেহই কিছু বুঝিল না! কেহই কিছু বলিতে পারিল না! সকলেই মূঢ়ের মত নির্ব্বাক হইয়া পরস্পরের মুখ তাকাইতে লাগিল! সকলেই যেন জাগ্রত-অবস্থায়, কি এক অপূর্ব্ব সম্মোহন শক্তি প্রভাবে, দুঃস্বপ্ন বিভীষিকা-গ্রস্ত হতবুদ্ধি!

ক্ষণপরে বাহির হইতে একজন রাঠোর সর্দ্দার হাঁকিলেন "যুবন সিংহ, শীঘ্র এস, অশ্বারূঢ় মহারাজা, তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন—"

অম্বরেশ্বরকে ছাড়িয়া, মুক্ত ছুরিকা হস্তেই যুবনসিংহ এক লম্ফে তাঁহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন.—সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া, বলিলেন "অসৌজন্য ক্ষমা করবেন মহারাজ!—"

চক্ষের পলকে তিনি গৃহ ছাড়িয়া উধাও হইলেন! সভাস্থ সকলে বিহ্বল-স্তম্ভিত নয়নে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলেন!

স্বার্থ-কালিমা-মাখা, নীচতাময়ী বিদ্বেষ ভেদ করিয়া মুগ্ধ প্রীতির অমৃত স্রোত উথলিয়া উঠিল! অতুল গৌরব-শালী, বীরবংশের বংশধর,—রাণা ঈশ্বর প্রসাদের কঠিনরুক্ষ হৃদয়টা, এক মুহূর্ত্তে বীরত্ব-গৌরবের—তেজস্বী-চেতনায় সজাগ হইয়া উঠিল! জাতীয়-শৌর্য্য-সম্ভ্রমবোধের, বিরাট-চৈতন্য,—ব্যক্তিগত স্বার্থ-হীনতার গ্লানি লজ্জায় মরিয়া গেল! বীরের প্রাণ, বীরত্বের সম্মানে,—অপার্থিব ভক্তি শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল! লাফাইয়া উঠিয়া আত্মহারা-উল্লাসে ঈশ্বর প্রসাদ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "দেখ দেখ, সর্দ্দারগণ, প্রভু ভক্তির জ্বলন্ত আদর্শ দেখ!—রাঠোর সন্তানের অপূর্ব্ব শৌর্য্য মহত্ব দেখ! এমন প্রভুপ্রাণগত বীরগণ যাঁর সহায়, জগতের কোন শক্তি, তাঁর বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে না! রাণা বিজয়সিংহ তুমি ধন্য,—এমন অসীম শক্তিশালী অনুচরগণের অধিপতি

তুমি,—তোমার ভাগ্যকে সহস্র ধন্যবাদ! যাও বিজয় সিংহ, নিরাপদে চলে যাও,—জয়লক্ষ্মী স্বয়ং তোমার জয়শ্রী বহন করছেন, জগতে কারো সাধ্য নাই—তোমার কেশস্পর্শ করে! আমি তুচ্ছ বাদী,—সমগ্র জগত তোমার কাছে পরাজিত হতে বাধ্য!—আর মহাশূর যুবন,—তোমার অপূর্ব্ব সাহস-শৌর্য্যকে আমি অম্বরেশ্বর,—আজ এই পরাজয় অপমানের মধ্য হতে, সম্মানে সানন্দে, নতশিরে অভিনন্দন কর্‌ছি, তোমার বীরকীর্ত্তি বিশ্বের ইতিহাসে অক্ষয় উজ্জ্বল হয়ে থাক্‌বে!—"

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

অতুল।

—*—

এবার বেদনা মোরে
দিলে নাথ কি অতুল
ধ্যানেতে গভীর হয়ে
ফুটিল পূজার ফুল!
তোমার আঘাত লাগি
কোরক উঠিল জাগি
হৃদয় ডুবিল প্রেমে
বেদনায় প্রতিকূল
ধ্যানেতে গভীর হয়ে
ফুটিল পূজার ফুল

এতদিন ভয়ে ভয়ে
যে বেদনা চাহি নাই
না চাহিতে সে বেদনা
সুধায় ভরিল তাই!
যে মন বিমুখ হয়ে
অকূলে গেছিল বয়ে
সে মন তোমার লাগি
হল আজ প্রেমাকুল
ধ্যানেতে গভীর হয়ে
ফুটিল পূজার ফুল!

ভারত নারী ও যক্ষ্মা।

গতবর্ষে দিল্লীর 'লেডি হার্ডিং মেডিক্যাল কলেজে'র দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতায় লেডি চেমস্‌ফোর্ড মহোদয়া বলিয়াছিলেন—"কতকগুলি হাঁসপাতালে আমি অল্প বয়স্কা যুবতী যক্ষ্মারোগী দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। ইহা বিশেষ দুঃখের বিষয় যে ভারতে যক্ষ্মা একটি সাধারণ ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে। আমি বিশ্বাস করি যে ভারতীয় নারীগণ বিশেষতঃ শিক্ষিতারা এ বিষয়ে অনেক কার্য্য করিতে পারেন। মুক্ত বায়ু যক্ষ্মারোগের প্রধান প্রতিষেধক ও আরোগ্যকারক। যদি নারীগণ তাঁহাদের সন্তানগণকে শিশুকাল হইতেই ঘরের সমস্ত জানালা দরজা খুলিয়া রাখিয়া বা বারণ্ডায় বা ছাদে নিদ্রা যাইতে অভ্যস্ত করেন তাহা হইলে তাহারা সহজে ঠাণ্ডা লাগা বা এই ভীষণ ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারে। এইরূপ করিলে যক্ষ্মা দূরীকরণের পক্ষে অনেকই করা হইবে। স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করা যে একান্ত আবশ্যক তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমি ভারতীয় নারীগণকে একান্ত অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।'

যক্ষ্মাকে সহরবাসী ভদ্র নারীগণেরই রোগ বলা যাইতে পারে। ছোট, অধিক জনপূর্ণ গৃহ বা বাটীতে বাসে, দূষিত বায়ু সেবনে তাহাদের দেহ বিষাক্ত হইয়া পড়ে। সবল পেশীসমূহ উপযুক্ত ব্যায়াম বা পরিশ্রমের অভাবে দুর্ব্বল ও ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ফুস্‌ফুসের উপযুক্ত ব্যায়াম হয় না। দেহের সমস্ত বিষ, মল ও দূষিত পদার্থ দূর করিয়া দিতে রক্তসঞ্চালক যন্ত্রাদির দ্বিগুণ পরিশ্রম করিতে হয়। এইরূপে যক্ষ্মা-বীজাণুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে দেহের প্রতিষেধ ক্ষমতাও ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া থাকে।

রৌদ্র কিরণ, মুক্ত আকাশ ও মুক্ত বায়ুতে বাস করিয়া পল্লীবাসিনী নারীগণ, সুলভ চাল, ডাল বা গম হইতে নিজেদের উপযোগী পুষ্টি গ্রহণে সক্ষম হন। কিন্তু সহরে অস্বাভাবিক জীবন যাপন করিয়া নারীগণের পরিপাক শক্তি কমিয়া যায়। অধিকাংশ স্থলেই তাহাদিগকে আহারে মৎস্য, মাংস, ঘৃত বা দুগ্ধ প্রভৃতি অধিক মূল্যের সামগ্রী সংযোগ করিয়া দেহের পুষ্টি সাধন করিতে হয়। কিন্তু কেবল ধনীগণের পক্ষেই এরূপ খাদ্যের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হইয়া থাকে।

যুবতী নারীগণের সময়ে সময়ে অধিক শক্তি সঞ্চয়ের আবশ্যক হইয়া থাকে গর্ভাবস্থায়, মাতার গৃহীত খাদ্যে, মাতা ও গর্ভস্থ সন্তান উভয়েরই পুষ্টি সাধিত হয়। এইরূপ অবস্থায় দুইজনের পুষ্টির উপযোগী আহারের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। প্রকৃতি জাতিকে রক্ষা করিতে সর্ব্বদাই উৎসুক। গর্ভাবস্থায় মাতার রক্তে, মাতা ও সন্তান উভয়েরই পুষ্টি সাধিত হয়। দুগ্ধ মাতৃ রক্তের রূপান্তর মাত্র। দুর্ব্বল, অজীর্ণগ্রস্ত, রুগ্ন নারীগণ গর্ভাবস্থায় আরও শক্তিহীন হইয়া পড়ে এবং সে সময় তাহাদের রোগ প্রতিষেধ ক্ষমতা অনেক কমিয়া যায়।

কিরূপে এই মারাত্মক ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে ইহাই চিন্তার বিষয়। যেখানে সেখানে থুতুফেলা বন্ধ করিয়া, সংক্রামন প্রতিষেধের নিয়মগুলি প্রচার করিয়া অনেকটা সুফল আশা করা যাইতে পারে। জনপূর্ণ সহরের বায়ু সকল সময়েই দূষিত থাকে। বায়ুতে ভাসমান ধূলি যক্ষ্মা-বীজাণু বহন করিয়া ইতঃস্তত চালিত হয়। প্রত্যেক জনপূর্ণ সহরেই আমাদিগকে সকল সময় মারাত্মক শত্রুর মধ্যে বাস করিতে হয়। এই সকল শত্রুরা আমাদের দেহ মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়া মৃত্যুর দ্বার মুক্ত করিয়া দেয়।

দেহকে সর্ব্বদা রোগ প্রতিষেধের উপযোগী শক্তিসম্পন্ন রাখাই যক্ষ্মার আক্রমণ নিবারণের প্রধান এবং উৎকৃষ্ট উপায়। প্রত্যেক মানব দেহই বিভিন্ন প্রকারের লক্ষ লক্ষ কোষে গঠিত এক একটি সুপরিচালিত সমাজের মত। ভিতরের বাহিরের সমস্ত শত্রু হইতে আত্মরক্ষার ভার তাহারই উপর ন্যস্ত। দেহের রোগ প্রতিষেধ শক্তি সর্ব্বদা অক্ষুন্ন রাখা সহরবাসীর পক্ষে সম্ভবপর নহে। সহরের যুবতী নারীরাই যে কেবল যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয় তাহা নহে পুরুষেরাও অনুরূপ আক্রান্ত হইয়া থাকে।

আধুনিক সময়ে সহরের বৃদ্ধি নিবারণ করা যাইতে পারে না। সহর উঠাইয়া দিয়া প্রাচীন কালের মানবের মত বনে বাস করাও সম্ভবপর নহে। কিন্তু সহর প্রস্তুত ও বাটী নির্ম্মাণের ব্যবস্থার আমরা পরিবর্ত্তন করিতে পারি। দিবাভাগে ব্যবসায় কেন্দ্রে জনতা নিবারণ করা যাইতে পারে না কিন্তু সহর গঠণের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। ব্যক্তিগত খেয়াল অনুযায়ী সহর গঠিত হইতে দেওয়া কিছুতেই উচিত নহে। লোকের স্বাস্থ্য ও সুখ যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে, সকল বিষয়ের বিবেচনা করিয়া আদর্শ সহর স্থাপনে সেইরূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। উপযুক্ত-রূপ সূর্য্যকিরণ ও বায়ু চলাচলের জন্য প্রত্যেক বাটীতে আবশ্যকমত খোলা জায়গা রাখিতে হইবে। প্রত্যেক সহর কেবল কতকগুলি অট্টালিকার সমষ্টি মাত্র না হইয়া তাহাতে প্রসস্ত রাস্তা, সুদৃশ্য উদ্যান ও খালি জমি সংযুক্ত আবাস বাটী থাকিবে। প্রতি সহর এরূপে গঠন করিতে হইবে যে প্রত্যেক সহরবাসী নরনারী প্রচুর নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতে পারে।

ভদ্র সমাজের নরনারীর পরিশ্রম বা ব্যায়ামের প্রতি বৈরাগ্য ভাব পরিত্যাগ করিতে হইবে। পরিশ্রমী লোকই সকলের নিকট সম্মানের পাত্র। উচ্চ আশা শূন্য, প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত-পালিত কঠিন পরিশ্রমী কৃষকের উৎপন্ন খাদ্যেই সমস্ত মনুষ্যজাতি জীবন ধারণ করে। ধনী অলস নরনারীগণকে ইহাদের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিতে হয়।

পরিশ্রমে সম্মান আছে। পরিশ্রম পবিত্র ও পুণ্যময়। পরিশ্রমই খাদ্য লাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনার স্বরূপ। মনুষ্যকে প্রার্থনা করিতে হয় প্রার্থনা ভিন্ন কিছুই লাভ হয় না। প্রাচীন ঋষিরাও জমি কর্ষণ করিতেন। পরিশ্রমের সহিত কৃষিকার্য্য করিলে তবে প্রকৃতি আমাদিগকে খাদ্য দান করেন। প্রত্যেক পেশীই উপযুক্তরূপ ব্যায়াম করিবে, ইহাই দেহের ধর্ম্ম কর্ম্ম। পরিশ্রম না করাই পাপ। পরিশ্রমে ঘৃণা করা আর ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনায় ঘৃণা করা উভয়ই সমান। শ্রমজীবিকে ঘৃণা করা আর প্রকৃতির প্রধান পূজারীকে ঘৃণা করা একই কথা।

আমাদের মধ্যবিত্ত ও ধনী উভয় শ্রেণীর নারীগণকেই পরিশ্রম করিতে হইতে হইবে। ঘর পরিষ্কার করা, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, ধান ভাঙ্গা, যাঁতায় গম-কড়াই পেষা, রন্ধন করিয়া পরিবারবর্গকে ভোজন করান প্রভৃতি গৃহকর্ম্ম সকল নিজ হস্তে সম্পন্ন করিতে হইবে, ইহাতে শরীরের যথেষ্ট ব্যায়াম হইবে, অর্থের সাশ্রয় হইবে, এবং পরিবারবর্গও সুখাদ্য আহার করিয়া তৃপ্ত হইবে। পরিশ্রমের সঙ্গে নির্দ্দোষ আমোদও যে আবশ্যক, তাহা আমরা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু ভালবাসা ও স্নেহের বশে পরিশ্রম করাতেই সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দলাভ হইয়া থাকে। পরিশ্রম পুণ্যকার্য্য, নিজ পরিজনের সুখ সুবিধার জন্য পরিশ্রম করিয়া নারীগণ ভগবানেরই প্রিয়কার্য্য সাধন করেন। গৃহকর্ম্মে অবসর কালে পল্লীগ্রামে পুরনারীগণ প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া স্বাস্থ্য ও আনন্দ উভয়ই লাভ করিতে পারেন।

গৃহস্থঘরে অনেক স্থলেই দরিদ্রতা, নারীগণের যক্ষ্মা রোগের কারণ। দরিদ্রতার সমাধান করা সহজে সম্ভবপর নহে। দরিদ্র গৃহস্থের যতদূর সম্ভব সহর পরিত্যাগ করিয়া পল্লীগ্রামে বাস করা উচিত। অন্ততঃ স্ত্রীলোকগণকে পল্লীর মুক্ত বায়ু ও আলোকে রাখিতে পারিলেও অনেকটা মঙ্গল।

প্রফুল্লতা, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগহীনতা এবং স্নায়বিক উত্তেজনার অভাব প্রভৃতি সুস্থ দেহ ও মনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। অলস, বিলাসী ও মানসিক উত্তেজনা পূর্ণ হইয়া থাকিলে শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, ফলে সহজেই যক্ষ্মারোগ আক্রমণের সুবিধা ঘটে।

উপন্যাস পাঠ, সহরে বিশেষরূপে প্রচলিত হইয়াছে। সহরে অনেক অবস্থাপন্ন গৃহের নারীগণ বাজে গল্প, তাস-খেলা এবং উপন্যাস পাঠে সময় অতিবাহিত করেন। ইহাতে মনের অবনতি ঘটে এবং শরীরের পেশী সমূহও অপব্যবহারের ফলে শিথিল হইয়া যায়। এইরূপ অলস জীবন যাপন করা যে কেবল সংসার ও সমাজের পক্ষে পাপ তাহা নহে ইহা নিজ দেহ ও মন উভয়ের নাশের উপায়। ভগবানের নিকটও ইহা পাপ কার্য্য বলিয়া গণ্য। দরিদ্র নারীগণ ধনীগৃহের নারীগণের উদাহরণ দেখিয়া ক্রমে তাহাদের অনুকরণ করিতে শিক্ষা করে। ফলে সকলেরই অবনতির পথ প্রশস্ত হয়।

আমরা সহরবাসী ধনী, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীগণকে অনুরোধ করিতেছি যে তাহারা যেন দরিদ্র ভগ্নী-গণের স্বাস্থ্য ও সুখের দিকে দৃষ্টি রাখেন। তাহারা যেন শারীরিক পরিশ্রমকারিণীগণকে সম্মান করেন এবং অলসতা, বিলাসিতা, অত্যধিক অলঙ্কারপ্রিয়তা, উপন্যাসপ্রিয়তা প্রভৃতি দোষ পরিত্যাগ করেন। সহরের ধনী সুখী নারীগণ শারীরিক পরিশ্রম, ও গৃহকর্ম্মে আনন্দ প্রদর্শন এবং অলসতা ও বিলাসিতা বর্জ্জন করিলে তাহাদের উদাহরণে অনেক সুফল হইবে। আমরা এজন্য শিক্ষিত পিতা, ভ্রাতা, স্বামী ও পুত্র যোগে নারীগণকে বিশেষ অনুরোধ জানাইতেছি।

'স্বাস্থ্য-সমাচার'—শ্রাবণ-২৫

কন্যাদায়োদ্ধার।

—ঃ*ঃ—

মোরা, টাকা পেলেই রাজী আছি করতে কন্যাদায়োদ্ধার।
তা,—হোক্‌না শ্বশুর দস্যু অসুর, পশুর মতন ব্যবহার।
যায় যাবে জাত যায় যাবে কুল ঠেলুক সবাই হয় হবে ভুল,
প্রায়শ্চিত্তে গোঁপ দাড়ী চুল শেষে না হয় করবো কাবার॥
হোকনা বৌটি পেঁচী খাঁদী, হোকনা হাঁদী হোকনা নেড়ী,
হোকনা দেখতে বাঁদীর মতন হোকনা নেঙড়ী টেড়ী॥
হোকনা কুড়াকুষ্টী কালো হোকনা তাদের গুষ্ঠী কালো,
দেশটা কালো সৃষ্টি কালো কোন বিচার করবো না তার॥

হোকনা দেখতে তিন ছেলের মা হোকনা কুড়ি হোকনা ষোলো,
পোঁটাঝরা সাতবছুরী বিয়ের বয়স নেইবা হোলো।
হোকনা হেঁপো হোকনা কেশো রাগবে রাগুক মামা মেসো
বাড়ী তাদের হোকনা বেঁশো সে সব দিকে নির্ব্বিকার॥
বাপের খরচান্ত করে, পাশ করেছি এক্‌জামিন
বি-এ এম-এর নেইকো সাধ্যি রোজগারে যে শুধবে ঋণ।
পিতৃঋণের ব্যবস্থাটা কাজেই দ্যাখ শ্বশুর ব্যাটা
ভিন্ন বলো করবে কেটা আমরা এটা বুঝি সার॥

বেতাল-ভট্ট।

বিধির মা'র।*

—:*:—

হরিহর ভট্টাচার্য্যের শেষেরদিনের ডাক পড়িল। উপরি-উপরি তিন চারিবার ম্যালেরিয়া জ্বরে উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া শেষটা পত্নী কমলাদেবীর তাড়নায় তিনি কবিরাজের ঔষধ খাইতেছিলেন, কিন্তু নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বে; বিশেষ উপকারও হইতেছিল না। দেহ ও প্রাণের প্রতি এই তাচ্ছিল্য তাঁহার শাস্ত্রচর্চ্চার ফল কিনা বলা যায় না, কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে বরাবর দেখিয়া আসিয়াছেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ব্যবহারে তাঁহারা বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হন নাই। তিনি এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। শৈশব হইতেই তাঁহার দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠতার বাড়াবাড়ি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। যাহা সত্য, ন্যায়, ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া মনে করিতেন তাহার সম্পাদনে তিনি কখনও বিরত হন নাই; ব্যক্তিবিশেষ অথবা সমাজের রক্তচক্ষুর বড় একটা ধার ধারিতেন না। লোকে বলিত, "ঠাকুরের মাথার একটু গোল আছে—ছিট আছে।" যখন প্রতিবেশী রহিমের কনিষ্ঠ পুত্রটার "মায়ের অনুগ্রহ" হইয়াছিল, তখন সকলেই মাথায় হাত ঠেকাইয়া মায়ের মহিমা ও পরাক্রমের বিষয় স্মরণ করিয়া তাঁহার অনুগ্রহের দাবী হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সে দিক মাড়াইত না। ঠিক সেই সময়ে হরিহর পণ্ডিত আত্মীয়-স্বজনের কাতর-অনুযোগ উপেক্ষা করিয়া অস্পৃশ্য মুসলমান বন্ধুর গৃহে চারি পাঁচদিন থাকিয়া মুমূর্ষু বালকের সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলেন—"মায়ের অনুগ্রহের" ভয় করেন নাই। পুত্রের মৃত্যুতে যখন রহিম পাগল, তখন তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, অযথা শাস্ত্রের কথা তুলিয়া বা ভগবানের ইচ্ছার দোহাই দিয়া তাহার পুত্রশোক প্রশমিত করিতে প্রয়াস পান নাই। রহিমের পুত্রের শবাধার বহিয়া লইয়া গিয়া তাহার গোর দিয়া ফিরিবার সময় গ্রাম্য মাতব্বরগণ ভ্রূকুটী করিয়া যখন তাঁহাকে "একঘরে" করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়াছিল তখন তিনি শান্ত হাসি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "বেশ তো! একঘরে কল্লেই তো আর আমি একঘরে হচ্ছি না—আমি ভাব্‌বো, সকল গ্রামখানিই

---

* সত্য ঘটনার ছায়া অবলম্বনে।

আমার ভাইদের—আমি কিছুতেই একঘরে হ'ব না।" দুই তিনজন ব্রাহ্মণ প্রতিবেশী যখন তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে বলিয়াছিলেন, তখন এমন কঠিন ঘৃণাভরে তাহাদিগের দিকে চাহিয়াছিলেন, যে তাহাদের প্রাণ শুকাইয়া উঠিয়াছিল, পণ্ডিতকে উপদেশ দিবার স্পৃহা ও স্পর্দ্ধা তখনই উড়িয়া গিয়াছিল।

ভট্টাচার্য্যের সংসারের মধ্যে পত্নী কমলাদেবী ও একমাত্র কন্যা রমা। রমার বয়স ষোড়শ বৎসর। দেহে লাবণ্য ধরিত না, রূপ উছলিয়া পড়িত। দৈহিক পরিপুষ্টির সহিত তাহার মনেরও যথেষ্ট পরিপুষ্টি হইয়াছিল। পিতার নিকট লেখাপড়া মন্দ শিখে নাই। বিদুষী আর্য্যরমণীগণের কাহিনী বলিয়া রমা মাতাকে চমৎকৃত করিয়া দিত। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী--এই কন্যার বিবাহের কথা লইয়া কমলাদেবী অনেক কান্নাকাটা করিয়াছেন,—পিতৃপুরুষগণ নরকগামী হইতেছেন, সমাজে ঢিঢি পড়িতেছে; কত লোকে কত কথা কহিতেছে—ইত্যাদি বলিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের স্থৈর্য্য পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি শান্ত ভাবে উত্তর দিয়া গৃহিণীর নিরাশার মাত্রা কেবল বাড়াইয়াছেন বই কমান নাই। "রমা, আমার যে ছেলে মেয়ে দুই-ই! গলায় কলসী বেঁধে তো আর ওকে ডুবিয়ে মার্‌তে পার্‌বো না। যতদিন না একটি লেখাপড়া জানা, সচ্চরিত্র, সদ্বংশজাত পাত্র পাই ততদিন ওকে অবিবাহিত থাক্‌তেই হবে—তুমি মনে কোরো না. আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি।" যখন কমলাদেবী কথায় কথায় বলিলেন—"সোনাথালির জমিদারবাবু রমার সঙ্গে তাঁর ছেলের বিয়ে দিতে চেয়েছেন। সেদিন এক মাগী এসে এই কথা জানালে। সে ভাগ্যি কি আর রমার হবে?" সেদিন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারেন নাই গৃহিণীকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন—"সেই নীচবংশের বধূ হবে রমা! দুর্ব্বিনীত গোমূর্খ, মাতাল, লম্পট ছেলেটার সঙ্গে ভৈরব চক্রবর্ত্তী রমার বিয়ে দিতে চেয়েছে, আর সেই কথা শুনে তুমি আহ্লাদে আটখানা হ'চ্চ। ধন্য তুমি! আভিজাত্যে নীচু যে ঘর, তা কি টাকায় বড় হয়ে উঠ্‌বে? আর আমাদের এই উঁচু ঘরে কারবার করবার স্পর্দ্ধা কর্‌বে?—সে মহামহোপাধ্যায় রামরতন শাস্ত্রীর পৌত্র বর্ত্তমান থাক্‌তে নয়—যতদিন আমি বেঁচে আছি, কারু সাধ্য নাই যে এ সম্পর্ক ঘটাতে পারে। আমি বরঞ্চ মা রুক্মিণীর কাছে রমাকে বলি দিতে পারি, তবুও তাকে হীনকুল, ভ্রষ্টাচার প্রজারক্তলেহী, ধনাভিমানী, অত্যাচারী ভৈরবের কুলবধূ হ'তে দিতে পারি না। আর তুমি কি মনে কর, যে সেখানে গিয়ে তোমার মেয়ের সুখ উথলে পড়্‌বে?—আমার কাছে এ সম্বন্ধের কথা আর কখনও কোয়ো না, গিন্নি!" ইহার পর কমলাদেবী আর বড় একটা রমার বিবাহের কথা উত্থাপন করিতেন না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় টোলে ছাত্র পড়াইয়া বেশ যেন নিশ্চিন্তে দিন কাটাইতে লাগিলেন। আর কমলাদেবী মেয়ের বিবাহের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া দিন দিন কাঠ হইতে লাগিলেন। কয়েক মাস হইতে তাঁহার ভাবনা আরও বাড়িয়াছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অসুখে ভুগিতেছিলেন, অথচ ঔষধপত্র খাইতেছিলেন না। দিন দিন জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িতেছিলেন। এদিকে ভৈরব জমিদার শাসাইতেছিলেন যে "যদি হরিহরটা আমার ছেলের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী না হয় তো তার ঘরবাড়ী লুট করে, তার মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়ে জোর করে আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবো! তার কোন্ বাবা রক্ষে করে দেখা যাবে" ইত্যাদি—ইত্যাদি। এই সংবাদে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কয়েক মুহূর্ত্ত বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় নাই। এ বিপদে যে তিনি গ্রামবাসীর নিকট কোন সাহায্য পাইবেন না! এই অপমান হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য কেহ একপদও অগ্রসর হইতে সাহস করিবে না তাহা তিনি বিশেষ জানিতেন। ভিন্ন গ্রামের জমীদার হইলেও ভৈরবের তথায় অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার নৃশংস লুটতরাজ অত্যাচারের ভয়ে নিজের প্রজাবর্গ তো ব্যতিব্যস্ত থাকিতই, পরন্তু পাশাপাশি গ্রামের প্রজারা ও

তাঁহাকে বাঘের মত ডরাইত, পরের সাহায্য করিতে মিছামিছি কোন সংসারী লোক নিজকে বিপদগ্রস্ত করিতে চায় !

সেই দিন হইতে মানসিক উত্তেজনা ও নিরাশায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ক্রমে শেষ দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামের অনেকে তাঁহাকে দেখিতে আসিল, আর আসিল মুসলমান বন্ধু রহিম। ভট্টাচার্য্য কাতর স্বরে প্রতিবেশীদিগকে বলিলেন—"দেখিবেন, আমি মরিয়া গেলে আমার অনাথা স্ত্রী কন্যার উপর সোনাখালির জমিদার যেন উপদ্রব না করে।" তারপর রহিমকে বলিলেন—"দেখো ভাই যেন ভৈরব চক্রবর্ত্তী রমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ছেলের সঙ্গে জোর করে না বিয়ে দেয়।" রহিম উত্তর করিল, "খোদার নামে বলছি, আমি সাধ্য মত চেষ্টা করব তোমার কথা রাখ্‌তে—তোমার পরিবারকে উপদ্রব থেকে বাঁচাতে, বিশ্বাস করতে পার, তুমি থাক্‌লে যা হ'ত এ অধম হতে তা হবে।" ভট্টাচার্য্যের মুখ প্রসন্ন হইল। নিষ্প্রভ বদনমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ভট্টাচার্য্য কাতর ভক্তি গদগদ কণ্ঠে ডাকিলেন—"বিপদবারণ শুনেছ আমার অন্তরের প্রার্থনা শুনিয়াছ প্রভু—রহিম যে ভার লইল তা অব্যর্থ হইবে—এখন আমায় তোমার শান্তি ক্রোড়ে স্থান দাও প্রভো !"

কথা কয়টি বলিতেই যেন তাঁহার দেহে প্রাণ ছিল—ভগবানের নাম করিতে অচিরেই ভট্টাচার্য্য অনন্ত শান্তি লাভ করিল।

(২)

হরিহর পণ্ডিতের মৃত্যুর চারিদিন পরে সোনাখলির জমীদার বাড়ীতে মহা উৎসব হইতেছে। দুর্দ্দান্ত জমীদার ভবন, উৎসব উপলক্ষে যেমন করিয়া সাজান হইতে পারে তেমনই হইতেছে। কোনওখানে সামান্য ত্রুটী হয় নাই। জ্যোৎস্নার আলোক সত্ত্বেও শত শত অভ্রের চিমনীযুক্ত ল্যাম্প জ্বলিতেছে। অ্যাসিটেলিনের প্রভাবে একটা উৎকট গন্ধের সৃষ্টি হইয়াছে।

সুসজ্জিত বৈঠকখানায় মিষ্টভাষী চাটুকারগণ পরিবৃত হইয়া ভৈরব চক্রবর্ত্তী একটী গুড়্‌গুড়ির সুদীর্ঘ-নল টানিতেছিলেন, আর মুখবিনির্গত ধূমপুঞ্জ বিশাল গুম্ফদ্বয়ের আবেষ্টন অতিক্রম করিয়া কুণ্ডলীকৃত হইয়া ঊর্দ্ধে মিলাইয়া যাইতেছিল। চাটুকারগণ কেহবা ফরসীটার কারুকার্য্যের প্রশংসা করিতেছিল, কেহবা সুবাসিত তামাকের পূর্ব্বইতিহাস ও কোষ্ঠীর বিচার করিতেছিল, আর কেহ বা মৃত হরিহর ভট্টাচার্য্যের দুর্ভাগ্যের উল্লেখ করিয়া কৃত্রিম আক্ষেপ করিয়া কহিতেছিল, "আঃ হা, হা—বেচারী আপনাকে একবার বেয়াই ব'লে ডাক্‌তে পে'লে না—ওহো তার আগেই পটোল তুলে ফেল্লে—হতভাগাটার যেমন বরাত !" আর এই রহস্যে হাসির কল্লোল উঠিয়া বাহিরে যে ছেলেগুলি হুটোপাটী করিতেছিল তাহাদের প্রাণে ভীতির সঞ্চার করিয়া তাহাদিগকে পলায়নপর করিতেছিল।

এমন সময় দুই চারি জন বন্ধুর সহিত রহিম সেখানে আসিতেই একজন উঠিয়া গিয়া—"আদাব, আদাব, বেয়াই ম'শায়, আসুন, আসুন, তশরিফ্‌ লইয়া আসিতে আজ্ঞা হউক" বলিয়া খুব তামাসা করিয়াছি ভাবিয়া-হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। রহিম ধীরভাবে গৃহে প্রবেশ করিতেই জমীদার কহিলেন—"কি মনে ক'রে এসেছ, বন্ধু! গরীবের ঘরে যে বড় পায়ের ধূলো পড়্‌লো !"

রহিম বলিল, "যখন সম্পর্কটা নিতান্ত হ'লই, তখন না এসে আর থাকি কি করে ? মেয়েটাকেও তিন দিন ধ'রে নিয়ে এসেছেন ! তাই একবার তাকে দেখতে এলাম।"

তখনই তিন-চারি কণ্ঠে চীৎকার হইল, "তা আসবেনই তো, তা আসবেনই তো—যাঁহা উনিশ, তাঁহা বিশ—যাঁহা বেয়াই, তাঁহাই বেয়াইয়ের ভাই!—এর তফাৎটা কোনখানে? এই যাঁহা হরিহর ভট্ট—চায় আর (হাতে হাতে আঘাত করিয়া) তাঁহাই—রহ্ হি-ইম চা-চা!"

রহিম কিছু বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল—বলিল "যাই একবারে বাহিরে—মেয়ের ঐশ্বর্য্যটা দেখে আসি!" সে বাহির হইতেই আর একবার একটা হাসির হর্‌রা ছুটিল।

বাহির হইয়া আসিয়া রহিম দেখিল, ভিতর ও বাহিরের বারান্দায় অসংখ্য লোক পাত পাড়িয়াছে। সোনাখালি ও আর পাঁচটা গ্রামের ব্রাহ্মণ জড় হইয়া ভৈরব চক্রবর্ত্তীর লুচিমণ্ডার শ্রাদ্ধ করিতেছে। আরও বিস্ময়ের সহিত দেখিল নিজগ্রাম কুসুমপুরের ব্রাহ্মণেরা নির্লজ্জভাবে এই ভোজন ব্যাপারে যোগদান করিয়াছে। ভৈরব বাবু তিন দিন আগে যখন মৃত হরিহরের বাড়ী লুট করিয়াছিল, তখন সকলে নিজ নিজ স্ত্রী কন্যা ভগিনীর জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিয়াছিল, 'বড় অত্যাচার! বড় অত্যাচার' বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল এমন কি কেহ কেহ স্ত্রী কন্যাকে অন্যস্থানে রাখিয়া আসিবারও উদ্যোগ করিয়াছিল, আর আজ তাহারাই সব ভুলিয়া গিয়া জমীদার বাড়ীতে ঘটা করিয়া বৌভাত খাইতে আসিয়াছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল।

কিয়ংক্ষণ পরে রহিম আবার বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। আবার চাটুকারগণ অভ্যর্থনা করিল। হাসিতে হাসিতে রহিম বলিল—"বেয়াই ম'শায়ের দৌলত দেখে বড় খুসী হয়েছি। মেয়েটা আমার খুব সুখে থাকবে।" পরে গুড়গুড়িটার নল ধরিয়া বলিল—"বেয়াই মশায়ের তামাকটা কি রকম, একবার পরখ ক'রে দেখি।"

এই রসিকতায় ক্রমে বিরক্ত হইয়া জমীদার বলিলেন "হয়েছে! হয়েছে! ওরে বেয়াই ম'শায়কে একটা ভাল দেখে গুড়গুড়ি দে তো রে!"

রহিম বলিল—"আর দোসরা ফরসিতে কি দরকার আছে? একটাতেই হবে'খন, যখন বেয়াই হয়েছিই, এখন আর ফরসীর তফাত কল্লে চল্‌বে কেন?"

রহিম একটা বিরাট তামাসা করিয়াছে ভাবিয়া চাটুকারগণ উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল, "কেরামৎ! কেরামৎ! তবে নাকি বেয়ায়ের রস্‌কস্ কিচ্ছুই নেই?"

রহিম জমীদারের দিকে চাহিয়া বলিল—"না, না, রস্‌কসের কথা এর মধ্যে কিছুই নেই। বেয়াই ম'শায়! আমিই হচ্চি আপনার সত্যিকারের বেয়াই—আপনার ছেলের সঙ্গে আমারই মেয়ের বিয়ে হ'য়েছে। হরিহর ভট্‌চাযের মেয়ে আর স্ত্রী এ তল্লাটে নেই। রমা এখন ভাজনঘাটে তার মামার বাড়ীতে। যে দিন আপনি লুঠ করবেন সে দিন খবর পেয়েই আমি বৌঠা'নকে (কমলা দেবী) ও রমাকে আপনার কবল থেকে রক্ষা করবার জন্য অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমার বাড়ীতে এনে রেখেছিলাম। আমার মেয়ে ফুলজানি, রমার বয়সী, তাঁরই মতন সুন্দরী, তারই মত গড়ন পেটন। আপনি তাকে লুট করে নিয়ে গিয়ে পাছে শীকার ফস্‌কায় এই ভেবে সেই রাত্রেই জোর ক'রে আপনার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিলেন। মুসলমানের কন্যা ঘরে এনে—কুল উজ্জ্বল করলেন। আপনার উপযুক্তই হয়েচে! এখন ফরসী দিতে মানা করে নিজের জাত বজায় কচ্ছেন! খোদাকে ধন্যবাদ যে আমার বন্ধুর মরণের সময় তার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তা রাখ্‌তে পেরেছি।"

যে দৃঢ়তার সহিত রহিম কথাগুলি বলিল জমিদার ও চাটুকারগণ তাহাতে রহস্যের গন্ধ না পাইয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। ভৈরব চক্রবর্ত্তীর মাথায় যেন শত বজ্রাঘাত হইল। চীৎকার করিয়া তিনি বলিলেন—"তুই জোচ্চোর বদমায়েস, তোর কথা আমি বিশ্বাস করি না। ও হরিহরের মেয়ে কোন সন্দেহই নেই—আমি এখনই

দেখ্‌ছি।" বলিয়া উন্মত্ত ভাবে রহিমকে টানিয়া লইয়া যেখানে বধূ বসিয়াছিল সেখানে উপস্থিত হইলেন। পিতাকে দেখিবামাত্র ফুলজানি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে "বাবা" "বাবা" করিয়া রহিমের কাছে আসিল। এই অসম্ভাবিত ঘটনায় সকলেই বাক্‌শূন্য হইল। নিয়তির এই নির্ম্মম-বিধানে ভৈরবের জ্ঞান লুপ্ত হইল—এই তীব্র অপমানের আঘাতে তিনি স্তম্ভিত, নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। একটা গণ্ডগোল হইতেই ব্যাপার বুঝিয়া ব্রাহ্মণেরা পাত ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। উত্তেজনাবশে সেই উচ্ছিষ্ট হাতেই পৈতা ছিঁড়িয়া কয়েক জন, জমিদারকে অভিসম্পাত দিলেন—"নিপাত যাও—নিপাত যাও, সবংশে একসাড় হও। অত্যাচারী পাষণ্ডটা শেষকালে কি না মুসলমানীর হাতে খাইয়ে জাতটা মাল্লে!" একটা তুমুল কোলাহল পড়িয়া গেল।

এমন সময় ফুলজানি পাল্কী চড়িয়া রহিমের সহিত পিতৃগৃহে ফিরিতেছিল।

শ্রীকালীপদ মিত্র।

বিশ্ব সঙ্গীতে।

—*—

মৌন মুখর অন্তর-বীণা
নীরব কণ্ঠতার,
আর কতকাল রহিবে ঘুমায়ে'
কথা কও একবার।
নিখিলের যত আকুল পিয়াসা
বরিয়া আপন বুকে,
বাজো একবার মর্ম্ম বাঁশরী,
জীবনের সুখে দু'খে।
কান পেতে শোন বাহির ভুবনে
সঙ্গীত মধুময়,
অনাদিকালের সাক্ষী বহিয়া
ঘোষিছে কাহার জয়!
অম্বরে গুরু ডম্বরু ধ্বনি
তুলিছে গভীর তান,
নীল পয়োধির ধেয়ান ভাঙ্গিয়া
গরজে বিপুল গান।
সঙ্গীত জাগে পবন স্বননে
নিদাঘ উষ্ণশ্বাসে,
সঙ্গীত জাগে বনের পাদপে,
দামিনী অট্টহাসে।

প্লাবনপীড়নে, নদীহিল্লোলে
নিঝরের কলগানে,
ভৈরবী কার উঠেছে ধ্বনিয়া
আকুল আবেশ তানে।
বাঁশবনে আজো সুপ্ত বাঁশরী
তোলে অনুপম গীতি,
বিহগকণ্ঠে চির অভিরাম
ধ্বনিছে সাহানা নিতি।
মরতের মণি শিশুর কণ্ঠে
মনগড়া কচি সুর,
হেথায় ধরার বেদনা-বিপিনে
এনেছে স্বরগপুর।
ব্যথিতের আর বিরহীর শ্বাসে
করুণ কোমল তান,
সমরাঙ্গনে যোদ্ধার বুকে
রুদ্র দীপক গান।
জাগে তপোবনে সুধার উৎস
ঋষি বালকের সাম,
গৃহপ্রাঙ্গনে জাগিছে বঙ্গে
মধুময় হরিনাম।
সঙ্গীত এত নিখিল ভুবনে
শুধু কি লুকায়ে রবে ?
আমার মাঝারে বিশ্বের তান
রণিয়া উঠিবে কবে!
সব সঙ্গীত ছাপিয়া উঠিবে
বিদারি পৃথ্বী ব্যোম
সঞ্চিত যেথা বিশ্বের গীতি,
প্রাণময় গীতি 'ওম্'।

শ্রীসুকুমার দাসগুপ্ত।

পত্র।

—ঃ-ঃ—

প্রিয়বরেষু—

• • • • •

স্বীকার করি, মনের অতিরিক্ত ধোঁয়া বের করে দেবার জন্যে মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা দেওয়া দরকার হয়; কিন্তু এ-কাজের উমেদার পথেঘাটে এত বেশী দাঁড়িয়ে গিয়েছে যে মৌনী থাক্‌বার লোকই সম্প্রতি দুষ্প্রাপ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দুনিয়ার সকলেই যদি মুখ খোলে তা' হ'লে মূক থাক্‌বে কে? অথচ কোলাহলের মাঝখানে কান খাড়া রাখ্‌বার জন্যে মুখ বন্ধ করাও যে দু'দশজনের পক্ষে দরকার তা বলাই বাহুল্য। 'আমি যে এই শেষোক্ত দলে ভিড়ে পড়াই বাঞ্ছনীয় মনে করেছি সে শুধু এই জন্যে যে তাতে অন্ততঃ ভাবী জাতীয়-জীবন-গ্রন্থের মুখবন্ধটাও গড়ে উঠ্‌তে পার্‌বে। তবে, চিঠি যদি চান এবং আর কিছু না চান (আশা করি, তা' হ'লে বন্ধুত্বটাও শেষ পর্য্যন্ত টেঁকে থাক্‌তে পার্‌বে) তা' হ'লে, লেফাফায় মুড়ে ও-পদার্থটী মধ্যে মধ্যে পাঠাতে পারি,—আর যদি বলেন তো এ-চেষ্টাও কর্‌তে পারি যাতে ওটা নিতান্তই লেফাফা-দুরস্ত না হয়।

পত্র-রচনা প্রচলিত হয়ে পড়ায় লাভও যে নেই তা নয়। যে-যুগ রক্তসিন্ধু সন্তরণ করে এগিয়ে আস্‌ছে, তাতে দশজনের মন হরণ করে' বহুমানাস্পদ হবার চেষ্টা একেবারেই চল্‌বে না এবং লোকের প্রশংসমান দৃষ্টির চেয়ে তাদের প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ই অনেক বেশী দামী হয়ে উঠ্‌বে। এ-অবস্থায় নিজের গুরুত্ব জাহির কর্‌বার জন্যে কৌতূহলী পাঠক, দর্শক বা শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে পরস্পরকে টেক্কা দেবার প্রবৃত্তি ক্রমেই কমে আস্‌বে, এবং কাব্যে ও গল্পে ভালবাসার ফোয়ারা খুলে না দিয়ে মানুষ পরস্পরের জন্যে ও-পদার্থটী সঞ্চিত রাখ্‌তেই চাইবে। গল্প, কাব্য বা প্রবন্ধ লিখে আমরা বড়-জোর সাহিত্য-ক্ষেত্রে দলাদলির সৃষ্টি কর্‌তে পারি—কিন্তু মানুষে মানুষে কোলাকুলির ভূমিকা একমাত্র পত্রের সাহায্যেই সৃষ্ট হতে পারে। বারংবার দেখা গেল,—পত্র-যোগে যে-সব জায়গায় প্রাণ-মনের যোগ সূচিত হয়েছিল, পত্রিকা-যোগে সে সকল স্থান বিয়োগেরই সুস্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত হয়ে পড়লো। পত্র যার অবতরণিকা প্রস্তুত করে, পত্রিকা যে তাতে উপসংহার এনে দেয়—এর কারণ—পত্র গোপনে বলে, আর পত্রিকা প্রকাশ্যে চলে।* মানুষকে সংশোধন করে' নিজের মনের মতন গড়ে তুল্‌তে চাইলে খামের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে আড়ালে অভিসার করাই ভাল—কেন না আমাদের এই মধুর-রসের দেশে 'অভিসারিকা'ই হচ্ছে মানুষের আকাঙ্ক্ষারাজ্যের অদ্বিতীয়া অধিশ্বরী। 'পত্র'কে ও-সাজে সাজানো সম্ভব হলেও 'পত্রিকা'কে একেবারেই নয়—যেহেতু শেষেরটা হচ্ছে বাজারে জিনিষ—সুতরাং সরকারী। তা' ছাড়া, জাতীয় অকর্ম্মণ্যতার যুগে সরকারী গল্প-প্রবন্ধাদি যতই দরকারী বিবেচিত হোক্ না কেন,—ভবিষ্যতে পরস্পরের মধ্যে কাজকর্ম্মে যেটার আদান-প্রদান দরকার হবে, সেটা চিঠি ছাড়া আর কিছুই নয়। বলা বাহুল্য, দু'ছত্র চিঠি সাজিয়ে গুজিয়ে লিখে উঠ্‌তে পারাও এ-যাবৎ আমাদের ধাতস্থ হয়ে ওঠেনি—এ ক্ষেত্রে প্রবন্ধ বা গল্পের আবর্জ্জনায় পুঁথি না বাড়িয়ে, ভবিষ্যতের বন্ধু এই পত্র-দূতকে বিদ্যুৎ-গতি-বিশিষ্ট কর্‌তে শিখ্‌লে দোষ কি?

তারপর স্বলিখিত প্রবন্ধকে মধুবৎ মনে করবার কারণ ঘটলেও বা সাহস করে ও-মাল চালানো যেত; কিন্তু পাঠকের কানে মধুবর্ষণ করা দূরে থাক্, হুল বিদ্ধ করাই যে ওদের কাজ তা তো গোড়া পত্তনেই স্থির হয়ে গিয়েছে। দুর্ম্মুখের সচ্ছন্দে চলাফেরা করার অধিকার রামরাজ্যে ছিল,—কিন্তু এদেশের সাহিত্যরাজ্যের আর যে দোষই থাক্,

---

* পত্র পত্রিকার চাপিয়ে এ পক্ষ কোন্ ধারায় ধরা পড়লেন—সমস্যা সেইটাই। পত্র গৃহীত।

রামনামের সঙ্গে কুটুম্বিতার অপবাদ অবশ্যই নেই; কেননা সে-ক্ষেত্রে মানবাত্মার ওপর ভূতের উপদ্রব থেমে যেত, অর্থাৎ যত রাজ্যির আধিভৌতিক ব্যাপার আধ্যাত্মিক বলে গ্রাহ্য হত না। এ অবস্থায়, পরিচারিকাকে টেঁকিয়ে রাখ্‌তে হলে এমন সমস্ত লেখক ওর জন্য বেছে নেওয়া দরকার হবে, যাঁরা যথেষ্ট পরিমাণে পয়োমুখ—অর্থাৎ কিনা কবি।* দুনিয়ার মধু যে শুধু কবির মুখেই আছে, তার প্রমাণ ও-মুখের কথা শুন্‌লেই মানুষের মন আঙুরের মতন সরস ও তুল্‌তুলে হয়ে ওঠে এবং তুলোর গদিওয়ালা কৌটোয় বিশ্রামলাভ কর্‌তে চায়। আমার মতে কবিত্ব হচ্ছে সেই সমস্ত রচনা, যা' পাঠ কর্‌লে প্রকৃতি ও পুরুষ অর্থাৎ স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতি পরস্পরের প্রতি মধুর রসাত্মক মিলনাকাঙ্ক্ষায় আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। পুরুষ ও প্রকৃতি এই দার্শনিক পরিভাষা দুটীকে সাধারণ স্ত্রীপুরুষ অর্থে গ্রহণ করায় সম্ভবতঃ গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতে পারলুম না, কিন্তু সেজন্যে আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ নেই—, কেননা চিন্তা স্রোতের গভীর তলদেশে যা' পাওয়া যায়, তা' হয় পঙ্ক—আর না-হয় বালি। আমি নিজে হাল্‌কা কথা ও লঘু ভাবেরই পক্ষপাতী, তবে বিচক্ষণ বুদ্ধিতে এ সকল বাক্য ঝাপ্‌সা দেখাবার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, দূরনিবদ্ধ দৃষ্টি অত্যন্ত কাছের জিনিসই চিন্‌তে পারে না। সাধারণ স্ত্রীপুরুষের সচল সম্পর্কটীর ওপরই যে দার্শনিক মহাশয়েরা ভয়ানক ভয়ানক প্রকৃতিপুরুষতত্ত্ব গড়ে তুলেছেন, এ-সম্বন্ধে আর যারই সন্দেহ থাক আমার নেই। স্ত্রীজাতির যাদুবিদ্যার rango মনোরাজ্যের যতদূর যায়, ততটাই হচ্ছে দার্শনিক-নির্দ্দিষ্ট 'প্রকৃতি' এবং কাব্যিক মনোভাবের ভোগভূমি। চিত্তচাঞ্চল্যই যে কবি-প্রকৃতির বিশেষ লক্ষণ, তার কারণ তাঁদের মনের ঘুড়ি সূক্ষ্মসূত্রযোগে উড়লেও, লাটাইটী থাকে স্ত্রীলোকের হাতে। অপর পক্ষে দার্শনিক নির্দ্দিষ্ট 'পুরুষ' হচ্ছে সেই জাতীয় জীব যার আনন্দ স্ত্রীজাতীর অঞ্চলে আবদ্ধ নেই, পরন্তু স্ত্রী-মনোভাবই যার হাতে খেলার পুতুল। এই জন্যেই পুরুষের খেলাঘর বা যোগাসনের নাম হচ্ছে আর্ট। কবি যখন সুন্দরী-বিধৃত-কর্ণে বেদনা অনুভব করে' ডাক ছাড়তে থাকেন—

"আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে, হে সুন্দরি!
বল কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোণারতরী?"—

আর্টিষ্ট তখন হয়তো পরম নির্ব্বিকার-চিত্তে স্ত্রী-বিদ্যুত আর পুংবিদ্যুতের মিলন লক্ষ্য করে' আহ্লাদে আটখানাই হতে থাকেন।

মোট কথা—পৃথিবীর যাবতীয় মারাত্মক জটিলতার মূলে ঐ পুং-বিদ্যুৎ আর স্ত্রীবিদ্যুতের জোয়ার-ভাটা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেই যে মানুষ প্রবৃত্তি-মূলক দর্শন গড়েছিল, তা' অতি স্পষ্ট কথা; তবে বৈষ্ণব দর্শনে আর শাক্ত দর্শনে প্রভেদ এই যে প্রথমটীর উপসংহার হচ্ছে ভোগ, অর্থাৎ ঐ যুগল-বিদ্যুতের গোঁজা-মিলনে; আর দ্বিতীয়টীর পূর্ণচ্ছেদ হচ্ছে যোগে অর্থাৎ ও-দুয়ের বিরোধ অঙ্গীকার করেও অসীম সৌন্দর্য্যময় সোজা মিলনে। দৃষ্টান্ত দেখুন:—

বৈষ্ণব মনোভাব অনুসারে বা কাব্যিক প্রণালীতে মিলন-সাধনের উপায় হচ্ছে ধরা-চূড়া পরে' ও বাঁশী মুখে করে' নায়িকা-সাধনোদ্দেশে কদমতলার দিকে বেরিয়ে পড়া এবং আকুলভাবে ও মিহিসুরে উক্ত যন্ত্রের ছিদ্র পথে ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদা; তারপর যথাকালে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একের বগলের তলা দিয়ে অন্যের হাতদুখানি তুলে ধরা এবং চার হাতে বাঁশীটী ধরে' পরস্পরের দিকে আড়ে আড়ে চাওয়া; সর্ব্বশেষে 'দেহি পদপল্লবমুদারং' বলে, মিলন-ব্যাপারটী পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক করে তোলা। অপর পক্ষে শান্ত-মনোভাব-অনুসারে বা আর্টিষ্টিক প্রাণালীতে মিলনের উপায় হচ্ছে—কদমতলার ত্রিসীমানায় না যাওয়া এবং তৎপরিবর্ত্তে ধুতরোর বীচি-সংযোগে দিব্যি এক-কল্‌কে গাঁজা সেজে নিয়ে সোজা শ্মশানের দিকে রওনা হওয়া; ফলে শিব নায়িকা-সাধন না কর্‌লেও, গৌরীকে নায়ক-সাধনের

* বটে। 　　সঃ সঃ।

জন্যে কঠোর তপস্যায় পর্য্যন্ত প্রবৃত্ত হতে হয়। কাব্যের শ্রীকৃষ্ণে মাধুর্য্য ছিল প্রচুর—আর সে-মাধুর্য্য এম্‌নি ননী-খাওয়ার মতন মোলায়েম যে বুড়ো বয়েস পর্য্যন্ত তাঁর রমণী-সুকুমার মুখমণ্ডলে গোঁফের রেখাটীও দেখা দেয়নি। মিলন প্রবৃত্তি-প্রাবল্যে পৌরুষ-বিসর্জ্জনের এমন মধুর দৃষ্টান্ত অতুলনীয়,—আর এরই নাম হচ্ছে কবিত্ব। কবিত্ব যে মেয়ে-কবি ও মেয়েলি-কবিদের এত প্রিয়, তার কারণ ওতে নারীত্বেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। মহাদেব কাব্যের বড় একটা ধার ধারতেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন একজন পাকা আর্টিষ্ট। মধুর রস হয়তো তাঁর মনের মধ্যে প্রচুর-পরিমাণেই ছিল, কিন্তু তার চর্চ্চাটা এত লোভনীয় ভাবে চালাতে পারেন নি যাতে কাব্যের পর কাব্যে তার কীর্ত্তন চালাতে ইচ্ছে হয়। এ-সত্ত্বেও চতুর শ্রীকৃষ্ণের উপর ফতুর মহাদেবই যে জয়ী থেকে গিয়েছেন তার প্রমাণ—এ-কালের (শ্রীরাধিকাদের কথা বলতে পারিনে) মা-দুর্গারা শিবের মতন স্বামী-লাভের জন্যেই বালিকা-ব্রত করে থাকেন। মেয়েলি-স্বামী না চাইতেই পাওয়া যায়, কিন্তু দ্বিতীয়টা সকলে চাইলেও এক তপস্যা-বিশুদ্ধচিত্তা গৌরী ছাড়া অপর কারুর ভাগ্যে জোটে না। ইনি পুরুষকে নিজের ভোগ্য করতে না চেয়ে নিজেকে পুরুষের যোগ্য করতে চেয়েছিলেন বলেই ভারতীয় চিত্র-ভাণ্ডারে এমন ছবি আমরা দেখ্‌তে পেয়েছি যা আর্টে অবিনশ্বর, কল্পনা মহত্ত্বে অক্ষয় ও শিল্প-সাধনার অভ্রভেদী শুভ্রকীর্ত্তি। রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলন-চিত্র যদি কবিত্বের শেষ কথা হয়—তবে আর্টিষ্টিক creation এর চরম কথা হচ্ছে, রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণার সিংহাসন-তলে ভিক্ষাপাত্র-হস্তে নির্ব্বিকার নির্লিপ্ত ও সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী-শিবের পৌরুষ-বলিষ্ঠ প্রতিমূর্ত্তি। একদিকে শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ আর একদিকে পৌরুষের অনবদ্য প্রকাশকে এম্‌নি বিরোধালঙ্কারের যোগসূত্রে সুসম্বদ্ধ দেখে যে সমস্ত নরনারীর চোক ফেটে আনন্দাশ্রু-ধারা ছুটে না বেরোয় তারা আত্মবিস্মৃত।

এদেশের কাব্যযুগ রবীন্দ্রনাথে পূর্ণ-বিকশিত হয়ে সম্প্রতি তার যথার্থ-আধ্যাত্মিক ভোগ-স্পৃহাটীকে আর্টিষ্টের যোগাসনের দিকে মেলে ধরবার উদ্যোগ করেছে—আর এই আর্টিষ্টেরও চেষ্টা হচ্ছে—"শিবমূর্ত্তি হেরি বিশ্বে, দেহ এ ক্ষমতা।" কিন্তু একথা একবার বলতে গিয়ে কবিরাজ ও কবিরাণীদের কাছে কানমলা খেয়েছি—সুতরাং আর ও বেলতলার দিকে যাবার চেষ্টা করবো না। তবে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ প্রথমে এই artistic ginius টীকে 'শুক্‌নো ডাঙা' বলে' উড়িয়ে দিতে চাইলেও সম্প্রতি যে আর চান না, তার পরিচয় আষাঢ়ের 'প্রবাসীতে' তাঁর 'মালা' শীর্ষক কবিতা থেকে পাবেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে প্রকাশ যে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র উদীয়মান রবীন্দ্রনাথের গলায় তাঁর স্বোপার্জ্জিত যশোমাল্যখানি দুলিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন,—সে-মালাকে বিজয়-মাল্যে পরিণত করবার শক্তি দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশকে মুগ্ধ করেছেন—কিন্তু বিজয়-মাল্যের পরও যে একটা বরণ-মাল্য আছে, অর্থাৎ সম্মোহন-বিদ্যা আর ব্রহ্ম-বিদ্যা যে এক জিনিষ নয়, এ-সত্য প্রকাশ করে তিনি অন্ধ-ভক্তদের রক্ষা করেছেন, নইলে সাহিত্য-ক্ষেত্রে অসংখ্য আগাছা গজিয়ে উঠ্‌তো। বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রসাহিত্যকে আগাছা বল্‌বার স্পর্দ্ধা আমার নেই, কেননা তা' বললে সবচেয়ে-বড় মিথ্যাকথাই বলা হবে; তবে একথা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে রবীন্দ্রনাথের ঘাড় ধরে যিনি আত্মকথা লিখিয়ে নিয়েছেন, তিনি স্ত্রীলোক এবং আদর্শ স্ত্রীলোক—প্রমাণ ও কবির মনোভাবের মাথায় আজ পর্য্যন্ত ঘোমটা রয়েছে। গৌরীর কঠোর তপস্যাশেষে যদি প্রমথনাথের যোগাসন আজ টলে থাকে, তাতে ক্ষুব্ধ হবার কারণ নেই, কেন না পৃথিবীর সংস্তটাই স্ত্রী-বিদ্বাৎ নয়। তবে 'বর বড় কি কনে বড়' এ-সমস্যার জন্যে ব্যস্ত হওয়া অনাবশ্যক,—যেহেতু ওর মীমাংসা নেই। যাঁদের মধ্যে প্রকৃতির ভাগ বেশী তাঁরা কাব্যকে, আর যাঁদের মধ্যে পুরুষের ভাগ বেশী তাঁরা আর্টকে আদর করবেন—এইমাত্র।

* * * * *

শ্রী বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

প্রতিবাদ।

—*—

কাব্যের পরিস্ফুটন কোথায়? কবি যখন কোন একটা বিষয়ে হঠাৎ বেদনা অনুভব করিয়া কিম্বা কোন পুরাতন কথা স্মরণ করিয়া লেখনী ধারণ করেন তখনই তাঁহার কাব্যের সার্থকতা। তাঁহার সেই আবেগভরা হৃদয় লইয়া তখন যাহাই লিপিবদ্ধ করেন তাহাতেই একটা মাধুর্য্যের স্বর্গীয় ছবি প্রকটিত হয়। ১৩২৫ সালের বৈশাখ সংখ্যায় "পরিচারিকায়" শ্রীযুক্ত ভবতারণ গুহ ঠাকুরতা লিখিত 'কাব্য ও কবি' প্রবন্ধে লেখক মহোদয় তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ব্যথা বা উচ্ছ্বাসের নীরব পরিস্ফুটনে কবি ও কাব্যের প্রকাশ। কথাটা ঠিক। "মাঝি ভিড়ায়ো নাকো চলুক তরী নদীর মাঝে" নামক গানটিতে কবির মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে জনৈক কবি প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুর পর একদিন নদীপথে যাইতে যাইতে মৃত প্রিয়ার গ্রামের পার্শ্বে আসিয়া উপনীত হন। হঠাৎ তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি মনে পড়াতে হৃদয় দুঃখে উদ্বেল হইয়া উঠে এবং হৃদয় হইতে সঙ্গে সঙ্গে করুণ রাগিণীর সৃষ্টি হয়। তাই তিনি গাহিয়াছেন:—

এমনি সাঁঝে আমার প্রিয়া
যেত ছোট কলসীটিকে
কোমল তাহার কক্ষে নিয়া।

* * * *

বাস্তবিক তাঁহার অনুমান কোনক্রমেই অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। গানটিতে এমনি একটি হৃদয়ভেদী করুণ রাগিণী ঝঙ্কৃত হয় এবং এমন একটা প্রাণস্পর্শী ভাব নিহিত আছে যে কবিতাটি পড়িবামাত্রই কবির জীবনের ছায়াটুকু সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয়, অস্ফুট বেদনার অনুভূতি জাগাইয়া দেয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা কবির লেখনীর চরম আদর্শ।

আধুনিক পল্লীকবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ই এই গানের রচয়িতা। তাঁহার সম্বন্ধে ভুল ধারণা অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। আমার সঙ্গে তাঁহার বহুদিনের জানাশুনা বিশেষ পরিচয় সত্ত্বেও এই ভুল সংশোধনের সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। উপস্থিত 'কাব্য ও কবি' প্রবন্ধে তাঁর মৃত পত্নীর উল্লেখ দেখিয়া তাঁর ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় পাঠকবর্গের নিকট ভুল সংশোধনের অবতারণা।

'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের' লেখক তাঁহার গদ্য কাব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রিয়তমা পত্নীর বিয়োগ দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া। 'সেই মুখখান' তিনি জীবনে ভুলিতে পারেন নাই। যে কাজে মন দেয় তাহাতেই বাধা পড়ে কেবলি মনে পড়ে 'সেই মুখখানি।' তিনি তীব্র দুঃখের আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া হৃদয়ের সব আবেগ-গভীর বেদনা অমর কাব্যে প্রকাশ করিয়া মনকষ্ট লাঘব করিয়াছেন। 'এষা'র কবিও এই পথের পথিক। কিন্তু কুমুদবাবু ত এ পথের পথিক নন। অথচ কেন যে তাঁর 'একতারাতে' এ বিরহ সুর তুলিলেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন। তিনি যে গান গাহিয়াছেন তাহা বিরহীর প্রাণে আঘাত করিবার একটি সুমহান যন্ত্র এবং বিরহীর হৃদয়েই সম্ভবে। যিনি নিজে তাহা অনুভব করেন নাই তাহার তথ্য নিরূপণ করিয়া অপরের নিকট প্রকাশ করা দুরূহ ব্যাপার।* কিন্তু কুমুদবাবুর প্রকৃতি অন্যরূপ। পত্নী বিয়োগ তাঁর জীবনে ঘটে নাই। স্ত্রী এখনও বর্ত্তমান। অথচ কেমন করিয়া তিনি এ গভীর রাগিণী তুলিলেন! জীবনের অপ্রকৃত ঘটনাকে বাস্তবে পরিণত করিয়া মানবচক্ষে ধরা সামান্য লিপিচাতুর্য্যের ফল নয় কি।

শ্রী পঞ্চানন দাসগুপ্ত।

---

* কবি, ঐতিহাসিক নহেন, বাস্তব হইতে তাঁহার হৃদয়ে কল্পনার প্রভাব অধিক। সেইখানেই তাঁহার সার্থকতা। তাঁহার কল্পনা, সুখদুঃখ কেবল নিজকে লইয়া সীমাবদ্ধ নহে, বিশ্ব তাঁহার আপনার—বিশ্বের সুখদুঃখে যে কবির হৃদয়-তন্ত্রী ঝঙ্কৃত—তিনিই কবি। কবির রচনায় তাঁহার জীবনের ঘটনা প্রকটিত—ইহা অনুমান করা নিরাপদ নহে। সঃ।

বড়লাট দরবারে ফিজি প্রবাসী কুলীর কথা।

আশার কথা,—ফিজি প্রবাসী ভারতীয় কুলী নরনারীর দুঃখ দুর্দ্দশা মোচন প্রচেষ্টা, আন্দোলনের সুফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। বিগত ১১ই সপ্টেম্বর বড়লাট বাহাদুরের ব্যবস্থাপক-সভায় মাননীয় পণ্ডিতপ্রবর মালবী মহোদয় কুলীদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া যে উত্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আশাপ্রদ। গভর্ণমেণ্টের আদেশে ফিজি দ্বীপের চুক্তিবদ্ধ কুলীর চুক্তি-সর্ত্ত নাকচ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদিগকে চুক্তি-বন্ধন মুক্ত করিয়া দেশে ফেরত পাঠাইবার কোনই চেষ্টা হইতেছে না। তাহাদের ত দূরের কথা যে সকল কুলী চুক্তি-কাল অতীত হওয়ায় মুক্ত ও চুক্তির সর্ত্তানুযায়ী যাহাদিগকে ভারতে ফেরত পাঠাইতে নিযুক্তকারী বণিকগণ বাধ্য, তাহাদিগকে পর্য্যন্ত জাহাজের অল্পতার অছিলায় দেশে ফিরিতে দেওয়া হইতেছে না! মালবী মহোদয় কুলীদিগের এই দুর্দ্দশা নিরাকরণ উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করেন যে, ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারত সচিবের বরাবর ভারতীয় কুলীগণকে প্রকৃত পক্ষে মুক্তিদান করিবার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যান্তর্গত ঔপনিবেশিক গভর্ণমেণ্ট সমূহকে অনুরোধ করুন। তাঁহারা যেন এ অনুরোধ হৃদয়ের যুক্তি-তর্কহীন উচ্ছ্বাস বলিয়া উড়াইয়া না দেন, এ যে জীবন মরণ সমস্যা! গভর্ণমেণ্ট যেন বিষয়টার প্রকৃত দিকটাই (right view) গ্রহণ করেন এবং যাহাতে এই কুপ্রথার প্রতিরোধ হয় সে সম্বন্ধে চেষ্টিত হন। ফিজির কুলীলাইনে যে ভীষণ পাপস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহা প্রতিহত করা অত্যাবশ্যক। মানুষের নৈতিক জীবন যেখানে অবজ্ঞাত, সেখানে আর রাজকীয় শক্তি প্রভাবের স্বার্থকতা থাকে কোথায়।

গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সার জর্জ বার্ণেস প্রত্যুত্তরে চুক্তিবদ্ধ কুলীদের সর্ত্তগুলি আলোচনান্তর বলেন,—ফিজি দ্বীপে ভারতীয় কুলীগণের যে এরূপ দশা দাঁড়াইবে তাহা পূর্ব্বে অনুমান করা যায় নাই। বিগত মার্চ্চ মাসে মহামান্য বড়লাট বাহাদুর প্রবাসী কুলীর উন্নতিমূলক বহু প্রস্তাব সম্বলিত একখানি পত্র মিঃ এণ্ড্রুজের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। মহামতি বড়লাট বাহাদুর উক্ত পত্র ও তাহার সহিত ফিজি গভর্ণরের নামে আর একখানি ব্যক্তিগত পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্রে কুলীদিগের নৈতিক জীবনের দিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। সম্প্রতি ভারত সচিবের নিকট হইতে সেই পত্রের উত্তর আসিয়াছে। তিনি জানাইয়াছেন মিঃ এণ্ড্রুজের প্রস্তাবের অনেকগুলি গৃহীত হইয়াছে এবং আইনও তদনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বিবাহিত কুলীগণের জন্য স্বতন্ত্র আবাস নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। শিক্ষাবিস্তার ও অন্যান্য উন্নতির চেষ্টা ফিজিতে আরম্ভ হইয়াছে—এই সকল কার্য্যে চিনিকরগণ যোগ দিয়াছে। ভারত হইতে শিক্ষক লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত ফিজি গবর্ণমেণ্ট করিয়াছেন। ফিজি কাউন্সিলে একজন প্রবাসী ভারতবাসী নিযুক্ত হইয়াছে! এগুলি নিশ্চয়ই উন্নতির মত উন্নতির লক্ষণ। কোন উপনিবেশই তাঁহাদের দায়ীত্ব বিস্মৃত হইতে পারেন না। বর্ত্তমান দুঃসময়ে কুলীগণকে ভারতে ফেরত পাঠানের সত্যই অনেক বাধা। ভারত গবর্ণমেণ্ট, প্রবাসী ভারতীয় কুলীদের উন্নতির জন্য বিশেষ ভাবে লেখালেখি করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন ও বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি অতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন। ইহা আন্দোলন কারীগণকে বিশেষ ভাবে গভর্ণমেণ্ট জানাইতেছেন।'

আমরা সদাশয় গভর্ণমেণ্টের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসবান; গভর্ণমেণ্টের আন্দোলনে স্থায়ী ফল ফলিবে আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস।

জা—

কোচবিহার ষ্টেট্ প্রেসে শ্রীঅম্বিকানাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও কোচবিহার সাহিত্য-সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মাতৃমূৰ্ত্তি

বারাবিনো কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

২য় বর্ষ { , ১৩২৫ সাল। } ১২শ সংখ্যা।

সত্যলাভ।

—:*:—

অনেক ঠকা ঠকেছি যে
অনেক ভালবেসে,
সত্যেরে চাই শেষে।
ব্যর্থ গেছে অনেক চাওয়া,
ঝাপ্‌টা দিল অনেক হাওয়া,
অনেক ঢেউয়ের আঘাত খেলাম
এ-কূল ও-কূল ভেসে।
সত্যেরে চাই শেষে।
সুখের নেশা ভাঙ্গেই যদি
ভাঙ্গুক তবে ঘোর,
সত্যেরে চাই মোর।
মধুর গিয়ে আসে যদি
নিঠুর সর্ব্বনেশে,
সত্যেরে চাই শেষে।

ভিক্ষা যদি মিল্‌ল নারে,
ফিরে আসুক অশ্রুভারে,
রিক্ত হিয়া পূর্ণ হ'বে
চরণতলে এসে ;
সত্যেরে চাই শেষে।

ভাষার পঙ্গুত্ব।*

—:*:—

সাহিত্য-ক্ষেত্রে ভাষার গতি মানবের স্বাভাবিক বাক্‌শক্তির ন্যায় অবাধিত নহে। ভাব ঘনীভূত হইলে উহার বাহন ভাষা, উচ্ছ্বসিত সাগর তরঙ্গের ন্যায় মন্থর ও সময়ে সময়ে একেবারে নিশ্চল বা পঙ্গু হইয়া পড়ে। ইহার কারণ ভাষা মানবের দীর্ঘ কালীন যত্ন ও আয়াসের ফল, আর ভাব ঈশ্বরের করুণার দান। মানবের যত্নসম্ভূত ও ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রসূত দ্রব্য কখনও তুল্যমূল্য কিংবা সম আদরণীয় হইতে পারে না। ভাব যেখানে প্রগাঢ় গুরুগম্ভীর ও মাধুর্য্যঘন ভাষা সেখানে স্থিরধীর আত্মবিস্মৃত যোগীর ন্যায় মূক। ভাষার এই নৈমিত্তিক মূকতা বা পঙ্গুতা উহার সমধিক উৎকর্ষের পরিচায়ক। আলোক ও বায়ুর ন্যায় ভাষা না থাকিলে আমাদের জীবনযাত্রা অসম্ভব হইয়া উঠে। সংসারসমাজে থাকিতে হইলে পদে পদে ভাষার সাহায্য লইতে হয়। সমাজ অতীত যোগীঋষিগণ ভাষার মুখাপেক্ষী নহেন। তাঁহারা পরব্রহ্মের দেশের লোক। তথায় শব্দব্রহ্ম বা বাঙ্ময় জগতের অধিবাসিগণের উপর আধিপত্য-শালিনী ভাষার গতায়াত বন্ধ। নামরূপময় বা বাঙ্ময় জগতই কবিদিগের কর্ম্মক্ষেত্র ও সাহিত্য। ভাষাদেবীর বরপুত্র কবি সাহিত্যের মন্দিরে তাঁহার ইষ্টদেবীকে যথেচ্ছলীলাবিলাসময়ী দেখিতে পাইলেও, কখনও কখনও আমরা উঁহাকে লীলামুক্ত নির্গুণভাবরসময়ীরূপে বিরাজ করিতে শুনি। এই উচ্চতর অবস্থা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ প্রমাণের বলে অনুভূত হয় না। এজন্য নারায়ণের অবতার ব্যাসদেব এই রসময় স্বরূপকে কোথাও "অবাঙ্মনস-গোচর," কোথাও "অতীন্দ্রিয় গ্রাহ্য" কোথাও বা প্রজ্ঞা বা "বোধিমাত্র গম্য" (pure intuition) আর কোথাও "তুরীয় চৈতন্য" বলিয়া নানাভাবে বর্ণনা করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ এই অবস্থা বাহেন্দ্রিয়ের জ্ঞানের সাহায্যে জ্ঞাত হওয়া যায় না। ইহা কেবল স্বয়ং বেদ্য ও স্বয়ং আস্বাদ্য। এই দিব্য মাধুর্য্য আস্বাদনে যাহার মন একেবারে মজিয়া যায়, তাহার বাক্‌শক্তি লুপ্ত হইয়া থাকে। মধু কেমন, না মিষ্ট। মিষ্ট কেমন, কথায় এ ব্যাখ্যা আজ পর্য্যন্ত কেহই দিতে পারেন নাই। কোনও কালে পারিবেন বলিয়াও মনে হয় না। এই প্রশ্নের যেদিন সুমীমাংসা হইবে, সেদিন অতিজটিল অথচ বিস্ময়কর বিশ্বরহস্যের চিরন্তন "গোলোক ধাঁধার" পথ অনায়াসেই আবিষ্কৃত হইবে। সেদিন ঐ পথের উপযুক্ত পথিক জুটিবে কিনা বলা যায় না। ভাষার এই অব্যক্ত মাধুর্য্যের রাজ্যবেদন অদ্যাবধি কোন দেশেই হয় নাই। কি ভারতে, কি অন্যদেশে যিনি যখন প্রকৃতির রহস্যগীতিকার

* কোচবিহার সাহিত্য-সভার তৃতীয় বার্ষিক চতুর্থ মাসিক-অধিবেশনে পঠিত।

সুমধুর স্বরলহরীর মূর্চ্ছনার ক্রম উদ্‌ঘাটিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তিনিই তখন আপ্রাণপাত চেষ্টা করিয়াও ভাষায় উহা বর্ণনার উপযোগী কথা খুঁজিয়া পান নাই। তাই একজন পাশ্চাত্য কবি (J. Keats) ভাবের ঘোরে তান ধরিয়াছেন—"Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter," আমরা বাহ্যেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে সকল মধুময়ী স্বরলহরীপূর্ণ রাগরাগিণী শুনিতে পাই ঐগুলি ত মিষ্ট বটেই, কিন্তু বিশেষ বিশেষ সময়ে আমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে শোক, বিরহ, হর্ষ, বিস্ময় প্রভৃতির ঘাতপ্রতিঘাতে যে অশ্রুতমধুর ঝঙ্কার উত্থিত হয়, ঐগুলি অধিকতর সুমিষ্ট। বায়ুবাহিত বাহ্যস্বরমাধুর্য্য অচিরস্থায়ী ও সর্ব্বজনসংবেদ্য। কিন্তু হৃদয়তন্ত্রীবাদিত মধুর ভাবতরঙ্গগুলি কেবল অন্তরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য, চিরস্থায়ী ও সহৃদয়হৃদয়বোধ্য। বিশালদর্পণপ্রতিবিম্বিত বৃহৎ বস্তুর ন্যায় সুবিশাল হৃদয়েই কেবল ঐ ভাবের উৎস উৎসারিত হয়। সঙ্কীর্ণ চিত্তে উহার কখনও স্থান সংকুলান হয় না। ভাবুক কবি যখন ভাবের উন্মাদনায় প্রাণের আবেগে কল্পনার বৈকুণ্ঠে বিচরণ করিতে থাকেন, তখন তাঁহার দৈবী প্রতিভা চিত্রিত অতিলৌকিক চিত্র ভাষারাজ্যের ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায়। ভাষা তখন ভাবুকতায় ডুবিয়া যায়। চিন্তা তখন মননের ক্রোড়ে সুপ্ত হইয়া পড়ে। কল্পনা তখন তন্ময়তার আবেশে বিবশ হইয়া উঠে। এ অবস্থায় জড়-লেখনীর দুরবস্থা অবর্ণনীয়। তাই আর একজন পাশ্চাত্য কবি ইঙ্গিতে বুঝাইতেছেন ;—

"He hailed the bird in spanish speech ;
The bird in spanish speech replied,
Flapped round his cage with joyous screech,
Dropt down, and died."

আমরা T. Cambell. নামধেয় জনৈক ভাবুক কবির "The Parrot" শীর্ষক কবিতার শেষোক্ত পদ্যটীতে কবিবরের এই শ্রবণমোহিনী উক্তি শুনিতে পাই। তিনি প্রথম দৈববিড়ম্বিত আবাল্যপ্রোষিত শুকবরের মুখে আগন্তুক প্রিয়তম স্বদেশীয়ের স্বাগত সম্ভাষণ করাইয়াছেন। তৎপরে ভাবগদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বিহগবর হর্ষোল্লাসজনিত মধুর চীৎকার করিতে করিতে আনন্দের মোহে বিহ্বল হইয়া স্বপিঞ্জরের চারিদিকে ছুটিয়া ছুটিয়া পক্ষাঘাত করিতে করিতে পড়িয়া গেল ও অমরত্ব পাইল, লিখিয়াছেন। এখানে আমরা সুদীর্ঘকাল পরে স্বদেশীয় পক্ষীর সহিত দেশীয় ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া আজন্মবন্দী শুকের মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা কবির ভাষায় শুনিতে পাইলাম না। ভাষা, পক্ষীকে স্বর্গে পর্য্যন্ত লইয়া গেল ; কিন্তু তাহার অন্তরের ব্যথা,—মনের কথা শুনিতে পাইল না। ধন্য কবি, ধন্য তাঁহার প্রতিভা, শত ধন্য তাঁহার অমর কল্পনা-চিত্রিত অস্ফুটচেতন—শুকরাজ। আর ততোধিক ধন্য সে দেশ, যে দেশ এতাদৃশ স্বাধীনতার একনিষ্ঠ সাধক কবিকে নিজ পুত্ররূপে সোহাগ আদর করিতে পারিয়াছেন। বাহিরের উদাহরণ ছাড়িয়া ভাষার পঙ্গুত্বসম্বন্ধে এখন দু'এক জন ঘরের কবির কথা বলি। ভাবুকতাবিভোর ভবভূতির "উত্তর রামচরিত" কিংবা উহার ছায়ায় রচিত মহাত্মা বিদ্যাসাগরের "সীতার বনবাস" অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। উহাতে কবিবর ভবভূতি তাঁহার অভীষ্ট দেবদেবী রামসীতার লীলাময়ী চরিতাবলীর বর্ণনা করিতে করিতে যখন যখনই ভাবের উন্মাদনায় প্রমত্ত হইয়াছেন ; তাঁহার শক্তিশালিনী লেখনী তখন তখনই স্তম্ভিত ও নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা উত্তরোত্তর সে স্থলগুলি বুঝিতে চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ রক্ষোরাজ রাবণের কবল কবল হইতে উদ্ধৃতা দীর্ঘ-বিয়োগের পর অযোধ্যার সুখশীতল প্রাসাদে উপাধানীকৃত রামচন্দ্রের সুকোমল বাহুযুগলে মস্তক রাখিয়া প্রেমনির্ভরসুপ্ত বিদেহরাজদুহিতার নীলকান্তমণিশীতল দেহলতিকা পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করিয়া প্রেমময় রামচন্দ্রের কিরূপ ভাবোচ্ছ্বাস হইতেছে, কবি তাহাই দেখাইতেছেন, "আমি এখন কি

অবস্থায় আছি তাহা ঠিক করিতে পারিতেছি না। আমার মনে এখন যে ভাবের উদয় হইতেছে, সেটি সুখ কি দুঃখ, মূর্চ্ছা কি নিদ্রা, বিষক্রিয়া কি মদমত্ততা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। প্রিয়তমাস্পর্শ জন্য চিত্ত-বিভ্রম, ক্ষণকাল আমার সংজ্ঞা লোপ করিয়া পরক্ষণেই আবার আমায় সঞ্জীবিত করিতেছে।" কবি এস্থলে প্রিয়-স্পর্শ সম্ভূত আনন্দের সম্মোহনে নিত্যচৈতন্য শ্রীরামচন্দ্রেরও চৈতন্য লোপ হইতেছে বলিয়া তাঁহার লেখনী প্রেমাবিষ্ট রামচন্দ্রের তদানীন্তন অবস্থা বর্ণনে পঙ্গুতা দেখাইয়াছেন। আবার স্থানান্তরে;

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহি বিজ্ঞাতুমর্হতি ॥"—

বলিয়া কুলিশকঠোর ও কুসুমকোমল চিত্তযুক্ত অতিমানবদিগের কর্ম্মপদ্ধতি ভাষার আয়ত্তের বাহিরে বুঝাইয়াছেন। তারপর, শূদ্র তপস্বী শম্বূকের উদ্ধারপ্রসঙ্গে জনস্থান আগত রামচন্দ্র, পিতৃসত্যপালনার্থ লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বনবাসকালে পরিচিত জনস্থানের রম্য সরোবর, প্রান্তর, কন্দর প্রভৃতি দেখিয়া নির্ব্বাসিত সীতার গাঢ় শোকের প্রহারে ব্যথিত হইয়া বিলাপের ছলে তাঁহার উপর সীতার কিরূপ অকপট প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল, তন্ন তন্ন করিয়া তাহার বিশ্লেষণ করিতেছেন।

"অকিঞ্চিদপি কুর্ব্বাণঃ সৌখ্যৈর্দুঃখান্যপোহতি।
তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়োজনঃ ॥"

"প্রিয়জন কোন সুখকর কার্য্য না করিলেও কেবল দর্শন, স্পর্শন, সম্ভাষণাদিজনিত আনন্দরাশির দ্বারা দুঃখ-পরতন্ত্র মানবের যাবতীয় সংসার জ্বালা বিদূরিত করেন। অতএব যে যাহার প্রিয় বা ভালবাসার পাত্র সে তাহার কি যেন এক অনির্ব্বচনীয় বস্তু।" কবি এখানেও প্রেমাস্পদের স্বরূপ বর্ণনার উপযোগী ভাষা সম্পদে দরিদ্র। কেবল ভবভূতি নহেন তাঁহার ভক্তিভাজন মহাজন কবিগুরু বাল্মীকি ও রামসীতার স্বর্গীয় প্রেমের ছবি আঁকিতে গিয়া ভাষা হারাইয়া ফেলিয়াছেন;—

"তথৈব রামঃ সীতায়াঃ প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়োঽভবৎ।
হৃদয়ংত্বেব জানাতি প্রীতিযোগং পরস্পরং ॥"

এখানেও স্পষ্ট দেখিতে পাই, রামসীতা উভয়ে উভয়কে প্রাণ অপেক্ষায় ভাল বাসিতেন। সে ভালবাসা কেমন কবিগুরু তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ; তাই আভাসে বুঝাইতেছেন। অকৃত্রিম বন্ধু, বন্ধুকে কেমন ভালবাসেন, সেটা যেমন তিনি বাক্যে প্রকাশ করিতে পারেন না, সেরূপ রামসীতার ভালবাসা কেবল তাঁহাদেরই হৃদয়ের বোধ্য, অপরের বোধ্য নহে। আবার;—

"ক্ষুভিতাঃ কামপিদশাং কুর্ব্বন্তি মম সাম্প্রতং।
বিস্ময়ানন্দসন্দর্ভজর্জ্জরাঃ করুণোর্ম্ময়ঃ ॥"

বলিয়া কবি ভবভূতি রামচন্দ্রের মুখ দিয়া গভীর বিলাপের সুরে গাইতেছেন, "আমার হৃদয়ের শোকতরঙ্গগুলি যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের তুমুল সংঘর্ষে ভঙ্গপ্রবণ হইয়া সম্প্রতি কি যে এক অনমুভবনীয় অবস্থায় উপনীত হইতেছে, তাহা আমি বলিতে পারিতেছিনা।" সুপ্রসিদ্ধ উত্তররামচরিত নাটকের বিশেষ বিশেষ স্থল হইতে যথাক্রমে উদ্ধৃত বাক্যাবলীতে দেখিতে পাইলাম; যে কবি তাঁহার কাব্যের প্রারম্ভে, "বাগ্‌বশ্যেবাহুবর্ত্ততে," বলিয়া বাগ্‌দেবীকে তাঁহার গুণানুরাগিণী রমণীরূপে কীর্ত্তন করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই; তিনিই কিন্তু ভাবমুগ্ধ-কবিকুলের

আত্মবিস্মৃতি বশতঃ স্থানে স্থানে বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া পড়িয়াছেন। এরূপ মৌন ভাব কবিশক্তির ন্যূনতার পোষক নহে, পরন্তু কবির অসীম মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। মানবের অন্তরে অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত অনন্ত রাগ-রাগিণীতে যে সকল স্বরলহরীর সূক্ষ্ম অনুরণনা উঠিতেছে, সেগুলি কখনও সাস্তবিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষের উদ্ভাবিত কৃত্রিম যন্ত্রে নিঃশেষে ধ্বনিত হইতে পারে না। প্রাণের সুরের রাগরাগিণী যত শান্ত সুন্দর, মিষ্ট মধুর হয়, কথার সুরের মাধুর্য্য তত কোমল ও সুমিষ্ট হইতে পারে না। বাহ্য পূজার মন্ত্র উচ্চকণ্ঠে পড়িতে হয়। কিন্তু ইষ্ট মন্ত্র মনে মনেই জপিতে হয়। মুখের কথার চেয়ে মনের কথার জোড় খুব বেশী। মৌখিক ভালবাসা আর আন্তরিক ভালবাসায় স্বর্গ নরকের প্রভেদ। ভাষা, ভাবের পরিচারিকা মাত্র। তাই ভাষাকে পদে পদে ভাবের মুখাপেক্ষী হইয়া চলিতে, বলিতে, খেলিতে ও শিখিতে হয়। দুইজন প্রবীণ বঙ্গকবি, ভাষার পঙ্গুতার কি উজ্জ্বল উদাহরণ দিয়াছেন, দেখুন ;— মানিনী রাধিকার সমক্ষে মানভঙ্গপ্রয়াসী মুরলীবিলাসী, শঙ্কিত, চকিত, ভীত ও ম্লানচিত্তে অধোবদনে করযোড়ে দণ্ডায়মান। তাঁহার মুখে কথা সরিতেছে না। ভক্তকবি শ্রীলবিদ্যাপতি ঠাকুর, সুযোগ বুঝিয়া ইহার ছবি তুলিতেছেন ;—

"গদ গদ নাগর হেরি ভেল ভীত।
বচন না নিকসয়ে চমকিত চিত ॥"

আবার স্থানান্তরে লিখিতেছেন,—

"পিয়াক পিরীতি হাম কহবি না পার।
লাখ বদন বিহি না দিল হামার ॥"

প্রেমের কবি চণ্ডিদাসের প্রেমার্দ্র কবিতা-দলের প্রতি-রেণু যেন প্রীতির রসে চল চল। তাঁহার মধুর-ভাষিণী রসনা, অহরহ রসময় বিগ্রহের প্রেমরসাস্বাদনে জড়তাপন্ন হইয়াই যেন মধ্যে মধ্যে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে ; তাই দেখিতে পাই ;

"অনুক্ষণ মন, করে উচাটন,
মুখে না নিঃসরে কথা,
চণ্ডিদাসের মন, অরুণ নয়ন
ভাবিতে অন্তরে ব্যথা।"

আবার শুনি ;—

"আর জ্বালা সইতে নারি কত উঠে তাপ।
বচন নিঃসৃত নহে বুকে খেলে সাপ ॥"

কবির মুখ ফুটিতেছে না, কিন্তু বুক টুটিতেছে। অন্তরে সাপের খেলার ন্যায় ভাবের ফোয়ারা ছুটিতেছে। ভগবৎ প্রেমে পাগল কবির এ যে কি অবস্থা তাহা দুর্ব্বল ভাষায় কোনও দেশে কোনও কালে প্রকাশিত হয় নাই। আর একজন চিন্তামণি বারবনিতার বশ্য শিষ্য প্রেমের কবি অন্ধ হইয়াও প্রেমাঞ্জনলিপ্তনয়নে শ্রীভগবানের ভুবন-মোহন রূপলাবণ্য দর্শনে বিহ্বল হইয়া গাহিয়াছেন।—

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরং।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিত মেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং ॥"

আমার দয়িত ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহ মধুর, বদনমণ্ডল অতি মধুর, পারিজাতপরাগনিন্দি মৃদু মন্দ হাস্য তাহা হইতেও অতি সুমধুর। গলদশ্রুনয়নে নাচিতে নাচিতে ও এই রূপ বলিতে বলিতে শেষে অরূপের রূপসাগরে একেবারে ডুবিয়া গিয়া নামরূপ ভুলিয়া কেবল, "মধুর" "মধুর" "মধুর", "মধু" "মধু" "মধু", "ম" "ম" "ম", পরিশেষে "অ" "অ" "অ" করিতে করিতে আনন্দ জড়তায় অবাক্ ও অচৈতন্য হইয়াছেন। কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে আর একজন নদীয়ার পাগল, পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথ দেবের রথাগ্রে উদ্দণ্ডনৃত্য করিতে করিতে এই রূপ দিব্যমহাভাবের উন্মাদনায় জগন্নাথনাম গান করিতে উদ্যত হইয়া, "জজগগ, জজগগ" গদ্ গদ বচন হইয়াছিলেন। তখনকার বহুভাগ্যবান্ এ দৃশ্য চাক্ষুষ করিয়াছেন। এটী চিরকুমার ত্যাগী ভক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতরচয়িতার, স্বপ্নদৃষ্ট নরেশ্বরের মায়ামৃগ শীকারের রূপকথার ন্যায় "রচা কথা" নহে। এই নৈসর্গিক ব্রহ্মচারী ভক্ত-কবি অমিয়ময় চরিতামৃতের স্থানান্তরে বলিয়াছেন ;—

বাহিরে বিষ জ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণ প্রেমার অদ্ভুত চরিত।

* * * * *

এই প্রেমের আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃত একত্র মিলন ॥"

ভক্তের জীবনে বিষও অমৃতের ন্যায় মিলন ও বিরহের সমকালে স্ফূর্ত্তির কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ তাহা কি কখন জড় ভাষায় প্রকাশিত হইতে পারে? কবি-জগৎ ও ভক্ত-জগতে সময়ে সময়ে ভাষার কিরূপে জীবন্মুক্তি ঘটে, তাহা আমরা দেখিলাম? এখন জ্ঞানের রাজ্যে ভাষার পরিধি কতদূর বিস্তৃত, তাহার কিছু সন্ধান লইব। প্রথম কঠোপনিষদে যম ও নচিকেতার প্রসঙ্গে, "অশব্দ মস্পর্শ মরূপ মব্যয়ং" যাহা শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ শূন্য অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর ; পুনরায় "তদেতদিতি মন্যন্তে হনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখং" সেই অনির্দ্দেশ্য পরম সুখকে "তাহা এই" এইরূপে সাধক জ্ঞানিগণ মনন করিয়া থাকেন, বলিয়া বাক্যাতীত রূপে উপদিষ্ট দেখিতে পাই। দ্বিতীয়তঃ কেন উপনিষদে, "নতত্র চক্ষু র্গচ্ছতি, ন বাগ্ গচ্ছতি, ন মনো।" "যদ্ বাচান ভ্যুদিতং য়েন বাগভ্যুদ্যতে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি," তাঁহার নিকটে চক্ষু গমন করে না, বাক্য গমন করে না, এমন কি মনও তথায় পঙ্গু। যাঁহাকে বাক্য প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু বাক্যকেই যিনি প্রকাশ করিয়াছেন; তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান ; এইরূপে সাক্ষাৎ বাচক শব্দের অভাবে দ্বিগুণ সর্ব্বনাম যদ্ ও তদ্ শব্দ দ্বারা "যে সে" রূপে পরতত্ত্বের উপদেশ আছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদও ভাষার মৌনভাবের অকাট্য সাক্ষ্য দিতেছেন ; "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" মনের সহিত বাক্যসমূহ যাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া যাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। বনবাসী শাকমূলফলাশী চীরবল্কলপরিধানকারী জটাজূটধারী আদিমকালের ঋষিদের কথা ছাড়িয়া, পরবর্ত্তীকালের গ্রামবাসী ঋষি পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের সরল সুন্দর ভাষাও সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরতত্ত্বের তত্ত্ব নিজ ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেছে না ;—

"অহেয় মনুপাদেয়ং মনোবাচা মগোচরং।
অপ্রমেয় মনাদ্যন্তং ব্রহ্ম পূর্ণ মহং মহঃ॥
অনিরূপ্যস্বরূপং যৎ মনোবাচামগোচরং।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্মনেহনানাস্তি কিঞ্চন॥"

বিবেক চূড়ামণি।

যিনি অত্যাজ্য, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, বাক্য ও মনের অবিষয়, পরিমাণবিহীন, অনাদি, অনন্ত, তেজঃ স্বরূপ, আমি সেই পূর্ণব্রহ্ম। যাঁহাকে কোনও লক্ষণের দ্বারা নিরূপিত করা যায় না। যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, সেই একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই এ জগতে বিদ্যমান, অন্য নানাবিষয় কিছুই নাই। ইহার পর পঞ্চদশীরচয়িতা শ্রীমদ্ ভারতী-তীর্থ বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর তাঁহার গ্রন্থে পূর্ব্বপূর্ব্বোক্ত মহাজনগণের কথার সরল বিবৃতি দিয়াছেন ;—

"সমাধিনির্ধৃত মলস্য চেতসো নিবেশিতস্যাত্মনিযৎ সুখং ভবেৎ।
ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরাতথা স্বয়ং তদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে॥"

পঞ্চদশী, ১১ প, ১১৮।

যোগাভ্যাসদ্বারা বিশুদ্ধ মন আত্মাতে নিবেশিত হইলে, যোগী সাধকের অন্তঃকরণে যে সুখ অনুভূত হয়, বাক্য দ্বারা তাহা বর্ণনা করা যায় না। কেবল তাদৃশ অর্থাৎ যোগাভ্যাসে নির্ম্মল অন্তঃকরণদ্বারাই উহা গৃহীত হইয়া থাকে। এইবার কবি যে তাঁহার উপজীব্যবিষয় বর্ণনাকালে কখন কখনও অক্ষম হইয়া পড়েন, ইহার প্রমাণের জন্য ভাষাদেবীর বরপুত্র কবিকুলতিলক কালিদাসের সুপ্রসিদ্ধ রঘুবংশ কাব্য হইতে একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম ;—

"মহিমানং যদুৎকৃত্য তব সংহ্রিয়তে বচঃ।
শ্রমেণ তদশক্ত্যা বা ন গুণানামিয়ত্তয়া॥" দশম, ৩২ শ্লোক।

হে ভগবন্! আপনার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আমরা যে বাক্যের উপসংহার করিলাম, ইহার কারণ আপনার গুণের পরিচ্ছেদ নহে, পরিশ্রম ও অক্ষমতাই ইহার মূল। এস্থলে কেহ যেন কবির পরিশ্রম জন্য অশক্তি মনে না করেন। কারণ শ্লোকে যে "বা" শব্দ আছে উহা স্পষ্ট পক্ষান্তরের বোধক। কবিবর স্বয়ং ও সুপ্রাচীন দার্শনিক-গণের বহুলপ্রযুক্ত "অবাঙ্ মনসগোচরম্" পদটী অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন। যথা, "অথৈনং তুষ্টুবুঃ স্তুত্যমবাঙ্ মনস গোচরম॥" দশম, ১৫। গ্রন্থের আরম্ভে কবির স্বয়ং প্রযুক্ত "তনু বাগ্‌বিভবঃ" বিশেষণেও এ ভাবের আভাস পাওয়া যায়। প্রীতির অমিয়ময়ী মূরতির বর্ণন করিতে যাইয়া, "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু," নামক সুপ্রসিদ্ধ ভক্তি-গ্রন্থপ্রণেতা লিখিয়াছেন ;—

"ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রাসুষ্ঠু সুদুর্গমা॥"

যে প্রেমবানের হৃদয়ে প্রীতির নবীন অঙ্কুর উদ্গত হয়, তাহার কার্য্য, বাক্য ও চেষ্টার প্রণালী পরমর্ম্মবিদ্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরাও বুঝিতে পারেন না।" যোগশাস্ত্রকারও "কুমারী যেমন যৌবনকালবেদ্য দাম্পত্যপ্রেমের মধুর আস্বাদ বুঝে না, অযোগী ব্যক্তি তেমনি যোগমাত্র বিজ্ঞের ব্রহ্মানন্দের মহিমা ধারণা করিতে পারে না", বলিয়া ভাষার ত্রুটি প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলতঃ বাগিন্দ্রিয় যখন মনের সঙ্গে তাহার মনের কথা কহে, তখন বাহিরের লোক তাহা শুনিতে পায় না। এ যেন বোবার সহিত বোবার মনের রহস্যালাপ। তাই অমৃতের সংবাদ বাহকগণ,

"মূকাস্বাদনবৎ" বলিয়া এই ভূমানন্দ আস্বাদনের একটা অস্পষ্ট পরিচয় দিবার যত্ন করিয়াছেন। গৌড়কাব্য-কাননের কলকণ্ঠ কোকিল শ্রীমধুসূদন, ভাষাকে—

"নবশশিকলা তুমি ভারত আকাশে,
নবফুলকাব্যবনে নবমধুমতী ॥"

কিংবা, "শকুন্তলা তুমি, তব মেনকা জননী"—বলিয়া গরবের ভরে সোহাগের সুরে পরম আদর করিয়াছেন। এখানেও আমরা বুঝিতে পারি যে, কবির ভাষারূপিণী নবশশিকলা প্রতিপদের ক্ষীণ চন্দ্র-কলার ন্যায় গগনে গুপ্তপ্রকাশ থাকিয়াও কুতূহলী দর্শকের মনে সুধাধারা ঢালিয়া দেয়। নব বিকসিত কুসুমদামে শোভাময় প্রমোদকাননের নববাসন্তী ছবির মত সহৃদয় জীবনিবহের প্রাণে প্রীতির অনন্ত নির্ঝর প্রবাহিত করে। আর অপ্সর-কুলললামভূতা মেনকাদুহিতা শকুন্তলার ন্যায় কাব্যরাজ্যে যুগান্তর সংঘটিত করে। ভারতের গৌরব-রবি কবিকালিদাসের সর্ব্বস্ব শকুন্তলাকে তখনই আমরা অনিন্দ্যসুন্দরী বলিয়া বুঝিতে পারি; যখন তিনি দুষ্মন্তের প্রথম দর্শনে তাঁহার রূপগুণের একান্তপক্ষপাতিনী হইয়াও আবাল্য সহচরীদ্বয়কে সে কথা "বলি বলি" করিয়া বলিতে পারিতেছেন না। যখন তিনি কুটীরের দিকে ফিরিয়া যাইতে পদতল কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া অভিরাম গ্রীবাভঙ্গ সহকারে প্রেমাস্পদ রাজার প্রতি পুনঃ পুনঃ সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছেন। যখন তিনি কুরুবক শাখায় কাপড় জড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া অকারণ স্বেচ্ছাকৃত গতিভঙ্গ ঘটাইয়া বার বার তির্য্যক্ নয়নে মহারাজের প্রতি সপ্রেম কটাক্ষক্ষেপ করিতেছেন। যখন তিনি ঋষিকুমার যুগল ও আর্য্যা গৌতমীর সহিত আর্য্য কণ্বের সমক্ষে পতিগৃহ গমনে উদ্যত হইয়া আজন্মপরিচিত, শান্ত, মধুর, স্নেহশীতল তপোবন ও তথাকার সঙ্গীদের ভাবী বিরহের আশঙ্কায় দারুণ মর্ম্মব্যথায় নীরবে অশ্রু মোচন করিতেছেন। আর যখন নৈরাশ্যকঠোর সুদীর্ঘ বিরহের অবসানে, যোগীশ্বর মরীচির আশ্রমে দুর্ব্বাসার অভিশাপমুক্ত প্রণয়িযুগলের ঘটনাক্রমে পুনঃ সাক্ষাৎ ও আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে, নিজ অপরাধ ভাবিয়া শঙ্কিত শরণাগত আদর্শপ্রেমিক দুষ্মন্তের প্রতি মূর্ত্তিমতী প্রীতি শকুন্তলার হর্ষলজ্জা বিজড়িত অশ্রুসিক্ত নীরব প্রেমসম্ভাষণের অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত করিবার বৃথা প্রয়াসে চতুর কবি কালিদাস স্বীয় মধুবর্ষিণী লেখনীর মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করেন নাই; তখনই আমরা শকুন্তলার অনবদ্য সৌন্দর্য্যরাশি নয়নগোচর করিবার পূর্ণ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। মধুর কবি মধুসূদন, ভাষাকে সুমধুর শকুন্তলা নামে আখ্যাত করিয়াছেন। সেই ভাষারূপিণী শকুন্তলা ভাষা হারাইয়া আকারে ইঙ্গিতে, গতি ভঙ্গীতে, চেষ্টায় কার্য্যে, ও নয়নবদনভঙ্গিমায় যেখানে যেখানে তাঁহার হৃদয়বীণার অব্যক্ত মধুর গম্ভীর ভাবগুলি প্রকাশ করিয়াছেন; আমরা সে স্থলগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। উচ্চঅঙ্গের সাহিত্যে এরূপ দৃষ্টান্ত অবিরল। অধিক উদাহরণ উদ্ধার নিষ্প্রয়োজন। ভাষার পঙ্গুতার নিদর্শনের নিমিত্ত প্রবন্ধের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যতগুলি উদাহরণ প্রদর্শিত হইল, বিজ্ঞ পাঠকবর্গ চিন্তাশীলতার সহিত বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, ঐ সকল স্থলে ভাষার মৌনাবলম্বন শোভন ও সঙ্গত হইয়াছে কিনা। বাগ্মিতা স্পৃহণীয় ও আদরণীয়; কিন্তু দেশকালপাত্রভেদে মৌন ভাবই প্রয়োজনীয় ও অত্যন্ত রমণীয়। আমাদের মনে হয়, স্বপ্রকাশ সূর্য্যকিরণের ন্যায় কাব্যজগতে ভাব যখন স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া পড়ে, ভাষার তখন মৌন ভাবে বিশ্রাম করাই উচিত।

শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ।

ধ্যান।

—•-

আজি হেন দিনে কি করিছ তুমি গুণে' বলিবারে পারি,
মুখখানি ম্লান সারাদিনমান আঁখিপাতা ভারি-ভারি।
একবার তুমি যাইতেছ ছাদে আবার আসিছ নীচে,
উপাধানতলে লুকাতেছ মুখ সান্ত্বনাতরে মিছে।
ধাঁধনিক' চুল হয় নানা ভুল পরে আছ নীল-শাড়ী,
আন বাতায়নে যাইতেছ তুমি এক বাতায়ন' ছাড়ি।
লিখিবারে চিঠি সংযত দিঠি করেছিলে বারবার,
কাগজ ছিঁড়িয়া লেখনী ছুঁড়িয়া, লিখিতে পারনি আর।
বই লয়ে তুমি পড়িতে বসিলে করিয়া চিত্তরোধ,
কালিঢালা ছবি একটি কথারো হলোনা অর্থবোধ।
থামের উপর করিছে কূজন কপোতী কপোতে নিয়া,
চেয়ে দেখে দেখে তপ্তশ্বাসে গুমরি উঠিল হিয়া।
সূচ সূতা লয়ে বসিলে তখন মেজেয় পাদুটী মেলে,
সূঁচের ছিদ্রে সূতা নাহি যায় ছুঁড়ে তাও দিলে ফেলে।
শূন্যের দিকে চাহিয়া রহিলে ইন্দ্রধনুর পানে
মুহুমুহু বুক কেঁপে উঠে দূর—বৌকথাকও গানে।
হেথা হতে আমি বলে' দিতে পারি ধ্যানযোগে অবিকল,
এইবার তব চক্ষের কোণে আসিল ক' ফোঁটা জল।
চরণের ধ্বনি পশ্চাতে শুনি 'চোখে কি পড়িল' বলে-
আঙুলে নয়ন পীড়িতে পাড়িতে তথা হ'তে গেলে চলে'।

শ্রীকালিদাস রায়

ফুলওয়ালী।

—:*:—

সে ছিল ফুলওয়ালী। দিল্লীর চৌমাথার উপর নাতিবৃহৎ তাহার ফুলের দোকানখানি ফুলের মতই সুন্দর, আবর্জ্জনাহীন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাহার বয়স হইয়াছিল; প্রৌঢ়ের গাম্ভীর্য্য তখন তাহকে অধিকার করিয়াছে।

ফুলের ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে তাহার দোকানে রাত্রিবাসের স্থানও মিলিত। রাজকার্য্যে বাধ্য হইয়া কয়েকবার উপর্য্যুপরি আমাকে দিল্লী আসিতে হইয়াছিল; আমি তাহার দোকানে আশ্রয় লইতাম, সেই সূত্রে তাহার সাহত আমার পরিচয়। তাঁহার ব্যবহার, গাম্ভীর্য্য আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল—ক্রমে আমাদের মধ্যে একটু ঘনিষ্টতাও জন্মিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া আমার কেন যেন তাহার জীবনের অতীত কথা—একটা রহস্য বলিয়া মনে হইত—সে একা,—এমন একটা প্রাণ একা—বদনে তাহার গাম্ভীর্য্যে যেন বিষাদ-চিহ্ন! ইচ্ছা হইত তাহাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করি,—প্রথমে সাহস হয় নাই,—শেষে একদিন ঔৎসুক্য দমন করিতে না পারিয়া, আত্মীয়ের মতন সহানুভূতির সুরে জিজ্ঞাসা করিলাম—"সুনিপুণ গৃহিণী তুমি—এ সংসারে তুমি কি চিরদিনই একা,—সধবার চিহ্ন তোমাতে দেখি—তিনি তবে কোথায়? দোষ লও না, কৌতূহলে কতদিন এ কথা আমার মনে হইয়াছে!"

সে আমার কথা শুনিয়া প্রথমে কোন কথা বলিল না—বোধ হয় বলিতে পারিল না,—একটা উদাস দৃষ্টি আমার নয়নে নিক্ষেপ করিল। আমি অপ্রতিভ হইলাম—ভাবিলাম, পরের—স্ত্রীলোকের জীবন-রহস্যে কৌতূহলী হওয়া ঠিক হয় নাই!

ফুলওয়ালী কতক্ষণ পরে একটী দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "শুনিবে! শুনিয়া আর ফল কি! শোন—এ কথা ত কেউ কখন আমায় জিজ্ঞাসা করে নাই—আমাকে দেখিয়া তোমার মনে যে ব্যথাটুকু জাগিয়াছে—আমার কথা শুনিয়া তা যে আরও গভীর হইবে। ভাইয়ের মত ভাবি তোমাকে—বোনের দুঃখ-কাহিনী—আমার সুখের কথা শুনিতে চাও শোন। আমি ভাই চিরকালের ফুলওয়ালী নই—গৃহস্থ ঘরের মেয়ে,—মাটিতে পড়িতে না পড়িতেই সব হারাইয়াছিলাম, ছিলেন মাত্র মা। মা আমার এক গৃহস্থের বাটীতে রন্ধনের কার্য্য করিতেন; তখন আমার বয়স আট বৎসর। এই আট বৎসর কাল সাধারণ মুসলমান গৃহস্থ যেমন করিয়া জীবন যাপন করে আমরাও তেমনি ভাবেই দিন কাটাইয়া আসিয়াছি। পিতা, মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে সম্রাটের সৈন্যদলে চাকুরী করিতেন। হঠাৎ যেদিন তাঁহার মৃত্যু হইল সেদিন আমরা চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম। পিতা, বেতন হইতে এক পয়সাও সঞ্চয় করিতে পারেন নাই বরং পাঁচশত টাকা ঋণ করিয়া গিয়াছিলেন। কাজেই সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া মাতা হতাশ হইলেন। কেমন করিয়া মৃত স্বামীর সৎকার করিবেন এবং কেমন করিয়াই বা স্বামীর ঋণ শোধ করিবেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু খাতক, ঋণ শোধের উপায় নির্দ্ধারণে সক্ষম বা অক্ষম যাহাই হউক না কেন উত্তমর্ণের তাহাতে বিশেষ কিছুই আসিয়া যায় না। অকস্মাৎ পিতার মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া আমাদের উত্তমর্ণ সেখ কাদের তৎক্ষণাৎ টাকার তাগিদের জন্য আমাদের নিকট আসিল। পিতার মৃতদেহ তখনও স্থানান্তরিত করা হয় নাই, এরূপ সময়ে সেখ আসিয়া কড়া কথায় আমাদের বেশ দুই কথা শুনাইয়া দিয়া গেল এবং ইহাও জানাইতে ভুলিল না সে আগামী সপ্তাহে টাকা না পাইলে সে আমাদের ঘর বাড়ী দখল করিয়া লইবে; কোন ওজরআপত্তি গ্রাহ্য করিবে না। তাহার কথা শুনিয়া ক্রন্দনরতা মাতা আরও আকুল

হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমি সব কথা না বুঝিলেও ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় অশ্রুরোধ করিতে পারিলাম না।

অবশেষে অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া মাতা স্থির করিলেন তাঁহার সামান্য যে কয়খানা গহনা আছে তাহা এবং তৎসহ আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল সেই বসতবাটীখানি বিক্রয় করিয়া পিতার সৎকার এবং উত্তমর্ণের মায় সুদ ঋণ ৬৫০৮/১৫ টাকা পরিশোধ করিবেন।

সংকল্পমত কার্য্য করিয়া আমাদের হস্তে অবশিষ্ট রহিল মাত্র তিন শত টাকা। এই তিন শত টাকার উপর নির্ভর করিয়া আমাদের দিন কাটিতে লাগিল। মাতা ইতিমধ্যে একটা চাকুরীর সন্ধান করিতেছিলেন; তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে একটা চাকুরী জুটিতে বিলম্ব হইল না।

পর মাসের প্রথম তারিখেই আমরা আমাদের বাসা-বাটী তুলিয়া দিয়া কর্ম্মস্থানে আসিলাম। আমাদের নূতন মনিব ইয়াকুব সাহেব মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। সংসারে তাঁহার পত্নী রোসেনা বিবি ও পুত্র মিরজুমলা ব্যতীত আর কেহ ছিল না। রোসেনা বিবি চিররুগ্না বলিয়া কোন কাজকর্ম্ম বড় একটা করিতে পারিতেন না। মাতাকেই সমস্ত সংসারের ভার গ্রহণ করিতে হইল। মিরজুমলার বয়স ছিল বার বৎসর; শীঘ্রই আমি তাহার খেলার সাথী হইয়া উঠিলাম।

মির, ছেলেটী যেমনি শান্তশিষ্ট ঠিক তেমনই প্রিয়দর্শন। কোনদিন সে মখ্‌তবে যাওয়া ব্যতীত অন্য কোন কারণে বাড়ির বাহির হইত না। ফুলবাগানে আমরা দুজনে খেলা করিতাম। কখনও একরাশ ফুল তুলিয়া সে আমায় ফুলরাণী সাজাইতে বসিত, আবার কখনও আমি বিনা সুতার মালা গাঁথিয়া তাহার গলে পরাইয়া দিতাম।

শুধু যে খেলার সময়েই আমরা পরস্পর মিলিত হইতাম তাহা নহে, সমস্ত দিনের মধ্যে এক মখ্‌তবের অনুপস্থিত কালে এবং রাত্রে নিদ্রার সময়টা ব্যতীত আর সব সময়ই আমি তাহার নিকট থাকিতাম।

পাঠের সময় তাহার নিকট গিয়া বসিতাম, সে একখানা প্রথমভাগ বর্ণপরিচয় খুলিয়া আমায় 'তে' 'বে' 'সে' চিনাইয়া দিয়া অধ্যয়ন করিতে বলিত। আমি কোন দিনই তাহার কথা অমান্য করিতে পারিতাম না। মিরের চেষ্টা ও যত্নে আমি কাজচলাগোছ লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিলাম।

এমনি করিয়া পরস্পরের সাহচর্য্যে আমরা বাল্য ও কৈশোর প্রায় একরূপ কাটাইয়া দিলাম। কিন্তু তখনও আমাদের সাহচর্য্য লাভের বাসনা কিছুমাত্র তৃপ্ত হয় নাই, বরং দিন দিন, বাড়িয়াই চলিয়াছিল।

কৈশোরোদ্গমে আমার অপূর্ণ গৌর-তনু অনেকটা পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। আমার বয়স যখন চতুর্দ্দশ এবং মিরের বয়স অষ্টাদশ বৎসর তখন একদিন আমাদের পরস্পরকে আমরা এক সৌন্দর্য্যময় নূতন চক্ষে দেখিলাম। মিরের সুন্দর সুগৌর মুখখানি নবীন গুম্ফরাজি সুশোভিত হইয়া সে এক মনোহর বেশ ধারণ করিয়াছিল। একদিন বৈকালে আমরা দুইজনে উদ্যানমধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলাম। অস্ত-রবির লোহিত আভায় আমাদিগকে রঞ্জিত করিরা দিয়াছিল। আমি একটা প্রস্ফুটিত গোলাপ, মিরের বুকে গুঁজিয়া দিতে দিতে তাহার মুখেরদিকে চাহিয়া বলিলাম,—"সত্যি ভাই মির, তুমি কি সুন্দর!"

মির আমার হাতখানা একটু জোর করিয়া টিপিয়া দিয়া বলিল,—"আর তুমি আমিনা? তুমি বোধ হয় কোন দিন দেখনি আর্সিতে যে কত সুন্দর তুমি? তা দেখলে কখনই একথা আমায় ব'লতে না।"

আমি একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিলাম,—"বাঃ! তা বই কি!"

মির হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল, একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"আমিনা তোমায় ক'দিন ধরে একটা কথা ব'লব-ব'লব করছি কিন্তু কিছুতেই বলা হ'য়ে উঠছে না।"—বলিয়া সে আমার মুখের দিকে চাহিল।

আমি একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলাম, মনের মধ্যে কি জানি কেন একটু আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল উৎকণ্ঠিত ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া আমি বলিলাম,—"কি কথা মির, বলনা ?"

মির আমার হাত ধরিয়া বলিল,—"চল ঐ বেঞ্চের উপর বসিগে, তারপর ব'লছি।"

আমি বিনা বাক্য ব্যয়ে তাহার সহিত চলিলাম।

বেঞ্চটা একটা বৃহৎ হাস্নুহানা গছের পার্শ্বে স্থাপিত ছিল ; সেখানে বসিলে অকস্মাৎ কেহ দেখিতে পাইত না। সেই বেঞ্চের উপর আসিয়া আমরা বসিলাম।

মির তখনও ইতস্ততঃ করিতেছিল। সহসা আমার দুইহস্ত আপনার করমধ্যে গ্রহণ করিয়া ব্যাকুল দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল,—"আমিনা, তুমি আমায় ভালবাস ?"

"হ্যাঁ ত' মির, আমি ত' তোমায় খুব ভালবাসি।" –কথাটা আমি সরল ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলাম।

মির বলিল,—"সে রকম ভালবাসা নয় আমিনা, বাল্যের ভালবাসা এক –আর যৌবনের ভালবাসা অন্য জিনিষ! লোকে সে ভালবাসাকে প্রণয় বলে। আমি –আমি জান্তে চাচ্ছি তুমি আমায় সেই রকম ভালবাস কিনা ?"—বলিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

আমি কি উত্তর দিব। তাহার কথার অর্থই যে আমি সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলাম না—কি উত্তর দিব ? আমি নতদৃষ্টিতে নীরবে বসিয়া রহিলাম।

মির, সশব্দে একটা দীর্ঘ-শ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার মুষ্টি শিথিল হইয়া আসিতেছিল। আমি বিস্মিত নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। অকস্মাৎ কি যে একটা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল, সে সাগ্রহ-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, -"আমিনা, আমি যদি তোমায় বিয়ে কর্ত্তে চাই তুমি তাতে রাজী হবে ?"

আমার সমস্ত মুখখানা লজ্জায় লাল হইয়া গেল। অস্ফুটকণ্ঠে আমি বলিলাম, –"হব"

"হবে ত' আমিনা, হবে ত' ? তা হ'লে তুমি আমায় ভালবাস ? তবে বল্লে না কেন সে কথা ?"--বলিয়া ধীরে ধীরে সে আমার দেহ করদ্বারা বেষ্টন করিয়া আপনার দিকে আর একটু টানিয়া আনিল। তাহারপর আমার মুখের নিকট মুখ আনিয়া বলিল,—"মনে থাকবে ত' আমিনা—ভুলে যাবে না ত ?"

তেমনি ভাবে আমি বলিলাম,– "না।"

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে আমরা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। মার কাছে যাইতেই তিনি প্রশ্ন করিলেন,—কোথায় ছিলি লা এতক্ষণ ?"

"বাগানে মা!"

"মিরও ছিল ত' সেখানে ? আচ্ছা তোর কি কখনও বুদ্ধিশুদ্ধি হবে না লা ? দিন দিন বয়েস বাড়ছে না কম্‌ছে ? কতদিন বলেছি এখন আর মিরের সঙ্গে অত মিশিস নি, তবু ত' তুই শুনিস না!"

অকস্মাৎ কে ঈষৎ অমুচ্চকণ্ঠে বলিল,—"নানি, আমিনাকে আমি বে ক'রব মনে করেছি!"

চাহিয়া দেখিলাম বক্তা মির। আমি লজ্জায় অধোবদন হইয়া একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলাম। মাতারও বিস্ময়ের সীমা ছিল না ; আনন্দের আতিশয্যে তিনি পড়িয়া যাইতে ছিলেন, দ্বার ধরিয়া কোনরূপে আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইলেন।

সারা রাত্রি মাতা আমার আনন্দের আতিশয্যে নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। বোধ হয় মনে মনে অনেক কিছুর আশা করিতেছিলেন।

পরদিনই কিন্তু তাহার এই অতি আশায় বিধাতা বজ্রাঘাত করিলেন। মিরের মাতা সেদিন আসিয়া বলিলেন,—"হামিদা বিবি, তুমি আস্‌ছে মাস থেকে অন্য জায়গায় কাজের চেষ্টা ক'র আমরা আর লোক রাখব না"—মাসের তখন আর তিনটী দিন বাকী; হতাশয় মা বসিয়া পড়িলেন। কেন যে আজ কর্ত্রীঠাকুরাণী অকস্মাৎ এ কথা বলিলেন মাতার তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না; আমিও কতক কতক বুঝিয়াছিলাম।

সমস্ত দিনটা মিরের সহিত ভাল করিয়া কথা কহিবার অবকাশ পাই নাই—অবকাশ পাই নাই কেন, সে সাহস করিয়া আমার নিকট আসিতে পারিতেছিল না;—কি-যেন কাহার ভয়ে সর্ব্বদাই চকিত দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিতেছিল।

সন্ধ্যার সময় আমি পূর্ব্বদিনের ন্যায় বাগানে গিয়া বেঞ্চের উপর বসিলাম। সেখানে তখন আর কেহই ছিল না আমি বসিয়া ভাবিতেছিলাম,—মিরের সহিত কথা কহিতে না পাইয়া মনটা আমার এত খারাপ হয় কেন? কে আমার সে, তাহার সহিত কথা কহিতে না পাইলে কি আমার ক্ষতি বৃদ্ধি যে তাহার জন্য আমার মনের প্রফুল্লতা নষ্ট হয়?

এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি কতকটা অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম এরূপ সময়ে অকস্মাৎ কাহার করস্পর্শে চমকিয়া উঠিলাম,—"কে গা?"

ফিরিয়া চাহিতেই দেখিলাম সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকিয়া মির আমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি সাগ্রহে তাহাকে হাত ধরিয়া পার্শ্বে বসাইলাম,—"এমন চুপি চুপি এলে যে?"

অপেক্ষাকৃত নিম্নকণ্ঠে মির বলিল,—"আমিনা, আজ সকালে বাবাকে আমি বিয়ের কথা বলেছিলুম···তিনি কি বল্লেন জান..."

আমি কোন কথা না বলিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

মির বলিল, —"···তিনি এ বিয়ে দিতে রাজী হন্‌নি, অনেক কথা ক'য়ে শেষে বল্লেন "আজ থেকে আমিনার সঙ্গে তুমি দেখা ক'রতে অবধি পারবে না, আর শিগ্‌গিরই ওদের তাড়িয়ে দিচ্ছি।"

কি জানি কেন--কথাটা শুনিয়া আমার বুকের মধ্যে হাহাকার জাগিয়া উঠিল। মিরের বিচ্ছেদে কোন দিন যে আমি প্রাণে ব্যথা পাব তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। সেইদিন প্রথম বুঝিতে পারিলাম মিরকে আমি কত ভালবাসি। দুই হাতে তাহার হাত দুইখানি চাপিয়া ধরিয়া আমি নীরবে বসিয়া রহিলাম।

অন্ধকারে পরস্পরকে আমরা দেখিতে পাইতেছিলাম না; কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া মির বলিল,—"আমিনা, বাবা যে সব কথা বল্লেন তাতে ত' মনেই হয় না যে কোন দিন এ বিয়েয় মত দেবেন·········আমি একটা কথা ভাব্‌ছি···········"

বাধা দিয়া আমি বলিলাম,—"কি?"

"··· · তোমার মত হ'লে দু'জনে বেরিয়ে পড়ি, তারপর একটু দূর জায়গায় গিয়ে আমরা বিয়ে ক'রব।"

আমি বলিলাম,—"কিন্তু তারপর?"

"তারপর দিল্লী গিয়ে আকবর বাদসার দরবারে কিছু একটা চাকরী নেব।"

কথাটা আমার মন্দ লাগিল না। আমি তাহার কথায় সম্মতি জানাইলাম। তখন সব দিক ভাবিয়া দেখি নাই, দেখিলে বোধহয় দুজনের কেহই একাজ করিতে সাহসী হইতাম না। যৌবনের হৃদয়-চাঞ্চল্যের সঙ্গে সঙ্গে

উদ্দাম-বাসনায় লোককে অন্ধ করিয়া রাখে; আমরাও তখন অন্ধ। মির বলিল,—"তুমি তা হ'লে ঠিক হ'য়ে থেক। কাল সন্ধ্যাবেলা আমরা যাব। তুমি একটা অসুখের ভাণ ক'রে বিকেল থেকেই ঘরে শুয়ে থেক। খিড়কির দরজার একটু দূরেই আমি একটা গাড়ী মোতায়েন করে রাখব, তারপর একটু অন্ধকার নামলেই তোমার জানলায় গিয়ে ইসারা ক'রব আর তুমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসবে"—বলিয়া চোরের মত সন্তর্পণে সে বাগান হইতে চলিয়া গেল। আমিও চিন্তিত মুখে বাড়ী ফিরিলাম।

সেদিন সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবারও আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল না; নানা চিন্তা। মাতা পার্শ্বে শয়ন করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে নিদ্রা যাইতেছিলেন। আমার মনের মধ্যে কেবলই গুমরিয়া উঠিতেছিল সেই মা'য়ের কথা;—এই মা, এই স্নেহময়ী মাতাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, আর হয় ত' কোন দিন তাঁহাকে দেখিতে পাইব না। কত স্নেহে; কত যত্নে যিনি আপনার কথা একেবারে বিস্মিত হইয়া আমরই সুখের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছেন তাঁহাকেই নিতান্ত অকৃতজ্ঞের মত আমায় ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে.....একটা কথাও বলিতে পাইব না, একটা বিদয়-সম্ভাষণ করিতে পারিব না!......না না কিছুতেই আমি এমন করিয়া মাতাকে ত্যাগ করিতে পারিব না.........কে সে মির, যে আমি অনায়াসে অন্ধের মত তাহার কথায় এমন কার্য্য করিতে যাইতেছি?......কে সে?......কে আমার......?

মাতার কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলাম। কিন্তু ভাল করিয়া কাঁদিবার উপায় ছিলনা, যদি মাতা জাগিয়া উঠেন! বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া অবশেষে স্থির করিলাম; আমি কাল মিরের সহিত যাইব না। সকালেই কোনরূপে মিরকে জানাইব যে এ কার্য্য আমার দ্বারা হইবে না।......আমি কোনমতেই মাতাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিব না।

ভোরের শীতল বাতাসে রোদন-শ্রান্ত আমি কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম জানিনা। সকালে যখন ঘুম ভাঙিল তখন অনেকটা বেলা হইয়া গিয়াছে, মাতা তাহার বহুপূর্ব্বেই উঠিয়া গিয়াছিলেন।

সমস্ত দিনটা উৎকণ্ঠা ও অশান্তির মধ্যে কাটিয়া গিয়াছিল। একবার মিরের সাক্ষৎ পাইয়াছিলাম কিন্তু চেষ্টা করিয়াও আমি তাহাকে আমার সংকল্পের কথা জানাইতে পারি নাই। কি যেন একটা কিসে আমার কণ্ঠ রোধ করিয়াছিল।

সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে চিন্তায় ও উৎকণ্ঠায় সত্য সত্যই আমার মাথা ধরিয়া উঠিল। মাতাকে গিয়া বলিতেই তিনি বলিলেন,—"একটু ঘুমুগে যা, তা হলেই সেরে যাবে; আজ আর না হয় কিছু খেয়ে কাজ নেই।"

আমি একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে মাতার মুখের দিকে চাহিলাম......ও-মুখ হয় ত আর দেখিতে পাইব না! তাহার পর ধীরে ধীরে তাঁহার নির্দ্দেশমত আসিয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

ঝড়ের পূর্ব্বে সাগর যেমন স্তব্ধ গম্ভীর হইয়া থাকে, আমার মন তখন ঠিক সেইরূপই স্তব্ধ হইয়াছিল। শ্রবণেন্দ্রিয় যেন দ্বিগুণতর তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, পত্রের মর্ম্মরটী আমার কানে আসিতেছিল! বাতাসে জানালা নড়িয়া উঠিলে, মির ডাকিতেছে মনে করিয়া আমার বক্ষের স্পন্দন দ্রুততর ও স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল। সমস্ত দেহটার মধ্য দিয়া একটা দৌর্ব্বল্য আপনার প্রতিপত্তি খাটাইতেছিল। এমনি ভয়, দুর্ব্বলতা ও উৎকণ্ঠার মধ্যে আমি সময় কাটাইতেছিলাম; মনে হইতেছিল এক একটা ঘণ্টা একটা যুগ সমই দীর্ঘ! কি বিরক্তিকর সেই প্রতীক্ষা!

অবশেষে নির্দ্ধারিত সময় আসিল। মির. জানালায় আঘাত করিয়া আমায় ইঙ্গিত করিল। আমি উঠিয়া বসিলাম। উত্তেজনায় আমার বক্ষের স্পন্দন. গির্জ্জার মৃত্যু-ডঙ্কার মতই আমার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছিল; দেহের সমস্ত রক্ত উর্দ্ধমুখে ছুটিয়া মাথায় উঠিতেছিল। চক্ষের সমক্ষে একটা অস্পষ্ট আবছায়া আসিয়া দৃষ্টি-শক্তি রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল, আমি ইতস্ততঃ করিতেছিলাম; কিন্তু অধিকক্ষণ তাহা পারিলাম না, কি যেন একটা অদৃশ্য-শক্তি বিপুল বেগে আমায় মিরের দিকে আকর্ষণ করিতেছিল। আমি স্খলিত পদে উঠিলাম; দৌর্ব্বল্য ও উৎকণ্ঠায় আমার পদদ্বয় কাঁপিতেছিল; প্রাচীরগাত্র ধরিয়া অতি সাবধানে খিড়কির দ্বারে উপস্থিত হইলাম। দ্বার খুলিবার জন্য লোহার খিলটা তুলিবামাত্র ঝণ্ ঝণ্ শব্দে সেটা আমার করচ্যুত হইয়া পড়িল। কর্ত্রী-ঠাকুরাণী কি জানি কেন সেই সময় সেই দিকে আসিতেছিলেন, খিল পড়ার শব্দ শুনিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"কে রে?—কে ওখানে?"

আমি লজ্জায় ভয়ে দেওয়ালের সহিত মিশিতে চাহিতেছিলাম, কোন উত্তর দিলাম না। তিনি নিকটে আসিয়া আমায় তদবস্থ দেখিয়া কোন কথা না বলিয়া সরাসর দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

আমি আর তিলমাত্র সেখানে অপেক্ষা না করিয়া আমাদের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে আসিয়া শয়ন করিলাম। বাহ্যজ্ঞান তখন আমার লোপ পাইয়াছিল।

* * * * *

সেইদিন রাত্রেই আমরা মিরের বাটী হইতে বিতাড়িত হইলাম, তাহার পর চেষ্টা করিয়াও মাতা আর কর্ম্ম জুটাইতে পারেন নাই। শেষে বাধ্য হইয়া আমরা মাতাপুত্রীতে মিলিয়া এই ফুলের দোকান করিলাম। মনকষ্টে মাতার শরীর দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। অধিক দিন আর তাঁহাকে ফুল বিক্রয় করিতে হয় নাই।

একাই যখন আমি দোকান চালাইতাম সেই সময় একদিন হঠাৎ মিরের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম। সে তাহার প্রতিজ্ঞা পালন করিতে আসিয়াছিল। ধন্য হইলাম—সে আমাকে ভুলে নাই, সুযোগ হইবামাত্র সে আমার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে। সকল দ্বিধা সকল বাধা কাটিয়া গেল, আমরা অন্তরে বাহিরে এক হইয়া গেলাম, সে আমায় বিবাহ করিল। আমরা দোকান তুলিয়া দিয়াছিলাম।

দশটা বৎসর আমাদের বেশ সুখ-স্বচ্ছন্দেই কোথায়দিয়া কাটিয়া গেল। মির, মোগল-বাদসাহের সেনাদলে পাঁচহাজারীর পদ পাইয়াছিল।

অবশেষে মিরের পিতা মাতার অভিসম্পাত ফলিল। চিতোর অবরোধের জন্য মোগল বাদসাহ আকবরের বিপুল-বাহিনী যাত্রা করিল। মিরকেও যাইতে হইল। সেই গিয়াছে—আজও আমার মির ফেরে নাই, তারা বলে "সে আর ইহজগতে নাই। সৈনিক অতুল শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অমর হইয়াছে,"—কিছুতেই সে কথা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না,—ধারণায় আসে না! মির আমার—প্রিয়তম আমার—সে কি আমায় ছাড়িয়া মহাপ্রস্থান করিতে পারে! সে আসিবে, নিশ্চয় আসিবে, এই ফুলওয়ালী বেশে তাহারই প্রতীক্ষায় যৌবন কাটাইয়া পাইয়াছিলাম তাহাকে। আবারও তাহারি প্রতীক্ষায় তেমনি করিয়া জীবন কাটাইয়া দেব! এপারে—না হয় পারেও কি তাহাকে পাইব না!" সে থামিল, আমি তন্ময় হইয়া তাহার কথা শুনিতে ছিলাম, চমকিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। তাহার আননে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে—ধরা জ্যোৎস্না প্লাবিত।

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাজমহল।

—:*:—

তোমার সকাশে আসি পল্লীকবি হয়ে যায় মূক
কথা নাহি খুঁজে পায়, রহে তাই বন্দন-বিমুখ।
লাবণ্যের মহাসত্রে ফেরে হায় ভুখারী কাঁপর,
শোভার শ্রাবণ-ধারা ঢাকে ক্ষীণ চাতকের স্বর।
হর্ম্ম্য তুমি? না না তাজ, কথা হীন মূর্ত্ত তুমি সুর,
মর্ম্মরে অমর করা প্রণয়ের চুম্বন মধুর।
ফুলধনু হ'তে ঝরা একটী কুসুম নিরমল
প্রেমের পবিত্র স্মৃতি মন্ত্রে বুঝি হলে অচঞ্চল?
বিচ্ছেদে পাথর করা সতীর সে অভিমান লাজ,
যৌবন জমায়ে গড়া অঙ্গ তব ছায়াময়ী তাজ।
বাদসা আকার দিল, মর্ম্মরেতে মণি জহরতে
হাফেজের 'কাসিদায়' ওমারের শ্রেষ্ঠ রুবায়তে।
কিম্বা তুমি সুকঠোর বিরহের রমজানে বাদ্
চন্দ্রকলা এনে দিলে মিলনের ইদের সংবাদ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

ব্রহ্মচর্য্য।

—:*:—

প্রাচীন ভারতের প্রথম ও প্রধান সাধনা ছিল ব্রহ্মচর্য্য। অযুতশতাব্দী পূর্ব্বে একদিন যে হিন্দুর সহস্রকোটি কণ্ঠোচ্চারিত সামসঙ্গীত, প্রবলঝঙ্কারে সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত নিনাদিত করিয়াছিল, একদিন যে তাহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার, বিমল জ্যোস্নায়, দেশদেশান্তর উদ্ভাসিত হইয়াছিল, আজিও যে তাহার অমলধবলা কীর্ত্তি-বৈজয়ন্তী আসাম-আমেরিকা-চীন-জাপান-সিংহল-পুনা-কাবুল-কাশ্মীরে বিরাজমানা, তাহার কারণ—হিন্দু জিতেন্দ্রিয় ছিল। কত শত অত্যাচার অবমাননার কঠোর নিষ্পেষণেও সে যে আপনার অস্তিত্ব লুপ্ত করে নাই, শতশতাব্দীর দাসত্বের গুরুভার বহন করিয়াও যে সে নিজেকে অটুট রাখিয়াছে; কত রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রবল ঝঙ্কার পরেও যে তাহার ক্ষীণ দেহযষ্টি দিগন্তব্যাপী ধ্বংসের মধ্যে আজিও জাগিয়া আছে তাহা সেই পুণ্যশ্লোক ভগবান্ বাল্মীকী-বিশ্বামিত্র-ব্যাস-বৈশম্পায়নাদি-মহামহর্ষিদিগের বহুবর্ষব্যাপী সাধনা ও সংযমের ফল।

যদি হিন্দুর সেই অতীত-গৌরবের দিন আবার ফিরাইয়া আনিতে হয়, যদি এই পরপদলাঞ্ছিত লজ্জিত জাতিকে আবার মহত্বের উচ্চশিখরে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তবে পূর্ব্বাচার্য্যগণের অনুষ্ঠিত পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া ঘরে-ঘরে ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর-সাধনার পুনঃ প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। নান্যঃ পন্থাঃ।

কিন্তু সংসারে বিগতস্পৃহ অনেক মহাপুরুষ সুদীর্ঘ তপস্যায় নিরত থাকিয়াও যে মহাব্রত পালনে অসমর্থ হইতেন, স্বয়ং দেবাদিদেব শঙ্কর যে ব্রত ভঙ্গ করিয়া বিম্বফলাধরোষ্ঠ দর্শনে পরিলুপ্তধৈর্য্য হইয়াছিলেন তাহার সাধনা যে অস্মাদৃশ প্রাকৃত জনের পক্ষে নিতান্ত সুকঠোর—সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

তবে একটা সহজ উপায় আছে—বৈধব্য। সমাজের যে-কোন নেতাকে জিজ্ঞাসা কর "আমার আট, দশ বা বার বৎসরের কন্যা বিধবা হইয়াছে। কিং কর্ত্তব্যং?" উত্তর, "ব্রহ্মচারী কর।" এই অবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য যদি নিতান্ত সুখসাধ্য না হইত তবে কি এই রাগদ্বেষ বর্জ্জিত মহাত্মাগণ সর্ব্বসাধারণের জন্য এই একটীমাত্র ব্যবস্থা এত নিঃসঙ্কোচে দিতে পারিতেন, কখনই না।

বৈধব্য সকলের অদৃষ্টে ঘটে না। এই জন্য কুমারী, সধবা অথবা পুরুষের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য সাধন অপেক্ষাকৃত দুরূহ। কিন্তু তাই বলিয়া পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না।

পুরুষের কথা ছাড়িয়া দিলাম। প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী যুবকগণের মধ্যে পদস্খলন অজ্ঞতা বশতঃই হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে পর পর চারটা বা পাঁচটা বিবাহ করিয়া থাকেন, এবং কেহ কেহ আশীবৎসর বয়সেও দারপরিগ্রহে অভিলাষী হয়েন বটে, কিন্তু এরূপ বিবাহ কখনই দেহ সম্বন্ধে নহে—ইহা সন্তানার্থ, বা সন্তান পালনার্থ বা সন্তানের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার্থ। তৃতীয়তঃ, পুরুষ ব্রহ্মচারী না হইলে ক্ষতি নাই। কারণ, তাঁহারা পুরুষ, তাঁহারা সমাজের নেতা, তাঁহাদের পক্ষে একটু অসংযম কখনই অশোভন হয় না। আরও, এই প্রবন্ধের লেখক স্বয়ং পুরুষ। সধবার পক্ষেও ব্রহ্মচর্য্য অনাবশ্যক। শুধু তাহাই নহে, অনুচিত। কারণ, শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ্যের বিধি। যিনি গার্হস্থ্য অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মচারী হইলে সমাজবন্ধনের শিথিলতা ও শাস্ত্রের অমর্য্যাদা হয়।

কুমারীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য কষ্টসাধ্য। এই জন্য দশবৎসরের পরও কন্যা-অবিবাহিতা থাকিলে পিতামাতার এত উৎপীড়ন। কিন্তু-দৈবক্রমে এই দশমবর্ষীয়া বালিকার যদি পতিবিয়োগ ঘটে, অমনি সব বিপদ কাটিয়া গেল। তাহার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য পালন একেবারে নিঃশ্বাসগ্রহণের মত সহজ হইয়া আসিল।

ধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিলেও, সমাজের দিক হইতেই কি বিধবা-বিবাহের সমর্থন করা যায়?

নেতারা ঠিকই বলেন স্ত্রী যদি আজ জানিতে পারেন যে তাঁহার পুনর্ব্বিবাহে অধিকার আছে তবে কি সমাজে কোন পুরুষ আর জীবিত থাকিবেন? স্ত্রীগণ কি নব-নব পতিলাভের আশায় প্রত্যহ পুরাতন পতিকে খুন করিবেন না? সমাজের পরিচালকগণই যদি নিমঝোলের সহিত morphine খাইয়া বা তাম্রকূটধূম্রের সহিত হাইড্রোসিয়ানিক এসিড পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন তবে আর সমাজের রহিল কি? যদি তর্কের খাতিরে ইহাও মানিয়া লওয়া যায় যে পিনালকোডের ভয়ে কোন কোন স্ত্রী, উক্ত প্রকার দুঃসাহসের কার্য্য করিবেন না, তাহা হইলেও ইহা ত অস্বীকার করা যায় না যে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের প্রবল ইচ্ছার প্রতিকূলতাচরণ করা হীনশক্তি-মানবের পক্ষে অসাধ্য। তিনি যাঁহার অদৃষ্টে বৈধব্য লিখিয়াছেন আমরা কি জোর করিয়া তাঁহাকে সধবা করিতে পারি? জবরদস্তি করিয়া বিধবার বিবাহ দিলেও যে তিনি আবার বিধবা হইবেন না

কে বলিল ? একেই পৃথিবীতে-স্ত্রীর অনুপাতে পুরুষের সংখ্যা অত্যন্ত কম। পার্ব্বতীর বা পর্য্যন্ত একথা স্বীকার করেন।

কেবল ইহাই নহে, সমাজে বিধবার সংখ্যা যে পরিমাণে বাড়িতেছে, পুরুষের সংখ্যা নিশ্চয়ই সেই পরিমাণে কমিতেছে—পুরুষ না মরিলে ত আর স্ত্রী বিধবা হয় না। ইহার উপর যদি প্রত্যেক বিধবা পুনঃ পুনঃ বিবাহদ্বারা পাঁচ, ছয়, বা ততোধিক পতির মৃত্যুর কারণ হন, তাহা হইলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই পুরুষ জাতি "তোতা" পাখীর ন্যায় সেকালের কথায় স্থান পাইবে, এবং তাঁহাদের স্থানে কতকগুলা অনূঢ়া কন্যার.পাল, দেশে একটা ঘোর অকল্যাণের সৃষ্টি করিবে। যদি সকলেই কুলীন হইতেন তাহা হইলে ঘরে ঘরে চিরকুমারী রাখা দোষাবহ হইত না। কিন্তু প্রকৃত কুলীন কয়জন আছেন ? যে দেশে কোটি কোটি নারী জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া পতির সহগামিনী হইয়াছেন. যে দেশে ইতিহাসের প্রতি ছত্র, সাবিত্রী. সীতা, দময়ন্তী, মৈত্রেয়ী, গার্গী, খনা প্রভৃতি—আদর্শ-রমণী-গণের সতীত্বের-উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে দীপ্ত, যে দেশের প্রতিধূলিকণা সতীর পবিত্র অস্থিসংস্পর্শে পূত, সে দেশের এমন অধঃপতন কেন হইল ? সহমরণ ত উঠিয়া গিয়াছে, পুলিশের ভয়ে। ব্রহ্মচর্য্য,—তাহাও যাইতে বসিয়াছে অশক্তি বশতঃ—নহে অনিচ্ছা বশতঃ। সাধুকার্য্যে-এরূপ অপ্রবৃত্তির কারণ আর কিছুই নহে, সুশিক্ষার, অভাব।

কিছুদিন হইতে স্ত্রীশিক্ষা লইয়া দেশে যথেষ্ট আস্ফালন দেখা যাইতেছে। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার প্রতি কয়জন মনোযোগী হইয়াছেন ! রোগ নির্দ্ধারিত হইবার পূর্ব্বে চিকিৎসার, চেষ্টা বিড়ম্বনামাত্র। মানসিক রোগ ও তাহার প্রতীকার সম্বন্ধেও এই নিয়ম। অতএব স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পূর্ব্বে দেখিতে হইবে স্ত্রীর স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা কি ?

১। শিক্ষা বলিলে, অনেকে পুঁথিগত বিদ্যাকেই বুঝিয়া থাকেন। ইহা একটী কুসংস্কার। বিদ্যালাভ যে বৈধব্যের অব্যবহিত কারণ তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই। উহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু শাস্ত্র হইতে স্ত্রীচরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহা হইতে বেশ প্রতীয়মান হয় যে লিখিতে ও পড়িতে জানিলে যুবতিগণ পরপুরুষকে প্রেমপত্র লিখিবেন। ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। চাকুরীর সহায়তা করিবে বলিয়াই লোকে গ্রন্থাদি হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। স্ত্রীর পক্ষে এরূপ শিক্ষার কোনও সার্থকতা দেখি না। বালকগণ বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করুন, পড়া বলিতে না পারিলে বেঞ্চের উপর দাড়াইয়া থাকুন ; পান, চুরুট খাইয়া বা অতিরিক্ত বাবুয়ানী করিয়া, পিতৃ ও মাতৃ-পক্ষীয় অভিভাবকগণের নিকট লাঞ্ছিত হউন, রাত্রি জাগিয়া পড়া মুখস্থ করিয়া ভাল ভাল পাশ করুন ও পরে বিবাহ করিয়া পিতার পকেট এবং চাকুরী করিয়া স্ত্রীর দেহ সোণা রূপায় উজ্জ্বল করিয়া তুলুন। আর বালিকারা বেলা আটটার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া, একটী বা দুইটী পান এবং আবশ্যক হইলে তাহার সহিত অল্প পরিমাণে দোক্তা, চর্ব্বণ করিতে করিতে পাকশালে গমন করুন, সেখানে তরকারী কুটিয়া বা থালী ধুইয়া মাতাকে সাহায্য করুন, কর্ত্তাদের জন্য পান সাজুন, তারপর দুটী আহার করিয়া একটু বিশ্রাম করুন, তিন চার ঘণ্টা নিদ্রার পর উঠিয়া বিবাহিতা ও অবিবাহিতা সখীদের সহিত কিছুক্ষণ রসালাপ করুন, বৈকালে উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া সমবয়স্কাদিগের সহিত খেলা করুন, তারপর তাহাদের সহিত ঝগড়া করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিয়া আসুন, এবং তৎক্ষণাৎ বা যেদিন কাঁদিবার সুযোগ হইবে না সে দিন, দিদিমার গল্প শুনিতে শুনিতে—ঘুমাইয়া পড়ুন, পরে রাত্রে অনেক কাঁদাকাটি ও ঝগড়াঝাটির পর দুটী অন্ন উদরসাৎ করিয়া আবার শয্যা গ্রহণ করুন। এইরূপে গৃহকর্ম্মে যথেষ্ট দক্ষতা লাভ করিবার পর কুমারীগণ আট বৎসর বয়স হইতে ব্রতাদি পালন ও শিবপূজা দ্বারা উত্তম পতির কামনা করিতে থাকুন।

২। সঙ্গীত, হাস্য, সশব্দে বাক্যালাপ প্রভৃতি সকল প্রকার নির্লজ্জ ব্যবহার তিনি সযত্নে পরিহার করিবেন। যদি কোন প্রতিবাসিনীর কোন বিশেষ আত্মীয়ের প্রতি বুভুক্ষা থাকে, তবে. পুরুষগণের অসাক্ষাতে যথাসম্ভব

উচ্চকণ্ঠে সে কথা প্রকাশ করা যাইতে পারে। নৃত্যগীতাদিতে রুচি থাকিলে, প্রিয়সখীর বিবাহবাসরে অজ্ঞাত কুলশীল নূতন জামাইএর সমক্ষে তাহার চর্চ্চা করিলে ক্ষতি নাই। কিন্তু আপন গৃহে বসিয়া সঙ্গীতাদি গণিকারাই করিয়া থাকে—সুতরাং তাহা বর্জ্জনীয়।

লজ্জাই নারীর ভূষণ কিন্তু তথাকথিত শিক্ষার প্রভাবে ঘরের পর্দ্দা উঠিয়া গিয়াছে। মুখের পর্দ্দাও অনেকের নিকট অসহ্য হইয়াছে।

একটু চিন্তা করিলে বা দু একখানা নভেল নাটক পড়িলেই দেখা যাইবে, এরূপ স্বাধীনতার ফলে স্ত্রীগণ আর গৃহকর্ম্ম করিতে চাহিবেন না। তাঁহারাই আফিস-কাছারি করিবেন, আড্ডায় বসিয়া পাশা খেলিবেন, আর সপ্তাহে তিন বার রঙ্গালয়ে সিগারেট টানিয়া টানিয়া রাত কাটাইয়া দিবেন। পুরুষ দিগকেই ঘরে থাকিয়া কাপড় কাচা, বাসন মাজা, রন্ধন ও সন্তান পালন করিতে হইবে; এবং তরকারীতে নুন একটু বেশী বা পানে চুণ একটু কম হইলে স্ত্রীর পদাঘাত সহ্য করিতে হইবে। এক কথায় আমরা এখন তাঁহাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করি তাঁহারাও আমাদের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিতে থাকিবেন। কিন্তু স্ত্রী দেবী। তাঁহার পক্ষে যাহা সমুচিত আমাদের কাছে সে ব্যবহার অত্যাচারের নামান্তর মাত্র। অতএব হে অন্ধ ভারত সন্তান, যদি আপনার হিতকামনা কর, এখনও সাবধান হও, এখনও সুন্দরীদিগকে পর্দ্দার আড়ালে টানিয়া আন।

৩। ধর্ম্মপ্রবণতাই হিন্দুর বিশেষত্ব। তাহার শয়ন ভোজন গমন মননাদি সমস্ত কর্ম্মই ধর্ম্মের সহিত নিবিড় ভাবে সংশ্লিষ্ট। এই ধর্ম্মের সাহায্যে তাহার দেশে, শান্তি, সমাজে, শৃঙ্খলা, গৃহে, স্বচ্ছলতা, কর্ম্মক্ষেত্রে বেতন বৃদ্ধি ও আদালতে জয়লাভ হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে পুরুষগণ চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে পারেন না। কাজেই অধর্ম্মরূপ মহা অনর্থ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার ভার কুললক্ষ্মীগণের উপরেই ন্যস্ত হইতেছে। এই হেতু, উত্তরশিয়রে শয়ন, চর্ব্বিমিশ্রিত সাবান ব্যবহার, সোডাওয়াটার পান, নোক না বলিয়া লোক বলা বা থার্মনি না বলিয়া থার্মমেটার বলা, শিবরাত্রির দিন জলগ্রহণ করা, ইত্যাদি সকল রকম নাস্তিকতা হইতে তাঁহারা আপনাদিগকে প্রবল ভাবে রক্ষা করিবেন।

৪। পূজার্চ্চনাদি ধর্ম্মের অঙ্গ বটে। কিন্তু সকলের জন্য নহে। সাধ্বী স্ত্রীর পতিই ধর্ম্ম, পতিই তীর্থ, পতিই পরমগুরু এবং পতিই পরমদেবতা। অতএব কন্যাকাবস্থানুষ্ঠিত শিবপূজাদি জলাঞ্জলি দিয়া তিনি স্বামীর মনোরঞ্জনে যত্নপর হইবেন—অবশ্য দিনের বেলা নহে। রাত্রে সকল ঘরে বাতি নিভিবার পূর্ব্বে তিনি স্বামীর দৃষ্টির সীমা হইতে দূরে থাকিবেন, এবং শুধু চারগাছি মলের সাহায্যে আপনার অস্তিত্ব ঘোষণা করিবেন। মনু বলিয়াছেন "স্ত্রী পুরুষের সাক্ষাৎকার ঘৃত ও বহ্নির মিলনের ন্যায় বিপদসঙ্কুল।" তাই তিনি যুবাকে, মাতা বা ভগিনীর সহিত ও অধিকক্ষণ একত্র থাকিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে স্ত্রী যদি যখন-তখন স্বামীর সহিত দেখা করেন বা তাহার খেলাধূলা, পড়াশুনা বা আশা-আনন্দে যোগদান করেন তবে উভয়েরই অনিষ্টের কথা—'আত্মসুখার্থ স্ত্রীকে সহচরী করিব' এ আদর্শ তাহার নহে। তাহার মনে "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা।"

৫। পতির সেবা করিয়া যে সময় অবশিষ্ট থাকিবে তাহা নিদ্রা, তাসখেলা, চুলের উপর আলবাট তোলা বা লতা কাটা, টিপ পরা, পরচর্চ্চা, কড়িবরগা গণনা করা প্রভৃতিতে যাপন করাই বিধি। পূজাপার্ব্বণে, সুবিধা মত, দিবাভাগে—কালিঘাট ও রাত্রে—থিয়াটার দর্শন করা যাইতে পারে। সন্তান পালন সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। কারণ এ বিষয়ে তাঁহাদের অশিক্ষিত-পটুত্ব চিরপ্রসিদ্ধ।

হিন্দুললনার সনাতন শিক্ষাপদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। এইবার বিধবাকে ব্রহ্মচর্য্যের পথে অটল রাখিবার জন্য নিম্নলিখিত কয়টী উপদেশ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

১। তাঁহাকে দেবসেবায় ব্রতী কর। যে দেবতা এই পবিত্র বৈধব্য দিয়া তাঁহাকে দেবীত্বে অভিষিক্ত করিয়াছেন তাঁহার প্রতি ভক্তি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং তিনি যে আজ্ঞামাত্র "তুলসী, অশ্বথ, বেল, বট, পাথর" প্রভৃতি যে কোন একটা বিগ্রহে আত্ম-সমর্পণ করিবেন ইহা নিঃসন্দেহ।

২। তাঁহাকে গৃহকর্ম্মে নিয়োজিত রাখ। তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া কর্ত্তা-কর্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া দাস-দাসী পর্য্যন্ত সকলকে আহার করাইবেন, গৃহের সীমন্তিনীদিগের চুল বাঁধিয়া দিবেন, তাঁহাদের পুত্রকন্যাগুলিকে সাজাইয়া দিবেন, পিতা, ভ্রাতা, বা শ্বশুর, সেবকাদির ঘর পরিষ্কার রাখিবেন, যত্ন করিয়া তাঁহাদের শয্যা পাতিয়া দিবেন, এবং তাঁহারা স্ব স্ব স্ত্রী লইয়া আপন আপন ঘরে অর্গল আঁটিবার পর একখানি কম্বল লইয়া বারাণ্ডায় বা ভাঁড়ার ঘরে শয়ন করিবেন এবং ভূতযোনিপ্রাপ্ত পতির পদযুগল ধ্যান করিতে করিতে নিদ্রিত হইবেন। তিনি একাকিনী আছেন বলিয়া কাহারও উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই। যেহেতু শাস্ত্রেই আছে "আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতা।"

৩। খাইতে দিও না। যক্ষ্মারোগী এই কারণে জিতেন্দ্রিয়। বিধবা, মাসের মধ্যে যে কয়দিন উপবাস করিবেন সে কয়দিনই লাভ। তবে গৃহস্বামীর লাভ তাঁহার মত পারত্রিক নহে।

৪। তাঁহাকে থান কাপড় পরিতে দিও। অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ পতিই যখন বস্ত্রক্রয়কালে গৃহিনীর মনের মত পাড় বাছিতে পারেন না, তখন পতিহীনার জন্য কে পাড় পছন্দ করিবে? তাঁহাদের চুলগুলা ছাঁটিয়া দাও। সঙ্গে সঙ্গে নাকটাও কাটিতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু আপাততঃ এ-প্রথা প্রচলনের কোনও সুবিধা দেখিতেছি না।

৫। অলঙ্কার পরিতে দিও না। কেন তাহা বলিতেছি?—এ পর্য্যন্ত যুক্তিহীন কথা একটাও বলি নাই। এখনও বলিব না। ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলকর্ত্তৃক পরিচালিত একখানি কাগজে কিছুদিন পূর্ব্বে একটী গভীর তত্ত্ব প্রকশিত হইয়াছিল। তাহা এইরূপ:—"স্বর্ণের ভিতর একজাতীয় তাড়িত আছে, যাহা দেহের সহিত মিশ্রিত হইলে ইন্দ্রিয়গণকে অতিরিক্ত মাত্রায় উত্তেজিত করিয়া তুলে।" যাঁহারা বিধবা নহেন তাঁহাদের ইন্দ্রিয়কে অনুক্ষণ অতিরিক্ত মাত্রায় উত্তেজিত না রাখা মহাপাপ। এইজন্য পাঁচ মাসের শিশু হইতে ১০৫ বৎসরের বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সকলকে সর্ব্বদা স্বর্ণালঙ্কারে মণ্ডিত রাখা কর্ত্তব্য—যদি তাঁহারা বিধবা না হন। কিন্তু বিধবাকে?—সর্ব্বনাশ! তাঁহাকে যে জিতেন্দ্রিয় করিতে হইবে।

ধন্য তাড়িত শক্তি! তুমি না থাকিলে এই ম্লেচ্ছ-সংস্পর্শ-কলুষিত, মোহান্ধতমিস্রাবিজড়িত দেশে হিন্দুধর্ম্মের মহত্ব কে বুঝিত?

যদি বল "উত্তেজক তাড়িত, স্বর্ণেই আছে, স্বর্ণেতর পদার্থে নাই। অতএব বিধবাকে শাঁখা পরাইব," তবে—তবে উচ্ছন্ন যাও।

শ্রীমনবিহারী মুখোপাধ্যায়।

কুমুদের ব্যথা।

আলোকের পালে দিনের তরণী চলে যায় যবে ধীরে
আকাশ-গঙ্গা কনকোপকূলে অস্তপুরীর তীরে—
　　ক্লান্ত-কণ্ঠ যবে বিহঙ্গ ফিরে
　　বিহগীরে ডাকি আপন নিভৃত নীড়ে
　　শব্দ যখন স্তব্ধ হইয়া মাগে
　　　নিবিড়-নীরব কোল
কে মোরে তখন কাণে কাণে কয়—"এইবার আঁখি খোল্।"

আমার চাহনি ছেয়ে ফেলে সব আঁধার কালিম করি,
তাড়াতাড়ি ফিরে তরুণীরা ঘরে সাঁঝ সারা-জল ভরি—
　　ব্যস্ত বধূর কঙ্কণ-সঙ্কেতে
　　প্রিয় পরিতোষী-কর-জল-ভঙ্গেতে
　　ঠেলা দিয়া গা'য় ক'য়ে যায় কাণে কাণে
　　　"এইবার আঁখি মেল"
রজনীটি যেন বিফলে না যায়, দিন তো বৃথাই গেল।"

নিভে আসে দীপ, থেমে যায় গীত, আরতি, পথের কায,
গৃহের কণ্ঠ ক্ষীণ হ'তে হ'তে ঢুলে পড়ে গৃহ-মাঝ
　　খণে খণে বায়ু দীর্ঘ নিশ্বাসে ছুটে
　　বন-মর্ম্মের মর্ম্মর-ব্যথা ফুটে
　　পুলিন নিম্ব জম্বু শাখায় পাখী
　　　ডেকে ওঠে বার বার—
"ও-কি-ও—ও-কি-ও দেখ' প্রেম-সাধ গুণহীনা কুরূপার।"

জানি আমি কত ছোট, তাই নীচ পঙ্কে পড়িয়া রই
সবার আড়ালে আঁধারে ফুটিয়া, চিত্ত-বেদনা বই।
দিনের কুসুম ফুটে হয়ে যায় ধূলা
কমল-ভগিনী প্রমোদ পর্য্যাকুলা
প্রিয়োত্তরীর প্রান্তে শিথান রচে
মিলন-মুদিত আঁখি।
জ্বলে' পুড়ে' মরে' সারাদিন আমি, সারানিশি জেগে থাকি।

বিশ্ব মাঝারে আমি রে অভাগী—
রূপ গুণ কিছু নাই
আলোকে ও-লোক মাঝে, চোখ মেলি
চাহিতে নারি গো তাই।
পথ চেয়ে তাঁর এমনি জীবন ভো'র
কত না জনম কেটে গেল ওগো মোর!
আর কত দিনে হবে তবে দয়া তোর?

* * * *

হবে জানি নিশ্চয়,
নহিলে দাঁড়াব গলা জলে' কেন—
একটু বৈ ত' নয়?

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

চিরকুমারের ব্রতরক্ষা।

(১)

অতুলকৃষ্ণ রায়, ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে দিন রীতিমত ডাক্তার হইয়া বাড়ীতে আসিয়া বসিল, তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল—সে চিরকুমার থাকিয়া দেশের উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করিবে। নূতন উৎসাহে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিল। দরজার পাশে দেওয়ালে ইংরাজীতে—"ডাক্তার অতুল কৃষ্ণরায় এম. বি." খোদিত হইয়া মার্ব্বেল পাথর শোভা পাইল। বাহিরের বৈটকখানা-ঘরটা বড়-বড় আলমারীভরা শিশি-বোতলে বোঝাই হইয়া উঠিল। রাশি রাশি ডাক্তারী বই আলমারী সেল্ফ-টেবেলে বোঝাই হইয়া তাহার আসবাব ও বিদ্যাবত্তার উভয়েরই পরিচয় দিতে লাগিল। কিন্তু মাতা নাছোড়বান্দা; তিনি ধরিয়া বসিলেন "এইবারে বিয়ে কর্, চিরকাল কি মায়ের আঁচল ধরে থাকলে চলে, আমি আর ক'দিন—বৌয়ের মুখ দেখে যাই।" কিন্তু পুত্রের ধনুক ভাঙ্গা পণ, কিছুতেই টলিল না। একটুখানি হাসিয়া কহিল "বেশ আছি মা, আবার কেন ডেকে আপদ ঘরে আনা।" পুত্রের কথায় মাতার হৃদয়ের স্নেহ যেন উথলিয়া উঠিল। মৃদু হাসিয়া কহিলেন "শোন কথা! বালাই, আপদ হ'তে যাবে কেন, বিয়ে ত সবাই করে, তা বলে কি—সকলের মা, পর হয়ে যায়? সে ভয় নাই—তুই বিয়ে—কর্।" অতুল আবার হাসিয়া কহিল "তুমি বোঝ না মা, এই মাতাপুত্রের সংসারে—মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান দেবার দরকার কি?" পুত্রের নির্ভরতায় মাতার অন্তরের আনন্দ যেন মুখেচোখে ছড়াইয়া পড়িতে চাহিতেছিল, কিন্তু তিনি তাহা বাহিরে প্রকাশ হইতে দিলেন না। সহসা তাঁহার মুখখানা ভার হইয়া উঠিল। "তুমি ত বোঝ না বাপু আমারও ত সাধশ্রদ্ধা আছে! লোকে বলে..." কি বলিতে বলিতে চোখের জলে স্বর কম্পিত হইয়া উঠিল। অতুল, বুঝিল মাতা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি যখন সন্তুষ্ট থাকেন, তখন পুত্রকে "তুই" বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন, ক্রোধের কোনও কারণ ঘটিলেই "তুমি" বলিয়া সম্বোধন করেন। এ সময় কোন কথা বলিলে হয় ত মাতার অন্তরে ব্যথা লাগিতে পারে, ভাবিয়া সে নিঃশব্দে উঠিয়া গেল। মাতা, পুত্রকে চিনিতেন, বুঝিলেন পৃথিবী লয় হইবে তবু ছেলের গোঁ দূর হইবে না।

পাশের বাড়ীর প্রকাশ মুখুজ্যের সহিত অতুলের খুব বন্ধুত্ব ছিল। মা, একদিন প্রকাশকে ডাকিয়া আপনার অন্তরের বেদনা একে একে সমস্ত জানাইলেন। তাঁহার দুইটি চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। মৃদু হাসিয়া প্রকাশ কহিল "কোন চিন্তা নাই মাসী মা, সব শুধ্‌রে যাবে এখন।" প্রকাশের সান্ত্বনাবাক্যে মাতা একটু আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন "দেখিস্ বাবা, তোর উপরে সব ভার রৈল।" প্রকাশ, স্বর একটু মৃদু করিয়া, একবার এদিক-ওদিক দেখিয়া কহিল "ওকে বেশী তাড়া দিওনা মাসি মা, আমি সব ঠিক্ করে দেব এখন।" মাতার মুখখানি হর্ষোজ্জল হইয়া উঠিল, ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "তবে আমি নিশ্চিন্ত রইলুম বাবা।" "হ্যাঁ—সে কথা আর বল্‌তে হবে না।" বলিয়া প্রকাশ বিদায় লইল।

একমাত্র পুত্র অতুলকে দশ বৎসরের লইয়া মাতা আনন্দময়ী বিধবা হইয়াছিলেন। স্বামীর সংসারে অর্থ সচ্ছলতা থাকায় সে ভাবনা তাঁহাকে কোন দিনই ভাবিতে হয় নাই বটে, কিন্তু তাঁহার সমস্ত হৃদয়টা জুড়িয়া পুত্রের মঙ্গল চিন্তা সর্ব্বদাই জাগিয়াছিল। মায়ের এক সন্তান যে কি, সে শুধু মায়ের অন্তরই অনুভব করিতে পারে, তাহার উপর অতুল পিতৃহীন! তবু তিনি পুত্রকে অত্যধিক আদর দিয়া, বা তাহাকে কোন অন্যায় কার্য্যে প্রশ্রয় দান করিয়া, তাহার পরকালের পথ অপরিষ্কার করিয়া রাখেন নাই। পিতামাতার স্নেহ ও শাসন দিয়া, আপনার মনের মত করিয়া, পুত্রের প্রকৃতি গঠন করিবার জন্য তিনি প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন। হইয়াছিলও তাই, লোকে যেরূপ সুসন্তান লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকে—অতুল সে-সকল বিষয়ে মাতার বাসনা পূর্ণ করিয়া ছিল। কেবল এই একটা বিষয়ে সে মায়ের অবাধ্য ছিল। পুত্রের শিক্ষা সম্বন্ধে পাছে বাধা পড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় তিনিও বড় একটা বিবাহের জন্য জেদ করিতেন না। কিন্তু লোকে এ জন্য তাঁহার নিন্দা করিতে ছাড়িত না। তখন বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন চলিলেও স্থানে স্থানে সে প্রথা প্রচলিত ছিল। সে কালের প্রথায় অতুলের বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু তিনি পুত্রের শিক্ষার আছিলায় সকলের মুখ বন্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। সে বাসনা তাঁহার পূর্ণ হইয়াছে। আর সে অছিলা খাটিবে না। এখন পুত্রের বিবাহ না দিলে লোকে বলিবে কি! আর তাঁহারও ত একটা জীবনের সাধ আছে। পুত্রের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূর ও পৌত্রের মুখ দেখিবার সাধ কোন্ মাতার হৃদয়ে না জাগিয়া থাকে। তা ছাড়া তিনি ত চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবেন না, পুত্রকে সংসারী দেখিয়া যাইবার বাসনা প্রবলভাবে তাঁহার হৃদয়টাকে অধিকার করিয়া বসিল। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, পুত্রকে কোন মতে বশে আনিতে পারিলেন না। অগত্যা প্রকাশের সহিত যুক্তি স্থির করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন। সেই দিন হইতে পুত্রের নিকটে বিবাহের কথা আর ওষ্ঠাগ্রেও আনিতেন না।

(২)

প্রকাশদের বাড়ীর পাশেই নীলরতন মিত্রের বাড়ী। নীলরতন বাবুর কন্যা লিলির সহিত প্রকাশের পত্নী নিভার খুব ভাব, সর্ব্বদাই যাওয়া আসা চলিত। নব্য প্রথানুসারে নীলরতন বাবু বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন! কাজেই বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও লিলি এখনও অবিবাহিতা। লিলি সুন্দরী, সে রূপে মোহ আসিত। একবার দেখিলে আবার দেখিবার বাসনা হইত। সে রূপের প্রভায় যুবক অতুল মুগ্ধ হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? তাহার বিবাহের অনিচ্ছার মূলে কি ছিল—কে জানে।

অতুল বাহিরের বারাণ্ডায় একখানা ইজি-চেয়ারে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় একখানা ডাক্তারী কেতাব লইয়া পাঠের জন্য প্রস্তুত হইত—ঠিক্ সেই সময় লিলি প্রত্যহই ফিটিংএ চড়িয়া সান্ধ্য বায়ু সেবনের জন্য বাহির হইত। সে নিত্য ঘটনা,—অতি সাধারণ ঘটনা, তাহার মধ্য দিয়া সে কবে কেমন করিয়া অতুলের অন্তরে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, বলা কঠিন। প্রকৃতির পরিশোধ! যতই সে তাহাকে মন হইতে দূরে ঠেলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিত, অবাধ্য মনটাকে কিছুতেই বশে আনিতে না পারিয়া, ততই সে নিজের প্রতি বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। তবুও বহু দূরের একটা কিছু—নিতান্ত কাছে করিয়া লইবার জন্য একাগ্র বাসনা সর্ব্বদাই তাহার অন্তরের নিভৃত প্রদেশে জাগিয়া উঠিতেছিল। সে তাহাকে অন্তরের মধ্যেই চাপা দিয়া রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা

করিলেও তাহার এই ভাবান্তর প্রকাশের চক্ষুকে এড়াইতে পারিল না। এই সময়ে তাহার নিকটে কেহ বিবাহের নাম উল্লেখ করিলে সে চটিয়া উঠিত।

সূর্য্যের শেষ রক্ত আভাটুকু তখনও সন্ধ্যার শ্যামাঞ্চলে ঢাকিয়া ফেলে নাই। অতুল, প্রতিদিনের অভ্যাসমত সে দিনও সেই স্থানে বসিয়া যেন কাহার অপেক্ষায় ঘন ঘন রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। কৈ—সে ত আর আসিল না। সে আর একবার ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল। নাঃ, সময় অতীত হইয়া গেছে। ঐ বুঝি গাড়ীর গড়্ গড়্ শব্দ শুনা যাইতেছে—না? সে আবার আগ্রহ-দৃষ্টিতে পথের পানে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু সে যাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে সে আজ আসিল না। নিদারুণ হতাশায় ব্যথিত-বক্ষ দুই হস্তে চাপিয়া সে শয্যাতলে লুটাইয়া পড়িল। একটুক্ষণ পরে উঠিয়া একখানা বই লইয়া পাঠে মনোযোগ দিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিল। নাঃ, তাহাও ভাল লাগিল না। আনমনে সে বাহির হইয়া প্রকাশের বাড়ীর দিকে ধীর-পদে চলিতে লাগিল। ভ্রান্ত-আশায় মুগ্ধ হইয়া প্রকাশের বাড়ীর দ্বারে আসিয়া থামিল। সচকিত নেত্রে একবার চারিদিকে দেখিয়া লইল —পাছে কেহ দেখিয়া ফেলে! হঠাৎ তাহার চৈতন্য হইল—সে করিতেছে কি? সেই না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল বিবাহ করিবে না, মায়ের সহস্র স্নেহ অনুযোগ, বন্ধুর শত অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া—সেই না নিজের জেদ বজায় রাখিয়াছিল। অনুশোচনায় তাহার হৃদয়ে যেন শত বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা অনুভব করিল। এই জন্য সে মায়ের মনে কতই না দুঃখ দিয়াছে, বন্ধুর বিরাগের ভাজন হইয়াছে। অনুতপ্ত হৃদয় লইয়া সে তাড়াতাড়ি প্রকাশের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে আজ অসময়ে আসিতে দেখিয়া, প্রকাশ, আশ্চর্য্য হইয়া কহিল "কি অতুল যে।" অতুল দেখিল—একটা ত কিছু বলা চাই, নইলে প্রকাশ কি মনে করিবে। একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল "যে গরম, তাই ভাবলুম একটু বেড়িয়ে আসি।" প্রকাশ ঈষৎ হাসিয়া নিভাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—"ও গো—দেখ ত আজ কোন্ দিকে চাঁদ উঠেচে!" নিভা, বাহিরে আসিয়াই অতুলকে দেখিয়া, এক হাত ঘোমটায় মুখখানা ঢাকিয়া ছুটিয়া পলাইল। অতুল, ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল "এই জন্যই ত আস্তে ইচ্ছা হয় না, বৌদির ঐ একহাত ঘোমটার ব্যবধান কি কোনকালেও ঘুচবে না?" প্রকাশ মৃদু হাসিয়া ধীর স্বরে কহিল "তোর বৌদি কি বলে জানিস?" জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রকাশের মুখের পানে চাহিয়া অতুল কহিল "কি?" প্রকাশ একবার দ্বারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, বলে "লক্ষ্মীহীন ঠাকুরটির পাশে যে-দিন লক্ষ্মীঠাকরুণ এসে দাঁড়াবে—সে দিন আপনা হ'তেই ওই ঘোমটার ব্যবধানটা সরে যাবে।"

আজ আর অতুল চটিল না, মনে মনে লজ্জিত হইয়া কহিল "কেন ভাই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও-কথা বলে আমাকে কষ্ট দেওয়া।" মনে মনে হাসিয়া প্রকাশ কহিল "আচ্ছা আর বলবনা ভাই, তুমি বোস।" অতুল বসিল! কিন্তু যে একটা দুর্ভাবনা তাহার অন্তরের অন্তরতম গহ্বর হইতে অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিয়া তাহার সর্ব্ববিধ দ্বিধা-সঙ্কোচ সজোরে ছিনিয়া লইয়া এই পথটাতে তাহাকে ঠেলিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে—সে কথাটার কোনই মীমাংসা ত এখানে হইবার সম্ভাবনা নাই! তবে সে কি আশায় বসিয়া থাকিবে। অল্পক্ষণ পরে সে ক্ষুণ্ণ মনে উঠিয়া গেল। প্রকাশ, তাহা লক্ষ্য করিয়া নিভার মুখের পানে চাহিয়া ঈষৎ হাসিল।

অতুল, বাড়ী ফিরিয়া একবারে শয়নকক্ষে যাইয়া শয্যায় শয়ন করিল। মাতা আহারের জন্য অনুরোধ করিলে—"ক্ষিদে নাই" বলিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিল। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও নিদ্রা আসিল না, চক্ষুদুইটি মুদ্রিত করিয়া বৃথা চেষ্টা করিতেছিল।

লিলির ছোট ভাই রাজেন আসিয়া ডাকিল "ডাক্তার বাবু একবার দরজাটা খুলুন ত।" সবেমাত্র তাহার চোখে তন্দ্রা আসিয়াছে। রাজেনের ডাক শুনিয়া সে ধড়মড়িয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল। নিদ্রালসজড়িত ভাব তখনও সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় নাই, শয্যা ছাড়িয়া অতুল, তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে রাজেন ?" ভীত ব্যকুলিত কণ্ঠে রাজেন কহিল "দিদির বড় ব্যারাম, আপনাকে ডাকছেন।" তাহাকে—দ্বিতীয় বাক্যের অবসর না দিয়াই অতুল, রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। রাস্তার মাঝখানে অতুলের দৃষ্টি পড়িল "যাঃ জুতাটা নিতে ভুলেগেছি যে।" আপনার কার্য্যে মনে মনে লজ্জিত হইল। কিন্তু তখন আর ফিরিয়া যাইবার কোনও উপায় না দেখিয়া রাজেনের সহিত তাহাদের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

নীলরতন বাবু তাহাকে সঙ্গে লইয়া লিলির কক্ষদ্বারে আসিতেই, মুহূর্ত্তের জন্য অতুলের বুকটা একবার কম্পিত হইয়া উঠিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। একখানা পাতলা চাদরে লিলির সর্ব্বাঙ্গ আবৃত। ক্ষণকালের জন্য সে এমনি অভিভূত—অভদ্র ভাবে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল যে, তাহার তাৎকালীক কর্ত্তব্যের কথা মনেই রহিল না। সে বিহ্বলতা ঘুচিয়া গেলে—লজ্জিত ভাবে মস্তক নত করিয়া, নাড়ী-পরীক্ষার জন্য অগ্রসর হইয়া লিলির হাতখানি নিজের হস্তের মধ্যে তুলিয়া লইতেই আবার তাহার বক্ষের রক্ত যেন অশান্ত হইয়া উঠিল। অল্পক্ষণ পরে আত্মসম্বরণ করিয়া তাড়াতাড়ি যাহা হউক একটা প্রেস্‌ক্রপশন লিখিয়া দিল। লিলির কি যে ব্যারাম তাহা সে ভাল বুঝিতে পারিল না, সব যেন ওলট-পালট হইয়া গেল। দ্রুত পদে সে কক্ষের বাহির হইয়া একবারে বড়ীতে আসিয়া হাঁপ্ ছাড়িল—এমন বিপদেও মানুষ পড়ে? এই বিপদের মধ্যেও--কি-একটা মোহে পড়িয়া তাহার স্বাধীন প্রাণটা আজ আবার নূতন করিয়া দৃঢ়ভাবে বাঁধা পড়িয়া গেল। সে তাহা ভালরূপ বুঝিতে না পারিলেও হৃদয়টা সে শূন্য করিয়া গৃহে ফিরিয়াছে—তাহা সে ভালরূপেই অনুভব করিতে পারিল। প্রাণটা আছাড়ি-বিছাড়ি করিতেছিল, বিবেক যেন খোঁচা দিতেছিল—সে কর্ত্তব্য-পালন করিতে পারে নাই, ডাক্তার রোগ না বুঝিয়া প্রেস্‌ক্রপশন করিয়াছে—তাহার পরিণাম কি—তাহাতে ধর্ম্ম যাহাই বলুক—পাছে ও প্রেস্‌ক্রপশনে তার অনিষ্ট হইবে না।

(৩)

"মাসিমা"

"কে প্রকাশ, আয় বাবা, ঘরে আয়।" বলিয়া আহ্বান করিয়া আনন্দময়ী, তাড়াতাড়ি একখানা মাদুর পাতিয়া দিলেন। প্রকাশ বসিয়াই একটা আরামের নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল। "অতুল কোথা মাসিমা?" বিস্মিত হইয়া আনন্দময়ী কহিলেন "আঃ আমার কপাল, তোর সঙ্গে দেখা হয়নি বুঝি? বাইরের ঘরেই ত আছে সে, ডেকে দিব কি?" প্রকাশ কহিল "নাঃ—তার দরকার নাই, তা হলে সে নিশ্চিন্তে আছে! যাক্, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি মাসিমা।" জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মাতা, প্রকাশের মুখের পানে চাহিলেন, কোন কথা বলিলেন না। অতুল আপনা হইতেই আবার কহিল "আচ্ছা মাসিমা, নীলরতন বাবুর মেয়ের সঙ্গে অতুলের বিয়ে হলে কেমন হয়?" মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কথা কেন বাবা?" মৃদু হাসিয়া প্রকাশ কহিল "তাতে তোমার কিছু বাধা হ'তে পারে কি?" সমস্ত বুঝিয়া তিনি কহিলেন "ওঁরা ব্রাহ্ম-ধরণের লোক—সেই জন্যে বলা ত? তাতে আমার কি বাধা আছে বাবা, অতুলের ইচ্ছা হয়—বেশ ত! অতুলকে নিয়েই ত আমার সংসার! আমি আর ক'টাদিন প্রকাশ, তাছাড়া আমি ত কারুর হাতেই খাইনে বাবা—তা যদি খেতুম তাতেও বোধ হয় বাধা হতো না।" একটুখানি থামিয়া আবার কহিলেন "অন্যের এ বিষয়ে বাধা থাকলেও

আমার তো নাই বাবা।" আশ্চর্য্য হইয়া প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল "তোমারি বা নাই কেন মাসিমা।" একটুখানি হাসিয়া মা কহিলেন "কি জান বাবা—সকলেই এক ঈশ্বর-সৃষ্ট জীব! আমিও তার মধ্যেই অতি ক্ষুদ্র মানুষ বৈ ত নয়, অন্যকে ঘৃণা করবার আমার কি অধিকার আছে বাবা?" তাঁর হৃদয়ের মহত্ত্ব বুঝিয়া প্রকাশ কহিল "তা হলে বিয়ের সব ঠিক্ করে ফেল মাসিমা. শীগ্‌গীর বিয়েটা হয়ে যাক্।" মাতা একটু ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিলেন "অতুলের মত হলে ত।" ঈষৎ হাসিয়া প্রকাশ কহিল "তার মত হয়ে আছে, সে জন্য চিন্তা নাই।" আনন্দময়ীর মুখখানা আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। একটুখানি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সত্যি বলচিস্ বাবা?" "হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, সত্যি নয় ত কি মিথ্যে বলচি।" বলিয়া প্রকাশ উঠিয়া গেল।

বাহিরের বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে একখানা ইজি চেয়ারে পদদুইটা যথাসম্ভব বিস্তার করিয়া দিয়া, অতুল, একখানা কেতাব হস্তে লইয়া, পাঠের জন্য প্রস্তুত হইল। সম্মুখে জানালার বাহিরে নব বর্ষার ধূসর শ্যামল মেঘে মধ্যাহ্নের আকাশ ভরিয়া উঠিতেছিল। অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে সে তাহাই দেখিতেছিল। বইখানা তাহার মনটাকে আকর্ষণ করিতে পারিল না, খোলা অবস্থায় তাহার ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। রাজেনের হস্ত ধরিয়া প্রকাশ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। এবং তাহার গাঢ়চিন্তায় বাধা দিয়া কহিয়া উঠিল "কি অতুল, আজ কাল পড়ায় এত মন দিয়েচ যে, তোমার দেখা পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েচে!" অতুল সচকিত হইয়া, একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল "হ্যাঁ, আজকাল একটু কাজের ভিড় পড়েচে কি না।" একটু পরে রাজেনের দিকে চাহিয়া আগ্রহের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "এস হে—রাজেন, কি খবর বল ত?" রাজেন মৃদু হাসিয়া কহিল "সব ভাল।" কিন্তু তাহাতে তাহার মনের ক্ষুধা নিবৃত্তি হইল না, একটা দারুণ আকুলতার চিহ্ন তাহার সারামুখখানিতে যেন ছড়াইয়া পড়িতেছিল। প্রকাশ তাহা নিঃসন্দেহে অনুভব করিয়া একখানা বই লইয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। একটুখানি পরে হাসিয়া "না, ভাল লাগেনা, এ সব তোমারই ভাল।" বলিয়া গৃহের বাহির হইয়া গেল।

রাজেনের কাছে খুঁটিয়া খুঁটিয়া সব কথা জানিয়া লইয়াও অতুলের পিপাসার নিবৃত্তি হইল না। অশান্ত বালক, বন্ধন মুক্ত পাইয়া ছুটিয়া পলাইল। কিন্তু অতুল যাহা চাহিতেছিল তাহা পাইল না। ক্ষুণ্ণমনে প্রকাশের পরিত্যক্ত বইখানি আনমনে হস্তে তুলিয়া লইল। এবং পাতার পর পাতা কেবল উল্টাইয়া যাইতেছিল। এটা কি? একখানা পত্রনয়? মেয়েলি হাতের লেখা বলে বোধ হচ্ছে! সে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। তাই তো, সে যাহা চাহিতেছিল তাহাই ত পাইল। কিন্তু বইখানা একবার প্রকাশ হাতে নিয়েছিল না? নাঃ এযে মেয়ে মানুষের লেখা! রাজেনও ত একবার বইখানা নিয়ে নাড়া চাড়া করিয়াছিল। আর পত্রেও ত—তাই লেখা রহিয়াছে। তাই বটে! এতক্ষণের পর তাহার মনের সংশয় দূর হইয়া মুখখানা আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। পত্রখানা বার বার পাঠ করিয়াও সে ভাল তৃপ্তি পাইতেছিল না—যতবার পাঠ করিতেছিল, আবারও পাঠের ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। আবার পত্রের উত্তর সাঙ্কেতিক স্থানে রাখিয়া দিবার কথাও লেখা আছে। আনন্দে অতুলের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, সত্যই কি সে তবে সৌভাগ্যবান! পরক্ষণেই মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল "ছিঃ ছিঃ—একি! এই কি রমণী! প্রণয়পত্র যে রমণী এমন উপযাচিকা হইয়া লিখিতে পারে, সেও আমার বরণীয়া! ছিঃ—ছিঃ—নাঃ সে ইহাকে কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারিবে না।" খাতাখানি অতুল দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল—গম্ভীর বিমর্ষ মুখে ইজিচেয়ারে সটান শুইয়া পড়িল। হায় হইল কি!

কয়েক মুহূর্ত্তে কোথায় গেল তাহার হৃদয়ের দৃঢ়তা! অতুল উঠিল—ধীরে ধীরে গিয়া যেন আনমনে খাতাখানা তুলিয়া লইল। তখন তাহার মনে হইয়াছিল খাতাখানা বুঝি জগতে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু! সে পত্রের উত্তর দিতে

বসিল। লিখিবার পূর্ব্বে কত ভাবিল—কয়েকখানা কাগজ লিখিল—ছিঁড়িল, অবশেষে সত্যই পত্র গেল! চিরকুমারের প্রথম প্রেম-পত্র কি না! ইহার পর রাজেনের ঘন ঘন যাওয়া আসা আরম্ভ হইল। এবং পত্রের আদান-প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরও প্রণয়টা অত্যন্ত জমিয়া উঠিতেছিল।

(৪)

দিবসের শেষ আলোটুকু তখনও সন্ধ্যার অন্ধকারে নিঃশব্দে মিলাইয়া যায় নাই। অতুল, আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে বসিয়া আপনার সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়াছিল। কল্পনানেত্রে প্রেমের মোহিনী ছবি সে আপনার হৃদয় মধ্যে আঁকিয়া তুলিতেছিল। সে-রাজ্যের রাণী লিলির সৌন্দর্য্য, তাহার মানসনেত্রের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল—নব উদ্দাম যৌবন-শ্রী—বর্ষাকালের ভরা নদীর ন্যায় কেমন কুলে কুলে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে, সে দেহের লাবণ্য যেন পরিহিত বসনের মধ্য হইতে বাহিরে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

প্রকাশ আসিয়া তাহার পৃষ্ঠে একটা মৃদু চাপড় বসাইয়া দিয়া কহিল "কি ভাবছিস্, চল, তোর বৌদি চায়ের নেমতন্ন দিয়েচে যে।" কল্পনার চিত্রগুলা তখনও তাহার মনে একটা প্রফুল্লতা আনিয়া দিতেছিল, মৃদু হাসিয়া কহিল "সত্যি নাকি? চল তবে, আর বেলাও নাই বড়।" দুই বন্ধুতে আজ আবার বহুদিন পরে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। প্রকাশ, অতুলের মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল "একটু ঘুরে যাবি নাকি?" "না না, বৌদি হয় ত অপেক্ষা করে বসে আছেন।" তাহার এই ভাবটা প্রকাশের চোখে একটু বিসদৃশ বোধ হইল। কারণ এরূপ ব্যবহার বহুদিন পরে আজ আবার সম্পূর্ণ নূতন। দেখিতে দেখিতে তাহারা প্রকাশের বাড়ীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

"ওগো হুলু দাও, বর এসেছে।" নিভা বাহির হইয়া সত্য-সত্যই হুলুধ্বনি দিয়া চকিতে সরিয়া গেল। কৃত্রিম ক্রুদ্ধ হইয়া অতুল কহিল "সময় অসময় নাই, তোমার কেবল ঠাট্টা," মৃদু হাসিয়া প্রকাশ কহিল "অসময়টা হলো কিসে শুনি?" রহস্যপূর্ণ স্বরে—"তোমার যেমন সর্ব্বদাই প্রাণটা বিভোর হয়ে আছে—সকলের ত তা নয়।" কথাটা বলিয়াই অতুলের লজ্জায় মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিল। ঈষৎ হাসিয়া প্রকাশ কহিল "ওঃ, বন্ধুর দুঃখে, চোখে সরষের তেল দিয়ে, একটু কাঁদা উচিত ছিল না? কিন্তু যাতে প্রাণটা বিভোর থাকে সেই মত কাজ করলে ত হয় ভাই! কেউ ত বাধা দেয় নি—নিজেরি ত ইচ্ছাকৃত দুঃখ।" মৃদু হাসিয়া অতুল কহিল "যাও মিছে বকোনা। যদিও এই অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক আলোচনাটা অতুলের কর্ণে সুধা ঢালিয়া দিতেছিল। তথাপি সে ঔদাসীন্য দেখাইয়া আলোচনাটা বন্ধ করিবার চেষ্টা পাইতেছিল। রহস্যের স্বরে কহিল "রেখে দে তোর পেটে ক্ষিদে, মুখে লাজ।" বেদনাস্থানে আঘাত পাইয়া অতুল চটিয়া উঠিল। ক্রুদ্ধস্বরে কহিল "কিসে তুমি বুঝলে—পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ?" প্রকাশ মৃদু হাসিয়া দ্বারের দিকে দৃষ্টি করিয়া কহিল "কই গো তোমার চা হলো? সন্ধ্যা হয়ে গেল যে।" নিভা, দ্বারের পাশে বসিয়া দুই বন্ধুর বাক্যালাপ শুনিতেছিল। স্বামীর আদেশ ও ইঙ্গিত বুঝিয়া ধীরে উঠিল। এবং চায়ের পেয়ালা লইয়া সম্মুখ টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিল। অঞ্চল হইতে চিঠিরগুচ্ছ স্বামীর হস্তে অর্পণ করিয়া তাহার মুখের পানে সলজ্জদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। প্রকাশ, চায়ের পেয়ালাতে চুমুক দিয়া কহিল যেও না;—দাঁড়াও, সাক্ষী চাই।" অতুল বিস্মিত হইয়া কহিল "কি রকম?" প্রকাশ চিঠির তাড়াটা বন্ধুর হাতে দিয়া, তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল—কোন কথা বলিল না। পত্রে আপনার হস্তাক্ষর দেখিয়া অতুলের বুঝিতে দেরী হইল না, তবুও আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য কহিল তাতে হয়েছে কি;

তুমি এ-চিঠি কোথায় পেলে শুনি ? প্রকাশ হাসিয়া কহিল "চিঠিগুলা যার উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে— তারই কাছে পাওয়া গেছে, যদি অবিশ্বাস হয়—এই সাক্ষী দাঁড়িয়ে আছে, সঠিক প্রমাণ করিয়া দিতে পারি।" অতুল লজ্জিত-ভাবে মস্তক নত করিল। কোন কথা বলিল না। প্রকাশ সব বুঝিয়া আবার কহিল "আর কেন ভাই ধরা পড়ে গেছ, যদি বল ত—সব ঠিক করে ফেলি।" কুণ্ঠিত স্বরে অতুল কহিল "কিন্তু মার মত হবে ত ?" "খুউব" বলিয়া নিভার দিকে চাহিয়া কহিল "তুমি এইবার যেতে পার, আসামী বিনা-প্রমাণেই ধরা দিয়েচে।" নিভা চলিয়া গেল। বহুদিন পরে আজ দুইটি বন্ধুতে হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করিয়া আলাপ আরম্ভ করিল।

(৫)

নীলরতনবাবু সাহেবী চা'লে চলিতেন। তাঁহার বাড়ীর সব শিক্ষাদীক্ষা নব্যতন্ত্রের ছিল। অতুলের দিকে তাঁহার নজর পূর্ব্ব হইতেই ছিল, কেবল গোঁড়া হিন্দুর ঘরে মেয়ে প্রত্যাখ্যাত হইবার ভয়ে তিনি সে কথা মুখে প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। তিনি যখন প্রকাশের নিকট আনন্দময়ীর মত শুনিলেন, তখন তাঁহার আর আনন্দের অবধি থাকিল না। ধুমধামের সহিত লিলির সঙ্গে অতুলের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহ অবশ্য হিন্দু-মতেই হইয়াছিল। জানি না কোন্ স্পর্শমণির সংযোগে লিলিকে এক রাত্রিতে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিল। তাহার মাতা যখন বিবাহ রজনীর পিতৃদত্ত উপহার সুন্দর ইংলিশ সিল্কের ফিরোজ রংএর শাড়ী, সুদীর্ঘ লেস ও কৃত্রিম পত্রপুষ্পখচিত সাহেববাড়ীর জ্যাকেট, এবং বিলাতী লাল মকমলের জুতা পরাইয়া হাল-ফেসানী সাজে সজ্জিতা করিয়া লিলির অনিন্দ্যনীয় সৌন্দর্য্যকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন, তখন সে মনে মনে অসুখী হইয়া উঠিতেছিল। অবশেষে সে সখী মারফত সে কথা মাতাকে না জানাইয়া পারিল না। মাতাও তাহাতে অসুখী হইলেন না। লিলি, বঙ্গবধূর চিরপ্রচলিতবেশেই সুসজ্জিতা হইয়া শ্বশুরালয়ে স্বামীর অনুগামিনী হইল। বরকনে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে ছুটাছুটী, হুটাহুটি পড়িয়া গেল। সেই ভিড় ঠেলিয়া নিভা তাহার সখীটিকে নামাইয়া লইতেই, অতুল ঈষৎ বঙ্কিমনেত্রে চাহিয়া দেখিল, বিস্ময়ে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল, লিলির সে সাজসজ্জা কোথায় ? কেবল একখানা রাঙ্গা চেলি পরিহিতমাত্র ! লিলি কোনও রূপে তাহার লজ্জানত শরীরটাকে আবৃত করিয়া স্বামীর সহিত যাইয়া শাশুড়ীর পদধূলি গ্রহণ করিল। তিনি অজস্র আশীর্ব্বাদে ও আনন্দের অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া পুত্র ও পুত্রবধূর শিরশ্চুম্বন করিয়া গৃহে তুলিলেন।

ফুলশয্যার রাত্রে অতুল ইচ্ছা করিয়াই একটু অধিক রাত্রে শয়নকক্ষে গমন করিল। চাঁদের আলো, জানালা গলাইয়া পুষ্পময় শয্যায় এবং সুপ্তা লিলির মুখে চোখে, সুগোল বাহুযুগলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া অতুল সেই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছিল। মনে মনে আপনার ভাগ্যের প্রশংসা করিয়া ঘুমন্ত পত্নীর ললাটে সস্নেহে চুম্বন করিল। লিলি ধড়মড়িয়া উঠিয়া শয্যা'পরে বসিল। অতুল সপ্রেমদৃষ্টিতে পত্নীর মুখের পানে চাহিয়া কহিল "ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়ে অন্যায় করেচি কি লিলি, তুমি কি অসন্তুষ্ট হলে ?" লজ্জাবনতমুখী লিলি ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়া দিল যে, সে অসন্তুষ্ট হয় নাই। অতুল আবার জিজ্ঞাসা করিল "কথায় বল, তুমি কি অসন্তুষ্ট হয়েছ !" লিলি, মুহূর্ত্তের তরে চক্ষু তুলিয়া স্বামীর মুখের পানে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আবার তৎক্ষণাৎ চক্ষু নত করিয়া লইল। অতুল আবারও জিজ্ঞাসা করিল, "বল—অসন্তুষ্ট হয়েছ কি না !"

লিলি সলজ্জভাবে কহিল "ও আবার কি কথা !"

অতুল হাসিয়া বলিল "বটে ঐ ভরসাতেই ত আমার এত সাহস লিলি ! তুমি যদি লজ্জা ত্যাগ করে প্রথমে চিঠি না দিতে, তবে আমি কি করে বসতাম কে জানে। জানি লিলি, তোমার প্রেম কি গভীর—কি টানে তুমি এ অযোগ্যকে আপন হৃদয়গুণে গ্রহণ করেছ !"

লিলি, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল "কিসের—তুমি কি বলচো !"

অতুল, প্রেমাভিনয়ের আয়োজন পূর্ব্ব হইতেই করিয়া, প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল। সে চিঠির তাড়াটা লিলির সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল "চালাকি ছাড়—প্রমাণ এই হাতে হাতে !"

লিলি, চিঠির তাড়া তুলিয়া লইল। কয়খানা চিঠি এপিঠ-ওপিঠ করিয়া পড়িল, সন্দেহ-আশঙ্কা মুহূর্ত্তের তরে তাহার হৃদয়ে খেলিয়া গেল—একি ! চিঠিতে তাহারই যে নাম সই ! এ যে তাহার পরিচিত হাতের লেখা ! বুঝিতে আর বাকী থাকিল না ! বলিল "বুঝেছি এ যে ও-বাড়ীর বৌদির কাণ্ড ! এঁ্যা—এত !"

অতুল আগ্রহে কহিল "কি—হয়েছে কি, কাণ্ড আবার কিসে !"

লিলি বলিল "তোমাদের মত অগ্রপশ্চাৎ জ্ঞানহীন অতি সূক্ষ্মবুদ্ধি পুরুষগুলোর বুদ্ধির দৌড়—আর ভোঁতা মেয়েলি বুদ্ধিতে—"

সমস্ত কথা বলিয়া বলিল "বল ত এখন বুদ্ধি কাদের ক্ষুরধার !" আর কি অস্বীকার করিবার উপায় আছে এই বুদ্ধিতেই যে তখন 'চিরকুমারের ব্রতরক্ষা।'

শ্রীশরদিন্দু দাসী।

স্বরলিপি।

কীর্ত্তন—একতালা।

পিরীতি সুখের সাগর দেখিয়া,
নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া, ফিরিয়া চাহিতে,
লাগিল দুখের বায়॥
কেবা নিরমিল, প্রেম সরোবর,
নিরমিল তার জল।
দুখের মকর, ফিরে নিরন্তর,
প্রাণ করে টলমল॥
গুরুজন জ্বালা, জলের শিহালা,
পড়সী জীয়ল মাছে।

কুল পানীফল, কাঁটা যে সকল,

সলিল বেড়িয়া আছে ॥

কলঙ্ক পানায়, সদা লাগে গায়,

ছাঁকিয়া খাইল যদি ।

অন্তর বাহিরে, কুটু কুটু করে,

সুখে দুখ দিল বিধি ॥

কহে চণ্ডিদাস, শুন বিনোদিনি,

সুখ দুখ দুটী ভাই ।

সুখের লাগিয়া, যে করে পিরীতি,

দুখ যায় তার ঠাঞি ॥

কথা ও সুর—কবি চণ্ডীদাস । স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা ।

II মা় ধা পা | ধা ধা ধা | ধা র্না´ র্সা´ | পা ধা পধা I

পি রী তি সু খে র সা গ র দে খি য়া ০

কে বা নি র মি ল প্রে ম স রো ব র ০

শু ন অ ম ত্যা ল্যা ক লে ব শি য়া লা ০

ক ল ঙ্ক পা না য় স দা লা গে গা য় ০

ক হে চ ণ্ডী দা স শু ন বি নো দি নি ০

২´ ৩ ০ ১

I পা ধা ধা | পা মা মা | পা পা –া | –া –া –া

না হি তে না মি লাম তা য় ০ ০ ০ ০

নি র মি ল তা র জ ল ০ ০ ০ ০

প ড় সী জী ব ন যা ছে ০ ০ ০ ০

ছাঁ কি য়া খা ই ল য দি ০ ০ ০ ০

সু খ দু খ দু টী ভা ই ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১

I র্সা র্সা র্সণা | ধা ধা ধণা | পা র্সা র্সা | ণা ধা ণধা I

পি রী তি০ সু খে র০ সা গ র দে খি য়া০
কে বা নি০ র মি ল০ প্রে ম স রো ব র০
শু ক্ষ জ্ব০ ন আ লা০ জ লে র শি হা লা০
ক ল স্ক০ পা না য়০ স দা লা গে গা য়০
ক হে চ০ ণ্ডী দা স০ শু ন বি নো দি নি০

২´ ৩ ০ ১

I পা পধণা ধা | পা মা রমা | পা পা -া | -া -া -া I

না হি০০ তে না মি লাম তা য় ০ ০ ০ ০
নি র০০ মি ল তা ০র জ ল ০ ০ ০ ০
প ড়০০ সী জী য় ০ল মা ছে ০ ০ ০ ০
ছাঁ কি০০ য়া খা ই ০ল য দি ০ ০ ০ ০
সু খ০০ দু খ দু ০টী ভা ই ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১

I র্সা র্রা র্রর্গর্মর্গা | র্রা র্রা র্রা | র্সা মা র্গা | র্রা র্রা র্রর্গর্মর্গর্রর্সা I

না হি য়া০০০ উ ঠি য়া ফি রি য়া চা হি তে০০০০০
দু খে র০০০ ম ক র ফি রে নি র স্ত র০০০০০
কু ল পা০০০ নী ফ ল কাঁ টা যে স ক ল০০০০০
অ স্ত র০০০ বা হি রে কু টু কু টু ক রে০০০০০
সু খে র০০০ লা গি য়া যে ক রে পি রী তি০০০০০

২´ ৩ ০ ১

I র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সণধপা | পা ধা -া | -পধা -ণধা -পা II

লা গি ল দু খে র০০০ বা র ০ ০০ ০০ ০
প্রা ণ ক রে ট ল০০০ ম ল ০ ০০ ০০ ০
স লি ল বে ড়ি য়া০০০ আ ছে ০ ০০ ০০ ০
সু খে দু খঁ দি ল০০০ বি ধি ০ ০০ ০০ ০
দু খ যা র তা র০০০ ঠা ঞি ০ ০০ ০০ ০

কেশবচন্দ্র ও বাঙ্গালা ভাষা

বঙ্কিমচন্দ্রই আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের জন্মদাতা বা গুরু। বাস্তবিক তিনিই ত সর্ব্বপ্রথমে এই ভাষায় সহজ-পাঠ্য উপাদেয় উপন্যাসাদি রচনা করিয়া বঙ্গবাসীর ঘরে-ঘরে ইহা প্রচার করিয়াছেন এবং তিনিই ত তাঁর সম-সাময়িক বঙ্গীয় যুবা ও ললনাদের এই ভাষা আলোচনার প্রবৃত্তি বিশিষ্টরূপে উদ্দীপন করেন।

যে সময়ে শিক্ষিত যুবকদের ইংরাজী ভাষা চর্চ্চাই অধিক আদরনীয় ও শ্লাঘার বিষয় ছিল, যখন শিক্ষিত যুবকগণ পরস্পরের সঙ্গে কথোপকথনে এমন কি পত্রাদি লেখনেও ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করাই অধিক গৌরবের মনে করিতেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসই যে বাঙ্গালী যুবকদিগকে বাঙ্গালাভাষা পাঠে অনেক পরিমাণে আকৃষ্ট করে তাহা কে অস্বীকার করিবে? বাস্তবিক তাঁহার দ্বারাই যে বর্ত্তমান বঙ্গভাষা সাহিত্য-জগতে যথেষ্ট প্রসারিত হইয়াছে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কেশবচন্দ্রও বঙ্গভাষাকে সর্ব্বজন প্রিয় করিতে কম করেন নাই। তাঁহারা বক্তৃতার ভাষা এরূপ স্ললিত ও সুমিষ্ট, এমন হৃদয়গ্রাহী যে সেই ভাষার গুণে আকৃষ্ট হইয়া অনেকেই 'মন্দির' পূর্ণ করিতেন। তাঁহার ভাষা অনুকরণ করিতে পারিলে অনেকেই নিজকে ধন্য মনে করিতেন। এ সম্বন্ধে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে আমি স্বকর্ণে যাহা শুনিয়াছি তাহাই সাহিত্য দরবারের পেশ করিতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন আলীপুরে কাজ করিতেন এবং কলিকাতা ভবানীচরণ দত্তের লেনে প্রসিদ্ধ সেন পরিবারের বাটীর দক্ষিণ দিকের একটী বাড়ীতে বাসা করিয়া থাকিতেন, সে সময় তিনি কেশব অনুজ স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেনের বৈঠকখানার দালানে প্রায় প্রতিদিনই আসিয়া বসিতেন। একদিন সেখানে স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেন, স্বর্গীয় প্রচারক প্রসন্নকুমার সেন ও এই সেবকের সাক্ষাতে কথোপকথন ছলে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বলিলেন, "আমি যে ব্রহ্মমন্দিরে কেন যাই জান? কেবল কেশবের বাঙ্গলা শিখ্‌তে। কেশবের মত বাঙ্গলা বক্তৃতা কর্ত্তে না পার্লে এ দেশের উদ্ধার হচ্ছে না।"

এই কথা শুনিয়া স্বর্গীয় প্রসন্ন বাবু উত্তর করিলেন "হ্যাঁ, এখন আমাদের অনেক ছেলে সেরকম বাঙ্গলায় বক্তৃতা কর্ত্তে শিখ্‌ছে," এ সেবকের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "ইনিও কম নন।"

শুনিয়া যেন সানন্দ চিত্তে বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন "তাইত চাই।"

যাহাহউক তিনি যে "বাঙ্গালা শিখ্‌তে" এই কথা বলিয়াছিলেন আমার বিলক্ষণ মনে আছে। তিনি শ্রীকেশবকে "কেশবই" বলিতেন, কারণ কেশব তাঁর প্রায় সমবয়স্ক ও বোধহয় সহপাঠীও ছিলেন। কেশবচন্দ্রের ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার ন্যায় তেমন ব্যাকরণসম্ভূত পরিমার্জ্জিত ভাষা নয়, কিন্তু তাঁহারই ছাঁচে যে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা ঢালাই করা তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কিন্তু কেশবচন্দ্রই বা এ ভাষা পাইলেন কোথা হইতে, তাঁহার শিক্ষা গুরু কে? তিনি স্বয়ং তাঁহার "জীবন বেদে" স্পষ্ট বলিয়াছেন "জীবনের সেই উষাকালে, যখন ঈশ্বর বলিলেন তোর বইও নাই কিছুই নাই, তুই কেবল প্রার্থনাই কর" তখন "আমি বাঙ্গালা ভাল জানিতাম না যে ভাষা বদ্ধ করিয়া প্রার্থনা করিব, ভাব রাখিতে পারিতাম না। সকালে একটী রাত্রেতে একটী লিখিয়া প্রার্থনা করিতাম।"

অশ্চর্য্য এই, সেই ব্যক্তিই কেমন করিয়া এমন ভাষা অনর্গল বলিতে শিখিতে সক্ষম হইলেন, যাহা শিখিতে বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় প্রতিভা সম্পন্ন, সংস্কৃত ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন শিক্ষিত ব্যক্তি ব্রহ্মমন্দিরে গিয়া চাতকের ন্যায় তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিতেন ?

এ সম্বন্ধে শ্রীকেশব চন্দ্র স্বয়ং একবার যাহা তাঁর অনুবর্ত্তী জগৎ-পরিব্রাজক বক্তা শ্রীপ্রতাপচন্দ্রকে বলেন তাহা হইতেই এ প্রশ্নের মীমাংসা পাওয়া যাইতে পারে। প্রতাপ চন্দ্র একদিন জিজ্ঞাসা করেন, "কেশব, তুমি ত কখনও কোন বাঙ্গালা বই পড়নি, আমি ত অনেক পড়েছি, কিন্তু তবু তোমার মত বাঙ্গালা বলতে পারিনা কেন বল দেখি ? ইহার উত্তরে কেশব একটু হাসিয়া বলিলেন "তাই ত আমিও ত জানিনা কেমন করে বলি, আমর যা আসে তাই বলে ফেলি তাতে কি ভাষা হয় না হয় কিছুই বলতে পারি না।" ইহাই কেশবের ভাষা জ্ঞানের অলৌকিক রহস্য।

যে অলৌকিক দৈব বলে পুরাকালে কালিদাস ভাষাজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান যুগে সেই অলৌকিক দৈব বলেই কেশবচন্দ্রের ভাষাজ্ঞান। তাঁর ভাষাশিক্ষা ব্যাকরণে নয়, স্বয়ং বাক্‌বাদিনীর কাছেই তাঁহার শিক্ষা। *

পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব যেমন বলিতেন কেশব "দৈবী পুরুষ," তাঁর ভাষাও দৈবী ভাষা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত মার্জ্জিত সাধুভাষা ও প্রচলিত বাক্যকথন ভাষার সংমিশ্রনে ইহা সত্যই এক নূতন ভাষা।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র এই ভাষা অবলম্বনের বহু পূর্ব্ব হইতেই "সুলভ সমাচারে" এবং ব্রহ্মমন্দিরের উপদেশে ও বক্তৃতায় শ্রীকেশবচন্দ্র ইহা প্রবর্ত্তন করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তীগণকে ইহাতে দীক্ষিত শিক্ষিত করাতে তাঁহাদের দ্বারাও এই ভাষার প্রসারণ কম হয় নাই।

আমার স্মরণ হইতেছে বাঁকীপুরে যখন সাহিত্য-সভার বার্ষিক অধিবেশন হয়, তখন সভাপতি স্যার আশুতোষ সরস্বতী মহাশয় বলিয়াছিলেন যে বাঙ্গালা ভাষাকে যদি জগতে প্রসারিত ও আদৃত করিতে হয় তাহা হইলে এই ভাষায় দর্শন বিজ্ঞানের মৌলিকতত্ত্ব সকল লিখিত হওয়া আবশ্যক। বাস্তবিক ইহা অতিশয় সত্য কথা। কিন্তু সরস্বতী মহাশয় বোধহয় তখন জানিতেন না কেশবচন্দ্র তাঁহার প্রবর্ত্তিত বাঙ্গালাভাষায় অতি গভীর অধ্যাত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞান তাঁহার "প্রার্থনা" ও "জীবন-বেদে" এবং যোগ ভক্তির অতিউচ্চ মৌলিক তত্ত্ব তাঁহার "ব্রহ্ম গীতোপ-নিষৎ" গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন। সে সকল গ্রন্থ প্রকৃতরূপে কোন ভাষাতেই যেন ভাষান্তরিত হইবার নহে।

তত্ত্বপিপাসু ব্যক্তিগণ আগ্রাতিশয় সহকারে যে বাঙ্গালাভাষা শিক্ষা করিয়া এই সকল তত্ত্ব-সুধা পানে তৃপ্ত হইবেন ইহা নিশ্চয়।

এমন দিন আসিবে, যখন বাঙ্গালাসাহিত্যও সভ্যজগতে ক্রমে এইরূপ প্রসারিত, আদৃত এবং গৌরবান্বিত হইবে ইহা নিঃসন্দেহ।

শ্রীব্রহ্মানন্দ দাস।

---

*ফলতঃ ভাবে যিনি পুষ্ট তাহার ভাব প্রকাশে ভাষার অভাব হয় না। চিরকালই ভাবের অনুবর্ত্তিনী ভাষা। ভাবপুষ্ট-ভাষা ক্রমেই সংশোধিত হইয়া আসে, ভাষায় ভাবের অভিব্যক্তি-চেষ্টাই তাহার মূলে—সে চেষ্টা আন্তরিক—প্রাণের প্রার্থনা—বাক্‌দেবী যে ভক্তের সে প্রার্থনা পূরণে বিরত হন্তা—এ কল্পনা অন্যায় নহে। সঃ

কাকদূত।

—ঃ*ঃ—

মঙ্গলাচরণ।

উরগো উরগো সুভ্রু, শুভ্র পদ্মাসীনা
বীণাপাণি, অয়ি রাণি, কাব্যকুঞ্জবন-
সঞ্চারিণি, ঘুঘুরাণি। কাচ্ছা বাচ্ছা লয়ে
হৃদয় প্রাঙ্গনে মোর আসি আড্ডা গাড়,
দেউলিয়া ঘরে যথা। মগজ উটজে
ভাঙাবাক্স, ছেঁড়াকাঁথা, হুঁকা, কল্কিরূপে
লজ্জা ভয়, বুদ্ধি আদি যাহা কিছু আছে
নিলামে চড়ায়ে দাও, অয়ি সুরসিকে।
মিশাইয়া নবরস, তব আশীর্ব্বাদে,
রচিব পাচন দিব্য ; যাহা পান করি
দন্তপাঁতি ছরকুটি বঙ্গসন্তানেরা
কান্নাভারি ঘুঁড়ি সম পড়িবে লট্‌কায়ে।
তুমিও আইস দেবি বোলতা ঘরণি,
'হক্-কথা', দুর্ম্মুখের নিত্য সহচরি,
সমালোচকের চির আরাধ্য দেবতা,
অয়ি শুভে, এ সংসার-ময়রা দোকানে
মধুরস যদি কিছু পেয়ে থাক তাহা
নিজের উদর মধ্যে চিরবদ্ধ রাখি
জগতে বিলাও শুধু তব তীব্র হুল।

পূর্ব্বকাক।

—●—

রসের সাগরে থরে থরে থরে—যেথা ভাসে রসগোল্লা,
সখ্যবাঁধনে বাঁধি একসনে কৃশ্চান হিঁদু মোল্লা,
সে বাগবাজার ঠাসিয়া হাজার প্রাসাদ দিয়েছে সারি।
তারি একটীতে লুটায় মাটীতে বিরহী, নয়নে বারি।

ধূলামাখাবেশ, আলুথালুকেশ, উড়িছে অসংযত,
টেরিটীগুপ্ত, বালুবিলুপ্ত ফল্গু নদীর মত।
কোটরনয়ন, পাংশুবয়ন, রসনে রোচেনা অন্ন,
বহি চিন্তার দুর্ব্বহ ভার দেহখানি অবসন্ন।
কৃশ অঙ্গুলি হ'তে সবগুলি অঙ্গুরী দামী দামী
খসে অবিরাম, গলার বোতাম নাভিপাশে আসে নামি।

শুকায়ে নধর শুষ্ক অধর নিশ্বাসে বহে আগ,
পাংশু ওষ্ঠ, লালিমা ভ্রষ্ট দুকপোল বীতরাগ।
এই ভাবে দিন কাটে। একদিন রজনীর অবসানে
ভাঙিল যুবার তন্দ্রার ভার কার কালোয়াতি তানে।
কোথা হা হন্ত! দাড়ি ও দন্ত, গায়ক বা কোথা হায়!—
ছাদের ওধারে সহসা নেহারে বিহগ কৃষ্ণকায়!

হেরি চমকিত তনু পুলকিত, বহিল সুখের স্রোত
হৃদয় ক্ষেত্রে, করুণ নেত্রে ভাসায়ে আশার পোত।
অথ মধুরাণী কহে যুবজানি, উন্মনা মনোদুখে:—
(কেবা এ দুষ্ট জগতে তুষ্ট না রহে মিষ্ট মুখে ?)
কি মধুর ডাক আজি ওহে কাক, শুনাইলে এ অধীনে
কর্ণরন্ধ্র করিয়া বন্ধ সঙ্গীত Glycerineএ!

কবিগুলা চাষা! কভু তব ভাষা শোনেনি কি তারা কানে ?
শুনি সে কূজনে, পিক গরজনে মজে তারা কোন প্রাণে ?
আপন কুলায়ে কোকিল ভুলায়ে তুমিই শিখালে বুলি,
তার যত গান সে তোমারই দান, একি তারা গেছে ভুলি?
উচ্চ তোমার আসন, তোমার জন্ম খচর কুলে,
কত শিরে তাজ রাজামহারাজ পড়ি রহে পদমূলে!

জানে সব জনে রাবণারিসনে করিয়াছ সংগ্রাম।
রবি সহচর, হে বায়সবর, তোমারি গুণগ্রাম
মোর বাঁশী, বীণা, লেখনী এ দীনা, করিবে সুপ্রচার
গানে, বৈঠকে, কাব্যনাটকে, সাপ্তাহিকেতে আর।
আজিকে কিন্তু আছে গো বন্ধু প্রার্থনা অভাগার—
হ'য়ো না অধীর, কেরাণীগিরির নহি আমি উমেদার।

রোগের মিষ্ট্রী Ganot, Chemistry, হিষ্ট্রী বুঝিনা ছাই
Tonic, Novel, গন্ধের তেল, সৃষ্টিও করি নাই।
ভয় নাই কিছু, চাহিবনা পিছু কোন প্রশংসাপত্র।
এ দাসের হিতে হবেনা কহিতে মিছা কথা একছত্র।
কি বলিব দুখ, ফেটে যায় বুক, হেথায় গ্রহের ফেরে
পড়ে আছি দীন প্রিয়তমাহীন। চাঁদ মুখ নাহি হেরে
সুন্দর ধরা অন্ধ তিমিরা হেরিতেছি অবিরত,
দিনে দিশাহারা জীবন্তে মরা কালপেচকের মত।
না মিটিল আশ, কাটিল ন'মাস, শনিবার আসে যায়,
শ্বশুরের গেহ আজিও না কেহ যাইতে সাধিল হায়!
প্রেয়সীর লাগি সারা নিশি জাগি লিখিয়াছি মাথাকুটে
পদ্যে প্রণয় লিপি, অনুনয় করি, ধর করপুটে।
বন্ধুর দ্বারে ঘুরি বারেবারে, রবিবাবু, জয়দেব,
উলটিপালটি লেখা এই চিঠি ভুলিওনা এটী দেব।
পতি পত্নীকে যদি চিঠি লিখে লোকে দেখে পায় লাজ;
পত্রটী তায়, মিত্র, তোমায় গোপনে সঁপিনু আজ।
হের করি ধুম উড়িতেছে ধুম গুলির আড্ডা 'পর,
উহার সঙ্গে মিশায়ে অঙ্গ উঠ বিহঙ্গবর।
অম্বর পথে স্বত এ রথে যাত্রা কর রে পাখী,
দিগ্বধূগণ আঁখিরঞ্জন অঞ্জন রেখা আঁকি
বহুযানার্ত্ত ঐযে বর্ত্ম, অতুল মর্ত্ত্যধামে
দিগন্তব্যাপে, জেনো সংক্ষেপে উহারে কর্ণনামে।
চলি, পথমাঝে দেখিবে বিরাজে অদৃশ্য কত টোল
দিবস রাত্র বিবিধ ছাত্র-কৃত-অশ্রুত রোল।
ঘুরে গুরুভুঁড়ি মুণ্ডিত মুড়ি পণ্ডিত ঝাঁকে ঝাঁকে
ঠাসি অজস্র ঝাঁজাল নস্য অনতি হ্রস্ব নাকে,
দেখিবে দুহাতি। জেনো এটা হাতি-বাগান পুণ্যে গাঁথা
চল হেথা অতি সংযত গতি সম্নত করি মাথা।
সমুখে তোমার ষ্টার-থিয়েটার সংযত রঙ্গভূমি
দাঁড়ায়ে তুঙ্গশিখর শৃঙ্গশতকে গগনে চুমি'।

নিখিল বিশ্ব মানব দৃশ্য, কলির ঋষ্যমূক,
যার আশ্রয়ে আসি নির্ভয়ে যুবারা ফুলায় বুক।
প্রতি শনিবার যেথা অনিবার ছুটে আকুলিত চিত্ত
কত কুতুকিনী মরালগামিনী দেখিতে moral নৃত্য।
সভ্যতাসেতু, গর্ব্বের হেতু, সর্ব্ব সাধের ধন
ঢালি রস নানা গড়িল এ দানা না জানি কে মহাজন!
প্রাসাদের তলে গড়া কৌশলে পক্ষিরাজের মূর্ত্তি,
করজোড়, তবু রাজার খিতাবে নিশ্চয় মনে ফূর্ত্তি।
তাঁর পদে নতি করি, সম্প্রতি হও পাখি আগুয়ান্
চপের সুবাসে চলি আশেপাশে, লইয়া সুরুয়ার ঘ্রাণ।

অদূরে বেথুন কলেজ! মিথুন-ফাটকে পশিছে Light,
হিঁদুয়ানি শিলা করিবারে ঢিলা রচিত এ Dynamite.
পশ্চাতে ছাড়ি এ বিদ্যার বাড়ি, সামালি ব্রহ্মধাম
ফেলি কালিতলা, নামিয়া শীতলা চলহে ঘনশ্যাম।

থাম, বেড়াঘেরা পার্কের সেরা বড় গোলদিঘী দেখে
ঈশ্বর যেথা অশ্ম কঠিন ফাটকে হাজির থেকে।
যেথায় হেয়ার জ্ঞান-অবতার শায়িত ধরণী কোলে,
দক্ষিণেএর সিটিকলেজের, হল্ হের মাথা তুলে;
বিরাজে পূর্ব্বে অতি অপূর্ব্ব Theosophical hall
বিকাত যেখানে ব্রহ্মবিদ্যা, খাঁটি ঘৃত, আটা, চাল।
সঞ্জীবনী সঞ্জীবিতা, পতাকায় আঁকা যার,
সাম্য স্বাধীনতা মৈত্রীর মটো—সকল সেরার সার॥
পশ্চিম দিকে Senate বাটিকা, যিনি এ ভারতবর্ষে
সাহেব লোকের সভ্য-নোকর জোগান বর্ষে বর্ষে।

যাঁর মুখে রাখি বিনিদ্র আঁখি ভাবে ভাবি-বরপক্ষ।
পুত্র কটারে Highest bidderএ চড়াবেন মহালক্ষ্য!
শোভিতেছে বামে মোটা মোটা থামে সংস্কৃত পাঠাগার
নাস্তিক দল নাস্তানাবুদ অনুস্বারেতে যার।
বাহিরে বিলান পাঁজির বিধান ভিতরে রাখেন গুপ্ত
কত অনাচারী বিদ্যাসাগর, শিবনাথ মধুগুপ্ত।

মোর কথা রাখ যদি হ'য়ে থাকে শ্রান্ত, দীঘির নীরে
পিপাসা নিবারি, হে বিমানচারি, চল পুনঃ ধীরে ধীরে।
হোথা মেডিকেল কলেজ বিরাজে, যাহার কিরীট চূড়ে
Diphtheratic membrane ঠিক পতাকার মত উড়ে।
রোগে জর্জ্জর ক্ষীণ কলেবর অভাগা কত অগণ্য
যেথা ছুটে আসি Diagnosis শুনিয়া হইছে ধন্য।
বামে সারে সার দাঁত বাঁধাবার দোকান, যেখানে আসি
নববুয়ে নব যৌবন লভে উদ্বাহ-অভিলাষী।
শুনো কিছু দূরে সপ্তম সুরে ময়রা পদার বিন্দে
পিটিশন কত ভেটিছে নিয়ত তোমার স্বজন বৃন্দে।

বাষ্প বৃষ্টি-কলুষ দৃষ্টি হানিয়া নির্ণিমেষ
দেখো সুধালেশ-মিশ্রিত দেশ-বিশ্রুত সন্দেশ।
সুন্দর, হৃদিনন্দন, বিধি বন্দন পারিজাত,—
যাহা নির্ভয়ে শিষ্য আলয়ে করিতে উদরসাৎ
পারে গো নব্য যুবক ভব্য উড়াতে দিব্য টিকি,
ছাড়ি Hat, Boot তসরেট সুট Necktie আর ও কি কি।

ময়রার প্রতি অকথ্য অতি অজস্র গালি বর্ষি,
জঠরাগ্নিরে রসনার নীরে নিবারো খগরাজর্ষি,
সম্মুখে শুভ সঙ্গম শোভে লৌহ রেখাঙ্কিত
পরিটী পাথর, তাড়িত রথের ঘর্ঘর মুখরিত।
সেথা হ'তে ডা'নে ছুটি সাবধানে, এড়ায়ে চাঁদনী ছলা,
গলদ্ঘর্ম্ম, কৃষ্ণ চর্ম্ম, পাইবে ধর্ম্মতলা।

উর্দ্ধ-শিখর-সৌধ-নিকর-কিরীট শীর্ষে আঁটা
মসৃণ সরণি মালিকা, ধরণী পালিকা এ Calcutta
ক্রম-উন্নতি পথে দ্রুতগতি ছুটিয়াছে নাহি ভুল,
ঐদেখ, ধীর, মহানগরীর উদাত্ত লাঙ্গুল
মনুমেণ্ট্ ইতি-সজ্জিত, নিতি-কীর্ত্তিক নামডাক—
বাহিরে সরল, ভিতরে কেবল ঘোরান সিঁড়ির পাক!
ফিরিছে অযুত গোরা মজবুত চৌরঙ্গীর দিকে
বীরমদ-ভরে পদাহত ক'রে পদানত পথটীকে।

তারা দেখে পাছে, এই ভয়ে গাছে লুকায়ে কৃষ্ণবর্ণ
মেঠো পথ চিনে ছুট দক্ষিণে অনুখন উৎকর্ণ
আছে পাছু পাছু অনেকের Statue ময়দানে ছড়াছড়ি
হায়, পাখিবর, লঘু কলেবর কোনটার পর চড়ি।
ইতি মহাকবি শ্রী গালিদাস বিরচিতে কাকদূতে
পূর্ব্বকাকঃ।

উত্তরকাক।

—:*:—

মাঠ পার হ'য়ে দেখো যায় ব'য়ে আদুরে ছেলের মত
শরীর শীর্ণ, কলুষাকীর্ণ, খাল সে অব্যাহত।
খালের উপরে লৌহ নিগড়ে বাঁধা সুবিপুল পুল।
চরণ লক্ষ দলিত, বক্ষ ফুলায় তবু বাতুল!
সেতুর ওপারে পথের বাঁধারে ছ্যাকড়া গাড়ির সারি
অহিফেনবশ নিদ্রা-অলস বৃদ্ধার অনুকারী।
সাড়া নাই মুখে, ভুঞ্জিছে সুখে বিশ্রাম বড় সাধের।
একপা কিন্তু নড়িলে, অন্ত না রহে আর্ত্তনাদের।
চলি গেছে বামে, কি একটা নামে গলি এক অতিরম্য
ন্যায় বেদান্ত সব নিতান্ত কুটিল অনধিগম্য।
গলিটির শেষে নর্দ্দমা ঘেঁসে দুইতলা গৃহখানি
অধম জনার—কি বলিব আর? বন্ধু! না সরে বাণী।
বঙ্গীয় নবযৌবনে যবে রঙ্গিল মোর প্রিয়া
নবমবর্ষে হিঁদু আদর্শে হ'ল অরক্ষণীয়া,
সে দুঃসময়ে অধর্ম্মভয়ে চকিত তাঁহার পিতা
বাঁধা রাখি তায় এড়াইলা দায় কোন মতে, জেনো মিতা।
দ্যাল হ'তে খালি খ'সে পড়ে বালি ইট বাহিরায় গিছে,
সন্তোষে হাসি দন্ত বিকাশি যেন সে আহ্বানিছে।
চারিটী ক্ষুদ্র জানালা রুদ্ধ, দরজায় ছেঁড়া পর্দ্দা
বারাণ্ডা দিক আগুলিছে চিক, উঁকিমারে কার স্পর্দ্ধা।

তামাকের ছাই মাখি সারাগায় ভাঙাচোরা সিঁড়িগুলি
সন্ন্যাসী ফিরে, না পাইয়া শিরে প্রেয়সীর পদধূলি ?
ঘন কাল দাড়ি গোঁফেভরা হাঁড়ি-মুখে বিড়ি-শিখা-সম
গ্রস্ত সবলে এ গৃহ কবলে অবলা ঘরণী মম।
অঙ্গে পরণ বিম্ববরণ ব্রহ্মের মত সূক্ষ্ম
তিন পেড়ে সাড়ী, বুঝেনা আনাড়ী সত্তা তার, এই দুঃখ
মন্দ মধুর গন্ধবিধুর, 'তরল আলতা' পরা
অরুণ দুখানি চরণে, মুখানি ধসিছে বসুন্ধরা।

ছল ছল আঁখি পাউডার মাখি খোঁপা মাঝে রাখা Bouquet
করুণমূর্ত্তি, দোক্তা-সূর্ত্তি মলিনদশন শোকে।
অস্ফুট ভাষে সখীরা সহাসে জিজ্ঞাসে 'কিলো সই,—
কতদিন গেল, কতদিন এল, তোর তিনি এল কই ?
শুনি যান সরি মৃদু গুঞ্জরি। ফিরে আসে প্রিয়তমা
পুনঃ কি মন্ত্রে, সখীর যন্ত্রে তাড়িত তন্ত্র সমা।

হয়ত সকালে রন্ধনশালে বসি দিদিমার পাশে,
করেন শ্রীমতী কত না মিনতি গল্পশুনার আশে,
এদিকে যেমনি ডাকেন জননী "ক্ষেন্তি কোথায় গেলি ?"
অমনি লাফায়ে উঠি, দুইপায়ে থালা, ঘটি, বাটি ফেলি
সেথা হ'তে বেগে ফরফরি, রেগে চলে যান দূরে বালা,
নাহি শুনে কথা, ছুঁচাবাজী যথা মুখেতে আগুন জ্বালা।
হয় ত দুপরে, মাটির উপরে, পাটিখানি বিছাইয়া
আছেন সুপ্ত মোহবিলুপ্ত চেতন পরাণপ্রিয়া।

শিথিল-করবী দেহবল্লরী, ব্যায়ত বদনচন্দ্র।
গগনে গগনে উঠিছে সঘনে নাসার মধুর মন্দ্র।
কমল অক্ষি ঢাকিছে মক্ষি, মশক গাহিছে গান,
পাশ না ফিরিতে অস্তগিরিতে ঢলে পড়ে ভানুমান।
কিম্বা কাজলে, তাম্বুলে, তেলে, চুনে রঞ্জিত খাটে
অর্দ্ধশয়িতা হৃদয়দয়িতা নিরত কাব্য পাঠে।
সম্মুখে খোলা "পিরীতির .দেলা" "সুড়ঙ্গসঙ্গিনী"
"চুম্বনে খুন" "রূপের আগুন" অথবা "কলঙ্কিনী।"

কভু দুঃসহ দীর্ঘবিরহ দুঃখেতে ভরপুর,—
ধূলাকালি আঁকা ছোট ভাইটাকে ধমকে করিয়া দূর,—
ব্যাকুল বক্ষে, নিরালা কক্ষে বসিয়া, চক্ষে ধারা,
লিখেছিল চিঠি কুরঙ্গ দিঠি প্রেমের ছবিটী পারা।
প্রিয়ার পরশ মদিরা-বিবশ অধীর হংস পুচ্ছ
কাগজেতে ক'সে মুখ ঘ'সে ঘ'সে উগারে আখর গুচ্ছ।
অঞ্চলে কালি সিঞ্চয়া, খালি দোয়াত, হারায় ছিপি,
হৈল তূর্ণ কলম চূর্ণ, ছিদ্রে পূর্ণ লিপি।
বসি জানালায় বিকালবেলায়, হয় ত প্রাণেশ্বরী
বিব্রত র'ন মাথার কারণ সমুখে মুকুর ধরি।
উর্দ্ধবসতি, উদ্ধতঅতি' মূর্দ্ধজগুলি মত্ত
চিরুণী তাড়নে রসির বাঁধনে করিছেন নিজায়ত্ত।
হের মনভোলা আল্‌বার্টতোলা সিঁথিটী শুভ্রসাজে
হৈলদীপ্ত তৈললিপ্ত সিক্ত কেশের মাঝে।
সিঁথির গোড়ায় পাহারা দাঁড়ায়, ব্রহ্মচর্য্য-নাশা,
রূপান্তরিত মকরধ্বজ, সিন্দূর ইতিভাষা!
কভু রথাসনে সখিগণসনে অঙ্গনে উপবিষ্টা
সন্ধ্যাবেলায় বিন্তিখেলায় আছেন তিনি নিবিষ্টা
ভরিয়া আস্য উঠিছে হাস্য, ফুটিছে পঞ্জা ছক্কা
ছুটিছে সরবে রসনা, গরবে না রাখি কাহারো তক্কা।
যদি দেখ মোর প্রিয়তমা ঘোর দুঃখহিমাচ্ছন্ন
বদন কমলে তুলিছে বিরলে গরসে গরসে অন্ন,——
যেয়োনাক' কাছে, পুষী সেথা আছে তীক্ষ্ণ চরণ-পাণি,
কটা চোখোদের পদাঘাতে ঢের পাখাগুলা মরে জানি।
হয় ত প্রভাতে, একেলাটি ছাতে দাড়াইয়া দাঁতে মিশি,
সরোজলোচনা, রূপের জোছনা-কিরণে উজলে দিশি।
তোমারে নিরখি যদি প্রিয় সখি মরি সঙ্কোচে লাজে,
ত্রস্তচরণে, স্রস্তবসনে, নাহি যান আন কাজে;
তবে চিঠিখানি, করি জোড়পাণি, ধরিয়া চরণপদ্মে,—
পায় ধীরে ধীরে অবনতশিরে ক'য়ো 'অয়ি অনবদ্যে,—

কোরো না ভরম, লজ্জা, সরম কঠোর মরম দুখে
এই ক'টিকথা তোমার ভর্ত্তা কহিছেন মোর মুখে ;—
'হৃদি-মন্দির-দেবি, সুন্দরি, সিন্দুর শোণ-পাণি
কুন্দ রদনে, ইন্দুবদনে, হিন্দু সদনে রাণি,
হায়গো কেমন প্রফুল্ল মনে আছ ভুলি অভাগায় ?
তোমার বিরহ সহি অহরহ হনু যে মৃত প্রায়।
যখনি বাতাস বহে নিশ্বাস-সৌরভ তব লুটে
হয় যে মনটা আলিঙ্গনটা করি তারে গিয়া ছুটে।
তাতেও ত' ছাই সাহস না পাই, পড়ি নাই ব্যাকরণ,
বলিতে না পারি পুরুষ কি নারী দক্ষিণা সমীরণ।
তোমার পুণ্য-পরশধন্য প'ড়ে আছে রাজপথ।
যাতনা ভুলিতে উহার ধূলিতে গড়াইতে মনোরথ ;
Scavengingএর জ্বালায় কিন্তু ভরসা না পাই মোটে ;
পবিত্র ধূলা, তাও লোকগুলা রাখে কি ঝাঁটার চোটে ?
কভু দিবাভাগে, নিদ্রার আগে, ঘরে অর্গল আঁটি,
যখন গোপনে রচি মনে মনে প্রণয়ের কবিতাটী
মিল মেলে যদি মেলেনা ছন্দ, ছন্দ মেলে ত শব্দ,
একটু ত্রুটিতে চরণ গুটায়ে ভারতী রহেন স্তব্ধ !
যদি হে প্রিয়সি, কভু ছাদে বসি, তাকায়ে আকাশপানে,
হৃদয়ের ভারে লঘু করিবারে চাহি বিরহের গানে,
পাড়াটা শুদ্ধ বাক্যযুদ্ধ করিতে ছুটিয়া আসে,
সঙ্গীত মম নববধূ সম অমনি লুকায় ত্রাসে।
এমনি করিয়া কতকাল, প্রিয়া, রহিব এখানে পড়ি ?
ডাক একবার, নহিলে এবার দিলাম গলায় দড়ি !"
নিশ্চয় পাখি, তাঁর দুটী আঁখি হবে জলে ভর ভর
বৈশাখ মাসে কচি তালশাঁস হায়রে যেমন তর।
শ্রীমতীর প্রেম-অমৃতসিক্ত দুইটী বচনমুক্তা
স্ফুটিত-অধর-শুক্তি হইতে হয় ত হইবে মুক্তা।
সেগুলি মগজে গাঁথি, পদরজে রঞ্জিত করি শির
এস ত্বরা করি চিৎপুর ধরি। তোমারে, কর্ম্মবীর,

দেখিবার ভানে, বারাণ্ডাপানে চাহিয়া বিগতশোক,
মলিন কোর্ত্তা আপিস ফের্‌তা কৃতকৃতার্থ হোক্‌।
ইতি মহাকবি শ্রীগালিদাস বিরচিতে কাকদূতে উত্তরকাকঃ।

শ্রীশ্রীগালিদাস।

বর্ণের প্রভাব ও আকারের পসার।

জীব-জগতে বর্ণের প্রভাব সর্ব্বত্র। 'মনেরে না বুঝাইয়া নয়নের দোষ কেন' কবিউক্তির সার্থকতা বাস্তব-ক্ষেত্রে অতি কম; বরং 'আগে দর্শনধারী পরে গুণ বিচারী!'—বাহিক সৌন্দর্য্যের প্রভাবই আদিতে;—নয়ন ভুলে প্রথমে, মন ভুলায় সে তারপর। নয়নের সে আকর্ষণ কিসে? বস্তুর গঠন-সৌষ্ঠবে বা বর্ণে। নয়নের উপর গঠন-সৌষ্ঠবের আধিপত্য অপেক্ষাকৃত গৌণে; দৃষ্টিমাত্রই তাহা নয়ন ধাঁধিয়া দিতে পারে না, পর্য্যবেক্ষণ, পর্য্যা-লোচনের অপেক্ষা রাখে কিন্তু বর্ণ চক্ষে পড়িবামাত্র তৃপ্তিতে দৃষ্টি তন্ময় হইয়া যায় বা অসহনীয় তীব্র বর্ণাভায় নয়ন তখনি আপনি মুদিয়া আসে। সত্য বটে 'বিবাহ-বাজারে' সৌন্দর্য্য-অন্ধ বরকর্ত্তার নিকট রূপচাঁদের ঝুন্ ঝুন্ টুন্ টুন্ মধুর মিষ্ট নিক্কণের তুলনায় বর্ণের মূল্য শূন্য, কিন্তু নটবর তরুণ নায়কের প্রার্থনীয় ঐ বর্ণ, তাহার বন্ধুবর্গের বাহবা ঐ বর্ণে; দুধ-আলতা-গোলা রংটির জোরে কত খাঁদাটেরা সসম্মানে সুন্দরীর আসনে অনায়াসে প্রতিষ্ঠিতা; পক্ষান্তরে সুগঠিতা বহু কষ্টিপাথর-প্রতিমা প্রথমেই বর্ণাঘাতে দর্শকের নয়ন প্রতিহত করিয়া "ভুতনী" নামে অভিহিতা, অবজ্ঞাতা। বলিবে "ভ্রমর?" অমর কবির অতুলনীয় প্রতিভার ফল সে, অপূর্ব্ব কল্পনা-দুহিতা, তাহার জোড়া বাস্তব জগতে অতি অল্প! সে ভ্রমরকেও বর্ণের দৌরাত্ম্য কম সহ্য করিতে হয় নাই। থাকিত যদি তাহার রোহিণীর মত রূপ, তবে কি তাহাকে অমন গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া মরিতে, হইত! রোহিণী জয়ী কোন আয়ুধে?—রূপে,—ঐ বর্ণে; রক্তবিম্বাধরের হাসিতে, বিদ্যুৎ-আকর্ষণী ঐ নয়নতারকার কৃষ্ণবর্ণে।

উনিশ বৎসরের ইন্দিরা ঠাকুরাণী যখন দস্যুহস্তে, তখন তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল কিসে?—ঐ বর্ণে। যখন দস্যুরা তাহাকে 'নিবিড় অরণ্যে অন্ধকার রাত্রিতে' 'বন্যপশুদিগের মুখে সমর্পণ করিয়া যায় দেখিয়া' ইন্দিরা কাঁদিয়া উঠিল, কহিল, "তোমাদিগের পায়ে পড়ি, আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চল।" 'এক প্রাচীন দস্যু সকরুণ-ভাবে বলিল, "বাছা অমন রাঙ্গা মেয়ে আমরা কোথায় লইয়া যাইব? এ ডাকাতির এখনই সোহরৎ হইবে—তোমার মত রাঙ্গা মেয়ে আমাদের সঙ্গে দেখিলেই আমাদের ধরিবে।'

তারপর অন্ধকার রজনীতে অরণ্যে অসহায়া, ক্ষুধাতৃষ্ণায় ওষ্ঠাগতপ্রাণ, পরিধানে 'ছেড়ামুড়া কাপড়টুকু' 'তাহাতে কোনমতে কোমর হইতে আটু পর্য্যন্ত ঢাকা পড়ে'—বুক পর্য্যন্ত পৌঁছায় না। ইন্দিরা স্থির করিল, 'কেমন করিয়া লোকালয়ে কালামুখ দেখাইব? যাওয়া হইবে না—এখানেই মরিতে হইবে।' মৃত্যুই তখন তাহার বরণীয়। ইন্দিরা মরিবে,—নিরাশ হৃদয় বলিতেছে "মৃত্যুই সুখ।" তাহাকে তখন রক্ষা করিল কিসে?

নিরাশ হৃদয়ে আশার আলোক কে জ্বালাইয়াছিল? ঐ বর্ণ। 'দিবার আলোক দেখিয়া আবার বাঁচিবার ইচ্ছা হইয়াছিল।' 'পৃথিবীতে রবিরশ্মি প্রভাসিত দেখিয়া' 'লতায় লতায় পুষ্পরাশি দুলিতেছে দেখিয়া আবার বাঁচিবার ইচ্ছা প্রবল হইল।' তাহাকে বৃক্ষতল হইতে গৃহে স্থান দিয়াছিল কে?—ঐ রূপ, বর্ণ। প্রাচীন ব্রাহ্মণের নিকট সুন্দরীর বংশপরিচয় দিয়াছিল স্বয়ং, তাহার রূপ। ব্রাহ্মণ স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে আইস। তোমার ময়লা মোটা কাপড় বটে, কিন্তু তুমি বড় ঘরের মেয়ে, ছোট ঘরে এমন রূপ হয় না।"

তারপর দত্তবাড়ীর পুত্রবধূ সুভাষিণী কেমন করিয়া প্রথম দর্শনেই বুঝিয়াছিল, ইন্দিরাও তাহারই মত বড় ঘরের মেয়ে, বড় ঘরের পুত্রবধূ। সুন্দরীরা অন্যের রূপের সুখ্যাতি বড় সহজে করিতে চায় না। সুভাষিণী আদিতে ইন্দিরার রূপে আকৃষ্টা হইলেও, ইন্দিরাসম্ভাষণে সে কথা মুখে আনিল না—সে যে ইন্দিরার সোনার অঙ্গে অলঙ্কারের কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্ক (রূপ দেখিতে) দেখিয়াছিল তাহারই উল্লেখ করিল। সেই রূপ, সেই ঢল ঢল সরল নির্ম্মল নয়ন, তাহাকে ইন্দিরার বংশের বিষয়ে,—পবিত্রতা সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় করিয়াছিল। সহৃদয়া সুভাষিণী রমণীর মান, তাহার বংশের সম্মান রক্ষা করিয়া সখীর মতই বলিল "ভাই, কার মেয়ে, কার বউ, কোথা বাড়ী তাহা এখন জিজ্ঞাসা করিব না। এখন যাহা বলিব শুন। তুমি বড় মানুষের মেয়ে, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি, তোমার হাতে গলায়, গহনার কালি আজিও রহিয়াছে। তোমাকে দাসীপনা করিতে হইবে না—তুমি কিছু রাঁধিতে জান কি? * * * তোমাকে রাঁধুনীর মত রাঁধিতে হইবে না। আমরা সকলেই রাঁধিব, তার সঙ্গে তুমি দুই একদিন রাঁধিবে। কেমন রাজি?" ইন্দিরা ত রাজি, কিন্তু সুন্দরী সুভাষিণী ইন্দিরার জন্য এত করিতে, সখীরূপে গ্রহণ করিতে প্রথম দর্শনেই, পরস্পরের হৃদয় অজ্ঞাত অপরিচিত থাকিতেই রাজি হইল কেন?—এ রাজির মূলে কি সৌন্দর্য্য, দুধ-আলতা-গোলা বর্ণ নহে? গৃহিণীর,—সুভাষিণীর শাশুড়ীর,—"কালীর বোতলের', ইন্দিরাকে তাঁহার গৃহে স্থানদানের আপত্তির কারণও ঐ রূপ:—সে বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায়ও হইয়াছিল, সুভাষিণীর রূপে, নতুবা কি রমণবাবুও অত সহজে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া রাজি হন। পরিশেষে সেই 'সধবা হইয়াও জন্মবিধবা' ইন্দিরার স্বামীর সহিত সুখ-মিলন ঘটাইল কে?—তাহার বর্ণ,—অঙ্গসৌষ্ঠব,—রূপ, কাল চোখের 'একটা চোরা চাহনি।' স্বামী, স্ত্রীর প্রকৃত পরিচয় না পাইয়াও যখন তাহার বাহ্যিকসৌন্দর্য্যকে জগতের সকল সৌন্দর্য্য হইতে (মোহে বা যাহাতেই হউক) বড় দেখিলেন; ইন্দিরার রূপ ঐশ্বর্য্যের তুলনায় যখন বিমল ধবল মল্লিকা পুষ্পের অনিন্দ্য স্নিগ্ধ বর্ণও নিষ্প্রভ, হীন হইয়া গেল। তিনি 'মল্লিকা কোরকের বালা' পরিহিতা ইন্দিরার 'হাতখানা ধরিয়া রাখিয়া যেন বিস্মিতের মত হাতের পানে চাহিয়া রহিলেন। ইন্দিরা বলিল "দেখিতেছ কি?" তিনি উত্তর করিলেন "একি ফুল? এ ফুলে মানায় নাই। ফুলটা অপেক্ষা মানুষটা সুন্দর। মল্লিকা ফুলের চেয়ে মানুষ সুন্দর এই প্রথম দেখিলাম।"—তখনি দীর্ঘ-বিরহবাসরে স্বামীস্ত্রীর ভাবি-পুনর্মিলনের অঙ্কুর রূপ-সৌন্দর্য্যে অস্তিত্ব লাভ করিল। ইন্দিরাও তখন 'হোলির দিনে আবির খেলার মত, পরকে রাঙ্গা করিতে গিয়া, আপনি অনুরাগে রাঙ্গা হইয়া' গেল। তাহার কত পুরে না পরিচয়,—রূপসী তখন সত্যই—

তাঁহারই সোহাগে আমি সোহাগিনী

রূপসী তাহারই রূপে'—বলিবার অধিকারিণী।

উপসংহারে সেই 'সুখবাসরে রমণী পল্টনে'ও বর্ণের পূর্ণ প্রভাব। সেখানে কত 'ভ্রমর-তারা চোখ', 'কত কালো কালো কুণ্ডলীকরা ফণাধরা অলকরাশি' 'কত রাঙ্গা ঠোঁটের ভিতর হইতে কত মুক্তাপংক্তির মত দন্তশ্রেণীতে

কত সুগন্ধি তাম্বুলচর্ব্বণে কত রকম অধর লীলার তরঙ্গ', 'পায়ে আলতার বাজার', কোথায় বা "কালোতে রাঙ্গা, যেন যমুনাতে জবা।' পরণে 'কত বানারসী, বালুচরী, মৃজাপুরী, ঢাকাই, শান্তিপুরে, সিমলা, ফরাসডাঙ্গা,—চেলি গরদ সুতা—রঙ্গকরা, রঙ্গভরা, ডুরে ফুরফুরে'*—রঙ্গের বাজার,—রঙ্গে মনোলোভা—যেখানেই সৌন্দর্য্যসৃষ্টির প্রয়াস সেখানেই বর্ণের সম্মিলন! এপ্রথা আজিকার নয়—মানব হৃদয়ের স্তরে স্তরে চিরন্তন এ বর্ণ-পিপাসা। আদি-কবি বাল্মিকীও বর্ণপ্রভাব হইতে মুক্ত নন। রামায়ণে—আদি মহাকাব্যের প্রকার মহাসমরের মূলে এই বর্ণপ্রভাব; সর্ব্বনাশী সূর্পনখা যদি বীরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণের নিখুঁৎ সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠবে, শেফালিকা-বৃন্ত-লাঞ্ছিত গৌরবর্ণে আত্মবিক্রীত করিতে পাগল না হইত, লঙ্কেশ্বর যদি উষার স্বর্ণরাগরঞ্জিত অনন্ত উদার আকাশতুলা জানকীর অনিন্দ্য অতুলনীয় রূপ-সমুদ্রে ঝম্পপ্রদানপ্রয়াসী না হইতেন, মায়ামৃগরূপী মারিচের অস্বাভাবিক দ্যুতিঃ সম্পন্ন স্বর্ণবর্ণ যদি অমন স্থিরাধীরা রমণীশিরোমণি সীতা ঠাকুরাণীর বিলাস-বিভ্রম না ঘটাইত, মেধার জীবন্তবিগ্রহ, ভূতভবিষ্যত-বিচারে সর্ব্বজ্ঞ, সুধীশ্রেষ্ঠ, ধরণীর আদর্শ অধীশ্বর রামচন্দ্র যদি ক্ষণেকের জন্য সর্ব্ববিচারবিচ্যুত হইয়া রূপ-পীয়াসিক্ত পত্নীর লালসাপূরণে ব্যগ্র না হইতেন, তবে কি পুণ্য-প্রতিমা, সতীশ্রেষ্ঠা জানকীকে অমন ভীষণ পরীক্ষায় পতিত হইতে হইত,—না, স্বর্ণলঙ্কা ওরূপ ভাবে অধঃপাতে যাইত, যে রাবণ বিপুলবংশা—এক লক্ষ পুত্র যার সওয়া লক্ষ নাতি সেই কি নির্ব্বংশ হয়! কাব্যকথা, এ বৈজ্ঞানিক যুগে কবির কল্পনা বলিয়া বিবেচিত হওয়া বিচিত্র নহে কিন্তু বর্ণ বিড়ম্বনায় নীলাচলে মহাপ্রাণের মহাপ্রয়াণ, যে প্রত্যক্ষ ঘটনা,—মাত্র পঞ্চশত বৎসরের কথা। নীলাম্বুধি, গৌর অঙ্গ হৃদয়ে ধারণ করিতে চিরচঞ্চল তরঙ্গায়িত,—সে নীলাভ ফেনপুঞ্জ নীলমাধবের কুঞ্চিত চাঁচর চিকুরের ন্যায় দুলাইয়া দুলাইয়া কি আকর্ষণে অতবড় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের, অসামান্য প্রতিভার অবতারের, মহাপ্রাণ চৈতন্যের চৈতন্য বিলোপ করিয়া বক্ষে টানিয়া লইয়াছিল—তাঁহার উপাস্যের—প্রেমাস্পদের বর্ণাভা অনুকরণই কি তাহার সাফল্যের কারণ নহে? ভাবের ঠাকুরের ভাবতাড়িত হৃদয়ের কথা না হয় অপার্থিব। অতি সাধারণ ব্যক্তির হৃদয়ের উপরও বর্ণের প্রভাব কম নহে। ডাক্তারী পত্রিকায় প্রকাশ ফরাসীদেশে এক ব্যক্তি অনবরত রক্তবর্ণ কাগজ আচ্ছাদিত গৃহে আবদ্ধ থাকায়, বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া গিয়াছিল; রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হইতে দেখিয়া কত লোক উন্মাদে পরিণত হইয়াছে এরূপ ঘটনা সংসারে বিরল নহে। পক্ষান্তরে পারিপার্শ্বিক বৃক্ষলতাদির সবুজবর্ণ, নভোমণ্ডলের সুনীল স্নিগ্ধ বর্ণাভা কিরূপ মনমুগ্ধকর নয়নপ্রাণ তাহাতে কিরূপ তৃপ্ত! অসভ্যগণের পুষ্পপ্রীতি, গৃহপ্রাচীরে নানা বর্ণের চিত্র চিত্রণে তাহাদের অনুরক্তি বর্ণানুরাগেরই পরিণাম। সভ্য জগতে গৃহে গৃহে বর্ণপ্রীতির উদাহরণ; বেশভূষায়, গৃহে, অবস্থানকক্ষে, গৃহপ্রাঙ্গনে, উদ্যানে, মনোময় বর্ণসামঞ্জস্যের চেষ্টা। বৃহৎ নগরে, কর্ম্মব্যস্ত উত্তেজনার মধ্যে একটু নিরালা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া তাহাতে প্রকৃতির ভাবে প্রকৃতিকে ফলাইবার কত কৌশল; কৃত্রিম উপায়ে পাহাড়, হ্রদ, নদী, পুষ্পবাটিকা, লতামণ্ডপাদি প্রস্তুত করিয়া প্রকৃতির বর্ণ গৌরবকে প্রাধান্য দানে মানব মনকে তৃপ্ত করিবার কত প্রয়াস। প্রাকৃতিকদৃশ্য-বৈচিত্র্যহীন শ্যামসৌন্দর্য্যবিরল শীতপ্রধান পাশ্চাত্যখণ্ডে ত প্রত্যেক ধনীর আদর্শ-ভবনই প্রকৃতির অনুকরণে কৃত্রিম দৃশ্য সম্বলিত। এমন কি অনেক প্রাসাদসংলগ্ন বন মধ্যে সুদৃশ্য হরিণাদি জীবেরও অভাব নাই। তুষারের শুভ্রবর্ণাবদগ্ধ ধনীহৃদয় লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে এই সকল নয়নাভিরাম বর্ণ-সৌন্দর্য্য ক্রয় করিতে কিরূপ ব্যগ্র,—মানব মনের উপর বর্ণের কি অপ্রাকৃত প্রভাব।

* বন্ধনী উদ্ধৃত অংশগুলি সাহিত্যগুরু বঙ্কিম চন্দ্রের।

মানুষ হিতাহিত জ্ঞান সম্পন্ন জীব,—বিচার বুদ্ধিতেই তাহার মানবিকতা। রূপের আকর্ষণ অপরিমেয় হইলেও জ্ঞানীর নিকট, তাঁহার বিচারবুদ্ধির বলে, বাহ্যিক-সৌন্দর্য্য অপেক্ষা গুণেরই অধিক আদর। কিন্তু মানবেতর জীব সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির কবলে। তাহাদের অধিকাংশেরই জীবনমরণ, আত্ম-রক্ষা, বংশসংরক্ষণ, এমন কি অস্তিত্বের আদিতে এই বর্ণাধিপত্য বা গঠন বৈচিত্র্য। আত্ম-রক্ষার জন্য জীবের কি ভীষণ জীবনসংগ্রাম, তাহার ফলে, ক্রমবিকাশে জীবজগতে কি মহাপরিবর্ত্তন, বিবর্ত্তনবাদের মূলে প্রকৃতির,—তাহার প্রধান সম্পদ আলোক আঁধারের, বর্ণের—কতখানি হাত, তাহা আমরা "মৎস্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ" প্রবন্ধে প্রসঙ্গতঃ আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকযুগে ক্রমবিকাশতত্ত্বের আদিগুরু ডারুয়িনের মতবাদ হইতে তাঁহার শিষ্যবর্গ উন্নত তথ্যে উপনীত হইলেও আত্মরক্ষা প্রচেষ্টায় ক্রমবিকাশ-সূত্র-সম্বন্ধে কাহারও মত-বিরোধ ঘটে নাই। জীবের আত্মঅভাব পূরণে,—বংশপরম্পরা প্রচেষ্টায় তাহারা যাহা যাহা লাভ করিয়া,—অঙ্গ অবয়বে যে সকল পরিবর্ত্তনে পুষ্ট হইয়া শত্রুজয়ী হইতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার প্রধানটি হইতেছে বর্ণের পরিবর্ত্তন। ক্রমবিকাশফলে উন্নত জীব আত্মরক্ষার উপযোগী আরও আয়ুধ লাভ করিয়াছে সত্য কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনুন্নত কীটপতঙ্গাদি জীবের ও উদ্ভিদাদির আত্মরক্ষার প্রধান সহায় বর্ণ বা আকারের পসার।

দুর্ব্বলের নীতিই,—য পলায়তি স জীবতি। ইতরপ্রাণীর মধ্যেও এ নীতির কম প্রসার নহে; আত্মগোপন দ্বারা শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের প্রবৃত্ত জীব জগতে যথেষ্ট। পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গাদির মধ্যে এমন জীব অনেক আছে, যাহারা তাহাদের বর্ণের তুল্য বর্ণ বিশিষ্ট পারিপার্শ্বিক কোন না কোন বস্তুর সহিত বেমালুম রং মিশাইয়া প্রবল শত্রুর তীক্ষ্ণ চক্ষু প্রতারিত করে।—আশ্রিত বস্তুর অন্বেষণে ইহাদের লুকাইবার আবশ্যক নাই,—ইহারা আশ্রয় স্থলের বর্ণে বর্ণ মিলাইয়া এমন নিশ্চল নিশ্চেষ্ট ভাবে, তাহাতে লগ্ন হইয়া থাকে যে অতি নিকটে অবস্থান করিয়াও তাহা সহজে লক্ষ্যীভূত হয় না। একদা একটি ফিকে রেসমী রং যুক্ত প্রায় অর্দ্ধহস্ত পরিমিত প্রজাপতিকে উড়িতে দেখি,—পরক্ষণেই সেটি কোথায় অদৃশ্য হইল, অথচ তাহাকে বহুদূরে উড়িয়া যাইতে দেখিলাম না,—কৌতূহলী হইয়া অনুসন্ধান করিয়াও বিফল মনোরথ হইবার উপক্রম, এমত সময় একটী ভেড়াগুা বৃক্ষে আমার গাত্র স্পর্শ হওয়ায় প্রজাপতিটি উড়িয়া আবার একটি পক্কভেড়াগুাপত্রে বসিল—তখন দেখি সে এমন ভাবে পত্রে অঙ্গ মিশাইয়াছে, উভয়ের বর্ণে এমন সাদৃশ্য যে তথায় প্রজাপতির অস্তিত্ব আর উপলব্ধি হইবার উপায় নাই। ইহারা লক্ষিত (detected) হইলে এত দ্রুত পলায়ন করিয়া আবার অন্য আশ্রয় অবলম্বন করে যে সহজে সে স্থল লক্ষ্য করা কষ্টকর। বস্তুরও অন্ত নাই, বর্ণবৈচিত্র্যেরও অন্ত নাই—আত্মগোপনপ্রয়াসী জীবের তুল্যবর্ণ-বস্তুর অভাব হয় না। প্রকৃতিতে শ্যাম ও সবুজবর্ণের আধিক্য,—এই শ্রেণীর জীবগণ, বিশেষতঃ বৃক্ষপত্রাবলম্বী কীটপতঙ্গের অধিকাংশই দূর্ব্বাদলশ্যাম বা সবুজবর্ণের। বৃক্ষপত্রবর্ণ প্রজাপতির (Kallima or leaf-like butterflies) পক্ষের উপরিভাগের বর্ণ প্রায়ই সাধারণ পত্রের রং,—কাহারও বা পক্কপত্রের ন্যায় হরিদ্রাভ; কিন্তু পক্ষনিম্নের রং নানাপ্রকারের এবং পক্ষের পার্শ্বগুলিও অনেকটা পত্রপার্শ্বের আকারের। সবুজবর্ণের কীটাদি সবুজপত্র অবলম্বন করিয়া, হরিদ্রাবর্ণের পক্কপত্র আশ্রয়ে আত্মগোপন করে; কিন্তু ইহার মধ্যেও একটু কৌশল করিতে দেখা যায়। কতকগুলি সবুজবর্ণ কীট সবুজপত্র হইতে তাড়িত হইলে অনেক সময় পক্কপত্রে আশ্রয় লয়, এবং তাহাদের পক্ষের উপরিস্থ কঠিন আবরণ উন্মুক্ত করিয়া হরিদ্রাবর্ণের পক্ষ বিস্তার করিয়া বসে। কেহ বা সঙ্গে সঙ্গে শরীরের অঙ্গ অবয়ব কুঞ্চিত বা প্রসারিত করিয়া বহুরূপ ধরিতে সমর্থ, তাহাদের বিকৃত আকার দেখিয়া, সেই যে পূর্ব্বদৃষ্ট জীব তাহা আর বুঝিবার উপায় থাকে না। ইহাদের অধিকাংশেরই সেই আকার পরিবর্ত্তনে একটা বিশেষত্ব বর্ত্তমান। ইহাদের বিকৃত

আকারটি প্রায়ই শত্রুর বিরক্তি বা ভীতি উৎপাদক কোন একটি জীবের আকারে প্রকাশ পায় ; তখন আর তাহারা আত্মগোপন প্রয়াসী থাকে না, বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা পায়, শত্রু সে মূর্ত্তি দেখিয়া ত্রাহিত্রাহি রবে পলায়নের পথ পাইলে বাঁচে।* ইন্দারায় একপ্রকার কীট দেখিয়াছি, ইহাদের উদরের বর্ণ সাদা ও পৃষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণের ; সাধারণতঃ ইহারা ইন্দারার ভিত্তি সংলগ্ন হইয়া থাকে, কিন্তু তাড়া দিলে তৎক্ষণাৎ চিৎ হইয়া জলে নিশ্চলভাবে ভাসে, জলের বর্ণে উদরের বর্ণ মিশাইয়া আক্রমণকারীর দৃষ্টিবিভ্রম ঘটায়। ভেকাদি অনেক জীব, তাড়া পাইলে শুষ্ক তৃণ বা পত্রের স্তূপ মধ্যে প্রবেশ করিয়া মুহূর্ত্তে আত্মগোপন করে ; উহা তাহাদের বর্ণের সহিত পারিপার্শ্বিক বস্তুর বর্ণের মিলনে সংঘটিত হয় না,—আলো ছায়ার খেলায়, (Light and shade এ) সম্পাদিত হয় ; অতি দ্রুত তাহারা এমন একটা অলোক-অন্ধারক স্থান পছন্দ করিয়া লয় যে কোথায় তাহারা আশ্রয় লইল, সহজে অনুধাবন করা যায় না। তাহারা চক্ষে পড়িলেও শুষ্কপত্রস্তূপ মধ্যে, তাহাদের অর্দ্ধ লুক্কায়িত দেহ অস্পষ্ট-ছায়া-অন্ধকারে (in shades) ভিন্ন বস্তু বলিয়া প্রতীয়মান হয় ও শত্রুর দৃষ্টি প্রতারিত করে। আলোছায়ার দৌরাত্ম্যে এরূপ দৃষ্টিবিভ্রম বহুক্ষেত্রে। জিলিপীর মত পেচান সুস্পষ্ট মোটা দাগ কাগজে অঙ্কিত করিয়া ঘুরাইলে যে কারণে চক্রের ন্যায় ঘুড়িতেছে বলিয়া মনে হয় ; মৌচাকের ছিদ্র সারির প্রথায় সজ্জিত, কাগজে অঙ্কিত গোলাকার দাগগুলি একটু দূরে রাখিয়া দেখিলে যেহেতু ষট্‌কোণী ছিদ্রের আকারে দেখা যায়, সংসারের অধিকাংশ দৃষ্টিবিভ্রমই তুল্য কারণে ঘটিয়া থাকে ! দৃষ্টিশক্তির মূলেই আলোক ; নয়নমণিতে আলোকের প্রভাবেই ভালমন্দ দর্শনশক্তি ; আলোকে, সুতরাং বর্ণেই যত অভ্রম-বিভ্রম—চক্ষের ধাঁধা !

শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য যেমন জন্তুর আত্মগোপন, শত্রুকে আক্রমণ করিবার জন্যও আবার তেমনি। সিংহ পশুরাজ, সেও সন্ধ্যার আধআলো আধছায়ায় ঝোপের মধ্যে বেমালুম বর্ণ মিশাইয়া শিকারের অপেক্ষায় ছোঁ পাতিয়া বসিয়া থাকে।† উত্তরমেরুর শ্বেতভল্লুক, শুভ্র বরফের মধ্যে তাহার বাস, গাত্রের বর্ণ অন্য প্রকার হইলে, তাহার জীবনধারণ অসম্ভব হইত ; শ্বেতবর্ণের জোরে উহারা বরফে মিশিয়া থাকিয়া শিকার করে ; আমেরিকায় এক প্রকার বিষহীন সর্পের প্রিয়খাদ্য বানর ; উহাদের গাত্রবর্ণ বৃক্ষ-বল্কলের ন্যায় ; সেই বলেই উহারা দ্রুতগামী চঞ্চল বানর শিকারে সমর্থ। আমাদের দেশের 'লাউডগা' সর্পের শিকার প্রণালীও ঐরূপ। মাকড়সা জাতীয় জীবের মধ্যে এরূপ উদাহরণের অভাব নাই। বিহঙ্গের মধ্যে শুভ্রোদর বক প্রভৃতি বর্ণ অস্ত্রে শিকার করিয়া বর্ণের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। অনেক সরিসৃপের শিকার সহায় বর্ণ। কৃকলাস মুহুর্মুহু গাত্রবর্ণ পরিবর্ত্তনের জন্য প্রসিদ্ধ, ইহারা আবশ্যকমত গায়ের রং বদলায়। প্রবল শত্রুর তাড়নে বৃক্ষান্তরালে লুকাইবার সময় বৃক্ষের বল্কলের বর্ণ অনুকরণ করে ; শিকার করিবার কালে নীলাভ, গলদেশ পার্শ্বে দুইটি রক্তবর্ণের থলিয়া বাহির করে, শিরদাঁড়ার উপরের রক্তাভ কাঁটাগুলি খাড়া করিয়া তুলে, দেহ ঘনঘন কাঁপাইতে থাকে, তখন তাহার "যুদ্ধং দেহির" আঠারআনা আয়োজন, তাহা দেখিয়া শিকারের প্রাণ জীবত্বেই 'যাই যাই' করে,—রক্তবর্ণ দেখিয়া রক্তহীন। রক্তচক্ষুর (Bloodshot eyes) মহিমা অবশ্য এই দাসত্বপ্রিয় বঙ্গবাসীকে কষ্ট করিয়া বুঝান নিষ্প্রয়োজন ! সমগ্র জীবজগতে বর্ণ বিশেষে ভীতি ও বিশিষ্ট বর্ণে প্রীতি পরিলক্ষিত হয় ; মনের

* This method of rendering invisible any part which would interfere with the resemblance is well known in mimicry. A common aid to concealment is the adoption by different individuals of two or more different appearances, each of which resembles some special object to which an enemy is indifferent. (W. Muller zool :)

† Darkest Africa.

উপর ও স্নায়ুতন্ত্রে বর্ণের প্রভাব নিরতিশয়। শত্রুর মনের এই দৌর্ব্বল্যের সহায়তা অবলম্বন করিয়া অনেক দুর্ব্বল প্রাণী প্রবল শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করে। ইহারা ভীষণ শত্রুর সমক্ষে পতিত হইলে পলায়নপর হয় না বা আত্মগোপন করে না; শত্রুর ভীতিপ্রদ বর্ণে বা তাহার অপ্রীতিকর আকারে বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া আত্মরক্ষা করে; বিজ্ঞানের ভাষায় জীবের এই প্রবৃত্তির নাম "অনুকৃতি" (Mimicry) অর্থাৎ অনুকরণ দ্বারা শত্রুর হস্ত হইতে অব্যাহতি বা শত্রুর কোন প্রবল শত্রুর অথবা শত্রুর কোন 'চোখের বালির' রূপ অনুকরণে সিংহচর্ম্মাচ্ছাদিত গর্দ্দভের ন্যায়, নিজে দুর্ব্বল হইয়াও 'বহুরূপী বিদ্যা বলে' শত্রুর ভীতি উৎপাদন করিয়া শক্তিহীনের আত্মত্রাণের উপায় বিধান। জীবের এই "অনুকৃতিতে" আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি প্রথমে অনুধাবন করিয়াছিলেন, প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদ্ প্রাণিপণ্ডিত এচ, ডবলিউ বেটস্ (H. W. Bates). তাহার পূর্ব্বে মহামতি ডারুয়িনের দৃষ্টি অতি অস্পষ্ট ভাবে এদিকে পতিত হইয়াছিল, তিনি জীবের যৌন-নির্ব্বাচন প্রবৃত্তি আলোচনা কালে তাহাদের মন ও স্নায়ুর উপর বর্ণপ্রভাব লক্ষ্য করেন* কিন্তু তখন তিনি অন্য তথ্যানুসন্ধানে বিশেষভাবে ব্যস্ত থাকায় এদিকে দৃষ্টি দেন নাই। পণ্ডিত বেটস্ 'জীবের আত্মরক্ষা প্রবৃত্তির' অনুশীলন ব্যপদেশে লক্ষ্য করিলেন, পত্র বৃক্ষবল্কলের বা অন্য কোন পারিপার্শ্বিক জড়বস্তুর বর্ণে আত্মবর্ণ সংযোগে আত্মরক্ষার সূত্র (theory) সকল ক্ষেত্রে কার্য্যকরী নহে, বিশেষতঃ যেখানে জীব আত্মপ্রকাশ দ্বারা আত্মরক্ষা করে সেখানে পূর্ব্বোক্ত 'বর্ণাচ্ছাদনে আত্মরক্ষা' সূত্র অচল। তিনি দেখিলেন, এ শ্রেণীর জীবেরা, শত্রুর কোন প্রবল শত্রুর আকার ও বর্ণের অনুকরণ করিয়া শত্রুর ভীতি উৎপাদনে আত্মরক্ষা করে, তাহা হইলেই শত্রুর স্বভাব ও তাহার ভীতিপ্রদ বস্তু সম্বন্ধে তাহার (অনুকরণকারী দুর্ব্বল জীবের) একটা ধারণা আছে—যে কোন প্রকারেই হউক শত্রুর মনে আতঙ্ক সঞ্চার করাই তাহার উদ্দেশ্য। এ সংজ্ঞাত বুদ্ধি অনুকরণকারীর থাকা অসম্ভব নহে—কারণ অনুকরণকারীর সমজাতীয় (belong to the same genus) জীবের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর (species) বা সমবংশীয়দের (of family) মধ্যে শত্রু শত্রু অন্তর্গত থাকে যদি, তবেই গিয়া দুর্ব্বলের প্রবল জাতির 'অনুকৃতি' দ্বারা আত্মরক্ষা সম্ভব। আবশ্যকমত সামান্য পরিবর্ত্তনের প্রাধান্য না দিয়া বেটস্, অনুকরণকারী (Mimic) এবং আদর্শের (model) উভয়ের আকারগত সাদৃশ্যের প্রভাবই স্বীকার করিলেন। পরবর্ত্তী জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মুলারের (Muller) অনুসন্ধান কালে বেটসের সূত্র (Batesian mimicry) প্রসারিত হইয়া "এক জাতীয় জীবের" সীমা অতিক্রম করিল। মুলার প্রমাণ করিলেন—'অনুকৃতি নীতি এক জাতীয় জীবে সীমাবদ্ধ নহে; নানাজাতীয় জীব,—মাকড়সা, পিপীলিকা, গোবরেপোকা প্রভৃতি, এমন কি শম্বুক, সর্প, গিরগিটী,—একজাতীয় জীব অন্য জাতীকে আত্মরক্ষা ব্যাপারে অনুকরণ করিতেছে। একস্থানের বাসিন্দা জীবগণ (animals living in the locality) অন্যের বিপক্ষপক্ষের স্বভাবাদি বুঝিয়া আত্মরক্ষার উপায় করে। উহা সহজাতসংস্কার নহে,—বহুদর্শীতার ফল।† সুতরাং বস্তুর প্রথম আস্বাদন মাত্রেই অভিজ্ঞতা, অর্থাৎ বস্তু সম্বন্ধে একটা স্থায়ী ধারণা জন্মিতে পারে না; এটা আহারীয় রূপে গ্রহণীয়, ওটার স্বাদ 'বিশ্রী', অখাদ্য, সে জ্ঞান অনেক ঠেকিয়া ঠকিয়া তবে লাভ করা যায়, এবং কেহ সে মত সহজে পরিবর্ত্তন করিতে চায় না; চুণে মুখ পুড়িলে দধি ভক্ষণে ভীত হয় অনেকেই। শত্রুর মনের এই প্রকৃতির সহায়তায়, সমজাতীয় প্রাণীর বিস্বাদত্ব অথবা শত্রুর অবজ্ঞা বা ভীতিব্যঞ্জক অন্য গুণে অপর কত জীব আত্মরক্ষায় সমর্থ হইতেছে। ইতর প্রাণীর ত দূরের কথা

* Life and letters—C Darwin, 1887.

† The knowledge is acquired by experience and since it is not at all events as a rule, taught by the first taste to any individual bird, it is reasonable to infer that a considerable amount of injury, sufficient to disable if not to kill, is annually inflicted upon insects belongnig to species protected by distatefulness or kindered qualities. Mimicry. Encyclopaedia Britanica.

বুদ্ধিজীবি মানুষকে পর্য্যন্ত শত্রুর স্মৃতিতে হতবুদ্ধি করে। সর্পের নাম স্মরণ হইবামাত্রই সঙ্গে সঙ্গে উহার মারাত্মক বিষের কথা আমাদের মনে উদিত হয়। ইহার ফলে কোন বিষহীন সর্পও যদি দৃষ্টিপথে পতিত হয়, উহাকে বিষহীন জানিয়াও আমরা পলায়নপর না হইয়া পারি না। বিপদের স্মৃতি ক্ষণেকের জন্য বিচারবুদ্ধি লোপ করিয়া দেয়। যাভা দ্বীপের এক প্রকার বানরের সর্পভীতি এত যে উহারা সর্পাকার বন্য লতা হইতে শত হস্ত দূরে থাকে। মধু মিষ্ট হইলেও মৌমাছির হুল কাহারও নিকট মধুর নহে। মৌমাছির রাণী নিজে হুলহীন, আত্মরক্ষায় অসমর্থ কিন্তু হুতুর্মু মৌমাছির সহিত তাহার আকার ও বর্ণগত সাদৃশ্য থাকায় সে একা অসহায় অবস্থায় পতিত হইলেও শত্রু হইতে নিরাপদ। ইংলণ্ডে মৌমাছির রাণীর আকারে এক প্রকার কীট পুষ্পোদ্যানে দৃষ্ট হয়, ইহাদিগকে পক্ষীরা স্পর্শ করে না। এ তথ্যের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক লয়েড্ মরগানের (Professor Lloyd Morgan) মতে মৌমাছির হুলভীতি এ ক্ষেত্রে পক্ষিহৃদয়ে কার্য্য করিতেছে। তিনি জীবের এ প্রবৃত্তি সম্বন্ধে হাতেকলমে বহু পরিক্ষা করিয়াছেন। কতকগুলি মুরগী শাবকের খাদ্যে তিনি কাল বা হরিদ্রা রং ও কুইনিন মিশ্রিত করিয়া দিয়া দেখিয়াছেন; তাহারা বুভুক্ষার জ্বালায় দুইচারি দিন সে খাদ্য গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিলেও, কুইনিনের তীব্র তিক্ত স্বাদের স্মৃতি তাহাদের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে তাহাদের (মাত্র দুইটি ছাড়া) জীবনে কখনও কাল বা হরিদ্রাবর্ণের বস্তু স্পর্শ করে নাই। অথচ তুল্য প্রকার খাদ্য, উক্ত বর্ণে রঞ্জিত না হইলে, আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করিয়াছে। প্রাণীতত্ত্ববিদ্ লর্ড মারশাল একটি বনমানুষকে তাহাদের অখাদ্য এক প্রকার বিস্বাদ প্রজাপতি (acraea anemosa) অনবরত খাইতে দিতেন, ফলে মনুজবংশের আদিপুরুষ মহাশয়কে খানার দৌরাত্ম্যে হরিবাসর করিতে হইত; অবশেষে তাহার প্রিয় আহারীয় অন্য আর এক প্রকার প্রজাপতি (precis sesamus) অথচ পক্ষের বর্ণে দেখিতে প্রায় উহার পূর্ব্বোক্ত জাতির ন্যায়, তাহাকে আহারের জন্য দেওয়া হয়, কিন্তু সে জঠরজ্বালায় অস্থির থাকিলেও, উহা ভক্ষণ না করিয়া, অতি সন্তর্পণে উহাকে পরীক্ষা করিয়া অনাহত অক্ষত অবস্থায় উড়াইয়া দিল। বানরপ্রবর অবশ্য দীর্ঘউপবাসের পর ধর্ম্মার্জ্জনপ্রবৃদ্ধ হইয়া উপযুক্ত পারণ-উপকরণ ত্যাগ করে নাই, কারণ পরক্ষণেই যখন তাহাকে শেষোক্ত জাতীর (precis sesamus) প্রজাপতির পক্ষচ্ছেদন করিয়া দেওয়া হইল, তখন প্রাপ্ত মাত্রই ভক্ষণ। খাদ্যের বর্ণই যত অনর্থের কারণ। দক্ষিণ আমেরিকায় খুব চটুল বর্ণবিশিষ্ট এক প্রকার প্রজাপতি প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়, ইহারা উড্ডয়ন-শক্তিহীন বলিলেই হয়, অতি সহজেই ইহাদিগকে ধরা যায় কিন্তু কোন পক্ষীই ইহাদিগকে কখনও বধ করে না অথচ প্রাণীবিজ্ঞানের বিভাগ অনুযায়ী অন্য যে সকল পতঙ্গ ইহাদের পর্য্যায়ভুক্ত তাহারা পক্ষীগণের প্রিয়খাদ্য। প্রসিদ্ধ প্রাণীতত্ত্ববিদ্ বেটস্, ওয়ালেস্ এবং বেল প্রত্যেকেই বিশেষ ভাবে পক্ষীর তাদৃশ অদ্ভুত আচরণের কারণ স্বাধীন ভাবে অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহাদের তিন জনের মতেই, উক্ত প্রজাপতির অগ্নিবৎ বর্ণপ্রাখর্য্যই পক্ষীগণের অনমুরক্তির কারণ; বেল বলেন, কোন সুদূর অতীতকালে এই প্রজাপতিপর্য্যায়ে এমন এক শ্রেণীর পতঙ্গ ছিল, যাহার অঙ্গে পক্ষী জাতির মহা অনিষ্টকারী বস্তুর অস্তিত্ব ছিল; সে শ্রেণীর পতঙ্গের বংশ যে কারণেই হউক লোপ পাইয়াছে বা বর্ত্তমান প্রজাপতিতে সেই পক্ষীকুল অপকারক অংশের অপলাপ ঘটিয়াছে, কিন্তু পক্ষীজাতী আজও পূর্ব্বস্মৃতি ভুলিতে পারে নাই। বেলের মতের প্রতিবাদ করিয়া পাউলটন (E. B. Poulton) বলেন, মিঃ বেলের মতবাদে সহজাতসংস্কারের কথাই মনে আসে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, স্বয়ংবেলও এ মত স্পষ্ট অস্বীকার করিয়াছেন; অনুকৃতিতে তিনি সহজাত সংস্কারের প্রভাব স্বীকার করেন না; ফলতঃ ঐ অস্বাভাবিক বর্ণটাই পক্ষী জাতির অসহ্য,—অপ্রীতিকর—তাই অদ্যও উক্ত প্রজাপতি চিরাজ করিতেছে।

স্বরের আকর্ষণী শক্তির ন্যায় বর্ণের আকর্ষণী বা বিকর্ষণী শক্তি আছে। বর্ণবিশেষ, জীববিশেষে স্নায়ুমণ্ডলের উপর পুরাদস্তুর প্রভাব বিস্তার করে। বন্য গো বা মহিষ রক্তবর্ণ দেখিলে উন্মত্তপ্রায় হয় ও বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে তাড়া করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। হরিদ্রা বর্ণে কয়েক জাতীয় কীটের প্রীতি তাহাদের এই ধর্ম্ম আবিষ্কারের ফলে য়ুরোপীয় পক্ষীপালকগণ হরিদ্রাবর্ণের ফাঁদ পাতিয়া বিনাটোপে উহাদিগকে ধরিয়া বিনা সূতায় মোহরের হার গাঁথিতেছে কি না জানি না—কিন্তু খাঁচার পাখীর উদরে উহারা স্থানলাভ করিতেছে তাহার লি[illegible]ত দলিল আছে। আমরা শিলং পাহাড়ে পাইনবনের নিকটে ছাপাড় জঙ্গলে একটী ইংরাজ যুবককে হরিদ্রাবর্ণের কাপড়ে নির্ম্মিত ফাঁদে পক্ষীর আহারোপযোগী কীট ধরিতে দেখিয়াছি। মশকেরও বর্ণবিশেষে অপ্রীতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।* পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিয়াছেন, বহ্নিতে পতঙ্গের প্রাণাহুতি উহাদের আলোকপ্রীতির কারণ নহে, বস্তুত আলোকপ্রভাবে উহাদের স্নায়বিক বিকৃতির ফল। পতঙ্গ চক্ষে আলোক পতিত হইবামাত্র উহাদের স্নায়ুমণ্ডলে একটা কার্য্য করে যাহাতে উহারা আলোকের প্রতি ধাবিত না হইয়া পারে না, প্রাণান্তক আকর্ষণ! মৎস্যজাতির মধ্যেও এ আলোক-উন্মত্ততা দৃষ্ট হয়, রাত্রে বাতির আলোকে আকৃষ্ট হইয়া অনেক মৎস্য জালে ধরা পড়ে। মনুষ্যের বর্ণপ্রীতির কথা (বিশেষত যৌননির্ব্বাচনে) না বলাই ভাল;—সহজে কি অসভ্য খাসিয়া রমণী মিসেস্ ব্রাউন বা মিসেস্ বড়ারিকে পরিণত হইয়াছে! প্রকৃতই যৌননির্ব্বাচন ব্যাপারে বর্ণ নিজ প্রভাব ন্যূনাধিক পরিমাণে, জীব-হৃদয়ে প্রধানতঃ ইতর প্রাণীতে বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। মনস্বী ডারুয়িন, যৌন-নির্ব্বাচন প্রসঙ্গ আলোচনায় এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।† প্রাণীগণ, বিশেষতঃ পক্ষীজাতির মধ্যে পুরুষগণ প্রণয়িনীকে সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট করিবার জন্য কিরূপ উজ্জ্বল বর্ণরাগে, সুন্দর পালকে সজ্জিত হয়, সুস্বরে আলাপে বিভোর থাকে, তাহা লক্ষ্য করিবার। ওয়ালেস, ডারুয়িনের এ মত (Theory) মানেন না—তাঁহার মতে যৌবনাগমে স্বাভাবিক মিলন প্রবৃত্তিই পশুপক্ষীর মিলনের মূলে। কিন্তু অধিকাংশ জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতই ডারুয়িনের মতের পক্ষপাতী। অনেক জীবেই পুংজাতির অঙ্গরাগের উপযুক্ত বর্ণকোষ দৃষ্ট হয়; উহারা আবশ্যকমত তাহা হইতে বর্ণাত্মকরস (Pigment) নিসৃত করিয়া অঙ্গরাগ সম্পন্ন করে। আমাদের দেশের ধনেশপাখী এ কার্য্যে সুপটু,—ইহারা ইচ্ছামত বর্ণে অঙ্গরাগ করিতে সমর্থ। পেকৃহাম প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মাকড়সাজাতীয় জীবে এসম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া সন্তোষজনক ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন প্রণয়িনীগণ পুংজাতির প্রেমনৃত্যে বিশেষভাবে মনসংযোগ করে কিন্তু প্রণয়াস্পদ নির্ব্বাচন ব্যাপারে স্ত্রীগণ নিজেই কর্ত্রী এবং তাহাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরই তাহা নির্ভর করে।‡ কিন্তু পুরুষের এই রাগ প্রবৃত্তি যৌননির্ব্বাচনের সময় ব্যতীত অন্য সময় থাকে না।§ ওয়ালেস্ উক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, বর্ণাত্মক রস, তাহাদের সৌন্দর্য্য অনুরাগের ফল নহে; যৌন-নির্ব্বাচনকালে পুংজাতিকে অধিকতর শ্রমী হইতে হয়, প্রতীদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিতে তৎকালে অধিক জৈবীশক্তির সঞ্চয় আবশ্যক; সেই অতিরিক্ত চাঞ্চল্যই (Surplus vital activity) সেই বর্ণের কারণ।

*কি বর্ণে মশকের বিরক্তি, কোথায় তাহা পাঠ করিয়াছি, এ দুর্ব্বল স্মৃতিতে আসিতেছে না—এ ম্যালেরিয়াপ্লাবিত দেশে তাহার আলোচনা, পরীক্ষা হইলে উপকার হইত। লেখক।

† The Descent of man—Darwin.

‡ "The females pay close attention to the love-dances of the males, and also that they have not only the power, but the will, to exercise a choice among the suitors for their favour."—(Nat : Hist. Soc. of Wisconsin, Vol. I. 1889.)

§ Epigamic characters are often concealed except during courtship. Encyclo : Britta :

উদ্ভিদ রাজ্যেও বর্ণের প্রভাব কম নহে। অনেক বিলাতী ফুল মনোরম বর্ণৈশ্বর্য্যের জোরে ঐশ্বর্য্যশালীর প্রমোদ উদ্যানে স্থান পাইয়াছে। অনেক পুষ্পের বর্ণবিভবে ভ্রমর জাতিকে ভুলাইয়া, পুংকেশর পরাগ গর্ভকেশরে সঞ্চারিত করিবার উপায় বিধান করিয়া বংশরক্ষার করিতেছে। পুষ্পের আত্মপ্রকাশ সুগন্ধে মধু বা বর্ণে, সুগন্ধ ত আর সকল ক্ষেত্রে সম্ভবে না। সুগন্ধের জোর যাহাদের তাহারা আত্মগোপনে চেষ্টিত তবু গুণ গরিমায় সুবিদিত হইতে বাধ্য, কিন্তু সংসারে যূথিকা, বকুল, চূতমুকুল সংসারে কয়টি?—শিমুল পলাশের প্রসারই বেশী, হীনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণপ্রভাবকেও সে ক্ষেত্রে হীন হইতে হইয়াছে; বাহিরের চকচকে ঝকঝকে বর্ণ প্রথমে অন্যকে আকৃষ্ট করিবার মত বটে কিন্তু ও চটুল বাহ্যিকসৌন্দর্য্যমোহ আর কতক্ষণ টেকে। কাজেই অন্য আর একটি দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব চাই, পুষ্পে সেটা মধু; পরিমল লোভেই মধুকর পুষ্পের পরাগ সন্নিধানে নীত হয়। গোলাপাদি মধুহীন বর্ণসর্ব্বস্ব পুষ্প আরও অসহায়, ভ্রমর বড় জোর তাহাকে দেখা দিয়াই উড়িয়া যায়; তাহার সে আগমন হইতে ফলের আশা নাই, গোলাপ এ হিসাবে নির্গুণ কিন্তু পরোক্ষে তাহার বংশরক্ষা করিতেছে ঐ বর্ণঐশ্বর্য্য—মানব হৃদয়ে তাহার বিপুল প্রভাব। গোলাপের ফল নাই কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্যের জন্য বংশরক্ষা করিবার, তাহাকে উন্নত করিবার প্রবৃত্তি সৌন্দর্য্যপিপাসু মানবের মনে,—তাহা হইতে কত প্রকারের কলমের সৃষ্টি; কলমের মূলে তাহা হইলেই বর্ণ, বর্ণে বংশরক্ষা।

বর্ণপ্রভাবে আত্মরক্ষা, বংশরক্ষা,—আবার সেই বর্ণেই কত সর্ব্বনাশ, কত অনর্থ ভেজালের বারো আনাই এই বর্ণমাহাত্ম্যে, দুগ্ধে,—স্বয়ং মা গঙ্গাদেবী—না—তাহলেও বরং ভাল ছিল, পচাপুকুরের পানি, খড়িগোলা পালো; ভয়সাঘৃতে মহুয়া তৈল, চর্ব্বি ইত্যাদি, গব্যঘৃতে রং ফলাইতে হরিদ্রা; ময়দা বা আটায় বাসের বীজ বা রামখড়ির গুঁড়া (French chalk)। তৈল, ওটাতে ভেজালের ত অন্ত নাই, —মিঠাইগুলার ভেজালের সাক্ষী অম্বলের রোগী—এক কথায় খাদ্য বলিয়া যাহা মুখে তুলিয়া দেওয়া যায় তাহার অধিকাংশেই ভেজাল, নিম্ন স্বাস্থ্যনাশকর বস্তুর দ্বারা বিকৃত, কিন্তু প্রত্যেকটি খাদ্যই আসলের সহিত বর্ণসামঞ্জস্য রাখিয়া প্রস্তুত।* অতি প্রাচীনকাল হইতেই এ দৌরাত্ম্য—যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায়

"ভেষজ স্নেহলবণগন্ধধান্যগুড়াদিষু,
পণ্যেষু প্রক্ষিপন্ হীনাং পণান্ দাপস্ত ষোড়শ"

ঔষধ, ঘৃত, তৈলাদি স্নেহদ্রব্য, লবণ, কুঙ্কুমাদি গন্ধদ্রব্য, ধান্য, গুড় প্রভৃতি পণ্য এবং ভেজাল মিশ্রিত করিলে ষোড়শ পণ দণ্ড হইবে। দণ্ড, ভেজালের মুণ্ডপাত করিতে, পারে নাই। তথাকথিত সভ্যতা যত বৃদ্ধি হইতেছে,—খাদ্য, বসনেভূষণে ব্যবসায় কথাবার্ত্তা, চালচলনে, জীবনে ভেজালের ক্রিয়া পূর্ণতেজে চলিয়াছে—সর্ব্বক্ষেত্রেই ক্ষত ঢাকিয়া রংফলাইবার চেষ্টা। সেই কৃত্রিম বর্ণ দেখিয়াই জীবজন্তু তাহারা যত নয়—জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ আরো বেশী পাগল। বর্ণ ও অবয়ব লইয়াই রূপ; রূপে মোহ—অন্ততঃ সহস্র মনুজ মধ্যে সংসার-রস অনভিজ্ঞ, অনন্ত সাগর মধ্যে দ্বীপটির মত আত্ম-স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট সন্ন্যাসী জোর গলায় এ সত্য প্রচারে সিদ্ধ। আর দিব্যদর্শী কমলাকান্ত, কালাচাঁদপ্রসাদাৎ প্রকৃত এই অবিনশ্বর বস্তু লক্ষ্য করিতে পারিয়াছেন। তিনি রমণীরূপমুগ্ধ পুরুষকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—"তোমরা কুসংস্কারাবিষ্ট পৌত্তলিক। তোমার উপাস্য দেবতার প্রকৃতমূর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিকৃত প্রতিমূর্ত্তির পূজা করিতেছ। স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যরূপ বুকড়িচালের ভাত, প্রণয় কলাপাতে ঢালিতে ঢালিতেই ঠাণ্ডা হইয়া যায়—আর কাহার সাধ্য খায়? শেষে বেশভূষারূপ তেঁতুল মাখিয়া, একটু আদরলবণের ছিটা দিয়া কোনরূপে

* ভেজালের উপকরণতালিকা, বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয়ের খাদ্য নামক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

গলাধঃকরণ করিতে হয়।"* সত্য কথা ঠাকুর, তোমাকে অন্য যা বলিয়া যে নিন্দা করুক, তুমি মনেমুখে দুই যে অপবাদ তোমাকে অতি শত্রুতেও দিতে পারিবে না' তুমি রূপের বালাই রাখ না, প্রসন্নকে তুমি চেন না, তুমি ধর্ম্মাধিকরণ সমক্ষে সজ্ঞানে স্পষ্টই বলিয়াছ "মেয়েমানুষকে কে কবে চিনিতে পেরেছে দিদি?" প্রসন্নময়ীকে তুমি চেন না কিন্তু তার দুধদই? তার বর্ণ মহিমা যে তোমার হাড়ে হাড়ে,— প্রসন্নের নিকট তা ত স্বীকার করিয়া বলিয়াছ "তোমার দুধদই চিনি না, এমন কথা বলতেছিনা তোমার দুধদই বিলক্ষণ চিনি। যখনই দেখি এক পোয়া দুধ তিন পোয়া জল, তখনি চিনিতে পারি যে প্রসন্নগোয়ালিনীর দুধ—যখনই দেখতে পাই যে ঘোলের চেয়ে দুধ ফিকে, তখনই চিনিতে পারি যে এ প্রসন্নময়ীর দধি।"* তবেই ফিকে রং চোখে লাগিয়া আছে!

রূপেই বাহ্যজগতের বিকাশ,—যেখানে ফুলটি ফুটে, ফলটি দোলে, যেখানে পাখীটি উড়ে, যেখানে মেঘ ছুটে, গিরিশৃঙ্গ উঠে, নদী বহে, জল ঝরে, যেখানে বালক প্রফুল্ল মুখমণ্ডল আন্দোলিত করিয়া হাসে, যেখানে যুবতী ব্রীড়াভাবে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া শঙ্কিতগমনে যায়, যেখানে পৌঢ়া নিতান্তস্ফুটিতা মধ্যাহ্নপদ্মিনীবৎ অকাতরে রূপের বিকাশ করে?* সেখানেই মন রূপের নেশায় বিভোর, একটিতে তৃপ্ত না হইতেই অপরটিতে ধাবিত—"গতিই সংসারে সুখ—চাঞ্চল্যই সংসারের সৌন্দর্য্য। নয়ন ভরে না।* পরিবর্ত্তনশীলতাতেই রূপমাধুর্য্য—বর্ণবৈচিত্র্যই তাহার প্রাণ,—চঞ্চল হৃদয়মনে চাঞ্চল্যের যত প্রাধান্য। বর্ণ ও আকারের এরূপ পসার।

এ চাঞ্চল্যের সীমা কোথায়? ঔষধ কি? বিষের ঔষধ বিষে,—অবশ্য সুবৈদ্যের হাতে,—রূপে বিশ্বরূপের অনুভূতিই সেই অমোঘ ঔষধ! যিনি ফুলেফলে সরিৎসাগরে, আকাশে বাতাসে, সমুদ্রবক্ষে প্রকৃতিতে রূপের প্রকাশ যাঁহার হৃদয়ে, যিনি বলিতে পারেন 'হে রূপ, হে সৌন্দর্য্য! হে অন্তঃপ্রকৃতির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট* তুমি নিত্য শাশ্বত বস্তুর প্রাসাদাৎ সত্য; যিনি 'প্রমদাবদন দরশন করি' নয়ন ঝরিলে' বিস্ময়মুগ্ধা রূপসী, তাহাতে আকৃষ্ট ভাবিয়া,—

"বিষয়-বিরাগী তুমি ভুবনে প্রচার,
কি হেতু জন্মিল তব মানস-বিকার?
সামান্য ললনারূপ করি বিলোকন
উচিত না হয় তব অশ্রু বরষণ"—

প্রশ্ন করিলে নির্ব্বিকার যোগীর উপযুক্ত উত্তরে বলিতে পারেন—

"বালে! করহ শ্রবণ,
নেত্র ঝরে তব হেতু ভেব না এমন।
যে শিল্পী রচিল অই সুধাংশু বদন,
তাঁহার স্মরণে ঝরে নয়নে জীবন।"†

তাঁহারই রূপ দর্শন সার্থক,—চিরচঞ্চল বিশ্বরূপের চিরচঞ্চল রূপপ্রভাব তাঁহার চক্ষে শান্ত—তাঁহার জীবন মন, দেহধারণ—ধন্য!

শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

* কমলাকান্ত। † সদ্ভাবশতক

হাসি ও কান্না।

—:*:—

কুন্দকুসুম কমনীয় কম ফুল্ল অধরে হাসি।
কান্না হৃদয় মাঝে টেনে আনে ক্ষুব্ধ যাতনা রাশি।
হাসির লহরে হৃদয় গগনে উদিত শারদ শশী।
কান্না হৃদয়ে বর্ষার স্রোতে ঢালে অবিরত মসি।
হাসির ঝিলিকে সুখের বিজলী ক্ষণিক চমকি চায়,
কান্নার মেঘ দুঃখের ভারে হৃদয় আকাশ ছায়।
অবিরাম সুখে অবিরাম প্রাণে অবিরাম শত হাসি,
বিরামে তাহার বিরাম পরাণে কান্না উদিত আসি।
সিদ্ধান্ত যে করে গেছে পুনঃ বহুদিন রাম শর্ম্মা,
'নিত্য সমাস মতন জানিবে যত হাসি তত কান্না।'

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ।

মতি ও গতি।

—:*:—

নারীর জ্ঞানার্জ্জন।

আত্মচিন্তা যাঁহারা মোটেই করেন না, দৃষ্টি যাঁহাদের অত্যন্ত ক্ষুদ্র, উচ্চ আদর্শহীন ছোট ছোট বৈষয়িক কাজ করিয়াই যাঁহারা সারাজীবনটা কাটাইয়া দিতেছেন ও দিতে চান, আমার মনে হয় তাঁহারাই নারীর উচ্চশিক্ষার প্রতিবন্ধক। আহার নিদ্রা প্রভৃতির দৈহিক ভোগসুখেই তাঁহারা সন্তুষ্ট। মুখে তাঁহারা যাহাই বলুন, কাজের বেলা দেহকে তাঁহারা আত্মা বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন। জীবনের উচ্চ লক্ষ্য যা কিছু আছে তাহা বোধহয় তাঁহারা একবারও ভাবেন না। কাজেই এরূপ লোকের নারীজীবনের সম্বন্ধে কোন কোনো উচ্চ ধারণা করিয়া থাকা সম্ভব নহে। তাঁহারা মনে করেন পুরুষ প্রভু, নারী দাসী। তাঁহাদের মতে নারী পুরুষের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের জন্য।

নারী যে মানুষ, এই সহজ কথাটা বোধ হয় তাঁহারা স্বীকার করিবেন। মানবজীবনের একটা চরম লক্ষ্য আছে নিশ্চয়ই। সে লক্ষ্য কি? মানবজীবনের চরমলক্ষ্য—পরমাত্মাকে জানা,—ব্রহ্মকে লাভ করা। এই আদর্শ অনুসারেই মানবজীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক পারিবারিক ও সামাজিক সকলপ্রকার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। বিশেষতঃ হিন্দু একথা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কারণ তাহা হইলে তাঁহাকে তাঁহার দর্শন ও

অতীতের ইতিহাস অস্বীকার করিতে হইবে। সংসার, সমাজ, রাষ্ট্র, জ্ঞানার্জ্জন সকলই তো মানবজীবনের চরম লক্ষ্য, ব্রহ্মলাভের উপায়। মানবজীবনে যে লক্ষ্য তাহা স্ত্রী পুরুষ সকলেরই। তবে পুরুষ যদি জ্ঞানপিপাসু হইতে পারে, নারী সেই মানব চিত্তের অধিকারিণী হইয়াও জ্ঞানপিপাসু হইলে অস্বাভাবিকতা কোথায়? পুরুষের নিকট যে জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছ, নারীর বেলায় তাহা রুদ্ধ রাখিলে কোন নীতিতে? কেন কোন্ নীতিতে পুরুষকে জ্ঞানের আলো দান করিয়া তাহার মনকে উদ্ভাসিত করিবার চেষ্টা করিতেছ; দিনের পর দিন তাহাকে শুনাইতেছ—

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাসমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥
অন্তবন্তইমেদেহা নিত্যনোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য...... .....”
“ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজোনিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

তাহাকে শুনাইতেছ—তুমি অমর, তুমি স্বাধীন, তুমি অসীমবলে বলীয়ান্; আত্মানং বিদ্ধি, আত্মাকে জান, ব্রহ্মলাভ মানবজীবনের চরমলক্ষ্য। নারীও তো মানুষ, তবে নারীকে কেন অজ্ঞানতিমিরে ডুবাইয়া সর্ব্বদা কথায় ও কাজে, আচার ব্যবহারে তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছ যে, সে দুর্ব্বল, সে নিম্নস্তরে থাকিবার উপযুক্ত, তাহার মানসিক উন্নতির দরকার নাই, জ্ঞানার্জ্জনে তাহার প্রয়োজন নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৈহিক ও বৈষয়িক সুখ ভোগেই (তাহাও যথেষ্ট পরিমাণে নহে!) তাহার জীবনের চরম লক্ষ্য! মুখে স্ত্রীকে স্বামীর “সহধর্ম্মিণী” বলা হইয়া থাকে। “সহধর্ম্মিণী” হওয়া দূরের কথা, বর্ত্তমান সময়ে কয়জন স্ত্রী স্বামীর উচ্চ ভাবরাজ্যের সঙ্গিনী হইতে পারেন? কি পল্লীতে, কি সহরে অধিকাংশ নারীরই greater time ও space সম্বন্ধে ধারণা নাই। ইহার জন্য মুখ্যভাবে দায়ী কি তাঁহাদিগেরই স্বামী, পিতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন; এবং গৌণভাবে দায়ী কি সমাজের আইনকানুনপ্রণেতা পুরুষগণ নহেন?

নারী যখন মানুষ হইয়া জন্মিয়াছে, তখন মানবজীবনের চরমলক্ষ্যে পৌঁছিবার এবং তজ্জন্য জ্ঞানার্জ্জন করিবার চেষ্টা সে করিবে না কেন? তুমি পুরুষ, নারীর এই স্ব ভাবিক দাবীতে বাধা দিয়া তাঁহাকে টানিয়া আনিয়া অজ্ঞান তিমিরে বন্ধ করিয়া রাখিবার তোমার কি অধিকার আছে? সমস্ত বিশ্ব, পরমাত্মাকে জানিবার জন্য দিনরাত্রি হু হু করিয়া চলিয়াছে। অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া মানুষ যাহাই ভাবুক না কেন, ওই গতিরোধ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

এতদিন সমাজগঠনে, সামাজিক নিয়ম প্রণয়নে, রাষ্ট্রে, পুরুষের একাধিপত্য ছিল; তাই তাঁহারা নারীকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাদের উপর জুলুম করিয়া আসিয়াছেন। বলিতে লজ্জা হয়, য়ুরোপে স্থানে স্থানে নারীর আত্মা (Soue) আছে কি না একসময়ে এই লইয়া একটা তর্ক উঠিয়াছিল। কিন্তু ভগবানের রাজ্যে কাহারও উপরে জুলুম করা বেশীদিন চলে না। তাই আজকাল য়ুরোপে সমস্ত নারীশক্তি জাগিয়া উঠিতেছে। তাঁহাদের দাবী তাঁহারা বুঝিয়া লইতে শিখিতেছেন। অবশ্য প্রথম উদ্যমে কেহ কেহ যে ভুল ও অন্যায় না করিতেছেন তাহা নহে। কিন্তু যে শক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে তাহাকে সমূলে বিনষ্ট করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই। শীঘ্রই হউক আর দেরীতেই হউক এই আন্দোলনের তরঙ্গ ভারতের নারীর হৃদয়ে আঘাত করিবেই। কালের গতি রোধ করিবে কে? সেইজন্য

যাঁহারা নিজের, পরিবারের, সমাজের, দেশের ও মানবের মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সময় থাকিতে নারীর উন্নতির জন্য মনোনিবেশ করা উচিত।

এই নূতন আন্দোলনের আঘাতে যেন আমাদের পরিবারে ও সমাজে অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতা না আসিতে পারে, অথচ ইহার ভালটুকু গ্রহণ করিয়া জাতির বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া কিরূপে সমাজকে সংস্কৃত করিয়া লইয়া আমরা দেশের নরনারী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারি তাহা ভাবিবার সময় আসিয়াছে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

কর্ম্মের পথে।

—:*:—

কর্ম্ম - সুখদুঃখ, বন্ধনমুক্তির একমাত্র হেতুভূত কারণ। কর্ম্মই যোগ, কর্ম্মই সাধনা, কর্ম্মই সিদ্ধি। কর্ম্মে হৃদয়ের বিশ্বাস, জীবনের সমস্ত আশা-ভরসা, ধ্যান-ধারণা, অচল অটল ভাবে নিবদ্ধ করিতে না পারিলে,—ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যাবতীয় জ্ঞানের মধ্যে নিখুঁত সত্যের প্রেরণাটী, বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ না করিলে, আপ্রাণপাত চেষ্টাতেও সাফল্যের মুখ-দর্শন অসম্ভব। জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম, ত্রিবেণীর এই ত্রিধারাপূত বিমল কর্ম্মসলিলে, কর্ম্মীর আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া সাধনা-স্রোতে বীরের মত অগ্রসর হইতে হইবে। পথ যতই দুর্গম হউক—যতই বিপদসঙ্কুল হউক,—ঘূর্ণাবর্ত্তের মত উত্তাল-তরঙ্গ-মালা ভেদ করিয়া—আপনাকে নিজ্জিত নিষ্পেষিত করিয়া—সাফল্যের পরপারে দাঁড়াইতে হইবে। যখন বিজয়-উল্লাস-দৃপ্ত নয়নের তড়িৎ-প্রবাহ তাহার, দেশের সমগ্র নূতনের মর্ম্মে-মর্ম্মে বিঁধিয়া আকর্ষণ করিবে, তখন সমাজ-শাসনে নয়,—শাস্ত্রের প্ররোচনায় নয়,—গুরুর উপদেশে নয়,—স্বভাবের অঙ্গুলি সঙ্কেতে উদ্ভ্রান্তের ন্যায় সমষ্টি, তাহার পানে ছুটিবে—প্রাণশক্তি তাহার, প্রত্যেক ব্যষ্টিজীবনকে নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া নবীন ভাবে গড়িয়া তুলিবে।

মুগ্ধ আমরা—কর্ম্মের মাহাত্ম্য শুনিয়া—কর্ম্মের পথে ছুটিয়া যাই, জ্ঞানের আলোচনায়—জ্ঞান-গুরুর আশ্রয় লই, ভক্তির গৌরবে—ভক্তের পায়ে লুটাইয়া পড়ি, কিন্তু সঙ্কীর্ণতা-পঙ্কিল-দুষ্ট হৃদয় আমাদের, বিশুদ্ধ করিবার জন্য যে আয়াস—যে সহিষ্ণুতা—যে ধৈর্য্যধারণ আবশ্যক, আমরা তাহাতে অভ্যস্ত হইয়াছি কি? শতদিকের শত কোলাহলের মধ্যে নির্ব্বন্ধ প্রাণ-শক্তিটুকুর সন্ধান লইয়াছি কি?

শুধু প্রাণের প্রেরণায় নয়—বুদ্ধির উদ্বোধনে নয়—সত্তার সত্য বিকাশই কর্ম্মসাধনের মূলমন্ত্র। ধ্যান ধারণা বা সমাধির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া—হর্ষলাঞ্ছনার সীমানায় পা না দিয়া, নাচিয়া উঠিবে—মন প্রাণ দেহ, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শিরা, কৈশিকা, ধমনী—প্রত্যেক শোণিতবিন্দুটী,—তবেই না কর্ম্মসাধনার পূর্ণসিদ্ধি!—কর্ম্মজীবনে চিত্ত-বৃত্তিগুলিকে নিবৃত্তি করিয়া কর্ম্মনাশার অগাধ জলে ফেলিয়া দিলে, আত্মসমর্পণ করিতে গিয়া—'অচিন' দেশের মানুষের হাতে আপনাকে বিলাইয়া দিলে, বিষয় বাসনা বর্জ্জন স্থলে—যথাসর্ব্বস্ব পরিহার করিলে সে যোগ সিদ্ধি হইবার নহে—

"দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞাবৈরাগ্যম্॥"

(পাতঞ্জল দর্শন সমাধিপাদ ১৫ শ্লোক)

অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগেচ্ছা ত্যাগ করিতে পারিলেই উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য হয়।

বৈরাগ্য দুই প্রকার—দৃশ্য ও অদৃশ্য। যাহার রূপ, লাবণ্যে দর্শনেন্দ্রিয় মুগ্ধ হয়, যাহার রসাস্বাদনে রসনা তৃপ্ত হয়, যাহার আঘ্রাণে ঘ্রাণেন্দ্রিয় বিহ্বল হয়, যাহার সুকোমল স্পর্শে শরীর স্নিগ্ধ হয়, যাহার মধুর নিক্কণে শ্রবণ তুষ্ট হয়, সেই মায়াত্মক দৃষ্ট বস্তুর স্পৃহা-বর্জ্জনই দৃশ্য বৈরাগ্য। আর যাহা দেখা যায় না—স্বর্গ, সুধা, অপ্সরা প্রভৃতি যাহার নাম শ্রবণেই চিত্তে ভোগস্পৃহা বলবতী হয়, সেই অদৃশ্য-মায়াত্মক বিষয়ের উপভোগ কামনা পরিহার করারই নাম অদৃশ্য-বৈরাগ্য। আমরা ইহলোকে দৃশ্য, পরলোকে অদৃশ্য-মায়াত্মক বিষয়ের উপভোগ কামনা করিয়া থাকি। কিন্তু সেই উভয়বিধ মায়াত্মক বিষয়ের ক্ষণভঙ্গুরত্ব প্রভৃতি দোষ অন্বেষণ করিয়া লইলে, নির্ম্মলবুদ্ধির সাহায্যে তাহা হইতে আরও শত-শত দোষ বাহির হইয়া ভোগবাসনার বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দিবে। কর্ম্মপথের এই প্রথম বাধা অতিক্রম, বড় সহজ ব্যাপার নহে। জন্মকাল হইতে চিত্ত, কেবল আশার দাস—বাসনার বশম্বদ হইয়া পড়িয়াছে। আন্তরিকতাশূন্য চেষ্টা বা উত্তেজনার ক্ষণিক অনুধাবনে কোনও ফলের আশা নাই। শ্রদ্ধার সহিত—উৎসাহের সহিত—দৃঢ়তার সহিত—কাম্যবস্তুর দোষ মর্ম্মে-মর্ম্মে প্রত্যক্ষ করিলে দীর্ঘকালের অভ্যাসে ইচ্ছাশক্তির গতি প্রবলতর হইয়া আত্মার সহিত লয় প্রাপ্ত হইবে যেহেতু ইচ্ছা, আত্মারই গুণ—

"ইচ্ছাদ্বেষ প্রযত্ন সুখ দুঃখ জ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গমিতি ॥" ন্যায় দর্শন।

কাম্যবস্তু সম্ভোগ-স্পৃহা আমাদের চিত্তক্ষেত্রে যখন প্রবলভাবে জাগ্রত হয়, তখন বাসনা মন্দিরের নিভৃত-কেন্দ্রে, মানস-মোহিনী কত সোনালী ছবি ফুটিয়া উঠে—কত অপ্সরাকুল-পরিবৃত নন্দন-কানন একে একে ভাসিয়া যায়—কত আশার মোহিনী-মূর্ত্তি, আমাদিগকে হাতছানি দিয়া ডাকিতে থাকে! অনুরাগের এই শুভ মুহূর্ত্তে, লুব্ধ আমরা, ভুলিয়া যাই—ইহ পরকালের কত যত্নসঞ্চিত ধৈর্য্য, মুছিয়া ফেলি—বিবেকের নগণ্য-প্রলাপ—সংযমের শিরে পদাঘাত করিয়া উন্মত্ত-পতঙ্গ, প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে ঝাঁপ দেই…!

ত্যাগ জিনিষটি সহিয়া লওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। আগে, উত্তেজিত-অনুরাগের দোষা দোষ অন্বেষণের জন্য শত শত বিবেকপ্রহরী নিযুক্ত করিতে হয়, পরে দেখিতে হয়, আরও কোন অনুরাগ, চিত্তসীমার মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতেছে কি না—তারপর চিত্তসীমার বাহিরে কোন অনুরাগ উঁকি দিতেছে কি না! এই সজাগপ্রহরীর অনুশাসনে, অনুরাগ যখন চিত্তদেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিবে, তখন ইহলোকের বিষয়স্পৃহা কোন্ ছার্—স্বর্গলোকের—এমন কি ব্রহ্ম-লোকেরও স্পৃহা, চিত্তের এক কণামাত্র স্পর্শ করিতে পারিবে না—বিশ্বপ্রেমানন্দ, ত্যাগের ভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলিবে।

নিত্যানিত্য বস্তু বিচারাদ্ নিত্য সংসার সমস্ত সঙ্কল্পক্ষয়ো মোক্ষঃ ॥ নিরালম্বোপনিষৎ।

কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া, কেমনে ত্যাগ সহ্য করিতে হয়, ধন জন, স্ত্রী পুত্র, আত্মীয় স্বজনের প্রতি কিরূপ নির্লিপ্ত আদর্শ প্রকাশ করিতে হয়,—মনোবৃত্তিগুলিকে নির্ম্মল-বুদ্ধির দ্বারা শোধন করিয়া জীবাধার বিশুদ্ধ রাখিতে হয়, নবীন সাধক সর্ব্বাগ্রে তাহারই পন্থা অনুসন্ধান করিবেন; বিশ্ব-প্রাণে আপনার প্রাণকে উৎসৃষ্ট করিয়া দিবেন। তখন ব্যষ্টির শুদ্ধসত্তায়—সমষ্টি, সমষ্টির আত্মনিবেদনে—সমগ্র দেশ নবভাবে নবসাজে সাজিয়া উঠিবে—কেহ অজ্ঞান থাকিবে না—কেহ ঘৃণ্য থাকিবে না—কেহ ছোট থাকিবে না। উৎসর্গমন্ত্রের প্রথম ফুৎকারেই হৃদয়ের প্রত্যেক তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিয়া উঠিবে—

"সমাধিমথ কর্ম্মাণি মা করোতু করোতু বা।
হৃদয়ে নষ্ট সর্ব্বেহো মুক্ত এবোত্তমাশয়ঃ ॥ (মুক্তিকোপনিষৎ, ২ অঃ, ২০ শ্লোক)

অবশ্য ইহা অসম্ভব নহে যে যতদিন পর্য্যন্ত মানব --মানবদেহ ধারণ করিবে, ততদিন আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান্ হইলেও ইন্দ্রিয়বৃত্তির কবল হইতে এককালে নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হইবে না। তবে উহার দ্বারা যাহাতে চরিত্রের কোনরূপ ব্যত্যয় না ঘটে—নির্ম্মল শুদ্ধ-সত্তায় কালিমার রেশমাত্র না পড়ে, তাহাই সর্ব্বোতোভাবে বাঞ্ছনীয়। জনক, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি কর্ম্মযোগীর, ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভক্তগণের কর্ম্ম ও সাধনার উজ্জ্বল চিত্র যদিও আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের মর্ম্মে-মর্ম্মে ক্ষোদিত রহিয়াছে কিন্তু তাহাতে নব্যতান্ত্রিক, বিজ্ঞান-সম্মত কোনও পরিষ্কার আদর্শ পাইতেছেন না। ইঁহাদের কর্ম্মযোগের প্রকৃত লক্ষণ—হৃদয়বৃত্তির প্রাধান্য বিহীন অবস্থায় নির্ম্মল-বুদ্ধির সাহায্যে নিকাম-কর্ম্ম সম্পাদন। ঐ নিষ্কাম কর্ম্মযোগেরই নাম বুদ্ধিযোগ। গীতায় উক্ত হইয়াছে :—

"কর্ম্মণ্যে বাধিকারাস্তে মাফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোস্ত্ব কর্ম্মণি।" গীতা ২ অঃ, ৪৭ শ্লোক।

কর্ম্মফলের কামনশূন্য হৃদয়, প্রেমের চির-আবাস ভূমি। আবার অবাধিত-প্রেমই সমাজ-জীবনের প্রকৃত সুখ। ঐ প্রেম-গগনে নির্ম্মল-বুদ্ধি-সমীরণ দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া হিংসা ঈর্ষা প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তি-মেঘকুল বিতাড়িত হইলে, প্রেম-সুধাকরের অমল-ধবল-কৌমুদীতে সমগ্র জগৎ প্লাবিত হইয়া উঠিবে। স্মরণাতীত যুগ হইতে আবহমান কালের গতিপথে বিশুষ্ক কর্ম্মবীজগুলি সাধনার অমৃতবারি স্পর্শে আবার অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে—কত স্তিমিত জ্যোতিঃকণা অনুভূতির নিভৃত কক্ষে আবার জ্বলিয়া উঠিবে।

আমরা প্রলোভনরাশির মধ্যে থাকিয়া নির্ম্মল-বুদ্ধির সাহায্যে মনোবৃত্তিগুলিকে যতই না কেন দমন রাখি, উহাদের এমনি প্রবল শক্তি, কোনও কিছুর একটু আনুকূল্য পাইলেই--বিবেকের শত বন্ধন ছিন্ন করিয়া শৃঙ্খল-মুক্ত মাতঙ্গের ন্যায় স্বীয় গন্তব্য-পথে ধাবিত হয়। গীতায় ভগবানের প্রতি অর্জ্জুনের সংশয় উক্তি—

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবৎ দৃঢ়ং।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥" গীতা ৬ অঃ, ৩৪ শ্লোক।

শুধু মুখে বলিলে হয় না, কানে শুনিলে হয় না—হৃদ্‌বৃত্তির পরতে-পরতে প্রাণ-সত্তায় শুদ্ধ-সত্য ভাব অঙ্কিত না হইলে—দেহের প্রত্যেক রক্ত-কণিকাগুলি উহা মানিয়া না লইলে—কর্ম্মপথে বহু বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। সুতরাং বিবেকবুদ্ধির দ্বারা মনকে নিগ্রহ না করিলে তাহাকে বশে আনিবার অন্য সহজ উপায় নাই। মনের উপর বিবেকের যতই প্রতিপত্তি স্থাপিত হইবে, সাফল্যের পথ ততই পরিষ্কার হইয়া আসিবে ; কেননা—

"বিবেকখ্যাতিস্তু হানোপায়॥" সাংখ্য দর্শন।

প্রবৃত্তিকে নির্ম্মল-বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত করিয়া শুদ্ধ-সত্তায় অর্পণ করিতে পারিলে কর্ম্মপ্রবাহে হাবুডুবু খাইতে হয় না। শুধু সংস্কারক বেশে দেশ-বিদেশে ভাসিয়া বেড়াইলে কোন ফল নাই। বাহিরের কোলাহলে বিন্দুমাত্র যোগদান না করিয়া স্থির-চিত্তে কর্ম্মের পথ অনুসরণ করাই শ্রেষ্ঠবুদ্ধির লক্ষণ। সাধক-কবি তুলসীদাস বলিয়াছেন—

"সব্‌সে বসিয়ে সব্‌সে রসিয়ে সব্‌কা লিজিয়ে নাম।
হাঁজি হাঁজি ক'রতে রহিয়ে বৈঠিয়ে আপনা ঠাম॥"

চিত্তের অস্থিরতাই কর্ম্মযোগের অন্যতম শত্রু।

"দুঃখদৌর্ম্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসা বিক্ষেপসহভুবঃ॥"

পাতঞ্জলদর্শন, সঃ পাঃ, ৩১ শ্লোক।

চিত্তস্থৈর্য্যের অভাব হইলে,—দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য (ইচ্ছার ব্যাঘাতে যে মনঃক্ষোভ), অঙ্গকম্পন, শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রবল গতি প্রভৃতি বিক্ষেপ জন্মিয়া থাকে। প্রথমতঃ এই সকল উপদ্রব নিবারণের জন্য একতত্ত্ব অর্থাৎ যে কোনও একটী চিরশান্তিময় পরমার্থ-বস্তুর ভাবনা করিতে হয়। চিন্তিত-বস্তুতে চিত্ত সম্পূর্ণ লিপ্ত রাখিয়া যতক্ষণ বা যতদিন না সেই পূর্ব্বজাত দুঃখাদি উপদ্রবের শান্তি হইয়া থাকে—ততক্ষণ বা ততদিন একতত্ত্ব অভ্যাস করিতে হয়, কিন্তু এই অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তকে পরিষ্কৃত হইতে হইবে। স্বচ্ছস্বভাব কাচ, মলিন থাকিলে যেমন প্রতিবিম্ব গ্রহণে অসমর্থ থাকে—আকর্ষণক্ষম চুম্বক মলদিগ্ধ (মরিচাধরা) থাকিলে যেমন আকর্ষণের ক্ষমতা থাকে না, অপরিষ্কৃত বা মলিন চিত্তও সেইরূপ সূক্ষ্ম তত্ত্ব গ্রহণে অসমর্থ হইয়া বিক্ষিপ্ত হয়। সেস্থলে—

"মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাংসুখদুঃখ পুণ্যাপুণ্যবিষয়ানাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্ ॥"

পাতঞ্জলদর্শন সঃ পাঃ ৩৩ শ্লোক।

"মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা এই উপায় চতুষ্টয় অবলম্বন করিতে হয়। অর্থাৎ পরের সুখ দেখিয়া ঈর্ষার পরিবর্ত্তে মিত্রতা, পরের দুঃখে হর্ষের পরিবর্ত্তে করুণা, পরের শুভকার্য্যে (পুণ্যকর্ম্মে) হিংসার পরিবর্ত্তে প্রেম (মুদিতা), পরের পাপকার্য্যে বিদ্বেষ বা ঘৃণার পরিবর্ত্তে উপেক্ষা (ঔদাসীন্য) অবলম্বন করিতে হয়। তাহাতে চিত্ত-বিকৃতি ক্রমে-ক্রমে নির্ম্মল হইয়া একাগ্রতা লাভ করিবে।

কালের ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত্তে আমাদিগকে যে অবস্থায় উপস্থিত করিয়াছে তাহাতে সত্য ও শ্রেয় পথের অনুসরণ করা, সমাজের আবর্জ্জনারাশির মধ্য হইতে কর্ত্তব্যের বাস্তবটুকু বাছিয়া লওয়া ভয়ের কারণ হইয়াছে। কিন্তু যেখানে দেশ-প্রেম—সঙ্কীর্ণতাকে নির্জ্জিত করিয়া, মহাপ্রাণ—ব্যষ্টি-প্রাণের মমতা ছাড়াইয়া, পরার্থ—স্বার্থের বুকে পদাঘাত করিয়া, দূরে—বহুদূরে অগ্রসর হইয়াছে,—নব্যতান্ত্রিক, সেই নির্লিপ্ত সাধনা-কেন্দ্রে উপস্থিত হইতে ভীত হইলে চলিবে না। কর্ম্মের পথে শত বাধা, শত বিপত্তি, শত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও লাঙ্গুলাবমৃষ্টা সর্পিণীর ন্যায় বুকে ভর দিয়া চলিতে হইবে।—আপনার ষোলআনা মহা-প্রাণের মঙ্গলে যোগ করিয়া, মাটির দেহে,—অভিমান মাটি করিয়া, খাঁটি মানুষের মতন খাটিতে পারিলে পথ পরিষ্কার হইবে। পূর্ব্বাপর ভাবিয়া চিন্তিয়া— ব্যাকুল না হইয়া আপনার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিবে। যেন মনে থাকে,—কেহ আমার উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন করিলে, আমার যেমন কষ্ট হয়—আমার দ্বারাও অপরের ঐ সকল অনিষ্ট সাধিত হইলে তাহারও তদ্রূপ কষ্টের উদ্রেক হইবে।—যেন মনে থাকে অনির্দ্দিষ্ট স্বল্প জীবন-কালটুকুর মধ্যে আমাকে এমন শত কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে, অন্ততঃ যাহার একটী কার্য্যও জাতীয়-জীবন-যন্ত্রের গতি-সৌকর্য্যের বিন্দুমাত্র সহায়তা করিবে।

দেহ মন বাক্যের দ্বারা আমরা যাহা কিছু অনুষ্ঠান করি, যাহা কিছু অনুভব করি, তাহা আমাদের চিত্তে বা মনোময় সূক্ষ্মশরীরে ছাপ লাগার ন্যায় আভাস থাকিয়া যায়—উহাই কর্ম্ম-সংস্কার—কর্ম্ম-বাসনা। পূর্ব্ব-সঞ্চিত-কর্ম্মবাসনা উদ্বুদ্ধ হইলে তাহাই প্রবৃত্তি, রুচি, স্মরণ, ভোগেচ্ছা প্রভৃতি বহু নামে আখ্যাত হয়। সেই সকল বাসনাই চিত্তের এক প্রকার শক্তি এবং উহাই ভবিষ্যতে কর্ম্মবীজ রূপে কর্ম্মানুরূপ অঙ্কুর প্রসব করিয়া থাকে। সেই অঙ্কুর—অনুশীলন-শীকর-সম্পৃক্ত হইয়া কালে বহু শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত মহামহীরুহে পরিণত হয়।

এই আদি অন্তহীন কর্ম্মবাসনা, রূপাদি বিষয় অবলম্বন করিয়া মোহ প্রভৃতি মিথ্যাজ্ঞানের সঞ্চার করে। মিথ্যা জ্ঞান হইতে রাগ দ্বেষাদি অভিপ্রায়—অভিপ্রায় হইতে পরানুগ্রহ, পরনিগ্রহাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। সদসৎ কর্ম্ম হইতে পরিণাম-শুভাশুভের বীজ এবং সেই বীজ হইতে ভোগরূপ বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

বহুপল্লবিত ভোগ-বৃক্ষ, নিষ্পত্র ও নিস্তেজ করিতে না পারিলে, জীবনচক্রের পুনরাবর্ত্তনকালে তাহারই আপাতঃমধুর ছায়ায় চিত্ত আকৃষ্ট হয়। চিত্তভোলা কর্ম্মপথের পথিক, তখন ভুলিয়া যায় স্বীয় গন্তব্য—চিরশান্তিনিকেতন।

যাহা গুণিয়া শেষ করা যায় না, চিত্ত সেই অসংখ্য বাসনার আবাসস্থল। আবার চিত্ত, আত্মারই ভোগাবস্তু। আত্মার প্রবৃত্তি অনুযায়ী—চিত্ত, নানাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাহার সন্তোষবিধানে সর্ব্বদা উদ্যোগী।

চিত্তের বৃত্তিসকল অনুশীলনসাপেক্ষ। অনুশীলনবলে হৃদয়নিহিত সদ্বৃত্তির বিকাশ ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত দুষ্প্রবৃত্তিগুলি শাসিত না হইলে, চিত্তগতি বিবর্ত্তনের চেষ্টা পদে পদে ব্যর্থ হইয়া থাকে।

গতি ফিরিয়াছে। নবীনযুগের নূতনপ্রেরণা, নব্যতান্ত্রি'কর প্রাণে সাড়া দিয়াছে। যাহার ফলে আমরা জাতীয়-জীবনকে গড়িয়া-পিটিয়া নূতন ছাঁচে ঢালিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি।—এখন চাই পথ-নির্দ্দেশ, শুদ্ধ সংযম, ধর্ম্মবুদ্ধি ও হিতাহিত জ্ঞান।—মানবিকতা যাহাতে বিকশিত পরিপুষ্ট হয়, যাহাতে আমরা মানুষের মত মানুষ হইতে পারি—তাহার সাধনা। আমাদের সেই সাধনা অপূর্ণ ছিল,—তাই কর্ম্মের পথে মর্ম্মহারা আমরা চারিদিকে ইতস্ততঃ ছুটিয়া মরিতেছি। বিশ্বপ্রেমে ডুবিতে গিয়া ডুব দিয়াছি কামনার বিষাক্ত হ্রদে। শান্তি সংস্থাপনের ভাণে চারিদিকে হিংসার আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছি! পরমকারুণিক ভগবানের আশীর্ব্বাদে ভ্রম ঘুচিয়াছে। ভারতের পবিত্র হৃদয়ে এতদিন যে কলঙ্ক-কালিমা ঢালিয়া দিয়াছি তিনি স্বহস্তে তাহা ধুইয়া মুছিয়া শুদ্ধসত্তা বিকাশে যত্নবান হইয়াছেন। অতীতের নীল যবনিকার অন্তরালে ঐ যে তাঁহার করুণার আলোক ক্রমেই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। কর্ম্মী, ব্যস্ত হইও না—সংযমে বুক বাঁধ, চিত্তস্থির কর উদ্দাম উত্তেজনা ভগবানের পায়ে অর্পণ করিয়া এই কর্ম্মচাঞ্চল্যের দিনে স্থিরধীরপদে অগ্রসর হও। বিভূদত্ত আশীর্ব্বাদ তোমার কর্ম্মপথের মর্ম্মকেন্দ্রে ধ্রুব হউক!

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

পাহাড়িয়া।

তারা পাহাড় কোলে গাছের ডালে পাতায় বাঁধে কুঁড়েঘর,
সবাই তাদের আপন জনা নাইক তাদের কেউরে পর।
গাছের কোমল পাতায় আর দূর্ব্বাদলে শয্যা রচে,
ভাতের হাঁড়ি মালসা খোলা ঝুলিয়ে তারা রাখে গাছে।
বাঘ ভালুকের সঙ্গে থাকে তাদের সাথে কথা কয়,
সবাই যথা চায় না যেতে নাইক তাদের তথায় ভয়।
সূর্য্য তাদের দিনের ঘড়ি জোৎস্না তাদের সাঁঝের বাতি,
হাত-বালিসে রাখি মাথা কাটায় তারা সারা রাতি।

সকাল হ'লে দলে দলে তীরধনুটী সঙ্গে নিয়ে,
বাঁশের বাঁশীর সুর মিলিয়ে চলে তারা গানটী গেয়ে।
প্রাণীমারা ধর্ম্ম তাদের দয়ামায়া নাইক প্রাণে,
কঠোরতায় পূর্ণ দেহ বিবেক যেন নাইক' মানে।
ভুট্টা তাদিক ছ'মাস রাখে বাকী ছ'মাস মহুয়ায়
আঁকা বাঁকা ঝরণা তাদের বারমাসেই প্রাণ ভুলায়,
তারা,—বাবরী চুলে পাগড়ী বেঁধে প্রিয়ার কালো হাতটা ধরে
লিনেরেতে সাঁঝসকালে বেড়ায় বনে ঘুরে ঘুরে।
সহর তারা চিনে নাক' চায় না যেতে তাহার ঠাঁই,
তথায় যে গো শাল পিয়ালের প্রাণ মাতান গন্ধ নাই।
সেথায় শুধু উচ্চাভিলাষ যশের তরে মারামারি
তথায় যে গো গাছের ডালে গান করে না শুক ও শারী।
উচ্চ প্রাসাদ শিখর দেখে তাদের প্রাণে জাগে ভয়,
স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত সবাই স্বার্থ নিয়ে কথা কয়।
অসভ্যতা তাদের ভাল সভ্যতাতে নাইক কাজ
সভ্যতাতে আনে কেবল প্রাণের মাঝে শতেক লাজ।

শ্রীসনৎকুমার সেনগুপ্ত।

দুই।

গণিতে সংখ্যার সীমা নাই তথাপি সংসারে "দুই"এর প্রভাব যত অধিক এত আর কোন সংখ্যার নাই। কুড়ে লোকের সম্বন্ধে বলা হয়,—

কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই,

অথচ দিনের মধ্যে আমরা আরও কত রকমের কাজ করিয়া থাকি, আবার প্রবচনে বলে,—

যত্ন হাসি তত কান্না, বলে গেছে রাম শন্না (শর্ম্মা)। এখানেও বহু প্রকারের মানসিক অবস্থা হইতে মাত্র দুইটি বাছিয়া লওয়া হইয়াছে।

শত-শত প্রকারের ইতর প্রাণী থাকিতেও আমরা বলি পশু ও পাখী, দশটা দিক থাকিতেও আমরা বলি হয় বামে-দক্ষিণে, নয় অগ্র-পশ্চাৎ কিংবা ঊর্দ্ধ-অধঃ। মনে হয় যেন মানুষ প্রথমে স্বজাতির মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই প্রকারের ভেদ দেখিয়া সর্ব্বত্র দুই প্রকারের ভেদ কল্পনা করিয়া লইয়াছে। সংস্কৃতে তাই দ্বিবচন ছিল। বাঙ্গলায় আমরা একবচন ও বহুবচন রাখিয়াছি বটে কিন্তু বচনকালে মুখে বহু না আসিয়া দুই বাহির হয়। আমরা যে-সে-লোক বুঝাইতে বলি রামা-শামা কিংবা যদো-মধো নয় কেও-কেটা কি ক্ষেষ্ট-বিষ্টু।

জগতের সমস্ত পদার্থের দুই প্রকারের ভাগ—জড় ও চেতন। অধিকাংশ হিন্দু দ্বৈতবাদী—শিব-দুর্গা, রাম-সীতা, রাধা-কৃষ্ণ এই যুগলরূপের উপাসনা করিয়া থাকেন। সৌর ও গাণপত্য সম্প্রদায় লোপ পাইয়াছে। আমরা আত্মীয়স্বজনের তালিকা দিতে গেলেও বলি—মাতা-পিতা, ভাই-ভগ্নী, পিসী-মাসী। সর্ব্বত্র জোড়া-জোড়া অর্থাৎ দোসর যাই।

পুরুষের মধ্যে উত্তম ও মধ্যম অর্থাৎ আমি ও তুমি বা আমরা ও তোমরাই শ্রেষ্ঠ। কারণ এই দুয়ের জন্যই চক্ষুলজ্জা, সংস্কৃতের প্রথম পুরুষ বাঙ্গলায় তৃতীয় ব্যক্তি। অসাক্ষাতে তাহার সম্বন্ধে আমরা যাহা ইচ্ছা বলিতে পারি।

আমরা বহুবার কাজ করিলেও বলি বার-বার, নয় রোজ-রোজ, কি দিন-দিন অর্থাৎ এক নিঃশ্বাসে দুয়ের অধিক বলিবার সামর্থ্য যেন আমাদের নাই।

জড়পদার্থের মধ্যে আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা ৭০টি মূল পদার্থের আবিষ্কার করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারাও সেগুলিকে প্রধান দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, ধাতু ও অ-ধাতু। ভারতায় পণ্ডিত বলিতেন পঞ্চভূত—ক্ষিত্যপ্‌তেজো-মরুদ্ব্যোম। কিন্তু আমরা সাধারণ কথায় দুটিকে বাছিয়া লইয়াছি—জল ও স্থল। এতদিন আমরা হয় জলপথে, নয় স্থলপথে বেড়াইতে পারিতাম। এখন আবার খপথেও যাতায়াত চলিতেছে। কিন্তু শিশু. ভূগোলে পড়ে পৃথিবীর ৩ ভাগ জল ও ১ ভাগ স্থল। সুতরাং জল ও স্থল ছাড়া আবার আকাশ বলিয়াও একটা পদার্থ আছে যাহা মানুষের কাজে লাগিতে পারে এ কথা সহজে আমাদের মনে ধরিবে না।

পৃথিবীর প্রত্যেক পদার্থেরই তিনটি পরিমাণ আছে যাহা দীর্ঘ প্রস্থ ও বেধ। কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা লম্বা ও চওড়া এই দুইটি লইয়াই অধিক কারবার করি। ঘরের লম্বা-চওড়া দেখি জমিরও লম্বা-চওড়া জানিতে চাই। গাছ ও মানুষের ৩ প্রকারের পরিমাণকেও আমরা দুয়ে পরিণত করি অর্থাৎ খাড়াই ও বেড় বলি।

আমাদের অষ্টধাতুও দুইজোড়ায় পরিণত হইয়াছে। হয় পিতল কাঁসা, নয় সোনা-রূপা। আমাদের পরিচিত পশু, হয় হাতী-ঘোড়া, নয় ছাগল-গরু, কি কুকুর-বিড়াল। আমাদের (?) পালিত পাখী হাঁস-মুরগী আর বনের পাখী, হয় কাক-কোকিল নয় শামা-দয়েল। আমাদের তরিতরকারী হয় লাউ-কুমড়া নয় আলু-পটোল। আমিষ ভোজীদের মাছ-মাংস। আমাদের আহার্য্য, হয় ডাল-ভাত নয় লুচি-কচুরী কি কালিয়া-পোলাও। জলখাবার হয় জল-ফুলরী নয় চা-বিস্কুট। বিশিষ্ট অতিথিকে সম্মানার্থে, হয় দিই পাদ্য-অর্ঘ্য নয় চা-চুরুট কি পান-তামাক।

জ্ঞানীরা বলেন ব্রহ্ম এক। কিন্তু অনেক ধর্ম্মেই ঈশ্বরের প্রতিযোগী একজন শয়তান কল্পিত হইয়াছে কেননা—ভগবানের সৃষ্টিমধ্যে ঠিক দুই বিপরীত-প্রকারের পদার্থ বা অবস্থা দেখা যায়। আলো-আঁধার, দিন-রাত্রি, জড়-চেতন, জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, নিদ্রা-জাগরণ, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, ভাল-মন্দ, ভিতর-বাহির, বীর-কাপুরুষ, ভীরু-সাহসী ইত্যাদি।

গ্রীকরা অনন্ত মানবজাতিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিল—গ্রীক ও বার্ব্বেরিয়ান। এইরূপ প্লীবিয়ান-প্যাট্রিসিয়ান, খ্রীষ্টান-হীদেন্, মুসলমান-কাফের, সদ্ধর্মী-পাষণ্ডী, আর্য্য-অনার্য্য, হিন্দু—ম্লেচ্ছ প্রভৃতি নামে দুই ভাগ ছিল।

জ্যোতিষ্কের মধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্র প্রধান। ভারতে বৎসর গণনা দুই প্রকার—সৌরবৎসর ও চান্দ্র বৎসর। চন্দ্রের দুই পক্ষ—শুক্ল ও কৃষ্ণ। ক্ষত্রিয় রাজাদের দুই বংশ—সূর্য্য ও চন্দ্র। বাঙ্গালার হিন্দুরা—হয় ব্রাহ্মণ নয় শূদ্র এবং মুসলমানেরা—হয় শিয়া নয় সুন্নি। হিন্দুর দুই কাব্য,—মহাভারত ও রামায়ণ। হিন্দুর মধ্যে দুই প্রধান সম্প্রদায়—শাক্ত ও বৈষ্ণব।

ইংরেজ, ছেলেকে প্রথমে শিখায় এ, বি, সি, কিন্তু আমরা শিখাই, হয় অ-আ, নয় ক-খ। আমাদের বর্ণ দুই প্রকারের—স্বর ও ব্যঞ্জন। অক্ষর দুই প্রকারের—সংযুক্ত ও অসংযুক্ত। বাক্যের দুই অংশ—উদ্দেশ্য ও বিধেয়। ক্রিয়া দুই প্রকারের—সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক। ব্যাকরণে পূর্ণ জ্ঞান হইলে বলি বস্তু-শব্দ জ্ঞান হইয়াছে।

কার্য্যের সুবিধার জন্য অনেকস্থলে কার্য্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। আদালত দুই প্রকারের হয় উচ্চ ও নিম্ন নয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী। হাকিম দুই প্রকারের—হয় মুন্সেফ ডিপুটী নয় জজ ম্যাজিষ্ট্রেট। এইরূপ উকীল-মোক্তার; ডাক্তার-কবিরাজ, স্কুল-কলেজ, শিক্ষক-অধ্যাপক, ব্যবস্থা-পরিষদ্, শাসন-পরিষদ্, শাসন-বিভাগ, বিচার-বিভাগ, রেল-ষ্টীমার, নৌকা-গাড়ী, প্যাসেঞ্জার-গুড্‌স্, ওয়াগন্-ক্যারেজ।

জ্ঞানের দুই ভাগ—আর্ট ও সায়েন্স্। লেখা দুই প্রকারের—বাম হইতে দক্ষিণে বা দক্ষিণ হইতে বামে। কাব্য দুই প্রকারের—গদ্য ও পদ্য। বাঙ্গলায় প্রধানতঃ দুই প্রকারের লেখা বেশী বাহির হয়, উপন্যাস ও কবিতা। তন্মধ্যে উপন্যাস গ্রাহকের নিকট কাটে আর কবিতাবই পোকায় কাটে। পত্র দুই প্রকারের—মাসিক ও সংবাদ। উহাদের কর্ত্তা দুই—সম্পাদক ও ম্যানেজার।

আমাদের মুদ্রা প্রধানতঃ দুই—টাকা ও পয়সা, ওজন প্রধানতঃ—মণ ও সের, মাপ ছোট হইলে হাত ও আঙ্গুল, বড় হইলে বিঘা ও কাঠা। সময় ছোট হইলে—ঘণ্টা-মিনিট, বড় হইলে—বৎসর-দিন। আমাদের ঘরের জিনিষপত্র সব জোড়া-জোড়া বা যুগলরূপে বর্ত্তমান। চালডাল, নুনতেল, পিতলকাঁসা, সোনারূপা, ছানামাখন, সন্দেশ-রসগোল্লা, মিহিদানাসীতাভোগ, গুড়চিনি, কিস্‌মিস্‌পেস্তা, আমকাঁঠাল, দুধদই, হাঁড়িকুঁড়ি, জিরেগোলমরিচ, কাপড়-জামা, জামাজোড়া, কাপড়চাদর, শিশিবোতল, শালদোশালা, কোটপাতলুন, হুকোকল্কি, তামাকটীকা, পানসুপারী, ছুঁচসুতো, ছুরিকাঁচি, ঘটিবাটী, ঘরদুয়ার, বাহিরেও তাই—নদীনালা, পাহাড়পর্ব্বত, পথঘাট, ইঁটপাথর, খালবিল, দোকানহাট, হাটবাজার।

কাজের বেলায় আমরা—খাইশুই, রাঁধিবাড়ি, হাসিকাঁদি, নাইধুই খেলাধুলো করি নয় আমোদপ্রমোদ করি আবার কখনও হাসিখুসি করি।—আমরা দিইথুই, নিইদিই, মাখিচুখি। সর্ব্বত্র যুগলরূপ। সহজে যুগলরূপ খাঁটি না পাইলেও আমরা একটা কল্পনা করিয়া লই। কাপড়চোপড়, তেলটেল, গহনাগাঁঠি, পোকামাকড়; আবার কখনও একই জিনিষ দুবার আবৃত্ত করিয়া যুগলরূপ গড়ি; যথা -সদাসর্ব্বদা, জ্বালাযন্ত্রণা, কাঙ্গালগরীব, ভুলচুক্। যুগলরূপ এমনই আমাদের অস্থিমজ্জাগত।

বাঙ্গলায় দুই প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমান। হিন্দুর মধ্যে দুই জাত—ব্রাহ্মণ-শূদ্র। ভদ্রের মধ্যে দুই জাত—বামুন-কায়েত। কায়েত বা কায়স্থ মহাশয়রা রঘুনন্দনের ব্যবস্থা উল্টাইয়া ক্ষত্রিয় হইতে আরম্ভ করিয়াছেন তাই তাহাদের মধ্যে ৪ প্রকার কায়স্থ এখন দুই দলে বিভক্ত হইয়াছেন, উপবীতী এবং অনুপবীতী। আমাদের

ধর্ম্মকার্য্যে চাই গুরু-পুরোহিত, নয় নাপিত-পুরোহিত। আমাদের যাত্রী দুই প্রকারের—বর ও কনে। পুত্র দুই প্রকারের—ঔরস ও পোষ্য। বিবাহ দুই প্রকারের—কুমারীবিবাহ ও বিধবাবিবাহ। আমাদের রাজনীতির নেতারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—নরম ও গরম; তজ্জন্য দুইখানি দৈনিক আছে, বেঙ্গলী ও পত্রিকা। কথ্যভাষার উচ্চারণ হিসাবে আমরা দুইভাগে বিভক্ত—হয় বাঙ্গাল নয় বাঙ্গালী। সাহিত্যিকের দুই দল—হয় বস্তুতন্ত্র, নয় ভাবপ্রবণ কিংবা কথ্যভাষার ও সাধুভাষার দল।

দুই ভিন্ন তৃতীয় পন্থা বা অবস্থার অস্তিত্ব আমরা যেমন মানি না—হিরণ্যকশিপুও তেমনই জানিত না তাই সে যখন অমর বর পাইল না তখন সে কৌশলে বর চাহিল "আমি যেন নর কি পশু, দেব কি দৈত্যের হাতে না মরি; ভূমিতে বা আকাশে, বহির্ভাগে বা অভ্যন্তরে এবং দিবসে বা রাত্রিতে না মরি," সে ভাবিল এইরূপে সে ব্রহ্মাকে ঠকাইল। কিন্তু দেবতাগণের বুদ্ধিকৌশলে শেষে সে নিহত হইল। তথাপি আমরা সর্ব্বত্র দুইয়ের অস্তিত্ব দেখি ও মানি। আমাদের শাস্ত্রে তৃতীয় সংখ্যাটি অত্যন্ত অশুভ। প্রমাণ—বলি রাজা ত্রিপাদ ভূমি দান করতে গিয়া বিপাকে ঠেকিয়াছিল তাই আমরা ত্র্যহস্পর্শে বা তিনজনে যাত্রা করি না। যাত্রাকালেও আমরা তাই দুর্গা-দুর্গা নয় হরি-হরি বলি। ত্রিমূর্ত্তির বিষ্ণু ও শিবকে আমরা পূজ্য দেবতা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। ব্রহ্মার নাম সহজে করি না, কেবল বিবাহের সময় প্রজাপতি বলিয়া ডাকি কিন্তু ছাপাখানার-কথনে তিনিও ফড়িং হইয়াছেন। আমরা জন্মমৃত্যুর সময়ে একাই আসি, একাই যাই সেইজন্য কাঁদি। তাই অগৌণে আমরা বিবাহ করিয়া দম্পতি-রূপ ধারণ করি—সংসারে যে যুগলরূপ নহিলে আমাদের একদণ্ড চলে না। আমরা সংসারে যখন বিরক্ত হই তখন কাশী যাই, নয় মক্কা যাই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিরোধে ও মিলনে "দুই" আমাদের হাড়ে হাড়ে গাঁথা। তাই বাঙ্গলার ধর্ম্মে একেশ্বরবাদ অপেক্ষা যুগলরূপবাদের প্রাধান্য অর্থাৎ আমরা সীতারাম, রাধাকৃষ্ণ অথবা হরগৌরী বা শিবদুর্গার উপাসক। আর বাঙ্গালার কর্ম্মে আমরা হয় লক্ষ্মী কিংবা সরস্বতীর উপাসক।

শ্রীরাখালরাজ রায়।

কোচবিহার ষ্টেট্ প্রেসে শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও কোচবিহার সাহিত্য-সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কোচবিহার-সাহিত্য-সভা।

সাম্বৎসরিক-বিশেষ অধিবেশন।

ল্যান্সডাউন হল, ১৩২৫ সন ১লা বৈশাখ, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬।০ ঘটিকা।

সভাপতি।

সভার অভিভাবক কোচবিহারাধিপতি

মহামহিম শ্রীশ্রীমহারাজ সার জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, কে, সি, এস্ আই।

কার্য্যবিবরণ।

১। শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে নিম্নলিখিত আবাহন সঙ্গীত গীত হয়।

ছায়ানট—একতালা।

আমরা জ্ঞানের ভিখারি মিলেছি
জ্ঞান-মন্দির-দ্বারে,
জ্ঞানদা জননী সন্তানে তব
ফিরায়ো না বারে বারে।
তোমার বিন্দু কৃপাকণিকায়
ভিক্ষুর ঘরে ধন লুটে যায়,
মোরা কি ফিরিব রিক্ত হিয়ায়
নিরাশা অন্ধকারে?
জ্ঞানদা জননী সন্তানে তব
ফিরায়ো না বারে বারে
ভারত গগনে উদিছে অরুণ
জাগিতেছে আশা নবে,
বঞ্চিত হ'য়ে ফিরিব না বুঝি
তব অক্ষয় ধনে।
প্রসাদ ভিক্ষু সন্তান দলে
...ের মাল্য দোলাইবে গলে,
রিক্ত হৃদয় ভাণ্ড ভরিবে
জ্ঞান অমৃতধারে।
জ্ঞানদা জননী সন্তানে তব
ফিরায়ো না বারে বারে।

২। শ্রীযুক্তা রাণী নিরুপমা দেবী মহোদয়া রচিত নিম্নলিখিত উদ্বোধন কবিতা সদস্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পাঠ করেন।

উদ্বোধন।

জ্ঞানের তীর্থে শুদ্ধ হইতে
এসেছে মোদের পরাণগুলি
মন্ত্র হৃদয়ে তুলে নেব আজ
এই ভারতের পুণ্যধূলি!
এই যে গগন ধ্যানগম্ভীর,
কল-জলধারা এই জলধির,
ইহার সম্মুখে প্রণত হইয়া
দাঁড়াইব আজ বিভেদ ভুলি,
জ্ঞানের তীর্থ-পুণ্য-সলিলে,
শুদ্ধ করিব হৃদয়গুলি!

কে বলে মোদের দরিদ্র দীন,
বঞ্চিত কেবা করিতে আসে,
যার লাঞ্ছনা বাজিয়াছে বুকে,
জড়াইয়া আছে প্রাণের পাশে!
শতযুগে ঢাকা এ জ্ঞানের খনি,
খুঁজিয়া তুলিব অমূল্য মণি
নিজ ধনে আজ হব মোরা ধনী,
হাসাব আবার ভাগ্যাকাশে,
রাজরাণী যার আপন জননী,
কে তাহারে ঘৃণা করিতে আসে

কতদিক হ'তে জীবনের ধারা
মিলিয়াছে মহাসাগর নীরে,
যুগে যুগে কত জ্ঞানের মন্ত্র
ধ্বনিয়া উঠেছে ইহার তীরে।
চীন, বৌদ্ধের ভিক্ষুরদল,
শিল্প-বিলাসী পাঠান, মোগল,
আর্য্যঋষির যজ্ঞ-অনল
জ্বলিতেছে আজো ইহারে ঘিরে,
মিলিয়াছে শত জীবনের ধারা
এই ভারতের সাগর-নীরে।

ভুলিব না মোরা তাঁরই সন্তান,
ভুলিবনা মোরা তাঁহারি ছেলে,
জ্ঞানের আলোকে জাগিয়া উঠিব,
অজ্ঞ-জড়তা-তিমির ঠেলে!
চির আরাধিতা আমাদের দেবী,
চল আজ তাঁর শ্রীচরণ সেবি
ভক্তি জড়িত অঞ্জলি ভরি
জ্ঞানের স্বর্ণ-পদ্ম মেলে,
ভুলিব না মোরা জ্ঞান-অধিকারী,
ভুলিব না মোরা মায়ের ছেলে।

জ্ঞান রতনের ভাণ্ডারী যিনি,
তিনি আজ নিন্ মোদের ভার,
পথের দিশারী কাণ্ডারী হ'য়ে
পার করে দিন্ এ পারাবার!
হৃদয়ে জ্বালুন্ সত্যের শিখা,
দিব্য জ্ঞানের অক্ষয় টীকা
ললাটের পরে এঁকে দিন্ আজ,
আপন পুণ্য-করেতে তাঁর,
জ্ঞান ভাণ্ডারে ভাণ্ডারী যিনি,
তিনি আজ নিন্ মোদের ভার।

৩। সম্পাদক কর্ত্তৃক সভার ১৩১৪ সনের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পঠিত হইলে শ্রীযুক্ত প্রিন্স ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ মহোদয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দে মজুমদার মহাশয়ের সমর্থনে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হয়। অতঃপর সভাপতি মহারাজ ভূপ বাহাদুর নিম্নলিখিত অভিমত ব্যক্ত করেন।

His Highness said that he was sure that the report which had just then been read must have convinced all who were present of the efficiency with which the work of the Sahitya Sabha had been carried on in the past year. It should be congratulated for having been able to unearth so many works of Maharajah Harendra Narayan and others. It seemed that no body before, attached any importance to the past history of the State, as should have been done.

His Highness found that a good many books had been added to the sixty-nine of last year's and he expected that most of them were useful. The resultant effect of the researches of the Sabha had been the collection of the books of His Highness' great-grand father and Chila Rai, and of the poems of Maharani Brindeswari and the Sabha could boast of having done something very useful for the State of Cooch Behar.

His Highness thought that Babu Sarat Chandra Ghoshal should be publicly thanked for having undertaken a work which was by no means easy.

His Highness fully recognised the difficulty felt for the want of a separate habitation for the Sabha. His Highness could not at present promise anything but he was sure that very soon a Town Hall would be built which would provide suitable accommodation for the Sabha.

As the price of paper had gone up, His Highness proposed to give something more towards the cost of publication of the books of the Sabha. His Highness said that he would give the Sabha a further sum of Rs 500 for the purpose.

In conclusion, His Highness summed up by saying that he had nothing more to say except to congratulate those who deserved to be congratulated and he hoped that they would continue their work with equal zeal and luck and be able to unearth more books which would be useful for writing the history of the State.

বঙ্গানুবাদ।

সভাপতি মহোদয় নিম্নলিখিত মর্ম্মে বলিলেন:—যে কার্য্যবিবরণী এখন পঠিত হইল, উহা গত বৎসরে সভা যে দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়াছে তদ্বিষয়ে উপস্থিত সকলের প্রতীতি উৎপাদন করিয়াছে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ও অন্যান্য লেখকের এতগুলি গ্রন্থ আবিষ্কার করার জন্য সভা ধন্যবাদ পাইবার যোগ্য। বোধহয়, ইহার পূর্ব্বে আর কেহ কোচবিহারের অতীত ইতিহাসের উপযুক্ত প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন নাই। গত বৎসরের ৬৯ খানি পুস্তকের সহিত বহু গ্রন্থ যোগ করা হইয়াছে। আশা করি ইহার অধিকাংশই প্রয়োজনীয়। সভার অনুসন্ধানের পরিণাম ফলে আমার বৃদ্ধপিতামহ ও

চিন্তা রায়ের গ্রন্থ এবং মহারাণী বৃন্দেশ্বরীর কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। কোচবিহার রাজ্যের বিশেষ প্রয়োজনীয় কিছু কাজ করিয়াছে বলিয়া সভা গর্ব্ব করিতে পারে। বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষাল যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কোন প্রকারেই সহজ নহে। আমি মনে করি এজন্য তিনি প্রকাশ্য ভাবে ধন্যবাদার্হ। সভার পৃথক্ গৃহের অভাবে যে অসুবিধা অনুভূত হইতেছে তাহা আমি সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিতেছি। এক্ষণে যদিও কোন প্রতিশ্রুতি করিতে পারি না, তথাপি আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে অতি সত্বরই একটি 'টাউন হল' নির্ম্মিত হইবে। ইহা সভার উপযুক্ত স্থান দিতে পারিবে।

কাগজের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। এই হেতু সভার গ্রন্থাবলী প্রকাশের নিমিত্ত আমি আরও কিছু দিতে ইচ্ছা করি। এই উদ্দেশ্যের জন্য আমি সভাকে আরও ৫০০৲ শত টাকা দিব।

আমার আর কিছু বলিবার নাই। যাঁহারা ধন্যবাদার্হ তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। আশা করি তাঁহারা এইরূপ উৎসাহে কার্য্য করিতে থাকিবেন, ফলপ্রাপ্তিতে এইরূপ সৌভাগ্যশালী হইবেন, এবং এরাজ্যের ইতিহাস রচনার পক্ষে প্রয়োজনীয় আরও গ্রন্থ আবিষ্কার করিতে পারিবেন।

৪। সভার সহকারী-সভাপতি শ্রীযুক্ত দেওয়ান নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় বলেন যে;—

"সাহিত্য-সভার পক্ষে আমি মহারাজকে আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। শত কার্য্যের মধ্যে অবসর সৃজন করিয়া অনেক অসুবিধা অগ্রাহ্য ও অতিক্রম করিয়া তিনি যে কৃপা করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ এবং সহানুভূতি দ্বারা আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন, তাহার জন্য সাহিত্যসভা তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞ থাকিবে ও রহিল।

সাহিত্যসভা তাহার স্থায়িত্ব, উদ্যোগ এবং উৎসাহ তাঁহার নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছে। ভরসা করি তাঁহার অর্থসাহায্য, উপদেশ এবং উৎসাহে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব।

আমি পুনরায় বার বার তাঁহাকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি।"

সদস্য শ্রীযুক্ত কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ সাহেব কর্ত্তৃক ইহা সমর্থিত ও সমবেত সদস্যমণ্ডলীকর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়। সর্ব্বশেষে সহকারী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মুস্তফী মহাশয় পুষ্পমাল্য দানে সভাপতি মহোদয়কে সম্বর্দ্ধিত করেন। অতঃপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীআমানতউল্যা আহম্মদ—সম্পাদক।

শ্রীভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ—সভাপতি।

কোচবিহার-সাহিত্য-সভার দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণী।

সন ১৩২৪।

কোচবিহারাধিপতি মহামহিম শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর ও শ্রীশ্রীমতী মহারাণী আই দেবতীর অনুমতিক্রমে মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রিন্স ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ মহোদয় ১৩২২ সনের ১৩ই পৌষ তারিখে কোচবিহার-সাহিত্য-সভা স্থাপন করেন। শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার অভিভাবকের পদ গ্রহণ করিয়া সভার গৌরব ও সদস্যবৃন্দের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

১। আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির পরিচালক ছিলেন :—

শ্রীযুক্ত প্রিন্স ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ,—সভাপতি।
,, ,, লেপ্টনান্ট হিতেন্দ্রনারায়ণ ও
,, নরেন্দ্রনাথ সেন, বি.এল., বার-এট্-ল,—সহকারী-সভাপতি।

সভ্য।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম.এ., বি.এল.,।
,, জানকীবল্লভ বিশ্বাস।
,, শরচ্চন্দ্র ঘোষাল, এম.এ., বি.এল.।
,, নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ।
,, রায় চৌধুরী সতীশচন্দ্র মুস্তফী।
,, মনোরথধন দে এম.এ.,।
,, মৌলবী আবদুল হালিম।
,, গঙ্গাপ্রসাদ দাস গুপ্ত, বি.এ.,।
,, দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচী।
,, কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, এম.এ.,—পত্রিকা-সম্পাদক।
,, খান চৌধুরী আমানত উল্যা আহম্মদ,—সম্পাদক।
,, প্রফুল্লচন্দ্র মুস্তফী—সহকারী-সম্পাদক।

২। ১৩২৪ সনে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ৭টী অধিবেশন হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ৬টী অধিবেশন হইয়াছিল।

৩। আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ সভার "বিশিষ্টসদস্য" নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

(১) মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সরস্বতী, শাস্ত্রবাচস্পতি, সম্বুদ্ধাগমচক্রবর্ত্তী, নাইট, সি.এস্.আই., এম্.এ., ডি.এল্., ডি.এস্.সি., এফ্.আর্.এ.এস্., এফ্.আর্.এস.ই., এফ.আর্.এস্.বি., কলিকাতা।

(২) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী, এম্,আর্,এ,এস্., এফ্,আর্,এ,এস্., গৌহাটী।

৪। বর্ষশেষে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ (২১৭ জন) সভার সাধারণ সদস্য শ্রেণীভুক্ত রহিয়াছেন। পূর্ব্ব বৎসরে ১১৫ জন "সাধারণ সদস্য" ছিলেন।

সদস্য তালিকা বর্ণমালাক্রমে।

১। শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র ভারতীভূষণ, কোচবিহার।
২। " অজিতকুমার সেন, কোচবিহার।
৩। " অন্নদাপ্রসাদ রায়, কোচবিহার।
৪। " অমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কোচবিহার।
৫। " অরুণ সেন, বি.এ., বার-এট্-ল, ৮০ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
৬। " অশ্বিনীকুমার পাল, বি.এ. কোচবিহার।
৭। " আজিজর রহমান, কোচবিহার।
৮। " আজিম উদ্দিন আহম্মদ, বড় মরিচা পোঃ।
৯। আদিত্যচন্দ্র কার্য্যী, কোচবিহার।
১০। আনন্দচন্দ্র ঘোষ, ঐ
১১। মৌলবী আনসার উদ্দিন আহম্মদ, বি.এ., ঐ
১২। আফতাব উদ্দিন আহম্মদ, ঐ
১৩। খান চৌধুরী আমানত উল্যা আহম্মদ, ঐ
১৪। আমানত উল্যা আহম্মদ, ডাক্তার। ঐ
১৫। আমীর উদ্দিন মহম্মদ, ঐ
১৬। আমীর উল্যা আহম্মদ, তুফানগঞ্জ।
১৭। আমীর উদ্দিন মহম্মদ, মেখলীগঞ্জ।
১৮। আলীম মহম্মদ, কোচবিহার।
১৯। মৌলবী আবদুল হালিম, কোচবিহার।
২০। আশুতোষ ঘোষ, বি.এল., মাথাভাঙ্গা।
২১। " আশুতোষ দত্ত, বি.এ., বি.এস্.সি., এম্.এস্.সি., কোচবিহার।
২২। " ইন্দুভূষণ দে মজুমদার, বি.এ.,এম্.এস্.সি., কোচবিহার।
২৩। " ইন্দ্রনারায়ণ সরকার, মাথাভাঙ্গা।
২৪। " সেখ মহম্মদ ইব্রাহিম, কোচবিহার।
২৫। " রায় চৌধুরী ঈশানচন্দ্র লাহিড়ী, বামনহাট পোঃ কোচবিহার।
২৬। " উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, এম্.এ., কোচবিহার।
২৭। " উপেন্দ্রনাথ রায়, এম্.এ., কোচবিহার।
২৮। " উমানাথ দত্ত, বি.এল্., মেখলীগঞ্জ।
২৯ " উমেশচন্দ্র সিংহ, কোচবিহার।
৩০ " এমদাদ আহম্মদ, বড় মরিচা পোঃ, কোচবিহার।
৩১ " কমর উদ্দিন আহম্মদ, ঐ।
৩২ " কলিম উদ্দিন আহম্মদ, বলাইরহাট পোঃ, কোচবিহার
" কাজিম উদ্দিন আহম্মদ, কোচবিহার
" কার্ত্তিকচন্দ্র গুপ্ত, কোচবিহার
" কামিনীকুমার রায়, কোচবিহার
" কালীপদ মিত্র এম্.এ. বি.এল্., ভাগলপুর।
" কালীপ্রসাদ সাহা, কোচবিহার।
" কালীমোহন পাল, কোচবিহার।
৩৯ " কিশোরীমোহন বড়ুয়া, দিনহাটা।

শ্রীযুক্ত ঠাকুর কৃষ্ণমোহন সিংহ, মেখলীগঞ্জ।
১ " কৃষ্ণবিনোদ সাহা, এম.এ., কোচবিহার।
২ " কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, কোচবিহার।
৩ " কেদারনাথ বিশ্বাস, কোচবিহার।
৪ কেদারনাথ সিংহ, কোচবিহার।
৪৫ " কৈলাসচন্দ্র সেন, কোচবিহার।
৪৬। শাস্ত্রী কোকিলেশ্বর বিদ্যারত্ন এম্.এ., ১৩।৩ সান্‌-পেণ্টাইন লেন, বহুবাজার (ইউনিভারসিটি কলেজ,) কলিকাতা।
৪৭। " ক্ষেত্রমোহন ব্রহ্ম, কোচবিহার।
৪৮। " ক্ষেত্রলাল সাহা, এম.এ., কোচবিহার।
৪৯। " খগেন্দ্রনারায়ণ পাটয়ারী, আদাবাড়ী, গোসানীমারী, পোঃ কোচবিহার।
৫০। " খড়্গনাথ বা বড় দেউড়ী, গোসানীমারী, পোঃ কোচবিহার।
৫১। " গঙ্গাপ্রসাদ দাস গুপ্ত, বি.এ., কোচবিহার।
৫২। " কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ, এম.আর. এ.সি. কোচবিহার।
৫৩। " গণেশচন্দ্র গুহ, কোচবিহার।
৫৪। " গিরিজামোহন রায়, কোচবিহার।
৫৫। " গিরিজাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, কোচবিহার।
৫৬। " গুরুচরণ রায়, ভোগডাবরী, চিলাহাটী পোঃ, রঙ্গপুর।
৫৭। " গুরুদয়াল ভট্টাচার্য্য,
৫৮। " গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, কাব্যব্যাকরণতীর্থ,কোচবিহার।
৫৯। " গোপালগোবিন্দ গুহ, কোচবিহার।
৬০। " গোপালচন্দ্র গুহ,
৬১। " গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি.এল., কোচবিহার।
৬২। " গোবিন্দচন্দ্র সর্ব্বাধ্যক্ষ, বি.এল., জলপাইগুড়ি।
৬৩। " গোবিন্দবন্ধু রায়, কোচবিহার।
৬৪। " জগদ্বল্লভ বিশ্বাস, এম.এ., বি.এল., কোচবিহার।
৬৫। " জগদীশচন্দ্র সেন, বি.এ., কোচবিহার।
৬৬। " জলধর মিত্র, এল. এম. এস., কোচবিহার।
৬৭। " জর্জ্জ পার্শিভাল এডামসন, কপূর্রতলা।
৬৮। " জানকীবল্লভ বিশ্বাস, কোচবিহার।
৬৯। " জাফর আলি সরকার, দিনহাটা।
৭০। " জিতেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত, বি. এস. সি., কোচবিহার।
৭১। " জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কোচবিহার।
৭২। " জ্ঞানশঙ্কর বাগচী, কোচবিহার।
৭৩। " তারাপ্রসন্ন দাস গুপ্ত, ৩১ নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা।
৭৪। " রায় চৌধুরী তারিণীচরণ চক্রবর্ত্তী, কোচবিহার।
৭৫। " তারিণীমোহন দাস, কোচবিহার।
৭৬। " ত্রিগুণাচরণ চক্রবর্ত্তী, দিনহাটা।

৭৭। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সিংহ, মেখলীগঞ্জ।
৭৮। „ দক্ষিণারঞ্জন ধর, বি.এল., তুফানগঞ্জ।
৭৯। „ দিবাকর চট্টোপাধ্যায়,
৮০। „ দীনেশানন্দ চক্রবর্ত্তী, এল.এম.এস., কোচবিহার।
৮১। „ দুর্গাচরণ সরকার, কোচবিহার।
৮২। „ দেবীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, বি.এ., কোচবিহার।
৮৩। „ দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচী, কোচবিহার।
৮৪। „ ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি.এ. ৩ সার্পেণ্টাইন লেন, কলিকাতা।
৮৫। „ নগেন্দ্রনাথ বসু রায়, এম.এ., কোচবিহার।
৮৬। „ নগেন্দ্রনাথ রায়, এম.এ., বি.এস.সি., এ.সি.জি. আই., জি.এম.আই.ই.ই., কোচবিহার।
৮৭। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি.এ., ঐ
৮৮। নরসিংহচন্দ্র ঘোষ, এম.এ. বি.এল., ঐ
৮৯। নরেন্দ্রনাথ সেন, বি.এল., বার-এট-ল, ঐ
৯০। নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বি.এ. ঐ
৯১। কুমার নলিনীন্দ্রদেব রায়কত, ঐ
৯২। নলিনীমোহন বক্সী, ঐ
৯৩। নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ, ঐ
৯৪। প্রিন্স ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ, ঐ
৯৫। নির্ম্মলচন্দ্র মুস্তফী, বি.এল., ঐ
৯৬। নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ঐ
৯৭। নিবারণচন্দ্র রায়, মেখলীগঞ্জ।
৯৮। নিশাহর বর্ম্মী প্রামানিক, ঐ।
৯৯। নৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, কোচবিহার।
১০০। পঞ্চানন বর্ম্মা, এম.এ. বি.এল., নবাবগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপু
১০১। পদ্মনাথ ঈশর, কোচবিহার।
১০২। পূর্ণচন্দ্র নিয়োগী, ঐ।
১০৩। পূর্ণচন্দ্র মিত্র. বি.এল., জলপাইগুড়ি।
১০৪। প্রফুল্লকমল সেন, কোচবিহার।
১০৫। প্রফুল্লচন্দ্র মুস্তফী, ঐ
১০৬। প্রফুল্লরঞ্জন ধর, এম.এ., ঐ
১০৭। প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়, ঐ
১০৮। প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম.এ. বি.এল., ঐ
১০৯। প্রমদানন্দ রায়, ঐ
১১০। রায় চৌধুরী প্রমদারঞ্জন বক্সী ঐ
১১১। প্রবোধচন্দ্র সেন, ঐ
১১২। প্রবোধচন্দ্র মিত্র, ঐ
১১৩। প্রিয়ভূষণ রায়, বি.এ., ঐ
১১৪। প্রিয়লাল ঘোষ, ঐ
১১৫। ফকির দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ., ঐ
১১৬। মৌলবী ফজলল করিম, কাকিনা পোঃ, রঙ্গপুর।
১১৭। ফণীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, এম.এ., কোচবিহার।
১১৮। মৌলবী বজলর রহমান বি.এল., মাথাভাঙ্গা
১১৯। বরদাচরণ সাংখ্য ভারতী,
১২০। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, কোচবিহার।
১২১। বসন্তকুমার রায়, এম.এ., ঐ
১২২। বাণীনাথ ন্যায়পঞ্চানন, ঐ

১২৩। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার ঘোষ, কোচবিহার।
১২৪। „ বিনোদবিহারী দত্ত, বি.এল., ঐ
১২৫। „ বিপদভঞ্জন ভট্টাচার্য্য, ঐ
১২৬। „ বিভূতিভূষণ বসু, ঐ
১২৭। „ বিমলাচরণ সেন গুপ্ত, ঐ
১২৮। „ বিষ্ণুচরণ মজুমদার, ঐ
১২৯। „ বিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী, ঐ
১৩০। „ কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণ, ঐ
১৩১। „ বীরেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য, এম.এ., ঐ
১৩২। „ বীরেশ্বর সেন, কৃষ্ণনগর।
১৩৩। „ বেচারাম দত্ত, কোচবিহার।
১৩৪। „ বৈকুণ্ঠচন্দ্র নিয়োগী, ঐ
১৩৫। „ বৈকুণ্ঠনাথ দাস, ঐ
১৩৬। „ ব্রজনাথ দত্ত, ঐ
১৩৭। „ ভবাব্ধি কমল সেন ঐ
১৩৮। „ ভানুনাথ বিদ্যারত্ন, ঐ
১৩৯। ভুবনমোহন দত্ত, ঐ
১৪০। ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ. বি.এল., ঐ
১৪১। মথুরানাথ রায়, ঐ
১৪২। মণীন্দ্রনাথ রায়, এম.এ., ঐ
১৪৩। রায় চৌধুরী মনোমোহন বক্সী, ঐ
১৪৪। মনোমোহন সান্যাল, ঐ
১৪৫। মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, ঐ
১৪৬। মনোরঞ্জন দে, এম.এ., ঐ
১৪৭। মন্মথনাথ রায়, ঐ
১৪৮। মহিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঐ
১৪৯। মহেন্দ্রনাথ বর্ম্মা অধিকারী, ঐ
১৫০। মহেন্দ্রনাথ দাস, শীতলখুচী।
১৫১। মোদনাথ স্মৃতিরত্ন, কোচবিহার।
১৫২। মোহিতলাল সেন, এল.এম.এস., ঐ
১৫৩। মোহিনীমোহন বকসী, ঐ
১৫৪। যতীন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, মাথাভাঙ্গা।
১৫৫। যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত, বি.এল. দেবীগঞ্জ পোঃ, জলপাইগুড়ি।
১৫৬। যতীশচন্দ্র সেন, কোচবিহার।
১৫৭। যতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত, ঐ
১৫৮। যদুনাথ নিয়োগী, ঐ
১৫৯। যোগেন্দ্রচন্দ্র রায়, বি.এস.সি., এ.এম. আই.ই.এল. এম. আর. আই কোচবিহার।
১৬০। যোগেন্দ্রনাথ ভিষগ্রত্ন, ঐ
১৬১। যোগেন্দ্রনাথ দাস. ঐ
১৬২। যোগেন্দ্রনাথ বর্ম্মা, বাঘমারা শুকানদিঘী, মাথাভাঙ্গা পোঃ, কোচবিহার।
১৬৩। „ রজনীকান্ত ভৌমিক, এম.এ. বি.এল., মাথাভাঙ্গা।
১৬৪। „ রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী বি.এ. কোচবিহার।
১৬৫। „ রজনীকান্ত রায়, ঐ
১৬৬। রমনীমোহন দত্ত, ঐ
১৬৭। রমেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, কোচবিহার।

১৬৮। শ্রীযুক্ত রমেশনারায়ণ চৌধুরী কোচবিহার।
১৬৯। ,, রসিকলাল মুখোপাধ্যায় ঐ
১৭০। ,, রাখালচন্দ্র বণিক বি.এ. ঐ
১৭১। ,, রাজনারায়ণ পোদ্দার ঐ
১৭২। ,, রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ঐ
১৭৩। ,, রাজেন্দ্রপ্রসাদ রায়, বি.এল. ঐ
১৭৪। ,, রাধাগোবিন্দ রায় ঐ
১৭৫। ,, রামরতন চক্রবর্ত্তী ঐ
১৭৬। ,, রামেন্দ্রনাথ ঘোষ ঐ
১৭৭। ,, মৌলবী রেয়াজ উদ্দিন আহম্মদ, দলগ্রাম, ভুবভাণ্ডার পোঃ, রঙ্গপুর
১৭৮। ,, লাটুগোপাল মুখোপাধ্যায়, কোচবিহার।
১৭৯। ,, লোকনাথ দত্ত, এল.সি.ই, ঐ
১৮০। ,, শরচ্চন্দ্র গুপ্ত, এম. এ. ঐ
১৮১। ,, শরচ্চন্দ্র ঘোষাল, এম.এ. বি.এল; সরস্বতী, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাভূষণ, ভারতী, ঐ
১৮২। ,, শরৎকুমার দেব বক্সী ঐ
১৮৩। ,, শশিভূষণ সেন, ঐ
১৮৪। ,, শশিমোহন বসু, ঐ
১৮৫। ,, শৈলেন্দ্র ঘোষ, বি. এ, দিনহাটা।
১৮৬। ,, শ্যামাচরণ তালুকদার কোচবিহার।
১৮৭। ,, শ্রীনাথ রায় ঐ
১৮৮। ,, শ্রীশচন্দ্র রায় ঐ
১৮৯। ,, সতীশচন্দ্র রায়, ঐ
১৯০। ,, সতীশচন্দ্র গুহ, ঐ
১৯১। ,, রায় চৌধুরী সতীশচন্দ্র মুস্তফী ঐ
১৯২। ,, সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি.এল, ঐ

১৯৩। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী কোচবিহার।
১৯৪। ,, সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত, ঐ
১৯৫। ,, সারদাচরণ মজুমদার ঐ
১৯৬। ,, সীতানাথ রায়, ঐ
১৯৭। ,, সীতেশচন্দ্র সান্যাল, ঐ
১৯৮। ,, সুজনবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, ঐ
১৯৯। ,, সুরেন্দ্রকান্ত বসু মজুমদার বি,এল, ঐ
২০০। ,, সুরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী ঐ
২০১। ,, রায় চৌধুরী সুরেশচন্দ্র মুস্তফী ঐ
২০২। ,, সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী, এম.এ; ঐ
২০৩। ,, সূর্য্যকুমার সামন্ত ঐ
২০৪। ,, সূর্য্যকুমার পাল ঐ
২০৫। ,, সূর্য্যনাথ গুপ্ত, ঐ
১০৬। ,, সোলতান উদ্দিন আহম্মদ ঐ
২০৭। ,, হরকান্ত দে, ঐ
২০৮। ,, হরনাথ সরকার ঐ
২০৯। ,, হরমোহন ভট্টাচার্য্য
২১০। ,, হরসুন্দর সাংখ্যরত্ন,
২১১। ,, হরিদাস সেন গুপ্ত এম.এ., কোচবিহার।
২১২। ,, হরিনাথ বসু, বি.এল., খুলনা
২১৩। ,, হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, বি.এল., ৭৪।২এ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট কলিকাতা
২১৪। ,, হরেন্দ্রনারায়ণ দাস, কোচবিহার।
২১৫। ,, প্রিন্স লেপ্টনাণ্ট হিতেন্দ্রনারায়ণ ঐ
২১৬। ,, হৃদয়ভূষণ ঘোষ, ঐ
২১৭। ,, হেমেন্দ্রকিশোর সেন গুপ্ত, বি.এল; ঐ

৫। আলোচ্য বর্ষে সভার নিম্নলিখিত ৭টী অধিবেশন হইয়াছে। পূর্ব্ববৎসরে ৫টী সাধারণ ও ২টী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

তারিখ	অধিবেশন	পঠিত প্রবন্ধ ও সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ।
১৬ই বৈশাখ	সাধারণ	শ্রীযুক্ত খান চৌধুরী আমানত উল্যা আহম্মদ লিখিত "কোচবিহার রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ হরিদাস মণ্ডল ও তৎপত্নী রাণী হীরা দেবী" প্রবন্ধ।
৬ই শ্রাবণ	বিশেষ (বিদ্যাসাগর স্মৃতিসভা)	শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ লিখিত সানুবাদ সংস্কৃত কবিতা। শ্রীযুক্ত গিরিজামোহন রায়, জানকী বল্লভ বিশ্বাস, নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ ও সুরেন্দ্র কান্ত বসু মজুমদারকর্ত্তৃক বিদ্যাসাগর-জীবনী আলোচনা।
১৩ই শ্রাবণ	সাধারণ	শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী কোকিলেশ্বর বিদ্যারত্ন লিখিত "মায়াবাদ" প্রবন্ধ। মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের গ্রন্থাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা।

আপনার অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেম আপনাকে সমাজের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির নিমিত্ত নিযুক্ত রাখিয়াছে। দেশের সর্ব্বত্র পাঠশালার নিম্নশিক্ষা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা পর্য্যন্ত নানাপ্রকার সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিভাগের বিদ্যার উন্নতি এবং বিস্তার সম্বন্ধে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গঠন ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিবিধান সম্বন্ধে, নানাপ্রকার উচ্চাবচ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের নানাবিভাগে পাঠ্যপুস্তক এবং বিষয়ের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে, বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার সমাদর সংস্থাপন সম্বন্ধে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রতিভাশালী নিষ্ঠাপর শিক্ষার্থী ছাত্রদিগের উত্তরোত্তর অধ্যয়নস্পৃহা এবং জ্ঞানলিপ্সা সম্বর্দ্ধনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আপনি যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য সমগ্র দেশ আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। দেশের ভবিষ্যৎ আশাভরসার স্থল ছাত্রমণ্ডলী যাহাতে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা এবং সাধনায় ঋষিদিগের মহান্ আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রাচ্যের সনাতন সভ্যতার সহিত প্রতীচ্যের নূতন সভ্যতার নিত্য নব নব উন্নতি এবং উন্মেষশীল সামাজিক এবং নৈতিক আদর্শসমূহের সামঞ্জস্য বিধান এবং সংসারক্ষেত্রে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিয়া জগদ্বাসীর বিরাট পরিষদে বিজয়গৌরবে সমলঙ্কৃত হইয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল এবং জন্ম সার্থক করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে আপনার অতুলকীর্ত্তি ভবিষ্যতের অনুকরণীয় হইয়া থাকিবে। আমরা ভারতের এতাদৃশ সুসন্তানকে আমাদের গৃহে পাইয়া ধন্য এবং কৃতার্থ হইয়াছি, ও আনন্দবিহ্বল-চিত্তে পুনঃ পুনঃ আপনার অভিনন্দন করিতেছি।

এই পুণ্যভূমি কামরূপের রত্নস্বরূপ কোচবিহাররাজ্যে শিববংশাবতংশ শুভচরিত্র পুণ্যশ্লোক বিদ্বজ্জন-প্রতিপালক বিদ্যারসিক মহাপ্রতাপান্বিত নরপতিগণ সকলেই বিদ্যার এবং বিদ্বানের সমুচিত সমাদর এবং পূজা করিয়াছেন। অর্দ্ধআর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর মহারাজ নরনারায়ণ এবং তাঁহার সহোদর দিগ্‌বিজয়ী বীরচূড়ামণি সেনাপতি শুক্লধ্বজের সভা সেকালের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতসমূহে সতত সমুদ্ভাসিত থাকিত। মহারাজ প্রাণ-নারায়ণের পঞ্চরত্ন পণ্ডিতসভা দেশবিখ্যাত ছিল। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী আজিও রাজকীয় পুস্তকাগারের শোভা এবং সমৃদ্ধিবর্দ্ধন করিতেছে, এবং সাহিত্যসভা ঐ গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ এবং রাজ্যের সর্ব্বশ্রেণীর শত শত বিদ্যালয় মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের বিদ্যানুরাগের জ্বলন্ত নিদর্শনরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীশ্রীজিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির আশ্রয় এবং তিনিই এই সাহিত্যসভার প্রাণস্বরূপ। তাঁহার সুযোগ্য মধ্যম সহোদর মহারাজকুমার শ্রীল শ্রীযুক্ত ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ মহোদয় আমাদের সভাপতি। তাঁহাদের কৃপাতেই আমরা অদ্য এই রাজধানীতে ভবাদৃশ মহানুভব সজ্জনের প্রতি আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা সম্মান ও অভিনন্দন অর্পণ করিতে সমর্থ হইতেছি।

আপনার প্রতি আমাদের হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আমরা আপনাকে আমাদের এই সাহিত্য সভার "বিশিষ্টসদস্য" পদে বরণ করিয়াছি এবং আপনি যে কৃপাপূর্ব্বক এই পদ গ্রহণে আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি ইতি।"

অভিনন্দন পত্রের উত্তর।

কোচবিহার সাহিত্য সভার সভাবৃন্দ এবং ভদ্র মহোদয়গণ :—

যে সাহিত্যসভার অভিভাবক কোচবিহারের অধিপতি, যাহার সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রিন্স ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ, যাহার সহকারী সভাপতি আমার বহুকালের বন্ধু শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় সেই সভার বিশিষ্টসদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হওয়া অত্যন্ত সম্মান বলিয়া মনে করিতেছি (করতালি)। আমার যখন রাজকীয় কর্ম্মোপলক্ষে কোচবিহারে আসিবার কথা হয়, তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে আপনারা আমাকে এরূপ ভাবে অভিবাদন করিবেন।

আপনারা যে অভিনন্দনপত্র দিয়াছেন, তাহা আমি অন্য সর্ব্বপ্রকার অভিনন্দনপত্র অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করি (করতালি)। ভারতের স্বাধীন রাজ্য সমূহের মধ্যে কোচবিহার প্রধানতম।

তহার কারণ স্বর্গগত মহারাজের উদ্যোগে ও চেষ্টায় কোচবিহার রাজ্যে যেরূপ শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে, সেরূপ কোথাও দেখা যায় না (করতালি)। আমরা ব্রীটীশ ভারতের অধিবাসী হইয়াও দেখিতেছি যে কোচবিহারে যেরূপ শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে, ব্রীটীশ ভারতে সেরূপ হয় নাই (করতালি)।

আপনারা বাঙ্গালাভাষার উন্নতি এবং দেশের ইতিহাসের অনুশীলনের জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে আমি প্রীত হইয়াছি এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যেন আপনাদের এই অধ্যবসায় সফল হয়।

আমার ইচ্ছা ছিল যে অন্ততঃ দুই তিন দিন এখানে থাকিয়া সকলের সহিত আলাপ করিয়া সুখী হই; কিন্তু রাজকার্য্যের উৎপাতে—উৎপাতই—বলিতেছি, সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। আজ এখনকার রাজকীয় কাজ শেষ হইয়াছে, এবং আজই আমাকে কলিকাতা যাইতে হইবে। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে কোচবিহারে আমরা যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি (করতালি)।

আমি পুনরায় আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

৮। আলোচ্যবর্ষে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের ১০ম অধিবেশন বগুড়া নগরে আহূত হইয়াছিল। অভ্যর্থনা সমিতির নিমন্ত্রণানুসারে সভার দুই জন প্রতিনিধি ও কয়েক জন সদস্য উক্ত অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন।

৯। ভূতপূর্ব্ব কোচবিহারাধিপতি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের অনুবাদিত ও বিরচিত ১২ খানা পুথি এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে সঙ্গীত পুথীখানার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। কয়েকখানা পুঁথির অংশ বিশেষ তাঁহার রচনা। পুথিগুলি শতবৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালা সাহিত্যের সমআসনে স্থান পাইবার উপযুক্ত। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় পরিদর্শনান্তর পুঁথিগুলির মুদ্রণ বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। সভা প্রথমাবধি এই সমস্ত পুঁথি মুদ্রণের চেষ্টায় প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপবাহাদুরের কার্য্যালয়ের বিগত ১৯১৬ সনের ৩১এ মে তারিখের ৪০৯ নং পত্রে পুঁথিগুলি মুদ্রণের অনুমতি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্য পরিষদে প্রাচীনপুথি মুদ্রণ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে। সভা বিশেষ আলোচনার পরে উপরোক্ত পুথির বর্ণবিন্যাস ও ভাষা যথাযথ রক্ষা করিয়া মুদ্রণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা যে কেবল মাত্র পুঁথিগুলি যথাযথ রক্ষিত হইবে ইহা নহে, সমসাময়িক ভাষার রূপ ও লিখন পদ্ধতি ইহাতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। সদস্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের সম্পাদকতায় কলিকাতা ও স্থানীয় প্রেসে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী মুদ্রিত হইতেছে। মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের বিরচিত অনেকগুলি সঙ্গীত ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী মহারাণী বৃন্দেশ্বরী আইদেবতীর বিরচিত কোচবিহারের পদ্য ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

১০। কোচবিহার ট্রেজারী ব্যতীত শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপবাহাদুরের নিজের অধিকারে বহু সংখ্যক প্রাচীন স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা রক্ষিত আছে। মুদ্রাগুলির পরিচয় ব্যক্ত হইলে দেশের তাৎকালিক ধর্ম্মবিশ্বাস, শিল্প, বিজ্ঞান ও সভ্যতার অনেক সংবাদ জনসমাজে প্রচারিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। সভাপতি মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে মুদ্রাগুলির পাঠোদ্ধার হইতেছে। খান চৌধুরী আমানতউল্যা আহম্মদ নারায়ণী মুদ্রাগুলির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল হালিম, সেখ মহাম্মদ ইব্রাহিম ও খান চৌধুরী আমানতউল্যা আহম্মদ কর্ত্তৃক, আরব্য ও পারস্যাক্ষরে লিখিত নিম্নলিখিত মুদ্রা গুলির পাঠোদ্ধার হইয়াছে :—

	নাম	অক্ষর	ধাতু	সংখ্যা	সময়	মন্তব্য
	কোচবিহার					
১।	মহারাজ নরনারায়ণ	মিশ্র দেবনাগর	রৌপ্য	১	১৪৭৭ শক	ওজন ১৫৮·৫৬ গ্রেণ ৮৵০ আনা ও প্রায় অর্দ্ধ পাই।
২।	„ লক্ষ্মীনারায়ণ	„	„	১	১৫০৯ „	১৫০·৪৬৭ গ্রেণ ৮৴১৷০ পাই

১৫ই আশ্বিন	সাধারণ	শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন লিখিত "বঙ্গভাষা" প্রবন্ধ (আংশিক পঠিত)। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়কে "বিশিষ্ট সদস্য" নির্ব্বাচন।
২২এ পৌষ	,,	শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনায় ব্যবস্থা ও তাঁহাকে 'বিশিষ্ট সদস্য" নির্ব্বাচন।
৫ই ফাল্গুন	,,	শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ লিখিত "সেবাধর্ম্ম" প্রবন্ধ।
২৪এ চৈত্র	বার্ষিক	১৩২৫ সনের সম্ভাব্য আয়ব্যয় অবধারণ ও উক্ত সনের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠন।

৬। বিগত ১৩ই বৈশাখের অধিবেশনে বঙ্গের সুসন্তান শ্রীযুক্ত সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয় সভায় আগমন করিয়াছিলেন। সভার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণান্তর তিনি ইংরেজী ভাষায় যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল:—

"ইংরেজী ভাষায় বলিতেছি বলিয়া সর্ব্বাগ্রে আমি আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমাকে কিছু বলিবার জন্য আহ্বান করা হইবে এ বিষয়ে যদিও পূর্ব্বে আমায় কেহ সতর্ক করিয়া দেন নাই, তথাপি আপনারা আমায় যে অনুগ্রহ পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়াছেন তাহার জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিবার এই সুযোগপ্রাপ্ত হওয়াতে আমি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। কোচবিহারে এই আমার প্রথম আগমন, আমি একজন অপরিচিতের ন্যায় আপনাদের নিকট আসিয়াছিলাম। আপনাদের মধ্যে আমি দুইদিন মাত্র আছি, এ কথা বিবেচনা করিলে, আপনাদের অভ্যর্থনার আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ না হইয়া পারি না।

"এইরূপ এক ক্ষুদ্র স্থানেও এই প্রদেশের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য আপনারা একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। একটা কথা আছে "অতীত চিরদিনই অতীত। আমাদের তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই।" কিন্তু ইহা ঠিক্ নহে। আমরা অতীতেরই ধারা, এবং অতীতের সহিত সম্বন্ধ না রাখিয়া আমাদের বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ গঠন করিতে পারি না। আমাদের জাতীয় উন্নতির জন্য অতীতের ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে হইবে। অতীতের ব্যর্থতা আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিবে এবং অতীতের সফলতা দৃষ্টি করিয়া আমরা আমাদের পথ এমন ভাবে গঠন করিতে পারি যাহাতে বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে আমরা সিদ্ধিলাভ করিব।

"আমরা জানি যে প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে ইতিহাস অনাদৃত ছিল। মুসলমান আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, কাশ্মীরের ক্ষুদ্র ইতিহাস ব্যতীত, ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে কোন প্রাচীন ধারাবাহিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল না। প্রাচীন ভারতে ঐতিহাসিক গ্রন্থের অভাবের হেতু বুঝাইবার জন্য বহু কারণ অনুমিত হইয়া থাকে, কিন্তু সেগুলির উল্লেখের প্রয়োজন নাই। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে যদিও সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থ আমরা পাইয়াছি, প্রাচীন ভারতে ইতিহাস সম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ আমরা পাই নাই।

"প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সঙ্কলনে আমাদের প্রয়াস বিঘ্নসঙ্কুল। কিন্তু দেশের নানা স্থানে মুদ্রা, খোদিত লিপি, তাম্রশাসন এবং নানাপ্রকার ধ্বংসাবশেষ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে! সমসাময়িক প্রাচীন লেখকগণের বর্ণিত প্রাচীন ভারতের কাহিনীও আমরা পাইয়াছি। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারি, অশোকের শিলালিপি, মেগাস্থিনিস, ফা হিয়ান ও হিউএন সাঙের বর্ণনা আমরা পাইয়াছি, পরম্পরাক্রমে আগত জনপ্রবাদও আমরা পাইয়াছি।

পুরাণ সমূহেও ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে। এই সকল একত্রিত করা বর্ত্তমান যুগের ঐতিহাসিকের পক্ষে দুরূহ কার্য্য ; কঙ্কালের অংশবিশেষ হইতে প্রাণীতত্ত্ববিদ্ যেমন অতিকায় জীবদেহ গঠন করেন, এ কর্ত্তব্য তেমনি কঠিন। কিন্তু এই সকল বাধা সত্বেও আমরা অনেকটা সফলতা লাভ করিয়াছি। এই বিষয়ে বহু সমিতি উত্তম কার্য্য করিতেছেন দেখিয়া আমি আনন্দিত। " বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি " যে সকল উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাসে উজ্জ্বল আলোক সম্পাত হইয়াছে। অতীতের পুনরুদ্ধার এবং সাধারণভাবে গবেষণায় আপনাদের প্রয়াসের সিদ্ধি কামনা করি।"

৭। বিগত ২৫এ পৌষ তারিখে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ম্মোপলক্ষে কোচবিহার নগরে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করার নিমিত্ত উক্ত দিবস অপরাহ্ন ৪৷৷০ ঘটিকার সময় স্থানীয় ল্যান্সডাউনহলে সভার উদ্যোগে একটী সম্মিলনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সম্মিলন সভায় সাহিত্যসভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সুদৃশ্য রৌপ্যাধারে অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয় এবং তিনি তাহার উত্তর প্রদান করেন। অভিনন্দনপত্র ও তাহার উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইল। প্রাচীন নারায়ণী ও ইণ্ডোগ্রীক্ মুদ্রা, ১৬শ শতাব্দীতে পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ অনূদিত দশমস্কন্ধ শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১৭শ শতাব্দীর কবিশেখর অনূদিত মহাভারতীয় কিরাতপর্ব্ব ও মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর অনূদিত ও সঙ্কলিত ক্রিয়াযোগসার, উপকথা, সুন্দরকাণ্ড, সভাপর্ব্ব ও স্কন্দপুরাণ নামক প্রাচীন পুথি সম্মিলনে প্রদর্শিত হইয়াছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুঁথিগুলি পরিদর্শনান্তর সভার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে তাহা মুদ্রিত করিয়া রক্ষার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করেন। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলীর মুদ্রণ কার্য্য পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছে এবং তাহা বিনা পরিবর্ত্তনে যথাযথ মুদ্রিত হইতেছে, অবগত হইয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় সন্তোষ প্রকাশ করেন। সর্ব্বশেষে জলযোগ অন্তে তিনি প্রস্থান করেন।

অভিনন্দন পত্রের প্রতিলিপি।

"মহামাননীয় মহনীয়চরিত নিখিলগুণনিকেতন বিবিধবিদ্যাবিশারদ অশেষশাস্ত্রনিষ্ণাত স্বদেশগৌরব শ্রীযুক্ত সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সরস্বতী, শাস্ত্রবাচস্পতি, সম্বুদ্ধাগমচক্রবর্ত্তী, নাইট্, সি. এস্. আই., এম্.এ., ডি.এল্., ডি.এস্.সি., এফ্. আর্.এ.এস্., এফ্.আর্.এস্.ই., এফ্.আর্.এস্.বি., বঙ্গদেশের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণের বিচার-পতি মহোদয় সমীপেষু,—

মহাত্মন্,

ভারতের শীর্ষমুকুট শৈলরাজ হিমালয়ের পদাশ্রিত গৌড়বঙ্গের পূর্ব্বোত্তরপ্রান্তে অবস্থিত পুরাণপ্রখ্যাত প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষ এবং মধ্যযুগের মহাপবিত্র কামাখ্যা মহাপীঠাধিষ্ঠিত কামরূপ মহারাজ্যের শ্রেষ্ঠতম অংশ এই কোচবিহার রাজ্যের রাজধানীতে আপনার শুভাগমনে কোচবিহার সাহিত্যসভার সদস্যবৃন্দ অতিমাত্র আনন্দোচ্ছ্বসিত হৃদয়ে সবিনয়ে ও সম্মানসহকারে পুনঃ পুনঃ স্বাগতসম্ভাষণ করিতেছে। কোচবিহার রাজধানীতে আপনার এই প্রথম আগমন আমাদের এই দেশের পক্ষে অতিশয় শুভ এবং গৌরবময় ঘটনা। ইহা এই সাহিত্যসভার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় এবং আমাদের স্মৃতিপটে চিরসমুজ্জ্বল থাকিবে। পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে আপনি অনন্যসাধারণপ্রতিভাবলে প্রাচীন এবং নবীন, দেশীয় এবং বিদেশীয় সাহিত্য, গণিত, দর্শন, বিজ্ঞান, ব্যবহার প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যাবিভূষিত এবং জ্ঞানোজ্জ্বলচরিত্রসমলঙ্কৃত হইয়া স্বদেশের কর্ম্মক্ষেত্রে শিক্ষা, সভ্যতা ও চরিত্রের আদর্শরূপে শোভা পাইতেছেন। বঙ্গদেশের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপতিরূপে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চেন্সেলাররূপে আপনার ন্যায়নিষ্ঠতা, সত্যপরতা এবং দক্ষতার সুযশ ভারতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

	নাম	অক্ষর	ধাতু	সংখ্যা	সময়	মন্তব্য
৩।	মহারাজ প্রাণনারায়ণ	মিশ্র দেবনাগর	রৌপ্য	২	---	আধুলি
৪।	,, রূপনারায়ণ	,,	,,	২	...	,,
৫।	,, উপেন্দ্রনারায়ণ	,,	,,	৪	...	,,
৬।	,, দেবেন্দ্রনারায়ণ	,,	,,	৩	...	,,
৭।	,, ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ	,,	,,	১	...	,,
৮।	,, হরেন্দ্রনারায়ণ	,,	,,	২	...	,,
৯।	,, শিবেন্দ্রনারায়ণ।	বাঙ্গালা ও মিশ্রদেবনাগর	,,	২	...	,,
১০।	,, নরেন্দ্রনারায়ণ	,,	,,	১	...	,,
১১।	,, নৃপেন্দ্রনারায়ণ	,,	,,	২	...	,,
১২।	অপঠিত	মিশ্রদেবনাগর	,,	৮	...	,,
	গৌড়েশ্বর—					
১।	গয়েশ উদ্দিন বাহাদুর	আরবী	,,	৪	১৪শ শতাব্দী	
২।	আলাউদ্দিন আলী	,,	,,	১	,,	
৩।	ইলিয়াস সাহ	,,	,,	১১	,,	
৪।	সেকেন্দার সাহ	,,	,,	১৫	,,	
৫।	গয়েশ উদ্দিন আজম সাহ	,,	,,	৩	,,	
	দিল্লীশ্বর—					
১।	আলাউদ্দিন মহাম্মদ	আরবী	,,	৯	১৩শ শতাব্দী	
২।	সুলতান সের সাহ	,,	,,	১	১৬শ শতাব্দী	
৩।	জালাল উদ্দিন আকবর	আরবী ও পারসী	,,	৬৭	১৬শ ও ১৭শ শতাব্দী	
৪।	জাঁহাগীর	পারসী	,,	৭	১৭শ শতাব্দী	
৫।	সাহ জাহান	,,	,,	৩৯	,,	
৬।	আওরঙ্গজেব	,,	,,	৭	১৭শ ও ১৮শ শতাব্দী	
৭।	মহাম্মদ সাহ	,,	,,	৮	১৮শ শতাব্দী	
৮।	আলমগীর (২য়)	,,	,,	১	,,	
৯।	সাহ আলম (২য়)	,,	,,	৩১	,,	
১০।	আকবর (২য়)	,,	,,	৫	১৯শ শতাব্দী	

ব্রাহ্মী, গ্রীক্ ও খরোষ্ঠী অক্ষরে লিখিত অনেকগুলি মুদ্রা উল্লিখিত সংগ্রহের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। (Punch Mark) পঞ্চচিহ্নবিশিষ্ট "পুরাণ" বা "ধরণ" নামক অতি প্রাচীন ৬টি মুদ্রা আছে। মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণের বিচারে এই প্রকারের মুদ্রা বুদ্ধদেবের সমসময়ে ভারতে ব্যবহৃত হইত। এই শ্রেণীর মুদ্রা ভারতের আদিমুদ্রা বলিয়া অনেকে মনে করিয়া থাকেন।

এসিয়াটিক সোসাইটির পুরাতন পত্রিকায় মহারাজ নরনারায়ণের পুরা টাকার চিত্র আছে। আসল মুদ্রা এতদিন লোকলোচনের গোচরীভূত হয় নাই। কোচবিহারের ইতিহাসে প্রকাশ, মহারাজ নরনারায়ণই ১৪৭৭ শকে সর্ব্বপ্রথম

নারায়ণীমুদ্রা প্রচার করেন। উল্লিখিত সংগ্রহের মধ্যে এই মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের ১৫০৯ শকে প্রস্তুত উপরোক্ত পূরা টাকা একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক উপকরণ।

আসামের আহম রাজগণের ৪টি ও জয়ন্তিয়া রাজের ১টি মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

১১। কোচবিহার-রাজপ্রাসাদে রক্ষিত কামান ও তরবারের ক্ষোদিত লিপির পাঠোদ্ধার কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। ইহার সংশ্রবে অন্যান্য আবশ্যক সংবাদ সংগ্রহ অতি দুরূহ কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। বাঁকীপুর খোদাবক্স-পুস্তকাগারে প্রাপ্ত কতকগুলি সংবাদ এই লিপির পাঠোদ্ধারে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। এই লিপির সংশ্রবে অনেক নূতন ঐতিহাসিক তথ্য ব্যক্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। সভাপতি মহোদয় এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকাগারে এতৎসংক্রান্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। সভার অভিভাবক শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপবাহাদুরও এই অনুসন্ধানের সহায়তার নিমিত্ত অনুগ্রহ পূর্ব্বক জামনগর ও জয়পুর দরবারের সহিত স্বয়ং পত্র ব্যবহার করিতেছেন। ভূতপূর্ব্ব কোচবিহারাধিপতিগণের সংশ্রবে নেপালের কাঠমাণ্ডু নগরে উৎকীর্ণ শিলালিপির প্রতিও তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে।

১২। ১৭শ শতাব্দীতে পারস্য ভাষায় "তবারিখেআসাম" নামক কোচবিহার ও আসামের এক খণ্ড ইতিহাস রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ "ফাতেহায়েইব্রিয়া" নামেও পরিচিত। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ইতিহাস লেখক কোচবিহার সম্বন্ধে এতাদৃশ বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন কি না জানিতে পারা যায় নাই। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্. এ; মহাশয় এই গ্রন্থের একখণ্ড শুদ্ধ প্রতিলিপি সভায় প্রদান করিবেন বলিয়া নকল আরম্ভ করিয়াছেন। সভা তাহার ব্যয় ভার বহন করিতেছেন।

১৩। ১৬শ শতাব্দীতে কোচবিহার রাজবংশীয় স্বনামখ্যাত মহাবীর শুক্লধ্বজ গীতগোবিন্দের একখণ্ড সংস্কৃত ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছিলেন। এই সভার বিশিষ্টসদস্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় কর্ত্তৃক অল্প দিন হইল তাহা আসামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। গোস্বামী মহাশয়ের প্রাচীন পুঁথি আলোচনায় বিশেষ দক্ষতা ও প্রতিষ্ঠা আছে। তাঁহার সম্পাদকতায় উক্ত গ্রন্থ সভা হইতে মুদ্রণের চেষ্টা হইতেছে।

১৪। আলোচ্যবর্ষে সভা ভূতপূর্ব্ব কোচবিহারাধিপতি মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণের একটি মুদ্রা ও নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ক্রয় করিয়াছেন।

১। পদ্মপুরাণম্
২। রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী (২য়ভাগ)
৩। সুনীতি
৪। যোগোপনিষৎ
৫। প্রভাত সঙ্গীত
৬। সন্ধ্যা সঙ্গীত
৭। ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলী
৮। ছবি ও গান
৯। কড়ি ও কোমল
১০। মানসী
১১। চিত্রা
১২। চৈতালি
১৩। কণিকা
১৪। ক্ষণিকা
১৫। কল্পনা
১৬। কথা
১৭। কাহিনী
১৮। শিশু
১৯। নৈবেদ্য
২০। খেয়া
২১। গান
২২। ধর্ম্ম সঙ্গীত

উক্ত পত্রিকা কোচবিহার হইতে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। সভার বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পরিশিষ্ট স্বরূপ "পরিচারিকা"য় মুদ্রিত হইতেছে।

১৮। সভার পাঠাগারের দ্বার পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা ও অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত সদস্যগণের নিমিত্ত উন্মুক্ত রাখা হয়। আলোচ্যবর্ষে পাঠাগারের নিমিত্ত নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি সভা ক্রয় করিয়াছেন :—

মাসিক

ভারতী, সবুজপত্র, সাহিত্য ও ভারতবর্ষ।

সাপ্তাহিক

হিতবাদী, সঞ্জীবনী, মোসলেম হিতৈষী ও বসুমতী।

"পরিচারিকা" সম্পাদিকা মহোদয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক নিজের "পরিচারিকা" ও নিম্নলিখিত বিনিময় পত্রিকাগুলি সভার পাঠাগারে বিনামূল্যে প্রদান করিয়াছেন। এজন্য সভা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করিতেছেন।

মাসিক।

প্রবাসী, মানসী ও মর্ম্মবাণী, নব্যভারত, জগজ্জ্যোতিঃ, মালঞ্চ, সৌরভ, প্রবর্ত্তক, আল্‌-এসলাম, স্বাস্থ্যসমাচার, আর্য্যকায়স্থপ্রতিভা, বামাবোধিনী, নারায়ণ, আয়ুর্ব্বেদ, সাহিত্য-সংবাদ, প্রতিভা, কৃষিসম্পদ, ঢাকারিভিউ, ব্রহ্ম ও বিদ্যা ও উদ্বোধন।

ত্রৈমাসিক।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ও রাজসাহী-কলেজ-মেগাজিন।

সাপ্তাহিক।

রঙ্গপুর দর্পণ ও রঙ্গপুর-দিক্‌প্রকাশ।

১৯। সভার অভিভাবক মহামহিম কোচবিহারাধিপতি শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপবাহাদুর অনুগ্রহপূর্ব্বক সভার বার্ষিক উৎসব অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। তিনি সভার হিতার্থে কৃপাপরবশ হইয়া এককালীন ১০০ শত মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন এবং মাসিক ২৫ টাকা করে সাহায্য দান করিতেছেন। তাঁহার এই অনুগ্রহে উৎসাহিত হইয়া সভা মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং আশা করিতেছেন যে তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতায় কামরূপের প্রাচীন সাহিত্য সম্পদ লোক-লোচনের অন্তরালে পাটাবদ্ধ হইয়া আর বিনষ্ট হইবে না।

২০। সভার কার্য্যালয় ও পাঠাগার কোচবিহার নববিধান-সমাজের সংলগ্ন গৃহে স্থাপিত রহিয়াছে। কার্য্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটী পৃথক ও উপযুক্ত গৃহের আবশ্যকতা অনুভূত হইতেছে, কিন্তু আর্থিক অবস্থা অস্বচ্ছল নিবন্ধন এই অভাব মোচনে কার্য্যতঃ কিছুই করিতে পারা যায় নাই।

২১। আলোচ্য বর্ষে ৪০ টাকা বেতনে একজন লেখক সভার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে কয়েক ঘণ্টা কর্ম্ম করিতেন। কার্য্য বৃদ্ধি হেতু বর্ষশেষে ২০ টাকা বেতনে একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। ৮ টাকা বেতনে একজন ভৃত্য সভার অন্যান্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকে।

২২। এই বর্ষে সভার কার্য্যালয় হইতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ১১০ খানা পত্র প্রেরিত ও ১১০ খানা পত্র কার্য্যালয়ে আগত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ৮৮ খানা পত্র প্রেরিত ও ৫০ খানা আগত হইয়াছিল।